ষড়বিংশ বর্ষ ১৩৪৮ সাল	বৈশাখ	প্রথম খণ্ড ১ম সংখ্যা

সংহতি-বিজ্ঞান

ধর্ম্ম ক্রিয়ানিষ্পাদ্য। আমি নির্ব্বিশেষ ধর্ম্মের কথা বল্‌ছি। এই ধর্ম্ম যে শ্রেণী বা জাতি অনুসরণ করে, তার একটা নাম আছে। এই জন্য বলা যায় হিন্দুধর্ম্ম বা ইসলাম-ধর্ম্ম প্রভৃতি। পরন্তু ধর্ম্মটা ধর্ম্মই এবং প্রত্যেক মানুষেরই তা' অনুসরণীয়।

ধর্ম্ম মানুষের দেহ-পরিচ্ছিন্ন আত্মার সুপ্ত মহাশক্তি জাগ্রত করে—আত্মজ্ঞান প্রকাশ পায়। আত্মার গুণ নিরাসক্তি ও জ্ঞান। তা' উপরে সূর্য্যকরের ন্যায় জ্যোতির্ম্মণ্ডল সৃজন করে আর নিম্নে কর্ম্মক্ষেত্রের বিস্তৃতি হয় দেহাদির আশ্রয়ে। যে কর্ম্ম সুখ, শান্তি ও গতি অনাহত রাখে, তাহাই ধর্ম্ম নামে অভিহিত হয়। ধর্ম্মই অধর্ম্ম নাম ধরে যখন উহা [illegible] প্রকরণ আশ্রয় না করে। ধর্ম্মও যথাযথ প্রকরণের সাহায্যে মানুষের ঐহিক সুখ ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রকাশ করে।

মানুষের অভ্যুত্থান ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে হলেও তা' ধর্ম্ম। দেশ ও জাতি হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন ছন্দঃ হবেই। কিন্তু ধর্ম্ম যে জাগরণের গতির আশ্রয়, এ কথা কেহই অস্বীকার করে না।

একটি দেশের মধ্যে অধিকাংশ লোক যদি কোন একটি প্রকরণের মধ্য দিয়ে কর্ম্ম করে, তা' হলে তাদের আকৃতি ও প্রকৃতিগত এক প্রকার ঐক্য অভিব্যক্ত হয় এবং প্রকরণটি নিয়ম ও সংযমপূত হওয়ায়, প্রকৃতির সহিত মস্তিষ্কের গঠনও সমভাবে সম্পন্ন হয়। এই জন্য ভারতে জাতি গড়ার জন্য জন্মকাল থেকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত এক সম আচার-পালনের শাসন প্রবর্ত্তিত হয়েছিল।

শ্রদ্ধা ও প্রত্যয় না থাকলে, গুরু বা শাস্ত্র-প্রবর্ত্তিত সকল আচার পালন ও গ্রহণ করা অনেকের পক্ষে সম্ভব হয় না। আত্মসংযমও এক প্রকার প্রকরণ। এই সঙ্কল্প গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে কোন এক গুরু বা তৎপ্রচারিত শাস্ত্রা[illegible] হওয়াটা স্বাভাবিক হয় এবং অনেকে যখন এইরূপ সম প্রকরণ গ্রহণ ও পালন করে, তাদের মধ্যে ধীরে ধীরে মূলগত ঐক্যপ্রতিষ্ঠা হয়ে থাকে। বাইরের সংঘাত এ ক্ষেত্রে স্থায়ী নয়; কেন না একই প্রকরণে শ্রদ্ধাশীল অনেকের মধ্যে ঐক্য-বন্ধন দৃঢ় হবেই—এর অন্যথা হতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রনির্দ্দেশ বা প্রকরণ-পালনের যদি ব্যবস্থা থাকে, সেখানেই অনৈক্য স্থায়ী হবে। স্বার্থকে কেন্দ্র করে' যেখানে অনেকে মিলিত হয়, অন্তরের ঐক্য কোন মতেই সে ক্ষেত্রে সম্ভব হতে পারে না। স্বার্থ যখন ভিন্ন ভিন্ন শতধা বিভক্ত হয়, তখন সেখানে বাক্য, মন এবং কর্ম্মও বিপরীত পথে পরস্পরকে ভিন্নমুখী ও বিরোধী করে' তোলে। এই অবস্থায় সংহতির মূল্যও কিছুই নয়, ইহা বলাই বাহুল্য। সংহতির মূলগত কয়েক জনের মধ্যে বাহ্যতঃ কার্য্যতঃ সংহতিবদ্ধ হ[illegible] চেষ্টার চেয়ে প্রকরণকে আশ্রয় করে' ও মস্তিষ্কগত ঐক্যসৃষ্টিই বাঞ্ছনীয় মনে করি।

গলদ কোথায় ?

শ্রীমতিলাল রায়

"প্রবর্ত্তকে"র সেবায় পূর্ণাহুতি দেওয়ার পর, পত্রিকার চালকবর্গের নিকট হইতে অনুরুদ্ধ হইয়া "প্রবর্ত্তকে" কিছু কিছু লেখার প্রতিশ্রুতি দিয়াছি। আমার অনুরাগী পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট হইতেও এইরূপ অনুযোগ পাইয়াছি।

আমি নববর্ষে "প্রবর্ত্তকে"র আশ্রয়ে জাতির নিকট যে বাণী পৌঁছাইয়া দিতে চাহি, তাহা শুধু শাস্ত্র, যুক্তি ও অনুভূতি-সিদ্ধ নহে, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের ভিত্তির উপরেই ইহা প্রতিষ্ঠিত।

জগতের এই রাষ্ট্র-মন্বন্তরে ভারতের সম্মুখে জাতীয় অভ্যুত্থানের যে নব সূর্য্যোদয়ের সূচনা দেখা দিয়াছে, তাহার প্রথম বন্দনা-গীতি বাঙ্গালীকেই গাহিতে হইবে, ইহাই আমার ঘোষণা।

যদিও বাঙ্গালী জাতি অসংখ্যপ্রকার মতবাদে, শত শত ধর্ম্মগুরুর আবির্ভাবে, লক্ষ্য ও আদর্শের বৈচিত্র্যে শতধা ছিন্ন-ভিন্ন, তবুও আমি বিশ্বাস করি, বাঙ্গালীকেই আবার রাষ্ট্রে, ধর্ম্মে, শিক্ষায়, সাহিত্যে, শিল্পে, বাণিজ্যে, নব সমাজ-প্রবর্ত্তনে সমগ্র ভারতের দিশারী হইতে হইবে। আজ বাংলায় অসংখ্য প্রকার কর্ম্মক্ষেত্রে নানাভাবে কর্ম্মরত নর-নারীর মধ্য হইতে অভিনব ভাবস্রোতে অভিষিক্ত করিয়া একদল নব পুরোহিতকে বাছিয়া লইতে হইবে; ইহারা ভারতের সনাতন সংস্কৃতির প্রচারক হইবেন, নবরাষ্ট্রগঠনের নেতৃস্থান অধিকার করিবেন, নব সমাজ-প্রবর্ত্তনের অগ্রণী হইবেন। ইহারাই জাতীয় জীবনে নবশক্তিসঞ্চারের জন্য সর্ব্বতোভাবে আত্মোৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইবেন। এই মানুষের সংখ্যাধিক্যের প্রয়োজন নাই। একবুদ্ধিবিশিষ্ট শত-সংখ্যক প্রবর্ত্তকের আবির্ভাবপ্রার্থী হইয়া সুমাতা বঙ্গভূমির বন্দনা-গীতি গাহিতেছি।

দেশে আমাদের মানুষ আছে। বর্ত্তমান লোক-[illegible] হয়তো ৫ কোটী বাঙ্গালী [illegible] কোটীতে পরিণত হইবে। কিন্তু এই ৬ কোটী মানুষের প্রাণে জাতীয় সংস্কৃতির প্রভাব-রক্ষার জন্য ৬জন মানুষ পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। জাতীয় জীবনরক্ষার জন্য এইরূপ দিশারীর এমনই অভাব হইয়াছে। এইজন্যই আমরা সব থাকিতেও ভিক্ষুকের অধম, হৃতসর্ব্বস্ব।

কথা শুনিয়া অনেকেই হয়তো বিস্মিত হইবেন। অনেকেই বলি[illegible] ভারতের ন্যূনাধিক ৬০ লক্ষ সন্ন্যাসীর কিছু [illegible], উঁহারা কি এতই নগণ্য যে, জাতীয় অভ্যুত্থানকল্পে কার্য্যকরী নহে? ইহার উত্তরে বলিব—ত্যাগ ও তপস্যাপ্রদীপ্ত সর্ব্বহারা বাঙ্গালীর সংখ্যা কম বলিয়া আমি এই কথা বলিতেছি না। সত্য পথ পরিত্যাগ করিয়া বিপথে ত্যাগ-তপস্যার মাত্রা যতই হউক, উহা শ্রেয়ের কারণ হয় না। মাত্র শত সংখ্যক সত্যাশ্রয়ী কর্ম্মত্যাগী যাহা করিতে পারে, ভ্রান্ত কোটী সন্ন্যাসীর পক্ষেও তাহা সম্ভব হয় না।

আমাদের দেশ ধর্ম্মের দেশ। ধর্ম্মের ভিত্তির উপর জাতির অভ্যুত্থান ও মুক্তি নির্ভর করে—ইহা কোন পুরুষের বাণী নহে, ইহা অপৌরুষেয় বেদ-বাণী। কিন্তু যে চারিটী কারণে আমরা সত্যবঞ্চিত হই, সেইগুলি আমাদের বুদ্ধির মূল ছিন্ন করিয়াছে। আমরা নির্ব্বিচারে ধর্ম্মের বিজ্ঞাপন দেখিয়া অধর্ম্মের অনুসরণ করিতেছি। শ্রুত বাক্যে দৃঢ়-বিশ্বাসী হইয়া শ্রুতির অপমান করিতেছি। যে বস্তু যাহা নহে, সেই বস্তুকে তাহা মনে করিয়া বিপর্য্যয়গ্রস্ত হইতেছি। লৌকিক প্রবাদের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া ধর্ম্মাচার আশ্রয় করিতেছি। এই অবস্থায় ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় আমাদের ত্যাগ, বৈরাগ্য, জ্ঞান, সন্ন্যাস সবই যে নিরর্থক হইবে, এ বিষয়ে আর সংশয় কি?

জাতির পতনযুগ যখন আসে, তখন এইগুলি অনিবার্য্য হয়। পতন—যুগধর্ম্মেই আসে। এইজন্য প্রতিবাদের কিছু নাই। কিন্তু প্রারব্ধ-ক্ষয়ের জন্য যে কর্ম্ম, তাহা অদৃষ্ট বলিয়া আমরা স্বীকার করি; ক্রিয়মাণ অবস্থায়

পুনঃ ভবিষ্যৎ-রচনার পুরুষকারকে আমরা অস্বীকার করিব কেন? ইহাতে পতনের মাত্রাই বৃদ্ধি পাইবে। মানুষ গড্ডলিকা-প্রবাহ নহে। ধর্ম্মানুশাসন মানুষেরই বুদ্ধিগম্য হয়। ঈশ্বর-বিগ্রহ মানুষের মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ। এই মানুষ কালজয়ী হইবে, পরম পুরুষার্থ লাভ করিবে। যুগের ধর্ম্ম বলিয়া অধর্ম্মকে আশ্রয় করিবে, এমন হইতে পারে না।

দুষ্কৃত জনেরা হেয় কর্ম্ম করে, সমাজের অধম স্তর তাহাদের বিচরণক্ষেত্র। সুকৃতিভাজন বলিয়া আমাদের দেশের মহাপুরুষেরা যদি ধর্ম্মের কিম্বদন্তীতে লোকপ্রবাদ-মূলক সাফল্যের মরীচিকা দেখিয়া নির্ব্বিচারে বিপর্য্যয় আনয়ন করেন, ইহাপেক্ষা অধিক অপরাধ আর কিছুতে নাই। এরূপ দৃষ্টান্ত ভুরি ভুরি থাকিবে। [illegible] লিখিত আছে। একটা উদাহরণ দিই। সৃষ্টিমানসে ঈশ্বর স্বয়ং যখন সৃষ্টিধর হইলেন, তখন তাঁহা হইতে যে "জয়গণের" আবির্ভাব হয়, তাঁহাদের তিনি জীবনের পথ নির্দ্দেশ করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। কিন্তু জীবন ক্ষয়বৃদ্ধিশীল। জীবনের উত্থানপতনও আছে। এই দোষ-দর্শনে তাঁহারা জীবনবিমুখ হইয়া মুক্তিপ্রার্থী হইলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁহাদের ক্ষমা করেন নাই—লোকে ময়াননুজ্ঞাতঃ কঃ স্বাতন্ত্র্যমিহার্হতি। অর্থাৎ জগতে আমার অনুজ্ঞা ব্যতীত কে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে পারে? এইরূপ ভর্ৎসনা করিয়া তিনি তাঁহাদের বলিয়াছিলেন, আমি যখন সমস্তই ব্যাপ্ত করিয়া আছি, তখন "কো মাং লোকেঽভিসন্ধয়েৎ" —কে আমাকে অতিক্রম করিতে পারে?

কল্পান্তকালস্থায়ী এই বিশ্বজগতে ঈশ্বরেচ্ছায় যে জীবন-প্রবাহ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা অনতিক্রমণীয়। কত হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুব মনুর যুগে যে সপ্তর্ষির পুণ্যাবির্ভাব ঘটিয়াছিল, সপ্তম মনু বৈবস্বতের সময়ে জনলোক হইতে তাঁহাদের পুনরাবির্ভাব স্মৃতিপ্রসিদ্ধ ইতিহাস। আমরা দেখি—ভারতের পতনযুগে পূর্ব্বোক্ত "জয়গণের" ন্যায় জীবনবাদে বিতৃষ্ণ হইয়া সাধুজনেরা মোক্ষপ্রার্থী হইয়াছেন, ইহা শ্রুতিবিরুদ্ধ নীতি। জীবন বলিতে মর্ত্ত্য জীবনই নহে। আমি নির্ব্বিশেষ জীবনের কথাই বলিতেছি। জীবন হইতে মুক্তির জন্য যে আকূতি, তাহা সত্য পথ নহে, বিপথ। আমাদের দেশে দীর্ঘদিন শিষ্টজন এই পথেই চলিয়াছেন। তাঁহারা মহাজন বলিয়া পূজিত হওয়ায় ধর্ম্ম বলিতে সর্ব্বসাধারণের চিত্ত এই ভ্রান্ত পথেই আকৃষ্ট হয়। এই জন্য ধর্ম্মের ভিত্তির উপর জীবনের প্রতিষ্ঠা আজ কেহ প্রত্যয় করিতে পারে না। অথচ ধর্ম্মের আকর্ষণমুক্তও কেহ নহে। অতএব ভারতীয় সংস্কৃতি আজ বিশৃঙ্খল ও জটিল সমস্যাপূর্ণ।

ধর্ম্ম জীবনের জন্যই। ধর্ম্ম আমাদের শাশ্বত সুখ দেয়, শান্তি ও গতি দেয়; ধর্ম্ম—কর্ম্মের পরিণতি। মানুষ প্রথমেই ধর্ম্মের সন্ধান পায় নাই, কর্ম্মই পাইয়াছিল। কর্ম্ম করিতে করিতেই তাহারা বুঝিয়াছিল—কোন কর্ম্ম শ্রেয়ঃ, কোন কর্ম্ম শ্রেয়ঃ নহে। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় তাহারা বুঝিয়াছিল—যাহা শ্রেয়ঃ, তাহাই অভ্যুত্থানের হেতু, তাহাই অমৃত। তাই মানবজাতি ধর্ম্মামৃতে অভিষিক্ত হইয়া জীবনকেই শাশ্বত বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল। এই ইতিহাস ভারতের অভ্যুত্থান-যুগের। তারপর ধর্ম্ম-বৈকল্যে ধর্ম্ম বিলুপ্ত হয়; জাতির এই পতনযুগই আমাদের সম্মুখে। এই যুগে কি ধর্ম্ম, কি ধর্ম্ম নহে, এই বিচার লইয়া মানুষ বিভ্রান্ত হয়। ক্রমে মতভেদে জ্ঞান-পার্থক্যে জনগণ নানাবিধ শাস্ত্র প্রচার করিতে থাকে। জ্ঞানপার্থক্য নিবন্ধন জাতি কর্ম্মবিপর্য্যয়ে পরস্পর বিদ্বেষী হইয়া জীবনবাদের বেদী চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলে। এই অবস্থাই আমাদের আসিয়াছে। দলাদলি আজ সর্ব্বক্ষেত্রে। মতামতের অনৈক্য পুরামাত্রায় রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্ম্মজীবনে বার রাজপুতের তের হাঁড়ীর ন্যায় আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা নষ্ট করিয়া দিতেছে। দুর্দ্দিনে এমনই হয়। সুদিনের আয়ুঃ শেষ হইল, মৃত্যুলীলার এই লক্ষণ অনিবার্য্য। কিন্তু জীবন-সূত্র ছিন্ন হইবার নহে, আবার পুনরুত্থানও অবশ্যম্ভাবী। আমি অধঃপতনের প্রকরণ প্রদর্শন করিয়া, অভ্যুত্থানের অব্যর্থ বিজ্ঞানের কথা বলিব। মতভেদে বুদ্ধিভেদ হয়। যে মত পুরুষের, সে মত জন্মাদিজনিত অশুদ্ধিগ্রস্ত। এইজন্য ভারতের জাতি শ্রুতি ভিন্ন অন্য মত গ্রহণ করিত না। শ্রুতি অপৌরুষেয় এবং শাশ্বত। শ্রুতি-প্রমাণ ধর্ম্মের প্রমাণস্বরূপ। কিন্তু শ্রুতিবিরুদ্ধ নীতি লইয়া অহঙ্কারী মানুষ স্ব স্ব মত প্রাধান্য [illegible]কাঙ্ক্ষে মহাপুরুষ বা অবতার-[illegible]

আবির্ভূত হন, তখন বহু গুরু ও বহু শাস্ত্রের অনুশাসনে একই জাতির মধ্যে বহু সম্প্রদায় গড়িয়া উঠে। ইহাদের ভিত্তি ধর্ম্ম নহে। কেননা, ইহাদের মতবাদ বেদ-প্রতিষ্ঠ নহে। তাই ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে যত বিদ্বেষ, যত দম্ভ, এমন সাধারণ ক্ষেত্রে নহে। বিপর্য্যয় আশ্রয় করা হেতুই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। কাজেই এই সকল ধর্ম্মমতবৈচিত্র্যে মানুষ সনাতনধর্ম্মহীন হইয়া বাক্য, মন ও কর্ম্মজনিত দুঃখে অবসন্ন হইয়া পড়ে; তারপর নির্ব্বেদপ্রাপ্ত হইয়া সমস্ত জাতিকে অবসাদগ্রস্ত করে। এই অবস্থা সুধীজন প্রত্যক্ষ করিতে পারেন।

নির্ব্বেদের মাত্রা যত ঘনীভূত হয়, ততই বাক্য, মন ও কর্ম্মজনিত দুঃখ হইতে মুক্তির জন্য মানুষের মনে বিচারশক্তি জাগ্রত হয়। বিচার হইতেই বৈরাগ্যের আবির্ভাব। বৈরাগ্যের সমুজ্জ্বল অগ্নিশিখায় গলদের সন্ধান মিলে। কোন দোষে জাতির অধঃপতন, ইহার অবধারণ হয় জ্ঞানে এবং এই সকল সনাতনধর্ম্মী সাধুজন সমষ্টিবদ্ধ হইয়া পতনযুগের অজ্ঞানঘন অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া, আবার জাতিকে অভ্যুদিত করার নূতন আলোক প্রদর্শন করেন।

এই প্রকরণ লক্ষ্যভেদে বিপরীতগামী হয়। মোক্ষ যদি লক্ষ্য হয়, তবে নির্ব্বেদের প্রেরণায় দুঃখ-বিষয়ের বিচার করিতে গিয়া যে বৈরাগ্যের অভ্যুদয় হয়, সেই বৈরাগ্য তাহাকে জীবনবিমুখ করিবেই। কিন্তু জীবন-বাদী এই বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া, জাতীয় জীবনের অধঃ-পতনের হেতুবাদ আবিষ্কারের জন্য ঋতময় জ্ঞানের আগুন প্রজ্জ্বলনপূর্ব্বক মানবতার জয়-কেতন উড়ায়। ভারতের শাস্ত্র ও সংস্কৃতির পরিপন্থীরূপে অজ্ঞানজনের প্রচারিত ধর্ম্মমতকে খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহারা জাতির মৌলিক সংস্কৃতিমূলক জীবন-নীতিই প্রবর্ত্তন করে।

আমি ভারত-সাধনার সকল পর্য্যায় কায়মনোবাক্যে আশ্রয় করিয়াছি। কোন পর্য্যায়ের প্রতি আস্থাহীন হই নাই। কিন্তু সকলেরই সীমা থাকায়, সব কিছুই অতিক্রান্ত হইয়াছে; শেষে উদাত্ত কণ্ঠেই বলিব—বেদ আমাদের শাস্ত্র। বেদের বাণী সত্যই অপৌরুষেয়। কর্ম্ম ও জ্ঞানের পরম বিজ্ঞান বেদেই আছে। এই বেদধর্ম্ম কুতর্কে আত্মগোপন করে, কিন্তু ইহা যুক্তিযুক্ত। বেদ-ধর্ম্মের অসাধারণ জীবনদৃষ্টান্ত এ দেশে বিরল নহে। এই অপার্থিব সংস্কৃতির ইতিহাসও আছে এবং ইহা বিজ্ঞানসঙ্গত।

জাতির অভ্যুত্থানকামী উদীয়মান জাতির সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম[illegible] স্বীকার করিয়া ও সম্মান দিয়া, বাংলার সেই চিহ্নিত বরপুত্রগণকেই আহ্বান করিয়া বলিতেছি, দেবজননি বঙ্গভূমি! তোমার ক্রোড়ে এমন[illegible] সন্তান কি জন্মে নাই মা, যাহারা ভারতীর দুয়ারে নতজানু হইয়া, তোমার বরদৃপ্ত টীকা ললাটে ধরিয়া হাঁকিয়া বলিবে—আমরাই সেই অমৃতের পুত্র! নির্ব্বিশেষ ধর্ম্মের ভিত্তির উপরই জাতির পুনর্জ্জন্ম চাহিতেছি। এই শতদল জীবন-শোভায় দেশ কি আবার ঝলমল করিয়া উঠিবে না? এই মকরন্দের সৌরভে জাতি কি অমৃতের আঘ্রাণ পাইবে না? আমি যে জাতীয় অভ্যুত্থানের মঙ্গলশঙ্খধ্বনি সততই শুনিতেছি—মা, জয় দে! এই সংগঠন-মন্ত্র সিদ্ধ করার জন্য কোন আন্দোলন বা সংঘর্ষের তো প্রয়োজন নাই। সেই শ্রুতি-স্মৃতি-যুক্তি-বিশ্বাসী ভারতীর শতপুত্রের আত্মদানেই নব জাতির ভিত্তিপত্তন হইবে। এই আশার গান শুনিয়াও কি জাতি নীরব থাকিবে? হে বাংলার বরপুত্রগণ! শুধু মনে রাখিও—ধর্ম্মের লক্ষ্য মোক্ষ নহে, জীবন। নির্ব্বিশেষ জীবন। অখণ্ড ভাগবত জীবন। ওঁ শান্তি।
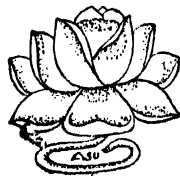
"প্রবর্ত্তকে"র নববর্ষ

রজত-জয়ন্তীর পর "প্রবর্ত্তক" ষড়বিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। এই উপলক্ষে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের অনুষ্ঠিত বর্ষব্যাপী জয়ন্তী-প্রচার-ব্রতও সুসমাপ্ত হইয়াছে। দ্বাদশ মাসে বাংলার দ্বাদশটী জেলায় সংগঠনের মর্ম্মবাণী ঘোষণা করিয়া গত ১৫ই মার্চ্চ তিস্তা নদীর তীরে জলপাইগুড়ি সহরে সঙ্ঘগুরু যোগ্যভাবে এই ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছেন। "প্রবর্ত্তকের" মন্ত্রপ্রচার অ[illegible] থাকিবে। [illegible] নয়, মন্ত্রনিষ্ঠ ভাবসমষ্টির উপরেই নির্ভর করিবে। "প্রবর্ত্তক" পত্রিকার পক্ষে ইহা নিঃসন্দেহে একটা সন্ধিযুগই বলিতে হইবে। সঙ্ঘ, সঙ্ঘের সর্ব্বকর্ম্ম, তথা [illegible] বিজয়কেতন "প্রবর্ত্তক" মুখপত্র চিরদিন যাঁহার আশ্রিত, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবান ও তাঁহার নিত্যকল্যাণময়ী দিব্য প্রেরণা আশ্রয় করিয়া যন্ত্রস্বরূপ আমরা আজও পূত ও সশ্রদ্ধ চিত্তে গুরুদায়িত্বভার মাথা পাতিয়া লইলাম। এই নির্ভরতার মূল—লক্ষ্য ও আদর্শে পরম শ্রদ্ধা। "শক্ত্যাং ভগবতি চ শ্রদ্ধা"—সঙ্ঘসাধনার ইহাই অমোঘ, অব্যর্থ জীবনবীর্য্য।

"প্রবর্ত্তক" জন্ম হইতে আজ পর্য্যন্ত যে স্থির লক্ষ্যের অনুসরণ করিয়াছে, তাহা জাতির পুনর্গঠন—ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারে ভারত-জাতির ঋদ্ধি, সিদ্ধি, মুক্তির প্রতিষ্ঠা। এ লক্ষ্য দুই, দশ, এমন কি সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসরেও যদি সুসিদ্ধ না হইয়া থাকে, বুঝিতে হইবে—সাধনায় পূর্ণাহুতি এখনও বাকী আছে, বাঙালীর তপস্যা এখনও পূর্ণাঙ্গ হয় নাই। বাংলার অসমাপ্ত মুক্তি-সাধনার সূত্র ধরিয়া এখনও "প্রবর্ত্তক"কে লক্ষ্যপথে আলোর সন্ধানে চলিতে হইবে।

বাঙালীর গভীর প্রাণশক্তি এখনও ফল্গু-প্রবাহের মত জাতি-গঠনের প্রেরণায় তপঃরত। এই অভিনব সঙ্কেত অনুসরণ করিয়া তাহাকে চলিতেই হইবে, অন্য পথ তাহার নাই। ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালী জাতিকে আর সব কিছু হইতে বঞ্চিত করিয়া, এই একমাত্র পথেই বিধাতা দীর্ঘদিন আহ্বান করিতেছেন—বাংলার যুগান্ত-ব্যাপী ইতিহাসই তাহার প্রমাণ। বাঙালীর হাড়ে হাড়ে যে ঈশ্বর-বীর্য্য, তাহা কোন আঘাতে, প্রলেপে প্রসুপ্ত বা একেবারে লুপ্ত হওয়ার নহে। প্রচণ্ড বাধার আবর্ত্ত উদ্ভিন্ন করিয়া সে যুগে যুগে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙালীর জীবন-পণ—ভগবানকেই জীবনে সিদ্ধ ও মূর্ত্ত করিবে।

কথার যুগ শেষ হইয়াছে। কথার পরিণতি কাজে—আজ ইহাও সবখানি নহে। বাঙালীর জীবনে যখনই দৈবী প্রেরণা ঢল দিয়া নামিয়াছে, সে তার হৃদয়ের সমস্ত অবদান ঢালিয়া তাকে বরণ করিতে কুণ্ঠা করে নাই—বুকের রক্ত অকাতরে মোক্ষণ করিয়া সে উহা কার্য্যে পরিণত করিতে অগ্রসর হইয়াছে, অসাধ্য সাধন করিয়াছে। বাংলার আত্মদান—ভারতের বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু সে নির্ব্বিচার ত্যাগ ও প্রচুর আত্মবলির সুফলে কেন আজ সে এতখানি বঞ্চিত, উপেক্ষিত—ইহা ভাবিবার কথা বটে!

আপত্তি উঠিবে—আমরা বাংলার হিন্দু শক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই এমন অনুযোগ তুলিতে পারি। বাংলা দে[illegible] শুধু হিন্দুর দেশ নহে, মুসলমানেরও। ইহা সত্য কথা, সন্দেহ নাই। কিন্তু হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, এক সম্প্রদায়কে কোণঠাসা করিয়া অন্য সম্প্রদায়ের কর্ত্তৃত্ব ও প্রভাব সমগ্র জাতির অভ্যুদয় ও কল্যাণ ত বলা যায় না। কাজেই বাঙালীর দুর্দ্দিন আজিও ঘুচে নাই, ইহাই আমরা বলিব। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ফলে আর আমরা পরাধীন জাতি নহি, একথা বলাও নিরর্থক।

কথায় মুখর হইয়া যে প্রতিবাদের আন্দোলন, তাহাতে প্রতিকার নাই, ইহা আমরা ভাল করিয়াই আজ বুঝিয়াছি। প্রতিহিংসায় প্রতিবিধিৎসা আমাদের জাতীয় প্রকৃতির অনুকূল নহে—উহা আমাদের [illegible]

একমাত্র সংগঠনের পথই এ জাতির কল্যাণময় ও প্রশস্ত পথ। সেই পথেই ধীরচিত্তে ও দৃঢ়পদে আমরা চলিব। "প্রবর্ত্তকে"র ইহাই সিদ্ধান্ত। বাঙালী—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান নির্ব্বিশেষে—আজ জাতি হিসাবে সংগঠনের পথচারী হইলেই ঋজু, সত্য মুক্তি-সাধনার অধিকারী হইবে। জাতির মধ্যে পরস্পর ভেদ ও দ্বেষবুদ্ধি বিশোধিত হইয়া মিলনের রসায়ণও এই পথেই আবিষ্কৃত হইবে।

"প্রবর্ত্তক" নূতন বর্ষে জাতি-দেবতার আশীর্ব্বাদ মাথায় করিয়া বাঙালীর জাতীয় আদর্শ সুস্পষ্ট করিয়া তুলিবে। "প্রবর্ত্তক" আদর্শকে বিগ্রহান্বিত করার একমাত্র উপায় যে সংহতি-সাধনা, তাহার অব্যর্থ নীতি ও বিজ্ঞান প্রকাশ করিবে। "প্রবর্ত্তক" সহায়তা করিবে—বাংলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উপর জাতীয় শিক্ষার অভিনব পরিস্থিতি-রচনায়। জাতির আর্থিক, সাম্প্রদায়িক, সামাজিক সমস্যাগুলির বৈজ্ঞানিক পর্য্যালোচনা ও সমাধানে সে উদ্বুদ্ধ করিবে বাঙালীর বিপ্লবী মনীষাকে—রাষ্ট্রক্ষেত্রে সংগঠনমূলক প্রণালী ও প্রক্রিয়া আশ্রয় করিয়াই তাহাকে আহ্বান করিবে অখণ্ড বঙ্গের পুনর্গঠনে ও সেই দৃঢ় বনীয়াদের উপরেই স্বাধীনতার আদর্শানুশীলনে। এই সকল বিষয়েই আমরা বাংলার বরেণ্য সুধীবর্গের প্রতিভা ও চিন্তার আনুকূল্য ও সহায়তা প্রার্থনা করি। বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রেও পূত-পবিত্র আব্‌হাওয়া-রচনায় আমরা সতত অবহিত থাকিব—তাই দেবী ভারতীর বরপুত্র ও সেবকমণ্ডলীর সানুরাগ শুভদৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করি। আমাদের স্থির বিশ্বাস—আগামী দশ বৎসরের মধ্যে বাংলায় এক শক্তিশালী মহাজাতি বৈজ্ঞ[illegible] সৃজনশীল হইয়া জয়গর্ব্বে মাথা তুলিবে। নবীন "প্রবর্ত্তক" এই নব জাতিরই পুরোভাগে শঙ্খধ্বনি করিয়া চলিবে। শ্রীভগবানের বাণীযন্ত্র তিনিই যোগ্য[illegible] বাঁধিয়া লউন—এই প্রার্থনা।

"প্রবর্ত্তকে"র নীতি ও ভবিষ্যৎ

রজত-জয়ন্তী বর্ষের শেষে আমাদের শুভানুধ্যায়ী বন্ধু ও "প্রবর্ত্তকের" প্রাচীন গ্রাহক পত্র-প্রসঙ্গে এই কথাগুলি লিখিয়াছেন :

"আমি এই বৎসরেই চাঁদা বন্ধ করিব ভাবিতেছিলাম। শ্রদ্ধেয় মতিবাবু সম্পাদক-পদ হইতে অবসর লইতেছেন। যদিও তিনি সুযোগ্য শিষ্য......সম্পাদকত্বে প্রবর্ত্তকের মন্ত্র-মর্য্যাদা-রক্ষার ভার অর্পণ করিয়াছেন এবং......তন্ত্রধারকপদে নিযুক্ত করিয়াছেন, তথাপি আমার কেমন সংশয় জাগিতেছিল এবং আমি প্রবর্ত্তক বন্ধ করিতে চাহিতেছিলাম। তবে এক আকুল আগ্রহ যে, আপনাদের হস্তে প্রবর্ত্তক কি রূপ ও পরিবর্ত্তন ধারণ করে, আমাকে এ বৎসর গ্রাহক থাকিতে প্ররোচিত করিল। প্রার্থনা করি, প্রবর্ত্তকের মৌলিক আদর্শ ও ভাবধারা বীর্য্যবান্ অধ্যাত্মজীবনগঠনের নির্দ্দেশ-বাণী আপনাদিগের হস্তে অক্ষুণ্ণ অব্যাহত থাকিবে। প্রবর্ত্তক যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহা যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়। অন্যান্য মাসিক পত্রে গল্প, উপন্যাস, তরল বিষয়-বস্তু প্রচুর থাকে—প্রবর্ত্তক যেন প্রবন্ধ-গৌরবে, ভারতীয় কৃষ্টি, সভ্যতা, ধর্ম্ম, সাহিত্য বিষয়-ভারে পূর্ণ ও আদৃত হয়। সঙ্ঘ-জীবন ও জাতিগঠন প্রবর্ত্তক-মন্ত্র। ইহা যেন সর্ব্বদাই আপনাদের পত্রিকায় ধ্বনিত হয়। চিন্তামূলক প্রবন্ধ যতই ইহাতে স্থান পায়, [illegible]ই মঙ্গল। Commercial motive (ব্যবসাদারী লক্ষ্য [illegible]) এর প্রবর্ত্তককে রাখিবেন না। তজ্জন্য আপনা[illegible]র অন্যান্য শাখা আছে। আমার এই মন্তব্য ও মত-প্রকাশের ধৃষ্টতা প্রার্থনা করি, আপনারা নিজ ঔদার্য্যগুণে মার্জ্জনা করিবেন।"

পরিশেষে, আর একটী বিশেষ অনুরোধও তিনি সনির্ব্বন্ধে জানাইয়াছেন—

"মতিবাবু অবসর গ্রহণ করিলেও, তিনি যাহাতে প্রতি মাসে একটী মৌলিক প্রবন্ধ অবশ্য দেন, তাহার জন্য সচেষ্ট থাকিবেন। ব্রহ্মসূত্র বা জীবন-সঙ্গিনী, এরূপ serial writing নয়। মূল individual article—যাহাতে তাঁর অভিজ্ঞ অনুভূতিসম্পন্ন বাণী সাধারণকে বীর্য্যবান্, ধর্ম্মিষ্ঠ ও গরিষ্ঠ করিবে। ভগবৎসমীপে প্রার্থনা করি, প্রবর্ত্তক নিজ গৌরবে উন্নীত হউক।"

পত্রলেখক "প্রবর্ত্তকে"র সত্যই একজন দরদী ও মরমী গ্রাহক-বন্ধু, ইহা তাঁহার পত্র-মর্ম্মেই পরিস্ফুট—আমরা তাঁহার আন্তরিক শুভকামনার জন্য এই সুযোগে হৃদয়ের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। তাঁহার কথা যে তাঁর একার মাত্র নহে, "প্রবর্ত্তকে"র অনুরাগী সুহৃদ্ ও শত শত পাঠক-পাঠিকার সাধারণ মনোভাব ও মতপ্রকাশ প্রতিভূ-স্বরূপ তিনি করিয়াছেন, ইহা আমরা কল্পনায় অনুভব করিতে পারি—তাই তাঁর কথাগুলি লইয়া একটু আলোচনা করিব। আশা করি, ইহাতেই তাঁহার ন্যায় প্রত্যেক

অকৃত্রিম সুহৃদই "প্রবর্ত্তক" সম্বন্ধে বর্ত্তমানে অনুসরণীয় নীতি ও উদ্দেশ্য অবগত হইয়া সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হইতে পারিবেন।

প্রথমেই বলা আবশ্যক যে, "প্রবর্ত্তকে"র মন্ত্র-শক্তি জাতির স্তিমিত প্রাণবীর্য্যকে ফুৎকারে ফুৎকারে প্রজ্জ্বলিত করার মুখ্য উদ্দেশ্য হইতে যেদিন বিরত হইবে, সেদিন তার অস্তিত্বেরই আর কোন প্রয়োজন থাকিবে না। এই মন্ত্র একটা সংহতিকে সৃষ্টি করিয়াছে; তাহাতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, "প্রবর্ত্তকে"র মূলমন্ত্র সাধারণ বাণী মাত্র নয়, ইহা সৃজনেরই বীর্য্যসম্পন্ন। বাণীর উৎস আছে—যে বাণী ঈশ্বরের। ভারতের ঋষি তাই বাক্যের পিছনে যে বাক্, তাহারই অন্বেষণে থাকিবে।... উচ্চারণ করিয়াছিলেন; উত্তরে যে সত্যের সন্ধান মিলিয়াছিল তাহা ঋষি-দৃষ্ট পরম তত্ত্ব—"যদ্‌বাচো হ বাচম্।" ইহাই কেনোপনিষৎ। "প্রবর্ত্তক" ঈশ্বর-বাণীর আবাহন করিয়াছে —সংস্কৃত ঋক্-ছন্দে না হইলেও, তাহাও সত্যদীপ্ত, অগ্নিময়। "প্রবর্ত্তক" প্রাণের সত্যই জাতিকে শুনাইয়াছে— ঈশ্বরের আজ্ঞা-পালনে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে যে জাতিকে, সে জাতি আদেশের মর্ম্ম শ্রুতি ও বাক্-যোগে কথঞ্চিৎ অবধারণ না করিলে, অদম্য জীবন-বেগসম্পন্ন একটা ঈশ্বরনিষ্ঠ সমষ্টির উদ্ভব এই জাতির মধ্য হইতেই হয় কেমন করিয়া?

প্রাণের ঋত-মন্ত্রই জাতির জীবন ধর্ম্ম। তাই নব-যুগের বাঙালীর একটা ক্ষুদ্র অংশও জীবনধর্ম্মে দীক্ষা পাইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে দৃঢ় অবিচল চিত্তে অগ্রসর হইয়াছে— "প্রবর্ত্তক" অগ্নিমন্ত্র বুকে লইয়া। মন্ত্রের কর্ম্ম—মর্ম্ম-গঠন। জাতির অন্তর্নিহিত সুপ্ত বাণী আবিষ্কার ও উদ্ধার করিয়া তাহার ঘুমন্ত কর্ণে পরিবেশন করেন জাতীয় ঋষি বা গুরু। তাই সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র শুধু "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রের ঋষি নহেন, তিনি জাতীয়তারও মন্ত্রগুরু। "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রের সাধনে বাঙালী জাতি যে মাতৃ-রূপের সাক্ষাৎকার পাইয়াছিল, তিনি মৃণ্ময়ী ও চিন্ময়ী দেশমাতৃকা। যেদিন ঋষির "বন্দেমাতরম্" গান বাহ্যেন্দ্রিয় অতিক্রম করিয়া প্রাণে আঘাত করিল, সেই-দিন বাঙালীর হৃদয়ে জাগিল স্বদেশ-প্রেম, মর্ম্মে মাতৃমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। স্বদেশ মাতা, স্বদেশ ভগবান—বেদান্ত-শিক্ষার অন্তর্গত এই মহতী শিক্ষা জাতীয় অভ্যুত্থানের বীজ-স্বরূপ। শক্তিস্বরূপিণী, বহুভুজান্বিতা, বহুবলধারিণী দেশ-জননী ভগবানেরই একটী শক্তি, মাতা, দেবী, জগজ্জননী কালীরই বিশেষ রূপ বা বিভূতি। তাঁহার পূজা মাতৃ-পূজা, ইষ্ট-রূপেরই পূজা। বাঙালী এই পূজা সাঙ্গ করিয়া তারপর আবাহন করিয়াছে অঘটনঘটনপটীয়সী মহাশক্তিকে। ইনিই সর্ব্বকর্ত্রী, সর্ব্বধাত্রী, সর্ব্বান্তর্য্যামিনী স্বরূপময়ী মা। বাঙালী মায়ের বাহ্য রূপের পূজায় ও সেবায় শুদ্ধ-চিত্ত হইয়া, অতঃপর অন্তর্নিহিত মাকে আত্মসমর্পণ করার আদেশ পাইয়াছে। এই আত্মসমর্পণের যুগেই "প্রবর্ত্তকে"র পাঞ্চজন্য জাতির কর্ণে অনাহত ধ্বনির পর ধ্বনি তুলিয়া, তাহাকে নূতন পথের সন্ধান দিয়াছে। এই পথ—নির্ম্মাণের, সংহতিগঠন ও জাতিগঠনের। নূতন যুগের "প্রবর্ত্তক" এই সংগঠনেরই দিগ্‌দর্শন আরও বিশদ ও পূর্ণ করিবে।

নীতি আমাদের অভ্রান্ত। কিন্তু হৃদয়ের প্রাপ্তি ও সিদ্ধান্ত বুদ্ধির কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া যুক্তি ও হেতু-বাদের শৃঙ্খলায় সজ্জিত ও ছন্দিত না করিলে ব্যাপক ও সর্ব্বজনগ্রাহ্য হয় না। এই হেতু "প্রবর্ত্তক" ঋষির মন্ত্রগুলি স্তরে স্তরে গ্রহণ করিয়া জাতির মনস্বী ও সুধীগণের যুক্তিশীল চিন্তার উপযোগী আকারে গোচর করিবে—দেশগঠনকামী কর্ম্মী ও মনীষিমাত্রের ইহা গভীর মন ও মস্তিষ্কের যোগ্য খাদ্য হইবে। তব গল্প, উপন্যাসের মধ্য দিয়া যে বঙ্গ-সাহিত্যের বর্ত্তমান যুগস্রোতঃ, তাহা কতকাংশ বন্দী করিয়া, উহাকেও কতখানি প্রেয়ঃ হইতে শ্রেয়ের পথে চালিত করা যায় তাহা আমরা দেখিব। তাই অধিকার ও জয়ের জন্যই কিছুটা হয়ত তাহার সহগামী হইতে হইলেও, আমরা বাণীপূজার পবিত্র বেদীপীঠ কোন মতে কলুষিত হইতে দিব না, ইহা সুনিশ্চিত। শক্তিশালী সাহিত্য-সাধক ও ধুরন্ধরগণের নিকট আশা করি, আমাদের এই আবেদন ব্যর্থ বা বিড়ম্বিত হইবে না—আমরা তাঁহাদের লেখনীর অমৃতপ্রপাতই আকর্ষণ করিব ও পাইব। ধৈর্য্য ও প্রতীক্ষা আমরা সুগভীর প্রত্যয়ে [illegible]

রক্ষা করিব। সহৃদয় পাঠক ও পাঠিকাদেরও এ বিষয়ে আমাদের সহিত ধৈর্য্য রক্ষায় অনুরোধ করিতেছি।

তারপর আমাদের পরম হিতৈষী পত্র-লেখকের শ্রদ্ধেয় মতিবাবুর অবসরে আশঙ্কা ও তাঁহার অন্ততঃ দুই একটী লেখার জন্যও সুস্পষ্ট দাবীর কথা আমরা তাঁহার এই শঙ্কা ও দাবী দুইই সমগ্র অন্তরের সহানুভূতির সহিত গ্রহণ করিতেছি। বিশেষতঃ, তাঁহার সঙ্ঘগুরুর অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ প্রবন্ধের দাবী একান্ত ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি। তাঁহার ন্যায় সকলেরই আশ্বস্তির জন্য আমরা এইখানে একথা বলিতে পারি—পূজনীয় সঙ্ঘগুরু অন্তর্য্যামীর অলঙ্ঘ্য আহ্বানে নব জীবনপর্ব্বের সম্মুখীন হইলেও, তাঁহার সে অবসরের ডাক মাত্র নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ত্তব্যের বন্ধন হইতেই তাঁহাকে অব্যাহতি দিতে পারে; মুক্তির অবাধ লীলাক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ত্ত জীবনের—তথা হৃদয় ও প্রতিভার অবদান হইতে কে বা কি তাঁহাকে নিরস্ত করিবে? তাই তাঁর অবসরের লেখনী "প্রবর্ত্তকে"র জন্যই আজও পূর্ব্বপ্রস্তুত "ব্রহ্মসূত্র" সহ প্রথম প্রবন্ধেও তো অমিয় নির্ঝরিণী বর্ষণ করিবেই—যথার্থ অবসর-বৃদ্ধির সহিত বরং তাঁহার আরও অনেক ও বিচিত্র রসসৃষ্টির সম্ভারে আমরা ক্রমশঃ "প্রবর্ত্তক"কে সমধিক অলঙ্কৃত ও গৌরবিত করার সুযোগ পাইব। অতএব "প্রবর্ত্তকে"র পাঠক পাঠিকা, গ্রাহক অনুগ্রাহক, সেবক, সহায়ক, সকলেরই পরিপূর্ণ স্নেহানুকূল্য, আস্থা ও নিবিড় সহানুভূতি যেমন "প্রবর্ত্তকে"র সহিত চিরসংযুক্ত থাকিবে, তেমনি সর্ব্বা[illegible] ইহাকে চিরদিন অনুপ্রাণিত ও তাঁর স্নেহবর্ম্মে সুরক্ষিত করিবে, ইহা অবধারিত।

বাংলায় জাতিগঠন

"একবুদ্ধিবিশিষ্যতে"—তাহাই যোগ, যাহা বহুবুদ্ধি যুক্ত করে। এখানে বুদ্ধি অর্থে বুদ্ধিবৃত্তি। প্রত্যেক চিত্তবৃত্তির, এমন কি দেহের প্রত্যেক জীবাণুকোষের (cell) স্বতন্ত্র অহমিকা অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি আছে, ইহা বিজ্ঞানসম্মত কথা। অহমিকা বুদ্ধিরই বৃত্তিবিশেষ। অহংকার—'আমি আছি', 'আমি আছি' এই বোধ—বুদ্ধিরই ঘোষণা। এই আমি-বোধ—সত্বাদি গুণভেদে আবার বিভিন্ন ও বিচিত্র হয়। ইহাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের আদি ভূমিকা।

জীবদেহ—organism। কারণ, সেখানে বহু জীবাণু-কোষ এক লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত ও সংগঠিত হয়, যাহাতে সমগ্র দেহটী একটী অখণ্ডভাবে সজীব ও সক্রিয় হয়। ইহাতেই জীবের জীবত্ব—যাহার আধুনিক নাম জৈবিকধর্ম্ম—organic nature. জৈবিক রসায়ণশাস্ত্র, উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান, নব্য সমাজবিজ্ঞান এই organism বা অখণ্ড জীবভাবকে কেন্দ্র করিয়া স্ব-স্ব আলোচনার ধারা-পুষ্টি করিয়াছে। অধুনাতন রাষ্ট্রক্ষেত্রেও totalatarian state বলিয়া কথার উদ্ভবও সম্প্রতি খুবই প্রচলন দেখা যাইতেছে। জাতির অভ্যুত্থানের জন্য যে দর্শন ও প্রকরণের প্রয়োজন, তাহা[illegible]আলোচনায় এই জীব-তত্ত্ব বা জৈবিকতাবাদের কি স্থান ও দান, তাহা মনীষিগণের বিশেষ অনুধাবন-যোগ্য।

জাতির উন্নতি ও মুক্তির সাধনায় শক্তিশালী সংহতি বা দলের প্রয়োজন আছে। জাতি-গঠনে অখণ্ড জাতীয়তা-বোধের জাগরণ ও দৃঢ় প্রতিষ্ঠাই প্রয়োজনীয়। দল বহুবুদ্ধি লইয়াও হইতে পারে; সম-প্রকৃতির প্রাধান্য ভিন্ন জাতির কথা উঠিতেই পারে না। যদি বহু বুদ্ধিই প্রধান হয়, তাহার চরম প্রকাশ সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় স্বৈরাচার (anarchy); সেখানে প্রত্যেকেই একান্তভাবে স্ব স্ব প্রধান অর্থাৎ হর্ত্তা, কর্ত্তা ও বিধাতা। প্রাকৃতিক আবহাওয়ায় যেমন শূন্য বা vaccuum থাকিতে পারে না, তেমনি এরূপ চরম বহুপ্রকৃতিক অবস্থা পৃথিবীতে দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় না। প্রকৃতিই আবার যে কোন প্রকার একটা নিয়ম-শৃঙ্খলা স্থাপন করে। যাহারা বহুপ্রকৃতিক, তাহারাই নিজেদের শুভবুদ্ধি জাগাইয়া এই কার্য্য করিতে না পারিলে, প্রাকৃতিক বিধানে বাহির হইতে কোন প্রবলতর তৃতীয় শক্তি আকৃষ্ট হইয়া সেই সুযোগ গ্রহণ করে ও পরতন্ত্র স্থাপন করে। ইহাই জাতীয় পরাধীনতার কারণ। যাহারা ভিতরের শুভবুদ্ধি জাগ্রত করিতে পারে ও ব্যক্তি বা দলবিশেষকে কেন্দ্র করিয়া স্বৈরাচার নিয়মিত

করে অর্থাৎ নিয়ম-শৃঙ্খলা স্থাপন করে, তাহার পায় আংশিক জাতীয় শাসন। সম্পূর্ণ আত্মশাসন বা গণ-শাসনে জাতির অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যষ্টির শ্রেয়োবুদ্ধি স্বেচ্ছায় সম-নীতি ও আচার বরণ করিয়া প্রেম ও ঐক্য-শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। ইহা আদর্শ ও পূর্ণ স্বারাজ্য। পৃথিবীর সাধারণ গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত-বরণেও যে স্বেচ্ছাকৃত নিয়মনিষ্ঠা ও আনুগত্যের পরিচয় ব্যষ্টি বা গোষ্ঠীর পক্ষ হইতে পরিদৃষ্ট হয়, তাহাও ঐ আদর্শ স্বারাজ্যের কিঞ্চিদপি মহিমা রক্ষা করে।

শ্রেষ্ঠ জাতি—এক বুদ্ধিই বরণ করে। কিন্তু ইহার মধ্যে জোর-জবরদস্তির স্থান নাই। প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ বিধানে বহু কোষের সম্মেলনে যে [illegible] উৎপত্তি, [illegible] থাকিবে। সেথায় বহু আমি আপনাপান মি[illegible] একটা আমিত্বে পরিণত হয়, সেই একই প্রকারে স্বেচ্ছায় বা স্বভাবের অলঙ্ঘ্য প্রেরণায় মানব-গোষ্ঠী, সমাজ ও জাতির সৃষ্টি বা সংগঠন সম্ভব কি না? ইহাই প্রশ্ন। এ প্রশ্নের সদুত্তর সাধনারই উপর নির্ভর করে। শুদ্ধ যুক্তি-তর্কে তাহার সম্ভবপরতা বা অসম্ভাব্যতা স্পষ্ট নিরাকরণ করা যায় না।

একাত্মার অনুভূতি গভীর চিন্তাশীলতা ও সাধনা-সাপেক্ষ। তাহার জন্য দীর্ঘদিনের শিক্ষা, নিষ্ঠা, তপস্যা চাই। এক আদর্শ, এক লক্ষ্য ও নীতি, এক বা সমান আচারের গ্রহণ ও পালন সহজ নয়, সুসাধ্যও নহে। বিশেষভাবে পরাধীন জাতির জীবনে এইরূপ একমুখী সংহতি-সৃষ্টির প্রেরণা প্রকৃতই বিরল। পরাধীনতা জাতির শুভবুদ্ধি কথঞ্চিৎ বা অনেকখানি হরণ করিয়াই তাহার জীবনে চাপিয়া বসে; পরে পরতন্ত্রের চাপে বাকীটুকুও শোষণে, শাসনে উবিয়া যায়। এইরূপ বিকৃত-বুদ্ধি জাতি স্বৈরাচারকে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পরম রূপ বলিয়া ধারণা করে ও সেই আদর্শের অনুবর্তন করিতে গিয়া আরও ছন্নছাড়া, বিকৃততর দশা প্রাপ্ত হয়। জীবদেহের প্রত্যেক কোষ ভিন্নাচারী ও ভিন্নবুদ্ধি হইলে কেমন হইত? জীবদেহের উহাই ধ্বংস বা পঞ্চত্বপ্রাপ্তির কারণ। সমাজ যদি বহুকোষাত্মক জীবেরই ন্যায় বহুজীবাত্মক সমষ্টিপ্রাণ হয়, তবেই সে সমাজকে বলা যায় সমাজাত্মা বা সমাজ-পুরুষ। জাতির ক্ষেত্রেও তাই। জাতি অর্থে 'নেশন'—উহা অখণ্ড সত্তা, অখণ্ড জাতি-পুরুষ বলিয়াই [illegible] যুগে ধারণাযোগ্য হইয়াছে। তাই না আইরিশ মনীষী [illegible] (A. E.) "National Being" (জাতীয় সত্তা), "National Soul" (জাতীয়াত্মা) শব্দ-প্রয়োগে এই জাতীয়ত্ব-বোধটীকে অমন সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন।

বাঙালী কি অখণ্ড জাতিবোধে সংগঠিত হইয়াছে, হইবে অথবা হইতে পারে? ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের জাগরণ বাংলায় জাতীয়াত্মারই উদ্বোধন বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। বাংলার মহাকবি

"এক দেশ, এক ভগবান,
এক জাতি, এক মনোপ্রাণ"

বলিয়া সে জাতির আগমনীসঙ্গীত গাহিয়াছিলেন। ঋষি বঙ্কিমের "বন্দেমাতরম্" এই জাতি-সৃষ্টিরই সিদ্ধ বীজ-মন্ত্র বলিয়া ধারণা জন্মিয়াছিল। বাঙালীর অখণ্ড জাতীয়াত্মা তার দেশমাতাকে দ্বিখণ্ডিত হইতে দেয় নাই—ভাঙা বঙ্গ মরণপণ সঙ্কল্পে ও তপস্যায় জোড়া লাগাইয়াছিল।

কিন্তু এই জাতি-পুরুষ আজ সাম্প্রদায়িক বিদ্রোহে অপমৃত্যু বরণ করিলেন কি না, সংশয় ও আশঙ্কা জাগে। এই সংশয়, এই আশঙ্কা আজ অমূলক বলিয়াও মনে হয় না। বাংলার জাতি-সত্তা আজ দুইটী সমাজ-সত্তার দ্বন্দ্বে বুঝি বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত হইয়া যায়। হিন্দু-সমাজ কৃষ্টি ও সংস্কৃতিপ্রধান সমাজ। মুসলমান সমাজ আচারপ্রধান। উভয়েরই অবস্থা আজ সুস্থ ও স্বাভাবিক লক্ষণযুক্ত নহে। হিন্দু ও মুসলমান সমাজপুরুষ কি আজ বাংলার জাতি-পুরুষের সহিত দ্বন্দ্বরত? হিন্দুর সমাজদেহ বাংলার সীমা অতিক্রম করিয়া সারা ভারতে ছড়াইয়া আছে—তাই হিন্দু বাঙালী থাকিলেও, হিন্দু মাত্রেই বাঙালী নহে। মুসলমানের সমাজ-দেহ আবার আরও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত —ভারতের ভিতরে ও বাহিরে তার বহু কোষ পড়িয়া আছে। এইজন্যই পাকিস্তানের বুলি তার মাঝে সুর তুলিতে পারে। বাঙালী মুসলমান থাকিলেও, মুসলমান মাত্রেই তেমনি বাঙালী নহে।

বাঙালী জাতি কিন্তু উভয় সমাজপুরুষকে স্বীকার ও অঙ্গীভূত করিয়াও আপন সত্তা বা প্রাণপুরুষকে ঊর্দ্ধে

করিয়া তুলিতে পারে। ইহা বস্তুতন্ত্র করাও সম্ভব। বাংলা ও বাঙালীরও আত্মস্বাতন্ত্র্য ও বিশেষ কৃষ্টি আছে, বিশেষ ভাষা, সাহিত্য, শীল, সংস্কৃতি, আচার আছে। সেখানে হিন্দুত্ব, ইসলামত্ব বা আর যাহা কিছু এক বাঙালীত্বেরই কুক্ষিগত হইয়া তাহার সভ্যতার শোভা-সম্পাদন ও জাতীয়তার রসপুষ্টি আগেও করিয়াছে, অবহিত হইলে এখনও করিবে। আমরা সেই বাঙালী জাতীয়তা এই নবভাবে আবাহন ও প্রবর্ত্তনে অনুপ্রেরণা পাইতেছি। বাংলার ভাবুক ও দেশপ্রেমিকগণ এই নূতন চিন্তাভঙ্গীর উপর আলোকপাত করিলে সুখী হইব।

রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি

পৃথিবীতে ক্ষুদ্র রাষ্ট্র থাকিতে পারে না। উপগ্রহের ন্যায় কোনও বৃহত্তর গ্রহ অথবা তারকার কক্ষে সমাকৃষ্ট হইয়া তাহাদের আত্মরক্ষা করিতে হয়। ইহা মনুর বিধান। ভারতের রাষ্ট্রনীতিক পরিভাষায় ইহাকে মাৎস্য-ন্যায়ও বলা হইয়া থাকে। সরোবরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মীনগুলি যেমন বৃহৎ মৎস্যের উদরেই আত্মরক্ষা করে—জগতের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির প্রায়শঃ এই দশাই ঘটে, তাহারা প্রতিবেশী বৃহতের শরণাগত অথবা উদরস্থ হয়।

আর এক নীতির আশ্রয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রনিচয় যে আত্মরক্ষায় সক্ষম হয় না, তাহা নহে। ভারতের রাষ্ট্রশাস্ত্রে ইহা তৃণগুচ্ছে হস্তিবন্ধন ন্যায় নামে অভিহিত করা যায়। বহু তৃণ গুচ্ছবদ্ধ হইয়া যেমন মহাকায় হস্তীকে বন্ধন করিতে সমর্থ হয়, তেমনি কয়েকটী ক্ষুদ্র রাষ্ট্রশক্তি ব্যূহবদ্ধ হইয়া একটী শক্তি-চক্র নির্ম্মাণে প্রবল প্রভাবশালী হইতে পারে ও অতি প্রতাপশালী বৃহতের গ্রাস হইতে আপনাদের অস্তিত্ব সংরক্ষণ করিতে পারে।

ইউরোপে জর্ম্মণীর অভ্যুত্থানে হিটলারকে মাৎস্য ন্যায়ের আশ্রয়েই পোল্যাণ্ড, জেকোস্লোভাকিয়া, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশগুলি দখল করিতে দেখা গিয়াছিল। বৃটন ও ফ্রান্সের ঔদাসীন্য ইহার অন্যতম কারণ। পরে হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম, ডেনমার্ক, নরওয়ে এবং ফ্রান্সেও বাহ্যতঃ মিত্রশক্তিপুঞ্জের গঠন হইলেও, কার্য্যতঃ মাৎস্যন্যায় অর্থাৎ মনুর বিধানই চলিতে থাকে। তখনও বৃটন যোগ্যভাবে প্রস্তুত হইতে পারে নাই, ইহাই হেতু। আজ মধ্য ও দক্ষিণ ইউরোপের বালস্কন্দ অর্থাৎ বলকান রাষ্ট্রগুলির অন্যতম দুইটী রাষ্ট্র রুমানিয়া ও বুলগেরিয়া ইতিমধ্যে জর্ম্মণীর কুক্ষিগত অথবা কক্ষগত হইতে বাধ্য হইয়াছে। ইহা[illegible] যুগস্লোভিয়ার পালা যথাক্রমেই আসিয়াছিল। কিন্তু একদিকে গ্রীসের হস্তে ইতালীর পরাভব, অন্যদিকে বৃটনের ক্রমবর্দ্ধমান শক্তিসাধনা ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রভাব-বিস্তারের উপর নির্ভর করিয়া, যুগস্লোভিয়া বৃহৎ শক্তি জর্ম্মণীর কুক্ষিগত না হইয়া বৃটনেরই কক্ষাশ্রিত হওয়া সম্ভবতঃ [illegible]য়াছে এবং বৃটনও এই ক্ষেত্রে অবশিষ্ট বলকান রাষ্ট্রত্রয়—গ্রীস, যুগস্লোভিয়া ও তুর্কীকে একত্র করিয়া একটী শক্তিচক্র-নির্ম্মাণে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। বৃটনের এই প্রচেষ্টা পূর্ব্বের ন্যায় বিফল হইবে কিম্বা এবারে সফল হইবে, তাহা আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই নির্ণীত হইয়া যাইবে। বর্ত্তমান যুদ্ধের পরবর্ত্তী গতিচ্ছন্দও এই ঘটনায় অনেকটা পরিদৃশ্যমান হইয়া উঠিবে। এক্ষেত্রে বলকানে অন্য বৃহৎ প্রতিবেশী রুষ মহারাষ্ট্রের অবলম্বিত নীতিও কিছু প্রভাব প্রক্ষেপ করিতে পারে।

বৃটন স্বয়ং আকারে ক্ষুদ্র হইলেও, শক্তিসাধনায় বৃহৎ, এমন কি বর্ত্তমান পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রশক্তি বলিয়াও দাবী করার অবস্থায় পৌছিয়াছিল। বৃটনের এই সৌভাগ্য-যুগের মূলে ভারতের সহিত সম্বন্ধ। ভারতবর্ষ যার করগত, সে পৃথিবীর সব চেয়ে সৌভাগ্যশালী, শক্তি ও ঐশ্বর্য্য-লক্ষ্মীর বরপুত্র হইতে বাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু ভারতের প্রতি বৃটনের আচরণ রাজনীতির দিক্ দিয়া যাহাই হউক, মানবনীতির দিক্ দিয়া কোন মতেই সমর্থনযোগ্য নয়। ইউরোপের ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল, বিপন্ন রাষ্ট্র-গুলির স্বাধীনতারক্ষার সহায়ক ও জর্ম্মণীর নববিধানের বাহিরে তাহাদের এক হিসাবে একমাত্র নির্ভরস্থল হইয়া—এমন কি আফ্রিকায় আবিসিনিয়ারও লুপ্ত স্বাধীনতার পুনরুদ্ধারে সাহায্যকারী হইয়া বৃটনের সাম্রাজ্যশক্তি আজ বিধাতার আশীর্ব্বাদে যে পুণ্যশক্তি

অর্জ্জন করার সুযোগ পাইয়াছে, ভারতের প্রতি তাহারই অন্যথাচরণে সে পুণ্য অনেকখানি ক্ষয়িত হইয়া যাইতেছে। ভারত যতই আত্মহারা, সর্ব্বহারা হউক, ভারতলক্ষ্মীর কৃপায় ইংলণ্ডের ঐশ্বর্য্য ও সাম্রাজ্যের বিস্তার এবং অসাধারণ অভ্যুদয়, ইহা অস্বীকার করার নয়। ভারতকে অসহায় না রাখিয়া, বৃটনের আত্মস্বার্থের জন্যও যোগ্যভাবে অস্ত্রশস্ত্রে ও পূর্ণাঙ্গ সামরিক শক্তিতে সুসজ্জিত ও শক্তিশালী করিয়া তোলা বাঞ্ছনীয়। এদিকে বৃটিশের দীর্ঘসূত্রী রাজনীতির অবশেষে মোড় ফিরিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু এই সঙ্গে ভারতের হৃদয় আকর্ষণ করাও আবশ্যক। নচেৎ শুধু হৃদয়হীন কায়ার সমর্পণ যে বলাৎকারেরই পর্য্যায়ভুক্ত, তাহা নৈতিক চক্ষেও যেমন দূষণীয়, তেমনি রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও আখেরে শুভাবহ হয় না।

বৃটন কি ভারতকে নূতন চক্ষে গ্রহণ করিয়া, যুগের ইতিহাসে অভিনব ও সমুজ্জ্বল কীর্ত্তন স্থাপন করিবে?

অক্ষয়া তৃতীয়া উৎসব

বাংলার সংগঠন-কর্ম্মে প্রবর্ত্ত[illegible] থাকিবে। [illegible]ণী হইয়াছে। এই সংগঠন জাতীয়াত্মার অভ্যুত্থান এ[illegible] তাহারই লক্ষণ-স্বরূপ অভিব্যক্তি রাষ্ট্রে, সমাজে, অর্থনীতিক ক্ষেত্রে ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। এই অভিনব কর্ম্মচ্ছন্দে জাতিকে সংবৃদ্ধ করার জন্য সঙ্ঘের অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে অক্ষয়া তৃতীয়া উৎসব একটি বিরাট্ যজ্ঞ। আগামী ১৩৪৮ সালের ১৬ই বৈশাখ এই উৎসব উনবিংশ বর্ষে পদার্পণ করিবে। এই উৎসব শুক্লা তৃতীয়া হইতে পূর্ণিমা কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী থাকিবে। সুপ্রাচীন প্রবর্ত্তক শ্রীমন্দির ঘিরিয়া ত্রয়োদশদিনব্যাপী মহোৎসবে ধর্ম্মপ্রাণ ও দেশপ্রাণ নরনারী আনন্দের সহিত যে শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় পান, তাহা যে বাঙালীর স্বরূপ-ধর্ম্ম, এ কথা আর নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। এই উৎসবে স্বদেশজাত পণ্যদ্রব্যাদির প্রচারও হইয়া থাকে। এই বৃহৎ কর্ম্ম ঈশ্বরপ্রসাদেই হয়, সঙ্ঘ উপলক্ষ্য।

উৎসবের সহিত অনুষ্ঠিত জাতীয় মেলা ও প্রদর্শনীতে যে সকল ভাব ও আদর্শ চিত্রে, রেখায়, মৃণ্ময় মূর্ত্তিযোগে এবার প্রদর্শিত হইবে, তাহার বিশেষ বিশেষ ধারাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে প্রদত্ত হইল

১। ভারতের অধ্যাত্মধারা বৃন্দাবন ও কুরুক্ষেত্রের পরবর্ত্তী যুগে কেমন করিয়া বাংলার শ্রীধাম শান্তিপুর, নবদ্বীপ, হালিসহর ও দক্ষিণেশ্বরে নবমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল, তাহার বিবরণ

২। অক্ষয়তৃতীয়ার স্মরণীয় ঘটনাগুলির স্মৃতিচিত্র।

৩। জন্ম হইতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত সম আচারপরায়ণ না হইলে জাতি গড়ে না, ইহার দৃষ্টান্ত ও পরিচয়।

৪। হিন্দুধর্ম্ম যে সনাতন মানবধর্ম্ম বা বিশ্বধর্ম্ম, তাহার যুক্তি ও প্রমাণ।

৫। বাঙালী জাতির অধঃপতনের হেতু ও পশ্চিমের জীবনগতির সহিত তুলনায় আমাদের জাতীয় ত্রুটির প্রতিকার।

৬। প্রগতির নামে যদৃচ্ছা জীবনগতির কুপরিণাম।

৭। বাংলার লোকবল, অর্থবল প্রভৃতির পরিচয়ে মুক্তিপথের যোগ্যতানিরূপণ।

৮। তরুণের মস্তিষ্কগঠনের জন্য শিক্ষানীতির বিশ্লেষণ ও আদর্শ-নির্দ্দেশ।

উৎসবের মধ্য দিয়া এই বিচিত্র আয়োজন যেন একটী অস্থায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা করে। লোক-শিক্ষার এই অপূর্ব্ব ব্যবস্থা উদ্যোক্তৃগণের অভিনব কল্পনাশক্তি ও সৃজনপ্রতিভার সমবায়ে জাতি-গঠনের অমূল্য উপকরণ ঘরে ঘরে রচনা করিয়া তুলিতেছে। এই উপকরণগুলি যাহাতে স্থায়ীভাবে সুরক্ষিত ও দেশের ব্যাপক সাংস্কৃতিক অনুশীলনের ভিত্তিস্বরূপ হয়, সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়া বাঞ্ছনীয়। আমরা অক্ষয়া তৃতীয়ার মহাযজ্ঞে প্রবীণ ও নবীন সকল দেশবাসীকেই মস্তিষ্ক, শ্রম, অর্থ প্রভৃতি সর্ব্বোপায়ে সহানুভূতি ও সহায়তা দান করিতে অনুরোধ করি।

কি দেখিলাম

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ছোটদিকে আমি বড় করে' দেখি,
এটা মোর অপবাদ,
ছোটর মাঝারে কত বড় থাকে
দেখাইতে হয় সাধ।

বালুকার সাথে মিশে রয় আহা,
কত যে সোণার কণা,
দেখে না চাহিয়া বিলাসী সমাজ
চলেছে অন্যমনা।

দীর্ঘ দিবস ব্যাপিয়া দেখেছি
পল্লীর আশেপাশে,
হীনতার গাঢ় তমসার মাঝে
আজও গ্রহতারা ভাসে।

ভীতিসঙ্কুল নিবিড় এ বনে
মনে হয় কিছু নাই।
তবু কত দিন বংশীর ধ্বনি,
নূপুরের সাড়া পাই।

এখনও মানুষ রয়েছে দেখিছি
হীন পল্লীতে হেথা।
'ভক্তমালে'তে লেখার যোগ্য
যাদের জীবনকথা।

স্বার্থপরের জনতার ভীড়ে
দেখিছি এমন ত্যাগী,
জঘন্য গ্রাম তীর্থ হয়েছে
কেবল যাঁহার লাগি।

এমন গৃহীও হেরিয়াছি চোখে
চরিত্র অনুপম,
সঙ্গ যাঁহার আকাঙ্খী হন
যাচিয়া নরোত্তম।

এমন সাধ্বী সতী দেখিয়াছি
ক্ষুদ্র কুটীর মাঝে।
সাবিত্রী আর সীতারও যাহারে
'সখী' বলে' ডাকা সাজে।

সন্তর্পণে সরে' থাকে এরা
এমনি এড়ায়ে চোক—
মহিমা তাঁদের জানিতে পারিনে
মোরা এ যুগের লোক।

পঞ্চাশোর্দ্ধে বনেতে যাইনি
যেথা রন মুনি-ঋষি,
অশুচি মলিন আমি কি সাহসে
তাঁহাদের সাথে মিশি!

তীর্থবাসের করি নে কামনা
[illegible]স মোর মাথায় থাক,
দেবের দেউলে যাবে না ভ্রমর,
গড়িতে নূতন চাক।

আমি ভালবাসি নিভৃত পল্লী,
দুখে রোগে ক্ষীয়মাণ
এর কাদা-ধূলি মোর মত দীনে
করে গৌরব দান।

পাই চারিদিকে আমিষ-গন্ধ—
ভীত হই, কত ভাবি;
সহসা পাঠায় গন্ধের ভেট্
কোথা হতে মৃগনাভি!

হত কুৎসিৎ গুল্মেতে ঘেরা
ধূসর এ প্রান্তরে,
দিক্-দিগন্ত আমোদিত করে
একটা নাগেশ্বরে।

অতি পিচ্ছিল পঙ্কিল পথ
কষ্টে' তোলে মনোলোভা-
পথের পার্শ্বে হঠাৎ একটী
পদ্মদীঘির শোভা।

অনেক না হ'ক, অধিক না হ'ক
এই সান্ত্বনা হায়,
পরাণ-জুড়ানো পরমানন্দ
একজনে পাওয়া যায়।

বড় যেখানেতে ছোট হয়ে থাকে
সুখী সেই ঠাঁই পেয়ে,
মুক্ত এ মেঘ-রৌদ্রও ভাল
বড়'র আওতা চেয়ে।

আদায়ের ইতিহাস

শ্রীমানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

এক

বৈশাখ মাসে ত্রিষ্টুপের জন্ম হইয়াছিল। ছাব্বিশ বছর পরে বৈশাখ মাসেই একদিন তার খেয়াল হইল, এ পর্য্যন্ত জীবনে পাওয়ার মত কিছুই সে পায় নাই।

সে দিনটা তার জন্মদিন নয়। জীবনের সর্ব্বপ্রথম কান্না সে কোন মাসে কাঁদিয়াছিল, এটা তার জানা ছিল বটে; কিন্তু তারিখের কোন হিসাব ছিল না। হিসাব থাকিলে জন্মদিনে মানুষ জন্মমৃত্যুর দুর্ব্বোধ্য রহস্যের কথা হয়তো একটু ভাবে, ম[illegible] কিবে। [illegible] ছাড়া দার্শনিকতার কষ্টিপাথরে জীবনের দাম কষিবার সাময়িক ইচ্ছাও হয়তো একটু জাগে। ওসব সমস্যা নিয়া ত্রিষ্টুপ আজ মাথা ঘামাইতে বসে নাই। সাধারণ হিসাবে এমন কিছু ঘটেও নাই যে, মনটা তার খারাপ হইয়া যাইবে এবং মনে হইবে এ জগতে সব ফাঁকি আর জীবনটা তার একদম ফাঁকা। আসলে, সকাল বেলা ঘুম ভাঙ্গিয়া তখন সে সবে বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছে।

তবে রাত্রে সে একটা স্বপ্ন দেখিয়াছিল। বড়ই খাপছাড়া অদ্ভুত স্বপ্ন। তার ছেলেটি যেন মরিয়া গিয়াছে। ছেলের শোকে সে ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে আর আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব টিটকারী দিয়া তাকে বলিতেছে, তার মত মানুষের কি ছেলের জন্য শোক করা উচিত! স্বপ্নে সে অবশ্য সকলের মনের ভাবটা চমৎকার বুঝিতে পারিয়াছিল। ছেলের শোকে পাছে সে পাগল হইয়া যায় অথবা সন্ন্যাসী হইয়া সংসার ত্যাগ করে, এই আশঙ্কায় সকলে তার শোককে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার ভাণ করিতেছিল।

উদ্দেশ্য খুব ভাল, সন্দেহ নাই। স্বপ্নে সে কারও উপর রাগ করে নাই, শুধু একটু সহানুভূতির জন্য ব্যাকুল হইয়া শোকের প্রকাশটা আরও জোরালো করিয়া তুলিয়াছিল। কেমন করিয়া সকলকে সে বুঝাইয়া দিবে যে, তারা ভুল করিতেছে, এভাবে তার শোক শান্ত করা যাইবে না, সকলে তার সঙ্গে একটু কাঁদিলেই বরং তার ব্যথা জুড়াইয়া যাইবে, ভাবিয়া স্বপ্নে বুকটা যেন ফাটিয়া যাইতেছিল। ঘুম ভাঙ্গিবার পর সকলের উপর সে একটা তীব্র বিদ্বেষ অনুভব করিতেছে। স্বপ্ন মিলাইয়াই গিয়াছে স্বপ্নে, এখন শুধু আছে একটা বেদনামাখা বিস্ময়কর ভার-বোধ এবং সকলের নির্ম্মমতার বিরুদ্ধে অভিমান ভরা-নালিশ।

ছেলে তার নাই। এ পর্য্যন্ত সে বিবাহ করে নাই। স্বপ্নের কথা ভাবিয়া তার হাসি পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু স্বপ্নের কথা সে ভাবিতেছে না, স্বপ্নের প্রভাবটা শুধু তার ভাবনাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

তার কেউ নাই। সকলে তার পর। তার কিছু নাই। কেউ তাকে কিছু দেয় নাই।

সংসারের কলরব কাণে আসিতেছিল। তাকে বাদ দিয়াই সকলে কলরব করিতেছে। স্বপ্নের মত সে যদি এখন শূন্যে মিশাইয়া যায়, কারও কিছু আসিয়া যাইবে না, এমনি ভাবে কলরব করিয়া চলিবে দিনের পর দিন। এ যে ছেলেমানুষী চিন্তা, ত্রিষ্টুপ তা' বুঝিতে পারিতেছিল, কিন্তু উপায় কি! চিন্তাগুলি আজ যেন তার স্বাধীন হইয়া গিয়াছে, এতদিনের ধরা-বাঁধা পথে শিক্ষিত সৈন্যের মত সংস্কারগত নির্দ্দেশের তালে তালে পা ফেলিয়া চলিতে রাজী নয়। এই ধরণের আরও কত চিন্তা কোথা হইতে আসিয়া তার মনে খেলা করিয়া বেড়াইতে লাগিল, সংযত করিবার কোন চেষ্টাই কাজে আসিল না।

সাত বছরের একটি মেয়ে দরজার ফাঁকে ডাক দিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, 'বারোটা পর্য্যন্ত ঘুমোবে নাকি মামা, বিছানা ছেড়ে উঠবে না?'

'এদিকে শোন, রাণু।'

রাণু নির্ভয়ে কাছে আসিল। মামা তাকে বড় ভালবাসে। হয় তো কাল রাত্রে বাড়ী ফেরার সময়ে তার জন্য কিছু কিনিয়া আনিয়াছে, নয় তো তাকে একটু আদর করিবার সখ জাগিয়াছে মামার। মুখে প্রত্যাশার হাসি ফুটাইয়া রাণু কাছে আসিয়া দাঁড়ানো মাত্র ত্রিষ্টুপ সজোরে তার গালে একটা চড় বসাইয়া দিল।

'ইয়ার্কি হচ্ছে আমার সঙ্গে, না?

এ তো আদর নয়, রাগের ভাণে খেলার ছলে শাসন করা নয়। চমক ভাঙ্গিয়া আঘাতের বেদনায় চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিতে রাণুর একটু সময় লাগিল। ততক্ষণে বিছানা হইতে নামিয়া ত্রিষ্টুপ গট-গট করিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

একটি ছোট দোতলা বাড়ীর একতলায় তাহাদের অধিকার। ত্রিষ্টুপ ঘুমায় বৈঠকখানায়। দিনের বেলা তার বিছানা ভিতরে টানিয়া আনা হয়, রাত্রে আবার বৈঠকখানার চৌকিতে বিছানাটি পাতিয়া দেওয়া হয়। ঘরটিতে দোতলার ভাড়াটেদের ভাগ আছে; দিনের বেলা ত্রিষ্টুপ একা ঘরটি দখল করিয়া থাকিলে, তারা আপত্তি করে। সারাদিন একটি লোকও তাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসে কি না সন্দেহ, তবু তারা যেন সব সময়ে কোন এক অজানা আগন্তুকের প্রতীক্ষা করে এবং কেউ আসিয়া পাছে কিছু মনে না করে, এই ভয়ে দিনের বেলা ত্রিষ্টুপের বিছানাটি চৌকীর উপর গুটাইয়া রাখিতেও দেয় না।

উঠানের এক কোণে তার দিদি প্রভা টিউবওয়েলে জল তুলিয়া বড় একটা বালতি ভরিতেছিল, ত্রিষ্টুপকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, 'রাণু কাঁদছে কেন রে?'

ত্রিষ্টুপ গম্ভীর মুখে বলিল, 'মেরেছি।'

'কেন, কি করছিল মেয়েটা?' কৌতূহলের বশেই প্রভা কথা জিজ্ঞাসা করিল, অনুযোগ দিবার জন্য নয়। কিন্তু প্রশ্ন শুনিয়াই ত্রিষ্টুপ যেন ক্ষেপিয়া গেল।

'অত কৈফিয়তে তোমার দরকার? খুসী হয়েছে —মেরেছি।'

প্রভা খানিকক্ষণ অবাক্ হইয়া ভাই-এর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া, বাহিরের ঘরের দিকে চলিয়া গেল। ত্রিষ্টুপ তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া, রান্না ঘরে গিয়াই দাবী জানাইল, 'আমার চা কই?'

মা খুন্তি দিয়া তরকারী নাড়িতেছিলেন, বলিলেন, 'এই যে করে' দি'। এত বেলা করে উঠলি, চা-ই বা খাবি কখন, চান করে' খেতেই বা বসবি কখন। ওঁর সঙ্গেই তো যেতে হবে তোকে?'

'না।'

তোর বুঝি দেরীতে আফিস? তা' হোক, ওঁর সঙ্গেই তুই যা বাবা, প্রথম দিনটা। তিনি সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিতে পারেন।'

'আমি চাকরী করব না।'

কথা শুনিয়া মা হাতের খুন্তি উঁচু করিয়া ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অনেক দিনের অনেক চেষ্টার পর পঁচাত্তর টাকা বেতনের এই চাকরীটি জুটিয়াছে, আজ তার ছেলের প্রথম চাকরীতে যোগ দিবার কথা, এখন সে বলিতেছে চাকরী করিবে না। প্রথমটা মা একেবারে থতমত খাইয়া গেলেন। তারপর তাঁর মনে হইল, তাই কখনও হয়! ছেলে তার সঙ্গে দুষ্টামি করিতেছে।

'নে, খুব হয়েছে, আর ফাজলামি করে না। প্রভাকে ডাকতো, তোকে খেতে দিয়ে চা'টা করুক।'

গামছা কাঁধে ত্রিষ্টুপের বাবা অবিনাশ তেলের খোঁজে রান্নাঘরে আসিলেন। ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, 'এখন আর চা খেতে হবে না, চান করে' ফ্যাল। সাড়ে আটটা বেজে [illegible] শের গাড়ীটা ধরতেই হবে। আজ ফিরব [illegible] মানিথলিটা করে' ফেলিস কিন্তু, ভুলিস্ না।'

ত্রিষ্টুপ বলিল, 'আমি যাব না, বাবা।'

'যাবি না? যাবি না মানে?'

'চাকরী করা আমার পোষাবে না।'

অবিনাশ তেলের বাটি হইতে হাতের তালুতে তেল ঢালিতেছিলেন, খানিকটা তেল মাটিতে পড়িয়া গেল। মা'র হাতের খুন্তি আবার কড়াইএর অনেকখানি উঁচুতে নিশ্চল হইয়া রহিল।

প্রথম কথা কহিলেন অবিনাশ।—'কি বলছিস্ তুই পাগলের মত?'

এমন সময়ে রাণুর হাত ধরিয়া প্রভা সেখানে আসিল। রাণুর গালে ত্রিষ্টুপের আঙ্গুলের দাগ স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। মেয়েটা ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছিল, ঠিক স্বপ্নে ত্রিষ্টুপের ছেলের শোকে কাঁদার মত। প্রভার মুখ মেঘে ঢাকা আকাশের মত অন্ধকার। মেয়ের গালটি সকলের সামনে ধরিয়া সে বলিল, 'দ্যাখো বাবা, কেমন করে' মেরেছে মেয়েটাকে। বেলা হয়ে গেছে, আজ আবার আপিস যাবে, আমি তাই মেয়েটাকে বলেছিলাম তোর মামাকে ডেকে দেতো রাণু। ও গিয়ে যেই ডেকেছে, অমনি মেরে একেবারে খুন করে' দিয়েছে। ওর কি দোষ? তোমরাই বল, ওর দোষটা কি? দু'টি খেতে পরতে দিচ্ছ বলে—'

প্রভা নিজেও ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

(ক্রমশঃ)

যুগোশ্লাভিয়াঃ বলকান

ভূপর্য্যটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

বেলগ্রেদের "অতোমবিল ক্লাবের" সেক্রেটারী আমাকে বলেছিলেন : আমাদের দেশের ইতিহাস বড়ই সুন্দর। এই দেখুন সেদিনও আমরা তুরুকদের অধীনে ছিলাম। তুরুকরা কত অত্যাচার যে আমাদের উপর করেছে, তার অন্ত নেই। তুরুকদের হাত থেকে রেহাই পেয়ে যখন স্বাধীন হলাম, তখন আমরা গঠনের কাজে মন দিলাম মনে-প্রাণে। গঠন-কার্য্য সমাপন হবার পূর্ব্বেই এসে পড়ল মহাসমর। সেই যুদ্ধের কথা কেউ লেখেন নি, লিখ্‌তে সাহসও করেন নি। এমন কি আমাদের দেশের লোকও তা' লেখেন নি। এক[illegible]কিবে। [illegible]ক্রান্ত বুলগার, অন্যদিকে ভিনিক সেপাই আমাদের দেশে এসে হাজির হল, আমরা লড়তে গিয়ে মরেছি, মেরেছি এবং ছত্রভঙ্গ হয়েছি। আমাদের ছেলেমেয়ে কোথায় গিয়েছে, আমরা তাদের সংবাদও রাখতে সক্ষম হইনি। পিতা হতে পুত্রের বিদায়, মাতা হতে কন্যার চিরতরে বন্ধন-ছেদন—তা' উপলব্ধি যে করেছে, সেই বুঝেছে এর মর্ম্ম কি? তারপর যখন লড়াই শেষ হল, আমাদের দলের দেশগুলি যখন জয়ী হল, তখন আমরা পেয়েছি সুদে এবং আসলে। তবে ঐ দেখুন "জেরা" ইতালিয়ানরা ধরে রেখেছে, ছাড়বে বলে' বড় ভরসাও নেই। যে সূত্রে আমরা ক্রট্, মন্তেনিগ্রো এবং মাসুদদের কবলে এনেছি, হয়ত একদিন "জেরা" নামক সমুদ্র-বন্দরও পেয়ে যাব। "জেরা" যে পর্য্যন্ত আমরা না পাব, সে পর্য্যন্ত ইজিয়ান সাগর ইতালিয়ানদেরই হয়ে থাক্‌বে।

যেমন বিরূপ কটাক্ষপাত করে' অতোমবিল ক্লাবের সেক্রেটারী ইতালীয়ানদের বিরুদ্ধে বল্লেন, তাতে আমার যেমন ভয় হল, তেম্‌নি দুঃখও হল। কি দোষ করেছে ক্রট্, মাসুদ এবং মন্তেনিগার? তারা আজ যুগোশ্লাভিয়ার কুক্ষিগত। এদেরে মুক্ত করে' দেবার নাম নেই, অথচ "জেরা" পাবার কি প্রবল বাসনা! উত্তর যুগোশ্লাভিয়ায় ভ্রমণকালে বুঝেছিলাম "সুইডেনটেন"এর মতই কতকগুলি অষ্ট্রিয়ান দেশ যুগোশ্লাভিয়াকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা সবাই দাসত্বের নাগপাশে আবদ্ধ। একদিকে স্বাধীনতা, অন্যদিকে পরাধীনতার ব্যবস্থা দেখে আমার যুগোশ্লাভিয়ার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা কথাই মনে হয়েছিল। অষ্ট্রিয়ানরাও ভুলবে না, ম্যাসিডোনিয়ানরাও ভুলবে না। সময় পেলেই আপন পথ বেছে নিবে। তারপর আলবেনিয়াতে যে সকল "আলমন" বাস করে, তারাও শ্লাভ-অধ্যুষিত যুগোশ্লাভিয়ানদের উপর হাড়ে হাড়ে চটা। তাদেরও পিতৃভূমি শ্লাভরা অধীন করে' রেখেছে। বহু জাতির আবাসভূমি বলকানের ভাঙ্গা-গড়া রোধ হবার যেন নয়।

আমাদের উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বাসিন্দারা শতকরা যেমন নব্বইজনই আরিয়ান বা আর্য্য, ঠিক তেমনিই আলবেনিয়াতে যারা বসবাস করে, তারাও শতকরা পঁচানব্বইজনই আর্য্য—ধর্ম্মটা বদ্‌লিয়েছে মাত্র। জার্ম্মাণরাও মাঝে মাঝে নিজকে "আলমন" বলে থাকে। আলবেনীয়ার আলমন্‌রা ধর্ম্মে এবং ভাষায় যদিও এক নয়, কিন্তু উভয় জাতের শরীরের গঠন প্রায় একরূপ। আলবেনিয়াবাসী ধর্ম্মে ইসলাম কবুল করলেও, আরব, নিগ্রো এবং তুরুকদের সঙ্গে রক্তের মিল-মিশ করেনি। এরা অনেক সময়ে বাধ্য হয়ে তুরুক বলে' পরিচয় দিয়ে থাকে মাত্র। রাগলেই এরা বলে "তোরা নিগ্র", সে গ্রীকই হউক আর তুরুকই হউক। বড় অপরূপ জাত এরা! এই জাতটিও যুগোশ্লাভদের উপর সুখী নয়

যুগোশ্লাভিয়া পরের ঘাড়ে বন্দুক রেখে স্বাধীনও হয়েছে, রাজ্যবিস্তার করে' সাম্রাজ্যবাদীও হয়েছে। এ সব কারসাজির পেছনে ছিলেন্ন বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী। যুগোশ্লাভিয়ার ধনীরা তাকেই বলে তাদের সৌভাগ্য। কিন্তু এ সৌভাগ্যের পরিণতি পৃথিবীর লোক একদিন নিশ্চয়ই দেখবে। সুখের বিষয়, যুগোশ্লাভিয়ার সাধারণ লোক বড়ই নিরীহ এবং শান্তিপ্রিয়। তাদের মাঝে অত্যধিক হিংসা এবং ঘৃণা নেই। জিপ্‌সীদেরেও তারা ঘৃণা করে না। কিন্তু কথা হল ধনীর দল ত সাধারণ মানুষ নয়, তারা হল বিশেষ মানুষ। তাদের চালচলন, কথাবার্ত্তা সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে মোটেই মেলে না। তারা ছলে, বলে, কৌশলে আত্মপ্রতিষ্ঠা চায়

যুগোশ্লাভিয়ার লোক জাতে শ্লাভ। ক্রট, মন্তেনিগ্রো এরা কিন্তু শ্লাভ নয়। অথচ শ্লাভরা ওদের উপর অদম্য বিক্রমে শাসন এবং শোষণ করছে। ক্রট্‌রা একবার বিদ্রোহও করেছিল। প্রিন্স পাওয়েল মাঝে পড়ে' গণ্ডগোলের সমাধা করেছেন বটে, কিন্তু শান্তি আনতে পারেন নি। এতগুলি অশান্তির দাবানল যখন একসঙ্গে জ্বলে উঠবে, তখন হয়ত যুগোস্লাভিয়া পূর্ব্বের সার্ব্বিয়ায় পরিণত হতে বাধ্য হবে বলে' মনে হয়। যুগোশ্লাভিয়া গত মহাসমরের পরবর্ত্তী একটা জগাখিচুড়ী রাষ্ট্রমাত্র।

অনেকেই ভাবে হয়ত রুষিয়া স্বজাতি-ভাই সার্ভিয়াকে বাঁচাতে চেষ্টা করবে। হাজার হক আপন জাত ত? কিন্তু এসব ভ্রাতৃপ্রেম চলে, যদি উভয় ভ্রাতার মত ও পথ এক থাকে। যুগোশ্লাভিয়ার ধনীরাই যুগোশ্লাভিয়ায় রাজ্য করছে—নিজের জাতকে যেমন করে' এক্‌সপ্লয়েট্‌ করছে, অন্যকেও তেমনি এক্‌সপ্লয়েট্‌ করছে। রাশিয়াতে জাতিভেদ নেই। কেউ কাউকে এক্‌সপ্লয়েট্‌ করতে পারে না। কার্ল মার্ক্সের থিওরিই হল—এক্‌সপ্লয়েট্‌ না করা। এই হেতু উভয় দেশের মাঝে মেলামেশা মোটেই হতে পারে না। রাশিয়ার সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করবার মত ক্ষেত্র যুগোশ্লাভিয়ায় এখন প্রস্তুত হয় নি। তারপর আছে জার্ম্মাণীর উস্কানি। এখানকার বর্ত্তমানে প্রতিপত্তিশীল ধনীর স্বার্থ সাম্রাজ্যবাদীর সহযোগিতায় অধিক চরিতার্থ হবার সম্ভাবনা। আভ্যন্তরীণ কোন বিদ্রোহ না হলে, শেষ পর্য্যন্ত যুগোশ্লাভিয়া হয় ইংলণ্ড, নয়তো জার্ম্মাণীর হাতে হাত মেলাবার সম্ভাবনা এখনও বেশী।

বুলগেরিয়া এবং যুগোশ্লাভিয়াতে বহু পূর্ব্ব হতেই মনের মিল ছিল না। তার একমাত্র কারণ হল তুর্কীর সুলতান। একটা জাতকে দ্বিখণ্ড করে, কিরূপে তাদের উপর রাজ্য চালান যায়, সেই তথ্য তুর্কীর সাম্রাজ্যবাদী সুলতান খুব ভালই জানতেন। তাই ১৯১২ খৃষ্টাব্দে সন্ধির সময়ে সুলতান শ্লাভদের স্বাধীনতা মঞ্জুর করলেন বটে, কিন্তু তিনি সাম্রাজ্যবাদীর স্বার্থমূলক ষড়যন্ত্রে শ্লাভ-অধ্যুষিত বলকান দেশটাকে দু'ভাগে বিভক্ত করে' দিলেন। উপায় নেই, স্বাধীনতা পেতেই হবে, তুরুকদের হাত হতে মুক্ত হওয়া চাই। তাই ইউরোপের অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীরা, তুর্কীর সুলতানকে পরামর্শ দিলেন, শ্লাভ-অধ্যুষিত দেশটাকে দু'ভাগ করে স্বাধীনতা মঞ্জুর কর। এতে সুলতানের বাসনা যেমন পূরণ হল, তেমনি বাসনাপূরণ হল ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদীদের।

রাষ্ট্রীয় স্বার্থ দ্বিখণ্ডিত শ্লাভদের মধ্যে হীনতা এনে দিল। একই জাত যখন দুটা রাষ্ট্রে পরিণত হল, তখন তাদের মাঝে এমন বিভিন্ন ভাব এসে পড়ল যে, একের মাংস অন্যে খেতে চাইলে। গত মহাযুদ্ধের সময়ে লোক তা' স্বচক্ষে দেখল। বুলগেরিয়ার 'দুব্র', যুগোশ্লাভিয়ার 'দুব্রে'কে হত্যা করতে প্রবৃত্ত হল। রুষিয়ান ভাষায় অথবা শ্লাভ ভাষায় "ভাল" কথাটাকে দুব্র বলে। এই কথাটা শ্লাভরা বার বার [illegible] বলে'ই অনেকে রাশিয়ানদেরও "দুব্র"ও ব[illegible]কেন। বুলগেরিয়ার পূর্ব্ব অঞ্চলের লোক "দুব্র" উচ্চারণ করে এবং পশ্চিম বুলগেরিয়া হতে যুগোশ্লাভিয়া পর্য্যন্ত সবাই দুব্রেই বলে' থাকে। গত মহাযুদ্ধের সময়ে অনেকে বল্‌ত—দুব্র এবং দুব্রে যুদ্ধ বেধেছে।

এই ত গেল জাতীয়তাবাদীদের কর্ম্মসূচী। যুগোশ্লাভিয়ায় ধনীরা সংখ্যায় বেশী। বুলগেরিয়ার ধনীর সংখ্যা কম। এজন্যই বোধ হয় বুলগেরিয়াতে সোসিয়েলিজম প্রবেশ করতে পেরেছে। যুগোশ্লাভিয়ায় যে একেবারে সোসিয়েলিজম প্রবেশ করেনি তা' নয়; সেখানেও কমিউনিষ্ট দল আছে, কিন্তু সে দল তত প্রবল নয়। সময়ের ফাঁকতালে যদি উভয় দেশের কমিউনিষ্ট মিলে যেতে পারে, তবেই হবে ধনিক জাতীয়তাবাদীদের মরণ আর নূতন এক অখণ্ড সোসিয়েলিষ্ট রাষ্ট্রের অভ্যুত্থান। বল্‌কানের পুঁজিবাদীর দল সে ভয় হতে রক্ষা পাবার জন্য এবং নিজ স্বার্থের জন্য যথেচ্ছা করতে রাজি হবে। হয়তো জার্ম্মাণীর সঙ্গে মিলে প্যাক্টও করবে। কিন্তু তার ফল ভাল হবে না। সাধারণের জাগরণ দীর্ঘ কাল চেপে রাখা শক্ত হবে। সে ক্ষেত্রে ফিনদের মতই এরাও রাশিয়ার সহায়তা অবধারিত পাবে। ভবিষ্যৎ ইহা প্রমাণ করবে। বর্ত্তমান যুদ্ধই ইউরোপের শেষ যুদ্ধ নয়। সাম্য ও সাম্রাজ্যবাদীর শক্তিপরীক্ষা নিকট ভবিষ্যতে একদিন আসবেই। যুগোশ্লাভিয়া কেন, সমুদয় বলকান-সমস্যার সমাধান হবে তখনই, এখন নয়।

খেলা-ধূলার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি

শ্রীসন্তোষকুমার দে, এম. এ., এইচ্. ডিপ্. এড্ (ডবলিন)

অতীত যুগে ভারতীয় দার্শনিকেরা খেলাকে যে হীন চক্ষে দেখিতেন না, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এই বিশ্বসৃষ্টির মূলে শ্রীভগবানের লীলাখেলাই তাঁরা দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাই তাঁহাকে লীলাময় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন*। শিশুর খেলা লক্ষ্য করিয়াই কবির মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে :—

> চূর্ণ খেলানার ধূলি উড়ে দিকে দিকে,
> আপন সৃষ্টিকে
> ধ্বংস হ'তে ধ্বংস মাঝে, স[illegible]কিবে।
> খেলারে করিস্ রক্ষা ছিন্ন করি' খেলানা-শৃঙ্খল।

দার্শনিক তত্ত্ব ছাড়িয়া দিয়া এক্ষণে শিক্ষাবিশারদেরা ও মনোবিজ্ঞানবিদেরা খেলা-ধূলাকে কি চক্ষে দেখেন, তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

অনেক মনস্তাত্ত্বিক খেলাকে একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি (instinct) বলিয়া মনে করেন। তাঁদের এইরূপ মনে করিবার কারণ হয়ত ইহাই যে, মানুষ আপন মনের আবেগেই খেলিয়া থাকে। নরশিশু এবং পশুপক্ষী প্রভৃতি সকল প্রাণীই আপন রুচি অনুসারে খেলে, ইহা কাহাকেও শিখাইতে হয় না—সকল শিশু এবং সকল প্রাণীই আপন মনের অসীম আনন্দ খেলার রূপেই প্রকাশ করিয়া থাকে। খেলা-ধূলার উৎপত্তি সম্বন্ধে কতকগুলি মত-বাদের সৃষ্টি হইয়াছে; কাজেই এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচনা করিতে হইলে, এই মতগুলির সমস্ত আলোচনার প্রয়োজন।

(১) খেলাধূলা সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রাচীন মতবাদটি হইল, জর্ম্মাণ-কবি শিলারের। তাঁর এই মতবাদটি পরে ইংরাজ-পণ্ডিত হার্ব্বাট স্পেন্সার আরও বিশদভাবে আলোচনা করিয়া গ্রহণ করেন। এইজন্য এই মতটি Schiller-Spencer Theory বলিয়া খ্যাত। এই মতানুসারে, উদ্বৃত্ত স্নায়বিক শক্তির ফল হইল ক্রীড়া। নরশিশু বা পশুশিশু শৈশবাবস্থায় পিতামাতা কর্ত্তৃক সযত্নে লালিত পালিত হয়; তাহাদের আহারান্বেষণ, গৃহনির্ম্মাণ, আত্মরক্ষা প্রভৃতি কোন বিষয় ভাবিতে হয় না, কাজেই তাহাদের শক্তি পূর্ণমাত্রায় অটুট থাকে। এই অতিরিক্ত, অটুট প্রাণশক্তি কাণায় কাণায় পূর্ণ হইয়া যখন উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়ে, তখন তাহার ফলে শিশু উদ্দেশ্যহীনভাবে আপন হস্তপদাদি-সঞ্চালিত করিতে থাকে। এই লক্ষ্যহীন হস্তপদাদি সঞ্চালনের অন্য নাম হইল খেলা, অবশ্য নিয়ম বা বিধিবদ্ধ কোন শৃঙ্খলাযুক্ত ক্রীড়া নহে। ইহা লম্ফন, ধাবন প্রভৃতি সাধারণ ক্রীড়াকেই বুঝাইতেছে। এই তথ্যের মধ্যে অবশ্য কিছু সত্য আছে; কিন্তু সর্ব্বপ্রকার ক্রীড়াকে, এমন কি জীবজন্তুর অতি সাধারণ ক্রীড়াকেও এই তথ্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। একটি মাত্র কারণে এই তথ্যের যাথার্থ্য ব্যর্থ হইয়া পড়ে; সেটি হইতেছে এই যে, নরশিশু এমন কি পশুশিশুও শ্রান্ত অবস্থাতেও খেলিতে অসম্মত হয় না এবং খেলিতে খেলিতে যতক্ষণ না একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়ে, ততক্ষণ খেলিতে থাকে এবং মানুষ অনেক সময়ে ক্লান্তি-বিনোদনের জন্যও খেলিয়া থাকে। কাজেই উদ্বৃত্ত প্রাণশক্তির ফলে খেলার উদ্ভব হইয়াছে, এ কথা ঠিক মানিয়া লওয়া যায় না; তবে এ কথা সত্য যে, খাদ্য ও পানীয়ের দ্বারা পরিতৃপ্ত হইলে ও উপযুক্ত বিশ্রাম পাইলে খেলার আগ্রহ বাড়িয়া উঠে; কিন্তু এ কথা শুধু খেলা কেন, কাজের বেলায়ও খাটিয়া থাকে। উপযুক্ত আহার ও বিশ্রাম পাইলে, কার্য্য করিবার শক্তি ও আগ্রহও বাড়িয়া যায়। এই তথ্যের এই সমস্ত ত্রুটি থাকায়, অন্যান্য মনোবিজ্ঞানবিদেরা আর এক নূতন তথ্য খাড়া করিয়াছেন।

---

* বালক যেমন খেলার ছলে ভাঙে গড়ে, কোন উদ্দেশ্য তাহার খেলার পিছনে থাকে না। সেইরূপ সেই বিশ্বকর্ম্মাও এই বিশ্বটাকে লইয়া ভাঙিতেছেন। নিজের কোন প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য লইয়া কিছু করিতেছেন না। কারণ, তিনি তো নিত্যপূর্ণ আপ্তকাম।"—বিষ্ণুপুরাণ ১।২।১৮

"ক্রীড়তো বালকস্যেব চেষ্টাম্ তস্য নিশাময়।"—গরুড়পুরাণ ১।৪।৫

(২) এই তথ্যটির নাম হইতেছে পুনরাবৃত্তি তথ্য (Recapitulation Theory)। এই তথ্যটি সংক্ষেপে হইল এই যে, মনুষ্যজাতিকে বর্ত্তমান সভ্য অবস্থায় পৌঁছিবার পূর্ব্বে সুশৃঙ্খলভাবে বিভিন্ন জীবন-বিজ্ঞান (Biological) ও সমাজ-বিজ্ঞানসম্মত (Sociological) অবস্থার মধ্য দিয়া পার হইয়া আসিতে হইয়াছে। ব্যক্তির বিকাশও লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, ইহা পশুজীবন ও মানবীয় ইতিহাসের ক্রমবিকাশের সুবিন্যস্ত সংমিশ্রণের ফল। অর্থাৎ জীবন-বিজ্ঞানের দিক্ দিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, সরল ভ্রূণাবস্থা হইতে পূর্ণাঙ্গ মানবাবস্থা পর্য্যন্ত যেন এক সরল পশুজীবন হইতে জটিল মানব-জীবনের বিবর্ত্তনের পুনরাবৃত্তি হইতেছে (Ontogenesis parallels phylogenesis)। আর সমাজ-বিজ্ঞানের দিক্ দিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, বর্ত্তমান সভ্যতা অতীতের পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই অতীত ইতিহাস হইল, শিশুরা এক বয়সে নৈতিক ও মানসিক বিষয়ে ঠিক বর্ব্বরদের মত থাকে। তখন তাহাদের প্রবৃত্তি হয় ভবঘুরে ও লুণ্ঠনকারীদের ন্যায়, কারণ পূর্ব্বপুরুষেরা এক সময়ে এইরূপ জীবনই যাপন করিয়াছিলেন। তারপর জীবনে আসে রাখাল-জীবনের (Pastoral stage) প্রভাব। এইভাবে সর্ব্বশেষে শিশু সমসাময়িক জীবনের কার্য্যকলাপে আনন্দ পাইয়া থাকে এবং তখনি বুঝিতে হইবে সে সংস্কৃতির যুগে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। মানব-জীবনের এই অতীত ইতিহাস খেলাধূলাতেও প্রতিফলিত হইতে দেখা যায়। দেখা যায় যে, শিশু এক সময়ে সঙ্গীর সহিত কারণে বা অকারণে মারামারি, হাঁচড়াহাঁচড়ি, কামড়াকামড়ি করিতে ভালবাসে এবং যতক্ষণ না সঙ্গীর অঙ্গে রক্তপাত দর্শন করে ততক্ষণ ক্ষান্ত হয় না। এটি আসলে তাদের মারামারি নয়—ইহার মধ্যে অসূয়া বা বিদ্বেষ নাই—এটি একটি খেলা। এই খেলার ছলে শিশু অতীত যুগের বর্ব্বর মানব-জীবনের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করিতেছে মাত্র। তারপর দেখা যায় যে, শিশুদের জীবনে একটা সময় আসে, তখন তারা লাঠী, ছড়ি লইয়া 'টোটো' করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে ভালবা[illegible] এটিও একটি খেলা। এই খেলায় শিশু অতীত যুগে, মানব যখন স্থান হইতে স্থানান্তরে আহার ও বাসের সন্ধানে যাযাবর জাতির ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইত, সেই যুগের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করিতেছে। তারপর তারা বসিয়া বসিয়া খেলিতে ভালবাসে। এই সময়কার খেলাগুলিতে Pastoral Stage-র ছায়া পড়ে। পরিশেষে শিশু নিয়মকানুনে বাঁধা সুসংবদ্ধ খেলা খেলিতে আরম্ভ করে এবং তখন সে বর্ত্তমান সভ্যযুগের মানবের স্তরে আসিয়া পৌঁছায় এবং এইভাবে Recapitulation Theoryর সমস্ত পর্য্যায়গুলি শেষ করে। এই তথ্যটি জার্ম্মাণীর বাহিরে বিশেষ সমাদর লাভ করে নাই; তাহার কারণ জীবন-বিজ্ঞানের দিক্ দিয়া এই তথ্যটি ভ্রমাত্মক যুক্তি[illegible] ভ্রূণাবস্থায় অবশ্য কিছু পরিমাণে নিম্ন শ্রেণীর জীবের সহিত সাদৃশ্য দেখা যায়, কিন্তু তবু ইহাকে অতীত অবস্থার পুনরাবৃত্তি বলা চলে না। তাহা ছাড়া পুনরাবৃত্তি তথ্যকে পুরাপুরি মানিয়া লইতে হইলে, বিবর্ত্তনবাদের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পড়িতে হয়। অসভ্য বর্ব্বরযুগ হইতে বর্ত্তমান সভ্যযুগে আসিয়া পৌঁছাইতে মানবজাতিকে এই সব কল্পিত স্তরের মধ্য দিয়া আসিতে হইয়াছে, তাহার কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই। অধ্যাপক ম্যাক্‌ডুগাল ইহা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নন। তিনি বলেন:

"This recapitulation theory of play and the educational practice based on it are founded on the fallacious belief that, as the human race traversed the various culture periods, its native mental constitution acquired very special tendencies, and that each period of culture was, as it were, the expression of certain well-marked stages in the evolution of human mind."

অর্থাৎ ক্রীড়াবিষয়ক এই পুনরাবৃত্তি তথ্য এবং উহার উপর ভিত্তি করিয়া যে শিক্ষাপদ্ধতি রচিত হইয়াছে, তাহা এই ভ্রমাত্মক বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত যে, মনুষ্য-জাতি বিভিন্ন সংস্কৃতির যুগ অতিক্রম-কালীন তাহার সহজাত মানসিক অবস্থাও বিশেষ বিশেষ প্রবণতা লাভ করিয়াছে এবং প্রতি কৃষ্টির যুগ যেন মানব-মনের ক্রমবিকাশের বিশেষ বিশেষ সুস্পষ্ট পর্য্যায়কে প্রকাশ করিতেছে।

(৩) এই পুনরাবৃত্তি তথ্যকে একটু ঘুরাইয়া অধ্যাপক ষ্ট্যান্‌লী হল "পূর্ব্বস্মৃতি তথ্য" (Reminiscent Theory) গড়িয়া তুলিয়াছেন। ক্রীড়ারত শিশুকে লক্ষ্য করিয়া অধ্যাপক মহাশয় বলিতেছেন :

"The child is not so much rehearsing the serious activities of his own adult life as harking back to and recapitulating those of her remote ancestors."

অর্থাৎ শিশু বয়স্ক জীবনের গুরু কার্য্যগুলি অধিগত করিবার জন্য যত না অভ্যাস করিতেছে, ততদূর পূর্ব্ব-পুরুষদের অতীত বাণী শুনিতেছে এবং তাঁহাদের কার্য্য-কলাপের পুনরাবৃত্তি করিতেছে। অধ্যাপক মহাশয় কিছু নূতন কথা বলেন নাই। প[illegible] তথ্য ও পূর্ব্ব-স্মৃতি তথ্যের মধ্যে কোন পা[illegible] থাকিবে। [illegible] যায় না ; একটিকে না মানিলে, অপরটিকে মানা যায় না।

(৪) খেলা সম্বন্ধে আর একটি তথ্য আছে। এই তথ্যটি Malebranche প্রথমে প্রচার করেন ; পরে Karl Groos ইহার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করেন। কার্ল গ্রুস পশুশিশু ও নরশিশুর খেলা লক্ষ্য করিয়া বলেন, ভবিষ্যৎ জীবনের কর্ম্মসূচির সূচনা এই খেলাতেই।* কি মানুষ, কি পশু ভবিষ্যতে জীবন-যুদ্ধে যাহাতে টিকিয়া থাকিতে পারে, তাহার উদ্যোগ আয়োজন হয় এই খেলাতেই। তাঁর এই বক্তব্য গুটিকতক দৃষ্টান্তের দ্বারা সহজবোধ্য করা যাইতে পারে। পশুদের খেলার কথাই ধরা যাক্। একটি বিড়াল-শিশু সম্মুখে একটি শুষ্ক পত্র বা একখণ্ড কাগজ বা অনুরূপ কিছু দেখিতে পাইলে, সেটিকে লইয়া যেভাবে খেলা করে, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। দেখা যাইবে যে, বিড়াল-শিশুটি ঐ শুষ্ক-পত্র বা কাগজখণ্ডগুলি বার বার থাবা মারিয়া ধরিতেছে, ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেছে এবং দৌড়াইয়া গিয়া আক্রমণের ভঙ্গীতে পুনরায় ধরিতেছে, হাঁচড়াইতেছে, কামড়াইতেছে, লোফালুফি করিতেছে ; ঠিক যেন বড় হইয়া তাকে যে শিকার ধরিয়া খাইতে হইবে, তার অভ্যাস এখন হইতেই করিতেছে। কিন্তু ঐ পত্রখণ্ডটি একটি ছাগ-শিশুর সম্মুখে ধরিলে, সে কখনই ঐভাবে খেলিবে না। কুকুর-শিশুর খেলা লক্ষ্য করিলেও, ঠিক অনুরূপ দৃশ্যই দেখা যাইবে। চার-পাঁচটি কুকুর-শিশু যখন খেলা করে, দেখা যায় যে, তারা লাফালাফি করিয়া পরস্পরকে আক্রমণ করিতেছে, কামড়াইতেছে বা সেই আক্রমণকে প্রতিহত করিবার চেষ্টা করিতেছে বা পলাইয়া যাইতেছে, কি পলাইবার ভাণ করিতেছে। এই সমস্ত কার্য্যই তার ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয়। তাহাকে আক্রমণ করিয়া অপরের নিকট হইতে খাদ্যদ্রব্য কাড়িয়া লইতে হইবে, কাড়িয়া লইতে না পারিলে নিজের সংগৃহীত খাদ্য লইয়া পলাইয়া যাইতে হইবে, বিপদ্‌কে এড়াইয়া চলিতে হইবে। শিশুবয়সে এই অতি প্রয়োজনীয় কার্য্যগুলি খেলার ছলে শিখে বলিয়াই ভবিষ্যৎ জীবনে এই বিষয়ে সে আরও চতুর ও দক্ষ হইয়া উঠে। কার্ল গ্রুস খেলাকে যে 'preparation for the serious business of life' বলিয়াছেন, সেটি মনোবিজ্ঞানের ভাষায় দাঁড়াইতেছে 'Premature ripening of instincts.' এবং তাঁর মতবাদ শিলার-স্পেন্সারো মতবাদের একেবারে বিপরীত ; অর্থাৎ শিশুরা যে উদ্বৃত্ত উৎসাহের ফলে এবং শিশু বলিয়াই খেলে তাহা নহে, পরন্তু খেলে বলিয়াই তাহাদের এই শৈশবাবস্থার সৃষ্টি।

মনুষ্য-শিশুর খেলা লক্ষ্য করিলেও, গ্রুসের উক্তির সত্যতা অনেকটা প্রমাণ হয়। "মুকুলিকা বালিকা-বয়সী অনন্তযৌবনা উর্ব্বশী" "আঁধার পাথার-তলে বসিয়া একেলা মাণিকমুকুতা ল'য়ে" খেলে শৈশবের খেলা। আর মনুষ্যসমাজে বালিকারা বাল্যাবস্থায় খেলা করে পুতুল লইয়া ; পুতুলের বিবাহ দেয়, "বর-বধূ" খেলে,

"সারাদিন মেতে থাকে হাঁড়ী-কুঁড়ি খেলাতে ;
বালি দিয়ে ভাত রাঁধে—ঝোল রাঁধে ঢেলাতে।
রাঁধাবাড়া শেষ হ'লে টেনে দিয়ে ঘোমটা।
জানালার ধারে বসে' ছেড়ে নিল দোমটা।"

সাজ-সজ্জা, সন্তানপালন প্রভৃতি ভবিষ্যৎ জীবনের নানা প্রয়োজনীয় কাজগুলি খেলার মধ্য দিয়া তারা সুনিপুণভাবে অভিনয় করিয়া থাকে। একদিন তারা যে বধূ, গৃহিণী, লীলাসঙ্গিনী, জননী হইবে তাহারই পূর্ব্বাভাস দেখা যায় এই সমস্ত খেলায়।

* The Play of Animals and the Play of Man.

"তারপর একদিন কি জানি সে কবে—
জীবনের বনে, যৌবন-বসন্ত যবে
প্রথম মলয় বায়ু ফেলেছে নিঃশ্বাস,
মুকুলিয়া উঠিতেছে শত নব আশ,
সহসা চকিত হ'য়ে আপন সঙ্গীতে
চমকিয়া হেরিলাম—খেলাক্ষেত্র হ'তে
কখন অন্তরলক্ষ্মী এসেছে অন্তরে
আপনার অন্তঃপুরে গৌরবের ভরে।"

খেলার সঙ্গিনী হয়—"মর্ম্মের গেহিণী, জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।"

আর বালকদের খেলা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, তারা খেলে যুদ্ধ-বিগ্রহের খেলা, বাঘ-ভালুক-শিকারের খেলা, দোকানদারি খেলা, চোর-বিচারকের খেলা; কিংবা হয়ত তারা বলে,—

"কাজের কথা জানিনে ভাই, লাঙল দিয়ে খেলি,
নিড়িয়ে দেই ধানের ক্ষেতের সবুজ রঙের চেলি।
খেলা মোদের গান গাওয়া ভাই, খেলা লাঙল চষা,
সারাটি দিন খেল্‌তে জানি, জানিই নেক বসা।"

অর্থাৎ যে খেলাগুলির সহিত তাদের ভবিষ্যৎ জীবন অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত, সেইগুলিই তারা খেলিয়া থাকে। কোন সুস্থ ও স্বাভাবিক বালক বালিকার খেলা খেলিবে না, আবার কোন বালিকাও সাধারণতঃ কোন বালকের খেলা খেলিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিবে না। অবশ্য ইহার ব্যতিক্রম যে দেখা যায় না, তাহা নহে; এ গুলিকে পুরুষের মেয়েলী ঢং আর মেয়েদের পুরুষালী ভাবের অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

কুকুরের বাচ্চার এই যে খেলা—হাঁচড়া-হাঁচড়ি, কামড়াকামড়ি, ইহাতে একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল যে, বাচ্চাগুলি পরস্পরকে আক্রমণ করে, কামড়াইয়া ধরে, মাটিতে টিপিয়া রাখে, হাঁচড়াইয়া দেয়, কিন্তু রক্তপাত কখনও হয় না; দাঁত বসাইয়া দিলেও, এত গভীরভাবে দাঁত বসায় না, যাহাতে চামড়া ফুঁড়িয়া রক্ত বাহির হইতে পারে—হাঁচড়াইয়া দিলেও, এত প্রবলভাবে নখরাঘাত করে না, যাহাতে মাংস ছিঁড়িয়া যাইতে পারে। এইরূপ না হইবার কারণ, মনোবিজ্ঞানবিদ্‌দের মতে হইল, এটি ত সত্যকা[illegible] ঝগড়া নয়, এটি হইল মারামারি খেলা, তাই ইহাতে মারামারির কপট অভিনয় আছে, কিন্তু মারামারির তিক্ততা অর্থাৎ ক্রোধ নাই। ক্রোধ হইল পূর্ব্বাভাস—ক্রোধ না থাকিলে, তাহা সত্যকারের মারামারি হইতেই পারে না। কিন্তু এ প্রশ্নও মনে স্বতঃই জাগে, মারামারি না হইয়া খেলা হইলেও, এই খেলাতে মারামারির সমস্ত চিহ্নই বর্ত্তমান এবং মারামারির এই কপট অভিনয় করিতে গিয়া কুকুর-শিশুর এই আত্মসংযমের ক্ষমতা আসিল কোথা হইতে? প্রবল বেগে আক্রমণ করিল, কামড়াইয়া ধরিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল, দাঁত বসাইল; কিন্তু যতটা গভীরভাবে বসাইলে রক্তপাত হইতে পারে, খেলার এই উত্তেজনাতেও তাহা ভুলিয়া গিয়া, ততটা বসাইল[illegible] আত্মদমন, ইহার মূল কোথায়? যদি সত্যই আত্মদমন হয়, প্রকৃতিদত্ত না হইলে, তাহাও নিশ্চয় শিক্ষাসাপেক্ষ। কিন্তু অতি ক্ষুদ্র সারমেয়-শিশু শিক্ষার অপেক্ষা না রাখিয়াও এইভাবে খেলিয়া থাকে। যতটা জোরে দন্ত প্রবেশ করাইলে চর্ম্ম ফুঁড়িয়া রক্ত বাহির হইতে পারে, তাহার পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা থাকিলে, খেলাতে কুকুর-শিশু পূর্ব্ব অভিজ্ঞতানুসারে আক্রমণের বেগকে অল্প বা অধিক করিবে; কিন্তু দেখা যায় যে, এই অভিজ্ঞতা-লাভের পূর্ব্বেই কুকুর-শিশু এবং অন্যান্য জন্তুও এইভাবে খেলিয়া থাকে। এই প্রশ্নের উত্তর Mr. F. H. Bradley দিয়াছেন। তিনি বলেন, শুধু কুকুর-শিশু কেন, পূর্ণ-বয়স্ক কুকুরও আপন প্রভুর সহিত কামড়াকামড়ি খেলা করে, প্রভুর হাত চাটে; কিন্তু যতটা জোরে কামড়াইলে রক্তপাত হইবে বা প্রভু আঘাত পাইবেন, ততটা জোরে সে কখনই কামড়াইবে না। এই আত্মসংযমের শক্তি এই সমস্ত জীবের আছে এবং এই আত্মসংযমই হইল খেলার একটি বিশেষত্ব। এই আত্মসংযমই পরে খেলার নানাবিধ নিয়ম-কানুনে পরিণত হয়। "There is restraint, a restraint which later may be formulated as the rule of the game." ব্র্যাড্‌লির এই যুক্তিতে ম্যাক্‌ডুগ্যাল সাহেব সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, এই যে সুবিবেচিত আত্ম-সংযম, ইহা কুকুর-শিশুর পক্ষে কখনই সম্ভবপর নহে। এইরূপ খেলা মনুষ্য-শিশুর মধ্যেও দেখা যায়। ছোট

ছোট ছেলেরা ঝগড়া করে, মারামারি করে, কামড়া-কামড়ি, খুস্কাখুস্কি করে, কিন্তু কখনই তারা কাহাকেও সাংঘাতিক ভাবে আঘাত করে না। শিশুরা খেলিতে খেলিতে কাহাকে হত্যা করিয়াছে বা সাংঘাতিকভাবে আহত করিয়াছে, এরূপ কখনও শুনা যায় না। তাহাদের এইরূপ না করিবার কারণ; তাহারা জানে, প্রবল আঘাত করিলে, অভিভাবকদের নিকট শাস্তি পাইতে হইবে; এই শাস্তির ভয়েই তাহারা প্রবল উত্তেজনার মধ্যেও আত্মসংযম হারায় না; কিন্তু অনুরূপ মনোবৃত্তি কুকুর বা অন্যান্য ইতরপ্রাণীর নিকট কিছুতেই আশা করা যাইতে পারে না। মনুষ্য-শিশু যতটা চিন্তা করিতে বা যুক্তিতর্ক করিতে পারিবে, কুকুর-শিশু নিশ্চয় [illegible] পারিবে না। তাহা ছাড়াও বয়স্ক কুকুর সম্বন্ধে না হয় [illegible] কথা কিছু পরিমাণে আসিতে পারে; কিন্তু কুকুর-শিশু সম্বন্ধে এ কথা একেবারেই বলা চলে না—সে কোনরূপ সংযম শিক্ষা করিবার পূর্ব্বেই এই সংযমশক্তি দেখাইয়া থাকে। তাই ইহাকে আত্মসংযম না বলিয়া অধ্যাপক ম্যাক্‌ডুগ্যাল ইহাকে একটা সহজাত প্রবৃত্তি (instinct) বলিতে চাহেন —যাহার শিক্ষার প্রয়োজন হয় না, যাহা জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই জন্মিয়া থাকে।

"The movements, with their characteristic differences from those of actual combat, must be regarded as instinctive, but as due to excitement of some modified form of the combatic instinct, an instinct differentiated from, and having an independent existence alongside the original instinct. And that the movements are not the expression of the true combative instinct is shown also by the fact that the specific affective state, namely anger, which normally accompanies its excitement, is lacking in playful activity."*

(৫) খেলা সম্বন্ধে আর একটি মত আছে—সেটি হইতেছে Cathartic Theory (রেচক তত্ত্ব)। এই মতানুসারে যে সমস্ত রুদ্ধ আবেগ ও সহজ জ্ঞান (instinct) জীবনে প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশিত হইতে পায় না, তাহাদেরই বহিঃপ্রকাশের নাম হইল ক্রীড়া।†

এখানে ক্রীড়া সম্বন্ধে সমগ্র তথ্যের সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল। এতগুলি মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে—ইহা হইতেই ক্রীড়ায় জটিলতা ও সমাজ-জীবনে তাহার প্রভাব স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। ধীর ভাবে দেখিলে দেখা যাইবে, যে এই বিভিন্ন মতের একটিও ঠিক পরস্পর-বিরোধী নয়—একটিকে অপরটির পরিপূরক বলা যাইতে পারে। এই মতবাদগুলির মধ্যে কার্ল্ গ্রুসের মতটিই বেশীর ভাগ পণ্ডিতেরা সমর্থন করেন।

ক্রীড়া লক্ষ্যহীন ভাবে মানসিক শক্তির অপচয় নয়—ইহা আনন্দদায়ক, স্বতঃস্ফূর্ত্ত, স্বাভাবিক—ইহা সৃষ্টি। আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয় ইহা উদ্দেশ্যহীন; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে—লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ইহার আছে কিন্তু তাহা স্বতঃপ্রবর্ত্তিত। ইহাই লক্ষ্য করিয়া ম্যাক্‌ডুগাল বলিয়াছেন, "খেলার উদ্দেশ্য একটি নয়; বহু এবং অনেক সময়ে সেগুলি অতি জটিল হইয়া থাকে; এই জন্য সংক্ষেপে একটি কথায় তাহাদের বিশেষত্ব প্রকাশ করা যায় না।" বাস্তবিকই খেলার উদ্দেশ্য বহুবিধ হইতে পারে—নিপুণতা লাভ করা, যাহা নয়, তাহার কল্পনায় আনন্দ লাভ করা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা, শ্রেষ্ঠতা লাভ করা। এই স্থলে ক্রীড়া আর ক্রিয়ার মধ্যে ভেদরেখা অতি ক্ষীণ। অর্থাৎ কাজের যা উদ্দেশ্য, খেলারও তাই; কাজেই খেলা কাজের চেয়ে বড় কম কাজের জিনিস নয়।

খেলার প্রধান লক্ষণ হইল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। যে জাতি যত বেশী যুদ্ধপ্রিয়, তাহাদের জাতীয় খেলাগুলিও তত বেশী প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক। সেইজন্য দেখা যায় যে, য়ুরোপীয় খেলাগুলি সাধারণতঃ অন্যান্য দেশের খেলা অপেক্ষা অধিক প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক। ইহাই প্রমাণ করিবার জন্য ম্যাক্‌ডুগোল বলিতেছেন:

"The impulse of rivalry is very strong in the people of Europe, specially perhaps, in the English people, it constitutes the principal motive to almost all our many games, and it lends its strength to the support of almost every form of activity......on the

* Play—Mc. Dougall.

† বর্ত্তমান সভ্যজগতে বিবাদশীলতা (Instinct of Pugnacity) প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ করিবার পক্ষে যথেষ্ট অন্তরায় রহিয়াছে; সেই জন্য এই স্বাভাবিক সংস্কারটি খেলায় আত্মপ্রকাশ করে। তাই দেখা যায় যে, খেলা মাত্রেই এক একটি নকল যুদ্ধ।

other hand, men of the unwarlike races, e. g. the mild Hindoo or the Burman, seem relatively free from the impulse of rivalry. To men of these races such games as football seem utterly absurd and irrational, and, in fact, they are absurd and irrational for all men born without the impulse of rivalry; whereas men of warlike races, e. g. Maories, who like our ancestors found for many generations their chief occupation and delight in warfare, take up such games keenly and even learn very quickly to beat us at them."

অর্থাৎ য়ুরোপীয়দের মধ্যে, বিশেষ করিয়া মনে হয় ইংরাজদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রবৃত্তি অতি প্রবল; এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমাদের প্রায় সমস্ত খেলারই প্রধান উদ্দেশ্য এবং আমাদের সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মশক্তি ইহারই দ্বারা অনুপ্রাণিত; অপরদিকে যুদ্ধবিমুখ জাতিরা, যেমন নিরীহ হিন্দু বা ব্রহ্মবাসীরা এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা-প্রবৃত্তি হইতে আপেক্ষিকভাবে যুক্ত। এই সব জাতির কাছে ফুটবল প্রভৃতি খেলা একেবারে অসঙ্গত ও অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় এবং বাস্তবিকই যে সব জাতির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপ্রবৃত্তি নাই, তাহাদের কাছে এই সব খেলা অসঙ্গত ও অযৌক্তিক বলিয়া মনে হইবেই; কিন্তু মাওরিদের মতন রণপ্রিয় জাতিরা—আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের মত যাহাদের নিকট যুদ্ধই প্রধান বৃত্তি ও আনন্দের বিষয় —এই সমস্ত খেলা অতি ব্যগ্রভাবে খেলিয়া থাকে এবং অতি সহজেই শিখিয়া লইয়া আমাদের হারাইয়া দেয়।

ম্যাক্‌ডুগাল সাহেব তাঁর এই উক্তি প্রমাণ করিবার জন্য আরও বলিয়াছেন যে, তিনি একবার টোরিস-প্রণালীর অন্তর্গত এক ক্ষুদ্র দ্বীপে লাপুয়া-ম্যালেনেসিয়া নামে এক সঙ্কর জাতির মধ্যে বাসকালে লক্ষ্য করেন যে, ঐ জাতির মধ্যে প্রতিযোগিতা-প্রবৃত্তি একেবারেই নাই। এই জাতির অধিকাংশ খেলাতেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা একেবারেই দেখা যায় না। তিনি ইহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নানারূপ বিলাতী খেলা শিখাইতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতার জন্য তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্তির অভাবকে দায়ী করেন। এই জাতি নিজ দরিদ্র অবস্থার জন্য একেবারেই অসন্তুষ্ট নয় এবং নিকটবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জে গিয়া সামান্য পরিশ্রম করিলেই যথেষ্ট পারিশ্রমিক পাইবার সম্ভাবনা থাকিলেও, তাহারা সে সুযোগ কখনই গ্রহণ করিত না। এই জাতি অতি নিরীহ এবং এত যুদ্ধবিমুখ ও শান্তিপ্রিয় যে, নিজেদের মধ্যেও তাহারা কখনও মারামারি করিত না। তাহাদের এই অহিংসভাব যে সুশিক্ষা বা উৎকৃষ্ট সমাজব্যবস্থার ফলে হইয়াছে, সেরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই, কেননা একপুরুষ পূর্ব্বেও তাহারা ভগ্নপোত নিরাশ্রয় নাবিকদের ধরিয়া ধরিয়া খাইত।

যোদ্ধজাতির খেলাগুলিতে জাতীয় জীবনের ছায়া পড়িবে, সেগুলিতে যুদ্ধের অল্পবিস্তর নকল উন্মাদনা থাকিবে, প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা রহিবে, মনোবিজ্ঞানের দিক্ দিয়া এক[illegible] প্রস্তুত থাকিলেও, একথা স্বীকার করিতে মো[illegible]স্তুত নহি যে, এই কারণেই নিরীহ প্রকৃতির হিন্দুর নিকট ফুটবল, ক্রিকেট, হকি একেবারে অসম্ভব ব্যাপার হইয়া উঠিবে। ভারতবর্ষের ফুটবল-ক্রিকেট হিন্দু খেলোয়াড়দের খবর যাঁরা রাখেন, তাঁরা কি ম্যাক্‌ডুগ্যাল সাহেবের এই মন্তব্য নীরবে মানিয়া লইতে পারিবেন? ভারতের হকি-টীম ভুবনবিজয়ী, এ কথা কে না জানে? অধ্যাপক মহাশয়ের টিপ্পনী অনুসারে হটনটট্, জুলু, বেদুইনদের য়ুরোপীয়দের অপেক্ষা ভাল ফুটবল বা রগ্‌বী খেলোয়াড় হওয়া উচিত; কিন্তু সত্যই কি তাই? য়ুয়োপীয়েরা নিজেদের এই দীনতা মানিয়া লইবেন কি?

যাক্, এ কথা ছাড়িয়া দিয়া এখন খেলার দুইটি প্রধান বিশেষত্ব লইয়া আলোচনা করা যাক্। খেলার মধ্যে দেখা যায় দুইটি প্রধান লক্ষণ—প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর বিরোধ-শীলতা (combative instinct)। এই দুইটি আপাত দৃষ্টিতে এক বোধ হইলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে এক নয়। বিরোধশীলতা শিশুদের মধ্যে অল্প বয়সেই দেখা দেয় কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা শিশুদের মধ্যে চার পাঁচ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে দেখা যায় না। চার পাঁচ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে শিশুরা যে সমস্ত খেলা খেলে, সেগুলি সুসংবদ্ধ নয়। এই সময়কার খেলাগুলির কোন বিশিষ্ট আকার নাই, শৃঙ্খলা নাই, উদ্দেশ্য নাই। দেখিলেই মনে হয়, শিশু যেন তার উদ্বৃত্ত প্রাণশক্তি কোন প্রকারে ব্যয় করিয়াই আনন্দ পাইতেছে। এই বয়সের শিশুর খেলা

শুধু লম্ফ ঝম্ফ, দৌড়াদৌড়ি, লুটাপুটি, চীৎকার। কবির ভাষায়:—

বালুকা দিয়ে বাঁধিছে ঘর;
ঝিনুক নিয়ে খেলা।
বিপুল নীল সলিল 'পরি
আপন হাতে হেলায় গড়ি,
পাতায় গাঁথা ভেলা।
জগৎপারাবারের তীরে
ছেলেরা করে খেলা।

তারপর আর একটু বয়স হইলে, শিশু আর এই সব খেলায় কোন আনন্দ পায় না, বয়সের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স শৃঙ্খলাবদ্ধ খেলায় যোগদান করিবে। ... করে— য খেলায় আছে পূর্ণ-মাত্রায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ইহাই লক্ষ্য করিয়া অধ্যাপক ম্যাক্‌ডুগাল খেলাকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন। একটি হইল নিছক খেলা Pure play) আর একটি হইল প্রকৃত খেলা। নিছক খেলায় কোন উদ্দেশ্য নাই, নিয়মকানুন নাই, খেলা শেষ করিবার কোন তাগিদ নাই; আর সত্যকারের খেলায় আছে নিয়মকানুনের শৃঙ্খলা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, একটা উদ্দেশ্য। নিছক খেলাগুলিতে কোন শৃঙ্খলা বা উদ্দেশ্য না থাকিলেও, তাহাতে আছে শিশুর প্রচুর আনন্দ, হস্তপদাদির প্রভূত চালনা, বিপুল উৎসাহ। এখন প্রশ্ন হইতে পারে—শিশুর এই বিপুল উৎসাহ আসিল কোথা হইতে? ইহার উত্তরে ম্যাক্‌ডুগাল বলিতেছেন, শিশুর জীবনযাত্রার সমস্ত প্রয়োজন পিতামাতা মিটাইয়া থাকেন বলিয়া শিশুর বিপুল প্রাণশক্তির একটুও অপচয় হয় না, তাই সে বিপুল প্রাণশক্তি খেলাতে নিয়োজিত করে।

"Hence in the well-fed and well-rested young creature the hermic energy overflows directly into various motor mechanisms. actuating them to the aimless activities, which constitute pure play or gambling. This is but another more technicai statement of the popular view of such play, the view that it is a mere working off of an excess of animal spirits."

অধ্যাপক ম্যাক্‌ডুগাল কিছুই নূতন কথা এখানে বলিতে পারেন নাই, Schiller-Spencer Theoryটী প্রকারান্তরে নিজের ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি Surplus energyকে মানিয়া লইয়াছেন, তবে এই energyর উৎস কোথায়? তিনি তাহার ইঙ্গিতমাত্র দিয়াছেন, পরিষ্কার করিয়া কিছু বলেন নাই।

"There is some reason to suppose that all the instincts draw their energies from a common source, the special function of each instinct being to give specific direction of such energy towards its own special goal."

অর্থাৎ এক সাধারণ উৎস হইতেই যে সমস্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তি শক্তি সংগ্রহ করিয়া থাকে, এইরূপ ভাবিবার কারণ আছে; প্রত্যেক স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিশেষ কর্ত্তব্যই হইল—এই শক্তিকে আপন চরিতার্থতার দিকে লইয়া যাইবার জন্য যথাযথ নির্দ্দেশ দেওয়া। এই "সাধারণ উৎসটি" কি, ম্যাক্‌ডুগাল তাহা পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই। ইহা কি ফ্রয়েডের Libido! হাঁরি বর্গসঁ'র Elan Vital?

খেলা সম্বন্ধে প্রচলিত সমস্ত মতবাদের আলোচনা করা হইল। এই মতগুলি ঠিক পরস্পরবিরোধী নয়, পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। একটির দোষ ত্রুটি অপরটি পূরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছে মাত্র। খেলা জিনিসটা এত জটিল যে, এ সম্বন্ধে কোন সর্ব্ববাদিসম্মত মত আজও বাহির হয় নাই। বারান্তরে এ সম্বন্ধে আরও আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

বাংলা ভাষা এবং উহার প্রচার

রায় বাহাদুর শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম.এ.

আমরা যে বাংলা ভাষা-জননীকে ভক্তিপ্রীতির চক্ষে দেখিব, ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। অন্য প্রদেশের ভ্রাতৃ-গণও যে সেইরূপ আপন আপন মাতৃভাষা সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করিবেন, তাহাতে আপত্তি করিবার কি থাকিতে পারে? তাঁহাদের ভাষা নিকৃষ্ট থাকিতে পারে, আমাদের ভাষা উৎকৃষ্ট, এ ভ্রাতৃ-কলহে কোনও লাভ আছে বলিয়া আমি মনে করি না। সম্প্রতি রাষ্ট্রভাষা লইয়া এইরূপ একটি আত্মঘাতী প্রতিদ্বন্দ্বিতা ধীরে ধীরে ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছে, ইহার সম্বন্ধে পরে কিছু বলিতে চেষ্টা করিব। আপাততঃ বাংলা ভাষার প্রচার সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি।

বাংলা ভাষা স্বভাবতঃই ঐশ্বর্য্যশালিনী, ইহার আবেদন অন্য কোনও ভাষার তুলনায় ন্যূন নহে। সেই জন্য বাংলা ভাষার গ্রন্থরাজি যেরূপ অন্যান্য ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়াছে, সেরূপ আর কোনও ভাষার ভাগ্যে ঘটে নাই। সম্প্রতি যুক্তপ্রদেশের ডিরেক্টার অব্ পাবলিক ইনষ্ট্রাক্শন এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন:

Bengali is a living literature. It has great poets and great writers. I always look upon Bengali as the French of India. অর্থাৎ বাংলা ভাষা একটি জীবন্ত সাহিত্য। এই ভাষায় অনেক বড় কবি এবং বড় লেখক আছেন। আমি সব সময়েই বাংলা ভাষাকে ভারতবাসীর "ফরাসী ভাষা" বলিয়া মনে করি। পাউয়েল প্রাইস্ সাহেব ইংরেজ। তাঁহার মুখে আমাদের মাতৃভাষার প্রশংসা শুনিয়া নিশ্চয়ই আমাদের গৌরব হইবে। কিন্তু ইহা যে একটুও অতি-রঞ্জিত নহে, ইহা যে নিছক সত্য—এই কথা জগতের নিকট প্রমাণ করিবার জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে। আমাদের ভাষা-জননীর সম্পদ বৃদ্ধি করিবার জন্য আমাদিগকে সজাগ থাকিতে হইবে। যে সুখ্যাতি আমাদের ন্যায্য প্রাপ্য, তাহাও রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা ও শ্রম করা আবশ্যক। বাংলা দেশের বিশ্ববিদ্যালয় সেই কার্য্যে [illegible]নেকখানি সহায়তা করিতেছেন।

কিন্তু এখানেই ইহার পরিসমাপ্তি নহে। আমরা চাই যেখানে যে বাঙালী আছেন, তাঁহাদের সমবেত চেষ্টায় পৃথিবীর সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার দাবী সম্মানের সহিত স্বীকৃত হইবে। প্রবাসী বাঙালীরা যাহাতে বঙ্গ-ভাষার অনুশীলনের সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন, বঙ্গ সাহিত্যে পরীক্ষা দিতে সক্ষম হন, তাহার জন্য তাঁহাদিগকে সচেতন করিতে হইবে। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই জড়ত্ববাদী হইয়া পড়িয়াছেন। বাংলার সন্তানগণ বাংলাকে ভুলিয়া রহিয়াছেন। ভাবিয়াছেন বাংলা ভাষার জন্য তাঁহাদের কর[illegible] বাংলার বাহিরে তাঁহারা নির্ব্বাসিত হইয়া আছেন, এইরূপ ভাবেই তাঁহারা চলিতেছেন। কিন্তু আমরা তাঁহাদিগকে এই নির্ব্বাসন ভোগ করিতে কেন দিব? তাঁহারা আমাদেরই ভাই বোন্, তাঁহারা বাংলার সাহিত্য, বাংলার কৃষ্টি হইতে পৃথক হইয়া পড়িলে বাংলা দেশের যে অত্যন্ত ক্ষতি হইবে, তাহা আমরা অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়া থাকি। আর সেই জন্যই তাঁহাদিগকে আমাদের ভাষাজননীর পাদপীঠতলে মায়ের পূজায় যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করি। আর একটি দিক সম্বন্ধেও এই প্রসঙ্গে আমি উল্লেখ করিতে চাই আমাদের মধ্যে অনেক জাতি আছে, যাহাদের কোনও লিখিত-সাহিত্য নাই। তাহাদের মধ্যেও আজ জাগরণ আসিয়াছে। তাহারা সাহিত্য সৃষ্টির উদ্যম করিতেছে, নিজের জাতীয় সংস্কৃতি রক্ষা করিবার জন্য তাহারা আয়োজন করিতেছে। সাঁওতালরা ইংরেজ মিশনরীদের সাহায্যে যে খৃষ্টানী সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছে, তাহাতে তাহাদের সেই প্রয়োজন্ কতদূর সিদ্ধ হইবে তাহা অত্যন্ত সন্দেহজনক। নাগা প্রভৃতি জাতিরও এইরূপ পর-মুখাপেক্ষী না হইয়া উপায় নাই। এই সময়ে তাহাদের মধ্যে যদি বাংলা ভাষার প্রচার করা যায়, তাহা হইলে প্রকৃতই আমাদের কল্যাণ হইবে; ভাষার প্রসার বৃদ্ধি হইবে এবং সভ্যতার আলোকবর্জ্জিত সম্প্রদায়েরও উপকার করা হইবে। আমি কিছুদিন পূর্ব্বে মণিপুর রাজ্যে গিয়াছিলাম। মণিপুরীরা বাংলার ভাবধারা এতদিন

সানন্দে গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের ভাষা যদিও আমাদের একান্ত দুর্ব্বোধ্য, তাহারা যে গান করে, যে পূজা অর্চ্চনা করে, তাহা বৈষ্ণব সংস্কৃতিরই প্রতিচ্ছবি। আমি তাহাদের কীর্ত্তন শুনিয়া মনে করিয়াছিলাম যে, বাংলা দেশেরই কোনও পল্লীতে আসিয়াছি। কিন্তু তাহাদের ভাষা আমি এক বর্ণও বুঝিতে পারি নাই। এতদিন বৈষ্ণব ভাবধারায় পুষ্ট হইয়া মণিপুরীরা আবার তাহাদের নিজের সংস্কৃতি আবিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, অর্থাৎ তাহাদের কোন যুগে এক প্রাচীন ভাষা ও লিপি ছিল, তাহাই কীটদষ্ট প্রাচীনতার কক্ষ হইতে বাহির করিয়া তাহাতেই ফিরিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। যদি ই[illegible] সফল হয়, তবে ইহা বাংলা দেশ ও বাংলা সংস্কৃতি[illegible]লিয়াই আমি মনে করিব। এই বিষয়ে বাঙালীরও কিছু কর্ত্তব্য আছে। মণিপুরবাসীরা বংশপরম্পরাক্রমে যে বাংলা ভাষাকে তাহাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাহন করিলেন, তাহা হঠাৎ তাঁহারা ত্যাগ করিয়া অনিশ্চিতের পশ্চাতে ধাবমান হইবেন কেন? মিথিলার সাহিত্যাকাশে যখন বিদ্যাপতির ন্যায় সূর্য্য বিরাজমান, তখনও তাঁহারা বাংলার বৈষ্ণব ভাবধারা পরিত্যাগ করেন নাই। মণিপুরীরাই বা কেন এরূপ করিবেন? তাঁহাদের সাহিত্য নাই, ব্যাকরণ নাই, কাব্য নাই—অথচ তাঁহারা তথাকথিত জাতীয়তার দোহাই দিয়া সেই পুরাতন জীর্ণ কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট সাহিত্যের প্রতি কেন যে অকারণ প্রলুব্ধ হইতেছেন, তাহা বুঝা যায় না।

আমার মনে হয়—এ বিষয়ে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে লইয়া একটি সমিতি গঠিত হওয়া উচিত এবং তাঁহারা মণিপুরবাসীদের সহিত এই বিষয়ে আলোচনা করুন। আমার বিশ্বাস যে, ইহাতে উভয় পক্ষের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদানের দ্বারা কর্ত্তব্য স্থির করিবার পক্ষে সহায়তা হইবে। অথবা বঙ্গভাষার প্রচার-সমিতি এই কাজের ভার গ্রহণ করিলে, সুফল হইতে পারে। পরিশেষে রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য যদি কোন একটি ভাষাকে অবলম্বন করা যায়, তাহা হইলে তাহাকেই রাষ্ট্রভাষার পদবী দান করা যাইতে পারে। কিন্তু প্রথমতঃ ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশকে এক সূত্রে গ্রথিত করাই এক কঠিন ব্যাপার। রাজকীয় প্রয়োজনে যদিও আমরা ভারতবর্ষের একত্ব কল্পনা করিয়া থাকি, কিন্তু তাহাতে ভাষার একত্ব সাধিত হয় নাই। ভারত-বর্ষের বিশাল জনসংখ্যার তুলনায় রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজনে মুষ্টিমেয় লোক ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করে। সে প্রয়োজনের অভাব ঘটিলে, এই ভাষার মোহ দূরীভূত হইবে। ইংরেজ জোর করিয়া সমগ্র জনসাধারণকে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা দিবার আয়োজন করেন নাই। যাহারা বুঝিয়াছে যে, ইংরেজি না শিখিলে চাকরী মিলে না, রাজদরবারে আসন পাওয়া যায় না, তাহারাই কোমর বাঁধিয়া ইংরেজি লেখাপড়ার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। এরূপ অন্য কোনও রাষ্ট্রনৈতিক বা আধ্যাত্মিক প্রয়োজন দেশের মধ্যে আছে কি না, তাহা বিবেচনা করিতে হইবে। কংগ্রেস সারা দেশের মধ্যে যে ঐক্যস্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, তাহা অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারিতেছে না। কংগ্রেসের নেতৃত্ব বর্দ্ধিত হইয়াছিল যখন রাজ-নৈতিক চক্রের আবর্ত্তনে ভারতের সাতটী প্রদেশে কংগ্রেস শাসনযন্ত্রে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। তখনই আমাদের দেশ একটী রাষ্ট্রভাষাপ্রবর্ত্তনের স্বপ্ন দেখিয়াছিল। কিন্তু সে ভাষার প্রকৃতি ও গঠন লইয়া প্রথম হইতেই গোলযোগের সূত্রপাত হয়। বাঙালীর প্রতিষ্ঠা রাজনৈতিক মণ্ডলীতে কমিয়া গিয়াছে। এখন বাংলা দেশ ঐ ক্ষেত্রে অনেকটা পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই বাংলাভাষাকে অস্বীকার করিয়া হিন্দুস্থানীকে রাষ্ট্রভাষা করিবার পরিকল্পনা নেতৃমণ্ডল কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত হয়। আমাদের হিন্দুস্থানী বন্ধুরা ইহাতে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু যখন জানা গেল যে, হিন্দুস্থানী হিন্দী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাষা, ইহাতে উর্দ্দুর প্রাধান্য থাকিবে অনেকখানি, তখনও তাঁহাদের মোহ কাটিল না। অনেক হিন্দীভাষী বন্ধু বুঝিলেন না যে, তাঁহাদের ভাষাকে দ্বিখণ্ডিত করিবার চেষ্টাই ইহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। তুলসীদাস, সুরদাস, নন্দদাসের সে ললিত কোমল মধুগন্ধী হিন্দী আর থাকিবে না, এখন যাহা প্রস্তুত হইবে, তাহা রাষ্ট্র[illegible]কের পক্ষে

সুস্বাদু খিচুড়ি হইতে পারে, কিন্তু সে প্রয়োজন বুদ্ধি-প্রসূত ভাষা ও সাহিত্য কাহারও মাতৃভাষা হইবে না, না হিন্দুস্থানের হিন্দুর, না ভারতবাসী মুসলমানের।

আমি সম্প্রতি দক্ষিণ ভারত ঘুরিয়া আসিয়াছি। তামিল দেশে বাংলারও যে কদর, হিন্দীরও তাহাই, অর্থাৎ সেখানে কেহ হিন্দীও বুঝে না, বাংলাও বুঝে না। খৃষ্টান্ মিশনের কৃপায় কতকে ইংরেজি বুঝে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যাও অল্প। কাজেই উত্তর ভারতেই হউক, আর দক্ষিণ ভারতেই হউক, বাংলাভাষা রাষ্ট্রভাষা হইলে কাহারও বিশেষ কিছু বলিবার থাকিবে না। সেদিকেও প্রচারসমিতি কিছু কাজ করিয়া রাখিতে পারেন বলিয়া মনে করি।

চীনের চিত্রসাধন

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

জাপানের চিত্রসাধন অপেক্ষা চীনের চিত্রচর্চ্চা অধিক প্রাচীন। চীনের জীবনে যে সব সংযম, নিয়ম ও প্রাচীনের অনুবর্ত্তনস্পৃহা আছে, তা' শুধু বহুকালের মাত্র নয়—এখনও সে সব বর্জ্জিত হয়নি। এখনও চীন প্রাচ্যজাতির ভিতর অমর হয়ে আছে। সেই অমরত্বের বন্ধনের খোঁজ পাওয়া যায় চীনের সাহিত্যে ও শিল্পে।

তিনটি ধর্ম্ম তিন দিক্ হ'তে চীনের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছে এবং এই ধর্ম্মগুলিই চীনের সাহিত্য ও শিল্পকে প্রভাবিত করেছে। কনফুসিয়ান ধর্ম্ম বহিরঙ্গ বিচারে চীনকে দক্ষতা দিয়েছে। এজন্য চিত্রকলায় বহিরঙ্গের অটুট পারিপাট্য দেখ্‌তে পাওয়া যায়। আবার অপরদিকে তাও ধর্ম্মের রহস্যবাদ জগতের অজানা, অস্পষ্ট ব্যাপারগুলির ইঙ্গিত ও প্রেরণাকে মূর্ত্তিমান্ করেছে। বিলাতের বৃটিশ ম্যুজিয়ামে কু-কাই-চি নামক একজন শিল্পীর একখানি চিত্র রক্ষিত আছে। বিখ্যাত রসিক ও পণ্ডিত Mr. Laurence Binyon এই চিত্রখানির সম্বন্ধে যে অদ্ভুত উক্তি করেছেন, তা' শুনে অবাক্ হ'তে হয়। তিনি বলেন—তিনি কুড়ি বছর ঐ ছবিখানি দেখে আসছেন; এখনও ছবিখানিকে তিনি শেষ করে' দেখতে পারেন নি—প্রতিদিনই এর ভিতর নূতন কিছু দেখ্‌তে পান। এরূপ উক্তি অত্যন্ত বিস্ময়কর। হাজার বছর আগে শিল্পী এর রচনা শেষ করেছেন—অথচ হাজার বছর দেখেও সাধারণ এটাকে শেষ করতে পারেনি। পৃথিবীর খুব কম চিত্র সম্বন্ধেই এরূপ বলা চলে।

চীনে[illegible]তি গভীর। এখানে বৌদ্ধধর্ম্ম নিয়ে আসে প্রকৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ। এই বৌদ্ধধর্ম্ম জগৎকে সত্য বলে' স্বীকার করে, 'মায়া' বলে' উড়িয়ে দিতে চায়নি। এজন্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের গভীরতা ও

মহাপুরুষ

ব্যাপকতাকে চীন শ্রদ্ধার সহিত দেখেছে। চীনের 'ভূচিত্র' বা landscape জগতে অতুলনীয়। পাহাড়ের তরঙ্গায়িত ধূসর শ্রেণীর ভঙ্গিম প্রাচুর্য্য চীনের চিত্রে যেমন পাওয়া যায়, এমন আর কোথাও নয়। আবার অরণ্যানীর গভীর

ক্রোড়কেও চীন সুস্পষ্ট করে' তুলেছে। বস্তুতঃ পাহাড়ের খেলা, সলিলের বিস্তৃত হিল্লোল বা প্রশান্ত নিস্তব্ধতা চীনের মত কোন জাতি চক্ষুগোচর করতে পারে না।

চীনের চিত্রকলা ভারত কর্ত্তৃক প্রভাবিত। সমগ্র বৌদ্ধধর্ম্মের আলঙ্কারিক অর্ঘ্য চীনদেশ ভারত হ'তে পেয়েছে। এই ভারতীয় প্রভাবে শিক্ষিত হয়ে বিবিধ

(উপরে)—পল্লী (নীচে)—সাধক

পথিক

চিত্রকর পারস্যচিত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে। কাজেই যে পারস্যচিত্রের প্রভাব মোগল আমলে ভারতে আসে, তার ভিতরও প্রচ্ছন্নভাবে ভারতেরই সূক্ষ্ম প্রেরণা ও প্রাণবেগ ছিল; এজন্য তার সহিত ভারতীয় ছন্দঃ সঙ্গত হ'তে পেরেছে।

সপ্তম শতাব্দীতে ভারতের প্রভাব খোটানের ভিতর দিয়ে চীনদেশে বিস্তৃত হয়—মিঃ ভিসার এরূপ মন্তব্য করেছেন। অধ্যাপক Hamader Kosku, Kokka পত্রে (১৯০৬, ১৯৬নং) বলেন: "Khotanese Painter Wei Ch'i Yseng was attached to the Chinese Court in the 7th century. Khotanese seventh century pictorial art might be associated with certain series of pictorial art in Japan."

অপরদিকে চীনের চিত্রকরদের সহিত পারস্য-চিত্রকরদের যথেষ্ট সম্পর্ক। পারস্যসাহিত্যে বার বার

'নক্সা-ই-চীন' এই নামের উল্লেখ দেখা যায়। সেকালে মধ্য এসিয়ার ধনী মুসলমানগণ চীনে চিত্রকরদের সাহায্যে ভাল ভাল ছবি আঁকতেন—কারণ মুসলমানদের ছবি আঁকা নিষিদ্ধ ছিল। এ কারণে পারস্যে চৈনিক প্রভাব বিসৃত হয়। এ প্রভাবে পুষ্ট হয়ে পারস্যশিল্প আবার ভারতে প্রবেশ করে মোগল আমলে এবং চিত্রকলারূপে সমগ্র ভারতীয় সৃষ্টিকে পুষ্ট করে। কাজেই চীনের প্রভাব ও রসবিতান সমগ্র মধ্য এসিয়া ও ভারতে বিস্তৃত হয়। চীনরাজ্য মুসলমান ও হিন্দু শীলতাকে সংযুক্ত করে এসিয়ার ইতিহাসে যশস্বী হয়েছে।

ত্যাঙযুগের একখানি বরফঢাকা দৃশ্য দেওয়া গেল (৬১৮—৯০৭ খ্রীঃ)। ইউরোপের রেণেসাঁস যুগের অর্থাৎ চতুর্দ্দশ পঞ্চদশ শতাব্দীর যে কোন চিত্রকে এ ছবিখানি বস্তুবাদ (realism) ও আলঙ্কারিক ঐশ্বর্য্যে পরাজিত করতে পারে। জলের ধার, পাহাড়ের শির প্রভৃতি বরফে ঢাকা—সাদা বরফ যেন আলোর রেখা বলে' মনে হচ্ছে।

সুঙযুগের একখানি চিত্রে জলপ্রপাতের অফুরন্ত বৈচিত্র্য ও রূপায়িত করা হয়েছে। জলপতনের এরূপ বিচিত্র কারুতা এবং অসীম রঙ্গ জগতের খুব কম চিত্রেই আছে। শিল্পী ছোটখাট অসংখ্য অবসরে বিরাট্ জলতারল্যকে ভেঙ্গেছে নূতন নূতন পাত্রে—পাহাড়, গাছপালা, উচ্চনীচ ভূমির আধার যেন বিচিত্র গতিবেগের অসংখ্য সোপান রচনা করেছে। এরূপ এক একখানি চিত্রের আর মৃত্যু নেই।

চিঙযুগের (Ching dynasty) একখানি প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রশান্ত স্থিরতা ও উদ্বেগহীন নিস্তব্ধতা খুঁটিনাটির ভিতর দিয়ে যেন অসীমে পৌছিয়েছে মনে হয়। সামনের দু'খানি বাঁশের কঞ্চির পুষ্ট স্বাস্থ্য ও সজীবতা, প্রশান্ত বাপীর তরঙ্গহীন অনাবিল শ্রী একটা কাব্যসৃষ্টি করেছে প্রকৃতির একটি গুপ্ত রহস্যকে উদ্ঘাটন করে'। প্রাকৃতিক এই তিনটি চিত্রই তিন শ্রেণীর। প্রথমটির রহস্য, দ্বিতীয়টির পর্য্যাপ্ত ও প্রাকৃত বিপুলতা এবং তৃতীয়টির বহিরঙ্গ নিষ্ঠা যথাক্রমে তিনটি প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতীক-স্থানীয় হয়েছে।

মানুষের চিত্ররচনায় চীনের হাত পরিপক্ক, সন্দেহ নেই। চৈনিক মহাপুরুষের চিত্রে চীনের অস্খলিত ঋজুতা ও অদম্য আত্মনির্ভরতা পরিস্ফুট হয়েছে। উপবেশনের ভঙ্গীতে প্রাচ্য ঔদার্য্য ও সৌম্য ভাব ফলিত হয়েছে—মুখ দিব্য দৃষ্টিতে পরিপূর্ণ। অপরদিকে সাধকের অবনত দেহ ও বিনয়প্লুত মুখচ্ছবির তুলনা পাওয়া কঠিন। অথচ বসন-ভূষণের কৌলীন্য ও মহার্হতাও দৃষ্টিকে অভিভূত করে।

সুঙ যুগ

প্রাকৃতবাদের (realism) দিক্ হ'তে এ ছবিকে সহজে পরাজিত করা সম্ভব নয়। Decorationএর দিক্ হ'তে এজন্যই চীন চিত্র কুহক সৃষ্টি করে। বস্তুতঃ চীনের সভ্যতা কোন সাময়িক সফলতা, তুচ্ছ বাহবাকে লক্ষ্য করে' অগ্রসর হয়নি। চীন যা' করেছে, তা' চিরন্তন—অফুরন্ত মানবের জন্য। চীনের দানে এজন্য সাময়িকতা বা কৃপণতা নেই।

অপরদিকে দিব্য অপ্সরী বা পরী-রচনায় চীন মেঘ-লোকের সহিত দিব্যলোকের সঙ্গম ঘটিয়েছে। পরীর

ণীয় রূপলীলা মেঘের হিল্লোল গতিকুহকের সহিত তান রেখে অগ্রসর হয়েছে। কোথায়ও কোন বিরোধ নেই। সব কিছুই যেন পরস্পরকে গ্রহণ ও বিকাশ করতে স্তু সমগ্র বিশ্বের বিধাতৃদত্ত উপঢৌকনাদি যেন পরস্পর পরস্পরকে সুরের তানে আলিঙ্গন করতে চায়; তাতে

প্রাকৃতিক দৃশ্য (সুঙ্গ যুগ) [১৬৪৪-১৯১২]

রে' এক জিনিষ অন্য জিনিষের সহিত যুক্ত হ'লে উভয়ের সৌন্দর্য্য বাড়ে।

চীনের 'Laughing Buddha' একটি চমৎকার ষ্টি। বুদ্ধকে হাস্যপরায়ণ করে' এজাতি যেন বুকের বাঝা নামিয়েছে।

বস্তুতঃ প্রাচীন হ'লেও, চীন নবীনের জন্য অনেক অর্থ রখে গেছে। জগতের অনাগত বিশ্বমানব-সমাজ এসব দেখে এক সময়ে জীবনের কোরককে প্রস্ফুটিত করে' ধন্য হবে। চীন সকল জাতির জন্য সৌন্দর্য্যের খোরাক রেখে গেছে। মিশরের মত তা' কবরের আশেপাশে ঘুরে' তিক্ত করেনি—গ্রীসের মত ভঙ্গুর ও সাময়িক করে' তাকে ক্ষণস্থায়ী করেনি; এমন কি ভারতের মত

তুষারাবৃত পর্ব্বত (ট্যাঙ্গ যুগ) [৬১৮-৯০৭ খৃঃ]

মনোজগতের গহন অরণ্যে গিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে যায়নি। চীন সাংসারিক, সমাজবদ্ধ, সমঝ্‌দার—পরলোকের লালিত্যকেও তা' রাজদরবারে হাজির করে' আরাম পায়। অতি কঠিন ধাঁধা সৃষ্টি করতেও তা' অসমর্থ নয়—তবে চীনের প্রাণ সরল ও সহজ হয়েছে জটিল পথের ভিতরে গিয়ে কূল খুঁজে না পেয়ে। এজন্য মৃত চীন আজও লড়াই করছে।

বর্ষফল ঃ ১৩৪৮

অধ্যাপক শ্রীরাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী জ্যোতিষসিদ্ধান্তাচার্য্য

বিশ্বসৃষ্টি একটা সুশৃঙ্খল ছন্দে ও নিয়মে চলিয়াছে। ইহার ব্যতিক্রম হওয়া প্রাকৃতিক বিধান নয়। কোন কিছুই আকস্মিক ঘটে না। মনুষ্যজীবনের ফলাফলও নির্ভর করে কার্য্যকারণ তথা কর্ম্মফলের উপর। অতীত কর্ম্মই মানুষের অদৃষ্ট এবং ক্রিয়মাণ যাহা, তাহাই পুরুষকার। এতদনুযায়ীই ব্যষ্টি, সমষ্টি ও বিশ্বজীবন গ্রহ এবং রাশিচক্রের সমাবেশ ও প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। এখানে ১৩৪৮ সালের রাশিচক্রানুযায়ী বর্ষফল মোটামুটি দেওয়া হইল।

এই বৎসরের প্রারম্ভে রাশিচক্রে যে যে গ্রহ যে যে রাশিতে অবস্থান করিতেছে, উহার মধ্যে বিশেষ অশুভ-যোগ পাঁচটী। যথা—

১। শনি, বৃহস্পতি যুক্ত হইয়া মেষ ও বৃষ রাশিতে থাকা।

২। সূর্য্য, শুক্র ও শুক্র, এই তিন গ্রহ বৈশাখ হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত এক রাশিতে অবস্থান করা।

৩। সূর্য্য, চন্দ্র ও বৃহস্পতি এই তিন গ্রহ ১১ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ১৩ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত এক রাশিগত হওয়া।

৪। আষাঢ়, ভাদ্র, কার্ত্তিক ও চৈত্র মাসে পাঁচটী রবিবার হওয়া।

৫। ২৭শে আষাঢ় ও ২৬শে পৌষ বুধ গ্রহের উদয় হওয়া।

উল্লিখিত প্রকারে গ্রহসন্নিবেশ দ্বারা যে সকল ভৌম ও আন্তরীক্ষ উৎপাতের লক্ষণ দেখা যায়, নিম্নে তাহার বিবরণ ও ঘটনাকালের সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইতেছে।

ভূমিকম্প

(ক) তাঃ ১লা জ্যৈষ্ঠ হইতে ৯ই জ্যৈষ্ঠ;—তাহার মধ্যে **৪ঠা জ্যৈষ্ঠ হইতে ৬ই পর্য্যন্ত** প্রবল।

(খ) তাঃ ২৪শে জ্যৈষ্ঠ হইতে ২৪শে আষাঢ়;—উহার মধ্যে **২১শে আষাঢ় হইতে ২৪শে** আষাঢ় পর্য্যন্ত প্রবল ও উল্লেখযোগ্য।

(গ) তাঃ ৪ঠা শ্রাবণ হইতে ২৩শে শ্রাবণ পর্য্যন্ত;—উহার মধ্যে **৪ঠা শ্রাবণ হইতে ৭ই** শ্রাবণ পর্য্যন্ত প্রবল ও উল্লেখযোগ্য।

(ঘ) তাঃ ২৫শে অগ্রহায়ণ হইতে ১লা পৌষ। এতদ্ভিন্ন আশ্বিন, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ এই তিন মাসে বিবিধ দুর্ঘটনার লক্ষণ দেখা যায় এবং উল্লিখিত ভূমিকম্পের নির্দ্দিষ্টকালের সমসাময়িক কালে একাধিক বার ভারতে ও তদ্বহির্দ্দেশেও সংঘটিত হইতে পারে।

বৃষ্টি

সন ১৩৪৭ সালের চৈত্র-সংক্রান্তির সময় হইতে ৩রা বৈশাখ;—কিন্তু এই বৃষ্টি কোন কোন স্থানে দৃষ্ট হইবে, সর্ব্বত্র হইবে না। তাঃ **২৮শে বৈশাখ হইতে ১২ই** জ্যৈষ্ঠ মধ্যে ভারতের নানাস্থানে ঝড় ও শিলাবৃষ্টি হইবে এবং কোন কোন স্থানে অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হইবে। এ বৎসর বৃষ্টির পরিমাণ কম নহে; কিন্তু ঝড়, ঘূর্ণীবায়ু, প্লাবন এবং ট্রেণ বা বাষ্পীয়যানের দুর্ঘটনা দ্বারা বহু লোক হতাহত ও দুঃস্থ হইবার আশঙ্কা আছে। এতদ্ভিন্ন হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধ জন্যও হতাহত দেখা যায়।

রোগ

এই বৎসর কলেরা ও বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক এবং কঠিন রোগের সংখ্যা এবং **মৃত্যু ও ক্লিষ্টতা বৃদ্ধি** পাইবে।

যুদ্ধ

যুদ্ধ সম্বন্ধে তিন প্রকার অবস্থা নির্ণয় করা যায়। ১ম অবস্থা—বৈশাখ হইতে ৬ই আষাঢ়। ২য় অবস্থা—৮ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ২০শে ভাদ্র এবং ৩য় অবস্থা—ফাল্গুন হইতে আগামী বর্ষের কিয়দংশ কাল পর্য্যন্ত। উক্ত সময়ের মধ্যে পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক গগনে অপেক্ষাকৃত অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া মহাসমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে।

বহু ঋত্বিক্ ও সদস্য এই নরমেধ যজ্ঞে আহুতি স্থানীয় হইবে। এতদ্ভিন্ন জাপান ও ফ্রান্সের ভৌগোলিক পরিবর্ত্তন দেখা যায়।

জার্ম্মাণী সমস্ত ইউরোপে নিজ প্রভাববিস্তারের জন্য উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমলোলুপেয় বিক্ষুব্ধ চিত্তের ন্যায়—দৃষ্টিলুব্ধ পতঙ্গের ন্যায়—উষার বিহঙ্গকুলের ন্যায় রণভূমি মুখরিত করিয়া তুলিবে। ত্রিশক্তির সংহত প্রভাব—এই বিরাট্ মিত্রশক্তিকে বিশেষভাবে বিব্রত করিয়া তুলিবে। কিন্তু মিত্রশক্তি, জার্ম্মাণীর গতি অবরোধ—স্বাধীনতা, প্রভুত্ব বা সম্মানরক্ষার জন্য রাজৈশ্বর্য্যের চূড়ান্ত ক্ষতি হইলেও, যে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা দ্বারা আপ্রাণ চেষ্টা করিবে, উহা চিরস্মরণীয় হইয়া ইতিহাসে সমুজ্জ্বল থাকিবে।

এ বৎসর হিটলারের পক্ষে অশুভ নহে। এইজন্য হিটলারের বাণিজ্য বিষয়েও লক্ষ্য থাকিবে।

ফ্রান্সই হোক্—আর আমেরিকাই হোক্—কাহারও চুপ করিয়া বসিয়া থাকা চলিবে না। এ বৎসর প্রধান প্রধান দেশগুলির মধ্যে প্রায়ই গৃহবিবাদ বা বিপ্লবের সূচনা করে।

ভারতবর্ষ

ইংরাজের পক্ষে যেমন এ বৎসর শুভ নহে, ভারতবর্ষের পক্ষেও তদ্রূপ। ভারতের শিল্প-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় হইবে। চাকুরী ও ব্যবসা, উভয় দিক্ হইতেই অধিকাংশ লোক কর্ম্মশূন্য হইবে। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, গৃহদাহ প্রভৃতি বৃদ্ধি পাইবে এবং অন্নাভাবে হাহাকার উঠিবে।

উচ্চপদস্থ তিন-চারি জন মুসলমান নেতার উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া অধিকাংশ মুসলমান হিন্দুদিগের উপর অত্যাচার করিবে এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামার দ্বারা বহু লোক হতাহত হইবে। মুসলমান ও হিন্দুর পরস্পরের বিরোধ দ্বারা ভবিষ্যতের পক্ষে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের ক্ষতি হইবে এবং ইসলাম-ধর্ম্মের প্রভাবের উপর আঘাত পড়িবে। এই বিপ্লবের সময়ে পৃথিবীর যে কোন স্থানে, যে কোন জাতির, যে কোন ব্যক্তি—দেশ-কালাদি বিচার করিয়া চলিবে, তাহাকেই বুদ্ধিমান্ ও শান্ত বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। কোন বৈদেশিক শক্তির প্রভাব ভারতে প্রবেশ করিয়া চাঞ্চল্য সৃষ্টি বা বিক্ষুব্ধ করিবার সম্ভাবনা আছে।

রাশিফল

মিথুন, তুলা, কুম্ভ ও মীন রাশির পক্ষে এ বৎসর বিশেষ অশুভ হেতু দেহ ও পত্নীপীড়া ('স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর পীড়া), চাকুরী ও ব্যবসায় হানি, ঋণবৃদ্ধি, দীর্ঘ-ব্যয়, চেষ্টায় অকৃতকার্য্যতা, বন্ধু এবং স্বজনপীড়া বা হানি ও মনোদ্বেগ প্রভৃতি আর্থিক ও পারিবারিক বিবিধ অশান্তি এবং বাধা দেখা যায়।

এক ঝাঁক রূপসী

(Walt Whitman থেকে)

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

অনেকগুলি মেয়েমানুষ ঘুরছে ইতস্ততঃ;
তাদের মাঝে কেউ বা কচি, কেউ বা নেহাৎ বুড়ী।
কচি সবাই দেখ্‌তে মধুর, সুশ্রী বেজায়,
অঙ্গভঙ্গী বেশ!
কিন্তু কচি মেয়ের চেয়ে বর্ষীয়সী আবার
দেখ্‌তে যেন আরও সুমধুর!

গান ও স্বরলিপি

(খেয়াল)

নটমল্লার—ত্রিতাল

ঘন ঘোর বরষায় কেতকী বনে
উতলা সুবাস কাঁদে ক্ষণে ক্ষণে।
পুচ্ছ মেলিয়া নাচে মানস কেকা,
সুদূরে বিধুরা বঁধু কাঁদিছে একা
শাওন স্বপনে রহি আনমনে।

কথা—শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, এম.এল.সি.

স্থায়ী

	+	৩	০	১
ন্ সা II	গরা -গরা -গা মা	পা -ধা পমগা -মা	গা রা গা -ন্	-া সা -া -া I
ঘ ন	ঘো০ ০র ০ ব	র ০ ষা০০ য়	কে ত কী ব	০ নে ০ ০

+	৩	০	১
রা মমপা পা পা	পা পা র্সধা র্সনর্সা	-া ধণা পা -মপা	মগা মগা ন্ সা II
উ ত০০ লা সু	বা স কাঁ০ দে০০	০ ক্ষ০ ণে ০০	ক্ষ০ ণে০ "ঘ ন"

অন্তরা

	+	৩	০	১
II	পা -া পা পা	না ধা না না	না র্সা র্সা না	র্সনা -র্রর্সা -না -র্সা I
	পু ০ চ্ছ 'মে	লি য়া না চে	মা ন স কে	কা০ ০০ ০ ০

+	৩	০	১
র্সা র্সা ধা র্সা	র্সা না র্রা র্রা	র্সা না র্সা র্সা	ধনা -পা -পা -া I
সু দূ রে বি	ধু রা বঁ ধু	কাঁ দি ছে এ	কা০ ০ ০ ০

+	৩	০	১
র্গা -র্গমা র্রা র্সা	র্সনা র্রর্সা -নর্সা ধণা	পা মপধা -নর্সধা পা	মগা -মরা ন্ সা I
শা ০ও ন স্ব	প০ নে০ ০০ র০	হি আ০০০০ন ম	নে০ ০০ "ঘ ন"

বৈষ্ণব-সাহিত্যে 'মান'

শ্রীরামেন্দ্র দেশমুখ্য

মানের মূল্য মনস্তাত্ত্বিকের কাছে অনেক। অতি আপন জনের কাছেই মান করা যায়। যে মানের মূল্য দিতে পারে বলিয়া জানি, তাহার কাছেই আমরা মান করি। বৈষ্ণব-সাহিত্যে মান প্রেমবৈচিত্র্যের এক অদ্ভুত অঙ্গ। বড় আশা করিয়া তোমার কাছে চাহিয়া যখন নিরাশ হইলাম, তখন আমার মূল্যটুকু তোমাকে বুঝাইবার জন্য মান করি। মানের মধ্যে আত্ম-সচেতনতা বোধ প্রবল। যদি যথারীতি মনঃসমীক্ষণ করিয়া যাওয়া যায়, তবে আমরা দেখি যে, একটী সম্পূর্ণাবয়ব মনের মধ্যে বহু ভাবের সমন্বয় আছে। বৈষ্ণব কবিরা মনোজগতের এই গূঢ় তত্ত্ব বা তথ্যের সঙ্গে ভালভাবেই পরিচিত ছিলেন। বহুভাবময়ী রাধার ভাব-বিচিত্র অন্তর্লোকে আলোক নিক্ষেপ করিতে তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টাই করিয়াছিলেন।

মানের পর্য্যায়-ভেদ আছে। মোটামুটি মানকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়, কারণ-মান ও অকারণ-মান। কারণ-মানেরও আরও বিভক্তি করা যায়, যথা—দুর্জ্জয় মান, অল্প মান, সখী-বচনে মান ইত্যাদি। অকারণ-মানেরও যে এইরূপ বিভক্তি করা যায় না, এমন নহে। মানের বহু স্তরভেদ করা বৈষ্ণব-সাহিত্যের যিনি প্রকৃত রসজ্ঞ, তাঁহার কাজ। সাধারণ পাঠকসমাজ কিন্তু বহু স্তরের পক্ষপাতী নন। তাঁহারা নানান রকমের ফুল দেখিয়াই সন্তুষ্ট—পাঁপড়ি খুঁজিতে যান না।

মানবৈচিত্র্য যুগে যুগে প্রেমিক-প্রেমিকার অনুভবের সামগ্রী হইয়া রহিয়াছে। অকারণ-মান মানসিক আবেগের (emotion) একটী অদ্ভুত ভঙ্গী। আগে হইতে কেহই প্রস্তুত থাকে না, আর হঠাৎ আবেগের ঝড়ো হাওয়ায় এই অকারণ-মান ভাসিয়া আসে। মিলনের মধ্যেও কারণহীন এই অকারণ-মান।

রসবতী রাধা, রসময় কান।
কো জানে কাহে করল দুহু মান॥
দুহুঁ অতি রোখে বিমুখ হই বৈঠ।
দুহুঁ দুহুঁ বৃন্দাবন মাহা পৈঠ॥
কি কহবরে সখি কহইতে হাস।
কিয়ে কিয়ে অদ্ভুত দুহুঁক বিলাস॥ —গোবিন্দ দাস।

এই প্রকারের মান মনের এক প্রকার অদ্ভুত বিলাস। সহজেই এ মান ভাঙ্গে, আবার সহজেই এ মান সৃষ্ট হয়। অবশ্য আমাদের পারিবারিক জীবনে দেখিয়াছি যে, এই প্রকারের অকারণে সহজ মানও কখন কখন হঠাৎ বাঁকিয়া দুর্জ্জয় মানে চলিয়া যায়। বৈষ্ণব গীতি-কাব্যে এই অকারণ-মান নায়ক-নায়িকার প্রেমতরঙ্গে এক আশ্চর্য্য রকমের অভিব্যক্তি।

তুয়া লাগি যো হরি করত ধেয়ান।
সো দুখে তুহুঁ ধনি ভেল অগেয়ান॥
ধরণী বিলম্বিত বিরস বয়ান।
কাহে বাড়ায়সি অকারণ মান॥ —গোবিন্দ দাস।

এক প্রকারের অকারণ-মান শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনেও লক্ষ্য করিয়াছি। শ্রীগৌরাঙ্গ ভাবে অবশ হইলে, অনেক সময়ে নিজেকে শ্রীরাধা বলিয়া মনে করিতেন। ভাবাবেশে তিনি অষ্ট নায়িকার লীলা উদযাপন করিয়াছেন।

মানে মলিন মুখ-শশাঙ্ক নয়নে ঝরত লোর।
অবনত মাথ, না কহ বাত, গৌরহরি পহুঁ মোর॥
কোকিল-কাকলি, ভোমরা-গুঞ্জন, শ্রবণে পৈঠত যব।
দুহুঁ হাত তুলি, দুহুঁ কান ঝাপই, উহু উহু করি' তব॥
—প্রেমদাস।

শ্রীচৈতন্য মান করিয়াছেন। মুখচন্দ্র তাঁহার ম্লান হইয়াছে আর নয়ন হইতে অশ্রু ঝরিতেছে। তিনি নীরবে মস্তক অবনত করিয়া রহিয়াছেন। কোকিলের মধুর কলরব কিংবা ভ্রমরের গুঞ্জন কাণে আসিলেই তিনি দুই হাত তুলিয়া কাণে আবরণ দিয়া শুনিতে অসম্মতি জানাইতেছেন। গৌরহরি নিজের পুরুষদেহের কথা সম্পূর্ণ ভুলিয়া আপনাকে শ্রীরাধা মনে করিতেছেন। শ্রীরাধার মত মানে আচ্ছন্ন হইয়া তিনি কালো কোকিল আর কালো ভ্রমরকে সহ্য করিতে পারিতেছেন না। কৃষ্ণ কালো বলিয়া এখন তাঁহার কালো যত কিছুই বর্জ্জনীয়।

কান্তাভাবে শ্রীচৈতন্যের এই প্রকার মান সাধারণের কাছে অহেতুক, কিন্তু ভাবাবিষ্ট চৈতন্যের নিকট তখন তাহা কারণ-মানই ছিল। ভক্তগণের কাছে এই সমস্যা আদৌ সমস্যা নয়, কারণ তাঁহাদের মতে—

অন্তরেতে শ্যামতনু বাহিরে গৌরাঙ্গ তনু
অদ্ভুত গৌরাঙ্গ-লীলা।
রাই সঙ্গে খেলাইতে কুঞ্জবন বিলাসিতে
অনুরাগে গৌরতনু হৈলা॥ —নরহরি দাস।

শ্রীচৈতন্যের মধ্যেই দুইটী সত্তার বিকাশ হইয়াছে। সুতরাং উপরোক্ত প্রকারের মান চৈতন্যের জীবনে অকারণ নয়। প্রাক্-চৈতন্যযুগে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে আমরা পুরুষ-প্রকৃতির (কৃষ্ণ রাধিকার) বহিরঙ্গে ও অন্তরঙ্গে এক হইবার আকুল কামনা দেখিয়াছি। পরবর্ত্তী যুগে চৈতন্যের মধ্যে বহিরঙ্গ বলিয়া বস্তুতঃ কিছু আর নাই। কিন্তু মনের জগতে তখন কামনা বহু ভাব ধারণ করিতেছে। জানিলাম সম্পূর্ণ মিলনেও স্বস্তি নাই, শান্তি নাই। অতএব শ্রীচৈতন্যের অতি-চেতনার জগৎ বহু ভাবময় হইল। মূলতঃ বৈষ্ণব দর্শনে একটা সত্য খুবই উজ্জ্বল। দেহকে অস্বীকার করিয়া নয়, কিন্তু গৌণ করিয়া ভাবের জগৎকে আরও সম্প্রসারিত করিয়া দেওয়াটা প্রাথমিক সত্য। দেহ হইতে শক্তিকে ভাবের স্তরে রূপান্তরিত (Transformation of energy) করিতে হইবে। এই সত্যটা আমরা বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলীতে পাইলাম। চৈতন্যের যুগে সেই সত্য আরও সুন্দর রূপ পাইল। চৈতন্যের এখন পুরুষ-প্রকৃতি আত্মস্থ। শ্রীচৈতন্যের ভাবময় জগৎ এখন সম্প্রসারিত হইয়াছে। এখন তিনি অদ্বৈত হইয়া আছেন। স্ত্রী-পুরুষের ভেদাভেদ চেতনা এখন ধ্যানলোকে, ভাব-লোকে আশ্রয় নিয়াছে। সেখানে এই চেতনা সুন্দর এবং জ্যোতির্ম্ময় ও কল্যাণজনক।

এখন বৈষ্ণব-সাহিত্যের রাধা-কৃষ্ণের কারণ - মানের তত্ত্বে আসা যাউক। কারণ-মানের পশ্চাতে শ্রীরাধার দারুণ আশাভঙ্গ আছে। মান আপনি ভাঙ্গিতে চায় না যেন। মান-ভঙ্গ বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রায় আপেক্ষিক। নায়ক আসিয়া সাধারণতঃ বহু সাধাসাধি করিয়া নায়িকার মান-ভঞ্জন করেন। নায়ক নিজের দোষ স্বীকার করিবেন। জয়দেবে আমরা দেখিয়াছি :

অথ কথমপি যামিনীং বিনীয় স্মরশর জর্জ্জরিতাপি সা প্রভাতে।
অনুনয়বচনং বদন্তমগ্রে, প্রণতমপি প্রিয়মাহ সাভ্যসূয়ম্॥

খণ্ডিতা শ্রীরাধার নিকট প্রভাতে কৃষ্ণ আসিলেন। রাধার দুর্জ্জয় অভিমান। সখী অনেক বুঝাইলেন। তারপর ক্রমে সন্ধ্যা আসিলে, রাধা কিছু সুপ্রসন্না হইলেন।

শ্রীরাধা বহু-ভাবময়ী। মান করিয়া শেষে হা-হুতাশও করেন।

আপন শিরে হাম, আপন হাতে কাটিনু,
কাহে করিনু হেন মান।
শ্যাম সুনাগর, নটবর শেখর,
কাঁহা সখি, করল প্রয়াণ॥ —চণ্ডীদাস।

দুর্জ্জয় মান সাধারণতঃ বৈষ্ণব-সাহিত্যে এই প্রকারে অভিব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীরাধা যত্নে বাসক-সজ্জা সাজাইয়া বসিয়া থাকেন। কৃষ্ণ আসেন না। রাধা অপেক্ষা করিতে করিতে ক্রমে উৎকণ্ঠিতা হন।

প্রসরতি শশধর-বিম্বে বিহিত-বিলম্বে চ মাধবে বিধুরা।
বিরচিত-বিবিধ-বিলাপংসা পরিতাপং চকারোচ্চৈঃ॥ —জয়দেব।

শেষ পর্য্যন্ত রাধা বিপ্রলব্ধা হন।

সখি হে কথিত সময় বহি গেল।
সো মধু-মথন অবহু নাহি মিলল
যামিনী অবশেষে ভেল॥ —চন্দ্রশেখর।

অতঃপর জাগিয়া জাগিয়া কৃষ্ণের প্রতীক্ষা করিয়া রাত্রি প্রভাত হইলে, রাধা আত্ম-সচেতনা হন। আত্ম-লজ্জা, অপমানবোধ, কৃষ্ণের ভ্রুক্ষেপহীনতা শ্রীমতীকে কাতর করে। তিনি মানের আশ্রয় নেন। বৈষ্ণব কবিরা মোটামুটি শ্রীরাধার মানের উপরি-উক্ত প্রকার পটভূমিই প্রধান রাখিয়াছেন। বৃথাই বিনিদ্র অবস্থায় রাত্রি কাটাইয়া রাধার মান দুর্জ্জয় হইবার সুযোগ পায়।

অন্যান্য পটভূমিও থাকে। তবে সে সব অপ্রধান। অন্য নাগরীর সঙ্গে কৃষ্ণের মিলনে সর্ব্বদাই শঙ্কিতা যে রাধা, তাহার মানের সূত্রপাত সহজেই হইতে পারে—এ কথা বলা বাহুল্য।

শ্রীরাধার মানলীলাকে রূপ দিতে বহু বৈষ্ণব কবিই সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিদের এই রূপসৃষ্টিতে কোন তুলনামূলক আলোচনা এখন করিতেছি না। আমি শুধু বর্ত্তমান প্রবন্ধে মানিনী রাধার একটী চিত্রাঙ্কনের চেষ্টা করিতেছি।

অবনত-বয়নী ধরণী নখে লেখি।
যে কহে শ্যাম-নাম তাহে নাহি পেখি॥
—বিদ্যাপতি।

শ্রীরাধাকে আশায় আশায় রাখিয়া সমস্ত রাত্রি কৃষ্ণ অন্যের সঙ্গে কাটাইয়া আসিয়াছেন। এখন প্রভাত হইতে শ্রীরাধা মানের আশ্রয় লইয়াছেন। এখন তিনি অবনত-মুখী আছেন এবং মাটিতে নখ দিয়া লিখিতেছেন। যে কেহ শ্যাম-নাম করিলে, তাহার দিকে তিনি ফিরিয়া চান না। শ্যাম-নাম তাহার অসহ্য। কেহ যদি গিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণের কথা বলিয়া কিছু বুঝাইতে চায়, তবে তিনি কোন উত্তর দেন না। কৃষ্ণের নাম শুনিলে তিনি কাণে হাত দেন। শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগকে যিনি নূতন নূতন করিয়া অনুভব করিতেন, সেই রাধা এখন কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় কোন কথাই শুনিতে চান না। দূতীর মারফৎ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বপ্রকার বিনীত আবেদনই অগ্রাহ্য হয়।

শ্রীকৃষ্ণ নিজে গিয়াও কত অনুনয়-বিনয় করেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। শ্রীকৃষ্ণ আভরণ ছাড়েন, মুরলী-বিলাস ছাড়েন, পীতবাস লুটাইয়া দেন; কিন্তু তবু রাধা ফিরিয়া চাহেন না। যে প্রিয়তমের দিকে না চাহিলে, যে কান্তকে না দেখিলে রাধার চোখের জলে বান ডাকিত, সেই কান্তের দিকে আর শ্রীমতী ফিরিয়াও দেখেন না:

যাক দরশ বিনে ঝুরয়ে নয়ান।
অব নাহি হেরসি তাক বয়ান॥
সুন্দরি তেজহি দারুণ মান।
সাধয়ে চরণে রসিকবর কান॥ —বিদ্যাপতি।

সুন্দরী একেবারে বাঁকিয়া বসিয়াছেন।

হরি পরসঙ্গ না কর মঝু আগে।
হাম নহ নাগরী ভয়া, মাধব লাগে॥ —বিদ্যাপতি।

হরি-প্রসঙ্গ আমার সামনে করিও না। মাধবকে পাইবার জন্য আমি নাগরী হই নাই। শ্রীরাধা এখন তাঁহার পূর্ব্ব-অবিমৃষ্যকারিতার জন্য অনুতাপ করেন।

কৃষ্ণের প্রেম-রীতি প্রথম বুঝেন নাই, রূপ দেখিয়া রাধা আকৃষ্টা হইয়াছিলেন। কি ফল চাহিতে এখন তিনি কি ফল পাইলেন! হায়, ভ্রমে ভুজঙ্গ হেরিলেন। যতদিন জীবন থাকিবে, কৃষ্ণের দিকে চাহিয়া জল পর্য্যন্ত তিনি গ্রহণ করিবেন না।

সখীরা শ্রীরাধার মান ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিয়া নিষ্ফল হয়। সখীরা বলিয়া যায়—শ্রীকৃষ্ণের অবস্থা ভাল নয়। কান্তার অনাদরে কান্ত শুকাইয়া গিয়াছেন। রাধা মনে মনে অনেক কিছু ভাবেন; কিন্তু হইলে কি হয়—

সখি না বোলহ আর।
হাম ফল পায়নু তার॥
সহজেই মতিগতি বাম।
তৈছন হই পরিণাম॥
সো অব হোয়ল চুর॥ —বলরাম দাস।

কৃষ্ণ কোন সখীকে পাঠান। সখী অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া শেষে কৃষ্ণের কাছে ফিরিয়া আসে। কৃষ্ণ সখীর মুখ দেখিতেই চমকিয়া উঠেন।

সখীর বদন, হেরিতে নাগর
নিঝরে নয়ান ঝরে।
শয়নে স্বপনে, না জানি যা বিনে
সে কেনে এমন করে॥ —যদুনন্দন দাস।

কৃষ্ণ কাঁদিয়া আকুল হন। রাধা কেন এমন হইল?
রাধা এদিকে বাঁকিয়াই আছেন। আর তিনি সহজে যেন কৃষ্ণকে ক্ষমা করিবেন না।

না বোল, না বোল, কানুর বোল
ও কথা নাহিক মানি।
বিষম কপট, তাহার প্রেম
ভালে ভালে হাম জানি॥ —অনন্ত দাস।

বিদ্যাপতি রাধাকে এমন নিষ্ঠুর দেখিয়া কহিতেছেন।

কো বলে কোমল অন্তর তোয়।
তু সম কঠিন হৃদয় নাহি হোয়॥
অব যদি না মিলব মাধব সাথ।
বিদ্যাপতি তব না কহব বাত॥ —বিদ্যাপতি।

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ ও সখীদের অনুরোধে উপরোধে শ্রীরাধার মান ভাঙ্গে। মানান্তে মিলন যে চমৎকার, সে বিষয়ে চিরকালের কবি-প্রসিদ্ধিও আছে। জ্ঞানদাসে আমরা দেখিয়াছি যে, শ্রীকৃষ্ণ নিজেই দূতী সাজিয়া আসিয়া রাধা-বিরহী কানুর অবস্থা জানাইয়া শ্রীরাধার মান-ভঙ্গ করিয়াছেন।

মান সখীবচনেও সৃষ্ট হইয়াছে। আবার সখীদের অনুরোধেও ভাঙ্গিয়াছে। সখীবচনে মান, যথা—

প্রিয়সখী নিকটে, যাই কহে দ্রুতগতি
শুন ধনি চতুরিণি রাধে।
চন্দ্রাবলী সঙ্গে, কানু রজনী আজু
কামে পুরায়ল সাধে॥ —উদ্ধবদাস।

ভিন্ন ভিন্ন কবি ভিন্ন দৃষ্টিতে শ্রীরাধার মান-ভাঙ্গানো দেখিয়াছেন। সূক্ষ্ম দৃষ্টি লইয়া আলোচনা করিলে, কবিদের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। কোন কবির চিত্রণে আমরা দেখিয়াছি, শ্রীরাধা মান-ভঙ্গ-কালে কৃষ্ণকে দুই একটী কথা শুনাইয়া দিতেও ত্রুটি করেন নাই। মান শেষ পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়াছে, সন্দেহ নাই। আমরা জয়দেবের মুখে যেন শুনিতেছি, চিরকালের তরুণ পুরুষ চিরকালের তরুণী রাধাকে বলিতেছেন :

> ত্বমসি মম ভূষণং, ত্বমসি মম জীবনম্,
> ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্।
> ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী,
> তত্র মম হৃদয়মতিযত্নম্॥

আবার সখীর অনুরোধে মানও ভাঙ্গে। সখী বিরহী কৃষ্ণের শেষ দশার কথা বলিলে, রাধা আকুল হন।

> কানুক শেষ দশা শুনি মৃগধিনী
> কাতরে সখী মুখ চাই।
> ঐছন ইঙ্গিত, বুঝিতে সহচরী
> যতনহি বেশ বনাই॥ —কবিশেখর।

রাধা উপলব্ধি করেন যে, তাঁহার অনাদরে কৃষ্ণের দুর্দ্দশা হইয়াছে। অন্তরে সারি বাঁধিয়া অনুতাপ, আত্মগ্লানি ভীড় করে। কলহান্তরিতা অবস্থায় রাধার কান্না পায়! শ্রীকৃষ্ণকে তিনি বিমুখ করিয়াছেন। আত্মদোষ এখন যেন তাঁহার ক্ষালন করিবার কোন উপায় নাই।

> সখি হে তে হম পাইয়ে দুখ।
> প্রিয়জন পদযুগে পাণি পসারল
> পালটি না পেখলু মুখ॥ —চন্দ্রশেখর।

বৈশাখ-বিলাস

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

বসন্ত যে বনছায়া রচি' গেল বৈশাখের লাগি'
শীতান্তের শূন্যতারে পূর্ণ করি' নব পত্র দিয়া—
সুপ্রখর করতাপে রহে তারা সাক্ষী সম জাগি'
মুঞ্জরিয়া শ্যামরূপে আছে যেন ভীরু-আজ্ঞা নিয়া।
এ সৃষ্টিলীলার সুধা ভুঞ্জিবারে নাহি অবসর,
সুরভি নিঃশ্বাস সৃজি' সৃষ্টি করি কুসুম-সম্ভার—
অস্থির চঞ্চল পান্থ চলি' গেল বসন্ত সুন্দর,
বাঁশরীর রন্ধ্রে তুলি' সুমধুর সঙ্গীত-ঝঙ্কার।
তাপ-স্তব্ধ ধরণীতে নামিয়াছে অলস দু'পর,—
ঝিল্লীর গুঞ্জন-গীতি ধ্বনিতেছে ঘন বনশাখে,
বউ-কথা পাখী এক স্তব্ধতারে করিছে মুখর,
নীলাঞ্জন নভতলে সূর্য্যরশ্মি ধূম্রছায়া আঁকে।
দূরান্তে মাঠের প্রান্তে বাটপার্শ্বে বটবৃক্ষছায়া
রাখালের শান্তিকুঞ্জ, অলসের বিলাস বিজন,
ক্লান্ত পথিকের তরে বিছায়েছে বিশ্রামের মায়া;
মরুতের মৃদু শ্বাস ক্ষণে ক্ষণে করিছে সিঞ্চন।

আম্র-পনসের বনে মুগ্ধ মধু মাধবের গান
পল্লব-মর্ম্মর সনে শ্যামস্নিগ্ধ কুঞ্জের কূলায়;
অজিও পিকের কণ্ঠে ব্যথাতুরে শুনি' অফুরান—
তাপদগ্ধ ধরণীর চিত্তে যেন পরশ বুলায়।
পল্লীর বিজন ক্রোড়ে মাতৃসমা পর্ণকুটীরেতে,
তারি ক্ষুদ্র বাতায়নে আমি একা দৃষ্টি প্রসারিয়া
বৈশাখ-বিলাসে আজি' অফুরন্ত রূপসুধা পেতে
রূপের অমৃত-ভাণ্ড কল্পনায় নিতেছি লুটিয়া।
স্বপ্নের সুন্দরী মোর এ চিত্তের নিবাসেতে বসি'
বিগতের লাগি' কেন ফেলিতেছে গভীর নিঃশ্বাস?
রুদ্রের ডমরু আর প্রলয়-সঙ্কেত উঠিবে উল্লসি'
ঝঞ্ঝার শিঞ্জিনীছন্দে বুঝি গণে মরণ-বিশ্বাস।
হে মানসি প্রিয়ে, তব চিন্তা-স্রোতে স্বপ্নের স্পন্দন
এমনি জাগিবে কত, সঙ্গীতের নানা রস নিয়া
তোমার বাণীর মূর্ত্তি পূর্ত্তি-সুখে বিচিত্র বন্দন
যুগান্তের সৃষ্টিছন্দে গেয়ে যাও সুধা-কণ্ঠ দিয়া।

মনের গহনে

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

১

"মেয়ে!" হরিসাধন সেদিন মহা উত্তেজিত হইয়া কহিয়াছিল, "আমার বাড়ীতে মেয়ে? না না, রামটহল সে কিছুতেই হতে পারে না।"

দেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বৃদ্ধ ভৃত্য রামটহল চোখের জল মুছিতে মুছিতে প্রথমেই মনিবের কাছে অনুরোধ জানাইয়াছিল যে, মাতৃহীনা কন্যা পার্ব্বতিয়াকে নিজের কাছে আনিয়া রাখিবার জন্য অনুমতি তাঁহাকে দিতেই হইবে। কারণ বলিয়াছিল যে, দেশের বাড়ীতে যে বৃদ্ধা আত্মীয়া এতদিন পার্ব্বতিয়াকে আগলাইয়া রাখিয়াছিল, তিন দিন পূর্ব্বে সে ভবযন্ত্রণা এড়াইয়া স্বর্গে গিয়াছে।

উত্তরে হরিসাধন অধিকতর উত্তেজিত হইয়া কহিয়াছিল, "সে হতেই পারে না রামটহল। আমার বাড়ীর ত্রিসীমানায় কোন মেয়ে আসতে পাবে না। সে তোমার মেয়ে হউক বা যে কেউ হউক।"

মেয়ে সম্বন্ধে হরিসাধনের এই সতর্কতার কথা রামটহল জানিত, আর সহরের আরও অনেকে জানিত। তবে ইহার কারণ যে ঠিক কি, তাহা কেহই জানিত না। প্রবীণেরা মনে করিত—বিপত্নীক হরিসাধন জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ; ফাজিল ছোকরারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিত—হরিসাধন নপুংসক। দুই একজন নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিত যে, নারী সম্পর্কে নিজের একটা বড় রকমের দোষ লোকচক্ষু হইতে ঢাকিয়া রাখিবার জন্যই নারী সম্বন্ধে বাড়ীতে হরিসাধনের অত বেশী সতর্কতা।

কিন্তু মনে যে যাহাই করুক না কেন, প্রকাশ্যে হরিসাধনকে কেহই কোন প্রশ্ন করিত না, তাহার ব্রতভঙ্গ করিতে অনুরোধ করা ত দূরের কথা। একটা উদ্ভট অস্বাভাবিকত্ব দীর্ঘকাল বজায় থাকিয়া লোকচক্ষে স্বাভাবিক হইয়াই উঠিয়াছিল।

কিন্তু গরজ বড় বালাই বলিয়াই সেদিন রামটহল কেবল যে প্রভুকে ব্রতভঙ্গ করিবার জন্যই অনুরোধ করিয়াছিল তাহা নহে, তাঁহার অত বড় সুস্পষ্ট "না"কে অবনত মস্তকে মানিয়া লইতে পারে নাই। অশ্রুজলের আবেদনকে যুক্তির খুঁটি দিয়া দৃঢ় করিবার জন্য সে কহিয়াছিল, "পার্ব্বতিয়া আর মেয়ে কোথায় হুজুর? বছর দশেক ওর মোটে বয়স। কুকুর, বেড়াল, ছাগল, ভেড়ার একটি বাচ্চার মতই সে এই এত বড় বাড়ীর এক কোণে পড়ে থাকবে।"

ইহাতেও হরিসাধন বিচলিত হয় নাই দেখিয়া রামটহল একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিল, কহিয়াছিল, "নিজের মেয়ে—তাকে ত আর ছাড়তে পারব না বাবুজী! কাজেই এ চাকরিই আমাকে ছাড়তে হবে।"

ইহার পর হরিসাধন আর নিজের সঙ্কল্পে অটল থাকিতে পারে নাই। সুদীর্ঘ পনর বৎসর কাল যে ভৃত্যের হাতে যথাসর্ব্বস্ব—মায় নিজের দেহটি পর্য্যন্ত নিঃসংশয়ে সঁপিয়া দিয়া পরনির্ভরতার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ প্রৌঢ় বয়সে নিজে সে আবার বালকের মতই অসহায় হইয়া পড়িয়াছে, সেই বিশ্বস্ত ভৃত্যকে ছাড়িয়া দিলে কেমন করিয়া যে তাহার নিজের জীবনযাত্রানির্ব্বাহ হইবে, তাহা ভাবিয়া না পাইয়া, অবশেষে অনিচ্ছাসত্ত্বেও রামটহলকে সে অনুমতি দিতে বাধ্য হইয়াছিল। বোধ করি, মনে মনে রামটহলের ঐ উদ্ভট যুক্তিটিকেও সে সত্য বলিয়াই মানিয়া লইয়াছিল

তবে অনুমতি দিবার পরেও রামটহলকে সে সতর্ক করিয়া দিয়াছিল, "সাবধান রামটহল, এ বাড়ীতে থাকলেও তোমার মেয়ে আমার ঘরের ত্রিসীমানায়ও আসতে পাবে না, আমার সামনে ত নয়ই।"

প্রথম দিকে হইয়াছিলও তাহাই। কবে যে পার্ব্বতিয়া এ বাড়ীতে আসিয়াছিল, হরিসাধন তাহা জানিতেও পারে নাই, রামটহলও স্বয়ং প্রভুকে ঐ সংবাদ জানায় নাই।

কিন্তু পার্ব্বতিয়ার উপস্থিতি বাড়ীর মালিক সজীব মানুষটির নিকট হইতে গোপন করিয়া রাখা হইলেও নিষ্প্রাণ বাড়ীটির নিকট হইতে উহা গোপন রাখা সম্ভব হয় নাই। ঘণ্টা কয়েক যাইতে না যাইতেই জড় গৃহখানি কেবল যে ঐ সংবাদ জানিতে পারিয়াছিল তাহা নহে,

জানিয়া পার্ব্বতিয়ার সঙ্গে একটা অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ পাতাইয়া উহারই আনন্দে সে হাসিয়াও উঠিয়াছিল।

ছোট হইলেও, পার্ব্বতিয়া মেয়ে; কিছু না শিখিলেও, গৃহকর্ম্ম সে শিখিয়াছিল। তাই কেহ বলিয়া না দিলেও, হরিসাধনের স্ত্রী-বজ্জিত গৃহের সুস্পষ্ট শ্রীহীনতার মৌন নির্দ্দেশেই যেন প্রথম দিনই সে এ সংসারের অনেকগুলি কাজ নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছিল। বৃদ্ধ রামটহল আপত্তি করে নাই; বরং তাহার নিজের কর্ম্মভার অপ্রত্যাশিতভাবে লঘু হওয়াতে মনে মনে সে খুসীই হইয়াছিল।

কেবল একটি বিষয়ে পার্ব্বতিয়াকে সে পুনঃ পুনঃ সতর্ক করিয়া দিয়াছিল—বলিয়াছিল যে, কোন দিন কোন কারণেই সে যেন "মালিকে"র সম্মুখে দূরে থাকুক, তাহার ঘরের কাছেও না যায়। কেবল মুখের নির্দ্দেশ দিয়াই সে নিশ্চিন্ত থাকে নাই, হরিসাধনের অনুপস্থিতিতে তাহার ব্যবহৃত দুইখানি ঘর নিজের হাতে তালা বন্ধ করিয়া রাখিয়া, পার্ব্বতিয়ার পদস্পর্শ হইতে উহাদিগকে সে সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছিল।

কিন্তু বিশেষ করিয়া এই কারণেই ঐ অচেতন ঘর দুইখানি এবং উহাদের ও তাহাদের সকলের 'মালিক' সচেতন জীবটি সম্বন্ধে পার্ব্বতিয়ার কৌতূহলের অন্ত ছিল না এবং ইহাদের সম্বন্ধে প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া এবং মালিক স্বয়ং না হইলেও, তাহার ব্যবহৃত ঘর দুইখানি একবার অন্ততঃ তাহাকে দেখিতে দিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া সেই প্রথম দিন হইতেই তাহার পিতাকে সে উত্যক্ত করিয়া আসিতেছিল।

কন্যার এমনই আবদার ও নির্ব্বন্ধাতিশয্যে যেন বিরক্ত হইয়াই রামটহল অবশেষে একদিন হরিসাধনের অনুপস্থিতিতে ঘর খুলিয়া পার্ব্বতিয়াকে উহা দেখিতে দিয়াছিল।

অত যাহার ঐশ্বর্য্য এবং অমন প্রবল যাহার প্রতাপ, সেই মালিকের পারিপাট্যহীন, শৃঙ্খলাহীন, ধূলিমলিন, আবর্জ্জনাবহুল শয়নগৃহ দেখিয়া পার্ব্বতিয়া গভীর বিস্ময়ে অনেকক্ষণ নির্ব্বাক্ হইয়া ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়াছিল, তারপর নাক সিঁটকাইয়া পিতাকে কহিয়াছিল, "ঘর এত নোংড়া কেন বাবা?"

এ সমালোচনা যে মালিকের নয়, রামটহলের নিজের কার্য্যের, তাহা রামটহল বুঝিতে পারিয়াছিল; কিন্তু উহা যে অন্যায় নয়, অতিশয়োক্তি দোষ-দুষ্ট নয়, তাহা অস্বীকার করিতে পারে নাই বলিয়াই রামটহল লজ্জিত ভাবে মুখ নত করিয়া উত্তর দিয়াছিল, "আমি যে বুড়ো হয়ে গেছি পার্ব্বতিয়া, আগের মত ভাল কাজ আর করতে পারি না। মালিকও মাঝে মাঝে তিরস্কার করেন—কিন্তু কি করব?"

সহজ কিন্তু সোৎসাহকণ্ঠে পার্ব্বতিয়া কহিয়াছিল, "এখন থেকে আমিই এ দু'খানি ঘরও পরিষ্কার করব—মালিক যখন বাড়ীতে না থাকেন তখন; তিনি জানতেও পারবেন না।"

রামটহল দৃঢ়স্বরে প্রতিবাদ করিয়াছিল; কিন্তু স্বীয় দুর্ব্বলতাবশতঃ নিজের সঙ্কল্পে সে শেষ পর্য্যন্ত দৃঢ় থাকিতে পারে নাই এবং পারে নাই বলিয়াই হরিসাধনের শয়নগৃহে পার্ব্বতিয়ার নিয়মিত প্রবেশের অধিকার লাভ হইয়াছিল।

সেই হইতে অনেক দিন পর্য্যন্তই হরিসাধনের অজ্ঞাতসারে এই ব্যাপার চলিয়াছিল। প্রথম দিকে দুই এক দিন নিজের ঘরের অসাধারণ পরিচ্ছন্নতা ও আসবাবপত্রের সুশৃঙ্খল বিন্যাস দেখিয়া হরিসাধন মনে মনে চমৎকৃত হইলেও, স্বভাবসুলভ স্বল্পভাষিতার জন্য রামটহলকে ঐ সম্বন্ধে সে কেবল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে নাই এবং পরে ঐ অসাধারণ অবস্থাই সাধারণ হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই উহা আর বিশেষভাবে তাহার মনোযোগও আকর্ষণ করে নাই। যাহার হস্তার্পণে এই শ্রীহীন বাড়ীতে শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সেই পার্ব্বতিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত হরিসাধনের দৃষ্টি ও জ্ঞান উভয়েরই বাহিরে থাকিয়া গিয়াছিল।

হয়তো বা বরাবর অমনই বাহিরে সে থাকিয়া যাইত, যদি না সেদিন হরিসাধন তাহার চিরাচরিত নিয়ম ভঙ্গ করিয়া অসময়ে বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইত।

আষাঢ়ের এক বর্ষণমুখর মধ্যাহ্নে কি একটা গুরুতর প্রয়োজনবশতঃ জলে ভিজিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া নিজের

শয়ন-ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই হরিসাধন গভীর বিস্ময়ে থমকিয়া দাঁড়াইল।

একটা প্রচলিত হিন্দুস্থানী গানের একটিমাত্র কলি গুণ্-গুণ্ করিয়া ভাঁজিতে ভাঁজিতে পার্ব্বতিয়া ঠিক ঐ সময়েই ঘরের সমস্ত আস্‌বাব লণ্ডভণ্ড করিয়া লইয়া সম্মার্জ্জনী হস্তে উহার সংস্কার সাধন করিতেছিল; এই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত পরিণতিতে সেও হতভম্ব হইয়া গেল। তাহার কণ্ঠের গান আপনা হইতেই থামিয়া গেল, সম্মার্জ্জনী হাত হইতে সশব্দে খসিয়া পড়িল, একটা আর্ত্ত চীৎকার তাহার বক্ষ হইতে উঠিয়াও ওষ্ঠপ্রান্তে ধাক্কা খাইয়া ভিতরেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল এবং আশঙ্কায় দুই চক্ষু অসম্ভব রকম বিস্ফারিত করিয়া হরিসাধনের মুখের দিকে চাহিয়া সে বাতবিক্ষুব্ধ বেতসীলতার মত থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

চাষার মেয়ে—তথাপি সে মেয়ে। ধরিতে গেলে তাহার কৈশোর সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে—তথাপি সে কিশোরী। অনাহার ও অর্দ্ধাহারের ভিতর দিয়া শৈশব ও বাল্য কাটাইয়া আসিলেও, অটুট তাহার স্বাস্থ্য। রৌদ্রদগ্ধ, অমার্জ্জিত, ধূলিমলিন হইলেও, তাহার বর্ণ গৌর—ভস্মাচ্ছাদিত হইলেও, উহা বহ্নিশিখা। বাসন্তীরঙের ধূলি মলিন অর্দ্ধছিন্ন শাড়ীর নীচে উদ্‌গমোন্মুখ নারীবক্ষের অস্পষ্ট আভাষ; তেলচিটে হইলেও, লালরঙের হাতকাটা ব্লাউজের সুদূর মুষ্টিবন্ধনের বাহিরে সুপুষ্ট লতার মত একখানি বাহু, অনাবৃত মাথার অযত্নবর্দ্ধিত রাশি রাশি কালো চুলের অনেকগুলি বিদ্রোহী গুচ্ছের অন্তরালে লুক্কায়িত ললাটের ছোট একটু অংশ এবং সর্ব্বোপরি বড় টানা চক্ষু দুইটি ভয়বিহ্বল হইলেও, সুস্পষ্ট দৃষ্টির ভিতর শাণিত ছুরিকার মত নারী-চক্ষুর বিদ্যুদ্দীপ্তি—কবি বিদ্যাপতির ধ্যানদৃষ্টির সম্মুখে একদিন কিশোরী নারীর যে মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়া তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল, সেদিন হরিসাধন যেন তাহার সম্মুখে সেই কিশোরী রাধিকারই ভস্মাচ্ছাদিত প্রকাশ দেখিয়া বিভ্রান্ত হইয়া গেল।

কিন্তু নিজে সে কোন কিছু ভাল করিয়া বুঝিবার পূর্ব্বেই সর্ব্বনাশ হইয়াছে মনে করিয়া রামটহল ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া প্রভুর পার্শ্বে দাঁড়াইল এবং বোধ করি বা পিতার উপস্থিতিতে সাহস পাইয়াই পার্ব্বতিয়া ও হরিসাধনের পাশ কাটাইয়া তীরের মত ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

বিহ্বল হরিসাধন রামটহলের মুখের দিকে চাহিল, ভীত দৃষ্টি নত করিয়া রামটহল শুষ্ককণ্ঠে কহিল, "ও আমার মেয়ে—পার্ব্বতিয়া।"

"পার্ব্বতিয়া!" হরিসাধন কতকটা যেন প্রতিধ্বনির মতই উচ্চারণ করিল। সে কুমারসম্ভব পড়িয়াছিল ছাত্র-জীবনে; কিন্তু মহাকবির কল্পনাসৃষ্ট তপঃক্লিষ্টা পার্ব্বতীকে এতদিনেও সে যে ভুলিতে পারে নাই, তাহাই যেন অকস্মাৎ তাহার স্মরণ হইল। তাহার মনে হইল যে, কুমারসম্ভবের পার্ব্বতীই যেন এইমাত্র তাহার পাশ কাটাইয়া বাহির হইয়া গেল।

—"ও এসেছে, সে কথা আমায় জানাও নি কেন?" হরিসাধন প্রশ্ন করিল।

রামটহল ঢোঁক গিলিয়া উত্তর দিল, "মেয়েমানুষ আপনি দেখতে পারেন না, তাই।"

হরিসাধন ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রামটহলের মুখের দিকে চাহিল; কিন্তু কোন কথা সে কহিল না—বোধ করি বা যে কথা তাহার মুখে আসিতেছিল, উহা চেষ্টা করিয়াই সে চাপিয়া গেল এবং যে কাজের জন্য অসময়ে সে বাড়ীতে আসিয়াছিল, তাহা শেষ করিয়া ভিজা কাপড় না ছাড়িয়াই সে পুনরায় বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু বৈকালে চা খাইতে খাইতে নিজেই সে রামটহলকে কহিল, "পার্ব্বতিয়াকে একবার ডাক দেখি।"

সেই শতছিন্ন নোংরা শাড়ীর খানিকটা অংশ ঘোমটার মত করিয়া সে মাথায় তুলিয়া দিয়া এবং বাকি অংশটিতে নিজের দেহ সযত্নে আবৃত করিয়া বলির পাঁঠার মত কাঁপিতে কাঁপিতে পার্ব্বতিয়া প্রভুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং হরিসাধন তাহার মুখের দিকে চাহিতেই ঝর-ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, "আর কোনদিন এমন কাজ করব না বাবুজী, আর কোনদিন আমি আপনার ঘরে যাব না।"

কেমন একটা দুর্নিবার লজ্জায় হরিসাধনের সমস্ত মুখ অকস্মাৎ কালীবর্ণ হইয়া গেল। অপরাধীর মত দৃষ্টি নত

করিয়া সে কহিল, "ভয় পাচ্ছ কেন? আমি সত্যি অত ভয়ঙ্কর লোক নই। তা' ছাড়া তোমার ত কোন দোষ হয় নি।"

রামটহল স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল। তথাপি প্রভুর মনস্তুষ্টিসাধনের উদ্দেশ্যে কহিল, "আর কোনদিন ওকে আমি আপনার ঘরে ঢুকতে দেব না বাবুজী। এতদিনও আমি দিতে চাই নি; কিন্তু ওর জিদ, ঘরকরণার কাজ কিছুটা ও করবেই।"

—"এতদিন পার্ব্বতিয়াই আমার ঘরের কাজ করছে নাকি?" হরিসাধন মুখ তুলিয়া সাগ্রহে প্রশ্ন করিল। তাহার মনে পড়িল—ইদানীং তাহার ঘর ও গৃহশয্যার অভূতপূর্ব্ব পরিচ্ছন্নতা, গৃহবিন্যাসের নয়নস্নিগ্ধকর শ্রী।

রামটহল অপরাধীর মত কহিল, "কি করব বাবুজী, কিছুতেই ও বারণ মানবে না। কত বার বলেছি যে, বাবুর ঘর গুছিয়ে রাখা তোর সাধ্য নয়, ও তুই পারবি নে—"

—"কে বলে পারবে না?" হরিসাধন বাধা দিয়া কহিল; পরিহাসোজ্জ্বল দুই চক্ষুর দৃষ্টি রামটহলের মুখের উপর বিন্যস্ত করিয়া সে ঐ প্রতিবাদের সঙ্গে জুড়িয়া দিল, "তোমার চাইতে ওর হাতেই আমার ঘর ঢের বেশী পরিষ্কার হয়েছে।"

এ তাহার নিজের নিন্দা হইলেও, তাহারই পুত্রীর প্রশংসা, সুতরাং দুঃখের চাইতে রামটহলের আনন্দই হইল বেশী। সে হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিল।

একটু থামিয়া হরিসাধন পার্ব্বতিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া রামটহলকে কহিল, "এখন থেকে পার্ব্বতিয়াই আমার ঘরের কাজ করবে। তোমার যেমন, ও আমারও তেমনই মেয়ে।"

পার্ব্বতিয়াকে লক্ষ্য করিয়া সে সকৌতুক কণ্ঠে কহিল, "কেমন রে পার্ব্বতিয়া—আমার মেয়ে হবি ত? বাবু বলে' ত ডাকিস্ই, আর তোদের ভাষার বাবুও যা, বাবাও তাই;—নয়?"

সলজ্জ আনন্দের স্নিগ্ধ হাস্যে মুখখানি উজ্জ্বল করিয়া পার্ব্বতিয়া সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইল।

৩

দিন কয়েক পর একদিন মধ্যাহ্নে খাইতে বসিয়া অদূরে দণ্ডায়মানা পার্ব্বতিয়ার দিকে অনেক ক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া হরিসাধন হঠাৎ রামটহলকে রুক্ষকণ্ঠে কহিল, "পার্ব্বতিয়ার জামা-কাপড় অত নোংড়া কেন?"

দৃষ্টি নত করিয়া রামটহল কুণ্ঠিতকণ্ঠে উত্তর দিল, "আমি বাবু গরীবমানুষ, বেশী কাপড় ত ওকে কিনে দিতে পারি না।"

হরিসাধন ইহার কোন প্রত্যুত্তর করিল না, কিন্তু সেইদিন বৈকালে আপিস হইতে বাড়ীতে না ফিরিয়া সে বাজারে গিয়া উপস্থিত হইল এবং পরিচিত এক কাপড়ের দোকানে প্রবেশ করিয়া দোকানদার ও পরিচিত খরিদ্দার সব কয় জনকে বিস্মিত করিয়া মেয়েদের জামা ও শাড়ীর নমুনা চাহিয়া বসিল।

—"মেয়েদের শাড়ী?" দোকানদার কৌতুহল দমন করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসাই করিয়া বসিল, "আপনার বাড়ীতে আবার মেয়ে কোথা থেকে এল বাবুসাহেব?"

—"হরিসাধনবাবুর গৃহে এতদিন পর আবার গৃহলক্ষ্মী এলেন নাকি?" পরিচিত একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক সকৌতুক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন।

কুণ্ঠিত হইয়া হরিসাধন উত্তর দিল, "না হে না; আমার চাকরটি আমাকে বিপদে ফেলেছে। নিয়ে এসেছে তার মেয়েটিকে আমার বাড়ীতে। বোঝা বইতে হচ্ছে আমাকেই।"

—"সে ত আরও ভাল", বলিয়া দোকানদার পার্শ্ববর্ত্তী ভদ্রলোকটির দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল, তারপর উঠিয়া গিয়া প্রমাণ সাইজের কয়েকখানি শাড়ী ও কয়েকটি ব্লাউজ বাহির করিয়া আনিল।

হরিসাধন বিব্রত হইয়া কহিল, "এত বড় কাপড় চাই না ত। ছোট মেয়ের শাড়ী—এই দশ বার বছর।"

বাঙ্গালী ভদ্রলোকটি যেন আকাশ হইতে পড়িয়া আঘাত পাইলেন, কহিলেন, "অত ছোট? বলেন কি হরিসাধনবাবু?"

হরিসাধন অধিকতর বিব্রত হইয়া কহিল, "হ্যাঁ, খুব ছোট।"

অথচ ঐ খুব ছোট মেয়েটির জন্য শাড়ী ও জামা পছন্দ করিতে বসিয়া নিজে সে গলদঘর্ম্ম হইয়া উঠিল ও দোকানদারটিকেও রীতিমত হয়রাণ করিয়া ফেলিল।
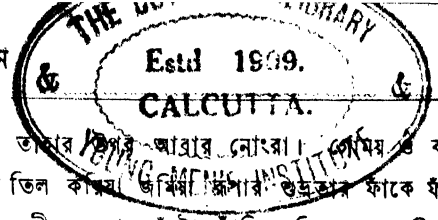
এবং অনেক জিনিষ অপছন্দ করিবার পর অবশেষে যাহা সে পছন্দ করিয়া ক্রয় করিল, তাহা কোন বড় ঘরের মেয়ের দেহেই বেমানান হইবার নহে।

কেবল কাপড় ও জামা নহে, গায়ে মাখিবার সাবান, তেল, আর্সী ও বড় দাঁড়ওয়ালা চিরুণী কিনিয়া হরিসাধন যখন বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল, তখন রাত্রি হইয়াছে। উদ্বিগ্ন রামটহল ছুটিয়া সম্মুখে আসিতেই জিনিষগুলি এক রকম তাহার গায়ের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া হরিসাধন কহিল, "পার্ব্বতিয়াকে দাও গে। আবার যদি কোনদিন তাকে আমি নোংরা দেখি, তবে এখান থেকে দূর করে' দেব।"

বিহ্বল রামটহল একবার ঐ জিনিষগুলির দিকে ও একবার প্রভুর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল এবং ব্যাপারটির অর্থ অবশেষে যখন তাহার সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইল, তখন সে কুণ্ঠিত কণ্ঠে কহিল, "আমরা গরীব মানুষ হুজুর, এত দামী জিনিষ দিয়ে আমরা কি করব?"

—"গরীব বলে'ই নোংরা থাকতে হবে নাকি? হরিসাধন কণ্ঠস্বরে অনেকখানি ঝাঁজ ঢালিয়া দিয়া উত্তর দিল, "না বাপু, আমার বাড়ীতে ওসব চলবে না। এখানে না আসত ও—সে আলাদা কথা; কিন্তু এসেছে যখন—" বলিতে বলিতে বাক্যটি সম্পূর্ণ না করিয়াই সে নিজের ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল।

বেশভূষা ও প্রসাধন করিবার অত সব সামগ্রী এক সঙ্গে হাতে পাইয়া পার্ব্বতিয়া নিজের দেহের উপর উহার যে প্রয়োগ করিল, আধুনিক কায়দা ও রুচিসম্মত না হইলেও, উহা ঠিক অপপ্রয়োগ হইল না। দেখিয়া হরিসাধন মুগ্ধকণ্ঠে কহিল, "বাঃ!"

পার্ব্বতিয়ার সলজ্জ হাসিমুখ আপনা হইতেই নত হইয়া পড়িল।

সেই অবনত মুখের দিকে চাহিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে হরিসাধন কহিল, "আর কোনদিন নোংরা থেকো না যেন।"

কিন্তু বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার দৃষ্টি গিয়া পড়িল পার্ব্বতিয়ার প্রকোষ্ঠের রূপার কঙ্কন দুইখানির উপর। একে রূপার জিনিষ, তাহাতে কুশ্রী গড়ন, তাহাতে পুরাতন এবং তাহার উপর আবার নোংরা। গোময় ও কাদা তিল তিল করিয়া জমিয়া রূপার শুভ্রতার ফাঁকে ফাঁকে যেন কুশ্রী কৃষ্ণতার ফোঁটা আঁকিয়া দিয়াছে। হরিসাধন জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল, "খুলে' ফ্যাল্ তোর হাতের ঐ কাঁকণ—এখনই খুলে ফ্যাল্!"

ভয় পাইয়া পার্ব্বতিয়া সেই প্রথম দিনের মতই দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া হরিসাধনের মুখের দিকে চাহিল; রামটহল হাতের কাজ ফেলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে এ ঘরে ছুটিয়া আসিল।

হরিসাধন রামটহলকে কহিল, "ঐ নোংরা কাঁকণ এখনই ওর হাত থেকে খুলে' ফেলে দাও—এখনই।"

প্রভুর নির্দ্দেশের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে রামটহলের সময় লাগিল এবং উহা বোধগম্য হইবার পর সে ঢোঁক গিলিয়া ক্ষুণ্ণকণ্ঠে কহিল, "কিন্তু আর ত কিছু আমাদের নেই। কাঁকণ ফেলে দিলে ও পরবে কি?"

—"খালি হাতে থাকবে", বলিয়া হরিসাধন কেবল কণ্ঠস্বরের জোর দিয়াই রামটহলের সমস্ত যুক্তি তৃণখণ্ডের মত উড়াইয়া দিল। রামটহল আর প্রতিবাদ করিবারও সাহস পাইল না।

কিন্তু পার্ব্বতিয়াকে খালি হাতে থাকিতে হইল না। দিন পনর পর হরিসাধন নিজেই এক জোড়া সুদৃশ্য সোণার রুলি কিনিয়া আনিয়া পার্ব্বতিয়াকে কাছে ডাকিয়া নিজের হাতে তাহার নগ্ন প্রকোষ্ঠে উহা পরাইয়া দিল এবং ঐ ছোট সুডৌল হাত দুইখানির দিকে চাহিয়া আর একদিনের মতই মুগ্ধকণ্ঠে কহিল, "বাঃ!"

রামটহল হাসিমুখে রুলি দুইগাছি অনেক ক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া কতকটা সমালোচনা ও কতকটা জিজ্ঞাসার ভঙ্গীতে কহিল, "এ তো পিতল নয়! এ বুঝি কেমিক্যাল?"

—"দূর বোকা!" হরিসাধন হাসিয়া উত্তর দিল, "এ যে সোণা—একেবারে গিনি!"

—"সোণা?" রামটহল বিভ্রান্তের মত প্রভুর মুখের দিকে চাহিল। অনেক ক্ষণ পরে ঢোঁক গিলিয়া কহিল, "এর যে অনেক দাম বাবুজী! ওর জন্য এত টাকা কেন আপনি খরচ করলেন?"

—"ওর জন্য করিনি ত", হরিসাধন স্মিতমুখে উত্তর

দিল, "করেছি আমার নিজের তৃপ্তির জন্য। আমার মেয়ে থাকলে তাকেও ত আমি দিতাম—আর পার্ব্বতিয়াও ত আমারই মেয়ে!"

বৃদ্ধ রামটহলের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। দুই ফোঁটা অশ্রু হাতের পিঠে মুছিয়া ফেলিয়া সে গদগদকণ্ঠে কহিল, "ওরও আর কেউ নেই বাবুজী। ওকে আমি আপনাকেই দিলাম; ওর আখেরের ব্যবস্থা আপনিই করে' দেবেন।"

আখেরের কথা হরিসাধন কি যে ভাবিল, বলিতে পারি না; তবে তাহার নিজের জীবনের যেটুকু বর্ত্তমান তাহার অনেকখানিই যে পার্ব্বতিয়া অধিকার করিয়া বসিল, তাহা বাহিরের লোকেরও চক্ষু এড়াইল না।

গৃহকর্ম্ম ও পরিচর্য্যার ভিতর দিয়া হরিসাধন ও পার্ব্বতিয়ার দেনা-পাওনার কারবার বাহিরে বাড়িতে বাড়িতে কোন একদিন যে উহা অন্তরেও প্রভু ও পরিচারিকার সমাজ-স্বীকৃত সম্বন্ধটিকে একেবারে ওলট-পালট করিয়া পরিচারিকাকে রাণী ও প্রভুকে তাহার করুণাপ্রার্থী ভিখারী করিয়া তুলিল, তাহা দুইজনের কেহই জানিতে পারিল না। সর্ব্বস্ব হারাইয়াও এই কারবারে মোটের উপর হরিসাধনের যাহা লাভ হইল, উহার মূল্য হরিসাধন নিজে অস্বীকার করিতে পারিল না বলিয়াই ক্ষতির দিক্‌টা কোনদিনই সে খতাইয়া দেখিবার প্রয়োজন বোধ করিল না এবং ঐ লাভটা সত্য সত্যই এমনই বিপুল আকারে বাহিরে প্রকাশ পাইল যে, হরিসাধনকে যাহারা জানিত, উহা দেখিয়া তাহাদের বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

যে হরিসাধনকে কোনদিনই কেহ হাসিতে দেখে নাই, প্রয়োজন ভিন্ন কোনদিনই যে কোন কথা বলে নাই, সে যে কেবল হাসিতেই শিখিল তাহা নহে, হাসিয়া, রহস্য করিয়া, অনর্গল কথা বলিয়া, অনাবশ্যক চীৎকার করিয়া এবং অকারণে পার্ব্বতিয়ার সঙ্গে কলহ করিয়া সে পাড়ার সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিল এবং যে গৃহে পূর্ব্বে নারীকণ্ঠ দূরে থাকুক, মনুষ্যকণ্ঠের ক্ষীণ স্বরও প্রায়ই শোনা যাইত না, উহাই এখন থাকিয়া থাকিয়া কলরব ও কলহাস্যে মুখরিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

হরিসাধনের জনৈক বন্ধু একদিন রহস্যচ্ছলে বলিয়াই ফেলিল, "হরিসাধন বাবুর অচলায়তন এইবার ভেঙ্গেছে।"

হাসিয়া হরিসাধন উত্তর দিল, "সত্যি ভাই, মেয়েটা আমার সর্ব্বনাশ করল।"

"সর্ব্বনাশ নয়", ভদ্রলোক প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "মৃতের মমিকে জীবন্ত মানুষ করেছে ত।"

হরিসাধন গম্ভীর হইয়া উত্তর দিল, "হয়ত তাই। বোধ করি বা পূর্ব্বজন্মে ও আমার মেয়েই ছিল।"

৪

বৎসরখানিক পরের কথা। ফাল্গুনের এক আরক্ত সন্ধ্যায় আপিস-ফেরৎ হরিসাধন প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিয়াই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল।

প্রাঙ্গণের একটি মাত্র আম গাছের গন্ধমধুর স্নিগ্ধ ছায়ায় পার্ব্বতিয়া পাশের বাড়ীর নূতন ভাড়াটিয়াটির নূতন চাকর রামজীবনের সঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া গল্প করিতেছিল।

রামজীবন যুবক; বয়স কুড়ির বেশী হইবে না। তাহার বর্ণ কালো; কিন্তু চমৎকার তাহার দেহের গড়ণ। দীর্ঘ ঋজু দেহ, উন্নত বিশাল বক্ষ, বলিষ্ঠ পেশী, মুখে-চোখে স্বাস্থ্য ও বুদ্ধিমত্তার সুস্পষ্ট দীপ্তি। অনেক ক্ষণ পূর্ব্ব হইতেই পার্ব্বতিয়ার সঙ্গে তাহার সুখ-দুঃখের কথা হইতেছিল।

হরিসাধনের সংসারে পার্ব্বতিয়ার সুখ ও সৌভাগ্যের কথা শুনিয়া রামজীবন দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিয়াছিল, "বেশ আছিস্ তুই" এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিজেদের বাড়ীর দিকে একবার সতর্ক দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিয়া বোধ করি বা মনিবের অনুপস্থিতি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াই পরে কণ্ঠস্বর নত করিয়া সে কহিয়াছিল, "আর আমার যে মালিক—ব্যাটা একেবারে চামার!"

কথার মধ্যে হাসি ফুটাইবার মত কিছু না থাকিলেও, পার্ব্বতিয়া খিল্-খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়াছিল—সেটা রামজীবনের বলিবার ধরণ দেখিয়া এবং হাসি থামিলে সে কহিয়াছিল, "ওর চাকরি তুমি ছেড়ে দাও না কেন? দেশে তোমার এত জমিজমা, এত গাই-বলদ থাকতেও তুমি চাকরি করতে এসেছ কেন?"

রামজীবন উত্তর দিয়াছিল, "ছেড়েই দিতে হবে। ভেবেছি যে এই বোশেখ মাসেই দেশে ফিরে' যাব। তারপর বিয়ে করে' গাঁয়েই চাষবাস করব।"

পার্ব্বতিয়া হাসিয়া ফেলিয়া কহিয়াছিল, "তাই ভাল।" একটু থামিয়া, ক্ষণকাল একটু চিন্তা করিয়া সহসা সে ঠোট বাঁকাইয়া কহিয়াছিল, "দেশে গেলেই ত আমাকে তুমি ভুলে যাবে!"

রামজীবন ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিয়াছিল, "না।"

—"না আবার কি?" পার্ব্বতিয়া কহিয়াছিল, "তুমি বিয়ে করলে আর আমার কথা তোমার মনে থাকবে নাকি? ককখনো না।"

—"আলবৎ থাকবে", রামজীবন উত্তরে শপথ করিয়া কহিয়াছিল, "আমি মাঝে মাঝে তোকে দেখতেও আসব।"

—"ঝুট্", বলিয়া পার্ব্বতিয়া এক পায়ের উপর অদ্ভুত ভঙ্গীতে একটা ঘুরপাক খাইয়া লইয়াছিল।

কথাগুলি হরিসাধন শুনিতে পায় নাই, সে ঐ কসরৎটিই দেখিতে পাইয়াছিল আর শুনিতে পাইয়াছিল উহাই লক্ষ্য করিয়া রামজীবনের উচ্ছল কণ্ঠের প্রাণখোলা হাসি। শুনিয়াই অসহ্য বিরক্তিতে তাহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু ঠিক ঐ সময়েই ইহার চাইতেও গুরুতর আর একটা ব্যাপার ঘটিয়া গেল। একখানি ঘুড়ি কোথা হইতে যেন উড়িয়া আসিয়া একেবারে পার্ব্বতিয়ার মাথার উপরে পড়িল। চমকিয়া পার্ব্বতিয়া নিজের হাতে উহা ধরিতে যাইতেছিল; কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই রামজীবন হাত বাড়াইয়া ঘুড়িখানি ধরিয়া ফেলিল।

ঠোট ফুলাইয়া পার্ব্বতিয়া কহিল, "ঘুড়ি আমার, ও আমার মাথায় পড়েছে।"

রামজীবন কহিল, "না আমার, কারণ আমি ধরেছি।"

পার্ব্বতিয়ার মুখ মলিন হইয়া গেল, কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য। পরক্ষণেই সে ক্রুদ্ধা ব্যাঘ্রীর মত রামজীবনের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া, আকস্মিক আক্রমণে তাহাকে একেবারে বিহ্বল করিয়া দিয়া, ঘুড়িখানি তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইল।

ঘুড়িখানি হাতে পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার ক্রোধ চলিয়া গেল এবং বিহ্বল রামজীবনের অসহায় নৈরাশ্য-মলিন মুখের দিকে চাহিয়া সে সকৌতুকে খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া রামজীবনকে প্রতিযোগিতায় আহ্বান করিবার ভঙ্গীতে বুক ফুলাইয়া মাথা দুলাইয়া কহিল "কেমন মজা! আর লাগবে আমার সঙ্গে? এস দেখি, এস—"

বর্ষণোন্মুখ মেঘের মত মুখ গম্ভীর করিয়া হরিসাধন ডাকিল, "পার্ব্বতিয়া!"

ভয় পাইয়া রামজীবন মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রাচীর টপকাইয়া তাহাদের নিজেদের বাড়ীর কোথায় যেন অদৃশ্য হইয়া গেল। কিন্তু পার্ব্বতিয়া ভয় পাইল না; বরং সমস্ত ব্যাপারটির এবং বিশেষ করিয়া পালাইবার চেষ্টায় রামজীবন এইমাত্র যে কসরৎ দেখাইয়া গেল, উহার উদ্ভটত্বের কথা স্মরণ করিয়া পরম কৌতুকে হাসিতে হাসিতে একেবারে মাটিতে লুটাইয়া পড়িবার মত হইল। অনেক ক্ষণ পরে হাসিতে হাসিতে ক্লান্ত হইয়াই সে যেন হরিসাধনের দিকে ফিরিয়া, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "দেখ না বাবুজী, ভারি বদমায়েস ঐ রামজীবন। আমার ঘুড়ি ও নিতে চাইছিল, কিন্তু পারে নি। আমি কেড়ে নিয়েছি। ও দেখতে জোয়ান হ'লে কি হবে, গায়ে ওর একটুও জোর নেই।"

পশ্চিমের আকাশে সূর্য্য তখন অস্ত যাইতেছিল। আবীরের মত উহারই লালিমার অনেকখানি পাশের বাড়ীর উঁচু সাদা দেয়াল হইতে ঠিকরাইয়া পড়িয়া পার্ব্বতিয়ার মুখের উপরেও যেন আবীরের ছোপ লাগাইয়া দিয়াছিল। সেই মুখের দিকে চাহিয়া হরিসাধনের মনে হইল যে, উহার প্রত্যেকটি রেখা পার্ব্বতিয়ার অন্তরের পাত্র হইতে উপচাইয়া পড়া আনন্দেরই যেন এক একটি ফেনিল তরঙ্গ। রামজীবনের নিন্দা করিয়া এক নিঃশ্বাসে এই যে এতগুলি কথা সে উচ্চারণ করিয়া গেল, তাহার মুখের প্রত্যেকটি রেখা, চোখের হাসির প্রত্যেকটি ঝলক যেন তাহার মুখের কথাগুলির নীরব কিন্তু সুস্পষ্ট প্রতিবাদ। মিনিটখানিক নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে ঐ মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবার পর হরিসাধন পার্ব্বতিয়ার একখানি হাত দৃঢ় মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া কঠিন কণ্ঠে কহিল, "যা, ভিতরে যা।"

সেই রাত্রে রামটহলকে নিজের ঘরে ডাকিয়া আনিয়া হরিসাধন গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "শোন রামটহল, পার্ব্বতিয়া এখন ত আর কচি খুকীটি নেই—এখন তাকে আর যেখানে সেখানে, যার তার সঙ্গে খেলতে দেওয়া যায় না!"

বৃদ্ধ রামটহল গম্ভীর হইয়া উত্তর দিল, "সে ত ঠিক কথাই বাবুজী।"

কিন্তু অমন উত্তর শুনিয়াও, উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া হরিসাধন তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, "মুখে ত বলছ ঠিক কথাই, কিন্তু এদিকেত দেখছি চোখের মাথা একেবারে খেয়ে বসে' আছ। সারাদিন তুমি বাড়ীতে থাক, তোমার মেয়ের উপর তুমি চোখ রাখতে পার না? আমি ত আর ওর জন্য সারাদিন বাড়ীতে বসে' থাকতে পারি না!"

হরিসাধন স্পষ্ট করিয়া কোন কথা কহিল না, অথচ আধুনিক কালের বিপদ্-আপদ্ সম্বন্ধে বলিতে কিছুই সে বাকি রাখিল না। বৃদ্ধ রামটহল গম্ভীর মুখ গম্ভীরতর করিয়া সমস্ত শুনিয়া গেল; কিন্তু কোন কিছু সে স্পষ্ট করিয়া বুঝিল না বলিয়া প্রত্যুত্তরে এক "হ্যাঁ" ভিন্ন সে আর কোন মন্তব্য করিল না।

মাস তিনেক পর একদিন বৈকালে পার্ব্বতিয়ার পরিবর্ত্তে রামটহলকে জলখাবার লইয়া আসিতে দেখিয়া হরিসাধন সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "পার্ব্বতিয়া কোথায়?"

চক্ষুর ভঙ্গীতে পাশের বাড়ী নির্দ্দেশ করিয়া রামটহল উত্তর দিল, "ওখানে গেছে।"

মহা বিস্ময়ে হরিসাধন কহিল, "ওখানে কেন?"

ঈষৎ বিরক্ত কণ্ঠে রামটহল কহিল, "এ এক বিপদ্ হয়েছে বাবুজী। ও বাড়ীর ছোকরা তেমন কাজকর্ম্ম জানে না, ওর বাবুর হাতে প্রায়ই ওকে মার খেতে হয়। এদিকে কিছুদিন যাবৎ তাই সে পার্ব্বতিয়াকে ডেকে নিয়ে যায়, তার দু'একটা কাজ করে' দিতে। স্বজাতি—তাকে 'না'ও বলা যায় না। মাঝে মাঝে যেতেই হয়।"

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া হরিসাধন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রামটহলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর থালার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া গ্রাসের পর গ্রাস মুখে পুরিতে লাগিল। রামটহলের অতগুলি কথার প্রত্যুত্তরে সে একটি কথাও কহিল না।

কিন্তু দিনতিনেক পর একদিন বৈকালে বাড়ীতে ফিরিয়া কোনপ্রকার ভূমিকা না করিয়াই সে রামটহলকে কহিল "নূতন বাড়ী ঠিক করে' এলাম রামটহল, আসচে মাসেই এ বাড়ী ছাড়ব।"

কোনদিন কোন অসন্তুষ্টি প্রকাশ না করিয়া দশ বৎসরের অধিক কাল যে বাড়ীতে কাটান হইয়াছে, হঠাৎ উহা পরিত্যাগ করিবার কি যে প্রয়োজন উপস্থিত হইল তাহা বুঝিতে না পারিয়া রামটহল বিহ্বলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বাবুজী?"

—"এ বাড়ীতে আর সুবিধা হচ্ছে না", হরিসাধন সংক্ষেপে উত্তর দিল এবং ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই সে বুঝাইয়া বলিল না।

৫

বাড়ী ছাড়িবার কথা শুনিয়া রামটহল বিস্মিত হইয়াছিল; কিন্তু তাই বলিয়া সে ঐ কথা লইয়া প্রভুর সঙ্গে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হয় নাই। বরং তখনও ভাদ্র মাসের অনেকদিন বাকি থাকিলেও, তখন হইতেই সে সাড়ম্বরেই যাত্রার আয়োজন সুরু করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু ইহারই মধ্যে একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল।

সেদিন রাত্রে রামটহল হরিসাধনের শুইবার ঘরে প্রবেশ করিয়া, প্রভুকে রীতিমত বিস্মিত করিয়া দিয়া মেঝের উপর জাঁকিয়া বসিল।

"ব্যাপার কি রামটহল?"-হরিসাধন সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল।

সলজ্জ মুখ নত করিয়া রামটহল উত্তর দিবার পরিবর্ত্তে টেঁক হইতে খইনি বাহির করিয়া, উহারই খানিকটা বাম হাতের তালুর উপর রাখিয়া দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়া জোরে জোরে টিপিতে আরম্ভ করিল এবং বিস্মিত হরিসাধনের ধৈর্য্য যখন প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিতেছিল, তখনই সে মৃদুকণ্ঠে কহিল, "আমার কিছু টাকা ত আপনার কাছেই রয়েছে বাবুজী, তার সঙ্গে আরও কিছু দিয়ে দু'শো টাকা আসচে মাসেই আমায় পুরো করে' দিতে হবে।"

"দু'শো টাকা!" হরিসাধন কহিল, "এক সঙ্গে এত টাকা দিয়ে তুমি করবে কি রামটহল?"

হরিসাধনের মুখের দিকে হাসিমুখে চাহিয়া রামটহল উত্তর দিল, "পার্ব্বতিয়ার বিয়ে ঠিক করেছি বাবুজী। ভাবছি যে আসচে মাসেই ক্রিয়া শেষ করব।"

—"পার্ব্বতিয়ার বিয়ে!" হরিসাধন কতকটা টানিয়া টানিয়া কথা দুইটি উচ্চারণ করিল, তারপর সহসা শয্যার উপর সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া সাগ্রহ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "বিয়ে? কোথায়? কার সঙ্গে?"

"পাশের বাড়ীর ঐ যে ছোকরা—রামজীবন?—তার সঙ্গে!" রামটহল উত্তর দিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই টিনের কৌটাটি পুনরায় খুলিয়া আরও একটু খইনি ছিঁড়িয়া, ঐ ছিন্ন টুকরাটি বামহস্তের তালুর উপর পরিপাটি করিয়া সাজাইতে আরম্ভ করিল।

হরিসাধন ক্ষণকাল বিহ্বলের মত রামটহলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর সহসা অগ্নিসংযুক্ত বারুদ-স্তূপের মত জ্বলিয়া উঠিয়া সে কহিল "ককৃখনো না,—কিছুতেই এ বিয়ে হবে না—ককৃখনো না।"

রামটহলের বিস্ময়ের অন্ত রহিল না এবং তাহার কম্পিত হস্ত হইতে কখন যে খইনিটুকু মাটিতে পড়িয়া গেল, উহা তাহার খেয়ালেই হইল না। সে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে প্রভুর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মনের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিবার প্রয়াস পাইল এবং বোধ করি বা উহাতে অকৃতকার্য্য হইয়াই অবশেষে নিজের কথাটাই তাহাকে বুঝাইবার জন্য কহিল, "কেন বাবুজী? রামজীবন খুব ভাল বর। আমাদের পাল্টা ঘর, জোয়ান ছোকরা, দেশে জমিজমা আছে; হাল, গাই, বলদ কিছুরই অভাব নেই।"

হরিসাধন আরও বেশী উত্তেজিত হইয়া কহিল, "আমি বলছি এ বিয়ে হবে না। না, না, না!"

রামটহল আবার ক্ষণকাল প্রভুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর ঢোক গিলিয়া ক্ষুণ্নকণ্ঠে কহিল, "কিন্তু বিয়ে ত একদিন দিতে হবেই—মেয়ে যখন। আর বয়সও ত তার নিতান্ত কম হয় নি? মুখে বলি দশ, বার। কিন্তু এই বৈশাখ থেকে ওর চৌদ্দ বছর চলছে। বর না খুঁজতেই জুটে গেছে, এটা ওর ভাগ্য। এ বর একবার হাতছাড়া হ'লে আবার কবে পাওয়া যাবে কে জানে!"

কিন্তু অতগুলি বাছা বাছা যুক্তি সমস্তই হরিসাধনের অনিচ্ছার বর্ম্মে বাধা পাইয়া ব্যর্থ হইয়া গেল। প্রবল উত্তেজনায় শয্যা ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া রামটহলের মুখের দিকে চাহিয়া গর্জ্জন করিয়া হরিসাধন কহিল, "যাও এখান থেকে। আমি বলছি পার্ব্বতিয়ার বিয়ে হবে না। এ বিয়ের জন্য কিছুতেই আমি টাকা দিব না—এক পয়সাও না।"

প্রভুর মুখের দিকে কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া রামটহল সানুনয় কণ্ঠে কহিল, "এমন সুযোগ আর পাওয়া যাবে না বাবুজী। এ কেবল ভাল ঘর, ভাল বরের কথাই নয় এ বিয়েতে ওদের দু'জনেরও মত রয়েছে।"

হরিসাধনের উত্তেজিত আরক্ত মুখ দেখিতে দেখিতে পাণ্ডুর হইয়া গেল। রামটহলের দিকে ঈষৎ একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া সে শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কি বললে? এ বিয়েতে ওদেরও মত আছে?"

রামটহলের মুখ প্রত্যাশায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে উত্তর দিল, "হ্যাঁ বাবুজী। রামজীবনই ত তার কাকাকে দিয়ে এ প্রস্তাব করিয়েছে।"

—"আর পার্ব্বতিয়া"! হরিসাধন শুষ্ক জিহ্বা দিয়া ততোধিক শুষ্ক ওষ্ঠ দুইটি একবার লেহন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল।

সলজ্জ দৃষ্টি নত করিয়া রামটহল উত্তর দিল, "হ্যাঁ বাবুজী, তারও মত আছে।"

পাংশুমুখে শূন্যদৃষ্টিতে হরিসাধন অনেক ক্ষণ রামটহলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর শয্যার উপর আবার শুইয়া পড়িয়া বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া কহিল, "বেশ দাওগে বিয়ে। তোমার মেয়ে, তুমি বিয়ে দেবে, আমার তাতে কি? ভাল হোক, মন্দ হোক—আমার বয়ে গেছে!"

কথাগুলি সম্মতিসূচক হইলেও, ঠিক সম্মতি যে এ নয় গ্রাম্য চাষা হইলেও রামটহল তাহা বুঝিতে পারিল। কিন্তু তাহার ও পার্ব্বতিয়ার অতি হিতাকাঙ্ক্ষী মনিব কেন যে এমন সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয় বিবাহের প্রস্তাবও সাগ্রহে

সম্মতি দিল না, তাহা কিছুতেই রামটহলের বোধগম্য হইল না। কিন্তু না হইলেও, এই কথা লইয়া তখনই হরিসাধনের সঙ্গে আর বেশী বাদানুবাদও সে করিবার সাহস পাইল না। বিহ্বলের মত মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে সে ক্ষুণ্নমনে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

৬

পরদিন হরিসাধন ভোরে উঠিয়া স্নান করিয়াই তাড়াতাড়ি কাজ আছে বলিয়া উত্তরীয়খানি কাঁধে ফেলিয়া সেই যে বাহির হইয়া গেল, তাহার পর সারাদিনে সে আর বাড়ী ফিরিল না এবং সন্ধ্যার পর প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জলখাবারটুকুও না খাইয়া অসুখ করিয়াছে বলিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল। রামটহলের উদ্বিগ্ন কণ্ঠের অনেকগুলি প্রশ্নের কোনটিই সে ভাল করিয়া উত্তর দিল না এবং পার্ব্বতিয়া বাতায়নপথে মুখ বাড়াইয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলে, তাহাকে সে হাঁকাইয়া দিল।

পরের দিনও সে গম্ভীর হইয়াই রহিল এবং তাহার ভাব দেখিয়া রামটহল কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার সাহসই পাইল না।

কিন্তু পার্ব্বতিয়া অত সহজে হার মানিল না। এ পর্য্যন্ত হরিসাধনের নিকট হইতে উৎসাহ পাইয়া যে স্পর্দ্ধা সে অর্জ্জন করিয়াছিল, উহার সবটুকু সাড়ম্বরে প্রকাশ করিয়া ঐ দিন রাত্রে শায়িত হরিসাধনের শয্যার উপর ঠিক তাহার মাথার কাছে উপবেশন করিয়া সে কর্ত্তৃত্বের কঠোরকণ্ঠে কহিল, "তুমি এমন করছ কেন বাবুজী? তোমার কি হয়েছে বল দেখি!"

হরিসাধন বিরক্তকণ্ঠে উত্তর দিল, "কিছু হয়নি; তুমি এখন যাও।"

পার্ব্বতিয়া যাইবার কোন লক্ষণই প্রকাশ করিল না, বরং সে খাটের উপর আরও জাঁকিয়া বসিয়া দৃপ্তকণ্ঠে কহিল, "না, যাব না। তোমার কি হয়েছে, আমায় বলতে হবে বাবুজী।"

অপরিসীম বিরক্তিতে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া, হরিসাধন ঘাড় ফিরাইয়া পার্ব্বতিয়ার মুখের দিকে চাহিল।

টেবিলের উপর হইতে অর্দ্ধাবৃত হ্যারিকেন লণ্ঠনের সবটুকু আলো হরিসাধনকে এড়াইয়া পার্ব্বতিয়ার মুখের উপর পড়িয়া, তাহার মুখমণ্ডলের অর্দ্ধেকটা উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল। হরিসাধনের চোখ পড়িল—তাহারই নিজের হাতের কিনিয়া দেওয়া সুদৃশ্য সোণার দুলখানি মাথার চুলের অবাধ্য কয়েকটি গুচ্ছের সঙ্গে বাতাসে উড়িয়া, সুপুষ্ট গণ্ডের উপর বরাবর আছাড় খাইয়া পড়িতেছে। ইহারই তুলনায় পার্ব্বতিয়ার মুখের অপর অংশের ছায়ার মত অস্পষ্ট সমগ্রতা হরিসাধনের চোখে আরও মধুর বলিয়া প্রতীয়মান হইল।

তিরস্কারের কথা কয়টি হরিসাধনের ওষ্ঠপ্রান্তেই আটকাইয়া গেল, কুঞ্চিত ভ্রূযুগল দেখিতে দেখিতে স্বাভাবিক অবস্থায় রূপান্তরিত হইল। তাহার দুই চক্ষুর মুগ্ধ দৃষ্টি পার্ব্বতিয়ার চক্ষু দুইটির উপর স্থির হইয়া থামিয়া গেল।

চোখাচোখি হইতেই পার্ব্বতিয়া হাসিয়া ফেলিল। ঘাড় বাঁকাইয়া, মাথা ঝাঁকিয়া এবং উহারই কম্পনে কাণের ডিম্বাকার দুল দুইখানিতে প্রতিফলিত আলোকের শত তরঙ্গ ফুটাইয়া তুলিয়া পার্ব্বতিয়া তাহার কণ্ঠস্বরের মধ্যে অনেকখানি আব্দার ঢালিয়া দিয়া কহিল, "বল না বাবুজী, তোমার কি হয়েছে! ব'লবে না?"

হরিসাধনের বুকের ভিতর হইতে কি যেন ঠেলিয়া উঠিয়া, তাহার গলার মধ্যে গুলি পাকাইয়া আটকাইয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি ঘাড় ফিরাইয়া অস্ফুটকণ্ঠে কহিল, "কিছুই হয়নি ত!"

"ঝুট্", বলিয়া পার্ব্বতিয়া তড়াক্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর ঠোঁট ফুলাইয়া অভিমানের ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিল, "বলবে না আমাকে? বেশ, না বললে! তবে তোমার বাড়ীতে আমি আর থাকবও না। ও পাড়ার হরিবাবু দাই খুঁজছেন, দু'বার আমাকে বলেছেনও। যাব আমি ওদের বাড়ীতেই চাকরি করতে।"

আব্দার-ভরা সুমিষ্ট নারীকণ্ঠ—উহাতে স্নেহ আছে, অধিকারের দাবী আছে, নৈরাশ্যের বেদনা আছে, অভিমানের অবরুদ্ধ ক্রন্দন আছে। অথচ সব মিলিয়া উহা যাহা, তাহা সুমিষ্ট সুরের মত হরিসাধনের মর্ম্ম স্পর্শ করিয়া এক নিমিষে তাহার দেহ ও প্রাণ উভয়ই সঞ্জীবিত

করিয়া তুলিল। সে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ফিরিয়া পার্ব্বতিয়ার দিকে চাহিল।

পার্ব্বতিয়া দাঁড়াইয়াছিল—আব্ছায়া আলোতে দেখা গেল তাহার দীর্ঘ ঋজু দেহ, অনাবৃত একখানি বাহু, ললাট ও গণ্ডের সঙ্গে কয়েকটি চূর্ণ কুন্তলের লুকোচুরি খেলা, চোখের কোণে আকাশের নীল ও শাণিত ছুরিকার বিদ্যুদ্দীপ্তির অপরূপ সংমিশ্রণ। সেই প্রথম দিনের কথা হরিসাধনের মনে পড়িল। পার্ব্বতিয়া সেদিন তাহার চোখে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত প্রতীয়মান হইয়াছিল, আজ তাহার মনে হইল ভস্মমুক্ত বহ্নি-শিখা দীপ্ত তেজে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সে রাত্রে রামটহল যাহা বলিয়াছিল, তাহাও তাহার স্মরণ হইল—পার্ব্বতিয়ার চৌদ্দ বৎসর চলিতেছে। হরিসাধনের মাথার মধ্যে কেমন যেন করিয়া উঠিল।

পার্ব্বতিয়া অভিমান করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, হরিসাধন তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া সাগ্রহ কণ্ঠে ডাকিল, "পার্ব্বতিয়া, শোন।"

পার্ব্বতিয়া হাসিমুখে ফিরিয়া চাহিল। একবার ঢোঁক গিলিয়া হরিসাধন কহিল, "পার্ব্বতিয়া, দুটো কথা আছে।"

ফিরিয়া আসিয়া পার্ব্বতিয়া খাটের উপরেই আবার বসিতে যাইতেছিল, হরিসাধন সম্মুখের চৌকিখানি দেখাইয়া দিয়া গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "ওতে বস।"

পার্ব্বতিয়া চৌকিতেই বসিল, বসিয়া উৎসুক দৃষ্টিতে হরিসাধনের মুখের দিকে চাহিল।

কিন্তু হরিসাধন কথা কহিল না, পার্ব্বতিয়ার কাঁধের উপর দিয়া সে বাতায়ন-পথে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

ক্ষণকাল পর পার্ব্বতিয়া অধৈর্য্য কণ্ঠে কহিল, "কি বলবে বল না বাবুজী!"

হরিসাধন চমকিয়া পার্ব্বতিয়ার মুখের দিকে চাহিল, তারপর একবার ঢোঁক গিলিয়া মুখখানি হাসিবার মত করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "ও বাড়ীর চাকর রামজীবনকে তুমি জান। কেমন লোক ও?"

কৌতুকের হাস্যে পার্ব্বতিয়ার সমস্ত মুখখানি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে ঘাড় নাড়িয়া, মাথা দোলাইয়া উত্তর দিল, "ভারি বদমায়েস ও বাবুজী। আমার সঙ্গে কেবল ঝগড়া করে। ওকে আমি দু' চক্ষে দেখতে পারি না।"

অথচ যে চক্ষু দুইটি দিয়া রামজীবনকে সে দেখিতে পারে না বলিল, উহাই এই কথা কয়টি বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই হাসির হিল্লোলে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল।

উহারই দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া হরিসাধন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি না হয় ওকে দেখতে পার না, কিন্তু ও?"

—"ও আমাকে জ্বালিয়ে খায়," পার্ব্বতিয়া উত্তর দিল, "এই দেখ না বাবুজী, রোজই দু'বেলাই ও আমাকে ডাকে ওর কাজ করে' দিতে।"

—"আর তুমি কি কর?" হরিসাধন জিজ্ঞাসা করিল।

ঠোঁট বাঁকাইয়া পার্ব্বতিয়া উত্তর দিল, "কি আর করব, যেতেই হয়।"

হরিসাধন নিঃশব্দে একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল; তারপর পার্ব্বতিয়ার কাঁধের উপর দিয়া পুনরায় বাহিরের দিকে চাহিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া পার্ব্বতিয়া আবার অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল, কহিল, "তোমার কথা যদি না থাকে, তবে আমি যাই।"

"না, না; আর একটু বস", হরিসাধন নড়িয়া বসিয়া উত্তর দিল এবং ইহার পরেও ক্ষণকাল একটু ইতস্ততঃ করিয়া শেষে কতকটা মরিয়ার মত হইয়াই সে বলিয়া ফেলিল, "রামজীবনকে তুমি বিয়ে করবে পার্ব্বতি?"

"ধ্যেৎ", বলিয়া, লজ্জায় কাণ পর্য্যন্ত লাল করিয়া পার্ব্বতিয়া দুই হাতের মধ্যে মুখ লুকাইল।

সেই আরক্ত মুখের দিকে ক্ষণকাল নীরবে চাহিয়া থাকিয়া হরিসাধন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "লজ্জা করো না পার্ব্বতি—বল, তাকে বিয়ে করবে?"

তথাপি পার্ব্বতী উত্তর দিল না। দেখিয়া হরিসাধন পার্ব্বতিয়ার মুখের উপর হইতে তাহার হাত দুইখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, "আমাকে ত তুমি বাবা বলে'ই ডাক পার্ব্বতি। আমার কাছে লজ্জা করো না। বল।"

নতমুখ আরও খানিকটা নত করিয়া পার্ব্বতিয়া মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "বাবা যদি বলে, তো।"

হরিসাধন আবার নিঃশব্দে একটি দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিল। তারপর পার্ব্বতিয়ার হাত ছাড়িয়া দিয়া কহিল, "আচ্ছা, এখন যাও।"

পার্ব্বতিয়া নতমুখে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

৭

পার্ব্বতিয়া চলিয়া গেলে, হরিসাধন উঠিয়া ঘরের মধ্যেই অনেক ক্ষণ পায়চারি করিয়া বেড়াইল এবং বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ এক সময়ে পার্শ্বের মুকুরে প্রতিফলিত নিজের প্রতিবিম্বের উপর চক্ষু পড়িতেই সে মুকুরের সম্মুখে স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

এদিকে অনেক দিন হরিসাধন যাহা করে নাই, আজ সে তাহাই করিল। নিজের মুখ নিজে আজ সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করিয়া দেখিল। কেরোসিনের আলোর ম্লান আলোকে হইলেও স্পষ্টই দেখা গেল যে, তাহার জীবনের সুদীর্ঘ বিয়াল্লিশটি বৎসর তাহার মুখের উপর পরতে পরতে পদচিহ্ন আঁকিয়া রাখিয়া গিয়াছে। সে চিহ্ন এতই সুস্পষ্ট যে, এতদিন কেন যে উহারা তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই, ইহাই ভাবিয়া আজ সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। হরিসাধন চাহিয়া চাহিয়া আরও দেখিল যে, তাহার কাণের দিকে মাথার চুলে পাক ধরিয়াছে, চোখের নীচে জমিয়া উঠিয়াছে অনেকখানি কালি, দৃষ্টিতে আর সে সজীব উজ্জ্বলতা নাই—অগ্রহায়ণের কুয়াসার মত একখানি পাতলা আবরণ প্রৌঢ়ত্ব যেন তাহার চোখের ডিম দুইটির উপর সতর্ক হস্তে বিছাইয়া দিয়া গিয়াছে। চাহিয়া চাহিয়া হরিসাধনের চক্ষু দুইটি অকস্মাৎ জ্বালা করিয়া জলে ভরিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি মুকুরের সম্মুখ হইতে সরিয়া মুক্ত বাতায়নের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল।

সেদিন পূর্ণিমার কাছাকাছি কি একটা তিথি—প্রায় পূর্ণচন্দ্রের দৃষ্টিতলে নীচে দুধের সাগর উচ্ছল আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল। একটু দূরে কতকগুলি বন্য লতাগুল্মের ছায়ার মত অস্পষ্ট কৃষ্ণতার উপর উহাদেরই কোন একটি গাছের অনেকগুলি সাদা ফুল বড় স্পষ্ট হইয়াই হরিসাধনের চোখে পড়িল। তাহার নিজের প্রাঙ্গণ হইতে হাসনাহানা ও বেলফুলের মিশ্রিত গন্ধ বহন করিয়া আনিয়া বাহিরের বাতাস অনবরত তাহার মুখের উপর আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিল—আর অনেক দূর হইতে ভাসিয়া আসিয়া তাহার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল কাহার যেন বাঁশের বাঁশীর করুণ একটানা একটা সুর।

বাতায়নপার্শ্বে অনেকক্ষণ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার পর হরিসাধন সশব্দে দ্বার খুলিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "রামটহল।"

রামটহল তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, প্রভুর আহ্বানে সচকিতে জাগিয়া উঠিয়া সে সন্ত্রস্ত ভাবে এ ঘরে ছুটিয়া আসিল।

কোন ভূমিকা না করিয়া হরিসাধন এক নিশ্বাসে বলিয়া গেল, "রামজীবনের সঙ্গেই পার্ব্বতিয়ার বিয়ে ঠিক করে' ফেল। যত টাকা লাগে, সব আমি দেব। আসচে মাসেই বিয়ে হবে, আর এই বাড়ীতেই। বাড়ী আর বদলাবার দরকার নেই।"

যে বিবাহের প্রস্তাবে এই দুইদিন পূর্ব্বেও হরিসাধনের অত আপত্তি ছিল, উহাতেই কেন যে সে সম্মতি দিয়া ফেলিল, তাহা রামটহল বুঝিতে পারিল না। বিশেষ করিয়া এই কথাটা কিছুতেই তাহার মাথায় ঢুকিল না যে, কেন তাহার প্রভু ঐ কথাটা বলিবার জন্য এত রাত্রে তাহাকে ঘুম হইতে জাগাইয়া তুলিল। সুতরাং সে ভাল-মন্দ কিছুই না বলিয়া বিহ্বলের মত চাহিয়া রহিল।

হরিসাধন তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল "হাঁ করে' দাঁড়িয়ে রইলে যে? এখন যাও। এখন যাও। বিয়ের কথা পাকা করে' ফেল। আসচে মাসেই বিয়ে হওয়া চাই।" বলিয়া রামটহলকে সে একরকম ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়া সশব্দে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

৮

রামটহলের বিস্ময় কাটিল, রামজীবনের সঙ্গে পার্ব্বতিয়ার বিবাহের কথা পাকা হইয়া গেল এবং ঐ

সম্পর্কে হরিসাধনের গৃহে যে উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ হইল, উহার বিপুলত্ব সারা সহরে সকল অধিবাসীকেই তাক লাগাইয়া দিল।

একজন হরিসাধনকে বলিয়াই ফেলিল, "ব্যাপার কি হরিসাধন বাবু! চাকরের মেয়ের বিয়ে, তার জন্য এই আয়োজন?"

হরিসাধন অপ্রস্তুত হইয়া কুণ্ঠিত কণ্ঠে উত্তর দিল, "আয়োজন না করে' পারছি কই? ও বলে যে, এই বাড়ী থেকেই ও ওর মেয়ের বিয়ে দেবে। অনেকগুলি টাকা আমার খস্‌ল।" একটু থামিয়া একবার ঢোঁক গিলিয়া সে পুনরায় কহিল, "যাক্, নিজের মেয়ে থাকলে তারও ত বিয়ে দিতে হ'ত।"

জনৈক হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক একদিন রহস্য করিয়া কহিল, "বিয়ের পর দু'জনকেই বাড়ীতে রাখবেন হরিসাধনবাবু—সব রকমের কাজ চলবে।"

উত্তেজিত হইয়া হরিসাধন কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিল, কিন্তু কথাটা তাহার কণ্ঠে আটকাইয়া গেল।

আয়োজন মহাসমারোহেই অগ্রসর হইতে লাগিল, হরিসাধন উহা লইয়াই আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া মাতিয়া উঠিল এবং বালিকা পার্ব্বতিয়া বিবাহের পূর্ব্বেই বধূ হইয়া আত্মগোপন করিল।

কিন্তু বিবাহের দিন তিনেক পূর্ব্বে মখমলের একটি সুদৃশ্য বাক্সে অনেকগুলি অলঙ্কার এবং এক তাড়া নোট বিহ্বল রামটহলের হাতে গুঁজিয়া দিয়া হরিসাধন কহিল, "গয়নাগুলি পার্ব্বতিয়ার আর টাকাগুলি ওর বিয়ের খরচ। এদিকের কাজকর্ম্ম তুমি যা হয় কর। আমি আজ রাত্রির গাড়ীতেই দেশে যাব।"

রামটহল যেন আকাশ হইতে পড়িল, কহিল, "সে কি বাবুজী?"

—"না গেলেই নয় রামটহল", হরিসাধন উত্তর দিল, "দেশ থেকে চিঠি এসেছে—পিসীমার বড় অসুখ। আমাকে যেতেই হবে আর আজই।"

রামটহল বিহ্বল হইয়া কহিল, "এদিকে এই রাজসূয় যজ্ঞের ব্যাপার—একা আমি কি করব?"

হরিসাধন হঠাৎ যেন জ্বলিয়া উঠিল, কহিল, "তোমার মেয়ের বিয়ে—তুমি করবে না তবে কি আমি করব?"

ইহার পরেও রামটহল মুখ ফুটিয়া অনেক অনুরোধ করিল, কিন্তু ফল কিছুই হইল না। হরিসাধন তখনই তাহার সুটকেস গুছাইতে আরম্ভ করিল এবং সন্ধ্যার প্রাক্কালেই গাড়ী আসিবার অনেক পূর্ব্বেই সে ঘোড়ার গাড়ী আনাইয়া উহাতে চড়িয়া বসিল।

গাড়ী যখন চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন বারান্দা হইতে পার্ব্বতিয়া অনেকদিন পর বহু পূর্ব্বের মত বন্ধনহীনা কুমারী বালিকার উচ্ছল তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বেশী দেরী যেন করো না বাবুজী—শীগগীর ফিরে এসো।"

হরিসাধন পার্ব্বতিয়ার দিকে একবার চাহিয়াই তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল, তারপর গাড়োয়ানকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "জলদি হাঁকাও।"

যাহা পুরাতন—যাক্ ওরে চুকে—

শ্রীজিতেন্দ্র বক্সী

নব-বর্ষের উদার রৌদ্রখানি
জীবনে জাগাক্ নবীন দীপ্ত বাণী!
দূরে যাক্, আজি সব সংশয়
সকল দুঃখ, সব ক্ষতি-ক্ষয়;
দূরে যাক্ ব্যথা—
মুছুক্ সকল গ্লানি।

জীর্ণ বনের শুষ্ক প্রশাখা ভরি'
জাগে সহাস্যে চম্পক-মঞ্জরী!
যাহা পুরাতন যাক্ ওরে চুকে
হের ডাকে পথ, ডাকে সম্মুখে,
বন্ধুর মত—
বাড়ায়ে শুভ্র-পাণি॥

তিথি-নিরূপণ

শ্রীফণিভূষণ দত্ত

পঞ্জিকাগণনায় যেমন সৌর তারিখ ও বার-গণনার আবশ্যক, তিথি-গণনারও সেইরূপ আবশ্যকতা লক্ষিত হয়। ভারতবর্ষ একটি বৃহৎ দেশ। ইহার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন পদ্ধতিতে তারিখ গণিত হয়। বাঙ্গালা, আসাম, উড়িষ্যা ও দাক্ষিণাত্যের কয়েকটি স্থানে সৌর তারিখ-প্রচলিত থাকিলেও, ভারতের অন্য সকল প্রদেশেই তিথি-সংখ্যা দ্বারা তারিখ নিরূপিত হইয়া থাকে। শুধু তারিখ নিরূপণের জন্য তিথির প্রয়োজন নহে, হিন্দুর অধিকাংশ ধর্মকার্য সর্বত্রই তিথির উপর নির্ভর করে। সুতরাং, ধর্মকার্যে সৌর তারিখকে বাদ দিলেও চলিতে পারে, কিন্তু তিথি বাদ দিবার কোন উপায় নাই। এই জন্য যে-সকল প্রদেশে সৌর তারিখ প্রচলিত, সে-সকল স্থানেও তিথি-গণনা পূর্ণরূপেই আবশ্যক হয়।

সূর্যের উদয় হইতে পুনরুদয় পর্যন্ত সময়কে এক সাবন দিন বলে। সূর্যের এক রাশি অবস্থান-কালকে এক সৌর মাস বলে। সূর্য ও চন্দ্রের কেন্দ্র গগনমণ্ডলে একই দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত হইলে অমাবস্যা হয়। চন্দ্রের গতি সূর্যের আপাতগতি অপেক্ষা অধিক হওয়ায়, সূর্যকে অতিক্রম করিয়া চন্দ্র পূর্বদিকে অগ্রসর হইতে থাকে। অমাবস্যার দিন চন্দ্র সূর্যের সহিত একত্র অবস্থান করায়, চন্দ্র আকাশে দৃষ্ট হয় না। চন্দ্র সূর্য হইতে যতই দূরে চলে, ততই তাহার কলা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে, এবং ১৮০° দূরে চন্দ্র পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইলে পূর্ণিমা হয়। তাহার পর, চন্দ্র পুনরায় সূর্যের নিকটবর্তী হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ তাহার কলা হ্রাস পাইয়া অমাবস্যার দিন শূন্যকলা হইয়া পড়ে। অমাবস্যা হইতে পুনরমাবস্যা পর্যন্ত সময়কে এক চান্দ্র মাস বলে। ইহার পরিমাণ প্রায় ২৯.৫৩০৫৯ সাবন দিন। সূর্য হইতে ১২° চলিতে চন্দ্রের যে সময় অতীত হয়, তাহাই এক চান্দ্র দিন বা তিথি। ৩০ তিথিতে এক চান্দ্রমাস হয়। চন্দ্র ও সূর্যের পারস্পরিক অবস্থানানুসারে তাহাদের গতির বিভিন্নতা নিবন্ধন প্রত্যেক তিথির সাবন দিনপরিমাণ সমান নহে। সুতরাং, কোন্ তিথি কখন শেষ হইবে, তাহা স্থির করা সূক্ষ্ম গণনাসাপেক্ষ। যাহাই হউক, সৌর বৎসরের সহিত চান্দ্র বৎসরের সম্বন্ধ স্থির করিতে পারিলে, কোন দিবসের তিথি নিরূপণ করা যাইতে পারে।

৩৬৫.২৫৬৩৬ দিনে এক সৌর বৎসর, এবং ২৯.৫৩০৫৯ দিনে এক চান্দ্র মাস হইয়া থাকে। ১৯ সৌর বৎসরে ৬৯৩৯.৮৭০৮৬ দিন, এবং ২৩৫ চান্দ্র মাসে ৬৯৩৯.৬৮৮১৮ দিন হয়। উভয় দিন সংখ্যার পার্থক্য মাত্র .১৮২৬৮ দিন বা ৪ঘ. ২৩মি. ৩.৫ সে.। এই গণিত হইতে বুঝা যাইতেছে যে, ১৯ বৎসর পরে প্রতি তারিখের তিথিগুলি পুনরাবৃত্ত হইবে। অর্থাৎ, এই বৎসরের কোন তারিখে যে তিথি আছে, ১৯ বৎসর পরে সেই তারিখে পুনরায় উক্ত তিথি আসিবে। কিন্তু এই তিথি বর্তমান বৎসরে যে সময়ে আরম্ভ হইতেছে, ১৯ বৎসর পরে সেই সময়ের .১৮২৬৮ দিন পূর্বে আরম্ভ হইবে। তিথির আরম্ভ-কাল প্রতি ১৯ বৎসরে উক্তরূপে আগাইয়া আসিয়া, ৯৫ বৎসর বা ১১৪ বৎসর পরে প্রায় একদিন আগাইয়া আসিবে। এই বৎসর কোন তারিখে অমাবস্যা থাকিলে, ৯৫ বা ১১৪ বৎসর পরে সেই তারিখে অমাবস্যা না হইয়া তাহার পরবর্তী তিথি প্রতিপৎ হইবে। সুতরাং, ১৯ বৎসরের মধ্যে প্রতি বৎসরের আরম্ভ কালে কোন্ তিথি ছিল জানা থাকিলে, যে কোন বৎসরের কোন তারিখের তিথি বলা যাইতে পারে।

সম্প্রতি (নবীন মতে) মাসের দিন সংখ্যা নির্দিষ্টীকৃত হওয়ায়, যে কোন তারিখের বার সূক্ষ্মরূপে নির্ণয় করা যাইতে পারে। বার জানা থাকিলে, তারিখের তিথিটি ঠিক হইয়াছে কিনা, তাহাও স্থির করা যায়। নবীন মতে, তিথির বার স্থির করিয়া, প্রাচীন মতে উক্ত বারের সহিত মিলাইয়া, তিথির তারিখ সহজেই নির্ণয় করা যাইতে পারে।

নবীন মতে, গণনা করিয়া দেখা যায় যে, প্রথম শকাব্দের আরম্ভ কালে ২৯ তিথি বা কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথি অতীত হইয়াছিল। পূর্বেই বলিয়াছি, ৯৫ বা ১১৪ বৎসর অন্তর তিথিটি একদিন পূর্বে আরম্ভ হয়। কিন্তু উক্ত সময়ের মধ্যে প্রত্যেক ১৯ বৎসর অন্তর তিথি ও তারিখের

সাম্য রক্ষিত হয়। নিম্নে একটি সারণী দিলাম। এই সারণী হইতে প্রতি ১৯ বৎসরাত্মক চক্রের আরম্ভ-কালে কোন্ তিথি অতীত হইয়াছিল, তাহা অবগত হওয়া যাইবে। এই সারণী হইতে জানা যাইতেছে যে, ১৩৮৮ শকের আরম্ভ-কালে ১৩ তিথি অতীত হইয়াছিল। শুধু ১৩৮৮ শক নহে, ইহার পরবর্তী ১৯ বৎসর অন্তর, ১৪০৭, ১৪২৬, ১৪৪৫ ও ১৪৬৪ শকের আরম্ভ-কালেও ১৩ তিথি অতিক্রান্ত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার পরবর্তী ১৯ বৎসর অতীত হইলে, ১৪৮৩ শক হইতে ১৪ তিথি অতিক্রান্ত হইতে থাকিবে। (বঙ্গাব্দে ৫১৫ যোগ করিলে, শকাব্দ পাওয়া যায়।)

এক সৌর বৎসরের পরিমাণ ৩৬৫·২৫৬৩৬ দিন, এবং চান্দ্র বৎসরের পরিমাণ ৩৫৪·৩৬৭০৬ দিন। চান্দ্র বৎসর হইতে সৌর বৎসর ১০·৮৮৯৩১ দিন বা ১১·০৬২৩৯ তিথি অধিক হওয়ায়, প্রতি সৌর বৎসরের অন্তে একটি চান্দ্র বৎসর অতীত হইয়া পরবর্তী চান্দ্র বৎসরের ১১ তিথি অতীত হইতেছে। এইরূপে ৩ বৎসরে ৩৩ তিথি অতীত হয়। এই স্থলে সৌর ও চান্দ্র বৎসরের সমতারক্ষার জন্য একটি মলমাস গণনা করিয়া ৩ তিথি অতীত হইয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে। আমরা নিম্নে দ্বিতীয় সারণী দিলাম। এই সারণীতে ১৯ বৎসরের মধ্যে প্রত্যেক বৎসরের প্রারম্ভে কোন্ তিথি অতীত হইয়াছে এবং কোন্ বৎসরে মলমাস হইবে তাহা দেখান গেল। অভীষ্ট শকাব্দ সংখ্যাকে ১৯ দিয়া ভাগ করিয়া যাহা অবশেষ থাকিবে, তাহাই অব্দশেষ। সারণীতে প্রত্যেক অব্দশেষের পার্শ্বে অতীত তিথি-সংখ্যা লিখিত হইয়াছে। *তারকা-চিহ্নিত বৎসরগুলিতে মলমাস হইবে।

প্রথম সারণী

শকাব্দ সংখ্যা	চক্রারম্ভে অতীত তিথি	শকাব্দ সংখ্যা	চক্রারম্ভে অতীত তিথি	শকাব্দ সংখ্যা	চক্রারম্ভে অতীত তিথি
১	২৯	৯৭০	৯	১৯৯৬	১৯
২০	০	১০৬৫	১০	২১১০	২০
১৩৪	১	১১৭৯	১১	২২০৫	২১
২২৯	২	১২৭৪	১২	২৩১৯	২২
৩৪৩	৩	১৩৮৮	১৩	২৪১৪	২৩
৪৩৮	৪	১৪৮৩	১৪	২৫২৮	২৪
৫৫২	৫	১৫৯৭	১৫	২৬২৩	২৫
৬৪৭	৬	১৬৯২	১৬	২৭৩৭	২৬
৭৬১	৭	১৮০৬	১৭	২৮৩২	২৭
৮৫৬	৮	১৯০১	১৮	২৯৪৬	২৮

দ্বিতীয় সারণী

অব্দশেষ	তিথ্যঙ্ক	অব্দশেষ	তিথ্যঙ্ক
১	০	১১	২০
২*	১১	১২	১
৩	২২	১৩*	১২
৪	৩	১৪	২৩
৫*	১৪	১৫*	৪
৬	২৫	১৬	১৫
৭*	৬	১৭	২৬
৮	১৭	১৮*	৮
৯	২৮	১৯	১৯
১০*	৯		

এই দুইটি সারণীর অতিরিক্ত আর একটি সারণী দেওয়া গেল। এই তৃতীয় সারণীতে—চৈত্রমাস হইতে অতীত মাস সংখ্যা, মাসের নাম, প্রতি মাসের প্রারম্ভে অতীত তিথি ও তারিখ সংখ্যা চারিটি পৃথক্ স্তম্ভে প্রদর্শিত হইয়াছে।

তৃতীয় সারণী

১ চৈত্র হইতে অতীত মাস সংখ্যা	২ মাসের নাম	৩ অতীত তিথি সংখ্যা	৪ অতীত তারিখ সংখ্যা
১	বৈশাখ	০	০
২	জ্যৈষ্ঠ	৩২	৩১
৩	আষাঢ়	৬৩	৬২
৪	শ্রাবণ	৯৬	৯৪
৫	ভাদ্র	১২৭	১২৫
৬	আশ্বিন	১৫৯	১৫৬
৭	কার্ত্তিক	১৮৯	১৮৬
৮	অগ্রহায়ণ	২২০	২১৬
৯	পৌষ	২৫০	২৪৬
১০	মাঘ	২৮০	২৭৫
১১	ফাল্গুন	৩১০	৩০৫
১২	চৈত্র	৩৪১	৩৩৫

কয়েকটি উদাহরণ দ্বারা সারণী কয়টিকে সুগম করা যাউক।

১ম উদাহরণ। ১৮৬১ শক (১৩৪৬ সাল) ২১এ ভাদ্র কোন তিথি ছিল।

১৮৬১ শক, ১৮০৬ ও ১৯০১ শকের মধ্যবর্তী হওয়ায়, প্রথম সারণী হইতে ১৮০৬ শকের পার্শ্বে লিখিত তিথ্যঙ্ক ১৭ লইতে হইবে। ১৮৬১÷১৯, অবশিষ্ট ১৮। দ্বিতীয় সারণী হইতে ১৮ অব্দ শেষের পার্শ্বে লিখিত ৮ তিথ্যঙ্ক অব্দশেষ তারকা-চিহ্নিত থাকায়, এই বৎসরে মলমাস আছে জানা যাইতেছে। তৃতীয় সারণী হইতে অভীষ্ট মাসের অতীত তিথির সংখ্যা ১২৭ পাওয়া গেল। এই তিথ্যঙ্ক তিনটি একত্র যোগ করিয়া, যোগফলে মাসের তারিখ সংখ্যা যোগ করিলে, অভীষ্ট তারিখের অতীত তিথি-সংখ্যা পাওয়া যাইবে।

১৭+৮+১২৭+২১=১৭৩। এক চান্দ্র মাসে ৩০ তিথি হওয়ায়, ১৭৩÷৩০, অবশিষ্ট ২৩। অতএব অভীষ্ট দিনে ২৩ তিথি বা কৃষ্ণা অষ্টমী পাওয়া গেল।

২য় উদাহরণ। একটি প্রাচীন তারিখের তিথি গণনা করিয়া দেখা যাউক। ১০১৩ শকের ১৭ই কার্তিক কোন্ তিথি ছিল?

প্রথম সারণী হইতে ৯৭০ শকের পার্শ্বে লিখিত অতীত তিথি-সংখ্যা—৯। ১০১৩÷১৯, অবশিষ্ট ৬। দ্বিতীয় সারণী হইতে অব্দশেষ ৬ সংখ্যায় ২৫ তিথি এবং তৃতীয় সারণী হইতে কার্তিক মাসের পার্শ্বে অতীত তিথি-সংখ্যা ১৮৯ পাওয়া গেল। প্রাচীন মতে, অভীষ্ট শকের ১৭ই কার্ত্তিক নবীন মতানুযায়ী ১৬ই কার্তিকের সমান—উভয় তারিখই মঙ্গলবার।

সুতরাং অভীষ্ট দিনের তিথি, ৯+২৫+১৮৯+১৬= ২৩৯। ২৩৯÷৩০, অবশিষ্ট ২৯। অতএব ঐ দিন ২৯ তিথি বা কৃষ্ণা চতুর্দশী ছিল।

পূর্ববর্তী উদাহরণে যেমন কোন নির্দিষ্ট তারিখের তিথি নিরূপণ করা গেল, সেইরূপ বিপরীত ক্রমে কোন নির্দিষ্ট তিথির তারিখ-নিরূপণও উক্ত সারণী কয়টির সাহায্যে করা যাইতে পারে।

যে মাসের তিথির তারিখ গণনা করিতে হইবে, চৈত্র মাস অবধি সেই মাসের অতীত তিথি-সংখ্যায় কত দিন গত হইয়াছে, তাহা গণনা করিয়া, তাহার সহিত নির্দিষ্ট তিথি-সংখ্যা যোগ করিতে হইবে। এই যোগফল হইতে প্রথম ও দ্বিতীয় সারণী-নির্দিষ্ট তিথ্যঙ্কের সমষ্টি বিয়োগ করিয়া, বিয়োগফল হইতে তৃতীয় সারণীর চতুর্থ স্তম্ভে প্রাপ্ত সর্বাধিক সংখ্যা বিয়োগ করিলেই—সৌর-মাস ও বিয়োগফল হইতে তারিখ পাওয়া যাইবে।

৩য় উদাহরণ। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব ১৪০৭ শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত তিথির সৌর তারিখ ও বার নির্ণয় করিতে হইবে।

চৈত্র হইতে ফাল্গুন পর্যন্ত অতীত মাস সংখ্যা ১১

চান্দ্র মাসের দিন সংখ্যা ২৯.৫ দ্বারা

গুণ করিলে, গুণফল ৩২৫ দিন

পূর্ণিমার তিথি সংখ্যা ১৫ দিন

যোগফল— ৩৪০ দিন

১ম ও ২য় সারণী হইতে ১৪০৭ শকের অতীত

তিথ্যঙ্ক ১৩

বিয়োগফল—৩২৭ দিন

৩য় সারণীর ৪র্থ স্তম্ভে (ফাল্গুনের পার্শ্বে

সর্বাধিক সংখ্যা—৩০৫

বিয়োগফল— ২২

সুতরাং, নির্ণেয় তারিখ ২২এ ফাল্গুন, শনিবার (ন. ম.); অথবা ২৩এ ফাল্গুন, শনিবার (প্রা. ম.)।

এই দেশে চান্দ্রমাস—অমান্ত ও পূর্ণিমান্ত হিসাবে— দুই প্রকারে গণিত হইয়া থাকে। যে চান্দ্রমাস শুক্ল প্রতিপদে আরম্ভ হইয়া অমাবস্যায় শেষ হয়, তাহা মুখ্য চান্দ্র, এবং যে চান্দ্র মাস কৃষ্ণ প্রতিপদে আরম্ভ হইয়া পূর্ণিমায় শেষ হয়, তাহা গৌণ চান্দ্র মাস। উত্তর ভারতের সর্বত্র গৌণ চান্দ্র, এবং দাক্ষিণাত্যে মুখ্য চান্দ্র মাসের ব্যবহার হইয়া থাকে। কোন মুখ্য চান্দ্র মাসের কৃষ্ণ পক্ষীয় তিথিগুলি গৌণ চান্দ্রের পরবর্তী মাসের কৃষ্ণ পক্ষীয় তিথির সমান। কিন্তু শুক্ল পক্ষীয় তিথি-গণনায় মুখ্য ও গৌণ চান্দ্রে কোন পার্থক্য হইবে না। আমরা যে সকল সারণী দিয়াছি, তাহা গৌণ চান্দ্র মতে গণিত।

৪র্থ উদাহরণ। ১৫৩৪ শকের ১১ই জ্যৈষ্ঠ (ন. ম.) কোন্ তিথি ?

১ম সারণী হইতে, ১৫৩৪ শকের অতীত তিথি-সংখ্যা			১৪
২য় সারণী হইতে, (১৫৩৪÷১৯, অ ১৪)	„	„	২৩
৩য় সারণী হইতে, জ্যৈষ্ঠ মাসের	„	„	৩২
নির্দিষ্ট তারিখ—			১১
যোগফল			৮০

৮০÷৩০, ভাগফল ২ ও অবশেষ ২০। ২ সংখ্যায় গৌণ জ্যৈষ্ঠ (৩য় সারণী), বা মুখ্য বৈশাখ মাস। ২০ সংখ্যায় কৃষ্ণা পঞ্চমী।

যে বৎসর মলমাস থাকে, সে বৎসর তিথি-গণনার সময়ে—অতীত মাস-সংখ্যায় মলমাসটিকেও গণিতে হইবে, এবং বৎসরটিতে ১৩ চান্দ্র মাস হইবে। ১ম উদাহরণে প্রাপ্ত তিথি-সংখ্যা ১৭৩কে ৩০ দিয়া ভাগ করিলে, ভাগফল ৫ ও অবশিষ্ট ২৩ পাওয়া যায়। উক্ত বৎসরে শ্রাবণ মাস মলমাস ছিল। সুতরাং, ৫ সংখ্যায়—চৈত্র হইতে মল শ্রাবণ পর্যন্ত পাঁচ মাস অতীত হওয়ায়, গৌণ ভাদ্র বা মুখ্য শ্রাবণের কৃষ্ণা অষ্টমী।

নিম্নে নবীন মতে, কোন তারিখের বার নির্ণয়ের সারণী দিলাম। এই সারণীর শীর্ষদেশে বারের নাম ও অঙ্ক, এবং তাহার নিম্নে অব্দশেষ ও মাসের নাম সাতটি স্তম্ভে লিখিত হইয়াছে। প্রত্যেক অব্দশেষ ও মাসের শীর্ষে যে বারাঙ্ক আছে, তাহাদের সমষ্টির সহিত তারিখ-সংখ্যা যোগ করিয়া, যোগফলকে ৭ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট হইতে রবিবার ক্রমে তারিখের বার পাওয়া যাইবে। * তারকাচিহ্নিত বৎসরগুলি অতিবর্ষ। বঙ্গীয় অব্দকে ৩৯ দিয়া, এবং শকাঙ্ক হইতে ৮ বিয়োগ করিয়া ৩৯ দিয়া ভাগ করিলে অব্দশেষ পাওয়া যায়।

চতুর্থ সারণী—বারচক্র

বার নাম —	র.	সো.	ম.	বু.	বৃ.	শু.	শ.
বারাঙ্ক —	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	৫	৬	১	২	৩	৪*	১০
	১১*	১৭	৭*	১৩	৮	৯	২১
অব্দশেষ	১৬	২৩	১২	১৯*	১৪	১৫*	২৭*
	২২	২৮	১৮	২৪	২৫	২০	৩২
	৩৩	৩৪	২৯	৩০	৩১*	২৬	৩৮
	৩৯*		৩৫*		৩৬	৩৭	
	পৌষ	আশ্বিন	জ্যৈষ্ঠ	কার্ত্তিক		আষাঢ়	বৈশাখ
মাস নাম		মাঘ	শ্রাবণ	ফাল্গুন		ভাদ্র	
						অগ্রহায়ণ	
						চৈত্র	

৫ম উদাহরণ। ১৩৪৬ সালের ৩রা ভাদ্র কি বার ?

১৩৪৬÷৩৯, অব্দশেষ ২০। ∴ ৬+৬+৩=১৫ ; ১৫÷৭, অ ১। অতএব নির্ণেয় বার রবিবার।

নক্ষত্র গণনা। ২৭.৩২ দিনে চন্দ্র নক্ষত্রমণ্ডলকে একবার পরিভ্রমণ করিয়া আসে—ইহাই এক নাক্ষত্রিক মাস। চান্দ্র মাস ২৯.৫৩ দিনে। উভয় মাসের পার্থক্য প্রায় ২ দিন। সুতরাং, নক্ষত্র-গণনার জন্য চৈত্র হইতে অতীত মুখ্য চান্দ্র মাসের সংখ্যা নিরূপণ করিয়া, তাহাকে ২ দিয়া গুণ করিতে হইবে। এই গুণফলে উক্ত দিবসের তিথি-সংখ্যা যোগ করিয়া, যোগফলকে ২৭ দিয়া ভাগ করিলে, অবশিষ্ট সংখ্যা দ্বারা অশ্বিনীক্রমে নক্ষত্র নাম পাওয়া যাইবে। মনে রাখিতে হইবে—যে বৎসর মলমাস আছে, সেই বৎসর চৈত্রের কোন নক্ষত্র গণনা করিতে হইলে, দুইটি নক্ষত্র কম লইতে হইবে; চৈত্র ভিন্ন অন্য কোন মাস হইলে, বৈশাখ মাস হইতে অতীত মাস গণিতে হইবে। এই রূপ বৎসরের পূর্ববর্তী বৎসরের চৈত্র মাস হইলে একটি নক্ষত্র কম লইতে হইবে।

৬ষ্ঠ উদাহরণ। ১৩৪৬ সালের মুখ্য আষাঢ় কৃষ্ণা সপ্তমী (২২) কোন নক্ষত্র ছিল ? ১৩৪৬ সালে মলমাস থাকায়, বৈশাখ হইতে অতীত মাস সংখ্যা ২। ২×২+২২ (তিথি সংখ্যা)=২৬। ২৬÷২৭, অ. ২৬। ২৬ অঙ্কে উত্তর ভাদ্র পদ নক্ষত্র।

একই তিথি তিন দিন ব্যাপিয়া থাকিলে, অথবা তিনটি তিথি এক দিনকে স্পর্শ করিলে, অবম বা ত্র্যহস্পর্শ হয়। বর্তমান প্রবন্ধে যেভাবে তিথি নিরূপণ বা নক্ষত্র-গণনার বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে সর্বত্র সূক্ষ্ম ফল পাওয়া যাইবে। কিন্তু অবম বা ত্র্যহস্পর্শের সন্নিহিত কোন তিথি বা নক্ষত্র গণনা করিতে হইলে, এক দিনের পার্থক্য হইতে পারে। সে স্থলে অবশ্য সূক্ষ্ম গণনার দ্বারা তিথ্যন্ত বা নক্ষত্র শেষের কাল নিরূপণ করা আবশ্যক।

আমরা যে কয়টি সারণী প্রকাশিত করিলাম, তাহাদের সমবায়ে এমন দুইটি সারণী প্রস্তুত করা যাইতে পারে, যাহা হইতে দৃষ্টি মাত্রেই কোন তারিখের তিথি বা কোন তিথির তারিখ সহজেই বলা যাইবে।

২৩

শীতের জড়তা শেষ হইল। বসন্তের আভাষে প্রাণে পুলক জাগিল। জাতীয়তার সাধন-ক্ষেত্রে নব প্রাণের সাড়া উঠিল, আমরাও সেই জাগরণের তরঙ্গে গা ভাসাইয়া নিজেদের অন্তর-বীণায় যে সুর মূর্চ্ছনা তুলিতেছিল, তাহাই উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলাম।

গৃহ নাই, সম্পদ্ নাই, আচার্য্য নাই, কিছুই নাই 'নব সঙ্ঘে' নব বিদ্যাপীঠে প্রতিষ্ঠার কথা প্রকাশ করিলাম। দেশবাসীর নিকট প্রার্থনা করিলাম—"চাই প্রাণ, চাই অর্থ। কাহার প্রাণ আছে এস, সাহায্য কর,—দেশসেবায় সমুৎসুক শত জন তরুণের শিক্ষাদীক্ষায় নবজীবনলাভের ব্যবস্থা করিবে। ভিক্ষার জন্য হাত পাতিব না; মাসিক বার আনা সুদের হিসাবে এক শত টাকা ঋণ দাও। সংগৃহীত অর্থে ব্যবসা করিয়া উহার লভ্য হইতে সুদ বাদে যে অর্থ থাকিবে, এই নব বিদ্যাপীঠের তাহা হইতেই ব্যয়নির্ব্বাহ হইবে।"

এমন উদ্ভট কর্ম্মনীতি বাতুল না হইলে, অন্যের পক্ষে সম্ভব নহে—ইহা সকলেই বলিবেন। সে দিন এই পথে অন্য কোন নিষেধই ছিল না, একমাত্র বাধা ছিলেন আমার স্ত্রী। তিনি বলিলেন "এক বৎসর ধরিয়া যত টাকা ঋণ হইয়াছে, তাহার আয়ের হিসাব কিছু করিয়াছ কি?"

হিসাবের দিন তখনও আসে নাই। আমি কেবল জীবনের খাতায় অঙ্কের সংখ্যাই বসাইয়া চলিয়াছি। হিসাবের তাগিদ কেহ দিলে, বিরক্তির সীমা থাকিত না। আমি তাঁহাকে ধমক দিয়া বলিলাম "ঈশ্বরের আদেশ—বিদ্যাপীঠ খুলিতে হইবে। তাহার জন্য যাহা প্রয়োজন, তাহা পূরণ করার পথে তুমি প্রতি পদে বাধা দাও কেন?"

তিনি বলিলেন "ভগবানের আদেশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সুব্যবস্থাও তো ভগবান দিবেন। ঋণেই তো দিন দিন ডুবিতেছ; ইহার দিকে লক্ষ্য না দিলে, দাসীর কথা যে দিন মিষ্ট লাগিবে, সে দিন যে আর বাঁচার পথ থাকিবে না।"

একটু ভাবিলেই তাঁহার কথা যে সমীচীন, তাহা বুঝা যাইত; কিন্তু আমার প্রকৃতিকে আমি অস্বীকার করিতে পারি না। বিদ্যাপীঠ হইবেই; কেন না, ইহা ঈশ্বরেচ্ছা। ঋণও হইবে, ইহাও তাঁহার ইচ্ছা; নতুবা ঋণ দেয় কে? ঋণের ধর্ম্ম—উহা পরিশোধনীয়, অতএব উহা স্বধর্ম্ম স্বয়ং রাখিবে। আমার দুশ্চিন্তা নিরর্থক। এই বুদ্ধি আমার নিজস্ব। দুঃখের আবর্ত্ত দেখিয়া অনেকে এই পথে আতঙ্কিত হইবেন; আমার সুখ-দুঃখ দুইই তুল্য। ঈশ্বর যাহা চাহেন, তাহাই আমার করণীয়। ঋণের পর ঋণ মিলিল। হিসাব করিয়া দেখিলে, সেদিনও দেখিতাম—১৯২০ খৃষ্টাব্দের ঋণকৃত সমস্ত অর্থই যাহাদের হস্তে ব্যবসার জন্য প্রদত্ত হইয়াছে, তাহারা শনৈঃ শনৈঃ তাহা আত্মসাৎ করিয়া লইতেছে; অথবা ব্যবসায়ে অনভিজ্ঞতাবশতঃ প্রতি পদে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া, মূলধন নষ্ট করিতেছে। সেদিকে যিনি দৃষ্টি দিলে আমি সতর্ক হইতে পারি, তিনি যদি উদাসীন হন, আমার সেই ক্ষেত্রে কি করিবার আছে? জীবনের পথে স্বামীকে বিপন্মুক্ত করার জন্য সাধ্বীর সকল প্রচেষ্টাই এই ক্ষেত্রে ব্যর্থ হইয়াছিল। ঋণকৃত অর্থেই "প্রবর্ত্তক বিদ্যাপীঠ" গড়িয়া উঠিল। এই বিদ্যাপীঠের সাফল্যে জীবন-সঙ্গিনীর তপস্যাও কতখানি দায়ী, সে কথা এখানে বলিবার নহে।

শুভ ১লা ফাল্গুন শ্রীপঞ্চমীর দিনে "প্রবর্ত্তক বিদ্যাপীঠে"র উদ্বোধন হইল। উদ্বোধনসভায় বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। "হিতবাদীর" অন্যতম ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই সভার পৌরোহিত্য করেন। সভা শেষ হইলে, সমবেত জনগণকে লইয়া বিদ্যাপীঠের জন্য যে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, সেইখানে উপস্থিত হইলাম। সেদিন জাতীয়তার স্বপ্নে চক্ষে ইন্দ্রজাল সৃষ্টি হইত; ভাষায় স্বপ্নচিত্র এমন সুন্দর করিয়া রচনা করিতাম যে, শ্রোতাও তাহাতে

বিমোহিত হইতেন। বিদ্যাপীঠ অর্থে গঙ্গাতীরবর্ত্তী প্রায় তিন বিঘা জঙ্গলাকীর্ণ বনভূমি। আম্র, কাঁঠাল বৃক্ষের শুষ্ক পত্রে সমস্ত স্থানটী সমাকীর্ণ। বহু লোকের পদচাপে মর্ম্মরশব্দ উঠিল। শাখায় শাখায় সন্ত্রস্ত পক্ষিকুল অব্যক্ত শব্দ করিতে করিতে ইতস্ততঃ উড়িতে লাগিল। অতি প্রাচীন চারিটী শিবমন্দিরের সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র আটচালার ভগ্নস্তূপের উপর দাঁড়াইয়া আমি নিঃসংশয় কণ্ঠে বলিলাম—"এই বিদ্যাপীঠ—এইখানে বাংলা, ইংরাজী, সংস্কৃত, হিন্দুস্থানী, ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা হইবে; ইতিহাস, তর্ক, দর্শন, সমাজ, রাষ্ট্র, মনস্তত্ত্ব, অর্থনীতির অনুশীলন হইবে; জড় বিজ্ঞান, রসায়ন, শরীর ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান এবং উচ্চ গণিতের শিক্ষা দেওয়া হইবে। কৃষিকর্ম্ম ও বয়নবিদ্যা, কাঠের কাজ, কামার, কুমারের কাজ প্রভৃতি শ্রমশিল্প শিক্ষা দেওয়া হইবে; ব্যবসা-বাণিজ্য, দোকানদারী, সংবাদপত্রপরিচালনার শিক্ষাদিও ছাত্রগণ এইখানে থাকিয়া লাভ করিবে।" আমার মনোপাখী তার বিচিত্র ডানা মেলিয়া কল্পনার আকাশে বিচিত্র ভঙ্গীতে উড়িতে উড়িতে সমবেত বন্ধুদের চিত্ত আকৃষ্ট করিল। কাহারও চক্ষে সংশয়ের লেশমাত্র প্রকাশ পাইল না। সকলেই একবাক্যে বিদ্যাপীঠের সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন লইয়া বাড়ী ফিরিলেন। কোথায় ছাত্রাবাস? কোথায় অধ্যয়ন-অধ্যাপনার গৃহ? কোথায় গ্রন্থাগার, পাঠ্যপুস্তকাদির ব্যবস্থা? কোথায় বা অধ্যাপনার জন্য সুবিজ্ঞ অধ্যাপক? এমন অসম্ভব ব্যাপারও আমার সহতীর্থেরা সহজ ভাবেই স্বীকার করিয়া লইল। 'নবসঙ্ঘে' বিদ্যাপীঠের বিবরণ বাহির হইল। চন্দননগর বিদ্যাপীঠের সংবাদ অন্যান্য সংবাদপত্রাদিতেও বড় বড় অক্ষরে প্রকাশিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের আগমন। একে একে অর্দ্ধশত ছাত্র আসিয়া আমায় ঘিরিয়া ধরিল। এই সকল ছাত্রদের মধ্য হইতেই যাহারা এই সাধনায় আত্মদান করিল, তাহারাই প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। অতএব বিদ্যাপীঠ-রচনার স্বপ্ন যে অলীক ছিল না, এ কথা না বলিলেও চলিবে।

ছাত্রদের আবাসগৃহ নাই, ভোজনাদির ব্যবস্থা নাই, পাঠ্যপুস্তক নাই; কিন্তু বিদ্যাপীঠের নিয়ম যথারীতি পালন করার দায়িত্ব আমি স্বয়ং গ্রহণ করিলাম। উষাসমাগমে বিদ্যাপীঠে গিয়া উপস্থিত হইতাম। ছাত্রদের লইয়া মধ্যাহ্নে ভোজনে বসিতাম; রাত্রি এক প্রহরের পর পরিশ্রান্ত হইয়া শয্যা গ্রহণ করিতাম। সেই অর্দ্ধশত ছাত্র প্রচলিত বিদ্যালাভের আশা ছাড়িয়া, কেবল আমাকে কেন্দ্র করিয়া দিনের পর দিন অতিবাহিত করিতে লাগিল। এই সময় হইতেই দুই জন ছাত্রীও এই বিদ্যাপীঠে যোগ দিয়াছিল। আমি এই সকল ছাত্র-ছাত্রীদের লইয়া নিতান্ত অজ্ঞাতসারেই সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিতেছিলাম—এ সংবাদ অন্তর্য্যামীই রাখিতেন, আর কেহ নহে।

বিদ্যাপীঠের জঙ্গল পরিষ্কার করা হইতে গৃহ-নির্ম্মাণ, ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিয়া দিন গুজরাণ—ছাত্ররাই করিয়াছে। "প্রবর্ত্তক বিদ্যাপীঠের" কথা শুনিয়া ছাত্রদের ন্যায় কয়েক জন অধ্যাপকও আমায় সাহায্য করার জন্য সমাগত হইয়াছিলেন। কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া অধ্যাপকেরা দেখিলেন—ইহা আমার দুঃস্বপ্ন ভিন্ন আর অন্য কিছু নহে; তাঁহারা প্রস্থান করিলেন। কিন্তু এই দুঃস্বপ্নকে এক মহত্তর সত্যে পরিণত করার পথে আমার প্রাণপুরুষ কোন বাধাই স্বীকার করিল না। ছাত্রগণ এক বিল্ববৃক্ষতলে এক একখানি ইষ্টকখণ্ড লইয়া আসন করিয়া বসিত আর আমার কণ্ঠে বাজিত শিবের ডম্বরু; কোন এক অপৌরুষের সত্তা বুঝি সেদিন এই পঙ্গুকে আশ্রয় করিয়া নববেদ উচ্চারণ করিতেন। আর নবযুগের ঋত্বিকেরা সে বাণী শ্রবণ করিতে করিতে নবজীবনের অমৃতে অভিষিক্ত হইয়া নব সঙ্ঘরচনার সঙ্কল্পে দৃঢ়চিত্ত হইত।

শরীরের, মনের প্রতি শিরা-উপশিরার ক্লান্তি অপনোদন করার ভার লইয়াছিলেন সঙ্ঘজননী। তাঁর জীবনের রাগিণী আমারই জীবনসঙ্গীত। তাই আত্মগীতি গাহিয়াই জীবনসঙ্গিনীর পূত চরিত্র অঙ্কন করার এই নববিধান আশ্রয় করিয়াছি। স্বামী কায়া বলিয়া যে জাতির স্বীকৃত, জায়া ছায়া বলিয়া যে জাতির সংস্কৃতি ও প্রত্যয়, সেই জাতির একজন হইয়া আমি নির্ব্বিবাদেই বলিতে পারি যে, এই কায়াকে আশ্রয় করিয়া যে কিছু ঘটনা, তাহার

সবখানির জন্যই আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার সহধর্ম্মিণীও দায়ী; তাই তাঁর জীবনের স্বতন্ত্র ইতিহাস নাই। বিশেষ করিয়া এই সময়ে যে নিরলস কর্ম্মজীবনের আবর্ত্তে আমি চুবান খাইতেছিলাম, তাহাতে আমা ছাড়া তাঁর যে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, তাহা খেয়াল করার আমার তো সময়ই ছিল না। প্রতি মুহূর্ত্তে সেবার অর্ঘ্য হাতে তাঁহাকেই দেখিতাম শরীরে অশরীরে। ভোরে উঠিয়া আল্না হইতে ধৌত বাস তিনি আমার অঙ্গে জড়াইয়া দিতেন—নিজের হাতে পরিষ্কার করিয়া পাদুকাযুগল সম্মুখে ধরিতেন—দরজায় দাঁড়াইয়া যতক্ষণ দেখা যায়, ততক্ষণ আমার দিকে চাহিয়া থাকিতেন। বিদ্যাপীঠে আসিয়া বাণীপ্রবাহের শেষে কণ্ঠ যখন নীরব হইয়া আসিত, অবসাদে স্নায়ু-নিচয় নিস্তেজ হইয়া পড়িত, দেখিতাম—প্রাতরাশের থালি হাতে নির্দ্দিষ্ট সেবিকার আগমন—সঙ্গে করিয়া আনিতেন হৃদয়ের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও করুণা। মধ্যাহ্নের আহ্বান কোনদিন বিলম্বিত হইত না। তিনি নিজ হাতেই আমার অভ্যঙ্গ তৈলমর্দ্দিত করিতেন। মস্তকে সুগন্ধি সুশীতল তৈল মর্দ্দন করিতে করিতে সুকরুণ কণ্ঠে বলিতেন "ইস্, ব্রহ্মতলাটা তপ্ত খোলার মত আগুন হয়ে উঠেছে"—চক্ষের কোলে বুঝি অশ্রুবিন্দু উথলিয়া উঠে। যেন তাঁহার মনে হইত—রক্ত-মাংসের শরীরে এত শ্রম সহিবে না। অকারণ নিষ্ঠুর ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া তাঁর চিত্ত বেদনাতুর হইয়া উঠিত। তাই বিজড়িত কণ্ঠে তিনি বলিতেন "কাজ তো সবাই করে, তুমি কেন এমন আপন-হারা; নিজের শরীরের দিকে নিজের দৃষ্টি না রাখ্‌লে আমি বড় অসহায় হয়ে পড়ি যে!"

আমি তাঁকে বক্ষে চাপিয়া সান্ত্বনা দিয়া বলিতাম "আমার কথা নয়, আমি কিছু নই, আমার কথারও মূল্য কিছু নাই; কিন্তু তুমি, তোমার নিষ্ঠা ও ভক্তি আমায় বলায়, এ তোমারই কথা—আমি মরব না; তুমি এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত হও।" এই কথায় তিনি বড় ভরসা পাইতেন। তাঁহার বদনে অনিন্দ্য শ্রী ঝলসিয়া উঠিত। সীমন্তের সিন্দুর রক্ত-ঊষার ন্যায় ঝিলিক দিত। হিন্দু ভারতের সে বিজয়িনী সতীমূর্ত্তি আমি দেখিয়াছি; তাই হিন্দু পুরুষের কোথায় আশা, কোথায় শক্তি ও জয়, তাহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমার ধন নাই, বিদ্যা নাই, খ্যাতি নাই, ব্যক্তিত্ব নাই; কপর্দ্দকহীন ভিক্ষুক—আমার সর্ব্বসম্পদ্ গৃহলক্ষ্মীর প্রদীপ্ত নয়নের দীপ্তি, ওষ্ঠে পতির সংরক্ষণী শক্তি, ললাটে সুদৃঢ় চরিত্রবলের অপরূপ লাবণ্য।

বিদ্যাপীঠের সূচনায় প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের অমিশ্র সংগঠনের নব যুগপর্ব্ব আমার চক্ষের সম্মুখে দেদীপ্যমান হইল। কিন্তু আমার পুরাতন বন্ধুদের কথা স্মৃতিপট হইতে মুছে নাই। বাংলার বিপ্লবযুগের ইতিহাসে যাঁহাদের নাম চিরাঙ্কিত থাকিবে, তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জনের সহিত আমার যে সম্বন্ধ ছিল, সেই সম্বন্ধসূত্র ধরিয়া স্পষ্টতার ক্ষেত্রে তাঁহাদের জীবনও নূতন করিয়া লীলায়িত হউক, এই প্রেরণাও সেদিন আমায় অস্থির করিয়াছিল। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের সম্রাটের করুণাবর্ষণে যে সকল রাজবন্দী মুক্তি পাইয়াছিলেন, তাঁহার মধ্যে অনেকেই প্রকাশ্য কর্ম্মক্ষেত্রে নূতনভাবে জীবনযাত্রার সুবিধা পাইয়াছিলেন; কিন্তু যাঁহারা বৈপ্লবিক কর্ম্মসূত্রে ছদ্মবেশে সঙ্গোপনে জীবনযাত্রা করিতেছিলেন, তাঁহাদের মুক্তিকামনায় আমি বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন উপস্থাপন করিলাম। ইঁহাদের মধ্যে চন্দননগরের অধিবাসী শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসু, কলিকাতার শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ ও আন্দামানে নির্ব্বাসিত রাজাবাজার বোমার মামলায় অভিযুক্ত শ্রীঅমৃতলাল হাজরাও ছিলেন। তখন গোয়েন্দাবিভাগের বড় কর্ত্তা ছিলেন জি, ডব্লিউ, ডিক্‌সন্। তিনি আমার পত্রোত্তরে জানাইলেন—রাসবিহারী বসু সম্বন্ধে তাঁহাদের কিছু করিবার নাই, এবং সে ব্যক্তি ভারতবর্ষেও নাই। ইহার জন্য আমাকে সেণ্ট্রাল ইণ্টেলিজেন্সের ডিরেক্টরের নিকট লিখিতে হইবে। অমৃতলাল হাজরাও আন্দামানে। অতুলচন্দ্র ঘোষ সম্বন্ধে কোন অভিসন্ধি না লইয়া, তাহার সহিত ব্যবস্থানুযায়ী আমি সাক্ষাৎ করিতে পারি।

রাসবিহারী বসু সম্বন্ধে আমার শত চেষ্টায় নিরাশ হইতে হইয়াছিল। অমৃতলাল হাজরার মুক্তির পথ প্রশস্ত হইয়াছিল। আর সে এক স্মরণীয় ঘটনা—চন্দননগরে যে গৃহ-প্রাঙ্গণ ভারতের নেতৃমণ্ডলীর শুভাগমনে পবিত্র, স্বদেশী যুগের দেশসাধকগণের দ্বারা অধ্যুষিত, সেই প্রাঙ্গণেই বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের গোয়েন্দাবিভাগের

কর্ত্তৃপুরুষগণও উপস্থিত হইয়া আমার সহিত যথারীতি সদালাপের পর দেশসেবী অতুলচন্দ্র ঘোষের মুক্তির ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। একদিন যে প্রাঙ্গণভূমি স্যার টেগার্টের সদম্ভ পদভরে কম্পিত হইয়াছিল, আজ সেই প্রাঙ্গণভূমির উপরেই ইংরাজ রাজকর্ম্মচারিগণ প্রসিদ্ধ বৈপ্লবিক অতুলচন্দ্রকে মুক্তির টীকা ললাটে পরাইয়া সহাস্যে বিদায় লইলেন। অঘটনঘটনপটীয়সী অদৃশ্য শক্তির এমন লীলা-চাতুর্য্য আমার জীবনে বহুবার ঘটিয়াছে। অতুলচন্দ্র মুক্তিলাভ করিয়া আজ উত্তম নাগরিক জীবন যাপন করিতেছেন। আমি ইহাতেই ক্ষান্ত হইলাম না। তখনও বাংলার আর কয়েকটী বরণীয় সন্তান—ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীনলিনীকান্ত কর, শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও ৺পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় আত্মগোপন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। ইঁহাদের জন্য মুক্তিপ্রার্থনার উত্তরে মিষ্টার ডিক্‌সন আমায় লিখিলেন—"অতুল ঘোষের ন্যায় ডাক্তার যাদুগোপাল প্রভৃতিরও মুক্তি-সম্ভাবনা আছে, যদি তাঁহারা বৈপ্লবিক কর্ম্ম হইতে অপসৃত হইবেন, এইরূপ নিশ্চয়তা প্রদান করেন।" ইহাতে অবশ্য কাহারও আপত্তি ছিল না। কিন্তু আমার কোন এক পরিচিত বন্ধু মিষ্টার ডিক্‌সনকে জানাইয়াছিলেন যে, ইঁহারা সকলেই চন্দননগরেই আছেন এবং অস্ত্র-শস্ত্র গভর্ণমেণ্টের নিকট অর্পণ করিতেও প্রস্তুত। এই সংবাদ সত্য ছিল না। অবশ্য মিষ্টার ডিক্‌সন লিখিয়াছিলেন "No question will be asked regarding any weapons so surrendered,"

অর্থাৎ অস্ত্র-সমর্পণের বিষয় লইয়া তাঁহাদিগকে কোনই প্রশ্ন করা হইবে না।

আমি এইরূপ দাবী পূরণ করিতে পারি নাই, যেহেতু যাদুগোপাল প্রভৃতি আমার সান্নিধ্যে ছিলেন না। আমি সংবাদপত্রাদিতে বিজ্ঞাপন দিয়া তাঁহাদের ডাকাইয়া আনিয়াছিলাম এবং গভর্ণমেণ্টের ধারণানুযায়ী অস্ত্রাদি পাওয়ার যে সম্ভাবনা নাই, তাহা হিসাব দেখাইয়া মিষ্টার ডিক্‌সনের নিকট অকপটে জানাইয়াছিলাম। আমার উক্তির মধ্যে একবিন্দু মিথ্যা ছিল না। বঙ্গীয় রাজপুরুষগণও সম্ভবতঃ আমার কথা অবিশ্বাস করেন নাই, উক্ত বন্ধুদের বিনা সর্ত্তে মুক্তি দিয়া তাঁহারা আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছিলেন। এই সকল বিপ্লবী তরুণ আমার আত্মীয়স্বজন কেহই নহেন, কিন্তু তাঁহারা আমার স্বদেশ-বাসী, দেশসেবী। আমি উপলক্ষ্যস্বরূপ এই সকল মহৎ-জীবনের মুক্তির জন্য নিজেকে ধন্য মনে করি। তখনও বাকী রহিলেন আমার প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—তাঁহার মুক্তির ইতিহাস উপন্যাসের ন্যায় বিচিত্র, রোমাঞ্চকর। সে কথা পরে যথাস্থানে বলিব।

এই যে জীবনরঙ্গ, ইহার পশ্চাতে যাঁহার উদ্যত হস্ত সহায় হইয়াছে, সাহস দিয়াছে, তাঁহাকেই বার বার স্মরণে পড়ে। মিঃ ডিক্‌সন প্রমুখ রাজকর্ম্মচারিগণ যেদিন আমার বাড়ী উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেদিন আমার রন্ধনশালা যজ্ঞশালায় পরিণত হইয়াছিল। গৃহলক্ষ্মীর ছিল অন্নপূর্ণার মন্দির। স্বধর্ম্মী-বিধর্ম্মী বিচার ছিল না—এখানে মিঃ পিয়ার্সন বা মৌলভী লিয়াকৎ হোসেনের ন্যায় ভিন্ন ধর্ম্মী বন্ধুগণ আমার আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবের সহিত তুল্যভাবে আতিথ্যের পরিচর্য্যায় পরম প্রীত ও পরিতুষ্ট হইয়াছেন। কর্ম্মে প্রিয়াপ্রিয় ঘটনার সৃষ্টি হইলেও, হৃদয় ছিল নিষ্কলুষ গঙ্গোত্রীর মত শুভ্র। গৃহদেবী সেদিন এই নব অতিথিগণের জন্য বিবিধ প্রকার খাদ্য-দ্রব্যাদির আয়োজন করিয়াছিলেন। কিন্তু সাহেবরা সেদিন আমাদের অন্তরের পরিচয় জানিতেন না, হয়তো সেই জন্যই তাঁহারা খাদ্যাদি-গ্রহণে নিঃসঙ্কোচ হইতে পারেন নাই। তবুও তাঁহার পীড়াপীড়ির প্রভাব তাঁহারা উপেক্ষা করিতে না পারিয়া, প্রচুর খাদ্যাদি ছাঁদা-বাঁধার ন্যায় মোটরে করিয়া লইয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত এই অন্নপূর্ণার মন্দির হইতে কেহ অভুক্ত অবস্থায় ফিরেন নাই। সেই অনাবিল আতিথ্যের অনাহত প্রবাহ আজিও রুদ্ধ হয় নাই।

এইবার বিয়োগান্ত নাটকের একাঙ্ক সমাপ্ত হওয়ার করুণ কাহিনী বিবৃত করিব।

অরবিন্দ আর আমি—এই দুই যখন অখণ্ড আকৃতি লইতে চলিয়াছে, বিদ্যাপীঠের সূচনার পরেই দেখা গেল যে, সে প্রেম ও ঐক্য মর্ত্ত্যে বঝি প্রত্যক্ষ হইবার নহে।

নব জীবনের মন্দাকিনীধারা ধরণীর বুকে অবতরণ করিলেও, দুই কূলের ব্যবধান যেন ঘুচিল না। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসেও চন্দননগরের এই সৃষ্টির সহিত শ্রীঅরবিন্দের যে অভিন্ন পরিচয়, তাহা তাঁহার পত্রের কয়েক ছত্র উক্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

তিনি লিখিয়াছিলেন—"This, as I conceive it, has to be done in two lines. First, what has already been created by us and given a right spirit, basis and form, must be kept in tact in spirit, in tact in basis and intact in form and must strengthen and enlarge itself in its own strength and by its inherent power of self-development and the divine forces within it. This is the line of work on which you have to proceed."

অর্থাৎ "যেমন আমি বুঝি, তাহাতে দুইটী প্রণালীতে কার্য্য সিদ্ধ করিতে হইবে। প্রথমতঃ, আমাদের দ্বারা যাহা সৃষ্ট হইয়াছে, সত্য ভাব, ভিত্তি এবং আকৃতি পাইয়াছে, তাহার সেই ভাব, ক্ষেত্র ও আকৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে, এবং ইহা নিজ শক্তিতেই আত্মপূর্ত্তির অন্তর্নিহিত গতিবেগ এবং দিব্যশক্তির প্রেরণায় শক্তিপূত ও বিস্তৃত হইবে। তোমাকে এই কর্ম্মগতি ধরিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে।"

আমার প্রকৃতি অশরীরী ভাবকে আশ্রয় করিয়া যেমন উৎফুল্ল হইয়া চলে, বস্তুতন্ত্র বিধি তাহাকে তাদৃশ তৃপ্তি দেয় না। বারীন-দা প্রমুখ আমার পুরাতন বন্ধুরা আমার গতির তালে তাঁদের পরিচিত সঙ্কেত না পাইয়া, আমার কার্য্য দিব্য নহে, এইরূপ একটা সোরগোল তুলিয়াছিলেন। বাহিরের জগতের সহিত আজ পর্য্যন্ত সম্বন্ধ না রাখিয়াই আমি চলিয়াছি আমার এক নিজস্ব জীবনচ্ছন্দে। অসত্যকে আশ্রয় দিই নাই; বাহিরের পরিচিত কর্ম্মনীতি অর্থাৎ টেক্‌নিক্ আমার সাহিত্যেও নাই, কর্ম্মেও নাই। তবুও যে ইহা ব্যর্থ হয় নাই, এই দৃষ্টান্ত চক্ষের সম্মুখে ধরিলেও, প্রচলিত ছন্দে আমার জীবন-গতিকে টানিয়া আনার প্রযত্ন আমি তাঁহাদের অপপ্রচেষ্টা বলিয়াই দৃষ্টি দিতাম না। বাস্তবতঃ ইহা আমার অহঙ্কার বলিয়া ভ্রান্তির সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু আমার বিশ্বাস ছিল—আমার জীবনধর্ম্মের কষ্টিপাথর শ্রীঅরবিন্দ। সেখানে ছিল আমার সর্ব্ব কর্ম্মের সমর্থন। আমি তাই অভীঃ হইয়াই চলিতেছিলাম।

অসংখ্য কর্ম্মের মধ্যে আমার অবহিত প্রকৃতিকে বাহিরের দিক্ হইতে কৌশল করিয়া চঞ্চল করার সর্পিল গতি আমাদের নিজেদের মধ্যেই ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হইতে লাগিল। যেন চতুর্দ্দিকে ষড়যন্ত্রের অস্ফুট গুঞ্জন শোনা গেল—শ্রীঅরবিন্দের প্রেরণাশক্তিকে লুটিয়া লইয়া আমি নাকি নিজেকেই পুষ্ট করিতেছি। শ্রীঅরবিন্দ এই খবর এতদিন রাখিতেন না যে, আমি তাঁহার প্রচুর দানেই নিজে প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিতেছি। এইরূপ অসদৃশ বিপরীত প্রচারে চিত্ত আমার মাঝে মাঝে অপ্রসন্ন হইয়া উঠিত, অথচ কাজের অন্ত ছিল না। ব্যবসাবাণিজ্যের সহিত তিন-খানি সংবাদপত্র-পরিচালনা, বিদ্যাপীঠের উৎসাহী তরুণদের লইয়া নবজীবনের আন্দোলন, ১৯২২ খৃষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দ আসিবেন বলিয়া তাহার জন্য বিপুল আয়োজন—আমার এইরূপ অসংখ্য কর্ম্মপ্রেরণা—দিন যে কোথা দিয়া ফুরাইয়া যাইত, উহার হিসাব ছিল না। কিন্তু সহকর্ম্মীদের সহিত একত্র হইলে পূর্ব্বে যে অনাবিল প্রেম ও ঐক্যের আস্বাদ মিলিত, তাহা যেন শুম্ভিত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে যেমন সকলে মিলিয়া অতি গুরুতর কর্ম্মও সুসিদ্ধ করিয়া তুলিতাম, এখন অতি সামান্য কার্য্য করিতে হইলেও পরস্পর ঠেলাঠেলি চলিতে থাকে। শ্রীঅরবিন্দ যেন আমার সহিত নূতন করিয়া বুঝাপড়ার জন্য আকুলতা প্রকাশ করেন। বারীনদাকে যেমন আমি আপনার করিয়া লইবার আশায় হাত বাড়াইয়াছিলাম, সে আশা একেবারেই অমূলক মনে হইল এবং যাঁহাদের চন্দননগরের কর্ম্মে চিরদিন সহায়তা পাওয়ার আশা ছিল, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই মনোভাব দ্বন্দ্বময় বলিয়া মনে হইতে লাগিল। আমি অবস্থার স্পষ্টতার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দের নিকট গিয়া আমার বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে বিশদ করার জন্য আমি অরুণচন্দ্রকে পণ্ডিচারী পাঠাইয়া দিলাম।

(ক্রমশঃ)

বৈচিত্র্য
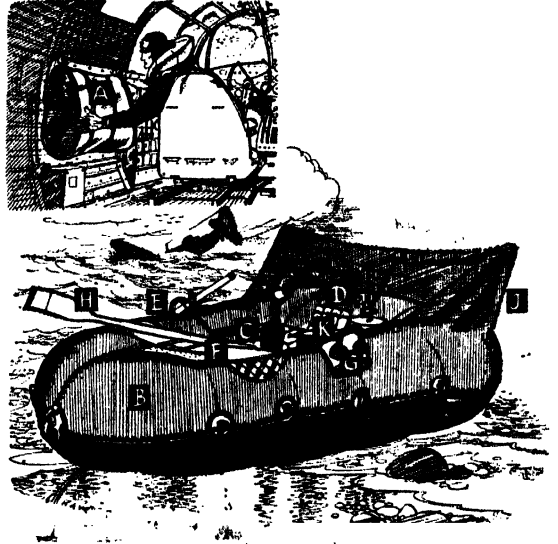
পৃথিবীর রূপ

আক্রমণ আর প্রতিরোধ

পৃথিবীর রূপ—

আমাদের এই পৃথিবীর উপর দাঁড়িয়ে আমরা পৃথিবীর চেহারা কল্পনা করতে পারি না। পৃথিবীটা শুধু গোলাকার বললে আমাদের ধারণা সম্পূর্ণ হয় না। পৃথিবী থেকে চল্লিশ হাজার কিলোমিটার অর্থাৎ পঁচিশ হাজার মাইল দূরে মহাশূন্যের বুকে দাঁড়িয়ে পৃথিবী ঠিক যেমনটি দেখা যায় তার ছবি এখানে দেওয়া হ'ল। ধরিত্রীর পর্ব্বত, স্থল, জল মিশে এ একটা বিচিত্র রূপ।

ঝাড়ুদার শিম্পাঞ্জী

-লণ্ডনের রিজেণ্ট পার্কের পশুশালায় (Zoo) এক জোড়া শিম্পাঞ্জী আছে। এরা ঘর-বাড়ী-আঙ্গিনা ঝাড়ু দেয়, আবর্জ্জনাগুলোকে এক জায়গায় জড় করে' নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখে। বহু সংখ্যক ঝাড়ুদারের মধ্যে এরাই সবচেয়ে কর্ম্মঠ।

আক্রমণ আর প্রতিরোধ—

আক্রমণ যেমন চলে নূতন ধরণে, তার প্রতিরোধের ব্যবস্থাও হয় তেমনি উন্নত ধরণের। মুখোস, এ্যাণ্টি-এয়ার-ক্র্যাপ্ট প্রভৃতি এমনি আত্মরক্ষামূলক আবিষ্কার। এবারকার ব্যাপক আকাশ যুদ্ধে স্ফীতি-প্রবণ (in flatable) ডিঙ্গি জলে পড়লে বাঁচার উপায় স্বরূপ ব্যবহার হচ্ছে। ভাঁজ করলে ক্যাম্বিসের ব্যাগের মত দেখায় (A চিহ্নিত ছবি)। আধ মিনিটে হাওয়া পুরে একে নৌকা করা চলে (নীচের ছবি দ্রষ্টব্য)। ৬ জন যাত্রী ধরে। ওজন আধ মণেরও কম।

প্রবর্ত্তক রজত-জয়ন্তী উৎসব ঃ জলপাইগুড়ি

সমাপ্তি অনুষ্ঠান

শ্রীপ্রীতিনিধান রায়, এম.এ, বি.এল.

জলপাইগুড়ির সহিত প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের সম্পর্ক বহু-দিনের। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের বহু কর্ম্মী বহুবার জলপাইগুড়ি সহরে আসিয়াছেন। প্রথম প্রথম যাঁহারা আসিতেন, প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে যাঁহারা সঙ্ঘের সহিত জলপাইগুড়ি-বাসীর প্রীতিমধুর সম্পর্ক স্থাপনে অগ্রণী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহ কেহ আজ ইহ-জগতে নাই। জলপাইগুড়ি সহরে রজত-জয়ন্তী উৎসবের কথা বলিতে গিয়া আজ তাঁহাদের কথাই পুনঃ পুনঃ মনে পড়িতেছে।

বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলায় "প্রবর্ত্তক" পত্রিকার রজত-জয়ন্তী উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছে। সঙ্ঘ - প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় জলপাইগুড়িতেই তাঁহার ব্রতের উদ্‌যাপন করিয়াছেন। রজত-জয়ন্তী উৎসবের শেষ অনুষ্ঠান জলপাইগুড়ি সহরে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই বিশেষ সম্মানে জলপাইগুড়িবাসী গৌরব-বোধ করিয়াছে। উৎসব উপলক্ষে সঙ্ঘগুরু ও তাঁহার সহকর্ম্মীগণের সান্নিধ্যলাভ করিয়া তাহারা সত্যই সুখী ও ধন্য হইয়াছে। সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাতার ইহাই এই সহরে প্রথম আগমন। ১লা ও ২রা চৈত্র দুইটি দিন জলপাইগুড়িবাসীর একটা উৎসবের মত কাটিয়াছে। কোনও জাঁক-জমক ছিল না, অনাবশ্যক স্তুতিবাদ ছিল না, বাঙ্গালীসুলভ ভাব-বিলাস ছিল না। একটা কাজের আব্‌হাওয়ার মধ্যে শ্রীযুক্ত মতিবাবু তাঁহার বাণী, তাঁহার অনুসৃত কর্ম্মপন্থার কথা জলপাইগুড়িবাসীকে শুনাইয়া গিয়াছেন।

সভাপতি শ্রীনলিনীরঞ্জন ঘোষ, এম-এ, বি-এল

১লা চৈত্র তারিখে শ্রীযুক্ত মতিবাবু ও তাঁহার সহ-কর্ম্মিগণ আমাদের সহরে আসেন। ঐ দিনই অপরাহ্ন ৬ ঘটিকার সময়ে স্থানীয় আর্য্য নাট্যসমাজ গৃহে এক জনসভায় উৎসবের উদ্বোধন হয়। সভায় অভূতপূর্ব্ব জনসমাগম হইয়াছিল। লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল ও স্থানীয় Bar Associtionএর সভাপতি শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন ঘোষ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রথমে নলিনীবাবু তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। সভাপতি তাঁর সুদীর্ঘ অভিভাষণে হিন্দুসমাজের বিভিন্ন সমস্যার কথা উল্লেখ করেন। সঙ্ঘের অন্যতম সুহৃৎ শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মৌলিক মহাশয় সংক্ষেপে দু' চারিটি কথায় প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের পরিচয় প্রদান করেন। তারপর সঙ্ঘগুরু শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় মহাশয় তাঁহার স্বাভাবিক ওজস্বিনী ভাষায়- ভারতীয় সংস্কৃতিকে ভিত্তি করিয়া জাতিগঠনের বাণী বিবৃত করেন।

সমগ্র ভারতীয় জাতি গড়িবার পূর্ব্বে হিন্দু বাঙ্গালীকে বিশেষভাবে বাঙ্গালী হিন্দুজাতি গড়িবার কাজে আত্ম-নিয়োগ করিতে হইবে। সেজন্য তাহার সংস্কৃতির চারিটি কেন্দ্র হইতে উপকরণ সংগ্রহ প্রয়োজন—নানুর, নবদ্বীপ, হালিসহর ও দক্ষিণেশ্বর। প্রথম দিন মতিবাবু জাতি-গঠনের এই সংস্কৃতিক ভিত্তির কথাই আলোচনা করেন।

দ্বিতীয় দিনের সভাতেও বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল। স্থানীয় মহিলাগণ উভয় দিনের সভাতেই উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম দিনের বক্তৃতায় মতিবাবু তাঁহার বক্তব্যের সূত্রপাত করেন। দ্বিতীয় দিনের বক্তৃতায় তিনি যুক্তি ও দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহার বক্তব্য বিশদ করেন এবং সভাক্ষেত্রে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের একটা কর্ম্মপ্রণালী (programme) উপস্থাপিত করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

"ভারতের যেখানে যত হিন্দু আছে, তাহাদের সংহতিবদ্ধ করার চেষ্টা প্রশংসনীয়। আমরা এই সামান্য লক্ষ্য সিদ্ধ করার জন্য বিশেষ লক্ষ্যরূপে বাংলার হিন্দুকে সর্ব্বাগ্রে ঐক্যবদ্ধ করিব। আমরা বৈদিক সংস্কৃতি সাধনার কয়েকটি শিক্ষানিকেতন গড়িয়া তুলিতে চাই। ইহার মধ্যে একটি হইবে বৈদিক সংস্কৃতির বিশ্ববিদ্যালয়। এই সংস্কৃতি-গৌরব রক্ষা করিতে হইলে, আমাদের রাষ্ট্রীয় মুক্তি স্বাধীনতাও চাই।"

তিস্তাতীরে স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী, ডাঃ তারাপদ সান্যাল, শ্রীমতিলাল রায়, শ্রীমান নীলু ও শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন ঘোষ

দুই দিনের জনসভা ব্যতীত, ২রা চৈত্র তারিখে নলিনীবাবুর গৃহে আহুত একটি ছোট বৈঠকে মতিবাবু স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সহিত দীর্ঘকাল আলোচনা করেন। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের আদর্শ ও অনুসৃত কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে তাঁহাকে বহু প্রশ্ন করা হয়। নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে তিনি প্রত্যেক প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করেন। মতিবাবু একাধারে দার্শনিক ও কর্ম্মী। যুক্তি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বক্তব্য বিশদ করিবার ক্ষমতা তাঁহার অসাধারণ।

তাঁহার বক্তৃতা ও আলোচনা শুনিলে মনে হয়, তিনি এক পরম সত্যের সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, এই সত্যকেই মূর্ত্তি দান করিতে তিনি জীবন-পণ করিয়াছেন। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘই তাঁহার লব্ধ সত্যের প্রথম বিকাশ।

প্রবর্ত্তকের সাধনা ও প্রচারিত আদর্শের মূল্য নিরূপণ করিবার ক্ষমতা ও অধিকার আমাদের নাই। সে সময়ও সম্ভবতঃ উপস্থিত হয় নাই। সে চেষ্টা করিব না।

আজ বাঙ্গালীর, বিশেষভাবে হিন্দু বাঙ্গালীর বড় দুর্দ্দিন। উপস্থিত লাভের দুর্ব্বার লোভ তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। বড় কথা, বড় ভাব, বড় আদর্শ তাহাকে আর করে না। সে অপেক্ষা করিতে চায় না, হাতেহাতে ফল লাভ করিতে চায়। হিন্দু সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করিয়া রাজনৈতিক প্রয়োজনে হিন্দু সংগঠনের কথা আজ মুখে মুখে প্রচারিত। শ্রদ্ধেয় মতিবাবুর বক্তৃতা ও আলোচনার ফলে যদি বাঙ্গালী হিন্দুর দৃষ্টিভঙ্গী কিছুটা পরিবর্ত্তন হয়, তাহা হইলে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের উদ্দেশ্য আংশিক সফল হইবে।

রজত-জয়ন্তী উৎসব শেষ হইয়াছে। প্রবর্ত্তকের বন্ধুগণ বিদায় লইয়া চলিয়া গিয়াছেন। কয়েকদিন একটা ব্যথা হৃদয়-মন আচ্ছন্ন করিয়াছিল।

প্রবর্ত্তকের বন্ধুগণের হস্তে রবীন্দ্র- নাথের কয়েক ছত্র কবিতা উপহার দিয়া আমরাও বিদায় লইলাম।

"কোনোদিন কর্ম্মহীন পূর্ণ অবকাশে
বসন্ত বাতাসে
অতীতের তীর হ'তে যে রাত্রে বহিবে দীর্ঘশ্বাস
ঝরা বকুলের কান্না ব্যথিবে আকাশ,
সেই ক্ষণে খুঁজে দেখো, কিছু মোর পিছে রহিল সে
তোমার প্রাণের প্রান্তে; বিস্মৃত প্রদোষে
হয়তো দিবে সে জ্যোতিঃ,
হয়তো ধরিবে কভু নামহারা স্বপ্নের মুরতি।
পরিবর্ত্তনের স্রোতে আমি যাই ভেসে
কালের যাত্রায়,
হে বন্ধু, বিদায়!"

য় রঙ্গমঞ্চ

শ্রীতারাকিশোর বৰ্দ্ধন

এবার নববর্ষের প্রারম্ভ হইতেই রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চে তৃতীয় অঙ্কের অভিনয় আরম্ভ হইবে। পোলাণ্ডের যুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া ম্যাজিনো লাইন ধ্বংস পর্য্যন্ত এই নাটকের প্রথম অঙ্ক বলা যায়। ফরাসীর পতনের পর হইতে যুগোস্লাভিয়ার অক্ষশক্তিপুঞ্জের আশ্রয় গ্রহণ পর্য্যন্ত উহার দ্বিতীয় অঙ্ক। বৈশাখ মাসের প্রারম্ভ হইতে এই বল্কান ব্যাপার অবলম্বন করিয়া তৃতীয় অঙ্কের অভিনয় আরম্ভ হইবে। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জার্ম্মান সৈন্যদল পোলাণ্ডে প্রবেশ করিয়া দুই সপ্তাহের মধ্যেই উহাকে পর্য্যুদস্ত করিয়া রুশিয়ার সঙ্গে উহাকে ভাগাভাগি করিয়া লয়। তারপর ৮ মাস পর্য্যন্ত যুদ্ধের গতি শিথিলতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। হঠাৎ ১৯৪০ সালের ৯ই এপ্রিল তারিখে জার্ম্মাণীর দুর্জ্জয় রথচক্রে আবার গতি সঞ্চারিত হইয়া দুই মাসের মধ্যেই নরওয়ে, ডেনমার্ক হলাণ্ড, বেলজিয়াম ও ফ্রান্স নিষ্পেষিত করে। বৃটিশ নৌবহরের আক্রমণবেগ বিমানবহর দ্বারা প্রতিহত করিয়া জার্ম্মাণী যেরূপ দ্রুতগতিতে নরওয়ে দখল করে, তাহা রণবিষয়িণী প্রতিভার একটি জলন্ত দৃষ্টান্তস্থল। কিন্তু ইহার পর অল্প সময়ের মধ্যে ফরাসীদেশস্থ মিত্রশক্তিপুঞ্জকে সর্ব্বতোভাবে পরাস্ত করিয়া আধুনিক জার্ম্মাণী যে প্রকার সামরিক শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন দিয়াছে, তাহার তুলনা ইতিহাসে আর নাই।

বল্কানের মানচিত্র

কিন্তু ফরাসীর পরাজয়ের পর হইতে এক বৎসর পর্য্যন্ত জার্ম্মাণ বিজয়াভিযান বিশেষভাবে বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে। আবার এদিকে ফরাসীর পতনের পর ইংলণ্ড অধিকতর পরিমাণে আমেরিকার সাহায্য পাইয়া তাহার নৌবহর ও বিমানবহর এমন ভাবে সাজাইয়াছে যে, উহাতে হিট্‌লারের ইংলণ্ডাক্রমণ পরিকল্পনা প্রতিহত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। দ্বিতীয় অঙ্কের উহাই মূল ঘটনা। সরাসরি ইংলণ্ড আক্রমণ সম্ভব নয় জানিয়াই সম্ভবতঃ হিটলার এখন আটলান্টীক মহাসাগরে সুশৃঙ্খলভাবে ব্রিটিশ জাহাজ ডুবাইবার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাও তাঁহার সমরপরিকল্পনার একটি দিক্ মাত্র। অপর দিকে তিনি পরাজিত ইটালীকে সাহায্য করিয়া বল্কান উপদ্বীপের ভিতর দিয়া পারস্য উপসাগর ও সুয়েজ খাল পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তারে প্রয়াস করিয়াছেন। দ্বিতীয় অঙ্কের আলোচনায় এসব আমরা লক্ষ্য করিব।

ফরাসী গবর্ণমেণ্টের পতনের পর হইতে হিটলার সর্ব্বদাই চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, যাহাতে মার্শেল পেঁত্যার অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট এবং ফরাসী জাতি জার্ম্মাণীর সঙ্গে বিবাদ পরিত্যাগ করিয়া জার্ম্মাণীকে পৃথিবীতে নববিধানপ্রতিষ্ঠার সাহায্য করে। এই চেষ্টায় হিটলারকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছে। অপরপক্ষে মিত্রশক্তিপুঞ্জ ও জেনারেল দ্য গলের সহায়তায় ফরাসী জাতিকে

অবার জার্ম্মাণীর বিপক্ষে সংগ্রাম করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। এই চেষ্টার পরিণতি হয় ডাকারের ঘটনায়। দ্যু গলে ফরাসী আফ্রিকার রাজধানী ডাকারে যাইয়া হানা দেন এবং সেখানের ফরাসী গবর্ণরকে তাঁহার প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিতে আদেশ করেন। কিন্তু ডাকারের গবর্ণর কামান দাগিয়া ইহার উত্তর প্রদান করায়, দ্যু গলেকে হটিয়া আসিতে হয়। মোট কথা, যাবতীয় ফরাসী উপনিবেশগুলির মধ্যে কয়েকটী ক্ষুদ্র জনপদ ব্যতীত আর সমস্তই মার্শাল পেঁত্যার অনুগত এবং নানাপ্রকার কূটনীতিক দখলে আসে।* অন্যদিকে একটী বৃটিশ বাহিনী দুর্ব্বার গতিতে আবিসিনিয়ায় প্রবেশ করিয়াছে। ঐ বাহিনীর সঙ্গে আবিসিনিয়ার ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্ "হাইলে সেলাসি" আছেন। আবিসিনীয়ার প্রজাপুঞ্জ নিশ্চয়ই বৃটিশ বাহিনীর অনুকূল; এজন্য ইটালীর সৈন্য ক্রমশঃ হটিয়া যাইতেছে। বৃটিশ বাহিনী একটা স্বতন্ত্র রণাঙ্গনে বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড পুনরধিকার করিয়া ইতালীর ইরিট্রিয়ারও এক বিস্তৃত অঞ্চল দখল করিয়াছে। তাহা ছাড়া গ্রীসদেশে ইংরাজের সাহায্যে পুষ্ট গ্রীক বাহিনীর নিকট ইটালীয় বাহিনীর বিষম পরাজয় ঘটিয়াছে। গ্রীক বাহিনী

বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ ইডেন

যুগোশ্লাভিয়ার বালক-রাজা পিটার

জাপানী পররাষ্ট্র-সচিব মাৎসুওয়াকা

জয়-পরাজয়ের মধ্য দিয়া ফরাসীর ভিসি গবর্ণমেণ্ট আজও জার্ম্মাণীর অনুকূল ভাবেব নীতি পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। ইহা হইতেছে দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ফরাসীর পতনের পর হইতে আফ্রিকাতে ইটালী ও ইংরাজ বাহিনীর মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছে। প্রথমে ইটালীয় বাহিনী বৃটিশ সোমালীল্যাণ্ড দখল করে। কিন্তু তার পর হইতেই জেনারেল ওয়েভেলের নেতৃত্বে পরিচালিত হইয়া ভারতীয় বাহিনী ও অষ্ট্রেলিয় বাহিনী লিবিয়ার যুদ্ধে ইটালীকে পর্য্যুদস্ত করিয়াছে। টব্রুক ও বেন্‌ঘাজি নামক ইটালীর প্রধান ঘাঁটি দুইটাও ইংরাজদের ইটালীয়গণকে বিতাড়িত করিয়া আলবেনিয়ারও প্রায় অর্দ্ধেক দখল করিয়া বসিয়াছে। ইহাই হইল দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

এদিকে জার্ম্মাণী কূটনীতির দাবা খেলা খেলিতে আরম্ভ করিল। হিটলার ফ্রান্সে যাইয়া মার্শেল পেঁত্যা এবং জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সঙ্গে দেখা করিলেন। রুশিয়ার মলোটফ্‌ ৩২ জন বিশেষজ্ঞ সঙ্গে লইয়া জার্ম্মাণীতে বেড়াইতে আসিলেন। জাপানের সঙ্গে রুশিয়ার মিতালীর চেষ্টা

* এই প্রবন্ধ ছাপা হইবার সময়ে সংবাদ পাওয়া গেল যে জার্ম্মাণ-ইতালীর সম্মিলিত আক্রমণের ফলে বেন্‌ঘাজি হইতে বৃটিশ সৈন্য অপসারিত হইয়াছে।

হইতে লাগিল এবং পারিপার্শ্বিক ঘটনা হইতে ইহা মনে করা অসঙ্গত নয় যে, এসব চেষ্টা বহুল পরিমাণে ফলবতী হইয়াছে। ইতিমধ্যে রুশিয়ার জ্ঞাতসারেই ইটালী, জার্ম্মাণী ও জাপান মিলিয়া একটা ত্রিশক্তি চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। পৃথিবীতে এই ত্রিশক্তির তাঁবেদারীতে নববিধান-প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন লইয়াই এই চুক্তির জন্ম। জাপান পূর্ব্ব এশিয়ায় নববিধান প্রতিষ্ঠা করিবার দায়িত্ব লইয়াছে এবং ইউরোপ-আফ্রিকার নববিধান প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব ভার ইটালী ও জার্ম্মাণীর উপরে পড়িয়াছে। কথার সঙ্গে সঙ্গে কাজ। জার্ম্মাণীর চক্রান্তে রুমানিয়া হইতে বেসারাবিয়া রুশিয়াকে প্রদান করিয়া রুশিয়ার সঙ্গে মিতালী অধিকতর সুপ্রতিষ্ঠিত করা হইল। জাপানও রুশিয়াকে কাঞ্চন-মূল্য প্রদান করিয়া রুশ-জাপ মিতালী পাকাইয়া তুলিবার পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। হাঙ্গেরী, স্লোভাকিয়া, রুমানিয়া ও বুলগেরিয়া ক্রমে ক্রমে ত্রিশক্তি চুক্তিতে সম্মতি জানাইয়া নববিধান মানিয়া লইয়াছে। এদিকে রুশ-জাপ মিতালীকে পাকা বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জাপানী পররাষ্ট্র-সচিব সফরে বাহির হইয়াছেন। তিনি মস্কো হইয়া বার্লিন এবং বার্লিন হইতে রোমে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে পুনরায় বার্লিন হইয়া মস্কোতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। জাপানী পররাষ্ট্র সচিব মাৎসুওয়াকা এই সফরের ফলাফল সম্বন্ধে বিশেষ উৎফুল্ল হইয়া বলিয়াছেন যে, ত্রিশক্তি চুক্তি শতাব্দীকাল স্থায়ী হইবে; যেহেতু ইহা বিশ্বে একটা নবযুগ প্রতিষ্ঠার চুক্তি—সাধারণ চুক্তিমাত্র নহে। বলকান উপদ্বীপে নব বিধানের জন্য আর বাকি রহিল যুগোস্লাভিয়া, গ্রীস ও তুরস্ক। কিন্তু যুগোস্লোভিয়ার ব্যাপারে সম্প্রতি বেশ একটু করুণ রসের সঞ্চার হইয়াছে। প্রথমে যুগোস্লাভিয়ার মন্ত্রিসভা ভিয়েনায় যাইয়া ত্রিশক্তি চুক্তিতে সম্মতিপত্র সই করেন। কিন্তু তার পরদিনই একটা রক্তপাতশূন্য বিপ্লব হয়। তাহার ফলে ১৮ বৎসর বয়স্ক রাজা পিটার স্বহস্তে শাসন-ভার গ্রহণ করেন, সেনাদল তাঁহার বাধ্য থাকে এবং পূর্ব্বতন মন্ত্রিমণ্ডলকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই ব্যাপারকে জার্ম্মাণীর পরাজয় মনে করিয়া মিত্রশক্তিপুঞ্জ উল্লসিত হইয়া পড়েন। এমন কি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও প্রধান মন্ত্রী চার্চ্চহিল যুগোস্লাভিয়ার নূতন গবর্ণমেণ্টকে অভিনন্দিত করেন। অতঃপর প্রকাশ পায় যে, যুগোস্লাভিয়ার বিপ্লব একটা আভ্যন্তরীণ ঘটনা, ইহার দ্বারা যুগোস্লাভিয়ার পররাষ্ট্রনীতির কোনও পরিবর্ত্তন হইবে না। যুগোস্লাভিয়াকে লইয়া একটা রাষ্ট্রনৈতিক বোড়ের খেলা ও তদন্তে জার্ম্মাণীর সামরিক হুমকিও সুরু হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতেই ইহার পরিণাম জানা যাইবে। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, বল্‌কানে গ্রীস ও তুরস্ক বাকী রহিল। কিন্তু গ্রীসে নাকি তিন লক্ষের উপর বৃটিশ সৈন্য মোতায়েন আছে। কূটনীতির খেলায় উহারা বিনা যুদ্ধে হটিয়া আসিবে না। আর তুরস্কও কি বিনা যুদ্ধে এশিয়ার পথ ছাড়িয়া দিবে? বস্তুতঃ এইখানে আগামী বসন্তে নূতন অধ্যায় রচিত হইবে। সুতরাং এই যুগোস্লাভিয়ার ব্যাপার পর্য্যন্ত এই মহানাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্ক শেষ হইল।

হলাণ্ড ও ফরাসীর পতনের পর হইতে জাপানের পররাষ্ট্র নীতিতে পরিবর্ত্তন সূচনা হয়। সে এখন বুঝিতে পারিয়াছে যে, ইন্দোচীন এবং ওলন্দাজ পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কোন শক্তিশালী মালিক নাই। সুতরাং এই সুযোগে ঐ দেশগুলি দখল করার প্রয়োজন। চীনের সঙ্গে যুদ্ধে তাহার ক্ষতিই বেশী হইবে। কারণ চীনের অধিবাসিগণ জাতীয়তাবোধে সঞ্জীবিত। আবার সেখানে উপনিবেশ করিবার মত স্থানাভাব। এজন্য সে চীনের সঙ্গে একটা আপোষ-রফা করিয়া দক্ষিণ সমুদ্রে মনো-নিবেশ করিতে চায়। কিন্তু এই ব্যাপারে ইংলণ্ড ও আমেরিকা তাহার প্রবল প্রতিবাদী। এখন তাহার রাশিয়ার সঙ্গে মিতালীর পালা। তাই পররাষ্ট্রসচিব মস্কোতে দৌড়াইয়াছেন। এবারে জাপানকে তার লভ্যাংশ হইতে বেশ কিছু বখরা না দিলে, রুশ-ভল্লুকের তৃপ্তি হইবে না। যাহা হউক—"সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ" এই সনাতন নীতির অনুসরণ করিয়া চতুর জাপানী এবারে যথাসম্ভব কাঞ্চনমূল্যে রুশিয়ার প্রীতি ক্রয় করিবে। দক্ষিণ সমুদ্রের প্রবল আকর্ষণে জাপান হাইনান দ্বীপে বড় নৌঘাঁটি স্থাপন করিয়া

ইন্দোচীন এবং শ্যামরাজ্যকে জাপানী নববিধান মানিয়া চলিতে বাধ্য করিয়াছে। আর বেশী অগ্রসর হইলেই আমেরিকা ও বৃটেনের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধিবে। ইহাই হইল দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

ফরাসীর পতনের পর এবং বিশেষ করিয়া ডাকারের ঘটনায় জেনারেল দ্যু গলের প্রত্যাবর্ত্তন হইতে আমেরিকার মার্কিণ যুক্তরাজ্য ইংলণ্ডের পরাজয় হইলে আমেরিকাও নাৎসি-কবলিত হইবে, এই দুর্ভাবনায় আতঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন। কারণ আমেরিকা হইতে ডাকারই প্রাচীন গোলার্দ্ধের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী বন্দর। একে তো দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসীর অধিকাংশই স্পেনবংশ-সম্ভূত, তদুপরি উহাদের উপর জার্ম্মাণীর মিত্র জেনারেল ফ্রাঙ্কোর যথেষ্ট প্রভাব, আবার তার উপর যদি ডাকারে শত্রুপক্ষের ঘাঁটি হয়, তাহা হইলে দক্ষিণ আমেরিকার সজ্ঞানে নাৎসী-লোকপ্রাপ্তির বড় বিলম্ব ঘটিবে না। আমেরিকানদের এই আতঙ্কের উপর নির্ভর করিয়াই প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট তৃতীয় বার নির্ব্বাচনে জয়লাভ করিয়া একটী রেকর্ড স্থাপন করিয়াছেন এবং উহারই উপর নির্ভর করিয়া বর্ত্তমানে "Lease and Lend bill" পাশ করাইয়াছেন। এই বিলের মর্ম্ম এই যে, ইংলণ্ডের জয়লাভে পৃথিবীতে গণতন্ত্র ও শান্তির নববিধান প্রতিষ্ঠিত হইবে। আর ডিক্টেটারগণের জয়লাভে মানবজাতির প্রগতি ও স্বাধীনতা ব্যাহত হইবে। সুতরাং ডিক্টেটারগণের জয়লাভের পথে মার্কিণ যুক্তরাজ্য বাধা দিবে। ইংলণ্ডকে উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করাই ফ্যাসিষ্টগণকে বাধা দিবার প্রকৃষ্ট উপায়। ইংলণ্ড তাহার মূল্য দিতে সক্ষম নয়। এজন্য মূল্য-পরিমাণ টাকা তাহাকে ধার দিতে হইবে। কিন্তু বিনা বন্ধকে আমেরিকা ধার দেয় কি করিয়া? অতএব বন্ধক গ্রহণ করিবার জন্য এই "Lease and Lend" বিল। ইহার খাঁটি কথা এই যে, উপযুক্ত পরিমাণ সম্পত্তি বন্ধক দিয়া ইংলণ্ড যে টাকা ঋণ করিবে, সেই অর্থ দ্বারা আমেরিকার তৈরী অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করিতে হইবে। টাকা নগদ পাইবে না। এই বিলের মাহাত্ম্য এখনও প্রকাশ পায় নাই। কোন্ কোন্ সম্পত্তি উত্তমর্ণের নিকট আবদ্ধ থাকিবে, তাহা ঐ সব স্থানের অধিবাসীদের জানিবার চেষ্টা করা বর্ত্তমানে অন্যায় হইবে। এটুকু মাত্র জানা গিয়াছে যে, আমেরিকায় যে সব বৃটিশ ব্যবসায় ছিল, তাহাদের সমবেত মূলধন ২৫ কোটী পাউণ্ড; ঐ ব্যবসায়গুলি প্রথম কিস্তিতে বন্ধক দেওয়া হইয়াছে। পরবর্ত্তী কিস্তিগুলি কি, তাহা ভবিতব্য জানেন। ইহাই হইল দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

এক্ষণে নববর্ষের প্রারম্ভেই আমরা তৃতীয় অঙ্কের প্রত্যাশা করিতেছি। কোন কোন দৃশ্যের অভিনয় হইবে, তাহা এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে হইলেও, জল্পনা-কল্পনার অন্ত নাই। আমরা কোনও প্রকার ভবিষ্যদ্বাণী করিতে চাই না। যুক্তির দিক্ দিয়া বিচার করিলে ভবিষ্যতে কি কি ব্যাপার ঘটা সম্ভবপর তাহারই একটু আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

অদূর ভবিষ্যতে ইংলণ্ডে অভিযান করিবার মতলব জার্ম্মাণীর দেখা যাইতেছে না—যদিও সে এই ইচ্ছা একেবারে পরিত্যাগ করে নাই। এ বৎসরের প্রারম্ভে জার্ম্মাণীর সাবমেরিণ ও তাহার সহায়তাকারী অন্যান্য রণতরী ও বিমানবহর আটলাণ্টিক মহাসাগরে বৃটিশ বাণিজ্যের এবং আমেরিকার সাহায্যের পক্ষে বিষম বিঘ্ন-সৃষ্টি করিবে। নূতন ফরাসী গভর্ণমেণ্ট ও স্পেন এই বিষয়ে জার্ম্মাণীকে সাহায্য করিবার সম্ভাবনা। মার্কিণ যুক্তরাজ্য যুদ্ধে নামিবার জন্য যতই অগ্রসর হইবে, স্পেনের ফ্যাসিষ্ট পার্টি দ্বারা দক্ষিণ আমেরিকায় ততই মার্কিণবিরোধী প্রচার-কার্য্য চালাইবার প্রচেষ্টা জার্ম্মাণী করিবে। ইউরোপ, জাপান, ও দক্ষিণ আমেরিকার ঘটনায় মার্কিণ যুক্তরাজ্যের পক্ষে কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণে বিঘ্ন ও বিলম্ব ঘটিবে।

এবারে ভূমধ্যসাগরে ও প্রশান্ত মহাসাগরেই যুদ্ধের প্রধান পটভূমিকা হইবে। জার্ম্মাণী ছলে, বলে, কৌশলে যে ভাবেই হউক, তুরস্কের ভিতর দিয়া রাস্তা করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। যদি তাহাতে সে সফল হয়, তবে জার্ম্মাণবাহিনী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া, এক শাখা ইরাক ও পারস্যের তৈলের জন্য ও অপর শাখা সুয়েজ প্রণালী অভিমুখে ধাবিত হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্পেন কর্ত্তৃক জিব্রাল্টার অবরুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। এ সব ব্যাপারে যদি তাহারা সফলতা লাভ করিতে

পারে, তাহা হইলে ভূমধ্যসাগরস্থ বৃটিশ নৌবাহিনী একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে এবং ইটালী ও জার্ম্মাণীর আফ্রিকা-জয়ের পথ সুগম হইবে। ইরাক ও পারস্যের তৈলখনি জার্ম্মাণীর অধিকারে গেলেও, বৃটেনের খুব বেশী ক্ষতি হইবে না। কারণ পৃথিবীর পেট্রোলের মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগ উৎপন্ন হয় একমাত্র মার্কিণ যুক্তরাজ্যেই। সেই জন্য আমেরিকার অফুরন্ত সম্পদ্ থাকিতে বৃটেনের এই দিক্ দিয়া কোনও ভয় নাই। ইরাকের পথে জার্ম্মাণীর অগ্রগতি ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর ও পারস্য সাগরের বৃটিশ নৌবাহিনীর দ্বারা অবশ্য ব্যাহত হইবে।

সুদূর প্রাচ্যেও এবারে মহাসমর বিস্তৃত হইয়া পড়িতে পারে। রুশ-জাপান মিতালী স্বাক্ষরিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে জাপান চীনের সঙ্গেও একটা রফা করিবে, এরূপ আভাস পাওয়া যাইতেছে। তাহা সফল হইলে, জাপান আমেরিকার হুমকি অগ্রাহ্য করিয়াও ব্রহ্মদেশ বা সিঙ্গাপুর অথবা পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ আক্রমণ করিতে পারে। জাপান আসরে নামিলে, আমেরিকাও আর বসিয়া থাকিতে পারিবে না। কাজেই এবারে আটলাণ্টিক ও প্রশান্ত উভয় মহাসাগরে এবং ভূমধ্যসাগরে প্রলয়বিষাণ বাজিয়া উঠাও একেবারে অসম্ভব মনে হয় না।*

* এই প্রবন্ধ ছাপা হইবার সময়ে সংবাদ পাওয়া গেল যে, ৬ই এপ্রিল প্রাতঃ ৫।১৫ মিঃ রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চের তৃতীয় অঙ্কের যবনিকা উঠিয়াছে। প্রথম দৃশ্যের স্থান যুগোশ্লাভিয়া ও গ্রীস। উভয় স্থানেই জার্ম্মাণ সৈন্যের যুগপৎ আক্রমণ এবং প্রবেশ।

ছায়া

এস, এ, জাফর

হে আমার ছায়া!
কেন ফের সাথে সাথে?
দুর্য্যোগের ঘনান্ধকার রাতে
বিজুরী-চমকে দেখি আমার পশ্চাতে
নিশ্চিন্ত নীরবে তুমি আছ সাথে সাথে।
কখনো কেটেছে দিন আনন্দ-উচ্ছ্বাসে
ফাল্গুনের কুসুম-সুবাসে
কখনো কেটেছে রাতি অশ্রু-ভরা চোখে
ক্ষীণ, স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না-আলোকে;
কখনো বিজয়ী আমি গর্ব্বোদ্ধত শিরে
বিষাক্ত করেছি রোষে
দিনান্তের প্রশান্ত সমীরে,
ম্লান মুখে শঙ্কিত ধরণী
আমার দুয়ার-প্রান্তে
ভীড় করে' দাঁড়ায়েছে আসি'
বক্র দু'টী মেলিয়া নয়ন
সম্মুখে তাদের
হানিয়াছি উপেক্ষার হাসি।
চক্রের আবর্ত্তনে কভু দিবস শর্ব্বরী
ব্যর্থতার ক্ষুব্ধ আর্ত্তনাদে উঠিয়াছে ভরি'
অনন্ত তিমির-তলে আনন্দের দিনগুলি
রচিয়াছে শ্রান্ত শয়ন,
চূর্ণ আশা গলিয়া দু'ধারে
ভরিয়াছে আমার নয়ন।
বন্ধু, সাথী, প্রিয়জন যত
দূরে গেছে- চলি'
সরমের ছিন্ন ফুল দলি'।
তবু তুমি আছ সাথে সাথে
দিবসের প্রদীপ্ত আলোকে
দুর্দ্দিনের তিমিরাস্তৃত রাতে।
হে বন্ধু, হে অতনু, মৌন সাথী মম
কোন অন্ধ মায়া—
আমাতে মিলাল তব
সৌম্য, প্রিয় কায়া?
অচ্ছেদ্য বন্ধন দিয়ে বাঁধিল নীরবে
এক সূত্রে তোমাতে আমাতে অপূর্ব্ব গৌরবে।

ব্রহ্মসূত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পাদ

শ্রীমতিলাল রায়

প্রথম অধ্যায়ে সৃষ্টির উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ ব্রহ্ম, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং শ্রুতিতে যে সকল মহাবাক্য আছে, সেগুলি সবই যে ব্রহ্মবাচী, তাহাও যুক্তি-সহকারে প্রমাণ করা হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ের শেষে সাংখ্যশাস্ত্রপ্রতিপাদিত প্রধানই সৃষ্টির কারণ বলিয়া উক্ত হওয়ায়, সাংখ্য শাস্ত্রের প্রতি কটাক্ষপাত করা হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্ব কেবলই শ্রুতিপ্রমাণ হইলে, বেদজ্ঞ পণ্ডিত-গণেরই উহা প্রতিপাদ্য হয়। সকলেই বেদজ্ঞ নহেন। এই হেতু ব্রহ্মতত্ত্ব স্মৃতি ও যুক্তিসঙ্গত হওয়ার প্রয়োজন আছে। দ্বিতীয় অধ্যায় এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য বিরচিত হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ের ন্যায় দ্বিতীয় অধ্যায়টীও চারি পাদে বিভক্ত এবং প্রতি পাদে প্রথম কয়েকটী সূত্র অধিকরণ এবং অবশিষ্টগুলি অঙ্গসূত্র মাত্র। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে ১৩টী অধিকরণ-সূত্র আছে; আমরা অতঃপর এইগুলি অবধারণ করার চেষ্টা করিব।

স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্য-
স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ ॥১॥

স্মৃতি (কপিলাদি কৃত স্মৃতিশাস্ত্রের) অনবকাশ (নির্ব্বিষয়ত্ব হেতু) দোষপ্রসঙ্গ (আনর্থক্য অর্থাৎ নিরর্থক হওয়ায় স্মৃতিশাস্ত্রের আনর্থক্য হয়) ইতি চেৎ (এইরূপ যদি বলি) ন (না, তাহা বলিতে পারি না) (এইরূপ হইলে) অন্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ (মন্বাদি-স্মৃতিরও অনবকাশ অর্থাৎ নিরর্থকতা দোষ উপস্থিত হইতে পারে, এই হেতু)

ব্রহ্মকে শ্রুতি জগৎকারণ বলিয়াছেন। সাংখ্যস্মৃতি বলিতেছেন—ব্রহ্ম জগৎকারণ নহেন, প্রধান জগৎকারণ। এই হেতু সাংখ্যস্মৃতি পরিহার্য্য হইতেছে। এইরূপ যদি হয়, সাংখ্যের সহিত অন্যান্য স্মৃতিও কি নাকচ হইয়া যায় না? ব্যাসদেব বলেন—না। পূর্ব্বপক্ষ বলেন—সাংখ্য যে একটি শাস্ত্র, তাহা সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ। কোন শাস্ত্র উপেক্ষা করিয়া বেদান্তব্যাখ্যা সমীচীন নহে; সাংখ্যের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া ব্রহ্মসূত্র রচনা করাই যুক্তিসঙ্গত। বেদব্যাস কেন "না" বলিলেন, তাহার যুক্তি দেখাইতেছেন। সাংখ্য শাস্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া শ্রুতিবাক্যের ব্যাখ্যা করিতে হইলে, অন্যান্য স্মৃতির আনর্থক্য স্বীকার করিতে হইবে। কেন? তাহার প্রমাণ দেখান হইতেছে। সাংখ্য—সৃষ্টির কারণবাদ ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন নাই; কিন্তু অন্যান্য স্মৃতি তাহা করিয়াছেন। মনুসংহিতাও স্মৃতিশাস্ত্র। ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব মনুস্মৃতিতে আছে, যথা—

মহাভূতাদিবৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ।
সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ ॥
অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীর্য্যমপাসৃজৎ ॥

অর্থাৎ সেই তমোভূত অবস্থাকে ধ্বংস করিয়া, মহা-ভূতাদি তত্ত্বে ভগবান প্রবৃত্তবীর্য্য হইলেন।

তিনি স্বকীয় শরীর হইতে বিবিধ প্রজাসৃষ্টি ইচ্ছা করিয়া, চিন্তামাত্রে প্রথমতঃ জলের সৃষ্টি করিলেন এবং তাহাতে আপন শক্তিবীজ অর্পণ করিলেন। আরও আছে—পুরাণ শাস্ত্রে, যথা—

তেজসা যশসা বুদ্ধ্যা শ্রুতেন চ বলেন চ।
জায়স্তে তৎসমাশ্চৈব তানপীহ নিবোধত ॥

অর্থাৎ তিনি তেজঃ, যশঃ, শ্রুতি ও বলের দ্বারা বিভূষিত হইয়া আত্মতুল্য বিবিধ প্রজারূপে সমুৎপন্ন হইলেন। আপস্তম্ভ ঋষি বলিতেছেন—"তস্মাৎ কায়াঃ প্রভবন্তি সর্ব্বে স মূলং শাশ্বতিকঃ স নিত্য ইতি" অর্থাৎ তাঁহা হইতে সকল জীবের জন্ম, তিনি মূল, তিনি শাশ্বত ও নিত্য। শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন—"অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা" অর্থাৎ আমি নিখিল জগতের উৎপত্তি ও লয়ের কারণ। এমন অসংখ্য স্মৃতি ও পুরাণ শাস্ত্রে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ঈশ্বরই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। সাংখ্যস্মৃতির সহিত বেদান্ত-ব্যাখ্যার সামঞ্জস্য করিতে হইলে, এই সকল ঈশ্বরকারণবাদী শাস্ত্রাদির

আনর্থক্যদোষ উপস্থিত হয়। সাংখ্যবাদী কেবল প্রধানকেই সৃষ্টিবাদের কারণ বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই, পরন্তু জীবের নানাত্ব দর্শন করিয়া আত্মভেদে নানা আত্মা স্বীকার করিয়াছেন। ইহা বেদবিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত। শ্রুতির প্রতিধ্বনি ভারতগ্রন্থে সুস্পষ্ট। মহাভারতে পুরুষ এক কি বহু, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে—

মমান্তরাত্মা তব চ যে চান্যে দেহিসংজ্ঞিতাঃ।
সর্ব্বেষাং সাক্ষিভূতোঽসৌ ন গ্রাহ্যঃ কেনচিৎ ক্বচিৎ॥
বিশ্বমূর্দ্ধা বিশ্বভুজো বিশ্বপাদাক্ষিনাসিকঃ।
একশ্চরতি ভূতেষু স্বৈরাচারী যথাসুখম্॥

ইনিই আমার আত্মা, তোমার আত্মা ও অন্যের আত্মা সমস্ত দেহের আত্মা, সকলের সাক্ষী। ইনি কখন কাহারও গোচর নহেন। বিশ্বে তাঁহার মস্তক, তিনি বিশ্ববাহু, বিশ্বপাদ, বিশ্বনেত্র, বিশ্বনাসিক। ইনি এক, যদৃচ্ছবিহারী, সকল ভূতে যথাসুখে বিরাজ করিতেছেন। সাংখ্য ব্যতীত অধিকাংশ শাস্ত্রেই এই একাত্মবাদের প্রচার হইয়াছে, নানাত্মবাদ স্বীকৃত হয় নাই। শ্রুতিও একবাক্যে বলিতেছেন—

যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥

যাহার চিত্তে সমস্ত ভূতে আত্মজ্ঞান জন্মে, সেই একতত্ত্বদর্শীর শোকই বা কি, মোহই বা কি?

এই সকল একাত্মবাদী শ্রুতি ও স্মৃতির বিরুদ্ধবাদ সাংখ্য স্মৃতিতে থাকায় এবং বেদ প্রমাণে উহার নির্ব্বিষয়ত্ব প্রতিপন্ন হওয়ায়, উহার নিরর্থকতা অনিবার্য্য হইয়া পড়িতেছে। এইবার প্রতিপক্ষ বলিবেন—মহর্ষি কপিলকৃত সাংখ্যের প্রতি উপেক্ষা করিয়া বেদান্তবাক্যের ব্যাখ্যায় শ্রুতিকেই প্রকারান্তরে উপেক্ষা করা হয়। কেননা, কপিলাদি ঋষিগণের স্তুতি কেবল স্মৃতিকারগণ করেন নাই, শ্রুতিও করিয়াছেন। শ্রুতি বলিতেছেন—"ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্ব্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ" ইতি

অর্থাৎ প্রথম প্রসূত কপিলকে ঋষি ও জ্ঞানী করিয়াছেন যিনি, সেই ঈশ্বরকে জ্ঞানগোচর করিবে। এই হেতু শ্রুতিপ্রসিদ্ধ এই কপিল-বাক্য অযথার্থ হইবে, ইহা কি সঙ্গত কথা? বিশেষতঃ, সাংখ্য স্মৃতি শুধু বাক্য নহে, যুক্তিসিদ্ধ। বেদান্তবাক্যের ব্যাখ্যা সাংখ্যস্মৃত্যনুসারে হওয়াই উচিত। ইহার প্রথম প্রত্যুত্তর পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ নানাত্মবাদী সাংখ্যবাদ গ্রাহ্য করিতে হইলে, একাত্মবাদী বহু শাস্ত্রের অনবকাশ দোষ উপস্থিত হয়। অতএব—"তস্মাদবিগানাচ্ছ্রৌত এবার্থ আস্থেয়ো ন তু স্মার্ত্তো বিগানাদিতি" অর্থাৎ স্মৃতির মধ্যে বিরোধ যদি হয়, তাহা হইলে একতর গ্রাহ্য ও অন্যতর ত্যাজ্য করিতে হইবে। ইহার মীমাংসাও খুব সহজ—যাহা শ্রুতির অনুগামী, তাহাই গ্রহণীয়। যাহা শ্রুতিবিরুদ্ধ, তাহা অগ্রাহ্য করিতে হইবে। এই ন্যায়ের দ্বারা সাংখ্য স্মৃতি শ্রুতিবিরোধী বলিয়া তাহা বর্জ্জন করিলে, অন্য স্মৃতির অনবকাশ দোষ হইতেই পারে না। আরও প্রমাণ আছে। "বস্তুতস্তু শ্রুতি-স্মৃতি-বিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী" ইত্যাদি। অর্থাৎ যে স্থলে শ্রুতির সহিত স্মৃতির বিরোধ হয়, সেই স্থলে শ্রুতিকেই গরীয়সী করিয়া লইতে হইবে। মীমাংসা-দর্শনের এই অনুশাসনে, সাংখ্য স্মৃতির যে অংশ শ্রুতিবিরুদ্ধ, তাহা আনর্থক্য বশতঃ ত্যাজ্য হইলে, সেই হেতু অন্য স্মৃতিরও আনর্থক্য দোষ হইবে, এমন কি কথা আছে?

আরও কথা আছে—শ্রুতি ও স্মৃতিতে কপিলের প্রশংসা বাক্য আছে, এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য্য। কিন্তু শ্রুতি কোন কপিলের স্তুতি করিয়াছেন, তাহার স্থিরতা কি? কপিল শব্দটী বিশেষ-বাচী নহে। উহা সামান্যবাচী। কোন এক বন্দ্যোপাধ্যায়ের খ্যাতিপ্রকাশ হইলে, বন্দ্যোপাধ্যায়োপাধি সর্ব্বজনের খ্যাতি করা হইল, ইহা ন্যায়সঙ্গত কথা নহে। শ্রুতি এক কপিলের অপ্রতিহত জ্ঞানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। স্মৃতি বাসুদেব নামক অন্য এক কপিলের নাম করিয়াছেন। ইনিই সগরসন্তাননাশী কপিল মুনি। শ্রুতি কপিলের প্রশংসা-বাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন, মনু-মাহাত্ম্যও কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই মনুই আবার কপিলের নিন্দা করিয়াছেন। শ্রুতিখ্যাত কপিলের নিন্দা শ্রুতিখ্যাত মনু যদি করেন, শ্রুতির খ্যাতিবচন মূল্যহীন হয়; অতএব শ্রুতি যে কপিলের প্রশংসা করিয়াছেন, সে কপিল বহুত্ববাদী কপিল নহেন। গীতায় আছে—

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥

সাংখ্যেরা যে স্থান লাভ করেন, যোগীরাও সেই স্থান প্রাপ্ত হন। সাংখ্য ও যোগ যিনি এক করিয়া দেখেন, তিনিই সত্যদর্শী।

এই স্থলে সাংখ্য শব্দের অর্থ জ্ঞান, যোগ শব্দের অর্থ কর্ম্ম। শ্রুতিই কর্ম্ম ও জ্ঞানের প্রসূতি। কর্ম্ম ও জ্ঞানের গতি পরস্পর অম্বিত হইয়া যে গতি লাভ করে, তাহাই গীতার পরম গতি। অতএব সাংখ্যবাদী সর্ব্বক্ষেত্রে বহুত্ববাদী নাও হইতে পারেন। আমরা পুরাণাদিতে এক কপিলের সাক্ষাৎকার পাই। এই কপিল কর্দ্দম ঋষির ঔরসে দেবহুতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি সাংখ্যবাদ প্রচার করেন। সাংখ্য যদি জ্ঞান হয়, তবে এই কপিলদেব স্বতঃসিদ্ধ মহাজ্ঞানী ছিলেন। এই কপিলের কণ্ঠেই ভক্তিযোগ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বৈদিক ও লৌকিক কৃত্যে তাঁহার উক্তিও প্রমাণস্বরূপ গৃহীত হয়। ইনি বেদপ্রচারিত অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বের বিরুদ্ধবাদ প্রচার করেন নাই। এই আদি কপিল এই দেহেই ব্রহ্মলাভের কথা বলিয়াছেন; তাঁহার এইরূপ উক্তিতে প্রমাণিত হয়, দেহ পরিণামী নহে, পরন্তু ব্রহ্মই দেহ-রূপ গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রুতির ব্রহ্ম যে সকলেরই উপাদান কারণ, তাহাই উপরোক্ত বাক্যে প্রমাণিত হয়। এই কপিল-দেবের পিতাও সৎ ও অসতের বিচার দ্বারা স্বয়ং নির্গুণ হইয়া সগুণ ভাবে বিরাজমান ভগবানকে লাভ করিয়াছিলেন। শ্রুতি যে কপিলের প্রশংসা করিয়াছেন, তিনি বৈদিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধবাদী কপিল নহেন। ভারত-সংস্কৃতির মূল কথাই "একং যোবেত্তি পুরুষং তমাহু-র্ব্রহ্মবাদিনম্ ॥" অর্থাৎ যিনি সেই একমাত্র পুরুষকে জ্ঞাত হন, তাঁহাকেই ব্রহ্মবাদী বলা যায়।

অতঃপর কেহ বলিতে পারেন—বেদবাক্য স্মৃতি ও যুক্তিসঙ্গত করিতে গিয়া, ব্রহ্মসূত্রকার সাংখ্যদর্শনকে স্মৃতির পর্য্যায়ভুক্ত কেন করিলেন? স্মৃতি-প্রমাণ সম্বন্ধে এই প্রসিদ্ধ সূত্র আছে—

মন্বন্তরস্যাতীতস্য স্মৃত্বাচারঃ পুনর্জগৌ।
তস্মাৎ স্মার্ত্তঃ স্মৃতো ধর্ম্মো বর্ণাশ্রমবিভাগজঃ ॥

অর্থাৎ পূর্ব্ব মন্বন্তরের আচার স্মরণ করিয়া যাহা উপদিষ্ট হয়, তাহাই স্মার্ত্ত। এই স্মার্ত্ত ধর্ম্ম 'বর্ণাশ্রমবিভাগজঃ'।

সাংখ্য-দর্শন কি এই নিয়মে স্মৃতিশাস্ত্র নামে অভিহিত হইতে পারে? কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যাখ্যা এই কথায় নিবদ্ধ নহে। শ্রুতি নিরপেক্ষ স্বতঃ-প্রমাণ। যাহা পুরুষ-বাক্য ও মূল-সাপেক্ষ কিছুর প্রতীক্ষা রাখে, তাহা স্বতঃ প্রমাণ নহে, পরতঃ প্রমাণ। যাহা পরতঃ প্রমাণ, তাহাও স্মৃতি নামে অভিহিত হয়। একমাত্র শ্রুতি অতীন্দ্রিয়ার্থ জ্ঞানের কারণ। শ্রুতি অপৌরুষেয়। কপিলাদি ঋষি জন্মমৃত্যুর অধীন। তাঁহারা সিদ্ধ, তাঁহাদের জ্ঞানও অনাবৃত; কিন্তু বেদনিরপেক্ষ হইয়া তাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞান সম্ভব নহে। সিদ্ধি বা অপ্রতিহত জ্ঞান ধর্ম্মসাপেক্ষ; ধর্ম্ম বেদপ্রবর্ত্তিত। বেদজ্ঞান, তদর্থের অনুষ্ঠান, তৎপরে সিদ্ধি; অতএব সিদ্ধপুরুষ বা অপ্রতিহত-জ্ঞানীর উক্তি প্রকারান্তরে পরায়ত্ত। এই হেতু ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, গুরু ও শাস্ত্রের সহায়তা অনিবার্য্য হইলেও, উহা যদি শ্রুতিসিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে জ্ঞানান্তরাশ্রয়ে বেদ-প্রতিষ্ঠিত জাতির মধ্যে মতভেদে বুদ্ধিভেদ ও জাতিভেদ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। এইজন্যই ব্রহ্মসূত্র বেদবিমুখ স্মৃতির মত পরিহার করিয়া জাতির মধ্যে ঐক্যসূত্র অচ্ছিন্ন রাখার জন্য একাত্মবাদী শ্রুতির দিকেই ভারতীয় সন্তানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। যে সাংখ্যে ঈশ্বরকে সৃষ্টির উপাদান কারণ বলিয়া স্বীকার না করিয়া মতান্তর কথিত হইয়াছে, সে শাস্ত্র পরিত্যক্ত হইলে পূর্ব্বোক্ত বহু যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঈশ্বর-কারণবাদিনী অন্যান্য স্মৃতির অনবকাশদোষ হইবে না। ইহার অন্য হেতুও আছে।

ইতরেষাঞ্চানুপলব্ধেঃ ॥২॥

ইতরেষাম্ (মহদাদি পরিণামী সাংখ্যতত্ত্ব) অনুপলব্ধেঃ (লোকে বেদে অপ্রসিদ্ধ)

অর্থাৎ সাংখ্যে যে মহদাদি তত্ত্বের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা কি শ্রুতিতে, কি ব্যবহারক্ষেত্রে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত হয় না।

পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে—শ্রুতিতে মহদাদির কথা আছে; কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য সাংখ্যোক্ত মহদাদির

অভিপ্রেত অর্থ নহে। এই সূত্রে ব্যাসদেব সাংখ্য স্মৃতির পরিণামী তত্ত্ববিচার বেদান্তবিচারে অগ্রাহ্য করিয়া, পরসূত্রে বলিতেছেন—

এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ ॥৩॥

এতেন (সাংখ্যস্মৃতি নিরসন করার যুক্তির দ্বারাই) যোগঃ (যোগস্মৃতি) প্রত্যুক্তঃ (প্রতিসিদ্ধ হইতেছে)

বেদে কিন্তু আছে, "শ্রোতব্যো মন্তব্যো 'নিদিধ্যাসিতব্য' ইত্যাদি। অর্থাৎ আত্মদর্শনের জন্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিবে। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে "ত্রিরুন্নতম্ স্থাপ্যং সমং শরীরং" ইত্যাদি অর্থাৎ বক্ষ, গ্রীবা, মস্তক উচ্চ ও সমান রাখিয়া যোগসাধনের উপদেশ আছে। যোগ দ্বারাই আত্মজ্ঞানলাভ হয়। তবে যোগস্মৃতিকে নাকচ করার কি হেতু আছে?

সাংখ্য ও যোগ পরমপুরুষার্থলাভের উপায়—বেদবাক্যের দ্বারাও উহা পরিপুষ্ট; তবুও সাংখ্য ও যোগ নিরাকরণের এই প্রচেষ্টা নিরর্থক নহে কি? ইহার উত্তরে বলা যায়—শ্রুতি যখন বলিতেছেন "ত্বমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেয়নায়—" অর্থাৎ তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যু অতিক্রম করা যায়, অন্য পথ আর নাই। সাংখ্য ও যোগ যেখানে একাত্মদর্শনের পরিপন্থী, সেইখানেই উহা শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিতে হইবে। নতুবা সাংখ্য শব্দের অর্থ জ্ঞান, যোগ শব্দের অর্থ কর্ম্ম—এইরূপ ধারণা করিতে পারিলে, সাংখ্য ও যোগ বেদবহির্ভূত হইতে পারিবে না। যেমন সাংখ্যের পুরুষ নির্গুণ। 'অসঙ্গোহয়ং পুরুষঃ' অর্থাৎ এই পুরুষ অসঙ্গ। যোগও বলিতেছেন "নিবৃত্তিনিষ্ঠত্বং প্রব্রজ্যাদ্যুপদেশেনানুগম্যতে"—নিবৃত্তিনিষ্ঠার উপদেশ শ্রুতিরই অনুগামী। এই সকল অংশ নিরসন করার প্রযত্ন ব্রহ্মসূত্রকার করেন নাই। সাংখ্য ও যোগ স্মৃতির বেদবিরুদ্ধ অংশেরই নিরাকরণ করা হইয়াছে।

সাংখ্য ও যোগ যুক্তি ও অনুভূতিসিদ্ধ, শিষ্টগণ কর্ত্তৃকও গৃহীত। তাহার একাংশ গৃহীত হইবে, অন্যাংশ পরিত্যক্ত হইবে—এমন কথা কি প্রকারে যুক্তিসঙ্গত হয়?

অনুমান হইতেই তর্কের উৎপত্তি। এই তর্কের দ্বারা যাহা উপপত্তি হয় অর্থাৎ কোন এক বিষয়গ্রহণের অনুকূল যুক্তি যদি হয়, তাহাতে ব্রহ্মসূত্রকার আপত্তি করেন না। ব্যাসদেব বলিতেছেন—বেদই যদি প্রতিপাদনীয় হয়, তবে তাহা ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতি ও গুরূপদেশে ভিন্ন ভিন্নরূপে গ্রহণীয় হইলে, একাত্মজ্ঞান অখণ্ডভাবে সর্ব্বজনগ্রাহ্য হইবে না। তত্ত্বজ্ঞান একমাত্র বেদান্তবাক্যের দ্বারাই হইয়া থাকে, এইরূপ প্রত্যয় ব্রহ্মলাভের একমাত্র উপায় বলিয়া শ্রুতি বলিতেছেন—"নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তং, তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" ইত্যাদি অর্থাৎ বেদজ্ঞ না হইলে, বৃহৎকে জানিতে পারে না, আমি তাই উপনিষদুক্ত পুরুষকেই জানিতে ইচ্ছুক। শ্রুত্যুক্ত এই উপদেশ শ্রুতি প্রমাণের দ্বারাই সিদ্ধ হইতে পারে। বাদরায়ণ এইজন্যই ব্রহ্মসূত্রের অবতারণা করিয়াছেন।

ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বঞ্চ শব্দাৎ ॥৪॥

ন (না। কি না?) অস্য (এই জগতের) বিলক্ষণাৎ (ব্রহ্মস্বভাব হইতে বিপরীত) চ (আরও) তথাত্বম্ (ব্রহ্ম ও জগতের বিপরীত ভাব) শব্দাৎ (শ্রুতি হইতেই জানা যায়, এই হেতু)।

ইহার বিশদার্থ—ব্রহ্ম চেতন। জগৎ অচেতন। ইহারা পরস্পর বিপরীতস্বভাববিশিষ্ট। কিন্তু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—ব্রহ্মই জগৎ-কার্য্যের কারণ। এ কথা কেমন করিয়া সঙ্গত হইবে? যে বস্তুর যাহা উপাদান, সে বস্তু তাহার সহিত সমলক্ষণাক্রান্ত হইলে, এই ন্যায়ের দ্বারা ব্রহ্ম যদি জগৎ হইতে বিরুদ্ধলক্ষণযুক্ত হন, তবে সৃষ্টির কারণ ব্রহ্ম, একথা সঙ্গত হইতে পারে না। শ্রুতিই বলিতেছেন—ব্রহ্ম জগৎ-বিলক্ষণ।

জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ ব্রহ্ম, ইহা শ্রুতিপ্রমাণে সিদ্ধ হইয়াছে। স্মৃতির আপত্তিও খণ্ডন করা হইয়াছে। এক্ষণে যুক্তি-সিদ্ধান্ত নিরসন করার চেষ্টা হইতেছে। কোন বিষয়ের নিশ্চয় সিদ্ধান্ত হইলে, সে বিষয় লইয়া তর্ক নিষ্প্রয়োজন হয়। ব্রহ্ম এই হেতু তর্কাদির বিষয় নহেন। কিন্তু যুক্তিবাদী বলিবেন—কোন বস্তুর সিদ্ধান্ত সুনিশ্চিত হইলেও, সেই বস্তু সম্বন্ধে যুক্তির প্রসার না থাকিবে কেন? যুক্তির দ্বারাই আমরা অদৃশ্য পদার্থের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি এবং তাহা দৃষ্টান্তস্বরূপ সর্ব্বজনগ্রাহ্য হয়। শ্রুতি বস্তু-প্রমাণের

এইরূপ সার্ব্বজনীন উপায় নহে। ব্রহ্মবিজ্ঞানের ফল যদি নিঃশ্রেয়স হয়, তবে এই অনুভব সিদ্ধ করার জন্য যুক্তিশাস্ত্রের স্থান অবশ্যই থাকিবে।

শ্রুতিও যখন বলিতেছেন—শ্রবণের পর মনন করিবে, তখন এই মনন অনুমান ব্যতীত আর কি হইতে পারে? অনুমান তর্ক-প্রমাণের অন্তর্গত। প্রকারান্তরে শ্রুতি তর্ক-শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনই করিয়াছেন। ব্যাসদেব স্বয়ং এই হেতু শ্রুত্যুক্ত প্রমাণের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইবার জন্য তর্ক-প্রমাণ প্রত্যাহৃত করিতে পূর্ব্বোক্ত সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন।

ধরিয়া লওয়া হউক—শ্রুতি যে বলিতেছেন, ব্রহ্মই জগতের কারণ, তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে! যেহেতু এখানে কার্য্যকারণ সমলক্ষণযুক্ত নহে, প্রত্যুত বিলক্ষণ। সম-লক্ষণ না হইলে, প্রকৃতি-বিকৃতি-জনিত বৈচিত্র্যসৃষ্টি সম্ভব নহে। কলসী ও মৃত্তিকার সমলক্ষণতা প্রযুক্ত মৃত্তিকার পরিণামে কলসীরূপ বিকৃতি দেখা যায়। পক্ষান্তরে মৃত্তিকা ও সুবর্ণবলয়ের প্রকৃতি-বিকৃতিভাব থাকিতেই পারে না। ব্রহ্ম যদি শুদ্ধ ও চেতন হয়, জগৎ অচেতন ও অশুদ্ধ—এইরূপ হইলে প্রকৃতি-বিকৃতি-ভাবসৃষ্টি কি করিয়া হইতে পারে? অতএব জগৎ ব্রহ্মলক্ষণবর্জ্জিত; এই হেতু ব্রহ্ম জগতের কারণ নহেন।

এই যুক্তি খণ্ডন করার জন্য অনেকে শ্রুতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। লোষ্ট্র-কাষ্ঠাদি অচেতন, কিন্তু উহার মধ্যেও অল্লাধিক চৈতন্য অব্যক্ত আছে। শ্রুতিই বলিয়াছেন—"মৃদব্রবীদাপোঽব্রুবন্নিতি" ইত্যাদি অর্থাৎ মৃত্তিকা বলিয়াছিল, জল বলিয়াছিল প্রভৃতি। এমন কি ইন্দ্রিয়াদিও কলহ করিয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইল—তাহারা তাঁহাকে বলিল—সাম গান কর প্রভৃতি। এই প্রমাণের দ্বারা জগৎ ও ব্রহ্মের বৈলক্ষণ্য দূর হইতেছে। ব্যাসদেব বলিতেছেন—না, এইরূপ নহে। 'তথাত্বংচ শব্দাৎ'—ব্রহ্ম জগৎ হইতে বিলক্ষণ, এ কথা শ্রুতিতে আছে।

অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্ ॥৫॥

তু-শব্দ (পূর্ব্ব প্রকার আশঙ্কা নিরাকরণ করিতেছে), অভিমানিব্যপদেশ (মৃত্তিকা বলিল, এইরূপ কথা তদভিমানী দেবতারই প্রতি বলা হইয়াছে) বিশেষ অনুগতিভ্যাং বিশেষ ও অনুগতির দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে।

কৌশিতকী ব্রাহ্মণে স্পষ্টরূপেই বলা হইয়াছে—বিবদমান প্রাণ অথবা মৃত্তিকা, জল প্রভৃতি চেতনঘটিত হইয়াই ঐরূপ উক্তি সম্ভব করিয়াছে। "দেবতাগণের বিশেষণে বিশেষিত এই অচেতন জগৎ"—এই উক্তির দ্বারাই জগতের চেতনত্ব নিবারিত হয়। মন্ত্র, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতিতে দেখা যায়, সর্ব্বত্র অভিমানিনী চেতনদেবতার অনুগতি। মৃত্তিকা কহিল, প্রাণ কহিল—একথা জড়ের নহে, দেবতার বিশেষণে বিশেষিত চৈতন্যের ইহা অভি-ব্যক্তি। শ্রুতি বলিতেছেন "অগ্নির্ব্বাগ্ভূত্বামুখংপ্রাবিশৎ" অগ্নি বাক্ হইয়া মুখে প্রবিষ্ট হইলেন। এইরূপ শ্রুতিবচনের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়, প্রত্যেক জড় বস্তুর অনুগ্রাহিক এক এক দেবতা আছেন। শ্রুতিতে এইরূপ ব্যপদেশ থাকায়, স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, জগৎ ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ। জগদ্বস্তু চৈতন্যে বিশেষিত ও অনুগতি পাইয়া চেতনবৎ প্রতীত হয়। পূর্ব্বপক্ষের এখনও কথা আছে। তাঁহারা বলিবেন—জগদ্বস্তু ব্রহ্ম-লক্ষণ না হওয়ায়, উহা ব্রহ্ম-প্রভব নহে; বলয় স্বর্ণ হইতে বিলক্ষণ হইলে, উহা-দ্বারা বলয় হইতে পারে না। তাহার সমাধান হইতেছে—

দৃশ্যতে তু ॥৬॥

তু (তু-শব্দ পূর্ব্বপক্ষের যুক্তিখণ্ডনের জন্য প্রয়োগ করা হইয়াছে) দৃশ্যতে (দেখা যায়।) (কি দেখা যায়?) অর্থাৎ চেতন চেতনেরই উৎপাদক, এই নিয়ম ঐকান্তিক নহে। ইহার অন্যথাও হইয়া থাকে। যেমন মনুষ্য চেতন বস্তু, তৎপ্রভব কেশ ও নখাদি অচেতন। আবার গোময় অচেতন পদার্থ, তৎপ্রভব বৃশ্চিকাদি চেতন। এই দৃষ্টান্তের দ্বারা কার্য্য ও কারণের বৈলক্ষণ্য ঠিক নিরাকরণ হয় না; কেননা কেশ ও বৃশ্চিক, মনুষ্য ও গোময়ের মধ্যে যে বিসদৃশ পার্থক্য দেখান হইয়াছে—তাহা কতখানি সত্য তাহা বিচার্য্য। আসলে মনুষ্যদেহটা চেতন নহে, অচেতন; অতএব অচেতন পদার্থ হইতে অচেতন কেশাদির উৎপত্তি; পরন্তু চৈতন হইতে অচেতন হয় নাই। গোময়ও অচেতন বস্তু, উহা হইতে অচেতন

বৃশ্চিক-দেহই উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্ব পক্ষের এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে বলা যায়, অচেতন মনুষ্যদেহ হইতে অচেতন কেশ-নখাদি না হয় উৎপন্ন হইল, অচেতন গোময় হইতে এইরূপ অচেতন বৃশ্চিক-দেহ জন্মিলে কথা থাকিত না; কিন্তু বৃশ্চিকের সবখানি অচেতন নহে। তাহার কতকটা চেতন বস্তুও বটে। এক অচেতন হইতে এমন বস্তু জন্মিবে, যাহার কতকটা চেতন, কতকটা অচেতন, এমন কথা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। অতএব গোময় ও বৃশ্চিক পরস্পর অতিশয় বিলক্ষণ হওয়া সত্বেও ইহাদের মধ্যে কার্য্য-কারন সম্বন্ধ থাকায়, চেতন ব্রহ্ম অচেতন জগতের কারণ হইতে পারে—উপরোক্ত দৃষ্টান্তে তাহাই প্রমাণিত হইল।

বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকেরা বলিবেন—গোময় হইতে বৃশ্চিক হয় না। ইহার প্রমাণ, কতকটা গোময় যদি বায়ুনিরুদ্ধ স্থানে রক্ষা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, উহা হইতে বৃশ্চিক উৎপন্ন হইবে না। অতএব গোময় হইতে বৃশ্চিক জন্মে না; উহার বীজ বাহির হইতে বায়ুযোগে গোময়ে অনুপ্রবিষ্ট হইলে, বৃশ্চিকের জন্ম সম্ভব হয়।

এই যুক্তিতে অচেতন হইতে চেতন বৃশ্চিকের জন্ম রহিত হইল না। বায়ুও চেতন পদার্থ নহে এবং বায়ু যে বৃশ্চিকের চেতন বীর্য্য আনয়ন করে ইহা বৈজ্ঞানিকের অনুমাণ ব্যতীত দৃষ্টান্ত প্রমাণ আছে কি? তদ্ব্যতীত মনুষ্যশুক্র অচেতন গোময়স্তূপে নিহিত হইলে, উহা হইতে কি মনুষ্যসৃষ্টি হয়? বৃশ্চিক প্রাচীন প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌দের নিকট জরায়ুজ বীজের ন্যায় জীবস্ত নহে। উহা স্বেদজ। চতুর্ব্বিধ প্রজার মধ্যে ইহার স্থান প্রাচীন ঋষিরা এইরূপই স্থির করিয়াছেন। গোময় ব্যতীত বৃশ্চিক কুত্রাপি জন্মে না। কাষ্ঠে ঘুণ, দ্রুমে নীল মক্ষিকা, কেশে যুকের ন্যায় "বৃশ্চিকাঃ শুষ্ক গোময়াৎ।" অবশ্য ব্রহ্মসত্তা সর্ব্বত্র বিদ্যমান। এই সত্তার আশ্রয়ে জাড্যগুণসম্পন্ন বস্তুসৃষ্টি অসম্ভব নহে। কুতর্ক-নিবারণের জন্য এই সকল কথা বলা হইল। পরন্তু—ব্রহ্মবস্তু প্রমাণের দ্বারা অনুভব করা যায় না। ব্রহ্ম নিষ্পাদ্য বস্তু নহেন। তাঁহার রূপাদি, লিঙ্গাদি কিছুই নাই। শ্রুতিই তাঁহার একমাত্র প্রমাণ। এই কথা শ্রুতি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। যথা—

"নৈষা তর্কেণ মতিরপনেয়া
প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ
কোঽদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ
ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব"

অর্থাৎ এই মতি অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান তর্কের দ্বারা বাধিত করিতে নাই। নিজ বুদ্ধিতেও উৎপাদিত করিতে নাই। ইহা অন্য কর্ত্তৃক অর্থাৎ বেদতত্ত্বজ্ঞ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইলে, তবেই ফলবতী হয়। যাহা হইতে বিচিত্র সৃষ্টি হইয়াছে, কে তাহাকে বুঝাইয়া দিবে? কে তাহাকে বলিবে? এমন ব্যক্তি কে আছে?

আরও বলা হইয়াছে, তিনি চিন্তার অতীত, তর্কের অতীত। অচিন্ত্যত্বই সেই বস্তুর লক্ষণ।

পরিশেষে, শ্রবণ ও মননের সার্থকতা স্বীকার করিয়া অথচ যুক্তির অপ্রয়োজনীয়তা বলায়, শ্রুতি কি অসঙ্গতিদোষ-দুষ্ট হইতেছে না? না, উপরোক্ত কথায় যুক্তিকে অগ্রাহ্য করা হয় নাই। শ্রুতি যখন ব্রহ্মানুভূতির এক মাত্র কারণ, সেই শ্রুতি খণ্ডন করার জন্য যে কুতর্ক, তাহাই পরিহার করার কথা বলা হইয়াছে; কিন্তু শ্রুতির অনুগামী যুক্তিও আছে। শ্রুতি-সমর্থিত অর্থের প্রতিষ্ঠার জন্য অনুকূল যুক্তির আশ্রয় লইতে হইবে। শ্রুতিবিরুদ্ধ তর্ক, তাহা শ্রুত্যুক্ত সিদ্ধান্তের অনুকূল কোন কালে হইতে পারে না। শ্রুতিবচনখণ্ডনপ্রচেষ্টায় আততায়ীর তর্কশাস্ত্র ব্রহ্মবাদী কি হেতু বহন করিবেন?

পরস্পর সমলক্ষণ নহে বলিয়া প্রকৃতি-বিকৃতি-ভাবের অভাবে ব্রহ্ম জগৎকারণ নহেন, পূর্ব্ব পক্ষের এই মত বৃশ্চিকের দৃষ্টান্তে নিরসিত হইয়াছে। চেতন ও অচেতন সর্ব্ব বস্তুর উপাদান ব্রহ্ম, ব্রহ্মসত্তার শাশ্বত স্বভাবের উপর আকাশাদি যাবতীয় পদার্থসমন্বিত অচেতন জগৎ চেতন ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, ইহাই প্রমাণিত হইল।

শ্যামাচরণের অঙ্গুষ্ঠ

শ্রীজগদীশ গুপ্ত

জ্ঞানী বলিয়া বিশ্বাসভাজন এবং সজ্জন বলিয়া শ্রদ্ধাভাজন এবং সংযমী বলিয়া ঈর্ষ্যাভাজন অনেকে বলিয়া থাকেন যে, মানুষ পরস্পরকে নিরন্তর বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করিতেছে—মনে মনে এবং কার্য্যতঃ। তাঁহারা আরও বলেন যে, ঐ কাজটির হেতুর যেমন ইয়ত্তা নাই, তেম্‌নি নাই তাহাতে ছোট-বড় বিচার।

কমলাকান্ত দুধ খাইয়া প্রসন্ন গোয়ালিনীকে উহাই দেখাইত; মার্জ্জার দুগ্ধ এবং মৎস্য চুরি করিয়া খাইয়া মানুষকে উহাই দেখায়; বৃষ গুঁতাইতে আসিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারীকে পশ্চাৎ দিক্ হইতে দেখায় উহাই···

মানুষ অবিরাম উহাই দেখিতেছে এবং দেখাইতেছে। উহা দেখাইবার কারণ প্রধানতঃ এই: লোকে ও-পক্ষকে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ করিয়া জানাইতে চায়, তোমাকে গ্রাহ্য করি না; তোমাকে ফাঁকি দিলাম; তুমি আমার সঙ্গে মুখের কি গায়ের জোরে পারিলে না!

হাতের ঐ আঙুলটি সম্মুখে তুলিয়া ধরিলে, মানুষের রাগ করিবার কারণ উহা, অর্থাৎ অবজ্ঞা প্রভৃতি ছাড়া আরও আছে। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, সকল আঙুলের চাইতে ঐ আঙুলটি দেখিতে খারাপ, খাটো এবং মোটা, এবং ঠিক সরল নয়। ঐ কদর্য্যতায় মানুষের রাগ আরও বাড়ে। পুনরায় লক্ষ্য করিলে, ইহাও দেখা যাইবে যে, ঐ আঙুলটাকে একেবারে স্বতন্ত্র করিয়া তুলিয়া ধরা এবং হঠাৎ প্রাধান্য দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ প্রক্রিয়া। কাজেই লোকে মনের ভাবপ্রকাশের আর ভাবচালনার অনায়াসসাধ্য উপায় হিসাবে ঐ অঙ্গুলির উত্তোলন অর্থপূর্ণ এবং অভ্যস্ত করিয়া লইয়াছে। বাঁ হাতের ঐ আঙুলটি ব্যঞ্জনার দিক্ দিয়া আরও তীব্র—এক জোড়া আরও বলবৎ, আরও গুরু। তবে মনে মনে উহা দেখানো পৃথক্ এবং গভীরতর ব্যাপার।

কিন্তু শ্যামাচরণ বিশেষ কাহাকেও উদ্দেশ না করিয়া বাঁ হাতের এবং ডা'ন হাতের, অর্থাৎ একজোড়া, বৃদ্ধাঙ্গুলি যুগপৎ কেন দেখাইয়া গেল তাহা ভাবিবার বিষয়।

পঞ্চাশের পরই বনে যাওয়ার, অর্থাৎ সংসারকে অঙ্গুষ্ঠপ্রদর্শনের একটা অনুজ্ঞা আছে; কিন্তু দেখা যায়, সে-অনুজ্ঞা এখন কেহ মানে না। তরঙ্গিনী নাম্নী যে-রমণী যৌবনে রূপের ছটায় উদ্যান আলোকিত করিয়া পুষ্পচয়ন করিত, সে বর্ত্তমানে গলিত কেশদন্ত আর লোল চর্ম্মে কুরূপা হইয়াছে বলিয়া এই সংসারই, অর্থাৎ জনপদসমূহ অরণ্য হইয়া উঠিয়াছে; অতএব গৃহে বাস অরণ্যে বাসের মতই, ইহা সত্য নহে—লোকে তা' মনে করে না—অতটা ভাবারোপণ আজকাল প্রচলিত নাই। সুমিষ্ট ফলে মূলে সমৃদ্ধ বাসের উপযুক্ত বন এখন নাই, এবং বনের কথা মনেই পড়ে না, ইহাও সত্য নহে। ঋণের দরুণ উৎসন্নের উপক্রম হইলে, এবং অক্ষমতার দরুণ স্ত্রীর ভর্ৎসনায় বিষের আগে বনের কথা অবশ্যই মনে পড়ে; কিন্তু অনভিজ্ঞ বা নাবালক পুত্রের হাতে সংসারের আর ভবিষ্যতের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে বনগমন কখনই সম্ভব হয় না—

কেহ বলে, সুদিন আসিবেই; ছেলেরা মানুষ হউক, তখন সবাইকে অঙ্গুষ্ঠ দেখাইব···

কেহ বলে, ভগবান্ আছেন; তিনি সদয় হইলেই প্রচুর বৃষ্টিপাত হইবে—প্রজারা খাজানা মিটাইয়া দিবে—তখন দেখাইব অঙ্গুষ্ঠ সবাইকে।

ইত্যাদি প্রকারে অঙ্গুষ্ঠ দেখিতে দেখিতে অঙ্গুষ্ঠ দেখাইবার আয়োজন চলিতে থাকে···

কিন্তু কাহাকেও অপদস্থ না করিয়াও শ্যামাচরণ কি মনে করিয়া যুগল অঙ্গুষ্ঠ দেখাইল, তাহা জানি না; তবে ঘটনা এই:

শ্যামাচরণের বয়স একদিন পঞ্চাশ পার হইয়া একান্ন হইল। এই বয়সই বনে যাওয়ার বয়স, এবং সেই কারণেই মানুষের বনে যাওয়ার কথা উঠিয়াছিল। কিন্তু শ্যামাচরণের সে-উদ্যম দেখা দেয় নাই—সে আকাঙ্ক্ষাই তার জন্মে নাই। ছেলেরা একদিন মানুষ, অর্থাৎ লায়েক হইবে, এবং প্রচুর বৃষ্টিপাতের পর প্রজারা খাজানা মিটাইয়া দিবে, সম্ভবতঃ এই আশা লইয়া সে গৃহেই আছে··· তরঙ্গিনী বৃদ্ধা হইয়াছে কি না, তাহা সে জানেই না।

গৃহে সে কুশলে নাই—তার অকুশলের প্রধানতম কারণ তার আর্থিক অবস্থা, তা' আদৌ ভাল নয়।

ওদের পারিবারিক পূর্ব্বাবস্থার কিয়দংশ এইরূপ :

দু' ভাইয়ের শ্যামাচরণ জ্যেষ্ঠ। কনিষ্ঠ রাধাচরণ বিদেশে থাকে; সে রোজগার করে প্রচুর, এবং সে বলে, তার ব্যয়ও প্রচুর।

দু'ভাই একান্নেই ছিল, এবং আছে; কিন্তু তাদের একান্নবর্ত্তিতার তেমন অনুভবযোগ্য মানে দাঁড়ায় নাই। ঘর-বাড়ী, জমি-জায়গা, হাঁড়ী-কড়াই, বাসন-বিছানা, বাঁশের ঝাড় আর আম-তেঁতুলের গাছ প্রভৃতি পৈতৃক সম্পত্তিসমূহ লোকজনের সাক্ষাতে এবং সালিসীতে এবং ঘোষণাপূর্ব্বক এবং একটা মেজাজের উপর ভাগাভাগি করিয়া লওয়াই তা'ই-, যার নাম ভাইয়ে ভাইয়ে পৃথক্ হওয়া। কিন্তু এরা তেমন ভাবে পৃথক্ হয় নাই; এবং সেই কারণেই প্রশংসার সহিত বলা হয়, দু'ভাই একান্নেই আছে।

দুই ভাই পৃথক্ হওয়ার পর একই স্থানে পাশাপাশি হইয়া বাস করিলে, পৃথক্ হওয়াটা তাৎপর্য্যযুক্ত বাস্তব হইয়া ওঠে; কিন্তু এক ভাই দ্বিতীয় ভাইকে যথাসর্ব্বস্বের মালিক করিয়া দিয়া যদি সরিয়া যায়, এবং যদি গরজ বা প্রেমের অভাবে আসিবার আগ্রহ না দেখায়, তবে তাহাই হয় অঙ্গুষ্ঠ দেখাইবার মত, এবং পৃথগন্নের পার্থক্য লক্ষিতই হয় না।

রাধাচরণ পৈতৃক ভবনে দাদার কাছে আগে আসিত—তারপর ঘটনাগতিকে ক্রমশঃ ছাড়িয়া দিয়াছে···

ওদের যথাসর্ব্বস্ব অর্থাৎ পৈতৃক সম্পত্তি বলিতে যা' লোকের নজরে পড়ে, তা' হইতেছে দু'খানা টিনের ঘর, বিঘাকতক জমি, ঘরকতক প্রজা···

আর শ্যামাচরণের নিজের অর্জ্জিত সম্পদ্ হইতেছে চাকুরিটি—তার ঐ চাকুরির, স্কুল-মাষ্টারীর, ন্যায্য আয় মাসিক ৪৫৲ টাকা। পৈতৃক সম্পত্তির প্রতি রাধাচরণ নিশ্চয়ই লোভ করিত, অর্থাৎ অবলম্বন হিসাবে তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিত, যদি তাহাকেও অনন্যোপায় হইয়া বাড়ীতেই থাকিতে হইত : কিন্তু সে থাকে বিদেশে—চা'ল ডা'ল কিনিয়া খায় সেখানকার; আর, বাকি খাজানা সম্পূর্ণ আদায় হইলেও, তার অর্দ্ধাংশে রাধাচরণের ধোপার খরচই হয় না।

রাধাচরণ চিরকালই প্রবাসমুখী, বিদেশপ্রিয়—

বলিত, বিদেশে বাহির না হইলে, মানুষের ষোল আনা চৈতন্যই ফোটে না—নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বুঝিবার ও খেলাইবার অবসর হয় না; বুদ্ধির বিকাশ ঘটে না—আর, প্রতিযোগিতাহীন নির্জ্জীব কর্ম্ম সঙ্কীর্ণ স্থানের ভিতর মানুষকে অত্যন্ত গতরপোষা, দৃষ্টিহীন, অসার আর অক্ষম করিয়া রাখে। বিদেশে বিভুঁইয়ে লোকের আত্মনির্ভরতা আর সমবোধ বাড়ে—প্রতিষ্ঠালাভের উদ্যম এবং বিদেশীর নিকট হইতে শ্রদ্ধালাভের আকাঙ্ক্ষা আসে—মানুষ অনেকটা নিঃস্বার্থভাবেও কাজ করিতে প্রলুব্ধ হয়। বাংলার বাহিরে অনেক বাঙালী যে অতুলনীয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন এবং স্মরণীয় হইয়াছেন, তাহার কারণই ঐ···

ঐ সব কথা এবং আর অনেক কথা বলিয়া, আর, অনেক অমূল্য সুযোগের উল্লেখ করিয়া আর শ্রীবৃদ্ধির সুরম্য চিত্র বর্ণনা করিয়া রাধাচরণ তার দাদাকে বিদেশে যাইতে পরামর্শ দিত···

বলিত, আমাকে এখানকার স্কুলেই একটা মাষ্টারী নিতে বল্‌ছে, কিন্তু আমি নেবো না।

শ্যামাচরণ বলিত, সবই সত্যি; কিন্তু আমার উপায় নেই যে! পৈতৃক সম্পত্তি ফেলে দিতে পারি নে!

—কিন্তু চিরদিন যদি এম্‌নি না যায়। এখানে স্কুল-মাষ্টারীতে কি উন্নতি আশা কর?

শ্যামাচরণের হিসাব করাই থাকে—একদিকে ভূমির দান এবং আদায়ী খাজানার পরিমাণ, আর মাষ্টারীর বেতন এবং অন্যদিকে খরচ কত···

বলিত, চলে' যাবে।

এ কথা অনেকদিন আগেকার; কিন্তু মনে আছে সবারই—অদৃষ্টের ক্রূরতায় এখন তা' অগ্রতম আর উগ্রতম হইয়া খুব মনে পড়ে। তখন শ্যামাচরণ পৈতৃক সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া বিদেশে চলিয়া গেলে কি ঘটিত, সুবর্ণ সুযোগে সুবর্ণ সুলভ হইয়া উঠিত কি না, তাহা

কেহই বলিতে পারে না; কিন্তু বিদেশে রাধাচরণের দিব্য উল্লাসের সহিত চমৎকার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে।···

তা' ছাড়া, শ্যামাচরণের এমন যে প্রিয় পৈতৃক সম্পত্তি, তাহাই রক্ষণাবেক্ষণ করিতে করিতে ক্রমশঃ দেখা গেল ক্লান্তি আসিতেছে, রক্ষণ এবং বীক্ষণ অত্যন্ত অকারণ হইয়া উঠিতেছে—ভূমিতে ফসলোৎপত্তি এবং ভাগী চাষীর সাধুতা দিন দিনই এমন দ্রুতগতি হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে যে, ভাবিতে প্রাণে ঘা লাগে; খাজানা আদায় করিবার উদ্যোগেই দেখা যায়, নগদ পয়সার চাইতে সাম্‌নে বাক্যের ঝুরি আর চোখের জলই নামে বেশী। থোক টাকা হাতে আসে মাস কাবারে স্কুল হইতে; কিন্তু অধুনা স্কুলের অবস্থা ভূমির মতই—আকাঙ্ক্ষিত দানের প্রতিটি কিস্তিই মুষ্টিমেয়; বেতনের সমগ্র টাকাটা হাতে পাইতে সময়ে সময়ে এত সবুর সহিয়া থাকিতে হয় যে, ধৈর্য্যে কুলায় না—হাত খালি হইয়া অবস্থা সঙ্গিন হইয়া ওঠে···

পূজায় রাধাচরণের একমাস ছুটি, তখনও, এখনও। আগে সে সেই ছুটির সময়ে বাড়ীতে আসিত। ঐ এক মাসের সাংসারিক খরচ অনেকটা সে-ই চালাইত—নূতন কাপড়-জামা-জুতাও বিতরণ করিত, সার্ব্বজনীনভাবে নয়, ভাইপো আর ভাইঝিদের ভিতর। সঙ্গতিসম্পন্ন খুড়া মহাশয় ভ্রাতুষ্পুত্রকন্যাগণকে পূজায় নূতন কাপড় জামা আর জুতা দেন, ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে; খুব একটা প্রশংসার বিষয়ও নহে; কিন্তু উহারই মধ্যে একটা ব্যাপার ঘটিয়া গেল—শ্যামাচরণের স্ত্রী মহামায়া পরপর তিন বারই লক্ষ্য করিল যে, কাপড়-জামা-জুতা তাঁর ছেলেমেয়ের জন্য যা' আনা হয়, তা নূতনই বটে, কিন্তু নিকৃষ্ট। এরূপ স্থলে ঐ ইতরবিশেষ কেবল লক্ষ্য করাই চলে—তার দরুণ অতিশয় মন খারাপ করাও চলে, কিন্তু তার প্রতিবাদ করা চলে না; তুল্য মূল্যের হইলে মনে করা যায়, অকৃত্রিম স্নেহের দান—বেশী মূল্যের হইলে মনে করা যায়, অতুল স্নেহের দান, অল্প মূল্যের হইলে মনে হয়, কপট স্নেহের দান—কিছু উপহার দিয়া কেবল চক্ষুলজ্জা কাটানো—সে দেওয়ায় স্নেহের চাইতে অনুগ্রহের ভাবটাই যেন বেশী। শ্যামাচরণ দরিদ্র, রাধাচরণ অর্থবান্; অবস্থার ঐ তারতম্যের দরুণই মহামায়ার মন একটু বেশী বাঁকিয়া গেল; তার মনে হইল, রাধাচরণ যেন পুনঃপুনঃই জানাইতে চায়, দরিদ্রের নিজের পছন্দ-মত কাঁড়া-আকাঁড়া বাছা অন্যায়—আকাঁড়া চা'ল দেখিয়া তার ক্ষুণ্ণ হইবার কারণ নাই—শূন্য ঝুলির ভিতর যাহা দেওয়া হয়, তাহাই উহাদের শিরোধার্য্য অর্থাৎ মহামায়া দেবর রাধাচরণের একটি অঙ্গুষ্ঠ লক্ষ্য করিল···

মহামায়া ব্যাপারটাকে ঐ ভাবে লইল; এবং রাধাচরণ প্রভৃতি চলিয়া গেলে, সে স্বামীকে জানাইল অঙ্গুষ্ঠের কথা নয়, কাপড়-জামা-জুতার বিষয়টা··

শ্যামাচরণ তা' তিন বারের একবারও একটুও লক্ষ্য করে নাই—শুনিয়া সে বিস্মিত এবং বিষণ্ণ হইল; দরিদ্র বলিয়াই সে আঘাত অনুভব করিল বেশী···ক্ষুধার মত দরিদ্রের প্রেমাভিলাষও অধিকতর সতেজ—সম্বিৎ ও মর্য্যাদা-জ্ঞান অত্যন্ত সজাগ, অসহিষ্ণু আর তীক্ষ্ণ। কিন্তু নিজের ক্ষোভ সে প্রকাশ করিল না; স্ত্রীর মর্ম্মবেদনা দূর করিবার অভিপ্রায়ে সে হাসিয়া বলিল, তুমি হয়তো ভুল করেছ···

মহামায়া বলিল, এত ভূত দেখা নয় যে, কি দেখতে কি দেখেছি বল্‌বে!

—সত্যিই যদি তা' হয়, তবে তার অন্য কারণও থাকতে পারে—হয়তো টাকায় কুলায় নাই।

—তা' ত' হ'তেই পারে; একবার, দু'বার, তিন বারও তা' হ'তে পারে। বলিয়া মহামায়া একটু হাসিল।··· অসম্ভব কিছুই নয়; আর, অনেক কাজের একমাত্র কারণটি চিরকাল লুকানোই থাকে; কিন্তু প্রেমপ্রকাশে কুণ্ঠার সহজ প্রমাণ পাইয়া কেহ গভীর কারণ অনুসন্ধান, অর্থাৎ কল্পনা, করিতে বসে না।

মহামায়া খেদ করিতে আসিয়া হঠাৎ শিক্ষা পাইয়া গেল—শ্যামাচরণ বলিয়া দিল, এ-সব কথা আমাকে না জানানোই ভাল।

মহামায়া শিক্ষা পাইয়া স্বামীকে আর কিছুই জানাইল না; জানাইল না যে, জ্যেঠামহাশয়ের কালচিটে-পড়া

জামা, খোঁচাখোঁচা দাড়ি, চাদরের অভাবে অব্যবহার্য্য কাঁড়পাতা বিছানা, এবং ঐ রকম আরও অনেক অদ্ভুত বস্তু দেখিয়া রাধাচরণের ছেলেমেয়েরা বিস্তর গা-টেপাটিপি আর কৌতুক করিয়াছে তার সাক্ষাতেই—

অলকা, রাধাচরণের স্ত্রী, শ্বশুরের ভিটার টিনের ঘর তাদের বাসের অনুপযুক্ত মনে করিয়া খুঁত্‌খুত্‌ করিয়াছে বিস্তর—এবং অলকার সঙ্গে তার কিঞ্চিৎ কথা কাটাকাটি হইয়া গেছে। তার উপলক্ষ উদ্দেশ্য তেমন কিছুই নয়—অলকা একদিন কথায় কথায় বলিয়াছিল যে, শাশুড়ীর সঙ্গে মাঝে মাঝে তার ঝগড়া হইত ··

মহামায়া বলিয়াছিল, কিন্তু আমার সঙ্গে হ'ত না।

—তা' হ'লে আমিই লাগাতাম, এই তুমি বল্‌ছ···

—তা' বল্‌ছি নে, ছোট বউ। তাঁর কতকগুলো 'রকম' ছিল। তার প্রতিবাদ না করে স'য়ে গেলেই তিনি দিব্যি লোক।

—স'য়ে আমি যেতাম; কিন্তু দিব্যি হ'তে তাঁকে দেখিনি। দেখেছি, আমার ছেলেমেয়ের চাইতে তাঁর বড় ছেলের ছেলেমেয়ের ওপর তাঁর টান ছিল বেশী।

অলকার অসন্তোষের ঐ কথাটা একেবারেই যে অকারণ তা নয়; কিন্তু ইহাও সত্য যে, শাশুড়ীর টানের সেই কম বেশী গভীর কিছু নয়। বেশীটুকু যা' লক্ষিত হইয়াছে তা' বঞ্চিত দরিদ্রের প্রতি করুণা—সর্ব্বদা যারা কাছে থাকে আর যারা হাতে মানুষ, তাদের প্রতি অধিকতর মমতা। আর একটা কথা এই যে, ছোট বউয়ের দর্প এবং তার ছেলেমেয়েদের চালবাজির ধরণ দেখিয়া, আর তাদের অতিরিক্ত দাপটে বুড়ো মানুষ কখনও কখনও বিরক্ত না হইয়া পারিতেন না—টান অর্থাৎ আদর দেখানো তাঁর পক্ষে সাময়িকভাবে অসম্ভব হইয়া উঠিত।

ঐ কথার পর মহামায়াকে নীরব দেখিয়া অলকা বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বলিয়াছিল, দিদি, কথা বল্‌ছ না যে?

—কথা বাড়া'লেই বাড়ে। মরা মানুষের নিন্দে না করাই উচিত; আর, খুঁত্‌ না আছে, এমন লোক নেই। কোন সময়ে কোন ব্যাপারে তোমার হয়তো মনে হয়েছে —মায়ের আমার ছেলেমেয়ের ওপরেই টান বেশী। আবার আমিও সময়ে সময়ে দেখেছি, যেন তোমাদের ওপরেই তাঁর টান বেশী—তা' না দেখেছি এমন নয়। তখন তা'ই মনে হ'ত; কিন্তু এখন বুঝছি, আমাদেরই বুঝার ভুল। ছেলেমেয়ের মায়ের অমন ভুল ঘটে।

ইহাও সত্য—শ্যামাচরণের ছেলেমেয়ের প্রতি অবিচার করিয়া রাধাচরণের প্রবাসাগত ছেলেমেয়েকে তিনি প্রশ্রয় ঢের দিয়াছেন। অলকা তা' না বুঝিত, এমন নয়—তখন সে হাসিত; কিন্তু সেই কথার উল্লেখে এখন সে রাগ করিল—

বলিল,—তা' জানি নে। কিন্তু কথা বল্‌ছ না বলায় তুমি অনেক কথাই শুনিয়ে দিলে। বলিয়া অলকা যেন পরাস্ত হইয়াই উঠিয়া গিয়াছিল।

পরাস্ত হওয়ার অনেক জ্বালা—নানান্‌ ফল; আনন্দ অন্তর্হিত ত' হয়ই, তার উপর ব্যক্তিবিশেষের ক্রমশঃ কূটবুদ্ধি খুলিতে থাকে। কিন্তু কূটবুদ্ধি খুলিলেই তা'কে খেলানো, অর্থাৎ তার অবাধ প্রয়োগ সর্ব্বদাই সম্ভব হয় না, নিরুপায়ের অস্বস্তি আরও ভয়ঙ্কর। তবে এ-ক্ষেত্রে দৈব তেমন বিরোধী নয়, রাধাচরণের স্ত্রী অলকা নিরুপায় নয়—কূটবুদ্ধি প্রয়োগ করিবার সুযোগ সুবিধা তার যথেষ্টই আছে।

শাশুড়ী কেমন ছিলেন, সেই চর্চ্চার পর অলকার মনে হইতে লাগিল, কেবল তাহারই সঙ্গে শাশুড়ীর কথান্তর হইত বলায় এবং শাশুড়ীকে দোষমুক্ত করায়, তাহাকেই মুখরা, অবুঝ, নির্ব্বোধ, বদ্‌মেজাজী, অসহিষ্ণু, দোষগ্রাহী ইত্যাদি অনেক কিছুই স্পষ্টাক্ষরেই বলা হইয়াছে।··· সম্পর্কে এবং বয়সে ছোট হইলে কি হয়! টাকা কার?

বলা বাহুল্য, রাধাচরণের টাকা-কড়ির 'বিলি-ব্যবস্থা' স্ত্রী অলকার হাতে।

অনেক লেখালিখির পর মাসিক দশ টাকা করিয়া সাহায্য মঞ্জুর হইয়াছিল এবং রাধাচরণের নিকট হইতে শ্যামাচরণের কাছে তা' আসিত—সেই অগ্রহায়ণে তা' আসিল না। মহামায়া টাকার এই ডুব মারার হেতুটি বুঝিল, শ্যামাচরণ বুঝিল না···সে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল, "রাধা কেন টাকা পাঠালে না!" বলিয়া সে অনেক উস্‌খুস্‌ করিয়া এবং কয়েক দিন উদ্বিগ্নভাবে পথ চাহিয়া থাকিয়া জরুরী এক স্মারকলিপি প্রেরণ করিল—

তখন টাকা আসিল ; টাকার সঙ্গে চিঠিও আসিল—রাধাচরণ তার দাদাকে নয়, অলকা লিখিল মহামায়ার কাছে : "টাকা পাঠাইবার কথা মনেই ছিল না। অভিমান ত্যাগ করিয়া পত্র না দিলে, টাকা পাঠানোই হইত না। কিন্তু আর কতদিন এইভাবে খরচ পাঠানো সম্ভব হইবে তাহা বলা যায় না। পাটের দর বাড়িবে শুনিতেছি। পাটের দর দেখিয়া আগামী মাসে টাকা পাঠানো সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাইবে।" ইত্যাদি।

অলকা পাটের বাজারের খবর রাখে দেখিয়া, বধূমাতার আধুনিকতম প্রশস্ততায়, শ্যামাচরণ পুলকিত হইতে পারিল না, এবং অনুমানও করিতে পারিল না যে, ওদিকে সুবৃহৎ একটি অঙ্গুষ্ঠ উত্তোলিত হইয়াছে…

কথা এই যে, পাটের দর এ বৎসর সত্যই বেশী হইয়াছে—দর ক্রমশঃ বাড়িয়া অধুনা ১০৲ দরে খরিদ-বিক্রয় হইতেছে ; এবং ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, বার মণ পাট বেচিয়া শ্যামাচরণ ১২০৲ টাকা ঘরে তুলিয়াছে। কিন্তু উহাই ত' ব্যাপারের সব নয়—খাওয়ার উদ্দেশ্যে সে টাকায় হাত দেওয়া চলে না। কন্যার বিবাহ আর দু'এক বৎসরের মধ্যে না দিলেই নয়—তার বয়স ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে, পনর চলিতেছে…

সন্তর্পণে পুঁটলি বাঁধিয়া সমুদয় টাকাটা স্বতন্ত্র করিয়া তুলিয়া রাখা হইয়াছিল ভরসাময় সেই উদ্দেশ্যেই ; কিন্তু তার সমগ্রতা রক্ষা করা গেল না—তার উপর প্রচণ্ড এক ছোঁ মারিল জমিদারের নায়েব—ভাঙিয়া দিল। অত্যন্ত কড়া মেজাজ এবং কয়েক নম্বর নালিশ করার ভয় দেখাইয়া নায়েব সেই টাকার চার ভাগের প্রায় তিন ভাগই আদায় করিয়া লইল। নায়েবেরই বা দোষ কি! জমিদারের খাজানা চার বৎসর বাকি পড়িয়া আছে—বহু টাকা তাঁর প্রাপ্য। সুতরাং শ্যামাচরণ একটা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া টাকা লইয়া জমিদারের কাছারীতে গেল, এবং নিঃশ্বাস ছাড়িয়া কাছারী হইতে ফিরিল। প্রজার নিকট হইতে খাজানা আদায় করিয়া জমিদারকে খাজানা দেওয়া শ্যামাচরণের মত মৃদু জোত্‌দারের কর্ম্ম নয়।

শ্যামাচরণ ঐ খবরটি অন্যতর উত্তরাধিকারী রাধাচরণকে দিল ; কিন্তু সেই করুণ কাহিনী ফলপ্রদ হইল না—পৌষের টাকা আসিল না। পুনরায় তাগিদ্ দিয়াও সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া পাওয়া গেল না।…

বহু বিলম্ব করিয়া এবার স্বয়ং রাধাচরণই লিখিল : "দাদা, ক্ষমা করিবেন। এ বৎসর বরুণা ও করুণা উভয়েই ম্যাট্রিকের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। অনেক টাকা লাগিবে। অজয় মেডিক্যাল কলেজে পড়িতেছে। তাহার দরুণ খরচের অন্ত নাই। বরুণা ও করুণার শুভ বিবাহের কথাও দু'এক স্থানে উত্থাপিত হইয়াছে—বিস্তর টাকা লাগিবে।

বাড়ী হইতে আসিবার পর হইতেই আমার স্ত্রীর শরীর তত ভাল নাই, প্রায়ই বৈকালের দিকে চোখ জ্বালা করে শুনিতে পাই। তাঁহাকে সত্বরই পশ্চিমে কোথাও চেঞ্জে পাঠাইব মনস্থ করিয়াছি। শ্রীমান্, শ্রীমতীরাও তাঁর সঙ্গে যাইবে। সেখানে বাড়ী-ভাড়া প্রভৃতিতে টাকা জলের মত ঢালিতে হইবে। সুতরাং অত্যন্ত দুঃখের সহিত এবং অত্যন্ত নিরুপায় হইয়া জানাইতে হইতেছে যে, টাকা অন্য বাবতে খরচ করিবার উপায় নাই।

আপনার উজ্জলাও বড় হইয়া উঠিয়াছে। তাহার বিবাহের বিষয়ে কিরূপ চিন্তা করিতেছেন, তাহা জানাইলে সুখী হইব। আপনার প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে কাহাকেও যোগ্য পাত্র মনে করিয়া যদি সম্মত করিতে পারেন, তবে অল্প ব্যয়ে শুভ কার্য্য সমাধা হইতে পারে।"

তারপর "বাটীস্থ সকলে" স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খানিক্ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছে, "শ্রীচরণে প্রণতি পূর্ব্বক নিবেদন ইতি"—এবং তারপর নাম সহি করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে—এবং নামের পূর্ব্বে লিখিয়াছে, "প্রণত সেবক।"

অনুজের প্রণাম-গ্রহণের পরই শ্যামাচরণের কাছে জলের মত পরিষ্কার হইয়া গেল যে, রাধাচরণ সাহায্যদান বন্ধ করিল, এবং উজ্জলার বিবাহের খরচ সে কিছু দিতে পারিবে না।

শ্যামাচরণ ঐ চিঠিখানা তর্জ্জনী আর অঙ্গুষ্ঠের ভিতর ধারণ করিয়া নিজের মুখে অকারণেই খানিক বাতাস দিল—তারপর আর বিশেষ কিছু সে করিল না—স্ত্রীকে পত্রখানা পড়িতে দিল…

তার পড়া শেষ হইলে অম্লান বদনে বলিল, উজ্জ্বলার বিয়ের ভাবনা আমি মোটেই ভাবি নে। টাকা আছে।

শ্যামাচরণ যেন রাধাচরণের অঙ্গুষ্ঠ লক্ষ্যই করে নাই।

মহামায়া জানিতে চাহিল, কোথায় আছে?

—লাইফ্-ইন্‌সিওরের টাকা পেতে আর বছর আড়াই বাকি···

—কিন্তু শ'—আড়াই যে নিয়ে রেখেছ অনেক আগেই!

—তা' বাদেই সাত আট শো পাব। সুদ কেটে' রেখে' টাকাটা দেবে। তা' ছাড়া স্কুলের ফণ্ড থেকেও শ'-দুই পাব। আবার কি চাও!···সুধীরের জ্বর ছেড়েছে?

—হ্যাঁ।

ওদিকে নিশ্চিন্ত হইয়া শ্যামাচরণ গোল কোথায় তাহা জানাইল; বলিল,—কিন্তু গোল হচ্ছে রোজকার খরচ নিয়ে। চল্‌ছে না। চাল্‌টা কিন্‌তে না হ'লে, তবু কতকটা আসান্ হ'ত।

মহামায়ার মনে হইল বলে, "পৈতৃক সম্পত্তি এখন শিকায় উঠিল যে?"···কিন্তু বলিল না।

পাটের টাকার আরও কিছু খসিল—নবগৌরাঙ্গ সাহার চাউলের দোকানে কিছু টাকা অবিলম্বেই না দিয়া পারা গেল না। তারা স্পষ্ট করিয়া এখনও কঠোর বা কটু কথা বলে নাই; কিন্তু মুখের ভঙ্গীতে যেন আক্রমণের আভাস পাওয়া গেছে···

শ্যামাচরণ ভয়ে ভয়ে কুড়িটী টাকা লইয়া নবগৌরাঙ্গ সাহার হাতে দিয়া আসিল—পুনরায় কিছুদিন ধারে খাইবার পথ খোলসা হইল; আর, শ্যামাচরণের মনে হইল, হাতে টাকা রাখা তার অদৃষ্টে নাই।

লাইফ্-ইন্‌সিওরের অফিস হইতে সুদের ছাপানো তাগিদ্ আসিল—সুদ নিশ্চয়ই দেওয়া গেল না···

শ্যামাচরণ হাসিয়া আপন মনেই বলিল, এরা সম্মুখে আসিয়া চোখ রাঙায় না, তাই রক্ষা।

তার উপর স্কুলের ছেলেরা যা' করিয়াছিল, সে কাজও বেশ পাকা—তারা ধর্ম্মঘট করিয়াছিল; তাহারই ফলে মাহিনার টাকার কথা যেন ভাবিতেই পারা যাইতেছে না। কবে ধর্ম্মঘটের অবসান হইবে, এবং তাহাদের অসন্তুষ্ট অভিভাবকগণ স্কুলের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বেতন দিতে সম্মত হইবেন, তাহা তাঁহারাও জানেন না, জানেন ঈশ্বর···

ঈশ্বরকে যখন ঠিক মনে পড়িয়াছে, এবং মনে পড়িয়া নিঃশ্বাস জমিয়া জমিয়া উঠিতেছে, তখন একদিন প্রাতঃকালে মহামায়া শ্যামাচরণের সম্মুখে দাঁড়াইল।

শ্যামাচরণ অত্যন্ত উড়ুউড়ু মন লইয়া তার প্রিয়তম পুস্তক বিল্বমঙ্গল নাটকখানা পড়িতেছিল—সম্মুখে স্ত্রীর কণ্ঠধ্বনি হইতেই সেদিকে তার মন গেল—তাহারই উদ্দেশে উচ্চারিত শব্দগুলি তার কাণে গেল; কথার মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম হইতেও বিলম্ব হইল না।

মহামায়া বলিল, একেবারে চাষা গরিবের ঘরে বিয়ে হ'লে, এর চাইতে বোধ হয় ভালই হ'ত—বাঁদীগিরি করে' খেতাম; নাই-নাই করে' রোজ-রোজ এত রক্ত বোধ হয় শুকতো না।

অন্ধ বিল্বমঙ্গল বৃন্দাবনে উপনীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের দেখা পাইয়াছেন; কিন্তু তিনি তা' বুঝিতে পারেন নাই। ঐ রাখালই শ্রীকৃষ্ণ···

ভক্তবৎসল ভগবানের ঐ ছলনায় শ্যামাচরণের মন আগে দ্রব হইয়া চোখ ছলছল করিত; কিন্তু আজ সে স্তিমিত চিত্তে অনুভবই করিল, কিছুমাত্র রেখাপাত হয় নাই···

তৎক্ষণাৎ সে মুখ তুলিয়া বলিল,—ঘট্‌ল কি ফের!

—কি ঘটবে? ঘটার কিছু বাকি আছে নাকি! ভদ্দর হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছি; কিন্তু ভদ্দরের দশা দেখে' শেয়াল-কুকুরে কাঁদ্‌ছে।

—তা' জানি ত'···

—সব জান না; কেবল জান যে, হালে পানি পাচ্ছে না। আমরা হয়েছি সকলের করুণার পাত্র। দরদ দেখা'তে এসে লোকে ঐ ছলে কেবলি মনে করিয়ে দিচ্ছে, তোমাদের মত দুর্দ্দশা কারও নয়···

—তা' ত' সত্যিই।

—কিন্তু কার দোষে? পৈতৃক বাড়ী আর সম্পত্তি ত' চুলোয় গেছে—বাকি আছে প্রাণ ক'টি…

—তোমার কথায় আমি বড় কষ্ট পাচ্ছি।

—তুমি কষ্ট পাচ্ছ' তোমার নিজের দোষে। কিন্তু আমি কষ্ট পাচ্ছি কার দোষে? ছেলেমেয়েগুলো কষ্ট পাচ্ছে কার দোষে? ভিখিরী মাগী এল, বল্‌লাম চা'ল বাড়ন্ত। সে আমার লম্বা সেলাই করা কাপড়ের দিকে তাকিয়ে টিট্‌কিরি দিয়ে বলে' গেল, বাড়ন্ত নয়, মা দেবে কোত্থেকে!…আমি বারবার দোহাই পাড়িনি' যে, আর কোথাও চাকরি খোঁজো? পেয়েওছিলে ত' একটা। তা' গেলে না। এখন পৈতৃক বাড়ী মাথার উপর ভেঙে' পড়ুক, আর আমরা গুষ্টিশুদ্ধ ধন্য হই। তোমার মত অকেজো, নির্বোধ আর কুনো স্বামী যেন আর কারও না হয়।

শ্যামাচরণের চোখ বিল্বমঙ্গল নাটক ছাড়া অন্যদিকে নিবিষ্ট হইয়া ছল্‌ছল্ করিতে লাগিল; বলিল,—ছেলে দু'টো বেকার হ'য়ে রইল—বিস্তর চেষ্টা…

কিন্তু মহামায়া তখন চলিয়া গেছে, এবং যাইবার সময়ে অসীম অবজ্ঞাভরে স্বামীকে যেন অঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া গেছে।

মহামায়ার এই রোষ আর দোষারোপ নূতন নহে। তার একটি কথাও মিথ্যা নহে, তাহা শ্যামাচরণ শত শত বার স্বীকার করিয়াছে—ক্ষমাও চাহিয়াছে; কিন্তু আজ যেন ঝাঁজ বেশী লাগিল—মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় শ্যামাচরণ মূর্চ্ছিতের মত বসিয়া রহিল—থর্‌থর্ করিয়া তার গা কাঁপিতে লাগিল…

শ্যামাচরণের পূর্ব্বাবস্থার রূপ, ছবি এবং ছায়া ঐরূপ—অবিরাম কল্পনাশীল একটা নির্জ্জীব অস্তিত্ব।

এখন একেবারে হালের কথা:

মর্ম্মাহত অবস্থায় শ্যামাচরণ যখন দিন যাপন করিতেছে, অর্থাৎ ধুঁকিতেছে, তখন একদিন, ২৭-এ ফাল্গুনের পর, আসিল তার 'জয়ন্তী' নয়, তার বানপ্রস্থের, গৃহ ত্যাগ করিয়া বনে প্রস্থানের বয়স—তার বয়স হইল একান্ন—একটা সম্মুখাভিমুখী দিবস হইতে যাত্রা শুরু করিয়া দেহটিকে ধারণ করিতে করিতে অর্দ্ধ-শতাব্দী সে উত্তীর্ণ হইল। একটি মাত্র শব্দে তার জীবনের এই দীর্ঘ ব্যাপ্তির ইতিহাস ব্যক্ত করা যাইতে পারে: অক্ষমতা!

কিন্তু রাধাচরণকে সে আর টাকা পাঠাইতে লেখে নাই; এবং রাধাচরণ তাহাদের কথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে। তাহার এই ভুলিয়া যাওয়া অনেকটা স্বাভাবিক। বিদেশেই সে গৃহনির্ম্মাণ করিয়াছে; গৃহস্থের গৃহ বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা সে সেখানেই সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে এবং আপনাকে পরিপূর্ণ করিয়া তাহা সে সম্ভোগ করিতেছে; গৃহ নয়নানন্দ সন্তানসন্ততিতে পূর্ণ আর সুদৃশ্য হইয়া উঠিয়াছে—তাহারাই তাহার সমগ্র অন্তরের চিন্তার বিষয়—নিরবচ্ছিন্ন তাদের অধিকার। তার উপর, লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ঘটিয়া তাহার দৈনন্দিন আলাপ-পরিচয়, কাজ-কর্ম্ম, কথাবার্ত্তা চব্বিশ ঘণ্টাই চলিতেছে এমন সব লোকের সঙ্গে, যাঁহারা তার পরীক্ষিত পরম হিতার্থী, সুখ-দুঃখের সাথী, অভিন্নহৃদয় বন্ধু, প্রীতির পাত্র, শ্রদ্ধেয়। জীবনের চতুঃসীমার এমনি নিবিড় অব্যবহিত আব্‌হাওয়া আর বন্ধন অতিক্রম করিয়া বহু দূরবর্ত্তী বাড়ীর কথা মনে করিতে বসা ঘটিয়া ওঠে না—তা' অসম্ভবই। নিজেকে লইয়াই সে বিব্রত না হইলেও, তাহাকে গ্রাস করিয়াছে বিদেশের অন্তরঙ্গগণ এবং সেখানকার গৃহ…

দাদা প্রভৃতির কথা হঠাৎ মনে পড়িলেও, মনে-পড়াকে কার্য্যকর করিবার অবকাশই তার মেলে না। কখনও কখনও মনে হয়, ভালই আছেন বই কি…

এখন এতক্ষণে, আসিল শ্যামাচরণের অঙ্গুষ্ঠের কথা—চিরকাল পরের উহা দেখিয়া দেখিয়া এইবার সে দেখাইবে।

একান্ন বৎসরে পড়িয়াই শ্যামাচরণ যেদিন মহামায়ার রোষে এবং দোষারোপে অধিকতর ঝাঁজ লাগিয়া অধিকতর মর্ম্মাহত হইল, সেইদিনই, ৩০-এ ফাল্গুন তারিখে, সে স্কুল হইতে ফিরিল জ্বর লইয়া; জ্বর সামান্যই; রাত্রে ভাতের পরিবর্ত্তে সে খই আর বাতাসা খাইল। পরদিন সকালবেলা উত্তাপ সামান্য একটু বৃদ্ধি পাইল; কিন্তু তাহাতে কাজ বন্ধ রহিল না—একটু দুধ খাইয়া সে স্কুলে গেল…

তার পরদিন জ্বরের জন্য নয়, কেবল দৌর্ব্বল্যের দরুণ সে স্কুলে গেল না···রাত্রে শুইতে যাইবার আগে মহামায়া তার কপালে হাত দিয়া দেখিল, জ্বরটুকু নাই—কপাল অল্প অল্প ঘামিতেছে—দেখিয়া সে নিশ্চিন্ত হইল···

এবং সকালবেলা গায়ের উত্তাপ দেখিতে যাইয়া মহামায়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—শ্যামাচরণ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে।

মানুষের ইহলোক ত্যাগ করা অভিনব ব্যাপার কিছু নয়—প্রতি মুহূর্ত্তে তা' ঘটিতেছে; কিন্তু শ্যামাচরণের বেলায় একটা জায়গায় যেন একটু অভিনবত্ব দেখা গেল—

দেখা গেল, দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধ পর্য্যন্ত তার বুকের উপর রহিয়াছে—চারিটি অঙ্গুলী দেহসংলগ্ন—কেবল অঙ্গুষ্ঠটি একটু উঠিয়া আছে···

বাম হস্ত মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় প্রসারিত হইয়া শয্যার উপর পড়িয়া আছে; মুষ্টি খুব শিথিল, আর অঙ্গুষ্ঠটি উত্তোলিত হইয়া আছে···

কেহ তাহা লক্ষ্য করিল না—

সবাই কাঁদিতে লাগিল।

জল-পথিক

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

ওরে, জল পথে যাই—
ভেসে ভেসে যাই—
নাহি বাধা, নাহি বন্ধ।
জল-জল শুধু
চারিদিকে জল,
ঢেউএ ঢেউএ মহানন্দ।
ঢেউএ ঢেউএ নাচে
ছোট ছোট নাউ,
নাচে কত ভাউলিয়া।
জাহাজের গায়ে
ছোট ঢেউগুলি
নাচে হাসে তালি দিয়া।
দেহ মোর নাচে,
মন নাচে মোর,
আমিও ঢেউর সাথী।
নিথর আঁধারে
তীরের আলোতে
কাটে মোর সুখ-রাতি।

দু' পাশে বিরাজে
মূক কলিকাতা,
কোথা তার অত কথা?
কোথা হানাহানি,
হাঁকাহাঁকি তার,
কোথা তার ব্যস্ততা?
মানুষে মানুষে
এত যে লড়াই,
সে কি অসীমেরে হানে!
সলিলে আকাশে
তারায় তারায়
তারে অবজ্ঞা দানে।
এত মারামারি
এত কাটাকাটি
আমাদেরি ঘিরে রয়;
উদার হাস্যে
শান্ত আকাশ
করে যেন সবি জয়।

সাময়িক সাহিত্য

—শূলপাণি—

[আধুনিক বাংলা সাময়িকের ক্ষেত্রে লেখকের সংখ্যা যেমন ক্রমবর্দ্ধমান, তেমনি সাহিত্যেও Mass production সুরু হইয়াছে। এই রাশি রাশি পুস্তক ও সাময়িকের অরণ্যে আমরা যেন পথ হারাইয়া ফেলিতেছি। অথচ দিগ্‌দর্শনের একান্ত অভাব মনে হইতেছে। মাসিক সাহিত্যের আলোচনা সাময়িকের ক্ষেত্রে এই নূতন নয়, 'প্রবর্ত্তকে' ইতিপূর্ব্বে মাসিক সাহিত্যালোচনার প্রচেষ্টা চলিয়াছিল। তাহারও পূর্ব্বে "মানসী ও মর্ম্মবাণী" পত্রিকায় মাসিক সাহিত্য লইয়া রীতিমত আলোচনার আসর গড়িয়া উঠিয়াছিল। আরও কোন কোন ক্ষেত্রে এ প্রচেষ্টা দেখা গেলেও, তাহা নিতান্তই অপ্রচুর। বর্ত্তমান বিভাগটি পরিচালনা করিতে বসিয়া এই কথাই ভাবিতেছি যে, আধুনিক যুগে কি সাহিত্যে, কি সমাজে, কি রাষ্ট্রনীতিতে সর্ব্বত্রই যেন আমরা পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হারাইয়া ফেলিয়াছি। বর্ত্তমানে বাংলার নূতন সাহিত্যের পত্তন হইতেছে, কাব্য ও সাহিত্যের form বদলাইতেছে, বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য এক অভিনব পথে যাত্রা করিয়াছে। অনেক কিছু হইয়াছে সত্য; কিন্তু গত বিশ বৎসর পূর্ব্বেকার বাংলা সাহিত্যের দিকে তাকাইলে বর্ত্তমানে খুব আশান্বিত হইয়া উঠিবার কারণ দেখি না। যে সুষ্ঠু শিল্পসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী থাকিলে সাহিত্য সুন্দর ও সার্থক হইয়া ওঠে, জাতিগঠনে সাহায্য করে, আজ তাহারই একান্ত অভাব। আমরা সাহিত্যে গোঁড়ামির পক্ষপাতী নই। কারণ ধরা-বাঁধা কোন নীতিবাদের মুখ চাহিয়া কোথাও বড় সাহিত্য গড়িয়া ওঠে নাই। তথাপি সংযম ও মাত্রা-জ্ঞানেরও একটা মূল্য আছে। সাহিত্য কোনদিনই ইহা উপেক্ষা করিতে পারে না। সাময়িক সাহিত্যালোচনার সূত্র ধরিয়া হয়ত বহু অপ্রিয় আলোচনা করিতে হইবে। নিরপেক্ষ এবং শুভেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়াই ইহা আমরা করিব। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বর্ত্তমানের সাহিত্যিক কোলাহল ও মানসিক অরাজকতার ঊর্দ্ধে বাঙলার চিরন্তনী প্রতিভা নিজের আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজিয়া পাইবে।]

পরিচয়—চৈত্র, ১৩৪৭—

বিদেহ-বৈকল্য—রচয়িতা শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত। বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রবন্ধটি শেষ হইয়াছে। অধ্যাত্মবিজ্ঞান ও পরলোকতত্ত্বে সুপণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথের রচনা 'পরিচয়'-এর বড় আকর্ষণ, ইহা নিঃসন্দেহ। পাশ্চাত্য হিন্দু ও বৌদ্ধ-দর্শনে তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্য আলোচ্য বিষয়ের মত একটি জটিল তত্ত্বকে আলোকিত করিয়াছে। "পরিনির্ব্বাণ অস্তি-নাস্তির অতীত অবস্থা। It is the annihilation of selfhood, the doing away of separateness." লেখক বলিয়াছেন "বাস্তবিক ব্যক্তিত্বের বিলোপ অতি অকিঞ্চিৎকর—তাহাতে নাস্তিত্ব আসে না। আমরা যাহাকে ব্যক্তিত্ব (individuality) বলি, সেটা অনন্ত ব্রহ্মবারিধির তরঙ্গ নয়, বীচি নয়, লহরীও নয়—নগণ্য বুদ্বুদ্ মাত্র।" এ সম্পর্কে দার্শনিকশ্রেষ্ঠ সোপেন্‌হয়র-এর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তিনি বিষয়টিকে পরিস্ফুট করিয়াছেন "Every body knows himself only as an individual * * * If he were able to be conscious of what he is besides and apart of this, he will willingly let go his individuality and smile at the tenacity of his adherence to it." বিদেহ-মুক্তি ও পরিনির্ব্বাণ তত্ত্বের ন্যায় জটিল বিষয়ের আলোচনা করিতে গেলে যে তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন, তাহা সাধারণের নাই, লেখক বর্ত্তমান প্রবন্ধে জ্ঞান ও বুদ্ধির অগোচর সেই আঁধারের রাজ্যে (Land of silence and non-being) কিঞ্চিৎ আলোকপাত করিয়াছেন। তাঁহার রচনার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া এ প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি: "অতএব এই অস্তি-নাস্তির অতীত বিষয়ে দ্বৈত ও অদ্বৈত লইয়া বিতণ্ডা কেবল নিষ্প্রয়োজন নয়—বেশ অশোভন। কিন্তু বিদেহ-মুক্তি বা পরিনির্ব্বাণ অতর্ক্য, অবর্ণ্য, অকথ্য, অচিন্ত্য হইলেও—পরিনির্ব্বাণে ব্যক্তিত্বের বিলোপ, জীবভাবের অভাব ঘটিলেও—বিদেহমুক্তি নাস্তিত্ব নয়—পাশ্চাত্যেরা যাহাকে "abyss of absolute annihilation বলিয়াছেন, পরিনির্ব্বাণ নিশ্চয়ই সে বিনাশ নহে।"

ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির প্রাচীন ইতিহাস ও তাহার ক্রমবিবর্ত্তনের ধারা সুপণ্ডিত লেখকের রচনায় পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। বহু প্রমাণ-প্রয়োগ ও তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে। সমাজবিজ্ঞানের আলোচনায় যাঁহারা আনন্দ পান, তাঁহারা লেখকের এই আলোচনা হইতে চিন্তা ও গবেষণার খোরাক পাইবেন। রচনাটি ধারাবাহিক।

ভারতবর্ষ ও কার্ল্ মার্ক্স্—হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ভারতবর্ষের জটিল সমাজ-ব্যবস্থায় মার্ক্স্-বাদের প্রয়োগ লইয়া বহু চিন্তাশীল ব্যক্তির মধ্যে মতপার্থক্য বর্ত্তমান।

আধুনিক যুগে বামপন্থী বহু দল ও উপদলের মধ্য দিয়া আমরা সেই প্রমাণই পাইয়াছি। ভারতের জল-হাওয়ায় খাঁটি মার্কস্‌-বাদ কিরূপ পরিগ্রহ করিবে, সে সম্পর্কে অস্পষ্ট চিন্তা ও ভাবপ্রবণতার উচ্ছ্বাসই সাময়িক পত্রাদিতে দৃষ্টিগোচর হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে লেখক এ সম্বন্ধে গোটাকয়েক স্পষ্ট কথা বলিয়াছেন। "ভারতের গণশক্তি জাগ্রত না হওয়া পর্য্যন্ত নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে না। ইংরেজ শাসন শুধু তার বাস্তব ভিত্তি স্থাপন করেছে, বিদেশী শাসন এসে অত্যাচার অনাচার করে' পুরোনো সমাজের কাঠামো না ভেঙ্গে দিলে তা সম্ভব হত না। কিন্তু বিদেশী শাসনের কাজ সেখানেই শেষ; ভারতের গণ-শক্তিই ভারতের ভবিষ্যৎকে গড়তে পারে।"

বসন্ত-অভিযান—(গল্প) শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী। কুশলী লেখকের রচনায় গল্পটি রূপে রসে উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। সাধারণ জীবন-যাত্রার তুচ্ছ ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া সরোজকুমারের লেখনী চিত্রের পর চিত্র আঁকিয়াছে। আধুনিক যুগের গল্প-উপন্যাস-কণ্টকিত সাময়িকের ক্ষেত্রে গল্পটি অপর্য্যাপ্ত সাহিত্য-রসের খোরাক যোগাইবে।

পুস্তক-পরিচয় ও অন্যান্য রচনা "পরিচয়ের" সুনাম অক্ষুন্ন রাখিবে বলিয়া আমরা আশা করি।

মন্দিরা—চৈত্র, ১৩৪৭—

মনের সঙ্গে একাকী—শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ। লেখকের রচনা সুন্দর, পথ চলার ফাঁকে ফাঁকে মনের সঙ্গে বোঝা-পড়া আছে। ভাবুকতা ও সাহিত্য-দৃষ্টি রচনাটিকে সত্যকারের উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে।

মনু ও নারীজাতি—শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত। অতি সাধারণ রচনা। মনুর সমসাময়িক নীতিশাস্ত্রের কয়েকটি সূত্র তুলিয়া লেখক যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে সেই মামুলি যুক্তি-তর্কের পরিচয় পাইলাম। এই ধরণের রচনার কি সার্থকতা, তাহা বোঝা গেল না। ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী ও অনুসন্ধিৎসার অভাবই রচনার সর্ব্বত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কবিতীর্থে—শ্রীমতী বীণা দাস। লেখিকার লিপি-কৌশলে রচনাটি সত্যই উপভোগ্য হইয়াছে। এই পথ চলার কাহিনীর মধ্যে লেখিকার চিন্তাশীল মন মাঝে মাঝে উদগ্র হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার রচনার একটি স্নিগ্ধ মাধুর্য্য সহজেই মনকে আকৃষ্ট করে, বহুর মধ্যেও একটি স্বাতন্ত্র্য তাঁহার রচনাকে বিশিষ্ট করিয়া তোলে, আমরা কিছুকাল হইতে ইহা লক্ষ্য করিতেছি।

দেশ-প্রেম—শ্রীবিমল বসু। Scott-এর Patriotism কবিতার অনুসরণে রচিত। কবিতাটি মন্দ হয় নাই।

জীবন-স্মৃতি—ম্যাক্সিম্‌ গোর্কি। অনুবাদক—শ্রীহেমন্ত-কুমার তরফদার। কয়েক সংখ্যা হইতে ধারাবাহিক ভাবে চলিতেছে। অনুবাদ হইলেও, উপন্যাসটি পড়িয়া আনন্দ পাওয়া যায়। ঝরঝরে ভাষা অনুবাদের উপযোগী।

বেন্দা—শ্রীমতী সুপ্রীতি মজুমদার।

পথ-পরিচয়—শ্রীমতী শান্তিসুধা ঘোষ।

সাধারণ রচনা, গল্প দুইটি পড়িয়া বিশেষ প্রশংসার কিছু পাইলাম না।

মহাপ্রসাদ—শ্রীহরীশ দেবনাথ। এই ধরণের কবিতার সার্থকতা কি বুঝিলাম না। আধুনিক ঢঙে রচিত, না হইয়াছে কবিত্ব-সৃষ্টি, না আছে সৌন্দর্য্য-বোধ। "সরু গলিটার মোড়ে এক ডাষ্টবিন"-এরই যোগ্য।

শনিবারের চিঠি—চৈত্র, ১৩৪৭—

বঙ্গভাষার ক্রমবিকাশ—রচয়িতা অঃ বিঃ আঃ। আশুতোষ কলেজের সংস্কৃত ও বঙ্গভাষার অধ্যাপক শ্রীনগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী এম. এ., পিএইচ. ডি. লিখিত বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের ক্রমবিকাশ, প্রথম ভাগ, গ্রন্থ উপলক্ষ্য করিয়া আলোচনা। লেখক এই গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে যে রস পরিবেশন করিয়াছেন, তাহাকে সাহিত্য-রস বলা চলে না; লেখক যে তালরসরসিক, তাহারই প্রমাণ দিয়াছেন। ফলে তিনি বেতালা বকিয়াছেন, গালাগালি ও ভাঁড়ামি যুক্তি ও বিচারের স্থান অধিকার করিয়াছে। কোন পুস্তকের ভ্রমপ্রমাদ দেখাইতে গিয়া যদি গ্রন্থকারের সেই পুস্তকের কোন কোন বিষয়ে একমত পোষণ করেন, তাহা হইলে মহাভারত অশুদ্ধ হয় বলিয়া আমরা মনে করি না, অথচ এই যুক্তিই প্রবন্ধলেখক গ্রহণ করিয়াছেন। যেহেতু গ্রন্থকার বিজয়বাবুর "The History of Bengali Language" নামক পুস্তকের কোন কোন

তথ্য-প্রমাণের সহিত একমত হইতে পারেন নাই—সেই হেতু তিনি বিজয়বাবুর পুস্তকের অন্যান্য বিষয়ের সহিতও একমত হইতে পারেন না। যুক্তি যেখানে এইরূপ, সেখানে সুবিচারের আশা বৃথা। অধ্যাপক মহাশয় একটা ভুল করিয়াছেন, গ্রন্থপ্রকাশের পূর্ব্বে তিনি শনিবারের আখড়ায় নাম লিখাইলে ভাল করিতেন। আমাদের এ ধারণা দৃঢ় হইয়াছে আর একটি ব্যাপারে। কিছুদিন আগে ন্যাশন্যাল লিটারেচার কোম্পানীর পুনর্মুদ্রিত বঙ্গদর্শনকে লক্ষ্য করিয়া শনিবারের চিঠি যে শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, দেখিলাম তাহাতে যথেষ্ট কাজ হইয়াছে। বর্ত্তমান সংখ্যায় ন্যাশন্যাল লিটারেচার কোম্পানীর একটি পূর্ণপৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন 'শনিবারের চিঠি'র শোভা বর্দ্ধন করিতেছে।

শ্রীমধুসূদন—'মেঘনাদবধ কাব্য' পাঠ—কল্পনা ও কবিত্বশক্তি (৫)। রচয়িতা শ্রীমোহিতলাল মজুমদার। লেখকের তথ্যবহুল সুদীর্ঘ আলোচনা বর্ত্তমান সংখ্যায় শেষ হইয়াছে। মধুসূদনের প্রতিভার বিভিন্ন দিক্ লেখক এক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। সুদীর্ঘকাল পরে সত্যকারের সমালোচনার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। "শনিবারের চিঠি"র কণ্টকঘন অরণ্যে মোহিত-বাবুর রচনা "একটি কুসুম মাত্র অরণ্যে যেমতি।"

সংবাদ-সাহিত্যের লেখক কিছুদিন হইতে দেখিতেছি শ্রীযুত মনোমোহন ঘোষ মহাশয়কে লইয়া পড়িয়াছেন। ঘোষেদের হুঁস একটু দেরীতেই হয় কিনা জানি না, তবে "শনিবারের চিঠি"র ক্ষেত্রে যে বহু যাদব ধনুর্দ্ধরের সাক্ষাৎকার আমরা পাইয়াছি, তাহা বিশেষ প্রমাণ-সাপেক্ষ নয়। বাংলাভাষা ও সাহিত্যের যাঁহারা সোল এজেন্সি লইয়াছেন, তাঁহাদের কাছে ইহা তথ্য বলিয়া মনে হইতে পারে।

জয়শ্রী—চৈত্র ১৩৪৭।

ভারতীয় রাজনীতিতে বামপন্থা—লেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র রায়। লেখক রাষ্ট্রনৈতিক দর্শন লইয়া বহু আলোচনা এই পত্রিকাতে করিয়াছেন। তাঁহার তথ্যপূর্ণ আলোচনা "র একটি বিশেষ আকর্ষণ, সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধে লেখক ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে বিভিন্ন দল ও তাহাদের কর্ম্মপন্থা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে তথাকথিত বামপন্থী দলগুলির স্বরূপ ও কর্ম্ম-পন্থা এই প্রবন্ধে লেখক বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন।

মহা অভীপ্‌সা—মহেন্দ্রনাথ

সাতটি লাল রবিবার—বিনয় চট্টোপাধ্যায়

এই দুইটি উপন্যাস কিছুকাল ধরিয়া "জয়শ্রী"তে ধারাবাহিকভাবে বাহির হইতেছে। এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে, এই ধরণের উপন্যাসে proleterian সাহিত্যের যে পরিচয় আমরা পাইয়াছি, তাহাতে বাঙলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আমরা শঙ্কিত হইতেছি। ষ্ট্রাইক্, কুলিলাইন, চিমনীর ধোঁয়া—এই সাহিত্যের যাহা কিছু stock-in-trade, সব কিছুই আলোচ্য উপন্যাস দুইটিতে আছে, শুধু নাই সত্যিকারের সাহিত্য-রস অথবা জাতিগঠনের ইঙ্গিত। এই শ্রেণীর উপন্যাস বাঙালীর গভীর চিত্তে কতটুকু আবেদন সৃষ্টি করিতে পারিবে, তাহাতে আমাদের সন্দেহ আছে।

আমার চাকর ও কুকুর—শান্তিসুধা ঘোষ। গল্পটি সত্যই ভাল হইয়াছে। বিষয়বস্তুতে নূতনত্ব আছে। লেখিকার সত্যকারের সাহিত্যদৃষ্টি ও রসবোধ সাধারণ বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করিয়া রূপায়িত হইয়াছে।

বন্দী (কবিতা)—অশোককুমার মৈত্রেয়। আধুনিক ঢঙে রচিত কবিতা হইলেও, ভাষার ঝঙ্কার ও ভাবসৌন্দর্য্য পাঠককে মুগ্ধ করে, অতি আধুনিকতার ন্যাকামি নাই—একটি বলিষ্ঠ আদর্শবাদ সমস্ত কবিতার মধ্যে প্রবহমান।

শূন্যপাতা—সাময়িক পত্রিকা—

স্কটিশচার্চ্চ কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা পরিচালিত ও শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র রায়ের সম্পাদনায় পত্রিকাখানি বাহির হইতেছে। ইংরাজী ও বাংলা উভয় বিভাগই কয়েকটি চিন্তাশীল রচনা পত্রিকাটির শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে। বাংলা দেশের আধুনিক সাময়িকের অরণ্যে এই পত্রিকাটি একটি বিশিষ্ট পথ ধরিয়া চলিতেছে। আমরা পত্রিকটির উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা কামনা করি।

সমালোচনা

শ্রী ১০৮ সন্তদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত—শ্রীমৎ স্বামী ধনঞ্জয় দাসজী মহারাজ প্রণীত ও ১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠাঙ্ক ৫৩২, মূল্য ২৷৷০ টাকা মাত্র।

বাংলার গৌরব লোকোত্তরচরিত মহাপুরুষ সন্তদাস বাবাজী মহারাজের আলোচ্য সম্পূর্ণাঙ্গ জীবন-চরিতখানি বাঙ্গালী মাত্রেরই নিকট অভিনন্দিত হইবে। তদীয় শিষ্য ও শ্রীনিম্বার্ক আশ্রমের বর্ত্তমান মোহান্ত মহারাজ শ্রীমৎ স্বামী ধনঞ্জয়দাসজী কর্ত্তৃক গ্রন্থখানি লিপিবদ্ধ হওয়ায় ইহা বিতর্কবিহীন পূর্ণতর রূপ পাইয়াছে। বাবাজী মহারাজের প্রথম, মধ্য ও শেষ জীবনকে অবলম্বন করিয়া এই সুবৃহৎ গ্রন্থ তিন খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। মহারাজজীর অমৃতোপম উপদেশাবলী, সাধক রামদাস-সিদ্ধবাবা-মোহিনীমোহন-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং মহারাজজীর প্রয়াণ পরবর্ত্তী সন্তদাস-স্মৃতি পরিশিষ্টে প্রদান করা হইয়াছে। সর্ব্বশেষে একটি শুদ্ধিপত্র সংযোজিত হইয়াছে। কয়েকখানি এক রঙা হাফটোন প্লেট গ্রন্থের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে। এইরূপ গ্রন্থ দেশে যত অধিক প্রচারিত ও পঠিত হয় ততই মঙ্গল।

কথা ও কবিতা—কবি শ্রীজ্যোতিন্দ্রমোহন রায় ও শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ঘোষ। ২০৬ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থ ভারত বুক এজেন্সি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দাম এক টাকা।

বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের আবৃত্তির উপযোগী করিয়া রচিত। লেখকদ্বয়ের এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। 'হালখাতা' 'ভীষ্মলোচনের গান' 'অভিলাষ' 'আত্মসমর্পণ' এই কয়টী কবিতা ছাড়া বাকীগুলি অমুল্লেখযোগ্য। সংগ্রাহকদ্বয় আরও ভাল লেখা একটু চেষ্টা করিলেই সংগ্রহ করিতে পারিতেন। ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

আধুনিক যুদ্ধ—শ্রীভবেশচন্দ্র রায় ও শ্রীনরেন্দ্রনাথ সিংহ প্রণীত। ৪০-এ মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য—২৲।

এ দেশে অনেক কাল যুদ্ধবিগ্রহ হয় নাই। পরাধীন দেশে তাহা হইবারও প্রয়োজন নাই। আধুনিক যুদ্ধের বিচিত্র উপকরণের নাম সংবাদপত্রের মারফত নিত্য পরিবেশিত হইবার ফলে এ সম্বন্ধে পাঠকের কৌতুহল যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইলেও উহার যথাযথ বস্তুতন্ত্র জ্ঞানার্জ্জনের বাস্তব ক্ষেত্র তো নাইই, এমন কি বাংলা ভাষায় যুদ্ধ-বিজ্ঞান ও যুদ্ধের যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে কোনও পূর্ণাঙ্গ পুস্তক এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীযুক্ত তারাকিশোর বর্দ্ধনের 'ইউরোপের মহাসমর' প্রভৃতি দু' একখানা বই এবং আলোচ্য পুস্তকখানি এই অভাব অনেকখানি দূরীভূত করিয়াছে। আলোচ্য পুস্তকখানিতে জল, স্থল ও আকাশ যুদ্ধ এবং উহার আনুষঙ্গিক ব্যাপার ও তথ্যগুলি বেশ সাবলীল ভঙ্গী ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সমর-সাহিত্য সৃজনের মধ্য দিয়াও গ্রন্থকারদ্বয় বাংলা ভাষাকে যথেষ্ট পুষ্টি দিয়াছেন। বিবিধ বিষয়ের চিত্র বাহুল্য, একটি বর্ণানুক্রমিক নির্ঘণ্ট এবং বর্ত্তমান যুদ্ধের পটভূমিকা সংযোজিত হওয়ায় পুস্তকের মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। তরুণ-প্রবীন বাঙালী মাত্রেরই নিকট 'আধুনিক যুদ্ধ' অভিনন্দিত হইবে বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

দুর্য্যোগের ডাক—শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ দাশ প্রণীত। ৩।সি, আনন্দ পালিত রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীমিলনময় মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

পঁয়ত্রিশটি কবিতার গুচ্ছ লইয়া এই পুস্তকখানি সঙ্কলিত হইয়াছে। বইখানি লেখকের প্রথম সৃষ্টি হইলেও ইহার কবিতাগুলিতে কবির দরদী প্রাণের বেদনার আবেদন যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেকটি কবিতাই মানব জীবনের দুর্য্যোগময় সংঘাতে এক নব উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। 'দুর্য্যোগের ডাক', 'হে তরুণ তব সম্ভাষণ', 'মুক্তির স্বপ্নে', 'সাম্যের সুর', 'জীবন কোথায়' প্রভৃতি কবিতাগুলিই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ভাব, ভাষা, ছন্দ ও রস কোথাও ব্যাহত হয় নাই। কাব্য রসিকের নিকট পুস্তকটি যে আদৃত হইবে, তাহাতে আমরা নিঃসন্দেহ।

হাসতেই হবে—শ্রীজীবানন্দ ঘোষ প্রণীত। শ্রীবিজনকুমার গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সোণারপুর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ছয় আনা।

"উল্টা বুঝিলি", "শ্রীবিভীষণ চোঙ", "বিল্টুর চোখে কোলকাতা", "কার্ত্তিক ঠাকুরের কারসাজি"—এই চারিটি হাসির গল্পে হাসিতেই হইবে। এই হাস্যরসকে কেন্দ্র করিয়াই পুস্তকটি কোমলমতি বালক বালিকাদের উপযোগী করিয়া রচিত হইয়াছে। তরুণ লেখকের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ। ছাপা, প্রচ্ছদ পট ও বাঁধাই কিশোরদের মনোহরণ করিবে।

ধূপ ও দীপ—শ্রীগঙ্গাধর রায়চৌধুরী এম-এ প্রণীত। শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু বি, এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং গ্রন্থকারের দ্বারা সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত। মূল্য পাঁচ আনা।

কবির বিভিন্ন সময়ে রচিত ছোট বড় ছাব্বিশটি কবিতার সমষ্টি 'ধূপ ও দীপ'। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীহেমচন্দ্র সরকার এম-এ, আই-ই-এস মহাশয় ভূমিকায় কবিতাগুলির যে প্রশংসা করিয়াছেন তাহা যোগ্য বলিয়াই মনে করি। লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুকবি ৺ভুজঙ্গধরের সুযোগ্য সন্তান গঙ্গাধর বাবুর 'ধূপ ও দীপ' বাণীর মন্দিরে প্রথম অর্ঘ্য হইলেও, কবিতাগুলির ধূপ-সুরভিত দীপালোক শুভ্রতা ভাবী সাফল্যেরই সূচনা করে।

কাব্য ও অলঙ্কারশাস্ত্র

ফাল্গুনের 'রূপ ও রীতি'তে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রের মর্ম্ম এবং সম্বন্ধ তাঁর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সহজ ভাষা ও ভঙ্গীতে লিখিয়াছেন :

অলঙ্কারশাস্ত্রের মুখ্য কথা এই যে—কাব্য আগে, শাস্ত্র তার পরে।

আরিষ্টটলের অলঙ্কারশাস্ত্র গ্রীক নাটকের পরে। অলঙ্কারশাস্ত্র কাব্যের জন্মদাতা নয়,—কাব্যই শাস্ত্রের জন্মদাতা।

এ শাস্ত্রের নিয়ম মেনে চললেই যে কাব্য রচনা করা যায়,—সে ভুল অলঙ্কারশাস্ত্রীরা করেন নি। তাঁরা প্রায় সকলেই বলেছেন যে —প্রতিভাই কাব্যের মূল। প্রতিভা অর্থাৎ genius যে কি বস্তু, তার সন্ধান তারাও পান নি, আমরা আজও পাই নি। যদিও এ বিষয়ে দেশবিদেশে অনেক তর্ক করা হয়েছে।

অতএব অলঙ্কার কবিপ্রতিভার পায়ের শৃঙ্খল নয়।

এ বিশ্ব আমরা গাড়িতে পারিনে, কিন্তু তার হালচাল আমরা আবিষ্কার করতে পারি; আর সে শাস্ত্রের নাম Physics এবং Chemistry।

আর এক কথা। Physics and Chemistry যেমন সাম্প্রদায়িক হতে পারে না, অলঙ্কারশাস্ত্রও তেমনি সাম্প্রদায়িক হতে পারে না। কাব্যের নিয়মাবলী যদি আমরা ধরতে পারি, তাহলে সে নিয়মাবলী কাব্য মাত্রেরই নিয়মাবলী।

অবশ্য এ আবিষ্কার চূড়ান্ত নয়। নূতন কাল নূতন নিয়মাবলীর আবিষ্কার করে; যার ফলে নব্য Physics জন্মলাভ করেছে।

জড়বস্তুর নিয়মাবলী আবিষ্কার করা যত সহজ, মন নামক পদার্থের নিয়ম আবিষ্কার করা তত সহজ নয়। ফলে এক কালের অলঙ্কার শাস্ত্র অন্য কালের অলঙ্কারশাস্ত্রের পুনরুক্তিমাত্র নয়; তাহলেও, পূর্ব্ব শাস্ত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নও নয়। যেমন নব Physics গত Physicsএর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন নয়।

অলঙ্কারশাস্ত্রে অলঙ্কার মানে figure of speech। কাব্যের গুণাগুণও এ শাস্ত্রে বিচার করা হয়েছে। অলঙ্কার কাব্যশোভা বর্দ্ধন করে মাত্র।

শাস্ত্রীরা কাব্যের গুণকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এবং কাব্যের গুণ কি কি, তার বর্ণনা করেছেন। এই গুণই কাব্যের যথার্থ ধর্ম্ম। এই গুণগুলিই অলঙ্কারশাস্ত্রে মান্য।

কবি তৈরী করা অলঙ্কারশাস্ত্রের উদ্দেশ্য নয়। যদি এ শাস্ত্রের কোনও উদ্দেশ্য থাকে ত সেটি পাঠক তৈরী করা।

স্বীকরণ ও অনুকরণ

কালিঘাটের 'চৈতালী' সঙ্ঘের এক সম্মেলনে সভাপতি শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে এক শ্রেণীর আধুনিক কবিদের যে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহা সত্যই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিতেছেন—

সম্প্রতি কাব্যলক্ষ্মীর যে রূপান্তর দেখছি, সেটা সকৌতুকে লক্ষ্য করবার জিনিষ। বাঁধভাঙ্গা বন্যাজলের মত পাশ্চাত্য ভাব ও চিন্তা আমাদের মনের আনাচে কানাচে ঢুকেছে। তার ফলে এক শ্রেণীর কবিতার আবির্ভাব হয়েছে, যেটা ভাবে ও ভাষায় পশ্চিমের ব্যঙ্গানুকৃতি মাত্র। স্বীকরণ ও অনুকরণে একটা প্রভেদ আছে। কাব্য বিশ্বভারতীয়। কিন্তু তার প্রকাশ জাতীয় অভিজ্ঞতা অনুভূতি ও রুচিকে আশ্রয় করে যদি না ফুটে উঠে, তবে আমাদের এই হ্যাট্‌কোটের প্রসাধনের মত নিতান্ত বেখাপ্পা হয়ে ওঠে। খাদ্যটা পরিপাক লাভ করলে দেহের রসরক্তে পরিণত হয়ে আমাদের স্বাস্থ্যে, শক্তিতে ও মুখশ্রীতে প্রকটিত হয়। অন্যথা অজীর্ণ উদ্গারে উদরস্থ আহারটা ভুক্তবিকারের একটা দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে। যা বলি, যা লিখি, সেটা যে উপলব্ধিগত আত্মোক্তি নয়, এরূপ লক্ষণ উৎপাদন করে কর্ণপীড়া।

'ইসলাম ইন্ ডেনজার'

জাতীয়তাবাদী সুলেখক আবদুর রহমান সাহেবের 'ইসলাম ইন্ ডেনজার' শীর্ষক প্রবন্ধটি 'শীশ মহলে'র চৈত্র সংখ্যায় 'কৃষক' হইতে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধটির তীক্ষ্ণ রসায়িত মন্তব্য এবং জাতীয়তাবোধ বাঙালীর অনুধাবনীয়। প্রবন্ধটির কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা হইল :

এতাবৎকাল ধরিয়া আমরা সময়োপযোগী শিক্ষাকে গ্রহণ না করিয়া প্রচুর পরিমাণে 'দীনী এসলামে'র রস পান করিয়া আসিয়াছি—সেই জন্য আজ আমাদের দীনতা বা দৈন্যের অন্ত নাই। ইসলাম আমাদের নিকট বিপন্ন হইবে না ত বিপন্ন হইবে কি অপরের নিকট? তুরস্কের ইসলাম বিপন্ন হয় নাই, আরবের ইসলাম বিপন্ন হয় নাই, বিপন্ন হইয়াছে শুধু বাঙলার ইসলাম। তাহার একমাত্র কারণ বিদেশীরা আমাদের (?) বাঙলায় আসে ব্যবসা করিতে, আর আমরা বিদেশে যাই পুণ্য অর্জ্জন করিতে। * * * *

আজ শত শত বৎসর ধরিয়া মুসলমানেরা বাঙলার পল্লী-প্রান্তরে রৌদ্রে দগ্ধ হইয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়া, কাদা ঘাঁটিয়া, মাটি খুঁড়িয়া অনবরত ব্যাধি বীজাণুর সহিত সংগ্রাম করিয়া আপনার বুকের রক্তে বাঙলার মাটিতে সোনার ফসল ফলাইয়া আসিতেছে—অথচ তাহারা বাঙালী নয়; বাঙলাদেশে তাহাদের নিজস্ব কোন দাবী আজ যেন অপ্রীতিকর! কিন্তু ইহার কারণ কি? অনুসন্ধান করিলে হয়তো মাত্র এতটুকুই জানা যাইবে যে, বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের একান্ত অভাব। এবং তাহাই হইল মুলতঃ আজিকার এই দুর্দ্দশার জন্য একমাত্র দায়ী। 'সারা জাহাঁ হামারা' বলিয়া যাহারা দাবী করিয়া থাকে, বিশ্বশুদ্ধ যাহাদের কুটুম্ব, তাহাদের যে আপন জন কেহই নহে, মাথা গুঁজিবার স্থান যে তাহাদের কোথাও নাই; ইহাই হইল তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

বাঙলার জনসাধারণের মধ্যে বাঙালী মুসলমানেরা একটি গরিষ্ঠ সংখ্যা অধিকার করিয়া আছে, ইহা সত্য। অথচ এই বিরাট্ সংখ্যার মধ্যে শতকরা ৯৫ জন অজ্ঞ ও অশিক্ষিত। ইহাদের যাঁহারা নেতা, তাঁহারা আপন আপন বিলাস-কক্ষে নিশীথ চিন্তার অবসরে মধ্যে মধ্যে গাহিয়া উঠেন 'দূর আরবের স্বপন দেখি বাঙলা দেশের কুটীর হতে', 'ইস্লাম ইন ডেনজার' ইত্যাদি। আপন আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য মধ্যে মধ্যে আবার ইশ্তাহারও জারী করেন—'ফেলিস্তিন দিবস পালন কর' 'বিশ্ব-মুসলিম শান্তি দিবস পালন কর'। এইসব বড়লোকের খেয়াল—বাঙলার নিরন্ন কৃষককুলের ইহাতে কি আসে যায়? কিন্তু তবু তাহা করিতে হইবে এবং করাও হইয়া থাকে।

ধর্ম্মের নামে মুসলমানেরা অন্ধ, আরব পারস্যের নামে তাহারা আত্মহারা। একজন আরবী বা আফগানী মুসলমান তাহাদের সহিত একটু হাসিয়া কথা বলিলে তাহাদের উর্দ্ধতন সপ্তপুরুষ স্বর্গে চলিয়া যান। কিন্তু এই সকল বিদেশী মুসলমানেরা যে দেশের সাধারণ জনসমাজকে কি চোখে বা কোন চোখে দেখিয়া থাকে, তাহা আমাদের নেতৃবৃন্দের হয়তো অজানা নাই। তবু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তাহাদের সহিত একটু সম্বন্ধস্থাপন করিতে হইবে—বাঙালীকে অবমাননা করিয়া, বাঙলা ভাষাকে অবমাননা করিয়া।'

বাঙালী যখন না খাইতে পাইয়া মরিবে, তখন বলিব—let the dogs die starved, আর তুরস্কে বা কোয়েটায় যখন বন্যা আসিবে বা ভুমিকম্প হইবে, তখন ভিক্ষার ঝুলি হাতে করিয়া সেই সব নিরন্ন বাঙালীর দ্বারে দ্বারে বাহির হইব—'আরব আমার, ভারত আমার, চীনও আমার নহে গো পর'—এই হইল আমাদের মনোবৃত্তি। পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া কোন প্রকারে কিছুদিন কলিকাতা শহরে ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করিতে পারিলে এবং ভাল রকম একটা চাকুরী জোগাড় করিতে পারিলে বাঙলা ভাষাকে ঘৃণা করিতে শিখিব, বলিব—বাঙলা জবান কুত্তাকা জবান—অথচ তখনও হয়তো আমাদের মাতাপিতা দেশের বাড়ীতে সেই কুত্তাকা 'জবানে' আমাদিগকে সম্বোধন করিতেছেন —বলিতেছেন "বাবা কেমন আছো, অনেক দিন তোমার কোন খোঁজ খবর পাই নাই।" ইহাই হইল আমাদের জাতীয়তাবাদের নমুনা। যদি অনুকরণই করিতে হয় বিদেশী মুসলমানদের, তাহা হইলে তাহাদের ভিতর যে জাতীয়তাবোধ বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহা আমরা অনুকরণ করি না কেন? এই কলিকাতা শহরে অনেক সময় এমনও দেখা গিয়াছে যে, কোন পশ্চিমা-মুসলমান ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে তাহারা তাহাদের স্বদেশবাসী একজন হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীকে চাকুরী দিয়াছে, অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছে; কিন্তু বাঙালী মুসলমানকে দেয় নাই, তাহার প্রতি তাহারা সে অনুগ্রহ প্রদর্শন করে নাই।......

সকল দেশে ও সকল সমাজে দেখা গিয়াছে যে, তাহাদের জাতীয় জীবনের ধারার পরিবর্ত্তন আনিয়াছে বা তাহা পুনর্গঠন করিতে সাহায্য করিয়াছে তাহাদের ভাষা, তাহাদের সাহিত্য! বাঙলা দেশের ভাষা ও বাঙালী মুসলমানদের ভাষা এক কিনা তাহা আমরা জানিনা—তবে মুসলমানেরা যে বাঙালী নয়, তাহা এতদিন জানিতে না পারিলেও আজ জানিতে পারিয়াছি এবং বুঝিতে পারিয়াছি যে, নীল গগনের ওই শুভ্র চন্দ্রমাটিকে মুছিয়া ফেলিয়া সেখানে একটি 'চাঁদের চেরাগ' না জ্বালিলে কিছুই হইবে না।

বাংলা সাহিত্যের উন্নতস্তরে বাঙালী মুসলমানদের কোন বিশিষ্ট দান নাই—ইহার কারণ উন্নত শ্রেণীর মুসলমানদের ভিতর বাঙলায় ভাষার অবজ্ঞা—এই কথা আজ আমরা যতই চিন্তা করিতেছি, ততই বুঝিতে পারিতেছি যে, বর্ত্তমান বাঙলা ভাষাতে আমাদের কিছুই হইবে না—উহাকে এখন কলেমা পড়াইয়া শুধরাইয়া লইতে হইবে।

আমরা মুসলমান সাজিয়া বসিয়া আছি একমাত্র গরুর গোশ্তের লোভে। মুসলমান বলিয়া আমরা বড়াই করি, আরব পারস্যের স্বপ্ন দেখি, আবদুল্লা ও মর্জ্জিনার নাচে আত্মহারা হইয়া যাই, অতীতের ইতিহাসকে আত্মম্ভরিতার সহিত স্মরণ করিও অথচ আমাদের কালচার-কৃষ্টি সম্বন্ধে আমাদের কতটুকু ধারণা আছে, তাহা শুধু আমরাই জানি। নামের পূর্ব্বে মৌলবী না লিখিলে আমরা চটিয়া যাই অথচ এক লাইন কোরাণের অর্থ বিশ্লেষণ করিতে বলিলেই অমনি চশমা মুছিতে আরম্ভ করি। আমরা শুধু এতটুকুই জানি যে, পথে ভয় পাইলে 'কোলহুআল্লা' পড়িতে পড়িতে চটি খুলিয়া হাতে লইয়া পলায়ন করিতে হইবে। আরবী কোরাণ হইতে ইংরাজী অনুবাদ করেন প্রথম বাঙালী অমুসলমান ৺গিরিশ বসু, ইংরাজী ওমর খৈয়াম হইতে বাঙলা অনুবাদ করেন বাঙালী অমুসলমান দুইজন শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, শ্রীযুক্ত কান্তি ঘোষ, বাস্তবের তাজমহলকে লইয়া বাঙলা সাহিত্যের অমর কাব্য রচনা করেন বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথ। বাঙলা ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে মুসলমান সিরাজউদ্দৌলার কলঙ্কমোচনের প্রথম প্রচেষ্টা হয় ৺অক্ষয় মৈত্রের। হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণের আত্মশ্লাঘা হয়তো বাঙালী হিন্দু তরুণ-তরুণীর, কারাবরণের গৌরব হয়তো তাহাদেরই। আমরা শুধু কাঁদিয়া জিতিয়া যাই—'হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান্'।

মেঘ-তরণী

শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

এক
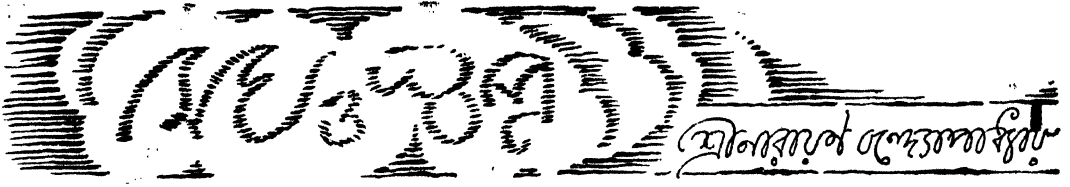
বিদ্যুৎকে যে ঠিক সহজে বোঝা যায় না—হাত দিয়ে ছোঁয়া যায় না, এর জন্যে গার্গীর কোনদিনই দুঃখ ছিল না। বরং তাকে অনুভব করতে হ'লে যে বিশেষ একটা মনের অবস্থার প্রয়োজন আছে, এবং তা গার্গীরই নিজস্ব, একথা ভেবে সে স্ফীত, কিছুটা গর্বিত। বিদ্যুৎ সম্বন্ধে গার্গীর চিন্তা নির্দিষ্ট সীমারেখা পর্যন্ত অগ্রসর হ'য়ে থামে—তার বেশী চিন্তা করাকে গার্গী কোনদিনই প্রশ্রয় দেয় নি। দেবেও না। সব থেকে ভাল লাগে ওর খেয়ালগুলোকে। নিজের সম্বন্ধে তার গভীর উদাসীনতা আর এলোমেলো অগোছালো ভাব গার্গীকে স্পর্শ ক'রেছে কতবার, আনন্দ দিয়েছে, হাসিয়েছে! তার এই ঔদাসীন্য—এই নির্লিপ্ত শান্ত, সমাহিত জীবনের উচ্ছ্বাসহীন স্রোতোবেগে গার্গী কতবার ভেসেছে; কিন্তু তবুও, গার্গীর মনে পড়ে, কোথায় তার মনের এক কোণে সহানুভূতির লঘু মেঘ অজ্ঞাতসারে জমা হ'য়ে উঠেছিল,—একদিন তারই আত্ম-প্রকাশে গার্গী লজ্জিত হ'ল। কিন্তু সে লজ্জা গার্গীকে অস্পষ্ট, ঝাপ্‌সা হ'তে দেয়নি। গার্গী শুধু তার এই বিশৃঙ্খল জীবনের একটা শৃঙ্খলার ইংগিত ক'রেছিল মাত্র, বিদ্যুৎ হেসেছিল, বলেছিল, "এই-ই তো ভালো, ভাস্‌তে ভাস্‌তে একদিন দেখা যাবে একটা কূলে এসে প'ড়েছি, হয়তো সেটাই হবে আমেরিকা,—নূতনতম আবিষ্কার, জীবনের একটা অপরিচিত দিকের আকস্মিক উন্মোচন! তবু বল্‌তে পারবো: বৈচিত্র্য পেলাম জীবনে।"

তখনই গার্গী এ কথার উত্তর দিতে পারেনি, পরে বলেছিল: "অন্যরকমও যে ঘটতে পারে না, এমন আশঙ্কাই বা তোমার নেই কেন বিদ্যুৎ? —ধরো" গার্গী মনে মনে আশঙ্কার বিষয়টাকে ঘনীভূত ক'রে নিয়েছে ততক্ষণে, "ধরো টাইফুন আছে, মেঘ আছে—দিগন্ত-বিস্তৃত ঘন নীল আকাশের সৌন্দর্যকেই বা কতক্ষণ বিশ্বাস করা যায়? তার ওপরে আছে ওয়ালরাশ, আছে তোমার, ক্ষিপ্ত, উন্মত্ত সংগীরা, তারপরে সেই অপরিচিত দেশবাসী তোমার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান্ নাও হ'তে পারে।"

বিদ্যুৎ হেসেছিল, বলেছিল, "তোমাদের পক্ষেই এটা সম্ভব! এ-ধারণা তোমাদের অযৌক্তিক নয়, সকলের আগে বিপদের হিংস্র অতিকায় দেহটাই চোখে পড়ে, তার ওপারের সৌন্দর্য-নিকেতনে যে পৃথিবীর পর্যাপ্ত সুখ তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছে, সে-কথা সম্পূর্ণ ভুলে যাও।"

"এ কথায় এই প্রমাণ করতে চাও যে আশঙ্কাটা শুধু মানুষের একটা বিশেষ শ্রেণীর ভেতরেই সীমাবদ্ধ র'য়েছে?" গার্গী একটু উত্তপ্ত কণ্ঠে ব'লেছিল, "যুগে যুগে তোমরাই মেরু আবিষ্কার ক'রেছ?"

"তোমরাও ক'রেছো" বিদ্যুতের মুখে সেই নির্লিপ্ত হাসি, "কিন্তু কত কম গার্গী?"

গার্গী উত্তর দেয়নি। ওর এই সহজ নির্লিপ্ততা, এই সহজ ঔদাসীন্যে, এই ধীর শ্লথ গতি গার্গীকে যেন অভিভূত করে সময়ে সময়ে।

তবু গার্গী ছাড়েনি, একদিন পুরোনো আলোচনার সূত্র ধ'রে আবার টান দিয়েছিল, বলেছিল, "আপাততঃ মহাপুরুষের সমুদ্র-যাত্রায় সব ক'টি জাহাজের পালই পূর্ণবেগে উড্ডীয়মান না কি?" এ কথার উত্তরেও বিদ্যুৎ সেই রকম সামান্য একটু হেসেছিল, "তোমার শ্লেষের জন্যে ধন্যবাদ দেবো, তবে শুনে সুখী হ'বে কিনা জানি না—পূর্ণবেগেই সব কটা পাল্লা মেলে আমি ভেসেছি" একটু থেমে ব'লেছে, "সামনে কোনও দ্বীপের সামান্যতম চিহ্নও পাওয়া যায়নি—সুতরাং এখন আমার ভেসে চলবারই কথা।"

"দ্বীপে উত্তীর্ণ হ'বার আশা মনে মনে পোষণ করছো নাকি আজকাল?" গার্গীও হেসে প্রশ্ন ক'রেছিল, "এ দুর্মতির কারণ জান্‌তে পারি?"

"নিশ্চয়ই" বিদ্যুৎ বলেছিল, "যে কারণে রোজ ভোরবেলা অগ্নিবর্ণ সূর্যের শৈশব জীবনের সৌন্দর্য ছড়িয়ে পড়ে,—ছড়িয়ে পড়ে আকাশের পূর্ব তোরণে।"

"ভয়ংকর দুর্বোধ্য কবিতা হ'য়ে গেল বিদ্যুৎ, আর একটু সহজ ক'রে বল্‌তে পারতে।"

"এর থেকেও সহজে বোঝাতে পারি, একথা জান্‌লে কি ক'রে?"

"অন্ততঃ অনুমান করার স্বাধীনতা আমার আছে, একথা বিশ্বাস করতো?" গার্গী বলেছিল।

বিদ্যুৎ উত্তর দেয়নি, অনেকক্ষণ পরে ব'লেছিল "যেটা স্বাভাবিক এবং অবশ্যম্ভাবী তাকে অস্বীকার করবার মত দুর্বলতা আমার নেই গার্গি।"

"তবেই তো" গার্গী তার নিজের সুকঠিন দৃঢ় মতবাদে এতক্ষণে ফিরে যেতে পারল, "তবেই তোমার এই অনির্দিষ্ট অর্থহীন সঞ্চরমান অবস্থার স্ব-পক্ষে যে যুক্তি নেই, এ কথাও স্বীকার করছো তো?"

"কিন্তু এটাও যে স্বাভাবিক" বিদ্যুৎ সেই আগের মতই গম্ভীরভাবে উত্তর দিয়েছে।

গার্গী এ কথার পরে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ছিল। পরে একটু অন্যভাবে আবার সে প্রশ্নটা টান্‌ল, বল্‌লে, "আমেরিকার মাটীতে পৌছবার জন্যে যে সাহস প্রয়োজন, তার কত অংশের তুমি অধিকারী—সে কথা আগে ভেবে দেখেছ কখনও?

"অর্থাৎ আমি কাপুরুষ?" বিদ্যুৎ হাস্‌ল।

"ঠিক সেই কথাটাই বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, যেটা স্বাভাবিক সেইটারই কথা বলেছি" প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপে গার্গী সামান্য ঝিক্‌মিক্ ক'রে উঠ্‌ল।

"আগেই এটা তোমার উপলব্ধি করার কথা গার্গী", বিদ্যুৎ বলেছিল, "যে জাহাজ মধ্য-সমুদ্র-পথে পূর্ণবেগে চ'লেছে, দিনের পর দিন, সে পঙ্গু নয়। এ কথা অতিরিক্ত সহজবোধ্য।"

"কিন্তু ভাসাটাই যে বড় জিনিষ, একথা তুমি জান্‌লে কি ক'রে?" গার্গী বলেছিল, "এমন একদিন আস্‌বে যেদিন দেখ্‌লে জাহাজের তলদেশে প্রকাণ্ড একটা ক্ষত হ'য়েছে,—সেই ক্ষতের নির্মম প্রতিক্রিয়া সহ্য করবার শক্তি সমস্ত জাহাজবাসীর আছে কিনা, সেইটাই চিন্তনীয়, আমার সন্দেহ আছে বলেই প্রশ্নটা তুল্‌লাম বিদ্যুৎ।"

বিদ্যুৎ এবারে জোরে হেসে উঠেছিল, উঠে দাঁড়িয়ে হাত দুটো যোড় ক'রে অনুনয়ের ভংগীতে বলেছিল, "হে সন্দেহবতি, অনেকক্ষণ তোমার এই সন্দেহ নিরসনের জন্যে মর্মান্তিক চেষ্টা ক'রেছি, এখন অবনত মস্তকে স্বীকার করছি: আমি অর্ধ-পরাজিত দয়া ক'রে এইবারে এক কাপ চা আন্‌লে সম্পূর্ণ পরাজিত হ'ব।"

গার্গী ভেবে দেখেছে, বিদ্যুৎকে ঠিক এইভাবে যুক্তি-তর্ক দিয়ে বোঝানো নিতান্ত অর্থহীন, তবু তার আশা ছিল যদি কিছু পরিবর্তন সে আন্‌তে পারে তার জীবনে সামান্য হ'লেও ক্ষতি নেই। কিন্তু তার সে আশাও একদিন দেখা গেল ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হ'য়েছে।

কিন্তু এর জন্যেও গার্গীর দুঃখ ছিল না—হয় তো এই শৃঙ্খলাহীন জীবনের বেদনা তাকে ছুঁয়েছিল, বিদ্যুতের এই অস্থির জীবনযাত্রা, উদাসীন কর্মপন্থা, তার ভাল লাগ্‌ত না, তবু গার্গী ভেবে দেখেছে এর মধ্যেই ওর যেন ছিল কেমন একটু সুষ্ঠু কমনীয়তা, কেমন একটা নৈর্ব্যক্তিক রস-কল্পনা। তারই মধ্যে বিদ্যুৎকে যেন দেখাতো কান্তিমান, আত্মবিশ্বাসে গম্ভীর, দৃঢ় একটী পৌরুষের প্রতিচ্ছবি!

আত্মবিশ্বাসের কথায় গার্গীর একটা পুরাণো দিনের ঘটনা মনে পড়ল। তখন বিদ্যুৎ সবেমাত্র শঙ্কিত-সঙ্কোচে বিরাট্ জনমণ্ডলীর একধারে লেখনী নিয়ে নেমে এসেছে—দিগন্তব্যাপী সেই প্রতিযোগীতার আকাশে তখন সে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করছে—ছোট্ট একটী ম্লান, নিষ্প্রভ তারকার মত। সেই সময়েই তার গার্গীর সংগে পরিচয়। গার্গী বলেছিল, "আপনি এত লেখেন, কিন্তু প্রকাশ করেন না কেন?"

বিদ্যুৎ হেসে বলেছিল, "প্রকাশ করি, কিন্তু প্রকাশিত হয় না"।

"অর্থাৎ—" গার্গী কথাটা বুঝ্‌তে পারেনি।

"অর্থাৎ সম্পাদকেরা ছাপেন না।"

"তবু আপনি লিখ্‌তে এত উৎসাহ পান?"

বিদ্যুৎ আবার হেসেছিল, বলেছিল, এইজন্যই উৎসাহ পাই যে তাঁরা বুঝ্‌তে পারেন নি, যেদিন বুঝ্‌তে পারবেন সেদিন আমার লেখা আর অবহেলিত হ'বে না।"

তারপরে বিদ্যুৎ ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর হ'য়ে উঠেছে; গার্গী লক্ষ্য ক'রেছে—নিদারুণ দুঃখের দিনেও বিদ্যুতের সাধনা ব্যাহত হয়নি, ক্রমশঃ সে স্ফুটতর হ'য়ে উঠ্‌লো, আভা থেকে আলোয়, জ্যোতিঃ থেকে জ্যোতির্ময়তায়, অংকুর থেকে মহীরুহে। তারপর একদিন দেখা গেল—বিরাট্‌ জনতার ভেতরে বিদ্যুৎকেই সকলের আগে চেনা যাচ্ছে। কোনও সাহিত্য-সঙ্ঘে বিদ্যুৎ সভাপতি হ'লে সদস্যেরা কৃতকৃতার্থ হ'চ্ছেন, কোনও তরুণ লেখকের ভূমিকা-রচনায় বিদ্যুৎ বসুকে দেখ্‌লে তাঁর বন্ধুরা কেউ বা গর্বিত, কেউ বা ঈর্ষ্যান্বিত!

কিন্তু এই খ্যাতি বিদ্যুতের জীবনে আন্‌লে প্রচণ্ড পরিবর্তন। অনেকেরই তা লক্ষ্য এড়িয়েছিল—কিন্তু গার্গী ধ'রেছে—গার্গীর চোখে এইটাই স্থূল হ'য়ে লাগ্‌ল। প্রথমে;—প্রথমে অর্থাৎ এই সাহিত্য-জীবনের অরুণোদয়ে বিদ্যুৎ যা ছিল, আজ দেখা গেল সে ঠিক তারই বিপরীত-পন্থী। এইটাই গার্গীকে বেশ পীড়া দিল। যে এত শক্তিশালী—যে এতখানি গভীরভাবে চিন্তা করতে পারছে—সে কেন হ'বে উদাসীন—এমন নির্মম ভাবে সমস্ত পৃথিবীর আবেদনকে করবে অতিক্রম—কেন হ'বে তার এমন বিশৃঙ্খল জীবনযাত্রা? গার্গীর গৃহমুখী মন বিদ্যুৎকে টান্‌তো—স্থির হ'য়ে বসুক সে একবার, তারপর গার্গী একদিন তাকে বোঝাবেই—গার্গী তাকে বল্‌বে কোথায় তার দুঃখ, কোথায় তার চরম অন্তর-বেদনা, কেন সে কাঁদে!

কিন্তু বিদ্যুৎ এক মুহূর্তও স্থির হ'য়ে ব'স্‌তে পারেনি। তবু—তবু গার্গী ভেবে দেখেছে এততেও তার হয় তো দুঃখ ছিল না—যা ছিল তা মনেই থাকুক, তাকে কোনদিন গার্গী সূর্যের আলোকে মেলে ধরবে না—ক্ষীণ সম্ভাবনা নিয়ে গার্গী হয় তো তারও পথ হাঁট্‌তে পারতো! আরও দূরে—কোনও শ্যাম-তালীবন-বেষ্টিত কুঞ্জে—যেখানে সহযাত্রীদের মধ্যে বিদ্যুৎ নেই—তবে তার আকাশে বাতাসে বিদ্যুতের ক্ষীণতম সম্ভাবনা আছে জড়িয়ে। বলা যায় না—সেই উষর মরু-প্রান্তর পার হ'য়ে একদিন দেখা গেল পূর্ণবেগে কার যেন ঘোড়া আসছে ছুটে, কার পদশব্দে সমস্ত মরূদ্যানে যেন সাড়া জাগ্‌ল, তার পিছনে হয়তো ঘোরালো মেঘ—সাম্‌নে মরুঝঞ্ঝার অবশ্যম্ভাবী পূর্বাভাষ—তবু সেই অশ্বারোহী ভ্রূক্ষেপহীন গতিতে ছুটে এসেছে, এবং যে এসেছে, সে বিদ্যুৎ!

কিন্তু এটা কবিতাই। গার্গী মনে মনে হেসেছে। কল্পনার এই ক্ষণ-বসন্ত চিন্তার এই ক্ষণ-বিলাস গার্গীকে পীড়া দেয়, অথচ আশ্চর্য; গার্গী ভেবে দেখেছে-জীবনে সে একটা সামান্য ছোট কবিতাও লিখ্‌তে পারল না, উপরে নীচে সমানে ছন্দ রেখে সুন্দরভাবে দুটী মিল সে সারা জীবনেও মেলাতে পারেনি। এক একবার মনে হ'য়েছে, হয়তো তার সাধনা হয়নি—সাধনার নামে শুধু চেষ্টাই হ'য়েছিল! কিন্তু, কিন্তু তাতেও কি গার্গীর ক্ষোভ ছিল? শুধু যদি বিদ্যুৎ তাকে ব'লে যেত—একটুও ভাববার সময় দিত, মুখোমুখি দাঁড়াবার লজ্জাকে সে যদি অতিক্রম করতে পারতো একবার!

আজ, এটুকুও কি তার বিদ্যুতের কাছে দাবী করার নেই—যাবেই যদি সে, কেন গেল ভীরুর মত, নিঃশব্দ পায়ে দূর ভবিষ্যতের অন্ধকারে। কেন গেল না বন্যার অজস্রতায়। ভাসিয়ে নিলে না গার্গীকে—কি তার দুঃখ, কি তার বেদনা, কেন সে জানাল না তাকে!

দীর্ঘ তিনমাস! গার্গীর মনে হ'ল তিন মাসের এই অনতিক্রমণীয় মন্থর দিনগুলি পাথরের মত ভারী হ'য়ে তাকে ঘিরে ধ'রেছে। অথচ যখন সে বি, এ, পড়তো, কি তাড়াতাড়িই সময়টা পার হ'ত তখন—মাসের পর মাস গার্গীর চোখের ওপর দিয়ে মসৃণভাবে চ'লে গেছে—গার্গী বুঝ্‌তেও পারে নি। জান্‌লার বাইরে কখনই বা বসন্ত এল, কখনই বা স'রে পড়ল, তার কোনও খবরই সে রাখেনি।

হয়তো রাখবার সময় ছিল না বলে'ই—হয়তো সে তখন আপনার মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মস্থ হ'য়ে থাকতে পেরেছিল, তাই। তবে আর একটা মুখ্য কারণ যে এর সংগে জড়ানো ছিল, সেটাও গার্গী অনুভব ক'রেছে মাঝে মাঝে; কিন্তু সেটাকে প্রাধান্য দেয়নি—মনের মধ্যেই ঢেকে রেখেছে। সে বিদ্যুৎ। গার্গীর দূর-বিস্তৃত বিরাট্‌ রাজপথে বিদ্যুৎ তখন সবে পা ফেলেছে, তার পদপাতে সমস্ত অশোকতরুর মূল কেঁপে উঠেছে। পথের

ধারের পলাশের পাতায় পাতায় লেগেছে রঙের ছোঁয়া, মর্মরিত নারিকেল কুঞ্জের অন্তরালবর্তী চন্দ্রালোকে সে পথ উজ্জ্বলতর, গার্গী সারা শরীরে তখন শিউরে উঠেছে মুহূর্তে মুহূর্তে—বাইরে কখন বসন্ত এল—কখন বসন্ত গেল—কি প্রয়োজন তার সেই সামান্য তুচ্ছতম সংবাদ-সংগ্রহের?

গার্গী মাথা তুললে। শাড়ীগুলো সেইভাবেই প'ড়ে আছে—একটাও গোছানো হয়নি। উত্তরের জানলাটা খোলা; অদূরবর্তী জনযানমুখরিত পথের কোলাহল স্তিমিত হ'য়ে এসেছে। গার্গী জানে এইভাবে ব'সে থাকার কোনও অর্থই নেই—তবু তার মাঝে মাঝে এই স্নায়বিক দৌর্বল্যকে জয় করা কঠিন হ'য়ে ওঠে—মাঝে মাঝে গার্গীর এই রকম কাজের মধ্যপথে সমস্ত শরীর মেলে দিতে ইচ্ছে করে অকারণ অলসতায়—চিন্তার এই শিথিল বিলাসে। ভালই লাগে। গার্গী ভেবে দেখেছে —কোথা দিয়ে সময়টা কাটে, তা মোটেই অনুধাবন করা যায় না। অবশ্য এই চিন্তার মধ্যে যে সময়টুকু ব্যয়িত হয়, সেইটুকু সময়ের কথাই গার্গী ভাবে। পরবর্তী বিরাট্ সময়ের স্রোত তো পাথরের মত ভারী হ'য়ে তাকে ঘিরে ধরে, সে-কথা আগেই আমরা জেনেছি। এই পরবর্তী সময়টার জন্যেই গার্গী শঙ্কিত—গার্গীর সমস্ত শারীর-চেতনা সেই নিষ্করুণ নির্মম সময়ের চিন্তাতেই যেন আচ্ছন্ন হ'য়ে আসে—জীবনটাকেও একটা পাথরের মত কোনও ভারী বস্তুর সংগে তুলনা দিতে ইচ্ছে হয় গার্গীর।

দরজায় শব্দ হ'ল। গার্গী মুখ তুললে, "কে?"

"আমি,—কি করছিস্ ভেতরে খিল দিয়ে?"

দরজার কাছাকাছি গার্গী উঠে এল, বললে, "সাজগোজ শেষ করছিলুম—লগ্নের সময়টা এগিয়ে এসেছে কিনা?" বলে' খিলটা খুলে দিলে।

"এতো সখ? —এখনও সাধ আছে নাকি একটুও?" আভা হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকল, "আমি তো ভেবেছিলুম আজ আর ঘর থেকে বেরুবি না মোটে—কিন্তু এটা ভাদ্দর মাস, কোন্ অরক্ষণীয়কে উদ্ধার করছিস্?"

গার্গী হাসলে, বললে, "বোঝ্—তোর কাকে মনে হয়?"

"নির্ভয়ে বলব?" আভা প্রশ্ন করল।

"না, স-সঙ্কোচেই বল, তবে শাস্তিটা কমই হ'বে জানিস্।" আভা আবার হেসে উঠল, বললে, "যে তোর মনটা জুড়ে এতক্ষণ ব'সেছিল আর আমি আসার পূর্ব মুহূর্তেই যে পালিয়েছে—"

এবার গার্গী সামান্য একটু হাসল, বললে, "নিজের জন্যে সত্যিই আমার দুঃখ হয় আভা—আমাকে একেবারে সাধারণের কোঠায় ফেললি—অন্ততঃ আমার চিন্তার যে নিজস্ব ভংগীকে তুই স্বীকার ক'রেছিলি একদিন, আজ তাকেই এত সহজে অস্বীকার করলি?"

"অত ঘুরিয়ে বলিস্ নি—মাথাটা আমার এখনও ছাড়েনি—সোজাসুজি বল—" আভা বললে।

"অর্থাৎ বিদ্যুতের কথা বলছিস্ তো?" গার্গী প্রশ্ন করলো "যদি তাই-ই হয়" আভা হাসল "তাতে ক্ষতি আছে কোনও গুরুতর রকমের?"

"ক্ষতিটাই সব জায়গায় বড় নয় রে আভা"—গার্গী আভার গাল দুটো টিপে দিলে, "তোর মনটাকে আর একটু ঝক্‌ঝকে করিস্—বুঝলি?"

"আচ্ছা তা নয় করা গেল, কিন্তু ভাবনাটা যে আমারও মধ্যে প্রবল হ'য়ে উঠছে; একটা মীমাংসা প্রয়োজন" আভা বললে।

"কেন, অলকেন্দুও কোনও আলোকপাত করতে পারলো না? মিছিমিছিই তোর দিনগুলো কাটল এখানে আভা?"

আভা হাসল, বললে "সত্যি বিদ্যুতের সম্বন্ধে আমি প্রায়ই ভাবি গার্গী—তোর এই শীর্ণায়মান স্তিমিত-দ্যুতি তাপসীমূর্তি আমাকে প্রায়ই ভাবায়, এতদিন তবু কাছে ছিলাম, দেখতে পেতাম। চোখের ওপরে তোকে আর অধঃপতনের দিকে নামতে দিতাম না, কিন্তু আবার ডাক পড়ল দিল্লীতে; এখন শুধু চিঠি—কিন্তু চিঠিতে আমরা কিই বা জানাতে পারি বা জানতে পারি?"

গার্গী হাসল, বললে, "তোকে এ কথার জন্যে পিঠের ওপরে একটা কিল মারতে ইচ্ছে করছে—কিন্তু নেহাৎই কাল যখন চ'লে যাচ্ছিস, তখন আমার সে ইচ্ছেকে সংবরণ করলাম; কাল ভোরেই যাচ্ছিস্?"

"হ্যাঁ, সেই রকম কথাই আছে" আভা বল্‌লে। "অলকেন্দু কিন্তু আমার সংগে দেখা করেনি এখনও—কথাটা মনে করিয়ে দিস্‌" গার্গী আভার দিকে চাইলে কাল যাবার আগে যেন একবার আসে, বুঝ্‌লি?"

"ওর কথা আর বলিস্ না" আভা বল্‌লে, "লজ্জাতেই বাবু গেলেন, সেই যে বিয়ের সময়ে তুই কি সব বলেছিলি, সেই থেকেই ও তোকে সমীহ করে, বলে, "বাবা, দিদির কাছে আর যাচ্ছি না।"

গার্গী হাস্‌লো, বল্‌লে "বলিস, দিদি এবার আর কিছু বল্‌বে না, ভীষণ ভদ্র হ'য়ে উঠেছে সে আজকাল।"

ঘড়িতে ন'টা বেজে গেল। আভা উঠে দাঁড়ালো "কিন্তু আমি যা বল্‌তে এসেছিলাম, শেষ পর্য্যন্ত তুই তা বল্‌তে দিলি না গার্গী।"

গার্গী ভ্রূ কুঞ্চিত করলে, "অর্থাৎ—?" একটু থেমে বল্‌লে, "ভূমিকা ছাড়—"

"অর্থাৎ বিদ্যুৎ সম্বন্ধে আমি অত্যন্ত চিন্তিত!"

"শুনে সুখী হ'লাম—আরও কিছু বল্‌তে চাস্?"

"হ্যাঁ", আভা গার্গীর কাছে এগিয়ে এল, হাত দুটো ধ'রে টেনে নিয়ে বিছানার ওপরে বসালো, বল্‌লে, "আমার কাছেও লুকোবি গার্গী?—তোর কান্না যে আমি রোজ শুনতে পাই, তোর চোখের দৃষ্টিতে যে তার প্রমাণ—তার প্রমাণ র'য়েছে তোর প্রাত্যহিক পথ-চলায়; তবু লুকোবি?"

গার্গী চুপ ক'রে রইল।

"বি-এ পাশ ক'রেছিলি এই জন্যেই? এই চিরন্তন গতানুগতিকতার একচ্ছত্র আধিপত্য হ'তে দিলি তোর জীবনে?"—এতটা আমি কোনদিনই ভাবিনি গার্গী!"

গার্গী উত্তর দিল না। আভা উঠে দাঁড়াল, বল্‌লে "কঠিন মাটীর ওপরে আলগোছে পা ফেলায় বিপদ আছে জানিস্—কঠিন ভাবেই চলা উচিত"—একটু থেমে সে বল্‌লে, "আজ আমি একটা অন্যায় ক'রেছি—তার জন্যে অনেক আগেই তোর কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সময় হয়নি—বিদ্যুতের একটা চিঠি পেয়েছি।"

গার্গী এতক্ষণে উত্তর দিলে, বল্‌লে, "তোকেই লিখেছে?"

"না, তোকে;—পিয়ন ভুল ক'রে পাশের বাড়ীতেই দিয়ে গেছে—আমি সেটা খুলেছিলুম—আমার অপরাধের উল্লেখ আগেই ক'রেছি।"

গার্গী সেই ভাবেই ব'সে রইল, নির্লিপ্ত গলায় বল্‌লে, "ভালই ক'রেছিস্, আমার হাতে এলে হয়তো খুলতাম না।"

"এতটা উদাসীনতা কিন্তু বাহুল্য বলে যে কোনও ভদ্র মহিলার মনে হওয়া স্বাভাবিক।"

"যদি তাই-ই হয়—সেজন্যে আমি যথেষ্ট দুঃখিত" গার্গী উঠে দাঁড়াল—"এতদিন পরে এই অকারণ স্মরণের কোনও মূল্য দেওয়ার শক্তি আমার নেই—থাক্‌লেও আমি কেন দেব, বুঝ্‌তে পারি না।"

আভা টেবিলের ওপরে খামটা রেখে দিলে, বল্‌লে, "চল্‌লুম—রাত্তির হ'য়েছে—কাল ভোরে আস্‌ব একবার; বড় অসময়ে চিঠিটা হাতে পড়ল, তিন চারদিন আগে এলেও হ'ত।" আভা দরজা খুলে' বেরিয়ে গেল।

গার্গী উঠ্‌ল না। জান্‌লা দিয়ে রাত্রির ঘনীভূত অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইল শুধু। রাত্রির অন্ধকারের মতই ঘন আর নীল বেদনা গার্গীকে ঘিরেছে। গার্গীর সমস্ত শরীর ঘিরে তারই তীব্র অনুরণন! 'হে ঈশ্বর' গার্গী প্রার্থনা করলে মনে মনে—তাকে শক্তি দাও—শক্তি দাও, সে যেন এই ভাবেই চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌তে পারে সুদীর্ঘ দিন—অনন্ত কাল!

(ক্রমশঃ)
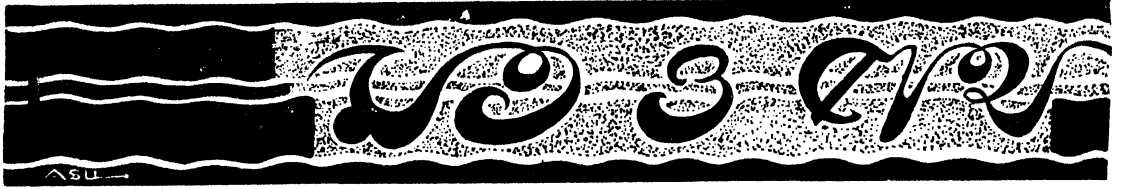
ধর্ম্ম-বিরোধ না স্বার্থ-বিরোধ?

ঢাকায় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে রক্তগঙ্গা বহিল। কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিলেও, উক্ত অঞ্চলের জীবনযাত্রা আমাদের লিখিবার সময় পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ নিরাপদ্ হয় নাই। যে বিষ-ব্রণের ইহা বিস্ফোরণ, তাহার সঠিক নিরাকরণ আজ পর্য্যন্ত বোধ হয় হয় নাই বা হইলেও, তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা সম্পর্কিত কাহারও হাতে নাই। এই ব্যাধি যেন চিকিৎসার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে বলিয়াই অধুনা বোধ হইতেছে। যাঁহারা চিকিৎসা করিতে পারেন, তাঁহারা নানা কারণে এ পর্য্যন্ত সুচিকিৎসার পরিবর্ত্তে কুচিকিৎসায়, অপচিকিৎসায় প্রকারান্তরে রোগবৃদ্ধিরই সহায়ক হইয়াছেন। তাঁহাদের মুখের অসতর্ক উক্তি ও অসমীচীন আচরণ অনেক সময়েই ইহার যোগাইয়াছে ইন্ধন—তারপর যখন রোগ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তখন তাহা চাপিতে গিয়া আরও ঘটিয়াছে বিপাক, অনর্থই বাড়িয়া চলিয়াছে। এ অবস্থা আর মানবাত্মার তথা জাতীয়াত্মারও সহনীয় নহে।

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম—নিখিল-বঙ্গ সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী দিবসে কলিকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন ও মুসলিম ছাত্র লীগের উদ্যোগে এই অসহ্য অবস্থার তীব্র অনুভূতি লইয়া একটী মহতী নাগরিক সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে ও তাহাতে শুধু সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের নিন্দা নয়, উপদ্রুত অঞ্চলে শান্তি ও সম্প্রীতি-রক্ষার জন্য ও জনসাধারণের মধ্য হইতে অপ্রীতিকর ভাব বিদূরিত করার জন্য ছাত্রদল-গঠন এবং জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সেবা ও সাহায্যের ব্যবস্থার সঙ্কল্প হইয়াছে। বাংলার ভবিষ্যৎ যারা, তাহারা যথার্থ এইভাবে উদ্বুদ্ধ হইলে, এই শোচনীয় অবস্থার গতিস্রোতঃ নিশ্চয়ই ফিরাইয়া দিতে পারেন, আমরা ইহা প্রত্যয় করি।

সভাপতি অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর এই সভায় ঠিক সুরেই কথা কহিয়াছেন—"প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম্ম লইয়া সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে মারপিঠ হয় না। মিঃ জিন্না প্রমুখ সাম্প্রদায়িক নেতৃবৃন্দের ধর্ম্মের সহিত বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। এই সকল নেতা ধর্ম্মকে নিজেদের কার্য্যে লাগাইয়া থাকেন মাত্র।"

জাতীয় শিক্ষায় বাধা

বাঙালী জাতীয় জীবনগঠনের জন্য একদিন জাতীয় শিক্ষার প্রবর্ত্তনে উদ্যোগী হইয়াছিল। সে উদ্যম কার্য্যতঃ সফল হয় নাই। স্বদেশী ও বিপ্লবযুগের বাঙালী দিন দিন অন্য মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। সে জাতীয়তার দৃষ্টিভঙ্গী আর নাই। সর্ব্বত্র কুণ্ঠা ও সংশয়, পরস্পর সঙ্কীর্ণ প্রতিযোগিতা—এ অবস্থায় কোনও শুভ চেষ্টাই বাঙালী সর্ব্বসাধারণের সহযোগিতার অভাবে দীর্ঘস্থায়ী ও ফলবতী হইতে পারে না। এই অবস্থারই ভিতর প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ রাষ্ট্রক্ষেত্রের বাহিরে দাঁড়াইয়া সংগঠনমূলক দেশসেবার বিবিধ প্রকার প্রচেষ্টা করিয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহার এই গঠনমূলক অসঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীও সংশয়ীর সংশয় বা সাম্প্রদায়িকতাবাদীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা এড়াইতে পারিতেছে না। সঙ্ঘের অর্থসচিব ময়মনসিংহের মেলেন্দহ পল্লীক্ষেত্রে সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠিত একটী জাতীয় বিদ্যালয়ের অবস্থা-পরিদর্শনে আমাদিগকে পত্র দিতেছেন—

"এখানকার যা অবস্থা, তাতে স্কুল রক্ষা করা দায়ের কথা। কয়েক জন উৎসাহী লোক আছেন, কিন্তু দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁদের আর্থিক আনুকূল্য কত আর আশা করা যায়? হিন্দু-মুসলমান সমস্যা তো আছেই। মুসলমানেরা উদ্যোগী হয়ে যে স্কুলটী খাড়া করেছে, তাদের পিছনে state-help ও ব্যক্তিগত সাহায্য (জিদের বশবর্ত্তী হয়ে) বেশ রয়েছে। ওটাই যে কালক্রমে affiliated হয়ে যাবে, এ আশা সকলেরই। তার উপর দেশের আর্থিক দুর্দ্দশা এত মূর্ত্ত, সেখানে মাহিনা দিয়ে ছেলেদের লেখাপড়া শেখান

অতিশয় দুরূহ ব্যাপার। অনেকেই মনে করেন—আমাদের স্কুল উঠে গেলে ছেলেদের হিন্দুভাবাপন্ন রাখা ভবিষ্যতে আর সম্ভব হবে না! এই অবস্থায় তাঁরা এখনও কিছু উদ্যোগী আছেন।"

বাঙালী জাতিগঠনকামী না হইলে, যে কোনও শুভ চেষ্টাই আরম্ভ হউক, তাহা ব্যর্থ হইবে। রাষ্ট্রীয় অর্থস্তম্ভে সাম্প্রদায়িক শিক্ষা-সৌধ দুই দিন দাঁড়াইয়া থাকিলেও, জাতীয় প্রাণের মাতৃদুগ্ধ বিষাক্ত হইলে বাহিরের কোনও সাহায্যই তাহাকেও বহু দিন রক্ষা করিতে পারিবে না। আমরা বিপন্ন বাঙালীকে আজ সমবেতভাবেই অন্ততঃ শিক্ষার ক্ষেত্রটুকু সঙ্কীর্ণতামুক্ত রাখিতে অনুরোধ করিতেছি।

প্রাথমিক শিক্ষা

মাধ্যমিক শিক্ষার প্রতি অস্বাভাবিক ঝোঁক দিতে গিয়া বঙ্গীয় মন্ত্রিমণ্ডলী বোধ হয় তাল রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। তাঁহাদের প্রাক্-নির্ব্বাচনী প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের সঙ্কল্পটী সম্ভবতঃ এই অবস্থায় ধামা-চাপা পড়িয়াই গেল। টাকার অভাব তো আছেই; কিন্তু তাহার জন্য কোটী টাকা ঋণ করার প্রস্তাব যখন গৃহীত হইল, তখন আবার অন্য বাধার কথা যথাক্রমেই উঠিয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষাপ্রচারের জন্য প্রায় ১ লক্ষ ৮৪ হাজার শিক্ষক চাই আর সে শিক্ষক হওয়া চাই সুশিক্ষিত অর্থাৎ ট্রেণিং পাস-করা। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে—বর্ত্তমানে ৬।৭ হাজারের বেশী এইরূপ শিক্ষক প্রতি বৎসর ট্রেণিং দেওয়ার সুযোগ পাইবে। অতএব, প্রাথমিক শিক্ষা এখন 'যথাপূর্ব্বং তথাপরং' চলিবে অর্থাৎ এখনও ৩০ বৎসর আমাদের অপেক্ষা করিতে হইবে। মন্ত্রিমণ্ডলী কি সত্য সত্যই প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের পরিকল্পনা এখনও মাথায় রাখিয়াছেন? না, ইহা ছিল শুধু ভোট পাইবার শ্লোগান মাত্র? দেশবাসীর এই প্রশ্নই মনে জাগিতেছে, তাঁহারা অনুসন্ধান করিলেই ইহা বুঝিতে পারিতেন।

ভাষা-সৃষ্টি

ভাষা জাতির নৈসর্গিক সৃষ্টি। সজীব জাতিই সজীব ভাষা সৃষ্টি করে। কিন্তু ইহা বুদ্ধির কৃত্রিম সৃষ্টি নহে। ভাষার দেবতা বাগ্দেবী জাতির অন্তরে ভাষারূপে ফুটিয়া উঠেন, প্রাণের প্রবাহে তিনি হংসবাহিনীরূপে ভাসিয়া চলেন। বুদ্ধি দিয়া ভাষা-রচনা Esperento-র ন্যায় কোড-সৃষ্টি, তাহা কোনও সজীব জাতীয় ভাষা নহে। কয়েক জন রাষ্ট্রনেতা ভারতে কৃত্রিম রাষ্ট্রভাষা গঠনের পরিকল্পনা স্থির করেন ও তাহার জন্য হিন্দী ও উর্দ্দু মিশাইয়া হিন্দুস্থানী ভাষা রচনায় উদ্যোগী হন, ইহার জন্য যুক্তপ্রদেশে হিন্দুস্থানী একাডেমী নামে একটী সমিতিও স্থাপিত হয়। এই সমিতির কার্য্য সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া সম্প্রতি একটী কমিটী এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—"বহু কসরৎ করিয়া কৃত্রিম উপায়ে একটা ভাষা সৃষ্টি করিয়া হিন্দী ও উর্দ্দুর বদলে তাহা চালাইতে চেষ্টা করিলে তাহা ব্যর্থই হইবে। হিন্দুস্থানী ভাষা-সৃষ্টির চেষ্টা ত্যাগ করাই উচিত। হিন্দুস্থানী ভাষা একটা স্বতন্ত্র ভাষাই নহে। উহাতে শুধু প্রাচীন সাহিত্যের শব্দসম্পদ্ ছাঁটিয়া বাদ দেওয়া হইয়াছে।" কমিটির এই মন্তব্যে আমরা সন্তুষ্ট হইলেও, এখনও আশ্বস্ত হইতে পারিতেছি না। ধুরন্ধরগণের খেয়াল ইহাতেই কি নিবৃত্ত হইবে?

বসুমতীর দণ্ড ও ভারত-রক্ষা আইন

সম্প্রতি কলিকাতার অন্যতম দৈনিক সংবাদপত্র "বসুমতী"র উপর তিন সপ্তাহের জন্য ভারতরক্ষা আইনানুযায়ী বন্ধ রাখার দণ্ডাদেশ জারী হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে মন্ত্রিমণ্ডল কয়েক বার এই পত্রিকাখানিকে আদালতে অভিযুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে না পারায়, পরিশেষে মাননীয় গভর্ণর বাহাদুর স্যার জন হার্ব্বার্টের নির্দ্দেশে উক্ত আইনের বলে কাগজখানিকে দণ্ডিত করা হইয়াছে, ইহাই স্বভাবতঃ সকলের মনে হইবে। জনসাধারণের সংশয় দূর করিতে হইলে, কর্ত্তৃপক্ষের দিক্ হইতে বুঝান আবশ্যক—ঠিক কি কারণে "বসুমতী"র উপর এই আইনের ক্ষমতা প্রযুক্ত হইল। বিশেষভাবে, সংবাদিক মাত্রেই "বসুমতী"র দৃষ্টান্তে যদি আতঙ্কিত হইয়া উঠেন, তজ্জন্য তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। কেননা, "দৈনিক বসুমতী"র নির্দ্দিষ্ট তারিখের সংখ্যায় যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা পড়িলে সাধারণ বুদ্ধিতে এমন কোন

মন্তব্য বা সংবাদ দেখা যায় না, যাহাতে গভর্ণমেণ্টের সমর চেষ্টার বাধা সৃষ্টি হইতে পারে। এ অবস্থায় ভারত-রক্ষা আইন সম্বন্ধে সঠিক ও সুস্পষ্ট ধারণা দিবার জন্যও দৃষ্টান্ত স্বরূপ "বসুমতী"র দণ্ডনীয় বিষয়টী খুলিয়া বুঝাইয়া দেওয়া উচিত—কি কি ব্যাপার উক্ত আইনের পরিধিগম্য। আশা করি, জনসাধারণের ও সংবাদপত্রসেবিগণের এই ন্যায়সঙ্গত দাবীর প্রতি গবর্ণর মহোদয়ের যোগ্য দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে।

শ্রীযুক্ত রুইকরের মুক্তিলাভ

এই ভারত-রক্ষা আইনের প্রয়োগ ও ব্যাখ্যা সম্বন্ধে নাগপুরের জেলা ও সেশন্‌স্ জজ মহোদয় উক্ত আইনে দণ্ডিত শ্রীযুক্ত আর, এস্, রুইকরকে আপীলে মুক্তি দিয়া যে বিশদ মন্তব্য করিয়াছেন, তাহাতে অনেকখানি আলো ও আশ্বস্তি পাওয়া যায়—ইহার জন্য সমগ্র দেশবাসী তাঁহার নিকট চির কৃতজ্ঞ থাকিবে। নিম্ন আদালতের রায়ে যে শাসন ও বিচার বিভাগের দায়িত্বে পরস্পর মিশিয়া অনর্থ বাধিয়াছে, দায়রা জজ ইহা বুঝিয়াছেন ও বলিয়াছেন—বিচার-কালে ম্যাজিষ্ট্রেটকে শাসনের কথা ভুলিয়া যাইতে হইবে। ইহা খাঁটি সত্য কথা। তারপর দেশের স্বাধীনতার দাবী অন্যায় নহে বা যুদ্ধের সময়ে উহাকে দাবিয়া রাখার কথাও নহে। কেননা, ভারতকে স্বাধীনতাদানে অন্ততঃ ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস দিতে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন এবং স্বাধীনতাই যাহার আদর্শ, সেই কংগ্রেস বা অন্যান্য রাজনীতিক আন্দোলনকেও গভর্ণমেণ্ট অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করেন নাই। দায়রা জজের মতে, গণ-আন্দোলন ও দেশের স্বাধীনতার দাবী জানাইয়া আন্দোলন কোনটাই আপত্তিজনক কার্য্য নহে এবং তাহা ভারত-রক্ষা অর্ডিন্যান্সের কবলে পড়ে না। বরং কংগ্রেস যদি স্বাধীনতা পাইলে বৃটেনকে যুদ্ধে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়, সেই ক্ষেত্রে এই স্বাধীনতার দাবী যুদ্ধকার্য্য-পরিচালনার সাহায্যসূচকই হইয়া পড়িবে।

ইহার পর, কোন আইন, এমন কি ভারতরক্ষা আইন সম্বন্ধে সমালোচনা ও রাজবিদ্বেষ সৃষ্টি করা যে এক কথা নহে, দায়রা জজ ইহা স্বীকার করিয়াছেন এবং স্বাধীনতার দাবী সম্বন্ধে সকলকে একমত হওয়ার অথবা ভারত রক্ষা অর্ডিন্যান্স জাতি ও রাষ্ট্রের স্বার্থের অনুকূল নহে, এই আন্তরিক বিশ্বাসের বলে কর্ম্মীদিগকে অহিংস আদর্শে অবিচল থাকিয়া গণ-আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়া তোলার জন্য আবেদন করাও যে অপরাধজনক নহে, তঁাহার এই কথায় অনেকেই সত্য সত্যই আশ্বস্তি ও শান্তি লাভ করিবেন। ভারত-রক্ষা আইন সম্বন্ধে এই প্রাঞ্জল ও ন্যায়োচিত ব্যাখ্যার জন্য আমরা পুনরায় সেশন জজ মহাশয়কে দেশের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

বাংলার জনগণনার ফল

গত জনগণনার ফল এখনও সরকারীভাবে জানিতে পারা যায় নাই; তবে অবস্থার অনুমানে বলা যাইতে পারে—এবার বাংলায় লোক-সংখ্যা শতকরা প্রায় ২০ জন বাড়িবে অর্থাৎ সমগ্র বাংলার লোক-সংখ্যা হইবে—৬ কোটী ৩ লক্ষ। বাংলার খণ্ডিত অঙ্গগুলি তাহার সহিত পুনরায় যুক্তি পাইলে, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের "সপ্তকোটিসন্তান-জননী" বঙ্গভূমিই আমরা পুনরায় দেখিতে পাইব, ইহা দুরাশা নহে। কিঞ্চিদূর্দ্ধ ৬ কোটী বাঙালীর মধ্যে পুরুষ ৩ কোটী ১৭ লক্ষ ও স্ত্রীলোক ২ কোটী ৮৫ লক্ষ। অনুপাতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা বাড়ে নাই। আসামের জনবৃদ্ধি হইয়াছে শতকরা ১৮ জন।

কলিকাতা সহরের জনসংখ্যা হইয়াছে পূর্ব্ব দশ বৎসরের প্রায় দ্বিগুণ—তন্মধ্যে পুরুষ ১৪॥০ লক্ষ ও নারী ৬॥০ লক্ষ—একুনে ২১ লক্ষ। ইহা ঠিক শতকরা ৮৫ জন জনবৃদ্ধির সূচক। এদিক্ দিয়া বাংলার বাহিরে পাঞ্জাবের লাহোর নগরীই সবচেয়ে রেকর্ড-সংখ্যা প্রদর্শন করিয়াছে। লাহোরের বৃদ্ধি শতকরা শত জন।

বাংলার প্রতি জেলাতেই লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। একদিকে নোয়াখালীতে শতকরা ৩০ জন, অন্যদিকে যশোহরে শত করা মাত্র ৮ জন—বৃদ্ধির দুই প্রান্তের এই দুই মাত্রা। ময়মনসিংহের জন-সংখ্যা ৬০ লক্ষ।

বাংলাদেশে বর্ণপরিচয়সম্পন্ন মানুষের সংখ্যা শতকরা ১০০ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহাও সুখের কথা। এই বর্ণজ্ঞানের সীমা কতটুকু, তাহা অবশ্য ইহাতে নির্দ্ধারিত হইবে না।

বিগত সেন্সাসে হিন্দু মুসলমানের সংখ্যা লইয়া যে দুশ্চিন্তা ও অশান্তির ঝড় বহিয়াছিল, তাহার শেষ হইলেও, জের এখনও মিটে নাই। হিন্দু-মুসলমানের বর্ত্তমান অনুপাত এখনও সঠিক জানা যায় নাই।

ভারতের জনসংখ্যা ও জাতীয় আয়

ভারতের জনসংখ্যা সম্বন্ধে যত দূর জানা যায়, তাহা সত্য হইলে বুঝিতে হইবে—দশ বৎসরে ভারতের মোট লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে প্রায় ৫ কোটী অর্থাৎ এবার আমরা ৪০ কোটী ভারতবাসী বলিয়া সত্যই গৌরব করিতে পারিব—সংখ্যাগৌরবে সম্ভবতঃ এবার আমরা মহাচীনকেও অতিক্রম করিব। লোক বাড়িতেছে, ইহাতে বিস্ময়ের কথা তেমন নাই। কিন্তু লোকবৃদ্ধির অনুপাতে জাতির অন্নসংস্থানের উপায়ও কি আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হইতেছে? ইহাই প্রশ্ন। এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবে?

ভারতের শিল্পোন্নতি

৪০ কোটী ভারতবাসীর জীবনযাত্রার উন্নতিও চাই। কৃষিপ্রধান এ দেশ। এই ৪০ কোটী ভারতবাসীর উপযোগী খাদ্যশস্য এ দেশে উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে, ইহা অনুমান করিয়া লওয়া যায়। ভারতের সমস্ত কৃষিযোগ্য জমি এখনও কর্ষিত হয় না। সুতরাং কৃষিক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের প্রয়োগ না হইলেও, সমস্ত কৃষিযোগ্য জমিতে স্বাভাবিক ভাবে লাঙ্গলের ফলা পড়িলেও যে শস্য উৎপন্ন হইবে, তাহাতে বর্দ্ধিত জনসংখ্যার আহার্য্যের অভাব হইবে না। ইহার উপর, বৈজ্ঞানিক কৃষিজনিত উৎপন্ন-বৃদ্ধি ঘটাইতে পারিলে তো কথাই নাই।

ভারতে কৃষি হইতে লোকের মাথাপ্রতি আয় ৫৮৲ টাকা। অন্য দেশের সহিত ইহার তুলনা করা বৃথা। আমেরিকায় ২১৯৲ টাকা, এমন কি ইংলণ্ডেরও ৬৮৲ টাকা মাথা পিছু কৃষকের আয়—জাপান, সোভিয়েট রাশিয়া —ইহাদের কথা কহিয়াই কাজ নাই। উপযুক্ত সরকারী দৃষ্টি ও সাহায্য পাইলে, ভারতীয় কৃষিজাত আয়ের পরিমাণ-বৃদ্ধি নিশ্চয়ই আশা করা যায়।

কৃষির পর অন্যান্য শিল্পের কথা। এখানেও তুলনা অশোভন। আমেরিকায় শিল্প-বাণিজ্যে জনপ্রতি ১৮০০৲ ও ইংলণ্ডে ১৬০০৲ নিয়োজিত আছে; ভারতে এই হার জনপ্রতি ২৫৲ মাত্র। শিল্পজাত আয়ের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রে মাথা পিছু ৮৩০৲ ও ইংলণ্ডে ৪৬৩৲; আর ভারতবর্ষের ১২৲ টাকা মাত্র। কাঁচা মালের অন্যতম মূল ভাণ্ডার হইয়াও, ভারতবাসীর যে শোচনীয় দারিদ্র্য, তাহা ঘুচাইবার সাধ্য বর্ত্তমানে আমাদের নাই। গভর্ণমেণ্টেরও এদিকে যে ভাবের ও যে পরিমাণ শুভদৃষ্টি ও দৃঢ়চেষ্টা প্রয়োজনীয়, তাহা এখনও দেখা যাইতেছে না।

স্যার বিশ্বেশ্বরায়ার সঙ্কেত

এই সম্বন্ধে বোম্বাই-এ নিখিল ভারত শিল্প সম্মেলনের সভাপতি স্যার এম, বিশ্বেশ্বরায়া যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে কয়েকটী উন্নতির সঙ্কেত দিয়াছেন, তাহা দেশবাসী ও গভর্ণমেণ্টের প্রণিধানযোগ্য। স্যার বিশ্বেশ্বরায়া বলেন —প্রথমতঃ বর্ত্তমান ভারতের শিল্প সম্বন্ধীয় একটী জরীপ প্রয়োজনীয়। দ্বিতীয়তঃ—শিল্পব্যবসায়ের সাহায্যকল্পে উপযুক্ত সংখ্যক নির্ভরযোগ্য ব্যাঙ্কের প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ —শিল্পসংরক্ষণকল্পে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সুচিন্তিত নীতি গ্রহণ করিতে হইবে।

তিনি আরও বলেন—আগে আমাদের কতকগুলি মৌলিক শিল্প গড়িয়া তুলিতে হইবে—যেমন এঞ্জিন ও কল-কব্জা নির্ম্মাণের শিল্প, নৌশিল্প, মোটর শিল্প প্রভৃতি। ইহা ছাড়া যুদ্ধকালীন অবস্থার দরুণ এদেশে যে সকল শিল্প-গঠনের সুযোগ আসিয়াছে, যথা—কৃত্রিম রেশম, রঞ্জন ও বিবিধ রাসায়নিক শিল্প, এইগুলির দিকেও বিশেষভাবে লক্ষ্য দিতে হইবে।

স্যার বিশ্বেশ্বরায়া গভর্ণমেণ্টকে একটী সুচিন্তিত পরিকল্পনানুযায়ী ভারতের শিল্পোন্নতির যথার্থ সহায়ক অনুকূল নীতিই অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিয়াছেন।

তাঁহার পরামর্শ ও নির্দ্দেশ আমরা প্রত্যেকটীই সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।

পল্লী-পুনর্গঠন

বঙ্গীয় পল্লী-পুনর্গঠন বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এইচ, এস, এম ঈশাথ কর্ত্তৃক প্রকাশিত একখানি প্রচার-পত্রিকা (বুলেটিন নং ১) আমাদের হাতে আসিয়া পৌছিয়াছে।

পত্রিকাখানিতে পল্লীগঠনের মূলমন্ত্র সম্বন্ধে কয়েকটি চিন্তাযোগ্য কথা আছে। কথাগুলি আন্তরিক হইলে, গভর্ণমেণ্টের দৃক্-ভঙ্গী যে ঠিক দিকেই ফিরিতেছে, ইহা ভাবিতেও সুখ হয়। পল্লীকে বাঁচাইবার কথা বহুদিন বহু ক্ষেত্র হইতে শুনা যাইতেছে। পল্লীগঠন যে "খাল কাটা, বিল ছেঁচা, রাস্তা বাঁধা, জঙ্গল কাটা, গর্ত্ত বুজান বা কচুরী পানা তোলাই শুধু নয়"—ইহা মাননীয় মিঃ সারওয়াডি মহাশয় বলিয়াছিলেন—তাঁর উক্তি এই পত্রিকায় উদ্ধৃত হইয়াছে—"I visualise rural reconstruction as a great psychological uplift, an exaltation of the rural mind". পল্লীবাসী উন্নতির ইচ্ছা হারাইয়াছে—এই বিমূঢ় ইচ্ছাকে ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যে জাগ্রত করাই পল্লী-সংগঠনের আসল উদ্দেশ্য। ব্যাধির নিদান দূর হইলে, তাহার বীভৎস লক্ষণসমূহ আপনিই নির্ম্মূল হইবে। পত্রিকায় পল্লী-বঙ্গকে একটী organism বলা হইয়াছে। বাংলার এই অখণ্ড পল্লী-সমাজ যাহাতে আপনার ব্যাধি আপনি নিরাকরণ করিয়া পূর্ণ আরোগ্য ও স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিতে পারে, তাহার জন্য "spiritual regeneration" দরকার, ইহাও উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কথাগুলির সুর কাণে ভালই লাগিল—এই দিক্ হইতে যথার্থ কার্য্য আরম্ভ হইলে আমরা সমধিক সুখী হইব—জাতির আশীর্ব্বাদও এরূপ শুভচেষ্টার উপর বর্ষিত হইবে।

প্রবাসী বাঙালীর ইতিহাস

বিহারের বাঙালী সমিতির পক্ষ হইতে বিহারপ্রবাসী বাঙালীদের অতীত ও বর্ত্তমান কীর্ত্তি-কাহিনীর বিবরণী সংগ্রহ করা হইতেছে। এই তথ্যসংগ্রহের মূলসূত্র হইবে—প্রবাসী বাঙালীরা প্রবাসের জন্যও নিঃস্বার্থভাবে যাহা করিয়াছেন, তাহার পরিচয় প্রদর্শন। বিহারপ্রবাসী বাঙালীর সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাসমূহের আলোচনাও ইহাতে থাকিবে। বিহার ছাড়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশেরও বিক্ষিপ্ত বাঙালী সমাজের আলেখ্যসংগ্রহে সমিতি চেষ্টা করিবেন। এই শুভ চেষ্টায় বিহার-বাঙালী সমিতি সকলের সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছেন। তথ্যাদি "বেহার হেরাল্ডে"র সম্পাদক শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দার, "পাটলীপুত্র", কদমকুয়া, পাটনা—এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

প্রবাসী নহে, বৃহত্তর বঙ্গের ব্যাপ্তি-পরিচয়ের প্রয়োজন আছে। আমরা এই আবেদন আন্তরিক সমর্থন করি।

সমস্যার মীমাংসা

বাংলায় মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর সাম্প্রদায়িক সমস্যা যখন অতি তিক্ত ও উৎকটতম মাত্রায় উঠিয়াছে, তখন তাহার সমাধানের জন্য একটা বিশেষ চেষ্টা স্বয়ং আরম্ভ করিয়াছেন এবং তদুদ্দেশ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নায়কবর্গের সহিত আলাপ ও পরামর্শ করিতেছেন। সমস্যার মূলসূত্র যাঁহাদের হাতে, তাঁহারা চেষ্টা করিলে তাহার সুমীমাংসাও হইতে পারে। স্যার জন হার্ব্বাটের এই চেষ্টা আমরা আন্তরিক বলিয়াই মনে করি।

অন্যদিকে, বোম্বাই-এর বৈঠকে স্যার জগদীশপ্রসাদ, স্যার চিমনলাল শীতলবাদ, স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রু, স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, স্যার কাওয়াস্‌জী জাহাঙ্গীর, পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু, প্রমুখ ধীরপন্থী নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে ও ডাঃ মুঞ্জে, বীর সাভারকর, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ প্রমুখ অন্যান্য বিভিন্ন পক্ষীয় নেতৃবৃন্দের সহায়তায় বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধানের জন্য যে শুভ প্রস্তাব হইয়াছে, তাহাও সময়োচিত হইয়াছে বলিয়া প্রত্যয় হয়। স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রু ইঁহাদের প্রতিনিধিস্বরূপ বর্ত্তমানে ভারতরাজপ্রতিনিধির সহিত দিল্লীতে সাক্ষাৎ করিতেছেন।

আমরা এই উভয় প্রচেষ্টার সার্থকতা দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব রহিলাম। যে যে কারণে এই বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে নেতৃবর্গের সকল উদ্যম ব্যর্থ হইয়াছে, সেই মূল অন্তরায়গুলি সম্বন্ধে আশা করি, উভয় পক্ষই সম্পূর্ণ সচেতন আছেন। উগ্র সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও ধূমায়িত রাষ্ট্রীয় অসন্তোষের বহ্নি বিশ্বের এই প্রলয়-সঙ্কট-মুহূর্ত্তে যদি এখনও না মাথা নত করে, তাহা হইলে ভারতের ভবিষ্যৎ ঘোরতর অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন, ইহা বলিতেই হইবে। ভগবান সকল পক্ষকেই সুমতি দিন—আমাদের এই প্রার্থনা।

সাময়িকী

বৈদেশিক সংবাদ

বল্কান পরিস্থিতি—

বুলগেরিয়া ত্রিশক্তি চুক্তিতে যোগদান করায়, বৃটেন বুলগেরিয়ার সহিত রাষ্ট্রনৈতিক সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়াছে।

যুগোশ্লাভিয়ায় জার্ম্মাণীর ক্রমবর্দ্ধমান কুটনীতিক চাপ ব্যর্থ হইয়াছে। উপর্য্যুপরি মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তন সত্বেও, যুগোশ্লাভিয়া শেষ পর্য্যন্ত এ্যাক্সিস্ চুক্তিতে যোগদান করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছে। সম্প্রতি জার্ম্মাণ বাহিনী যুগোশ্লাভিয়া ও গ্রীস আক্রমণ করিয়াছে। যুগোশ্লাভ ও গ্রীক সীমান্ত ভেদ করিয়া জার্ম্মাণবাহিনী অগ্রসর হইতেছে এবং ইতিমধ্যেই গ্রীসের স্যালোনিকা অধিকার করিয়াছে। বার্ণ হইতে ভিসিতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, বেলগ্রেডের উপর বিমানাক্রমণের ফলে যুগোশ্লাভিয়ার পূর্ত্ত-সচিব শ্লোভেন দলের নেতা মঃ কুলোভেটস্ নিহত হইয়াছেন। বৃটিশ, অষ্ট্রেলিয়ান ও নিউজিল্যাণ্ড সৈন্যদের এক বাহিনী সাফল্যের সহিত গ্রীসে অবতরণ করিয়াছে।

সম্প্রতি রুশিয়া যুগোশ্লাভিয়ার সহিত এক অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদিত করিয়াছে। আনকারার সংবাদে প্রকাশ সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট তুর্কী গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন যে, তুরস্ক যদি আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে সে সোভিয়েটের সদিচ্ছা ও নিরপেক্ষতার উপর নির্ভর করিতে পারে।

হাঙ্গেরীর প্রধান মন্ত্রী কাউণ্ট তেলেকি আত্মহত্যা করিয়াছেন।

আফ্রিকার যুদ্ধ—

নাইরোবির সংবাদে প্রকাশ, সমগ্র বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড এক্ষণে বৃটিশের করায়ত্তে ফিরিয়া আসিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে আবিসিনিয়ার অন্যতম প্রধান সহর নেগহেলি দখল করার সংবাদ প্রকাশ পাইয়াছে। দিবাযুব অধিকৃত হইয়াছে এবং তথায় ইটালীয় সৈন্যাধ্যক্ষ ও প্রায় ১৮০০ সৈন্য বন্দী হইয়াছে। সুরক্ষিত ইটালীয়ান ঘাঁটি কেরেণের পতন হইয়াছে এবং আবিসিনিয়ার দ্বিতীয় রাজধানী হারার পুনরধিকৃত হইয়াছে। বৃটিশবাহিনী আবিসিনিয়ার তৃতীয় প্রধান সহর দিরেদাওয়া পরিশেষে ও আদ্দিসআবাবাও দখল করিয়াছে। সরকারী ভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বৃটিশ সৈন্য পূর্ব্ব লিবিয়ার বন্দর বেনগাজী ও বার্দ্দিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে। তবরুক অঞ্চলে লড়াই চলিতেছে।

যুক্তরাষ্ট্র—

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট বৃটেনকে সাহায্য দান বিলে স্বাক্ষর করিয়াছেন। মার্কিণ সিনেট বরাদ্দ কমিটী বৃটেনকে সাত শত কোটী ডলার সাহায্যের বিলটি অনুমোদন করিয়াছেন। ঋণ ও ইজারা বিলের সর্ত্তানুযায়ী আমেরিকা পঞ্চাশ কোটি ডলার ব্যয়ে বৃটেনের জন্য চারি শত বাণিজ্য-জাহাজ নির্ম্মাণ করিবে। বর্ত্তমানে আটলাণ্টিকে জার্ম্মাণীর নৌশক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বন্দরে ৩৬ খানি ডেনিস্, ২৮ খানি ইটালিয়ান ও ২ খানি জার্ম্মাণ জাহাজ মার্কিণ কর্ত্তৃপক্ষ দখল করিয়াছে।

বৃটেনের খবরাখবর—

গত ২২শে মার্চ্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে বৃটেনের যুদ্ধের দরুণ মোট ১০ কোটি ২৬ লক্ষ ৯৯ হাজার পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে অর্থাৎ দৈনিক ব্যয় হইয়াছে ১ কোটি ৪৬ লক্ষ ৯১ হাজার পাউণ্ডের বেশী। ইংলণ্ডে ১২ই ও ১৩ই মার্চ্চ মার্সি নদী অঞ্চলে জার্ম্মাণ বিমানাক্রমণের ফলে ৫০০ নিহত ও ৫০০ আহত হইয়াছে। ১৩ই ও ১৪ই মার্চ্চ তারিখে ক্লাইভ নদী অঞ্চলে ৫০০ নিহত ও ৮০০ আহত হইয়াছে। বৃটিশ স্বরাষ্ট্র সচিব মিঃ হার্ব্বাট মরিসন্ কমনস্ সভায় বলেন যে, গত ১৩ই ও ১৪ই মার্চ্চ ক্লাইভ নদী অঞ্চলে ১১ শত নিহত ও সহস্রাধিক আহত হইয়াছে।

১লা এপ্রিল যে আর্থিক বৎসর শেষ হইল, সেই বৎসরে যুদ্ধের জন্য বৃটেন ৩৮৭ কোটি পাউণ্ড ব্যয় করিয়াছে।

খ্যাতনামা লেখিকা মিসেস্ ভার্জ্জিনিয়া উলফ্ সাসেক্স লিউয়েসের নিকট উক্ত নদীতে জলমগ্ন হইয়া মারা গিয়াছেন। বিখ্যাত গ্রন্থকার ও পুস্তকপ্রকাশক লিওনার্ড উলফ্ তাঁহার স্বামী।

সম্প্রতি জার্ম্মাণ বিমানাক্রমণের ফলে লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজ লাইব্রেরীর প্রায় এক লক্ষ পুস্তক বিনষ্ট হইয়াছে। ধ্বংসাবশেষ হইতে একখানি "A History of German culture" নামক গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে।

স্বাদেশিক সংবাদ

পরলোকে-

বিগত ৩রা চৈত্র সোমবার কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মহোদয় তাঁর কলিকাতা বিডন ষ্ট্রীটস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর ৭৭ বৎসর বয়ক্রম হইয়াছিল। হুগলী জেলার অন্তর্গত বালীতে উচ্চ ব্রাহ্মণ

৺কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর কলিকাতার থিওসোফিক্যাল সোসাইটির বিশিষ্ট সভ্যরূপে তিনি নীরব সাধুজীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁর স্বভাবের গাম্ভীর্য্য, অমায়িক ব্যবহার, উদার হৃদয়, সর্ব্বোপরি জীবনের সংযম ও সত্যনিষ্ঠা প্রশংসনীয়। ৺কেদারনাথের সুযোগ্য কৃতী সন্তানগণের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ সার্জ্জেন (মেডিকেল কলেজ) ডাঃ পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ সন্তোষ চট্টোপাধ্যায় (ক্যাম্বেল) এবং শ্রীযুত কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় এম-এ, (ম্যানেজিং ডিরেক্টর, প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক) এর নাম আজ সুপরিচিত। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ সভ্য হিসাবে শ্রীযুত কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় সঙ্ঘের প্রথানুসারে ১৩ই চৈত্র প্রবর্ত্তক আশ্রমে যথারীতি শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। সঙ্ঘগুরুর উপস্থিতি ও নির্দ্দেশে এই উপলক্ষে যে শ্রাদ্ধপর্ব্ব অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে সঙ্ঘের শতাধিক নরনারী দণ্ডায়মান হইয়া বিগতাত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী প্রদান করেন এবং তাঁর পুণ্য জীবন-কথা আলোচনা করেন। ঐ তারিখে ৺কেদারনাথের বীডন ষ্ট্রীটস্থ বাসভবনে তাঁর অন্য সুযোগ্য সন্তানগণ কর্ত্তৃক মহাসমারোহে শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে প্রচুর কাঙালী-ভোজনেরও আয়োজন হইয়াছিল।

* * * *

ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের বিচারপতি স্যার মহম্মদ সুলেমান পরলোকগমন করিয়াছেন।

* * * *

ভারতের প্রথম ভারতীয় হাই কমিশনার স্যার দাদিবা দালাল দীর্ঘকাল রোগভোগের পর প্যারিসে পরলোকগমন করিয়াছেন।

হিন্দু মহাসভার বৈঠক—

বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বড়লাটের প্রত্যুত্তর সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়, তাহাতে স্থির হইয়াছে যে, ৩১শে মার্চ্চের পর শেষ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হইবে।

গবর্ণরের বৈঠক—

বাঙ্গলার সাম্প্রদায়িক বিরোধের অবসানের জন্য গভর্ণর আইন-সভার বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দকে লইয়া একটি বৈঠক আহ্বান করিয়াছেন।

বাঙ্গলার বাজেট—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাজেটের 'সাধারণ শাসন' খাতে এক কোটি ২৭ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দের দাবী মঞ্জুর হইয়াছে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি হলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন হয়। ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জ্জী সভাপতি হইয়াছিলেন। শ্রীশরৎচন্দ্র বসু সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। সভায় যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার হয় ও অধিবেশনটি সাফল্যমণ্ডিত হয়।

কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার নিয়োগ—

কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা পদে মিঃ মুখার্জির পুনর্নিয়োগ বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট অনুমোদন না

মিঃ জে, সি, মুখার্জ্জী

করায় যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল, তৎসম্পর্কে ইহাই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, আরও ১৫ মাসের জন্য মিঃ মুখার্জি স্বপদে বাহাল থাকিবেন।

নিখিল ভারত মহিলা সম্মিলন—

কলিকাতা ভবানীপুরস্থ আশুতোষ কলেজ হলে নিখিল ভারত মহিলাসম্মেলনের দক্ষিণ কলিকাতা শাখার দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্তা নির্ঝরিণী সরকার সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। সভায় বর্ত্তমানের বিচিত্র সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

রবীন্দ্রনাথের অশীতিতম জন্মোৎসব—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আগামী মাসে রবীন্দ্র জন্মতিথি উৎসবের জন্য আয়োজন করিতেছেন। কলিকাতা
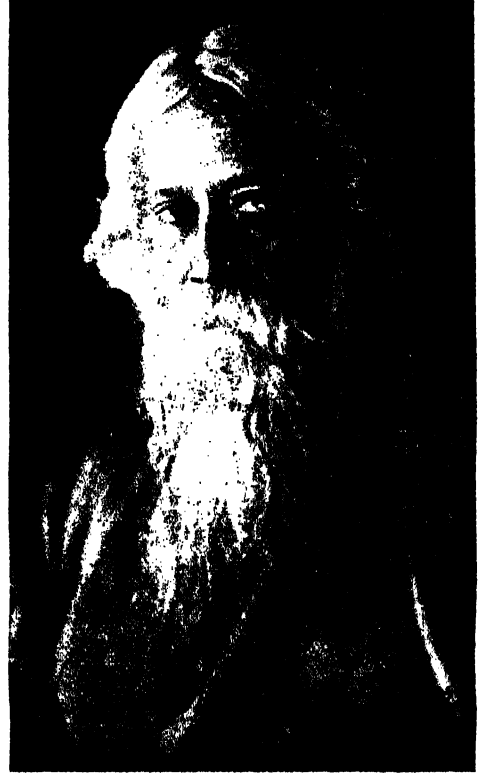
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

বিশ্ববিদ্যালয় বোধ হয় এই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালার একজন মনীষীর জন্মতিথি উৎসবানুষ্ঠানে উদ্যোগী হইয়াছেন। আমরা প্রার্থনা করি, এই উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হউক।

কলিকাতা কর্পোরেশনের কমার্শিয়াল মিউজিয়মের উদ্যোগে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ৮০তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এতৎসম্পর্কে মিউজিয়ম ভবনে একটি রাসায়নিক দ্রব্যের প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার এই জয়ন্তী-প্রদর্শনীর দ্বার-উদ্ঘাটন করিয়াছেন। রাসায়নিক প্রদর্শনীটি বিশেষ শিক্ষামূলক হইয়াছিল।

প্রমথ জয়ন্তী—

সাহিত্যিক শ্রীযুত প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) মহাশয়ের জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠানের জন্য কলিকাতার বিশিষ্ট সাহিত্যিক মহলে উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে। বাংলা ভাষার একজন অন্যতম সংস্কারক ও খ্যাতনামা সাহিত্যিকের সম্মান হিসাবে এই অনুষ্ঠানটি যে অত্যন্ত সময়োপযোগী হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা এই উৎসবের সাফল্য কামনা করি।

সার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্—

স্যার রাধকৃষ্ণন্ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদ ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির অধ্যাপক পদ গ্রহণ করিবেন। ইনি বহুকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাঙালীর সংস্কৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার—

ব্যবস্থাপরিষদে প্রশ্নোত্তর-কালে প্রধানমন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক জানান যে, ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত বাংলায় ভারতরক্ষা আইনে মোট ১৫৩৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বঙ্গীয় দোকান কর্ম্মচারী আইন—

১লা এপ্রিল হইতে ১৯৪০ সালের দোকান কর্ম্মচারী আইন বলবৎ হইয়াছে। এই আইনে প্রধানতঃ দোকান, কমার্শিয়েল এস্ট্যাব্লিশ্‌মেণ্ট, রেষ্টুরেণ্ট, কাফে, সিনেমা, থিয়েটার ও গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভবিষ্যতে নির্দ্ধারিত অন্যান্য প্রমোদাগারের কর্ম্মচারীদের বেতনপ্রদানের তারিখ, সাপ্তাহিক ছুটি ও বাৎসরিক ছুটির প্রথা নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে।

মহাজাতি সদন—

১৬৬নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউস্থ মহাজাতি সদনের ক্রোক ও রিসিভার-নিয়োগের আদেশ নাকচের জন্য আবেদন অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ওয়ালি উল ইসলাম অগ্রাহ্য করিয়াছেন। মহাজাতি সদন ক্রোকের এই আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা রুজু করিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

খেলাধূলার কথা—

ফুটবল মরশুম আগতপ্রায়। আগামী মাস হইতেই ফুটবল লীগের খেলা আরম্ভ হইবে। গত বৎসরের ন্যায় এই বৎসর ফুটবল খেলার সময়ে গণ্ডগোল হইবে বলিয়া অনেকেই আশঙ্কা করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি অনুষ্ঠিত আই, এফ, এর সভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে আর গণ্ডগোলের সম্ভাবনা নাই।

* * * * *

ভারতপ্রসিদ্ধ সাঁতারু এবং লাঠি, ছোরা, তরোয়াল প্রভৃতি বিভিন্ন শক্তিচর্চ্চার ক্ষেত্রে যশস্বিনী কুমারী বাণী ঘোষ সম্প্রতি স্বাধীনজীবী যুবক শ্রীহরিশচন্দ্র বসুর সহিত উদ্বাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। আদর্শ হিসাবে এই

শ্রীহরিশচন্দ্র বসু ও শ্রীমতী বাণী বসু (ঘোষ)

বিবাহে বরপণের কোন কথাই উঠে নাই। কন্যা দক্ষিণ রাঢ়ী (কলিকাতা) এবং পাত্র পূর্ব্ববঙ্গের (চাঁদপুর) বঙ্গজ কায়স্থ হওয়ায় এই পরিণয়ে খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তিরও পরিচয় আছে।

যুগ্ম সম্পাদক ঃ শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি-এ কর্ত্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত এবং প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৫২।৩ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীফণিভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
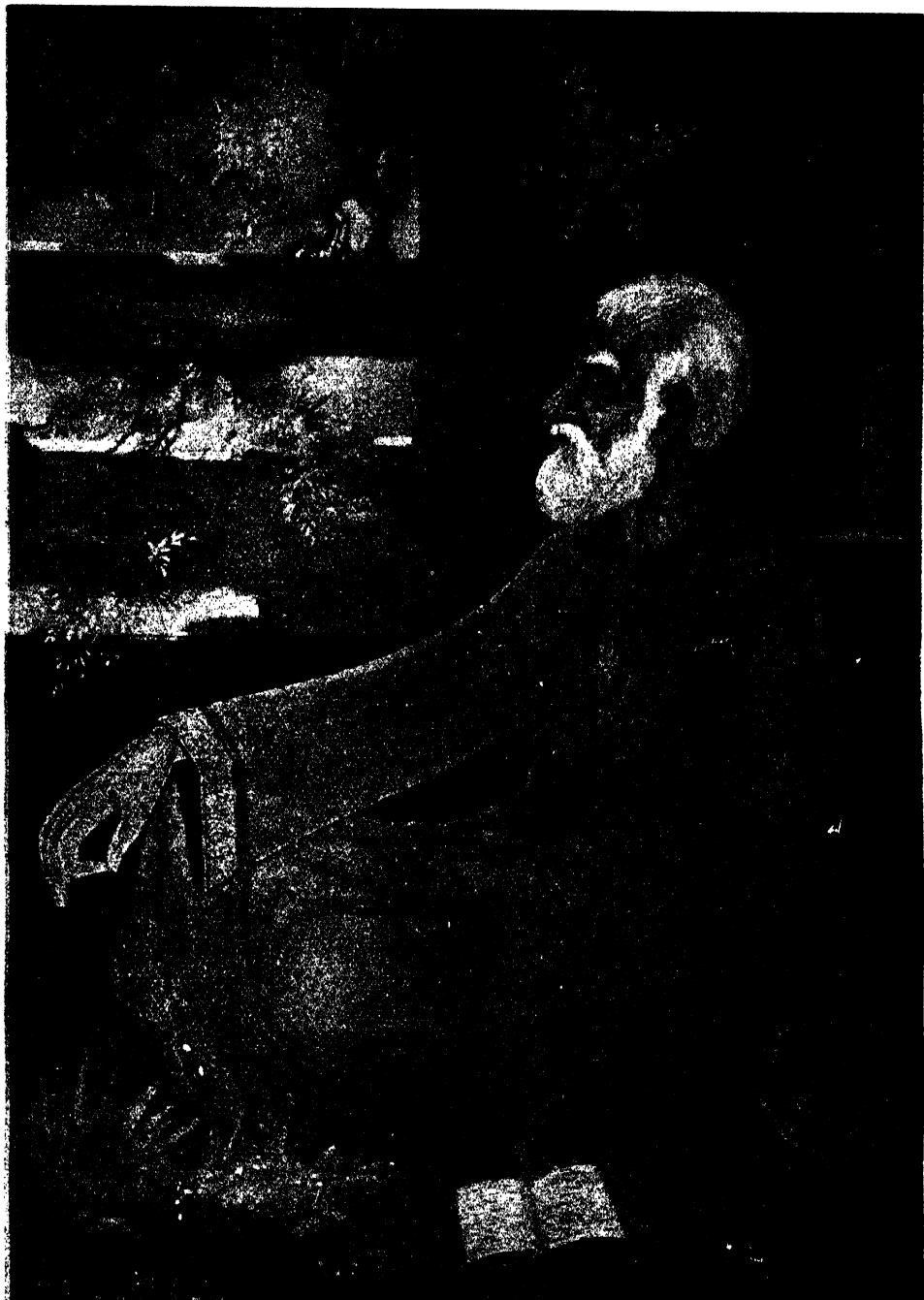
ষড়বিংশ বর্ষ ১৩৪৮ সাল	জ্যৈষ্ঠ	প্রথম খণ্ড ২য় সংখ্যা

জাতি-গঠনের ত্রিশক্তি

শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তিশাস্ত্র যেমন ভারতের সংস্কৃতি-রক্ষার হেতু, তদ্রূপ ভারত-সংস্কৃতিকে জীবনগত করার জন্য মন্ত্র, গুরু ও প্রতিমা, এই তিনই আশ্রয়। হিন্দুভারত এই তিনকে কোনদিন অবজ্ঞা ক'রবে না। এ বিষয়ে যখনই অনাস্থা এসেছে, তখনই কি ব্যক্তির, কি জাতির পতন লক্ষ্যে পড়ে।

শ্রুতি দেয় ঈশ্বর-বিশ্বাস, দেহের প্রতি অণু-পরমাণুতে ব্রহ্মোপলব্ধি। স্মৃতির মধ্য দিয়ে আমরা পাই জীবন-নীতি—কর্ম্মসিদ্ধির উত্তম বিধান। যুক্তি বিশ্বাসকে পুষ্টি দেয় বিজ্ঞানের আলোকে, জীবনে দেয় চিন্তার খাদ্য ও অনুভূতির পরিপোষক রসায়ণ।

মন্ত্র আমাদের ঈশ্বর-চৈতন্য রক্ষা করে। গুরুর মধ্য দিয়া আমরা অসীমের সাক্ষাৎকার পাই, অধ্যাত্মশক্তি পাই, শুনি ব্রহ্মবাণী। প্রতিমাকে আশ্রয় করে' পাই ভক্তি ও প্রেমের উপাদান। এই তিন আশ্রয় যার নাই, সে চিনির বলদ—সাধন-রসে বঞ্চিত। ধর্ম্মজীবনের অমৃত-পানে সে অনধিকারী।

মন্ত্র বেদ-শক্তি। উহা শ্রুতিরই ঘনীভূত বীর্য্য। গুরুমূর্ত্তি মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহায়। গুরু-তীর্থ পরম তীর্থ। এইখানে সর্ব্বধর্ম্মের উৎসর্গ যদি সফল হয়, মানুষ পায় সুখ, শান্তি ও পরম গতি। পঞ্চ রসের ঘনিমায় যে নিগূঢ় অপার্থিব সম্বন্ধ, তাহারই অভিষেকে ইষ্টপ্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়।

ভারতে সংস্কৃতি-রক্ষার সেই প্রকৃত অধিকারী, যে একাধারে পায় শ্রুতি, স্মৃতি, যুক্তির সাধনস্বরূপ মন্ত্র, গুরু ও প্রতিমার আশ্রয়—জাতি-গঠনের এই তিনই সিদ্ধ মহাবীর্য্য। —শ্রীম

কর্ম্ম ও কর্ম্মী

কর্ম্মের জন্য চাই কর্ম্মী। কাজ করিলেই কর্ম্মী হয় না; খাঁটি কাজ করিতে হইলে, চাই খাঁটি কর্ম্মী। কর্ম্মের শিক্ষা আছে। সে শিক্ষা কর্ম্ম-বিজ্ঞানের। কর্ম্ম-বিজ্ঞান ও ধর্ম্মবিজ্ঞান পৃথক্ নয়—একই বিজ্ঞানের দুইটী ধারা। কর্ম্মহীন ধর্ম্ম বা ধর্ম্মশূন্য কর্ম্মে শুভ হয় না, পরন্তু উহা উৎপাত ও অনর্থেরই সৃষ্টি করে।

ধর্ম্মমূলক যে কর্ম্ম, তাহাই শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম, শুভদায়ক তাহাই। ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী, সমাজ ও জাতি এরূপ কর্ম্মের আচরণেই মুক্তি ও কল্যাণের পথ প্রশস্ত করে। অন্যথা ঝঞ্ঝাটই বাড়ে; সাময়িক সাফল্য ঘটিলেও ঘটিতে পারে, কিন্তু তাহাতে মনের সুখ-শান্তি থাকে না। আর সে কর্ম্মজনিত যে সুফল—ঋদ্ধিলাভ বা সৌভাগ্য যদিও ঘটে—তাহা কুত্রাপি দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

আত্মসিদ্ধ কর্ম্মী চাই—সফল কর্ম্মের জন্য। এইরূপ মানুষের সংখ্যা অল্প হইলেও, ক্ষতি নাই। সংখ্যার চেয়ে গুণেরই অধিক প্রয়োজন। কেন না সংখ্যা বাহিরের; গুণ অন্তর্নিহিত শক্তির বীর্য্য। কর্ম্ম এই অন্তর্গুণেরই অভিব্যক্তি। আত্মনিষ্ঠ কর্ম্মীর কর্ম্ম অন্তর্গুণকে আশ্রয় করিয়া ধীরে ধীরে দেশ ও জাতিকে ছাইয়া ফেলে। সংখ্যা ইহার সহিত যুক্ত হইলে, সোণায় সোহাগা হয়। কিন্তু সংখ্যার বৃদ্ধি ও আধিক্যও এক্ষেত্রে নির্ভর করে গুণেরই উৎকর্ষ-সাধনায়। শুধু সংখ্যা যোগ করিয়া যে সংখ্যাধিক্য, তাহা প্রাণহীন যান্ত্রিক বাহিনীর মত কিছু দূর বহু বাধা অন্তরায় দলিয়া অগ্রসর হইলেও, গুণোৎকৃষ্ট সমসংখ্যা বা তার চেয়ে স্বল্পতর সংখ্যার সম্মুখীন হইলে গতি তার রুদ্ধ হয় পথের শেষে না পৌছিয়াই। কেন না, সংখ্যার গতি পরিমিত, গুণের গতি অপরিমেয়।

কর্ম্মের সাফল্য—সাধন-গুণেই। সাধকের ভাবের উপর ইহা নির্ভর করে। কর্ম্ম যেখানে মানুষের অন্তরশক্তি দিয়া সম্পন্ন হয়, সে কর্ম্ম কখনও ব্যর্থ হয় না। কর্ম্ম আমার নয়, ভগবানের—এই ভাবই সাধকের ভাব। ভগবান করাইতেছেন, তাই করিতেছি। যন্ত্রীর হাতে আমি যন্ত্র মাত্র। এই ভাবটুকু লইয়াই যে কোনও কর্ম্মী কর্ম্মের সাধনা আরম্ভ করিতে পারে। ভাব যত শুদ্ধ হয়, স্বচ্ছ হয়, কর্ম্মও তেমনি অমলিন ও সুন্দর হয়। ভগবানের শক্তিই আসলে সাধনা করেন কর্ম্মীর দেহ-মন-আত্মাকে আশ্রয় করিয়া। কর্ম্মীর আধার-শুদ্ধি কর্ম্মের উৎকর্ষ বিধান করে, দিন দিন কর্ম্মের মধ্য দিয়া শক্তি-প্রকাশ সমধিক প্রখর ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধিশীল হয়; কর্ম্মীদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও সৌহার্দ্দের বন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হয়। এই কর্ম্ম ও কর্ম্মশক্তি—দুইই ভগবানের বলিয়া, কর্ম্মীর অহংজ্ঞান প্রতিদিন স্বচ্ছতর হইয়া তাহাকে স্থির ও শান্ত করে। সে স্থৈর্য্য ও শান্তি ভিতরেরই সৌম্য সমাহিত ভাব—ইহা উপলব্ধির বস্তু। বাহিরের কর্ম্ম-সাধনে ইহাতে একেবারেই বাধে না; বরং অন্তরের প্রশান্ততায়, চিত্তচাঞ্চল্যের অভাবে কর্ম্মপ্রকাশ আরও সহজ ও শুচি-সুন্দর হয়। একটা নির্ম্মল উদার ধীরতা বা সমতা আসিয়া সমস্ত আধার-যন্ত্র স্নিগ্ধ ও নিরাময় করিয়া তুলে। কর্ম্মের প্রকাশ হয় যেন স্বতঃস্ফূর্ত্ত শক্তিরই বিগ্রহ-রূপে। কর্ম্মের একটা সাবলীল গতির ছন্দঃ সাধকের জীবনে আবিষ্কৃত ও ক্রমশঃ স্ফুটতর হইতে থাকে।

এই ধীর সমতাই পূর্ণযোগের ভিত্তি। প্রত্যেক সঙ্ঘ-সাধক বা দেশকর্ম্মী—যিনি যে ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়াই কর্ম্ম করুন—এই কর্ম্ম-বিজ্ঞানের অধিকারী হইয়া কর্ম্ম করিলে, কর্ম্ম করিতে করিতেই জীবন যোগযুক্ত করিতে সমর্থ হইবেন। কর্ম্মও হইবে নিখুঁৎ, সুন্দর। বিধাতার আহ্বানে এমন শত সংখ্যক পূর্ণযোগী কর্ম্মী একত্র মিলিত হইলে যে কর্ম্মসৃষ্টি হইবে, তাহার ভিত্তি যেমন সুদৃঢ়, তেমনি তাহার প্রভাব এবং কল্যাণকারিতাও সুদূরপ্রসারী হইবে, ইহা অবধারিত।

নির্ম্মাণের কথা

যুগের প্রচণ্ড কর্ম্মপ্রবাহের মধ্যেও বাঙালী সুযোগ পাইয়াছে—নির্ম্মাণের, আত্মগঠনের। এ বড় কম সৌভাগ্য নহে। বাঙালীর গঠন-সাধনা ধর্ম্মবীর্য্যে প্রতিষ্ঠিত, ইহা অভিনব কর্ম্মের উৎস। ধর্ম্ম—যোগ। কর্ম্মই—নির্ম্মাণ। এই উভয়ের কোনও একটীকে উপেক্ষা করিয়া জাতি বাঁচে না, ব্যক্তিও বাঁচে না। ব্যক্তি জাতি-ছাড়া নহে; তাই দেশের আবহাওয়া বিষাক্ত হইলে, কোনও ব্যক্তি—যত বড় অসাধারণই তিনি হউন না কেন—দীর্ঘদিন সে বিষের সংক্রমণশক্তি এড়াইয়া টিকিয়া থাকিতে পারেন না। বাঁচিবার পথ—ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠিত সংযুক্ত কর্ম্মসাধনা।

ক্ষুদ্র পারিবারিক জীবনেও সুখ, শান্তি ও ঋদ্ধি আকর্ষণ করিতে হইলে, পরিবারের অন্তর্গত ব্যক্তিগুলির মধ্যে একটা প্রীতি ও নিবিড় পরিচয়ের প্রয়োজন হয়; নহিলে পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাতে অচিরাৎ পারিবারিক শান্তিভঙ্গ উপস্থিত হয়—সুখের নীড় ভাঙ্গিয়া পড়ে। ক্ষুদ্র সংসারের ন্যায় বৃহত্তর গোষ্ঠী ও সমষ্টিজীবনেও চাই অন্তরের মিলন—নহিলে সমষ্টিরক্ষা হয় না। নির্ম্মাণের ইহাই কেন্দ্র-তত্ত্ব।

কর্ম্ম মিলনের জন্য—যদি এরূপ বলা যায়, তাহাও অত্যুক্তি হয় না। এই মিলনই জগতের আদি ধর্ম্ম। অণুর সহিত অণুর আকর্ষণ ও মিলনেই যেমন দ্ব্যণুক, ত্র্যণুক ও ত্রসরেণুর উৎপত্তি, তেমনি যাবতীয় পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব এই একই নীতি অবলম্বন করিয়া। বিকর্ষণ ভাঙ্গার বিধান। আকর্ষণেই সৃষ্টি। আর যে কর্ম্ম মিলনাত্মক বা আকর্ষণমূলক, তাহাই প্রতি বস্তুর স্বধর্ম্ম। ইহার বিপরীত অধর্ম্ম। কর্ম্মবিহীন সৃষ্টি নাই; এই সৃষ্টিবীর্য্যই জীবের সনাতন ধর্ম্ম। কলহ, বিবাদ, মৃত্যু, ধ্বংস—বিপরীত মূর্ত্তি, এগুলি বিকর্ম্ম বা অধর্ম্ম। বিশ্বের অভিব্যক্তিতে দুই-এর প্রয়োজন আছে। সৃষ্টি বা লয় কিছুই নাই বলিয়া, তাহা ধর্ম্মাধর্ম্ম উভয় ভাবেরই অতীত। অকর্ম্ম অভাবস্বরূপ, উহা মহাশূন্য।

আমরা সংগঠনমূলক কর্ম্ম বা ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াই জাতিনির্ম্মাণে অগ্রসর হইব—বাঙালীর ইহাই আজ বিধাতৃ-দত্ত যুগ-প্রেরণা। এই যুগধর্ম্ম হইতে আমরা কোনও কারণে বিরত বা বিচ্যুত হইব না। কর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া আমরা মিলিত হওয়ার ব্যর্থ প্রয়াস করিব না—মিলিত হইয়াই কর্ম্মরত হইব। আমাদের কর্ম্ম শুধু মিলন লক্ষ্যে রাখিয়া নিষ্পন্ন হইবে না, উহা হইবে মিলনের, ঐক্যেরই অভিব্যক্তি। একই কর্ম্মপ্রণালীর অনুবর্ত্তনেও মানুষের মধ্যে ঐক্যপ্রতিষ্ঠা সিদ্ধ হয় না, যদি না তাহাদের মধ্যে হয় অন্তরের যোগস্থাপন। ধর্ম্মমূলক গঠনকর্ম্মের মূল উৎস এইখানেই।

অবস্থার আনুকূল্যে যে হৃদয়-বন্ধন গড়ে, অবস্থার বিপর্য্যয়ে তাহা টুটিয়া নিশ্চিহ্ন হইবে, ইহা বিচিত্র নয়। অন্তরের টানে যে মিলন, তাহাই অচ্ছেদ্য। অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে পারে; আত্মার সহিত আত্মার সম্বন্ধ যদি কোথাও সত্যই অনুভূত হইয়া থাকে, তাহা মৃত্যুর খড়্গেও ছিন্ন হইবার নহে। আত্মার সম্বন্ধ অলীক নহে, বাস্তব সত্য। হিন্দু-ভারতের ইহা চিরপরিচিত অনুভূতির সত্য। এই অধ্যাত্মবন্ধনে হিন্দু স্বামি-স্ত্রীর দাম্পত্য-সম্বন্ধ চির অটুট, হিন্দুর সমাজ-সংস্থিতি নিত্য অক্ষয়, হিন্দু জাতির অমর জাতীয়তাও এইখানেই। কাজেই জাতি-গঠনের মূলসূত্রস্বরূপ অধ্যাত্মসম্বন্ধে দৃষ্টিহীন হইয়া ভারতে জাতিনির্ম্মাণ কদাচ সম্ভব নহে।

বাংলার সমাজে, রাষ্ট্রে মতভেদ, দলাদলি, হানাহানি। সাহিত্যে, সংবাদপত্রে রেষারেষি, স্বার্থ ও পথভেদের সংঘর্ষ। হয়ত বাংলার পবিত্র ধর্ম্মক্ষেত্রগুলিও এই ভেদ-বিসম্বাদ হইতে মুক্ত নহে। ইহাতেও নিরাশ হওয়ার হেতু নাই। যে মহাশক্তি দেশে একদিন অবতরণ করিয়াছিল, তাহা স্থিরভাবে অবধৃত করার ধারণ-সামর্থ্যের অভাবই এই অবস্থা-বৈষম্যের কারণ। যত দলই দেশে গড়িয়া উঠুক, উহাদের অন্তর্নিহিত মূল প্রেরণা—ভেদ-সৃষ্টি নহে, আত্মপ্রতিষ্ঠ জাতি-নির্ম্মাণ। এই আত্মপ্রতিষ্ঠার অস্ফুট অভিব্যক্তি যে দলের 'অহং', তাহা বৃহতেরই পথে অভিযানের একটী ক্রম মাত্র; ইষ্টে আত্মসমর্পণ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের লয়ে যে সংহতি-কেন্দ্র দেশে ব্যাঙের ছাতার ন্যায় গজাইয়া উঠিয়াছে, তাহার সমষ্টিভূত বৃহৎ ঐক্যমূর্ত্তি একদিন আমরা প্রত্যক্ষ করিবই। সে যুগ অনাগত, কিন্তু আসন্ন। সাম্প্রদায়িকতার বীভৎস

বিস্ফোরণে আজ দিকে দিকে যে লাভাস্রাব নিঃসরিত হইতেছে, তাহা নব যুগেরই নিদারুণ গর্ভবেদনা বলিয়া গ্রহণ করিলে, আমরা দেখিব—বাঙালীর অন্তরতলে নবীন জাতি-শিশু জন্মলাভ করিয়াছে—এ শিশু বাংলার গণ-বিগ্রহ, জীবনধর্ম্মী উদীয়মান অখণ্ড বাঙালী জাতিই।

সাহিত্যের জাগরণ

বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র নাই, শরৎচন্দ্র অস্তমিত; কিন্তু কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার রশ্মিজাল এখনও জ্যোতিঃ বিকীরণ করিতেছে। বঙ্গ-সাহিত্যে যে রবীন্দ্রোত্তর যুগের কথা মাঝে বড় উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল এবং এখনও মাঝে মাঝে যে ধূয়ার হুমকী শুনা যায়, উহার ঘনঘটা মনে হয় কিছু কাটিয়াছে। আজ যেন একটা থম্‌থমে অবস্থা ও বিমর্ষ আব্‌হাওয়াই আমরা পরিলক্ষ্য করিতেছি। জাতির সাহিত্য-প্রতিভা যেন গতির পথে একটু দম লইবার জন্য বিশ্রাম করিতেছে। জাতীয় জীবনের অবসন্নতাই হয়ত ইহার প্রধান বা একমাত্র কারণ। বাঙালী আজ তার রাষ্ট্রীয়, সামাজিক এবং কৃষ্টি ও সংস্কৃতি-মূলক জীবনে একটা সন্ধিস্থলে।

জাতির সাহিত্য জাতীয় জীবনের যুগপৎ প্রতিচ্ছবি ও সৃষ্টিবীর্য্য। বাঙালী আজ কি চাহিবে, ভাবিবে,—কোন পথে সে চলিবে? গতির পর বিশ্রাম যেমন জাগরণের পর নিদ্রা—কিন্তু আবার নূতন জাগরণ ও গতিরই তাহা সূচনা করে। বাঙালী আজ সেই নূতন গতির সন্ধান যদি পাইয়া থাকে, তবেই তার সমুজ্জল ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত। মনে হয়, আজ জাতীয় প্রতিভা তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছে। বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রেও এই অনুভূতিই তাই আমাদের অন্তরে সাড়া তুলে।

বাঙালী আজ সংঠনের পথিক। এই শঙ্খনিনাদ আমাদের কাণে বাজিতেছে। অবস্থার দায়ে এই আহ্বান নয়, ইহা আমরা বহুদিন হইতে বলিতেছি। জাতির অন্তরদেবতাই সে আহ্বান দিয়াছেন। এ ডাক বাঙালী দীর্ঘ দিন উপেক্ষা করিবে না, ইহা আমরা জানি। আজ যুগসঙ্কটে নূতন মন্ত্র, নূতন বাণী বাঙালীকে কে শুনাইবে? বাংলার সাহিত্যিকগণ, দেবী ভারতীর বরপুত্রগণ। আজ ব্যক্তিপ্রতিভার সংযম জাতির সমষ্টি-প্রতিভার কল্পশক্তি স্ফুরিত করিয়া তুলিবে। এই শক্তিই জাতির নূতন সৃষ্টি-বীর্য্য। ২৫ বৎসরের "প্রবর্ত্তক" যদি বাংলায় একটা কণিকা পরিমাণ সংহতি-সৃষ্টি করিয়া থাকে, তাহা সাহিত্যের সৃজনী ও সংগঠনী ক্ষমতাকেই প্রতিপন্ন করিয়া তুলিতেছে। যে সাহিত্য নূতন জাতি সৃষ্টি করিবে, তাহার জাগরণের দ্যোতনা বাঙালীর কল্পলোকে নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও অনুভূত হইতেছে। নহিলে এ আশা ও বিশ্বাসের স্পন্দন উঠে কোথা হইতে? আমরা বাংলায় যুগ-সাহিত্যের নবীন কর্ণধার ও মহারথিগণের অভ্যুত্থান কামনা করিতেছি। বাংলার ভাগ্য-দেবতা আমাদের এ শুভ কামনা নিশ্চয়ই পূর্ণ করিবেন।

আততায়িতার সম্মুখে

ঢাকা, বোম্বাই, কাণপুর, আহ্মেদাবাদ—সর্ব্বত্র একই গলিত, কলুষিত ক্ষত-মূর্ত্তি—সাম্প্রদায়িক সংঘাতের রক্তাক্ত অভিব্যক্তি। কতখানি সমাজদেহ বিষাক্ত হইলে এরূপ দুর্ঘটনা সম্ভব হয়, তাহা বুঝি ভাবিয়াও স্থির করা যায় না। নহিলে তৃতীয় পক্ষের কথা আসে কেন?

বর্ত্তমান দুর্ঘটনার শিক্ষা সম্বন্ধে একজন লিখিয়াছেন "দাঙ্গা নূতন নয়, ঢাকায়ও নয়, ভারতের বিভিন্ন স্থানেও নয়। দাঙ্গার শিক্ষা সর্ব্বত্রই সমান এবং মর্ম্মন্তুদ। কিন্তু ভারতের অধিবাসী সে শিক্ষা সত্বরই ভুলিয়া যাইতে অভ্যস্ত। কারণ সর্ব্বত্র জন কয়েক স্বার্থপর নেতা আছেন, যাঁহারা উত্তেজনার মাদকতায় লোককে নাচাইতে পারেন। অন্যের হিংস্র প্রবৃত্তি জাগাইয়া এবং নিজেরা সর্ব্বপ্রকারে নিরাপদ্‌ ব্যবধানে থাকিয়া ইহারা স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াস পান। ইহা অতীতেও চলিয়াছে, বর্ত্তমানে চলিতেছে,

ভবিষ্যতেও চলিবে। পাশ্চাত্য রাজনীতি এবং বিদেশী শাসক-রোপিত বিষবৃক্ষের ফল খাইয়া আমরা আত্মঘাতী মরণের দিকে এমনই অগ্রসর হইতেছি, হইবও।”

সহযোগী যে তৃতীয় পক্ষের সন্ধান দিয়াছেন, তাহারা বিদেশী শাসক-রোপিত বিষবৃক্ষের ফলভোজী হইলেও, এ দেশেরই সঙ্কীর্ণ স্বার্থান্ধ নেতৃবৃন্দ। ইহারা শুধু হিন্দু বা শুধু মুসলমান, এইরূপ বলা যায় না—কেন না, ইহাদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান দুই-ই আছেন। যে খুন-জখম, গৃহদাহ, সম্পত্তি-নাশ—তাহা হিন্দু পক্ষে বেশী হইতে পারে; কিন্তু কিছু না কিছু উভয় পক্ষেই হইয়াছে। —যদিও আতঙ্কের মাত্রাটা অতিরিক্ত বেশী হিন্দু পক্ষেই। যে আততায়িতা করে এবং যে আততায়িতার আক্রমণ-ভাজন হয়, উভয়েই সমানভাবে ভীরুতার কলঙ্কগ্রস্ত হয়, তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে।

দুই পক্ষে সমান বলশালী হইলে, আততায়িতা কার্য্যকরী হয় না। এখানে দাঁতের বিরুদ্ধে দাঁত, লাঠীর বিরুদ্ধে লাঠীর ভীতি পরস্পরের মাথা ঠাণ্ডা রাখে। ইহাতে অধিকাংশ স্থলে বাধ্য হইয়া শান্তিরক্ষা সম্ভব হয়। পরন্তু ধর্ম্মমূলক পরস্পর তিতিক্ষা বা পরমত-সহিষ্ণুতার শিক্ষা বর্ত্তমানে কোথাও তেমন কার্য্যকরী হইয়াছে বা হইতেছে বলিয়া দেখা যায় না।

নিখিল ভারত মোসলেম লীগ আজ যে পাকিস্তানের স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ, তার একটা ঢেউ ও ধাক্কা বাংলার বুকে আসিয়া পড়িয়াছে, এমন সংবাদও আমাদের কাণে আসিয়া পৌঁছিয়াছে—যত দূর অনুসন্ধানে জানা যায়, এ সংবাদ ভিত্তিহীন নহে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর বাঙালীকে খণ্ডিত করার এই দ্বিতীয় প্রয়াস সফল হইতে পারে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না। তবুও এমন দুর্ম্মতিও যদি এক শ্রেণীর বাঙালীর মধ্যে আজ ঘটে, এবং সে শ্রেণী হিন্দু ও মুসলমান, এই আখ্যা-ভেদে যদি দুই শিবিরে সজ্জিত হইয়া পরস্পর যুদ্ধমুখী হই দাঁড়ায়, তাহাদের সে তাল-ঠোকাঠুকি দেখিয়া বাংলার অন্তরাত্মা ক্ষণিক শিহরিয়া উঠিলেও, চিরদিনের জন্য আত্মঘাতী নীতি বাঙালী বরণ করিবে না।

বাঙালীকে বাঙালী বলিয়া দেখিতে তৃতীয় পক্ষ হয়তো আজও চাহে না—তাহার ঘর-ভাঙ্গা নীতিতেই এ নীতির প্রশ্রয় নাই। কিন্তু বাঙালীর শুভবুদ্ধি দীর্ঘ দিনের জন্য রাহুগ্রস্ত হইলেও, মুক্তি পাইবে, এ আশা আমাদের আছে। যাহা মিথ্যা ও অমঙ্গল, তাহা আত্মবিষে জর্জ্জরিত হইয়াই প্রতিকার চাহিবে—আজ না হউক, কালও। সাম্প্রদায়িকতা বাঙালীর আত্মবিস্মৃতির দুর্ল্লক্ষণ মাত্র। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কঠোর হইলেও, বিধাতার বিধানে তাহা অমোঘ ও অনিবার্য্য দণ্ড বলিয়াই বরণীয়।

আমরা দৃঢ় অকম্পিত কণ্ঠে বাঙালীর অখণ্ড শুভবুদ্ধিরই উদ্বোধন করিব। বাঙালীর অন্তরতম দেবতাই আজ এই শুভশক্তির জাগরণ চাহেন। সে জাগরণে হিংসা, লোভ, স্বার্থপরতার স্থান নাই। তৃতীয় পক্ষ উপলক্ষ—এইগুলিই বাঙালীর জাতীয় মুক্তি ও কল্যাণের বিরোধী। বাঙালী অন্তঃপ্রেরণা জাগ্রত করিয়াই এই বিঘ্ন দূর করিবে।

খণ্ড প্রাণের নয়, আত্মার জাগরণ এবার আমরা ঘোষণা করিব। ইহার মূল নীতি বিরোধ নহে, পরের আচরণের অপেক্ষাও ইহাতে নাই। বাংলার জাগ্রত পৌরুষ আততায়ীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইবে—রিক্ত হস্তে, উলঙ্গ বক্ষে অমর আত্মার প্রতীতি লইয়াই। জাগ্রত নারী-শক্তি পারিলে সতী দাক্ষায়ণীর কটাক্ষে দুর্বৃত্ত শাসন করিবে, নহিলে আঁশের বঁটি লইয়াও আত্মমর্য্যাদা-রক্ষায় পরাঙ্মুখ হইবে না। অভয়ার বরদৃপ্ত একজন বাংলার পুরুষ বা একজন বাংলার নারীই আজ সমগ্র জাতির লুপ্ত আত্মপ্রত্যয় ফিরাইয়া আনিবার পক্ষে যথেষ্ট। সমগ্র সংহতিই তাহাদের অনুসরণে অচিরে জাগিয়া উঠিবে।

পূর্ব্বানুবৃত্তি :

প্রভার নালিশ ও কান্না সকলের গা-সওয়া হইয়া গিয়াছে, বিশেষ বিচলিত কেউ হয় না। সারাদিনে অন্ততঃ একবার প্রভার নালিশ ও কান্না না শুনিলেই বরং সকলে একটু আশ্চর্য্য হইয়া ভাবে, কি হইয়াছে প্রভার আজ? তবে এক হিসাবে প্রভার মন খুব উদার, একটি ধমকেই সে সন্তুষ্ট হয়, কান্না থামিয়া যায়, ঘ্যান-ঘ্যান প্যান-প্যান করে না। কেবল ধমকটা দিতে হয় কতকটা এই ভাবে: চুপ কর্ প্রভা, কি বকছিস তুই পাগলের মত? তুই কি পর এসেছিস্ এ বাড়ীতে, কুটুম এসেছিস্?

আজ কেউ ধমক দিল না, কিছুই বলিল না। প্রভা আশ্চর্য্য হইয়া সকলের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। তার মেয়ের গালে চড় মারার চেয়ে অনেক বেশী গুরুতর কিছু ঘটিয়াছে বুঝিতে পারা মাত্র কৌতূহলের বন্যায় অভিমান ভাসিয়া গেল।

'কি হয়েছে মা?'

'হয়েছে আমার অদেষ্ট, আমার পোড়া কপাল!'

কি হইয়াছে বুঝা গেল না বটে; কিন্তু ভয়ানক কিছু যে সত্যই হইয়াছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ রহিল না প্রভার। ধৈর্য্য ধরিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সে মা'র মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। জলভরা চোখের সে দৃষ্টি কামিনী বেশীক্ষণ সহ্য করিতে পারিলেন না, বলিলেন, 'তিষ্টু চাকরী করবে না বলছে।'

'ও, এই! তিষ্টু ফাজলামি করছে।'

প্রভার স্বামী মিহিরের আজ চাকরী নাই তিন বছর, প্রভা ভাবিতেও পারে না মানুষ চাকরী পাইয়াও বলিতে পারে, সে চাকরী করিবে না।

বাপের সঙ্গে এ ধরণের ফাজলামি করা ত্রিষ্টুপের স্বভাব নয়, তবু অথই জলে পড়িলে মানুষ যেমন হাতের কাছে যা পায় তাই আঁকড়াইয়া ধরে, অবিনাশ ও কামিনীও তেমনি প্রভার কথা শুনিয়া উৎসুক দৃষ্টিতে ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। আশ্চর্য্য কি, সকলকে একটু চমক দেওয়ার জন্য ত্রিষ্টুপ হয় তো ফাজলামিই করিতেছে। ত্রিষ্টুপ কথা বলিল না, সে তখন অবাক্ হইয়া খোলা দরজা দিয়া ওদিকের রোয়াকে একটা তুচ্ছ ঘটনা লক্ষ্য করিতেছিল। রোয়াকে একটি আধপোড়া বিড়ি পড়িয়াছিল, কোথা হইতে আসিয়া ঘরে ঢুকিতে গিয়া মিহির হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া বিড়িটা কুড়াইয়া নিয়াছে। বিড়ি নিয়া মিহির ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল, সেখান হইতে ডাক আসিল রাণুর। ঘরে গিয়া সঙ্গে সঙ্গে রাণু ফিরিয়া আসিল।

'দেশলাইটা দাও না দিদিমা, বাবা চাচ্ছে।'

আধপোড়া বিড়ি কুড়াইয়া খায়, তিন বছরে মিহিরের এমন অবস্থা হইয়াছে? প্রভার জন্য ত্রিষ্টুপ হঠাৎ গভীর মমতা বোধ করে। মিহিরকে আজ আধপোড়া বিড়ি কুড়াইয়া বেড়াইতে হয় বলিয়াই তো প্রভা সারাদিন নালিশ করিয়া কাঁদিবার অজুহাত খোঁজে। আর কয়েক বছর পরে দু'জনের অবস্থা কি দাঁড়াইবে কে জানে!

অবিনাশ আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না, একবার একটু কাসিয়া বলিলেন, 'তাহ'লে চান-টান করে—'

'দাঁড়াও, আসছি।'

ত্রিষ্টুপ একেবারে বাড়ীর বাহিরে চলিয়া গেল, গলির মোড়ে গিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কি করা উচিত, আর একবার ভাবিয়া দেখিবার জন্য সে এখানে পলাইয়া আসিয়াছে; কিন্তু ভাবিবার কিছুই খুঁজিয়া পাইতেছে না। দ্বিধা ও সন্দেহে সমস্ত চিন্তা এলোমেলো হইয়া যাইতেছে। মা ও বাবার জন্য, প্রভা ও মিহিরের জন্য কিছুদিন চাকরী সে করিতে পারে, কিন্তু কেন করিবে? নিজের বিশ্বাস, আদর্শ আর নবলব্ধ প্রেরণা বলি দিয়া লাভ কি হইবে? এক ঘণ্টার মধ্যে প্রথম বাধার কাছেই যদি সে হার মানে, অত বড় প্রতিজ্ঞা করার কি দরকার ছিল? মন যার এমন দুর্ব্বল, তার অত বাহাদুরী করা কেন নিজের কাছে? খানিক আগে যে স্থির

করিয়াছে সে চাকরী করিবে না, পৃথিবী রসাতলে গেলেও করিবে না, এত শীগ্‌গির তাকে বাড়ী ছাড়িয়া পলাইয়া আসিতে হইয়াছে—চাকরী করিবে কি না, আর একবার ভাবিয়া দেখিবার জন্য! সে যে সত্যই অপদার্থ, এর চেয়ে তার বড় প্রমাণ আর কি আছে?

কিছুদিনের জন্য—? নিজের মনেই ত্রিষ্টুপ সংশয়ভরে মাথা নাড়ে। কিছুদিন পরে তো আর অবস্থা বদলাইবে না, বরং সে আরও জড়াইয়া পড়িবে। আজ চাকরী আরম্ভ না করা যত কঠিন মনে হইতেছে, কিছুদিন পরে চাকরী ছাড়া তার চেয়ে ঢের বেশী কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে।

তবে আর একটা কথা আছে। চাকরী না করিলেই বা এখন সে কি করিবে? বড় একটা আদর্শ সামনে খাড়া রাখিয়া চুপচাপ ঘরে বসিয়া দিন কাটাইলে তো তার চলিবে না। নিজের জীবনকে সব দিক্ দিয়া সার্থক করিবার প্রতিজ্ঞা সে গ্রহণ করিয়াছে, মানুষ হিসাবে তার যা প্রাপ্য সব সে আদায় করিয়া ছাড়িবে, জগৎকে বুঝাইয়া দিবে তার কাছে আর ফাঁকি চলিবে না; কিন্তু সেটা সম্ভব করিবার জন্য সকলের আগে একটা উপায় তো তার খুঁজিয়া বাহির করা চাই? ভাবিয়া চিন্তিয়া উপায় স্থির করার সময় অবশ্য সে পায় নাই, কিন্তু সময় পাওয়ার পরেও উপায় যদি সে স্থির করিতে না পারে? যে পথে চলিলে নীচে নামিতে হইবে না, পিছনে হটিতে হইবে না, আগাইতে আগাইতে সার্থকতায় পৌঁছিতে পারিবে, সে পথ যদি খুঁজিয়া না পায়? পথ খুঁজিয়া পাইলেও, পথ ধরিয়া চলিবার ক্ষমতা যদি তার না থাকে?

গভীর বিষাদ অনুভব করিতে করিতে নিজেকে তার বড় একা আর অসহায় মনে হয়। আর নিজের মত জগতের প্রত্যেক মানুষকে একা মনে হয় বলিয়া নিজের অখণ্ড ও অবর্জ্জনীয় একাকীত্বের বোঝা যেন দুঃসহ হইয়া উঠে। কত লোক চলিতেছে পথ দিয়া, কত চিন্তার ঢেউ উঠিতেছে প্রত্যেকের মনে, কিন্তু কেউ কারও চিন্তার খবর রাখে না। কত কাছাকাছি সকলের দেহগুলি, তাড়াতাড়ি চলিতে গিয়া একটি দেহের সঙ্গে আর একটি দেহের কত বার ঠেকাঠেকি হইতেছে, কিন্তু একজনের জগৎ কি এতটুকু কাছে আসিতেছে আর একজনের জগতের? এমন একটি মানুষও যদি থাকিত—যে তার আপন, যার সঙ্গে তার প্রকৃত যোগাযোগ আছে, হাসি-কান্না ছাড়াই যে বুঝিতে পারে সে সুখী কি দুঃখী, এখন তাকে সে জিজ্ঞাসা করিতে পারিত তার কি করা উচিত।

এই সব ভাবিতে ভাবিতে ত্রিষ্টুপের মনে পড়িয়া গেল, সকালে সে চা খায় নাই, রীতিমত অস্বস্তিবোধ হইতেছে; ডাইনে বিধুর চায়ের দোকান,—'স্বাধীন ভারত রেষ্টুরেণ্ট'। এক কাপ চা খাইতে খাইতে আর একবার চাকরীর কথাটা ভাবিয়া দেখা যায়। তক্তার মত চ্যাপ্টা বিধুর করাতের মত দাঁতাল অমায়িক হাসির জবাবে একটু হাসিয়া, দেওয়ালে জড়িপাড় সাড়ী পরা জগদ্ধাত্রীর ছবির পাশে পাকা ফলের মত টসটসে ও গোলাকার উলঙ্গ জাপানী মেয়ের ছবির দিকে আনমনে চাহিয়া চুমুক দিতে দিতে চায়ের কাপ খালি হইয়া গেল, এলোমেলো ভাবনাগুলিকে কোনমতেই আয়ত্ত করা গেল না।

'কলেজ স্কোয়ারে সস্তায় পাওয়া যায় ত্রিষ্টু।'

মণীশ কাছে আসিয়া বসিয়াছে, আলগোছে গরম চায়ের কাপে চুমুক দিতে গিয়া আড়চোখে চাহিয়া আছে। জুতা আর চুলে চকচকে পালিশ, পাঞ্জাবীর হাতা গিলে করা, তলায় গেঞ্জি দেখা যায়, সোণার বোতামগুলি সাদা শূন্যতার মধ্যে টুকরো টুকরো সোণালী অলঙ্কারের মত।

'কি পাওয়া যায়?'

'চীন জাপানের মেয়ে—এদেশীও পাওয়া যায়। কষ্ট করে' এখানে না এসে কয়েকটা কিনে এনে ঘরে টাঙ্গিয়ে রাখিস্, সারাদিন যত খুসী দেখতে পারবি।'

মনে মনে বিরক্ত হইলেও, ত্রিষ্টুপ একটু হাসিল।

'তবে একটা বিয়ে করলে, অবশ্য সব হাঙ্গামা চুকে যায়। তাই কর না?'

এই ধরণের পরিহাস করিতে মণীশ খুব পটু। বোধ হয় সেই জন্যই মণীশকে সে পছন্দ করে না। মানুষটা মণীশ খারাপ নয়; সাজসজ্জার দিকে তার অতিরিক্ত ঝোঁকটা ভাল না লাগিলেও, সেটা ত্রিষ্টুপ অপরাধ মনে করে না। মণীশের বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ, পড়াশোনাও সে অনেক করিয়াছে, ত্রিষ্টুপ বুঝিয়া উঠিতে পারে না সব সময়ে সে কেন এমন বাবু সাজিয়া থাকিতে ভালবাসে।

ত্রিষ্টুপের সব চেয়ে খারাপ লাগে, মণীশের অদ্ভুত আত্মপ্রত্যয় আর সবজান্তার ভাব। কিছুই সে যেন গ্রাহ্য করে না, সমস্তই তার কাছে যেন তুচ্ছ। রাজপুত্রের বেশে এই নোংরা চায়ের দোকানে চা খাইতে আসিয়া এখানকার সাধারণ মানুষগুলির সঙ্গে সমানভাবে হাসিগল্প করা আর ছেঁড়া জামা গায়ে চৌরঙ্গীর বড় সাহেবী হোটেলে খানা খাইতে গিয়া বড় বড় লোকের সঙ্গে মেলামেশা করা যেন তার কাছে সমান। মাঝে মাঝে সে এখানে আসে, বিনা চেষ্টাতে সকলের সঙ্গে মিশ খাইয়া যায়, তবু যেন একটা দূরত্ব ও ব্যবধান কোন সময়েই ঘোচে না। ঠিক অহঙ্কার নয়, মানুষগুলিকে অবজ্ঞা করা নয়, কেমন একটা নির্ব্বিকার উদাসীনতার সঙ্গে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি তুচ্ছ করিয়া চলা। প্রতিবেশীর নিন্দায়, গুজবের সৃষ্টিতে, ঘরের ব্যাপারের সঙ্গে মিশাইয়া পৃথিবীর রাজনীতির আলোচনায়, তর্কে আর কলহবিবাদে সকলে যখন মসগুল হইয়া যায়, মণীশ তাহাতে যোগ দিতে কসুর না করিলেও, ত্রিষ্টুপের মনে হয় সকলের ছেলেমানুষীতে সে তলে তলে নিছক আমোদ উপভোগ করিতেছে।

দু'দিন আগে বিকালবেলা পরিতোষ আসিয়াছিল, শোকে মুহ্যমান পরিতোষ। একটি চেয়ারও খালি ছিল না, সকলের আগে নিজের চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া মণীশ তাকে বসিতে দিয়াছিল। কিন্তু তখনও তার মুখে ত্রিষ্টুপ এতটুকু সহানুভূতির চিহ্ন দেখিতে পায় নাই। মুখ দেখিয়া বরং মনে হইয়াছিল, সে বুঝি ভাবিতেছে অনেক দূরে নৌকাডুবিতে একটি পরিবার নিশ্চিহ্ন হইয়া গেলে, এখানে একটা মানুষ আধমরা হইয়া যায় কেন!

ভাল লাগে না, কিন্তু মণীশকে তুচ্ছও সে করিতে পারে না। সময়ে সময়ে ত্রিষ্টুপের মনে হয়, আসলে এটা তার ভাল না-লাগা মোটেই নয়, আর দশজনের মত মানুষের সুখ-দুঃখ মানুষটাকে বিচলিত করে না বলিয়া তার অভিমান হইয়াছে, আর প্রতিকারহীন অভিমানের জ্বালাকে মনে হইতেছে বিরাগ।

'মনটা ভাল নেই মণীশদা।'

'মন ভাল নেই? সে কি কথা! মন খারাপ করেছ কেন?'

'আমি করিনি। ব্যাপারটা শুনুন—'

মণীশ শুনিয়া যায় আর শুনিতে শুনিতে তার মুখ গম্ভীর হওয়ার বদলে যেমন ছিল তেমনি থাকে, হাসি-হাসি ভাবটুকু পর্য্যন্ত মিলাইয়া যায় না। দেখিয়া ত্রিষ্টুপের ভাল-না-লাগা অথবা অভিমান উথলিয়া উঠিতে থাকে।

কথা শেষ করিয়া ঝাঁঝালো সুরে সে তাই জিজ্ঞাসা করিল, 'হাসবার কি হ'ল?'

মণীশ বলিল, 'হাসি নি। চাকরী করতে চাও না বলছ, বড় কিছু করতে চাও। কি করবে সেটা এখনও ঠিক করো নি। তা' যতদিন সেটা ঠিক করতে পারছ না, ততদিন চাকরীটা করলে হ'ত না? কিছু পয়সা জমাতে পারলে, বড় কিছু আরম্ভ করতে একটু সুবিধা হবে।'

'কিছুদিন চাকরী করলে যদি—'

'ও ভাবে যদির কথা ভাবলে কিছু হয় না তিষ্টু। প্ল্যান করবার সময়ে সমস্ত যদির হিসাব ধরতে হয়—যদি এ রকম হয়, তবে এই ব্যবস্থা করতে হবে, যদি ও রকম হয়, তবে ও রকম ব্যবস্থা করতে হবে, বাস্, সেইখানে যদির শেষ। যদি এ রকম না হয়ে ও রকম হয়, ভেবে প্রথমেই ভড়কালে তো চলে না! তা' ছাড়া, কিছুদিন চাকরী করে' সময়মত চাকরীটা ছাড়বার ক্ষমতা যদি তোমার না থাকে, তাতেই তো প্রমাণ হয়ে যাবে—বড় কিছু করবার ক্ষমতা তোমার নেই। চাকরী করে' যাওয়াটাই তখন সব চেয়ে ভাল হবে তোমার পক্ষে।'

'কিন্তু চাকরী করলেই জড়িয়ে পড়ব যে! বাড়ীর লোকের মুখ চেয়ে চাকরী নেওয়ার মানেই দাঁড়াবে—'

'বাড়ীর লোকের মুখ চেয়ে চাকরী নেবে কেন? নিজের জন্য চাকরী নেবে, বড় কিছু করার অঙ্গ হিসাবে চাকরী নেবে। কি করব, এখনো ঠিক করতে পারিনি, চাকরী করে যা' পারি উপার্জ্জন করা যাক—এই ভেবে চাকরী নেবে। বাড়ীর লোকের মুখ চেয়ে বড় কিছু করা যায় না তিষ্টু। সাক্সেসের জন্য স্বার্থপর না হ'লে চলে না। অবশ্য বাড়ীর লোকের মুখ কেন, পৃথিবীর লোকের মুখ চাইতে কোন বারণ নেই, সকলকে বঞ্চিত করে' নিজের সুখ খোঁজার স্বার্থপরতার কথা বলছি

না—সাক্সেসের পথে বিঘ্ন হিসাবে যা' কিছু দাঁড়াবে, সে সমস্ত বিসর্জ্জন দেওয়ার কথা বলছি। যেমন ধর —তুমি যেদিন চাকরীটা ছেড়ে দেবে, বাড়ীর লোক সেদিন কেঁদে-কেটে চোখ ফুলিয়ে ফেলবে, তুমিও তাদের সঙ্গে কাঁদবে, অন্ততঃ মনে মনে কাঁদবে। কিন্তু ভাববে, কাঁদুক, উপায় কি!'

সাড়ে দশটার সময়ে ত্রিষ্টুপ বাড়ী ফিরিল। অবিনাশ রান্নাঘরের দরজার কাছে মোড়ায় বসিয়া তামাক টানিতে-ছিলেন, তখন পর্য্যন্ত তিনি স্নানও করেন নাই।

'আপিস যাওনি যে?'

'লজ্জা করে না তোর? যোয়ান মদ্দ তুই ঘরে বসে' থাকবি, বুড়ো বয়সে আমি খেটে খেটে মরব? তুই যদি না যাস, আমিও আর যাব না।'

'চল, চল, আমিও যাচ্ছি।'—এক খাবলা তেল নিয়া মাথায় ঘষিতে ঘষিতে তিষ্টুপ তাড়াতাড়ি স্নান করিতে গেল।

বড়বাবু পদ্মলোচন অভিমান করিয়া বলিলেন, 'প্রথম দিনটাতেই দেরী হ'ল!'

অবিনাশ কাচুমাচু করিয়া বলিলেন, 'মন্দিরে একবার পূজো দিতে গিয়ে—'

পদ্মলোচন তাড়াতাড়ি কপালে হাত ঠেকাইয়া বলিলেন, 'তা বেশ, তা বেশ।'

ত্রিষ্টুপ অবাক্ হইয়া দু'জনকে দেখিতে থাকে। একজন অনায়াসে মিথ্যা কথাটা বলিয়া ফেলিল; পূজা দিতে গিয়া আপিস পৌঁছিতে দেরী করার জন্য বিরক্ত হইলে পাছে অপরাধ হয়, এই ভয়ে আর একজনের বিরক্তি সঙ্গে সঙ্গে উপিয়া গেল! দু'জন সমবয়সী নিরীহ গোবেচারী মানুষ, জীবনটাও হয়তো দু'জনের একই ছাঁচে ঢালা—পরীক্ষা পাস, চাকরী ও সংসার—কিন্তু একজন মন্দিরের নামে মিথ্যা বলিতে ভয় পায় না, আর একজন মন্দিরের নাম শুনিলেই ভড়কাইয়া যায়।

আপিস ত্রিষ্টুপের অপরিচিত নয়, আগে মাঝে মাঝে দরকার পড়িলে বাপের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে, চাকরী হওয়ার সময়ে বিনা দরকারেই ঘন ঘন অনেক বার আসিয়াছে। অনেকের সঙ্গেই তার চেনা ছিল, অবিনাশ আরও কয়েক জনের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিলেন—প্রত্যেকের ভদ্রতা ও শুভ কামনার জবাবে সবিনয়ে বলিতে লাগিলেন: 'আপনাদের দয়া।'

বাড়ী ফিরিবার সময়ে ট্রামে ও ট্রেণে অবিনাশ ছেলেকে অনেক রকম উপদেশ দিলেন, আপিসে কোন লোকটা ভাল আর কোন লোকটা বজ্জাৎ মুখে মুখেই তার লম্বা তালিকা শুনাইয়া দিলেন, কার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করিতে হইবে, তাও বুঝাইয়া দিলেন।

—'আস্তে আস্তে ডিপ্লোমেসী শিখতে হবে, নইলে উন্নতির কোন আশা নেই বাপু। দেরী করার জন্য পদ্মলোচন চটে' ছিল, দেখলি তো কেমন সামলে নিলাম?'—অবিনাশ সগর্ব্বে ছেলের মুখের দিকে তাকালেন—'অন্য কেউ হ'লে কেঁউ কেঁউ করত, আর ও ব্যাটা আরও চটে' যেত, আমি তো জানি কত ধানে কত চাল, এমন কৈফিয়ৎ দিলাম যে আর টুঁ-শব্দটি করতে পারল না!' —একটু থামিয়া উপসংহার করিলেন, 'তবে লোকটা সত্যি ধার্ম্মিক। মন্দির দেখলেই আধঘণ্টা ধরে' প্রণাম করে।'

ত্রিষ্টুপ বলিল, 'আর প্রার্থনা করে, আমার মাইনে বাড়ুক?'

অবিনাশ আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, 'সে তো সবাই করে!'

বিধুর চায়ের দোকানে মণীশ বসিয়া ছিল। সূর্য্য চোখের আড়ালে চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু তখনও সন্ধ্যা হয় নাই। এত আগে মণীশ কখনও বিধুর চায়ের দোকানে আসে না।

ত্রিষ্টুপ বলিল, 'তুমি এগোও বাবা, আমি আসছি।'

চায়ের দোকানে ঢুকিতে যাইতেছে দেখিয়া অবিনাশ শঙ্কিত হইয়া বলিলেন, 'খালি পেটে চা খেও না তিষ্টু।'

ত্রিষ্টুপ মাথা নাড়িয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

মণীশ জিজ্ঞাসা করিল, 'কেমন লাগল তিষ্টু?'

ত্রিষ্টুপ বলিল, 'কেমন যেন লাগল মণীশদা।'

'কেমন লাগল বুঝতে পারছ না? তার মানে ভালও লাগেনি, খারাপও লাগেনি।'

'সব যেন কেমন খাপছাড়া মনে হ'ল।'

মণীশ মাথা হেলাইয়া সায় দিয়া বলিল, 'বোস, চা খাও।'

ত্রিষ্টুপ দ্বিধাভরে বলিল, 'খালি পেটে—'

মণীশ হাসিল, 'পেট খালি থাকবে কেন? চপ খাও, কাটলেট খাও, টোষ্ট খাও,—বাড়ীর খাবার না হ'লে কি তোমার পেট ভরে না?'

মণীশের কাছে চিরদিন নিজেকে ত্রিষ্টুপের ছেলেমানুষ মনে হয়, আজ আরও বেশী মনে হইতে লাগিল। একটু শ্রান্তিও সে বোধ করিতেছিল, শারীরিক নয়, মানসিক শ্রান্তি।

সন্ধি হইয়া গিয়াছে, তবু সকালবেলার লড়াই-এর জের যেন এখনও মেটে নাই। কেবলি মনে হইতেছে—সে যেন সন্ধি করিয়াছে হার মানার ভয়ে। কেমন একটা অনির্দ্দিষ্টভাবে নিজেকে অপরাধী মনে হইতেছে।

'থাক্, দোকানের খাবার খেতে হবে না তিষ্টু। আমার বাড়ীতে কিছু খাবে চল।'

'আপনার বাড়ীতে মণীশদা? খাবার-টাবার করার হাঙ্গামা—'

'হাঙ্গামা আবার কিসের? খাবার তৈরী হয়েই আছে, চাটা শুধু করতে হবে।'

মণীশ উঠিয়া দাঁড়াইল।—'এস।'

মণীশের বাড়ী বেশী দূরে নয়, দু'চারবার ত্রিষ্টুপ তার বাড়ীতে গিয়াছে। আগে কোনদিন মণীশ তাকে ভিতরে ডাকে নাই, আজ একেবারে দোতলায় তার নিজের ঘরে নিয়া গেল।

'ব'স তিষ্টু।'

একটা রঙচটা কাঠের চেয়ারে বসিয়া ত্রিষ্টুপ বিস্ময়ের সঙ্গে চারিদিকে চাহিতে লাগিল। এ ঘর যে মণীশের, তা' যেন বিশ্বাস করা যায় না। যার মাথার একটি চুল সে কোনদিন স্থানভ্রষ্ট দেখে নাই, তার ঘরে এমন বিশৃঙ্খলা, এমন দারিদ্র্যের ছাপ!

টেবিলে আর টেবিলের নীচে যেমন তেমন ভাবে বই গাদা করা, এক কোণায় জমা করা কতগুলি ইংরাজী বাংলা সাময়িক পত্রে ধূলা জমিয়া আছে, ট্রাঙ্ক ও সুটকেসটির রঙ বিবর্ণ, অনেকদিনের পুরাণো খাটের বিছানার চাদরটা ময়লা। নূতন সোফা-টেবিলে জমকালো বাহিরের ঘর পার হইয়া বাড়ীর ভিতরের গরীবানা অপরিচ্ছন্ন চেহারা দেখিয়াই ত্রিষ্টুপ একটু অবাক্ হইয়া গিয়াছিল, মণীশের নিজের ঘর দেখিয়া সে একেবারে থ বনিয়া গেল।

তাকে বসিতে বলিয়াই মণীশ বাহির হইয়া গিয়াছিল। একটু পরেই সে ফিরিয়া আসিল। আরও খানিকক্ষণ পরে দু'হাতে দু'টি থালায় লুচি আর তরকারী নিয়া একটি মেয়ে ঘরে আসিল।

মেয়েটিকে ত্রিষ্টুপ কলতলায় বাসন মাজিতে দেখিয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

অহল্যা

৺ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী

আমার ভিতরে দেখি স্খলিত-চরণা
কামনার মূর্ত্তি ধরি' অহল্যা পাষাণী
কত যুগ জড়বৎ বিগত-চেতনা
ছিল পড়ি'।
তুমি নাথ! কবে গো না জানি
সহসা আসিয়া তার শিলাময় শিরে
রক্ত কোকনদ সম শ্রীচরণ দুটি
রাখিলে করুণা করি'; ধীরে, ধীরে, ধীরে
শ্রীপদ-পরশে তার সে জড়তা টুটি'
অঙ্গে অঙ্গে প্রবাহিল অপূর্ব্ব স্পন্দন,
মর্ম্ম-গূঢ় ভকতির স্থগিত নির্ঝর
উথলি' ঝরিল নেত্রে, পুলক-কম্পন
বহিল বিজলী-বেগে দেহের ভিতর।
প্রেমের চিন্ময় তনু লভিয়ে কামনা
হয় বুঝি আনন্দের সমাধি-মগনা।

অক্ষয় তৃতীয়া

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

মহাভারতের মুক্তি-সাধনা-যজ্ঞের বেদীতলে
দিগ্‌দেশাগত নরনারী আজি মিলিয়াছে দলে দলে।
কেহ আনিয়াছে সমিধ্‌-কাষ্ঠ, কেহ বা গঙ্গাজল,
কেহ বহি' আনে হবিঃ-মধু-দধি উৎসাহ-চঞ্চল।
কেহ-বা যোগায় প্রাণের ভক্তি, মনের শক্তি কেহ,
সন্ন্যাসী, গৃহী—কে আত্ম-পর, মনে জাগে সন্দেহ!

উদার কণ্ঠ, নয়নে দীপ্তি—ঋত্বিক্ মহামতি
হাঁকিয়া কহেন,—"তোমরাই এই সঙ্ঘের সংহতি!
তোমাদেরই লয়ে এ মহাযজ্ঞ ধন্য হউক আজি,
লক্ষ বক্ষে মাতৃ-সাধনা ঐক্যে উঠুক বাজি';
সত্য-শক্তি সঙ্ঘ-শক্তি আবার লভুক প্রাণ,
নব গৌরবে জাগুক মায়ের নিজ্জিত সম্মান।"

"পূর্ব্ব-অচলে উদিল অরুণ, অমৃত দীপ্তি তার
বাহিরে ও ঘরে ঘুচাক সবার মনের অন্ধকার;
অমিয়ার ধারা পড়ুক ঝরিয়া মানবের গৃহতলে,
মর্ম্মকোষের দল যেন তার ফুটে সহস্র দলে!
সার্থক হোক পুণ্য লগ্ন অক্ষয়া তৃতীয়ার—
অক্ষয় বট হয়ে উঠে যেন প্রতিষ্ঠা আজিকার।"

ওরে কবি, তুই আজিকার দিনে কি করিবি, তাই বল্,
তোর হাতে শুধু অতি নগণ্য বাঁশীখানি সম্বল।
প্রাণপণ করি' তাই বাজা তুই আজি এ যজ্ঞপুরে,
পৌরুষে-প্রেমে জাগায়ে চিত্ত নব নব সুরে সুরে। *

---

* প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবে অনুষ্ঠিত প্রবর্ত্তক সাহিত্য-সম্মেলনে কবি কর্ত্তৃক পঠিত।

২৪

কর্ম্মের ধূম বাড়িয়াই চলিতেছিল। বিদ্যাপীঠে ছাত্রসংখ্যা বাড়িতেছে, অথচ তাহাদের থাকিবার স্থান নাই। কেহ বৃক্ষতল আশ্রয় করিল, কেহ আমার বন্ধুবান্ধবের বাড়ী গিয়া রাত্রিযাপন করিতে লাগিল। সে এক অপূর্ব্ব অব্যবস্থার মধ্যে ভবিষ্যৎ-সৃষ্টির উদ্যোগ-পর্ব্ব! সে দিনের শিক্ষাপ্রার্থীরাই কিন্তু শক্ত মানুষ হইয়া প্রবর্ত্তক সঙ্ঘকে অবধারণ করার বীর্য্য লাভ করিয়াছে। শ্রীমান্ অরুণচন্দ্র পণ্ডিচারী হইতে যে অবস্থা আমার নিকট বিজ্ঞাপিত করিল, তাহা আমার ধারণাতীত এবং তখনও শ্রীঅরবিন্দ আমার প্রতি যে করুণা-মমতা বুকে রাখিয়া আমার শ্রেয়ঃ-কামনায় সর্ব্বদা প্রযত্ন করিতেছেন, তাহাও আমার চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করিল।

চণ্ডীদাসে পড়িয়াছিলাম—

"পরকে আপন করিতে পারিলে
পীরিতি মিলয়ে তারে।"

এই পড়া বিদ্যাটা জীবনে মূর্ত্ত করার জন্য যে প্রচণ্ড তপস্যার আবর্ত্তে হাবুডুবু খাইতেছিলাম, আমার সচেতন মনোবৃত্তিতে সেই সময়ে তাহা যদি ধরা পড়িত, এই দুঃসাধ্য কর্ম্ম হইতে সম্ভবতঃ বিরত হইতাম। অতি বড় কর্ম্ম অনেক সময়ে মানুষের অজ্ঞাতসারেই হয়, এইরূপ না হইলে সঙ্কীর্ণ মনের ক্ষেত্রে ইহার জন্য যে কঠোর দুঃখের সমুদ্র উথলিয়া উঠে, তাহা হইতে মুক্তির জন্য বৃহত্তর আদর্শকে মানুষ বিদায় দিয়া থাকে। অতর্কিতে যাহা গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহার জন্য দুঃখ ছিল না। যেখানে সতর্ক চেতনায় দিনের পর দিন স্বপ্নকে রূপ দিতে প্রাণান্ত করিতে বিমুখ ছিলাম না, সেইখানেই প্রলয়ঝঞ্ঝা নামিয়া আমার বৃহত্তর স্বপ্ন নিরর্থক করিয়া দিল; কিন্তু অচেতন মনের জগতে উপেক্ষিত সত্য বিরাট্ বিগ্রহে পরিণত হইয়া আমার জয় দিল খুব অসহায় অবস্থায়। সাধনার সমাপ্তি-মন্ত্র এইখানেই অর্থপূর্ণ হইয়া উচ্চারিত হইল মুক্ত কণ্ঠে।

খ্যাতি ও যশের বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র, বিপুল অভিজ্ঞতা ও ও গৌরবদৃপ্ত ব্যক্তিত্বের সহিত পরিচয়ের ঘোষণা, সংস্কৃতি ও সাধনার উন্নততর সোপানশ্রেণী, চিত্ত-মন একাগ্র করিয়া যেখানে স্থির দৃষ্টি রাখিতাম, সেই অপূর্ব্ব আদর্শ ও সৃষ্টি—কালের যবনিকায় সবই অনায়াসে ঢাকা পড়িল। চক্ষে অন্ধকার ঘনাইয়া দৃষ্টি যখন ফিরিয়া পাইলাম, আত্মসাধনায় তখন দেখিলাম—চির উপেক্ষিত অনাদৃত জন, কঠোর কর্ম্মক্ষেত্রে যাহাদের মূল্য একটি কপর্দ্দক বলিয়াও স্বীকার করি নাই, যাহাদের ব্যক্তিত্ব ও আভিজাত্য অতি নগণ্য বোধে ক্লান্তির অপনোদন ও অবকাশের ক্রীড়নক বলিয়াই যাহারা গণ্য হইত, তাহারাই জীবনের সুমহান্ আদর্শের সহায়করূপে দেখা দিল এই দুর্দ্দিনে। একান্ত অপ্রত্যাশিত ক্ষেত্রেই জীবনের অভাবনীয় সাফল্য এমন করিয়া লুকাইয়া থাকিতে পারে, তাহা পূর্ব্বে ভাবনার মধ্যেও ছিল না।

হিন্দুর অবিকৃত রক্তধারায় যে সংস্কৃতি চির বিজড়িত, তাহা হইতে মুক্তি আমার ভাগ্যে নাই—তাই প্রতি বর্ষারম্ভের প্রভাতে সূর্য্য-সন্দর্শনের জন্য গঙ্গাতীরে ছুটিয়া যাইতাম, দেখিতাম বালখিল্য চির-সহচর অবোধ ছাত্রগণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া নবযুগের ইতিহাস অধ্যয়ন করিতেছে। আর পুষ্প-চন্দনের থালি হাতে নিরক্ষরা পল্লীবধূ মেজবৌ চরণ-বন্দনা করিয়া বলিতেছে "ঠাকুর, আশীর্ব্বাদ করুন, বিশ্বাস-ভক্তি যেন চিরস্থায়ী হয়।" নববর্ষের প্রথম দিনের এই স্মৃতি মুছিয়া যায় নাই, স্তরে স্তরে আমার হৃদয় পূর্ণ করিতেছিল।

সংক্রান্তির গোধুম-চূর্ণ সেদিন নিঃশেষ হয় নাই। ইক্ষু-গুড়-সংযুক্ত শুভ লক্ষণস্বরূপ এই খাদ্যদ্রব্যটি যখন অসঙ্কোচে বিতরিত হইত, সেদিন লক্ষ্যে পড়িত মাধুর্য্যময়ী এক সাধ্বীর পবিত্র মূর্ত্তি, সীমন্তের সিন্দুর, চরণের অলক্ত, শাড়ীর

রক্তজবার মত রাঙ্গা রঙটুকু অন্তরে যে অপূর্ব্ব অনুভূতির প্রস্তরবেদী গড়িয়া তুলিতেছিল, দৃষ্টি অতর্কিত হইলেও, ভবিষ্যৎ তাহার জন্য অপেক্ষা করে নাই—উহা অবাধেই মূর্ত্তি লইতেছিল।

আষাঢ়ের টিপি-টিপি বৃষ্টির দিনে, কোন দূর পিচ্ছিল কর্দ্দমাক্ত পথের উপর দিয়া কত নারী-পুরুষ হাঁটিয়া চলিয়াছে, অনেক দূর হইতে ভাসিয়া আসিতেছে কাঁসর, ঘণ্টা আর মানুষের কণ্ঠে জয়ের কোলাহল। নবচূড় রথের রক্তপতাকা আকাশে উড়িয়া চলিয়াছে। পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদে পল্লীবধূদের লইয়া হৃদয়ানন্দদায়িনী পত্নী রথ দেখার করুণ আকুতি নিবেদন করিতেছেন—সহাস্যে আদেশ-বাক্য মাথায় লইয়া, তাঁর অঞ্চল দোলাইয়া রথোৎসব-দর্শনের যাত্রা। তাঁর প্রতি পদসঞ্চারে উৎসবের ঘোষণা মর্ম্মে মর্ম্মে যে ইতিহাস রচনা করিত, তাহার হিসাব সেদিন করিলেও, অঙ্কের বোঝা ভারী হইয়া উঠিতেছিল—তাহার ফল অবহেলা করা যায় না।

নির্ম্মল শারদ প্রভাতে শেফালীর রাশি অঙ্গনে ছড়াইয়া পড়িত; সুবাসে বাতাস প্রমত্ত বেগে ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করিত; শারদীয়া জননীর আগমন-বার্ত্তা ঘরে ঘরে চারণ ঘোষণা করিয়া বেড়াইত; ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় ললাটে ললাটে চুয়া-চন্দনের টীকা পরিয়া মাতৃমন্দিরে দলে দলে সকলে উপস্থিত হইত—সপ্তমীর প্রভাত হইতে দশমীর বিজয়া-লিঙ্গন পর্য্যন্ত আত্মচৈতন্যের ঊর্দ্ধে যে সৃষ্টিচক্র রচিয়া উঠিতেছিল, তাহার সন্ধান সেদিন করিতে চাহিলে, সৃষ্টির মধুচক্র সম্ভবতঃ এমন বাস্তব মূর্ত্তিতে গড়িয়া উঠিত না, কল্পনার রামধনুই আঁকিয়া উঠিত। কালীপূজার রাত্রে ঘরে ঘরে দীপালি-শোভা। তাড়া তাড়া পাকাটীর মশাল জ্বালিয়া ছুটাছুটী, দৌড়াদৌড়ি। আগুন লইয়া হুড়াহুড়ি। এমন বার মাসে তের পার্ব্বণে উৎসবের অনুষ্ঠানে, হাস্য-কৌতুকে অতর্কিতে এক অপার্থিব সৃষ্টি গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহার ধারণা আমি করিতে পারি নাই। কত জ্যোৎস্না-রাতে গঙ্গার বুকে শ্রেণীবদ্ধ তরণী বাহিয়া হাসি, কথা, গানে চিত্ত ভরিয়া উঠিত—দুকূল মুখরিত করিয়া সঙ্গীতের রেশ উঠিত—সেদিন সে সবই ছিল খোলা মনের সহজ অভিব্যক্তি—ইহার মধ্যেই বিনাইয়া বিনাইয়া ভাগ্যদেবী যে আমাদের মধ্যে এমন অমর সৃষ্টিচক্র গড়িয়া তুলিতেছিলেন, সে দিকে বিন্দুমাত্র দৃষ্টি ছিল না।

কত দ্বিপ্রহর রাত্রে কথা কহিতে কহিতে খোলা আকাশপথে কে যেন আবির্ভূত হইয়া টানিয়া লইয়া যাইত নদীতটের অশ্বত্থ-বটকুঞ্জে। সেখানে আলো-ছায়ার মাঝে হৃদয়-বিনিময়ের উৎস মুক্ত হইত। তারপর নৌকা করিয়া নদীপথে কত দূর যাত্রা, কে তাহার হিসাব রাখে! কেহ যথাসময়ে অনুপস্থিত থাকায় এই উৎসবে যোগ দিতে না পারিয়া নদীতীরে হতাশ হইয়া আমাদের সন্ধানে ছুটাছুটী করিত। কেহ বা এই গভীর রজনীতে গৃহ-দেবীর কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিত আমাদের সন্ধান। তিনি এই সংবাদে অজানা আশঙ্কায় বিচলিতচিত্ত হইয়া ঘর ছাড়িয়া অলিন্দে আসিয়া দাঁড়াইতেন—আমাদের পুনরাগমনের প্রতীক্ষায়। তারপর কলহাস্যে আমাদের পুনরাবির্ভাব। মুখে কাপড় দিয়া ভ্রূকুটীকটাক্ষে তাঁর তিরস্কার, তারপরে হাসির উৎস মুক্ত হইত—এইরূপ লুকাচুরি খেলার মধ্য দিয়া আমাদের বহুর হৃদয় এক সঙ্গে বাঁধা পড়িতেছিল। এসব হইতেছিল আমাদের অজ্ঞাতে। এই স্বতঃ-সৃজনের শক্ত বেদী আমি অস্বীকার করিলেও, ইহার প্রভাব অস্বীকারের ছিল না—তাহাই একটা প্রলয় সৃষ্টি করিয়া আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ করিল। শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন সত্যদৃষ্টিসম্পন্ন দিব্য শিল্পী, কিন্তু আমারই প্রকৃতি হয় তো তাঁহাকে অন্ধ করিযাছিল—এই বিচার আজও আমার শেষ হয় নাই।

যেখানে শ্রীঅরবিন্দের সহিত আমার সম্বন্ধচ্ছেদ, সেইখানেই জীবন-সঙ্গিনীর আত্মপ্রকাশ এবং সঙ্ঘ-জীবনের আরম্ভ। কিন্তু সে কথা হয়তো আমার বলা হইবে না। যেখানে জীবন-প্রবাহ অতল সমুদ্রগর্ভে আপতিত হইয়া, ধূলি-বালি-কর্দ্দমের স্তর-বিন্যাস করিয়া অভিনব জীবন-দ্বীপ-রচনায় খরস্রোতে ছুটিয়াছিল, সে প্রয়াস যেখানে ব্যর্থ হইল, দেবতার বোধন-সঙ্গীত গাহিতে না গাহিতে উৎসর্গের মঙ্গলঘট ভাঙ্গিয়া পড়িল, সেইখানেই আমার লেখনী নিশ্চল হউক।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগেই আমার জন্য যাহাদের আসিবার কথা, তাহারা আসিয়াছিল। দূর পথের যাহারা,

তাহারা পরে আসিবে বলিয়া আমার হৃদয়দ্বার চিরদিনই মুক্ত। আমি আজ কাহার নাম করিব? জীবনের কঠোর অগ্নিপরীক্ষার দিনে এই অতি দীন জনকে আশ্রয় করিয়া আমার ওষ্ঠপুটে একটু হাসির রেখা ফুটাইবার জন্য যাহারা সর্ব্বত্যাগী হইল, তাহাদের অমর স্মৃতি আমার হৃদয়-পটে চিরাঙ্কিত থাকিবে। কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আশা ও আদর্শের আকর্ষণ ইহাদের ছিল না—পরকে আপন করার কঠোর তপস্যাই ছিল এই সব মানুষের লক্ষ্য। এই নরনারীর সংহতি আত্মিক, তাই শাশ্বত ও অমৃত। জন্ম-জন্মান্তরের সাথী লইয়াই সঙ্ঘ হয়—সঙ্ঘ-ঘোষণার তাই ইহারাই হইল প্রবর্ত্তক।

সঙ্ঘের প্রথম যাত্রী অরুণ। সে আসে নাই; আমায় সে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল তাহার স্বক্ষেত্রে। আমি ছিলাম কেবল আপনারই কাছে কবি, ভাবুক, দার্শনিক। আমার খ্যাতিপত্র দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট মিলিবে না, তাহা আমি জানিতাম; কিন্তু হঠাৎ শ্রীঅরবিন্দের জ্যোতির্ম্ময় শুভ দৃষ্টির বিকীরণে আমার স্থান উচ্চ গ্রামে যেন সুপ্রতিষ্ঠিত হইল, নিজের অসাধারণত্বে আস্থাবান্ হইয়া জাতির নিকট বাণী প্রেরণ করিলাম—শ্রীমান্ অরুণচন্দ্রকে তবুও যেন অতিক্রম করিতে ইচ্ছা হইত না। সুকুমার শিশুকাল হইতেই সে আমার সকল প্রেরণার পুরোভাগে গিয়া দাঁড়াইত—মানবাত্মার সহিত মানবাত্মার সম্বন্ধ দৃঢ় ভিত্তি পাইলে, পর আপন হওয়ায় যে চিত্তের নির্দ্দয়তা, তাহা এখানে মিলিয়াছিল। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের গোড়ায় বারীন্দ্র প্রমুখ শ্রীঅরবিন্দের স্বজন ও অনুগত কর্ম্মিগণ মুক্তি পাইলেন। এই নূতন পরিস্থিতি-ফলে শ্রীঅরবিন্দ ও আমার মধ্যে যে অস্পষ্টতা ঘনাইয়া উঠিয়াছিল, তাহার নিরাকরণ করার জন্য শ্রীমান্ অরুণকেই পণ্ডিচারী পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। ঝড়ের আভাসেই অন্তরের যে অস্থিরতা জমিয়া উঠিতেছিল, তাহা হইতে মুক্তি পাইলাম। সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ চিত্তে আরব্ধ কর্ম্ম সুসম্পন্ন করার জন্য পুনঃ উদ্বুদ্ধ হইলাম।

কর্ম্মের ব্যাপ্তি অর্থক্ষেত্রেই নিবদ্ধ ছিল। চতুর্দ্দিকে "প্রবর্ত্তকে"র ভাবপুষ্ট সংহতি গড়িয়া উঠিতেছিল। প্রকৃত কর্ম্মী তখনও গড়িয়া উঠে নাই, সর্ব্বক্ষেত্র নিজেকেই দেখিতে হইত। অসাধারণ কর্ম্মশক্তির উৎস ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। এই অমোঘ বিশ্বাসেই দেহ ও মনের ক্লান্তি অনুভব করিতাম না। নানা প্রকার ব্যবসার সঙ্গে মানব-চরিত্র লইয়াও অসংখ্য প্রকার আবর্ত্ত-সৃষ্টি হইত। ইহার উপর গৃহদেবীকে কেন্দ্র করিয়া একটী নারীচক্রও গড়িয়া উঠিতেছিল। মানুষ গড়ার দাবী আমি করি না; কেননা অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিয়াছি—গড়া মানুষই যথাকালে যথাস্থানে উপস্থিত হইলে, নির্ম্মাতা গর্ব্ব করিয়া বলে—এ সৃষ্টি আমার। আমি এমন অন্ধ নহি।

এই সময়ে আমার অপর দুইটী শ্যালিকার পতিবিয়োগ হয়। আমার স্ত্রী ভগিনীগুলির বৈধব্যমূর্ত্তি দেখিয়া অতিশয় সন্ত্রস্ত হইয়া পড়েন। এই মূর্ত্তিকে তিনি অতিশয় ভয়ের চক্ষে দেখিতেন। আমি তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলাম—বিধাতার এই কঠোর বিধান যদি তাঁর ভাগ্যে থাকে, তাহা তিনি নিজের কঠোর তপস্যায় নিশ্চয় অতিক্রম করিবেন। এই কথায় তিনি সান্ত্বনা পাইতেন না—প্রণাম করিয়া বলিতেন, "আশীর্ব্বাদ কর, তোমার কোলে মাথা রাখিয়া যেন মরি।" আমি তাঁর মস্তক চুম্বন করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে এই আশীর্ব্বাদ করিতাম। আমার বাণী তাঁর হৃদয় স্পর্শ করিত—তিনি অতি উৎসাহে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন। স্বামিহারার প্রতি তাঁর অসাধারণ সহানুভূতি ছিল, তার একটী দৃষ্টান্ত পরে দিব। তিনি বলিতেন—"নারীর এত বড় দুর্ভাগ্য আর কিছুতে নাই।"

বৈধব্য সম্বন্ধে আমার চিন্তাধারা কিন্তু অন্যরূপ ছিল। আমি বলিতাম, ব্যবহারতঃ নারীর বৈধব্য দুর্ভাগ্য বটে, কিন্তু হিন্দু বিধবার এই তপঃপূত মূর্ত্তিটী কি মানবাত্মার অমরত্বকেই ঘোষণা করে না? শরীর লইয়া স্বামী নয়; শরীরনাশে পত্নী স্বামীর অবিনশ্বর আত্মার সাথী হইয়া থাকিবে। স্বামীর দেহ বিদ্যমানে স্ত্রীর এক মূর্ত্তি; অশরীরী স্বামীর পত্নী ভিন্ন মূর্ত্তি ধরে। নারীর বৈধব্যবেশ জাতিকে স্মরণ করাইয়া দেয়—পতির শরীর গিয়াছে, তাঁর অশরীরী আত্মা লইয়া সে তপস্বিনী।

কথা শুনিয়া তাঁর চক্ষে প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা জ্বলিত। তিনি বলিতেন, "পত্নীর দেহটা বিরহের আগুনে দগ্ধ হয়, সে ব্যথা তুমি বুঝিতেছ না? স্বামীর দেহ হারাইয়া পত্নীর বৈধব্য তোমার কথায় গৌরবের বস্তু—কিন্তু এ তপস্যা নারীকে যেন করিতে না হয়!" সে যে কি দরদ লইয়া কথা, তাহা ভাষায় বুঝান যাইবে না। তিনি নিজের ভগ্নীদের বড় আদর যত্ন করিতেন। স্বামিহারা যদি বেশভূষা করিত, তাহা হইলে তিনি বড় বিরক্ত হইতেন, যদিও মুখে কিছু বলিতেন না। তিনি একবার যাহা অন্তরের কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেন, তাহা আর কোন যুক্তিতর্কে নাকচ হইত না। স্বামিহারার বৈধব্যবেশকেই তিনি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। চির-ব্রহ্মচারিণী সাধ্বীও যেমন তিনি গড়িয়া গিয়াছেন, তেমনি চির-কুমারীও বাদ দিয়া যান নাই; আবার বিধবাকেও তিনি যথাক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা দিয়াছেন। যাহার যে ভাব ও অবস্থা, তাহার ব্যত্যয় হইতে তিনি দিতেন না। ইহার অন্যথা হইলে, তিনি অতিশয় ক্ষুণ্ণ

হইতেন। স্বামিহারা যদি সাজিয়া গুজিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিত, তিনি মনে মনে বলিতেন, "কাহার তৃপ্তির জন্য এই সাজ-সজ্জা?" আমি বলিতাম, "স্বামী না থাকিলেই কি মানুষকে সাজিতে গুজিতে নাই? মন বলিয়াও তো বস্তু আছে!"

তিনি তীব্রকণ্ঠে বলিতেন "মনের গলায় দড়ি। নিজের জন্য মানুষ সাজে না; ওদের মনে অন্য আছে। স্বামীকে ওরা পায়নি, ভালবাসে নি।"

এই পাওয়ার কথায় আমি তাঁর দিকে চাহিয়া ভাবিতাম, তুমি কি আমায় পাইয়াছ? একজন আর একজনকে যদি পাওয়ার মত পায়; সেই তো ধন্য হয়। এখানে যে পায় না একজনও মনের মানুষ, সে ভগবানকে পাওয়ার আশা কেমন করিয়া করে? যে নারী পতি পায়, পতির আত্মাকে স্পর্শ করে, সে নারী পতি হারায় কেমন করিয়া? শারীর সম্বন্ধই তো একমাত্র সম্বন্ধ নয়। বিধবা তাই অমর পতির স্মৃতিময়ী দিব্য প্রতিমা। বিপত্নীকেরও বিধুরাশ্রম এই হেতু হিন্দু সংস্কৃতির গৌরবসূচক।

আত্মার অমরত্ব স্বীকার করিতে হইলে, এই সমাজ-বিধানই মানবাত্মার ঋতময় অভিব্যক্তি। এইরূপ নব-সমাজ-প্রবর্ত্তনে তিনি বধূবরণ করিয়া ঘরে তুলিয়াছিলেন, চিরকুমারীকে সুপথ দেখাইয়া উৎসর্গ-মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছিলেন—বিধবার হাত ধরিয়া তিনি পরম পথের সন্ধান দিয়াছিলেন। শুধু অধ্যাত্ম-পুত্রদের প্রতিই তাঁর করুণা-প্রসাদ বিতরিত হয় নাই, নারীকেও তিনি বক্ষে তুলিয়া যথাযোগ্য স্থান দিয়া গিয়াছেন—সে অন্তরঙ্গ রহস্যময় ইতিহাসের কতটুকু বর্ণনা করিতে পারি? কেবল একটী বিধবা যুবতীর কথা উল্লেখ করিয়াই এই আলোচনা হইতে নিবৃত্ত হইব।

কোন এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের ষোড়শ বর্ষীয়া যুবতী কন্যা পতিহীনা হইয়াই অচিরকাল মধ্যে একমাত্র শিশু-পুত্রটীকেও হারাইয়া সমস্ত সংসারটিতে গভীর বিষাদের ছায়াপাত করে। এই যুবতীর পিতামাতা কন্যাকে কোন মতে সান্ত্বনা দিতে না পারিয়া আমাদের সহায়তা প্রার্থনা করেন। আমরা নিমন্ত্রিত হইয়া সদলবলে তাঁহাদের বাড়ীতে উপস্থিত হই। আমাদের আগমনে শোকাচ্ছন্ন পারিবারিক আব্‌হাওয়া কিছুক্ষণের জন্যও উৎসবময় হইয়া উঠিল। পানভোজনাদির মধ্য দিয়া এই শোকবিহ্বলা যুবতীও কিছু যেন সান্ত্বনা পাইল। অবস্থা অনুকূল অনুভব করিয়া সঙ্ঘজননী আমায় সঙ্কেতে জানাইলেন—এই মেয়েটী আমাদের আশ্রয়ে থাকিলে সুখী হইবে, ইহার পিতামাতার ইহাই আকূতি, এ দায়িত্ব আমায় লইতে হইবে। তিনি এই ভাবেই কার্য্য করিতেন; নিজে কিছু করিতেন না, আমাকে আশ্রয় করিয়া ক্ষুদ্র-বৃহৎ কর্ম্ম-সাধন ছিল তাঁর স্বভাব।

আমি এই যুবতীটীকে এই প্রস্তাব করা মাত্র, সে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল, সঙ্গে সঙ্গে তার চক্ষে আশার আলো বিকশিত হইল।

এই শোকবিধুরা যুবতীকে সঙ্ঘজননী নিজের কাছেই রাখিলেন এবং অকৃত্রিম স্নেহ-মমতায় দেখিতে দেখিতে তাহাকে আপন করিয়া লইলেন। সে অতি শীঘ্র তাহার সমস্ত অতীতটাকে বিদায় দিল। একেবারে নূতন ভাবে সে নিজেকে গড়িয়া লইল। অল্প দিনের মধ্যেই তার শোকমলিন বিবর্ণ মুখ সমুজ্জ্বল কান্তি ধারণ করিল। শূন্য হৃদয় পূর্ণ করার অসাধারণ কৌশলে তিনি মেয়েটীকে চিরদিনের জন্য শোকমুক্ত করিলেন। আমার সেবার ভার ধীরে ধীরে তার হাতে ন্যস্ত করিয়া তাহাকে এমন ভাবে আপনার করিয়া লইলেন যে, সে আর আমাদের পর মনে করিল না; মেয়েটী নিজের দুহিতার মত নবক্ষেত্রে নূতন জন্ম লাভ করিল। সতীর আশীর্ব্বাদ পতিহারাকে সেবার অধিকার দিয়া তাহাকে ধন্য করিল, আমার ধাত্রীরূপা নির্ম্মলা তাঁর স্নেহের দানরূপে আজিও নবজীবনের সাক্ষ্য দেয়।

তাঁর স্নেহে ও যত্নে সঙ্ঘের কন্যারা গরবিনী। তাহারাও পুরুষের ন্যায় সঙ্ঘের ভিত্তি রক্ষা করে। নিরবচ্ছিন্ন কর্ম্মের ভিতরেও সংস্কৃতি ও সাধনার জন্য তাহাদিগকে অবকাশ দিয়া, তিনি তাহাদের অপূর্ব্ব চরিত্র দান করিয়াছেন। সঙ্ঘের অনাটন তখন অকথ্য ছিল, মেয়েদের হাড়ভাঙ্গা শ্রম তাহার অনেকখানি লাঘব করিত। এই নিরবচ্ছিন্ন শ্রমের তিনিও ছিলেন সমান অংশীদার। নানা ঘটনা সৃষ্টি করিয়া ইহার মধ্যেই তিনি তৃপ্তির নির্ঝর উৎসরিত করিতেন। মেয়েদের কর্ম্মক্লান্ত দেহশ্রী তাই সতত লাবণ্যমণ্ডিত থাকিত। শ্রমই অমৃতের মত নারী-মন্দিরকে অপূর্ব্ব শক্তি ও শ্রী দিয়াছে।

সঙ্ঘের পুত্র-কন্যা সকলেরই তিনি ছিলেন যুগপৎ ভয় ও অভয়ের স্থান। কোনরূপ চাপল্য ও চাঞ্চল্য তাঁহার সম্মুখে প্রকাশ করার সাধ্য কাহারও হইত না। কিন্তু তাঁর গুরু-গম্ভীর আচরণ ও কঠোর অধ্যাত্মশাসনকৌশলের মধ্যেও কি এক অপূর্ব্ব আনন্দপ্রবাহ বহিত, কি যে অপার্থিব আকর্ষণে তিনি সকলকে মুগ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ করিয়া রাখিতেন, যাহার ফলে আমার প্রেরণার অনুকূলে সকলেই অবিরাম ছুটিত, দুঃখকে দুঃখ বলিয়া কেহ স্বীকার করিত না। এই হিসাব সেদিন যদি করিতাম, তাহা হইলে তাঁহাকে কেবল আমার সেবিকা সহধর্ম্মিণী বলিয়া স্নেহ-প্রীতি নয়, সেই সঙ্গে পূজার্ঘ্য দিয়াও সান্ত্বনা লাভ করিতাম। তিনি আমার অনুগতা শিষ্যার ন্যায় আমার জীবনধর্ম্মের অটল ভিত্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁর মহনীয় জীবনের ইতিহাস খুব অল্পদিনেই সমুজ্জ্বল কান্তিতে আমার কাছে প্রতিভাত

হইয়াছিল—সে খুব অল্পদিন—সে কাহিনী আমার অন্তরেই গোপন থাকিবে।

হিন্দুর নারীচরিত্র হিন্দু নারীই বুঝিবে। নারীর দরদ নারী যেমন বুঝে, অন্যের পক্ষে তাহা সম্ভব নয়। নারীর লক্ষ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে তিনি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। নারীর পবিত্রতা ও লজ্জাকে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিতেন। আর একটী বড় বিষয়ে তাঁহার লক্ষ্য স্থির ছিল। তিনি স্বামীকে বড় করিয়া দেখিতেন; কিন্তু স্বামীর ধর্ম্ম ততোধিক বলিয়া স্বীকার করিতেন। তাঁর জীবনদৃষ্টান্তই তাহার প্রমাণ। তিনি যে অতি অল্প বয়সে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা স্বামীর ধর্ম্মেরই দায়। এই ধর্ম্মে যাহারা যত উদ্বুদ্ধ হইত, তাহারা তাঁহার তত স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ লাভ করিত। তাঁহার মানসকন্যাগণ কর্ম্মক্লান্ত হইয়া যখন ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইয়াছে, স্বচক্ষে দেখিয়াছি—তিনি শত নিষেধ সত্ত্বেও তাহাদের ব্যজন করিতেছেন। তিনি সন্তানদের সুভোজ্যদানে তৃপ্ত করিতেন। তাঁর এইরূপ স্নেহামৃতে অনেকে ধন্য হইয়াছে।

আমার স্বাস্থ্যের প্রতি তাঁর কিরূপ সচেতন দৃষ্টি ছিল, তার একটী দৃষ্টান্ত দিই। ভর্ত্তার প্রতি হিন্দু নারীর এইরূপ অনুরাগ নূতন কথা নহে। খাওয়া-দাওয়ার দিকে তাঁর বিশেষ দৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও, মাঝে মাঝে সর্দ্দি-জ্বরে বড় কষ্ট পাইতাম, তিনি ইহার কারণ অন্বেষণে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন এত সর্দ্দি-কাশী হয়?" আমি ঘরের বাতায়নপথে চাহিয়া হাসিয়া বলিলাম "ঐ বিশাল ফল্সা গাছটা বাতাস বন্ধ করায়, স্বাস্থ্যহানি হয়।" সেই দিনই মধ্যাহ্নে দৈনন্দিন কর্ম্মাদি সমাপন করিয়া ঘরে আসিয়া দেখিলাম— আলো ও হাওয়ায় ঘরখানি ভরিয়া উঠিয়াছে। বাতায়নের দিকে চাহিয়া দেখি— ফল্সা গাছটার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করা হইয়াছে। তাঁর পক্ষে বিজয়দীপ্তি। কে শত্রু, কে মিত্র, তাঁর কাছে বলা দায় হইয়া উঠিল। 'নিরীহ' বৃক্ষটীও তাঁর বিরাগ হইতে মুক্তি পাইল না। ঘটনা তুচ্ছ, কিন্তু এমনই ছিল তাঁর মনোবৃত্তি।

এই সময় হইতে তাঁহার অন্তরে স্বচ্ছ উৎসর্গস্রোতঃ শতধা উচ্ছ্বসিত হইয়া আমার জীবনে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিতেছিল—এই সময়েই তিনি যেন আপনাকে প্রকাশ করার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছিলেন। আমিও যে প্রাণধারা এতদিন অলক্ষ্যে আমায় দিন দিন শক্তিশালী করিয়া তুলিতেছিল, তাহা যেন প্রত্যক্ষ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিলাম।

চন্দননগরে এই সতীমূর্ত্তিকে ঘিরিয়া অকল্পিত এক মধুচক্র যখন গড়িয়া উঠিতেছিল, সেই সময়েই সঙ্ঘের অন্যতম সাধক শ্রীমান্ অরুণচন্দ্র পণ্ডিচারীতে থাকিয়া শ্রীঅরবিন্দ ও আমার মধ্যে নানা কারণে যে অস্পষ্টতা ঘনাইয়া উঠিতেছিল তাহা নিরাকৃত করার চেষ্টা করিতেছিল। অরুণচন্দ্র সুদূর প্রবাসে থাকিয়া তার সুনিপুণ মানস-তুলিকায় শ্রীঅরবিন্দের নিকট যতই সঙ্ঘকে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতেছিল, চন্দননগরের সঙ্ঘ ততই শৃঙ্খলিত ও সুগঠিত হইয়া উঠিতেছিল। এই অপূর্ব্ব অধ্যাত্মরহস্যের কিছুটা বিবৃত করার জন্য তাহার ও আমার মধ্যে যে কয়েকখানি পত্রবিনিময় হইয়াছিল, তার কিয়দংশ অতঃপর উদ্ধৃত করিব।

অরুণচন্দ্র লিখিল: "প্রথম সাক্ষাতে 'অরো' জিজ্ঞাসা করিলেন—মতিলালের কাছ থেকে কি মেসেজ এনেছ? কণ্ঠস্বর কারুণ্যপূর্ণ···।···বল্লুম শুধু, 'সে মতিবাবুই জানেন'—নিজেরই কণ্ঠে বাধ ছিল···অন্তরের বার্ত্তা সে যে অসীম কাহিনী।······মেসেজ আমার সত্তা······এই আমি ও আমরা—বুঝে নাও অন্তর্য্যামী—কথাটা অন্তরেই বল্লাম। অনেক প্রশ্নাদির পর 'অরো' জিজ্ঞাসা করলেন 'মতিলাল সাধনার কথা তোমাদের কাছে বলে?'

আ—"বরাবর বলে' আসছেন, যারা ঠিক আমাদের, তাদের মধ্যে সাধনা বেশই চলছে।" যারা একটু ঘুরছে, তাদেরও নাম উল্লেখ করতে হল। তিনি বল্লেন—"না, মতিলালের নিজের সাধনার কথা। সে এখানে বিজ্ঞানে উঠেছিল, তারপর লিখেছিল সেখান থেকে নেমে কাজ করছে।"

অরুণের সহিত শ্রীঅরবিন্দের দীর্ঘ কথোপকথনের মর্ম্ম গভীরভাবেই হৃদয়ঙ্গম করিবার বিষয় ছিল। কেননা, ১৯২০ খৃষ্টাব্দের পর দেশের নূতন পরিস্থিতি উপস্থিত হইলে, শ্রীঅরবিন্দের সহিত আমার সুনিবিড় সম্বন্ধ যেন শিথিল হইয়া পড়িতেছিল। মীরাদেবী ও বারীন্দ্রনাথের আগমনের পর হইতে কি যেন একটা অলক্ষ্য ব্যবধান আমাদের উভয়ের মধ্যে ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হইয়া, নানা জটিল সমস্যার সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছিল।

অরুণ এই সকল বিষয় লইয়া শ্রীঅরবিন্দের সহিত আলোচনা করিয়া যে আলো আমায় দিতেছিল, তাহাই আমাদের ভবিষ্যতের পাথেয় বলিয়া মনে করিতাম। এই বিষয় লইয়া পরবর্ত্তী সংখ্যায় কিছু আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল।

(ক্রমশঃ)

নাগপুরে

মহেন্দ্রনাথ সরকার

রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী ভাস্করেশ্বরানন্দ কর্তৃক আহূত হয়ে মার্চ্চ মাসে নাগপুরে গিয়েছিলেম। নাগপুরে অনেক বাঙ্গালী আছেন। তাঁদের আদর, আপ্যায়নে তৃপ্তিলাভ করেছি। এঁরা সকলেই উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী। প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র মিঃ পি, কে, বসু বর্ত্তমানে নাগপুরের ডেপুটি একাউণ্টেণ্ট জেনারেল, ডিরেক্টর অব পাবলিক ইণ্ডাষ্ট্রিজ, মিঃ কে, ডি, গুহ, জি, আই, পি রেলওয়ের প্রধান ডাক্তার মিঃ বিশ্বাস—এঁদের সৌজন্যে, আন্তরিকতায় ও আতিথ্যে পরম আপ্যায়িত হয়েছিলেম। রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের ব্রহ্মচারীদের সেবা ও যত্নের কথা কোনদিন বিস্মৃত হব না। আশ্রমাধিবাসিবৃন্দদের অফুরন্ত তত্ত্বজিজ্ঞাসা, তাঁদের ঐকান্তিকী তত্ত্বোপলব্ধির আস্পৃহা আমার বিস্ময় ও আনন্দের কারণ হয়েছিল। এঁদের দেখে মনে হয়েছিল—রামকৃষ্ণ মিশন দেশে শুধু সেবাব্রতের উদ্বোধন করেনি, জীবনের মূলে জ্ঞান ও আনন্দের উপলব্ধির প্রেরণা বিস্তৃতভাবে জাগিয়ে দিয়েছে। এঁদের সঙ্গ আমার ভিতর যৌবনোচিত শক্তি সঞ্চার করত—দিনের পর দিন তত্ত্ব-কথায় কেটে যেত। ইষ্টগোষ্ঠীতে যে আন্তরিকতা প্রকাশ পায়, তা' আর কোথাও পাওয়া যায় না।

নাগপুর মহারাষ্ট্রপ্রধান দেশ। এখানে গভর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যাপকদের সঙ্গে, বিশেষতঃ দর্শনের অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। দু' একজন অধ্যাপক, ছাত্র ও ছাত্রীকে ঘনিষ্ঠভাবে জেনে বুঝেছি—বাংলা ও মহারাষ্ট্রের ভিতর চিন্তাধারা প্রায়ই এক। জীবনের মূলনীতি ও দৃষ্টির ভিতর কোন গভীর পার্থক্য নেই। মহারাষ্ট্রে সন্ত-সাধুদের প্রভাব এখনও বেশ পরিলক্ষিত হয়। গীতার জ্ঞানেশ্বরী টীকায় আজও মহারাষ্ট্রের মনীষা উদ্বোধিত। জ্ঞান-ভক্তি সমন্বয় করে' জীবনের স্ফূর্ত্তি হয়েছে। তিলকের জ্ঞানের ভিত্তিতে কর্ম্মপ্রতিষ্ঠা মহারাষ্ট্রকে কর্ম্মমুখর করে' তুলেছে। বর্ত্তমানে মেহের বাবার প্রভাব বেশ সুস্পষ্ট। এরূপ পরিবেষ্টনে বাঙ্গালীর, বিশেষতঃ চিন্তাশীলদের এ দেশে বেশ আদর আছে। যারা বুদ্ধি ও হৃদয়কে উদ্বোধিত করতে পারে, তাদের এদেশে অন্তরে প্রবেশ করতে বেশী বিলম্ব হয় না।

আতিথেয়তায় মহারাষ্ট্র এখনও প্রাচীন ভারতের অনুগামী। শুধু এক কাপ চা দিয়েই সন্তুষ্ট হয় না, নানাবিধ ভোজ্য উপকরণ সাজিয়ে দিয়ে সেবার আনন্দে উৎফুল্ল হয়। সত্যিই এদের আতিথেয়তায় মুগ্ধ হ'তে হয়। মেয়ে-পুরুষ একজন অপরিচিতকে যেরূপ স্বজনের ন্যায় ব্যবহার করে' শ্রদ্ধাপূত হৃদয়ে স্বহস্তে অন্নাদি পরিবেশন করে' সৌজন্যতার পরাকাষ্ঠা করেছিলেন, তার বিমল স্মৃতি ভুলবার নয়। ভারতবর্ষের এইরূপ আতিথেয়তা সর্ব্ব প্রদেশেই দেখতে পেয়েছি, অতিথি সর্ব্বদেবময়, এ বিশ্বাস প্রাচীনপন্থীদের ভিতর যে পরিমাণ আছে, তা' নবীন-পন্থীদের ভিতর বড় দেখতে পাওয়া যায় না। নবীনপন্থীরা পদমর্য্যাদা ও অধিকারবোধে তাঁদের আতিথেয়তার পরি-বেশন করেন। কিন্তু প্রাচীনপন্থীদের ভিতর এই মর্য্যাদাবোধ অপেক্ষা মানবিকতার বোধ বেশী পরিস্ফুট। শ্রদ্ধার ভিতর দিয়ে ভোজ্যসম্ভারের মধ্যে একটি সাত্ত্বিকী তৃপ্তি হৃদয় ভরে দেয়, এই কথাই মনে হয়েছিল ডাক্তার দেশমুখের বাড়ীর নিমন্ত্রণে। দেশমুখ-পত্নীর ও দেশমুখ-ছাত্রী আভার সানন্দ সেবাবৃত্তি ও তৎপরতা ও মহারাষ্ট্রের সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যময় আহার্য্য সেদিনকার আতিথেয়তাকে সর্ব্ব রকমেই করেছিল উপভোগ্য। ডাক্তার বিশ্বাসের বাড়ীতে বাঙ্গালীসমাজের একটি ছোট-খাটো ভোজ হয়েছিল আমারই জন্য। সেখানে অনেক বাঙ্গালী শ্রেষ্ঠ সন্তানদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। ডাক্তার বিশ্বাস ও তদীয় পত্নী ভুরিভোজে সকলকে পরিতৃপ্ত করেছিলেন। কল্যাণীয়া রেণুকার ও শ্রীযুক্ত পি, কে, বসুর পত্নীর সঙ্গীত বেশ উপভোগ্য হয়েছিল। হাসির লহরে, বৈঠকখানার গল্পে বাঙ্গালীর স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছিল। রাত্রি একটায় সকলেই ফিরে গেলেন। আমি মিঃ গুহের সঙ্গে তাঁরই মোটরে বের হলেম চাঁদিমা রাত্রে নাগপুরের

লেকগুলি দেখতে। চন্দ্রাতপতলে বিস্তীর্ণ লেকগুলি কি না সুন্দর দেখাচ্ছিল! গভীর রাত্রে পরিত্যক্ত জনপদে, নিঝুম নিস্তব্ধতার ভেতর প্রকৃতির বিশালতা হৃদয়ের আবেগ প্রশান্ত করে' বিশ্বব্যাপী এক মহনীয় সত্তায় পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিল। মিঃ গুহ ও আমি নীরবেই এই মহান্ সত্তার নীরব স্পর্শ অনুভব করছিলাম। জীবনাবেগ সেখানে কত ক্ষুদ্র, কত দৈন্যে ভরা! হৃদয়বৃত্তির প্রশমনে কত শান্তি!

নাগপুরে গিয়ে ইচ্ছা হয়েছিল সেবাগ্রামে মহাত্মা গান্ধীজীর আশ্রমে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করব। মিঃ গুহের কাছে এই কথা বলাতে তিনি তৎপর হয়ে সব ঠিক করলেন মিঃ আয়ন্যায়াকমের সহায়তায়। মহাত্মাজী মত দিলেন—আমাদের সঙ্গে দেখা হবে। একটি দিন ঠিক করে মিঃ বসু, মিঃ গুহ ও আমি মোটরে রাত্রির শেষ যামে ওয়ার্দা অভিমুখে যাত্রা করলেম। নাগপুর হ'তে ওয়ার্দার রাস্তাটি বড় সুন্দর। প্রাকৃত সৌন্দর্য্যে পূর্ণ। রাস্তার দু'পাশে বড় বড় গাছ। এক এক স্থানে দু'দিকের গাছের শাখাপ্রশাখা পরস্পর মিলিত হয়ে যেন স্বাভাবিক তোরণ সৃজন করেছে। প্রায় ৫০ মাইল পথ চলতে কোনই কষ্ট হ'ল না। বরং আমরা সকলেই বেশ আনন্দানুভব করতে করতে চলতে লাগলেম। সেবাগ্রাম পৌছাবার পূর্ব্বে ভোর হয়ে গেল। সেবাগ্রাম পৌছেই সূর্য্যোদয় দেখ্‌তে পেলেম। চারিদিকে মাঠের ভেতর একটি ক্ষুদ্র 'কলোনী' রচিত হয়েছে। এইটি গান্ধীজির আশ্রম।

আশ্রমটি একটি মরুভূমির মত স্থানেই প্রতিষ্ঠিত—চারিদিকেই শূন্য মাঠ, বৃক্ষলতা কিছুই নেই। নদনদী নেই—দূরে ছোট ছোট পাহাড়। আশ্রমটি অত্যন্ত সাদাসিদে রকমের। বাড়ী-ঘর-দুয়ার মাটির, দেয়াল মাটির, ওপরে কোথাও ছোন-চাল, কোথাও খাপ্‌রা। আশ্রমবাসী সবশুদ্ধ পঞ্চাশ পঞ্চান্ন জন।

আমরা শ্রীযুক্ত আয়ন্যায়কম ও শ্রীযুক্তা আশালতা দেবীর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেম। আশালতা দেবী আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু অধ্যাপক ফণিভূষণ অধিকারীর কন্যা। ইনি এম, এ; কিন্তু কিছু বোঝা যায় না। সাধারণ বাঙালী ঘরের মেয়ে যেমন কাজকর্ম্ম নিয়ে ব্যস্ত, এঁকেও তেমনি দেখলেম। আতিথেয়তা করলেন অত্যন্ত বিনয় ও শ্রদ্ধা সহকারে। নিজের হাতেই সব প্রস্তুত করলেন। নিজের হাতে পরিবেশন করলেন। এঁর স্বামী আয়ন্যায়কম যেমন মধুর, তেমনি গম্ভীর। শান্ত, সংযত, অথচ বিনয়ের পূর্ণ প্রতীক। আমাদের সেবা, সুখ, সুবিধাগুলিকে অতি তৎপরতার সঙ্গে দেখছিলেন। বলা বাহুল্য, গান্ধীজির আশ্রমে আমরা আশালতা দেবীর আতিথ্য পাব, এ সানুগ্রহ অঙ্গীকার পূর্ব্বেই পেয়েছিলেম। দেবী আশালতার একটী ছোট কন্যা আছে। দেখ্‌তে যেমন সুন্দর, সেবায় তেমনি তৎপর, কথাবার্ত্তায় তেমনি ক্ষিপ্র। কত স্নেহে বালিকাটির হৃদয় ভরা! সে আমাকে এত আপনার করে' নিল যে, আজও তার কথা স্মরণে আসে ও মনের অগোচরে সুখের স্পর্শ দিয়ে যায়।

আমাদের জন্য চা প্রস্তুত হ'ল। হাতে গড়া পাউরুটি, সদ্য মাখনের সঙ্গে বেশ লাগল। আর কমলালেবুর রসের ত কথাই নেই—যে যত পারল খেয়ে নিল। আমাদের চা পান শেষ হ'তে হ'তেই আয়ন্যায়কম্ বল্‌লেন, বাপুজী বের হচ্ছেন। আমরাও তাড়াতাড়ি বের হয়ে পড়লেম—গান্ধীজীকে দেখবার জন্য।

আমরা বের হ'তে না হ'তে মহাত্মাজী লাঠি হাতে একদল আশ্রম-বালকবালিকা-পরিবেষ্টিত হয়ে রাস্তায় এলেন। তাঁর সাথে ছিলেন মহাদেব দেশাই। আমাদের অগ্রগামী হ'তে দেখে মহাত্মাজী একটু দাঁড়ালেন। আমরা গিয়ে প্রণাম করলেম। মহাত্মাজী ব্যক্তিগত পরিচয় নিতে লাগলেন। আমরাও তাঁর সাথে চললেম। বাহাত্তর বৎসর বয়সে মহাত্মাজীর দ্রুত পদবিক্ষেপ দেখে বিস্মিত হলেম। রাস্তা চলতে বেশ অভ্যস্ত। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, অধ্যাপক, তোমার তো কোন ক্লেশ হচ্ছে না, এরূপ রাস্তা চলতে? তোমাদের কলকাতার রাস্তা কত সুন্দর, মোটরে যাতায়াত। আমি বল্‌লেম, আমি গ্রামের লোক, কলকাতায় থাকলেও গ্রাম্য পথে চলতে অভ্যস্ত। আর এ রাস্তা তো বেশ বিস্তীর্ণ। মহাত্মাজী বল্‌লেন, তা' হ'লে তো ভাল। মহাত্মাজী

অনুসন্ধান করলেন, আমি হিন্দী জানি কি না। আমি বল্‌লেম, জানি। মহাত্মাজী আনন্দ প্রকাশ কর্‌লেন। আর বল্‌লেন—পরিবারের সকলকেই হিন্দী শেখাবেন। আমরা বেড়িয়ে ফিরলেম। গান্ধীজি আমাকে বল্‌লেন, আমি এখন আশ্রমের রোগীদের দেখব। গান্ধীজির সঙ্গে সঙ্গে আমিও আশ্রমে প্রবিষ্ট হ'লেম। মহাত্মাজী রোগী দেখ্‌তে লাগলেন। আমি তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে আশ্রমটি সব দেখে এলেম। গান্ধীজী যে গৃহে থাকেন, অবশেষে সেখানে প্রবেশ করলেম। আমি মহাত্মাজীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবার জন্য একটু সময় ভিক্ষা করলেম। মহাত্মাজী বল্‌লেন, আজ কাজ বড় বেশী, আপনাকে আধ ঘণ্টা সময় দিতে পারবো। ৪টার সময় দেখা হবে। আমি মহাত্মাজীকে ধন্যবাদ দিয়ে চলে এলেম।

দেবী আশালতার ও আয়ন্যায়কমের বাড়ীতে এসে স্নান, আহারাদি করে' বিশ্রাম করলেম। আহার্য্যের প্রাচুর্য্য ছিল না, কিন্তু পবিত্রতা, শুচিতা স্পষ্টই অনুভব করেছিলেম। সকলেই মেয়ে-পুরুষ একত্র আহার করলেন। ইংরাজ রমণীও ছিলেন। একটা শান্তভাবের ভিতর প্রসন্নতা বড় ভাল লেগেছিল। গান্ধীজির আশ্রমের আহার্য্য বেশ স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিদায়ক। ঢেঁকি-ছাঁটা আতপের অন্ন, গমের রুটি, দেশী ও বিদেশী স্যালাড্, দধি, দুধ, মাখন, তরকারী—অত্যন্ত সরল অথচ সুস্বাদু স্বাস্থ্যকর খাদ্যের ব্যবস্থা। আহারান্তে বিশ্রাম করে' ৪টার পূর্ব্বেই চায়ের ব্যবস্থা হয়ে গেল। আমরা ৪টার সময়ে মহাত্মাজীর কাছে গেলাম।

মহাত্মাজী সাদর আহ্বান জানালেন এবং বল্‌লেন, আমাদের চরকা-প্রদর্শনীতে কি আপনাদের আহ্বান করতে পারি? আমরা সানন্দে মহাত্মাজীর সঙ্গে চরকা-প্রদর্শনীতে গেলাম। নূতন চরকা প্রস্তুত হয়ে এসেছে। এতে অতি অল্প সময়ে বেশী সূতা কাটা যায়। মহাত্মাজী বেশ করে' দেখলেন, এবং এরূপ চরকাই এখন চলবে বলে' সম্মতি দিয়ে এলেন।

আমরা মহাত্মাজীর ঘরে প্রবেশ করলেম। ডাঃ রাজেন্দ্র-প্রসাদ, মহাদেব দেশাই, মণিবেন প্যাটেল, রাজকুমারী অমৃতকুমারী, আশালতা দেবী, আয়ন্যায়কম্ ও আশ্রমের অন্যান্য স্ত্রী-পুরুষেরা এলেন। মহাত্মাজী আমাকে তাঁর সম্মুখে বসালেন, ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও মহাদেব দেশাইয়ের মাঝখানে।

মহাত্মাজী আমাকে লক্ষ্য করে' বললেন, আপনার কি জিজ্ঞাস্য? এদিকে আমাদের কথোপকথনের নোট মিঃ দেশাই ও অমৃতকুমারী গ্রহণ করছিলেন। মহাত্মাজীকে দেখ্‌তে এমন কিছু নেই, যা' বাইরের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট করে। কিন্তু তাঁর হাসি ও নানা কর্ম্মের ক্ষিপ্রতার ভিতর লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তাঁর স্থিতি অন্তরে কোন অতলস্পর্শ গভীরতায়। তিনি যেন সেখানেই প্রতিষ্ঠিত। সব কাজের প্রেরণা সেখান হ'তে আস্‌ছে। এই অভয়-প্রবিষ্ট ভাবটি তাঁর মুখে বেশ প্রতিফলিত। মহাত্মাজীকে জিজ্ঞাসা করলেম—অবিরত জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত থেকে পরতত্ত্ব সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা হয়েছে? নিশ্চয়ই আপনার ভিতর এ বিষয়ে এমন সুস্পষ্ট কিছু ধারণা আছে, যা' আপনাকে জীবন-সংগ্রামের ভিতর এমনি প্রসন্নতা ও স্বচ্ছতা দান করেছে।

মহাত্মাজী একটি তাকিয়ে ঠেস দিয়ে বসেছিলেন। আমার প্রশ্ন শুনে' হেসে উঠ্‌লেন ও আসন করে' বস্‌লেন। আর বল্‌লেন—আপনার প্রশ্ন আমার রক্তের চাপ বৃদ্ধি করেছে। মহাত্মাজীর হাসিটি সকলের ভেতরই হাসির সঞ্চার করল। সহসা গম্ভীর হয়ে' গেলেন আর প্রশান্ত ভাবে বল্‌লেন, "প্রেমই আমার কাছে পরতত্ত্ব।" বলে' নীরব হ'লেন, সকলেই নীরব হ'ল।

মহাত্মাজী চরকা চালিয়ে পুনরায় বল্‌তে লাগলেন, "এই যে আমি চরকা চালাচ্ছি, এও প্রেম দ্বারা উদ্বুদ্ধ। অগণিত নিরাহারী ও অর্দ্ধাহারীর কথাই আমার মনে পড়ে।"

আমি বল্‌লেম "আপনি কি বিশ্বাস করেন, প্রেমের দ্বারা বর্ত্তমান সভ্যতার পূর্ণ পরিবর্ত্তন সম্ভব হবে?"

মহাত্মা উত্তর দিলেন "নিশ্চয়ই, প্রেমই ত বিশ্বের মূল শক্তি। আমার মধ্যে প্রেম-শক্তির যথেষ্ট প্রকাশ নেই বলে' এখনও আমি মিঃ জিন্না ও লর্ড লিংলিথগোকে আকর্ষণ করতে পারি নি। আমার বিশ্বাস, সভ্যতার

রূপ পরিবর্ত্তন হবে এই প্রেমের দ্বারাই। পরিবর্ত্তন সময়-সাপেক্ষ হ'তে পারে, কিন্তু ইহা অবশ্যম্ভাবী এবং হবেই।

আমি জিজ্ঞাসা করলেম—"ঈশ্বরের ভিতর ঐশ্বর্য্য আছে কি না?"

গান্ধীজি উত্তর দিলেন, "আমার অনুভব সেরূপ নয়—প্রেমই আমার কাছে ঈশ্বরের স্বরূপ।"

এরূপ কথাবার্ত্তা হ'তে হ'তে মহাত্মাজী আমাকে বল্লেন,—"আপনার আধ ঘণ্টা সময় কি উত্তীর্ণ হয়নি?"

আমি ঘড়ির দিক তাকিয়ে দেখ্লেম যে, মহাত্মাজীর সময় বোধ কত ঠিক। আমার কথা শেষ হয়নি। তাই বল্লেম, "মহাত্মাজী, আমার আরও অনেক জিজ্ঞাস্য আছে; আমি আবার আসব, আপনার আতিথ্য গ্রহণ করতে।"

মহাত্মাজী বল্লেন, "আতিথ্য আপনার জন্য সব সময়ে প্রস্তুত থাকবে, কিন্তু বাংলার রসগোল্লা আপনাকে দিতে পারবো না।" সকলেই হেসে উঠ্লেন। মহাত্মাজীর স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে এমন একটি শিশুভাবের মিশ্রণ থাকাতে, তাঁর চরিত্রকে করেছে এত মধুময়। তাঁকে দেখে ভীতি বা সংকোচ হয় না। বরং শ্রদ্ধা ও ভালবাসার স্বতঃই স্ফূর্তি হয়।

আমরা ফিরে এলেম। আয়ন্যায়কম্ ও আশালতা দেবীর নিকট বিদায় নিয়ে সন্ধ্যায় নাগপুরে রওনা হলেম।

মহাত্মাজীর সঙ্গ-সুখ আমার বন্ধুরাও বেশ অনুভব করেছিলেন। গান্ধীজীকে দেখে মনে হ'ল—তিনি যেন কোন ঊর্দ্ধশক্তির স্পর্শ অনুভব করেন এবং তার দ্বারাই চালিত হন। সাধারণ লোকের বিচার বা হিসাব তাঁর নেই—তাই তাঁকে ভুল বুঝবার সম্ভাবনা, বিশেষতঃ মস্তিষ্কের গৌরব যাঁরা করেন, তাঁদের পক্ষে খুব বেশী। কিন্তু অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ হ'লেও, তিনি দিব্য, স্নিগ্ধ প্রেমশক্তির দ্বারা চালিত হন। তাঁর আশ্রমের পরিবেষ্টনীর মধ্যে কোন ঐশ্বর্য্য বা শক্তির প্রেরণা দেখ্তে পাইনি। তবুও তিনি কি শক্তিমান্! প্রেমই দিয়েছে তাঁকে অপার্থিব শক্তি—মানব-প্রেমে তিনি পূর্ণ, ঈশ্বর-প্রেমে তিনি সঞ্জীবিত। শারীরিক ক্ষীণ সত্তার ভেতর কি প্রেমের সঞ্চরণ! গান্ধীজী সেবার ও প্রেমের মূর্ত্তি। রুদ্রের তাণ্ডব নৃত্য বিশ্বের বক্ষে থেমে গেলে, হয়ত এই মানব-প্রেমিকের স্নিগ্ধ স্পর্শে সভ্যতার প্রাণে নবীন সুর জেগে উঠ্বে। অহিংসার ভিত্তিতে বিশ্বমানব-সঙ্ঘের নবীন বেদী রচিত হবে।

মহাত্মার প্রেমের ভিতর ভাবুকতা নেই। অতীন্দ্রিয় বিশ্বের অলৌকিকতার ছায়াপাত তাঁতে দেখা যায় না। অফুরন্ত আনন্দের সঞ্জীবনধারায় তিনি আপ্লুত নন। তাঁর ঈশ্বর-প্রেম, আত্ম-নিবেদন সেই শক্তি অনুসন্ধান করেছে, যাতে মানবের হৃদয়পরিবর্ত্তন হয়—মানুষ মানুষকে শ্রদ্ধার অবদান দিয়ে পীড়ন, অত্যাচার হ'তে রক্ষা করতে পারে। মানবের সুখ, দুঃখ ত্যাগ করে' তিনি অতীন্দ্রিয় বিশ্বে স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেমের সাবলীল স্বচ্ছ প্রকাশ অনুসন্ধান করেন নি। হৃদয়ের পবিত্রতা, প্রসন্নতা, স্বচ্ছতা ও শুদ্ধির ওপর প্রেমের বিকাশ নির্ভর করে, কারণ প্রেম হচ্ছে আত্ম-ধর্ম্ম। আত্ম-স্পর্শ না হ'লে, প্রেমের পূর্ণ স্ফুরণ হয় না। হৃদয়-বৃত্তিতেই এই আত্ম-ধর্ম্মের রূপ প্রতিফলিত হয়। এজন্যই মহাত্মাজী কতকগুলি নীতির অবশ্যম্ভাবিতা স্বীকার করেন এবং তাদের কঠোর রূপে জীবনে অবলম্বন করবার সার্থকতা উপলব্ধি করেন। সেগুলি যখন হৃদয়ের শুদ্ধির পরিপক্কতা নিয়ে আসে, তখনই প্রেমের পূর্ণ প্রকাশ সম্ভব হয়। মহাত্মাজীর চেষ্টা প্রেমকে বিশ্বমানবসভ্যতার ভিত্তি করা। যে প্রেম বিশ্বকে অতিক্রম করে' শুধু ঈশ্বরকে নিয়ে তাঁর সঙ্গ ও সাহায্যে লীলার রসবোধে পূর্ণ করে, সে প্রেম সম্বন্ধে তিনি এখনও নীরব। হয়ত তিনি তাকে জানেন, কিন্তু মানুষের হৃদয়কে তিনি অহিংসা ব্রত উদ্‌যাপন করে' প্রস্তুত করতে তৎপর। তাই হয়ত একদিন আবিষ্কার করবে, অন্তরে অনুস্যূত দিব্য প্রেম, যা' দেখিয়ে দেবে মানব-সমাজের অন্তরালে আছে দিব্য প্রেম-সঞ্জীবিত সমাজ—যেখানে দিব্য সংবিদে ও দিব্য আনন্দে মানুষ ভরপুর হয়ে বিশ্বাতীত প্রেমচ্ছন্দের হিল্লোলে বিশ্ব চেতনার স্ফূর্ত্তি অনুভব করে।

প্রতীচ্য সভ্যতার প্রবর্ত্তক গ্রীস

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

ইউরোপ ও এশিয়া মিলিতভাবে ইউরেশিয়া আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। এই ইউরেশিয়ায় এমন একটি বিশিষ্ট স্থান আছে, যেখানে মানব-সভ্যতার উদ্ভব-ভূমি এশিয়া সন্তানস্বরূপ য়ুরোপকে আলিঙ্গন করিবার জন্য ব্যগ্র বাহু বিস্তৃত করিয়াছে বলা চলে। এই বাহুটির ভৌগোলিক আখ্যা তুরস্ক। ইহাকে এশিয়া মাইনর নামও দেওয়া হইয়া থাকে। যেখানে এশিয়া ইউরোপকে প্রায়ই স্পর্শ করিয়াছে, তথায় বিশ্ব-বিখ্যাত ইস্তাম্বুল ও কনস্তান্তি-নোপল নগর দণ্ডায়মান। উভয় মহাদেশের মধ্যে শুধু স্বল্পপরিসর মর্ম্মর সাগর যৎসামান্য ব্যবধানরূপে বিরাজিত। মর্ম্মর সাগরের পূর্ব্ব দিকে কৃষ্ণসাগর এবং পশ্চিমে ইজিয়ন সমুদ্র। ইজিয়ন সমুদ্রকেও এশিয়া ও য়ুরোপের মধ্যবর্ত্তী স্বল্পপরিসর ব্যবধান বলা চলে। ভূমধ্যসাগরের অংশস্বরূপ এই সমুদ্রের একদিকে বহু বিচিত্র সুপ্রাচীন সংস্কৃতির লীলাস্থল এশিয়া মাইনর এবং অন্য-দিকে প্রতীচ্য সভ্যতার প্রবর্ত্তক গ্রীস। ইজিয়ন সাগরে বিরাজিত দ্বীপগুলি দেখিলে মনে হয়—প্রকৃতি দেবী যেন উভয় মহাদেশকে সংযুক্ত করিতে প্রয়াস করিয়াছেন।

প্রতীচ্য সভ্যতার প্রবর্ত্তক গ্রীস ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রান্তে ভূমধ্যসাগর কর্ত্তৃক সাগ্রহে আলিঙ্গিত হইয়া অবস্থিত বলিলে ঠিকই বলা হয়। দ্বীপ নহে বটে; কিন্তু অম্বুধি-চুম্বিত এই দেশ দ্বীপপুঞ্জে বেষ্টিত এবং প্রায়ই দ্বীপাকার। এই দেশের উত্তরে এলবেনিয়া, যুগো-শ্লাভিয়া বুলগেরিয়া এবং ইউরোপীয় তুরস্ক। ইহার পূর্ব্বে ভূমধ্য-সাগরের অংশবিশেষ দ্বীপপুঞ্জপূর্ণ ইজিয়ান সমুদ্র এবং দক্ষিণে ও পশ্চিমে খাস ভূমধ্যসাগর উত্তাল তরঙ্গ-বাহু উত্তোলিত করিয়া গভীর ভাবভরে নৃত্য করিতেছে। পৃথিবীতে বহু সমুদ্র আছে, কিন্তু এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ, এই তিনটি মহাদেশের মধ্যবর্ত্তী ভূমধ্যসাগরের সহিত কাহারও তুলনা চলিতে পারে না। ইহার বৈশিষ্ট্যের প্রধান কারণ, যে সকল প্রাচীন রাষ্ট্রকে শ্রেষ্ঠতম কৃষ্টির লীলাস্থল বলা চলে, সেইরূপ বহু দেশকে বেষ্টন করিয়া এই বারিধি বিরাজিত রহিয়াছে। তিনটি মহাদেশকে সংযুক্ত করিতেছে বলিয়া বাণিজ্যের দিক্ দিয়াও ইহার গুরুত্ব অসাধারণ।

বিশ্ব-সভ্যতায়, বিশেষ প্রতীচীর কৃষ্টিগত প্রগতির পথে গ্রীসের অবদান অতুলনীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমরা কল্পনার সাহায্যে আধুনিক ইউরোপকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, তাহার উন্নতির বা অগ্রগতির মূলে গ্রীক বা হেলেনিক সংস্কৃতির প্রবল প্রভাব দেখিতে পাইব। দর্শন ও বিজ্ঞান, ধর্ম্মনীতি ও রাজনীতি এবং সাহিত্য ও স্থাপত্য প্রভৃতি সকল বিদ্যা ও সুকুমার শিল্পকলা ইউরোপ গ্রীসের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছে। কতকগুলি বিষয়ে ভারতীয় সভ্যতার সহিত গ্রীক সভ্যতার বিস্ময়কর সাদৃশ্য আছে। উভয় জাতির অন্তরেই তত্ত্বজিজ্ঞাসা তীব্রভাবে জাগ্রত হইয়াছিল। যাহাকে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বলে, অবশ্য তাহা ভারত ব্যতিরেকে আর কাহারও অন্তরে তেমন গভীর ও ব্যাপকভাবে জাগে নাই, কিন্তু জ্ঞানের অগ্রদূত অন্যান্য জিজ্ঞাসা ভারতবর্ষের সত্যানুসন্ধিৎসু ও তত্ত্বপিপাসু ঋষিদিগের মতই গ্রীক পণ্ডিতদিগের মনেও ধ্বনিত হইয়া তাঁহাদিগকে সত্যের সন্ধানে উৎসাহিত করিয়াছিল। প্রতীচ্য দর্শনে গ্রীসের অবদান সত্য সত্যই অনুপম। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতক হইতে গ্রীক কৃষ্টি বা কালচার বিশেষ বিকাশ লাভ করিয়া খৃষ্ট-পূর্ব্ব পঞ্চম শতকে পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হয়। এই যুগকে হেলেনিক সভ্যতার স্বর্ণযুগ বলা চলে। সকল দিক্ দিয়া এই সময়ে গ্রীস উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। বারিধি-বেষ্টিত রাষ্ট্রের অধিবাসী বলিয়া গ্রীকগণ নৌ-চালনে নৈপুণ্য লাভ করিয়া নানা স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। গ্রীকরা অনতিদূরে অবস্থিত এশিয়া মাইনরে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া, তথায় মিলেটাস নামক একটি সমৃদ্ধ ও প্রসিদ্ধ শহর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। এই শহরে থেলস নামক যে গ্রীক দার্শনিক জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাকেই গ্রীক দার্শনিক তত্ত্বের প্রবর্ত্তক বলিয়া মনে করা হয়। ইনি জলকে

বিশ্বের আদি কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতকে তিন জন প্রসিদ্ধ দার্শনিক গ্রীক কৃষ্টির অন্যতম কেন্দ্র মিলেটাস নগরে আবির্ভূত হইয়া প্রতীচীতে তত্ত্বালোচনার ভিত্তিপত্তন করেন বলিলে ভুল হয় না। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৪৯৪ অব্দে গ্রীসের দিকে অগ্রসর পারসিক বাহিনী কর্ত্তৃক মিলেটাস নগর ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। হেলেনিক সংস্কৃতির প্রাচীনতম কেন্দ্রসমূহের অন্যতম এই নগর-ধ্বংস হইবার পর এশিয়া মাইনরের এফিসাস্ নামক আর একটি শহর কৃষ্টি-কেন্দ্রে পরিণতি পায়। এই নগরে হেরাক্লিটাস নামক দার্শনিক পণ্ডিতের আবির্ভাব হয়। ইহার পর খাস গ্রীসের এথেন্স নগরকে কেন্দ্র করিয়া হেলেনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি যে বিস্ময়কর বিকাশ লাভ করে, তাহাই ক্ষুদ্রকায় গ্রীসকে প্রতীচ্য সভ্যতার প্রবর্ত্তকের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। এই সময়েই (খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতকে) গ্রীসের জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ সক্রেটিসের আবির্ভাব ঘটে। যে সময়ে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবে ভারতের চিন্তা-জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল এবং ভারতীয় কৃষ্টি বিশ্ব-বিজয়ে যাত্রা করিবার উপক্রম করিয়াছিল, প্রায় সেই সময়েই গ্রীসে জ্ঞানিগণাগ্রগণ্য সক্রেটিস সমবেত শিষ্যগণকে আত্মার অমরত্ব প্রভৃতি শাশ্বত সত্য সম্পর্কীয় শিক্ষা প্রদান করিয়া গতানুগতিকের বন্ধন হইতে বিমুক্ত, স্বাধীন ও মৌলিক চিন্তার উপর প্রতিষ্ঠিত সমুন্নত সংস্কৃতির সৌধ গড়িয়া তুলিতেছিলেন। এই শতাব্দীই গ্রীসের সমুজ্জ্বল স্বর্ণযুগ। এই সময়েই পেরিক্লিসের ন্যায় রাষ্ট্রনেতা, সক্রেটিস্-শিষ্য প্লেটোর ন্যায় উচ্চশ্রেণীর চিন্তাশীল দার্শনিক, ফিডিয়াসের ন্যায় শিল্পী, এস্কিলাসের ন্যায় কবি ও নাট্যকার, লিওনিডাসের ন্যায় বীর জন্মগ্রহণ করেন। এই সময়েই প্লেটোর শিষ্য এরিষ্টটল জন্মগ্রহণ করিয়া রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও মনোবিজ্ঞানের যে বীজ বপন করেন, তাহাই এই সকল বিষয়ে ইউরোপের পথ-প্রদর্শক হইয়াছে।

ভারত ও গ্রীস উভয়েরই ঐতিহাসিক যুগ খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতক হইতে আরম্ভ। তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী যুগকে পৌরাণিক যুগ বলা চলে। এই পৌরাণিক যুগে যে সকল বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তি গ্রীসের গৌরবরূপে জন্ম পরিগ্রহ করেন, তাঁহাদের মধ্যে মহাকবি হোমারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। থেলস প্রভৃতি আদি দার্শনিকদিগের ন্যায় এই আদিকবিও এশিয়া মাইনরে জন্মান। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব্ব নবম শতকে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি অন্ধ ছিলেন বলিয়া কথিত। ইঁহার ইলিয়াড ও ওডিসি নামক মহাকাব্যদ্বয় পাঠ করিলে, গ্রীসের প্রাচীনতর যুগের বিচিত্র আচার-ব্যবহার এবং গ্রীক পৌরাণিক বীরবৃন্দের অলৌকিক কীর্ত্তি-কাহিনীর সহিত আমরা পরিচিত হই। ইলিয়াডের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় এশিয়া মাইনরে অবস্থিত ট্রয় নামক শক্তিশালী রাষ্ট্র ও নগরের বীরগণের সহিত গ্রীক বীরদিগের তুমুল সংগ্রাম। অনেকে ট্রয়কে হোমারের কল্পনা প্রসূত বলিয়া মনে করিতেন; কিন্তু পরে পুরাতত্ত্ব-বেত্তাদের প্রবল প্রযত্নে ট্রয়ের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হওয়ায় সেই ধারণা দূর হইয়াছে। ট্রোজান যুদ্ধের পর ট্রয়ের একদল অধিবাসী স্বদেশ ত্যাগ করিয়া ইটালীর উপকূলে উপনীত হয় এবং তথায় উপনিবেশ স্থাপন করে। এই কয়েক জন ট্রোজান বীর ইটালীর বুকে যে বীজ বপন করে, তাহাই পরে বিশ্ব-বিজয়ী লাটিন জাতিরূপ বিশাল বৃক্ষে পরিণতি পায়। ইলিয়াদের অনুকরণে ইলিয়াদ নামক মহাকাব্যে ইটালীর মহাকবি ভার্জিল এই দেশত্যাগ ও উপনিবেশস্থাপনের বিচিত্র বৃত্তান্ত লিপি-বদ্ধ করিয়াছেন। হোমারের কাব্যের সাহায্যে আমরা গ্রীক দেব-দেবীদের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইতে পারি। ইটালীয় দেববাদ গ্রীক দেববাদেরই অভিনব সংস্করণ।

প্রশ্ন হইতে পারে, সভ্যতা বিষয়ে গ্রীকদিগের শিক্ষক কে? এই প্রশ্নের উত্তর পাইবার জন্য আমাদিগকে গ্রীসের উপকূল পরিত্যাগ করিয়া ভূমধ্যসাগরের বুকের উপর দিয়া কিছুদূর দক্ষিণে অগ্রসর হইতে হইবে। আমরা গ্রীসীয়ান দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণ সীমান্তে একটি দীর্ঘাকৃতি অথচ অপ্রশস্ত দ্বীপ দেখিতে পাইব। এই পর্ব্বত-বন্ধুর দ্বীপের নাম ক্রীট বা ক্যাণ্ডিয়া। এই দ্বীপ গ্রীক কথা ও কাহিনীতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। পৌরাণিক কথানুসারে গ্রীক দেবরাজ জিয়াস (যিনি রোম্যান দেববাদের জুপিটর) ফিনিসিয়ার রাজা এগেনরের কন্যা ইউরোপার অপরূপ রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে লইয়া ক্রীটে পলায়ন করেন। শুধু যে আমাদের রজতগিরিনিভ মহাদেবই ষণ্ডে আরোহণ করিয়াছেন তাহা নহে, গ্রীকদের দেবরাজ জিয়াসও একটি দুগ্ধ-শুভ্র ষণ্ডে চড়িয়া পালাইয়া যান বলিয়া কথিত। ফিনিশিয়া এশিয়া মাইনরের উপকূলবর্ত্তী একটি প্রাচীন রাষ্ট্র। এশিয়ার রাজকন্যা রূপবতী ইউরোপার নাম হইতে একটি সমগ্র মহাদেশ যে নাম প্রাপ্ত হয়, তাহা আজিও বিশ্ব ব্যাপিয়া ব্যবহৃত হইতেছে। শুধু যে ইউরোপা হইতে ইউরোপের আখ্যার উদ্ভব তাহা নহে, এই রাজকন্যাকে ইউরোপীয় সভ্যতার জননী বলিলেও ভুল হয় না। ইঁহার গর্ভে দেবরাজের ঔরসে মাইনস নামক যে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাকে ইউরোপীয় সভ্যতার অগ্রদূত বলিলে ভুল হয় না। গ্রীস সভ্যতালোকে উদ্ভাসিত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতে ক্রীটে এক প্রকার বিচিত্র সভ্যতার বিকাশ দেখা গিয়াছিল। ক্রীটীয় সভ্যতা মিশরীয়, সুমেরীয় এবং

ভারতের সিন্ধু নদের তটদেশে অভিব্যক্ত (মোহেঞ্জো-দরো ও হারাপ্পার) দ্রাবিড়ী সভ্যতার প্রায়ই সমসাময়িক। ক্রীটে খ্রীষ্টাবির্ভাবের দশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে প্রস্তরযুগেও মনুষ্যের বাস ছিল বলিয়া জানা যায়। ইউরোপার পুত্র মাইনস হইতে যে রাজবংশ প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার প্রত্যেক নৃপই "মাইনস" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ইউরোপে গ্রীকপূর্ব্ব সভ্যতার বিদ্যমানতার কথা প্রথমে কেহই জানিত না। সার আর্থার ইভান্স কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত অক্লান্ত অনুসন্ধানের ফলে আবিষ্কৃত মাইনস-আখ্যাধারী নৃপগণের প্রকাণ্ড প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ ইউরোপের প্রত্নতাত্ত্বিক চিন্তাধারাকে পরিবর্ত্তিত করিল বলা চলে। ব্রোঞ্জযুগে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২০০০ অব্দেরও পূর্ব্বে মাইনোয়ান রাজগণের জন্য অসংখ্য কক্ষে পূর্ণ যে সুবিশাল সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা আমাদিগের বিস্ময়োৎপাদন করে। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১৫০০ অব্দে ক্রীটের সৌভাগ্য-সূর্য্য মধ্যাহ্ন-গগনে উপনীত হয় বলিলে ভুল হয় না। নোসস নামক স্থানে আবিষ্কৃত ভগ্নাবশেষ দেখিলে বুঝা যায়, ঐ সময় মাইনোয়ান নৃপগণের শক্তি ও ঐশ্বর্য্য বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং ক্রীটবাসীরা স্থাপত্য ও পূর্ত্ত সম্পর্কীয় কৌশলে ইউরোপের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিল। তখন সমুদ্র-বক্ষে তাহাদিগের অপ্রতিহত প্রভাব ছিল এবং বাণিজ্যে ও উপনিবেশস্থাপনেও তাহাদিগের দক্ষতা ও আগ্রহের অভাব ছিল না। কোন কোন পুরাতত্ত্ববেত্তার মতে মিশর হইতে একদল লোক এই দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া এখানে সভ্যতার প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করেন। সে যাহাই হউক, এ বিষয়ে লেশমাত্রও সংশয় থাকিতে পারে না যে, গ্রীক সভ্যতার মূলে ক্রীটীয় সভ্যতার প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। ক্রীটীয় সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের উপরেই প্রতীচ্য সভ্যতার প্রবর্ত্তক গ্রীক সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। ক্রীট কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ উন্নত হইয়াছিল, কিন্তু গ্রীসের প্রতিভা ছিল সর্ব্বতোমুখী। এই জন্যই ক্রীটের পরিবর্ত্তে গ্রীসকে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবর্ত্তক বলিয়া মনে করা হয়।

রাজধানী অগ্নিদগ্ধ হইবার এবং অন্যান্য প্রতিকূল ঘটনা-স্রোতঃ বহিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রীটের প্রাধান্য অতি দ্রুতগতিতে বিনষ্ট হয় এবং উন্নতির পথে অগ্রসর গ্রীস ক্রমশঃ প্রভাব প্রসারিত করিতে আরম্ভ করে। প্রথমে গ্রীসের পেলোপনিসাস্ নামক প্রদেশের অন্তর্গত টাইরিন্স ও মাইসেনি নামক নগরদ্বয় বিশেষ অভ্যুদয় লাভ করে। মাইসেনীতে অভিব্যক্ত সভ্যতার সহিত ক্রীটীয় সভ্যতার সাদৃশ্য অস্বীকার করা যায় না। মাইসেনীকে কেন্দ্র করিয়া গ্রীক সংস্কৃতি প্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল বলিলে ভুল হয় না। এই নগর খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতকে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। স্লিমান নামক জার্ম্মাণ প্রত্নতাত্ত্বিক কর্ত্তৃক ক্রীটের সহিত পরবর্ত্তী হেলেনিক কৃষ্টি সংযোগ-সূত্র মাইসেনির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার ইউরোপের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মাইসেনির সিংহ-দ্বারটিকে ইউরোপের প্রাচীনতম স্থাপত্য নিদর্শনসমূহের অন্যতম বলিয়া মনে করা হয়। উহা দেখিলে আমাদের দেশের প্রাচীন স্থপতিদিগের প্রস্তুত সিংহদ্বারগুলি স্মৃতিপথে উদিত হওয়া অসম্ভব নয়। প্রকাণ্ডকায় প্রাচীন প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ, গিরিগাত্র উৎকীর্ণ করিয়া প্রস্তুত সমাধিসমূহ এবং তথায় প্রাপ্ত বহু স্বর্ণালঙ্কার ও স্বর্ণমুদ্রা মাইসেনির অতীত সমৃদ্ধি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। গ্রীসের যে সমুন্নত শিল্প-সাধনা বিশ্ববাসীকে বিস্মিত করিয়াছে, তাহার সূচনা বা জন্ম মাইসেনিতেই হইয়াছিল।

যাহারা মাইসেনিয়ানদিগকে পরাজিত করিয়া এবং সেই সমৃদ্ধিশালী নগরকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিয়া পরবর্ত্তী যুগে প্রভাবশালী হইয়াছিল, তাহারা আপনাদিগকে এচিয়ান আখ্যায় অভিহিত করিয়াছিল। পরে গ্রীসের এই শক্তিশালী সম্প্রদায় এচিয়ানের পরিবর্ত্তে হেলেনেস নামে পরিচিত হয়। আরও পরে গ্রীক আখ্যার উদ্ভব ঘটিয়াছে। রোমের সহিত সংশ্রব হইবার পর রোম্যানদিগের দ্বারা গ্রীক নাম প্রদত্ত হইয়াছিল। "হেলেনেস" জাতির অন্তর্গত "গ্রেই" নামক ক্ষুদ্র সম্প্রদায় রোম্যানদিগের সংস্পর্শে আসিয়াছিল। রোম্যানরা প্রথমে সেই সম্প্রদায়কেই গ্রীক আখ্যা প্রদান করিয়াছিল। পরে সমগ্র জাতিই এই নামে অভিহিত হইতে আরম্ভ করে। ক্রেটানদের পর মাইসেনিয়ানগণ ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বাংশে প্রবল প্রভাব প্রসারিত করার সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক কৃষ্টিও চারিদিকে প্রচার করে।

মহাকবি হোমারের সময়ের গ্রীকগণ আপনাদিগকে এচিয়ান বলিয়া পরিচয় দিত। ভাষা এবং আচারগত বিভেদের জন্য এচিয়ান বা হেলেনেস জাতি তিনটি বিভিন্ন শাখা বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছিল। এই তিনটির নাম আয়োনিয়ান, ডোরিয়ান এবং ইয়োলিয়ান। আয়োনিয়ান শাখার গ্রীকগণ এই দেশের উত্তর পূর্ব্বাংশে বাস করিত। ডোরিয়ানগণ দক্ষিণের এবং ইয়োলিয়ান সম্প্রদায় উত্তর-পশ্চিমের অধিবাসী ছিল। আয়োনিয়ানগণ নৌবিদ্যায় অপেক্ষাকৃত অধিক দক্ষতা লাভ করিয়াছিল বলিয়া তাহারা বিভিন্ন দেশে গমন করিয়া গ্রীক বা হেলেনিক সভ্যতালোকের প্রসার-সাধনে সর্ব্বাধিক সামর্থ্যের পরিচয় দিতে সক্ষম হইয়াছিল। অতুলনীয় এথেন্স নগর আয়োনিয়ানদিগেরই অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। গ্রীকগণের মধ্যে দর্শনে, শিল্পে ও সাহিত্যে ইহারাই অদ্বিতীয় উৎকর্ষের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। বহু

বিশ্ববিখ্যাত চিন্তাশীল দার্শনিক ও সাহিত্যিক এই সম্প্রদায়ে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া ইহার ভাষা সমগ্র গ্রীসের সাহিত্যিক ভাষা বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। আয়োনিয়ান সম্প্রদায়ের গ্রীকরাই এশিয়া মাইনরে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া তত্ত্বালোচনার কেন্দ্রস্বরূপ মিলেটাস প্রভৃতি নগর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।

ডোরিয়ানগণ সুকুমার শিল্পে এবং দর্শনে তেমন উন্নত না হইলেও, বল-বীর্য্যে ও শৌর্য্য-সাহসে আয়োনিয়ানগণ অপেক্ষা অধিকতর অগ্রসর হইয়াছিল। যেমন শিল্প-সৌন্দর্য্যে অনুপম এথেন্স আয়োনিয়ানদিগের কীর্ত্তি, তেমনই বীরপ্রসূতি স্পার্টা ডোরিয়ানদিগের দ্বারা স্থাপিত। প্রসিদ্ধ কোরিন্থ নগরও ডোরিয়ানদিগের সৃষ্টি। থার্ম্মাপলি গিরিবর্ত্মে পারসিকদিগের সহিত যুদ্ধে স্পার্টাধিপতি লিওনিডাস এবং তাঁহার অনুচর স্পার্টানগণ যে অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ, অতুলনীয় দেশাত্মবোধ এবং বিস্ময়কর শৌর্য্যে ও সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার কাহিনী পাঠ করিলে গভীর সম্ভ্রমে মস্তক নত না করিয়া থাকা যায় না। প্রথমে আয়োনিয়ানদিগের প্রাধান্য গ্রীসে প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরে বলশালী ডোরিয়ানরা প্রধান হইয়া পড়ে। এই সময় এক প্রকার সৌধপ্রস্তুত-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়, যাহা ইউরোপীয় স্থাপত্যে "ডোরিক পদ্ধতি" আখ্যায় অভিহিত। ডোরিয়ান প্রাধান্য বহুকাল বিরাজিত ছিল। অবশেষে ইয়োলিয়ান সম্প্রদায় প্রভাবশালী হইয়া পরস্পর বিবাদে দুর্ব্বল অন্যান্য সম্প্রদায়ের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে।

গ্রীসের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা, দেখিতে পাই—এই দেশ কোনদিনই ঐক্যবদ্ধ মহারাষ্ট্রে পরিণত হয় নাই। ইহা চিরদিনই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। এক একটি নগরকে কেন্দ্র করিয়া এক একটি রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সকল নগর-কেন্দ্রিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যকে সিটি-ষ্টেট্স আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। এইরূপ নগর-কেন্দ্রিক রাষ্ট্র সুমের ও বাবিলোনিয়াতেও ছিল এবং অন্যান্য দেশেও ছিল না তাহা নহে। তবে গ্রীস ক্ষুদ্র দেশ বলিয়া ইহার অন্তর্গত নগর-কেন্দ্রিক রাষ্ট্রগুলিও আকারে ক্ষুদ্রতর ছিল। এথেন্স, স্পার্টা, কোরিন্থ এবং থেবিস, এই চারিটি প্রধান নগরকে কেন্দ্র করিয়া যে চারিটি প্রসিদ্ধ রাষ্ট্র সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে পরস্পর বিবাদ ও সংঘর্ষ প্রায়ই সঙ্ঘটিত হইত। বিশেষ এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে চিরন্তন শত্রুতা ছিল বলিলেও ভুল হয় না। এই বিবাদকে গণতন্ত্রের সহিত সামন্ত-তন্ত্রের বিবাদ বলা চলে। এথেন্স গণতন্ত্র সমর্থন করিত এবং স্পার্টায় কঠোর সামন্ত-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণাগার, সুকুমার শিল্পকলার সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত ভাণ্ডার এথেন্সের নিকট হইতেই ইউরোপ গণতন্ত্র মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছে। স্পার্টার সহিত এথেন্সের যুদ্ধ গ্রীক ইতিহাসে "পেলোপনেসিয়ান ওয়ার" আখ্যায় অভিহিত।

প্রশ্ন হইতে পারে, তবে কি প্রাচীনকালে গ্রীস কখনও ঐক্যবদ্ধ হয় নাই? অনেক দেশেই দেখা যায়—বাহির হইতে কোন পরাক্রান্ত শত্রু আক্রমণ করিলে, তখন দেশের পরস্পর বিবদমান রাজ্যগুলি ঐক্যবদ্ধ হইয়া বিপুল বিক্রমে সেই সার্ব্বজনীন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হয়। পারস্যপতি দারিয়ুস ও জেরাক্সিসের বিপুল বাহিনী কর্ত্তৃক গ্রীস আক্রান্ত হইলে, গ্রীকগণ সাম্প্রদায়িক বিবাদবিসম্বাদ ভুলিয়া দেশরক্ষার উদ্দেশ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সকল প্রকার বিপদ বরণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। থার্ম্মাপলীর গিরিপথে গ্রীকগণ দেশের জন্য আত্মত্যাগের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইলেও, পারস্যের বিপুল বাহিনীর গতি প্রতিহত করা তাহাদিগের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। স্পার্টাধিপতি লিওনিডাস এবং তাঁহার অনুগত অনুচরবর্গের সকলেই সেই সঙ্কীর্ণ গিরি-সঙ্কটে আত্মবলি দিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই যুদ্ধে পারসিক সৈন্যগণ জয়ী হইলেও, পরে ম্যারাথনের প্রান্তরে এবং স্যালামিসের জলযুদ্ধে তাহারা গ্রীকদিগের হস্তে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়াছিল। ম্যারাথনে যুদ্ধে মিল্টিয়াডিয়াসের অধ্যক্ষতায় গ্রীকগণ অপূর্ব্ব শৌর্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল! স্যালমিসের জল-যুদ্ধে গ্রীকগণ জয়ী হইবার প্রধান কারণ নৌবীর থেমিস্টোক্লেসের অতুলনীয় দক্ষতা ও কৌশল। থেমিস্টোক্লেসের অধ্যক্ষতায় এথেন্স নৌযুদ্ধে বিশেষ দক্ষ হইয়াছিল।

অবশেষে ইয়োলিয়ান সম্প্রদায়ের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি। এই সম্প্রদায় সভ্যতার পথে ডোরিয়ান ও আয়োনিয়ান এবং তদপেক্ষাও পূর্ব্ববর্ত্তী এচিয়ান, মাইসেনিয়ান ও মাইনোয়ান বা ক্রেটানদিগের মত অগ্রসর ছিল না। খাস গ্রীসের উত্তরে অবস্থিত মাসিডোনিয়া নামক প্রদেশ ইয়োলিয়ান সম্প্রদায়ের বাসস্থল ছিল। ইয়োলিয়ান বংশীয় রাজা ফিলিপ ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া গ্রীসের অন্যান্য প্রদেশের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ হন। বিশ্ববিজয়ী আলেকজেণ্ডার ইঁহারই পুত্র। আলেকজাণ্ডার বা সেকেন্দার শাহের বিস্ময়কর দিগ্বিজয়-কাহিনী এবং ভারত পর্য্যন্ত আগমনের বিচিত্র বৃত্তান্ত অনেকেই অবগত আছেন। খাস গ্রীসের অধিবাসীরা ইয়োলিয়ান বংশীয় ও মাসিডনবাসী ফিলিপ এবং আলেকজাণ্ডারকে যে দৃষ্টিতেই দেখিয়া থাকুক, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে, আলেকজাণ্ডার ও তাঁহার অনুচরবর্গ কর্ত্তৃক হেলেনিক কৃষ্টির বীজ নানা দেশে উপ্ত হইয়াছিল। বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতির সহিত গ্রীক সংস্কৃতির সম্মেলনে বহু বিচিত্র কৃষ্টি বা কালচার দৃষ্ট হইয়াছিল। দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের আগমনের সহিত গ্রীক কৃষ্টির প্রভাব উত্তর ভারতের পশ্চিমাংশে প্রসারিত হইয়াছিল। আফগানিস্থানে (অতীতের গান্ধার) এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সেই প্রভাবের বহু চিহ্ন বা পরিচয় আমরা আজিও প্রাপ্ত হইয়া থাকি। গ্রীক ও ভারতবর্ষীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যপ্রণালীর সংমিশ্রণে এক প্রকার অভিনব শিল্পাদর্শ সৃষ্ট হইয়াছিল। পণ্ডিতগণ এই বিচিত্র রচনাভঙ্গীকে "গান্ধারপদ্ধতি বা আদর্শ" আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। এই আদর্শে গঠিত বুদ্ধমূর্ত্তিগুলিও প্রাচীন প্রণালীতে প্রস্তুত বুদ্ধ হইতে বিভিন্ন। ফিলিপের সময়ে ইয়োলিয়ান প্রাধান্যের বিরুদ্ধে ওজস্বিনী অগ্নিবাণী উচ্চারণ করিয়া ডিমস্থিনিস বাগ্মিশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন। আর একজন ইয়োলিয়ানবংশীয় রাজা শক্তিশালী হইয়া রোমের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। অবশ্য তখন রোম শক্তি সঞ্চয় করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র। এই ইয়োলিয়ানবংশীয় রাজার নাম পাইরাস। ইনি এপিরাস প্রদেশের অধিপতি ছিলেন।

কার্থেজের সহিত রোমের তুমুল যুদ্ধের কথা অনেকেই অবগত আছেন। এই যুদ্ধে মাসিডনাধিপতি ফিলিপ (ইনি আলেকজাণ্ডারের পিতা নহেন) কার্থেজকে সাহায্য করিতে উদ্যত হইলে, রোম ক্রুদ্ধ হইয়া মাসিডন আক্রমণ করে। ক্রমশঃ সমগ্র গ্রীসই রোমের অধীন হইয়া পড়ে। রোমাধিকৃত এই রাজ্য প্রথমে মাসিডোনিয়া আখ্যায় অভিহিত হয় এবং পরে রোম্যানরা ইহাকে আচাইয়া নাম প্রদান করে। রোম বাহুবলে গ্রীস জয় করে বটে; কিন্তু গ্রীক কৃষ্টির নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। বিজেতা সাগ্রহে বিজিতের অপূর্ব্ব শিক্ষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে। রোমের অধীন গ্রীকরা আপনাদিগকে "রুমাইয়োই" আখ্যা দিয়াছিল। প্রাজ্ঞ প্রবর সিসিরো স্বীকার করিয়াছেন, সভ্যতার উৎসস্বরূপ গ্রীসের নিকট হইতে রোম সভ্যতালোক প্রাপ্ত হইয়াছে। বিজয়ী সীজারগণ রোমের প্রাধান্য নানাদেশে প্রসারিত করিয়া বিরাট্ সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিবার পর গ্রীসকে কেন্দ্র করিয়া বিজাণ্টাইন সাম্রাজ্য জন্ম লাভ করে। বিজাণ্টাইন সম্রাট্‌গণ গ্রীকভাষাকে রাজকীয় ভাষার গৌরব দান করে। বিজাণ্টাইন সাম্রাজ্য ধ্বংস ও লুপ্ত হইবার পূর্ব্বেই গ্রীস ওৎমানবংশীয় তুর্কদিগের অধীন হইয়া পড়ে।

এই বিষয়ে সংশয় নাই যে, নানা প্রকার ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে ও বিভিন্ন বিজেতৃ জাতির সংস্পর্শে গ্রীকগণের দেহে অন্যান্য সম্প্রদায়ের শোণিত সঞ্চারিত হইয়া তাহাদিগকে ক্রমশঃ অতীতের হেলেনিক জাতি হইতে স্বতন্ত্র এক বর্ণসঙ্কর নূতন জাতিতে পরিণত করিয়াছে। প্রতীচ্য সভ্যতার প্রবর্ত্তক সেই গ্রীস বা হেলাস আছে বটে, কিন্তু যে গ্রীক বা হেলেনিক জাতি সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বা শ্রেষ্ঠ কৃষ্টির সৃষ্টি করিয়াছিল, ঠিক তাহারা বসুন্ধরার বক্ষে আর বিদ্যমান নাই বলিলে ভুল হয় না। তবুও তাহারা সেই অতুলনীয় অতীতের উত্তরাধিকারী বটে এবং স্বল্প বা সামান্য হইলেও, সেই শোণিত তাহাদের শিরায় শিরায় (অপর শোণিতের সহিত) বহিয়া যাইতেছে, এ বিষয়েও সংশয় থাকিতে পারে না।

গান ও স্বরলিপি

ওগো পথের সাথী, নমি বারম্বার
পথিক জনের লহো নমস্কার!
ওগো বিদায়, ওগো ক্ষতি,
ওগো দিন-শেষের পতি,
ভাঙা-বাসার লহো নমস্কার!

ওগো নব প্রভাত-জ্যোতিঃ,
ওগো চিরদিনের গতি,
নব আশার লহো নমস্কার!

জীবন-রথের হে সারথি,
আমি নিত্য পথের পথী,
পথে চলার লহো নমস্কার।

কথা ও সুর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—অধ্যাপক শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার এম. এস্‌সি

-া সা সা II {ঋা মা | মা পা -র্সর্ণর্সা | ণদা -পা | -মপা -সা -ঋা I
০ ও গো প থে | র সা ০ ০ ০ | থী০ ০ | ০ ০ ০

ঋা মা | জ্ঞা ঋা -া | সা -া ‖ (-া সা সা)} I -া -া -া I
ন মি | বা র ম্ | বা ০ | র্ ও গো ০ ০ র্

সদা দা | দা দা -পা | পা দা | দর্সা ণা -দপা I
প০ থি | ক জ ০ | নে র | ল হো ০০

পণা দা | পা মা -া | জ্ঞরা -মজ্ঞা | ঋা সা -া II
ল০ হো | ন ম স্ | কা০ র্০ | "ও গো" ০

-া -া -া II {দা দপা | মা ণদা -া | ণা র্সা | ণা র্সা -া I
০ ০ র্ ও গো০ | বি দা য় | ও গো | ক্ষ তি ০

র্সা র্সঋা | ঋর্ণা ণর্জ্ঞা জ্ঞর্ঋা | ঋা -র্সা | ণা র্সা (-ণা)} I -া I
ও গো০ | দি ন০ শে০ | শে র্ | প তি ০ ০

-া -া | -া -া -া | র্সর্জ্ঞা র্জ্ঞর্ঋা | র্ঋর্সা র্সা -া I
০ ০ | ০ ০ ০ | ভা ঙা ০ | বা ০ সা র্

সা ঋা | জ্ঞা মা -া | জ্ঞরা -মজ্ঞা | ঋা সা -া II
ল হো | ন ম স্ | কা ০ র্ ০ | "ও গো" ০

-া -া -া II {সা সদা | দা দা -পা | পা পা | পা পা -ক্ষা I
০ ০ র্ ও গো | ন ব ০ | প্র ভা | ত জ্যো ০

পা -দা | -া -া -পা | মা দা | ণা র্সা -র্ঋা I
তি ০ | ০ ০ ০ | ও গো | চি র ০

ণা ণর্জ্ঞা | র্জ্ঞর্ঋা র্ঋা -র্সণা | র্সা -া | -া -া -া} I
দি নে ০ | র ০ গ ০ ০ | তি ০ | ০ ০ ০

{র্সর্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্ঋা র্সা -মা | মা ণদা | ণা র্সা -র্ঋা I
ন ব | আ শা র্ | ল হো | ন ম স্

র্ঋা -র্জ্ঞা | -র্ঋা -া -া | -র্সা -া | -া -া -া} II
কা ০ | ০ ০ ০ | ০ ০ | ০ ০ র্

II র্সর্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্জ্ঞা র্জ্ঞা -র্রা | র্জ্ঞা -া | র্জ্ঞা র্জ্ঞা -র্রা I
জী ব | ন র ০ | থে র্ | হে সা ০

র্জ্ঞর্রা র্জ্ঞর্মা | -া -া -া | র্মর্পা র্মা | র্জ্ঞা -র্রা র্জ্ঞা I
র ০ থি ০ | ০ ০ ০ | আ ০ মি | নি ০ ত্য

র্জ্ঞর্মা র্মর্জ্ঞা | র্জ্ঞর্ঋা -র্জ্ঞা র্ঋা | র্সা -া | -া -া -া I
প ০ থে | র ০ ০ প | থী ০ | ০ ০ ০

র্সর্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্ঋা র্সা -া | র্সর্ঋা র্সণা | ণর্সা ণা -দপা I
প থে | চ লা র্ | ল হ ০ | ল ০ হো ০ ০

পণা দা | পা মা -া | জ্ঞরা -মজ্ঞা | ঋা সা -া II II
ল ০ হো | ন ম স্ | কা ০ র্ ০ | "ও গো" ০

বিলাতী ছবির গোড়ার কথা

শ্রীঅপরূপ মুখোপাধ্যায়

এক হিসাবে ইংল্যাণ্ডের ছবির ইতিহাস সম্পূর্ণ করে' লিখতে গেলে আরম্ভ করতে হ'বে সেই সপ্তম শতাব্দী থেকে। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীর পরেও পাঁচ শ' বছর ইংরেজী ছবির ইতিহাস এতটা ছাড়া-ছাড়া ও অনুমান-নির্মিত যে, সেখানে কোন বৈদেশিকের প্রবেশ নিষিদ্ধ। এই পাঁচ শ' বছরের ছবিগুলি যেন কতগুলি ছড়ানো ফুল কুড়িয়ে নিয়ে ইতিহাসের সূত্রে গাঁথতে পারলে সে যুগের রাজনীতিক ইতিহাসে আলোকসম্পাত করা যা'বে (The wars of the Roses) ইংল্যাণ্ডে রিনেশাঁর আগমন ধ্বনিত হচ্ছিল। টিউডর শাসনাধীনে ইংল্যাণ্ড শান্তি নিরাপত্তা স্থাপন করল এবং নানারূপ পরিশীলনার পথ উন্মুক্ত হ'ল। অষ্টম হেন্‌রীর রাজত্বকালে ইংরেজি গীর্জার আমূল সংস্কার (রিফর্মেশন্) সাধিত হয়। তাঁ'র ছয় পত্নী প্রভৃতির জন্য যেমন তিনি বিখ্যাত, তেমনি হল্‌বাইনের আগমনও তাঁ'র রাজত্বের একটি স্মরণীয় ঘটনা।

হল্‌বাইন্ (১৪৯৭—১৫৪৩) খাঁটি স্বদেশী অভিব্যক্তির দিকে না-হ'লেও, একটি বিশিষ্ট চিত্রধারার প্রবর্ত্তন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। হল্‌বাইন্ রাজা - জমিদারের অভিজাত পরিবেশের মধ্যে বিশেষ স্বস্তি পেতেন কিনা, সন্দেহ। ভ্যান্ ডাইক্ যে-রকম জন্ম-রাজসিক ছিলেন, হল্‌বাইন্ নিশ্চয় সে-রকম ছিলেন না। তাঁ'র অপূর্ব চিত্রদক্ষতায় সন্দেহ নেই, কিন্তু চতুর্দশ লুইর রাজত্বকালের চিত্রকররা "Louis Quatorze"এর যে হাস্যকর রাজরূপ প্রকাশ করেছেন, ভ্যান্ ডাইক্ যেমন প্রথম চার্লসের গরিমান্বিত রাজরূপ এঁকেছেন, হল্‌বাইন্ ঠিক তেমন ভাবে অষ্টম হেন্‌রীর "Bluff ways" ছবির সাক্ষ্যে রেখে যেতে পারেন নি। এদিক্ দিয়ে হল্‌বাইনের তুলনা হচ্ছেন ভেলাজকুয়েজ্। কথিত আছে যে, হল্‌বাইন্ অংকিত অনেক নারীচিত্র দেখে হেন্‌রী তা'দের সঙ্গে প্রেমে পড়েন এবং তা'দের লাভ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু অষ্টম হেন্‌রীর প্রেম এক ভয়ানক "হায়-মরি" বস্তু। সেই প্রেমের নজীরে হল্‌বাইনের চিত্র-দক্ষতা বা শ্রেষ্ঠত্ব বিশেষ প্রমাণিত হয় না। হল্‌বাইনের

"স্যার ইসাম্ব্রাস্ এ্যাট্ দি ফোর্ড" : শিল্পী মিলাস্

ইংরেজ চিত্র-প্রতিভার বিকাশের প্রথম অবস্থায় ফ্রান্স এবং নিম্ন দেশগুলির (Netherlands) প্রভাব সুস্পষ্ট। শুধু যে প্রথম অবস্থায়—তা' নয়; গেনজ্‌বরো ও টার্ণার পর্য্যন্ত বিদেশী ছাপ ইংরেজি ছবিতে ধরা যায়। জাতিগত ঐক্য এজন্য কতখানি দায়ী—তা' বলা যায় না সঠিক করে'। এই মিল বা প্রভাবের জন্য প্রধানতঃ হল্‌বাইন্, ডিহিয়ারি, কার্টেল্, অলিভিয়ার, সোমার, মইটেন্‌স্, জনসেন্, ভ্যান্ ডাইক্ প্রভৃতি বিদেশী চিত্রকরদের নৈকট্য ও প্রভাবই দায়ী। দুই গোলাপের আত্মকলহের কালেই

মৃত্যুর পরেও ফ্লেমিশ্ প্রভাবের ধারা বিলাতী ছবিতে খুবই স্পষ্ট।

প্রথম চার্লসের মত রাজগুণান্বিত রাজা যেমন বিলাতী রাজতক্তে কম বসেছেন, ভ্যান্ ডাইকের মত চিত্রশিল্পীও তেম্‌নি কম জন্মেছেন। ডাইকের আগে তাঁ'র গুরু রুবেন্স্ কিছুকাল ইংল্যাণ্ডে ছিলেন। তাঁ'র ডায়েরী থেকে জানা যায় যে, চার্লস খুব শিল্পোৎসাহী ছিলেন এবং এ-সময়ে বেশ উচ্চাঙ্গের শিল্প-সৃষ্টি হচ্ছিল। হল্‌বাইনের মত ভ্যান্ ডাইক্‌ও (১৫৯৯—১৬৪১) জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাল ইংল্যাণ্ডে কাটিয়েছিলেন। ডাইক্ তাঁ'র প্রভু চার্লসকে নানাভাবে চিত্রাপিত করেছেন এবং তাঁর প্রত্যেকটি ছবিই খাঁটি রাজচিত্রের মর্যাদা পেতে পারে। লুভে রক্ষিত চার্লসের চিত্রখানাকেই সাধারণতঃ তাঁ'র "Supreme masterpiece" বলে' গণ্য করা হয়। ভ্যান্ ডাইকই পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা দ্রুত আঁকতে পারতেন এবং তাঁ'র বর্ণের বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। এ-বিষয়ে ওয়াটু ও গেন্‌জ্‌ব্রোর সঙ্গে তাঁ'র চমৎকার ঐক্য আছে।

ভ্যানের পরে ক্রম্‌ওয়েলের প্রটেক্টরেটের সময়ে কুপার নামক একজন উল্লেখযোগ্য চিত্রকরের অভ্যুদয় হয়েছিল। হেন্‌রীর সময়েই ছোট সাইজের ছবি ক্রমশঃ চালু হচ্ছিল। কুপার "মিনিয়েচার" ছবিকে একটি বিশিষ্ট আত্ম-মর্যাদা দিতে সমর্থ হ'লেন। তা' ছাড়া এ-সময়ে জেম্‌সিউন্ নামে একজন স্কটিশ্ চিত্রকর স্কট্‌ল্যাণ্ডে একটি বিশিষ্ট চিত্রধারার সৃষ্টি করেন। এই চিত্রসাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টা র‍্যাবার্ণ। যথাস্থানে র‍্যাবার্ণের কথা আমরা বলব।

রেষ্টরেশনের সময়ে শেলী ও তাঁ'র পরে নেলার নামে দুইজন চিত্রকর যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কিন্তু খাঁটি ইংরেজি চিত্রসৃজনের সফল সাধনা সুরু করলেন হোগার্থ (১৬৯৭—১৭৬৪)। হল্‌বাইনের সময় থেকে নেলার পর্যন্ত চিত্রধারাটি অনুসরণ করলে ক্রমবর্ধমান জাতীয় প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। নেলারের মধ্যে স্বাধীন রূপ-সৃষ্টির প্রেরণা ছিল। কিন্তু হোগার্থের মাঝে তাঁ'র ক্ষম সম্পূর্ণত্ব ঘটল।

হোগার্থ আজ চিত্রকর হিসাবেই আমাদের নিকট পরিচিত। কিন্তু প্রথম জীবনে তিনি এন্‌গ্রেভিং এর কায করতেন। সমসাময়িক সমাজের কঠোর সমালোচক হিসাবে তিনি চিত্রজগতের প্রথম "কার্টুনিষ্ট"* বলে গণ্য হ'তে পারেন। "Harlot's Progress" ও "Marriage a lá Mode" প্রভৃতি সিরিয়েল্ ছবিতে তিনি তাৎকালীন সমাজের গ্লানিকর দিক্ চিরকালের জন্য চিত্রাপিত করেছেন। অতি ছোটকালে তিনি থিয়েটারের

"দি শ্রিম্প্ গার্ল" (ন্যাশন্যাল গ্যালারি): শিল্পী—হোগার্থ

সং সাজতেন। তা'ই হয়ত "স্যাটায়ারের" নৈপুণ্য তাঁ'র এত চমৎকার।

হোগার্থ বিলাতী ছবিতে যতটা "significant and important", যে আর কেউ সে-রকম নন্। চসারের মত তিনিই সত্যকার প্রথম ইংরেজ চিত্রকর। বৈদেশিক প্রভাব ও অভিজাতের একচেটিয়া শিল্প-বিলাস থেকে

* আধুনিক connotation অনুযায়ী। রাফেল্ কার্টুনের স্বরূপ বিভিন্ন প্রকৃতির।

জাতির শিল্প-সাধনাকে মুক্ত করে' তিনি ইংল্যাণ্ডের সাধারণ্যে মিশে গেলেন। অতি সাধারণ জীবনের স্বপ্ন, তাৎকালীন রীতিনীতির কঠোর সমালোচনা হোগার্থকে অমর করেছে। তিনিই প্রথম ইংরেজ চিত্রকর, যিনি দেশের "Shrimp Girl"-কে সাদরে আঁকলেন। নানা দিক্ দিয়ে এই ছবিটির অসাধারণ মূল্য আছে। "ইম্‌প্রেশনিজমে"র অগ্রদূত হিসাবে "Shrim Girl" গণ্য হ'তে পারে! হোগার্থের সম-সময়ে কয়েক জন উঁচুদরের চিত্রকর ইংল্যাণ্ডে ছিলেন। কিন্তু তাঁ'দের উপর হোগার্থের সাধনা কোন রেখাপাত করতে পারেনি। কিছুদিন পরে একটি নয়া চিত্রকর গোষ্ঠীর উদ্ভব হ'ল—সাণ্ডবি, স্কট্ প্রভৃতি তরুণ ইংরেজ চিত্রকরের দল দেশের মাঠ ঘাট তরুলতার মাঝে অপূর্ব সৌন্দর্য খুঁজে পেলেন। প্রকৃতি-চিত্র তখন "ফ্যাসনেবল্" হয়নি বলে' এঁদের সমাদর হ'ল না বটে, কিন্তু এই খাঁটি স্বাদেশিকতা কোনদিন ব্যর্থ হ'বার নয়। তাই একদিন টার্ণারের জন্ম হয়েছিল ইংল্যাণ্ডে।

*　*　*　*　*

রিচার্ড উইল্‌সন্ (১৭১৪—১৭৮২), যসুয়া রেনোল্ডস্ (১৭২৩—১৭৯২), গেন্‌সব্রো (১৭২৭—১৭৮৮), রোম্‌নি (১৭৩৪—১৮০২) প্রভৃতি প্রায় সমসাময়িক। এঁদের যুগ বিলাতী ছবির ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা অধিক গর্বের।

উইলসন্ ও রেনোল্ডস্ রয়েল্ একাডেমী স্থাপন করেন (১৭৬৮)। আজকাল উইল্‌সনের ছবির খুব আদর হচ্ছে। কিন্তু জীবদ্দশায় তাঁ'কে ভয়ানক অভাবের তাড়না ভোগ করতে হয়েছিল। তাঁ'র মনের জোর ও শত অভাব-পীড়নের মাঝে আদর্শ-প্রীতির কথা এক অত্যাশ্চার্য কাহিনীর মত।

ইতালীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য : শিল্পী: রিচার্ড উইল্‌সন্

যসুয়া রেনোল্ডসের চরিত্র অত্যন্ত জটিল। উইল্‌সন্, গেন্‌সব্রো বা রোম্‌নির সম্পর্কে তাঁ'র প্রকৃত মনোভাব ও ব্যবহার নিয়ে আজও গবেষণা চলতে পারে। কিন্তু দুর্যোগের মধ্যে তিনি যেভাবে নিজের স্থানটি রক্ষা করেছিলেন, তা' বাস্তবিকই ইংরেজ ডিপ্লোমেসির পরিচায়ক। গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের চরিত্র লিটন্ ষ্ট্রাচী * যে-রকম অঙ্কিত করেছেন, যসুয়া অনেকটা সে-রকম ব্যক্তি ছিলেন বলে মনে হয়। উইল্‌সনের কদর তাঁ'র যুগ না-বুঝলেও, তিনি নিজে বেশ বুঝতেন এবং যসুয়ার জীবনের একটি অদৃশ্য স্তরের মধ্য দিয়ে উইল্‌সন্ একটা জ্বালাময় স্রোতের মত প্রবাহিত হয়ে গেছেন। মরবার আগে যে-দিন উইল্‌সন্ তাঁ'র ভাইয়ের মৃত্যুতে একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে অনেক সম্পত্তির মালিক হয়ে লণ্ডন ত্যাগ করেন—সেদিন নিশ্চয়ই যসুয়া এক ঘুমে রাত্রি ভোর করেছিলেন। উইল্‌সন্ ব্যতীত গেন্‌সব্রো-ও তাঁ'কে কম দুর্ভাবনা দেন নি। গেন্‌সব্রো যসুয়াকে উপেক্ষার চরম করে' ছেড়েছিলেন। রোম্‌নির সময়ে তো গোটা লণ্ডন-সমাজ একেবারে দু' ভাগে বিভক্তই

* Eminent Victorious : Lytton Strachey.

হয়ে গেছিল এবং এক সময়ে রোম্‌নির ভক্ত-সম্প্রদায়ই প্রবল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এ-সমস্ত ঝড়ঝাপ্‌টা উৎরে যশুয়া যে-ভাবে রয়েল্‌ একাডেমীর সর্বোচ্চ পদে থেকে গেলেন, সে-জাতীয় দৃষ্টান্ত একালে রাম্‌জে ম্যাক্‌ডোনাল্ডের প্রধান মন্ত্রিত্ব ছাড়া আর নেই। জন্‌সন্‌ বাস্তবিকই বলেছিলেন: How invulnerable is Joshua !

চেহারার দিক্‌ দিয়ে ভয়ানক কুশ্রী ছিলেন যশুয়া। ছোটবেলা বসন্ত হয়ে সারা মুখ ও দেহে বিশ্রী কালো দাগ হয়েছিল; ইটালীতে শিক্ষানবিশীর সময়ে ঘোড়ার উপর থেকে পড়ে গিয়ে ওষ্ঠাধর চিরতরে থেৎলে যায় এবং তিনি বধির হয়ে যান। কিন্তু এ-সমস্তই তিনি ভুলে গেলেন অরূপের সাধনায়, জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত চিত্রসাধনার পূজায় তিনি উৎসর্গ করে' দিলেন—এমন যে বিয়ের ছুটি পর্যন্ত কোনদিন মিলল না! সুদীর্ঘ জীবনে তিনি নানা রকমের ছবি এঁকেছিলেন: কাল্পনিক চিত্র, পৌরাণিক ও শিশু-চিত্র চরিত্রচিত্র, (Portrait's), পোজ্‌ চিত্র (যথা—থেঁইস্‌, ডাচেস্‌ অব্‌ ডিভনশায়ার ইত্যাদি) কিছুই বাদ নেই। গেন্‌জ্‌বরো বলেছিলেন, "Damn it ! how versatile is the man !" তাঁর মৃত্যুর বহুদিন পরে অপি মত প্রচার করেছিলেন যে, যশুয়ার ছবি একটু নিষ্প্রভ ও পুরাতন হ'লে অতি সুন্দর হয়ে ওঠে। এ-কথার সত্যতা "Love Me, Love My Dog," "The Age of Innocence", "Infant Samuel" প্রভৃতি চিত্রের বিচার করে' অনুভব করা যায়। যশুয়া তাঁর যুগের সমস্ত বড় বড় মনীষির সহিত প্রীতি-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। জীবনে কুরুচির পরিচয় একবার মাত্র তিনি দিতে উদ্যত হয়েছিলেন। কিন্তু গোল্ডস্মিথ্‌ তাঁকে সেই কলঙ্কের হাত থেকে রক্ষা করেন। যশুয়ার "The Tragic Muse" চিত্রটি সে-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী সারা সিডন্স্‌ থেকে আঁকা। গল্প আছে: যে-দিন সারার ছবি সম্পূর্ণ হ'ল, সে-দিন যশুয়া বলেছিলেন, 'ম্যাডাম, তোমার এই পরিচ্ছদের একটি কোণে আমার নামটি লিখে রাখি। তোমার সংগে আমাকেও তুমি অনাগত কালে নিয়ে যাবে।' অমরত্বের জন্য যশুয়ার দুশ্চিন্তার কোন কারণ ছিল না।

যশুয়াকে রাস্‌কীন্‌ সর্বশ্রেষ্ঠ বিলাতী চিত্রকর বলে' সম্বধিত করেছেন। গেনজ্‌ব্রোর দাবী নিয়ে অনেকে মারামারি করতে রাজী থাকা সত্ত্বেও, সব দিক্‌ বিচার করে রাস্‌কীনের অভিমত স্বীকার করতে:হয়। তা' ছাড়া বিলাতী চিত্রকলার উন্নতির জন্য যে-সংগঠন ক্ষমতার পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন—তা' বাস্তবিকই অপূর্ব। গেন্‌জব্রোকে তিনি প্রশংসা করতেন এবং শত দুর্ব্যবহার ভুলে গিয়ে তিনি এই প্রতিদ্বন্দ্বীর মৃত্যুশয্যার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর নিপুণ চিত্রণদক্ষতা, শিশু-

শিল্পী রেনল্ডস্‌
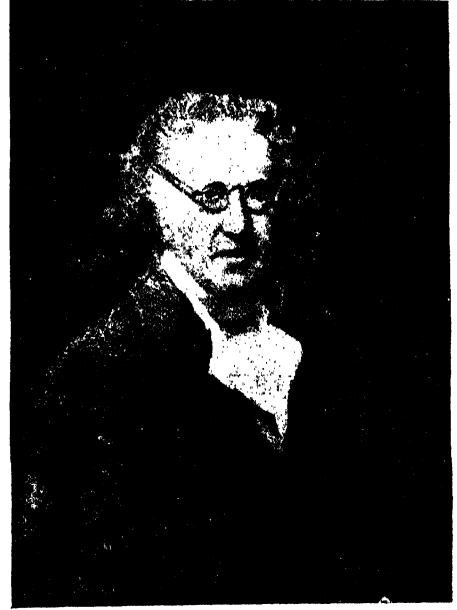
সৌন্দর্যের অপরূপ সৃষ্টি তাঁর শ্রেষ্ঠ সম্মানের আসন চিরকাল অটুট রাখবে। গেন্‌জ্‌ব্রো কোন কোন বিষয়ে তাঁর চেয়ে বড় ছিলেন বটে, কিন্তু রেণোল্ডস্‌ চরিত্র সৃষ্টি করতে পারতেন না—এরূপ অভিযোগ পক্ষপাত ও অজ্ঞতার পরিচায়ক। রেণোল্ডসের চরিত্রাংকন হল্‌বাইন্‌, কুয়েজ্‌ বা রেম্ব্‌রাণ্টের মত গভীর না-হ'লেও, তদংকিত জন্‌জন্‌ ও কেপেলের ছবি সত্যই চমৎকার। তিনি সর্বদা বল্‌তেন, আমি প্রতিভা বুঝি নে। আমি বুঝি মাথার ঘাম পায়ে না-ফেল্‌লে বড় শিল্পী হওয়া যায় না। গেনজব্রোর প্রতিভা তাঁর চেয়ে বড় ছিল। কিন্তু তাঁর

মত উদ্যমশীল, পরিশ্রমী বা "wise" গেন্‌জব্রো ছিলেন না। এজন্য ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার তিনি করতে পারেন নি।

গেন্‌জব্রো উনিশ বছর বয়সে বিয়ে করেছিলেন। এতটা সুখকর মিলন পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোন চিত্রকরের জীবনে হয় নি। সম্পদে, নিষ্ঠায়, সৌন্দর্যে মিসেস্ গেন্‌জব্রোর জোড়া চিত্রেতিহাসে আর নেই। এই বিয়ের পরে গেন্‌জব্রো লণ্ডনে এসে ষ্টুডিও খুললেন। তিনি নীল রং খুব পছন্দ করতেন। কথিত আছে যে, রেণোল্ডস্ নীল রংয়ে ভাল শিশুচিত্র আঁকা যায় না বলে' একদা মন্তব্য করেছিলেন। উত্তরে তিনি বিশ্ববিখ্যাত "The Blue Child" আঁকেন। সারা সিডনস্‌কে তিনিও এঁকেছিলেন। আমার মতে গেন্‌জব্রোর ছবিটি "much more gorgeous and imposing" হ'লেও ভাবসম্পদে "The Tragic Muse" অনেক বড়। সারার ছবি আঁকবার সময়ে গেন্‌জব্রো কেবল বলতেন, "Damn it! Your nose madam, it has no end!"* কিন্তু নারী-চিত্রে গেন্‌জব্রো কেবল রেণোল্ডস্‌কে পরাস্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। গেন্‌জব্রো গীতবাদ্যের খুব ভক্ত ছিলেন এবং তাঁ'র প্রবল সঙ্গীতপ্রবণতার বিষয়ে অনেক মজাদার গল্প আছে।

রোম্‌নি প্রথম যৌবনে স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ করে' লণ্ডনে আসেন। লণ্ডনে প্রথম-প্রথম ভয়ানক কষ্ট হ'ল—শেষে ক্রমশঃ অর্থাগম হ'তে লাগল। কিন্তু স্ত্রী যখন রোম্‌নির প্রত্যাবর্তনের জন্য পূর্ণহৃদয়ে অপেক্ষা করছিলেন, তখন রোম্‌নি শিক্ষার্থ রোমে চলে' গেলেন। যশুয়াকে প্রকৃত পরাজয়ে অবনত করবেন—এই সংকল্পে তিনি বুক বাঁধলেন। যে-অরূপের মোহে তাঁ'র নয়নমন আচ্ছন্ন হয়েছিল, তা'র বেদীমূলে একদিন দাম্পত্যপ্রেমের বলি হ'ল। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি রোম থেকে লণ্ডনে ফিরলেন "Keen and eager to try his strength"; ফিরে দেখলেন যে, অনুপস্থিতির দরুণ লণ্ডনের ব্যবসায় মাটি হয়ে গেছে, ঋণের দায়ে ভাই জেল্ খাটছে। সামান্য যা'-কিছু ছিল—তা'ই নিঃশেষ করে ভাইকে মুক্ত করতে গিয়ে নিজেই ঋণী হয়ে পড়লেন। কিন্তু তাঁ'র কঠোর প্রতিজ্ঞা তিনি ভুললেন না। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁ'র পসার হ'তে লাগল, সুরু হ'ল যশুয়ার সঙ্গে চিরবাঞ্ছিত সংগ্রাম। রোম্‌নি ও রেণোল্ড্‌সের জন্য লণ্ডন শহর দু' দলে বিভক্ত হয়ে গেল।—রোম্‌নির বিজয়াভিযানে যশুয়ার প্রতিষ্ঠা অনেকাংশে নষ্ট হ'ল। এম্‌নি সময়ে "Emma" এল তাঁ'র অংকন-প্রকোষ্ঠে। "Emma" রোম্‌নির সমস্ত চৈতন্য উচ্ছ্বসিত করে' তুলল। কিন্তু পর-পর যশুয়ার মৃত্যু ও "Emma"র অন্তর্ধানে রোম্‌নির জীবন অকস্মাৎ শূন্য হয়ে গেল। রোম্‌নি পাগল হয়ে গেলেন।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে কিসের এক অজ্ঞাত তাড়নায় রোম্‌নি জন্মস্থান কেণ্ডালের পথ নিলেন। তখন আর তাঁ'কে চেনা যায় না। পৃথিবীর কোন নেশাই আর নেই। নেশা ভিন্ন মানুষ কি করে' বাঁচে?—তা'ই তো রোম্‌নি আজ পাগল! বাড়ীর ভিতর ঢুকতেই কে একজন পক্ককেশা বৃদ্ধা এসে তাঁ'কে জড়িয়ে ধরল, চোখের জলে তাঁ'কে অশ্রুসিক্ত করল। আজ হ'তে ৩৭ বছর আগে রোম্‌নি লণ্ডন যাত্রা করেছিলেন। বলে' গিয়েছিলেন, 'মনে করো না মেরী, যে লণ্ডনে পৌঁছে তোমাকে ভুলে যা'বো! লণ্ডনে গিয়ে বিপুল সম্পদ অর্জন করবো—তোমাকে নিয়ে সোণার আসনে বসিয়ে রাখব।' মেরী কি স্বর্ণাসনের দুরাশাতেই সুদীর্ঘ ৩৭ বছর রোম্‌নির কথা ভাবতে ভাবতে বেঁচে ছিলেন? রোম্‌নি তখন পাগল, কিছুই বুঝলেন না।

রোম্‌নির তিরোধানের পরে বিলাতী ছবির একটি প্রকাণ্ড গৌরবের যুগ শেষ হ'ল। এ-সময়ে বেন্‌জামিন্ ও ব্যারি-জাতীয় চিত্রকরগণ চিত্রসৃষ্টির এক নূতন ক্ষেত্র বেছে নিলেন এবং বিলাতের ভবিষ্যকার ঐতিহাসিক চিত্রের পত্তন হ'ল।

* Damn it :—কথা দু'টি তিনি খুব বেশী ব্যবহার করতেন।

বিজয়িনী

শ্রীসুশীল জানা

সস্ত্রীক গ্রামের বাটীতে আসছিল সুরেন। স্ত্রী তার চিরকাল ক'লকাতার কোন একটা কাণা-গলিতে মানুষ, জনাকীর্ণ নগরী ছাড়া খোলা পৃথিবীর সঙ্গে কোন পরিচয় এতদিন ছিল না তার।

ষ্টীমার থেকে নেমে সুরেন অল্প একটু হেসে জিজ্ঞেস ক'রলে, কেমন লাগছে?

দূর নদী-পথ—যত দূর চোখ যায়, আকাশ আর পৃথিবী পাল্লা দিয়ে ছুটে গিয়েছে ঊর্দ্ধশ্বাসে। প্রমীলার ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ মনের সীমা ছাড়িয়ে মস্ত বড় আকাশটার নীচে পৃথিবী যেন মুক্তির নিশ্বাস ফেলে ছুটেছে বহুদূর-বিসারী নদীর জলরাশি পেরিয়ে, ওপারের অস্পষ্ট নারিকেল গাছের সারির ওপরে ঝুঁকে-পড়া শাদা মেঘের সীমানা পেরিয়ে কত দূরে, কত অপরিচিত গ্রাম-গ্রামান্তরে, প্রমীলা যেন ধারণাও ক'রতে পারে না।

ষ্টীমার-ঘাটের পাশ দিয়ে কেনেল চলে' গিয়েছে; কেনেলের মুখে নৌকার ভীড়, ধান-বোঝাই নৌকা—খড়-বোঝাই নৌকা—তেল, মশলা, এমনি বহু রকমের বোঝাই নিয়ে নৌকাগুলি অপেক্ষা ক'রছে। কোনটা বাইরে যাবে—কোনটা ঢুকবে কেনেলের ভেতরে, যাবে কোন গঞ্জের হাটে। কয়েকটি নৌকায় রাঁধা-খাওয়া চলছে। ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে নৌকা থেকে। যাত্রী-বাহী নৌকাও আছে কয়েকটি—ডেকে ডেকে ষ্টীমার-ঘাটে মাঝি-মাল্লারা যাত্রী যোগাড় ক'রছে। তাদের কয়েক জন সুরেনকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। তাদের সঙ্গে দর কষাকষি ক'রছে সুরেন। প্রমীলা ব'সে আছে একটা বেডিংয়ের ওপর।

অনেক কথা কাটাকাটির পর শ্রীনাথ মাঝির সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত একটা রফা হ'য়ে গেল। নৌকায় মালপত্র ওঠাবার জন্যে শ্রীনাথ তার ভাইকে ডাকতে গেল।

কিন্তু মাত্র সাত টাকায় রফা হয়েছে শুনে ক্ষেপে উঠল ভরত—ব'ললে, মাল তুই-ই বয়ে নিয়ে আয়গে। যেতে হবে সেই কোথায় গোলাবাড়ীর হাট—একদিন এক রাতের পথ! সাত টাকায় কি ব'লে রাজী হ'লি তুই! তুই যা—আমি যাব না।

শ্রীনাথ বিব্রত হ'য়ে পড়ল। চোখ মিট্ মিট্ ক'রে চাপা গলায় ব'ললে সে, আরে সাধে রাজী হ'য়েছি! খ্যাল আছে। কলকেতার বাবু।

ভরত এক মনে জাল বুনছিল—কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যে শ্রীনাথের মুখের দিকে তাকাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। তারপর ব'ললে, চল্।

ভরত লাফ দিয়ে ডাঙায় নামল। তারপর শ্রীনাথের পেছনে পেছনে ষ্টীমার ঘাটের দিকে এগোল।

প্রমীলা দূর নদী-পথের দিকে মুগ্ধ বিস্মিত দৃষ্টি মেলে বেডিংয়ের ওপর বসে' আছে। পরণের টক্‌টকে লাল সাড়ীখানিতে ভারী চমৎকার মানিয়েছে তাকে। হাল্‌কা হাওয়ায় মুখের ওপরে চূর্ণ চুলের গোছা কয়েকটি উড়ে উড়ে পড়ছে মুখে। ভরত মুগ্ধ দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যে তাকিয়ে রইল, তারপর শ্রীনাথের ঠ্যালা খেয়ে সচেতন হ'ল।

শ্রীনাথ ব'ললে, নে—তুই ওই বড় তোরঙ্গটা নে।

ভরত ব'ললে, তুই নিয়ে যা দাদা—আমার গাটা তখন থেকে কেমন বমি-বমি ক'রছে।

এই এত মাল, আমি একা নিয়ে যাব!

উহুঁ—আমি পারব না। আমি যাই—গাটা বড্ড বমি বমি ক'রছে।

আর কোন কথা না ব'লে হন্-হন্ ক'রে নৌকার দিকে ফিরল ভরত। শ্রীনাথ ফ্যাল্-ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে রইল।

ভরত ফিরে এল নৌকায়। ছোট একটা কাঠের বাক্সের মধ্যে মাঝি-জীবনের সমস্ত ঘর-সংসার। তারই মধ্যে হাফ-হাতা ফতুয়া একটা তালগোল পাকিয়ে গোঁজা ছিল—সেইটে টেনে বার ক'রল ভরত, ঝেড়েঝুড়ে গায়ে

দিলে। ছোট্ট একটি জাপানী আয়না বের ক'রে খুব গম্ভীর হ'য়ে দেখলে একবার নিজেকে, অবিন্যস্ত এলো-মেলো চুলগুলিকে আঁচড়ে ঠিক ক'রে নিলে। তারপর একটি বিড়ি ধরিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইল নৌকায়।

একে একে সব জিনিষ-পত্র বয়ে আনল শ্রীনাথ এবং সুরেনের সঙ্গে যে বছর আঠার বয়সের চাকরটি এসেছে।

শ্রীনাথ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ব'ললে, কতখানি বমি ক'রলি?

—সে অনেকখানি। চিঁ চিঁ ক'রে ব'ললে ভরত, গাটা ঝিম্-ঝিম্ ক'রছে।

সুরেনের পেছনে পেছনে প্রমীলা নৌকার ধারে এসে দাঁড়াল। সুরেন লাফ দিয়ে উঠল নৌকায়—নৌকার মুখ জলের দিকে সরে এল। প্রমীলা দাঁড়িয়ে রইল ডাঙায়।

সুরেন ব'ললে, উঠে এস না—জুতো খুলে ফেল।

প্রমীলা জুতো খুলল বিব্রত হ'য়ে। তারপর সাড়ী একটু তুলে' হাসতে হাসতে জলে নামল। ভরত নিটোল দু'খানি নগ্ন পায়ের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

শ্রীনাথ ভরতের দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে ঘুরে দেখল—ব্যস্ত হ'য়ে ব'লল, আহা-হা—জলে নামলেন কেন আবার! ভরত, দে না লগিটা ঠেলে একটু।

ভরত অলস কণ্ঠে ব'ললে, থা-ক—উঠে পড়বে।

সুরেনের হাত ধরে' নৌকায় উঠল প্রমীলা।

শ্রীনাথ ব'ললে, আপনাদের খাওয়ার কি হবে বাবু—রান্না ক'রবেন নাকি?

সুরেন প্রমীলার মুখের দিকে তাকিয়ে ব'ললে, সে আবার অনেক হাঙ্গাম!

প্রমীলা ব'ললে, খাবে কি তা' হ'লে? হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমরা রান্না ক'রব মাঝি।

—এ তোমার ক'লকাতা কি না! সুরেন হেসে ব'ললে, কত ঝঞ্ঝাট জান?

—তা' হোক।

শ্রীনাথ ব'ললে, ঝঞ্ঝাট আর কি বাবু—আমাদের উনুন তো আছেই, বাকী সব জিনিষ-পত্র বাজার থেকে কিনে আনা। ষ্টীমার-ঘাটের পাশেই তো বাজার।

সুরেন তাদের চাকরটির দিকে তাকিয়ে ব'ললে, কি রে পঞ্চু—পারবি তুটি রাঁধতে?

পঞ্চু ব'ললে, পারব না কেন বাবু—মা একবার দেখিয়ে দিলে হ'ল।

প্রমীলার দিকে তাকিয়ে সুরেন হেসে ব'ললে, হেরে গেলুম। রাঁধ তা' হ'লে।

প্রমীলা হেসে ব'ললে, কেন—রান্নায় তোমার আপত্তি কেন? এক্ষুণি যে ব'লছিলে—নৌকায় রেঁধে খেতে খুব ভাল লাগে তোমার?

—ভাল তো লাগে—কিন্তু কষ্ট হবে তোমার।

—আহা—

প্রমীলা দাঁতে দাঁত চেপে সুরেনের গাল দু' আঙুল দিয়ে টিপে ধরে' নাড়া দিয়ে দিল। সুরেনের গাল দুটো নাকি বড্ড ফুলো—সহ্য ক'রতে পারে না প্রমীলা। কিন্তু প্রকাশ্য দিবালোকে···চারদিকে তাকিয়ে দেখল সুরেন। নৌকার ওপরে কাঠের ঘর—তার মধ্যে প্রমীলা আর সে ছাড়া কেউ নেই, শ্রীনাথ মুখ ঘুরিয়ে নোঙরের দড়ি ধরে' টানছে, পঞ্চু তাই দেখছে। শুধু ভরত তাকিয়ে আছে স্তিমিত চোখে।

ওসব কেয়ার করে না প্রমীলা। সে ব'ললে, আমাকে নিয়ে আসছিলে না তুমি—কত ধাপ্পাই দিচ্ছিলে, ভয় দেখাচ্ছিলে। কিন্তু এত ভাল লাগছে আমার।

ভরতেরও ভাল লাগছে—ভয়ানক ভাল লাগছে তার। এত সুন্দর মেয়ে সে দেখে নাই জীবনে। কতকগুলো একঘেয়ে নিরবচ্ছিন্ন দিনের মধ্যে হঠাৎ একটি স্বপ্নের দিন উড়ে এসেছে আজ। এত হাল্কা, এত পলকা আর সুন্দর—একটু ছুঁলেই যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে।

রান্নার জিনিষ-পত্র কেনবার জন্যে পঞ্চু শ্রীনাথের সঙ্গে বাজারে চলে' গেল।

শ্রীনাথ ভরতকে ব'ললে, গুণ টানতে পারবি?

ভরত চিঁ-চিঁ ক'রে ব'ললে, আমার শরীর খারাপ—কি ক'রে পারব।

—নিতাই কোথায় গেল ?

—কি জানি। এক্ষুণি আসবে ব'লে গিয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে নিতাই এল। সে আর শ্রীনাথ গুণ টানতে নামল। ভরত বসল হাল ধরে'। সুরেন, প্রমীলা আর পঞ্চু রান্নার তোড়জোড় ক'রতে লাগল। সবই ঠিক হ'ল, কিন্তু উনুন ধরানোটাই হ'ল একটা বিশ্রী বিভ্রাটের ব্যাপার। ফুঁ দিয়ে দিয়ে প্রমীলা ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে। সুরেন এসে ব'ললে, সর—

কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে সুরেনও ধোঁয়ায় হাঁপিয়ে উঠল। তারপর এলো পঞ্চু। সে বেচারীও একটু পরে চোখ ঘষতে লাগল। প্রমীলার মুখ-চোখ লাল টুক্-টুক্ ক'রছে তার লাল সাড়ীর মত—আর মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছে ভরত।

প্রমীলা ব'ললে, অত বড় বড় চেলা কাঠ—তাই ধরছে না।

প্রমীলা কাটারি দিয়ে চেলা কাঠগুলো সরু ক'রবার জন্যে উঠে পড়ে লাগল। হাত লাল হ'য়ে গেল, চিবুকের কাছে ঘামের বিন্দুগুলি টুপ্-টুপ্ ক'রে ফোঁটা হ'য়ে ঝরে পড়ল। কাটারিতে ধার নেই—একটাও সরু চেলা হ'ল না।

সুরেন এগিয়ে এসে ব'লল, সর, সর—তুমি পারবে না।

প্রমীলা বিব্রত হ'য়ে তাকাল ভরতের দিকে—হেসে ব'ললে, এটা দিয়ে তোমরা কি ক'রে কাঠ চের মাঝি !

ভরত তৎপর হ'য়ে ব'ললে, আমি দিচ্ছি—

কিন্তু সুরেন তখন কাঠ চেরায় লেগে গিয়েছে। সরু-সরু কাঠের চেলাগুলো ভরতের পায়ের কাছে জড়ো হ'তে লাগল। ভরতের ইচ্ছে হ'ল—কাটারিটা কেড়ে নেয় সে সুরেনের হাত থেকে। নিরুপায় হ'য়ে সে শুধু দেখতে লাগল—মন আর হাত তার উস্‌খুস্ ক'রতে লাগল। ইচ্ছে হ'ল—ঠেলে ফেলে দেয় কেনেলের জলে সুরেনকে। আস্তে আস্তে আবার সে ফিরে গিয়ে হাল ধরে বসল।

উনুন ধরল শেষ পর্য্যন্ত। রান্না ব'সল। সুরেন মাঝে মাঝে প্রমীলাকে সাহায্য ক'রতে এসে জিনিষ-পত্র ছড়িয়ে একাকার ক'রে ফেল্‌লে।

প্রমীলা চেলা কাঠ উঁচিয়ে ব'ললে, পালাও ব'লছি। বিরক্ত ক'রো না।

রান্না শেষ হ'ল—খাওয়া-দাওয়াও শেষ হ'ল এক সময়ে। ভরত শুধু দেখতে লাগ্‌ল—অফুরন্ত দেখা। প্রমীলার হাল্‌কা হাসি, রাগ—দীর্ঘ চোখের কটাক্ষ, নিটোল নগ্ন বাহু—সুন্দর নখগুলি। ভরত চোখের পলক ফেলতে ভুলে গিয়েছে দেখার নেশায়।

বেলা পড়ে এল এক সময়ে।

শ্রীনাথ আর নিতাই তামাক খেতে উঠল নৌকায়। তামাক সেজে নিয়ে ভরতকে ডেকে চলে' গেল কেনেলের ওপরে।

শ্রীনাথ ভরতের দিকে তাকিয়ে ব'ললে, গোটা দুপুরটা টানলুম—আর পারছি নে, তুই এবার টান একটু। তারপর ফের না হয় আমি—কি বলিস্ ?

ভরত শুধু ব'ললে, আচ্ছা।

শ্রীনাথের চুলে পাক ধরেছে। তামাকের ধোঁয়া ছেড়ে ব'ললে, এই বয়সে কি আর গুণ টানা পোষায় ! কোমর ধরে যায়।

ভরত চুপ ক'রে নৌকার দিকে তাকিয়ে রইল। জানালা দিয়ে প্রমীলাকে দেখা যাচ্ছে।

নিতাই ব'ললে, রাত্রে নৌকো রাখবি কোথায় ?

শ্রীনাথ ব'ললে, বনগাঁর কাছাকাছি। নইলে সুবিধে হবে না। কি বলিস্ রে ? ব'লে সে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ভরতের দিকে তাকাল।

ভরত কোন উত্তর দিলে না।

ওদের তামাক খাওয়া শেষ হ'ল। শ্রীনাথ ফিরে গেল নৌকায়। নিতাই আর ভরত ঝুঁকে ঝুঁকে গুণ টানতে লাগল।

মাইল খানেক এসেই ভরত ব'ললে, থাম নিতাই—তামাক খাই চল্।

—এক্ষুণিতো খেলি।

—উঁহু, থাম্।

নিতাই দড়ি গুটোতে লাগল। ভরত নেমে গেল

কেনেলের নীচে—নৌকার কাছে। গাড়ু থেকে তামাক বের ক'রলে সে কিছু ক্ষণ ধরে', তারপর হুঁকো, তারপর তামাক। হাত যেন চলে না ভরতের। শ্রীনাথ চটে ব'ললে, কি কচ্ছিস এতক্ষণ ধরে'! নে চট্‌পট্‌।

—যাচ্ছি—চেঁচাস্ নি।

কল্কেয় ফুঁ দিতে দিতে দেখতে লাগল সে প্রমীলাকে। প্রমীলা জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখ্‌ছে।

তারপর আবার কিছু দূর টেনে চলল ভরত। কিছুদূর গিয়ে আবার ব'ললে, তামাক খাব।

নিতাই বিরক্ত হ'য়ে ব'ললে, কি হ'ল তোর আজ! তামাকে পেল দেখ্‌ছি। অত তামাক তো খেতিস্ না কোনদিন। চল্ চল্—ওই তালগাছটার কাছে গিয়ে খাবো।

ভরত গুণ টানতে লাগল। পেছনে ঘুরে দেখল একবার—প্রমীলাকে দেখা গেল না। কিছুক্ষণ পরে আবার ঘুরে দেখ্‌ল—প্রমীলা জানালার ধারে ব'সে আছে।

তালগাছের কাছে এক সময়ে নৌকা এল। ভরত ব'ললে, থাম্ এইবার ভাই নিতাই।

নিতাই বসে' পড়ে ব'ললে, যা—নিয়ে আয় সেজে। ইস্—তুই যে একেবারে ভিজে গিয়েছিস্ রে—ফতুয়াটা খুলে ফেল্ না। ফেঁসে যাবে কাঁধের কাছে।

—ফাঁসবে কেন—নতুন জামা। আঠার আনা নিয়েছিল—জানিস? বাজে জিনিষ নয়।

—কিন্তু গরম লাগছে না তোর!

—গরম লাগবে কেন! ওই যে বাবুরা অত জামা কাপড় পরে আছে—গরম লাগছে নাকি ওঁদের!

—আচ্ছা—যা যা, তামাক খাবি তো খেয়ে নে। সেজে নিয়ে আয় চট্‌পট্‌।

ভরত ব'ললে, তুই যা-না ভাই।

—ব'সে পড়েছি—যা-না বাপু তুই। নিতাই ব'ললে, দেরী হ'চ্ছে—শ্রীনাথ কি রকম কট্‌মট্‌ ক'রে তাকাচ্ছে ছাখ। যা—

—আচ্ছা যাচ্ছি। আমার টেরিটা ঠিক আছে কিনা, ছাখ দিকি একবার।

নিতাই হেসে ব'ললে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। তুই যে ভদ্রলোক হ'য়ে উঠলি-রে। যা যা।—

ভরত মাথার টেরি-কাটা লম্বা লম্বা চুলে সন্তর্পণে হাত বুলাতে বুলাতে চলে গেল। নৌকার কাছাকাছি আসতে চোখাচোখি হ'ল প্রমীলার সঙ্গে—আরও বেশী ঘেমে উঠল ভরত।

তামাক খেয়ে তারা আবার গুণ টেনে চল্‌ল। সন্ধ্যে হ'য়ে গিয়েছে। চাঁদের আলো ঝিক্-ঝিক্ ক'রছে কেনেলের জলে। ভরত পেছন ফিরে ফিরে দেখল বার কয়েক। প্রমীলাকে স্পষ্ট দেখা গেল না—শুধু যেন একটা অস্পষ্ট ছায়ামূর্ত্তি ব'সে আছে জানালার ধারে। কিন্তু সেই দুনিরীক্ষ্য অস্পষ্টতায় যেন সমস্ত দেখতে পেল ভরত—সেই দীর্ঘ প্রশান্ত চোখ, লম্বা সরু আঙুলগুলি আর সুন্দর হাসি।

ভরত গুণ টানতে টানতে ব'ললে, মেয়েটি বেশ সুন্দর—না রে!

নিতাই ভরতের মুখের দিকে তাকাল। হেসে ব'ললে—হ্যাঁ, বেশ সুন্দর।

কিছুক্ষণ পরে ভরত ফের যখন গুণ গুটিয়ে তামাক খেতে এল—তখন শ্রীনাথ আর রাগ চেপে রাখতে পারল না। হাল ছেড়ে দিয়ে নৌকা থেকে ডাঙায় লাফিয়ে পড়ল। ব'ললে, তুই ব'সে ব'সে তামাক খা—পাঁচ শো বার আসতে হবে না।

শ্রীনাথ চটে' গুণ টানতে চলে' গেল। ভরত নীরবে একটি বিড়ি ধরিয়ে হাল ধ'রে ব'সল।

ভারি সুন্দর জ্যোৎস্না-ধোয়া ফুট্‌ফুটে রাত্রি। প্রমীলা আর সুরেন বাইরে বেরিয়ে এসে ব'সল। দু'পাশে কেনেলের উঁচু পাড়ের ওপরে ছোট ছোট বাবলা গাছে অন্ধকার কালো হ'য়ে লেগে আছে, জলের একেবারে কিনারে লম্বা লম্বা জ'লো ঘাস আর কাঁটা গাছ। কেনেলের স্থির শান্ত জলে জ্যোৎস্না ভাঙা কাচের মত ছড়িয়ে পড়েছে লাখ টুকরোয়।

ভরত একধারে চুপ ক'রে ব'সে আছে—পঙ্গু ধরে' আছে হাল।

সুরেন ব'ললে, পঞ্চু হাল ধরতে পারিস্?

—শিখে ফেলেছি বাবু।

—সর্ দিকি—আমি একটু ধরি। সুরেন উঠল।

প্রমীলা ব'ললে, তুমি হাল ধরতে পার?

—কেন পারব না।

সুরেন হাল ধরে' ব'সল। কিছুক্ষণ পরেই নৌকার মাথা বেঁকে তীরমুখো হ'ল, নৌকা ভিড়ল জলের ধারের কাঁটা জঙ্গলের মধ্যে সর্ সর্ ক'রে।

প্রমীলা হেসে ব'ললে বাঃ—বেশ হাল ধরতে পারতো!

সুরেন হাসতে হাসতে হাল ছেড়ে দিয়ে প্রমীলার পাশে এসে ব'সল।

অনেক ক্ষণ ব'সে রইল তারা চুপ চাপ দূরের দিকে তাকিয়ে—প্রমীলার একটি হাত সুরেনের হাতের মধ্যে।

বহু দূরে একটি আলো জ্বলেছে। প্রমীলা ব'ললে, ওটা কিসের আলো বল তো!

—কোন খেয়াঘাটের আলো হবে বোধ হয়।

—আরও কত দূরে যেতে হবে আমাদের?

—কাল সকালে পৌঁছে যাব। কেন—ভাল লাগছে না আর তো?

—খুব ভাল লাগছে। আচ্ছা—এই কেনেলটা তোমাদের বাড়ীর পাশ দিয়ে গিয়েছে!

—না। আমাদের বাড়ী থেকে আধ মাইলখানেক হবে। ওকি—শুয়ে পড়লে কেন?

—দু'হাত অমন ক'রে টেনে নিলে আমি ব'সব কি ক'রে!

প্রমীলা সুরেনের কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ল।

সুরেন প্রমীলার চুলগুলি সব আস্তে আস্তে ছড়িয়ে দিল। সুরেন ব'ললে, একটা গান গাইবে—রবি ঠাকুরের গান। আস্তে গুণ্ গুণ্ ক'রে?

প্রমীলা গুণ্ গুণ্ ক'রে গান ধরল।

ভরত মুগ্ধ হ'য়ে শুনতে লাগল।

গান শেষ হ'ল এক সময়ে। সুন্দর সুকরুণ সুরটি ভরতের কাণে কাণে তখনও ঘুরতে লাগল।

ভরত সুরেনকে জিজ্ঞেস ক'রলে, আপনারা আবার কবে ফিরবেন বাবু?

সুরেন ব'ললে, এই মাসখানেক পরে।

—এই দিক্ দিয়েই ফিরবেন তো?

—নাঃ, এদিকে বড্ড হাঙ্গামা মাঝি। মোটরে গেলে তাড়াতাড়িও যাওয়া যায়—সুবিধেও আছে। তবে এক অসুবিধে এই যে, পাঁচ-শো বার ওঠা-নামা ক'রতে হয়।

—তার চেয়ে নৌকাই ভাল বাবু। ভরত ব'ললে, শুধু ব'সে থাকা। এদিক্ দিয়ে ফিরলে আমার নামে একটু চিঠি লিখে কারুকে গাঙচরের হাটে পাঠিয়ে দেবেন—ঠিক সময়ে নৌকা নিয়ে হাজির থাকব।

সুরেন হেসে ব'ললে, আচ্ছা—সে পরের কথা পরে হবে।

কি জানি, প্রমীলা আর এ পথে ফিরবে কি না! ভরত ভাবতে লাগল।

চাঁদ ঢলে' পড়েছে মাথার ওপর থেকে পশ্চিম দিকে। রাত প্রায় একটা হবে। বনগাঁয়ের মাঝামাঝি এসে নৌকা থামল। শ্রীনাথ গুণের দড়ি গুটিয়ে নৌকায় রাখলে—নোঙর খুল্‌লে। ভরতকে ডেকে ব'ললে শ্রীনাথ, এই—তামাক সেজে নিয়ে আয়। শ্রীনাথ কেনেল-পাড়ের ওপরে উঠে গেল।

সুরেন, প্রমীলা, পঞ্চু—সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। ছোট্ট জানালা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে প্রমীলার মুখে, কতকগুলি চুল এসে পড়েছে গালের ওপরে। ভরত কল্কেয় আগুন তুলতে তুলতে চোখ তুলে তুলে দেখ্‌ল কয়েক বার। তারপর নৌকা থেকে নেমে কেনেলের উঁচু পাড়ের ওপর উঠে গেল।

শ্রীনাথ চাপা-গলায় ব'ললে, সব তো ঘুমোচ্ছে—না?

ভরত শুধু ব'ললে—হুঁ।

নিতাই হেসে ব'ললে, আর জেগে থাকলেই বা কি!

—হ্যাঃ! শ্রীনাথ ব'ললে, তা' হ'লে চল্—উমেশ ওদের খবর দিয়ে আসি। ওরা জন চারেক এলেই হ'ল। আমাদের জন দুইকে বেঁধে ফেলবে—আর একজন পালাবে

বা জলে লাফ দিয়ে পড়বে। কয়েক দণ্ডের মধ্যেই তো সব চুকে যাবে। ওই বাবুটাকে এক ঘা দিলেই তো ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে। মেয়েটা বড় জোর একটু চেঁচাবে। কিন্তু কে-ই বা শুনতে পাবে! কি বল্? এক ক্রোশের মধ্যে কোথাও কিছু নেই।

নিতাই ব'ললে কানে ওগুলো কিসের দুল বল্ দিকিন? বেশ ঝক ঝক্ করে।

—দামিক পাথর-টাথর হবে নিশ্চয়ই। শ্রীনাথ ব'ললে, হাতে চার গাছা ক'রে সোণার চুড়ি আট গাছা—তারপর গলার হারটা—সব শুদ্ধ ভরি বার সোণা হবে। শ্রীনাথ হেসে উঠল—খুসীতে বীভৎস হ'য়ে উঠল তার মুখ। মুখ নেড়ে ব'ললে, এই যুদ্ধের বাজারে কত দাম হবে বল্ দিকিন—হিসেব কর।

নিতাই তাড়া দিয়ে ব'ললে, চল্ তা'হ'লে ওদের খবর দিয়ে আসি।

ভরত ব'ললে, আমি যাব না আর—তোরা যা দু'জনে।

তারপর শ্রীনাথ আর নিতাই মাঠের মধ্যে গিয়ে নামল—টল্‌তে টল্‌তে চলে' গেল—মিশে গেল দূরে। ভরত ফিরে তাকাল নৌকার দিকে। প্রমীলা ঘুমোচ্ছে অনাবৃত কণ্ঠদেশে সরু হারটি ঝিক্-ঝিক্ ক'রছে, গালের কাছে ইয়ারিংয়ের পাথরটা জল্-জল্ ক'রছে জ্যোৎস্নার আলোয়। ঘুমের ঘোরে হাত নাড়ল বুঝি প্রমীলা—চুড়িগুলি বেজে উঠ্‌ল, ভারি মিষ্টি আওয়াজ!

ভরত নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল প্রমীলার জ্যোৎস্না-পড়া মুখের দিকে। অকাতরে ঘুমোচ্ছে প্রমীলা—ভারি অসহায় আর সুন্দর। সুরেন মুখ ঘুরিয়ে ঘুমোচ্ছে—নাক ডাকছে তার।

জানালা দিয়ে হাত বাড়াল ভরত—ঠক্-ঠক্ ক'রে কাঁপছে সে। প্রমীলার এলোমেলো চুলগুলি স্পর্শ ক'রলে সে কম্পিত হাতে, মুখের ওপরে এসে-পড়া চুলগুলি সরিয়ে দেওয়ার লোভ সে ছাড়তে পারল না। হঠাৎ প্রমীলার নাকে লেগে গেল তার আঙুল একটা। ঘুমের ঘোরে সেই হাত জড়িয়ে ধরল প্রমীলা। হাত ধরা রইল প্রমীলার দুটি ঘুমন্ত হাতের মধ্যে। থর্-থর্ ক'রে কাঁপতে লাগল ভরত। প্রমীলা অসহায় হ'য়ে ঘুমোচ্ছে দুটি হাত ধরে'।

ভরত আস্তে আস্তে প্রমীলার অবসন্ন হাতের মুঠি থেকে টেনে নিলে নিজের হাত। পঞ্চুকে ঠ্যালা দিয়ে ডেকে তুল্‌ল। পঞ্চু চোখ ঘষতে ঘষতে উঠে ব'সল।

ভরত তখনও কাঁপছে। ব'ললে সে, হাল ধরতে পারবি?

—হুঁ।

—ধর্—আমি টানতে চ'ললুম।

ভরত গুণ টানতে উঠে গেল। লক্-গেট মাইল তিনেক দূরে। নিতাই ওদের নিয়ে ফিরতে ফিরতে টেনে যেতেই হবে তাকে সেখানে, লোকজনের ঘর-বাড়ী আছে সেখানে, জল-পুলিস আছে। প্রাণপণ বেগে গুণ টানতে লাগল ঝুঁকে ঝুঁকে ভরত। ছুটতে পারলে সে ছুটত এক মাইল—দু'মাইল—তিন মাইল। ভরত টেনে চল্‌ল—একা।

প্রমীলা তখনও ঘুমোচ্ছে।
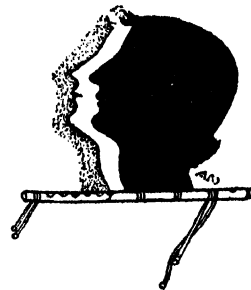
ক্রীড়া-বৈশিষ্ট্য

শ্রীসন্তোষকুমার দে এম.এ., এইচ্. ডিপ্. এড্ (ডবলিন)

খেলাধূলা সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদের আলোচনা বৈশাখ সংখ্যা "প্রবর্ত্তকে" করিয়াছি। তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, খেলাধূলার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সম্বন্ধে কোনও সর্ব্ববাদিসম্মত মতবাদে উপস্থিত হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই আমরা এক নূতন মতবাদের সৃষ্টির চেষ্টা না করিয়া, খেলার কতকগুলি বিশেষত্ব বা চিহ্ন, যেগুলি সকলেই মানিয়া লইতে চাহিবেন, সেইগুলি বাহির করিবার চেষ্টা করিব:

১। প্রথম ও প্রধান লক্ষণ হইল স্বতঃপ্রবৃত্তি (spontaneity)। খেলায় প্রবৃত্তি আপনা হইতেই আসিবে—ইহার মধ্যে জোরজবরদস্তি নাই।

২। আত্মবিস্মৃতি। খেলিতে খেলিতে যখন আপনাকে বিস্মৃত হইয়া যাইবে, তখনি বুঝিতে হইবে খেলাটি ঠিকমত জমিয়াছে।

৩। আনন্দ। খেলার একটি বড় লক্ষণ। আনন্দ না থাকিলে, খেলা আর বেগারখাটার মধ্যে কোন প্রভেদ থাকে না।

৪। প্রতিদ্বন্দ্বিতা। নিছক খেলাগুলিতে (pure play) প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে না বটে; কিন্তু শৃঙ্খলাবদ্ধ খেলাগুলিতে সকল সময়ে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে।

৫। স্বাধীনতা। এটিও একটি বিশেষ লক্ষণ। কাজের মধ্যে স্বাধীনতা না থাকিতে পারে বটে; কিন্তু খেলার মধ্যে স্বাধীনতা থাকিতে হইবে।

কর্ম্ম বনাম ক্রীড়া

অনেক মনোবিজ্ঞানবিদ্ কর্ম্ম ও ক্রীড়ার মধ্যে কোন পার্থক্য দেখিতে পান না; বাস্তবিকই এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য খুব বেশী নাই। অধ্যাপক ডিউই এক স্থলে বলিয়াছেন:

"Play and work correspond, point for point, with the traits of the initial stage of knowing, which consists in learning how to do things and in acquaintance with things and process gained in the doing."*

কর্ম্ম ও ক্রীড়া, দুইটাই একই উদ্দেশ্যের দ্বারা চালিত; তবে ক্রীড়ার উদ্দেশ্য ক্রীড়াই এবং তাহার লক্ষ্য বর্ত্তমানের প্রতি এবং প্রত্যক্ষ। কর্ম্মও উদ্দেশ্যের দ্বারা চালিত হয় বটে, কিন্তু এই উদ্দেশ্য অপ্রত্যক্ষ এবং দূর ভবিষ্যতের প্রতি ইহার লক্ষ্য। ক্রীড়ার উদ্দেশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা, শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার চেষ্টা; কর্ম্মের মধ্যেও এই উদ্দেশ্যগুলি আছে, উপরন্তু আছে ভবিষ্যৎ লাভের অর্থাৎ অর্থপ্রাপ্তির আশা এবং সব চেয়ে বড় পার্থক্য হইতেছে খেলার মধ্যে আছে স্বাধীনতা, কাজের মধ্যে আছে এই স্বাধীনতার অভাব। মোটের উপর, খেলা ও কাজের মধ্যে প্রভেদ অতি সূক্ষ্ম। স্বাধীনতার অভাব যখন অতিমাত্রায় হয়, তখন তাকে আর কাজ বলা যায় না। তাকে বলা চলে মজুরী (Drudgery)। এই drudgery আর খেলার মাঝামাঝি জিনিসটাই হইল কাজ—ইহাই মনে হয় কাজের খুব উপযুক্ত সংজ্ঞা, তা' ছাড়াও কাজের মধ্যে কল্পনা ও আবেশের (emotion) স্থান অল্পই—কাজ যেন অনেকটা mechanical, ভাবিবার চিন্তিবার বড় বেশী স্থান নাই; যেমন নির্দ্দিষ্ট আছে, তেমনি ভাবেই করিতে হইবে—নূতনত্বের আশা নাই। ড্রাজারি জিনিষটা অবশ্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যে কাজে আনন্দ নাই, যে কাজে মন বসে না, আস্থা নাই, শুধু শাস্তি এড়াইবার জন্যই যা' করিতে হয়, কিংবা অনিচ্ছা সত্ত্বেও শুধু অর্থের লোভেই করিতে হয়, তাহাই drudgery। খেলার মধ্যে যখন বাহিরের চাপ, লাভের বা লোভের আশা আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন খেলার পবিত্রতা নষ্ট হইয়া যায়, তখন যে খেলা হয়, সেটাকে ঠিক খেলা বলা চলে না—সেটা হয় একটা ড্রাজারি। সেই জন্যই প্রশ্ন উঠে ভাড়াটে খেলোয়াড়েরা প্রকৃত ভাবে খেলিতে পারেন কি না? উপরে খেলার যতগুলি লক্ষণ দেওয়া হইল, তাহার সহিত মিলাইলে স্পষ্টই জানা যায়, ভাড়াটে খেলোয়াড়রা সত্যকারের খেলা খেলিতে পারেন না—খেলা সম্ভব নয়। তাঁরা খেলার ভাণ করেন মাত্র, খেলার যা' আনন্দ, তা' হইতে তাঁরা বঞ্চিত; এক কথায় খেলা তাঁদের কাছে একটা ড্রাজারি।

* Play and Work in the curriculum.

খেলা ও আর্ট

কাজের মধ্যে যখন বাহিরের চাপ বা অনিচ্ছা আসিয়া পড়ে, তখন তাহা কাজ না হইয়া যেমন drudgeryতে পরিণত হয়, তেমনি কাজের মধ্যে যখন আনন্দের প্রাচুর্য্য আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাহা আর্টে পরিণত হয়। সকল শিল্পের মূল ইহাই। কুম্ভকার প্রথম কলসী কি পানপাত্রটি করিয়াছিল নিছক কর্ম্মের তাগিদে, প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধির আশায়; কিন্তু অবসর-প্রাচুর্য্যে রসোদ্বেলিত হৃদয়ে যখন সেই কলসী বা পানপাত্রের উপর রঙের ইন্দ্রধনু রচনা করিল, বা ফুলপাতা, নক্সা ফুটাইয়া তুলিয়া তাহাতে সুন্দরের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিল, তখন তাহা হইল আর্ট। ইহাতে তাহার লাভের বা লোভের আশা নাই, কর্ম্মের ব্যস্ততা নাই, শুধু আছে আনন্দের আতিশয্য। সর্ব্ব প্রকার চারু ও কারু-শিল্পের জন্ম এই খেলার আভাসে।

খেলা ও শিক্ষা

কাজ ও খেলার সহিত শিক্ষার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ট। এই জন্যই শিক্ষা-বিশারদেরা অনেক কাজকে (অবশ্য এগুলিকে কাজ না বলিয়া খেলাও বলা চলে) স্কুল-পাঠশালার পাঠের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। কাগজ, কার্ডবোর্ড, কাঠ, চামড়া, কাপড়, সুতা, কাদা, মাটি, বালি, লোহা, তামা, প্রভৃতি নানাবিধ ধাতু পদার্থ লইয়া খেলা। ছাত্রদের এই সব লইয়া ভাঁজ করিতে হয়, সাইজ করিয়া কাটিতে হয়, মাজিতে হয়, কোন কিছু গঠন করিতে হয় বা কোন একটা মডেল তৈয়ার করিতে হয়, ধাতুদ্রব্য লইয়া গালাইতে হয় বা ঠাণ্ডা করিতে হয়। ইহা ছাড়াও বাগান তৈরী করা, রন্ধন করা, সেলাই করা, বই বাঁধান, ছবি আঁকা প্রভৃতি নানান্ কাজ খেলা মধ্য দিয়াই শিক্ষা দেওয়া হয়। নিছক লেখাপড়া, অর্থাৎ ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, অঙ্ক, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য প্রভৃতি যা স্কুল কলেজে বহুদিন হইতেই পঠনপাঠন হইয়া আসিতেছে, সেগুলিও খেলার সাহায্যে যে কত মনোরম ও সহজভাবে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, তাহা প্রাচীনপন্থী শিক্ষাবিশারদেরা ধারণাই করিতে পারেন নাই। ইহার আভাস প্রথম দিয়া যান জঁ্যা জ্যাক্স্ রুসো। তারপর এই কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করিবার চেষ্টা করেন ফ্রোবেল। পরে এই ছায়াকে মূর্ত্তিপ্রদান করেন ম্যাডাম মণ্টেসরি। তাঁহার পদ্ধতি অনুসারে বালক-বালিকাদের যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তার মধ্যে না আছে বেত্রদণ্ডের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, না আছে পুরস্কার বা তিরস্কার। ছাত্র-ছাত্রীরা যেন সব খেলোয়াড়, আর শিক্ষয়িত্রী যেন শুধু দর্শক। কোন মণ্টেসরি স্কুলে প্রবেশ করিলে, মনে হইবে না কোন বিদ্যায়তনে আসিয়াছি, মনে হইবে যেন এক ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে আসিয়াছি, আর শিশুরা সব পুস্তক-পুস্তিকার পরিবর্ত্তে didactic apparatus, Sensory Gymnastics লইয়া খেলিতেছে। এই সব খেলার মধ্যে শিশুরা যা কিছু শিক্ষণীয় সবই অতি শীঘ্র ও সহজে শিখিতেছে।* Prof. Armstrong এই খেলার ছলেই ছাত্রদের বিজ্ঞানের দুরূহ বিষয়গুলি অতি সুন্দরভাবে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁর এই পদ্ধতির নাম Heurestic method। কল্ডওয়েল কুক তাঁহার পুস্তকে † কেম্ব্রিজ পার্স স্কুলের ছোট ছোট ছাত্রদের কিরূপে খেলার ছলে সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখিতে, নাটক অভিনয় করিতে, গল্প লিখিতে, তর্ক করিতে শিখান যায়, তাহা দেখাইয়াছেন। খেলার ছলে শিক্ষা দিবার আর একটি পদ্ধতি আছে। ইহার নাম Project method। ‡ এই পদ্ধতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন সমস্যাগুলিকে স্বাভাবিকভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা আছে। মিস্ হেলেন পার্কহর্স্ট প্রবর্ত্তিত ডলটন প্ল্যানে এই খেলার অভিনয়ে সমস্ত পাঠ্যবিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে।

নৈতিক কর্ম্মেও খেলার প্রভাব বড় কম নয়। সমস্ত ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিয়া যোগাসনে বসিয়া যে নৈতিক সাধনা করিতে হয়, তাহা কখনই সর্ব্বজনপ্রিয় হইতে পারে না।

* The Advanced Montessori Method Vol. II. by M. Montessorie.

† The Play Way—Mr. H. Coldwell Cook.

‡ The Project Method of Teaching—J. A. Stevenson.

নৈতিক সাধনার মধ্যেও থাকিবে এই খেলার আনন্দ ও উৎসাহ।

> ইন্দ্রিয়ের দ্বার—
> রুদ্ধ করি' যোগাসনে, সে নহে আমার।
> যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে, গন্ধে, গানে,
> তোমারি আনন্দ র'বে তা'র মাঝখানে।

খেলাধূলার সামাজিক প্রভাবের কথা উল্লেখ না করিলেও চলিতে পারে। চরিত্রগঠন, নেতৃত্বগ্রহণ, সহযোগিতা, দলের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ, জয়-পরাজয় সমভাবে গ্রহণ করিতে শিখা, সাধুতা, উদারতা প্রভৃতি বহু গুণ এই খেলার মধ্যেই শিক্ষা করা যায়।

এইরূপে জীবনের প্রতি কার্য্যে খেলার অভাব দৃষ্ট হয়; কাজেই খেলাকে তুচ্ছ বলিয়া ভাবিবার কোন কারণ নাই। শিশুর জীবনে খেলা যে কত প্রয়োজনীয়, তা' রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনবদ্য ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন।

"সৃষ্টির মূলে এই লীলা—নিরন্তর এই রূপের প্রকাশ। সেই প্রকাশের অহৈতুক আনন্দে যখন যোগ দিতে পারি, তখন সৃষ্টির মূল আনন্দে গিয়ে মন পৌঁছায়। সেই মূল আনন্দ আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত, কারও কাছে তার জবাবদিহি নেই।"

"ছোট ছেলে ধুলোমাটি, কাঠিকুটো নিয়ে সারাবেলা ব'সে ব'সে একটা কিছু গড়ছে। বৈজ্ঞানিকের মোটা কৈফিয়ৎ হ'চ্ছে এই—যে গড়্‌বার শক্তি তার জীবনযাত্রার সহায়, সেই শক্তির চালনা চাই। এ কৈফিয়ৎ স্বীকার ক'রে নিলুম; তবুও কথাটা মূলের দিকে অনেকখানি বাকি থাকে। গোড়াকার কথা হচ্ছে এই যে, তার সৃষ্টিকর্ত্তা মন বলে 'হোক'। সেই বাণীকে বহন করে' ধুলোমাটি, কুটোকাঠি সকলেই ব'লে ওঠে—'এই দেখ হ'য়েছে'। এই হওয়ার অনেকখানিই আছে শিশুর কল্পনায়। সাম্‌নে যখন তার একটা ঢিবি, তখন কল্পনা বল্‌ছে—'এই ত আমার রূপকথার রাজপুত্রের কেল্লা! তার ঐ ধূলোর স্তূপের ইশারার ভিতর দিয়ে শিশু সেই কেল্লার সত্তা মনে স্পষ্ট অনুভব কর্‌ছে। এই অনুভূতিতেই তার আনন্দ। গড়্‌বার শক্তিকে প্রকাশ কর্‌ছি ব'লে আনন্দ নয়, কেন না সে শক্তি এ ক্ষেত্রে বিশেষ প্রকাশ পাচ্ছে না; একটি রূপ-বিশেষকে চিত্তে স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি ব'লে আনন্দ। সেই রূপটাকে শেষ লক্ষ্য ক'রে দেখাই হ'চ্ছে সৃষ্টিকে দেখা, তার আনন্দই সৃষ্টির মূল আনন্দ"।*

শিশুকে ভালবাসিতে হইলে, বুঝিতে হইলে শিশুর খেলাকেও বুঝিতে হইবে। কবি শিশুকে বুঝিতে পারেন, তাই বলিয়াছেন:—

> শুধু শিশু বোঝে মোরে, আমারে সে জানে ছুটি ব'লে,
> ঘর ছেড়ে আসি তাই চ'লে।
> নিষেধ বা অনুমতি মোর মাঝে না দেয় পাহারা,
> আবশ্যকে নাহি রচে বিবিধের বস্তুময় কারা,
> বিধাতার মত শিশু লীলা দিয়ে শূন্য দেয় ভ'রে,
> শিশু বোঝে মোরে। —পূরবী, পথ

এইবার যে সমস্ত ছাত্র প্রতিভাশালী, দেশ ও সমাজের যাহারা ভবিষ্যৎ আশার স্থল, সেই সমস্ত ছাত্র কি ভাবে খেলাধূলায় সময় অতিবাহিত করে, খেলায় তাহাদের বৈশিষ্ট্য কি, সেই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের সমাপ্তি করিব।

আমেরিকার ষ্টানফোর্ড ইউনিভারসিটির কর্ত্তৃপক্ষ বহু সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে প্রতিভাশালী শিশুদের সম্বন্ধে যে গবেষণা চালাইয়াছিলেন, সেই গবেষণার ফল কয়েক বৎসর হইল পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছে। এই পুস্তকে প্রতিভাশালী শিশুদের খেলাধূলা সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা জানা যাইতেছে। সেই নূতন কথাগুলি একে একে এই স্থলে উল্লেখ করিতেছি। ৯০টি বিভিন্ন প্রকারের খেলা লইয়া এই সব প্রতিভাশালী ছাত্র-ছাত্রীদের উপর পরীক্ষা করা হইয়াছিল এবং পরীক্ষাতে Reliability co-efficient বাহির করিয়া এ সম্বন্ধে সন্দেহ বহু পরিমাণে দূর করা হইয়াছিল। সাধারণ লোকের ধারণা—বুদ্ধিমান ছাত্রেরা খেলাধূলা বেশী পছন্দ করে না; কেবল পড়াশুনা করিতেই ভালবাসে। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। অনেক সময়ে তাহারা খেলায় বেশী সময় অতিবাহিত করে না বটে, কিন্তু তাহা তাহাদের খেলাধূলার প্রতি বিতৃষ্ণার জন্য নহে, খেলাধূলা ছাড়াও আরও অনেক বিষয়ে তারা মন দেয়,

* পশ্চিমযাত্রীর ডায়রী।

সেই জন্যই খেলায় যতটা মন দেওয়া উচিত, ততটা মন দিতে তারা অনেক সময়ে পারে না। একজন নয় বৎসরের প্রতিভাবান্ বালক বা বালিকার বার বৎসর বয়সের সাধারণ বুদ্ধিবিশিষ্ট বালক বা বালিকাপেক্ষা খেলাধূলা সম্বন্ধে ধারণা অনেক বেশী। প্রতিভাশালী বালকবালিকাদের খেলাধূলা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশেষত্ব দেখা যায়।

১। তাহারা পুরুষোচিত খেলাই অধিক ভালবাসে।

২। সাধারণ বালকবালিকাপেক্ষা নির্জ্জনে বা একলা একলা খেলিতে অধিক ভালবাসে।

৩। নিজেদের বয়স অপেক্ষা অধিক বয়সের বালকবালিকাদের সহিত খেলিতে চাহে।

৪। স্বজাতির সহিত অর্থাৎ বালক বালকের সহিত এবং বালিকা বালিকার সহিত খেলিতে ভালবাসে; কিন্তু সাধারণ বালকবালিকাদের মধ্যে ভিন্ন জাতির সহিত অর্থাৎ বালক বালিকার সহিত এবং বালিকা বালকের সহিত খেলিবার আগ্রহ বেশী প্রকাশ করিয়া থাকে।

৫। তীক্ষ্ণবুদ্ধি বালকবালিকারা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলায় যোগদান করিতে কম চাহে।

খেলা-ধূলা সম্বন্ধে এত আলোচনার পর একথা নিশ্চয়ই জোর করিয়া বলা চলে যে, খেলা-ধূলাকে আর অবজ্ঞার চক্ষে দেখা উচিত নয় এবং য়ুরোপ, আমেরিকায় যেভাবে এই সব বিষয়ে গবেষণা চলিতেছে, আমাদের দেশেও সেই ভাবের গবেষণা আরম্ভ করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের দেশের শিক্ষাব্রতীরা দেশীয় খেলাগুলির ফিরিস্তি সংগ্রহ করিয়া, সেগুলি যে সমস্ত বালকবালিকাদের সাধারণ বালকবালিকা অপেক্ষা বুদ্ধিবৃত্তিতে বহুগুণে উচ্চশ্রেণীর বলিয়া মনে হইবে, তাহাদের উপর পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। অবশ্য এই কাজ বলা যত সহজ, কার্য্যে পরিণত করা তত সহজ নহে। অনেক বাধাবিপত্তি আছে। বুদ্ধিমান্ শিশুদের বাছিয়া লওয়াই একটা অতি দুরূহ কার্য্য, তারপর তাহাদের খেলাধূলা সম্বন্ধে পছন্দ-অপছন্দ পরীক্ষা করা আরও শক্ত। ইহা বহু সময় ও অর্থসাপেক্ষ এবং ব্যক্তিবিশেষের পক্ষেও এই কার্য্য সম্ভবপর নহে; তবে এইটুকু বলা যায়, চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই এবং সেই জন্যই ভরসা রাখি, আমাদের দেশেও এ সম্বন্ধে গবেষণা একদিন আরম্ভ হইবে। সেই অনাগত দিনের আসার আশায় বসিয়া রহিলাম।

রাতের বাতাস গর্জন করে

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

(জীবিত জার্ম্মাণ কবি Karl Gustave Vollmoeller হইতে)

রাতের বাতাস গান গেয়ে যায় মর্ম্মর তুলে' বেণু বনে;
হ্রদের পার্শ্বে দুলে দুলে ওঠে মিঠা কুসুমের লতানো ঝাড়;
আমি রাত জাগি—শিলা পৈঠায়, কোথা তুমি হায় এই ক্ষণে?
চুপ করে' এস···কেউ জান্‌বে না···সাম্‌নে তো তব সিংহদ্বার।

রাতের বাতাস গান গেয়ে যায় মর্ম্মর তুলে বেণু-বনে;
রাতের বাতাস ঝাঁট দেয় বন, নায়ে এসে করে কাণাকাণি:
স্তব্ধ এ হ্রদ—আমারে লুকাও তুলে' তব শ্বেত বাহুখানি;
তপ্ত ও তাজা শুভ্র বুকেতে চেপে ধরো মোরে নিরজনে।
কিবা উজ্জ্বল লাল তব ঠোঁট, কি যে চারু তব গ্রীবা রাণী···
রাতের বাতাসে ঝাঁট দেয় বন, নায়ে এসে করে কাণাকাণি!

খিন্ন হিমেল রাতের বাতাস কেঁপে কেঁপে যায় শর-বনে:
শোনো ডাকে ওই ভোরের পাখী যে···বৃথা হল' ভূমানন্দ তো!
তুমি কাঁদো নাকি?···করুণ কান্না···আমিও হারানু ছন্দ তো!
দুয়ার বন্ধ! চাঁদ রোষান্ধ যায়, সখি ছিল এই মনে!
রাতের বাতাস গর্জন করে, কম্পন হানে শর-বনে!

ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমশঃই গুরুতর রূপ ধারণ করিতেছে। কৃষির বিপুলতা এবং শিল্পের স্বল্পতা-প্রযুক্ত অসমঞ্জস পরিস্থিতি ভারতের অর্থনৈতিক সংগঠনের দুর্ব্বলতম অংশ। বর্ত্তমান মহাবিপ্লবের পূর্ব্বে এই দুর্ব্বলতা সম্যক্ পরিস্ফুট হয় নাই। উদ্বৃত্ত কৃষি বা পণ্যের কাট্‌তির উপায়ই এখন বিষম সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। যুদ্ধ হেতু সমস্ত মহাদেশিক (Continental) য়ুরোপের বাজার রুদ্ধ হওয়ার ফলে আমাদের রপ্তানী বাণিজ্য বিষম ক্ষতি-গ্রস্ত হইয়াছে। মালচালানী জাহাজে স্থানাভাব এবং মুদ্রাবিনিময়ের কঠোর শাসনবশতঃ ভারতের পক্ষে এখনও উন্মুক্ত দেশসমূহে রপ্তানী খর্ব্বীকৃত হইয়াছে। বিপত্তি আরও গুরুতর হইয়াছে এই জন্য যে, কেবলমাত্র ভারতের রপ্তানী রুদ্ধ হয় নাই। রপ্তানী-ক্ষেত্রে যে সকল দেশ আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী, তাহাদেরও রপ্তানী সীমাবদ্ধ হইয়াছে। ফলে, বর্ত্তমানের স্বল্প-পরিসর আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে, উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা অধিকতর প্রচণ্ড হইয়াছে। বিক্রয়ের ক্ষেত্র সংরুদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ হওয়াতে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন পণ্য স্তূপীকৃত হইতেছে এবং এরূপ অবস্থায় যাহা অবশ্যম্ভাবী, সেই মূল্যহ্রাস ঘটিতেছে। শ্রমজাত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে না পারিয়া, প্রাথমিক উৎপাদকেরা বিষম অর্থক্লেশ অনুভব করিতেছে। ফলতঃ অর্থনৈতিক অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। এই ক্ষতিপূরণের যে একমাত্র উপায়—শিল্প-পরিবর্দ্ধন, তাহারও কোন আশাপ্রদ ব্যবস্থা এতাবৎ কাল অবলম্বিত হয় নাই। যুদ্ধারম্ভে শিল্পসমুন্নয়ন ও পরিবর্দ্ধনের যে আশা আমাদের মনে জাগিয়াছিল—তাহা অঙ্কুরে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। ভবিষ্যৎ অবস্থা সংশয় ও সঙ্কট-সঙ্কুল।

সুখের বিষয়, এই সংশয় ও সঙ্কটাপন্ন ভবিষ্যতের অবশ্যম্ভাবী ভবিতব্যতা সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় শাসন-তন্ত্র অবহিত হইয়াছেন। রপ্তানী বাণিজ্যের উপদেষ্টা সমিতির (Export Advisory Council) গত পূর্ব্ব এবং গত অধিবেশনে রপ্তানী-রুদ্ধ উদ্বৃত্ত প্রাথমিক পণ্যের বিক্রয় ও ব্যবহার-বিধি সম্বন্ধে গভীর আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু কোন যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় নাই। একমাত্র পাট ব্যতীত অন্য কোন প্রাথমিক উৎপন্ন পণ্য সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থাই অনুষ্ঠিত হয় নাই। যে সকল পণ্যে সরকার মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন—সে সকল ক্ষেত্রে রপ্তানীকারক নির্দ্ধারিত মূল্যে পণ্য বিক্রয় করিতেছে। কিন্তু মজুত মালের পরিমাণাধিক্য হেতু, উৎপাদকগণের শীঘ্র বিক্রয় করিবার আকুল আগ্রহের সুযোগ লইয়া তাহারা তদপেক্ষা অনেক কম মূল্যে মাল সংগ্রহ করিতেছে। ফলে, প্রাথমিক উৎপাদকেরা "যে তিমিরে, সেই তিমিরে।"

এই প্রসঙ্গে কিছুদিন পূর্ব্বে যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরিত মীক্-গ্রেগরী অভিযানের বিবৃতিরও আলোচনা হয়। য়ুরোপের বাজার-বিচ্যুত রপ্তানী বাণিজ্যের বিপণি-সংগ্রহার্থ বাণিজ্য-বার্ত্তাবিভাগের পরিচালক স্যার ডেভিড মীক ও কেন্দ্রীয় শাসন-তন্ত্রের অর্থ-নৈতিক উপদেষ্টা ডাক্তার টি, ই, গ্রেগরী যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরিত হইয়াছিলেন। য়ুরোপের বাজার-বিচ্যুতির ফলে, আমাদের রপ্তানী বাণিজ্যের ক্ষতির পরিমাণ ত্রিশ কোটী টাকা। কিন্তু এই অভিযানের বিবৃতির সদ্য প্রকাশিত অতি-সংক্ষিপ্ত সরকারী বিবরণ হইতে আমরা অদূর ভবিষ্যতে ফলপ্রসূ কোন আশার আলোকের সন্ধান মাত্রও পাই নাই।

পাট-প্রস্তুত দ্রব্যাদি, কাঁচা পশম, কাঁচা চামড়া, অভ্র, কফি, চা, লাক্ষা, নারিকেলের ছোবড়া দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যাদি, হরিতকি, কাজু বাদাম প্রভৃতি কয়েকটি পণ্যের যৎকিঞ্চিৎ রপ্তানীর আশা আছে বটে ; কিন্তু অন্যান্য বহু পণ্যের বিপণি সেখানে দুর্লভ। কারণ, শেষোক্ত শ্রেণীর পণ্যের অধিকাংশই ফিলিপাইন দ্বীপ ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশসমূহ হইতে সহজে এবং সুলভে প্রাপ্তব্য। অধিকন্তু, উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান যুদ্ধাস্ত্র-প্রস্তুতি-ব্যয়বাহুল্য হেতু ঐ সকল শিল্পপরিচালনোপযোগী সামগ্রীসম্ভারে তাহাদের

অধিকাংশ অর্থ নিয়োজিত হইতেছে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের নিকট অধিক কিছু আশা ভারত পোষণ করিতে পারে না। এ গেল কাঁচা মালের (Raw materials) কথা। পাকা মাল, অর্থাৎ পরিণত দ্রব্য (Manufactured goods) সম্বন্ধে, মীক-গ্রেগরীর বিবৃতি অধিকতর আশাপ্রদ। জাপানের প্রতি ক্রমবর্দ্ধমান বিদ্বেষবশতঃ ভারতে প্রস্তুত পরিণত দ্রব্যের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের আসক্তি বাড়িতেছে। আশার ক্ষীণ আলোক!

কিন্তু কৃষিপ্রধান ভারতের কৃষিজ পণ্যই প্রচুর। এই বিপুল পণ্যভারের সম্পূর্ণ ও সম্যক্ সদ্ব্যবহার আমাদের দেশে এখনও সম্ভব নয়, কখন সম্ভব হইবে কি না, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে লীন। এই সকল প্রাথমিক পণ্যের উদ্বৃত্ত-বিক্রয়ের আশু ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব আফ্রিকা, সিংহল ও অন্যান্য সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশসমূহের সহিতই এখন আমাদের আদান-প্রদানের সম্পর্ক ব্যাপক, বিস্তৃত ও দৃঢ় করিতে হইবে। প্রাচ্য গুচ্ছের (Eastern Group Conference) অধিবেশনের পূর্ব্বে আমাদের বাণিজ্য-সচিব বলিয়াছিলেন যে, তিনি সাম্রাজ্যান্তর্গত প্রাচ্য দেশসমূহ হইতে আগত প্রতিনিধিবর্গের সহিত ঐ সকল দেশে আমাদের উভয়বিধ বাণিজ্য-বিস্তারের পন্থাবিষ্কার-সূচক আলাপ-আলোচনা পরিচালনা করিবেন। য়ুরোপের বাজার বন্ধ হওয়ার ফলে, ঐ সকল দেশের আমদানী বাণিজ্যের সঙ্কোচ ঘটিয়াছে; সুতরাং ঐ সকল দেশের সহিত আমাদের রপ্তানী বাণিজ্য-বিস্তারের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এরূপ আলাপ-আলোচনায় কোন আভাষ আজ পর্য্যন্ত পাই নাই। রপ্তানী বাণিজ্যের উপদেষ্টা সমিতির গত অধিবেশনে, এই সকল দেশে বাণিজ্যতদ্বিরকারক আমীন (Trade Commissioners) নিয়োগের আলোচনা হইয়াছিল।

যখন যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের প্রাথমিক পণ্যের আশানুরূপ বিপণি পাওয়া সম্ভব নয়, তখন আফ্রিকা, মিশর, সোমালিল্যাণ্ড, ফেডারেটেড্ মালয়া স্টেট্‌স্, ইন্দো-চীন, থাইল্যাণ্ড (শ্যাম), ফিলিপাইন্‌স্, পূর্ব্ব দ্বীপপুঞ্জ এবং অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে ঐ সকল দ্রব্যের কাটতি কি পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে পারা যায় এবং তাহার প্রকৃষ্ট উপায়ই বা কি, তাহার আশু দৃঢ় অনুসন্ধান প্রয়োজনীয়। অভিজ্ঞ এবং উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা যেমন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারের রুচি ও চাহিদার অনুকল্পে আমাদের দেশের কৃষিজ পণ্য-বিক্রয়-সম্ভাবনা যথাসম্ভব অনুসন্ধান করা হইয়াছে, উপর্য্যুক্ত দেশসমূহেও সেইরূপ অনুসন্ধান-আলোচনা অত্যাবশ্যক। যুক্তরাষ্ট্রে যে সকল মাল কাটতি হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহাদের অনেকাংশ এই সকল দেশ লইতে পারে। কারণ, য়ুরোপের বাজার বন্ধ হইয়া তাহাদেরও অনেক জিনিষের অভাব-অনটন বাড়িতেছে। প্রাথমিক অনুসন্ধানের ফল আশানুরূপ হইলে, ঐ সকল দেশে বাণিজ্যতদ্বিরকারক আমীন নিয়োগ এবং বাণিজ্য চুক্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

অনেকেই আশা করিয়াছিলেন যে, রপ্তানী-বাণিজ্য উপদেষ্টা সমিতির গত অধিবেশনে, আমরা এইরূপ প্রচেষ্টা এবং প্রাচ্যগুচ্ছের প্রতিনিধিবর্গের সহিত বাণিজ্য-বিস্তার-সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনার সুফল সম্বন্ধে কিছু আশার বাণী শুনিতে পাইব। কিন্তু সে আশা অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে।

ব্রহ্মদেশের প্রতিনিধিদের সহিত ভারত-সরকারের প্রতিনিধিগণের বাণিজ্য-চুক্তি ব্যপদেশে আলাপ-আলোচনা শেষ হইয়াছে। শিল্প-বাণিজ্যের বর্ত্তমান পরিস্থিতি নূতন চুক্তির পক্ষে অনুকূল কি না, সে বিষয়ে গভীর সন্দেহের উদয় হয়। যাহা হউক, এরূপ চুক্তিতে বাঙ্গালার তণ্ডুলোৎপাদকদিগের স্বার্থ যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকা কর্ত্তব্য।

প্রাথমিক-পণ্য-রপ্তানী-বাণিজ্যের,-নূতন নূতন ক্ষেত্রে বিস্তারপ্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে, আমাদের নিজেদের দেশে ঐ সকল কাঁচা মালের অধিকতর ব্যবহার দ্বারা যাহাতে আমরা তাহাদের অধিকাংশ পরিণত পণ্যে রূপান্তরিত করিয়া স্বদেশের প্রয়োজন সাধনপূর্ব্বক বিদেশে কিছু কিছু রপ্তানী করিতে পারি, তাহারই ঐকান্তিক চেষ্টা বর্ত্তমান জটিল সমস্যার একমাত্র প্রতিকার। সেই উদ্দেশ্য-সাধনার্থ নূতন নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা, পুরাতনের প্রসার এবং মুমূর্ষুর পুনরুজ্জীবন প্রয়োজনীয়। তজ্জন্য ব্যাপক ও বিভিন্নমুখী পরিকল্পনা আবশ্যক। সরকারী সক্রিয় সাহায্য

এবং সহৃদয় সহানুভূতি ব্যতীত গুরু লঘু উভয়বিধ শিল্পে, কোন ব্যাপক ও স্থায়ী পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করা সম্ভব নহে; কিন্তু সরকারের ভাবী অনুকম্পার আশার বাণী ব্যতীত, যুদ্ধশিল্প ব্যতিরেকে অন্য কোন স্থায়ী কল্যাণকামী শিল্পের সমুন্নয়ন অথবা প্রতিষ্ঠা হেতু কোন আশাপ্রদ উৎসাহের একান্ত অভাব।

যুদ্ধারম্ভে যে সকল আদিম ও মৌলিক এবং নূতন নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল, রাজনৈতিক পরিস্থিতির অনিশ্চয়তা এবং সরকারী ঔদাস্যের ফলে তাহা ঘটে নাই। যুদ্ধারম্ভেই একটি সুদৃঢ় ও সুপুষ্ট অর্থনৈতিক নীতি অবলম্বনপূর্ব্বক, বিবিধ বিভিন্নমুখী শিল্প-পরিকল্পনা দ্বারা শিল্পসমুন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও সম্বর্দ্ধনের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করা অতীব কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু সে পক্ষে কোন প্রচেষ্টাই পরিলক্ষিত হয় নাই। উদাহরণস্বরূপ আমরা তিনটি আদিম ও মৌলিক শিল্পের উল্লেখ করিতে পারি। বিমান, অর্ণবপোত এবং হাওয়াগাড়ীর নিম্মাণার্থ কোন প্রযত্ন প্রকট হয় নাই। অধিকন্তু, বে-সরকারী পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টাকে যথাযোগ্য উৎসাহ এবং অনুকম্পা প্রদর্শনপূর্ব্বক পুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইবার সুযোগ ও সুবিধা দিতেও সরকারের কৃপণতা ও কৃচ্ছ্রতা প্রচুর। সম্প্রতি প্রাচ্য গুচ্ছের (Eastern group) দিল্লী বৈঠক ও ব্রিটিশ যোগান মন্ত্রী কর্ত্তৃক প্রেরিত রোজার অভিযানের রীতি-নীতি ও মতিগতি দেখিয়া মনে হয় যে, সাম্রাজ্যান্তর্গত প্রাচ্যদেশসমূহের একযোগে ক্ষিপ্রতার সহিত যুদ্ধসম্ভার সংগ্রহ করিবার অজুহাতে আদিম ও মৌলিক স্তর-শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা প্রতিহত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

যুদ্ধারম্ভেই ভারতে এই সকল শিল্পের প্রবর্ত্তন ও প্রতিষ্ঠার সুস্পষ্ট পরিকল্পনা কর্ত্তৃপক্ষের গোচরে আনা হইয়াছিল; কিন্তু সক্রিয় সাহায্য অথবা সহানুভূতি দূরে থাকুক, প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতার নির্ভরযোগ্য ইঙ্গিত মাত্রও লাভ করা যায় নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সরকারের নিজ প্রয়োজনসাধনোপযুক্ত ভিত্তিতে, হাওয়া-গাড়ীনিম্মাণ কারখানার একটি সুচিন্তিত ও সুসম্বদ্ধ পরিকল্পনা বিশ বৎসর পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ রাজস্ব তদন্ত সমিতির (Fiscal Commission) বিধি-বিধানের অজুহাতে অগ্রাহ্য হইয়া যায়। গত আগষ্ট মাসে সরকার ভারতীয় সেনা-বাহিনীর নিমিত্ত বিশ হইতে ত্রিশ হাজার হাওয়াগাড়ীর জন্য দুইটি আমেরিকান কারখানার সহিত চুক্তিবদ্ধ হন। তাহার পরে আরও ত্রিশ হাজার গাড়ীর চুক্তি হইয়াছে। এই সকল চুক্তির একুণ মূল্য ২৪ কোটী টাকা। এই অর্থানুকুল্যে ভারতে হাওয়াগাড়ী নির্ম্মাণ-শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত। আদিম চুক্তি দূরে থাকুক, এই যাট হাজার গাড়ীর প্রয়োজনানুযায়ী পরিবর্ত্তনের ভিত্তিতেও এই শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে। এই প্রসঙ্গে মহীশূরের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান, প্রসিদ্ধ এঞ্জিনীয়ার স্যার মৎস্যগান্ধী বিশ্বেশ্বরায়ার পরিকল্পনা ও বহুবর্ষব্যাপী প্রচেষ্টার ইতিহাস সর্ব্বজনবিদিত।

অর্ণবপোতনির্ম্মাণ শিল্পপ্রতিষ্ঠার নিমিত্তও ভারতবাসী বহুদিন হইতে অক্লান্ত প্রয়াস পাইতেছে, কিন্তু এতাবৎ-কাল সফলকাম হইতে পারে নাই। সম্প্রতি সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী পূর্ব্ব উপকূলে ভাইজাগাপট্টমে একটি পোত-নির্ম্মাণ-অঙ্গন (Shipyard) প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত কেন্দ্রীয় সরকারের প্রসাদ লাভ করিয়াছেন। কলিকাতা, তথা বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য যে, কলিকাতায় এই বৃহৎ শি- প্রতিষ্ঠার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।

বিমাননির্ম্মাণপ্রচেষ্টা অতি আধুনিক। সুখের বিষয়, সরকার এই শিল্পপ্রতিষ্ঠার্থ যৎকিঞ্চিৎ সক্রিয় সাহায্য প্রদান করিয়াছেন।

ইতিমধ্যে এই সকল শিল্পে অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা এবং দক্ষিণ আফ্রিকা দ্রুত অগ্রগতি লাভ করিয়াছে, এবং তাহারা দাবী করিতেছে যে, যুদ্ধের আশু প্রয়োজনানুযায়ী যান-বাহনাদি যোগাইবার নিমিত্ত, ভারতে ব্যয় এবং সময়সাপেক্ষ প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া, যে দেশ যে শিল্পে অগ্রসর, অন্যান্য দেশ তাহাদের সুবিধার নিমিত্ত, তদুপযোগী উপকরণ উপাদানাদি তৎপরতার সহিত তাহাদিগকে প্রদান করুক। দৃশ্যতঃ এই প্রস্তাব অতি সমীচীন, কিন্তু ইহার পশ্চাতে ভারতের সর্ব্ববিধ নূতন প্রচেষ্টায় পশ্চাদপসরণের যে নিগূঢ় প্রতিক্রিয়া লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা শোচনীয়। অযোগ্যের সহিত যোগ্যের মিলন ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার ইহাই অবশ্যম্ভাবী ফল।

সাম্রাজ্যান্তর্গত প্রাচ্যদেশসমূহের বৈঠক এবং ব্রিটিশ যোগান মন্ত্রিত্ব (British Supply Department) প্রেরিত রোজার অভিযানের (Roger Mission) শুভাগমনের সূচনাতে ভারতবাসী উৎফুল্ল হইয়াছিল যে, প্রাচ্যগুচ্ছের সম্মিলিত যুদ্ধোপকরণাদি যোগাইবার ত্বরিত প্রচেষ্টার ফলে ভারতেও বহু নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে এবং লুপ্তের পুনরুদ্ধার ও পুরাতনের প্রসার ঘটিবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে কি ঘটিবে, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। এই প্রচেষ্টার ফলে ভারতের শিল্পসমুন্নয়ন ও সম্প্রসারণের উত্তম প্রগতি কিংবা দুর্গতি লাভ করিবে, এবং ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য বিস্তার কিংবা নিস্তার লাভ করিবে, তাহা বর্ত্তমানে দুর্জ্ঞেয়। জনসাধারণের মনে একটি বিশ্বাস ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করিতেছে যে, যুদ্ধ-প্রয়োজনের তাগিদে হয়ত বা ভারতের অগ্রগতি বহুল পরিমাণে ব্যাহত হইবে। অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের প্রতিনিধিবর্গের নায়ক স্যার ওয়াল্‌টার ম্যাসিগ্রীণের মন্তব্যই এই বিশ্বাসকে নির্ভরযোগ্য ভিত্তি প্রদান করিয়াছে।

এদিকে শিল্প-বাণিজ্য প্রসারের অনিশ্চয়তা এবং সঙ্কীর্ণতার পশ্চাতে প্রকৃতিপুঞ্জের করভার ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইতেছে। চলতি বৎসরের প্রথমেই অতিরিক্ত মুনাফার উপর কর ধার্য্য হইয়াছিল; রেলের মাশুল শতকরা সাড়ে বার ভাগ বাড়িয়াছিল। পাথুরিয়া কয়লার উপর অতিরিক্ত বোঝাই মাত্রা শতকরা সাড়ে বার হইতে কুড়ি ভাগ চাপিয়াছিল এবং তাহার পশ্চাতে আসিয়াছিল শর্করা এবং পেট্রলের (motor-spirit) উপর অন্তর্দ্দেশীয় শুল্ক। সম্প্রতি আয়কর এবং অতিরিক্ত করের হার শতকরা ২৫ ভাগ বাড়িয়াছে এবং ডাক, তারের খবর এবং ট্রাঙ্ক-টেলিফোনের মাশুলও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কেন্দ্রীয় শাসন-তন্ত্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া প্রাদেশিক শাসন-তন্ত্রগুলি ও প্রজাপুঞ্জের করভার বৃদ্ধি করিবার বহু কৌশল অবলম্বন করিতেছেন। ব্যয়বৃদ্ধির সঙ্কুলনার্থ কেন্দ্রীয় সরকারের আয়বৃদ্ধি প্রয়োজন; কিন্তু প্রাদেশিক কর্ত্তৃপক্ষ ব্যয়-সঙ্কোচের দিকে লক্ষ্য মাত্র না করিয়া দুঃখ-দৈন্য ও দারিদ্র্যে প্রপীড়িত প্রজার দুঃসহ বোঝা অধিকতর ভারী করিবার প্রচেষ্টা করিতেছেন।

প্রভূত ধন-সম্পৎ-সম্পন্ন হইলেও, ভারতবর্ষ দরিদ্রের দেশ। সুতরাং ব্যয়-বৃদ্ধির পূর্ব্বে ব্যয়-সঙ্কোচের সর্ব্ববিধ প্রযত্ন ও প্রচেষ্টা প্রয়োজনীয়। এ বিষয়ে জনসাধারণের মনে যাহাতে সন্দেহের অবকাশ মাত্র না থাকে, তৎপ্রতি শাসনকর্ত্তাদের সতর্ক হওয়া আবশ্যক। একদিকে যেমন করভার বৃদ্ধি পাইতেছে, অন্যদিকে তেমনি শিল্প-বাণিজ্যের আশানুরূপ বিস্তৃতির অভাবে নিঃস্ব ও নিরীহ প্রজাবৃন্দ অন্নবস্ত্রের অনাটনে বিপন্ন হইতেছে।

যুদ্ধপ্রয়োজনের তাগিদে কোন কোন শিল্পের সাময়িক উন্নতি ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু ব্যাপক ও কায়েমী শিল্পানুষ্ঠান ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রসার ও প্রগতি ব্যতীত জনসাধারণের অবস্থার কোন স্থায়ী উন্নতি সম্ভব নহে। পক্ষান্তরে রপ্তানী বাণিজ্যের ক্রম-বর্দ্ধমান সঙ্কোচ এবং দেশের অভ্যন্তরেও মাল-চলাচলের শাসন-সঙ্কেত হেতু শিল্প-বাণিজ্যের অগ্রগতি প্রতিহত, কোথাও বা দুর্গতি আসন্ন। মূল্যশাসন হেতু ব্যবসায়ীর আয়বৃদ্ধির পথ রুদ্ধ। সুতরাং যেমন কৃষক, তেমনি ব্যবসায়ীর পক্ষে নূতন করভার বহন করিবার একমাত্র উপায় অনশন অথবা অর্দ্ধাশন। কৃষকের স্বাস্থ্য বিপন্ন, ব্যবসায়ীর মূলধন বিপন্ন। সরকারী তহবিলে ঘাটতির মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি উন্মার্গগামী।

স্থায়ী, ব্যাপক ও বিভিন্নমার্গে বিস্তৃত শিল্পানুষ্ঠান ও শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং বহির্বাণিজ্যের প্রসার ও প্রগতি ব্যতীত, জনসাধারণের আয়বৃদ্ধিপূর্ব্বক, তাহাদের ক্রয়শক্তি বাড়াইবার দ্বিতীয় পথ নাই। যুদ্ধ-সঙ্কট সত্ত্বেও, শাসক, ধনিক, বণিক্ ও শ্রমিক সকলকেই এই বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে। সরকারী সাহায্য ও সহানুভূতি অপ্রচুর, সুতরাং শিল্পানুরাগী এবং শিল্পোৎসাহী ধনিক ও বণিক্‌কে যথাসাধ্য করিতে হইবে।

প্রচুর রাষ্ট্র-সাহায্য সত্ত্বেও জাপানের কয়েকটি ধনী পরিবার জাপানের শিল্প-বাণিজ্যকে সমৃদ্ধ ও সমুন্নত করিয়াছে। নান্যঃ পন্থাঃ।

আধুনিক বাংলা কবিতা

শ্রীধীরেন্দ্রমোহন মজুমদার

রবীন্দ্র-পরবর্ত্তী সাহিত্য বলে' একটা কথা উঠেছে। রবীন্দ্রপ্রতিভার সংস্পর্শশূন্য কাব্যের আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। কোন কোন মহলে অপ্রীতিকর হলেও একথা বলা প্রয়োজন, আধুনিক যুগে যে ক'জন কবি বাংলা কবিতায় নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন, তাঁরাও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ-রূপে মুক্ত নন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সুকবি শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাব্য-রচনাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রসমসাময়িক এই কবির রচনায় যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, বাংলা সাহিত্যের কাব্যসম্পদ্ তদ্দ্বারা বৃদ্ধি পেয়েছে, সন্দেহ নেই। আমরা পরবর্ত্তী কয়েকটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রসমসাময়িক কয়েক জন কবির কাব্য ও রচনারীতি সম্বন্ধে কিছু বলবার চেষ্টা করব। সুকবি বসন্তকুমারের কাব্য-আলোচনাকে আশ্রয় করে' প্রসঙ্গের সূত্রপাত হ'ল। রবীন্দ্র-কাব্য সম্বন্ধে বাংলার সাময়িক পত্রাদিতে এত বেশী আলোচনা হয়েছে যে, সম্ভবতঃ সেই সব মালমসলা একত্র করলে স্তূপাকার হয়ে উঠবে। হয়তো এত আলোচনা সত্ত্বেও রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে শেষ কথা বলা হয়নি। আমাদের মনে হয়—কাব্য আলোচনায় finality বলে' কোন কিছু থাকতে পারে না। রবীন্দ্রপ্রতিভার জয়গানে আমাদের সাহিত্যিক মহল এখনও কোলাহল মুখরিত, যার ফলে রবীন্দ্র-সমসাময়িক কবিদের সম্বন্ধে সুবিচার করা হয় নি এবং বেশী কিছু বলাও হয় নি। শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে বাংলা দেশে শক্তিশালী কবি ও ঔপন্যাসিকের জীবিতকালে তাঁর রচনা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করবার রীতি এখনও গড়ে ওঠে নি, যদিও বিলাতী বহু সাহিত্য পত্রিকায় এর বিপরীত উদাহরণ মিলবে। ইংরেজী সাহিত্যে বহু উদীয়মান সাহিত্যিকের রচনাকে উপলক্ষ্য করে' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়ে থাকে, এর ফলে এই সব সাহিত্যিক উত্তরকালে যে প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করেন, এই সব আলোচনাই তার পথ প্রশস্ত করে' তোলে তা'ছাড়া, এই ধরণের আলোচনার আর একটা মূল্যও থাকতে পারে, সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ইতিহাসকারের পক্ষে পুরাতন সাময়িক পত্রের ফাইলের প্রয়োজনীয়তা আজ অস্বীকার করবার উপায় নেই। সুদূর ভবিষ্যতে সাময়িকের ধূলিমলিন একটি ছিন্ন পৃষ্ঠা সাহিত্যের বহু অনালোকিত অধ্যায় আলোকিত করতে পারে।

এই সূত্রে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের যে আদর্শ গড়ে' তুলেছেন, সেই আদর্শ অনুসরণ করে'ই হোক বা কাব্যরচনার সাধারণ উৎকর্ষের জন্যই হোক, বর্ত্তমান যুগে কাব্যরচনার সাধারণ ষ্ট্যাণ্ডার্ড যথেষ্ট উঁচু হয়েছে, আজ বহু কবির রচনাই readable-এর পর্য্যায়ে পড়ে। আরও একটা কথা, বর্ত্তমানে বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতা আখ্যাধারী এক অদ্ভুত কাব্যরচনার এক্সপেরিমেণ্ট সুরু হয়েছে। সাহিত্যে এই তথাকথিত নূতন পথপ্রদর্শকেরা আজ রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত বলে' নিজেদের প্রচার করছেন এবং এই সম্পর্কেই রবীন্দ্র-পরবর্ত্তী সাহিত্য নামীয় একটি বিশেষ পর্য্যায়ে এঁদের রচনাকে শ্রেণীভুক্ত করবার প্রচেষ্টা চলছে। রবীন্দ্র-পরবর্ত্তী সাহিত্যে এঁদের কি দান, তা' এখনও স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় নি, যদিচ এই শ্রেণীর প্রচারিত কয়েকটি সাহিত্য-পত্রিকায় এঁদের তরফ থেকে জোর প্রচারকার্য্যের অন্ত নেই। আজ বাংলা সাহিত্যেও নিখিল ভারতীয় রাজনীতির অনুকরণে বহু দল ও উপদলের সৃষ্টি হয়েছে। রবীন্দ্র-পরবর্ত্তী কবিতা সম্বন্ধে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, এঁরা এখনও রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্ত্তিত গদ্যকবিতার আধুনিকতাকে আশ্রয় করে' পথ অতিবাহন করছেন, কাব্যের নূতনতম কোন form বা technique-এর প্রবর্ত্তন এঁরা করেন নি। কাব্যসাহিত্যে গদ্যকবিতার প্রয়োজনীয়তা ও আবির্ভাবের হেতু নিয়ে বিভিন্ন সমালোচকের মধ্যে মতের পার্থক্য থাকতে পারে;

কিন্তু একথা আজ অবশ্য স্বীকার্য্য যে, কবিগুরুর কাব্য-সাধনার একটি বিশেষ স্তরে তাঁর আধ্যাত্মিক কল্পনার বন্ধনহীন প্রকাশকে সহজতর মুক্তির পথ অনুসন্ধান করতে হয়েছিল। পরিণত বয়সে এই অভিনব কাব্যরীতি-প্রবর্ত্তনের পশ্চাতে রয়েছে রহস্য-সন্ধানী মিষ্টিক কবির আত্মপ্রকাশের সুমধুর লীলা-বিলাস। রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতার গঠনের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে যে ছন্দোবন্ধহীন কাঠামোটা দৃষ্টিগোচর হয়, সেটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। গদ্য-কবিতার কাঠামোয় রচিত রবীন্দ্রনাথের কোনও কবিতা একাধিক বার পড়বার পর মনে হয় যেন সমস্ত রচনার মধ্য দিয়ে অলক্ষ্যে একটা সঙ্গীতের প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে, হয়ত তুচ্ছ ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে' যে কাব্যকূজন সুরু হল, তার পরিণতি গিয়ে পৌঁছেচে এক গভীর আধ্যাত্মিক রসলোকে। রবীন্দ্রনাথের আধুনিক বহু গদ্য-কবিতায় এই জিনিষটি লক্ষ্য করা যায়। আমাদের মনে হয়—গদ্য-কবিতার সহজ ও অনাড়ম্বর গতিভঙ্গীকে একটি অতি সাধারণ কবি-কল্পনার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখবার যে ব্যর্থতা কবি তা' উপলব্ধি করেছেন এবং সেই জন্যেই মুষ্টিমেয় কয়েকটি কবিতা ছাড়া বহু গদ্য-কবিতাতেই রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব অধ্যাত্মবাদ সমস্ত কবিতার ভারকেন্দ্র অব্যাহত রেখেছে। অতি আধুনিক কবিদের মধ্যে অনেকেই আজ রবীন্দ্রনাথের বহুপ্রসারী প্রতিভার কবল থেকে মুক্তি পাবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন অথচ আশ্চর্য্য এই যে, রবীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত new techniqueকেই এঁরা প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে' আছেন। আরও একটা কথা, রবীন্দ্রনাথের যে বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী অতি আধুনিক কবিতার অন্তরে রসসঞ্চার করেছে, দুঃখের বিষয়, বহু তথাকথিত রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত কবির হাতেই তার চরম দুর্দ্দশা সাধিত হয়েছে।

আধুনিক বাংলা কবিতা সম্বন্ধে উপরে যা' বলা হয়েছে, তার পটভূমিকায় সুকবি বসন্তকুমারের কাব্যের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য ও বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। কবি বসন্তকুমার সাহিত্যের সেই যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যাকে ইংরেজী সাহিত্যের অনুকরণে আমরা Romantic Revival-এর যুগ বলতে পারি। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার দীপ্তিতে তখন বাংলা কাব্য-সাহিত্য ভাস্বর, সত্যেন্দ্রনাথের কলকাকলী বাংলার কাব্য-কাননে অপূর্ব্ব স্বরবিন্যাসের সৃষ্টি করেছে। সাহিত্যের এই গৌরবময় যুগে কবি যতীন্দ্র বাগচী, কুমুদ-রঞ্জন মল্লিক, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস রায় প্রভৃতির রচনা বাংলা কাব্যের পরিপূর্ণতার গণ্ডীকে যেন আরও প্রসারিত করে' তুলল। সাহিত্যের সেই যুগে সুকবি বসন্তকুমারের কাব্য-রচনাবলী সাহিত্যে সত্যকারের স্পন্দন তুলেছিল, বিশেষ করে' সেই সময়ে, যখন রবীন্দ্রনাথের পরিপূর্ণ প্রতিভা জগতের বিস্মিত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করছিল। পুরাতন সাময়িকের পৃষ্ঠায় এর প্রচুর পরিচয় মিলবে। সেকালের 'ভারতী', 'মানসী', 'মর্ম্মবাণী', 'প্রবাসী' প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রিকায় কবি বসন্তকুমার নিয়মিতভাবে যোগদান করতেন। স্বর্গীয় সমালোচকপ্রবর সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল, কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি মনীষীরা এঁর রচনার গুণমুগ্ধ পাঠক ছিলেন। কবির 'সপ্তস্বরা' নামক কাব্যগ্রন্থ পড়ে' কেম্ব্রিজের বিখ্যাত সাহিত্যিক স্বর্গীয় J. D. Anderson, I. C. S. উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় লিখেছিলেন—

"I am simply charmed. Your 'সপ্তস্বরা' has done me a great good in my stay out at change and since then it is my constant companion. You may quite pertinently claim to be a worthy chela of your great Guru"
—ইত্যাদি।

সুকবি বসন্তকুমারের কবিতার একটা বড় বৈশিষ্ট্য তাঁর ব্যক্তিত্ব। এই অসাধারণ ব্যক্তিত্ব তাঁর বহু কবিতার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। মানুষ যে দেবত্বের অধিকারী, অসীমের স্ফুলিঙ্গ যে তার মধ্যে বর্ত্তমান—এই ভাবটি তাঁর বহু কবিতায় বিচিত্রভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। এই দিক্ দিয়ে তিনি ইংলণ্ডের Romantic কবিদের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন।

"The personality of the writer has a characteristic place in it, because sensibility and imagination are of the very essence of individuality, whilst intelligence tends to be general. Everything considered, classicism laid stress upon the impersonal aspects of the life of the mind ; the new literature on the otherhand, openly shifts the centre of art, bringing it back

towards what is most proper and particular in each individual."

—History of English Literature
Legouis & Cazamian.

আমাদের হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রেও এই ভাবের চরমোৎকর্ষ দেখতে পাওয়া যায়। আবহমান কাল হতে অমৃত উৎসের অনুসন্ধানে মানুষের যাত্রা সুরু হয়েছে, অপার্থিব আশাপথের পথিক আমরা নূতন প্রভাতের উদ্বোধন-মন্ত্র শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। যে শ্রদ্ধায় আছে অপরাজেয় বীর্য্য, নাস্তিক্যবাদের অন্ধকারে যার দৃষ্টি পরাহত হবে না, যে ঘোষণা করবে—

বেদাহমেতৎ পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

কবির 'রূপ ও ধূপ' শীর্ষক কাব্যগ্রন্থের বহু কবিতায় এই ভাবটি প্রকট হয়ে উঠেছে। তাঁর ব্যক্তিত্ববাদের স্পষ্ট পরিচয় আছে এই গ্রন্থের 'আমি' ও 'মানুষ' নামক দু'টি কবিতায়। 'মানুষ' কবিতা পঁচিশটি সনেটের সমষ্টি।

আমি বিরাট্ বৃহত্তম,
আকাশ হইতে উচ্চতর ও
পাতাল হইতে গভীরতম।
সাগর হইতে ভীষণ ভয়াল
মরু হইতেও কঠোর করাল
তুষারমৌলি মেরুচূড়া দু'টি
যুগল চরণপদ্ম মম।

'মানুষ' কবিতায় মানুষের জয়গানে কবি মুখর হয়ে উঠেছেন। কবির অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এই কবিতার পঁচিশটি সনেটের মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয়ে উঠেছে।

পূর্ণ কর পাত্র, বন্ধু, ধর হাতে ধর
ফেনিল উচ্ছ্বল সুরা সুখে পান কর;
ভুলে যাও সব কথা, আসুক বিস্মৃতি,
প্রাণের ধ্যানের রূপ পরম অতিথি!
ভ্রান্তি এযে, মুক্তি এযে! এস কর দূর
জীবনের উৎসবের অবসাদ সুর।

আর এক স্থানে—

মানুষ অপূর্ব্ব সৃষ্টি, অনন্ত অনাদি,
নিত্য শুদ্ধ পবিত্র সে রস সাম্যবাদী,
* * *
পশু নহে নর, কিন্তু পশু আছে তথা;
দেবতা মানুষ নয়, মানুষই দেবতা।

—রূপ ও ধূপ—

কাব্যের আধুনিক ব্যক্তিত্বহীনতার যুগে কবির এই বলিষ্ঠ কল্পনা ও তার সুমধুর প্রকাশভঙ্গী বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব্ব সম্পদ্, সন্দেহ নেই। বিশেষ করে' সত্যেন্দ্র-সমসাময়িক এই কবির কাব্যে ছন্দঃ ও ভাষার সুললিত আবেদন এক রসমধুর সৌন্দর্য্যলোক সৃজন করেছে। 'মানুষ' শীর্ষক কবিতার শেষ সনেটটিতে কবির সুগভীর স্বাতন্ত্র্য প্রায় চরমে পৌছেচে।

সাহসে, শক্তিতে, প্রেমে, জ্ঞানে, মনীষায়
মানুষে উন্নত দেখি' ঈশ্বর লজ্জায়
আসিবে মানুষ পাশে সখারূপে তার—
মানুষ মানুষ তবে হইবে আবার।

এই প্রখর ব্যক্তিত্ববাদ ও আদর্শবাদিতা 'দেবতা ও মানুষ' কবিতার প্রতি ছত্রে ফুটে উঠেছে। কবিতাটির ধ্বনি-লালিত্য ও ভাব-সৌন্দর্য্য বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার বিষয়।

আমি চাহি না অমরাবতী—
ঘুচে না যাহার সুরাসুর-করে চিরদিন দুর্গতি!
সুরগণ চাহে আপন করিতে যারে,
অসুর ছিনায় নিজের বীর্য্যভারে—
সে মায়াপুরীর অধিকার লয়ে হোক্
দ্বন্দ্ব অসুরে সুরে—
আমি চাই শুধু একটি কুটীর ছোট
নিভৃত পল্লীপুরে।

হিন্দু ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা কবির বহু রচনায় নানা বৈচিত্র্যে প্রকাশমান। সংস্কৃত শব্দচয়নের সহিত ছন্দের হিল্লোল তাঁর একাধিক কবিতাকে classical-এর পর্য্যায়ে পৌছে দিয়েছে।

জয়, জয় বসুমতি—
নমো মৃণ্ময়ি, ভুবন-মাতৃ, ভূতগণ-সন্ততি।
বাসুকীর শির-সহস্র-দল-পদ্মে চরণাসন
আমনা, মণি-মাণিক-মৌলি, নাগ ও নাগিনীগণ
রতন-মীনার মুকুতামুকুট নীহারিকা ছায়ামাখা
যুগল মেরুর আঁধার কুক্ষি সঘন হিমানী ঢাকা
লহ মানবের নতি
দশদিক্‌ভুজা, অয়ি বসুমতি, মা মহাবিদ্যা সতি।

—রূপ ও ধূপ—

কবির 'হবিত্রী' নামক কাব্যগ্রন্থে জাতীয়তামূলক কবিতা প্রাধান্য পেয়েছে। এই গ্রন্থের বহু কবিতাকে আপাতদৃষ্টিতে 'দুঃখবাদ'-এর দৃষ্টিভঙ্গীতে রচিত বলে' মনে হয়, কিন্তু কিছু দূর অগ্রসর হলেই বোঝা যায়—কবির অন্তরের বলিষ্ঠ পৌরুষ ও ব্যক্তিত্বের ছায়াপাতে দুঃখের প্রকৃতি গেছে বদলিয়ে, একটা অনমনীয় দৃঢ়তা ও আদর্শ-নিষ্ঠা যেন দুঃখের ছদ্ম আবরণ ভেদ করে' প্রকাশিত হয়েছে। 'হবিত্রী' কাব্যগ্রন্থের 'কুলি-মজুরের গান' শীর্ষক কবিতা আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট করবে।

প্রাণপণে মোরা আহরণ করি তোমাদের তরে মোহর-মণি;
বিনিময়ে তার হাসিমুখে লই তামার কয়টি পয়সা ধনি।
মোদের জীবন-শক্তি-শোণিতে
অর্জ্জিত তব ধন ধরণীতে
এই কালো দৃঢ় বাহু দু'খানিতে
গড়েছি আমরা তোমার বেদী—
বাসুকীর মত ধরিয়া রেখেছি করিয়া তোমারে অভ্রভেদী।

কবির 'সপ্তস্বরা' কাব্য সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই বলেছি—এই গ্রন্থখানি সে যুগের বহু মনীষীর অবিমিশ্র প্রশংসা লাভ করেছিল। কবির অন্যতম কাব্যগ্রন্থ "পত্র ও চিত্র" সম্বন্ধে রবীন্দ্রাগ্রজ স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন —"এই কবিতাগুলি কি সুন্দর মর্ম্মস্পর্শী! এই কবিতাগুলি বুঝিতে অসাধারণ কল্পনাশক্তি কিম্বা তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না, সকলেই বুঝিতে পারে। কেননা এগুলি সাক্ষাৎ অনুভূতির বিষয়, ভুক্তভোগী গৃহী মাত্রই কথাগুলি আপনার কথা বলিয়া মনে করিবে—এগুলি এতই স্বাভাবিক। স্নেহ-প্রেমের অনুভূতি তো সকলেরই হয়, কিন্তু এই অনুভূতিকে আকার দেওয়া, রূপ দেওয়াই কবির কাজ। * * * * বিশেষতঃ 'ঘুমন্ত খোকা'র চিত্রখানি কি সুন্দর! এই কাব্যে কবির চিত্রাঙ্কনী-প্রতিভা বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে।"

ঘুমায় খোকা স্বর্গ-খানিক, মাতৃহিয়ার স্নেহের ঝাঁপি,
নারীর বুকের পুতুল-খেলা, লজ্জা যাহার জীবন-ব্যাপী।
স্থির চপলা, রূপের ঘুম, মূর্চ্ছিত এক বাঁশীর তান,
একটা মোহন ইন্দ্রধনু, ক্লান্ত নদীর কলগান।
ঘুমায় খোকা—এক অপ্সরীর দৃষ্টি যেন নির্নিমেষ,
একটা যেন আলিঙ্গনের ব্যাকুল বাহু নিরুদ্দেশ।

—'ঘুমন্ত খোকা',—পত্র ও চিত্র

সুকবি বসন্তকুমারের রচনার আর একটি বৈশিষ্ট্য—রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতার প্রভাব এই কবির কাব্যে কোথাও রেখাপাত করেনি। তাঁর কবিতায় mysticism-এর পরিচয় নেই। তিনি সহজ সরল রেখায় জীবনের প্রশস্তি গেয়ে গেছেন, কোথাও তাঁর রচনা ইঙ্গিতময় হয়ে ওঠে নি। রবীন্দ্রনাথের "সোণার তরী" ও "গীতাঞ্জলি"র বহু কবিতায় আভাসে ইঙ্গিতে যে অব্যক্ত সৌন্দর্য্যের প্রকাশ আমরা দেখতে পাই, বসন্তকুমারের রচনায় তার ক্ষীণতম প্রকাশ নেই। তাঁর রচনায় আছে প্রসারিত দৃষ্টির পরিচয়, উদার স্পর্শকাতর হৃদয়ের সুমধুর ব্যঞ্জনা। তিনি সরল মোটা রেখায় হৃদয়ের অনুভূতির রং দিয়ে যে ছবি এঁকে চলেছেন, তার পরিচয় আধুনিক কাব্য-সাহিত্যের পৃষ্ঠাকে উজ্জ্বল করে' তুলবে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁর কয়েকখানি মাত্র কাব্যগ্রন্থের আলোচনা করা হয়েছে। এগুলি ছাড়া আরও কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ সাহিত্যে খ্যাতি লাভ করেছে, এই আলোচনায় তার কোনই পরিচয় দেওয়া হয় নি। 'মন্দিরা', 'খঞ্জনী', 'সপ্তস্বরা', 'পঞ্চপাত্র', 'চিত্র ও চিত্ত', 'আলো-আঁধারী' সমস্তই কবির প্রতিভার পরিচয় পরিস্ফুট করে' তুলবে। কবির কাব্যালোচনা-প্রসঙ্গে এমন কতকগুলি কবিতার সন্ধান আমরা পেয়েছি, যা' কলেজ ও স্কুলের পাঠ্যতালিকায় স্থান পাওয়া উচিত—আমরা এদিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।
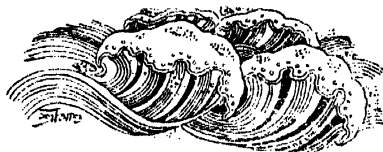
ভারতীয় নৃত্য

নৃত্যবিৎ মণি বর্দ্ধন

শাস্ত্র বলে—নাট্যবেদ ব্রহ্মা প্রথমতঃ মহামুনি ভরতকে প্রদান করেন এবং ভরত কর্ত্তৃক কি ভাবে নৃত্যকলার সৃষ্টি ও মর্ত্ত্যবাসীর মধ্যে প্রচারিত হয় এবং উদ্ধত তাণ্ডব নৃত্য ও সুকুমার লাস্য নৃত্য প্রভৃতির মধ্য দিয়া উহার বহুল প্রচার হয়, সে সম্পর্কে অনেক কথাই মহামুনি ভরত কর্ত্তৃক রচিত প্রাচীন পুস্তক নাট্যশাস্ত্রের ৪র্থ অধ্যায়ে ও নৃত্যের বিধি-বিধান 'নটনভেদাঃ', 'নাট্যম্', 'নৃত্তম্' ইত্যাদির সূক্ষ্ম রূপ-রীতির বিস্তৃত বিবরণ অন্যান্য অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। নৃত্যশাস্ত্রে আছে—ঋগ্বেদ হইতে পাঠ, যজুর্ব্বেদ হইতে অভিনয়, সামবেদ হইতে গীত ও অথর্ব্ববেদ হইতে রস আহরণ করিয়া পদ্মযোনি কর্ত্তৃক নাট্যবেদ রচিত হইয়াছিল। শাস্ত্রে যাহাই থাকুক, সুপ্রাচীন কাল হইতেই যে পৃথিবীর আদিম যুগের অধিবাসীরাও মনের সহজ আনন্দের আবেগে ধর্ম্মানুষ্ঠানে, উৎসবে ও সামাজিক পর্ব্বে নৃত্য করিয়াছে, সে সম্বন্ধে বহু নিদর্শন আছে। বিশ্ব ছন্দোময়—ছন্দের ব্যতিক্রম হইলে ধ্বংস অনিবার্য্য—বিশ্বের অধিবাসী হইয়া প্রাণিজগতের স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দোচ্ছ্বাসের প্রকাশ যে গতিছন্দে ও নৃত্যে হইবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক। বসন্তসমাগমে, বিধি-বিধান-রীতিবর্জ্জিত নৃত্য পশুপক্ষীর মধ্যেও দেখা যায়। নৃত্যের রীতিবিধি আসিয়াছে মানুষের রুচিবোধ ও সৌন্দর্য্যবোধের উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে। আমরা আজও ধরাপৃষ্ঠ হইতে যে সকল জাতি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহাদের রুচি ও সৌন্দর্য্যবোধের পরিচয় পাই ঐ সকল লুপ্ত জাতির শিল্পে, ভূগর্ভ হইতে প্রাপ্ত প্রস্তরফলকের মধ্যে অঙ্কিত, খোদিত শিল্পীর কল্পনা ও দেহভঙ্গীর রেখায়। প্রাচীন জাতি সুমেরীয়, মিশরীয়, ব্যাবিলনীয়, এসিরীয়, গ্রীক, রোমান, দ্রাবিড় ও আর্য্য সভ্যতার প্রাচীন রূপ-রীতির সংস্কার ও মনের পরিচয় আমরা তাহাদের শিল্পে, সাহিত্যে ও দর্শনে পাই। নৃত্যকলার দেহভঙ্গিরেখাই সেই সেই যুগের জাতির মনের সংস্কার ও রুচির উৎকর্ষের যথেষ্ট পরিচায়ক।

শিবতাণ্ডবের বিশেষ ভঙ্গিমায় নৃত্যবিৎ উদয়শঙ্কর

ভারতবর্ষেও যে এক সময়ে নৃত্য রূপে, রসে, ভাবসম্পদে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল এবং উহার বিধি-রীতি ও রূপবন্ধের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ হইয়াছিল, প্রাচীন কালে লিখিত পুস্তক নাট্যশাস্ত্র, অভিনয়-দর্পণ ও সঙ্গীত-রত্নাকর প্রভৃতি পুস্তকের রূপ-রীতি-বিধানের ব্যাখ্যা হইতেই তাহা অনুমিত হয়। যেহেতু সঙ্গীতের মত প্রাচীন নৃত্যের কোন প্রতিলিপি বা স্বরলিপির ন্যায় 'গতি-লিপি' নাই, কাজেই প্রাচীন ভারতের নৃত্য-স্বরূপ সঠিক কি ছিল এবং কখন ইহার জন্মকাল তাহা

সঠিক বলা সম্ভব নয়। তবে প্রাচীনকালে নাট্যসম্প্রদায় বোধ হয় দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—ভরত-সম্প্রদায় এবং নন্দীকেশ্বর-সম্প্রদায়। কোন্ সম্প্রদায় অধিকতর প্রাচীন সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও, ভরত-সম্প্রদায় যে তাৎকালীন জনসমাজে অধিকতর জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছিল, তাহা সত্য। নন্দীকেশ্বর-কৃত অভিনয়-দর্পণের স্থানে স্থানে ভরতমুনি ও তৎরচিত নাট্যশাস্ত্রের নামোল্লেখ

'মোহিনী' নৃত্যে মাদাম সিমৃকী (মাড়োয়ার দেশীয়)

হইতেই প্রতীয়মান হয় যে, অভিনয়-দর্পণের রচনাকাল ভরত-রচিত নাট্যশাস্ত্রের পরবর্ত্তী কালে। এতদ্ব্যতীত নন্দীকেশ্বর-সম্প্রদায়ের বহিরঙ্গের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ হইতেই প্রতীয়মান হয় যে, উহার রচনাকাল পরবর্ত্তী সময়ের। পাণিনির রচনায় 'নাট্যসূত্র' নামীয় গ্রন্থের রচয়িতৃরূপে শিলালীর নাম উল্লেখ দেখিতে পাই, কিন্তু নাট্যশাস্ত্ররচয়িতা ভরতের নাম দেখিতে পাই না। নাট্যশাস্ত্রে পাণিনির নাম দেখা যায় বলিয়া অনেক পণ্ডিত নাট্যশাস্ত্রের রচনাকাল পাণিনির পরবর্ত্তী যুগের এবং অভিনয়-দর্পণের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের বলিয়া মনে করেন। ভারতীয় শাস্ত্রোক্ত নৃত্য আজ লুপ্তপ্রায়। কিন্তু নাট্যশাস্ত্রের নৃত্যরীতি-পদ্ধতি সম্বন্ধে পুস্তকে বর্ণিত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ হইতে তাৎকালীন নৃত্যের স্বরূপ ও উৎকর্ষতা অনুমান করা যায়। ইহাও অনুমেয় যে, নাট্যশাস্ত্রের রচনার বহু পূর্ব্বকাল হইতেই শাস্ত্রলিখিত মার্গ-নৃত্যের চর্চ্চা চলিয়া আসিতেছিল এবং পরে উৎকর্ষতার সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যরীতি, রূপবন্ধ সম্পর্কে রূপ-রীতি আয়ত্তাধীনে রাখিবার জন্য নৃত্য-ব্যাকরণ, অর্থাৎ নৃত্যশাস্ত্র রচিত হইয়াছে। যেমন ভাষাসৃষ্টির পরেই ব্যাকরণ লিখিত হয়, তেমনি নৃত্য-শাস্ত্রের রূপ-রীতি-বিধির পুস্তক-রচনার বহু পূর্ব্বেই নৃত্য চর্চ্চা সুরু হইয়াছিল। ভারতীয় নৃত্য যে বহু প্রাচীন, সে সম্বন্ধে মতদ্বৈধ নাই।
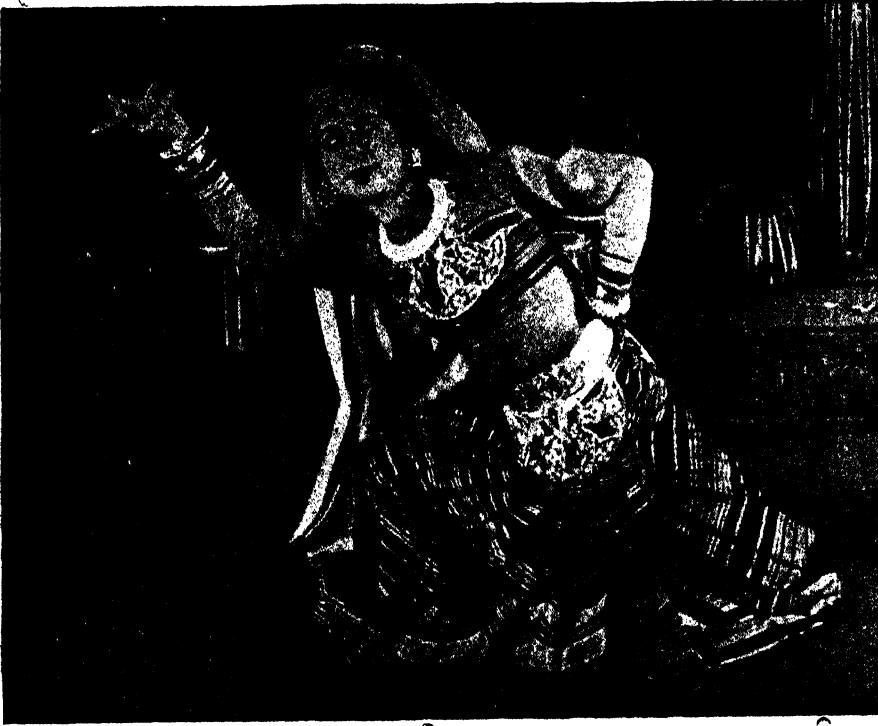
নাট্য ছিল রসাশ্রয়, নৃত্য ছিল ভাবাশ্রয় ও নৃত্ত ছিল তাললয়াশ্রয়। নাট্য ছিল অভিনয়প্রধান—অভিনয়ের ছিল চারি ভাগ—সাত্ত্বিক অভিনয়, আহার্য্য অভিনয়, আঙ্গিক অভিনয় ও বাচিক অভিনয়। আঙ্গিক অভিনয়কেই ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল নৃত্যাভিনয় ও নৃত্য। তাল, লয় ও ছন্দে অপরূপ দেহভঙ্গীর ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত, ছন্দায়িত গতি ও ব্যঞ্জনাত্মক হস্তপদের কর্ম্মকে নৃত্য বলা যায়। তবে আহার্য্য অভিনয় অর্থাৎ চরিত্র ও অবস্থাভেদে পোষাক-পরিচ্ছদ, অঙ্গাভরণ ও

রূপসজ্জা এবং নৃত্যক্ষেত্রে সাময়িক ভাবপ্রকাশের সহায়ক হিসাবে নৃত্যানুষঙ্গিক যন্ত্রবাদ্য ও কণ্ঠসঙ্গীত—যাহা অদ্যাপি দক্ষিণ ভারতের কথাকলি অভিনয়ে চরিত্রানুযায়ী রচিত ও গীত হয়, তাহাকে এ ক্ষেত্রে বাচিক অভিনয় বলা চলে। অভিনীয়মান রসবিকাশের সহায়ক হিসাবে কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত ভাষার কাজ করে। অভিনয়ের রসোদ্বোধক হিসাবে যাহা বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবরূপে স্থায়ী রসসৃষ্টির পক্ষে সাহায্য করে, তাহাকে সাত্ত্বিক অভিনয় বলা চলে। অভিনয় ও নৃত্যের সঙ্গে উপরোক্ত আহার্য্য অভিনয়, বাচিক অভিনয় ও সাত্ত্বিক অভিনয়—সমস্ত নৃত্যই

'ইন্দ্র' নৃত্যে রামনারায়ণ (কথক ভঙ্গী)

ইহার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল—কোন একটীর ব্যতিরেকে নৃত্য সুসম্পন্ন করা সম্ভবপর হইত না। ভারতীয় নৃত্যের রূপবন্ধ ও রূপ-রীতি সম্পর্কে বলা যায় যে, যদিও বর্ত্তমানকালে বহু রূপরীতি, রূপভেদ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তবু যাহা অদ্যাপি বিভিন্ন প্রদেশের নৃত্যে দৃষ্ট হয় এবং পুস্তকে পাওয়া যায়, তাহা দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। তদানীন্তন শাস্ত্রকারগণ বিভিন্ন প্রকার হস্তপদভেদ ও আঙ্গিক অভিনয়ের করণ, অঙ্গহার, উৎপ্লবন, ভ্রমরী, চারী, মণ্ডল সম্বন্ধে শুধু ব্যাখ্যা করিয়া নিরস্ত হন নাই, এমন কি কোন্ চরিত্র রঙ্গমঞ্চের কোন্ পার্শ্ব দিয়া মঞ্চে কিরূপ গতিতে কোন্ তালে প্রবেশ করিবে এবং সেই চরিত্রানুযায়ী রসস্ফূর্ত্তির জন্য হস্তপদ দ্বারা কিরূপ ভাব-ব্যঞ্জনার প্রয়োজন হইবে এবং সে অনুপাতে অক্ষিপুট ও অক্ষিতারকার কর্ম্মই বা কিরূপ হইবে এবং কটি-কর্ম্ম গ্রীবা-কর্ম্ম এমন কি জঠর-কর্ম্ম পর্য্যন্ত কেমন হইবে এই সমস্ত বিষয় বিশ্লেষণ করিয়া এমন সূক্ষ্মভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন যে, অদ্যাপি অধ্যয়নকালে বিস্মিত হইতে হয়—সমস্তই যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠে।

সে যুগ নাই, সে রুচিবোধও যুগধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমবিকাশের পথে পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়াছে। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধর্ম্মে প্রভাবিত হইয়া

নৃত্যভঙ্গীতে নৃত্যকুশলা মেনকা দেবী

শিল্পীর মনে ও রুচিতে আসিয়াছে পরিবর্ত্তন—তাই তার রূপসৃষ্টিতে প্রতিফলিত অন্তরের রূপ-বৈচিত্র্য লাভ করিয়াছে—আসিয়াছে ভেদ, ফলে বিভিন্ন পদ্ধতির ললিতকলার সৃষ্টি হইয়াছে। এভাবে সর্ব্ব দেশেই নিজস্ব চিন্তার ধারা ও বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া দেশের শিল্পী সৃষ্টি করিয়াছে বিভিন্ন রূপরীতি ও রূপবন্ধ। এমন কি একই দেশে বিভিন্ন রস ও রুচিবোধে, রস-স্ফূর্ত্তির মধ্য দিয়া শিল্পী তার আনন্দ-বেদনা সমস্ত রূপায়িত করিয়াছে। এভাবেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন পদ্ধতির নৃত্য, যথা—কথাকলি, দক্ষিণী, কথক, মণিপুরী,

ব্রহ্মদেশীয়—এমন কি ভারতের বহির্ভাগে সুদূর যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপেও ভারতীয় নৃত্য, ভারতীয় ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে গিয়া তদ্দেশীয় শিল্পীর মনের রঙ ও প্রকাশের ধারার ব্যঞ্জনায় অপূর্ব্ব সম্পদ্ হইয়া উঠিয়াছে।

প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যের রীতিরূপ আজ নানা প্রদেশে ইতস্ততঃভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। একই রূপবদ্ধ

কথাকলি নৃত্যে ভারতীয় নৃত্যকার

(technique) ভিন্ন দেশের আবহাওয়ায় ভিন্ন রূপ পরিগ্রহণ করিয়াছে ভিন্ন ভাব ও রসমূলক হইয়া। নৃত্যের গতিছন্দের অপরিহার্য্য একই স্থানে ঘূর্ণনের রূপ ভিন্ন দেশীয় রীতিতে ভিন্ন রূপ পরিগ্রহণ করিয়া নামান্তরিত হইয়াছে। যেমন—মণিপুরে যে ঘূর্ণন তাহাকে বলা হয় 'লোংলৈ', কথক নৃত্যে ঘূর্ণনকালীন নৃত্যবোলকে বলা হয় 'চক্করদার বোল'; আবার রাশিয়ান ব্যালেট্ নৃত্যে ঘূর্ণনকে বলা হয় 'পিরোয়েট'। কেবল নামই যে ভিন্ন হইয়াছে, তাহা নহে; এক্ষেত্রে রূপ-ব্যঞ্জনাও ভিন্ন প্রকার ভাব ও রসের উদ্বোধক। রূপপদ্ধতির ধারাও ভিন্ন এবং নৃত্যের বোল ও বাণীর ধ্বনি ও ছন্দেরও পার্থক্য আছে—যেমন "না ধি ধি না" এই খণ্ড বোলের অংশ কথক নৃত্যে রূপ পাইয়াছে "তৎ তৎ তা দ্রিগি" এই বেগোচ্ছল ধ্বনিমূলক বোলবাণীতে। আবার মণিপুরে উহাই রূপ পাইয়াছে "খিত্তা ধিন্তা" এই হিল্লোলিত দেহসঞ্চালনের শান্তরসমূলক ধ্বনিব্যঞ্জনায়, যাহা শুনিলে স্বতঃই দেবালয়ের সম্মুখে নৃত্যপরায়ণ শিল্পীর দেহভঙ্গীর হিল্লোলিত রূপ মনে জাগিয়া উঠে। কথাকলি নৃত্যের গাম্ভীর্য্যমুখী ধ্বনিবোল "থো হিত্তা থী থী" এবং দক্ষিণী নৃত্যে "নাধি ধিনা" এই অংশটাই রূপ পাইয়াছে "দালা গো দিগি তাকা তাধি

নৃত্যভঙ্গীতে বলিদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধা নৃত্যময়ী শ্রীমতী রক্তা

কিটা থোম্" এই বীর ও রৌদ্ররসমূলক ধ্বনিতে, যাহা শুনিলে সহজেই মনে পড়ে দক্ষিণ ভারতের শিবমন্দির সম্মুখে নৃত্যনটী দেবদাসীর কথা। বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, নৃত্যশিল্পীর দেহভঙ্গি-রেখায় ও আনুষঙ্গিক নৃত্যবোলে শুধু রুচি ও রসবোধই ধরা পড়ে না, এমন কি তাহাদের বিভিন্ন ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির

আভাসও মিলে। মণিপুরী বৈষ্ণবধর্ম্মী হওয়ায় যে নৃত্যরীতি পুষ্টি লাভ করিয়াছে, দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সংস্পর্শে আসায় তাহা অন্যরূপ ও অন্য রসে পরিপুষ্ট হইয়াছে দেখা যায় এবং একধর্ম্মী হইয়াও যে বিভিন্ন আব্‌হাওয়ায় রুচি-বোধ ও প্রকাশের ধারার তারতম্য ঘটে, তাহারও নিদর্শন আছে। যেমন একই কৃষ্ণবিষয়ক নৃত্যের বিষয়বস্তু এক হইলেও, মণিপুরী নৃত্যরীতিতে ও উত্তর ভারতের কথক নৃত্যের রীতিতে যথেষ্ট প্রভেদ রহিয়াছে। কারণও আছে—মধ্যযুগে যখন কথক নৃত্যের প্রচলন হয়, তখন শিল্পী তবলার সূক্ষ্ম বোলের অনুরূপ ধ্বনি নূপুরের সাহায্যে বিচিত্র লয়ে প্রকাশের চেষ্টায় বিশেষ যত্নবান্ ছিল বলিয়া দেহ-ভঙ্গীর অনুরূপ বৈচিত্র্যও পুষ্টিলাভ সেখানে করে নাই; আবার মণিপুরীরা ঠাকুরঘরের সম্মুখে মনের আনন্দ ও ভক্তির প্রেরণায় সহজ সাবলীল নৃত্যচ্ছন্দে শিল্পী অন্তরের আবেদন জানায় বলিয়া পাদকর্ম্মের সূক্ষ্মত্ব ও লয়-ছন্দের ততটা উৎকর্ষতা সেখানে লাভ করে নাই। এমন কি নূপুরের প্রচলনও কৃষ্ণ ব্যতীত তথাকার রাস-নৃত্যে দেখা যায় না। তবে উত্তর ভারত হইতে গৃহীত বাঈজীর অনুকরণে নৃত্যপরা 'লাইছাবী' নৃত্যেই নূপুরের প্রচলন শুধু মণিপুরে আমি দেখিয়াছি। আবার কথাকলি নৃত্য অভিনয়প্রধান বলিয়া অভিনয়ের সৌকর্য্যার্থে বহুল মুদ্রার প্রচলন হইয়াছে; কারণ অভিনীয়মান সমস্ত ভাবই ভাষায় না বলিয়া শুধু মুদ্রাব্যঞ্জনায় রূপ দিতে হয় বলিয়া পাদকর্ম্ম, অঙ্গহার ও করণের ততটা বৈচিত্র্য নাই, যতটা দক্ষিণী নৃত্যে

মণিপুরের একটি বিশেষ নৃত্যসজ্জায় মণিপুরী নৃত্যকুশলা বা 'লাইছাবী'

দেখা যায়। এই যে নৃত্যরীতির প্রকারভেদ ও বৈচিত্র্য, তাহার কারণ—বিভিন্ন দেশের শিল্পীর মনে ধর্ম্ম, সংস্কার, পারিপার্শ্বিক আব্‌হাওয়া ও রুচিবোধের প্রভাব-বৈষম্য। শিল্পী গড্ডলিকার স্রোতে ভাসিয়া চলে না—সে করে সৃষ্টি। নিজের মনের মাধুরী মিশাইয়া তাহাতে অভিনীয়মান ঘটনাটির কাম্য রূপের মধ্য দিয়া আদর্শ ফুটাইয়া তুলিতে সে চায়। ভারতেই বিশেষভাবে এই প্রকাশধারা হয় "লোকধর্ম্মী"। লোকধর্ম্মী প্রকাশধারা ভারতের শিল্পীর আদর্শ নহে।

ওরিয়েণ্টাল নৃত্যে এখন বাংলা দেশ মাতিয়া উঠিয়াছে। বাংলার বাহিরে যখন যাই, তখন দেখি সমস্ত প্রদেশেই হয় লোক-নৃত্য, নয় শাস্ত্রীয় নৃত্যের চর্চ্চা। তাহাদের প্রকাশের নিজস্ব ধারাও আছে, কিন্তু বাংলা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিলেই লোকনৃত্য হিসাবে বাংলার 'রায়বেশে নৃত্য'

যবদ্বীপীয় প্রথায় বৃহন্নলা নৃত্যে লেখক ও তাঁর সম্প্রদায়

"নাট্যধর্ম্মী" রীতিতে কোন সময়ে রূপক ও কোন সময়ে কাল্পনিক সৃষ্টির মধ্য দিয়া আদর্শ রূপ-সৃষ্টির চেষ্টা হইয়াছে। শিল্পী যখন বাস্তব জীবনের নিছক প্রতিরূপের অভিনয় না করিয়া স্বীয় প্রতিভাবলে সে ক্ষুদ্র ঘটনায়, বিচিত্র রঙে, নূতন মহিমায় নূতনতর মর্য্যাদা অর্পণ করে, তখন সেই প্রকাশধারা হয় নাট্যধর্ম্মী এবং অভিনেতা কর্ত্তৃক যখন অভিনীয়মান ঘটনাটিতে বাস্তব জগতের অবিকল প্রতিরূপই অভিনীত হয়, তখনই সেই এবং শাস্ত্রীয় নৃত্য হিসাবে ওরিয়েণ্টাল নৃত্যের কথা মনে পড়ে। এমন কি আমাদের কোন শিল্পী বহির্বঙ্গে শাস্ত্রীয় নৃত্য প্রদর্শন করিলেও, ওরিয়েণ্টাল নৃত্য বা 'ভাব-নৃত্য' নামেই অবাঙ্গালীরা তাহার নামকরণ করেন। বহির্বঙ্গের নৃত্যরসিকদের ধারণা—বাংলাদেশ ওরিয়েণ্টাল নৃত্যের জন্মস্থান। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই তথাকথিত "ওরিয়েণ্টাল নৃত্য" শব্দটীর অর্থ আমাদের নিকট আজও দুর্ব্বোধ্য। ওরিয়েণ্টাল শব্দের অর্থ প্রাচ্য, অর্থাৎ যাহা

প্রতীচ্য নয়, যাহা ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে বিভিন্ন। আরব দেশ হইতে জাপান, যবদ্বীপ হইতে ভারতবর্ষ, চীন প্রভৃতি সমস্ত এশিয়া ভূখণ্ডকে প্রাচ্য এবং বিশেষ করিয়া প্রাচ্য কৃষ্টি বলিলে আদর্শবাদী, তত্ত্বান্বেষী, অন্তর্ম্মুখী প্রাচ্যের জাতিদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ধর্ম্মকেই বুঝায়। যদিও ইউরোপ নানা যুগে কখনও প্রাচ্যকে বর্ব্বর জাতির দেশ, কখনও বা মণি-মুক্তা-হীরা-জহরতের দেশ, কখনও বা ধর্ম্মপ্রাণ সাধনমার্গী জাতির দেশ, কখনও বা খৃষ্টদ্বেষী জাতি বলিয়া ভাবিয়াছে। কিন্তু আজ এই বিংশ শতাব্দীতে প্রাচ্য সম্পর্কে প্রতীচ্য অন্য ভাব পোষণ করিতেছে—আজ তাহাদের প্রাচ্যকৃষ্টি, প্রাচ্যধর্ম্ম, প্রাচ্য ভাবধারা সম্পর্কে শ্রদ্ধা জাগিয়াছে। আজ প্রতীচ্য উৎসুক নয়নে প্রাচ্যের নবরূপ, নব বিকাশের প্রতীক্ষায় আছে। যে প্রাচ্য অর্থাৎ ওরিয়েণ্টাল শব্দের এই অর্থ, সেই প্রাচ্য শব্দটিকে নৃত্যজগতে যে কতটা অপপ্রয়োগ আমরা আজ করিয়াছি, প্রাচ্য নৃত্য দেখিলে তাহা স্পষ্ট অনুমিত হয়। যে প্রাচ্য ভাবসম্পদে মহান্, তত্ত্বান্বেষী, অন্তর্ম্মুখী, ধ্যানী, সেই প্রাচ্যের বৈশিষ্ট্য ও আদর্শের কোন তত্ত্ব বা চিন্তা-প্রকাশধারার বৈশিষ্ট্যের ছাপ না রাখিয়া, খেয়াল-খুশি-মত রীতিবিধানবর্জ্জিত রূপধারায় আজ প্রাচ্যকে প্রকাশ করিতে আমরা সচেষ্ট—ফলে আসিয়াছে নৃত্যজগতে যথেচ্ছাচার। শাস্ত্রীয় রূপবন্ধের বালাই নাই, কারণ শাস্ত্রীয় ভাবে ও রীতিতে সাধনার প্রয়োজন; সাধনা বিমুখ হইয়া আমরা তাই করিয়া চলিয়াছি নিত্য নূতন সৃষ্টি এবং পুরাতন নৃত্যরীতি-পদ্ধতিকে আঁকড়াইয়া থাকিলে নব সৃষ্টির আশা যে সুদূরপরাহত এবং সৃষ্টির দৈন্য এই জাতির মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ ইত্যাদি প্রবল যুক্তির দ্বারা মনকে প্রবোধ দিয়াই চলিয়াছি আমাদের রূপসৃষ্টি সম্পর্কে। কিন্তু কোন সৃষ্টিই রূপরীতিবর্জ্জিত হইলে চলে না। রূপরীতি নৃত্য নয়, সত্য—নৃত্যের উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি করা, কিন্তু রূপরীতি তাহার বাহন—এ কথা ভুলিলে চলিবে কি করিয়া? যেমন প্রতিমা কাঠামো নয়, প্রতিমার রূপ হইতেছে মাটি ও রঙের সাহায্যে শিল্পীর মনের ব্যঞ্জনাত্মক প্রতীক; আদর্শ রূপ কিন্তু প্রতিমার কাঠামোর উপরেই গড়িয়া উঠে; তেমন নৃত্যের ভাবসম্পদ্ ব্যঞ্জনায় ফুটিলেও রূপ ফুটাইয়া তুলিতে হইবে রূপরীতি ও রূপবন্ধকে বাহন করিয়া, রীতি-বিধানের মধ্য দিয়া। ব্যাকরণ সাহিত্য না হইলেও সাহিত্যসৃষ্টিতে ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য। প্রাচীন ভারতেও শিল্পীরা তাঁহাদের অপূর্ব্ব রূপসৃষ্টি রূপরীতি ও বিধানের মধ্য দিয়াই করিয়াছিল; তবে তাৎকালীন শিল্পীর স্বকীয়তায় মনের রঙে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছিল। সাধনাবিমুখ বলিয়া আমাদের ন্যায় খেয়ালখুশী সৃষ্টির স্পর্দ্ধা তাহাদের ছিল না। আজ বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ করিলেই নৃত্যশিল্পী হইয়া পড়ি। উর্ব্বশী নৃত্য, দেবদাসী নৃত্য, শ্রীরাধিকা নৃত্য ও অগ্নিনৃত্য শুধু পরিচ্ছদ ও নামকরণের বিভিন্ন নৃত্য নামে অভিহিত করি; কিন্তু বিষয়-বস্তুর চরিত্রানুযায়ী ভাবব্যঞ্জনা, নৃত্যরীতি ও পরিচ্ছদ পরস্পরবিরোধী ও বিমুখী সে কথা ভাবিয়া দেখি না। যে ভারত অসীম কালস্রোতকে সসীমতায় নৃত্যচ্ছন্দে রূপায়িত করিয়াছিল নটরাজের নৃত্যমূর্ত্তিতে, যাহাতে অন্তর্ম্মুখী তত্ত্বান্বেষী ভারতের অন্তরের ছাপ দেখিতে পাইয়া সমস্ত জগৎ এখন বাক্‌রুদ্ধ এবং যে রূপকল্পনায় প্রতীচ্য বিস্মিত, সেই ভারতে আজ ভারতীয় নৃত্য, ওরিয়েণ্টাল নৃত্য ইত্যাদির নামে যে ছেলেমানুষী চলিয়াছে, তাহা অত্যন্ত দুঃখের কথা। আজ আমরা সাধনাবিমুখ। প্রাচীন কৃষ্টি সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। সহজলভ্য যাহা, তাহাই চাই—অনধিকারী হইয়াও অধিকারের দাবী করি—ভুলিয়া গিয়াছি পাইতে হইলে সশ্রদ্ধভাবে চাহিতে হইবে। প্রাচীন ঋষি তাই বলিয়াছিলেন—শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্।

মেঘেতরী

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

দুই

কিন্তু ঈশ্বর বড় অকরুণ, গার্গী শেষ পর্যন্ত চিঠিটা খুল্‌লে। বেশ ভারী আর বড় চিঠি—অতিরিক্ত ডাক-মাশুল লেগেছে।

পরম কল্যাণীয়া গার্গি,

আমার সম্বোধনের ভেতরে পৌরাণিক প্রশাখার শিকড়ের আভাষ পেলে ব'লে দুঃখ করো না, মাঝে মাঝে এই রকম আকস্মিক প্রত্যাবর্তনের মধ্যে আমি অসহ্য আনন্দ পেয়ে থাকি, আমার সম্বন্ধে লোকের যে ধারণাই থাকুক, তোমার কাছে আমার মনের এই 'রূপ' অবারিত হ'ক্।

সংপ্রতি যেখান থেকে চিঠি লিখ্‌ছি, সেটার নাম গিরগাঁও রোড—বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত। দু'মাস আগে থেকেই তোমাকে চিঠি লিখ্‌বার কথা ভেবে রেখেছিলাম, কিন্তু এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে তা' সম্ভব হ'য়ে উঠ্‌ল না ব'লে আমি লজ্জিত। আস্‌বার সময়ে তোমাকে জানিয়ে আসারও সামান্য অবসর পাই নি—এর জন্যে মাঝে মাঝে আমার দুঃখ হয়—অনুশোচনা বোধ করেছি বহুদিন।

এখানে আসার আগে ভারতবর্ষের কয়েকটা বিখ্যাত জায়গায় ঘুরে এসেছি। ঘুরলাম অজন্তা, ইলোরা আর কণারকের সূর্য-মন্দিরে। এখন এই রকম ঘুরতেই বেশ লাগ্‌ছে, কলকাতায় ফিরবার কোনরকম প্রেরণাই পাচ্ছি না,—অতএব আমার এই আকস্মিক অজ্ঞাতবাসের মধ্যে সময়টা কি ভাবে কেটেছে, আশা করি, অতি সহজেই বুঝ্‌তে পারছ।

এর মধ্যে একটা ইতিহাস সৃষ্টি হ'য়েছে। সেই কথাটা জানাবার জন্যে এতদিন প্রবল অভীপ্সা অনুভব ক'রেছি মনে মনে, সময় হয় নি—সুযোগও আসেনি। আমার এই অস্বাভাবিক নীরবতার অবকাশ তোমাকে অসন্তুষ্ট ক'রেছে বোধ হয়। কিন্তু উপায় ছিল না গার্গি,—তুমি তো আমায় চেন—যদি অপরাধ হ'য়ে থাকে, মার্জ্জনা করো।

দু'মাস আগের একটা ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রেই আমার এই ইতিহাস। তখন আমি ভুবনেশ্বরে। খুব ভোরে খণ্ডগিরি আর উদয়গিরির পথে প্রায়ই বেড়াতে যেতাম। উদয়গিরি থেকে সূর্যোদয়ের দৃশ্য নাকি দেখ্‌বার মত, অবশ্য দার্জিলিংয়ের টাইগার হিলের মত নয়—কিন্তু তবু এর খ্যাতি আছে। আব্‌ছা আলোয় ভুবনেশ্বরের সেই অপ্রশস্ত লাল মাটীর পথ বেয়ে একলাই বেড়াতাম, দু'ধারে ঘন বন—অধিবাসীদের কাছে শুনেছি ব্যাঘ্র-দেবতার আবাসভূমি ব'লে এই বনটার প্রচুর খ্যাতি। পথের দু'পাশে নায়ভূমিকার গাছ। একটা অদ্ভুত গন্ধ পেতাম এখানকার বাতাসে। ঠিক ক'রেছিলাম এক সপ্তাহের বেশী ভুবনেশ্বরে থাকব না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এর আকাশ, বাতাস আর প্রকৃতির শান্ত সমারোহ আমাকে মুগ্ধ করলে।

রোজ সন্ধ্যার পর ছাদের ওপরে এসে ব'সতাম—মাথার ওপরের আকাশে অসংখ্য নক্ষত্ররাজির যে সৌন্দর্য্য লক্ষ্য ক'রেছি—মনে হ'ত অন্য কোনও জায়গায় আমার এ কথা মনে পড়েনি। কিন্তু সেটা আমার 'মনে হওয়াই', সময়ে সময়ে আমার এ চিত্ত-বিকারের পরিচয় তোমার কাছে অজ্ঞাত নয়।

প্রতিদিনের মত একদা ভোরে সেই আব্‌ছা অন্ধকারে ঢাকা পথ পার হ'য়ে উদয়গিরিতে এসে পৌঁচেছিলাম, তখনও সূর্য ওঠেনি—তবে বিশেষ দেরীও নেই এমন সময়ে লক্ষ্য করলাম একটা মোটর এসে থাম্‌ল। গাড়ীর থেকে নাম্‌লেন একটী অভিজাত পরিবার। অন্ততঃ প্রথম দৃষ্টিতে আমার তাই মনে হ'ল। সংখ্যায় তাঁরা পাঁচ জন।"

গার্গী পৃষ্ঠা ওল্‌টাল।

তারপর আমি আর তাদের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিনি। উদয়গিরির চূড়া থেকে সূর্যোদয় দেখে তখন খণ্ডগিরিতে উঠে এসেছি। ইতিমধ্যে অনেকটা সময় পার হ'য়ে গেছে। বুধ গুহার কাছাকাছি বেশ একটা ছায়াশীতল জায়গায় ব'সলাম। তারপরে খুললাম রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতা—তুমি হাসছ বোধ হয়, কিন্তু এইটাই আমার ভারী ভাল লাগে। এমনি নীল নির্জন পাহাড়ের চূড়ায় ব'সে ভোরবেলা সঞ্চয়িতা খোলার মধ্যে যে তৃপ্তি, তা' তোমাকে সহজে আমি কিছুতেই বোঝাতে পারব না।

'গীতিমাল্য', 'গীতালী', 'বলাকা' ও 'মহুয়া' পার হ'য়ে গেল, পার হ'ল 'পলাতকা', 'সোনার তরী', 'বিচিত্রিতা' নিজের মনেই পাতা উল্‌টে চ'লেছি। অল্প অল্প ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, চারদিক নির্জন। অদূরে গুহার মধ্যে এক সাধু ব'সে আছেন ধুনি জ্বালিয়ে, সমস্ত দেহ তাঁর ভস্মভূষিত। দু'একটা কি পাখী আচমকা ডেকে যাচ্ছে। তুমি ভাবছ এই নির্জন নিস্তব্ধ আব্‌হাওয়ায় কেমন ক'রে খুললাম সঞ্চয়িতা, কেমন ক'রে পার হলাম, 'মহুয়া' আর 'পূরবী'?—কিন্তু সে অনুভূতি বোঝাতে পারব না—আমার পক্ষে অন্ততঃ বোঝানো কঠিন।

'বনবাণী'র মধ্যে এক রকম ডুবে গিয়েছিলাম বল্‌তে পার—নিজের মনে তখন পড়ে' চ'লেছি:

"ওগো সন্ন্যাসী, পথ যায় ভাসি
ঝর ঝর ধারাজলে,—
তমাল বনের শ্যামল তিমিরতলে।
দ্যুলোকে ভূলোকে দূরে দূরে বলাবলি
চির বিরহের কথা,
বিরহিণী তার নত আঁখি ছলছলি'
নীপ অঞ্জলি রচে বসি' গৃহকোণে,
ঢেলে ঢেলে দেয় তোমারে স্মরিয়া মনে
ঢেলে দেয় ব্যাকুলতা
কভু বাতায়নে অকারণে বেলা বাহি
আতুর নয়নে দু'হাতে আঁচল ঝাঁপে—"

হঠাৎ একটা আকস্মিক চীৎকারে আমি চমকে গেলাম—একটু অস্ফুট আর্তনাদ। তারপরেই কয়েক জনের সম্মিলিত ক্ষীণ কোলাহল। বইটা ফেলে রেখেই এদিকে লাফিয়ে পড়লাম। কিন্তু এপারে এসে আমি কি যে করব, হঠাৎ বুঝ্‌তে পারলাম না।

পাহাড়ের গা বেয়ে সরু একটা আঁকা-বাঁকা পথ এদিকে নেমে এসেছে, তার ওপাশে একটা অতলস্পর্শ গভীর খাদ—তারি পাশ দিয়ে একখানি ঢালু অপ্রশস্ত বন্ধুর ভূমি। একটী তরুণী তারই প্রান্তভাগে কোনরকমে গড়াতে গড়াতে এসে আটকে রয়েছেন—একটু এদিকে ওদিকে নড়লেই নীচের সেই অতলস্পর্শী অন্ধকার গহ্বর তাঁকে লুফে নেবে।

খাদের অন্যপাশে দাঁড়িয়ে তাঁর অভিভাবকেরা অসহায় ভাবে কোলাহল করছেন, চেয়ে দেখ্‌লাম মোটর থেকে যাঁরা নেমেছিলেন সেই অভিজাত পরিবারেরই এঁরা!

মুহূর্তে মনকে ঠিক করলাম। ভেতরে আণ্ডারওয়ার পরা ছিল, কাপড়টা খুলে ফেলে তার এক প্রান্ত মেয়েটীর দিকে ছুঁড়ে দিলাম চেঁচিয়ে বল্‌লাম, "শক্ত ক'রে ধরুন, আমি যাচ্ছি", ব'লেই কাপড়ের আর একটা প্রান্ত এঁদের হাতে দিয়ে জুতো খুলে ফেল্‌লাম, বল্‌লাম, "খুব টেনে ধরবেন আপনারা"—মেয়েটী ওদিকে কোন রকমে কাপড়টা ধরে ফেলেছেন, কিন্তু শরীরকে নাড়াবার মত শক্তি বা সাহস কিছুই তাঁর নেই, জুতো খুলে কাপড়ের সেই দড়ী ধ'রে ধীরে ধীরে নীচে নেমে এলাম। তারপরে তাঁর একটা হাত ধ'রে আস্তে আস্তে ওপরে ওঠালাম—অতি সাবধানে সেই ঢালু আর মৃত্যু-মসৃণ পাথরের ওপর দিয়ে পার হ'য়ে এলাম অন্ধকার খাদের ভয়াবহতাকে—মেয়েটী তখন আমার কোমর দু'হাতে ভাল ক'রে জড়িয়ে ধ'রেছেন; ওপরে এসে যখন উঠ্‌লাম তখন একটী প্রৌঢ়া (পরে জেনেছি মেয়েটীর মা) খুব কাঁদছিলেন, বৃদ্ধ ভদ্রলোক তো আমাকে এসে একেবারে জড়িয়ে ধরলেন, বল্‌লেন "আপনি না থাক্‌লে রেবাকে আর পেতাম না আজ—কি ব'লে যে ধন্যবাদ জানাব।"

আমি ততক্ষণে কাপড়টা আবার ঠিক ক'রে প'রে নিয়েছি, বল্‌লাম, "এর জন্যে আপনাদের বেশী ভাব্‌তে হবে না, আগে দেখুন ওঁর কোথায় কেটেকুটে গেল, যে রকম বিশ্রীভাবে পাথরের ফাঁকে আটকে গিয়েছিলেন।"

এতক্ষণে মা এগিয়ে এলেন, বল্‌লেন, "তুমি নিশ্চয়ই দেবতা বাবা, এরকম জায়গায় ঠিক এইভাবে যদি না এসে পড়তে—" আরও অনেক কথা—কৃতজ্ঞতা আর প্রশংসার উচ্ছ্বসিত স্রোত ব'য়ে চল্‌ল—সে সব কথা বিশদভাবে আমি বোঝাতে পারব না—তুমি খানিকটা সহজেই আন্দাজ ক'রে নিতে পারবে। সেই প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের ঢেউয়ে আমি বিপর্যস্ত হ'য়ে গিয়েছিলাম বল্‌তে পার।

তাঁদের সকৃতজ্ঞ দৃষ্টির সাম্‌নে 'সঞ্চয়িতা'খানা মাটী থেকে তুলে নিয়ে একসংগেই নীচে নেমে এলাম। পথেই পরিচয় হল। বৃদ্ধ ভদ্রলোক গত পনেরো বৎসরের ওপরে দেশীয় কোন রাজার মন্ত্রিত্ব করে এসেছেন, একটী মাত্র মেয়ে রেবা, আর একটী ছেলে নাম সুজিত। আর কিছু নেই। সংগে স্ত্রী আছেন। রেবা এবারে বি-এ পরীক্ষা দিয়েছে, অবশ্য ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই সুজিত পড়ছে। ভদ্রলোকের নাম হরনাথ সামন্ত।

গার্গী পৃষ্ঠা উল্‌টে গেল।

পথের মাঝে আমাকে তাঁরা ছেড়ে দিতে রাজী হ'লেন না—মোটরে ক'রে তাঁদের বাড়ীতে এসে উঠ্‌লাম। হরনাথবাবু আমাকে নিয়ে যে কি করবেন ঠিক বুঝ্‌তে পারছিলেন না, অবশেষে জলযোগের পর আমার পরিচয়ের কথা উঠ্‌ল। একটা গোলটেবিল ঘিরে আমরা ব'সেছিলুম, বল্‌লাম 'পরিচয় আর কি সামান্যই—বাঙ্‌লা দেশে লেখক ব'লে আমি কিছুটা পরিচিত।'

লক্ষ্য করলাম, সকলেই যেন আগ্রহের সংগে আমার কথা শুনছেন, অবশেষে নাম বল্‌লাম। এতক্ষণ পর্য্যন্ত রেবা কোনও কথাই আমার সংগে বলে নি—এখন ফেটে পড়ল, "ও কি সর্বনাশ! —আপনি, আপনি বিদ্যুৎ বসু? —কি আশ্চর্য! শেষ পর্যন্ত এই ভাবেই আপনার সংগে পরিচয় হ'ল—"

অজস্র ক্ষীণ কোলাহল, অবারিত উচ্ছ্বাস—সকলেই আমাকে পেয়ে যেন কৃতার্থ হ'য়েছেন!

তারপর সন্ধ্যের আগে বাড়ী ফিরে এলাম।

একটা জিনিষ সেদিন তীব্র ভাবে অনুভব ক'রেছিলাম। সমস্ত রাত্রির মধ্যে আমার আর ঘুম আসে নি, কেমন যেন একটা অদ্ভুত অনুভূতি আমার সর্বশরীরে ছড়িয়ে প'ড়েছিল। সমস্ত রাতই জান্‌লা দিয়ে দূরান্তবর্তী তারাদের দিকে চেয়ে সময় কাটালাম—কেবলই মনে

হ'চ্ছিল সেই অবস্থাটার কথা—যখন রেবাকে অতলস্পর্শী খাদের আসন্ন মৃত্যু-গহ্বর থেকে ধীরে ধীরে অনন্ত আকাশের জীবন-চেতনায় ফিরিয়ে আন্‌ছিলাম। সেই অবস্থা—সেই অদ্ভুত শিহরণময় মৃত্যু-মুহূর্ত। রেবা আমাকে তার সমস্ত শরীর দিয়ে নির্ভর ক'রেছিল—একটুও দ্বিধা নেই, একটুও সংকোচ নেই—তার বাঁচবার ভার তখন আমার হাতে—হ'লামই বা আমি তার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত—তবু সে আমাকে ছাড়া এক মুহূর্ত'ও বাঁচবে না, এমনই আবেদন ঐ সময়টুকুর মধ্যে ছড়িয়ে ছিল। মানুষের এই বিচিত্র আত্মোপলব্ধির কথা ভেবে আমার আশ্চর্য লাগে। আশা করি, তুমি আমায় ভুল বুঝ্‌বে না গার্গি ;—অনুভূতি সম্বন্ধে যেটুকু বল্লেছি—ঠিক সেইটুকুই ঘটেছে, এর অতিরিক্ত যদি রঙের ছোঁয়া লাগে, তাহ'লে আমাকেই দায়ী ক'রো না।

যাক্, সেই থেকেই এঁদের সংগে আমার পরিচয়। তারপর গত দু'মাস এঁদের সংগেই ভারতের বহু জায়গায় ঘুরলাম,—রেবার মায়ের শরীর সুস্থ নেই—সেই উপলক্ষ্যেই এঁদের ভ্রমণ সুরু হ'য়েছে। অন্য দেশের বিশেষ জলহাওয়ার প্রভাব তাঁকে যদি আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আন্‌তে পারে, এই আশাতেই হরনাথবাবুর চেষ্টার ত্রুটি নেই। আদর্শ পত্নী-প্রেমিক বল্‌তে পার—অন্ততঃ আর একজন হরনাথবাবু যে আমার চোখে পড়েন নি—এ কথা নিশ্চয়ই জানাতে পারি।

অবশেষে আর একটা খবর দিয়ে আমার এই চিঠি শেষ করছি। প্রায় এক মাস আগে ঠিক হ'য়েছে হরনাথবাবু, সস্ত্রীক, স-পুত্র এবং স-কন্যা সমুদ্রে ভাস্‌বেন্—আপাততঃ লণ্ডন পর্যন্ত তাঁদের যাত্রাসীমা নির্দিষ্ট হ'য়েছে—সুবিধে হ'লে ওখান থেকে সুইজারল্যাণ্ড—আরও সুবিধে হ'লে ইউরোপের দর্শনীয় স্থানগুলি তাঁদের যাত্রাসূচীকে পরিবর্দ্ধিত করবে। শেষতম সংবাদ হচ্ছে এই যে, আমি তাঁদের পক্ষে সহযাত্রী হিসেবে নাকি অপরিহার্য। এবং আমি সম্মত হ'লে তাঁরা কৃতার্থ হ'বেন।

এ সব জায়গায় সমস্ত ভদ্রসন্তান যা' ক'রে থাকেন, আমি তার সব রকম প্রক্রিয়াই প্রয়োগ ক'রেছিলাম—শেষ পর্যন্ত আমার পরাজয়-বার্তাই সশব্দে চারিদিকে ঘোষিত হ'ল। রেবাই এ-বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী—আমি সংগী না হ'লে তাদের যাত্রার কোন অর্থই হ'বে না এবং অসম্পূর্ণ থাক্‌বে, এমন কথা ইংগিতে একাধিকবার সে আমাকে জানিয়েছে—অবশেষে কয়েককটা নেহাৎ ছেলেমানুষী উক্তি ক'রে আমাকে হাসিয়েছে। পরিষ্কার কথায় আমরা যাকে 'সেন্টিমেন্ট' বলি তাই। ভেবো না রেবার মধ্যে অসাধারণ কিছু পেয়েছি। শেষ পর্যন্ত সে নিতান্ত বাঙালী মেয়েই. পরিমিত আহার, আনন্দ, রসচর্চা আর অন্যের অযথা আলোচনার মধ্যেই তার এতটা জীবন কেটে এসেছে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে সংপ্রতি আমার আর একটা ভাবনা গ'ড়ে উঠেছে। অবশ্য সে চিন্তাটা কোন অদ্ভুত বা অভূতপূর্ব এমন একটা কিছু ভেবে নিও না, তবে সেটা প্রসংগক্রমে উল্লেখযোগ্য। চিন্তাটা হ'চ্ছে, আমাদের, অর্থাৎ ভারতীয়দের প্রায় প্রত্যেকের জীবনেই এমন একটা বয়েস আসে, যখন সে বহুবার এডেন বন্দর ছাড়িয়ে, সুয়েজের মধ্যে দিয়ে লণ্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ারে এসে পৌঁছয়। মাথা উঁচু ক'রে দেখে বাকিংহাম প্যালেস, হাইড্ পার্কে সন্ধ্যেবেলায় ঘুরে বেড়ায়।

যার কল্পনা আরও বেশী অগ্রসর, সে মিশরের মধ্যে দিয়ে—নীল নদের তীরে এসে বসে—ভাবে ক্লিওপেট্রাকে, আর এ্যান্টোনিওকে। তারপর সে যায় রোমের ভগ্নাবশেষের মরুভূমিতে। দেখে ফোরাম্—তারপর আরও অগ্রসর হয়ে দেখে লুভার মিউজিয়াম্—পার হয় হ্যামবুর্গ আর রাইন নদী। যেখানে সেক্সপীয়র জন্মেছিলেন, সেই বাড়ীটাকে দেখে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে—তারপর নায়েগ্রা ফল্‌স্! পৃথিবীর মধ্যে শক্তিশালী জলোচ্ছ্বাস! উন্নত পর্বত-শরীর বেয়ে সে অনন্তকাল থেকে ঝ'রে পড়ছে—তারপরে কেম্‌ব্রিজ্—হয়তো কেম্‌ব্রিজেই সে পড়বে ব'লে এসেছে। বলা যায় না—পথে একদিন টি, এস, ইলিয়টের সংগে দেখা হ'য়ে যেতে পারে। বলা যায় না, সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েডের সংগে এক জায়গায় ব'সে কথা বলার সৌভাগ্য থেকে সে নাও বঞ্চিত হ'তে পারে। (বিদ্যুৎ যখন একথা লিখ্‌ছে—তখন ফ্রয়েড মারা জান্‌নি—লেখক) অস্‌কার ওয়াইল্ড যেখানে থাকতেন, সে বাসাটা সে খুঁজে বের করবে।

আমি অসাধারণ নই—একদা আমার মনেও এ স্বপ্ন পাখা মেলেছিল। সে পাখায় ভর ক'রে বহু দূর পর্যন্ত উড়ে যেতাম।

তাই আজ কয়েক দিন থেকে বিসুবিয়সকে চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে পাচ্ছি—এডেন বন্দর ছাড়িয়ে আমরা যেন অনেকটা চ'লে এসেছি—আমাদের জাহাজে প্রচুর কয়লা নেওয়া হ'য়েছে এখান থেকে—

গার্গী আবার পাতা ওল্‌টাল :

সাম্‌নে দিগন্ত-স্পর্শী সমুদ্রের ঘন নীল জলোচ্ছ্বাস—ডেকের ওপরে ধরো আমি দাঁড়িয়ে আছি—অদূরে বিসুবিয়সের উদ্ধত শৃংগ, আকাশে একটুও মেঘ নেই : এমন সময়ে হঠাৎ তোমাকে মনে পড়ল, মনে হ'ল ডেকের ওপরে তোমাকে পেলে আরও কত ভাল লাগ্‌ত!

চিঠিটা অভদ্র রকম দীর্ঘ হ'য়ে গেল ; হয়তো শেষ পর্যন্ত তোমার ধৈর্য থাক্‌বে না। তবু লিখ্‌লাম—এতদিনের না লেখার মূল্য এটা। আগামী ৪ঠা সেপ্টেম্বর আমরা ভাস্‌ছি। আশা করি, সুস্থ আছ। আমার ভালবাসা গ্রহণ করো।

ইতি

তোমারই

বিদ্যুৎ।

পুনশ্চ :—

কোনও সূত্রে জান্‌লাম, তুমি এম, এ পড়ছ ; অভিযান জয়যুক্ত হোক, তোমার জন্যে এই একান্ত কামনাই রইল। ইতি—বিদ্যুৎ।

গার্গী চিঠিটা মু'ড়ে টেবিলের ওপরে রেখে দিলে। সাম্‌নের জান্‌লাটা খোলা। হু-হু ক'রে থেকে থেকে খানিকটা হাওয়া আস্‌ছে। ঘড়ির দিকে চেয়ে গার্গী দেখ্‌লে প্রায় বারোটা। জান্‌লার ধারে ব'সে অনেকখানি আকাশ দেখা যায়—আজ আর কিন্তু ভাল লাগছে না। এই রকম জান্‌লার ধারে ব'সেই সমস্ত রাতটা কাটিয়ে দিতে পারলে বেশ হয়।

বারান্দায় কার যেন পায়ের শব্দ শোনা গেল—দিদিমা আস্‌ছেন। গার্গী সোজা হ'য়ে উঠে বস্‌ল। "এখনো জেগে আছিস্ খুকি? কত রাত হ'ল বল দেখি! খাওয়া হ'য়েছে?" দিদিমা দেওয়াল ধ'রে ধ'রে কোনও রকমে এসে ঘরের ভেতরে ঢুকলেন, সমস্ত শরীরে বার্দ্ধক্যের রূঢ়তম আঘাত ছড়িয়ে র'য়েছে, একটু চল্‌তে গেলেই পা থর-থর ক'রে কাঁপে। নিষ্প্রভ জ্যোতিঃহীন দুই চক্ষুতে এখনও কোনও রকমে পৃথিবীর পথ পার হ'চ্ছেন। সময় হয় তো নিকটেই, হয় তো আরও দীর্ঘদিন এভাবে পথাতিবাহনের প্রয়োজন নেই।

গার্গী উঠে দাঁড়াল, "না, দিদা, খাইনি, ইচ্ছে নেই বিশেষ, কিন্তু তুমি কেন এলে এই অন্ধকারে ওপর থেকে নেমে, ধর যদি প'ড়ে ট'ড়ে যেতে—দাদু ঘুমিয়েছেন?"

"হ্যাঁ—" দিদিমা আস্তে আস্তে এসে গার্গীর বিছানার ওপরে বস্‌লেন "তোর জ্বালায় আমি আর পারি না খুকি, কেন, ভূভারতে কি আর মেয়ে নেই, না তারা লেখাপড়া শেখেনি? রোজ এত রাত্তির করলে শরীরে সইবে তুই ভাবিস্? আমি যে এক মুহূর্তের জন্যে স্বচ্ছন্দে নিঃশেষ ফেল্‌ব, তার উপায় নেই—এত লোকের মরণ হয়—আমায় পোড়া যম ভুলে গেছে—"

গার্গী বুঝ্‌লে এইবার দিদিমার অন্তর্দাহী ক্রন্দন প্রকাশ্যে রূপ নেবে। কিন্তু কি-ই বা সে করতে পারে! তবু চেষ্টা করলে, বল্‌লে, "ছিঃ দিদা, ওকি বলছ তুমি, এখনিই তোমার মরবার বয়েস হ'য়েছে নাকি?"

দিদিমা একটু সোজা হ'য়ে উঠে বস্‌লেন। বল্‌লেন, "তা' না তো কি দিদি—বয়েসটা কি কম হ'ল, যাই হ'ক, তুই আমায় একটু শান্তিতে মরতে দে—আর জ্বালাস্‌নি—সারাটা জীবনে কম জ্বলিনি, তোর মা থেকে আরম্ভ ক'রে আর তুই পর্যন্ত—কি পাপই যে আমি ক'রেছিলাম নারায়ণের চরণে—"

গার্গী পাশে এসে বস্‌ল। বল্‌লে, "না দিদা, আমি কি চাই যে তুমি খুব কষ্ট পাও—তবে এতক্ষণ একটা ভারী সুন্দর বই পড়ছিলাম—এত রাত্তির হ'য়ে গেছে বুঝতেই পারিনি, আর—হ্যাঁ, সত্যি বল্‌ছি দিদা, ক্ষিদে আমার একটুও নেই—তুমি ভেব' না, চল তোমায় ওপরে দিয়ে আসি।"

—"কেন, কি এত খেয়েছিস্ যে রাত্তিরে ক্ষিদে নেই, শরীর-টরীর ভাল আছে তো রে?" দিদিমা গার্গীর কপালে হাত দিলেন—জ্বর-জ্বর লাগছে নাতো?"

—"নাগো না, তোমরা খালি যত সব আজেবাজে কথা ভাব, বেশ ভাল আছি, একটুও শরীর খারাপ লাগছে না—চল।"

"আরে বাপ্‌রে—তুই যে আমায় ঘর থেকে জোর ক'রেই তাড়িয়ে দিবি ঠিক করেছিস্—যাচ্ছি—যাচ্ছি!" দিদিমা একটু হেসে ফেল্‌লেন, "একটা কথা ছিল খুকি, তোর সংগে, কর্ত্তা আমাকেই পাঠিয়ে দিয়েছেন, বলেন এ-সব কথা মেয়েরাই ভাল বল্‌তে পারে, কিন্তু কর্ত্তার ইচ্ছেই এতে সব থেকে বেশী—বুঝলি?"

ব্যাপারটা সহজেই গার্গী আন্দাজ ক'রে নিতে পারল এতক্ষণে—বুঝলে কয়েক মিনিট পরে যে নাটক আরম্ভ হ'বে, তারই অপটু ভূমিকা এটা। দিদিমা ততক্ষণে গার্গীর হাত ধ'রে টেনে তাকে আরও কাছে ঘন' ক'রে বসিয়েছেন, বল্‌লেন, "দিদি, আজ তোকে আমিও একটা কথা বল্‌ব, তোর বুদ্ধি আছে, বিবেচনা আছে, একটু ভেবে দেখিস্—আমরা আর ক'দিন···তোর সাম্‌নে এখন সমস্ত জীবন, বুঝে দেখেশুনে পথ হাঁটতে হ'বে দিদি। তোর দাদু সীতেশের কথা বল্‌ছিলেন, ছেলেটী একেবারে যাকে বলে রত্ন—আমাদের সংগে অনেক দিন থেকেই চেনাশুনো আছে, এবারে জলপানি পেয়েচে, শুনচি সোণার মেডেল পাবে নাকি আবার, খুব ভাল পাস ক'রেছে বলে।" এইখানে দিদিমা একটু থাম্‌লেন, তারপরে বল্‌লেন, "তুই তাকে দেখিস্‌নি বোধ হয়—কিন্তু

সত্যি একেবারে রাজপুত্তুরটীর মত চেহারা—কি চোখ, কি নাক! তুই আর অমত করিস্‌নি দিদি—বাড়ীর অবস্থা তাদের খুব ভালই, যশোরের ওদিকে খুব বড় জমিদারী আছে। তা' ছাড়া তিনটে কয়লার খনির মালিক সে নিজে—আর ভাই-বোন কিছু নেই, বাপের একটী মাত্তর ছেলে—"

গার্গী একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছে, বল্‌লে "তাই নাকি দিদা? তা' হ'লে তো সত্যি খুব ভাল। কিন্তু আমার যে বড়লোককে বিয়ে করতে ইচ্ছে হয় না, ওরা বড্ড খারাপ হয় কিনা—" গার্গী পূর্ণ আন্তরিকতা দিয়ে দিদিমার মনকে আরও নরম ক'রে আন্‌ল, "ওদের ওপর আমার একটুও বিশ্বাস নেই সত্যি!"

—"ওমা, ছিঃ ছিঃ" দিদিমা হঠাৎ জিব্ কাটলেন, "সে কথা তুই স্বপ্নেও ভাবিস না—ওমা, কোথায় যাব, অমন সচ্চরিত্র চরিত্রবান্ ছেলে সত্যিই আমি দেখিনি—ছিঃ ছিঃ, ও কথা বলিস্‌নি।"

—"কিন্তু এখন কি করে' হবে দিদা? আগে এম, এ'টা পাস ক'রেই নিই, তারপরে না হয় দেখা যাবে। —ধরো এখন যদি বিয়ে হয়, তা'হ'লে আমার আর পরীক্ষা দেওয়া হবে না, কত বাধা আস্‌বে পড়াশুনোর মধ্যে, কত বিপত্তি!"

—"হ্যাঁ, তা' না হয় ভেবে দেখব এখন" দিদিমা যেন অনেকটা আলো দেখতে পেয়েছেন, বল্‌লেন, "না হয় আর কয়েকটা মাস পরেই হ'ল, কিন্তু তুই যে মত দিলি, এই আমার সব থেকে আনন্দ খুকি।"

—"কয়েকটা মাস নয়—বছর" গার্গী হঠাৎ সংশোধন ক'রে দিলে।

"এ—তো দেরী হ'বে?" দিদিমার কণ্ঠে আবার একটু হতাশার সুর ভেসে উঠল।

—"তা' হবে না, এই তো সবে ভর্তি হলুম এম, এ, ক্লাসে, এখন ভাল ক'রে পড়াই আরম্ভ হয়নি যে।"

—"সবই বুঝতে পারছি খুকি" দিদিমা আবার অনুনয়ের সুরে ভেঙে পড়লেন, "সবই বুঝতে পারি, কিন্তু দেখ আমাদের ওপরও তোর একটা কর্তব্য আছে তো? ধর"—দিদিমা নিজের বলবার কথাগুলিকে এতক্ষণে বেশ সুন্দরভাবে গুছিয়ে নিতে পেরেছেন "ধর, কোনদিন দেখবি হঠাৎ ফট্ ক'রে ম'রেই গেলাম—আর সময় তো হ'য়ে এসেছে—কবে কি হ'বে ঠিক ক'রে কি বলা যায়? আমাদের একটা আশা-আনন্দ আছে তো—তুই আমার একমাত্র নাত্‌নী, তোর যদি—"

শেষ পর্যন্ত গার্গী দিদিমাকে তাঁর এই কথা-সৃষ্টির স্রোতে বাধা না দিয়ে পারল না। গার্গী জানে তাঁর কোনও মতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার আগে তিনি কয়েকটা অমোঘ প্রক্রিয়া ঠিক ক'রে রাখেন মনে মনে—তারপর যথাসময়ে বারংবার তারই প্রয়োগে তাঁর চেষ্টাকে ফলবতী করে' তুলবার আপ্রাণ পরিশ্রম করেন—সুতরাং গার্গী এইখানে দিদিমাকে বাধা না দিয়ে পারল না। বিশ্বাস নেই—হয় তো সমস্তটা রাতই দিদিমা তাঁর মতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে প্রচুর চেষ্টা করবেন। গার্গী এক রকম মনে মনে শিউরে উঠল। বল্‌লে, "পাগল? যত সব বাজে কথা খালি খালি ব'লে আমার মন খারাপ ক'রে দিচ্ছ দিদা—" ছোট মেয়ের মত গার্গী ঠোঁট দুটো ফোলালে—"বার বার যদি তুমি ঐ কথা বল, তা' হ'লে কত ক্ষণ ভাল লাগে বল তো? চল আর রাত করো না, বেশী রাত্তিরে শু'লে কিন্তু আমার শরীর ভীষণ খারাপ হ'বে।"

এত ক্ষণে গার্গী ঠিক জায়গায় আঘাত করতে পারল। দিদিমা আস্তে আস্তে খাট ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, বল্‌লেন "হ্যাঁ, তাতো হবেই, তাতো হবেই—সেই জন্যেই তো তোর কাছে মর্‌তে মর্‌তে এলাম, শুয়ে পড় এবার, এমনিই তো যা দুর্বল তুই—তার ওপরে এই পড়া আর রাত জাগা —কি ক'রে যে শরীর স্বাস্থ্য টিকবে?" গার্গী উঠে দাঁড়িয়ে দিদিমার হাত ধরল, বল্‌লে, "চলো, তোমায় আমি সিঁড়ি কটা পার ক'রে দিয়ে আসি—কি দরকার ছিল তোমার এই রাত্তিরে ওপর থেকে নেমে আসার? চল—"

দিদিমা আস্তে আস্তে এগিয়ে চল্‌লেন, বল্‌লেন, "তাই যদি বুঝবি ভাই, তা' হ'লে আর আমার দুঃখ কি? মরতে মরতে কেনই বা আসি তোর কাছে?—তাই যদি বুঝতিস্—"

—"দেখো, সাবধানে পা ফেলো" গার্গী বারান্দার আলোটা জ্বালিয়ে দিলে।

(ক্রমশঃ)

ব্রহ্মসূত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়

(প্রথম পাদ)

শ্রীমতিলাল রায়

অসদিতি চেন্ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ ॥৭॥

অসৎ (চেতন কারণবাদ স্বীকার করিলে, জড়-জগৎ-সৃষ্টির পূর্ব্বে ইহা ছিল না) ইতি চেৎ (এইরূপ যদি বলি), ন (না, তাহা বলিতে পার না)—প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ (উহা প্রতিষেধ মাত্র, এই হেতু)।

অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে কিছু ছিল না, এইরূপ নিষেধ-বাক্যের অর্থ কি হইতে পারে? উহা একটা কথার কথা। অসৎ অর্থে যাহা সৎ নহে। যাহা সৎ নহে, এই নিষেধ-বাক্যের নিষেধ্য কি? ইহার উত্তর নাই। এইহেতু বলা যায়—ইহা প্রতিষেধ মাত্র। জগৎ-রূপ কার্য্য যখন ছিল না, তখন উহা অসৎই ছিল। তাই বলিয়া কারণের বিদ্যমানতা নিষিদ্ধ হয় না। উৎপত্তির পূর্ব্বে এই সৃষ্টি কারণ-রূপে সৎই ছিল। এই হেতু কার্য্যের কারণত্ব ত্রৈকালিক অস্তিত্বসূচক। শ্রুতিও বলেন—"সর্ব্বং তং পরাদদেযাহন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদ" ইত্যাদি অর্থাৎ "তাঁহাকে এই সব সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, যে এই সমুদয়কে আত্মাতিরিক্ত দেখে।" এই হেতু জগৎ-সৃষ্টির পূর্ব্বে অসৎ ছিল না, সৎই ছিল। এই সৎকে চেতন বলায়, ইহা হইতে অচেতন-জগৎ-সৃষ্টি যুক্তি-বিরুদ্ধ বলিয়া যে তর্ক, তাহা চেতন হইতে অচেতন এবং অচেতন হইতে চেতন কেশ ও বৃশ্চিকাদির দৃষ্টান্তে নিরসিত হইয়াছে। ব্রহ্ম—শব্দাদি-বিহীন অনন্ত চৈতন্য। এই চৈতন্যের সত্তা বহুধা অভিমানিনী চেতনদেবতা-রূপে জড়ক্ষেত্রে আশ্রয় করিয়া থাকে। 'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং'—শ্রুতির এই উক্তি ইহার প্রমাণ। জড় জগতের উপাদানও চেতন ব্রহ্ম। কার্য্যের পশ্চাতে এই কারণবাদ শ্রুতি, স্মৃতি এবং দৃষ্টান্তের সাহায্যে প্রমাণিত হওয়ায়, উৎপত্তির পূর্ব্বে এই সকল ছিল না, এইরূপ আপত্তি টিকিতে পারে না। কার্য্য-কারণের অভেদ প্রতিপাদন করার সূত্রের ব্যাখ্যায় আমরা ইহা অধিকতর বিশদ করার চেষ্টা করিব।

অপীতৌ তদ্বৎ প্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্ ॥৮॥

অপীতৌ (প্রলয়ে) তদ্বৎ (কার্য্যের ন্যায় কারণের) প্রসঙ্গাৎ (এক হইয়া যায়, এই জন্য) অসমঞ্জসম্ (ব্রহ্ম-কারণবাদ সমীচীন নহে)।

যাহা কার্য্য, তাহা নিত্য নহে, তাহার লয় আছে। কার্য্য কারণেই লয়প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ কারণের সহিত উহা অবিভক্ত হইয়া পড়িবে। ব্রহ্ম চেতন ও শুদ্ধ। কার্য্য অচেতন ও অশুদ্ধ। কার্য্য যখন কারণগত হইবে, তখন কি উহা কারণের নিত্যশুদ্ধ চেতন স্বভাবকে দূষিত করিবে না? এই যুক্তিতে জগতের কারণ চেতন ব্রহ্ম, এই কথায় সামঞ্জস্যহানি হয়। যদি বলা যায়—কার্য্য কারণে লয় পাইলে, কার্য্যের গুণাদি থাকিবে কেন? কার্য্যের গুণাদি বর্ত্তমান থাকিতে উহার লয়-কল্পনা যুক্তি-সঙ্গত নহে। কিন্তু পূর্ব্বের শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণে ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, বস্তুর আত্যন্তিক লয়েও ইহার পুনরুৎপত্তি রুদ্ধ হয় না। এমন কি মুক্তাত্মারাও ব্রহ্মের সৃষ্টিপ্রেরণা প্রবুদ্ধ হইলে, পুনরুদ্ভব-প্রসক্তিপরায়ণ হইয়া থাকেন। এই সকল হেতু বশতঃ ব্রহ্ম কারণ, ইহা বলা যুক্তিবিরুদ্ধ হয়।

ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ ॥৯॥

ন তু (না, এ কথা বলিতে পার না। কি কথা বলিতে পার না? কার্য্য কারণে লয় পাইলে, কারণ তত্তৎ ধর্ম্ম-বিশিষ্ট হয়, একথা বলিতে পার না)। [কুতঃ] (কেন বলিতে পার না) দৃষ্টান্তভাবাৎ (ইহার বহু দৃষ্টান্ত থাকা হেতু)।

লয়প্রাপ্ত বস্তু তদীয় কারণকে যে স্বদোষে দূষিত করে না, তাহার দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ। মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ঘট মৃত্তিকায় লয় পাইলে, উহা কি ঘটাকৃতি ধর্ম্মে মৃত্তিকাকে দূষিত করে? অথবা সুবর্ণ হইতে উৎপন্ন বলয়, কঙ্কণাদি কি স্ব-স্ব আকৃতির লয়ে কারণ-রূপ সুবর্ণকে স্বধর্ম্মভ্রষ্ট করে?

পৃথিবীর বিকার স্বেদজ, অণ্ডজ প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ দেহ পৃথিবীতে লীন হইয়া তাহাকে কি তদাকৃতি দেয়? কার্য্য যদি কারণে স্ব-স্ব ধর্ম্ম রাখিয়াই প্রবেশ করে, তাহা হইলে লয় হওয়ার অর্থ কি? বলিতে পার—কার্য্য যদি কারণেই স্ব-স্ব ধর্ম্মসংস্কারবর্জ্জিত হইয়া একান্ত লয় পায়, তাহা হইলে তাহার পুনরাবির্ভাবের কথা যুক্তিবিরুদ্ধ হইবে। তদুত্তরে বলা যায়—বস্তুর কার্য্যরূপে লয় হয়, শক্তিরূপেই লয় হয় না। কার্য্যেরই কারণ; কারণ—কার্য্যাত্মক নহে।

এই সকল তর্কের কথা। বাহ্যতঃও দেখা যায়—কারণে কার্য্যের লয় কারণকে তদ্দোষে দূষিত করে না। ঈশ্বর-তত্ত্ব অতীন্দ্রিয়, অপার্থিব; উহা কার্য্যাদির লয়ে দোষদুষ্ট হইতে পারে না। ইহা কুতর্ক ব্যতীত অন্য কিছু নহে। এইরূপ তর্ক সর্ব্বক্ষেত্রে উত্থাপন করা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নহে। তাই ব্যাসদেব বলিতেছেন—

স্বপক্ষদোষাচ্চ ॥১০॥

স্ব-পক্ষ (যাঁহারা এই তর্ক করেন, তাঁহাদের পক্ষেও) দোষাৎ চ (এই দোষ থাকা হেতু)।

অর্থাৎ সাংখ্যবাদীও বলেন—প্রধান জগৎকারণ। শব্দাদিহীন এই প্রধান হইতে জগতের উৎপত্তি যদি হয় এবং এই জগৎ প্রলয়কালে কারণে যদি লয় পায়, যে দোষ শ্রুতির পক্ষে দেওয়া হইতেছে, সে দোষ উক্ত পক্ষেও সমানভাবে প্রযুজ্য হইবে।

উভয় পক্ষের মতবাদের দোষদর্শন করিয়া লাভ নাই। আত্মমত-সমর্থন পক্ষে যে যুক্তি, তাহাই গ্রাহ্য করিতে হইবে, এবং অতীন্দ্রিয় বিষয় সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে হইলে, তাহার সমাধানের জন্য অপৌরুষেয় শ্রুতির আশ্রয় লওয়াই সঙ্গত হয়। ইহার প্রতিবাদে বলা যায়—

তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতি-
চেদেবমপ্যবিমোক্ষঃ প্রসঙ্গঃ ॥১১॥

তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপি (তর্কের অনবস্থান হেতু অর্থাৎ তর্ক প্রতিষ্ঠিত নহে। তর্কের অপ্রতিষ্ঠা দোষ আছে) অন্যথা (যদি এমন তর্ক হয়, যাহা হইতে বিচলিত হইতে হইবে না) অনুমেয় (অনুমানের দ্বারা এমন তর্ক যদি গ্রহণ করা হয়) ইতি চেৎ (এইরূপ যদি বলি) এবমপি (এরূপ যদি বল, তাহাও) অবিমোক্ষ প্রসঙ্গঃ (তাহাতেও তর্কের যে দোষ-প্রসঙ্গ, তাহার মোচন নাই)।

তর্ক অনবস্থাদোষযুক্ত। নানা বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া তর্ক বিচরণ করে। তর্কের ক্ষেত্র বুদ্ধি, এই হেতু তর্কের উপাদান কল্পনা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। কল্পনা নিয়ম মানে না; উহা অবাধেই বুদ্ধিবৃত্তিকে আন্দোলিত করে। বিচিত্র মানব-বুদ্ধি, কাজেই কল্পনাবৈচিত্র্যে তর্কের গতিও বিচিত্র হয়। একজন কোন বস্তুকে যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠা দিলেই সেই বস্তুর নিরাপত্তা রক্ষা পায় না। অন্য তার্কিক তাহার ভিত্তি নষ্ট করিয়া দিতে পারে। বুদ্ধির উৎকর্ষতানুসারে উন্নত কল্পনার ক্রম পরিলক্ষিত হয়। তর্ক তদনুযায়ী একরূপ হয় না। তাই তর্কের অনবস্থা-দোষ সর্ব্বজন-স্বীকৃত। যদি বলা যায় যে, কপিল সর্ব্বজ্ঞ, তাঁর মতবাদ অকাট্য-যুক্তি-প্রতিষ্ঠিত, তখনই তার্কিক বলিবেন—গৌতম, কণাদাদি ঋষি কপিল হইতে অল্প জ্ঞানী, ইহা প্রমাণ করিতে না পারিলে, কপিলের তর্ক সুপ্রতিষ্ঠিত বলা যায় না।

তর্কের অনবস্থাদোষ যাহাতে না থাকে, এমন একটী তর্ক বাছিয়া লইয়া উহার দ্বারা বস্তু নির্ণয় করা কি যুক্তি-সঙ্গত নহে? এমন তর্ক কি নাই, যাহার দ্বারা সত্যের যাচাই হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, তর্কের অনবস্থা-দোষ কোনকালেই নিরাকৃত হয় না। তর্ক মানব-বুদ্ধি-প্রসূত। মানব কোনকালে দোষশূন্য হইতে পারে না। এই হেতু মানব-বুদ্ধিপ্রসূত তর্ক তত্ত্বনির্দ্ধারণের পক্ষে আশ্রয়ণীয় নহে। মানুষ যে দোষশূন্য নহে, ইহা স্বীকার করিয়া ঋষি-কণ্ঠে উদ্গান উঠিয়াছিল—"মা হিংসিষ্ট পিতরঃ কেন চিন্নো যদ্ব আগঃ পুরুষতা করাম॥"

অর্থাৎ 'আমরা মানুষ, কিছু কিছু অপরাধ আমাদের পক্ষে অসম্ভব নহে। সেই জন্য হে পিতৃগণ, আমাদের প্রতি হিংসা করিও না।'

প্রতিপক্ষ তবুও বলিতে পারেন—শ্রুত্যর্থের বিপ্রতি-পত্তি হইলে, পণ্ডিতেরা তর্কের দ্বারাই বাক্যবৃত্তি নিরূপণ করিয়া থাকেন। মনু মহারাজও কি বলেন নাই—

প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্।
ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা॥

ধর্ম্মশুদ্ধি ইচ্ছা করেন যাঁহারা, তাঁহারা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও বিবিধ আগম শাস্ত্র উত্তমরূপে অবগত হইবেন। আরও আছে—

আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥

যিনি বেদশাস্ত্রের অবিরোধী তর্ক অনুসরণ করিয়া ধর্ম্ম-বিধির অনুসন্ধান করেন, সেই পুরুষই ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করেন, অন্যে নহে।

এইরূপ তর্ক-প্রশংসা থাকায়, তর্ক মাত্রই পরিহার করার যুক্তি কি সঙ্গত হইবে?

বেদব্যাস বলিতেছেন—ইহাতে তর্কের অনবস্থাদোষ কি দূর হইল? যে বস্তুবিশেষের জ্ঞানের কথা বেদান্তে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা তর্কাধীন নহে। তর্কাতীত যাহা, তর্ক তাহার সমাধান কেমন করিয়া করিবে? মানব-বুদ্ধি কি দুরবগাহ জগৎকারণের তত্ত্ব-নিরূপণ করিতে পারে? বেদের তত্ত্ব অদ্বয় অখণ্ড। তর্ক বুদ্ধি-প্রভব বলিয়া, উহা বিভিন্ন ও পরস্পরবিরুদ্ধ পথে সম্যক্ জ্ঞানকে খণ্ড খণ্ড করিয়াই দেখিবে। বেদের ব্রহ্ম তার্কিকের নিকট নানারূপেই প্রতিভাত হইবে। এই হেতু যাহা নিত্য, সর্ব্বকালে বিদ্যমান, সর্ব্বদেশে সমান, সেই ব্রহ্মজ্ঞান শ্রুতি-শাস্ত্রের যুক্তির সাহায্যেই সিদ্ধ হইতে পারে—ইহাই সিদ্ধান্ত।

শ্রুতি বলিতেছেন—জগৎ-কারণ ঈশ্বর। কপিল, কণাদ, গৌতমাদি সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণ সৃষ্টিকারণের অন্যথা করিয়াছেন। কপিলাদি ঋষির অনুমান-প্রভব অন্যবাদ সকল বুদ্ধিভেদ বশতঃ আমাদের ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানই দিয়াছে। আশ্রয়-বস্তুর জ্ঞান-ভেদে শুধু বাক্য-ভেদ হইবে না, কর্ম্মভেদও হইবে। ইহা হইতেই পরস্পরের মধ্যে কালে বিজাতীয় ভেদসৃষ্টিতে জাতি পরস্পর হইতে পৃথক্ ও বিচ্ছিন্ন হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। এই শ্লোকের দ্বারা তাই বেদব্যাস বেদবাদ বেদের যুক্তিতেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, এই কথা বলিয়া অন্যান্য বাদেরও খণ্ডন করিতেছেন।

এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ॥১২

এতেন (এই সন্নিহিত উক্তির দ্বারা অর্থাৎ ব্রহ্মকারণ ব্যতীত প্রধানকারণবাদের খণ্ডনের দ্বারা) শিষ্টাপরিগ্রহা অপি (শিষ্ট মনু প্রভৃতির দ্বারা অপরিগৃহীত পরমাণুকারণ-বাদ প্রভৃতি সর্ব্ববাদই) ব্যাখ্যাতাঃ (নিরাকৃত হইল)।

সাংখ্যের মতবাদের সহিত বেদান্ত-মতের সাদৃশ্য অনেকখানি। বেদবিশ্বাসী ভারত সাংখ্যমতের যুক্তি-বল-বাহুল্যে অভিভূত হইয়া উহার অনেক অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। বেদব্যাস তাই সাংখ্যমতকে নিরস্ত করিয়া বলিতেছেন—ঈশ্বর-কারণবাদের বিরুদ্ধ সকল মতবাদ এই যুক্তির দ্বারা নিরসিত হইল। যাহা দুর্ব্বোধ্য, তর্কের অতীত, সেই জগৎকারণবাদ শ্রুতি-সমর্থিত তর্কের আশ্রয়েই স্বীকার করিতে হইবে। বুদ্ধির দোষে মতভেদ-সৃষ্টির প্রতিপক্ষতা করিয়া বেদান্তকার পরবর্ত্তী সূত্রের অবতারণা করিতেছেন।

ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ॥১৩॥

ভোক্ত্রাপত্তেঃ (ব্রহ্মকারণ বাদানুসারে ভোগ্য-ভোক্তা হইয়া যায়। অতএব) অবিভাগঃ (প্রসিদ্ধ ভোক্তৃভোগ্য-বিভাগের লোপ হইবে) চেৎ (যদি বলা যায়) স্যাৎ (এমন হইতে পারে) লোকবৎ (ব্যবহারক্ষেত্রে ইহার দৃষ্টান্ত আছে)।

ব্রহ্ম যদি কারণ হয়, তবে অমুক ভোক্তা, অমুক ভোগ্য এই প্রসিদ্ধ বিভাগের অভাব না হইবে কেন? তাহার উত্তরে বলা হইতেছে যে, অভিন্ন পদার্থের এইরূপ ভেদ-ব্যবহার নূতন কথা নহে।

শ্রুতির প্রতিপাদ্য ব্রহ্মকারণবাদ তর্ক-প্রতিপাদ্য নহে। কিন্তু যদি শ্রুতির স্বকীয় অর্থ শ্রুতির প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিরুদ্ধ হয়, তবে যুক্তিসিদ্ধ অন্য অর্থবাদগ্রহণে বেদান্তবাদীর আপত্তি কি? শ্রুতির কোন অর্থ স্বকীয় বিরুদ্ধতার কারণ হইয়াছে, তাহাই বিবেচ্য। জগতে ভোক্তা ও ভোগ্য, এই দুই প্রকার সৃষ্টিবিভাগ লোক-প্রসিদ্ধ জড় ও চেতন, এই দুই শ্রেণীর সৃষ্টি বিদ্যমান। জড় ভোগ্য, চেতন ভোক্তা। ভোক্তা—চেতন মানুষ। ভোগ্য অন্নাদি জড় বস্তু। ব্রহ্ম যদি সৃষ্টির অদ্বিতীয় কারণ হন, তবে এই ভোক্তৃ-ভোগ্য ভাব কেমন করিয়া সম্ভব হয়? এই হেতু ব্রহ্ম জগৎ-কারণ নহেন। কিন্তু লৌকিক দৃষ্টান্ত দেখাইয়াই ব্রহ্ম-কারণবাদীরা এই আপত্তি নিরসন করিতে পারেন। সমুদ্র তরঙ্গায়িত হইলে, একই জল

বিভাগ্য বলিয়া পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু বুদ্বুদ, ফেনাদি সমুদ্র ভিন্ন অন্য কিছু নহে। আকাশও ঘটে-মঠে প্রবেশ করিয়া ঘটাকাশ ও মঠাকাশ সৃষ্টি করে। অতএব ভোক্তৃ-ভোগ্য-বিভাগ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন না হইয়াও, প্রবর্ত্তিত দৃষ্টান্তের দ্বারা এই লোকপ্রসিদ্ধ বিভাগ অসম্ভব বলিয়া সৃষ্টির ব্রহ্মকারণবাদ নাকচ হইবে না।

তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ॥১৪

তদনন্যত্বম্ (কার্য্য ও কারণ এক, ভিন্ন নহে। অর্থাৎ কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যাভাব হয়) আরম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ (আরম্ভ প্রভৃতি শব্দের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয়।)

ব্রহ্ম জগৎকারণ, এই মতবাদের বিরুদ্ধপক্ষ অনেক আছেন। তাঁহাদের যুক্তি খণ্ডন করার জন্য এই কথার অবতারণা। ব্রহ্ম নিত্য শুদ্ধ, অবিকারী। তিনি অনিত্য, অশুদ্ধ, বিকারী জগতের কারণ কেমন করিয়া হইবেন? এই প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক। স্বর্ণ কি কখনও মৃণ্ময় ঘটের উপাদান হইতে পারে? বা চেতন সত্তা হইতে জড় অচেতন জগৎ গড়িয়া উঠিতে পারে? এইরূপ তর্কোত্তরে বেদান্তবাদীর কিছুই বলিবার নাই, তাহার কারণ ব্রহ্মসূত্রে যে তত্ত্বের বিচার, সে তত্ত্ব বুদ্ধির মাপ-কাঠিতে পরিমিত হইতেই পারে না। এই হেতু তত্ত্ব-প্রমাণ শ্রৌত ব্যতীত অন্য কিছু নহে, পুনঃ পুনঃ ইহারই আশ্রয় লওয়া হইয়াছে। জগৎ-কার্য্যের কারণ-তত্ত্বের সম্যক্ বিশ্লেষণ বুদ্ধিপ্রভব তর্কের সাধ্য কেমন করিয়া হইবে? সে কারণ-তত্ত্ব যে মানব-বুদ্ধির সীমার বাহিরে। আমরা যদি পাণিনির ভাষ্য পাঠ করিয়া পাণিনির জ্ঞানের সীমা নির্দ্ধারণ করিতে চাহি, তাহা যেমন নির্ব্বুদ্ধিতা হইবে—কেননা পাণিনির ভাষ্য হইতে পাণিনির জ্ঞানাধিক্যবশতঃ গ্রন্থের দ্বারা তাঁহারই জ্ঞানের পরিধি-নির্ণয় দুঃসাধ্য; তদ্রূপ জগৎকার্য্য দেখিয়া স্রষ্টার জ্ঞান-লাভ সম্ভব নহে। শ্রুতি ইহার একমাত্র সহায় বলায়, এইখানে আর কোনই কথা নাই। মানবাত্মার চির প্রবাহের মধ্য দিয়া প্রত্যয়ের যে প্রস্তরবেদী গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা বেদ-বিমুখ মানুষের পক্ষে ভাঙ্গিয়া দিবার প্রচেষ্টা প্রতিহত করার জন্য ব্রহ্মসূত্রে শ্রুতিপ্রতিষ্ঠিত তর্কের আশ্রয় লওয়া হইয়াছে।

শ্রুতিতে আছে—শ্বেতকেতু বেদাভ্যাসের পর গৃহাগত হইলে, পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন "হে শ্বেতকেতু, দ্বাদশবর্ষ গুরুগৃহে শিক্ষালাভের পর গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছ। তুমি কি সেই, যাহার দ্বারা অশ্রুত বিষয় শ্রুত হয়, অচিন্তিত বিষয় চিন্তিত হয় ও অজ্ঞাত বিষয় বিজ্ঞাত হয়, তাহাকে জানিয়া আসিয়াছ?" শ্বেতকেতু পিতার নিকটই সেই উপদেশ প্রার্থনা করিলেন।

পিতা বলিলেন "যথা সৌম্যেকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্।" অর্থাৎ হে সৌম্য, একটী মৃৎপিণ্ডের দ্বারাই সমুদয় মৃণ্ময় বস্তু জানা যায়। বিকার—বাক্যের অবলম্বন। কেবল নাম মাত্র। মৃত্তিকাই সত্য।

এই শ্রুত্যুক্ত আরম্ভণ-বাক্যের দ্বারা সৃষ্ট্যাদির কারণ-তত্ত্বের উপদেশ ছান্দগ্যোপনিষদে আছে। শ্রুতি তাই বলিতেছেন "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং, তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি, ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা, ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং আত্মৈবেদং, সর্ব্বং", অর্থাৎ এই সকলই ব্রহ্মাত্মক, তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। তিনিই তুমি। আত্মাই এই সমুদয় ইত্যাদি। এই সকল কথায়—মৃত্তিকাকে জানিলে, মৃত্তিকা-নির্ম্মিত সকল বস্তুই জানা যায়, এই দৃষ্টান্ত "এক-বিজ্ঞানেন সর্ব্ব-বিজ্ঞানং সম্পদ্যতে" অর্থাৎ এক বিজ্ঞানের দ্বারা সর্ব্ব বিজ্ঞান সিদ্ধ হওয়ার ধারণা দৃঢ় করিতেছে। ভোক্তৃ ও ভোগ্য ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বস্তু নহে, নাম-ভেদ মাত্র। কিন্তু এ কথাও সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। নামভেদের সহিত বস্তুভেদও স্বীকার করিতে হয়। ভেদব্যবহার আছে বলিয়াই, দেবদত্ত যখন ভোজন করিতেছে, তখন নামমাত্র বস্তু নহে, বস্তুর অস্তিত্বও স্বীকার করিতে হইবে এবং ভোজ্য বস্তু দেবদত্ত হইতে ভিন্ন স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ ব্রহ্ম হইতে জীব ও জড় ভিন্ন বলিয়াই দেখা উচিত। আচার্য্য শঙ্কর বলেন—জীব-ভাব বিনষ্ট হইলে, তাহাকে আশ্রয় করিয়া যে অনাদি ব্যবহার তাহা বিলুপ্ত হইবে, ইহার শ্রুতি প্রমাণ আছে। শ্রুতি বলিতেছেন—যখন এই সমস্ত আত্মভূত হইবে, তখন "কেন কং পশ্যেৎ"—'কে কি দিয়া দেখিবে?' অতএব সর্পে যেমন রজ্জুভ্রম হয়, স্বপ্নে যেমন মানুষ ভোজনাদি করে,

তদ্রূপ এই জগৎ ব্রহ্মকারণাত্মক কার্য্য হইলেও, নানাত্ব-রূপ মিথ্যাবিজৃম্ভিত। কেহ যদি বলেন—একত্ব যে নানাত্বে পরিণত হইয়াছে, তাহার সবখানি সত্য হইলে, ব্রহ্মের যে নির্ব্বিকারত্ব তাহা ক্ষুণ্ণ হয়। এইজন্য মায়াবাদীরা কার্য্য ও কারণের মধ্যে ভেদ দর্শন না করিয়া, সৃষ্টিকে মিথ্যা বলিয়া বাড়াইয়া দিয়াছেন। আমরা কিন্তু শ্রুতি-দৃষ্টান্তে নানাত্বের কারণ একত্ব স্বীকার করিলেও, সর্পে রজ্জুভ্রমের ন্যায় সৃষ্টির মিথ্যাত্বকে স্বীকার করিতে পারি না। ব্রহ্ম জগৎকারণ স্বীকার করিয়া মায়াবাদী কার্য্যকে একেবারেই অবিদ্যা-কল্পিত বলিয়া ঘোষণা করায়, উপনিষদে সৃষ্টি ও ভগবানের সহিত নিত্য সম্বন্ধই অস্বীকৃত হইয়াছে। প্রবুদ্ধ অথবা অপ্রবুদ্ধ হউক, কোন অবস্থাতেই সৃষ্টি আদি কারণের মৌলিক সঙ্কল্প অতিক্রম করিতে পারে না। আমরা তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দিতে পারি। প্রথম ব্রহ্মসূত্রই বলিতেছেন "আকাশই ব্রহ্ম, নামরূপের নির্ব্বাহক। তিনিই ব্রহ্ম।" "সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিন্ত্য ধীরো নামানি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্তে"—'সেই ধীর সমুদয় রূপের কল্পনা ও সে সকলের নাম প্রদান পূর্ব্বক, সেই সকল নাম ধারণ করিয়া বিদ্যমান আছেন'। শ্রুতিতে এমন বহু বাক্য আছে, যাহার দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করা যায় যে, ব্রহ্মই জগৎ হইয়াছেন। শ্রুতিতে এ কথাও আছে যে, জীব যখন অন্য কিছু দেখে না, শুনে না, জানে না, 'স ভূমা' অর্থাৎ সে ভূমা হয়। এই সকল কথায় এমন প্রমাণ হয় না যে, ব্রহ্মকে জগৎকারণ বলিয়া প্রমাণ করিয়া, পরে কার্য্যটা সবই ভূয়া, মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিতে হইবে। এ বিষয়ে আমাদের পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত পাঠকদের অনুধাবন করিতে বলি।

ব্যাসদেবের উক্ত সূত্রে কার্য্য-কারণের মধ্যে অভেদ-দর্শনের প্রতিজ্ঞার দৃষ্টান্তে ছান্দগ্যোপনিষদের যে আরম্ভণ-বাক্য উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার উপসংহারে এই কথাই আছে যে, কারণ হইতে যে কার্য্য তাহা নাম মাত্র, বৈকারিক শব্দাত্মক। মৃত্তিকা, সুবর্ণ, লৌহ এই সকল কারণ হইতে এতন্নির্ম্মিত যে সকল বস্তুর সৃষ্টি, তাহা সেই সেই মৃত্তিকাদির বিকার, ইহা কে না বলিবে? এতদনুযায়ী নাম ও রূপ লইয়া একই কারণ হইতে নানাত্ব সংঘটিত হওয়ার ন্যায় ব্রহ্ম হইতেই এই জগৎসৃষ্টি নাম-রূপ লইয়া উদ্ভূত। বিকার অর্থে স্বর্ণ ও মৃত্তিকা হইতে কুণ্ডল, কলসীর ন্যায় নানা রূপসৃষ্টি। পুরাণেও আছে—

অজো হি ক্রীড়য়া ভূপ বিক্রিয়াং প্রাপ্ত ইত্যুত।
আত্মানং বহুধা কৃত্বা নানেব প্রতিচক্ষতে॥

সেই অজ পুরুষ ক্রীড়াচ্ছলে বিকার প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে বহুধা বিভক্ত করিয়া নানা রূপে প্রতিভাত হন।

মায়াবাদী সবিস্ময়ে বলিবেন—এইরূপ হইলে, ব্রহ্ম যে বিকারী হইয়া পড়েন! আমরা বলিব—ব্রহ্মের কার্য্যকলাপ আমাদের বুদ্ধির নাগাল চিরদিনই ছাড়াইয়া আছে। অনাদি সৃষ্টির মূলে যে কারণ, তাহা হইতে অজস্র অনাদি বৈকারিক সৃষ্টি; সে যে কি অনাদি, অনন্ত, অনির্ব্বচনীয় তত্ত্ব, যাহা নির্দ্ধারণ করা সপ্তর্ষিগণের পক্ষেও সম্ভব হয় নাই। উহা দেবতাদেরও ধ্যানগম্য নহে। প্রজাপতির প্রথম সৃষ্টি জয়গণও যাহা অস্বীকার করিয়া প্রতিহত হইয়া জগতে আজও পরিভ্রমণ করিতেছেন, যে অনাদি কারণ আশ্রয় করিয়া গীতায় ভগবান বলেন 'সম্ভবামি যুগে যুগে', ঋষির কণ্ঠে মন্ত্রধ্বনি উঠে 'জায়ন্তে কার্য্যসিদ্ধ্যর্থম্', সেই অনাদি কারণ হইতে কার্য্যকে রজ্জুতে সর্পভ্রম, জীবের স্বপ্ন মাত্র বলিলে, বেদকেই অস্বীকার করা হয়।

এক হইতে অন্যের সৃষ্টি—তাহা নামরূপ মাত্র, পরন্তু উপাদান কারণ সম্বন্ধে অন্যমত নাই। নাম-রূপও নিত্য, উহা বিনাশের মধ্য দিয়া পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হয়। কার্য্যের লয়ে, কারণস্থিত সৃষ্টিশক্তি লুপ্ত হয় না এবং এই হেতু কারণ কার্য্যদূষিত বলিয়া ব্রহ্মতত্ত্বের বৈকারিক গুণ থাকার দুশ্চিন্তায় আমাদের ছুঁৎমার্গী মনোবৃত্তির প্রশ্রয় কিছুতেই শ্রেয়ঃ নহে।

মৃত্তিকাপৃষ্ঠে চতুর্ব্বিধ প্রজা প্রতিদিন লয় পাইতেছে। বেদের ঋষি বলিতেছেন—

সূর্য্য চক্ষুর্গচ্ছতু বাতমাত্মা দ্যাং চ গচ্ছ
পৃথিবীং চ ধর্ম্মণা ॥১০।১৬।৩
অপো বা গচ্ছ যদি তত্র তে হিতমোষধীষু
প্রতি তিষ্ঠা শরীরৈঃ ॥

হে মৃত ব্যক্তি, তোমার চক্ষুঃ সূর্য্যে গমন করুক। শ্বাস বায়ুতে। সুকৃতির দ্বারা পৃথিবী অথবা আকাশে যাও।

জলে যাইলে, যদি হিত হয়, জলে যাও। শরীরের অবয়বগুলি ওষধিবর্গের মধ্যে অবস্থিতি করুক। ইহার পর আরও বলা হইতেছে—

অজো ভাগস্তপসা তপস্ব তং তে
শোচিস্তপতু তং তে অচ্চিঃ ॥১০।১৬।৪

এই মৃত ব্যক্তির যে অংশ জন্মরহিত, শাশ্বত, হে অগ্নি, সেই অংশকে তুমি তোমার তাপ দ্বারা উত্তপ্ত কর।

বিভু-চৈতন্য আপনাকে অণু-চৈতন্যে বহুধা বিভক্ত করিয়া জড় প্রকৃতির মধ্যে নিত্য লীলায়িত। এই সনাতন তত্ত্ব অপৌরুষেয়-বেদ-প্রসিদ্ধ। এই শ্রুতিরই যুক্তিশাস্ত্র ব্রহ্মসূত্র। কোন পুরুষের ভাষ্য এই জড় ও চেতনযুক্ত সৃষ্টিতত্ত্বকে ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন বলিয়া, তাহা আবার মায়া বলিয়া যদি উড়াইয়া দিতে চাহে, তাহা বেদবাদী জাতিকে অস্বীকার করিয়াই ব্রহ্মসূত্রের মৌলিক উদ্দেশ্য যে জীবনবাদ, তাহাই প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

নারী

শ্রীসুকৃতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

নূতন ক'রে আর সুবর্ণ'র পরিচয় দেব না। কেন না সবাই জানে, সে শুধু সুবর্ণ নয়। সে মিষ্টার গিরীশ রায়ের মেয়ে মিস্ সুবর্ণপ্রভা রায়। মিষ্টার ছিলেন একজন খাঁটি সাহেব—উপার্জন যা ক'রতেন, তার বেশী খরচ ক'রতেন। মিষ্টারের সঙ্গে দেশের কোন সম্পর্ক ছিল না। থাকবার ভেতর ছিল এই মেয়েটি। আর একটি ইহুদি মেয়ে ঘোরাঘুরি করত তার চারদিকে। মিষ্টারের সঙ্গে তার পরিচয়টা ছিল অত্যন্ত অস্পষ্ট। সুবর্ণ কোনদিন জানতেও চায়নি। দেশ ছেড়ে এসে মিষ্টার খুলেছিলেন এক কাঠের কারবার। পয়সাকে পয়সা জ্ঞান করা' তার বিধি-বহির্ভূত ছিল। মেয়েকে গড়ে' তুলেছিলেন নিজের রুচিমত। বাধা দেবারও কেউ ছিল না। সুবর্ণ'র চালচলনটা ঠিক বাঙালী ধরণের ছিল না। চিন্তায়, কথায়-বার্ত্তায় সুবর্ণ ছিল রেঙ্গুন শহরের বাঙালীমহলের যথেষ্ট অগ্রগামিনী। তার চোখের পাতায় পাতায় ঘুরত ওখানকার যুব-সমাজেরা। আভিজাত্যের সর্বপ্রকারের পদার্থগুলিকে সংগ্রহ করবার ভিতর ছিল সুবর্ণ'র অদম্য চেষ্টা। অস্থিরতা ছিল তার চেয়েও বেশী। কন্‌ভেণ্টে পাস ক'রে সুবর্ণ যেবার বেরিয়ে এল, মিষ্টার আমাদের সেবার মারা গেলেন। সুবর্ণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে কি করা যায়, মাসের পর মাস ভেবে ঠিক করল, কাঠের গোলাটাকে বিক্রি করে' ফেলাই শ্রেয়ঃ। কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন গেল। এমন সময়ে শুধু প্রতিবাদ করল এসে একটি ওদেরই কর্মচারী। বলল, কেন নষ্ট ক'রবেন!

সুবর্ণ স্পষ্ট জানাল, দোকান চালাবার জন্য তার জন্ম নয়। এর চেয়েও বড় কিছু আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সে এসেছে।

কর্মচারীটি হেঁট মুখে বেরিয়ে গেল। বিক্রি করে' সুবর্ণ পুরান বাসা ছেড়ে সাহেবপাড়ায় ঘর খুঁজতে গেল। অনেক খোঁজাখুঁজি করে' ঘর একখানা তার পছন্দ হ'লে চাকরবাকরেরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। ঘর আর তার পছন্দই হয় না!

বাড়ীখানা চারতলা। নীচের তলাটাই জন-কয়েক মুসলমান দর্জির দোকান। দোতলার একদিকে একজন খৃষ্টান ধাত্রী। অপর দিকে একজন বর্মি হোমিওপ্যাথি ডাক্তার। আর তেতলার গোটা ফ্ল্যাট নিল আমাদের সুবর্ণ। উপরটা ফাঁকা।

সুবর্ণ বাইরের দেহকে মেজে ঘসে' যে জলুসই আনুক—সে বাঙালীর মেয়ে। বছর ত্রিশের উপর তার বয়স। চোখ দুটো তার বড় বড়। চুলগুলোকে একটা পাক দিয়ে কাঁধের উপর ঝুলিয়ে রাখে! কোনদিকে তার ত্রুটি নেই। বাঙালী জাতকে সে অত্যন্ত ঘৃণা করে। চুড়ি, ব্রেস্‌লেট্, নোয়া, সিঁদূর—মাগো মা, এসব আবার কেউ

পরে নাকি? স্বর্ণ মাঝে মাঝে গাউন পরে' জড়তা কাটাবার চেষ্টা করে। সংসারে তার রুচিবোধকে আঘাত করবার কেউ নেই। সে বসে' থাকবার মেয়ে নয়। দোকান-বিক্রির টাকাটা ব্যাঙ্কে জমা রেখে সে কাজের যোগাড়ে বের'ল। রান্নাঘরে তার একটা মাইনে-করা লোক আছে। সেই সব করে। বিয়ের ফুল যে তার আজও ফোটেনি, এ কথা ভাবা ভারি অন্যায়। তার বাপ বেঁচে থাকতে থাকতে বেশ বড় বড় সম্বন্ধ এসেছিল। মিষ্টার আমাদের আন্‌কোরা আই. সি, এসের লিষ্ট্‌ উল্‌টিয়ে ছেলের হদিশ খুঁজতেন। দু'শো টাকার চাকুরে তার মনে ধরত না। বাপ মরে' যাবার পরও অনেক এসেছে, মিস্ কাউকে সাড়া দেয়নি। সুন্দরী ব'লে তার যথেষ্ট গর্ব। শহরের যুব-সমাজেরা ওর রুচিবোধকে ঘন ঘন প্রশংসা ক'রে চিঠি পাঠায়। স্বর্ণ হেসে কুটি-কুটি হয়ে যায়। একখানা উড়ো চিঠি এসে একদিন হাজির। স্বর্ণ খুলে' দেখে—একজন পাঞ্জাবী উকিল লিখেছে তাকে—"তুমি আর আমি আজ বসন্তকালের মাঝামাঝি এসেছি। আমার ভারি ইচ্ছে হয় পথের ধারে দাঁড়িয়ে তোমার হাতের মালা গলায় নিই। ভোলনি ত?"

স্বর্ণ তন্নতন্ন ক'রে দেখল, লোকটাকে সে চেনে কি না। অবশেষে হদিশ পেল। না, তাকে সে চেনে। কোথাকার টেনিস-লনে আলাপ হয়েছিল বটে। সে অনেক দিনের কথা। সে দিন স্বর্ণ তাকে কি বলেছিল, তার মনে নেই। যাই বলুক, লোকটার স্পর্ধা সে কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারল না। তখুনি লিখে দিল, ধান-কলে যে বুড়ীগুলো কাজ করে, তাদের তোমার প্রস্তাব জানিও। কিন্তু মনে রেখ, চল্লিশের নীচে যেন তাদের বয়েস না হয়।

মিস্ সেবার দেশভ্রমণে বেরুল। বেরুলে সে কোন কালে তাড়াতাড়ি ফেরে না। এবার মাঝপথে জুটে গিয়েছিল একজন ক্যানেডিয়ান সাহেব। স্বর্ণ তার ঘাড় ভেঙ্গে ঘুরে এল মালয়, ফিলিপাইন, বোর্ণিও দ্বীপ থেকে। মাস কয়েক পরে হাসতে হাসতে এসে হাজির।

আবার একদিন হঠাৎ উধাও। তিন মাস তার কোন খোঁজ নেই। ফিরে এলে জানা গেল, স্বর্ণ এবার বেড়াতে গিয়েছিল চীনে। সেখানকার নারী আন্দোলনে তার প্রবন্ধ অত্যন্ত উচ্চ প্রশংসায় সমাদৃত হ'য়েছে। বিলেতের নামকরা লেখকদের বই কিনে স্বর্ণ আলমারি সাজাল। একখানা বাংলা বই কোত্থেকে এসে পড়েছিল, স্বর্ণ নোংরা মনে ক'রে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

আজ কদিন হ'ল শরীরটা তার বেজায় খারাপ। বাইরে বড় একটা বেরোয় না। মোড়া চেয়ারখানা বারান্দায় পেতে দেহটা এলিয়ে দিল। একা মানুষ। কাজ নেই কোন। সময় আর তার কাটতে চায় না। সামনে টি-পটটার ওপর খানকতক মাসিক পত্রিকা ছড়ান। স্বর্ণ নিজের লেখা একটা প্রবন্ধের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। বেলা দশটা। একটি পাতলা গড়নের মেয়ে এসে দাঁড়াল। সাধারণ বাঙালীর মেয়ের চিহ্ন তার নির্বোধ সরল মুখে আঁকা। হাতে সরু দু'গাছি চুড়ি। মুখখানি মলিন। পরিধানের বস্ত্রে কোন অসাধারণত্বের চিহ্ন নেই। নিতান্তই বাঙালীর মেয়ে সে। পায়ের পাতা পর্যন্ত কাপড় নেমে এসেছে। নাম তার মায়ালতা।

কাগজখানা সামনে ঠেলে রেখে স্বর্ণ জিজ্ঞেস করল, আজকাল এক ডাকে সাড়া পাওয়া যায় না কেন? কোথায় ছিলে তুমি? ঘরে ছিলে না বুঝি?

মাথা হেঁট করে মেয়েটি জবাব দিল, না।

তবে ছিলে কোথায় শুনি? চাকরবাকরের সঙ্গে ব'সে ইয়ার্কি-ঠাট্টা করছিলে বুঝি? মান-সম্মান জ্ঞান যদি তোমার এক তিলও থাকে!

স্বর্ণ সোজা হয়ে বসে মুখ বিকৃত করে' শাসনের সুরে বলল, ওসব নোংরামি না করে' তার চেয়ে বিয়ে কর না কাউকে। সে ঢের ভাল। কোথায় গিয়েছিলে শুনি?

ভয়ে ভয়ে মৃদু কণ্ঠে মায়ালতা বলল, উপরে।

স্বর্ণ বিস্ময়ে শিউরে উঠল, উপরে! সে ত ফাঁকা! ভজনপূজন কিছু কর নাকি?

মায়ালতা লজ্জায় ঘাড় নুইয়ে বলল, একজন নূতন ভাড়াটে এসেছেন। ঢাকার ওদিকে তাঁদের বাড়ী। তাই—

কে এসেছে বল্‌লে? একজন ঢাকাই বাঙ্গাল? কি করে? কে সে? কি ব্যাচেলার? স্বর্ণ ক্রোধক্ষিপ্ত কণ্ঠে অনেক প্রশ্ন ক'রে গেল।

মায়া বলল, এখানকার একটা বিলিতি ব্যাঙ্কে মোটা মাইনের চাকরি করে।

সুবর্ণ ঠোঁট উল্‌টে বলল, চাকুরে? শ্লেভ? হিস্! কত মাইনে পায়? কে আছে?

মায়ালতা বলল, মাইনে ছ'শো টাকার উপর পান। স্ত্রী আছেন। দুটি ছেলে। বড় ছেলেটি জার্ম্মাণীতে এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গেছে। তার বিয়ে হয়েছে। স্ত্রী এখানেই থাকে। আর ছোটটি বছরখানেক হ'ল এম, এ, পাশ ক'রে এখানকার য়ুনিভার্সিটীতে কি নিয়ে যেন রিসার্চ করছেন!

—তাই বল। নইলে তীর্থ-কাকের মত ধর্ণা দেবে কেন? শুনেছ পাস-করা ছেলে আর কি রক্ষে আছে, মৌমাছির মত গরম চিনির রসে আটকে গেছ। কিন্তু তাদের বলি, এ কেমন বাঙালিনী ভদ্রতা? ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে আসা? যাক্—যাও, রান্নার কত দূর হ'ল দেখগে।

মায়ালতা চ'লে গেলে সুবর্ণ ভেবে স্থির করল, না, কালকেই আলাপ করতে হবে।

পরদিনই সুবর্ণ মায়াকে ডেকে বলল, কৈ চল দেখি কেমন লোক তারা?

দরজার কাছে সাড়া পেয়ে জয়ন্তী বেরিয়ে এসে অভ্যর্থনা করে' নিয়ে গিয়ে ঘরে বসালেন।

সুবর্ণ আড় চোখে চারিদিকে তন্ন তন্ন ক'রে চেয়ে দেখল। জয়ন্তী তাকে বসতে ব'লে অমিয়াকে পাঠিয়ে দিলেন। অমিয়া এসে তাকে বসতে ব'লে বলল, মায়ার কাছে আপনার কথা সব শুনেছি। আমার শ্বশুরবাড়ীর দেশেই ওর বাড়ী কিনা, তাই আমার শাশুড়ীর ওকে ভারি ভাল লাগে। সুন্দর হাতের কাজ জানে। একটু একটু রোজ শিখি। জানি, আপনি এলে হয়ত আর ওর সময়ই হবে না, তাই—

সুবর্ণ অমিয়ার পানে অনেকক্ষণ চেয়ে দেখছিল। তার নিজের কিছু বয়স হয়েছে। মুখের খাঁজগুলোকে ঢাকবার জন্য সে চেষ্টার কসুর করেনি। চামড়ার খাদ্য মুখে সে অনেক খাইয়েছে। চোখের পাতা থেকে পায়ের নখের রঙ অনেক বার বদল ক'রে সুবর্ণ দেখল, লাল আর সবুজ, ফিকে আর গাঢ়—কোন কিছুতেই দেহের আর তার উন্নতি হ'চ্ছে না। যে বয়সটাকে সে পিছিয়ে এসেছে, তাকে ফিরিয়ে পাবার কোন যো নেই। দেহকে লালিত্য দেবার চেষ্টায় অনেক দড়াদড়ি সে বেঁধেছে। যদিও সে কুমারী, কিন্তু কিছুতেই অবাধ্য দেহ তার শাসন মানেনি। না মেনে যেখানে ক্ষীণই হবার কথা, সেখানে অসভ্য রকম স্থূল হ'য়ে উঠে' তাকে বিব্রত ক'রে তুলেছে। অথচ এই প্রসাধনকুশলহীনা মেয়েটীকে দেখে তার মনে বেশ একটা হিংসার ভাব জাগল। মনের অস্পষ্ট ভাবটাকে দমন করে' সুবর্ণ বলল, শেলায়ের ও কি জানে! ওর মত একটা অপদার্থ মেয়ে, সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেও খুঁজে পাবেন না। ওর বাবা আগে আমাদের কাছে একটা অল্প মাইনের চাকরি করত। প্রথম এসেছিল আমার বাবার কাছে। গরীব দেখে বাবার দয়া হয়। লোকটা বছর কয়েক বাদেই প্লেগে মারা গেল। মেয়েটার কোন কূলে কেউ ছিল না ব'লে ভাবলাম, যাক্, আমারও তো একটা লোকের দরকার। মাইনে-কড়ি তো আর দিতে হবে না, একটা মানুষ কতই বা খাবে? এই মনে ক'রে এনেছিলাম আমার কাছে। লেখাপড়া ছাই জানে, নিজের নামটাও পর্যন্ত ইংরিজিতে লিখতে জানে না—এমন কথা শুনেছেন কখনও? দিনরাত কোন চাকর-বাকরের সঙ্গে হাসিহল্লা চলছে। এতটুকু যার আত্মসম্মান জ্ঞান নেই, সে শেখাবে আপনাকে সেলাই? মাই গড্!

অমিয়া বলল, কিন্তু সেলায়ের কাজ তো সুন্দর জানেন। আপনি বুঝি ওর হাতের ফুল তোলা কখনও দেখেননি? এই দেখুন আমার দেওরের রুমালে কি সুন্দর ফুল তুলেছে!

কথার মোড় ফিরিয়ে নিয়ে সুবর্ণ বলল, আমি ও-সব আইডল্ টাস্‌ক পছন্দ করিনি। ভেবেছিলাম মনের মত ওকে একটা কিছু ক'রে তুলব। কিন্তু—

সুবর্ণ আচম্‌কা পিছনে চাইল। একটি বছর পঁচিশের যুবা ঘরে ঢুকে অমিয়ার পানে চেয়ে বলল, আজ যেন আমার বালিশের উয়াড়ে ময়ূর আঁকা শেষ হয়, নইলে বৌদি ওঁকে জরিমানা দিতে হবে বলে' যাচ্ছি।

এই বলে' সে একবার মায়ার দিকে কটাক্ষপাত ক'রে বেরিয়ে গেল।

সুবর্ণ মনে মনে সবই বুঝল। খুব সহজেই কারণটা আবিষ্কার করতে পারল সুবর্ণ, মায়ার মনটা সব সময়ে যেন উন্মনা থাকে। তার কাজে আজকাল অযাচিত কোন জটলা পাকিয়ে ভুল দেখা দেয়।

সুবর্ণ তার দিকে চাইল বটে, কিন্তু সে এমনি ভাণ ক'রে বেরিয়ে গেল যে, সে এ ঘরে তার বৌদি আর মায়া ছাড়া কোন কিছুকে দেখতেই পায়নি। অমিয়ার দিকে তাকিয়ে সুবর্ণ জিজ্ঞেস করল, এইটিই বুঝি আপনার দেওর? কি করেন এখন?

—এম, এ-তে ইতিহাস ছিল। তাই নিয়ে এখন রিসার্চ করছেন।

—আই সী। তারপর এটা-ওটা অবান্তর কথা টেনে সুবর্ণ ঘরে ফিরে এল। চেয়ারের উপরে দেহ এলিয়ে দিল। নিতান্ত অকারণে মনটা তার টন্-টন্ করতে লাগল। ভেবে কিছুতেই সে হদিশ পেল না, মায়ালতার মত একটা নির্গুণী মেয়েকে কেন তারা অত আমল দেয়!

সুবর্ণ জানে, সে যে সব সমাজে মেশে, সেখানে সাধারণ কেউ পৌছতে পারে না। মেয়রের বাড়ী অবধি সে নিমন্ত্রণে যায়। বড় বড় সাহেব-মেমরা তার বন্ধু। স্বয়ং মাদাম কায়-শেক্ তাকে চীনে যাবার নিমন্ত্রণ করে' পাঠান। ফুল আর চিঠির তাড়া তার চোখে প'চে গেছে। এক বেলার বেশী সে একটা জামা কাপড় পরে না। বিদ্যার সে জাহাজ; ম্যাঞ্চেষ্টার গাডিয়ানে জার্মাণীর নাৎসী-বর্ব্বরতা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখে সে সমালোচকদের কাছ থেকে প্রশংসা পেয়েছিল। রাশিয়ার নারীজাগরণের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে সে 'গ্রীটিং' পাঠিয়ে নারীর কর্ত্তব্য বজায় রাখে। দু'শো তিন'শো টাকার মাইনের চাকরকে সে আমলই দেয় না। বিলিতি গেজেটে আন্কোরা পাস-করা সিভিলিয়ানদের নামগুলো নোট ক'রে লিখে এনে এক আধখানা উড়ো চিঠি সে লিখে থাকে। অবশ্য গুণাবলী সব উল্লেখ করতে তার ভুল হয় না। জবাব তাকে সবাই দেয়; আশার হোক বা নিরাশার হোক—কেননা সে মিস্ সুবর্ণপ্রভা রায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ ডিগ্রীর অধিকারিণী সে। চিঠির সঙ্গে যে ছবিখানা পাঠায়, তা' দেখেই স্পষ্ট আঁচ ক'রে নেওয়া যায়—সিভিলিয়ানদের স্ত্রী হবার মত সর্ব প্রকার যোগ্যতা তার মধ্যে বিদ্যমান। আজ অবধি সুবর্ণকে কেউ অসম্মান করেনি। কেবল সেবার একটি মারাঠি ছেলে তাকে বড্ড খোঁচা দিয়ে লিখেছিল, 'বাঙালীর ঘরে ছেলের মড়ক্ ধরেছে নাকি? যাই হোক্, আপনি লিখেছেন, মোটর চালাতেও জানেন। কিন্তু ভেবেই পাচ্ছিনে আস্তাবলের কোন্ ড্রাইভারকে তাড়িয়ে আপনাকে রাখব।' সুবর্ণও খুব কড়া ক'রে জবাব দিয়েছিল। সেটা এমন কিছু নয়। জীবনের একটা দিনের তুচ্ছতম ঘটনা মাত্র।

আর মায়ালতা!

সুবর্ণ মনে মনে হেসে উঠল, ঐ তো একহারা শ্যাম-বর্ণ পাতলা গড়ন। গাল দুটো টল্-টল্ করছে। হাত-গুলো না সরু, না একটু স্মার্টনেস্, কোন চুলো নেই, গরীবের মেয়ে। আজ যদি সুবর্ণ তাকে দূর ক'রে দেয়, না খেয়ে এই রেঙ্গুন শহরে মায়ালতাকে মরতে হবে। কাপড়খানাও পা অবধি এসে পড়ে। পরতে কি জানে ছাই! অপদার্থ জীব! ভগবানের সৃজিত সে যেন প্রথম অবজ্ঞার জীব!

মায়াকে আসতে দেখে সুবর্ণ জিজ্ঞেস করল, আজ চাল নিতে বারণ করেছ কেন?

মায়া অপ্রতিভ হয়ে বলল, আমার আজ নেমন্তন্ন আছে, তাই।

নিমন্ত্রণ? সুবর্ণ যেন বিশ্বাস করতে পারল না।

বলল, আজ ক' বছরের ভিতর যাকে কেউ এক বেলার জন্যেও নিমন্ত্রণ করেনি, আজ হঠাৎ কে করল শুনি?

মায়ালতা তেমনি ঘাড় নুইয়ে জবাব দিল, উপরকার মাসীমা।

—মাসীমা! কে আবার তোমার মাসীমা? এই মগের মুল্লুকে তার এতদিনে মা-মরা বোনঝির কথা মনে পড়ল, যঁ্যা!

কথার ভিতর কি তীব্রতা! মায়া বলল, অমিয়ার শাশুড়ী।

—তাই বল। বেশ বেশ, বল্‌তে বল্‌তে উঠে সুবর্ণ পায়চারি করতে লাগল।

—হাতে তোমার ওসব কি ?

—আচার। লেবুর আচার খেতে ওঁরা খুব ভালবাসেন। আমি বানাতে পারি জেনে—

স্থবর্ণ সজোরে ঘাড় নেড়ে বলল, বুঝেছি, আর বলতে হবে না। কোন রকমে মন জুগিয়ে চলা এই তো? কিন্তু ভবিষ্যতে মনে রেখ ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে যাওয়া মোটেই নিরাপদ্ নয়। আর তাদেরও মনে করিয়ে দিও, তোমাকে নিমন্ত্রণ করতে হ'লে, আমাকে এসে জানান উচিত ছিল। তোমার আর কি, আমার এ সমস্ত বাঙালিনী ভদ্রতা বরদাস্ত হয় না। যদি উপরে যাও, তবে নীচে ত্যাগ ক'র, আর,—স্থবর্ণ গম্ভীর হয়ে ভ্যানিটী ব্যাগটা তুলে' নিয়ে বেরিয়ে গেল। সিঁড়িতে অমিয়ার দেওরের সঙ্গে তার দেখা।

স্থবর্ণ কি মনে ক'রে জিজ্ঞেস করল, আপনারাই তো উপরে এসেছেন, না?

নির্ম্মল জবাব দিল, হ্যাঁ। মায়ার সঙ্গে আমাদের ওখানে এসেছিলেন যে আপনি।

স্থবর্ণ ঢোঁক গিলে বলল, মাত্র একবার আপনাকে দেখেছিলাম কি না, তাই চিনতে পারিনি। শুনলাম আপনি নাকি রিসার্চ করছেন? আমারও এক সময়ে ওদিকে ভারি ঝোঁক ছিল। শুনে খুব খুসী হ'লাম। আসবেন না একদিন আমার ওখানে!

এমন সময়ে উপর থেকে অমিয়ার গলা পাওয়া গেল।

—ঠাকুরপো বেলা অনেক হয়েছে। চান করে' খেয়ে কলেজ যেতে দেরী হয়ে যাবে। মিস্ রায়ের সঙ্গে পরে আলাপ ক'র।

অমিয়ার দিকে কটাক্ষে চেয়ে স্থবর্ণ নীচেই নেমে গেল।

বড় বড় হোটেলে তার পথ খোলা ছিল। এখানে ওখানে বন্ধুও তার ছড়ান ছিল। কিন্তু মন তার একদম দমে' গেছে। কিছুই ভাল লাগছে না। আজ সমস্ত রেঙ্গুন সহরটা তার কাছে যেন কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে। পথে এক-আধ-জন চেনা লোকের সঙ্গে তার দেখাও হ'ল, কিন্তু কাউকে আজ সে ধরা দিল না। একদল ছেলে তার বাড়ীর খবর রাখে। তারা পিছু পিছু এসে জিজ্ঞেস করলে, হাউ ডু ইউ ডু, মিস্?

স্থবর্ণ পরম উপেক্ষা ক'রে চলে আসছিল, পিছন থেকে একটা চাপা আওয়াজ এল, এনি নিউ বয় টু কীল?

কাণ দুটো স্থবর্ণ'র ঝাঁ-ঝাঁ করে' উঠল। অপমান বোধ তাকে খুঁচিয়ে তুলল। একটা ট্যাক্সি ডেকে সে মাঝ পথ থেকে বাড়ী ফিরল। চাকরবাকর কাউকে সে দেখতে পেল না। মায়ালতাও নেই। নিশ্চয় সে উপরে আছে। হাতের ব্যাগটাকে সে টেবিলের উপর ছুঁড়ে রাখল। দাঁড়াল এসে বারান্দার কোণে। উপর থেকে অমিয়ার দেওরের গলা পাওয়া গেল। মায়ালতাকে লক্ষ্য করে'ই তাদের হাসির তুফান বইছে। স্থবর্ণ'র বুকে কে যেন হাতুড়ির ঘা দিল। এর আগে কৈ স্থবর্ণ'র তো কখনও এমন হয়নি। এ কথা কি সত্যি, মেয়েদের চেনা যায় হৃদয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়? স্থবর্ণ'র মুখ-চোখ তাই তো বলছে। স্থবর্ণ তাড়াতাড়ি কপাটটা ভেজিয়ে দিয়ে সেখান থেকে সরে' দাঁড়াল। মায়ার ঘরের সামনে এসে সে তন্ন তন্ন করে' দেখল, এই ঘরে, এই সামান্য আসবাবপত্র নিয়ে মায়ালতা তার অনুগ্রহে বছরের পর বছর কাটাচ্ছে। এই সামান্য জিনিষকে অবলম্বন করে' কারু বাঁচা চলে না। অথচ, সে মরেও নি। কেন? এই যার অবস্থা, এমনি অনুগ্রহের ভিতর যার দিন কাটে, সেই সামান্য মেয়েটার উপর ওদের এত দরদ কেন? যে ভাল করে' জীবনে কোনদিন হাসতে পারেনি, পুরুষ দেখলে যে লজ্জায় সরে' দাঁড়ায়, সারা পৃথিবীতে যে এক মুঠো অন্নের কাঙাল, মানুষ তাকেই দিল হৃদয়ের দোর খুলে প্রবেশের জন্য?

স্থবর্ণ ঘরে বসে' থাকতে পারল না। কে যেন তাকে টেনে পথে বের করল। রেলওয়ে ষ্টেশনে এসে সে একটা লোকাল ট্রেনে চ'ড়ে বসল। থিঙ্কানজনের কাছাকাছি এসে গাড়ী দাঁড়াতেই একটি বাঙ্গালী পরিবার উঠল। স্থবর্ণ'র সঙ্গে তাদের চেনা ছিল।

মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, কেমন আছেন স্থবর্ণদি'?

স্থবর্ণ চমকে ফিরে চাইল। গোটা চার ছেলে-মেয়ে ঘিরে মেয়েটিকে বিরক্ত করে' তুলল।

স্থবর্ণ বলল, ভাল। তুমি কেমন আছ নীলিমা?

নীলিমা বলল, কেমন দেখছেন বলুন তো?

—মন্দ কি! এ ক'টি তোমারই ছেলে মেয়ে তো? আর উনি বুঝি তোমার—

নীলিমা ইঙ্গিতে বলল, আমার মামা। বর্মা স্টেট রেলোয়েতে কাজ করেন কি না; তাই একটু ঘুরতে গিয়েছিলাম। মামা, ইনিই আমাদের স্বর্ণদি, আমাদের স্কুলে কিছুদিন পড়িয়েছিলেন।

—তাই নাকি? বেশ। মামা যুক্ত করে নমস্কার করলেন।

নীলিমা জিজ্ঞেস করল, কি করছেন এখন স্বর্ণদি?

স্বর্ণ নীলিমার ছোট ছেলেটাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল, চলে' যাচ্ছে কোন রকমে। এইটেই তোমার ছোট ছেলে বুঝি? খাসা ছেলে তো?

ছেলেটাকে দেহের শেষ সীমান্তে টেনে এনে সে আরও চেপে ধরল—তার কচি-কচি আঙুলগুলোকে বার বার বুকের উপর টেনে এনে তাকে অস্থির করে' তুলল।

নিজের কাছে নিজেকে স্বর্ণ আজ অনাবৃত ক'রে ধরল, দেখল, কত ঋতুর পর ঋতু চলে গেছে বিস্মৃতির অন্ধকারে। কত দ্বাদশীর চাঁদ তার জীবনের আকাশ ছুঁয়ে উঠেছে, আর কত ক্ষয় হয়ে গেছে; কত তারা এল আর কত না গেল! কত না সমারোহ করে' সে দিন কাটিয়েছে। বাধা দেবার তার কেউ ছিল না, লোকাচারের ধার সে কোনদিনও ধারেনি। যখন যেদিকে মন চেয়েছে, নির্বিবাদে সে ছুটে গেছে। সন্তানের মা হওয়ার মত প্রবৃত্তিকে সে বরাবর ঘৃণা করে' এসেছে। পুরুষের পরাক্রমের কাছে পাছে তার স্বাধীনতা বন্দী হয়, সেই ভয়ে সে কারও কাছে বন্দিনী হয়নি। তার সভ্য পালিশ-করা মনটার কোন্ কোণে সেই আদিম নারীর প্রবৃত্তিটা বাসা বেঁধে ছিল, স্বর্ণ নিজেও তা জানত না। সে জানত—এমনি নারীজাগরণের ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে আমার আমিত্বকে প্রতিষ্ঠা করাই সব চেয়ে বড় জয়। কিন্তু সেই অনাগত জয়ের চলমান পথের উপর তার বহু জন্মের চিরন্তন নারীত্ব যে লুটিয়ে পদদলিত পুষ্পের মত পড়ে ছিল, এতদিন সে কথা তার মনেই আসেনি। আজ নীলিমার ছেলের ভিতর দিয়ে সে খুঁজে পেল তার সত্যিকারের অভাব কোন্‌খানে! অকারণে ছেলেটাকে বার বার মুখের কাছে টেনে সে চুমু খেতে লাগল।

—তোমার নাম কি খোকা?

পরের ষ্টেশনে নামবার সময়ে নীলিমা নামটা বলে' গেল, নাম ওর অজিত।

স্বর্ণও আর এগুল না। সেখান থেকেই ফিরল। সে ব্যাগ থেকে আর্সিখানা বার করে' একবারও মুখখানা দেখল না। মনটা আজ তার নিতান্তই খাপছাড়া। জীবনে তার কোন শৃঙ্খলা নেই, শৃঙ্খলও নেই। সমাজের বাইরে তার বাস। মায়ালতার মত সেও আজ একা। অদৃষ্টজোরে তার কিছু টাকা আছে, তাই সে অনেকের হৃদ্যতা পায়। তাই অনেকেই জোটে। তাকে ভালবাসা জানিয়েছে অনেকে; কিন্তু ভাল তাকে কেউ বাসেনি। স্বর্ণ হাড়ে হাড়ে আজ বুঝল, জীবনকে নিয়ে সে শুধু ছিনিমিনি খেলেছে। ঘৃণা তাকে কেউ করেনি সত্য, কিন্তু তাকে না দেখলে কেউ উৎকণ্ঠা নিয়ে জিজ্ঞেসও করেনি, কেন আসনি স্বর্ণ?

স্বর্ণ রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবল, তার ভেতর কি এমন কিছুই নেই, যার জন্যে কেউ তাকে খোঁজে? এত বড় পৃথিবীতে, এই বিশাল জনতার মাঝে কি সত্যই সে একা? আস্তে আস্তে মায়ালতার ঘরের সামনে এসে সে দাঁড়াল। মায়া তখনও ঘুমোয়নি।

—কি হ'চ্ছে মায়া?—স্বর্ণ'র কণ্ঠে কি সহজ সুর!

মায়া উঠে বসে জবাব দিল, বই পড়ছি।

—কি বই ওখানা? উপন্যাস—না রবি ঠাকুরের কবিতার বই?

মায়া তৃপ্ত কণ্ঠে জবাব দিল, এটা একখানা ছেলেদের বই। স্কুলে পড়ান হয়। পৃথিবীর আদিম নরনারীর বিচিত্র জীবনধারা নিয়ে লেখা। বেশ লাগছে।

স্বর্ণ জিজ্ঞেস করল, ওসব তুমি পড় নাকি? বুঝতে পার কিছু? আচ্ছা মায়া, তুমি এত তো পড়, বলতে পার, মানুষের সৃষ্টির সময়ে কোন্ জিনিষটা আগে এসেছিল? মানুষ, না, মানুষের মন?

মায়া বইখানা মুড়ে রেখে জবাব দিল, মন।

স্বর্ণ অবিশ্বাস কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, সে কি?

মায়া সহজ ভাবেই জবাব দিল, আগে এসেছিল মন, তারপর এসেছিল মানুষ। তাই মনের পিছু পিছু ছোটে মানুষ। মানুষের পিছনে মন ছোটে না।

স্বর্ণ কথাটাকে ঘুরিয়ে দিয়ে হঠাৎ বলল, মায়া, তুমি অদৃষ্টকে মান? দেবতাকে বিশ্বাস কর?

মায়া জবাব দিল, করি।

—কর? কেন? স্বর্ণ সহজে ছাড়বার মেয়ে নয়। শিকড় ধ'রে উঠে গেল শাখা-প্রশাখায়। ভারিক্কি চালে বলল, কেন কর? কি পাও অনড় দেবতার কাছ থেকে? ঐ জগদ্দল মূর্ত্তিগুলো তো একটা ব্যবসার মূলধন ছাড়া আর কিছুই নয়। কি বিনিময় পাও?

—কি পাই, তা' বলা শক্ত। জানি, বাঁচতে গেলে একটা অবলম্বন দরকার। দোর খুলে যাওয়া যায় ঘরে। অনড় মূর্ত্তির ভিতর দিয়ে জ্যোতির্ম্ময়ের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

—পার ঐ মূর্ত্তি একটাকে আঁকড়ে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ভাসতে? পার মায়া?

মায়া তেমনি সহজ ভাবেই জবাব দিল, সব জিনিষের মূলে আছে আত্মবিশ্বাস। আমি জানি—ও আমাকে ডুবিয়ে দেবে। তবু যদি আমার মনে সে জোর থাকে, ওকে আকড়েই আমি স্বরে' যেতে পারব।

স্বর্ণ উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, কাম্ টু দি পয়েন্ট! কেন এখন বিশ্বাসের কথা বলছ? কি হ'ল এখন তোমার আরাধ্য দেবতার? এই জন্তেই আমি ভগবানকে মানি নে মায়া। মানি নে মানে, তোমাদের প্রচারিত সত্তাকে মানি নে। আমার ভগবান সম্বন্ধে দর্শনশাস্ত্র আলাদা।

বলতে বলতে স্বর্ণ অন্তর্দ্ধান করল। মায়া ভাবল, বাঁচা গেল। স্বর্ণ আর ঘুরে আসবে না। যারা অভাবে, অনুগ্রহে, নিপীড়নে মানুষ হয়, তারা সত্যিকারের দর্শন শাস্ত্র কি জানে না, তাদের দর্শনশাস্ত্র হ'ল অভাব, হ'ল অন্নবস্ত্র। দেবতা থাকুন না থাকুন, তাতে কোন ক্ষতি নেই। দশভূজা হ'ন আর একভূজা হন, তাতেও আপত্তি নেই। দিনান্তে শুধু একটি প্রণাম করতে পেলেই তারা খুসী। মায়া সামান্য মেয়ে। সে কি করে' জানবে এসব বড় বড় তত্ত্ব! কিন্তু স্বর্ণ তখুনি ঘুরে এল।

দরজার কাছাকাছি আসতেই মায়া জিজ্ঞেস করল, আজ আপনাকে বড় চঞ্চল মনে হচ্ছে।

—চঞ্চল? স্বর্ণ হেসে উঠল। বলল, কোথায় দেখলে আমার চঞ্চলতা? আমার তো মনে হয় শরীরে আমার এক বিন্দু রক্ত নেই। জীবনে কত ঘটনা ঘটে' গেছে। সব মুছে গেছে আজ। মনে করে' রাখবার মত হয়ত ছিল না কিছু। আজ পঁয়ত্রিশ বছরের সীমায় দাঁড়িয়ে কি মনে হচ্ছে জান মায়া?

—কি মনে হ'চ্ছে?

—মনে হচ্ছে আমার শৈশবটাকে যদি নূতন করে' ফিরিয়ে পেতাম, সেই সব দিনকে সামনে রেখে জীবনকে আরম্ভ করবার আবার সুযোগ পেতাম, আমি নূতন হয়ে উঠতাম আবার। কিন্তু—, স্বর্ণ চুলের জট ছাড়াতে ছাড়াতে অসমাপ্ত কথার জের রেখে চ'লে গেল। মায়া ভাবল, স্বর্ণ'র নিশ্চয় কিছু হয়েছে। কিন্তু পরদিন উঠে দেখে, না তার কিছুই হয়নি।

স্বর্ণ সকালে বেরিয়ে ফিরল যখন, তখন সূর্য্য মধ্যাহ্ন আকাশে অবস্থিত। মায়াকে দেখতে না পেয়ে স্বর্ণ চাকর-বাকরকে ডেকে জানল, মায়া অমিয়াদের সঙ্গে কোথায় গেছে। বিকেলে ফিরবে ব'লে গেছে। জামা কাপড় ছেড়ে স্বর্ণ উপরে উঠে গেল। অমিয়াদের ঘরের সামনে আসতেই একটা ঝি বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, কাকে চান?

—কে আছেন ভিতরে?

—কর্ত্তাবাবু আছেন।

—ডাক তাকে। বল, নীচেকার মিস্ রয় এসেছেন। চেন তো আমাকে? মায়ালতা আমার কাছে—

ঝিটি ঘাড় নেড়ে বলল, আসুন আমার সঙ্গে।

স্বর্ণ তাকে অনুসরণ করল।

অপরিচিতা নারীকে দেখে বলাইবাবু ত্রস্ত হবার অবকাশ পেলেন না। স্বর্ণ পাশের চেয়ারখানা সহজেই দখল করে নিয়ে বলল, আমাকে আপনি ঠিক চেনেন না। ঐ যে মায়ালতা মেয়েটি আসে, ও আমারই কাছে থাকে।

বলাইবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, বুঝতে পেরেছি। দরকারটা কি বলুন তো?

—তেমন কিছু নয়।—সুবর্ণ এদিক্ ওদিক্ চেয়ে বলল, আমি আশ্রয় বা চাকুরি কোনটার জন্যেই আসিনি। জানতে এসেছি ঐ মেয়েটাকে আপনারা অনর্থক কেন প্রশ্রয় দিচ্ছেন! আপনি বেশ জানেন, ও সোমত্ত মেয়ে। ঘরে আপনার সোমত্ত ছেলে। পরে আপনারা যখন চলে যাবেন, তখন ওর বিয়ে দিতে ভয়ানক মুস্কিল হবে আমাকে। সব চাপা যায়, কলঙ্ক আর আগুন কি চাপা থাকে? এত হৈ-চৈ ক'রে বেড়ায়, সেটা কি ভাল?

বলাইবাবুকে তথাপি নিরুত্তর দেখে সুবর্ণ একটু দরদ মিশিয়ে বলবার চেষ্টা ক'রল, আপনারা চলে' গেলে ওকে আর আগেকার মত সহজে পাওয়া যাবে না। জানালার কাছে বসে সময়ের অপব্যয় ক'রবে। আর তা' ছাড়া মেয়েদের সতীত্ব বলে'ও তো একটা জিনিষ আছে।

ব'লে সুবর্ণ বলাইবাবুর পানে ভীরু কটাক্ষে চাইল। বলাইবাবু তাতে এতটুকু টললেন না। ম্লান তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে জিজ্ঞেস করলেন, সতীত্ব বলতে কি বোঝেন আপনি?

সুবর্ণর গায়ের ভিতর যেন জ্বালা ক'রে উঠল, বলল, পদস্খলনের আখ্যা দিয়ে যাকে ব্যাখ্যা করেন। শেষের দিকে সে বেশ একটু টেনে টেনেই বলল।

বলাইবাবু বললেন, ছেলে আর মেয়ের দূরত্ব বাঁচিয়ে রাখাটাই কি চরম সতীত্বের নমুনা?

—আপনি কি বলেন? আপনার সমাজ কি বলে?

বলাইবাবু বললেন, যাই বলুক। আপনি কি বলেন, তাই শুনি। এই যে আপনি হৈ-হৈ করে' বেড়াচ্ছেন, আপনারও তো সেটুকু জানা উচিত ছিল।

—হোয়াট্ ডু ইউ মিন্ টু সে? সে আর আমি? হাসালেন আপনি। আমার তো উপায় আছে। তার? ভবিষ্যৎটা একবার ভেবে দেখুন তো!

বলাইবাবু অবিচল কণ্ঠে বলল, অনেক আগেই ভেবেছি এবং পথ একটা আবিষ্কারও করেছি।

—মানে? সুবর্ণ বড় বড় কাণ দুটো পেতে দিল।

বলাইবাবু বললেন, মায়ার সম্বন্ধে উৎকণ্ঠার আর আপনার কোন কারণ নেই। বিদেশে বিঁভুয়ে আপনি ওর অনেক করেছেন। তার প্রতিদানে কিছুই দেওয়া সম্ভব নয়। তবু এই বুড়ো মানুষটির অনুরোধ রইল—মিস্ রয়, সামনের বোশেখে যেন কোথাও যাবেন না। চীন কি তুর্কিস্থানের চেয়েও কাছাকাছি থাকবেন।

সুবর্ণ তার কথা শুনে অবাক্ হ'য়ে গেল।

বলল, কি ব্যাপার বলুন তো?

বলাইবাবু হেসে বললেন, ভেবেছিলাম আপনি খুব চালাক মেয়ে—এর বেশী খুলে না বললেও, সহজেই বুঝবেন। আমার ছোট ছেলেটিকে দেখেছেন তো?

সুবর্ণ চট্ ক'রে কথাটা ঘুরিয়ে দিয়ে বলল, কিন্তু মায়ার কি এমন যোগ্যতা আছে? না জানে লেখাপড়া, না জানে কাজ-কর্ম, ওকে দিয়ে কি ক'রবেন? মায়ার বিয়ে হওয়া উচিত একটা প্রাইমারি স্কুলের মাষ্টারের সঙ্গে। আপনার পুত্রবধূ হবার যোগ্যতা নেই।

বলাইবাবু বললেন, যারা সরল, যারা বোকা, তাদের উপর আমার একটা চিরকালের মোহ আছে মিস্ রয়। আমি বেশ জানি, মনে ওর পালিশ নেই। সভ্য সমাজে হয়ত অচল। তবু ভরসা আছে যে, ওকে ভেঙ্গে গড়ে নিতে পারব। কাঁচা পুতুলকে ভেঙ্গে মনের মত গড়া যায়। কিন্তু যারা পুড়ে ছাঁচে একবার ঢালাই হ'য়ে আসে, তাদের ভেঙ্গে আর মনের মত গড়া যায় না। শুধু ভেঙ্গেই যায়। কি হবে ওর যোগ্যতা বিচার করে'?

—এই হ'ল আপনাদের 'মনোপলি ট্র্যাডিশনাল ক্লেম' এর ভিতর কোন সূক্ষ্ম বিচার নেই। মডার্নিজমএর খারাপটাই দেখেছেন, ভালটা দেখবার সৌভাগ্য আপনার হয়নি হয়ত। বলতে বলতে সুবর্ণ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

বলাইবাবু বললেন, বসুন। চা আনতে বলি।

—নো। থ্যাংক্ ইউ।

সুবর্ণ দ্বিরুক্তি না ক'রে নীচে নেমে গেল। ঘরে এসে সে এক দারুণ অশান্তিতে ছটফট্ করতে লাগল। জীবনের চারদিক্‌টা আজ যেন হাহাকার তুলল।

মাসখানেক গেছে। সুবর্ণ সকালে কাগজের একটা কাটিং কেটে একখানা চিঠি লিখছে, এমন সময়ে পিওন

একখানা চিঠি দিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি খুলে' দেখে চিঠিখানা আসছে টেলিগ্রাফ অফিসের সাহেবের কাছ থেকে।

'জয়েন ইমিডিয়েট্‌লি য়্যাট্ আওয়ার কলম্বো অফিস।'

স্বর্ণ সারা সকাল ছুটে ছুটে যাবার আয়োজন করল। ব্যাঙ্কের টাকা ট্র্যান্‌স্‌ফার করা, বাড়ী ভাড়া চোকান, চাকর-বাকরের মাইনে, আরও এক-আধটা খুচরো পাওনা চুকিয়ে সে যখন ফিরে এল, তখন বারোটা বাজে।

চারটেয় তার জাহাজ।

চাকর-বাকরদের ডেকে সে জবাব দিল। জবাব দিল না শুধু মায়াকে। তাকে ডেকে বলল, আজ আমায় চ'লে যেতে হ'চ্ছে মায়া।

মায়া পরম আগ্রহে জিজ্ঞেস করল কোথায়?

হাতে ঘড়ি বাঁধতে বাঁধতে স্বর্ণ জবাব দিল, কলম্বোতে। ফ্ল্যাট আমি ছেড়ে দিচ্ছি। এখানে আর ফের্‌বার সুযোগও হবে না, দরকারও হবে না। যাক্, যদি নিতান্ত এসেই পড়ি, তুমি থাকবার একটু জায়গা দেবে না? না, আমায় দেখে সেদিন দরজাটা বন্ধ করে দেবে?

মায়ার চোখ-দুটো জলে টস্‌টস্ করে' উঠল। মায়া একান্ত অনুতপ্ত কণ্ঠে বলল, স্বর্ণদি, এখনও তো আপনার পায়ে চটি আছে, কেন তবে অপমান করছেন? স্বর্ণ অল্প হেসে বলল, আই সী। তুমি অপমান বোধ করছ? তবে আর বলব না। এই বলে' সে নিজের যাবার আয়োজনের দিকে একবার চোখটা বুলিয়ে নিল। শুদ্ধ দ্বিপ্রহর। স্বর্ণ'র যাওয়ার আয়োজনের পানে তাকিয়ে মায়ার মনে পড়ল, স্বর্ণ চলে গেলে এ ঘরে আর তাকে দেখা যাবে না। হয়ত স্বর্ণর মত উচ্ছৃঙ্খল মেয়ে এ সহরে আর নেই, তবু সে শুধু স্বর্ণ। দোষে গুণে জড়ান মেয়ে। মায়ালতার নির্ব্বাক্ মুখের পানে তাকিয়ে স্বর্ণ অনুতাপ মিশিয়ে বলল, তোমার বিয়ের নিমন্ত্রণ খাওয়া অদৃষ্টে ঘটে উঠল না মায়া। কিন্তু ছেলে হ'লে, পত্র-যোগে জানাবে তো?

মায়া লজ্জায় ও অপরিসীম বেদনায় ঘাড় নামিয়ে নিল দেখে' স্বর্ণ বলল, লজ্জা পাচ্ছ? আমার লজ্জা নেই। খোলাখুলি ব'লতে আমি চিরকাল ভালবাসি। আমি বেশ বুঝেছি, জীবনে আমার মত মেয়ে কোনদিন শান্তি পেতে পারে না। আমার চাওয়ার অন্ত নেই ব'লেই হয়ত আমি কিছুই পেলাম না। বাইরে এসেছি অথচ কেন যে ঘরের টান—তা' বুঝিনে। বুঝি সবই—কিন্তু উপায় কি? আই কান্‌ট্ হেল্‌প! অনেক বকেছি তোমাকে। আজও বড় বোনের মত বলে' যাচ্ছি, ঘরেতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবার যার কোন যোগ্যতা নেই, বাইরে এসে সেই শুধু হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দেয়। বিয়ে হবার যে মেয়ের আর কোন আশা নেই, সেই শুধু অবিবাহিত জীবনের জন্য লালায়িত হয়। এই চাপরাসি, সব লে গিয়া?

চাপরাসি ঘাড় নেড়ে জবাব দিল।

ব্যাগটা তুলে' নিয়ে স্বর্ণ মায়ালতার দিকে হাতখানা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'লেট্ আস্ হ্যাভ্ হ্যান্ড্ ইন হ্যানড্ টু ডে', আবার কবে দেখা হবে তার তো ঠিক নেই। একটু মনে রেখ শুধু। তোমার ভাবী স্বামীকে আমার নমস্কার জানিও। আচ্ছা, আসি মায়া। জাহাজের সময় হ'য়ে এসেছে।

ব'লে স্বর্ণ চাপরাসির পিছু পিছু নামতে নামতে আয়নাটা বার ক'রে একবার মুখখানা দেখে নিল। আয়নার ভিতর দিয়েই দেখল, সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে মায়া। মুখ তার শুকনো। স্বর্ণ আর একবার ঘাড়টা ফিরিয়ে বলল, গুড্ বাই মায়া!

কপাটে হেলান দিয়ে স্বর্ণর ঘরের দিকে চাইতেই মায়ার চোখ দিয়ে ঝর-ঝর করে' জল নেমে এল। জন-সমাজ যাই বলুক, মায়ালতা তো নারী ছাড়া কিছু নয়!

বৈচিত্র্য

রক্তদান

যুদ্ধের নৃশংস বর্ব্বরতার চিত্রই সাধারণতঃ চোখের সামনে ভেসে ওঠে, কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে মানবতার কারুণ্য ও দাক্ষিণ্যের যে অনুশীলন হয়, তা অনেক সময় অন্তরালেই থেকে যায়। বিজ্ঞানের খারাপ দিক যাই হোক, অন্ততঃ সমগ্র মানবসমাজকে সুখে দুঃখে, ব্যথা বেদনায় যে মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে, এ কথা অস্বীকার করা চলে না। বস্তুতঃ ধনী, দরিদ্র, চাষী, মজুর সকলেই এই হিসাবে বর্ত্তমান যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েছে।

রক্তদানের দৃশ্য : মেয়েটির শরীর থেকে প্রায় দেড়পো রক্ত নেওয়া হয়েছে

ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্রে ব্রিটিশের আহত সৈন্যদের সতেজ করে' তুলবার জন্য আমেরিকায় একটি সঙ্ঘ স্থাপিত হয়েছে। এই সঙ্ঘ মার্কিনবাসিদের রক্ত সংগ্রহ করে' ইংলণ্ডে চালান দিয়ে থাকে। স্বেচ্ছায় রক্তদান করার আগ্রহে মার্কিন মুল্লুকে বিস্ময়কর চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। শত শত মণ রক্ত এরই মধ্যে ইংলণ্ডে রপ্তানী হয়ে গেছে। রক্তদানকারীর ভীড় সামলানো এক বিপুল সমস্যা। শুধু এই কাজের জন্যই একটি টেলিফোন অফিস খোলা হয়েছে। এদের সময় নির্দ্দেশ করে' দেবার জন্য বহু মেয়ে চব্বিশ ঘণ্টা টেলিফোন ধরে থাকে।

রক্ত থেকে রক্তকণিকা বাদ দিয়ে তরল পদার্থটুকু সংগৃহীত হয়ে থাকে এবং উহা আহত সৈনিক বা নাগরিকদের শিরার মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত করার ফলে বহু মরণযাত্রীর প্রাণরক্ষা পেয়ে যায়।

রক্তদানের জন্য দাতারা ময়দানে সারি দিয়ে শুয়েছে - ভীড়ের জন্য এরূপ করা হয়

বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে রক্তলালা নিঃসরণ করা হচ্ছে

রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চ

শ্রীতারাকিশোর বর্দ্ধন

পটভূমিকা—

বিগত সংখ্যায় আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, নববর্ষারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই বর্ত্তমান মহাসমর নাটকের তৃতীয় অঙ্কের অভিনয় আরম্ভ হইবে। পাঠকগণ জানেন যে, এই অঙ্কারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই জার্ম্মাণ বাহিনী একদিকে লাইবিয়ার পুনরধিকার ও অন্যদিকে যুগোস্লাভিয়া ও গ্রীস আক্রমণ করিয়াছে। এক্ষণে যে সব ঘটনা রঙ্গমঞ্চে পরিদৃষ্ট হইবে, তাহাদের পটভূমিকায় কি কি ব্যাপার of finance capital বলা হয়। এই প্রকার রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থার বিপক্ষে জার্ম্মাণী, ইটালী, জাপান ও রুষিয়া প্রতিবাদী হইয়া দাঁড়ায়। ভার্সেলিসের বিধান ধ্বংস করিয়া উহারা পৃথিবীতে নববিধান প্রতিষ্ঠা করিতে চায়। অবশ্য ভবিষ্যতে নববিধান কি রূপ পরিগ্রহ করিবে, সে বিষয়ে জার্ম্মাণী ও রুষিয়ার মনোভাবে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। তথাপি বর্ত্তমান বিধানের পরিবর্ত্তন সাধনে রুষিয়া কোনও
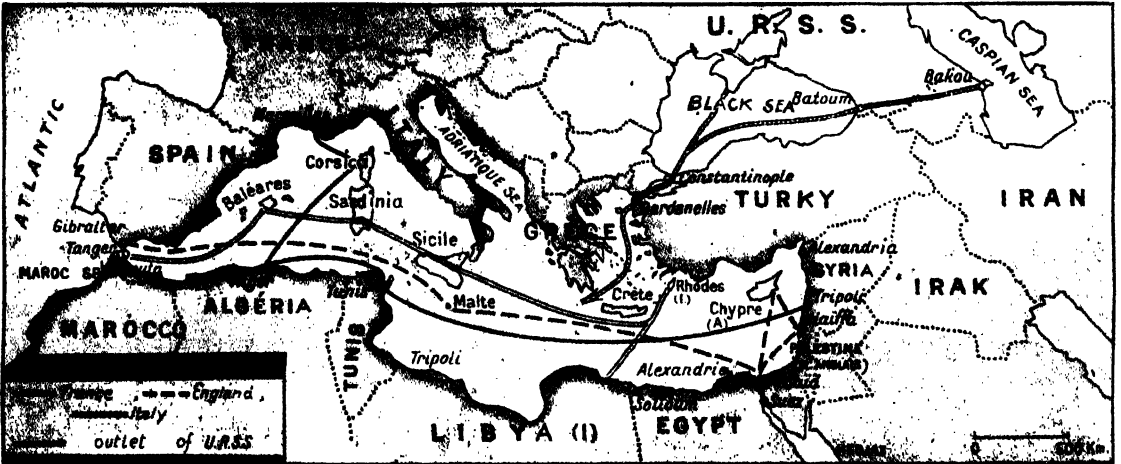
বর্ত্তমান মহাসমরের অন্যতম রঙ্গমঞ্চ ভূমধ্যসাগর : ব্রিটিশের 'লাইফ-লাইন' ভূমধ্যসাগরকে কেন্দ্র করিয়াই অবস্থিত

রহিয়াছে, বর্ত্তমানে আমরা তাহারই আলোচনা করিব। এই আলোচনার প্রথমেই জার্ম্মাণী ও রুষিয়ার ও পরে জার্ম্মাণী, ইটালী ও মার্কিণ যুক্তরাজ্যের রাজনৈতিক সম্পর্ক নির্ণয় করিতে হয়। বর্ত্তমান মহাসমরের কারণটি নির্ণয় করিতে পারিলেই জার্ম্মাণী, রুষিয়া ও আমেরিকার রাষ্ট্রীয় নীতি পরিচালনার রহস্য বোধগম্য হইবে।

ভার্সেলিসের সন্ধি-সর্ত্তানুসারে লীগ অব নেশন্স্ প্রতিষ্ঠিত হইলে পর পৃথিবীর যে অর্থ-নৈতিক কাঠামো গড়িয়া উঠে, তাহাতে দেখা যায় যে, এই ধরিত্রীর যাবতীয় ধনসম্পদের উপর ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও মার্কিণ যুক্তরাজ্যের [illegible]ত অধিকার দাঁড়াইয়াছে। উহাকে tyranny প্রকারের বাধা সৃষ্টি করিবে না—এই তত্ত্বের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া রুষিয়া ও জার্ম্মাণীর মধ্যে মিতালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া সমাজতন্ত্রী রুষিয়া চায় এক শ্রেণী-সর্ব্বস্ব রাষ্ট্র গড়িতে এবং নাৎসীবাদী জার্ম্মাণী চায় এক গোষ্ঠীসর্ব্বস্ব রাষ্ট্র গড়িতে। রুষিয়াতে সমাজতন্ত্রবাদ বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে। জার্ম্মাণীতে নাৎসীবাদও বৈপ্লবিক রূপান্তর (revolutionary change) ঘটাইয়াছে। এস্থলে বর্ত্তমানে রুষিয়া ও জার্ম্মাণীর রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক যে মলোটোফ্ ও রিবেনট্রপের দ্বারা যে ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, তাহাতে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, উভয় দেশের দুইটী বৈপ্লবিক ধারা পরস্পর পরস্পরকে

বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে (two revolutions are understanding each other)। ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করিয়া ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের পর হইতে রুষিয়ার কার্য্যাবলীর পর্য্যালোচনা করিলে উক্ত সমস্যার সন্তোষজনক মীমাংসায় উপনীত হওয়া যাইবে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব হেতু আমাদের অনেক সাম্যবাদী বন্ধু পরস্পর বিরোধী ভাব-দ্বন্দ্বের ঘাত প্রতিঘাতে হাবুডুবু খাইয়া থাকেন। জার্ম্মাণীর সঙ্গে রুষিয়ার যে সম্পর্ক এখন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা যুদ্ধের পরও বদলাইয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়াই আমাদের ধারণা। রুষিয়া ও জার্ম্মাণীর এই নূতন সম্পর্কের ভিত্তির উপরেই ফ্রান্স ও জার্ম্মাণীর সম্পর্ক এবং রুষিয়া ও জাপানের মিতালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমানের সামরিক পরিস্থিতির যথেষ্ট তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, এই তথ্য সর্ব্বতোভাবে অধিগত থাকা চাই। তাহা হইলেই বুলগেরিয়া, যুগোস্লাভিয়া ও তুরস্কের সঙ্গেও রুষিয়ার অনাক্রমণ চুক্তির বৈশিষ্ট্য বুঝিতে পারা যাইবে।

জেনারেল ইজমৎ ইনিনু: তুরস্ক রিপাবলিকের সভাপতি

বিজয়বার্ত্তা ঘোষণারত হের হিটলার

জার্ম্মাণীর পররাষ্ট্র-সচিব হের ভন রিবেনট্রপ

আমেরিকা—

মার্কিণ যুক্ত রাজ্যের সঙ্গে ইংলণ্ড ও জার্ম্মাণীর সম্পর্ক যে কি, তাহা ভালরূপে অধিগত না থাকিলে, বর্ত্তমান সময়ের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইবে না। মার্কিণ রাজ্য ইংলণ্ড ও ফরাসীর সহযোগীতায় পৃথিবীর ধনসম্পদের উপর প্রভুত্ব করে। তাহা ছাড়া মন্‌রো নীতির বলে পশ্চিম গোলার্দ্ধের উপর তাহার রাজনীতিক প্রাধান্যও অপরিসীম। উহার সামরিক শক্তি, রাষ্ট্রনৈতিক প্রভাব ও অপরিমিত ধনসম্পদের (finance capital) বলে সে দক্ষিণ আমেরিকার রাজ্যগুলির উপরে অপরিসীম প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে। পৃথিবীতে নববিধান প্রতিষ্ঠা যাহারা করিতে চায়, তাহারা দক্ষিণ আমেরিকার রাজ্যগুলির উপর মার্কিণের প্রভাব সহ্য করিতে পারে না। এই জন্যই দক্ষিণ আমেরিকায় জার্ম্মাণীর জোর প্রচার কার্য্য চলিতেছে। কিন্তু জার্ম্মাণীর প্রচার কার্য্য সেখানে খুব সুবিধা হওয়ার কথা নয়। কারণ ঐ অঞ্চলের অধিবাসিগণ স্পেনীয়গণের বংশ-সম্ভূত। এই জন্যই জার্ম্মাণী ১৯৩৬ সালে স্পেনে গৃহযুদ্ধ বাধাইয়া জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্ব সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। এখন জেনারেল ফ্রাঙ্কোর তরফ হইতে স্পেনীয় ফ্যাসিষ্ট-গণের প্রচার-চেষ্টা দক্ষিণ আমেরিকা হইতে মার্কিণের প্রভাব বিলুপ্ত হইবার সুত্রপাত হইয়াছে। কিন্তু মার্কিণে যুক্তরাজ্য বিনা সংঘর্ষে এ প্রভাব নষ্ট হইতে দিবে, এমন মনে হয় না। সুতরাং ইংলণ্ডকে সাহায্য করিবার উপলক্ষেই হউক বা জাপানকে বাধা দিবার

উপলক্ষেই হউক, অথবা দক্ষিণ আমেরিকায় নিজের প্রভাব রক্ষার জন্যই হউক, মার্কিন যুক্তরাজ্যের পক্ষে যুদ্ধে না নামিয়া উপায় নাই। কারণ আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই যুদ্ধের কারণই হইতেছে ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ফ্রান্সের অর্থ-নৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রভুত্ব বিনষ্ট করা। ইংলণ্ডের পক্ষ হইতেও মার্কিণকে যুদ্ধে নামাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চলিতেছে। প্রয়োজন হইলে Lease and Lend bill-এর কল্যাণে সাম্রাজ্যের উজ্জ্বলতম রত্ন পর্য্যন্ত বন্ধক দিয়া বৃটেন মার্কিণের সাহায্য ক্রয় করিবে। যদি মার্কিণ যুক্তরাজ্য যুদ্ধে নামিয়া পড়ে, তবে ক্রমশঃ Federation of the English Speaking races নামক একটি সংহতিও গড়িয়া উঠিতে পারে। বর্ত্তমান ঘটনাসমূহের প্রগতি লক্ষ্য করিয়া উহার সম্ভাবনার কথাই আমাদের মনে উদিত হইতেছে।

ইতালীর পররাষ্ট্র সচিব কাউন্ট সিয়ানো

ইটালী—

বর্ত্তমান যুদ্ধে যোগ দিয়া ইটালী তাহার রণনৈপুণ্যের অসারতা প্রমাণ করিয়াছে। উহার জন্য জার্ম্মাণীকে বহু পরিমাণে ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। কিন্তু ইটালীর ইতিহাসে দেখা যায় যে, সে কোনও যুদ্ধেই নিজে জয়ী হইতে পারে নাই। প্রত্যেক যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও তাহার মিত্রশক্তি জয়লাভ করায়, সে আখেরে বিজয় গৌরবের অংশ প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৮৬৬ সালে প্রুশিয়া ও ইটালী একত্র যোগে অষ্ট্রিয়ার বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইটালীয়গণ অষ্ট্রিয় সৈন্যদলের দ্বারা পর্য্যুদস্ত হইলেও, বিসমার্ক-পরিচালিত প্রুশিয়দলের নিকট অষ্ট্রিয়া সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়। ফলে সন্ধিসর্ত্তে পরাজিত ইটালী বিজয়ের অংশ পায়। ১৮৭০ সালে ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয় যুদ্ধে ফরাসী দেশ প্রুশিয় সৈন্যের দ্বারা পদদলিত হইলে, ইটালী রোম নগরী অধিকার করিয়া বসে। উহা পূর্ব্বে ফরাসী সৈন্যের অধিকারে ছিল। আবার ১৯১৪ সালের ইউরোপীয় মহাসমরে ইটালী মিত্রশক্তির সহিত যোগদান করে এবং প্রত্যেক যুদ্ধে অষ্ট্রিয় বাহিনীর নিকট পরাজিত হয়। কিন্তু ১৮১৯ সালের ভার্সেলিসের সন্ধি-সর্ত্ত রচনার সময়ে ইটালী বিজয়ীর গৌরবে গৌরবান্বিত হয়। এ বিষয়ে ইটালীর সৌভাগ্য ইতিহাস-পাঠকের অবিদিত নাই। ঐতিহাসিক ভাগ্য এ বারেও পুনরাবর্ত্তিত হইবে কিনা, কে বলিতে পারে? জার্ম্মাণীর সঙ্গে মার্কিণ ও রুশিয়ার যে সম্পর্ক দাঁড়াইবে, ইটালীর সঙ্গে ঠিক সেই প্রকার সম্পর্কই তাহাদের থাকিবে।

ভূমধ্যসাগর—

এক্ষণে আমরা এ মাসের সামরিক ঘটনার আলোচনা করিয়া বৃটিশবাহিনী লাইবিয়াতে ইটালীয় বাহিনীকে পরাস্ত করিব। তাহার প্রধান ঘাঁটি বেনঘাজি পর্য্যন্ত দখল করিয়াছিল এবং বৃটিশ ও গ্রীকবাহিনী ইটালীয়গণকে হটাইয়া এলবেনিয়ায় প্রায় এক চতুর্থাংশ পর্য্যন্ত দখল করিয়াছিল। তারপর হইতে জার্ম্মাণী ইটালীর সাহায্যের জন্যই হউক অথবা পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত কার্য্যক্রমানুসারেই হউক বিগত ৬ই এপ্রিল তারিখে যুগোস্লাভিয়া ও গ্রীস আক্রমণ করে। বল্‌কানে মাত্র এই দুইটী দেশই মিত্র-শক্তির পক্ষে দণ্ডায়মান হয়। কিন্তু মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে যুগোস্লাভিয়ার ও গ্রীসের সৈন্যদল আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। এই উভয় দেশ পর্ব্বতসঙ্কুল বলিয়া ঐতিহাসিক কাল হইতেই অভিযানকারীদের গর্ব্ব চূর্ণ করিয়াছে। তাহার উপর এবারে বৃটিশবাহিনীর দ্বারা পরিরক্ষিত হইয়াও বল্‌কানের পর্ব্বতরাজী অভিযান-কারীর গতি রোধে সমর্থ হয় নাই। আধুনিক যান্ত্রিক-বাহিনীর দুর্ব্বার গতি! গ্রীসে পাঁচ লক্ষাধিক বৃটিশ সৈন্যদল অবস্থিত ছিল।

ইতিমধ্যে জার্ম্মাণ যান্ত্রিকবাহিনী লাইবিয়ার সমস্ত ইতালীর হৃত রাজ্য পুনরধিকার করিয়া মিশর দেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। জার্ম্মাণগণ সিসিলি দ্বীপ হইতে রাত্রির অন্ধকারে গোপনে আফ্রিকায় পার হইয়া

যান্ত্রিক যুদ্ধের যাবতীয় সরঞ্জাম লাইবিয়ায় জড় করিয়াছিল। তাহাতে দেখা যায় যে, উহারা প্রায় ১০০০ ট্যাঙ্ক ব্যবহার করিয়া এক হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে, এবং বৃটিশবাহিনীর বাধা উল্লঙ্ঘন করিয়া মিশর দেশে পৌছিয়াছে। উহাতে তাহারা যান্ত্রিক যুদ্ধের এক নব পরিচ্ছেদ রচনা করিল। কারণ এই দুরন্ত গ্রীষ্মে, মরুভূমির ভিতর দিয়া এত দ্রুত গতিতে আর কেহ কখনও সাফল্য লাভ করে নাই।

এখন ইটালো-জার্ম্মাণ সৈন্যদল পশ্চিম প্রান্ত হইতে মিশর আক্রমণ করিয়াছে। আবার এদিকে গ্রীস-বিজয়ের পর জার্ম্মাণবাহিনী ইরাক, প্যালেষ্টাইন এবং সুয়েজ খাল অতিক্রম করিয়া মিশর দেশের পূর্ব্ব প্রান্ত আক্রমণ করিবার অভিলাষ করিয়াছে। তবে জার্ম্মাণ-বাহিনী কি ভাবে ইরাকে পৌছিবে, তাহা এখনও বলা যায় না। যদি তুরস্ক তাহাকে যাইবার অধিকার দেয়, তবে আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি খুব গুরুতর আকার ধারণ করিবে। জার্ম্মাণী উহার জন্য তুরস্কের উপর কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করিতেছে। যদি তুরস্কের সহায়তা তাহারা না পায়, তাহা হইলে জলপথে জার্ম্মাণবাহিনী সিরিয়াকে ঘাঁটিতে পরিণত করিয়া, ইরাক ও প্যালেষ্টাইন আক্রমণ করিতে চাহিবে। এক্ষণে জার্ম্মাণীর চূড়ান্ত অভিসন্ধি হইতেছে—সুয়েজ খাল ও জিব্রাল্‌টারকে যুগপৎ অধিকার করা। এই জন্য একদিকে তুরস্ক ও অন্য দিকে স্পেনকে সে কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করিতেছে। উহার ফলাফল সত্বরই জানা যাইবে।

নৌযুদ্ধ ও বিমান-যুদ্ধ—

ভূমধ্য সাগরের যুদ্ধ ব্যতীত আটলাণ্টিক মহাসাগরে সাবমেরিন ও বিমান দ্বারা জার্ম্মাণী বৃটেনের বহির্বাণিজ্যের উপর প্রবল আঘাত করিতেছে। তাহার উদ্দেশ্য—বৃটেনের বহির্বাণিজ্য শুষ্ক করিয়া তাহাকে ভাতে মারা। কিন্তু বৃটেনের ৩ কোটী টনের উপর জাহাজ রহিয়াছে। তাহার মধ্যে জার্ম্মাণী আজ পর্য্যন্তও ৭০ লক্ষ টনের বেশী ডুবাইতে পারে নাই। সুতরাং এই পথে ইংলণ্ডকে কাবু করা সম্ভব হইবে না। এই জন্য ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া জার্ম্মাণ বিমানবহর ইংলণ্ডের উপর ধ্বংসের তাণ্ডব নৃত্য চালাইতেছে। ইংলণ্ডবাসীর বাসস্থান ও ইমারত যান্ত্রিক শক্তির বলে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিলেও, একটী বীরজাতির হৃদয় তাহাতে জয় করা যায় না। ইংলণ্ডের উপর বিমান আক্রমণে এই প্রাচীন সত্য আবার সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

সুদূর প্রাচ্য—

ভূমধ্য সাগরে ও আটলাণ্টিক মহাসাগরে প্রজ্জ্বলিত সমরাগ্নি এবারে প্রশান্ত মহাসাগরে ছড়াইয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। জাপানী পররাষ্ট্রসচিব মৎসুকোয়ার ইয়োরোপ সফর সুফল প্রসব করিয়াছে। তিনি ব্যক্তিগতভাবে ষ্ট্যালিনের সঙ্গে সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন এবং রুশ-জাপান মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করিয়া আসিয়াছেন। রুশিয়ার বাধা বিদূরিত হওয়ায়, এখন জাপান দক্ষিণ সমুদ্রের দিকে দ্রুত ধাবিত হইবে। ভূমধ্য সাগরের উপর জার্ম্মাণীর ক্রমবর্দ্ধমান চাপ ও সুদূর প্রাচ্যে জাপানের প্রসারণের চাপ পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য বৃটেন এখন মার্কিণকে যুদ্ধে নামাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিবে। ফলে lease and land bill-এর মহিমায় এমন হইতে পারে যে, নূতন একটী দেশের অধিবাসিগণের অজ্ঞাতসারেই বৃটেন তাহাকে মার্কিণের নিকট বন্ধক দিয়াও তাহাকে যুদ্ধে নামাইতে পারে। মার্কিণের পক্ষে উভয় সঙ্কট। যুদ্ধে না নামিলেও, যদি চক্রশক্তি বিজয়ী হয়, তবে যুদ্ধ আজ হউক কাল হউক, তাহার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইবে। আবার আজকালের যুদ্ধে নামিবার মত যান্ত্রিকবাহিনীতে সে এখনও সুসজ্জিত হয় নাই। যাহা হউক, সুদূর প্রাচ্যের ঘটনার পরিণতিও খুব শীঘ্রই আমরা দেখিতে পাইব।

মহাযুদ্ধের গতি—

বিগত ৬ই এপ্রিল হইতে যুদ্ধের গতিশীলতা ফিরিয়া আসিয়াছে। আজ পহেলা মে। এখন যুগোস্লাভিয়া মানচিত্র হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, হাঙ্গেরী, ইটালী ও জার্ম্মাণী সকলেই উহার অংশ গ্রহণ করিয়া উহাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছে। গ্রীসের দক্ষিণ উপকূলেও আজ জার্ম্মাণবাহিনী আসিয়া পৌছিয়াছে। ইংরাজ সেনাদল গ্রীস হইতে মিশরে চলিয়া আসিয়াছে।

সুতরাং গ্রীসের ক্রীট দ্বীপ ব্যতীত সমগ্র গ্রীস উপদ্বীপ এখন জার্ম্মাণীর করায়ত্ত।

গ্রীসে ইংরাজ সৈন্যদল পাঠাইবার প্রতিবাদ করিয়া ইংলণ্ডে ও অষ্ট্রেলিয়ায় বেশ আন্দোলন হইয়াছে। বিপন্ন গ্রীসকে সাহায্য করা মিত্রপক্ষের কর্ত্তব্য, এই প্রকার নৈতিক বিচার ছাড়িয়া দিলেও, সুয়েজ খালের ঘাঁটি-রক্ষার জন্যই গ্রীস হইতে বাধাপ্রদানের ব্যবস্থা সামরিক হিসাবে ইংলণ্ডের অবশ্য করণীয় ছিল। এই বিচারে আমরা মনে করি, গ্রীসে সৈন্য পাঠাইয়া মিঃ চার্চ্চিল তাঁহার কর্ত্তব্যই করিয়াছেন—যদিও উহার ফল সন্তোষজনক হয় নাই। ভারতসচিব মিঃ আমেরি সম্প্রতি তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন,

"We have seen in the last few weeks a million of the bravest soldiers in the world, men I heard described in the last war as the finest infantry in Europe, equipped well according to the standards of the last war, scattered to the winds and broken in pieces by the armoured divisions which German foresight, dash and determination have provided."

অর্থাৎ বিগত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে দশ লক্ষ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী ও ইউরোপের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদাতিক বাহিনী জার্ম্মাণীর আধুনিক যান্ত্রিকবাহিনীর প্রবল আক্রমণে একবারে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

বর্ত্তমানে জার্ম্মাণীর লক্ষ্য সুয়েজ খাল, সেইজন্য মিশর আক্রমণ করিয়া একদল পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতেছে এবং অপর দলকে হিটলার সিরিয়ার ভিতর দিয়া ইরাক ও প্যালেষ্টাইন দখল করিবার পর সুয়েজ খাল আক্রমণের জন্য পাঠাইবেন। কিন্তু গ্রীস হইতে সিরিয়ায় যাওয়ার উপায় কি? যদি তুরস্ক পথ ছাড়িয়া দেয়, তবে সবই সুশৃঙ্খলায় চলিতে পারে। কিন্তু তুরস্ক যদি পথ ছাড়িয়া না দেয়, তাহা হইলে হিটলার জলপথেই সিরিয়াতে যাইবার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া মনে হয়। সেইজন্য তুরস্কের সীমান্তের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রীসের কয়েকটী দ্বীপ জার্ম্মাণী দখল করিয়া, ইটালীর অধিকৃত ডোডিকেনিস্ দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত তাহার বাহু বিস্তৃত করিয়াছে। এই দ্বীপপুঞ্জের শেষ দ্বীপ হইতেছে রোড্স্ দ্বীপ। সেখানে ঘাঁটি করিয়া সম্মুখস্থ সাইপ্রাস দ্বীপের বৃটিশ ঘাঁটি অতিক্রম করিয়া, সিরিয়ার বন্দর আলেক্জেন্দ্রিয়েটায় তাহাদিগকে পৌছিতে হইবে। দুই রাস্তার যে কোনটী অবলম্বন করিয়া যদি জার্ম্মাণ সৈন্য সিরিয়ায় পৌছিতে পারে, তবেই বলিতে হইবে যে, যুদ্ধের সঙ্কটকাল উপস্থিত হইয়াছে।

কারণ, সেই অবস্থায় সুয়েজ খাল পূর্ব্ব ও পশ্চিম দুই দিক হইতে আক্রান্ত হইবে। তাহার উপর একদিকে ইরাক ও ইরানের তৈল-সম্পদ্ এবং অপর দিকে যদি মিশরস্থ জার্ম্মাণবাহিনীর এক শাখা আবিসিনিয়ায় অবস্থিত ইটালীয় বাহিনীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করিতে পারে, তাহা হইলে লোহিত সাগরেও তাহাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। জার্ম্মাণবাহিনীর উভয় শাখা সুয়েজ খালে উপস্থিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে স্পেন কর্ত্তৃক জিব্রাল্টার অবরুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। তাহা সফল হইলে, ভূমধ্য সাগরে অবস্থিত যাবতীয় বৃটিশ রণতরী একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে। আমরা এতক্ষণ জার্ম্মাণ ষ্ট্র্যাটেজির আলোচনা করিলাম। তাহা ব্যাহত করিবার জন্য বৃটিশবাহিনীও সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত আছে। সম্ভবতঃ মে মাসের মধ্যেই উহার ফলাফল দেখা যাইবে।

বর্ত্তমান যুদ্ধে সম্প্রতি তিনটি সঙ্কট দেখা দিয়াছে। প্রথমতঃ ভূমধ্যসাগরে জার্ম্মাণ অগ্রগতি। এ বিষয়ে আমরা বিশদ আলোচনা করিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ—ইংলণ্ডের উপর ব্যাপক বিমানাক্রমণ এবং তৃতীয়তঃ—আটলাণ্টিক মহাসাগরে বেপরোয়া জাহাজডুবি। এই তিনটি সঙ্কটের প্রত্যেকটীর ফলাফল সুদূরপ্রসারী এবং ইহাদের কোনটাই কম নহে। ইংলণ্ডে বিমানাক্রমণের প্রাবল্যে দেশে অন্তর্বিপ্লব আরম্ভ হইতে পারে—এইজন্যই আমরা উহাকে প্রথম শ্রেণীর সঙ্কট বলিয়া পরিগণিত করিতেছি। আবার আটলাণ্টিক মহাসাগরের বাণিজ্য-পথে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ধমনী বলিয়া পরিগণিত—সুতরাং এই সঙ্কটের তীব্রতা সহজেই অনুমেয়। পক্ষান্তরে, এই সঙ্কটের মধ্য দিয়া আমেরিকারও সঙ্গে সঙ্গে জাপানের রণাঙ্গণে অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনাও ঘনীভূত হইয়াছে। *

* প্রবন্ধ ছাপা হইবার সঙ্গে সঙ্গে খবর আসিয়াছে যে, নবগঠিত ইরাক গভর্ণমেণ্ট জার্ম্মাণীর ষড়যন্ত্রে পরিচালিত হইয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়াছে। মহাসমর এবার এশিয়া মহাদেশেও বিস্তৃত হইল বলা যায়। ইতি ১লা মে '৪১ —লেখক।

সাময়িক সাহিত্য

শূলপাণি

ভারতবর্ষ—বৈশাখ, ১৩৪৮—

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক দৃষ্টিভঙ্গী—অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরী। লেখক বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের একটি বিশেষ দিক্ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। জাতিগঠন ও ধর্ম্ম-চেতনার পটভূমিকায় এই দুই মনীষীর উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রবন্ধটির নামকরণ ঠিক হয় নাই, ইহাতে একটু ভুল বোঝার সৃষ্টি হইতে পারে। 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'বিষবৃক্ষ' প্রভৃতি উপন্যাসের উল্লেখ না থাকায়, আমরা প্রথমে বিস্মিত হইয়াছিলাম। স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে—লেখক বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসগুলি পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন! ফলে রচনায় সমগ্রতা ও সম্পূর্ণতার অভাব হইয়াছে। 'চোখের বালি' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সমাজের যে দিক্‌টিতে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা সে যুগে সম্পূর্ণ নূতন ছিল। নারীমনের গোপন গহনে, হৃদয়বৃত্তির তপ্ত কটাহে ধীরে ধীরে যে বিষ সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারই ব্যঞ্জনায় বিনোদিনীর চরিত্র হইয়া উঠিয়াছে অপূর্ব্ব। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই বলিয়াছেন—মানুষের মনের কলকারখানায় নিরন্তর যে ভাঙ্গা-গড়ার কাজ চলিতেছে, তাহারই পরিচয় আছে 'চোখের বালি' উপন্যাসে। ইহা সত্ত্বেও, আমাদের মনে হয়, লেখকের রচনায় বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের একটি বিশেষ দিক্ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

গণনীয় নন্দকিশোর—শ্রীজগদীশ গুপ্ত। লেখকের গল্প বলিবার একটি বিশিষ্ট ভঙ্গী আছে, যাহা তাঁহাকে সাধারণ লেখকের ভীড় হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখে। গল্পের নামকরণেও জগদীশবাবুর মৌলিকতা ও শ্লেষের পরিচয় আছে, এ কথা আমরা স্বীকার করিতেছি। আলোচ্য গল্প সম্বন্ধে আমাদের এইটুকুই বলিবার আছে যে, লেখকের রসদৃষ্টি ও সুতীক্ষ্ণ মাত্রাজ্ঞান রচনাটিকে সত্যকারের উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। গল্পটির পরিণতির মুখে জগদীশবাবু শ্লীলতার প্রান্তসীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, হয়তো লেখকের হৃদয়াবেগের মৃদু স্পর্শে শ্লীলতার এই সূক্ষ্ম পর্দ্দাটি উড়িয়া গিয়া সমস্ত কিছুই নগ্ন ও কদর্য্য হইয়া দেখা দিত। কিন্তু লেখকের শক্তি এইখানেই যে, তিনি শক্ত করিয়া রাশ টানিয়া ধরিয়াছেন, ফলে সমস্ত জিনিষটাই রূপ ও রসে উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। লেখকের কৃতিত্ব এইখানে এবং ইহার জন্য লেখক আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

গোবিন্দদাসে শ্রীরাধার অভিসার—(প্রবন্ধ) শ্রীশুভব্রত রায়চৌধুরী। বিশেষত্বহীন রচনা, আলোচনা করিবার মত কিছু নাই।

রিক্ত পথিক! হতাশ হ'লে কি ঝড়ে?—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য। ভাবে, ভাষায় ও ছন্দে কবিতাটির মধ্যে সঙ্গীতের তরঙ্গ উচ্ছ্বসিয়া উঠিয়াছে।

গভীর অরণ্যে একটি রাত্রি—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়-চৌধুরী, এম-বি-ই। লেখক বাস্তবতার ভিত্তিতে একটু রোমাঞ্চের সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে তিনি সার্থক হন নাই। গল্প বলিবার দোষে ইহা মোটেই জমিয়া ওঠে নাই।

কে তুমি?—শ্রীমানকুমারী বসু। কবিতারচনায় লেখিকার নিজস্ব রচনাভঙ্গী আছে। আলোচ্য কবিতাটির মধ্যে একটি সরল অনাড়ম্বর মাধুর্য্য আছে, যাহা হৃদয় স্পর্শ করে।

একই—পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ। সাধারণ গল্প, বিশেষ কিছু বলিবার নাই।

ভারতচন্দ্র—(কবিতা) — শ্রীভোলানাথ সেনগুপ্ত। লেখক গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করিয়াছেন। রচনাটি উপভোগ্য।

গোবিন্দচন্দ্র ও ময়নামতী—অধ্যাপক শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য। ধারাবাহিক রচনা। বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসে গোবিন্দচন্দ্র ও তাঁহার মাতা ময়নামতীর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। আধুনিক যুগে সাহিত্যে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা সুরু হইয়াছে, কিন্তু সত্যকারের রসবিচার হইতেছে না। এই দিক্ হইতে লেখকের এই প্রচেষ্টার মূল্য আছে।

অন্ধের বৌ—শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। গল্পটি পড়িয়া আমরা লেখকের পূর্ব্বতন খ্যাতির কিছু পরিচয় পাইলাম না। এই একই বিষয়বস্তু লইয়া একটি গল্প ইতিপূর্ব্বে আমরা পড়িয়াছি। দরদের অভাবই সর্ব্বত্র প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।

জঙ্গম (উপন্যাস) — বনফুল। সুদীর্ঘকাল ধরিয়া ধারাবাহিকভাবে উপন্যাসটি চলিতেছে। লেখকের সূক্ষ্ম রসদৃষ্টি ও কলাকুশলতার পরিচয় ইহাতে আছে। কয়েকটি নূতন ধরণের চরিত্রের সাক্ষাৎকারও ইহাতে আমরা পাইয়াছি। ইহা সত্ত্বেও আমাদের একটি বক্তব্য আছে। নানা শাখাপ্রশাখায় পল্লবিত হইয়া এই সুদীর্ঘ উপন্যাসের কাহিনী একটা সুসম্বদ্ধ ঐক্য ও পরিণতির পথে অগ্রসর হইতে বাধা পাইতেছে। আমরা লেখকের দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করিতেছি।

গণদেবতা—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে চলিতেছে।

কলঙ্কিনীর খাল (গল্প)—শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় বাঙ্গলা পল্লীর শ্যামশ্রী লেখকের রচনা-সম্পদে প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। খাঁটি বাঙ্গলা গল্পের পরিচয় তাঁহার রচনাতে আছে। আধুনিক যুগে একাধিক লেখক সম্বন্ধে এ কথা বলিতে পারিলে, আমরা সুখী হইব।

প্রহেলিকা (নাটক)—শ্রীযামিনীমোহন কর। বর্ত্তমান সংখ্যায় শেষ হইয়াছে।

সংহতি—চৈত্র, ১৩৪৭—

আচার্য্য প্রফুল্ল জয়ন্তী সংখ্যা। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনের বিভিন্ন দিক্ ইহাতে আলোকিত হইয়াছে। আচার্য্যদেবের শিষ্যদের মধ্যে বহু খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক আছেন, তাঁহাদের রচনা বর্ত্তমান সংখ্যাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। ইহারই মধ্যে ১৩০৪ সালের 'প্রদীপ' হইতে পুনর্মুদ্রিত প্রফুল্লচন্দ্রের 'প্রথম জীবনী' আমাদের ভাল লাগিয়াছে। লেখক শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। বাংলার এই স্বদেশবৎসল মনীষীর জয়ন্তী উৎসবে 'সংহতি'র এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই।

নদ ও নদী—(উপন্যাস) প্রবোধকুমার সান্যাল। লেখকের ভাষার একটা ঔজ্জ্বল্য আছে। ডায়ালগের তীক্ষ্ণ আঘাত-প্রতিঘাতের যে কৌশল, তাহাই তাঁহার বহু উপন্যাসকে উপভোগ্য করিয়া তোলে। বর্ত্তমান উপন্যাসটিতে ভাষার সে ঔজ্জ্বল্য অস্তমিত হইয়া গিয়াছে, ডায়ালগেও রসের অভাব হইতেছে। অবশ্য লেখক যদি কোন থিয়োরী লইয়া মাথা ঘামাইয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহার শেষটুকু পর্য্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করিতে হইবে।

বাংলায় ভাল নাটক হ'ল না কেন?—শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র গোস্বামী। রচনাটি উপভোগ্য হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যে নাটক রচনার সূত্রপাত হইতে আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত নাট্যসাহিত্যের ধারা লইয়া লেখক আলোচনা করিয়াছেন। বিভিন্ন নাট্যকারের রচনার বৈশিষ্ট্য লইয়া লেখক যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা ঠিকই হইয়াছে। বাংলা ষ্টেজে এখনও মধ্যযুগীয় ধারা অব্যাহত আছে, বাস্তব জীবনের সমস্যা হইতে মুখ ফিরাইয়া নাটক-রচনা চলিতেছে। আধুনিক নাটক নামে আজ যাহা চলিতেছে, তাহাতে নরউইজিয়ান্ ও বিলাতী কায়দাই ফুটিয়া উঠিতেছে। অবশ্য বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায় বর্ত্তমানে ইহা লইয়াই দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাইতেছেন।

মিলন (কবিতা)—মহেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র অনুকরণ। ভাষা ও ছন্দেও স্থানে স্থানে মিল আছে। ব্যাপারটি যে সম্পাদক মহাশয়ের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে, তাহাতে বিস্মিত হইলাম। লেখকের সাহসও সীমাহীন। কবিতারচনার সখ আছে অথচ শক্তি কতটুকু, সে সন্ধান তিনি রাখেন না।

পল্লীচিত্র (কবিতা)—শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস, এম.এস্-সি

একা „ —শ্রীআদিত্য মুখোপাধ্যায়।

অপদার্থ রচনা, কবিতা হওয়া দূরে থাকুক, কিছুই হইয়া ওঠে নাই। বাংলাদেশে মাসে মাসে বহু পত্রিকার

জন্ম হইতেছে; কাজেই এই ধরণের অচল যে চলিবে, তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই।

আর্ত্তনাদ (গল্প)—শ্রীভবেশচন্দ্র দত্ত। একেবারে ছেলে-মানুষী রচনা। "এ যেন বিধাতার থালাভরা আশীর্ব্বাদ" —বুঝিতে পারিলাম না।

মাসিক বসুমতী—চৈত্র, ১৩৪৭—

টমাস, দীনেন্দ্রকুমার ও সৌরীন্দ্রমোহন—এই তিন মহাজনের হাতে পড়িয়া বসুমতীর অবস্থা হইয়াছে ঠিক সেই জাত-বোষ্টম টগরের মত। ইহাদের লইয়া ঘর করিলে কি হইবে, বসুমতীর চরিত্রটি ঠিক বজায় আছে। বসুমতী সাহিত্যপত্রিকা—ইহার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় আছে, "বিশ্ববিধ্বংসী লাভা-প্রবাহ, বুদ্ধিচাতুর্য্যের সার্চ্চলাইট, অধ্যবসায়ের অটল সুমেরু"—এই সার্চ্চলাইটের জ্বালায় আমাদের চক্ষু ধাঁধিয়া যাইতেছে, আমরা পদে পদে হোঁচট খাইতেছি। আর অধ্যবসায়ের বড়াইও আমাদের নাই; তবে বসুমতীর পাঠকদের যে আছে, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। বাংলাদেশে দুই শ্রেণীর পাঠক আছেন। এক দল—যাঁহারা সত্যকারের রসের কারবারী, মহুয়া রসের সন্ধান তাঁহারা রাখেন, এঁরা সৌখীন সেরা পাঠক। আর এক দলের নজর স্থানবিশেষে, ঝাঁঝাল পানীয়ের প্রতি নজর ইহাদের বেশি, তাহাদের জন্য বসুমতীর খোলা ভাঁটি সর্ব্বদা খুলিয়াই আছে। শেষোক্তদের সংখ্যাই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। আমরা সহযোগীর ব্যবসাবুদ্ধির তারিফ করি। 'সাহিত্য', 'সাহিত্য' বলিয়া চেঁচাইলেই হয় না, যদি তাহাতে "না মিলে শস্যকণা"।

পারাবার (উপন্যাস)—বাংলা কথা-সাহিত্যের মোপাঁসা সৌরীন্দ্রমোহনের রচনা। দীর্ঘকাল খোঁড়াইয়া চলিতেছিল, বর্ত্তমান সংখ্যায় শেষ হইয়াছে। আমরাও নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। রহস্যের ঠেলায় আমরা দিশাহারা হইয়াছিলাম, নির্ব্বিরোধী বাঙালীর প্রাণ ইহাতে বাঁচে কি করিয়া! শেষ করিবার পূর্ব্বে মোক্ষম রকমের 'Stunt' দিয়া 'ফিনিশ' করা হইয়াছে।

বান্ধবী—শ্রীমতী আশালতা সিংহ। ছোট গল্প, রচনার মধ্যে বিশেষ কারুকার্য্য না থাকিলেও, শেষটা বেশ উপভোগ্য হইয়াছে। 'শেষের কবিতা' পড়িয়া নায়কের হঠাৎ খেয়াল হইল—বান্ধবী ও স্ত্রীর মধ্যে যে তফাৎ আছে, তাহা সহজে মুছিয়া ফেলা চলে না। তাই ঘর-কন্নার আর দশটা আসবাবের সামিল সে মালতীকে করিতে চায় না। মালতী বান্ধবী, নিখিল বিরহী মনের সে চিরপ্রিয়া। প্রেমের রাজ্যেও যে diarchy আছে, তাহা আমাদের জানা ছিল না। কোনদিন শুনিব—communal percentageএর হিসাবনিকাশও সাহিত্যে চলিতেছে।

ভারতের পোতশিল্প—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। তথ্যপূর্ণ রচনা। নানা দিক্ দিয়া লেখক ভারতে এই শিল্প-বিস্তারের সম্ভাবনা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। অচিরে ভারতের নিজস্ব বলিষ্ঠ বাণিজ্যতরী বহর নির্ম্মাণ হওয়া আবশ্যক, লেখক ইহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

বংশগৌরব—শ্রীমতী নীলিমা দেবী। বংশের গৌরব কতখানি বাড়িয়াছে জানি না, বসুমতীর যে গৌরববৃদ্ধি হয় নাই, ইহাই বলিতে পারি।

প্রগতি—শ্রীমতী গিরিবালা দেবী। নেহাৎ 'goody goody' রচনা। শুধু উচ্ছ্বাস ও ভাবপ্রবণতায় পৃষ্ঠা ভরিয়া উঠিয়াছে। দুপুরের শুব্ধ নির্জ্জনতায়, মেয়েদের মজলিসে এই শ্রেণীর গল্পের আদর আছে, কাজেই ইহার ভিতর সাহিত্য খুঁজিতে যাওয়ার মত আহাম্মক আমরা নই।

টিলার দেশের লীলাবতী—(কবিতা) শ্রীরামেন্দু দত্ত। বহুদিন হইতে দেখিতেছি—লেখকের কাব্য-রচনায় আগেকার সে শক্তি আর নাই। পূর্ব্বতন খ্যাতির পথ বাহিয়া তিনি চলিতেছেন এবং আশঙ্কা হয়, এ পথেরও শেষ হইতে হয়ত আর বাকী নাই।

চিত্তবিকাশ (কবিতা) — শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত। বক্তব্য বিশেষ কিছুই নাই, সবই ধোঁয়াটে, অথচ বাছা বাছা শব্দের আড়ম্বরে বস্তুহীন vacuumকে ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

কেরাণী-জগৎ (কবিতা) — শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়। রসসৃষ্টি করিবার ক্ষমতা নাই অথচ দুশ্চেষ্টা আছে। ফলে ব্যাপারটা আগাগোড়া হইয়াছে ইয়ার্কী।

আপনারা বলিতে পারেন—শ্রীযুত দীনেন্দ্রকুমারকে বসুমতীর আসর হইতে এখনও অবসর দেওয়া হইতেছে না কেন ? ভদ্রলোকের pension ও peerage দুইই তো বহুদিন হইল পাওনা হইয়াছে। দীর্ঘকাল ইনি সহযোগীর কর্ণ ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহার অভাবে যোগ্যতর ব্যক্তির অভাব হইবে না, সে আমরা জানি।

প্রভাতী—বৈশাখ, ১৩৪৮—

পাটনা হইতে প্রকাশিত এই পত্রিকাখানি ইতিমধ্যেই বাংলা সাময়িকের ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। বর্ত্তমান সংখ্যায় কয়েকটী সুনির্ব্বাচিত প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা আছে। একটি পরিচ্ছন্ন রুচিবোধ ও সাহিত্যদৃষ্টি ইহার সমস্ত রচনায় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

এই আদি যুগের আদিম মানুষ—শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। প্রিমিটিভ, ক্লাসিক্যাল ও ডেকাডেণ্ট—এই তিন দশার মধ্য দিয়া যুগে যুগে দেশে দেশে শিল্পসৃষ্টির, জীবনের উপাখ্যান ও আত্মচরিত রচিত হইয়াছে—লেখকের এই উক্তি গ্রাহ্য। কিন্তু প্রিমিটিভ শিল্প ও সাহিত্যসৃষ্টির সৌন্দর্য্য স্বীকার করিলেও, অপর দুই যুগে সৃষ্টির অক্ষমতা ও সৌন্দর্য্যের অসারতা স্বীকার করা যায় না।

কবি (উপন্যাস)—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ধারাবাহিকভাবে চলিতেছে।

কৃষি-সঙ্কট—সুধী প্রধান। কৃষির বিভিন্ন সমস্যার দিক্ তথ্যের সাহায্যে আলোচনা করা হইয়াছে।

থাই দেশ—শ্রীরামনাথ বিশ্বাস। ভ্রমণ-কাহিনী হইলেও, লেখকের সাবলীল বর্ণনায় রচনাটি উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।

কাপালিক ও মহাকালী—শ্রীজগদীশ গুপ্ত। জগদীশবাবুর কুশলী হাতের পরিচয় ইহাতে আছে। বিষয়বস্তু যাহাই থাক, গল্প বলিবার বিশিষ্ট ভঙ্গীতে ইহা রসমাধুর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে।

চলচ্চিত্রের মর্ম্মকথা—অধ্যাপক শ্রীকুমারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'প্রভাতী'র পৃষ্ঠায় ইহা অন্যতম উপভোগ্য রচনা। রসবিন্যাসে ও ভাষার মাধুর্য্যে ইহা যথেষ্ট আনন্দের খোরাক যোগাইয়াছে।

জলভরা মেঘ (উপন্যাস)—বিশ্ব বিশ্বাস। ধারাবাহিকভাবে চলিতেছে।

রাজনৈতিক ভারত—নীলকণ্ঠ।

সমসাময়িক বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষ—বসুবন্ধু।

সমসাময়িক ঘটনার মধ্য দিয়া লেখকদ্বয় অন্তর্দৃষ্টি ও সুষ্ঠু বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন।

কবিতাগুচ্ছ নেহাৎ মামুলী, উল্লেখের কিছু নাই।

শীশ্-মহল—বৈশাখ, ১৩৪৮—

ইসলাম ও চিত্রকলা—এস, ওয়াজেদ আলি। চিত্রকলা সম্বন্ধে মুসলমান সমাজের যাঁহারা গোঁড়া, তাঁহাদের অদ্ভুত ধারণা আছে, লেখকের রচনায় সেই ভ্রান্ত ধারণা দূর হইয়া যাইবে। এ যুগে এই ধরণের আলোচনার একটা মূল্য আছে।

ইস্‌লামের কথা—ডক্টর মহম্মদ কুদ্‌রত-ই-খোদা। লেখকের রচনার গুণে ইস্পাত সম্বন্ধে বহু তথ্য সহজবোধ্য হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কবিতা 'রামদাস স্বামীরূপে এসেছিলে—' অপূর্ব্ব না হইলেও বিশেষ উপভোগ্য।

আটের পাশে নয়—গৌতম সেন। গল্পটি চলনসই।

সভ্যতা কোন্ পথে ?—শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে চলিতেছে। আরও অন্যান্য রচনা আছে। পত্রিকার সম্পাদকীয় সুরটি সাম্প্রদায়িকতার ঊর্দ্ধে অখণ্ড জাতিগঠনের অনুকূল।

মাছরাঙা (ছোটদের মাসিক)—চৈত্র, ১৩৪৭—

'মাছরাঙা' কাগজটি আমরা দেখিয়াছি। শিশুমনের কল্পলোকে প্রবেশ করিবার প্রচেষ্টা পরিচালকদের আছে মনে হইল। রচনায় নির্ব্বাচনপটুতা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। শিশু পত্রিকার পরিচালকের পক্ষে ইহা বড় কথা। শিশুমনে শুধু কল্পনার খোরাক দিয়া লাভ নাই, বাঙলার ভাবী শিশু-সমাজকে একটি সুদৃঢ় আদর্শের ভিত্তিভূমিতে দাঁড় করাইবার দায়িত্বও পরিচালকবর্গের —একথা ভুলিলে চলিবে না।

প্রাচীন ও নবীন

সুকবি সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র মহোদয়ের কালিঘাটের 'চৈতালী সঙ্ঘে'র অভিভাষণের 'সংস্কৃত ও বাংলা' সম্বন্ধীয় মন্তব্যটীর প্রতি আমরা বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তিনি ঠিকই বলিয়াছেন যে:

সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে আমাদের যোগ যেন দিন দিন বিচ্ছিন্ন হয়েই আসছে। প্রাচীনকে রূপান্তরিত ক'রেই নবীনের উদ্ভব, তাকে বাদ দিয়ে নয়। আজ কাল পশ্চিমে classicsএর বিরুদ্ধে একদল মুখর হয়ে উঠেছেন। সেই থেই ধরে আমরাও কেউ কেউ সংস্কৃতকে কোণ-ঠাসা করবার চেষ্টায় আছি। এতে কেবল যে আমাদের ভাষার পরিপুষ্টি দৈন্য লাভ করবে শুধু তাই নয়, আর্য্য সংস্কৃতির মূল সম্পদগুলির থেকেও আমরা ক্রমশঃ বঞ্চিত হব। বাংলা অনুবাদের সাহায্যে সংস্কৃত পুঁথিতে প্রবেশ লাভ করতে হ'লেও, দেবভাষার সঙ্গে কতকটা পরিচয় থাকার প্রয়োজন। তদভাবে সংস্কৃত ভাষা আমাদের কাছে ল্যাটিন গ্রীকের মত দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে এবং সেই সঙ্গে প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের যোগসূত্রটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। জাতীয় জীবনের পক্ষে এটা মারাত্মক বিপত্তি। এ সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক না হ'লে, আর দু'পুরুষেই আমরা প্রাচ্য সংস্কৃতির উৎস-মূল হারাতে বসব।

সাহিত্যে প্রত্ন-প্রীতি

সাহিত্যে রস-বিচারকে উপেক্ষা করিয়া ইহার ঐতিহাসিক কাঠামোটা লইয়া বর্ত্তমানে যে নাড়াচাড়া সুরু হইয়াছে, সে সম্বন্ধে সমালোচক শ্রীযুত যামিনীকান্ত সেন মহাশয় মাসিক মোহম্মদীর বৈশাখ সংখ্যায় কয়েকটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন:

আজকালকার সাহিত্যবিচার দাঁড়িয়েছে চার্লি চ্যাপলিনের মত প্রত্নপ্রীতির ছদ্মবেশ নিয়ে। কে আগে লিখেছে, কি আগে হয়েছে এ নিয়ে তুমুল হট্টগোল। চণ্ডীদাসের রসবিচার নিক্ষিপ্ত হয়েছে অগ্নিকটাহে—এর পরিবর্ত্তে চণ্ডীদাসের সংখ্যা কমান ও বাড়ান হয়েছে, কালোয়াতি ও কসরতের ব্যাপারে। "অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্" শিরে লিখা অসম্ভব হয়েছে।

বাঙলা সাহিত্যের বই পাওয়া গেছে প্রচুর, কিন্তু বিচার কিছুমাত্র হয়নি, একথা বল্‌লে অনেকে শিউরে উঠতে পারেন—অথচ না বলেও উপায় নেই। রসতত্ত্ব ও সৌন্দর্য্যবিচারের প্রাচ্যধারায় আমাদের দেশের সাহিত্য গঠিত—জাপানী নো-সাহিত্য, হিন্দী গজল, কবীরের দোঁহা, বৈষ্ণব পদাবলী বা হাফিজের গোলাপগীতি এসবের সঙ্গে এক আসনে কীট্‌সের কবিতা, হিউগোর উচ্ছ্বাস বা হুইটম্যানের হুল্লোড়কে বসান যায় না। আজ নিতান্ত এযুগে বলা হচ্ছে কাব্যে বা সৌন্দর্য্যসৃষ্টিতে বিষয়টি উপলক্ষ্য—রসসৃষ্টিই মুখ্য। এজন্যে একই বিষয় নিয়ে সেকালে কবিরা কাব্য লিখেছে, চিত্রকরেরা ছবি এঁকেছে এবং সঙ্গীতজ্ঞেরা গান রচনা করেছে। বাক্যই কাব্য নয়—রসাত্মক বাক্যই কাব্য, এই রসসম্পাত বিষয়বস্তুর অপেক্ষা রাখে না—এজন্য পরিচিত প্রাচীন প্রসঙ্গ নিয়ে রসিকরা রসচর্চ্চা করেছে। একই বিষয়ে ছবি আঁকা হয়েছে চীনদেশে হাজার হাজার বছর—কিন্তু তা'তেও অসীম ও বহুমুখী রসপ্রাচুর্য্যের আরোপ বিশুষ্ক হয়নি। এদেশে রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদাবলী একই বিষয় নিয়ে বিস্মিত করেছে অফুরন্ত বার্ত্তা। একই বিদ্যাসুন্দর বহু কবি রচনা করেছে। এতে গতানুগতিকতা প্রমাণ হয় না, বরং জাতি-হৃদয়ের একটি প্রশস্ত স্রোতকে অধিকার করে' তারই ভিতর সৌন্দর্য্যের হোলি-ক্রীড়া ফলিত করাতে বাহাদুরী অনেক বেশী। কোন আলোচক একে বাঙ্গালী-হৃদয়ের দুর্ব্বলতা বলেছে, কিন্তু এতে প্রমাণিত হয় সবলতা। ইউরোপেও এক সময় এরূপ হয়েছে। কবিগুরু গেটের পূর্ব্বেও অনেকে "Faust"-এর আখ্যান নিয়ে কাব্য ও নাটকাদি লিখেছে। শেক্সপীয়ারের "হ্যামলেট" প্রভৃতিও পুরাতন কাব্য হ'তে বস্তু ও আখ্যান সংগ্রহ করেছে। স্বাধীন কাব্যরস-প্রতিপাদনের সঙ্গে বিষয়-বস্তুর কাঠামো-গ্রহণের কোন সম্পর্ক নেই।

কলা-বৈচিত্র্য

আধুনিক ভারতীয় চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে বহু "ইজম্"এর আবির্ভাব হইয়াছে এবং বহু টেক্‌নিকে ছবি আঁকা সুরু হইয়াছে। এই বিচিত্র মতবাদকণ্টকিত আর্টের ক্ষেত্রে আজ যথেষ্ট অস্পষ্ট চিন্তা ও ভুল বোঝার সৃষ্টি হইয়াছে। বৈশাখের "নাচঘরে" শিল্পী শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় এ সম্বন্ধে কয়েকটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন:

বাংলা-সাহিত্যে যা ঘটেছে, চিত্র-কলার মধ্যেও তা ঘটাই স্বাভাবিক। যেমন বাংলা-সাহিত্যের টেক্‌নিক্, পাশ্চাত্যের বিচিত্র পদ্ধতির অনুশীলনের প্রভাবে ও অভিনিবেশের ফলে সমৃদ্ধ হতে প্রেরণা নিয়ে এসেছে, চিত্র-কলার মধ্যেও সেইভাবে নানা বৈচিত্র্যের প্রভাবে পুষ্টি এবং সমৃদ্ধি আসবে। সেইজন্য এখানে যতটা বেশী পরদেশীয় পদ্ধতির বৈচিত্র্য আমাদের দেশের শিল্পীর এবং রসিক-

সমাজের চোখের সমুখে ধরে দিতে পারা যায়, ততই শুভ। স্বাধীন দেশের স্বাধীন চিন্তার ফলস্বরূপ যে সকল উৎকৃষ্ট নিদর্শন, তা দেখার সুযোগ আরও সাধারণের ঘটে না। সেটা ঘটিয়ে তুলতে যাঁরা সাহায্য করেন, তাঁরা নিশ্চয় ধন্যবাদের পাত্র। পৃথিবীর যে যে দেশ শিল্প বা চিত্রকলায় সমৃদ্ধ হয়েছে, তার মূল প্রেরণা যুগিয়েছেন—প্রকৃতি। প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠভাবে না হ'লে কলা-বিদ্যার উৎকর্ষ অসম্ভব। বাহ্য ও অন্তরপ্রকৃতির সঙ্গে গভীর পরিচয়ের ফলে, শক্তিরূপে জাতির শিল্প-কলা বিকশিত হয়। সুকুমার কলার বিকাশে জাতির মধ্যে যে শক্তি সূচিত করে, পরে তাই জাতীয় মুক্তির নিমিত্ত কারণ হয়।

সভ্যাতর দান

ইংরেজ-শাসনের সুদীর্ঘ অবসরে ভারতের জাতীয় জীবনে, তাহার অন্তরপ্রকৃতিতে সুদূরপ্রসারী পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের জয়গানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ মুখরিত হইয়া উঠেন নাই। হতাশার যে কৃষ্ণচ্ছায়া আজ দিকে দিকে প্রসরমান, তাহারই বিরুদ্ধে কবির শাশ্বত আত্মা তাঁহার নব-বর্ষের মর্ম্মপীড়িত বাণীর মধ্যে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে :

ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে, কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জ্জনাকে! একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন একী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিবহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে। জীবনের প্রথম আরম্ভ থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের সম্পদ, অন্তরের এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা করে আছি পরিত্রাণ-কর্ত্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটিরের মধ্যে। অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্ব্ব দিগন্ত থেকেই। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট, সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ। কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্য্যন্ত রক্ষে করব। আশা করব মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্ম্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্ব্বাচলের সূর্য্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্য্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম ব'লে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।

মানবাত্মার মূল্য

দর্শনশাস্ত্রের পঞ্চম জর্জ্জ প্রফেসারশিপ হইতে বিদায়-গ্রহণ উপলক্ষে স্যার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে যে অভিভাষণ প্রদান করেন, তাহাতে বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থার অসঙ্গতি ও ইহার অন্তর্নিহিত স্ববিরোধিতার ভঙ্গুর কাঠামোটি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে :

বর্ত্তমানের সমাজব্যবস্থা মানবতাকে বলি দিয়া, জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে মনুষ্যজাতির প্রাথমিক অধিকারগুলি অগ্রাহ্য করিয়া, অমানুষিক শোষণ-নীতির ভিত্তির 'উপর গড়িয়া উঠিয়াছে। গণতন্ত্র, ডিক্টেটরী ও একনায়কত্বের মধ্যে পার্থক্যনির্ণয়ের চেষ্টা করিয়া কোন লাভ নাই। একনায়কত্ব বর্ব্বরোচিত আক্রমণমূলক যুদ্ধ চালায়, কিন্তু গণতন্ত্রও জনসাধারণের দুঃখকষ্ট সম্বন্ধে উদাসীন বলিয়া একটুও কম দোষী নহে। মানবাত্মার সত্যিকারের মূল্য উপলব্ধি করিতে না পারিলে সমস্ত পাপের মূলোচ্ছেদ করিয়া মহত্তর ব্যবস্থাপ্রবর্ত্তন কখনই সম্ভবপর হইবে না * * * বর্ত্তমানের যুদ্ধ গণতন্ত্র ও ডিক্টেটরীর মধ্যে যুদ্ধ নহে। ইহা অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে যুদ্ধ। অতীত এই জগতকে দুঃসহ অবস্থায় টানিয়া আনিয়াছে আর ভবিষ্যৎ প্রত্যেক মানবকে কিছু আশা দিয়াছে * * * আজ যে চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে, তাহা নষ্ট-গৌরব উদ্ধারের জন্য মানবাত্মার সংগ্রামের প্রতীকস্বরূপ।

ছোট গল্পের রীতি ও প্রকৃতি

'পরিচয়' পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় "প্রমথ চৌধুরীর গল্প" শীর্ষক প্রবন্ধে অধ্যাপক ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছোট গল্পের রীতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কথা বলিয়াছেন :

ছোট গল্প কেবল ছোট ও গল্প হলেই সার্থক হয় না, তার ছোটাও চাই; এবং ছোটবার জন্য কোঁচানো ধুতি পাঞ্জাবীর পরিবর্ত্তে শর্ট ও শার্টই সুবিধার। ভাষা যদি অযথা বিশেষণে, উপসর্গ ও কৃ ধাতুর নাগপাশে আট্‌কে যায়, তবে গতি ও পরিণতি রুদ্ধ হতে বাধ্য * * * বাঙ্গালী গল্পলেখক ঘটনাকে করায়ত্ত করতে পারেন না বলেই বিশেষণের আশ্রয় নিতে বাধ্য হন, সেইজন্য গল্প বর্ণনাবহুল হয়; এবং গতি সম্বন্ধে এক প্রকার অচেতন ব'লে কৃ-ধাতুর অপব্যবহারে জড়িয়ে পড়েন, ফলে কথোপকথন দীর্ঘ ও অবান্তর হয়। * * * বিশেষণত্যাগ তখনই সম্ভব, যখন বিশেষ্য যথার্থ, ক্রিয়াপদ গতিদ্যোতক এবং বাক্য অর্থবাহী। ভাষা, বিষয় ও লেখকের সংযম ও নির্ব্বাচন-বুদ্ধির রাজযোটকই আর্ট।

শরৎচন্দ্রের শিল্প-চাতুর্য্য — (প্রথম খণ্ড)
শ্রীক্ষীরোদবিহারী ভট্টাচার্য্য ও শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক : শ্রীরাধারমণ চৌধুরী, বি-এ, প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা মাত্র।

বাংলার উপন্যাস-সাহিত্যে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের দান অতুলনীয়। অথচ তাঁহার সাহিত্য সম্বন্ধে যেটুকু আলোচনা হইয়াছে, তাহাতে এ সাহিত্যের যথোচিত মূল্য দেওয়া হয় নাই। বহু স্থলে সমাজ সম্বন্ধে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সমালোচনা হইয়াছে, দৃষ্টির যে ব্যাপকতা ও বিচ্ছিন্ন মন লইয়া সমালোচনার প্রয়োজন, তাহা হয় নাই। সমাজ ও জীবন সম্বন্ধে ধরাবাঁধা যুক্তিবাদের পথ বাহিয়া যে সমালোচনা করা হইয়াছে, তাহাতে শরৎ-সাহিত্যের অমর্য্যাদাই হইয়াছে সবচেয়ে বেশী। অথচ আধুনিক যুগে জনপ্রিয়তার দিক্ দিয়া রবীন্দ্র-সাহিত্যও বাঙ্গালীর সহজ সরল অনুভূতিশীল মনে এত অধিক আবেদনের সৃষ্টি করিতে পারে নাই।

লেখকদ্বয় শরৎ-সাহিত্যের সেই বিশেষ দিক্‌গুলি তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সহিত আলোচনা করিয়াছেন যাহার মধ্য দিয়া তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভার সার্ব্বজনীনতা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা শরৎচন্দ্রকে খাঁটি realist বলিয়া সমালোচনা করেন, তাঁহাদের সহিত আমরা একমত নই। রিয়ালিস্‌মের শুষ্ক কঙ্কালের উপর সত্যকারের কোন সাহিত্য গড়িয়া উঠিতে পারে কিনা, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। এই দিক্ দিয়া শরৎচন্দ্র আদর্শবাদী। আদর্শবাদ ও বাস্তবতার অপূর্ব্ব সম্মেলন তাঁহার সাহিত্যকে যে সার্ব্বজনীনতা দিয়াছে, তাহা লেখকদ্বয়ও স্বীকার করিয়াছেন। অথচ এই বাস্তবতার খাতিরে intellectualism খুব বড় হইয়া দেখা দেয় নাই। বর্ত্তমান সাহিত্যে যুক্তিবাদ অত্যুগ্র হইয়া দেখা দিয়াছে, ঘটনার সেখানে দাম নাই, সমস্যাকে বড় করিয়া দেখান হইতেছে অথচ জীবনের বৃহত্তর পটভূমিকায় এই সমস্যা কোন অনিবার্য্য পরিণতির সৃষ্টি করে, তাহা দেখাইবার চেষ্টা নাই। ফলে সাহিত্য জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আদর্শশূন্য আত্মম্ভরিতায় পরিণতি লাভ করিতেছে। আলোচ্য পুস্তকের প্রবন্ধ কয়টির মধ্য দিয়া লেখক শরৎ-সাহিত্যের এই দিক্‌টার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। শরৎ-পূর্ব্ব-সাহিত্যে বাঙলার সামাজিক অন্ত্যজদের স্থান ছিল বাহিরে, ইহারা ছিল নেপথ্যচারী, শরৎপ্রতিভা ইহাদিগকে বৃহত্তর জীবনের সীমান্তে টানিয়া আনিয়াছে। যে সুখদুঃখ, হাসিকান্নার স্রোত মানুষের সহিত মানুষের আপাতগোচর প্রভেদটাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একাকার করিয়া তাহাকে নিরন্তর এক অদৃশ্য গন্তব্যের পথে টানিয়া লইতেছে, তাহার পরিচয় শরৎ-সাহিত্যে অত্যুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। মানুষের এই সহায়হীন ভঙ্গুর মূর্ত্তিটাই দেখিয়াছি তাঁহার সাহিত্যে, মানুষের জীবনের এত বড় সত্যও বুঝি আর কিছু নাই।

পুস্তকখানিতে শরৎচন্দ্রের মুখ্য নারীচরিত্রগুলির চিত্রণ-বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণপন্থায় আলোচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে 'কিরণময়ী ও সাবিত্রী' এবং 'গৃহদাহ' এই দুইটি অধ্যায় আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছে। বিশেষ করিয়া কিরণময়ী-চরিত্রের অন্তর্লোক লেখকদ্বয়ের বিশ্লেষণে সুষ্ঠু ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই বুদ্ধিজীবী নারীর চরিত্রে বিভিন্ন প্রকৃতির দ্বন্দ্ব বিশেষ উপভোগ করিবার বস্তু। শরৎ-সাহিত্যের আর একটি বড় জিনিষ তিনি কোথাও villianকে নিরবচ্ছিন্নভাবে পাশবিক শক্তির প্রতিমূর্ত্তি করিয়া আঁকেন নাই। মাঝে মাঝে দেবত্বের ক্ষণস্ফুরণ এই villian চরিত্রগুলিকে স্বাভাবিক মানুষেরই প্রতিচ্ছবি করিয়া তুলিয়াছে। মানুষ আগাগোড়া আত্মপ্রতিবাদীশীল, এক একটি মুহূর্ত্ত তাহার জীবনকে আগাগোড়া ভাঙিয়া চুরিয়া গড়িতে পারে, এই যে স্ববিরোধিতা, ইহা বোধ হয় মানুষের নিজস্ব। কারণ আত্মবিশ্লেষণের ফলে ইহাই দেখা যায়, অবস্থা ও ঘটনার এক টুকরা কাল মেঘ আমাদের মনের আকাশে মুহূর্ত্তের মধ্যে যে বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করে, তাহার ফলে বাহিরের জগৎটার কাছে আমাদের পুরাতন অতিপরিচিত মূর্ত্তিটাই যেন বিভিন্ন বেশ ধরিয়া আত্মপ্রকাশ করে। তাই মানুষের চরিত্রে কিছুই অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব্বে শরৎচন্দ্র এক জায়গায় বলিতেছেন, "অনেককেই সখেদে বলিতে শুনিয়াছি, অমুক যে এমন হইতে পারে তাহা কে ভাবিয়াছে! অর্থাৎ, অমুকের জীবনটা যেন সূর্য্য-গ্রহণ, চন্দ্র-গ্রহণের মত তাঁহার অনুমানের পাঁজিতে লেখা নির্ভুল হিসাব। গরমিলটা শুধু অভাবিত নয়, অন্যায়। যেন তাহার বুদ্ধির আঁক কষার বাহিরে দুনিয়ায় আর কিছুই নাই। জানেও না সংসারে কেবল বিভিন্ন মানুষই আছে তাই নয়, একটা মানুষই যে কত বিভিন্ন মানুষে রূপান্তরিত হয় তাহার নির্দ্দেশ খুঁজিতে যাওয়া বৃথা। এখানে একটা নিমেষও তীক্ষ্ণতায়, তীব্রতায় সমস্ত জীবনকেও অতিক্রম করিতে পারে। মানুষের এই যে পরিবর্ত্তনশীল রূপ, যাহাকে ধরা-বাঁধা আইন-কানুনের চতুঃসীমার মধ্যে বাঁধিয়া রাখা যায় না, ইহাই শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্র-গুলিতে একটা স্বাভাবিকতার সৌন্দর্য্য আনিয়া দিয়াছে। আমরা তাঁহার চরিত্রসৃষ্টির স্বচ্ছ মুকুরে আমাদের জীবনের আগাগোড়া অন্ধকার প্রত্যন্ত প্রদেশ পর্য্যন্ত দেখিয়া লইয়াছি। শরৎসাহিত্যের সার্থকতা এইখানে। আলোচ্য পুস্তকখানির আদ্যোপান্ত পড়িয়া আমাদের মনে হইয়াছে—লেখকদ্বয় শরৎ-সাহিত্যের বিশেষ traitsগুলি যথেষ্ট দক্ষতার সহিত আলোচনা করিয়াছেন এবং গল্পের টেক্‌নিকের দিক্ দিয়া তাঁহারা যে বিশ্লেষণের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাও সুষ্ঠু হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) বইখানির ভূমিকায় ঠিকই লিখিয়াছেন, "* * * শিল্পচাতুর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায় লেখকের ভাষায় আর তাঁর গল্পরচনায়। * * * তাঁদের ভাষা অকৃত্রিম, সহজ ও স্বচ্ছ। যাঁরা শরৎ-সাহিত্যের অনুরাগী, তাঁরা এ পুস্তক পড়ে সুখী হবেন।" বিরুদ্ধবাদীরাও যথেষ্ট চিন্তার খোরাক পাইবেন।

ছাপা, কাগজ ও প্রচ্ছদপটটী দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পুস্তকখানির ভূমিকায় সাহিত্যের যে সুচিন্তিত পটভূমি শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় আঁকিয়াছেন, তাহা গ্রন্থখানির মর্য্যাদা অধিকতর বৃদ্ধি করিয়াছে। বাংলাসাহিত্যে এই সুবৃহৎ সমালোচনা-গ্রন্থ রচনা করিয়া গ্রন্থকারদ্বয় বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।
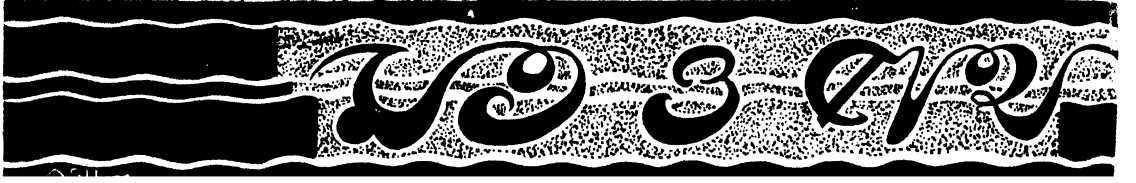
ভারতসচিবের দরদহীন নীতি

ভারত-সচিব মিঃ আমেরি বলিয়াছেন—ভারতবাসী পরস্পর মত-বৈষম্য বর্জ্জন করিয়া একটা চুক্তিতে উপনীত হইলেই স্বরাজ পাইবে। দেশনেতা মহাত্মা গান্ধী ইহার উত্তরে জানাইয়াছেন—তৃতীয় পক্ষ বর্ত্তমান থাকিতে ইহা কোনমতেই সম্ভব নহে। তৃতীয় পক্ষ সরিয়া যাক, পনের দিনের মধ্যে আমরা মতবিরোধ দূর করিয়া দাঁড়াইয়া যাইব। ইহার মধ্যে যদি কিছু মাথা ফাটাফাটিও হয়, তাহাতেও ক্ষতি নাই। দেশনেতা তিক্ত অভিজ্ঞতা মর্ম্মে লইয়াই এত জোর করিয়া এমন কথা বলিতে পারিয়াছেন। তাঁহার কথার প্রমাণস্বরূপ ঢাকা ও আহ্মেদাবাদের দৃষ্টান্তও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন।

কংগ্রেসের সহিত মোসলেম লীগকে এক মত হইতে হইবে। মোসলেম লীগকে এক-মত হইতে হইবে হিন্দু মহাসভার সহিত। নহিলে স্বরাজ নাই, স্বাধীনতা নাই—এমন কি ডোমিনিয়ন-ষ্টেটাস-লাভের আশাও সুদূরপরাহত দুঃস্বপ্ন মাত্র। একটা বৃহৎ দেশের—যাহা রাশিয়া-বর্জ্জিত সমগ্র ইউরোপ মহাদেশেরই সমতুল্য—অধিবাসিদের উপর এরূপ নির্দ্দেশ মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় অনেকেই অতিশয় কঠোর ও দরদহীন মনোভাবপ্রসূত বলিয়াই অনুভব করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। শুধু এদেশের রাষ্ট্রনেতৃবৃন্দই ইহা অনুভব করিয়াছেন, তাহা নহে। বহু বৃটিশ রাজনৈতিকও ভারতসচিবের কথায় আশা ও দরদের পরশ অনুভব করিতে পারেন নাই। শ্রমিক ও উদারনৈতিক সভ্যবৃন্দের তো কথাই নাই, স্যার ষ্ট্যানলী রীডের ন্যায় রক্ষণশীল সদস্যও ইংলণ্ডের রাষ্ট্রসভায় বলিয়াছেন—"Mr. Amery's speech left him under sense of depression. It did not take them anywhere." অতএব আমাদের মতভেদ দূর করিয়া স্বরাজ পাওয়ার কথায় বিশ্বাস বা আশ্বাসের মত কিছুই খুঁজিয়া পাইবার সম্ভাবনা নাই—ইহা না বলিলেও চলে। চল্লিশ কোটী ভারতবাসীর মধ্যে মতভেদ যদি এত সহজে দূর না হয় এবং তাহা দূর না হইলে যদি স্বরাজ-স্বাধীনতার স্বপ্ন স্বপ্নই থাকে, তবে ভারতের রাষ্ট্রীয় সাধনায় আশার গান গাহিবার হেতু নাই। বিশ্ব-দুনিয়ায় যাহাই ঘটুক, আমরা যে তিমিরে, সেই তিমিরেই থাকিব, —ইহাতে অন্যথা হয় নাই, হইবার কোন আশাও নাই—এই কথাই মিঃ আমেরী খোলাখুলি না বলিয়া ঝানু রাজনীতিকের ন্যায় ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বলিয়াছেন মাত্র। কিন্তু বৃটিশ জাতির এই ঘোর সঙ্কটের দিনেও মিঃ আমেরির এই ভুয়া আমীরী চাল কি ধোপে টিকিবে?

ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটীর উত্তর

শুধু মহাত্মা গান্ধী নয়, ভারত-সচিবের বক্তৃতা পড়িয়া স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রু প্রমুখ ধীরবুদ্ধি নেতৃবৃন্দও যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ ও বিক্ষুব্ধ হইয়াছেন, ইহা স্যার সাপ্রুর প্রত্যুক্তি হইতেই বুঝা যায়। মিঃ আমেরী বোম্বাই কন্‌ফারেন্সের নেতৃবৃন্দকে অগ্রে কংগ্রেস ও মোসলেম লীগের ঝগড়া মিটাইবার চেষ্টা করিতে উপদেশ দিয়াছেন—যদি তাহা নিতান্ত সম্ভব হয়, তবে একটা শক্তিশালী কেন্দ্রীয় দল (Centre Party) গঠন করা হউক—ইহাই তাঁহার পরামর্শ। স্যার সাপ্রু এই কথায় রুষ্ট কণ্ঠে বলিয়াছেন—এ চেষ্টা যে তিনি করেন নাই তাহা নহে, মহাত্মা গান্ধী ও মিঃ জিন্নার সহিত এ বিষয়ে তিনি যথেষ্ট লেখালেখি করিয়াছেন। তাঁর চেষ্টা এ পর্য্যন্ত বিফল হইয়াছে। আর সেণ্টার পার্টি যদি তাঁরা গঠনও করেন, মিঃ আমেরি এই নবীন দলকে একই কারণ দর্শাইয়া যে উপেক্ষা করিবেন না, এ সম্বন্ধে কি স্থিরনিশ্চয়তা আছে? তাঁহার মতে, মিঃ আমেরির ন্যায় বৃটিশ রাজনীতিকগণ যে ভাষায় কথা কহিতেছেন, তাহাতে এরূপ দলগঠনের কোনও আনুকূল্যই পাওয়া যায় না—পরন্তু বস্তুতঃ যে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের ভারতকে শাসনশক্তি দিবার কোন আগ্রহই নাই, এই কথাই সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে। বোম্বাই কন্‌ফারেন্সের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটীও পরামর্শান্তে এই সিদ্ধান্তই প্রকাশ করিয়াছেন।

ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটী মিঃ আমেরির আপত্তিগুলির যুক্তিযুক্ত উত্তরও দিয়াছেন। কন্‌ফারেন্স ভারতের পক্ষ হইতে যাহা দাবী করিয়াছেন, তাহার কোনটাই অযুক্তিকর বা অসাধ্য নহে। বর্ত্তমান ভারত-গভর্ণমেণ্টের জঙ্গী লাট সহ ৭ জন সদস্যের মধ্যে ৫ জন সরকারী ও ২ জন বেসরকারী সদস্য আছেন; গত আগষ্টের প্রস্তাবানুযায়ী স্বয়ং বৃটিশ গভর্ণমেণ্টই জঙ্গীলাট সহ ৩ জন সরকারী ও ৮ জন বেসরকারী, এই ১১ জন সভ্য লইয়া ভারত গভর্ণমেণ্টের এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিল গঠন করার কথা ছিল। বোম্বাই কন্‌ফারেন্স এই প্রস্তাবটিকে আরও একটু বাড়াইয়া ৪ জন সরকারী সদস্যকেই বেসরকারী করার প্রস্তাবনা করিয়াছেন মাত্র। ইহাতে বর্ত্তমান ভারত-গভর্ণমেণ্টের শুধু রূপ-পরিবর্ত্তন নয়, ইহার মূলোচ্ছেদ হইয়া যাইবে, মিঃ আমেরির এই আশঙ্কার কোনও হেতু নাই।

বোম্বাই কন্‌ফারেন্সের প্রস্তাবানুযায়ী ভারত-গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইলে, উহা ব্যবস্থাপক মণ্ডলীর রাজনৈতিক সহায়তা বা সমর্থন পাইবে না—মিঃ আমেরির এই উক্তিও যুক্তিসহ নহে। বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভার ১৪৩ জন সদস্যের মধ্যে কংগ্রেস ও লীগ সভ্য মাত্র ৬০ জন। কংগ্রেসের পরেই বড় কংগ্রেস জাতীয় দলের দলপতি মিঃ আনে স্বয়ং বোম্বাই কন্‌ফারেন্সের একজন সভ্য—তিনি ও তাঁহার দলের সমর্থন নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে। তারপর, কন্‌ফারেন্সের দাবী-মত নূতন ভারত-গভর্ণমেণ্ট ব্যবস্থাপক সভা নহে, ভারতসম্রাটের নিকট দায়ী থাকিবে। সুতরাং গভর্ণমেণ্ট ও ব্যবস্থাপক পরিষদের মধ্যে বিরোধের কথা এখানে অবান্তর।

ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটী ভারত সচিবকে কয়েকটী প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করিয়াছেন:—(১) ভারত-সচিবের আপত্তি-মূলে অর্থ ও দেশরক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃত্বভার হস্তান্তরিত করার অনিচ্ছা আছে কি না? (২) লীগ-নেতা মিঃ জিন্না তাঁর নিজ দাবী-মত সহযোগিতায় অস্বীকৃত হইলে, কি অন্য সকল রাষ্ট্রীয় দলের সহযোগিতার কোনও মূল্যই ভারত-সচিব স্বীকার করেন না? (৩) ভারত-সচিবের পরামর্শদাতৃগণ কি অকপটে বিশ্বাস করিবেন যে, কংগ্রেস বা অন্য কোনও প্রধান দলের সহিত মিঃ জিন্নার সন্ধিবদ্ধ হওয়া বর্ত্তমানে অসম্ভব?

তারপর, পার্ল্যামেণ্ট পূর্ব্বোক্ত ভাবে পুনর্গঠিত এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিলকে ডোমিনিয়ানোচিত অধিকার পূর্ণতর বা আংশিক রূপেও দিতে চাহিবেন না, মিঃ আমেরির এই কথার উত্তরে ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটী বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—তাহা হইলে এখনই ভারত-গভর্ণমেণ্টকে লীগ অব্‌ নেশন্‌সের মৌলিক সদস্যরূপে গ্রহণ বা সাম্রাজ্যসংক্রান্ত ও আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলনে এই প্রথা ত বৃটিশ পাল্যামেণ্ট দীর্ঘ ২০ বর্ষ ধরিয়া স্বীকার করিয়া আসিতেছেন।

মোটের উপর, ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটীর এই সকল যুক্তির পূর্ণ অনুযোগ ভারত-সচিবের শুধু কর্ণগোচর নয়, মর্ম্মগোচর না হওয়ার আমরা কোনও কারণ খুঁজিয়া পাই না। যুদ্ধের পর ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস কত দিনে পাওয়া যাইবে, এ দাবীও ভারতের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। মিঃ আমেরি কি এই সঙ্কটময় যুগসন্ধিক্ষণে বৃটেন ও ভারতের পরস্পর বুঝা-পড়ায় পুরাতন ও ব্যর্থতাপূর্ণ নীতি ছাড়িয়া দরদী হৃদয় ও উদার দূরদর্শী কল্পনা লইয়া অগ্রসর হইবেন না ও ভারতবর্ষকে অগ্রসর হইতে দিবেন না?

যুগপুরুষদ্বয়ের মর্ম্মবাণী

একদিকে মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ও অন্যদিকে মহাত্মা গান্ধীজি উভয়েই স্ব-স্ব ভাবে ও ভাষায় বৃটিশশাসন সম্বন্ধে তীব্র বেদনাগর্ভ মর্ম্মানুভূতি ব্যক্ত করিয়াছেন। এই দুই জন যুগমানবের কণ্ঠোত্থিত ব্যথার বাণী বিশ্বজাতির হৃদয়ে যে অনুভূতির প্রতিক্রিয়া তুলিবে, তাহা বৃটিশ সাম্রাজ্যের নৈতিক মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিবে না।

কবীন্দ্র বলিতেছেন—"ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত-সাম্রাজ্য ত্যাগ করে' যেতে হবে। কিন্তু কোন ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে' যাবে? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জ্জনাকে? একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন এ কি বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা, দুর্ব্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে?"

মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন—"I am convinced that if Britain would be true to India, then whether the Congress withdraws the

struggle or not, everything can be settled. British statesman have chosen the wrong path and have put imaginary obstacles in the way of India's freedom; but that is a chapter on which I have no desire to dilate."

কি মানবতা, কি রাষ্ট্রনীতি—উভয় দিক্ দিয়াই ভারত সম্বন্ধে ইংরাজ-জাতির দৃষ্টি ও চিন্তাভঙ্গী পুনর্ব্বিবেচনা করা উচিত এবং বাঞ্ছনীয়।

আমি বাঙালী

দাশনগরের তৃতীয় বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবসে কর্ম্মবীর শ্রীআলামোহন দাশ তাঁহার নব বর্ষের বাণীতে বাঙালীকে ব্যবসায় ও শিল্পের সাধনায় আহ্বান করিয়া যুগোচিত ভাষায় বলেন—তাঁহার এই বিপুল ও সফল কর্ম্ম-প্রেরণার উৎস একটী অনুভূতি—তাহা "আমি বাঙালী" এই চেতনা। যে দিন হইতে এই অনুভূতির জাগরণ তাঁহার তরুণ হৃদয়ে ঘটে, সেই দিন হইতেই তাঁহার চক্ষে নূতন আলো ফুটিয়া উঠে। বাঙালী বলিয়াই বাঙালীজাতির বিপুল সম্ভাবনা ও ব্যাপক পরিমণ্ডল সম্বন্ধে তিনি জাগ্রত ও সচেতন হইয়া উঠেন এবং তাঁহার সমগ্র কর্ম্মশক্তি, উৎসাহ, অর্থবল ও সাফল্য ইহাকে ঘিরিয়াই তিনি চিরদিন সঞ্চয় করিতে পারিয়াছেন। আর তাঁর এই সুদৃঢ় বিশ্বাসের কথাও তিনি অকম্পিত কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, এই জাতীয়তাবোধ যতদিন তাঁহার ভবিষ্য উত্তরাধিকারী তথা বাঙালীজাতিকে উদ্বুদ্ধ করিবে, ততদিন তাহাদের কর্ম্মগৌরব ও ব্রতসিদ্ধি অপ্রতিহত থাকিবেই।

শ্রীযুক্ত আলামোহন দাশের ন্যায় একজন কৃতকর্ম্মা বাঙালীর মুখে এই স্বচ্ছ অনুভূতির বাণী—এই জাতীয়তার শুদ্ধ মর্ম্মময়ী প্রেরণা বড় হৃদ্য, বড় প্রাণপ্রদ বলিয়া আমাদেরও প্রাণ স্পর্শ করিয়াছে। উদীয়মান বাঙালী-জাতিকে তাঁহার এই আন্তরিকতাপূর্ণ কথাগুলি গভীর চিত্তে অনুধাবন করিতে বলি ও সমগ্র জাতীয় জীবনকে বাঙালীত্বের চেতনায় অভিষিক্ত করিলে যে অভিনব কর্ম্ম-সিদ্ধির অধিকারী হইতে পারিব, এই প্রত্যয়কে দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে স্থান দিতে অনুরোধ করি।

যুদ্ধান্তের অর্থসমস্যা

বঙ্গীয় অর্থনৈতিক সম্মেলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের অভিভাষণ তাঁহার গভীর চিন্তা ও অভিজ্ঞতাপ্রসূত অনেকগুলি কথা আছে। যুদ্ধের সময়ে এ দেশে শিল্প ও ব্যবসাক্ষেত্রে যে উন্নতির সুযোগ আসিয়াছে, যুদ্ধের শেষে তাহার ভবিষ্যৎ কি, এই সম্বন্ধেই শ্রীযুক্ত সরকার প্রধানতঃ আলোচনা করিয়াছেন। যুদ্ধের পর, তাহার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আর্থিক দুর্গতি, বেকার-সমস্যা, ধন-বৈষম্য প্রভৃতি সমস্যা উপস্থিত হয়। এই জন্য তিনি দূরদর্শিতার সহিত এখন হইতেই আর্থিক সংগঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়াছেন। তাঁহার মতে, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয় অবস্থার জন্যই ভারতবাসীকে কৃষি ও শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে! এদিক্ দিয়া ভারতের ন্যায় বিপুল দেশে বিপুল ক্ষেত্র ও সুযোগ বিদ্যমান।

ধনবণ্টনের সমস্যা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সরকার বলেন—"এদেশে ধনীর সংখ্যা কম। কাজেই ধন-বণ্টনের অধিকতর সাম্যব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়া এ দেশের দারিদ্র্য-সমস্যার প্রতিকারের চেষ্টা অর্থহীন। ধনবণ্টনের সমস্যা এখনও আমাদের প্রধান সমস্যা নহে, অধিক হইতে অধিকতর ধনবৃদ্ধি করার পরিকল্পনা প্রথমে স্থির করিতে হইবে। তবেই মাথাপিছু দেশবাসীর আয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা ফুটিয়া উঠিবে। তখনই কেবল ধনবণ্টনের সমস্যার সমাধান-চেষ্টা সত্যই ফলবতী হইতে পারে।"

শ্রীযুক্ত সরকারের এই কথাগুলি কেহ কেহ হয়ত দ্বিধার সহিত গ্রহণ করিতে পারেন—কারণ সমাজে ধনিক-শ্রমিকের সমস্যাই আজ অত্যন্ত বড় ও উৎকট বলিয়া চিন্তা করার আব্‌হাওয়া সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে। আমাদের মনে হয়, নলিনীরঞ্জনবাবু এ বিষয়ে আরও বিশেষভাবে আলোচনা ও চিন্তা করিয়া, ভবিষ্যতে কোনও লেখায় বা বক্তৃতায় দেশবাসীকে তাহা জানাইলে, চিন্তাশীলগণ এ সম্বন্ধে স্পষ্টতর ভাবিবার ও বুঝিবার সুযোগ পাইবেন। আমাদের ধারণা, ধন-সৃষ্টি ও ধন-বণ্টন—পৃথক্‌ভাবে উভয় সমস্যা দেখিলে সমস্যার বৃদ্ধিই হইবে। যে সৃষ্টিশক্তি ধন সৃষ্টি করে, তাহা গোড়া হইতে যতখানি স্বার্থমুক্ত করা সম্ভব হইবে, ততখানিই স্বভাবতঃ সৃষ্ট ধন সহজভাবেই যোগ্য প্রণালীর মধ্য দিয়া ছড়াইয়া পড়িবে—তাহার জন্য স্বতন্ত্র বিপ্লবকরী ব্যবস্থার প্রয়োজনই হইবে না।

বৈদেশিক সংবাদ

ভারতের বাহিরে পাট উৎপাদন প্রচেষ্টা

ব্যবসায়ের ভিত্তিতে ভারতীয় পাটের উৎপাদনের জন্য ব্রেজিল সরকার ১৯২৫ সাল হইতে গবেষণা করিতেছিলেন। বর্ত্তমানে প্রতি বৎসরেই ব্রেজিলে পাটের চাষ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং আশা করা যায়, এ বৎসর ১৫০০ টনেরও বেশী পাট উৎপন্ন হইবে।

ইরাণ গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য-বিভাগ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে—আগামী পাঁচ বৎসরে ইরাণে অতিরিক্ত ২০০০ মেট্রিক টন পাট ও ৬০০ মেট্রিক টন লাক্ষা উৎপাদন করা হইবে।

দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ায় একপ্রকার সামুদ্রিক তন্তু পাওয়া যায়। পাট আমদানীর অসুবিধার জন্য গবর্ণমেণ্ট এই তন্তু দ্বারা থলিয়া নির্ম্মাণের চেষ্টা করিতেছেন।

কাঁচ হইতে এক প্রকার তন্তু নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রে নেকটাই, বিছানার চাদর প্রভৃতি নির্ম্মাণের জন্যও এই তন্তু ব্যবহার করা হইতেছে।

নৃত্যশিল্পী লা মেরী

সম্প্রতি আমেরিকার নৃত্যজগতে লা মেরী (La Meri) প্রভূত যশের অধিকারিণী হইয়াছেন। ছন্দোময় দেহসম্পদের অধিকারিণী এই শিল্পী মহিলা শিল্প-জগতের বিভিন্ন দেশীয় নৃত্যশিল্পে পারদর্শিনী, বিশেষ করিয়া ভারতীয় নৃত্যশিল্পে তাঁহার প্রতিভা তাঁহাকে অত্যল্পকালের মধ্যেই জগতের নৃত্যশিল্পীদের মধ্যে স্থান করিয়া দিয়াছে। সম্প্রতি নিউ ইয়র্কের সৌখীন Fifth Avenue নামক অঞ্চলে ইনি "School of Natya" নামে একটি নৃত্যশালা স্থাপন করিয়াছেন। ইনি শীঘ্রই ভারতে তাঁহার নৃত্যকলা প্রদর্শন করিবেন।

স্বাদেশিক সংবাদ

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ শতবার্ষিকী

প্রসিদ্ধ সাধক বিজয়কৃষ্ণের আবির্ভাবের পর ১০০ বৎসর গত হইল। এতদুপলক্ষে শ্রীযোগেশ ব্রহ্মচারী এম-এ মহোদয়ের প্রচেষ্টায় বঙ্গের বহু স্থানে তাঁহার শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। নবদ্বীপের অনুষ্ঠানটীও বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। তথাকার সুপ্রসিদ্ধ জননেতা শ্রীজনরঞ্জন রায় প্রভৃতি এই উদ্যোগের ভার লইয়াছিলেন। 'দেশ'-পত্রিকার সম্পাদক বৈষ্ণবদর্শনে সুপণ্ডিত শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন মহাশয় উক্ত অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। বিজয়কৃষ্ণের বহুমুখী প্রতিভা ও সাধকজীবনের স্মরণ ও কীর্ত্তন করিয়া দেশবাসী ধন্য হইয়াছিলেন।

বিশ্বভারতীর সাহায্য-ভাণ্ডারে চীনের দান

তাই চি তাও (Tai Chi Tao)—চীনের জাতীয় গভর্ণমেণ্টের ষ্টেট কাউন্সিলের সদস্য। ইনি গত বৎসর ভারতীয় চীন গুডউইল মিশনের নেতৃরূপে ভারতে আগমন করেন। সম্প্রতি জানা গিয়াছে, তিনি বিশ্বভারতীর ধনভাণ্ডারে ১০,০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। বিশ্বভারতীর গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনার সাহায্যকল্পে ও চীন-ভবনের সংস্কার-সাধনের জন্য এই দান করা হইয়াছে।

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের নবোদ্যম

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের উদ্যোগে বাঙ্গলা ভাষায় পরীক্ষাগ্রহণের এক পরিকল্পনা করা হইয়াছে। দুইটী পরীক্ষা হইবে (১) প্রবেশিকা, (২) বিশারদ। এই পরীক্ষায় বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী উভয় সম্প্রদায়ই যোগদান করিতে পারিবেন। ১৯৪১ সালের মধ্যে যাহাতে প্রবেশিকা পরীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা করা যায়, তাহার চেষ্টা কর্ত্তৃপক্ষ করিতেছেন। বাঙ্গলা ভাষার প্রসারের জন্য প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের এই প্রশংসনীয় চেষ্টা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।

রবীন্দ্র জন্মোৎসব

বিগত ১লা বৈশাখ সোমবার শান্তিনিকেতনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অশীতিতম জন্মোৎসব যথাযোগ্য গাম্ভীর্য্যের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। ২৫শে বৈশাখ তাঁহার জন্মতিথিতে

শ্বাধ রবীন্দ্রনাথ

তাঁহার অসংখ্য ভক্তের সঙ্গে আমরাও তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করি এবং প্রার্থনা করি, তিনি শতায়ুঃ হইয়া বাঙ্গলা ও বাঙালীর ভাষা ও সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করুন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিক্রি অনুমোদন

ত্রিবাঙ্কুর বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত ডিগ্রী অনুমোদন করিয়াছে। এই সিদ্ধান্তানুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি ত্রিবাঙ্কুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর তুল্যমূল্য হইয়াছে।

ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জ্জির অবসরগ্রহণ

ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখার্জ্জি এম. এল. এ. কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ইংরেজী-সাহিত্যের অধ্যাপক-পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ডক্টর মুখার্জ্জি প্রায় ৪০ বৎসর-কাল শিক্ষা-বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার সমস্ত শক্তি ও বিত্তই তিনি শিক্ষাপ্রসারের উদ্দেশে নিয়োজিত করিয়াছেন। তাঁহার দানের পরিমাণ চারি লক্ষাধিক টাকা হইবে।

আসামের শিক্ষাবিভাগে ভারতীয় ডিরেক্টর

শ্রীহট্ট মুরারীচাঁদ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুত সতীশচন্দ্র রায় এম্. এ. (লণ্ডন), আই. ই. এস. আসামের শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে আর কোন ভারতীয়ই আসামের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর হইতে পারেন নাই। অধুনা আসামে ইণ্ডিয়ান এডুকেশন্যাল সার্ভিসের লোকনিয়োগ বন্ধ হইয়াছে। শ্রীযুত রায়ই আসামের সর্ব্বশেষ আই. ই. এস।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্রীসম্মেলন

১৪ই বৈশাখ রবিবার অপরাহ্নে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থ আর্য্যসমাজ হলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্রীসম্মেলনের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হয়। মুর্শিদাবাদ জেলার ছাত্রী-সঙ্ঘের সেক্রেটারী শ্রীযুক্তা কিরণ দুগড় সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। স্ত্রী-শিক্ষা, মেয়েদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা, সাম্প্রদায়িকতার দূরীকরণে তাহাদের প্রভাব ও সর্ব্বোপরি স্বাধীনতাসংগ্রামে ছাত্রীগণের অংশগ্রহণের একান্ত প্রয়োজনীয়তা বিশদভাবে বিবৃত করিয়া সভানেত্রী মহোদয়া বলেন--পরাধীন ভারতের ছাত্রী আমরা, আমরা শুধু ছাত্রী নই—আমরা স্বাধীনতাকামী ছাত্রী। প্রথমে স্বাধীনতা, তবেই শান্তি, তবেই প্রগতি।

শোকসভা

গত ২৩শে এপ্রিল চন্দননগর ডুপ্লে কলেজ (ইণ্টার-মিডিয়েট) গৃহে চন্দননগর খলিসানী নিবাসী সুকবি নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে এক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত সভায় পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন শ্রীযুত চারুচন্দ্র রায়। শ্রীযুত নারায়ণচন্দ্র দে, শ্রীযুত হরিহর শেঠ, শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীশ্রীশচন্দ্র বসু, শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে প্রভৃতি সভায় কবির বিবিধ গুণাবলীর আলোচনা করিয়া বক্তৃতা করেন। চন্দননগর পুস্তকাগার গৃহে তাঁহার একখানি তৈলচিত্র রাখার প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়।

সহপাঠি-সম্মেলনের রজত জয়ন্তী

সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন — বাল্যপ্রণয়ে বিধাতার অভিশাপ আছে। কিন্তু কবির বাণী যে ক্ষেত্রে সত্য, ইহা সে ক্ষেত্রের কথা নয়। পঁচিশ বর্ষ পূর্ব্বে হুগলী

কলেজে এক দল তরুণ শিক্ষার্থীরূপে প্রবেশ করিয়া পরস্পর যে স্বাভাবিক প্রীতির পরিচয়ে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, সৌভাগ্যক্রমে তাঁহারা সেই পরিচয় এই ২৫ বৎসরেও ভুলেন নাই। সে দিনের তরুণ এখন অনেকেই বৃদ্ধ—কিন্তু বৃদ্ধের মধ্যে যে চির তরুণ, তার হাতছানি অনুসরণ করিয়া ইঁহারা বর্ষে বর্ষে মিলিত হন অতীতের কিশোর জীবনেরই মত স্বার্থহীন, বৈষয়িক উদ্দেশ্যহীন—শুধু অনাবিল' প্রীতিরই আকর্ষণে। এমন বাল্য-প্রেমে অভিশাপ নাই—অভিশাপ কখনও ফলিতে পারে না। ১৯২৩ সালে এই সহপাঠি-সম্মেলনের প্রথম পরিকল্পনা—১৩৪৮ সালে ইহার রজত জয়ন্তী উৎসব। প্রতি বর্ষের সম্মেলনে সারাদিন ধরিয়া অতীতের সহপাঠিরা অকৃত্রিম বাঁধনহারা আনন্দে মাতোয়ারা থাকেন। আলাপ, আনন্দ, বনভোজন এই চির-শিশুদেরই স্বপ্নময় খেলা ও মেলা বড়ই শুচিসুন্দর ও প্রীতি-মধুর। এবার হুগলী মহসিন কলেজে উক্ত রজত জয়ন্তী উৎসবে বৃদ্ধেরাই যেন নবযৌবনের আনন্দে এক সহপাঠীরই রচিত নাটক অভিনয় করেন। নাটকখানিও খুব উপযোগী হইয়াছিল—নাম "পঞ্চমাঙ্ক"। এই সহপাঠিদের অন্যতম শ্রদ্ধেয় শ্রীহরিহর শেঠ মহাশয়ের নিকট আমরা এই অনন্যসাধারণ অনুষ্ঠানটীর সংবাদ ও পরিচয় পাইয়া বড় আনন্দ অনুভব করিয়াছি। সহপাঠি-সম্মেলন বোধ হয় বাংলায় আর দুইটী নাই—ইহার দীর্ঘতর জীবনই আশা ও কামনা করি।

হুগলী কলেজে সহপাঠী সম্মেলনের রজত-জয়ন্তী উৎসব

দফরপুর প্রবর্ত্তক আশ্রম

বিগত ২৮শে চৈত্র শুক্রবার হাওড়া দফরপুর প্রবর্ত্তক আশ্রমে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের উপাসনা-মন্দির-প্রতিষ্ঠা উৎসব সুসম্পন্ন হয়। এতদুপলক্ষে সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল রায়ের উপস্থিতিতে সঙ্ঘাচার্য্য শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ সাংখ্যকাব্যতীর্থ পূজা, হবনক্রিয়াদি সম্পন্ন করেন। অপরাহ্ন ছয় ঘটিকার সময়ে শ্রীতুলসীচরণ মুখোপাধ্যায় এম-এ মহাশয়ের পৌরোহিত্যে এক সভার অধিবেশন হয়। স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী বৈদিক প্রশস্তিমন্ত্র উচ্চারণ করেন। তৎপরে আশ্রমসম্পাদক শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ ঘোষ সঙ্ঘের কার্য্য-বিবরণী পাঠ করেন এবং শ্রীযুত জীবনকৃষ্ণ কুমারের এককালীন ২৫০৲ টাকা দান ও অন্যান্য সাহায্যের কথা উল্লেখ করেন। পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ এবং শ্রীরাধারমণ চৌধুরী হিন্দুধর্ম্ম ও তাহার আচার ও অনুষ্ঠান সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সঙ্ঘগুরু শ্রীযুত মতিলাল রায় তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় হিন্দুধর্ম্ম ও সাধন সম্বন্ধে প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা করেন। স্বামী অমৃতানন্দজী সভাপতিকে ধন্যবাদ দেন। প্রবর্ত্তক নারীমন্দির কর্ত্তৃক সমাপ্তিসঙ্গীত গীত হইবার পর সভাভঙ্গ হয়।

মিউনিসিপ্যাল গেজেটের স্বাস্থ্য সংখ্যা

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের দ্বাদশ বার্ষিক স্বাস্থ্য সংখ্যা দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। বহু মূল্যবান্ প্রবন্ধ ও চিত্রাবলীর সমাবেশ ও সর্ব্বোপরি একটি গঠনসৌন্দর্য্য ইহার পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুন্ন রাখিয়াছে। বিশেষ করিয়া শিশুমঙ্গল ও মাতৃত্ব এই বিভাগটি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। জনসাধারণের মধ্যে পৌরসচেতনতা আনিতে সম্পাদক মহাশয়ের এই প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

গীতশ্রী-পরীক্ষা

গত ৫ই এপ্রিল সঙ্গীত সম্মিলনীর বার্ষিক 'গীতশ্রী' পরীক্ষা সঙ্গীত সম্মিলনী ভবনে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, প্রফেসর দবীর খাঁ, গৌরীপুরের শ্রীযুত বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এবং ডাঃ অমিয়নাথ সান্যাল পরীক্ষক ছিলেন। নিম্নলিখিত ছাত্রীগণ উত্তীর্ণ হইয়া 'গীতশ্রী' উপাধি লাভ করিয়াছেন। গুণানুসারে ছাত্রীদের নাম :— (১) কুমারী মীরা দাশগুপ্ত, (২) কুমারী রত্না গুপ্ত, (৩) কুমারী শ্যামলী চ্যাটার্জী, (৪) কুমারী শিবানী সরকার, (৫) শ্রীমতী অমলা রায়চৌধুরী (৬) শ্রীমতী কমলা ভট্টাচার্য্য, (৭) কুমারী ইলা ব্যানার্জী।

বিদায়ী মেয়র
এ, আর, সিদ্দিকি

নূতন মেয়র
শ্রীফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম

ডেপুটী মেয়র
মিঃ ইস্পাহানী
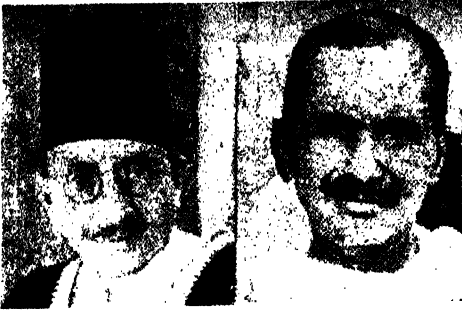
কুমারী মীরা দাশগুপ্তা (গীতশ্রী)

কলিকাতার নূতন মেয়র

কলিকাতা কর্পোরেশনের বিদায়ী ডেপুটী মেয়র শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম গত ১৫ই বৈশাখ সোমবার কলিকাতা কর্পোরেশনের অধিবেশনে ১৯৪১-৪২ সালের জন্য কলিকাতার মেয়র-পদে সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্ব্বাচিত হন। শ্রীযুত ব্রহ্ম কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েসন কর্ত্তৃক মেয়র-পদের জন্য মনোনীত হইয়াছিলেন। এম্, এ, এইচ ইস্পাহানী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কর্পোরেশনের ডেপুটী মেয়র নির্ব্বাচিত হন। মিঃ ইস্পাহানী মুসলীম লীগ দলের মনোনীত প্রার্থী ছিলেন। আমরা নব নির্ব্বাচিত মেয়র ও ডেপুটি মেয়র উভয়কেই অভিনন্দন জানাইতেছি।

দোকান-নিয়ন্ত্রণ আইন

বর্ম্মা শেল অয়েল কোম্পানীর প্রশ্নের উত্তরে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন যে, দোকান-নিয়ন্ত্রণ আইনে যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে কর্ম্মচারীদিগের পাওনা আকস্মিক প্রয়োজনীয় ছুটি (ক্যাজুয়াল), ব্যাঙ্ক-বন্ধজনিত ছুটি অথবা পরবের জন্য ছুটির মধ্যে গণ্য করিলে চলিবে না। অসুস্থতার জন্য ছুটিকেও আকস্মিক প্রয়োজনীয় ছুটির (ক্যাজুয়াল) মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে না। উহা ভিন্নভাবে মঞ্জুর করিতে হইবে।

যুগ্ম সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী
প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি-এ কর্ত্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত
এবং প্রবর্ত্তক প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, ৫২।৩ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীফণিভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ষড়বিংশ বর্ষ
১৩৪৮ সাল

আষাঢ়

প্রথম খণ্ড
৩য় সংখ্যা

ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠ জাতি

আমি ধর্ম্মকে বীর্য্যস্বরূপ মনে করি। ধর্ম্মই মানুষের আয়ুঃ ও যশঃ, ভাগ্য ও সম্পদ্। ধর্ম্ম মানুষকে দেবতার আসন দেয়। ধর্ম্মে আত্মার অভ্যুত্থান হয়। ধর্ম্মই সার্ব্বাঙ্গীণ মুক্তির হেতু। এর সামান্য অভিব্যক্তিও যেখানে নেই, সেখানে ধর্ম্মের নামে মিথ্যাই প্রশ্রয় পায়। অবশ্য অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার কালে ধূমের আবির্ভাব অনিবার্য্য; এইরূপ ধর্ম্মলাভের পথে বহু প্রকারের মনোবৃত্তি পরিদৃষ্ট হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু সাধককে সত্য ধর্ম্মই আবিষ্কার করতে হবে। নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়।

এই ধর্ম্ম পুরুষ-বাদ নয়। তবে পুরুষের কণ্ঠেই অপৌরুষেয় বেদ-বাণী উচ্চারিত হয়। আমাদের বেদকে আশ্রয় করতে হবে। বেদধর্ম্ম-প্রবর্ত্তককে গুরু বলে' স্বীকার করতে হবে। কোন সম্প্রদায়গত ধর্ম্ম নয়, বিরাট্ সনাতন ধর্ম্মই আমাদের একমাত্র আশ্রয়ণীয়।

আমাদের ধর্ম্ম জ্ঞান মাত্র নয়। শাস্ত্র জ্ঞান দেয়, প্রকরণও দেয়। জ্ঞানচর্চ্চায় মস্তিষ্কের অনুশীলন হয়; প্রকরণে সর্ব্বাঙ্গ তপঃ-পূত হয়। তাই প্রকরণের সঙ্গেই জ্ঞানানুশীলন বাঞ্ছনীয়। সনাতন ধর্ম্ম বেদ-প্রসিদ্ধ। কোন পুরুষ যদি ধর্ম্মমত প্রচার করে, মতভেদ অবশ্যম্ভাবী। মতভেদে শাস্ত্রভেদ হয়, শাস্ত্রভেদে আচারভেদ হবেই। আচার বাক্য, মন, শরীরের আশ্রয়ে হয়। মতভেদজনিত নানা আচারের প্রবর্ত্তনে একই জাতির মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়। বিরোধ প্রবল হ'লে, জাতি দুর্ব্বল হয়, ক্রমে অবসাদে নির্ব্বীর্য্য হ'য়ে পড়ে। এরই চরম অবস্থায়, এক শ্রেণীর মানুষ ব্যর্থ আলোচনা-আন্দোলন ছেড়ে সর্ব্বত্যাগী হয়ে যথার্থ অভ্যুত্থানের পথ খোঁজে। তারা আত্মদোষ-বিচারে শুদ্ধচিত্ত ও বৈরাগ্যে নিরাসক্ত হওয়ায়, কোথায় গলদ তা' লক্ষ্যে পড়ে। তখনই হয় জ্ঞানোদয়। তারপর, তারা আত্মসংবিৎ ফিরে পায় ও আবার সনাতন বেদ-ধর্ম্ম আশ্রয় করে' নবজীবনের আশ্রয় করে।

এই নূতন জীবনের বিগ্রহ-মূর্ত্তি নেতা বা গুরু। গুরু-বিগ্রহ ঘিরে' নব জাতির অভ্যুদয়। নবীন জাতি মন্ত্রশক্তি, বিদ্যাশক্তি, ধনশক্তি, রাষ্ট্রশক্তি ও সমাজশক্তি অর্থাৎ সাবিত্রী, সরস্বতী, মহালক্ষ্মী, দুর্গা ও শ্রীরাধা, এই পঞ্চ শক্তির সাধনায় মুক্তি ও কল্যাণের অভিযান করে। —শ্রীম

সংগঠনের ধারা

বাংলার ঋষিতুল্য মনীষী ও বৈজ্ঞানিক, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র দরদী হৃদয়ের আবেগময়ী ভাষায় বলিয়াছেন—"অশিক্ষিত উৎপীড়িত, অনশনক্লিষ্ট আমার দেশবাসিগণ। তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা, পীড়নের লাঘব ও ক্ষুধার অন্নসংস্থান—এই ত প্রধান কর্ত্তব্য।" এই কথাই কিঞ্চিৎ ভাষান্তরে সংগঠনের মূল ত্রি-নীতি রূপে আমরা গ্রহণ করিয়াছি—শিক্ষা, সংহতি ও অর্থপ্রতিষ্ঠান। বড় বড় আদর্শের কথা শিকায় তুলিয়া রাখিয়া, জাতির মধ্যে প্রকৃত শিক্ষা, সংহতি-শক্তি ও আর্থিক বনীয়াদ সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে, আর যাহা কিছু সহজে করায়ত্ত হইবে, ইহা না বলিলেও চলে। দেশের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা শুধু চীৎকারে বা ফাঁকা আন্দোলনে যেমন আসিবে না, তেমনি প্রতিবাদের দ্বারাও অত্যাচারের প্রতিবিধান সম্ভব নহে। শিক্ষা, সংহতি, অর্থশক্তি লইয়াই জাতিকে দাঁড়াইতে হইবে। বাঙালীর সব চেয়ে গুরুতর জীবন-সঙ্কট যে সময়ে, সে সময়ে করণীয় যাহা তাহা স্থির গভীর চিত্তে অবধারণ করিয়া লইতে হইবে, তারপর অনাহত কর্ম্মশক্তি উদ্বুদ্ধ করিয়া নিপুণ ও সুদৃঢ় হস্তে তাহা কার্য্যক্ষেত্রে প্রতিপন্ন করিয়া তুলিতে হইবে।

আমাদের শিক্ষা হইবে খাঁটি জাতীয় শিক্ষা। প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ইহার জন্য নাকচ করিতেই হইবে, এমন কোন কথা নাই। বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিয়াছে যুগের প্রেরণায়, তাহার সত্য উপেক্ষণীয় নহে। কিন্তু এই সঙ্গে ভারতীয় ভাব ও আদর্শে তরুণ জাতির মস্তিষ্ক সুসংস্কৃত করিয়া লইতে পারিলে, আমাদের আর ভয়ের কারণ নাই। ভারতীয় স্বভাব-স্বধর্ম্মের উপর দাঁড়াইয়াই আমরা যুগের সর্ব্ব শিক্ষা আয়ত্ত করিতে পারি। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র—এই সব ভারতীয় শাস্ত্র, সন্দেহ নাই। ভারতের প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধ্বংসস্তূপ ইহারা এখনও রক্ষা করিতেছে। এইগুলির যথার্থ মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে হইলেও, মৌলিক ভারতীয় মেধা ও মস্তিষ্ক চাই। তাহা যে সাধনসাপেক্ষ, ইহা বলাই বাহুল্য। অতএব বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া, যে প্রণালী-সহযোগে ভবিষ্য জাতির মেধা ও মস্তিষ্ক ভারতীয় মর্ম্মে ও ধর্ম্মে সুগঠিত হইয়া উঠে, তাহাই আমাদের চিন্তনীয়। ইহা কঠিন হইলেও, অসাধ্য নহে।

ভারতীয় সাধনায় সিদ্ধ মানুষের অভাব এ দেশে কোনদিনই হয় নাই। এই উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতেও আমরা তেমন মানুষ দেখিয়াছি ও পাইয়াছি। ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবন খাঁটি আর্য্য সাধনা ও সিদ্ধিরই দৃষ্টান্ত। উনবিংশ শতাব্দীর যুগসন্ধিস্থলে আবির্ভূত হইয়া শিক্ষিত বাঙালীর জীবনে যে প্রবল অধ্যাত্ম স্রোতঃ তিনি সঞ্চারিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রভাব আজিও সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয় নাই। বাঙালী আরও বহু 'যুগের মানুষ' পাইয়াছে, তাঁহাদের নামোল্লেখের প্রয়োজন নাই। এই অধ্যাত্ম-শক্তির প্রবাহ সমষ্টিজীবনে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। ইহার জন্য সংহতি-গঠন আবশ্যক। এই সংহতিও ভারতীয় ভাবের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

ব্যক্তি ও সংহতি যদি অমিশ্র জাতীয়তার মন্ত্রে সংগঠিত হয়, বাঙালীর সম্মিলিত জীবন-প্রকাশ বস্তুতন্ত্র অর্থ-সাধনাকেও একই ধারায় সুনিয়ন্ত্রিত করিবে, ইহাও আমরা অনায়াসে আশা করিতে পারি। জাতির ধর্ম্মবীর্য্যই আজ শিক্ষা, সমাজ, অর্থক্ষেত্রে সর্ব্বব্যাপী যুগান্তর আনয়ন করিবে। ইহার অনিবার্য্য পরিণতি—রাষ্ট্রীয় মুক্তি।

নেতা ও সংহতি

সংহতি গড়ে নেতার উদাত্ত আহ্বানে বা জীবনের আকর্ষণে। [illegible]ই সংহতির প্রেরণার উৎস। সংহতির অন্তর্ব্বর্ত্তী বিচ্ছিন্ন বিভক্ত ব্যষ্টিজীবনগুলিকে সংযুক্ত ও শৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত করিতে হইলে, নেতার কর্ম্ম-

প্রতিভার আবশ্যক, কিন্তু ততোধিক প্রয়োজনীয় হৃদয়ের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। কর্ম্মী ও নেতার মধ্যে যদি প্রেমের অনাবিল বন্ধন না থাকে, একদিকে নেতৃত্বের অহমিকা, অন্যদিকে কর্ম্মীর বিপরীত গতি জাগ্রত হইয়া সংহতির ভিত্তি চূর্ণ করিয়া দিতে পারে। হৃদয়ের প্রতি হৃদয়ের অনাবিল আকর্ষণই সংহতি-সাধনার মূল সূত্র। বহু হৃদয় চক্রের নেমিরেখার ন্যায় একটী মূল কেন্দ্রে সমাকৃষ্ট হইলে, সেই কেন্দ্র-হৃদয়ই সংহতির মধ্যমণিস্বরূপ হয়। সকল হৃদয়ের মৌলিক তপস্যা সেই কেন্দ্র-হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়া, ক্রমে ঘনমূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। কেন্দ্রপতি সমষ্টি-হৃদয়েরই প্রতিভূ-স্বরূপ সংহতি-শক্তি সুদৃঢ় করিয়া তুলেন। নেতার আদেশ বা কর্ম্মনীতি এই কারণেই সংহতির প্রাণ আপন চাওয়ারই প্রতিধ্বনিরূপে বরণ করে।

নেতা ও সংহতির মধ্যে এই অন্তরের সম্বন্ধ ও ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, কর্ম্মে আনুগত্য ও শৃঙ্খলা সহজসাধ্য হয়। কর্ম্মপ্রকাশ বহু হইলেও, একই কর্ম্মনীতি সংহতির নিয়ামক হয়। এখানে নেতার সহিত কর্ম্মকর্ত্তার পরিচয়ই বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে ঐক্যসূত্র অব্যাহত রাখে। কোনও কর্ম্মীই নেতাকে অতিক্রম করিতে পারে না, তাহার কারণ আসলে প্রেমের স্বীকৃতিই কাহাকেও কেন্দ্র-হৃদয় অস্বীকার করিতে দেয় না। কর্ম্মীর কর্ম্ম-সঙ্কট উপস্থিত হইলে, কর্ম্মকর্ত্তার যেমন, নেতারও ততোধিক টনক নড়িয়া যায়। নেতার কেন্দ্র-হৃদয়-জাত ঘনীভূত তপঃশক্তি সহায়স্বরূপ আবির্ভূত হইয়া সঙ্কট মোচন করে, কর্ম্মীকে রক্ষা করে। নেতৃত্বের এই অপার্থিব হৃদয়শক্তিই বর্ম্মস্বরূপ সমগ্র সংহতিকে ঘেরিয়া রাখে, উহাই সংহতিকে বাধা-জয়ের শক্তি ও কর্ম্মপ্রসারের গতিবেগ দান করে।

নেতার সহিত সম্বন্ধ সংহতির মেরুদণ্ড। কিন্তু সংহতির বিভিন্ন কর্ম্মীর মধ্যেও পরস্পর পরিচয় ও সম্বন্ধ চাই। নেতার প্রতি নিষ্ঠা যদি সংহতির প্রাণ-কেন্দ্র হয়, তবে এই পারস্পরিক প্রীতি ও সহানুভূতির সম্বন্ধই সংহতি-জীবনে ওতঃপ্রোতঃ রস সঞ্চার করে। ইহা ব্যতীত সংহতি-সাধনা নীরস, প্রাণহীন কর্ত্তব্য মাত্র হয়। কেন্দ্রের প্রতি সম-নিষ্ঠাই এই পারস্পরিক প্রীতি ও পরিচয়ের সেতুস্বরূপ হয়—কিন্তু ইহারও ঘনীকরণের সাধনা আছে। শুধু নেতৃনিষ্ঠা দিয়া বিরাট্ কর্ম্মযন্ত্র গঠিত হয়; পরস্পর সম্বন্ধ ও সহযোগিতার রসায়ণেই কর্ম্মযন্ত্র জীবন্ত মধুচক্রে বা "মিশনে" পরিণত হয়। বাঙালী সংহতি-সাধনায় উভয় দিক্ দিয়া অগ্রসর হইলেই যথার্থ সঙ্ঘবীর্য্য-ধারণে অধিকারী হইবে। এখন পর্য্যন্ত আমরা আংশিক সংহতি-সাধনারই পরিচয় পাইয়াছি। পূর্ণাঙ্গ সঙ্ঘ-সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিলে, তাহাই অখণ্ড জাতির মহাবীর্য্য হইবে। এইদিকেই বাংলার জাতি-প্রাণ স্বতঃ উদ্বুদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত হউক।

গণতন্ত্র ও একনায়ক-তন্ত্র

গণতন্ত্র ও একনায়ক-তন্ত্রে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে। ইউরোপের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ নাকি এই উভয় তন্ত্রেরই পরস্পর চরম সংঘাতের ফল। কোন জাতি গণতন্ত্র রাষ্ট্রনীতিরূপে বরণ করিয়াছে; কেহ বা একনায়কত্ব অর্থাৎ ডিক্টেটর-তন্ত্র। অতএব সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। কথাটা পূর্ণ সত্য নহে, অর্দ্ধ সত্য মাত্র। কেন না, খাঁটি ও পূর্ণ গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র মূলতঃ স্বতঃ-বিরোধী তত্ত্ব নহে। উভয়েই জাতি-ধর্ম্মের পরিপূর্ণ বিকাশের এক একটী দিক্ মাত্র। পূর্ণ অখণ্ড জাতীয় সত্তা যুগপৎ গণধর্ম্মী ও ডিক্টেটার-ধর্ম্মী হইতে পারে—হওয়ার কোনও মৌলিক বাধা নাই—ইহাই আমাদের ধারণা। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-বিশ্লেষণে আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইব।

গণতন্ত্র—বহু আত্মার সম্মিলন-সূত্র। বহু ব্যক্তি পরস্পর পরামর্শ ও আলোচনা করিয়া যে সম-নীতি গ্রহণ করে, তাহাই গণতন্ত্রের ভিত্তি-স্বরূপ। তাহাদের বহুত্ব তখন এককেই স্পর্শ করে। একের সাধনায় বহুত্বের উদ্বুদ্ধ হওয়ার ইহাই অব্যর্থ ক্রম বা প্রকরণ। পক্ষান্তরে, এই অন্তর্নিহিত ঐক্যতত্ত্ব কখনও কখনও কোনও মহাব্যক্তিত্ব আশ্রয় করিয়া বহুকে আপনার মধ্যেই খুঁজিয়া পায়—বহু তখন একের মধ্য দিয়া জাগ্রত ও সচেতন হয়, আপনার শক্তি ও মহিমার পরিচয় লাভ করে। উভয়তঃ, একই জাতিসত্তা আত্মপ্রকাশ করে—কখনও নিছক তত্ত্বরূপে, কখনও ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করিয়া। তত্ত্ব ও ব্যক্তি স[illegible]ভিব্যক্তি।

জাতির স্বরূপই নেতা ও সংহতির মধ্য দিয়া আত্মপ্রচার করিয়া থাকে। এই জন্য নেতা ও সংহতি, প্রভুশক্তি ও গণশক্তি অথবা আধুনিক ভাষায় সর্ব্বময় ডিক্টেটার ও গণবিগ্রহ ডিমোক্রেসী—স্বরূপতঃ অভিন্ন, একই জাতীয়াত্মার দ্বিধাবিভক্ত রূপায়ণ বা আত্মনিয়ন্ত্রণেরই প্রকরণ।

গণতন্ত্রও সঙ্কটকালে আজ একনায়কত্বের প্রকরণ গ্রহণ করিতেছে, দেখা যায়। ইহাতে মনে হয় যেন তন্ত্রের বিতত ভাব আপনাকে ঘনীভূত করিয়াই পূর্ণ করিয়া লইতে চাহিতেছে। অন্য পক্ষে, একনায়কত্বের অতি-ঘন প্রক্রিয়া অপরূপ কর্ম্মশক্তি বিকাশ করিয়াও, নিজের যান্ত্রিকতাই প্রতিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে—এই যন্ত্রে আর কিছু বেশী টান ধরিলেই উহা ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে, যদি না যন্ত্রধর্ম্ম তন্ত্রের প্রাণ-ধর্ম্মে নব সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। অদ্বিতীয় ডিক্টেটার এডল্‌ফ হিটলারের দ্বিতীয় বিগ্রহস্বরূপ রুডল্‌ফ হেসের ইংলণ্ডে পলায়ন যদি অন্য কোনও রাষ্ট্রীয় কূটনীতিমূলক না হয়, তবে তাহা জর্ম্মণীর প্রসিদ্ধ চিন্তাবীর টমাস ম্যান্ প্রমুখ যেমন অনুমান করিয়াছেন—একনায়ক-তন্ত্রের অতিমাত্র টানেরই (tension) অনিবার্য্য পরিণাম আত্মভেদেরই সূচনা। গণতন্ত্র ও একনায়ক তন্ত্র আজ উভয়ই খণ্ডিত, আংশিক রূপে বিকশিত—তাই উভয়েই পরস্পর পরিচয় পায় নাই। এইজন্য সংঘাত, সংঘর্ষ। অখণ্ড জাতিধর্ম্মে উভয়েরই স্থান আছে। শুধু তাই নয়, এই উভয় অর্দ্ধ সত্য পরস্পর না পূরণ করিলে, পূর্ণাঙ্গ জাতি-সাধনাই প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না।

দুর্গত দেশ

বাংলার দুর্গতির অবধি নাই, সীমা নাই। ঢাকার রক্তবন্যা শেষ হইতে না হইতে, বরিশালের ঘূর্ণিবাত্যা ও জলোচ্ছ্বাস সহস্র প্রজার জীবন নষ্ট করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, ভোলা হইতে নোয়াখালি পর্য্যন্ত দিগন্ত-বিস্তৃত প্রলয়-তাণ্ডবে কোটী টাকার অধিক মূল্যের সম্পদ্, খাদ্যশস্য প্রভৃতি বিধ্বস্ত করিয়া আরও হাজার হাজার নরনারীর জীবনযাত্রা পঙ্গু করিয়া তুলিল। এই শেষ মার বিধাতার মার—প্রতিবাদ নিষ্ফল, সতর্কতায় ফল নাই, প্রতিকারেরও উপায় নাই। যেখানে মানুষের দুর্ব্বুদ্ধি দায়ী নহে, সেখানে স্বয়ং প্রকৃতি-রাণীই দুর্ভাগ্য জাতির দুর্দ্দশার পাত্র পূর্ণ করিতে যেন উন্মুখ হইয়াছেন। আমাদের অদৃষ্টের কথা ভাবিয়া কুলকিনারা মিলে না!

ইউরোপ মরিতেছে—বোমারু বিমানের নিক্ষিপ্ত বজ্র ও অগ্নিবর্ষণে—ছাতারু সেনা বীরত্বের নেশায় গুলির সম্মুখে বুক পাতিয়া দিতেছে—নগর-নগরী চূর্ণ, নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতেছে আততায়ীর আক্রমণে। মানুষের বিরুদ্ধে সেখানে মানুষের ভয়াবহ চক্রান্ত—সেও ঢের বেশী নির্ম্মম, নিষ্করুণ—কিন্তু সেখানে তবু মনুষ্যত্বের একটা আত্ম-মর্য্যাদার সান্ত্বনা আছে। বীরজাতির বিরুদ্ধে বীরজাতি জয়ের কামনায় বিভোর হইয়াই পরস্পর মৃত্যুপণ সংগ্রাম বাধাইয়াছে। আমাদের নিরুপায় মৃত্যু, বাঁচিয়াও নিঃসহায়তার তুলনা নাই! আমাদের অবস্থা অবর্ণনীয়, অতুলনীয়।

ঢাকার দাঙ্গা-হাঙ্গামা সম্পূর্ণ শেষ হইল কি না জানি না; তবে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের জরুরী আইন এতদিনে প্রত্যাহৃত হইয়াছে, এইটুকুই আশার লক্ষণ। এখানে দায়ী প্রকৃতি নহেন, মানুষ, মানুষের দুর্ব্বুদ্ধি। তাহার প্রতিকারও তাই অনেকটা মানুষেরই হাতে। বাংলায় গুণ্ডাশাহীর প্রাদুর্ভাব বিনা কারণে অবশ্যই ঘটে নাই। এই কারণগুলিই ধীর চিত্তে আবিষ্কার ও অনুধাবন করিতে হইবে। সাম্প্রদায়িক বিষ-বাষ্পের প্রতিকার শুধু কথার সান্ত্বনায় হইবার নহে। শাসনতন্ত্রে ভেদবিচার প্রজায় প্রজায় সংশয় ও অবিশ্বাসের ভাব বিস্তার করিলে, কোনদিনই এইরূপ অনর্থ ও উৎপাতের স্থায়ী প্রশমন হইবে না। গুণ্ডারাজ সাম্প্রদায়িক স্বার্থ-প্রসূত হউক বা না হউক, উৎপীড়িতের আত্মরক্ষার অধিকার কোন কারণেই ক্ষুণ্ণ না হয়, সেইদিকে প্রত্যেক সম্প্রদায়, তথা সমগ্র দেশবাসীকেই সচেতন হইতে হইবে। ইহার জন্য আইন-ভঙ্গের প্রয়োজন হইবেই, এমন কোন কথা নাই। প্রত্যেক পুরুষ, প্রত্যেক নারীরই বীরের ন্যায় আত্মমর্য্যাদা-রক্ষার বিধিদত্ত অধিকার আছে। এই অধিকার ও মর্য্যাদার বোধকে সর্ব্বতোভাবে পুষ্ট ও রাজশক্তির অভয়-

দানে নিঃশঙ্ক করিয়া তুলিতে হইবে। গুণ্ডার বীভৎস লীলা রাজ্য-শাসনেরও দুরপনেয় কলঙ্ক—শাসনকর্তৃপক্ষের এ কলঙ্কমোচন না করিলে চলিবে না।

তারপর, গভর্ণমেণ্টের রাজকোষ হইতে নিঃস্ব ও রিক্তদের যে অর্থ দিয়া সাহায্যের ব্যবস্থা হইতেছে, তাহাও যাহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণেও কার্য্য সিদ্ধ করে, সেদিকেও আমরা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। নিঃসম্বলকে ঋণ দিয়া কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? মাসিক ২৲।১৲ টাকা ঋণ খাইতেই উড়িয়া যাইবে, খাতক ঋণ শোধ করিবে কোথা হইতে? টাকাই যদি গভর্ণমেণ্ট দেন, তাহা নিছক সাহায্যস্বরূপই দেওয়া কর্ত্তব্য। এখন কোনমতে এই সকল দুঃস্থ দেশবাসীকে বাঁচাইতে হইবে। তারপর, যাহাতে তাহারা নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারে, তাহার জন্য স্বতন্ত্র সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সকল দুর্দ্দিনের এইখানেই চরম নয়, ইহা আমরা বুঝিতেছি। কিন্তু আজিকার দুর্গতির প্রতিকার না হউক—ক্ষতের উপর কথঞ্চিৎ প্রলেপ-লেপনেই যদি আমাদের সমস্ত শক্তি ব্যয়িত হয়, তবে ভবিষ্যতের স্থায়ী দুর্দ্দশামোচনের আমরা কি উপায় নির্দ্ধারণ ও ব্যবস্থা করিতে পারিব? সাময়িক সেবা ও সাহায্যের ব্যবস্থা যেখানে প্রয়োজনীয় তাহা করিতেই হইবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চিরস্থায়ী দুঃখ ও দারিদ্র্য দূর করার যতটুকু শক্তি ও উপায় হাতে আছে, তাহা আশ্রয় করিতে কুণ্ঠা করিব কেন? আমরা ৫০,০০০৲ হাজার টাকা বিতরণ করিয়া কয়েক হাজার লোকের কয়েকদিনের দিন গুজরাণের ব্যবস্থা করিতে পারি—আরও ৫০,০০০৲ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া তাহাদের গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিতে পারি—আবার এইরূপ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া অর্দ্ধ সহস্র নরনারীর চিরদিনের অন্নসংস্থানের উপায়স্বরূপ কোন স্থায়ী শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠান রচনা করিতেও পারি। অস্থায়ী অভাব-মোচনের সঙ্গে এই স্থায়ী দারিদ্র্য দূর করারও সুচিন্তিত বিধি ও ব্যবস্থাগুলি সম্বন্ধে আমরা দেশকর্ম্মী তরুণদের ভাবিতে বলিব। কোটী কোটী দরিদ্র দেশবাসীর অন্ততঃ অন্নবস্ত্রসংস্থানের জন্য যাহা করা প্রয়োজন, তাহা একেবারেই আমাদের হাতের বাহিরে নহে। চাই সবল পরিকল্পনা, সুচিন্তিত কর্ম্মপদ্ধতি ও সংহতিবদ্ধ শ্রম-সাধনা। উদীয়মান বাঙালীর কি এই অন্তরের মূলধনটুকুও নাই?

অর্থনৈতিক সমস্যা

বাংলার মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা আজ ধনসৃষ্টির—এই কথা একজন অর্থনীতিবিৎ বিশেষজ্ঞ সেদিন বলিয়াছেন। এই তত্ত্বের সহিত ধনবণ্টনসমস্যাও বিজড়িত আছে কিনা, সে চিন্তা অনেকটা 'একাডেমিক'। বস্তুতন্ত্র সমস্যা—অর্থ-সৃষ্টির উপায় ও উপকরণ লইয়া। ধনসৃষ্টির জন্য চাই শ্রম, মূলধন, কাঁচা মাল, যন্ত্রপাতি এবং সর্ব্বোপরি শিল্প ও ব্যবসায়ের সংগঠনী-প্রতিভা। স্বাধীন দেশে রাজশক্তি সহায় থাকে বলিয়া এই সকলের সংযোগ অল্পায়াস-সাধ্য হয়। তথায় অকৃত্রিম স্বজাতি-প্রীতিও উৎপন্ন পণ্যের গ্রহণে ও প্রচারে ইহাতে পৃষ্ঠপোষকতা করে। আমাদের শিল্পসৃষ্টি ও বাণিজ্য-বিস্তারের জন্য সর্ব্বাধিক আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া চলা ছাড়া বর্ত্তমানে উপায়ান্তর নাই। এই আত্ম-শক্তি ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী ও শিল্পস্রষ্টার হইতে পারে অথবা সমবায় ও যৌথমণ্ডলীরও হইতে পারে। বাংলায় এক্ষণে উল্লেখযোগ্য যৌথপ্রতিষ্ঠান কিছু কিছু গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সকল বাঙালীর ধনসৃষ্টি ও ধনবৃদ্ধির সহায়তা করিতেছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ভারতের অতীত যুগে এই প্রকার যৌথ শিল্প বা বাণিজ্যনীতির প্রচলন ছিল কিনা, তাহা গবেষণার সামগ্রী—তাহা লইয়া আমাদের কথা নহে। যুগের প্রতিযোগিতায় আজ এই নীতির প্রয়োজন হইয়াছে। সুতরাং ঘরের হউক, পরের হউক, অর্থসংগ্রহ ও অর্থপ্রতিষ্ঠানচালনার এই যৌথ বিধান আজ দেশে চলিয়াছে ও চলিবেই। স্বাধীন জীবিকাবৃত্তির সহিত সংহতিশক্তির সংযোগে এই বিধানের উৎপত্তি। এই সম্মিলিত অর্থনৈতিক সাধনায় বাঙালীর অগ্রগতি আমরা দেখিতে চাই।

এই অগ্রগতির বাহিরের যে দিক, [illegible] অর্থনৈতিক

বিশেষজ্ঞগণের আলোচ্য বিষয়। আমরা ইহার ভিতরের দিক্ লইয়া দুই একটা কথা কহিব। ধনসৃষ্টির যে মূল শক্তি, তাহার উৎস মানুষের অন্তরেই। তাই অন্তর লইয়া যে সাধনা, তাহার সহিত জাতীয় শিল্প-বাণিজ্যাদি বহুমুখী সাধনা একান্তভাবে বিযুক্ত করিয়া রাখা যায় না। সেখানে গলদ থাকিয়া গেলে, জাতির ধনসৃষ্টির প্রচেষ্টা কতক জয়যুক্ত হইলেও, আমাদের জাতীয় জীবনের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইবে না।

শ্রম চাই। মূলধন চাই। কাঁচা মালও দেশে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়—ভবিষ্যতে আরও বহু বিচিত্র প্রকারের হইতে পারে। ইউরোপ হইতে যন্ত্রপাতির আমদানী আজ যুদ্ধের দরুণ বাধাপ্রাপ্ত হইলেও, আমেরিকা ও জাপানের মুক্ত দ্বার আমাদের পক্ষে এখনও রুদ্ধ হয় নাই। সংগঠনীপ্রতিভা-সম্পন্ন কৃতী ও অভিজ্ঞ পুরুষগণ আজ বাংলার স্থানে স্থানে আবির্ভূত হইয়া অর্থব্রতে ব্রতী হইয়াছেন। আশার ক্ষেত্র আজ আমাদের অনেক হইয়াছে। এই সব আশাক্ষেত্র সিদ্ধ অর্থক্ষেত্রে পরিণত হইলে, জাতির ধনগত দৈন্য ও অপবাদ, দুইই দূর হইবে।

এই কর্ম্মসিদ্ধিই কিন্তু আমাদের মূল লক্ষ্য নহে। যৌথ কারবারে সাফল্য সর্ব্বত্রই পরিচালকবর্গের অধ্যবসায়, সততা ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। অভিজ্ঞতার্জ্জনের ক্ষেত্র ক্রমশঃ বাড়িতেছে। এই সঙ্গে পাঁচ জন, দশ জন বা শত জন মিলিয়া যদি একটা নিখুঁৎ মিলনশক্তি গড়িয়া তুলিতে পারি, তাহা হইবে জাতীয় অভ্যুদয়েরই ব্রহ্মাস্ত্র।

এই মিলন শুধু হৃদয়ের মিলন নয়, প্রাণের ক্ষেত্রেও পরস্পর যুক্তি অনুবাদিত করিয়া তুলিতে হইবে। আমার অর্থ-সাধনা যদি জাতির জন্য, ধর্ম্মের জন্য, পরমার্থের জন্য হয়, তাহাতে অন্য স্বার্থ না থাকে, আর তোমারও আদর্শ ও লক্ষ্য যদি তাহাই হয়, মিলনের অমৃত-রসে আমরা উভয়েই শুধু ধন্য হইব না, ইহা জাতীয় ধনসৃষ্টিরই কেন্দ্র-শক্তি গঠন করিবে। অভিন্ন মত ও অভিন্ন পথের যাত্রীরা এক হৃদয়, প্রাণ ও কর্ম্মশক্তি লইয়াই জাতির মধ্যে অপার্থিব ঋদ্ধি ও ঐশ্বর্য্যের প্রতিষ্ঠা করিবে।

এই মিলন-চক্রের প্রত্যেকেই হইবে স্বাধীন, স্বাবলম্বী, স্বপ্রতিষ্ঠ। কিন্তু অর্জ্জন ও ব্যয়ের তারতম্যে তাহাদের উৎসর্গের তারতম্য ঘটিবে না। ধন-শক্তি ঈশ্বর-শক্তির দ্যোতক বা প্রতীক-রূপেই জাতির দুঃখ-দৈন্য-অভাব মোচন করিবে। ইহা সমষ্টিকে বাঁচাইবে—প্রত্যেকের দেওয়ার অধিকার বাড়াইয়াই তাহাদের চাওয়ায় কলরব প্রতিনিবৃত্ত করিবে। ভারতের অর্থক্ষেত্রে এই সত্য যদি কোথাও স্বীকৃত ও ঘনীভূত হয়, সেখানে ধন ও শ্রমের সমবায়ে মিলনের রাগিণীই নূতন ভাবে, নবীন সুরে ঝঙ্কৃত হইবে।

লও বন্ধু, একান্তের দীন প্রতিদান

শ্রীমতী জ্যোতির্ম্মালা দেবী

গোপন বান্ধব! হে অজ্ঞাত শুভঙ্কর!
হেরি' তব শুভ্র অর্ঘ্য মসৃণ কোমল
আমার হৃদয়পটে কোন্ যাদুকর
শ্রদ্ধার ইঙ্গিতে আঁকে হীরক-কমল।

সান্ধ্য-নভে অস্ত যায় অতীতের শিখা,
আশার সাগর বন্ধু, দুলে দুলে ওঠে—
আকাশের এক প্রান্তে সিত ইন্দুলিখা,
শ্বেতাব্জ আনন কার তারি বৃন্তে ফোটে!

হিয়া মোর পূজারিণী একান্ত ছায়ায়,
মধুপ গুঞ্জর সম শুনি জপ-রব;
অকস্মাৎ ধ্যান ভাঙি', স্মৃতির বীণায়
উৎসারে উদ্দেশে তব প্রীতির বৈভব।
লও বন্ধু, একান্তের দীন প্রতিদান—
উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের ছোট এই গান।

২৫

অরুণের পত্র যথারীতি পাইতেছিলাম। সঙ্ঘের সহিত অখণ্ড সম্বন্ধের মানুষ বলিয়া যাহাদের উপর প্রত্যয় ছিল, আমার অজ্ঞাতে তাহাদের মধ্যে কয়েক জন শ্রীঅরবিন্দের সহিত পত্র-ব্যবহারে চন্দননগরের অনেক দোষত্রুটি দেখাইয়া আমার সহিত শ্রীঅরবিন্দের অন্তর-বন্ধন শিথিল করিয়া দিতেছিল। অরুণের পত্রে এই সকল সংবাদ আমার মনকে পীড়িত করিতেছিল। আমার দুঃখের হেতু এই সকল সহকর্ম্মীদের এইরূপ আচরণের জন্য যত না হউক, শ্রীঅরবিন্দ ইহাদের অভিযোগগুলি কেন আমার কাছে গোপন রাখিতেছেন, ইহাই অধিক পীড়ার কারণ হইতেছিল। শ্রীঅরবিন্দ যে চন্দননগরের বিরুদ্ধ শক্তিকেন্দ্রগুলিকে সংহৃত করিয়া আমার পরিচ্ছন্ন প্রকাশের পথ খুঁজিতেছিলেন এবং এই সকল তুচ্ছ বিষয় লইয়া আমায় যে তিনি বিচলিত করিতে চাহেন নাই, এ কথা সে দিন উপলব্ধিগম্য হয় নাই। অরুণের পত্র খুঁটিয়া খুঁটিয়া এই সকল সংবাদ যতই লইয়া আসিতেছিল, আমি ততই মর্ম্মাহত হইয়া পড়িতেছিলাম। কিন্তু অরুণকে সম্মুখে রাখিয়া শ্রীঅরবিন্দ সেদিন আমায় যে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা কেবল আমার নহে, অনেকের স্মরণযোগ্য। এই হেতু আমি এই সকল কথা কিছু পাঠকদের উপহার দিব।

শ্রীঅরবিন্দ বলিতেন—চন্দননগরে কর্ম্ম ও ভক্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছে, কিন্তু জ্ঞানের অভাব পূর্ণ করিতে হইবে। অরুণের প্রশ্নোত্তরে তিনি সেদিন বলিয়াছিলেন "জ্ঞানের অভাব অর্থে একটা বিশাল ব্যাপক বিশ্বজনীন চৈতন্যে (universal consciousness) আস্থা স্থাপন চাই। মতিলালের ওখানে সম্পূর্ণ মুক্তভাবে (free) না হউক, প্রচুরভাবেই মুক্ত (free) শক্তির খেলা আর খুব ঘনীভূত (intense) ভাবের প্রকাশ আছে। সেই শক্তি আর ভাবের ধারা ধ'রেই উপরে উঠার গতি, ওখানে এইরূপ একটা মুক্ত ও নমনীয় (free and flexible) জ্ঞানের নিজস্ব খেলাও চলেছে। জ্ঞানের স্বভাব-শক্তি (native power of knowledge) হ'লে, বিজ্ঞানের পূর্ণ প্রকাশ সহজ হয়ে উঠবে।" শ্রীমান্ অরুণ ইহার উত্তরে বলিয়াছিল "জ্ঞানের এই অলৌকিক শক্তির অভাব পুস্তকাদি পড়ে' ত হয় না, আমাদের আছে উৎসর্গ এবং সঙ্ঘ-চেতনা, এইখানে আমরা অটল ভিত্তি পেয়েছি।"

অরুণের এই কথা শুনিয়া শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগরের সহিত পণ্ডিচারীর পার্থক্যবোধের হেতুটী দেখাইবার জন্য বলিয়াছিলেন "মতিলাল ছাড়া আর কাহারও মধ্যে বিশ্বজনীন চৈতন্যে বিশিষ্ট আত্মসত্তার প্রতিষ্ঠা দেখতে পাই না (Individual formation in the universal consciousness)।" অরুণ ইহাতে ব্যক্তিবাদের কথা আসিয়া পড়ায়, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করিলে, শ্রীঅরবিন্দ ব্যক্তিবাদের খারাপ দিকটা বাদ দিয়া ভগবানের এক একটা দেবত্বের প্রকাশের কথাই বলিয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের কথার উপর অরুণ সেদিন আর কোন কথা বলে নাই।

শ্রীঅরবিন্দ সেদিন চন্দননগরের অধ্যাত্মসাধনার যে সকল ত্রুটি অবধারণ করিয়াছিলেন, তাহার সবখানি তাঁহার আত্মদর্শনের ফল বলিয়া আমার প্রতীতি হইত না। শ্রীঅরবিন্দ ও আমার মধ্যে সম্বন্ধচ্ছেদের যে ষড়যন্ত্র এখানে প্রত্যক্ষ করিতেছিলাম, তাহার প্রভাব ইহার মধ্যে ছিল বলিয়া অনুভব করিতাম। এই হেতু আমাদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা পরিবর্ত্তন করার প্রচেষ্টা করিতে গিয়া অনেক সময়ে নিজেকে তাঁহার নিকট অকারণ লঘু করিয়া ফেলিতাম। ইহার দুই একটা দৃষ্টান্ত পরে দিব। শ্রীঅরবিন্দের মহার্ঘ উপদেশ কিন্তু সতত স্মরণে থাকিত ও তাহা পালনের জন্য উদ্বুদ্ধ থাকিতাম। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন "তোমরা যে বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠা

করছ, পুস্তকের স্তূপে ছেলেদের না চাপা দেওয়া হয়, এই দিকে দৃষ্টি রেখো। পুস্তক একেবারেই না থাকা দরকার। নানা প্রকার পর্য্যবেক্ষণ ও নানা বিষয়ের কৌতূহল (observation and interest) জাগানই ভাল। শিক্ষাক্ষেত্র যতটা সম্ভব আনন্দ-ক্ষেত্র করে' তুলতে হবে। ছেলেদের স্বতঃপ্রবৃত্ত মৌলিক মনোবৃত্তিবিকাশের মুক্ত প্রবাহ সৃষ্টি করতে হবে (free growth of original faculties)। তারপর, যখন প্রত্যক্ষ সঞ্চালনার ফলে মনোবৃত্তিগুলি স্ফূর্ত্তি পাবে, তখন যার যে দিকে রুচি, তদনুযায়ী পুস্তকনির্ব্বাচন শ্রেয়ঃ। গভর্ণমেণ্টের মত একটা বিশেষ প্যাটার্ণ—যেমন যোগ্য নাগরিক জীবন গড়া—এইরূপ কোন কিছু আমাদের শিক্ষায় থাকবে না। যার কাছে ভগবান যা' চান, তার ভিতর সেইটাই ফুটে' উঠুক। নৈতিক শিক্ষার জন্য বাঁধাধরা বই একেবারেই না থাকা ভাল। সত্যানুরাগ, প্রেম, ঔদার্য্য, শক্তি প্রকৃত-পক্ষে এই কয়টা হৃদয়বৃত্তি জাগাবার আছে। জীবনের আবহাওয়ার মধ্যেই তাহা বিকশিত হবে।" এই সময়ে 'প্রবর্ত্তকের' কথায় তিনি বলেন—"প্রবর্ত্তক যোগের বিশেষ ধারা গ্রহণ করে'ই চলেছে।" 'প্রবর্ত্তক'-পরিচালনায় ইহাতে বিশেষ উৎসাহলাভ করিতাম। কর্ম্ম-পন্থার নির্দ্দেশও তিনি কম দিতেন না—শ্রীমান্ অরুণের পত্র হইতে এই সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত কথঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি বলিয়াছিলেন, "চন্দননগরে যেমন কমিউন (commune) গড়ে' উঠেছে, এই রকম চারিদিকে কমিউন গড়ে' তুলতে হবে। কাজ আমি শুধু নেশনের জন্য করছি না, নেশনকে চাই—কিন্তু সমস্ত নেশনকে spiritual growthএর outfloweringস্বরূপে free communehood দেওয়া সম্ভব হবে না।"

সংহতি-শক্তি প্রবল হলে, সেই সংহতি-শক্তি দিয়ে জাতির জীবনতন্ত্র একেবারে দখল করে' বসতে হবে। অতঃপর জাতিকে স্বাধীনতাদান ও উহাকে যন্ত্রস্বরূপ করে' মানবজাতিকে নূতন সভ্যতা দিতে হবে। গান্ধীর রাষ্ট্রনীতির পিছনে সত্য আছে। কিন্তু যে ভাবে তা' চলেছে, তা' দুর্ব্বোধ্য। ইহার পরিণামে—দমননীতি (repression) অথবা রক্তপাত (violence) ও পরিশেষে অবসাদ অবশ্যম্ভাবী। আদি সিনফিনেরা রাজনীতি একেবারে বাদ দিয়ে কেবল জাতির মনঃ-পরিবর্ত্তনের জন্য আত্মনিয়োগ করেছিল। বর্ত্তমান পৃথিবীতে মানুষের ঘোরতর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। আমাদের দেশের তো কথাই নাই, অন্যান্য দেশেও তাই। মানুষ নাই। কেবল দুই জায়গায় জীবন্ত মানুষ চিন্তা ও সৃষ্টি করছে—আয়র্লণ্ড ও রুশিয়া। ভারতে যাঁরা রাজনীতি-চর্চ্চা করেন, তাঁদের কাজ যেন অনেকখানি ছেলেমানুষী; কিছু ফল যে না হয় তা' নয়, কিন্তু কি রকম মেজাজে যে চলেছে, সবই দুর্ব্বোধ্য। গান্ধী একটা মানুষ, আর যেন সব মালগাড়ী। তাদের তিনি টেনে নিয়ে চলেছেন। সি, আর, দাশ আধা মানুষ………।" তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন—"But politics should be put last, rather than first." অর্থাৎ রাজনীতি চাই সর্ব্বশেষে।

শ্রীঅরবিন্দের এই সকল চিন্তাধারা সেদিন আমাদের সম্মুখে নূতন আলোকপাত করিত। সঙ্ঘের মাতৃহৃদয়ের নীরব প্রভাবও এই সময় হইতেই এখানে কিরূপ কার্য্যকরী হইয়াছিল, তাহা অরুণের পত্রের শেষাংশ হইতে বুঝা যায়। অরুণ লিখিল "কাকীমার স্নেহভরা বুকখানি থেকে এক একটা ঢেউ এসে এখানে সত্যসত্যই আমার ছোট বুকখানিতে ঠেলিয়া ঠেলিয়া উথলিয়া উঠে।" আমি সেদিন আমার অজ্ঞাতে এই মৌনমূর্ত্তি মহীয়সী নারীর অন্তরবীণার মীড়ে মীড়ে সঙ্ঘ-রচনার এমন সুমধুর সঙ্গীতের অনাহত রাগিণী ঝঙ্কৃত হইতেছে, তাহা আমলেই আনিতাম না।

এই সময়ে চন্দননগরে ছিলাম বটে, কিন্তু সমস্ত প্রাণটা পড়িয়া ছিল পণ্ডিচারীতে। প্রতিদিন অরুণের পত্রের প্রতীক্ষা করিতাম; কেননা এই পত্রের মধ্য দিয়াই শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাস্রোতঃ কোন্ মুখে বুঝিয়া তদনুযায়ী চলার সুযোগ পাইতাম। শ্রীঅরবিন্দ ১৯২১ সালের মার্চ্চ মাসে বাংলায় প্রত্যাবর্ত্তনের কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে বাংলায় তাঁর পুনরাগমন-সংবাদ প্রকাশও করিয়াছিলাম। তাঁর এই পুনরাগমন-ব্যাপার তাঁহার বহির্গমনে সহায়তার মত আমারই উপর নির্ভর করে, এই ধারণা আমার বদ্ধমূল ছিল। শ্রীঅরবিন্দ

আমার এই গৌরব ভাবে ও ভাষায় তখনও পর্য্যন্ত অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন। তাহার জন্য একশ্রেণীর নিকট বন্ধুদের কাছে সপ্রেম ঈর্ষ্যার আস্বাদ অনুভব করিতাম। অরুণকে তিনি এই সময়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "তোমরা আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? চন্দননগরে না কলিকাতায়?" উপেনদাদা ছিলেন ব্যঙ্গ-কৌতুকের রাজা, তিনি নাকি কলিকাতার নাম শুনিয়া উচ্চ প্রশংসাত্মক খেউর গাহিয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ খুব হাসিতে হাসিতে উপেনদার কলিকাতা-বর্ণনা উপভোগ করিয়াছিলেন। উপেনদা চন্দননগরের কর্ম্মপদ্ধতি, দায়িত্ববণ্টন (delegation of responsibilities), লোকনির্ব্বাচন প্রভৃতি প্রসঙ্গ লইয়া চন্দননগরের খুব সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ এই সব জানিয়া অত্যন্ত আনন্দবোধ করিতেন। তিনি চন্দননগরে প্রত্যাবর্ত্তনের কথা তুলিয়া বলিতেন "মতিলালের সেই বাড়ীটার চেহারা আমার বেশ মনে আছে এবং ফ্রেঞ্চ-টেরিটরী বলিয়া সুবিধাও অনেক আছে।" এই সকল আলাপের কথা যত আমার নিকট পৌছিত, ততই উৎসাহিত হইয়া আমি শ্রীঅরবিন্দের ভবিষ্য জীবনের স্বপ্নচিত্রকে আঁকিয়া যে তৃপ্তি পাইতাম, তাহা বলিবার ভাষা খুঁজিয়া পাই না। আমি ১৯২২ খৃষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দের বাংলায় প্রত্যাবর্ত্তন বিষয়ে এমনই নিসংশয় হইয়াছিলাম যে, তাঁহার জন্য চন্দননগর আশ্রমে স্থাননির্দ্দেশ ও তাঁর আবাসভবনের জন্য অর্থসঞ্চয়েও উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলাম।

অন্তর-প্রেরণা কার্য্যে পরিণত করার জন্য যেমন আমায় উন্মাদ করিত, শ্রীঅরবিন্দের এক একটা বাণী সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আমি ততোধিক ব্যস্ত হইয়া পড়িতাম। অনেক অন্তরপ্রেরণা হয় তো অন্তরেই লয় পাইয়াছে; কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের বাণী কোনমতে ব্যর্থ হইতে দিই নাই। এই দৃঢ় ধারণা কর্ম্ম-দৃষ্টান্তে হৃদয়ে এমন শিকড় গাড়িয়াছে, যাহা আর উপাড়িয়া ফেলা সহজ নহে। আমার তাৎকালীন অবস্থা দেখিয়া সঙ্ঘ-জননী বহুবার বলিতেন "কোন বিষয়ে সবখানি ভাবনা-চিন্তা না করিয়াই তুমি যেরূপ বাড়াবাড়ি কর, তাহাতে মনে হয় তোমার অনেক শ্রম এবং শক্তি বৃথা হইয়া যায়। সব কাজই স্থির হইয়া যদি কর, অনেক বড় কাজ হইতে পারে।"

কথাগুলি চিরদিনই সত্য ও সকলের পক্ষে প্রণিধানযোগ্য; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আমার আয়-ব্যয়ের খতিয়ান দেখার সুযোগ হইল না। আজিও শক্তি ও সময়ের অপচয়-নিবারণকল্পে বহু সুহৃদের হিতবাণীতে অনেক সময়ে কর্ণপাত করিতে পারি না। কিন্তু বুঝিতে পারি, কর্ম্মের তুলনায় শক্তি ও সময়ের অনেক ব্যয় হইয়া যায়—সত্যই ইহা অপচয় ভিন্ন অন্য কিছু নহে। কিন্তু একটা পতিত জাতির মধ্যে মানুষের মত দাঁড়াইয়া থাকার জন্যও যে কত অধিক শক্তিব্যয়ের প্রয়োজন, তাহা আমি বুঝিয়াছি; আর এই ক্ষয় ও অপচয়ের হিসাব রাখিয়া কর্ম্ম করিলে হয় তো যে কোন কর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইতে পারে, কিন্তু কর্ম্ম-সৃষ্টির জন্য শক্তির অপচয়ে যে করুণ অভিজ্ঞতা অর্জ্জিত হয়, তাহার মূল্যও কম নহে। এই অবস্থায় অফুরন্ত শক্তির পরিচয় মিলে। প্রকৃতির এই দানের মূল্য নির্দ্ধারণ করা যায় না; তবে একথা বুঝাইবার নহে। শ্রীঅরবিন্দের আশ্রয়ে তাঁহার আদেশকে পুরোভাগে রাখিয়া কত যে দুঃসাধ্য ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তাহা আজ বলিবার নহে। কেবল তাঁহার সহিত পত্র-ব্যবহারের সঙ্গোপন-নীতি-রক্ষার জন্যও যে উৎকণ্ঠা, ঘড়ির কাঁটার দিকে চাহিয়াই যে সময়-ক্ষয় হইয়াছে, তাহার মূল্য আমার নিকট অল্প নহে। শ্রীঅরবিন্দের অভাবপূরণের জন্য সামান্য অর্থসংগ্রহেও শক্তি ও সময়ের অপচয় যতটা হইয়াছে, তদনুযায়ী ফল মিলে নাই। কিন্তু এই ক্ষয় ও অপচয় শক্তির অবাধ উৎসকেই আবিষ্কার করিয়াছে। এইজন্যই কর্ম্ম আমার চক্ষে আজও বড় বলিয়া বোধ হয় না, কাজের পিছনে অন্তরানুভূতিই আয়ুঃ ও আনন্দের হেতু হয়। কর্ম্ম যতই ক্ষুদ্র হউক—শক্তির আত্মপ্রকাশ ইহার মধ্যেই সিদ্ধ হয়। এই শক্তি শরীরিণী নহে, আমি অশরীরিণী শক্তির কথাই বলিতেছি। এই হেতু ক্ষয় ও অপচয়ের হিসাব আমার চিত্তে ব্যর্থতার রেখাপাত করে না।

ক্লান্তি আসিত শরীরের, শক্তির নয়; কিন্তু তাহাও সেবার দাবী লইয়া উপস্থিত হইত। সেবার অর্ঘ্য হাতে তখনই সাক্ষাৎকার পাইতাম গৃহলক্ষ্মীর—হৃদয় আবার ভরিয়া উঠিত স্বস্তি ও তৃপ্তিতে; আবার [illegible]তাম কর্ম্মলক্ষ্যে শক্তির দ্যোতনায়। নিষেধ মানিতাম [illegible]রও. কিন্তু

এই অবাধ্যকে তাহার জন্য কেহ তিরস্কার করে নাই, উপেক্ষা করে নাই। বরং সহানুভূতির অনুলেপে হৃদয় আমার সকলে অভিষিক্ত করিয়াছে। এইখানেই পরস্পরের পরিচয় ঘনিমাময় হইয়া দূরকে অতি নিকটে আনিয়া দিত, গৃহদেবীকেও এইখানে পাইতাম অতি সন্নিকটে। কর্ম্মক্ষেত্রেও আমি থাকিতাম তাঁর চক্ষে চক্ষে—কর্ম্মে তৃপ্তি, শক্তি-মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ হইত বলিয়া।

ঈশ্বরপ্রসাদ শক্তির বিগ্রহ ধরিয়া প্রতি প্রভাতে শয্যাত্যাগের সঙ্গে আমায় অভিষিক্ত করিত—নব নব প্রেরণায় সেবার উপকরণ ছিল উপলক্ষ্য। সেই যে মুখ-প্রক্ষালনের জলপাত্রটী ধরিয়া নতমুখে দেবী আসিয়া দাঁড়াইতেন, তাঁর বদনে যে শুভ্রশ্রী, নয়নে যে দীপ্তি, তাহা আমার চক্ষে চিন্ময়ী মহাদেবীর অনুবাদ বলিয়া মনে হইত। প্রাতরাশের নৈবেদ্য সাজাইয়া যখন তিনি আমার নিকট চারু হস্ত প্রসারিত করিয়া দাঁড়াইতেন, মধ্যাহ্নে অন্নথালি সাজাইয়া, অঞ্চল দোলাইয়া, স্নেহ-প্রেম-সঞ্চালিত ব্যজননিরত করপল্লব দুটী—এই অনন্ত পথযাত্রীর প্রয়োজনের চেয়ে প্রতিদানের মাত্রাই অধিক মনে হইত। পরিচ্ছন্ন শয্যাধার ধুলিচিহ্নশূন্য দেখিয়া পবিত্রতার দেবীই স্মৃতিপটে বিকশিত হইতেন। সুনিদ্রার প্রতীক্ষায় শিয়রে বসিয়া তিনি যখন মাথার চুলগুলি লইয়া কোমল কর-সঞ্চালন করিতেন, তাঁর স্নেহশীতল অবদান শ্বাসে-প্রশ্বাসে, হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনে, প্রতি নিমিষে আমায় শক্তির অজস্র বর্ষণ-সিক্ত করিত—আমি জীবনের ক্ষয়-অপচয়ের হিসাব হারাইতাম—সীমাহারা শক্তিই আমার আশ্রয়, এই অনুভূতি দৃঢ়তর হইত। আমি তাই জীবনে হিসাবের অঙ্ক কষিয়া যাত্রা সুরু করি নাই; শ্রম ও সময়ের মূল্যনিরূপণে আমি পূর্ত্তি পাই না। সেই যে প্রথম যৌবনে প্রার্থনার কণ্ঠ ফুকারিয়া উঠিত স্বতঃই "মা, জ্ঞান, শক্তি, প্রেম দে"—জ্ঞানঘনমূর্ত্তি কত দূরে, কত উর্দ্ধে ছিল, তাহার সন্ধান রাখিতাম না, শক্তি ও প্রেমের হিন্দোলে জীবনে দুলিয়া উঠিয়াছিল। জ্ঞান আসিয়া এইখানেই ধরা দিবে—এ বাণী শুনিতাম, সে ঋক্‌ও ব্যর্থ হয় নাই আমার কাছে। ভাবের কথায় বহু দূর [illegible]াসিব না, সেদিনের জীবনপ্রসঙ্গই বলিব। আমার [illegible] আরম্ভ হইয়াছিল মহাশূন্য হইতে। নিরতিশয় রিক্তও শক্তিপূর্ণ হয়, এই দৃষ্টান্তই আমার জীবন, ইহা বলিতে অত্যুক্তি হয় না। কি অর্থ, কি আভিজাত্য, কি বিদ্যা, কি অধ্যাত্মজ্ঞান, সব হইতে বঞ্চিত সর্ব্বহারাকে শক্তিই পূর্ণ করিতেছিল। দু'নয়নের মধ্যবিন্দু ললাটে যোগ-শক্তির তরঙ্গহিল্লোল যেমন উচ্ছ্বসিত হইত, অন্তরেও তেমনই উজানে বহিত প্রেমের তুফান—পর ও আপন বলিয়া বিচার ছিল না। কত আঘাত আসিয়াছে, কত ক্ষয় হইয়াছে অন্তর-বাহির উভয় সম্পদের—প্রাণের বিদ্যুৎ তাহাতে শুদ্ধ হয় নাই। যেখানে বড় আশা, সেইখানেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিরাশ হইয়াছি। সহকর্ম্মীর সংখ্যা অঙ্গুলীগণনায় শেষ হইত না, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে বার বার একা হইয়া পড়িয়াছি—দরদী, মরমী কয় জন মিলে? কিন্তু তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করার জন্যই ছিল নানা কর্ম্মসৃজনের ছলনা। একাই ছুটাছুটি করিতাম একবার প্রেসে, পুনরায় বুক-পাব্লিশিংএ, তারপর তাঁতশালায়, ইটখোলায় আবার কাঠের কারখানায়। প্রয়োজন ছিল না এত কিছুর; কিন্তু শক্তি নিজের পদচিহ্ন এইভাবেই আঁকিয়া চলিতেছিল। ইহারই ফাঁকে আবার "প্রবর্ত্তকের" ৬৪ পৃষ্ঠায় কালী ছড়াইয়া, "নবসঙ্ঘের"ও বুকে আঁচড় কাটিতে অকাতর ছিলাম। ইহার উপর ঘাড়ে চাপিয়াছিল "ষ্ট্যাণ্ডার্ড-বেয়ারার"। তাই শ্রীঅরবিন্দ দরদের সহিত বলিতেন "মতিলাল শ্রম দেয় উন্মত্ত ষাঁড়ের মত।" সেদিন শ্রমজল মুছাইবার মূর্ত্তিমতী মমতাময়ী সঙ্গিনী ছিলেন, আর ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। আর আজ সেদিনের সহিত এই প্রচণ্ড কর্ম্মের তুলনা হয় না, আজিকার এই বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে দেহ-মন-প্রাণ-বুদ্ধির অক্লান্ত শ্রমের প্রতিদান দিতে কোথায় সে প্রেমময়ীর নারীবিগ্রহ! কোথায় শ্রীঅরবিন্দ! সেই বরণীয়া শক্তির রূপান্তর লক্ষ্যে রাখিয়াই যেমন চলিয়াছি নিঃসঙ্গ, নিরালম্ব—তেমনই কি শ্রীঅরবিন্দও আমার নিকট অমূর্ত্ত রূপ ধরিয়া আজ আমার পৃষ্ঠে রক্ষা করিতেছেন! শক্তির এই অপ্রাকৃত লীলামাহাত্ম্য বুঝাইব কাহাকে?

সেদিন শক্তি ও প্রেম ছিল আমার কর্ম্ম-সৃজনের সর্ব্ব-প্রধান উপকরণ। আর জ্ঞানঘন-মূর্ত্তি ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। শ্রীঅরবিন্দের বাণী ছিল আমার বেদ-গ্রন্থ। সে যুগের বাণী

বলিয়া এ যুগেও তাহা আমার নিকট নাকচ হয় নাই; বরং ভারতের শাস্ত্রগ্রন্থাশ্রয়ে সে বাণীর মূল্য সমধিক প্রতীত হইয়াছে। এ যুগের মানুষের কাছে সে যুগের অরবিন্দের কিছু পরিচয় দেওয়ার লোভসম্বরণ করা তাই সম্ভব হইল না। অধ্যাত্মযোগী শ্রীঅরবিন্দের মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ ভারতের সাধনরাজ্যে নবালোক প্রদান করিবে। তিনি মনের নানা স্তর দেখাইয়া অবশেষে যে পর্য্যায়ের কথা বলিতেন, ভারতের ভাষায় তাহাই বিজ্ঞান (Supermind)। সেইখানে, সেই অধ্যাত্মরাজ্যে দেবরূপ গঠন করার কথা তিনি পুনঃ পুনঃ বলিতেন। বেদের সত্যে জাতির চিত্ত যাহাতে উদ্ভাসিত হয়, সেই নির্দ্দেশ তিনি দিতেন। তিনি দৃষ্টান্তচ্ছলেই বলিতেন—"বৈদিক ঋষি যেমন নিজ চিৎলোকে দেবতার জন্মদান করিতেন, এইটাই হইবে আমাদের গূঢ়তর কাজ—চেতনায় দেবসৃষ্টি। সাধারণতঃ আমরা যে অবস্থায় থাকি, সেটা অজ্ঞান মন (mind of ignorance)— ইহা প্রাণক্ষেত্র ফুঁড়িয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। এখানে আমরা কিছুই জানি না। জানিবার ক্ষীণ চেষ্টাপরম্পরা মাত্র এই ক্ষেত্রে সম্ভবপর হয়। আছে আর এক মন—শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় (mind of self-forgetful knowledge)—যেখানে সত্য ও জ্ঞান পাওয়া যায় আভাসে, আভাসে। যেন হারাণ নিধি, ভোলা জিনিষ সব বাহিরের আঘাতে অথবা ভিতরের উদ্দীপনায় পর্দ্দায় পর্দ্দায় জাগিয়া উঠিতেছে—স্মরণপথে আসিয়া ধরা দিতেছে। প্লেটোর থিওরি ছিল—সব জ্ঞানই বিস্মৃত বিষয়ের স্মৃতি (all knowledge is but a remembrance of forgotten things)। সাধকের প্রথম পরিচয় এই আত্মবিস্মৃত মনের সঙ্গে। বিবেকানন্দের ছিল সুপরিপুষ্ট প্রেরণাসিদ্ধ মন (highly developed intiuitive mind)। এই মনেরই উচ্চ পর্দ্দায় দাঁড়াইয়া তিনি ধাক্কা মারিয়াছেন তার উপরের স্তরে জ্ঞানঘন মনে—যাহা ঠাকুর রামকৃষ্ণের ছিল। এখানে জ্ঞানের জ্যোতিঃ-পুঞ্জের মধ্যে বাস—ইহাই দীপ্ত জ্ঞানরাজ্য। ইহার উর্দ্ধে উপস্থিত হইলে, ঠাকুর আর কথা বলিতে পারিতেন না—বলিতেন, "আর বলা যায় না।" মা সে যুগে ঐখানেই তাঁহাকে রাখিয়াছিলেন।"

আমার মনে হইত—শ্রীঅরবিন্দ চাহিতেছিলেন ঠাকুর যেখানে উপনীত হইলে আর কথা বলিতে পারিতেন না, জ্যোতিঃপুঞ্জে ডুবিয়া যাইতেন, সেই বিজ্ঞানঘন চেতনায় আরোহণ করিয়া দিব্যজীবনের সন্ধান। তিনি বলিতেন—এই উপরে উঠার একটা কৌশল আছে (art of opening up); সেই বিজ্ঞানের দুয়ার খোলার যে নিগূঢ় কৌশলপ্রয়োগ, এইটাই সব চেয়ে শক্ত কাজ। ইহা ধরিতে পারিলে আর সব তর্-তর্ করিয়া ফুটিয়া উঠে। অধ্যাত্ম-রাজ্যের রুদ্ধ দুয়ার খোলার তিনি প্রথম সন্ধান পাইয়াছিলেন মহারাষ্ট্রীয় সাধক লেলের কাছে, একথা তিনি আমাদের কাছে স্বীকার করিতেন। তবে তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলিতেন—এই উর্দ্ধের বিজ্ঞানময় চেতনার আবিষ্কারে তাঁর নিজের প্রবল ইচ্ছাই অধিক দায়ী।

তিনি অপ্রাকৃত দর্শনের অভিজ্ঞতার কথাও আমাদের শুনাইতেন। আমাদের মধ্যে অনেকেই ইহা বুজরুকী বলিয়া উড়াইয়া দিত। কিন্তু এ বিষয়ে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। এই ক্ষেত্রে সত্য-মিথ্যা-নির্দ্ধারণ সহজ ব্যাপার নহে। শ্রীঅরবিন্দ এই বিষয়ে বিশেষ ভাবে আমায় সাহায্য করিতেন; তাঁহার সমর্থনও আমি পাইতাম। শ্রীমান্ অরুণচন্দ্র আমার এইরূপ অধ্যাত্ম-দর্শনের কথা শ্রীঅরবিন্দের নিকট উত্থাপন করিয়াছিল; তিনি বলিয়াছিলেন "প্রথম প্রথম অনেক ভুলভ্রান্তি আসিতে পারে, কিন্তু ধীরে ধীরে এই দর্শন পরিশুদ্ধ হইয়া পর-মনেরই সন্ধান দেয়। মতিলাল মাথার উপরে কিছু গড়ার সন্ধান পাইয়াছে। সেইখানেই সকল জ্ঞান, চিন্তা, ইন্দ্রিয় কার্য্য করে; কিন্তু এইখানে চৈতন্যকে তুলিয়া রাখিলেই চলিবে না, কেননা এই উপরে উঠিয়া যতক্ষণ থাকা যায়, ততক্ষণই সব থাকে, প্রাচীনেরা এইজন্য সমাধির উপর জোর দিতেন, কিন্তু ঐ উর্দ্ধের অধ্যাত্মশক্তি প্রথমে মানসক্ষেত্রে (psychic plane)এ ধীরে ধীরে নামাইয়া আনিতে হয়, সেখানে নূতন যন্ত্র ও সূক্ষ্মতর ইন্দ্রিয়াবলীর সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় ভিতরের ইন্দ্রিয়গুলি বাহিরের সাহায্য না লইয়াও দর্শন, স্পর্শনাদি করে।" তিনি এই সময়ে মীরা দেবীর সাধনার কথাও বলিতেন। মীরা দেবী নাকি এই গঠিত নবসত্তার [illegible] সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়-

গুলি দিয়া দেখা-শুনা, যাবতীয় কর্ম্মাদি নির্ব্বাহ করেন, বাহিরের চোখ দিয়া প্রায় দেখেনই না।

যোগশাস্ত্রে প্রাকাম্য-সিদ্ধির কথা আছে। শ্রীঅরবিন্দ বলিতেন, "ইহা ততক্ষণ, পূর্ণাঙ্গ হয় না, যতক্ষণ না এই সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গুলি বহিরিন্দ্রিয়গুলির সহিত যুক্ত হইয়া কার্য্য করে।" শ্রীঅরবিন্দ নিজের উপলব্ধির কথাও ব্যক্ত করিতেন। তিনি বলিতেন—তিনি একটা অখণ্ড সত্তার মধ্যে বাস করেন। আত্মস্বাতন্ত্র্য একেবারেই খুঁজিয়া পান না। তিনি শরীরের রূপান্তরের কথাও বলিতেন। আকৃতি-পরিবর্ত্তনের কথা বলিতেন না, তবে দেহযন্ত্রগুলির পরিবর্ত্তন হইবে, শরীর অমৃতময় হইবে ; জরা, ব্যাধি থাকিবে না—এইরূপ উপদেশ তাঁহার মুখে সর্ব্বদাই প্রকাশ পাইত।

ক্রমশ

প্রীতি-আশীর্ব্বাদ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

কাব্যের অমৃতরসে চিত্ত যার প্রমত্ত মস্‌গুল,
মালঞ্চে যাহার নিত্য ফুটে গুল, ডাকে বুলবুল,—
সেই নজরুল-কবি—তা'রি এই জনম-তিথিতে
কোন্ প্রশস্তির বাণী কে-বা তারে যাবে শুনাইতে ?
যে জন সুরের রাজা—কি সুর লাগিবে তার কাণে!
অবেলায় বাষ্পে রুদ্ধকণ্ঠ যা'র—সেকি তাহা জানে ?
তবু সুধু এক কথা রহি' রহি' পড়ে আজি মনে,—
যে আর্ত্ত জননী তা'র অরুন্তুদ বেদনা-বন্ধনে
কাঁদে নিত্য নিরুপায়, যার লাগি' বিদ্রোহী সে হিয়া
নিজ্জিত নিষ্পিষ্ট কণ্ঠে নিরন্তর মরে গুমরিয়া,—
তাহারে সে ভুলিবে না—এ জীবনে কিম্বা পরপারে,
ঝঙ্কার-টঙ্কার হ'তে সে কথা সে ফুটাবে ওঙ্কারে !
যে শ্যামা অভয়া তার দিব্য নেত্রে দেখায় অভয়,
মুক্তিমন্ত্র জপ করি' তারই বরে লভিবে সে জয়।

পশ্চিমের ক্ষুব্ধ নাগ আজি যবে দিগ্বিদিক্ ভুলি'
পূর্ব্ব সুড়ঙ্গের পথে পশে তার গুপ্ত ফণা তুলি'
দংশিতে দুর্ব্বল দলে—পরস্পর খণ্ডিত কলহে,
এস কবি, তোমার সে মন্ত্র-ভরা বর-বংশী লয়ে
দণ্ডিতে ভুজঙ্গধর্ম্মে—হীন স্বার্থে সমুদ্ধত শির ;
অন্ধ মোহে, আত্মদ্রোহে আজি যারা উন্মত্ত অধীর,
ভুলাও তাদের বন্ধু, মিলনের মহোদাত্ত স্বরে,—
রচি' নব-শান্তিপর্ব্ব কলহের কুরুক্ষেত্র 'পরে।

নিম্নে যত ভেদ-গণ্ডী, ঊর্দ্ধে হানে অখণ্ড আকাশ,
শিল্পীরে বাঁধে না ধর্ম্ম, গুণীরে স্পর্শে না জাতি-পাশ ;
বাণীর বেদনাদীপ্ত প্রতিভার নাহি আত্মপর,
সেই সুরে ভরি' তোল বংশী তব সহজ-সুন্দর।

বিদায়ের পূর্ব্বে আজি বড় সাধ, এ লুব্ধ শ্রবণে
শুনে' যাব তোমারই জয়ের শঙ্খ সে মহামিলনে।

নজরুল ইসলামের জন্মতিথি বাসরে সভাপতি কর্ত্তৃক পঠিত]

আদায়ের ইতিহাস

শ্রীমানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

দুই

মনীশের বোনের নাম কুন্তলা। বিবাহ-দেওয়া-দরকারের বয়স হইয়াছে—দু'এক বছর বেশীই হইয়াছে। এই বয়সে সময় হিসাবে দু'এক বছর যে কত দীর্ঘ আর অ-তুচ্ছ কে তা না জানে? দাদা যে ত্রিষ্টুপকে বাড়ীতে ডাকিয়া আনিয়াছে কেন সেটুকু বুঝিবার মত আর বুঝিয়া যে জোরালো লজ্জা সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট করিয়া দিতে চায়, সেটা জোর করিয়া লুকাইয়া রাখার চেষ্টা করার মত জ্ঞান-বুদ্ধি অভিজ্ঞতা কুন্তলার জন্মিয়াছে।

প্রথমটা তাই ত্রিষ্টুপের মনে হইয়াছিল, মেয়েটা বুঝি একটু পাকা। তারপর দু'চার দিনেই এ ভুলধারণা তার ঘুচিয়া গিয়াছে কুন্তলার চালচলন কথাবার্ত্তায় যেটুকু অস্বাভাবিকতা ধরা পড়িয়াছিল, এখনও কিছু কিছু ধরা পড়ে, সাধারণ গৃহস্থ সংসারের এই বয়সের দেয়াল-চাপা ভীরু মেয়ের পক্ষে ওটুকু অস্বাভাবিকতাই স্বাভাবিক। তৃতীয়বার কুন্তলা যখন খাবারের থালা হাতে সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তখন ত্রিষ্টুপের খেয়াল হইয়াছিল যে বেচারী জানে, তাকে পছন্দ করাইতে পারিলে সে তাকে বিবাহ করিলেও করিতে পারে! পঞ্চম বার মনীশের বাড়ীতে গেলে কুন্তলা যখন চলনসই কাঁপা গলায় রবিবাবুর একটি গান শুনাইয়াছিল তখন ত্রিষ্টুপের আরেকটা বিষয় খেয়াল হইয়াছিল: তার মন ভুলানোর চেষ্টার মত কিছু পাছে বলিয়া বা করিয়া বসে এই ভয়ে কুন্তলা বড়ই কাবু হইয়া আছে।

ত্রিষ্টুপ মমতা বোধ করে। ভাবে যে মনীশের বাড়ীতে আর আসিবে না। এ ভাবে মেয়েটাকে পীড়ন করা, তার মনে মিথ্যা আশা জাগিবার সুযোগ দেওয়া উচিত নয়। কেবল কুন্তলা নয়, মনীশও তো অনেক কিছু আশা করিতেছে। তাকেও এ আশা পোষণ করিয়া চলিতে দেওয়া অন্যায় হইবে বৈকি।

আগে হইতে যদি মনীশের বাড়ীতে তার যাতায়াত থাকিত, তবে কোন কথা ছিল না। চাকরী হওয়ার পর তার কাছে বোনকে গছানোর ইচ্ছা মনীশের জাগিয়াছে টের পাইয়াও ওদের বাড়ী যাওয়া আসা বজায় রাখা দোষের হইত না। কিন্তু চাকরী আরম্ভ করার দিন তাকে বাড়ীতে ডাকিয়া নিয়া গিয়া কুন্তলার সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিবার উদ্দেশ্য মনীশ অস্পষ্ট রাখে নাই। জানিয়া শুনিয়া এখন ঘন ঘন মনীশের ও-বাড়ী যাওয়া চলে না।

কিন্তু দু'দিন যাওয়া বন্ধ রাখিয়াই ত্রিষ্টুপ বুঝিতে পারিল, কাজটা সহজ নয়। সন্ধ্যার পর মনীশের ছোট ভাই ক্ষিতীশ ডাকিতে আসিল। কুন্তলা নয়, মনীশের মা পিঠা তৈরী করিয়াছেন, এখনও ত্রিষ্টুপ যায় নাই কেন? অবিলম্বে ক্ষিতীশের সঙ্গেই সে যেন গিয়া হাজির হয়।

'ছোড়দি হাঁ করে বসে আছে, চলুন শীগগির।'

ত্রিষ্টুপের মুখ গম্ভীর হইয়া গেল।

—'ক্ষিতু, তোমাকে কে বলল ছোড়দি হাঁ করে বসে আছে?'

ক্ষিতীশ একটু ভড়কাইয়া গেল, বড় বড় চোখ মেলিয়া ত্রিষ্টুপের মুখের দিকে চাহিয়া সে বলিল, 'আমি দেখে এলাম যে!'

'ও, তুমি দেখে এসেছ। দাদা বলতে বলে নি, না?'

ক্ষিতীশ সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিল, 'দাদা আপনাকে ধরে নিয়ে যেতে বলেছে

'কেন?'

ক্ষিতীশের মুখে এবার একটু হাসি দেখা দিল। বড়রা কি বোকার মত কথা বলে!

'পিঠে খাবার জন্য। ছোড়দি কি বলে জানেন? আপনি শুধু পিঠে খেতে পারেন, আর আমি পারি। দু'টো তিনটের বেশী খেলেই দাদার অসুখ করে।'

এতক্ষণে ত্রিষ্টুপের গাম্ভীর্য্য কাটিয়া গেল। মনে মনে সে রীতিমত লজ্জাই বোধ করিতে লাগিল। পছন্দ হইলে কুন্তলাকে সে বিবাহ করিতে পারে ভাবিয়া বোনের সঙ্গে তার মেলামেশার ব্যব[illegible]রিয়া দিলেও

তাকে গাঁথিবার জন্য চালবাজী আরম্ভ করিয়া ব্যাপারটাকে কুৎসিৎ করিয়া তুলিবার মানুষ মনীশ নয়। তার নিজের মনটাই বিগড়াইয়া গিয়াছে।

তাকে পিঠা খাওয়ানোর জন্য কুন্তলা তার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে, হয়তো পরণের ছেঁড়া ময়লা শাড়ীখানি বদলাইয়া একখানা ফর্সা শাড়ী পরিয়াছে—সস্তা সাধারণ শাড়ী, পাছে সে মনে করে যে তার জন্য ঘটা করিয়া সাজ করিয়াছে। একবার ত্রিষ্টুপের মনে হইল, পিঠা খাওয়ার নিমন্ত্রণটা রাখিয়া আসে। একেবারে যাওয়া বন্ধ না করিয়া ধীরে ধীরে যাওয়াটা কমাইয়া আনাই কি ভাল নয়? দু'দিন যায় নাই, আজ যখন ক্ষিতীশ ডাকিতে আসিয়াছে, আজ একবার গেলে কি আসিয়া যাইবে? আবার চার পাঁচদিন একেবারে না গেলেই চলিবে। তারপর ত্রিষ্টুপ ভাবিল, না, আজ না যাওয়াই ভাল। যাওয়ার ইচ্ছাটা তার নিজেরই আজ বড় বেশী জোরালো হইয়া উঠিয়াছে, যাওয়ামাত্র সকলে তার আগ্রহ টের পাইয়া যাইবে। কাল পরশু বরং একবার দশ মিনিটের জন্য গিয়া দেখা করিয়া আসিবে, কতকটা ভদ্রতা রক্ষার দেখা করার মত, আজ নয়।

'আমার শরীর তো আজ ভাল নেই ক্ষিতু? কি করে যাব?'

'অসুখ করেছে?'

'হ্যাঁ, অসুখ করেছে।'

ক্ষিতীশ ক্ষুণ্ণ হইয়া চলিয়া গেলে ত্রিষ্টুপ একটু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। মিথ্যা অজুহাতে ক্ষিতীশকে ফিরাইয়া দিবার জন্য নয়, যায় নাই বলিয়া কুন্তলা ক্ষুণ্ণ হইবে ভাবিয়াও নয়, মনীশের বাড়ীর আকর্ষণ অনুভব করিয়া। এত অল্প সময়ের মধ্যেই কুন্তলা যদি তার মনকে টানিতে আরম্ভ করিয়া দিয়া থাকে, নিজের সম্বন্ধে তবে আর আশা ভরসা করিবার কিছুই নাই।

আধঘণ্টা পরে মনীশ আসিল।

'কি হয়েছে তিষ্টু?'

'এমনি শরীরটা একটু—'

'বিশেষ কিছু নয় তো? তবে এসো—দু'টো একটা পিঠে তোমায় [illegible] হবে ভাই। কাল থেকে আয়োজন করে পিঠে তৈরী হয়েছে, তুমি চেখে দেখে সার্টিফিকেট না দিলে কেউ খুসী হবে না।'

সুতরাং ত্রিষ্টুপ গেল। আগের দিন সহরের অন্য প্রান্ত হইতে স্বামী ও দুটি মেয়েকে নিয়া কুন্তলার দিদি বাপের বাড়ী বেড়াইতে আসিয়াছে। পিঠার আয়োজনটা হইয়াছে ওদের জন্যই, ত্রিষ্টুপের জন্য নয়।

কুন্তলার দিদি রমলাকে দেখিয়া ত্রিষ্টুপ আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কুন্তলার চেয়ে সে বয়সে চার পাঁচ বছরের বড়, সাত বছর আগে তার বিবাহ হইয়াছে এবং মেয়ে হইয়াছে দু'টি, তবু প্রথমবার তার দিকে তাকাইয়া ত্রিষ্টুপের মনে হইয়াছিল, কুন্তলাই বুঝি শাড়ী গয়না পরিয়া সিঁথিতে সিঁদুর দিয়া বৌ সাজিয়াছে। যমজ না হইয়াও যে দুটি বোনের চেহারায় এত মিল থাকিতে পারে, ত্রিষ্টুপ কোনদিন কল্পনাও করিতে পারে নাই।

কেবল বাহিরের নয়, দু'জনের ভিতরের মিলটাও যে বিস্ময়কর, প্রথমে ত্রিষ্টুপের কাছে তা ধরা পড়ে নাই। কুন্তলা ভীরু লাজুক নম্র; রমলা হাসিখুসী, মিশুক, কথা বলিতে পটু। সাত বছরের বিবাহিত জীবন অধিকাংশ মেয়েকেই ভোঁতা করিয়া দেয়, রমলার বেলা ফলটা হইয়াছে যেন ঠিক তার উল্টা। তার অনুভূতি তীক্ষ্ণ হইয়াছে, জীবনীশক্তি বাড়িয়াছে, আনন্দ আহরণের ক্ষমতা বাড়িয়াছে। স্ফূর্ত্তি আর উৎসাহের জন্য যেন বিশেষ উপলক্ষ দরকার হয় না, জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্তে উৎসবের প্রেরণা যেন সঞ্চিত আছে, চয়ন করিয়া নিলেই হয়। তারপর ক্রমে ক্রমে দু'জনের এতখানি পার্থক্য সত্ত্বেও মিলটা ত্রিষ্টুপের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। সে বুঝিতে পারিল, কুন্তলার সঙ্গে রমলার শুধু বিকাশের পার্থক্য, কুঁড়ির সঙ্গে ফুলের। যে কথায় কুন্তলার মুখে মৃদু হাসি ফুটিতেছে, সেই কথাতেই রমলা হাসিয়া উঠিতেছে উচ্ছ্বসিত ভাবে, যে মমতায় কুন্তলা কচি মেয়েটাকে কোলে নিয়া সন্তর্পণে তার গালে চুমা দিয়া বলিতেছে, কেঁদো না, সেই মমতাতেই রমলা বড় মেয়েটাকে বুকে চাপিয়া দলিয়া মলিয়া তাকে বুকের সঙ্গে যেন মিশাইয়া দিতে চাহিয়া বলিতেছে, 'কাঁদে না যাদু, মামা বাড়ী এসে কি কাঁদতে আছে রে দুষ্টু পাজী সোণা?'

যে সুখ দুঃখের হিসাব কুন্তলা ভবিষ্যতের কল্পনায় জমা রাখিয়া ভাবিতেছে, কে জানে আমার কপালে কি আছে, সেই সুখ দুঃখের স্বাদ নিতে নিতে কুন্তলা ভাবিতেছে, কে জানে আমার কপালে এত সুখ টিকিবে কিনা!

রমলা সত্যই সুখী। কেবল নিজে সে সুখী হয় নাই, আরেকজনকেও সুখী করিয়াছে। রমলার স্বামী ধীরেনের শান্ত, পরিতৃপ্ত আনন্দোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া ত্রিষ্টুপের হঠাৎ এক সময় মনে হয়, জীবনের হিসাব নিকাশের অঙ্ক শাস্ত্রটাই কি তবে তার ভুল? তিরাশী টাকার একজন কেরাণী এমন সুখী হইল কি করিয়া?

(ক্রমশঃ)

আমার চোখে প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ

শ্রীসুকৃতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাইরে থেকে কাউকে জানা সম্ভব নয় বলেই কাউকে না জেনে কিছু বলবার পক্ষপাতী আমি কোনকালেই নই। ভারতবর্ষের কয়েকটি সন্ন্যাসাশ্রমের সংস্পর্শে নানা কারণে আমাকে যেতে হোয়েছে, তাঁদের ভেতর আর বাইরের স্বাতন্ত্র্য দেখে সময়ে সময়ে আমি অবাক হোয়ে গেছি। সন্ন্যাস জীবনের আদর্শ অকর্মণ্য সন্ন্যাসীদের হাতে পড়ে' বিকলাঙ্গ হোয়ে গেছে। তলিয়ে দেখেছি—সন্ন্যাস-জীবনের আড়ালে তাদের সত্যিকারের ঘরমুখী মন, ভাবপ্রবণ জীবন এবং ভোগকামী চিত্ত যেন তাদের সুন্দর না করে' আরও রূঢ় করে' তুলেছে। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের কর্ম্মীদের এইখানেই একটু বিশেষত্ব লক্ষ্য করে' শুধু আশ্চর্য্য হইনি, নিজের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা পর্য্যন্ত নিঃসঙ্কোচে নিবেদন করেছি এবং একাগ্র মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তাঁরা দেশের ও সমাজের চোখে যে আদর্শ স্থাপন করবার জন্য নিজেদের সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে' এসে এই কঠিন ব্রত নিয়েছেন—যেন সার্থক হ'তে পারেন এবং এই চিরনিন্দিত অশেষ দুঃখের দেশের তরুণ সমাজরা যেন তাঁদের চিন্তাধারাকে বুঝতে না ভুল করেন।

ঘুরে ঘুরে সব কিছু দেখবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল। সব কিছুকে তন্ন তন্ন করে' দেখবার চেষ্টাও করেছিলাম। তাঁদের সন্ন্যাস-জীবনের ভিতর যে ভিক্ষা-বৃত্তির প্রশ্রয় দিয়ে নিজেদের পৌরুষকে ক্ষুন্ন করেন নি এইটাই আমার চোখে সব চেয়ে ভাল লেগেছে। নিছক আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য যে তাঁরা দিনের পর দিন জগদ্দল মূর্ত্তির সামনে বসে হাঁটু গেড়ে উপাসনা করছেন তা নয়, তাঁরা আধুনিক ভারতে এক নতুন ভাবধারার গোড়া পত্তন করবার জন্য সচেষ্ট। সারাদিন তাঁরা কলকাতার বুকে এসে ছুটোছুটি করেন, মস্ত বড় বড় কারবারের তদ্বির করেন, সহকর্ম্মিদের পাশে পদমর্য্যাদা বজায় রেখে কাজ করেন, সন্ধ্যে হ'লেই তাঁরা ছোটেন চন্দননগরে নিজেদের আশ্রমে। গঙ্গার ধারে আশ্রম। ঘটা নেই, ঐশ্বর্য্য নেই। সামান্য ঘর, সামান্য বিছানা-পত্তর, নিতান্ত প্রয়োজনীয় আহার্য্যকে অবলম্বন করে' তাঁরা বেঁচে আছেন মুখে এতটুকু বিষাদের ছায়া নেই। সবারই মুখে হাসি খুসী ভাব। অহং ভাবকে যে তাঁরা সত্যিই জয় করতে পেরেছেন সেদিনকার অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে অনুষ্ঠিত প্রবর্ত্তক সাহিত্য-সম্মিলনের সভামণ্ডপে হাজির হয়ে বেশ স্পষ্ট বুঝলাম। একদিকে ছিলেন মহারথীরা, এক পাশে ছিলাম আমরা কয়েকজন অখ্যাতনামা উদীয়মান লেখকেরা। এ রকম অঘটন সাহিত্য-সম্মিলনে নতুন নয় কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ অন্যান্য জায়গায় যে চোখে নবীন এবং প্রবীণ খ্যাত এবং অখ্যাতদের অভ্যর্থনা করেন, সেটা করেন মানুষের ব্যক্তিত্বকে। কিন্তু এঁদের কাছ থেকে সেদিন শিখলাম মানুষের ব্যক্তিত্বকে এঁরা বেশী প্রশ্রয় দেন না তাঁর দানটুকুকেই এঁরা নিতে চান। অভ্যর্থনার সময় সবাইকে চুল চিরে' ভাগ করে' দেন।

সঙ্ঘ-গুরু শ্রদ্ধেয় শ্রীমতিলাল রায়কে আমি এতদিন জানতাম তিনি একজন সাধকমাত্র। সাহিত্যের খোঁজ তিনি সামান্যই রাখেন। ভেবেছিলাম তিনি দু' চারটে ভগবান সম্বন্ধে কিছু ব্যাখ্যা শুনিয়ে রেহাই দিবেন। ঘটল তার উল্টোটাই। তাঁর বলবার কায়দা, শব্দসংযোজনার প্রণালী এবং সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য যে, তাঁর প্রতিটি শব্দের ভিতর সাহিত্যের রস নিহিত ছিল। অনেক কিছু সে দিন শুনলাম, যেটা আমার জীবনে নতুনই বলতে পারি। ভারতের সংস্কৃতির প্রতি এমন শ্রদ্ধাবান্ মানুষ এই সংশয়-সন্দিগ্ধ ও অনুকরণীয় যুগে খুব কম দেখা যায়। আমাদের শুনিয়ে সেদিন তিনি যা বললেন, সব মেনে নিতে না পারলেও, যদি কিছু মেনে চলতে পারি, অন্ততঃ এটুকু বুঝতে পারব যে, আমাদের হাত দিয়ে যে লেখা বেরুবে সেটা দেখে কারুর বুঝতে দেরী হবে না যে, এ ভারতের নরনারীর সুখ-দুঃখের কাহিনী নিয়ে লেখা।

রাত্রি নটার সময়ে সভা ভাঙ্গল। শ্রদ্ধেয় রাধারমণ-বাবুকে অবলম্বন করে বেরিয়ে এলাম। আসতেই চাদর গায়ে একজন ছোট খাটো মানুষ এসে দেখা দিলেন। বললেন, চলুন আপনাদের খাবার বন্দোবস্ত করেছি। সামান্য আয়োজন আমাদের। আসুন, আসুন—বলে' তিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন। ভেবেছিলাম বোধ হয় সাধারণ কোন কর্ম্মী। পরে পরিচয় পেলাম তিনি এই আশ্রমের জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র দত্ত। বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। দেশের শত সহস্র প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারিদের ছাপ মনে আঁকা ছিল। তাঁদের চাল চলন, কথাবার্ত্তা, ঠাট-ঠোট জানা ছিল। জানতাম, আমাদের মত মানুষ থাক্ না থাক্, তাঁদের তাতে কোন মাথা ব্যথা নেই।

কিন্তু তিনি এমন ভাবে পাশে এসে বসে গল্প করে, আদর করে' খাওয়াতে লাগলেন যে, কিছুতেই মনে ক'রতে পারছিলাম না যে, কোন সন্ন্যাসীদের আশ্রমে বসে' আছি। যেন প্রবাসী বড় ভাই অনেক দিন পরে ছোট ভাইদের কাছে পেয়ে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াচ্ছেন।

আমার সময় হোয়ে এল। সবাইকে নমস্কার করে' বিদায় নিলাম। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের অখ্যাত মেয়েদের গানও শুনলাম, আবার উপাধিধারী মেয়েদের গানও বহু শুনেছি। আমার উন্মনা ভাব দেখে বন্ধু একজন জিজ্ঞেস করলেন, কি ভাবছ হে ?

বললাম, মীরার ভজন অনেকের মুখে শুনেছি। কিন্তু এমন দরদ দিয়ে কেউ শুনিয়েছে কি না আমি জানিনে। তাঁদের পদবী নেই বড় বড়, সমাজের কাছে গীতশ্রী উপাধিও তাঁরা চান না, কিন্তু আমার মত বেরসিক লোকের মনেও মীরার ভজনের সুর ধ্বনিত হ'তে লাগল, এ কতখানি ক্ষমতা থাকলে তবে আর্টিষ্ট সক্ষম হন তা' বোধ করি প্রবর্ত্তকের পাঠকমাত্রেই জানেন।

চন্দননগর ষ্টেশনে এলে ট্রেণ ছাড়ল। দেখতে দেখতে চন্দননগরের ডিসট্যান্ট সিগন্যাল দূরে মিলিয়ে গেল। বাড়ি ফেরবার তাড়াহুড়ো কম ছিল না বটে, কিন্তু প্রবর্ত্তক আশ্রমের যে জীবন্ত রূপ চন্দননগরে দেখে এলাম, এখান থেকে তা' আঁচ করা সহজ নয়। তাঁরা দেশের যে সত্যিকারের পৌরুষকে আবার সঞ্জীবিত করে' তোলবার চেষ্টা করছেন যেন তা' সার্থক হয়।

সেই ভালো

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সাহা

সেই তো আমার ভালো,
যার প্রদীপের রশ্মিরেখায়
মিশায় প্রাণের কালো।

চলার পথে মোর
যার স্বপ্নলোকে
[illegible]ধি প্রেমের ডোর,

সেই তো শুধু ভালো
সকল সন্দ' ঘুচিয়ে যে দেয়
নিসর্গেরই আলো।

ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণচরিত

স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি

শ্রীমদ্‌ভাগবৎ পুরাণের মুখ্য বিষয় শ্রীকৃষ্ণচরিত্র বর্ণন। পুরাণ পঞ্চ-লক্ষণা হইয়া থাকে, এ জন্য সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিতও প্রসঙ্গতঃ বলা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তাহাও তন্মহিমা-সমন্বিতই দেখা যায়। এতদধিক শেষভাগে ভবিষ্যৎ রাজবংশ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা পাওয়া যায়। তাহাতে যে সব দিগ্‌দর্শন আছে, তদ্দ্বারা ঐতিহাসিকগণ রাজবংশ ও সময়নির্ণয়ের ধারা পাইয়াছেন। ভাগবতের ১০।৮।১৩ ও ১১।৫।২১ এই স্থানে উল্লিখিত আছে যে—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহস্য গৃহ্নতোহনুযুগং তনুঃ।
শুক্লোরক্ত স্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

অর্থাৎ—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারি যুগে ক্রমে ভগবানের শুক্ল, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। এখন তাঁর কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে। ইহাতে কৃষ্ণ-জন্মকালে কলি আবির্ভূত, এই জন্যই তাঁর কৃষ্ণতা প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। ঐ অন্যত্র—১।১৮।৬।

যস্মিন্নহনি যর্হ্যেব ভগবানুৎ সসর্জ্জগাম্।
তদৈবেহানুবৃত্তোহসাবধর্ম্ম প্রভবঃ কলিঃ॥

অর্থাৎ—যেদিন ভগবান দেহ ত্যাগ করেন, সেইদিন হইতেই অধর্ম্ম কলির প্রভাব অনুবৃত্ত হইয়াছে। সুতরাং কলিযুগেই কৃষ্ণের অবতার স্বীকার্য্য। কল্যব্দ বলিয়া একটী অব্দ পঞ্জিকাদিতে দৃষ্ট হয়, বর্ত্তমান ১৯৪১ ইং অব্দে ইহার ৫০৪১ বর্ষ চলিতেছে। কেহ কেহ যুধিষ্ঠিরাব্দ বলিয়া একটি অব্দ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাবসানে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের হস্তিনাপুরের সিংহাসনলাভের সময় হইতে গণিত বলিয়া বলেন। বর্ত্তমানে তাহার ৪৩৮৯ বর্ষ চলিতেছে। ইহাতে কলির ৬৫২ বর্ষ গতে কুরু-যুদ্ধ ঘটে বলিতে হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ৩৬ বর্ষ পরে শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশ ধ্বংস করিয়া দেহত্যাগ করেন। অর্থাৎ ৬৮৮ কল্যব্দে শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ হয়। কুরু-যুদ্ধের কাল ভাগবত দুই প্রকারে নির্ণয় করিয়াছেন। মহারাজ পরীক্ষিতের গর্ভবাস-কালে কুরু-যুদ্ধ ঘটে। তাহা হইতে ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট্ মহারাজ নন্দের সাম্রাজ্যে অভিসেচন-কাল সম্বন্ধে একটী শ্লোক আছে, উহা ১২।২।২৬ শ্লোক।

আরভ্য ভবতো জন্ম যাবন্নন্দাভিসেচনম্।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তুগতং পঞ্চদশোত্তরম্॥

অর্থাৎ মহারাজ পরীক্ষিতের জন্মকাল হইতে নন্দাভিসেচন মধ্যে ১৫১০ বর্ষ গত হয়। ইহাই পুনঃ ভবিষ্যৎ রাজবংশবর্ণনে দেখা যায়, সহদেববংশীয়গণ ১০০০ বর্ষ রাজত্ব করেন মগধে, তৎপরে প্রদ্যোৎবংশীয়গণ ১৪২ বর্ষ রাজত্ব করেন, পশ্চাৎ শিশুনাগবংশীয়গণ ৩৬২ বর্ষ রাজত্ব করার পর নন্দগণ সিংহাসন দখল করেন। ইহাতে ১৫০৪ বর্ষ হয়। নন্দাভিসেচন তাঁহার রাজত্বের ষষ্ঠ বর্ষে ঘটিলে ১৫১০ বর্ষ সহ বেশ মিল দেখা যায়। এই মতে ইংরেজ ইতিহাসকারগণ গণনা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে ৪২১ খৃঃ পূঃ বর্ষে মহারাজ নন্দ সিংহাসন লাভ করেন। সুতরাং ১৫১০+৪২১+১৯৪১ অর্থাৎ অদ্যাবধি ৩৮৭২ বর্ষ পূর্ব্বে কুরু-যুদ্ধ ঘটে। এই উভয় গণনায় ৫১৭ বর্ষ কম-বেশী ঘটিতেছে। অর্থাৎ ৩৮৩৬ বর্ষ পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করেন বলিতে হয়। ভগবান কৃষ্ণ ১২৫ বর্ষ মর্ত্ত্যধামে ছিলেন, ইহা ভাগঃ ১১।৬।২৪ শ্লোকে উল্লিখিত। সুতরাং ৫৬৩ কল্যব্দে ভগবানের মথুরায় কংস-কারাগারে জন্ম হয়। সাধারণতঃ লোকে মাতুলালয়ে বা পিতৃগৃহে জন্মগ্রহণ করে, এ বিষয়েও শ্রীকৃষ্ণের জন্ম অসাধারণ। মাতৃকোলে ও মাতৃস্তন্যে বঞ্চিত। গোকুলে নন্দ গোপগৃহে প্রতিপালিত। এই নন্দ গোপগৃহে ভগবান মাত্র এগার বর্ষ কাল বাস করেন। যথা—ভাগবতে ৩।২।২৬ শ্লোকে—

ততোনন্দ ব্রজমিতঃ পিত্রা কংসাদ্বিবিভ্যতা।
একাদশ সমাস্তত্র গূঢ়ার্চ্চিঃ সবলোঽবসৎ॥

এই অল্প বয়সেই তাঁর সব বাল্য-লীলা, যাহা অত্যদ্ভুত ও রোমহর্ষকর। যখন স্তন্যপায়ী শিশু, তখন বধোদ্যতা পুতনার স্তনপানছলে তিনি তাহার বধ সাধন করেন। শকট-নিম্নে শয়ান অবস্থায় পাদ-সঞ্চালনে তিনি শকট ভগ্ন করেন। তৃণাবর্ত্তাসুর শিশু কৃষ্ণকে হরণ করতঃ উড্ডীন হইলে, গুরুভার

হওয়ায় তিনি তাহার নিধন করেন। পরে কিশোর বয়সে মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছেন বলিয়া জননী কর্ত্তৃক ভর্ৎসিত হইয়া মুখব্যাদান করিলে, মাতা যশোদা তাঁহার মুখবিবরে চতুর্দ্দশ ভুবন দর্শন করেন। চুরি করিয়া মাখন ভক্ষণ করায় উদুখলসহ রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিতে গেলে, রজ্জুর সহিত রজ্জু যোজনা করিতে থাকিলেও রজ্জু বন্ধনপক্ষে কম হইতে থাকে, পশ্চাৎ বন্ধনদশায় যমলার্জ্জুন বৃক্ষ সহ রজ্জু জড়াইয়া টানিলে বৃক্ষদ্বয় ভাঙ্গিয়া ধরাশায়ী হয়। বকাসুর শ্রীকৃষ্ণকে গ্রাস করিলেও, তাহার বধসাধনে তিনি মুক্ত হইয়া আসেন। সর্পরূপী অঘাসুর গ্রাস করার জন্য আকাশব্যাপী হাঁ করিলে তিনি তদবস্থায়ই তাহার বধ সাধন করেন। ইহা পঞ্চবর্ষ বয়ঃক্রমের কথা। ভা ১০।১২.৩৫। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক গো ও রাখাল বালকগণ অপহৃত হইলে, কৃষ্ণ গো ও গোপবালক রূপসকল ধারণে বর্ষাধিক অবস্থান করেন। তিনি গর্দ্দভরূপী ধেনুকাসুর বধ করেন, হ্রদে রজলবাসী কালীয় দমন করেন, দাবাগ্নি পান করেন, প্রলম্বাসুর বধ করেন, গোবর্দ্ধন ধারণ করেন যখন সাত বর্ষ বয়ঃক্রম মাত্র, গোপীদের বস্ত্রহরণ করেন, তাহাদের সহ রাসলীলা করেন ও পশ্চাৎ মথুরায় গমন করতঃ কংসকে বধ করেন। তৎ পশ্চাৎ তিনি গুরুগৃহে গমনে অধ্যয়নাদি সমাধান করেন ও গুরুদক্ষিণাস্বরূপে গুরুর মৃত বালককে যমালয় হইতে আনিয়া প্রদর্শন করান ইত্যাদি। এই সকল শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বলিয়া অভিহিত হয়। যিনি অশিক্ষিত গোপগৃহে পালিত, চারিবর্ষ বয়ঃক্রম হইতেই বনে বনে গোচারণে নিযুক্ত, তাঁহার পক্ষে যোগসাধনে ঐশ্বর্য্যলাভের সম্ভাবনা কোথায়? অথচ এই সকল যোগৈশ্বর্য্যবলে সাধিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব ঐ ভগ বা ঐশ্বর্য্য তাঁহার জন্মগত বা স্বরূপগত ছিল বলা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। এজন্যই ভাগবতে তাঁহাকে "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্" বলিয়াছেন। অন্যান্য অবতারে এত অল্প বয়সে এমন ঐশ্বর্য্য সকল প্রদর্শন প্রসঙ্গ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনে এত ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ দেখা যায় না। সেখানে তিনি একজন অসাধারণ নীতিবেত্তা, কূট-রাজনীতিবিদ, বিচক্ষণ বিচারশীল, মহাবীর স্বরূপেই দৃষ্ট হন। মহা[illegible] জরাসন্ধের আক্রমণে ভীত হইয়া শূরসেন রাজ্য মথুরাদি ত্যাগে পলায়ন করেন ও সব দেশ অতিক্রম করতঃ কৃষ্ণ সমুদ্রতটে দ্বারকানগরীতে বাস করেন।

কালযবন সঙ্গে যুদ্ধে কৃতকার্য্য না হইলে, কৃষ্ণ সূর্য্যবংশীয় রাজা মুচুকুন্দের সাহায্যে তাহাকে বিনাশ করান। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অংশেই অবতীর্ণ হন, কারণ আমরা গীতাতে পাই "একাংশেন স্থিতো জগৎ"। সেই অংশ যে জগৎ, তাহাতেই যখন আবির্ভাব তখন অংশাবতরণ নিশ্চয়, ইহা ভাগবতেও বহু স্থানে উক্ত হইয়াছে, যথা—১০।৪১।৪৬ অবতীর্ণা-বিহাংশেন ক্ষেমায় চ ভবায় চ। ঐ ১০।৪৩।২৩ অবতীর্ণা-বিহাংশেন বসুদেবস্য বেশ্মনি। ঐ ১০।৩৮।৩২ অবতীর্ণৌ জগত্যর্থেস্বাংশেন বলকেশবৌ। ঐ ১০।৩৩।২৬ অবতীর্ণোহি ভগবানংশেন জগদীশ্বর ইত্যাদি। মহাভারতে ও বিষ্ণু-পুরাণে এবং ভাগবত পুরাণেও এক আখ্যান দেখা যায় যে, কেশ হইতে জাত জন্য তাঁর নাম কেশব এবং কৃষ্ণবর্ণ কেশ হইতে জন্ম জন্য কৃষ্ণ নামে অভিহিত হন। মহা-ভারতের আদিপর্ব্বে ১৭৯ অধ্যায়ে সচাপি কেশৌ হরিরুচ্চকর্ত্ত এবং শুক্লমপরঞ্চাপি কৃষ্ণম্। তৌ চাপি কেশবাবিশতাং যদূনাং কুলস্ত্রিয়ৌ রোহিণীং দেবকীঞ্চ। তয়োরেকোবলভদ্রো বভুব যোঽসৌ শ্বেতস্তস্য দেবস্যকেশঃ। কৃষ্ণোদ্বিতীয়ঃ কেশবং সম্বভূব কেশো যোঽসৌ বর্ণতঃ কৃষ্ণ উক্তঃ॥ ভাগবতে ২।৭।২৬ শ্লোকে—"কলয়াসিত কৃষ্ণ-কেশঃ। কৃষ্ণ কেশ জন্য কৃষ্ণ নাম। কলি যুগ জন্য কৃষ্ণত্ব যেমন উক্ত হইয়াছে, তেমনি কৃষ্ণ নামের আরও কারণ সকল উক্ত দেখা যায়, যথা—যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আকর্ষণ করিয়া স্থির-পথগ করেন অথবা প্রলয় আকর্ষণ দ্বারা স্বকুক্ষিগত করেন, অথবা ভক্তচিত্তাকর্ষক যিনি, তিনিই কৃষ্ণ। আবার মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বের ৬৯ অধ্যায়ে আছে—

কৃষির্ভূর্বাচকো শব্দো নস্তু নির্বিতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যংপরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যাদি ধীয়তে॥

কৃষ্ণ-সৎ বা আনন্দ, তাই সচ্চিদানন্দপর ব্রহ্ম কৃষ্ণশব্দার্থ দ্বারা পাওয়া যায়। পরব্রহ্ম-কৃষ্ণচরিত্র যেমন ভাগবতে বর্ণিত, তেমনি ঋগ্বেদে ইন্দ্রই পরম ব্রহ্ম ও তাঁর চরিত্র নানাভাবে বর্ণিত আছে। উভয়ের কার্য্য-চরিতাদিতেও বেশ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ঋগ্বেদে সূর্য্যরূপী ইন্দ্র যখন দক্ষিণ অয়নে বিষুব রেখার দক্ষিণ দেশগত হন, তখন উত্তর মেরু

প্রদেশে সূর্য্য অস্তমিত থাকেন। কোথাও ছয় মাস, কোথাও বা পাঁচ মাস কোথাও তিন মাস পর্য্যন্ত দীর্ঘ রাত্রি ও শীত ঋতুর প্রবলাক্রমণ ঘটে। তখন তিনি বৃত্ররূপ অহির কবল প্রাপ্ত হন। ইহাই বেদের কৃষ্ণসূর্য্য। অহি বা শুষ্ণকে বধ করতঃ ইন্দ্র সূর্য্যকে মুক্ত করিলে, তিনি উত্তর অয়নে উত্তর দেশবাসিগণের নেত্রগোচর হন। ঋ ১।১২১।১০ মন্ত্রে আছে "পুরা যৎসূরস্তমসো অপীতেস্তমদ্রিবঃ ফলিগং হেতিমস্তকস্য চিৎপরিহিতং যদোজাদিকপরিস্থপ্রথিতং তদাদ॥ অর্থ—তখনই সূর্য্য অন্ধকারের সহিত সংগ্রামে মুক্ত হইলেন, যখন হে দেব, বজ্রধারী, তুমি সেই বৃত্ররূপ শত্রুকে বিনাশ করিয়াছিলে এবং শুষ্ণের যে বল সূর্য্যকে আচ্ছাদন করিয়াছিল এবং সূর্য্যের উপর গ্রথিত হইয়াছিল তাহা তুমি ভগ্ন করিয়াছিলে। ভাগবতে ৩।২।৭ শ্লোকে আছে—"কৃষ্ণদ্যুমণি নিম্লোচ্চ গীর্ণেষ্বজগরেণহ"। অর্থাৎ কৃষ্ণ-সূর্য্য কালরূপ অজগর-গিলিত বলিয়া অস্তমিত। ঋগ্বেদে ও ব্রাহ্মণে ইন্দ্রই পরমাত্মা, পরব্রহ্ম, সৃষ্টিস্থিতি-বিনাশকর্ত্তা। তিনি মায়াবলম্বনে অবতীর্ণ হন। ইন্দ্রোমায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে। রূপং রূপং প্রতিরূপং বভূব, ইত্যাদি। পূর্ব্বে যে কৃষ্ণলীলা কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার কোন কোন ক্রীড়া ঋগ্বেদে ইন্দ্রের লীলা বলিয়া বর্ণিত আছে। শকটভঙ্গ ব্যাপারটী ঋ ৪।৩০।১০ ও ১০।৭৩।৬ মন্ত্রে, বধোদ্যতা পুতনার ন্যায় ইন্দ্র বধোদ্যতা স্ত্রীবধ করেন ঋ ৪।৩০।৮। ইন্দ্রকে কুযবা নামক অসুর বকাসুরবৎ গ্রাস করিলে, ইন্দ্র আপনাকে তাহার বধ-সাধনে মুক্ত করেন। হ্রদ-জলে কালীয়-দমনবৎ ইন্দ্র জলাবৃত প্রদেশে বৃত্র বা অহিকে বধ করেন ঋ ৮।৩৮।১ ও ৮।৩৮।৪ গোবর্দ্ধনপর্ব্বতধারণবৎ ইন্দ্র পর্ব্বত ধারণ করেন ও সঞ্চালন করেন (ঋ ২।১২।৯, ৪।১৬।৮, ৬।১৮ দ্রষ্টব্য)।

দধিক্ষীরপ্রিয়তা ইন্দ্রেরও দেখা যায়—ঋঃ ৯।৬৮।৮, ৯।৩৯।১। তদতিরিক্ত ইন্দ্র গোদেহে ক্ষীর প্রদান করেন ৪।৫৮।৫ কৃষ্ণ, গোপাল, ইন্দ্র গো-পতি ৪।৩০।২২, ১০।১১।৩। কৃষ্ণের ব্রহ্মাপহৃত গো-সমুদ্ধারের ন্যায় ইন্দ্রের পণি কর্ত্তৃক অপহৃত গো-সমুদ্ধার ঋ ৬।৪৪।৫ ; ৮।৩৬।২, ১।৩৩।১০ বলভদ্র-সহায়ে কৃষ্ণের ধেনুকাদি বধের ন্যায় বিষ্ণু-সহায়ে ইন্দ্র বৃত্র বধ করেন। কৃষ্ণ পাঞ্চজন্যধারক, ইন্দ্রও পাঞ্চজন্যধারক ও পোষক ১।১০০।২। কৃষ্ণ গরুড়বাহন, এই জন্য গরুৎমান, ইন্দ্রও গরুৎমান ১।১৬৪।৪৬। কৃষ্ণমাতা দেবকী, ইন্দ্রমাতা অদিতি। কৃষ্ণ পদ্মনাভ, ইন্দ্রনাভিতে ব্রহ্মাণ্ড ১০।৮২।৬। কৃষ্ণ সৃষ্টিকর্ত্তা, ইন্দ্রও বিশ্বস্রষ্টা ঋ ১০।৮২।৬, ১।৬১।৭, ৩।৩১।৫। কৃষ্ণের চতুর্ব্যূহ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ ; তেমনি বেদে ইন্দ্রের চারি অসূর্য্য দেহ থাকা বর্ণিত ১০।৫৪।৪। বাসুদেব কৃষ্ণদেহে সর্ব্বজীবাবাস, বাসব ইন্দ্রদেহেও সর্ব্বজীবাশ্রয় ঋ ৩।৩২।১১, ৩।৩৮।৪, ৮।৯৪।২, ৯।৯৬।১৮, ৬।৪৭।১৮ দ্রষ্টব্য। সর্ব্বদেহে বাস জন্য কৃষ্ণ বাসুদেব, তেমনি সর্ব্বদেহে বাস, এই জন্য ইন্দ্র বাসব ঋ ১০।৪০।৬, ১০।৫৫।৩, ৫।৩৩।৬, ১।৫৭।৩, ২।১৬.২, ১০।৭৪।৬, ১০।৫৫।৪। মায়াবলম্বনে কৃষ্ণ বহু কৃষ্ণ, গোপ, গোপী গো হন ; ইন্দ্রও মায়া দ্বারা বহু-রূপ হন ঋ ৬।৫৩।৪, ৬।৪৭।১৮, ১০।৫৪।২। কৃষ্ণ অগ্নি বা রুদ্র হইতে চক্র গ্রহণ করেন, ইন্দ্রও সূর্য্যাগ্নি হইতে চক্র গ্রহণ করেন, ঋ ১।১৭৫।৪, ৪।২৮।২। চক্র দ্বারা কৃষ্ণ দ্রোহী শিশুপাল বধ করেন, ইন্দ্রও চক্র দ্বারা দ্রোহী অসুর বধ করেন, ঋ ৮।৯৬।৯। কৃষ্ণকে হরি বলে, ইন্দ্রকেও বেদে হরি বলিয়াছে, ৮।৯।৩, ৮।৯।৪। গোবিন্দ কৃষ্ণ, ইন্দ্রও গোবিন্দ ১।৮২।৪, ১।১০৩।৬ দ্রষ্টব্য। কৃষ্ণকৈটভারি মধুসূদন, ইন্দ্রও বৃত্রারিনমুচিসূদন। কৃষ্ণকে জরা ব্যাধ বাণবিদ্ধ করে, ইন্দ্রকে বংশ তেমনি বাণবিদ্ধ করে ৪।১৮।৯। কৃষ্ণ যথা বাসুদেবাখ্য পৌণ্ড্রপুরাধিপতিকে বধ করেন, তেমনি ইন্দ্র কৃষ্ণ নামক অসুর বধ করেন। কৃষ্ণসখা অর্জ্জুন মহাবীর হন, ইন্দ্রসখা আর্জ্জুনি কুৎস প্রধান যোদ্ধা ৫।২৯।৯। যদি হৃতগর্ভ বর্জ্জন করা যায়, তবে কৃষ্ণ সপ্তম, ইন্দ্রও তেমনি আদিত্যগণের সপ্তম। ত্যক্তগর্ভ-গ্রহণে কৃষ্ণ অষ্টম মাতৃত্যক্ত, তেমনি অষ্টম গর্ভ মার্ত্তণ্ডও ত্যক্ত বলিয়া বেদে বর্ণিত, ১০।৭২।৮। কৃষ্ণের উদরে বিশ্ব ভাগ ১০।১৪।১৭, তেমনি ইন্দ্র-কুক্ষিতে বিশ্ব লুক্কায়িত ঋ ৩।৩২।১১।

কৃষ্ণের আচরিত বর্ত্ম সবাই অনুবর্ত্তন করে, ইন্দ্রবর্ত্মও অনুবর্ত্তন করে, ঋ ১০।৪৯।১। গীতা কৃষ্ণ বলেন সর্ব্ব-জীবহিতে ; যজ্ঞপদ্ধতি দেন ইন্দ্র সর্ব্বজীবার্থে ঋ ১।৪৯।১। কৃষ্ণ দুষ্টের দমনকারী, শিষ্টের পালক ; ইন্দ্রও তাহাই ঋ ১।৬৪।৩, ৩।৪৬।২। কৃষ্ণ কার্ত্তিকী পৌর্ [illegible] গোপীগণ

সহ রাস উৎসব করেন। ইন্দ্রও তেমনি কার্ত্তিকী শারদ পূর্ণিমায় বৃত্র বধ করতঃ দেবগণসহ উৎসব করেন, ঋ ২।১২।১২ দ্রষ্টব্য।

ভাগবতে আদি বিষ্ণু শ্বেতদ্বীপবাসী, শ্বেতবর্ণ, চতুর্ভুজ-জটাবল্কলধারী, বিশ্বাদ্য, বিশ্ববীজ ভাগ ১১।৫।২১ ; তেমনি শিব শ্বেত পর্ব্বতবাসী, শ্বেতবর্ণ, চতুর্ভুজ, জটাজুটধারী, বিশ্বাদ্য, বিশ্ববীজ। এতদ্দ্বারাও ইন্দ্র-কৃষ্ণবৎ শিব-বিষ্ণুর একত্ব অবধারিত হয়। ভাগবতেও ইহার নিদর্শন মিলে, যথা—১০।১৪।১৯ শ্লোকে সৃষ্টাঘিবাহং জগতো বিধান ইব ত্বমেষোহন্তইব ত্রিনেত্রঃ। তথা ৪।৭৫০ অহং ব্রহ্মাচ শর্ব্বচ জগতঃ কারণং পরম্। আত্মেশ্বর উপদ্রষ্টা স্বয়ং দৃগবিশেষণঃ॥

আত্মমায়াং সমাবিশ্য যোঽহং গুণময়ীং দ্বিজ।
সৃজন্ রক্ষন্ হরন্ বিশ্বং দধ্রেসংজ্ঞাং ক্রিয়োচিতং॥৫১
ত্রয়ানামেক ভাজানাং যো ন পশ্যতি ধেঃভিদাম্।
সর্ব্বভূতাত্মনাং ব্রহ্মণ্ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥৫৪

অর্থাৎ, সৃষ্টিস্থিতিবিনাশকর্ত্তা একই পরমাত্মা তৈত্তিরীয় শ্রুতি প্রভৃতিতে আছে। ভেদবুদ্ধি অবৈদিক ও অজ্ঞানপ্রসূত। "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্র দ্বারাও বেদান্ত-সূত্রে ব্রহ্ম জগৎকারণ বলা হইয়াছে। ভাগবতে সঙ্কর্ষণ সম্বন্ধে মতান্তর দেখা যায়—৫।২৫।৩ শ্লোকে সঙ্কর্ষণকে ত্রিঅক্ষ রুদ্র বলা হইয়াছে। তিনিই আদি দেব অনন্ত। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণ। আবার ১২।১১।১৩ শ্লোকে "অব্যাকৃতমনন্তা-খ্যমাসনং যদধিষ্ঠিতং" অব্যাকৃতা প্রকৃতি তাঁর অধিষ্ঠান বা আসন যাহা, তাহাই অনন্ত। যেমন গীতায় (৪।৬) প্রকৃতিং স্বামধিষ্টায় সম্ভবামি আত্মমায়য়া। আবার ভাগবতের ৩।২৬।২৩-২৫ শ্লোকে অহঙ্কার-রূপ সঙ্কর্ষণ ভগবদ্বীর্য্য-সম্ভব। আবার ১০।২।৫ ও ৮ শ্লোকে সপ্তমো বৈষ্ণবং ধাম যমনন্তং প্রচক্ষতে। গর্ভোবভূব দেবক্যা হর্ষ-শোক-বিবর্দ্ধনঃ॥ দেবক্যাঃজঠরে গর্ভং শেষাখ্যাং ধাম মামকং। তৎ সন্নিকৃষ্যরোহিণ্যা উদরে সন্নিবেশয়॥ গর্ভসঙ্কর্ষণাৎ তৎ বৈ প্রাহুঃ সঙ্কর্ষণং ভুবি।১০। উহার ১৷৩৷২৩ শ্লোকে—একোনবিংশে বিংশতিমে বৃষ্ণিষু প্রাপ্যনামনী। রামকৃষ্ণা-বিতিভূবো[illegible]বানহরদ্ভরম্॥ উহার ৫।২৫।১ শ্লোকে—যা বৈ[illegible]গবতস্তামসী সমাখ্যাতা অনন্ত ইতি। ইহাতে সঙ্কর্ষণ ভগবানের কলা। কলা অংশকে বলে। ষোড়শ-কল পুরুষ। ভাগবতের ২।১০।৩৬-৪৩ শ্লোকে পরমাত্মা কৃষ্ণ হইতে ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রের উৎপত্তি বর্ণিত। ঐ ১২।৫।১ শ্লোকে অত্রানুবর্ণ্যতেঽভীক্ষ্ণংবিশ্বাত্মা ভগবান্ হরিঃ। যস্য প্রসাদজো ব্রহ্মা রুদ্রঃ ক্রোধসমুদ্ভবঃ। এখানে রুদ্র হরির ক্রোধজাত। আবার ঐ ৩।১২।৭-১০ শ্লোকে রুদ্র ব্রহ্মার ভ্রূমধ্য হইতে ক্রোধাৎ জাতঃ। ঐ ৫।২৫।৬ শ্লোকে সঙ্কর্ষণ অনন্ত আদিদেব। ঐ ৫।২৫।৯ শ্লোকে অনন্ত সৃষ্টিস্থিতিবিনাশকর্ত্তা। ঐ ৫।২৫।২৩ শ্লোকে অনন্ত আত্মতন্ত্র বা স্বতন্ত্র বা নিজেই নিজের আধার বলা হইয়াছে। এই সকল হইতে ধ্বংসকারী সঙ্কর্ষণ বা রুদ্র সম্বন্ধে বিষম গোলযোগ দেখা যায়। ইহার কারণ ভাগবতে বেদ অনুসরণ করিলেও, স্থানে স্থানে সাংখ্য ও স্থানে স্থানে নারদ পাঞ্চরাত্র মতের অনুবৃত্তি দেখা যায়। রুদ্র বেদে পরমাত্মা, শিব, অদ্বৈত তত্ত্ব। রু—জ্ঞানপ্রকাশ দ্বারা দ্রাবয়তি মায়া তৎকার্য্যঞ্চ ইতি রুদ্র। তাই শ্রুতিতে "একোহিরুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ" বাক্যে আছে "প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতম্"। যদাতম স্তন্নদিবা নরাত্রির্নসন্নচাসচ্ছিব এব কেবলঃ। সুতরাং ভাগবতের আদি বিষ্ণু বা কৃষ্ণ ও শিবতত্ত্ব একই তত্ত্ব। যাঁহারা রজস্তমো-মোহাবৃত, তাঁহারাই বিসম্বাদী ভ্রমে পতিত হয়। কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম, সুতরাং অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত—নিষ্কাম, নিরঞ্জন, নির্ব্বিকার, নিষ্ক্রিয়, নিত্য, সত্য, ইন্দ্রিয়াতীত, কেবলবোধগম্য। এই অপ্রকাশিতকে প্রকাশ করে, এই জন্যই শ্রুতির মহিমা। অনুবাদ প্রকট করা শ্রুতির তাৎপর্য্য নহে। শ্রুতি অপ্রকাশিতার্থপ্রকাশক। তিনি প্রমাণচতুষ্টয় (প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও আপ্তবাক্য) দ্বারা গম্য নহেন, এই জন্য অপ্রমেয়। কেবল শ্রুতিপ্রমাণগম্য। তাই গীতায় (৭.২৩) ভগবান বলিয়াছেন—

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥

সাধারণ বুদ্ধিতে যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহাই সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। এজন্য চার্ব্বাকবাদী আকাশ স্বীকার করে না, ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও বায়ু, এই চারি ভূত মানে—

ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু হইতে পারে, এমত সম্ভব মনে করে না। তাই সাধকানাংহিতার্থায় ব্রহ্মণোরূপকল্পনা। ভাগবতে তাই ১২।১১ অধ্যায়ে কৃষ্ণের ব্যক্ত যে মূর্ত্তি সাধারণে ধ্যানাদি করে, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, শিরে শিখিপুচ্ছ, পরিধানে পীতবাস, কর্ণে মকর কুণ্ডল, বক্ষে কৌস্তুভমণি ও শ্রীবৎস-লাঞ্ছন, গলে বিলম্বিত বনমালা, অধিষ্ঠান অনন্ত সর্প ইত্যাদি, তাহা যে কল্পিত মাত্র, তাহা স্পষ্ট বর্ণিত দেখা যায়। তৎ যথা—

> কৌস্তুভ ব্যপদেশেন স্বাত্মজ্যোতির্বিভর্ত্ত্যজঃ।
> তৎপ্রভাব্যাপিনী সাক্ষাচ্ছ্রীবৎসমুরসাবিভুঃ॥১০
> স্বমায়াং ধনমালাখ্যাং নানাগুণময়ীং দধৎ।
> বাসচ্ছন্দোময়ং পীতং ব্রহ্মসূত্রং ত্রিবৃৎস্বরম্॥১১
> বিভর্ত্তি সাংখ্যং যোগঞ্চ দেবো মকরকুণ্ডলে।
> মৌলিং পদং পারমেষ্ঠ্যং সর্ব্বলোকাভয়ঙ্করম্॥১২
> অব্যাকৃতমনন্তাখ্যমাসনং যদধিষ্ঠিতঃ।
> ধর্ম্মজ্ঞানাদিভির্যুক্তসত্ত্বং পদ্মমিহোচ্যতে॥১৩
> ওজঃ সহোবলযুতং মুখ্যতত্ত্বং গদাং দধৎ।
> অপাং তত্ত্বং দরবরং তেজস্তত্ত্বং সুদর্শনম্॥১৪ ইত্যাদি।

ব্যপদেশেন ছলেন। বিভর্ত্তি ধারণ করেন। উরসা বক্ষে। বনমালা মায়া, ত্রিগুণা বাসবস্ত্র ত্রিবৃৎস্বর প্রণব। মৌলি শিরস্থ শিখিপুচ্ছ অভয়প্রদ পারমেষ্ঠীপদ। অব্যাকৃতা অক্ষুভিতা প্রকৃতি, দরবর শঙ্খ।

লীলামধ্যে বস্ত্রহরণ—বিবস্ত্রা হইয়া স্নান মেয়েরা পূর্ব্বে করিত, এখনও দেখা যায়। পাঁচ বর্ষ বয়স্ক রাখাল কর্ত্তৃক তাহা গ্রহণ কিছু নয়।

রাসলীলা সম্বন্ধে বিচারকালে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, তিনি মাত্র এগার বর্ষ কাল গোপগণ মধ্যে ছিলেন। ইহা পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অষ্টম হইতে একাদশ বর্ষের বালক পরস্ত্রী গমন করিয়াছে, ইহা সম্ভবপর নহে, এ বয়সে রতিবৃত্তির উদ্ভব ঘটে না। কৃষ্ণ-উপনিষদে স্পষ্ট উক্তি রহিয়াছে যে, তপস্বিগণ শ্রীরামচন্দ্রের আলিঙ্গনপ্রার্থী হইলে তিনি পরবর্ত্তী অবতারে তাহাদিগকে কোমলাভঙ্গ আলিঙ্গনসুখ দিতে প্রতিশ্রুত হন (তৎ প্রতিজ্ঞারক্ষার্থই আপন ঐশ্বর্য্যপ্রকাশে ১৬০০০ গোপী-সৃষ্টি, ১৬০০০ কৃষ্ণ সৃষ্টি করিয়া লীলা করিয়াছেন যেন প্রতিবিম্ব বিভ্রম, ইহা ভাগবতেই বর্ণিত আছে। আর যদি রূপক মানা যায়, তবে যে বেদান্ত শাস্ত্রে একই পরমাত্মার সর্ব্বঘটে বিহার, তাহারই প্রকাশক (বেদে আছে যত প্রাণীর যত ইন্দ্রিয়, তাহা ইন্দ্রেরই ইন্দ্রিয় ঋ ৩.৩৭।৯, তিনি প্রতি দেহে ইন্দ্রিয়গণের পরিচালয়িতা, এই জন্য হৃষীকেশ। দেহাভিমানে ভোক্তৃত্ব; যত ভোগ্যদেহ, তাতে তিনিই ভোক্তা। গোপী প্রকৃতি, তাহাতে পুরুষ ভোক্তা—ইহাই রাসলীলার তাৎপর্য্য। অলমিতিবিস্তরেণ।

শতাব্দীর মৃত্যু

শ্রীনীতীশচন্দ্র মজুমদার

রাত্রির অরণ্য মাঝে সমাধির তলে
শতাব্দীর অঙ্গ জ্বলে কাহার অনলে—
সে কি সভ্যতার?
"আরাধনা করেছি যাহার
বহুদিন, বহু বর্ষ ধরি'
পলে পলে মৃত্যু আনে আজ আর্ত্তনাদ করি'
মুমূর্ষু মৃতের মত
অবিরত—"

মানবের আত্মা কহে শুধু
"ভাল লাগে তবু—
ঘুমভাঙ্গা রাতে শোনা শতাব্দীর করুণ বিলাপ—
'সহিতে পারি নে আর সভ্যতার আগ্নেয় উত্তাপ।
অঙ্গ মোর হ'ল ছারখার—
প্রয়োজন নাহি সভ্যতার।'
মানবের আত্মা হাসে প্রেতের মত
ভবিষ্যের ক্রোড়ে দেখে শত [illegible] মৃত

রুশ-জীবনের রূপ

শ্রীসত্যব্রত মুখোপাধ্যায়

অজানাকে জানবার আকুল আগ্রহ যেখানে বাধা পায়, সেখানেই মানুষ খুলে দেয় কল্পনার আঁখি। কল্পনার দৃষ্টিতে মানুষ যা' দেখে, তা' যে সব সময়ে বাস্তবের সঙ্গে খাপ খায় তা' নয়। সুতরাং সে সমস্ত ক্ষেত্রে সত্য বিকৃত হওয়াই স্বাভাবিক। রুশ-জীবনের রূপ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানও অনেকটা সে ধরণের হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যে রাশিয়ার সাধারণ জীবন একদিন ছিল ইয়োরোপের সর্ব্বনিম্ন ধাপে; কি করে এবং কি যাদুস্পর্শে তারাই এগিয়ে গেল সকলের আগে আর কিইবা তার বর্ত্তমান রূপ, তা' জানতে আগ্রহ হওয়া সকলেরই স্বাভাবিক। বিশেষতঃ যারা পড়ে আছে জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যে ও সাবলীলতায় সকলের পেছনে, তাদের তা' জানবার আগ্রহ অন্যের চেয়ে আংশিক বেশী হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের দেশের যারা সর্ব্বহারা, তারা জ্ঞান ও অর্থ, সব কিছুতেই এত নিঃস্ব যে, সে উত্থানের ইতিহাস সমালোচনা দূরে থাক, তাদের জীবনধারা সম্বন্ধেও কল্পনা করা তাদের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার।

রাশিয়ার সম্বন্ধে জান্‌তে হ'লে আমাদের মত নিঃস্ব জাতির বই পড়ে' কল্পনা করা ছাড়া উপায় নাই। কিন্তু সে ধরণের বইএর প্রচলন এদেশে খুবই কম; যা'-ও পাওয়া যায়, সংগ্রহ করে' পড়া বা পয়সা দিয়ে কেনা অনেকের পক্ষেই অসাধ্য। সেই জন্যই রাশিয়াকে 'স্বপন দেশের সুন্দরী'; 'রহস্যের রঙ্‌মহল' প্রভৃতি উদ্ভট আখ্যায় আখ্যায়িত করা হয়। আবার অনেককেই আপ্‌শোষ করতে শোনা যায় যে, রাশিয়ায় নাকি অজ্ঞাত ভাষার তথ্যবহুল একখানা বই আছে, তাতে অনেক কিছু জানবার; কিন্তু কি রহস্য আছে, সেখানে আমাদের তা জানবার উপায় নাই। এমনি আরও কত কি!

যাই হোক, রাশিয়ার জীবনের মোটামুটি একটু আভাষ দিতে চেষ্টা করব—সবিস্তারে বলতে গেলে প্রবন্ধ না হ'য়ে এক ব[illegible] হয় যায়। প্রথমেই ধরি, জন্ম। অন্যান্য সভ্য দেশের মত হাসপাতাল বা ধাত্রী ডেকে মেয়েদের প্রসব করান হয়; কিন্তু ধরণ অতি উচ্চ। আবশ্যকীয় ঔষধপত্রের জন্য কোনও পয়সা খরচ করতে হয় না, ষ্টেট্ হ'তেই তা' পাওয়া যায়। ধাত্রীদের সনদের জন্য পরীক্ষা পাস করতে হয়; সনদ ব্যতীত কাহাকেও ধাত্রীর কাজ করতে দেওয়া হয় না। ধাত্রীরাও ষ্টেট্ হতেই মাহিনা পায়। স্বাধীন শিক্ষা তাদের এতটা উঁচুতে নিয়ে গেছে যে, ধাত্রীরা কখনও বেশী খাটুনীর অজুহাতে বক্‌শিসের দাবী ত করেই না, উপরন্তু কেউ দিতে চাইলেও তা' ঘৃণাভরেই প্রত্যাখ্যান করে।

প্রসূতিদের কষ্টলাঘবের জন্য রাশিয়া সর্ব্ববিধ আয়োজন করে' রেখেছে। ১৯৩৪ সালে রাশিয়ায় এক প্রকার ইন্‌জেক্‌সন্ আবিষ্কার করেছে, যা' প্রসূতিদের প্রসববাথারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োগ করলে প্রসবব্যথা কমে' যায় ও শরীরের কোনও যন্ত্রের ক্ষতি না করে' সুখপ্রসবে সাহায্য করে।

প্রত্যেক পিতামাতাই প্রথম ও দ্বিতীয় সন্তান পালন করতে বাধ্য। তৃতীয় সন্তানের ভরণপোষণের ও শিক্ষার আবশ্যকীয় ব্যয়ের অর্দ্ধেক দিবে পিতামাতা ও অর্দ্ধেক দিবে ষ্টেট্। তৃতীয় সন্তানের পরে আর যত সন্তান হবে, ষ্টেট্‌ই তাদের ব্যয় বহন করবে। যে সমস্ত দেশ বেকার-সমস্যাসমাধানের জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণে পিতামাতাকে উৎসাহিত করে, তাদের দৃষ্টি আমি রাশিয়ার জনসংখ্যা-বৃদ্ধির জন্য উল্লিখিত উৎসাহদানের দিকে আকর্ষণ করছি।

রাশিয়ার প্রত্যেক ছেলেমেয়ের ষোল বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক। এ অল্প সময়ের মধ্যেই তারা আমাদের দেশের বি.এ., বি.এস্‌সি.র মান পর্য্যন্ত শিক্ষা লাভ করে। তাদের সে শিক্ষার আরও একটু বৈশিষ্ট্য এই যে, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, রসায়ন, দর্শন, ভূগোল, ইতিহাস, তর্কশাস্ত্র, সাহিত্য, অঙ্ক প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়েই শিক্ষা গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। আমাদের

দেশে যারা বিজ্ঞান পড়ে, কলাশাস্ত্র তাদের কাছে অজানা থাকে; আর যারা কলাশাস্ত্র পড়ে, বিজ্ঞানের ধারও তারা ধারে না; কিন্তু রাশিয়ায় উভয় শিক্ষাই এক সঙ্গে চলে।

এস্থলে রাশিয়ার শিশুশিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু না বললে, বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়। রাশিয়ার শিশুশিক্ষার ব্যবস্থা অতি মনোজ্ঞ। মানবজীবনের ভিত্তি রচিত হয় শিশু-শিক্ষাতেই—এই কথাটি রাশিয়ার মত অন্য কোনও দেশ এমন কার্য্যকরী ভাবে গ্রহণ করতে পেরেছে কিনা সন্দেহ। শিশুদের জন্য বিদ্যালয়ও স্বতন্ত্র। প্রত্যহ সকালে শিশুরা বিদ্যায়তনে আসে। মেয়েদেরই সাধারণতঃ সে-সব বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ করা হয়। কারণ শিশুদের অন্তর নারীর মত পুরুষ বুঝতে পারে না। প্রতি মাসের নির্দিষ্ট সময়ে ডাক্তার শিশুদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করে। শিশুদের নিদ্রা ও খাদ্যের উপর সেখানে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। ছোট শিশুদের চুপ করে' থাকা, খেলা-ধূলা ও বর্ণপরিচয় প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় আবার প্রত্যেককে বাড়ী পৌঁছে দেওয়া হয়।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বলেছিলেন যে, আমাদের দেশের ছেলেরা যখন এম্.এ. বা এম্.এস্‌সি. পাস করে, তখনই তারা লাভ করে সত্যিকার জ্ঞানার্জ্জনের ক্ষমতা। কিন্তু আমাদের যে এমনি দুর্ভাগ্য, কার্য্যতঃ সেইখানেই হয় আমাদের শিক্ষার পরিসমাপ্তি। আমরা অবশ্য কল্পনাও করতে পারি না যে, রুশের ছেলেমেয়েরা কি করে' এত অল্প বয়সে এত বেশী শিক্ষালাভ করে। তাদের শিক্ষাপ্রণালী এতই সুন্দর ও সহজ যে, সত্যই তা' সম্ভব হয়। আচার্য্য রায়ের কথায় বলতে গেলে এইটুকু বলা চলে যে, রাশিয়ার বাধ্যতামূলক শিক্ষা শেষ করলেই তাদের প্রায় প্রকৃত জ্ঞানার্জ্জনের ক্ষমতা জন্মে। বাধ্যতামূলক শিক্ষার পরে শতকরা অল্প কিছু ছাড়া প্রায় সকলেই উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য পড়াশুনা করে। সুতরাং তাদের উচ্চ শিক্ষা যে কত উচ্চ, তা' সহজেই অনুমেয়।

রুশ-জীবনের প্রত্যেকটি স্তরেই ব্যক্তি স্বাধীনতার স্পষ্ট অভিব্যক্তি দেখা যায়। স্কুলের ছাত্রেরাই তাদের শিক্ষক নির্ব্বাচিত করে। অধিকাংশ ছাত্র যে শিক্ষককে পছন্দ করে না, সে শিক্ষককে অপসারিত করার ব্যবস্থা আছে। কাজে কাজেই শিক্ষক সব সময়ে ছাত্রদের সুখ, সন্তুষ্টি ও শিক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখতে বাধ্য হন। অবশ্য শিক্ষকতা না থাক্‌লেও, ষ্টেট তাকে অন্য কাজে নিযুক্ত করতে বাধ্য; কিন্তু অক্ষমতার অপযশঃ তারা গায়ে মাখাকে খুবই ঘৃণার চোখে দেখে। সে জন্যই শিক্ষকরা ছাত্রদের মৈত্রীর মধ্য দিয়ে অধ্যাপনা করতে চেষ্টা করেন। তা' ছাড়া আমাদের মত তাদের বিদেশী ভাষায় লেখাপড়া করতে হয় না। বিদেশী ভাষায় যা' এক মাসে আয়ত্ত করা যায়, মাতৃভাষায় সেই বিষয়ই একচতুর্থাংশ সময়ে আয়ত্তে আসে। ভূগোল প্রভৃতি কতকগুলি বিষয় তাদের ছায়াচিত্রের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হয়। যে ভূগোল আমাদের দেশে নীরস বিষয় বলে' শতকরা অতি অল্প ছাত্রই ভাল ভাবে পড়ে, তাকেই রাশিয়া ছায়াচিত্রযোগে এমন সরস ও সুন্দর করে' তুলেছে যে, প্রত্যেকটি ছাত্র ভূগোলে বেশ চমৎকার জ্ঞান অর্জ্জন করে। এমনি করে' পাঠ্য বিষয়কে যদি সহজ ও সরস করে' তোলার ব্যবস্থা থাকে আর ছাত্র শিক্ষকের মধ্যে থাকে আন্তরিকতা, তা' হ'লে অল্পদিনে বেশী শিক্ষা করা কারও পক্ষেই অসম্ভব কিছু নয়।

রুশ-ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া হয় তিন প্রকার—(ক) সংস্কৃতিমূলক (খ) শরীরবিষয়ক ও (গ) বৃত্তিমূলক। সংস্কৃতিমূলক শিক্ষার কথা বলা হ'য়েছে, এবার বাকী দু'টি সম্বন্ধে আভাস দিব। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে অন্যান্য শিক্ষা হ'তেও শরীরবিষয়ক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যচর্চ্চার দিকে বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়। প্রতি সপ্তাহের নির্দিষ্ট সময়ে ছাত্রদের বিশেষজ্ঞের নিকট শরীরবিষয়ক শিক্ষা নিতে হয় ও প্রত্যহ উপযুক্ত সময়ে শরীরচর্চ্চা অবশ্যকর্ত্তব্য। উক্ত বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দেওয়ার জন্য পদক-পারিতোষিকের ব্যবস্থা আছে।

বৃত্তিমূলক শিক্ষাও ছাত্রদের বাধ্যতামূলক। প্রত্যেক ছাত্রকেই নিজ নিজ রুচির অনুযায়ী যে কোনও একটা বৃত্তি শিক্ষা করতে হয়, যাতে বাধ্যতামূলক শিক্ষা সমাপনান্তে যারা উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য না যায়, তারা কাজ শেখার জন্য বৃথা সময় নষ্ট না করে' কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারে। অভিজ্ঞ শিক্ষকের পরিচালনায় ছাত্রেরা কল, কারখানা, ষ্টুডিও, [illegible]রি প্রভৃতি

দেখতে যায়। শিক্ষকের সতর্ক দৃষ্টি থাকে ছাত্রদের রুচির উপর—কোন শিল্প বা কোন প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে তাদের কিরূপ মতামত। উল্লিখিত উপায়ে ছাত্রবৃত্তিমূলক শিক্ষার বিষয় নির্ব্বাচিত হয় এবং পরীক্ষামূলক ভাবে তাদের সে সব বিষয় শিখতে দেওয়া হয়। কিছুদিন কোনও একটা বিষয়ে শিক্ষালাভের পর ছাত্র যদি তা' তার রুচির প্রতিকুল বলে' মনে করে, তখনই সেই বিষয় সে বদলে নিতে পারে। বাধ্যতামূলক শিক্ষাশেষের সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেক ছাত্রকেই বৃত্তিমূলক শিক্ষার সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। সেই সার্টিফিকেটানুযায়ী ষ্টেট্ তাদের কাজে নিযুক্ত করে।

বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা ও খরচাদি ষ্টেট্ই বহন করে। যারা উচ্চ শিক্ষার অভিলাষী হয়, তাদের তা' নিজ খরচেই করতে হয়। তবে মেধাবী ছাত্রদের জন্য উপযুক্ত সাহায্যের ব্যবস্থা আছে। যারা প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হবে বা এমনি ধরণের কোনও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা-দ্বারা বৃত্তিভোগী ছাত্রদের তালিকা স্থিরীকৃত হয়।

উপযুক্ত বয়সে বিবাহ করার জন্য পুরুষ-নারী সকলকেই উৎসাহ দেওয়া হয়। এমন কি উচ্চ শিক্ষার বিদ্যায়তনের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর বাস করার মত পৃথক্ ছাত্রাবাস আছে। স্বামী-স্ত্রী দু'জনের যে কোনও একজন সেখানকার ছাত্র হ'লেই সে সব ছাত্রাবাসে থাকতে পারে। যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়েই বিদ্যায়তনের বিদ্যার্থী হয়, তা' হ'লে ত কোন কথাই থাকে না। বিদ্যায়তনের সঙ্গেই বিবাহিত ছাত্র-ছাত্রীদের সন্তানপালনের জন্য "নার্সিং হোম" আছে।

আমাদের অনেকের ধারণা—ছেলে পড়ছে, সুতরাং বিয়ে দিলে পড়ার ক্ষতি হ'বে বা বিয়ে দিলেও, পাঠ্যাবস্থায় বৌ-ছেলেকে একত্রে বাস করতে দিলে তা' পড়ার পক্ষে মারাত্মক হ'য়ে দাঁড়াবে। কিন্তু রাশিয়ার চিন্তাবীরেরা বহু অনুসন্ধানের পর, যা' স্থির করেছে, তা' আমাদের ধারণার ঠিক বিপরীত। তারা বলে, যাদের পরিণত বয়সের পরও উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকৃতে হয়, তারা উপযুক্ত সময়ে বিয়ে না করলে বিদ্যাশিক্ষায় আশানুরূপ ফললাভ করতে পারে না। কারণ অনেক সময়ে তাদের যৌনক্ষুধাসম্ভূত [illegible] বিভিন্ন ব্যাধিগ্রস্ত হ'তে ও যুব-সুলভ প্রেমচিন্তায় কালাতিপাত করতে দেখা যায়—যাতে তাদের মনের একাগ্রতা ভেঙ্গে যায় ও অন্তর হ'য়ে উঠে চঞ্চল। আর যারা বিয়ে করে'ও নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করে, তাদের অবস্থা আরও খারাপ হয় বলে'ই তাঁরা বলেন। দূরগত প্রিয়া বা প্রিয়জনের উদ্দেশ্যে দীর্ঘশ্বাস ও মনস্তাপেই তাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি কেটে যায়।

উচ্চশিক্ষাসমাপনান্তে যে যে বিষয়ে যারা মেধাবী বলে' বিবেচিত হয়, তাদের ষ্টেট হ'তে সে সব বিষয়ের চর্চ্চার জন্য নিয়োগ করা হয়। যারা কবি, তারা অকুণ্ঠ চিত্তে গেয়ে যাবে ভবিষ্যের গান, সাহিত্যিক সৃষ্টি করবে সভ্যতার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নক্সা, বৈজ্ঞানিক খুঁজে বেড়াবে আবিষ্কারের আভাষ, কৃষি, শিল্পবিৎ প্রভৃতি চালিয়ে যাবে তাদের গবেষণা। এমনি করে' প্রত্যেক বিভাগের গবেষণা চল্‌তে থাকে অনিবার; প্রতি বৎসর নূতন নূতন প্রতিভা এসে তাদের শক্তিবৃদ্ধি করে'ই চলেছে। মস্কো প্রভৃতি কয়েক স্থানে গবেষণার কেন্দ্রীয় সমিতি আছে। একটা নির্দ্ধারিত সময়ে প্রত্যেক বিভাগের গবেষণায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের সভায় উপস্থিত হ'য়ে নিজেদের গবেষণা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে হয়। ফলে বিজ্ঞান বা কোনও বিষয়ে যদি কেহ কোন নূতন তথ্যের আভায দিতে পারে, অন্যান্য সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তাকে ক'রে তোলে দ্রুত ফলপ্রসূ ও জনহিতকর। অবশ্য বুর্জ্জুয়া দেশের মত আবিষ্কারকের ব্যক্তিগত কোনও স্বার্থ তার নিজস্ব আবিষ্কারের উপর থাকে না বা আবিষ্কারের মূল সূত্রটি গোপন রাখবার মত কোনও প্রশ্রয় সেখানে দেওয়া হয় না; প্রত্যেক আবিষ্কারক তার গবেষণার প্রত্যেকটি তথ্য কেন্দ্রীয় সমিতিতে ব্যাখ্যা করতে বাধ্য।

মনে করুন—একজন রাসায়নিক বিশ্লেষণ করলেন—পেঁয়াজে কি কি উপাদান আছে। অন্যান্য সকল গবেষণাকারী তা' জান্‌তে পারল এবং তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাকে প্রয়োগ করতে চেষ্টা করল। কৃষিবিৎ পেঁয়াজে এমন সার প্রয়োগ করতে লাগল, যাতে সেই সব উপাদান প্রচুর পরিমাণে আছে। রঞ্জনবিশারদ তথ্যটি নিয়ে ভেবে দেখলেন যে, কাপড় রং করতেও সেই সমস্ত উপাদান ব্যবহৃত হয়; সুতরাং তার পরিবর্ত্তে পেঁয়াজ ব্যবহার

করলে অতি অল্প খরচেই রং করা হয়। এমনি করে'ই এক একটি আবিষ্কৃত তথ্যকে বিভিন্ন ভাবে রাশিয়া কাজে লাগাবার সুবিধা পায়।

কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক সকলেই ষ্টেট্ হ'তে পারিশ্রমিক পায়। তাদের লিখিত বই ও সংবাদপত্রাদি রাশিয়ার প্রচলিত প্রত্যেক ভাষায় অনুদিত হ'য়ে সাধারণের নিকট আত্মপ্রকাশ করে। জাতির শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি এদেরই একটি সমিতির উপর ন্যস্ত।

শ্রম রাশিয়ায় বাধ্যতামূলক। পুরুষ-নারীর কোনও অধিকারের স্বাতন্ত্র্য সেখানে নাই। অধিবাসীরা কাজ করবে, ষ্টেট্ তাদের বাঁচিয়ে রাখবে—পরস্পর পরস্পরের নিকট যেন অঙ্গীকারবদ্ধ। সারা পৃথিবীর মধ্যে এক মাত্র রাশিয়ার অভিধানেই বেকার শব্দের উল্লেখ নাই; তা'ছাড়া সর্ব্বত্রই এর অস্তিত্ব সমাজের অঙ্গে দুষ্ট ক্ষতের মত পীড়া দিচ্ছে। শিক্ষাসমাপনান্তে আপন আপন বৃত্তিমূলক শিক্ষার সার্টিফিকেট দাখিল করে'ই তারা খালাস—ষ্টেট্ তাদের সার্টিফিকেটানুযায়ী কাজ দিতে বাধ্য।

মনে করুন—বাধ্যতামূলক শিক্ষার সময়ে বৃত্তি হিসাবে আমি তাঁতের কাজ শিখেছিলাম। আমার শিক্ষাশেষে আমাকে কাপড়ের কলের বয়নবিভাগে নিয়োগ করা হ'ল। রাশিয়ায় সাধারণতঃ শ্রমিকদের ছয় ঘণ্টা কাজ করতে হয়। এই ছয় ঘণ্টার মধ্যেও চার ঘণ্টা Practical ও দু'ঘণ্টা Theoretical training নিতে হবে। উক্ত বিভাগের পাঠ্য আমার যখন শেষ হ'য়ে যাবে, তখনই আমাকে অন্য বিভাগে বদ্‌লি করে' দেওয়া হবে। ক্রমে ক্রমে কটন্ মিল হ'তে আমি গেলাম লোহার কারখানায়, লোহার কারখানা হ'তে ঔষধ তৈরির কারখানায়। এমনি করে উপযুক্ত বয়সে বৃদ্ধ বয়সের মাসোহারা নিয়ে আমি যখন ঘরে গিয়ে বসলাম, তখন হিসাব করে' দেখলাম যে, যে অভিজ্ঞতা নিয়ে আমি ঘরে ফিরলাম তা' যে কোনও লোকের পক্ষে গর্ব্বের বিষয় এবং সে অভিজ্ঞতা দিয়ে আমি বিনা দৈহিক পরিশ্রমে দেশের ও দশের যথেষ্ট উপকার করতে পারি। এমনি ধরণের অভিজ্ঞ লোক রাশিয়া ছাড়া অন্যত্র খুব বিরল নয় কি?

অনেকে হয়ত মনে করতে পারেন যে, কারখানা যখন ষ্টেটের বলে' বিবেচিত হয়, নিশ্চয়ই তার উপরে ষ্টেটের একটা অপ্রতিহত ক্ষমতা আছে। কিন্তু সত্যি তা' নয়। ষ্টেটেরই উদ্যোগে তৈরি হবে কারখানা, কিন্তু তা' চালিত হবে শ্রমিকদের দ্বারাই। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক কারখানার শ্রমিকরাই মালিক। প্রত্যেক বিভাগের ইন্-চার্জ্জ প্রভৃতি নিজেরাই মনোনীত করে নিজেদের মধ্য হ'তে আর প্রত্যেক বিভাগ একসঙ্গে মনোনীত করে তাদের ম্যানেজার প্রভৃতি।

রাশিয়ার এই ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে ভুল বুঝবার অবকাশ নাই। তাদের নির্ব্বাচনপ্রণালী ও ধারা কোনও বুর্জ্জুয়া দেশের মতও নয়। নির্দ্দিষ্ট কয়েক মাস অন্তর প্রত্যেক নির্ব্বাচিত লোককে তার সহকারী শ্রমিকদের নিকট জবাবদিহি করতে হয়, হিসাব দিতে হয় এই কয় মাসের জন্য সে তাদের জন্য কি করেছে? যদি নির্ব্বাচিতের বিরুদ্ধে কারও কোন অভিযোগ থাকে, উক্ত কমিটীতে সে তা' প্রকাশ করতে পারে। অভিযোগ প্রমাণিত হ'লে, নির্ব্বাচিত ব্যক্তিকে শাস্তি নিতে হ'বে। শাস্তিও নির্দ্ধারিত হবে কমিটীর নির্দ্দেশানুযায়ী। এই সমস্ত কমিটীর নাম "লিন্‌চিন্ কমিটী"।

"লিন্‌চিন্ কমিটী" সম্বন্ধে আমার একটি ঘটনা জানা আছে; এখানে ব্যক্ত করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। এক কমিটীতে জনৈকা স্কুল-পরিদর্শিকার কাজের হিসাব তলব করা হ'ল। তিনি সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিয়ে বসলেন। সভার তরফ হ'তে কোনও অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে এল না, কেবলমাত্র তাঁর এক বান্ধবী দাঁড়িয়ে বললেন—"আমি জানি, একদিন কাজের সময়ে ইনি আমার বাড়ীতে বসে' গল্প করে' কাটিয়েছেন।" পরিদর্শিকা সে অভিযোগ অস্বীকার করতে পারলেন না। তার জন্য বিচারে তাঁকে সতর্ক করে' সে যাত্রা রেহাই দেওয়া হ'ল। আমাদের দেশ হ'লে সম্ভবতঃ এমন ধরণের বান্ধবীকে বিশ্বাসঘাতক বলে'ই অভিহিত করা হ'ত। কিন্তু সেখানে মানুষের মনোবৃত্তিই অন্য রকম। স্বাধীন মতের অবাধ অভিব্যক্তির মূল্য তারা দিতে জানে, আমরা জানি কিনা সন্দেহ।

আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের প্রাচুর্য্যে রাশিয়া আজ অতি সমৃদ্ধ। তবে বুর্জ্জুয়া দেশে নূতন যন্ত্রপাতির আবিষ্কারের ফলে লাভবান্ হয় ধনী এবং বেকারের খাতায় সংখ্যা যায় বেড়ে; কিন্তু রাশিয়ায় এর কোনটাই হয় না, সেখানে হয় শ্রম-লাঘব। মনে করুন—কলিকাতা সহরের কাপড়ের চাহিদা মিটাতে রোজ পাঁচহাজার গজ কাপড় দরকার। বর্ত্তমানে পাঁচশত তাঁতী ১০ ঘণ্টা দৈনিক ঠক্‌ঠকী তাঁত চালিয়ে দাবী মিটাচ্ছে। যদি ঠক্‌ঠকী তাঁত তুলে দিয়ে সেখানে power loom বসান হয়, তবে আমরা ৪০০শত তাঁতীকে জবাব দিয়ে ১০০শত তাঁতীকে দিয়েই ১০ ঘণ্টা কাজ করিয়ে ঈপ্সিত পাঁচ হাজার গজ কাপড় বুনে নিব, কিন্তু রাশিয়ায় নূতন কোনও আবিষ্কারের ফলে কলের উৎপাদনশক্তি যদি বেড়ে যায়, তবে তারা লোক সমান রেখেই অনুপাতানুসারে শ্রমের সময় কমিয়ে দিয়ে আবশ্যকীয় জিনিষ তৈরি করে' নেয়। সেই জন্যই তারা সম্ভবতঃ শ্রমিকদের চার ঘণ্টা দৈনিক শ্রম করিয়ে দু' ঘণ্টা করে theoretical শিক্ষা দিতে সক্ষম হয়।

কৃষিপ্রধান দেশ সাধারণতঃ গরীব হয় আর শিল্প প্রধান দেশ হয় সমৃদ্ধ। তাই রাশিয়া জারের কবল হ'তে মুক্ত হবার পর হ'তেই কৃষিকে শিল্পে উন্নয়নের চেষ্টা করছে। সম্প্রতি মস্কো হ'তে প্রচারিত এক বেতার বক্তৃতায় আমরা জানলাম যে, রাশিয়ায় কৃষি-উন্নয়ন সমাপ্ত হ'য়েছে। তারা এবার শিল্পোন্নয়নের উদ্দেশ্যে নূতন পরিকল্পনানুযায়ী কাজ আরম্ভ করবে। যে রাশিয়ায় দুর্ভিক্ষ ছিল প্রতি বর্ষের দুর্নিবার অতিথি, সেই দেশই সারা বিশ্বকে শুম্ভিত করে' প্রকাশ করেছিল যে, যুদ্ধ যদি না বাধত, তা' হ'লে তারা রুটি জল সাধারণকে বিনা পয়সায় বিতরণ করতে সক্ষম হ'ত। কোথায় দুর্ভিক্ষ আর কোথায় বা বিনা পয়সায় রুটি—এত অল্প সময়ের মধ্যে এতটা অভাবিত উন্নতি যে, আমরা কল্পনাও করতে পারি না।

জল-চলাচলের প্রতিকূল হ'তে পারে, এমন ধরণের চলাচলের রাস্তা ও রেলপথ প্রভৃতি আবশ্যক বোধে তারা মাটির নীচে টিউব করে' নিয়েছে। যে সমস্ত স্থান জলাভাবে [illegible]র, তার উপর দিয়ে তারা চালিয়ে দিয়েছে খরস্রোতা নদীর গতি। কোন জমিই কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় এবং সব কিছুই ষ্টেটের ও অনুমোদিত সঙ্ঘের; সে জন্যই কৃষির উন্নতি সেখানে এতটা দ্রুত সম্ভবপর হয়েছে। অল্প খরচে অধিক উর্ব্বর সার বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিকরা আবিষ্কার করে' কৃষিকে নিয়ে গেছে দ্রুত উন্নতির পথে। উল্লিখিত প্রথায় সমগ্র দেশকে উর্ব্বর করে'ও তারা আজ আরও চাষের উপযোগী জমি চায়। অবশ্য এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, মেরু অঞ্চলের দিকে রাশিয়ার এলাকাধীন কিছু জমি আছে, যাতে সারা বৎসরই বরফ জমে থাকে, তাতে চাষ আবাদ চলে না। তবে সুখের বিষয় এই যে, হিটলারের মত তারা অস্ত্র হাতে নিয়ে চাষের উপযোগী জমি খুঁজতে বেরোয় নি, বিজ্ঞানের সাধনায় তারা নিজ অধিকারের মধ্যেই তা' পূরণ করতে সমর্থ হ'য়েছে। শুনে হয়ত সকলের পক্ষে বিশ্বাস করা সম্ভব হ'বে না যে, দু'তিন তলা মঞ্চের উপর পর্য্যন্ত চাষ করে' তারা প্রচুর শস্যোৎপাদন করছে।

মাটিতে হয়ত কপির চাষ করেছে; তারই চার হাত উপরে মঞ্চোপরি চাষ করেছে বীট; তার খানিক উপরে আলু; তার উপরে পালং। মঞ্চের উপর ইট পাট্‌কেল জড় করে তাতে পাতলা এক পরতা সার মিশ্রিত মাটিতে চাষ হচ্ছে। কৃত্রিম উপায়ে সূর্য্যরশ্মি সরবরাহ করে' তাকে যোগান দেয় বেড়ে উঠার উপাদান। কৃষিক্ষেত্রের কিছু দূরে দূরেই গভীর নলকূপ আছে, তাতে অস্থায়ী বৈদ্যুতিক পাম্প বসিয়ে সারা মাঠ ভাসিয়ে দিয়ে যায়।

কো-অপারেটিভ সোসাইটির তত্ত্বাবধানে চাষ আবাদ হ'চ্ছে। তারাই শস্য সংগ্রহ করে' প্রয়োজনমত দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দেয়। কো-অপারেটিভ সোসাইটির পরস্পরের সহিত যোগাযোগ এমনই সুস্পষ্ট যে, চাহিদার অতিরিক্ত যাতে উৎপন্ন করা না হয়, তার দিকেও তাদের দৃষ্টি আছে। বাংলার পাটচাষীর মত ভবিষ্যৎ না ভেবে উৎপন্ন করে' পরের মুখের দিকে তারা তাকিয়ে থাকে না।

বিক্রয়ের ব্যাপারও সব কিছুই কো-অপারেটিভ পরিচালনা করে। প্রত্যেকেই যথা-প্রয়োজন কিন্‌তে

পারে। খুব বেশী অপব্যয়ী না হ'লে, পয়সার অভাব সেখানে কারও নাই। পুরুষ-নারী প্রাপ্তবয়স্ক সকলেই উপার্জ্জন করে। 'একা উপায় করি ৫০৲, খেতে ১৪ জন' —এমন ধরণের কথা আজকাল রাশিয়ার কোন নগণ্য কোণেও শুনতে পাওয়া যায় না। সন্তানও ২৷৷০ টার বেশী হ'লে, ষ্টেট ভরণপোষণের খরচ দেয়। তাদের প্রত্যেকটি শ্রমিকের গড়ে মাসিক আয় ১৯৪০ সালে ছিল সাড়ে চারি শত টাকা। সুতরাং তাদের দেশে বই কিনে পড়া, থিয়েটার, বায়স্কোপ দেখা ও জীবনকে আনন্দে মগ্ন রাখা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

মানুষ সেখানে এতটা ব্যক্তিস্বাধীনতা ও এতটা স্বচ্ছল হওয়া সত্বেও, তারা যে অপরাধ করে না তা' নয়। রাশিয়ায় অপরাধীর শাস্তির ব্যবস্থাও অন্য সব কিছুর মত অদ্ভুত। কোনও অপরাধ করলে তাদের জেল হয়। জেল বলতে বড় বড় প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, সঙ্গীনধারী পুলিস-পাহারা মোতায়ন করা কিছুর কল্পনা করলে অবশ্য ভুল হ'বে। সামান্য দু'ফেবৃতা তারের বেড়া দেওয়া একটা পল্লীর মত দেখতে তার বাহ্যিক অবয়ব। তারের বেড়াটা যেন সীমা-নির্দ্দেশের জন্যই দেওয়া হয়। পল্লীর ভিতরে সব কিছুই আছে—হাট-বাজার, কারখানা, শিক্ষা ও আনন্দের সব কিছুই। কয়েদীরা কাজ করে কারখানায়, শ্রমের মূল্যও পায় সকলের মতই। শুধু বাইরের সঙ্গে পার্থক্য এই যে, কয়েদীদের জেলের ভিতরেই স্থাপিত নৈতিক শিক্ষাপীঠে লেক্‌চার শুনতে হয়। প্রশ্ন হ'তে পারে—তবে শাস্তি হ'ল কই? কথাটি সত্যই, আমাদের কাছে এ শাস্তি বলে' মনে করার মত অবস্থা আজও আসেনি। এ সব জেলে কয়েদীরা ইচ্ছা করলে সপরিবারেও থাকতে পারে। তবে স্বামীর অপরাধে স্ত্রী সেখানে অতি অল্পক্ষেত্রেই কয়েদখানায় যেতে রাজী হয় বা স্ত্রীর অপরাধে স্বামীও তা' চায় না। তা' হ'লেও স্বামীস্ত্রী অস্থায়ী ভাবে স্বামীস্ত্রীরূপে দেখা করার সুবিধা আছে। কয়েদীরা বৎসরে একবার সপরিবারে রাশিয়াভ্রমণের সুযোগ পায়। যখনই জেলার বিবেচনা করে যে, অপরাধী তার অপরাধ বুঝতে পেরেছে এবং সংশোধন হয়ে গেছে, তখনই তাদের মুক্তি দেওয়া হয়।

এবার বলব—এ জেলে তাদের শাস্তি কিসে হয়। সাধারণতঃ বেশ্যাপল্লীকে মানুষ যেমন ঘৃণার চোখে দেখে, তেমনি রাশিয়ানরা কয়েদী ও জেলকে অনুরূপ ঘৃণার দৃষ্টিতেই দেখে। ওখানে যাওয়াই যে ঘৃণার ব্যাপার, তা' সকলের অন্তরেই সদা জাগরূক। এই ঘৃণা যদিও অশিক্ষিত মানুষের তেমন গায়ে বাধে না, কিন্তু শিক্ষিত লোকের প্রাণে তা' বিশেষ ভাবেই লাগে। রাশিয়ায় বর্ত্তমানে উক্ত ধরণের অশিক্ষিত আর নাই। তাদের বিবেক সাধারণের দৃষ্টির তলে এমন সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠে যে, তাই তাদের সব চেয়ে বড় শাস্তি।

বিবাহিত জীবনযাপনের জন্য রাশিয়ায় উৎসাহ দেওয়া হয়। যুবক ও যুবতীর অন্তরের মিল হ'লেই তাদের মধ্যে বিবাহবন্ধন হ'তে পারে। বিবাহ-বিচ্ছেদের নিয়মেরও কড়াকড়ি আদৌ নাই। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের এক পক্ষ বিবাহ-বিচ্ছেদের পক্ষপাতী হ'লেই তা' সম্ভব হ'তে পারে; কিন্তু তার সর্ত্তটি একটু জটিল। বিচ্ছেদকামী পক্ষকেই সমস্ত সন্তানসন্ততির ব্যয়ভার বহন করতে হয়। একদল সন্তান সহ যদি কোনও যুবতী বিবাহ-বিচ্ছেদের পর পৃথক্‌ হ'য়ে দাঁড়ায়, এমন অতি অল্প যুবকই আছে যারা পরের ছেলেকে পরিবারভুক্ত করে' বিবাহিত জীবনযাপনে ইচ্ছুক হয়। সুতরাং যাদের ছেলেমেয়ে হয়েছে, তেমন দম্পতি অনিবার্য্য কারণ ছাড়া বিবাহ-বিচ্ছেদের পক্ষপাতী হয় না। সন্তানহীন যুবকযুবতীর মধ্যেই বিচ্ছেদের প্রাচুর্য্য কিছু বেশী দেখা যায়।

রাশিয়ায় লোক-শিক্ষার ব্যবস্থা অতি সুন্দর। জাতীয় নাট্যপরিষৎ রাশিয়ার সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত আছে। তারা তাদের এলাকায় লোক-শিক্ষামূলক অভিনয় করে' বেড়ায়। এসব অভিনয় দেখতে কারও পয়সা খরচ হয় না। আসনের তারতম্য বলে' কোনও জিনিষই সেখানে নাই। নাট্য-পরিষদের অভিনেতারা এমনই দক্ষ যে, সাধারণ ইহা কোনও প্রকার প্রচার বলে' মনে করবার অবকাশ পায় না। অভিনয়ের নাটকগুলি বিপ্লবী সাহিত্যিকদের রচিত এবং কেন্দ্রীয় পরিষদের অনুমোদিত। তা'ছাড়া রাশিয়ার সর্ব্বত্র থিয়েটার বায়স্কোপ যথোপযুক্ত আছে। সে সবের মালিকও ষ্টেট অর্থাৎ জনসাধারণ।

এবার কিরূপে তাদের শ্রমের মূল্য নির্ণীত হয়, তা' বলব। কোনও উৎপন্ন জিনিষের কাঁচামালের মূল্য বাদ দিয়ে যা' থাকে, তাই সেখানে শ্রমের মূল্য। মনে করুন, পাঁচ সের তুলা এক টাকা দিয়ে কিনা হ'ল। ঐ তুলা দিয়ে তৈরি হ'ল চার জোড়া কাপড়। কাপড়ের মূল্য নির্ণীত হ'বে শ্রমের মূল্যের উপর। দেখা গেল, এই চার জোড়া কাপড় তৈরি করতে সব রকমে মিলিয়ে মোট কুড়ি ঘণ্টার শ্রম আবশ্যক হ'য়েছে। যদি প্রতি ঘণ্টার শ্রমের মূল্য আট আনা করে' ধরা হয়, তবে কাপড়ের দাম দাঁড়ায় এগার টাকা, ইচ্ছা করলে চার জোড়া কাপড়ের মূল্য ৪১৲ টাকাও ধরতে পারি। শ্রমিকদের যত বেশী হারে পারিশ্রমিক দেওয়া সম্ভব হ'বে, ততই তাদের কেনার ক্ষমতাও বেড়ে যাবে; অবশ্য শ্রমিকদের দেয় পারিশ্রমিক-নির্দ্ধারণের জন্য ক্ষেত্র-বিশেষে বিবিধ পন্থা অনুসৃত হয়; কিন্তু তার মূল সূত্রটি এই।

তা'ছাড়া শ্রমিকদের মধ্যেও আয়ের তারতম্য দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ রাশিয়ায় বাধ্যতামূলক শিক্ষা-শেষের পরই কার্য্যকালের আরম্ভ হয়। যারা বাধ্যতামূলক শিক্ষা-শেষের পরও উচ্চ শিক্ষায় সময় কাটায়, তাদের সে সময়ের শ্রমের মূল্য শিক্ষাসমাপনান্তে দেওয়া হয়। মনে করুন, কুড়ি বৎসর বয়স হ'তে পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাদের কার্য্যকাল নির্দ্দিষ্ট থাকে। যারা ছাব্বিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত উচ্চশিক্ষায় অতিবাহিত করল বা তার বেশী বয়স পর্য্যন্ত বিদ্যায়তনের গণ্ডীর মধ্যে রইল, তারা প্রকৃতপক্ষে সেই কয় বৎসরের উপার্জ্জন হ'তে বঞ্চিত রইল। সেই কারণেই যখন শিক্ষা শেষ করে' তারা কর্ম্মজীবনে আসে, তখন সেই কয় বৎসরের মোটামুটি আয়ের একটা মান স্থির করে' তা' তার পঁয়তাল্লিশ পর্য্যন্ত অবশিষ্ট কয় বৎসরের আয়ের মধ্যে ভাগ করে' দেওয়া হয়।

অনেকের ধারণা রাশিয়ায় অর্থসঞ্চয় নিষিদ্ধ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা' নয়। ব্যক্তিগত মূলধন খাটিয়ে অন্যের শ্রমার্জ্জিত অর্থের উপার্জ্জন নিষিদ্ধ; কিন্তু নিজের শ্রমকে শতভাবে কাজে লাগিয়ে উপার্জ্জন ও তা' ব্যয়ের স্বাধীনতা প্রত্যেকেরই আছে। নিজের শ্রমার্জ্জিত অর্থ উদ্বৃত্ত হ'লে, সঞ্চয় প্রত্যেকেই করতে পারে; কিন্তু সঞ্চয়ের দিকে ঝোঁক বিশেষ কাহারও নাই। বংশধরদের জন্য ভাবনা নাই, নিজের বৃদ্ধ বয়সের ভরণ পোষণও সব কিছুই ষ্টেট হ'তে পাওয়া যায়; সুতরাং সঞ্চয়ের দরকার কি?

অন্নদা

শ্রীমমতা ঘোষ

অন্নে অন্নে পূর্ণ তোমার ঘর,
সারা সংসারে একটি অন্ন নাই;
ম্লান মুখে দেখে ক্লান্ত মহেশ্বর
তোমার দুয়ারে দাঁড়ায়েছে এসে তাই।
অন্নপূর্ণা, বারেক করুণা কর,
পুণ্য হস্তে অন্ন-পাত্র ধর।

সারা নগরীতে ভিক্ষা মেগেছে হর—
কোথাও একটি মেলে নি অন্নকণা,
ফিরেছে বহিয়া বিমর্ষ অন্তর—
বিমুখ করেছে আজিকে সকল জনা।
হতাশ হৃদয়ে ফিরিয়াছে ভূতনাথ,
দাঁড়াল দুয়ারে প্রসারি' দক্ষিণ হাত।

আজিকে কোথাও মহেশ রাখেনি বাকি,
একে একে একে ত্রিভুবন ঘুরিয়াছে;
দেখেছে সবার নত মুখ ম্লান আঁখি,—
নিরুপায় ফিরে এসেছে তোমার কাছে।
দুঃখিত বড়, বড় ক্ষুধার্ত্ত মাগো,
ভিখারী হরেরে এবার ফিরাস্ না গো।

তিন ভুবনের অন্ন লইয়া হরি'
হেথায় জননী বসায়েছ মহামেলা,
কৌতুকে আজি রমারে রিক্তা করি'
সুরু হ'ল একি তোমার নতুন খেলা?
ত্রিলোক ঘুরিয়া মহাদেব এল ঘরে,
অন্নদা, দে মা অন্ন শিবের করে।

কাশ্মীর

শ্রীদুর্গাশঙ্কর মহলানবীশ

সন্ধ্যার অন্ধকারে আলোকমালা সুশোভিত রাজবর্ত্মে আসিয়া দাঁড়াইলাম। মর্ত্ত্যবাসী আমি, স্বর্গে আসিয়াছি—ভূ-স্বর্গ শ্রীনগরে। চোখের সামনেই একটা অভাবনীয় নাটক ঘটিয়া গেল। এই সেই শ্রীনগর! অনুভূতির জগৎ কোথায় যেন খসিয়া পড়িয়াছে। নিতান্ত নিঃসঙ্গ ঠেকিল নিজেকে। স্বর্গভূমে আমি পরবাসী, কেহই আমাকে অভিনন্দিত করিল না। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম—সুরপুরী অন্ধকার পারাবারে স্নান করিতে নামিয়াছে। তার নিমজ্জমান কণ্ঠে আলোর ঝিকিমিকি অতল কুহেলিকায় পথ হারাইতেছিল। আকাশতলে হেমন্তিকা কুয়াসার জাল বুনিয়াছে। বাহিরে দারুণ ঠাণ্ডা, রাস্তাঘাট জনহীন। বুঝিলাম না—ইহা শ্রীনগর কি বিশ্রীনগর।

সারাটী দিন প্রায় বিরামহীন ছুটিয়াছি—পাষাণকারা ভাঙ্গিয়া, আঁকাবাঁকা পথে, শিখর হইতে শিখরে, সানু হইতে শৈলে, বন হইতে বনান্তরে, নদী নির্ঝরিণীর অগ্রে পশ্চাতে বা পাশ দিয়া। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই মোটরে উঠিয়াছিলাম, পথে অস্ত-রবিকে বিদায় দিয়া অন্ধকারে নগরে পৌঁছিলাম। পাঞ্জাবের সীমান্তে লোকালয় ছাড়িয়া আসিয়াছি। রাস্তায় মানুষের কীর্ত্তি বড় একটা চোখে পড়িল না। বিসর্পিত একটানা দীর্ঘপথের দুই ধারে অগাধ অরণ্যের উদ্দাম বন্যতা মানুষকে মাতাল করিয়া দিতে চাহে। পাশে ক্ষুধিত পাষাণ মুখব্যাদন করিয়া চাহিয়া রহিয়াছে তার অতল খাতে একটী বলির জন্য। মনে হইল—হয়ত ইহারই অনুরূপ কোন পথে পাণ্ডবেরা মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন। পৃথিবীর বুকে আদিম জীবনের এই অক্ষুণ্ণ শ্যাম শুচিতা মানুষকে যেন জানাইয়া দিতে চাহে সে প্রকৃতির রাজ্য ছাড়িয়া আজ কোথায় গিয়া পড়িয়াছে। প্রাণে কিসের একটা তীব্র অভাব জাগিয়া উঠে।

যাত্রাশেষে মোটর আফিসের সামনে ফুটপাতে দাঁড়াইয়া শীতে কাঁপিতেছিলাম। কথা ছিল, লোক আসিয়া আমাদের বাসস্থান ঠিক করিয়া দিবে। কাহারও দেখা পাইলাম না। কোথায় যাইব ইতস্ততঃ করিতেছি, হঠাৎ টেলিফোনে ডাক পড়িল। "আপনি কে?" উত্তর দিলাম—আমি বিদেশী, জম্মু থেকে এসেছি। "মিসিজ্ দত্ত ওখানে আছেন কি?" বলিলাম—আছেন। "একটু অপেক্ষা করুন; ড্রাইভার যাচ্ছে, আপনাদের নিয়ে

মিসিজ্ আশারাণী দত্ত
এঁর আমি আতিথ্য স্বীকার করেছিলাম

আসবে।" একটী বাঙালী পরিবার আমাদের আসার খবর পাইয়াছিলেন, তাঁহারাই সেদিনের মত ব্যবস্থা করিলেন। রাত্রি নিঝুমতায় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িলাম।

শ্রান্ত তনু একক শয্যায় ঘুমাইতেছিল। স্বপ্নে নিদ্রাহারা প্রাণ সারা রাত জাগিয়া রহিল প্রভাতের সৌন্দর্য্য দেখিবার ঔৎসুক্যে। প্রাতে উঠিয়া দেখিলাম—নন্দনে পারিজাত ফুটিয়া নাই, দেববালিকারা কোথায় যেন অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে! সামনে গগনবিস্তারী দীর্ঘ একটা চেনারের গাছ, রাস্তার দুই ধারে দূরপ্রবাহিনী পপলারের (poplar) সারি। কিন্তু কোথাও গাছে পাতা নাই, থাকিলেও রং ধরিয়াছে, বাগানে ফুল নাই,

ফল নাই। চারিদিকেই হিমানীর নিষ্ঠুর অভিনয়— প্রকৃতি জীর্ণ, শীর্ণ, পাংশু। তাপমান যন্ত্রের পারা ৩৫° ডিগ্রীতে নামিয়া গিয়াছিল, স্থানে স্থানে বরফ পড়া সুরু হইয়াছে। বাহির হইতে দর্শক যারা আসিয়াছিলেন, তাদের সাথে বড় একটা দেখা হইল না। যে দুই একজন অবশিষ্ট ছিলেন, তাদের মুখেও "থাই থাই" রব।

রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম। কাশ্মীরীর অভিজ্ঞ চক্ষু সহজেই আমাকে চিনিয়াছিল বিদেশী বলিয়া। একটা শিকার মিলিল। চারিদিক হইতে তাহারা আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া ধরিল কোন একটা লাভজনক সওদার আশায়। যেখানে যাই, এদের হাত হইতে নিস্তার নাই। কেহ কেহ সাত আট দিন ধরিয়া আমার পিছনে পিছনে ঘুরিয়াছিল, শুধু একটীবার তার জিনিষগুলি যেন দেখিয়া আসি। শুনিয়াছিলাম কাশ্মীরী ভয়ানক প্রতারক।* তাদের এড়াইয়া চলিলাম।

জম্মুতে এক কাশ্মীরী বন্ধুর নিকট তার জন্মভূমির অপূর্ব্ব বর্ণনা শুনিয়াছিলাম। তিনি আমাকে পল্লীতে যাইতে বলিয়াছিলেন। সঙ্গী পাইলাম না। অদূরে বিতস্তা নদী বহিয়া চলিয়াছিল। সুন্দর স্বচ্ছ জল, তার দুই ধারে শহর। গঙ্গার ধার দিয়া অনেক শহর দেখিয়াছি, শ্রীনগরের বৈশিষ্ট্য সেখানে নাই। মানুষের হিংস্র আচরণ প্রকৃতির স্নেহকে উপেক্ষা করিয়া সেখানে আজ দানবীয় সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছে। কাশ্মীর বৈদিক আর্য্যদের লীলাভূমি। মানুষ সেখানে বহুযুগ "লতা-পাতা-চাঁদ-মেঘের" সহিত এক হইয়া মিশিয়াছিল। তারা ইহার চারি ধারের পাহাড় পর্ব্বতে সোমলতা আহরণ করিত, সবুজ মাঠে ধেনু চরাইত, ধন-ধান্য-পুষ্পে যাগ, যজ্ঞ, পূজা, হোম করিত।† এই আর্য্যভূমি এখনও প্রকৃতির শ্যাম রূপের নিকেতন। শ্রীনগরে নতুন স্রোত বহিতে সুরু হইয়াছে। তবুও এখানে আসিয়া পাহাড়-পর্ব্বত লতা-পাতা-চাঁদ-মেঘই প্রথম চোখে পড়ে। সমতল উপত্যকায় অফুরন্ত ধানের ক্ষেত। বৈদিক যুগে বিতস্তা নদী হয়ত ছিল না, তথাপি ইহা পৌরাণিক নদী, শ্রীনগরের ভিতর দিয়া বহিয়া উলার হ্রদে পড়িয়াছে। উলার হ্রদের পৌরাণিক নাম "উল্লোল সর" বা "মহাপদ্ম"। বিতস্তার নাম এখন ঝেলাম হইয়াছে। নদীতে সাতটী সেতু আছে, একটী এখন ভগ্ন। সপ্তম সেতুর পর ছাতাবল সেতুবন্ধ। নদীর এপার ওপার বাঁধিয়া এই সেতুবন্ধ (dam), জলের গভীরতা যাতে না কমিয়া যায়। বাঁধের উপর দিয়া জল উপচিয়া প্রপাত ছুটিয়াছিল। নৈসর্গিক কারণে জল বাড়িয়া কখনও কূল ছাপাইয়া উঠিলে আরও
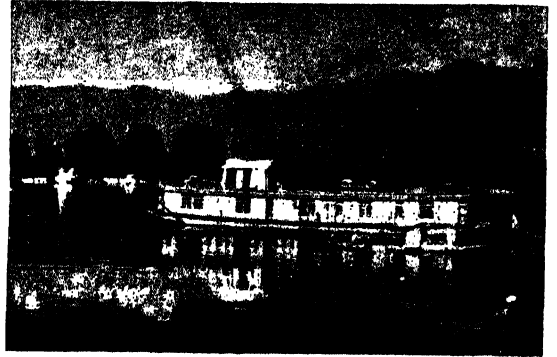
কাশ্মীরের "হাউস বোট"

অনেক খাল আছে জল বাহির হইয়া যাওয়ার জন্য। ধারে ধারে উইলো, চেনার, চির, দেওদার গাছ। পশ্চিম পারে গভর্ণমেণ্ট দপ্তর (সেক্রেটারিয়েট্) ও রাজগড় প্রাসাদ। তৃতীয় সেতুর পরে শাহ্-ই-হাম্‌দান্ মস্‌জিদ্। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল, বাহির হইতে প্যাগোডার মত দেখায়। পার্শ্বেই একটা ছোট হিন্দু মন্দির। সরকারী দপ্তরের ওপারে "সুন্তিকুল নালা" নদী হইতে বাহির হইয়া ডাল হ্রদে গিয়াছে।

নদী এবং হ্রদে নৌকার অভাব ছিল না—শিকারা (ছোট নৌকা), ডাঙ্গা, হাউস্ বোট। কাশ্মীর গিয়াছিলাম শুনিলেই লোকে হাউসবোটের কথা জিজ্ঞাসা করে। এই হাউস বোট কিন্তু কাশ্মীরের দেশীয় নৌকা নয়। প্রায়

* কাশ্মীরের মিশনারী হাসপাতালের ভূতপূর্ব্ব ডাক্তার আর্থার নীভ, এফ-আর-সি-এস্, লিখিয়াছেন—"কাশ্মীরীরা পাঠানের মতই বিশ্বাসঘাতক, কিন্তু তার মত সাহসী নয়; বাঙ্গালীর চেয়েও মিথ্যাচারী, কিন্তু তার সমান বুদ্ধিমান্; অধীনতায় হীন তোষামুদে, স্বাধীনতা পাইলে উদ্ধত।" জানিনা কাশ্মীরে এ বই কেমন করিয়া চলে। —লেখক।

† *See* Vedic Culture by Z. A. Ragozin.

৫০ বৎসর পূর্ব্বে মিঃ এম্-টি কেনার্ড ইহা শ্রীনগরে প্রথম প্রচলন করেন।* দেখিতে অনেকটা কবি রবীন্দ্রনাথের বজরার মত। লঞ্চের মত দ্বিতল বোটও আছে। ভিতরটা বেশ মনোরম ও সুসজ্জিত। কার্পেট পাতা, ভেলভেট, সিল্ক প্রভৃতির দ্বারা আচ্ছাদিত ৪।৫টী ক্যাবিন—শোবার ঘর, বৈঠকখানা, গ্রন্থাগার, ইত্যাদি। চেয়ার, টেবিল, সুরুচিসম্পন্ন বহু তৈজস-পত্রও থাকে। একখানি হাউস্‌বোট চালাইতে ৮।১০ জন লোক লাগে, সুতরাং ব্যয়সাধ্য। তবে একস্থানে নঙ্গর করিয়া থাকিলে খরচ হোটেলের চেয়ে বেশী নয়।

চশমাশাহী : কাশ্মীর

ডাল হ্রদের মুখে শঙ্করাচার্য্য পাহাড় সম্রাট্ অশোকের পুত্র জালোক ইহারা শিখরে জ্যেষ্ঠ-রুদ্রের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তারপর রাজা গোপাদিত্য তৃতীয় শতাব্দীতে এই জীর্ণ মন্দির পুনর্নির্ম্মাণ করিয়া জ্যেষ্ঠেশ্বরকে উৎসর্গ করেন। আজিও সেই প্রাচীন শিবলিঙ্গ শত শত নর-নারীর পূজার্ঘ্যে অভিষিক্ত হইয়া থাকে। এক হাজার ফুট উচ্চে এই পাহাড়ের চূড়া হইতে হ্রদের দৃশ্য ছবির মত। বেলা ৯।।০ টা বাজিয়াছিল। দ্রুতপদে শঙ্করের দর্শনোদ্দেশে চলিলাম। রোদ বেশ উঠিয়াছে, কিন্তু দারুণ ঠাণ্ডা হাওয়ায় অনাবৃত মস্তক জমিয়া যাইতেছিল। মনে হইল, চিন্তাশক্তি যেন ইচ্ছার বিরুদ্ধে চৈতন্য হারাইতেছে। দৌড়িয়া উঠিতে চেষ্টা করিলাম, হাঁপ ধরিল, তবু মস্তিষ্কের ধমনী সচল হইতে চাহিল না। পাহাড়ের আড়ালে আড়ালে বাতাস হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া চলিতে লাগিলাম। উপরে একটী ছোট মন্দির, দরজা খোলা। লোকজনের সাড়া পাইলাম না। পায়ে রবারের তলাযুক্ত কাপড়ের পাদুকা ছিল। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া জুতা পায়েই মন্দিরে প্রবেশ করিতে যাইতেছি। বাহ্যিক ক্রিয়া-কলাপের প্রতি আমি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ ছিলাম না, বিশেষতঃ আমার পাদরক্ষিকা কাপড়ের। অদূরে ধ্যান-মৌন হিমালয়। নীচে কশ্যপের তপঃনিষিক্ত সুচির সরসী। লক্ষ লক্ষ নরনারীর পুণ্যাঙ্কিত এই শৃঙ্গে মহেশ্বর হয়ত এখনও জাগ্রত। তাঁর প্রভাব হঠাৎ আমাকে অভিভূত করিল। চরণ আর চলিল না। পাদুকা খুলিয়া ফেলিলাম। নিষেধ

মার্ত্তণ্ড মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ : কাশ্মীর

* *Vide* Kashmir by Francis Younghusband.

পরেই অনুভব করিলাম—আমি শিবের সামনে ধ্যান-মগ্ন হইয়াছি।

ক্ষণপরে মানুষের গলার আওয়াজে ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল। নীচে একজন সন্ন্যাসী ডাকিয়া বলিল—কে এখানে জুতা আনিয়াছে? উত্তর দিলাম—আমি আনিয়াছি; মন্দিরের বাইরেই ত আছে। প্রশ্নকারী শুনিল না, বলিল—মন্দিরের চাতালেও আনা নিষেধ। খানিক তর্কের পর কহিলাম—আচ্ছা, দূরে রাখিয়া আসিতেছি। দেখিলাম—সন্ন্যাসী মন্দিরের এক কোণে এই শীত অগ্রাহ্য

এখানে রক্ষিত আছে শুনিলাম। সৈয়দ আবদুল্লা ১১১১ খৃষ্টাব্দে এই চুল কাশ্মীরে আনে। তাহার নিকট হইতে একজন ধনী সওদাগর ইহা কিনিয়া লয়।

পাশ দিয়া একটী রাস্তা গিয়াছে ক্ষীর ভবানী যাওয়ার। ক্ষীর-ভবানী শ্রীনগর হইতে প্রায় ১৫ মাইল। স্থানটী অতি মনোরম এবং নির্জ্জন—বিটপী ছায়ায় ঢাকা একটী দ্বীপ। চারিদিকে খরস্রোতা তটিনী। নিকটে কোন নদী বা ঝরণা হইতে নালা কাটিয়া এই তটিনীর সৃষ্টি হইয়াছে। সমস্তই কৃত্রিম—দ্বীপ, জল-প্রবাহ ইত্যাদি।

বিজবেহারা: কাশ্মীর

করিয়া ক্ষুদ্র এক কুটীরে বাস করে। নিকটে ভস্মস্তূপ। আমার নিকট সে কিছুই চাহিল না। আমি ধীরে ধীরে নামিয়া আসিলাম।

হ্রদের পশ্চিম তীরে নাসীমবাগ, নগিনবাগ—বিস্তীর্ণ ফলের বাগান, মোগল যুগের স্মৃতি। ইহার নিকটেই হজরতবল মস্‌জিদ্। মস্‌জিদের আঙ্গিনা পার হইয়া হ্রদে যাওয়ার সিঁড়ি। ঘাটে নৌকা বাঁধা রহিয়াছে। ওপারে বিলাস গৃহ হইতে মোগল বাদশাহগণ তরী বাহিয়া এখানে নমাজ পড়িতে আসিতেন। ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর এই মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করেন। মহম্মদের এক গোছা চুল

সমগ্র দ্বীপটী পাথরে বাঁধান, দক্ষিণেশ্বরের কালী বাড়ীর উঠানের মত। দ্বীপের বাহিরে জুতা রাখিয়া পুল পার হইয়া ক্ষীর-ভবানী দর্শন করিতে যাইতে হয়। মাঝখানে একটা ছোট পুকুর, তাহার কেন্দ্র হইতে ছোট একটা শ্বেত পাথরের মন্দির উঠিয়াছে। লোকজন পূজার ভোগ এই পুকুরে নিক্ষেপ করে। মন্দিরে পূজারী ভিন্ন আর কেহ যাইতে পারে না। শুনিলাম তিথি বিশেষে হাজার হাজার মণ দুধ এই পুকুরে নিক্ষিপ্ত হয়, তাই নাম ক্ষীর-ভবানী। এখানে আখরোট খুব সস্তা, আমাদের নিকট ১০০-এ তিন আনা চাহিল। ইহারই নিকট দিয়া পশ্চিমে

উলার হ্রদে যাওয়ার রাস্তা, শ্রীনগর হইতে প্রায় ১৮ মাইল। ভারতের ইহা বৃহত্তম হ্রদ, দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৪ মাইল। পথে আর একটা ছোট হ্রদ পড়ে—মানসবল, সুন্দর প্রাকৃতিক আবেষ্টনী চারিদিকে।

মোগল বাদশাদের বহু কীর্ত্তি ডাল হ্রদের পূর্ব্ব দিকে পাঞ্জাল গিরিমালার পাদভূমিতে। নিদাঘে দিল্লীর বাদশাহগণ কাশ্মীরের সুশীত উদ্যানে আমোদ প্রমোদে কাল কাটাইতেন। তাঁহাদের বিলাস-সম্ভারের প্রাচুর্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। পশ্চাতে পাহাড়শ্রেণীর পট-ভূমিকা, সম্মুখে সরসী। হ্রদের ধারে বর্ত্তমান মহারাজা বাহাদুরের প্রাসাদ; অতীতের বিলাস-বৈভবের স্মৃতি-বেষ্টিত হইয়া ইহা নগণ্য হইতেও নগণ্যতর মনে হয়। কাশ্মীরের আয়তন বাংলা দেশের সমান, রাজস্ব পৌণে তিন কোটী টাকা। এরূপ একটী খ্যাতনামা রাজ্যের রাজ-ভবন অন্যান্য দেশীয় নৃপতিদের প্রাসাদের সাথেও তুলনা হয় না। প্রাসাদ ছাড়াইয়া একটু উত্তরে গেলে চশমা-শাহী ঝরণা। বাদশাহগণ এই ঝরণার জল পান করিতেন। সুস্বাদু ও দীপক বলিয়া ইহার জলের খ্যাতি আছে। চশমাটী একটী ছোট উদ্যান-বাটিকা-বেষ্টিত। আমি অঞ্জলি ভরিয়া জল লইয়া তৃপ্তির সহিত পান করিলাম।

হ্রদের ধারে পপলার গাছের মাঝ দিয়া রাস্তা গিয়াছে বিখ্যাত নিশাৎবাগে। নুরজাহানের ভাই আসফখান বহু যত্নে এই প্রসিদ্ধ উদ্যান তৈয়ার করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর বাগিচাটী দেখিয়া এমন বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি ইহা নিজের ব্যবহারের জন্য চাহেন। কিন্তু আসফ্ তাঁহার প্রিয় কানন ভগিনীপতিকে দিতে স্বীকৃত হন নাই। ইহার সৌন্দর্য্য এখন বিলুপ্ত প্রায়। এমন একটী সুন্দর বাগান, মনে হয়, পৃথিবীতে বিরল। সুশোভিত গাছ, লতা, পাতা, ফুল, আলোকোদ্ভাসিত ঝরণা-শ্রেণী স্তরে স্তরে সোপানের মত হ্রদের তীর-ভূমি হইতে উঠিয়া পাহাড়ের আলেখ্য-পটে গিয়া মিশিয়াছে। অথচ ইহার এক একটা স্তরের বিস্তার কলিকাতার একটা পার্কের চেয়ে কম নয়। বাগানের বিশ্রামাগারে বসিয়া ঝরণার প্রবাহ দেখা যায়। আজকাল বাগানের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

প্রায় এমনই সুন্দর আর একটী বাগান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন সম্রাট্ জাহাঙ্গীর। ইহাও হ্রদের ধারে নিশাৎ হইতে ৩।৪ মাইল দূরে, শালামারবাগ নামে সুপরিচিত। সেকালে ইহার এক একটী উদ্যান তৈয়ারী করিতে ৮।১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। এই শালামারেই লালারুকের প্রণয়-কাহিনীর প্রধান দৃশ্য মুরের বিখ্যাত কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে।

আর কিছু দূর গেলে হ্রদের প্রায় তিন মাইল দূরে নিভৃত পাহাড়ের গায়ে বৌদ্ধ স্মৃতি বিজড়িত নাগার্জ্জুনের বাসভূমি "হারবান"। এখানেও ছোট একটা হ্রদ আছে। দেখিলাম ঝর ঝর শব্দে পাহাড় হইতে উৎস এই হ্রদে পড়িতেছে। নিকটে ট্রাউট মাছ পুষিবার ফিসারী বা রক্ষিত নালা। বিলাত হইতে ট্রাউট আনিয়া এখানে চাষ হইতেছে।

মোগল বাদশাহগণ ধরণীতে স্বর্গ রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন। নিশাৎ-শালামার দেখিয়া মনে হয়, তাঁহাদের সে স্বপ্ন একেবারে অলীক নয়। বাগানের শ্রী আজ নাই। বসন্তের নিশাৎ আমি দেখি নাই। শীত আসিয়াছে। হিমানীর শিশিরাঘাতে বন-ভবনে ঋতুরাজ মূর্চ্ছাগত। তার ফুল-ধনু, কিরীট, নূপুর, শ্যামল বেশ-বাস দেখিলাম না। রাশি রাশি চেনারের পাতা পড়িয়া বাগান শুষ্কপর্ণে আকীর্ণ। কঙ্কালসার দীর্ঘ গাছগুলি প্রেতপুরীর অন্তরাল হইতে সরু সরু হাত বাড়াইয়া মানুষকে যেন যমালয়ের পথ দেখাইতেছিল, যেখানে জাহাঙ্গীর-নুরজাহান গিয়াছেন। ফোয়ারাগুলি সব বন্ধ। দীপাধারে আলোকমালা জ্বলে না। একটা যেন ছন্ন-ছাড়া পুরী। সম্রাট্ সম্রাজ্ঞীদের পদরেণু এখনও বাগানের ধূলিকণায় মিশিয়া রহিয়াছে। তাদের তুহিন নিঃশ্বাস আমার চারিদিকে বহিতেছিল, কিন্তু তারা নাই—জীবন উৎসবশেষে "চিহ্ন তব প'ড়ে আছে, তুমি হেথা নাই।"

(আগামীবারে সমাপ্য)

নিঃশেষিত

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

১

কলে যখন বাঁশী বাজে, নিদ্রিত পুরী সজাগ হয়ে ওঠে ; সারি সারি ঘরগুলোতে তাড়াহুড়ো পড়ে যায়।

কিন্তু তারও অনেক আগে গোপাল উঠে পড়ে, ঘুম ভাঙ্গানোর বাঁশী বাজবার আগে তার সব কাজ শেষ হয়ে যায়, সে ধীরে সুস্থে চায়ের বাটিটা মাটিতে নামিয়ে ডাক দেয়—"পান চাই ?"

বিন্দু পান এনে দেয়—

খানিকটা চুপ করে থেকে বলে, "একটা কথা রাখবে ?"

গোপাল বুঝতে পারে, তবু না বোঝার ভাণ করে বলে, "কি কথা ?"

বিন্দু বলে, "খোকার জন্যে একখানা বই কিনে আনবে ?"

গোপালের মুখখানা অসম্ভব রকমের গম্ভীর হয়ে উঠে, তার ভ্রু দুটীও কুঁচ্‌কিয়ে যায়, সে কেবল অস্পষ্ট ভাবে গোঁ গোঁ করে বলে, "হুঁ—"

বিন্দু অনুনয়ের সুরে বলে, "কতই বা দাম,—এক পয়সা কি দু'পয়সা দিলে একখানা বই কিনতে পাওয়া যায়। ও ঘরের গোব্‌রা বলেছে—সে ওকে পড়াবে।

গোপাল গোঁ গোঁ করে বলে, "লেখাপড়া শিখে কি হবে শুনি ?"

বিন্দু তার কণ্ঠস্বরেই মনের কথা বুঝতে পারে, তবু আশা ছেড়ে দিলেও আশা রাখে ; তাই একটু থেমে, ঢোক গিলে বললে, "লেখাপড়া শিখলে তবু মানুষ হবে তো— ।"

—"মানুষ—"

গোপাল হঠাৎ হো-হো করে' হেসে ওঠে—তার সে হাসি আর থামে না।

খানিক হেসে ক্লান্ত হয়ে সে নিজেই হাসি থামালে—"হ্যাঁ মানুষ হবে,—এই যেমন মানুষ আমি হয়েছি, যেমন মানুষ আরও অনেকে হয়—তেমনি মানুষ হবে তো ? লেখাপড়া শিখিয়ে ওকে মানুষ করবার ভাবনা ছেড়ে দাও বিন্দু, বরং লেখাপড়া না শিখিয়ে অমানুষ নামে পরিচিত করে'ই ওকে মানুষ করার চেষ্টা কর।"

বিন্দু তার পানে চেয়ে থাকে, তার মুখ দিয়ে একটা কথাও বার হয় না।

গোপাল বলে চলে "কুলীর ছেলে কুলীই হয়ে থাকে, ভদ্রলোক কোনদিন হ'তে পারেনি, হ'তে পারবেও না। বংশানুক্রমে—কথাটা কোনদিন শুনেছো— ? শোননি, শুনবেই বা কি করে—এত বড় বড় কথা কেই বা বলে থাকে এই কুলীর বস্তীতে ? কিন্তু আমি শুনেছি—শুধু শুনিনি—নিজেকে দিয়ে এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণও পেয়েছি। বাপ মা, ঠাকুরদা আমার সাত পুরুষের যে রক্ত আমার মধ্যে বইছে—তার ঋণ আমার শুধতেই হবে, লেখাপড়া করলে আমার বাইরেও কেউ আমায় ভদ্র বলবে না, আমার রক্তও শোধিত হবে না।"

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে একটা পান মুখে দিয়ে চিবাতে চিবাতে সে বললে, "যেখানে পশু প্রবৃত্তি আসে শিক্ষার সুফল সেখানে ব্যর্থ হয়ে যায়। যাক গিয়ে, অত বড় বড় কথা তুমি বুঝবে না, বুঝাতেও চাইনে, মোট কথা জেনে রাখো—তোমার খোকার এ জন্মে লেখা-পড়া শেখা হবে না।"

হন্‌-হন্‌ করে সে বার হয়ে গেল, সবাই তখন বার হতে সুরু করেছে।

২

লেখাপড়া শিখে মানুষ হওয়া—

কারখানার যন্ত্র ঘুরাতে ঘুরাতে গোপাল হো হো করে এমন ভাবে হেসে ওঠে যাতে আশ-পাশে যারা থাকে তারা সচকিত ভাবে তার পানে চায়। সুবল জিজ্ঞাসা করে—"কি হ'ল রে গোপাল, হঠাৎ এত হাসি যে ?"

চাকা ঘুরাতে ঘুরাতে গোপাল বলে, "আর দাদা, বল কেন, আমার গিন্নীর ইচ্ছে ওঁর ছেলেকে লেখাপড়া শিখতে হবে ; শোন একবার অনাসৃষ্টি আব্‌দার। আরে,

লেখাপড়াই যদি শিখবার কপাল করবে—কুলীর ঘরে এসে জন্মাল কেন ?"

সত্যই কেন জন্মাল ?

লেখাপড়া আর লেখাপড়া ; লেখাপড়া শিখে চতুর্ভুজ হবে আর কি ! শেখেনি কি—গোপালও তো লেখাপড়া ঢের শিখেছিল। পথ চলতে যে সব ছেলেদের দেখতে পাওয়া যায়—বই-খাতা নিয়ে হাসতে হাসতে, গল্প করতে করতে, জীবনে উচ্চাশার স্বপ্ন দেখতে দেখতে পড়াশুনা করতে যায়—একদিন সে ওদের দলে মিশতো, অনেক বড় স্বপ্ন দেখতো। আজ সে ছেলেটী কোথায় ?

যে স্বপ্ন দেখেছিল—সে কুলীর কাজ করবে না, অফিসে চেয়ারে বসবে, লেখাপড়ার কাজ করবে, বিবাহ করবে, সংসার বাঁধবে ; মাস গেলে মাইনে পেয়ে হাসিমুখে বাড়ী ফিরবে, কত জিনিষপত্র কিনে ঘর সাজাবে ?

সে মরে' গেছে।

হ্যাঁ, মরে' গেছে কিনা জিজ্ঞাসা কর গোপালকে, পনেরো বছর আগেকার কথা মনে করে' সে বলে' দেবে।

গোপাল কাজ করতে করতে বসে' পড়ে, নিতান্ত শ্রান্ত দেখায় আজ তাকে—যা' তার স্বভাববিরুদ্ধ।

পাশের লোকেরা আশ্চর্য্য হয়ে যায়—গোপালও পরিশ্রান্ত হয়।

গোপাল ছুটি হ'তে একাই বার হয়ে পড়ে, আজ কি জানি কেন—কারও সঙ্গ তার ভাল লাগে না, সে একা পথে চলতে চায়। পথের পাশেই একখানা বইয়ের দোকান, একজন লোক কয়েকখানা বই পাতিয়ে বসেছে তার সামনে—সুর করে' বইগুলোর নাম বলছে, লক্ষ্মীর ব্রতকথা, সত্যনারায়ণের ব্রতকথা, শনির পাঁচালী, ধারাপাত, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ,—আরও কত কি !

গোপাল থমকে দাঁড়ায়—অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেই বইগুলোর সামনে বসে, নেড়ে চেড়ে দেখে লাল কাগজের মলাট দেওয়া প্রথম ভাগ, পাতা ওল্টালেই চোখে পড়ে—অ আ, ই, ঈ।

বইখানা হাতে নিয়ে গোপাল স্বপ্ন দেখে দূর অতীতের—পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসর আগেকার একটা দিনের কথা। এমনই একখানা লাল মলাট দেওয়া প্রথম ভাগ তার বাপ তাকে এনে দিয়েছিল, কয়দিনই বা লেগেছিল সেখানা শেষ করতে ?

গোপাল দূর অতীতের স্বপ্নে ডুবে যায়।

বাপ তাকে স্কুলে ভর্ত্তি করে' দিয়েছিল—ভদ্রলোকের মত সাজ পোষাক করে' সে স্কুলে যেত—সকলের চেয়ে ভাল ছেলে হওয়ার জন্য তার কি চেষ্টাই না ছিল !

মনে পড়ে সে যখন পড়তে বসতো। বাপও ছিল কলের মজুর, দিন গেলে মজুরী পেত, তবু তার মধ্য হ'তে পয়সা বাঁচিয়ে সে দিত ছেলের স্কুলের মাইনে, কিনতো পড়ার বই ইত্যাদি ; আবার এর মধ্য হ'তে সে মাসে দুই টাকা করে মাইনে দিয়ে মাষ্টার রেখেছিল হরিপদ মাইতিকে।

হরিপদ মাইতি নাকি ম্যাট্রিক পাশ করে' কলে কাজ করতে এসেছিল ; দু' টাকা করে' মাসে মাইনে পাবে প্রতিদিন এক বেলা এক ঘণ্টা পড়িয়ে, তাও ছিল তার প্রচুর লাভ।

গোপাল যখন সুর করে' করে' পড়তো, তখন তার বাপ প্রশংসমান দৃষ্টিতে ছেলের পানে চেয়ে থাকতো। হয় তো সে সময়ে সে কল্পনা করতো—একদিন তার লেখাপড়া জানা ছেলে চাই কি অফিসের হর্ত্তা-কর্ত্তা বিধাতা বড়বাবুও হ'তে পারে—তখন ?

তখনকার কথা ভাবতে ভাবতে গোপালের বাবার চোখ আনন্দে মুদে আসতো।

গোপাল ইংরাজী শিখতো।

তার মা তার সঙ্গে কথা বলতে থতমত খেয়ে যেতো, বাপকে কথা বলতে সে সংযত করতো—লেখাপড়া জানা ছেলের কাছে বাপ-মা কতখানি সঙ্কুচিত হ'য়ে থাকতো !

গোপাল চমকে ওঠে।

কোথায় গেল সে গোপাল—লেখাপড়া জানা ছেলে গোপাল ?

হাতের বই ফেলে দিয়ে গোপাল ধড়মড় করে' উঠে পড়ে।

বইওয়ালা লোকটী করুণ সুরে ডাকে—"বই নিন, মাত্র দুই পয়সা দাম—"

গোপাল হন্-হন্ করে পথ চলে, জনতার সঙ্গে মিশিয়ে যায়।

৩

চিন্তা তাকে ছাড়ে না।

অনেকদিন পরে অতীতের চিন্তাকে সে কুড়িয়ে পেয়েছে, দীর্ঘ পনেরো বৎসরের মধ্যে সে এসব চিন্তা করবার অবকাশ পায় নি।

কাজ—কাজ, অজস্র কাজ, এর মধ্যে ভাববার ফুরসৎ কোথায়? সকাল বেলায় ছুটতে হয়, দুপুরে এক ঘণ্টার জন্য ফিরে এসে স্নানাহার করে, আবার কারখানায় ছুটতে হয়, ফেরে একেবারে সন্ধ্যার সময়ে।

শ্রান্ত দেহ, ক্লান্ত চরণ সে দেহের ভার বইতে চায় না, তবু বইতে হয়।

প্রথম দু' চার দিন তার মধ্যে শিক্ষার অহঙ্কার ছিল। যখন দেখতো তার সঙ্গীরা ক্লান্তি দূর করবার জন্য নেশা করতো, তখন সে তাদের ধিক্কার দিতো, দারুণ ঘৃণায় তাদের কাছ হ'তে সরে থাকতো।

কিন্তু কয়দিনই বা সে অহঙ্কার? শিক্ষার গর্ব্ব তার একদিন মন হ'তে দূর করতে হ'ল, ইচ্ছা ক'রেই ভুলে যেতে হ'ল সে কোনদিন লেখাপড়া শিখেছিল, কোনদিন বইয়ের পাতা উল্টেছিল। আজ সামনে কোন বই, কোন কাগজ পড়ে' থাকলেও সে প্রাণপণে চোখ ফিরায়, বই বা কাগজে পা লাগলে সে চমকে ওঠে না, সে নমস্কারও করে না।

আজ আর পাঁচ জন যেমন সেও তেমনই, ওদের সঙ্গে তার এতটুকু পার্থক্য নাই। বড় বেশি ক্লান্তি বোধ করলে সেও ওদেরই পাঁচ জনের সঙ্গে মিশে দীনুর দোকানে প্রবেশ করে, পয়সা খরচ করে' মদ খায়। তারপর যখন বার হয়, তখন তার পা টলে, গা কাঁপে,—সেও আর পাঁচ জনের মত সুর করে' গান গাইতে গাইতে ঘরে ফেরে।

লেখাপড়া—শিক্ষা—জ্ঞান!

চুলোয় যাক্ লেখাপড়া, শিক্ষা আর জ্ঞান। ও সব শিখুক ভদ্রলোকের ছেলেরা, তাদের জীবনে চাকরী হিসাবে কাজে না লাগুক, সামাজিক জীবনেও আবশ্যকতা আছে; কিন্তু কুলীর ছেলে—যারা বস্তীতে জন্মেছে, মানুষ হয়েছে, পুরুষানুক্রমে জন-মজুরের কাজ করে' যারা খাবে, তাদের সমাজও নাই—কোন আইন-কানুনও নাই; বে-পরোয়া জীবন; হাস, খেল, ফুর্ত্তি কর, দিন কাটাও।

গোপাল ঝিমিয়ে পড়ে।

মনে পড়ে—কোন্ কালে সে পড়েছে—

লেখাপড়া করে যে,
গাড়ী ঘোড়া চড়ে সে।

আজ তার চীৎকার করে' বলতে ইচ্ছা হয়—সব মিছে কথা, আগাগোড়া মিছে কথা। লেখাপড়া মস্ত বড় ফাঁকি, —জীবনকে শূন্য দিয়ে ভরে' দেওয়া, মিছে সান্ত্বনা লাভ করা মাত্র।

গোপাল পথ চলে।

৪

বিন্দু ভর্ৎসনার সুরে বললে, "আজ আবার মদ খেয়ে এসেছো? ও এই না প্রতিজ্ঞা করেছিলে আর কখনও মদ খাবে না?"

বিছানায় শুয়ে পড়ে' গোপাল একটু হাসলে, বললে, "কি করব বল বিন্দু, এত আজগুবি ভাবনা মাথায় চেপেছিল, যা' মদ না খেলে চাপা পড়ে না। থাকতে পারলুম না, মনটাকে চাঙ্গা করে' তুলতে মদ খেতে হ'ল, —উপায় নেই কিনা!"

—"উপায় নেই—"

বিন্দু নিঃশব্দে চেয়ে রইলো।

সাত বছরের ছেলেটা একপাশে বসেছিল, বিন্দু তার পানে তাকিয়ে বললে, "কিন্তু একখানা বই—"

"বই—?"

হুঙ্কার দিয়ে গোপাল বিছানায় উঠে বসলো,—"বই? বই পড়ে' কি হবে শুনি, ওর নিজের সম্বন্ধে ওকে চেতনা দিয়ে কি লাভ হবে? বই পড়ে—লেখাপড়া শিখে কি লাভ হবে জানো,—ওর বুকে শুধু আগুন জ্বলবে, সেই আগুনের জ্বালায় ওকে ছটফট করে' মরতে হবে, তার চেয়ে,—বুঝলে বিন্দু, ও অশিক্ষিত মূর্খ কুলীর ছেলেই হয়ে থাক।"

শ্রান্তভাবে সে বিছানায় শুয়ে পড়লো। শ্রান্তকণ্ঠে বললে, "এই আমাদের জীবন, এই অন্ধকার স্যাঁতানো ঘর, মিটমিটে প্রদীপের আলো, কোন রকমে দু'বেলার

দুটো ভাতের সংস্থান করা—এই আমাদের জীবন। তবু এও ভাল বিন্দু, যদি এর মধ্যে শিক্ষার বালাই না থাকে, আমরা এর মধ্যেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারি, এর মধ্যেই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটিয়ে দিতে পারি।"

বিন্দু বলতে গেল, "কেন, লেখাপড়া শিখেও তো একদিন ভদ্রলোকের মত চাকরী করতে পারবে!"

মলিন হাসি হেসে গোপাল বললে, "হাঁ, যেমন আমি করছি। জানো বিন্দু, একদিন আমার বাপ মায়েরও ইচ্ছে ছিল আমি অফিসে কাজ করব, সেই আশা নিয়ে তারাও আমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছিল। আজকালকার দিনে অনেক লেখাপড়া শিখে ভদ্রলোকের ছেলেরা চাক্‌রী পাচ্ছে না, আর আমি কুলীর ছেলে হয়ে চাকুরী পাব—এ অসম্ভব কল্পনা কেউ করতে পারে? তাই আমাকে নামতে হ'ল আকাশ হ'তে মাটিতে, মিশতে হ'ল যাদের ঘৃণা করেছি তাদেরই সঙ্গে। আমি আজ কুলি, শ্রমিক, আমি আজ মাতাল, তবু—তবু জানো বিন্দু—"

বলতে বলতে সে দুই কনুইএর 'পরে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে উঠলো, বিকৃত কণ্ঠে বললে, "সেই যে শিক্ষালব্ধ সংস্কার, সেটা যখন নিজের অজ্ঞাতে মনে জাগে, আমার বুকে হাজার বিছে কামড়ায়, আমার বুকে আগুন জ্বলে; আমি পাগল হয়ে যাই এই ভেবে—আমি কোথায় উঠেছিলুম, কোথায় নামলুম!"

গোপাল বিছানায় মুখ গুঁজলো।

কত যুগ-যুগান্তর চলে' আসছে এই একই ধারা, রক্তের স্রোত পুরুষানুক্রমে বয়ে আসে এবং ঠিক সেই ধারানুযায়ী কাজ করতে মানুষ বাধ্য হয়। আবেষ্টনীর বাইরে থাকলেও, বংশের বৃত্তি মনে জাগ্‌বেই এবং ঠিক পিতৃ পুরুষের পথেই নিয়ে এসে ফেলে।

গোপাল বলে—মানুষের ধ্বংস হোক, বংশ লোপ হোক; নূতনের ভিত্তি গঠিত হোক এবং তারপরে হোক নূতন মানুষের প্রতিষ্ঠা। ভিখারীর বংশ বাড়িয়ে লাভ নাই, তার বংশকে গ্লানির হাত হ'তে রক্ষা করার ভার তার নিজেরই নেওয়া উচিত।

বিন্দু এত কথা বোঝে না, চুপ করে' সে শুনে যায়।

বংশ নষ্ট করার কথা গোপাল যখন বলে তখন সে শিউরে ওঠে, ছেলের মাথাটা বুকের পরে চেপে ধরে' বারবার বলে, "ষাট ষাট, শত বছর পরমায়ু হোক।"

গোপাল তার পানে চেয়ে হাসে।

এই মা—বুঝতে পারে না তার সন্তানের শত বর্ষ আয়ুঃ সন্তানকে করবে কতখানি নিপীড়ন, কতখানি দুঃখ-ব্যথা তাকে বইতে হবে। এ সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়াই ছিল ভাল, তবু পাছে অপুত্রক থাকতে হয়, তাই কত লোকে শান্তি স্বস্ত্যয়ন করেও পুত্র-কামনা করে।

ভিখারী, শ্রমিক, বেকার—এদের সন্তান আসার কি দরকার ছিল? যাদের "মানুষ" করা যায় না, "মানুষ" করে, যাদের শিক্ষা শিক্ষাপ্রদ হয় না, তাদের জন্মমাত্রই মরে' যাওয়া উচিত, মায়ের আশীর্ব্বাদে শত বর্ষ আয়ুঃ নিয়ে জগতে টিঁকে থাকার দরকার তাদের মোটেই নাই।

ছেলের দিকে চাইতে গোপালের ইচ্ছা হয় না, তার সঙ্গে কথা বলবার প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত হয় না।

৫

কারখানার শ্রীপতি দাস—গোপালের সঙ্গেই কাজ করে। বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি—সন্তান তার নাই।

গোপাল বলে, "বেশ আছ দাদা—নিজে কাজ কর, যা' পাও খেয়ে দেয়ে স্ফূর্ত্তিতে উড়াও। মরবে যখন, শান্তিতে চোখ বুজবে, কোন অপগণ্ডের ভাবনা ভেবে মরতে হবে না।"

শ্রীপতি মাথা চুলকায়, বলে, "তবু বংশটা তো রক্ষা করা চাই—সেই জন্যেই সেদিন আবার বিয়ে কর্‌তে হ'ল।"

গোপাল একেবারে আকাশ হ'তে পড়ে—"বিয়ে কর্‌তে হ'ল—মানে?"

শ্রীপতি বলে, "বংশ থাকে না যে—নইলে কি আর বিয়ে করতুম, জলপিণ্ডটা দেওয়ার জন্যেও একটা ছেলে চাই তো!"

জলপিণ্ড দেওয়ার জন্য চাই ছেলে—

গোপালের মাথাটা চড়াৎ করে' ধরে' ওঠে। কেউ কি ভাবে সে কথা—শ্রীপতিও তো ভাবলে না, তাই সন্তান না হওয়ায় সে কিনা এই আটচল্লিশ বৎসর বয়সে আবার বিয়ে করে এলো!

গোপাল বিশ্বাস করতে পারে না—মরণের পরে আত্মা এক গণ্ডূষ জলের জন্য হাহাকার করে' ফেরে, পুত্রের হাতে মুখাগ্নি না হ'লে আত্মার গতি হয় না।

গোপাল জোর করে' প্রমাণ করতে চায়—এ সব মিছে কথা, মানুষের ভোগলালসার নিবৃত্তি হয় না ব'লেই সে আরও চায়, আরও পোষ্য বাড়িয়ে তোলে। কেবল স্ত্রী নয়, ক্রমে চাই তার পুত্র-কন্যা, তারপর পুত্রবধূ, জামাতা, নাতি-নাতনী।

ধনী বাড়াক—কারণ তার অর্থের অপ্রতুলতা নাই, তার পরিবার বাড়তে বাড়তে কোন এক পুরুষে সমস্ত অর্থ নিঃশেষিত হয়ে যাবে, তখন হয় তো তার বংশধরকে কুঁড়ের আশ্রয় নিতে হবে—সেই দূর ভবিষ্যতের ভাবনা আজ তার না করলেও চলবে;—কিন্তু দরিদ্র যারা, যাদের দিন মজুরী করে' খেতে হয়, তিনদিন বিছানায় পড়ে' থাকলে যাদের হাঁড়ী শিকায় ওঠে, তারা বংশ বা জল-পিণ্ডি পাওয়ার আশা করে কোন লজ্জায়?

গোপাল কাজ করতে আরম্ভ করে অত্যন্ত শ্লথ গতিতে।

শ্রীপতি বলতে থাকে, "এ বয়সে আর বিয়ে করার ইচ্ছে ছিল না, লোকে বললে—কর কি, বংশটা লোপ পাবে—তাই আবার বিয়ে করতে হ'ল। আজ মাস পাঁচ ছয় বিয়ে হয়েছে; বড় বউ বলছে আসছে বছরেই ছেলে আসতে পারে।"

"আসতে পারে—"

গোপাল দাঁত কিড়মিড় করে।

সেদিন বাড়ী ফিরে সে বিন্দুর সঙ্গে তুমুল ঝগড়া করলে, ছেলেটাকে খুব মার দিলে, তারপর খানিকটা মদ খেয়ে বেহুঁসে রাত কাটালে।

৬

গোপাল খুন করেছে।

খুন করেছে তার নিজের ছেলেকে—তার দুলালকে,—একদিন যাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসতো, যাকে চোখের আড়াল করতে পারতো না—তাকে।

সে নিজেই পুলিসে গিয়ে জানিয়েছে—সে খুন করে' এসেছে তার একমাত্র শিশুপুত্রকে, তাকে বিষ খাইয়েছে নিজের হাতে।

লোকে একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে গেল—কোন বাপ তার সন্তানকে—বিশেষ করে' এতটুকু একটী শিশুকে বিষ খাইয়ে মারতে পারে বলে' কেউ শোনেনি। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—সে কেন হত্যা করলে?

সে খানিকক্ষণ দুই হাতে মুখ ঢেকে নিস্তব্ধে দাঁড়িয়ে রইলো, তারপর মুখ খুললো—তার কেবল চোখ দুটিই রক্ত জবার মত হয়নি, সারা মুখটা লাল হয়ে উঠেছে।

ধীরভাবে সে বলে' গেল তার ইতিহাস—কেন সে তার জগতের মধ্যে বড় প্রিয় একমাত্র সন্তানকে হত্যা করেছে।

সে চেয়েছে তার বংশলোপ করতে। নিজে সে যে কতটা কষ্ট দিনরাত সহ্য করছে তা' সেই জানে, তাই সে চায়নি—তার বড় প্রিয়তম পুত্র এই রকম যন্ত্রণা সয়ে জীবন অতিবাহিত করে, সেও আবার কয়েকটী নির্দ্দোষ জীবকে জগতে টেনে আনে। কেবল সেই জন্যই সে তার পুত্রকে হত্যা করেছে—একটা দুঃখী বংশ সৃষ্টি করতে চায় নি।

লোকে বললে পাগল।

বিন্দু এলো সাক্ষ্য দিতে—

হতভাগিনী বিন্দু—হত্যাকারী গোপাল তার পানে চাইতে পারলে না।

কম্পিত কণ্ঠে বিন্দু বললে, "তার ছেলেকে কেউ হত্যা করে নি, তার স্বামী কিছু জানে না। সে পায়ের ব্যথায় মালিস করবে বলে ওষুধ রেখেছিল, ছেলে ভুল করে' সেই বিষ খেয়ে মারা গেছে।"

গোপাল ক্রুদ্ধ বাঘের মত গর্জ্জন করে' উঠলো—"মিছে কথা—সব মিছে কথা! বিন্দু আমাকে বাঁচাতে চায়, সে জানে আমিই ওর ছেলেকে বিষ খাইয়েছি, বিষ ও আনে নি, আমি এনেছিলুম।"

কাঁপতে কাঁপতে বিন্দু কি বলতে গিয়েছিল—একটী কথাও তার মুখে ফোটে নি।

বিচারে গোপালের হ'ল দীর্ঘকাল কারাদণ্ডের আদেশ।

বেশ প্রসন্নভাবে গোপাল দণ্ড বহন করতে জেলে প্রবেশ করলে।

বিপিন-প্রসঙ্গ

শ্রীঅক্ষয়কুমার রায়

নিত্য নৈমিত্তিক জীবনের তুচ্ছ ঘটনা এবং ততোধিক তুচ্ছ কথার মধ্য দিয়া বাগ্মিপ্রবর মনীষী বিপিনচন্দ্র পালকে যেমনটি দেখিয়াছি, তাহাই এখানে সংক্ষেপে বলিবার চেষ্টা করিব।

এক নিঝুম দুপুরে, বৃদ্ধ ভিখারী আসিয়া ডাকিতে লাগিল, "খোকাবাবু, খোকাবাবু!" খোকাবাবু জ্ঞানাঞ্জন তখন তেতলার ছাদে বসিয়া আসন্ন বি. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। তাঁহার কাণে ভিখারীর কণ্ঠস্বর পৌঁছিল না। এই বৃদ্ধ ভিখারীটির সঙ্গে জ্ঞানাঞ্জনের জমিত প্রায়ই কথাবার্ত্তা, সেও তাহাকে ভাঁড়ার হইতে যখন যা' ফলমূল চাল আনিয়া দিত। বিপিনবাবু ঘর হইতে বারান্দায় আসিয়া, ভিখারীটিকে দেখিয়া জ্ঞানাঞ্জনকে ডাকিয়া দিলেন। তখন তাঁহার স্ত্রী বিরক্তির সহিত বলিলেন, "একে যা দেবার দিলেই তো চুকে যায়, ওকে আবার ডাকাহাকি কেন? একে ত তোমার ফাই-ফরমাস খেটে খেটে সে পড়ার সময় পায় না, এখন যা-ও একটু বই নিয়ে বসেছে, তাতেও তার নিস্তার নেই। এমনটি আর কোথাও দেখিনি!" বিপিনবাবু বলিলেন, "চুলোয় যাক্ তার পড়াশুনো, লোকটি ত কেবল চালই চায় না, সে যে খোকাকেও চায়।" বিপিনবাবুর ঘরে ছিল সকলের জন্যই অবারিত দ্বার। যদিও তিনি অনেক সময়ে কাজে ব্যস্ত থাকিতেন সেই নজীর দেখাইয়া কখনও কাহাকে বাধা দিতে দেখি নাই। কাজের ফাঁকেই যে কোন লোকের সঙ্গে আলাপ করিতেন।

অসহযোগ আন্দোলনের উদ্যোগ-পর্ব্বে ১৯২০ সালে, লালা লাজপৎ রায়ের সভাপতিত্বে কলিকাতায় যে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল, তাহার অব্যবহিত পরেই শ্রীহট্টে বসিয়াছিল আসামের প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সভা। তাহার সভাপতি হইয়াছিলেন, অবসর প্রাপ্ত স্কুল ইন্‌স্পেক্টার মৌলবী আবদুল করিম। কলিকাতা হইতে তাহাতে যোগ দেওয়ার জন্য যাইতেছিলেন শ্রীহট্টের কৃতী সন্তান মৌলবী আবদুল করিম, কামিনীকুমার চন্দ, ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি নেতারা। বিপিনবাবুর সঙ্গে তাঁহার মধ্যম পুত্র জ্ঞানাঞ্জন এবং ছোট মেয়ে মিনিও যাইতেছিলেন। ঘটনাচক্রে শান্তিনিকেতন হইতে আমিও আসিয়া তাঁহাদের সহিত যোগ দিলাম।

পথে পদ্মাবক্ষ যেন আলোড়িত হইয়া উঠিল,—রাজনৈতিক মতবাদের ঘাত-প্রতিঘাতে তখন আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় বসিয়া সকালের চা খাইতেছিলাম। আলোচনা চলিতেছিল মহাত্মা গান্ধীকে লইয়া—আমি সাধারণতঃ তাঁহার মতামত সম্বন্ধে কোন তর্ক করিতাম না। ভাল না লাগিলে আলোচনা হইতে উঠিয়া পড়িতাম, তাহা তিনি বুঝিতেন। সেদিন অসহ্য হওয়াতে একটু প্রতিবাদ করিয়া বসিলাম। বিপিনবাবু গর্জ্জিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি কী বোকা?" আমি বলিয়া উঠিলাম "আমার অল্প বিদ্যা বুদ্ধিতে যা কিছু বুঝি তা বলবার অধিকার আছে"—আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণ মুখ যেন বন্ধ হইয়া গেল, তিনি চুপ করিয়া গেলেন—আমি চা'র টেবিল হইতে উঠিয়া আসিয়া ডেকে দাঁড়াইলাম। অল্পক্ষণ পরে মিনি আসিয়া বলিল, "আপনি বড় বেয়াড়া হয়ে উঠেছেন, বাবার সঙ্গে তর্ক—"

আমরা যেদিন শ্রীহট্টে পৌঁছিলাম সেইদিন আসামের শাসনকর্ত্তা কমিশনার মিষ্টার বিট্‌স্ এণ্ড বেল্‌ও শিলং হইতে শ্রীহট্টে আসিয়া পৌঁছিলেন। সভা অধিবেশনের পূর্ব্ব রাত্রিতে বিষয়-নির্ব্বাচনী সভাতে স্থানীয় কোন এক নেতা এক প্রস্তাব তুলিলেন যে, মিষ্টার বিট্‌স্ এণ্ড বেল্ সভাতে যোগ দিতে চান,—তাঁহাকে যে কি ভাবে অভ্যর্থনা করা হইবে, তাহা লইয়া চলিতে লাগিল বিচার-বিতর্ক। অবশেষে বিপিনবাবু তাহার সমাধা করিলেন এই ভাবে যে, মিষ্টার বিট্‌স্ এণ্ড বেল্‌কে তাঁহার পদোপযোগী ভাবে গ্রহণ করা হইবে না। তবে একজন সম্মানিত শ্রোতা হিসাবে গ্রহণ করা হইবে।

পরদিন সভা আরম্ভ হওয়া মাত্রই মণ্ডপস্থিত শ্রোতৃ-মণ্ডলীকে বলিয়া দেওয়া হইল যে, মিষ্টার বিট্‌স্ এণ্ড বেল্ যখন আসিবেন, তখন যেন কেহ উঠিয়া না দাঁড়ান এবং তাঁহার সম্মানসূচক কোন প্রকার ধ্বনি না করেন।

এদিকে মঞ্চের উপর বক্তৃতার পর বক্তৃতা চলিতেছিল, এমন সময়ে মিষ্টার বিট্‌স্ এণ্ড বেল আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মণ্ডপস্থিত জনমণ্ডলী যে যাহার ভাবে ছিলেন, তেমন ভাবেই রহিলেন। কেবল সকলের উৎসুক দৃষ্টি গিয়া পড়িল সেই দিকে। মিষ্টার বিট্‌স্ এণ্ড বেল্ মঞ্চের উপর নেতাদের পাশে আসন গ্রহণ করার পরই সভাপতির নির্দ্দেশে বিপিনবাবু যখন বক্তৃতামঞ্চে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন মণ্ডপটী যেন আনন্দ-উৎসাহের করতালিতে কাঁপিয়া উঠিল, যদিও সময় তালিকায় তখন তাঁহার বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল না।

সেই সময়ে চা-বাগানের এক কুলী-রমণী সংক্রান্ত মামলার বিচারে ইংরাজ আসামীর বেকসুর খালাস পাওয়ার ফলে বিশেষ করিয়া আসাম প্রদেশে এক বিক্ষুব্ধ মনোভাব দেখা দিয়াছিল। মামলার অভিযোগ ছিল এই যে, হীরা নামে এক কুলী যুবতী রমণীকে সতীত্বনাশের হাত হইতে রক্ষা করিতে আসিয়া তাহার পিতা গুলির আঘাতে নিহত হন।

এই বিষাদ ভরা বিক্ষুব্ধ ভাবটি যেন রূপ ধরিয়া উঠিল বিপিনবাবুর বাগ্-বিভূতিপূর্ণ ওজস্বিনী কণ্ঠে। মিঃ বিট্‌স্ এণ্ড বেল্ চিত্রাপিতের ন্যায় উহা শুনিয়া গেলেন।

শ্রীহট্টের রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর সভা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব্ববঙ্গের নানা স্থান হইতে তাঁহার ডাক আসিতে লাগিল। জালিওনাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড এবং হিন্দু-মুসলমান মিলনের অপূর্ব্ব সাড়া যাহা হইয়াছিল তাহা জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে এক অঘটন ঘটনা—এই দুইটি বিষয়কে অবলম্বন করিয়াই পরাধীনতার ব্যথা এবং তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে বক্তৃতার পর বক্তৃতা দিয়া পূর্ব্ব বঙ্গের নানা স্থানে তিনি ঘুরিতে লাগিলেন। তাঁহার গতি ছিল যেন কাল-বৈশাখী ঝড়ের মত, কণ্ঠে ছিল যেন গুরুগম্ভীর দুন্দুভি।

এই ভ্রমণের পথে তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন ঢাকাতে। সেখানে ছিলেন তাঁহার প্রথম যৌবনের শিক্ষক শ্রীহট্টের মাননীয় দুর্গাকুমার বসু মহাশয়, তাঁহার আজিমপুরার বাড়ীতে। তখন তিনি পরপারের আশায় বসিয়া আছেন। সেই অবস্থায় সুদীর্ঘ কাল পরে এই ছাত্র-শিক্ষকের মিলন। তাহাতে ছিল আদর-আপ্যায়ন, সম্মান-সম্ভ্রম,—একদিন তাঁহার বাসায় আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ হইল। আহারাদির পরই বিপিনবাবু রাস্তার ধারে আসিয়া সিগারেট ধরাইলেন। তাহা দেখিয়া জ্ঞানাঞ্জন আমাকে ডাকিয়া বলিল, "অক্ষয়দা ঐ দেখুন, দেখুন—বাবা, লুকিয়ে লুকিয়ে সিগারেট খাচ্ছেন।"

বিপিনবাবু একবার কিছুদিনের জন্য সপরিবারে পুরীতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, ছেলেমেয়েদের ছিল গ্রীষ্মের ছুটি। আমিও তাঁহাদের সঙ্গে গিয়াছিলাম। স্থানীয় এক বলিষ্ঠ বৃদ্ধ ভৃত্য বাসায় দিত জল। লোকটি ছিল সরল সোজা প্রকৃতির। তাহার কাণে গোঁজা থাকিত তালপাতা জড়ান মোটা বিড়ি। একদিন বিপিনবাবু তাহাকে একটা সিগারেট দিলেন। সে হাওয়াতে সিগারেট ধরাইতে পারিতেছে না দেখিয়া বিপিনবাবু মুখের সিগারেট হইতে ধরাইতে বলিলেন। বৃদ্ধের ছিল না দাঁত, তাহাতে অনভ্যস্ত সরু সিগারেট ধরাইতে, বৃদ্ধটি কাঁপিয়া ঝাঁপিয়া একেবারে যেন পরিশ্রান্ত হইয়া উঠিল, যাহা পাঁচ ভাঁড় জল তুলিতেও হইত না। এই দৃশ্যে ছেলেমেয়েদের মধ্যে পড়িয়া গেল একটা হাসাহাসি। তাহার পর হইতে লোকটি সকালে কাজে আসা মাত্রই বিপিনবাবু তাহার লেখা ছাড়িয়া তাহাকে ডাকিতেন —'বন্ধু ফোঁ ফোঁ'—এই শব্দটা তিনি মুলিয়াদের কাছে শিখিয়াছিলেন। অর্থটা যে কি তাহা জানি না। তবে দেখিতাম দু'জনে মুখোমুখি হইয়া সিগারেট ধরাইবার পালা,—তাহা দেখিয়া তাঁহার স্ত্রী বলিতেন, "ঘরে নেই এক ফোঁটা জল, কি করে যে কাজ চলে? এখন তোমার রঙ্গ রস একটু রাখতো"—বিপিনবাবু গম্ভীর ভাবে তাহার উত্তর দিতেন মুলিয়াদের ভাষায়,—যেন বাংলা, হিন্দি, ইংরেজী তিনি কিছুই জানেন না।

একদিন আমাদের দুপুরের আহারের পর, একটি লোক ময়লা ছেঁড়া জামা-কাপড় পড়িয়া ইংরেজীতে বলিল,

"আমি বড় অভাবী—আমাকে কিছু খেতে দাও"—মনে হইল লোকটি মান্দ্রাজী হইবে। লোকটিকে সি-আই-ডি বলিয়া আমাদের সন্দেহ হইল—কারণ বিপিনবাবুর চির সহচর ছিল সি-আই-ডি। তিনি ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া লোকটির সঙ্গে আলাপ জমাইয়া তুলিলেন। কথায় কথায় তাঁহাকে এমন স্থানে আনিয়া ফেলিলেন যে, সি-আই-ডি বলিয়া অস্বীকার করিবার আর তাঁহার কোন উপায় রহিল না। পরে তিনি তাঁহাকে বলিলেন। —'এ কাজ করতে হয়তো কর, কিন্তু এমন বোকার মতন কাজ কর কেন? আমি যখন লণ্ডনে ছিলাম, তখন বুঝতে পারতাম যে, স্কটল্যাণ্ড্ ইয়ার্ডের সি-আই-ডি'রা আমাকে অনুসরণ করে' চলে—কিন্তু কখনও তাঁহাদের ব্যবহারের মধ্যে কোন প্রকার অসঙ্গতি ও সুরুচির ব্যতিক্রম লক্ষ্য করি নাই'—পরে তিনি তাঁহাকে খাওয়াইতে বসিয়া গেলেন। সকলের আহারের পর ডাল-তরকারী কম ছিল বলিয়া দোকান হইতে আমাদের দই-মিষ্টি আনিয়া দিতে বলিলেন। আমাদের মনের অবস্থা তখন প্রায় ধর আর মার! কিন্তু তাহার মধ্যে আবার এই উপদ্রব। অগত্যা অনিচ্ছাসত্ত্বেই দোকানে চলিলাম—তিনি তাহা লক্ষ্য করিলেন। লোকটিকে পরিতোষ সহকারে কাছে বসাইয়া খাওয়াইবার পর তাঁহাকে বিদায় দিয়া আমাদের বলিলেন, "অভুক্ত অবস্থায় যে কেহ দ্বারস্থ হয়, তাহাকে যাহা থাকে তাহাই দিতে হয়। কে কাকে খাওয়ায় বাবা, যার খাওয়া সেই আনে"—তখন সে কথার ভাবও বুঝি নাই, ভালও লাগে নাই।

দুপুরে আহারের পর মাঝে মাঝে আমাদের জমিত তাসের আড্ডা। কোন কোনদিন তিনিও আসিয়া আমাদের সহিত যোগ দিতেন; কিন্তু আমরা তাঁহার সহিত তাস খেলিয়া সুখ পাইতাম না, কারণ আমাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন নবীন-নবিশী আনাড়ি, আর তিনি ছিলেন যেন সর্ব্বজ্ঞ। হাতের তাস তুলিয়াই বলিয়া দিতেন কার হাতে কি আছে না আছে। তাই সময়ে সময়ে তাঁর মেয়েরা বলিতেন, "বাবা জ্ঞান তো চুপ করে' থাকো, কিছু বলো না"—খেলিতে খেলিতে দেখিতাম তিনি ভাষাতত্ত্ব ভাবিতেছেন—হরতন, চিরতন নাম কেন হইল!

একদিন আমরা হরিদাস বাবাজির মঠ দেখিয়া আসিলাম। পরে মঠের মোহন্ত খবর পাইলেন যে, বিপিনবাবু আসিয়াছিলেন। অন্য একদিন তাঁহাকে আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। তখন আমরা স্বর্গদ্বার হইতে পাথারপুরীর কাছে 'সুরমা-ভবনে' উঠিয়া আসিয়াছি। সেই সময়ে দার্শনিক ব্রজেন শীল মহাশয়ও কয়দিনের জন্য পুরীতে আসিয়া ভিক্টোরিয়া ক্লাবে ছিলেন। তিনি ছিলেন বিপিনবাবুর বহুকালের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু। বিপিনবাবু শীল মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া হরিদাস বাবাজীর মঠে চলিলেন। সেদিন মেয়েরা কেহ সঙ্গে ছিলেন না, তাঁহাদের সঙ্গে ছিলাম জ্ঞানাঞ্জন ও আমি।

আমরা মঠে গিয়া উপস্থিত হওয়া মাত্র মোহন্ত আপ্যায়ন সহকারে মঠের নীচে, সমুদ্রের ধারে আমাদের লইয়া বসিয়া গেলেন। মোহন্ত ছিলেন ভক্ত ও শিক্ষিত, এখন তাঁহার নামটি মনে পড়িতেছে না।

বালুর উপর বসিয়া তাঁহারা বৈষ্ণব-দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন, সে আলোচনা কিছু বুঝিলাম না, আমার মন পড়িয়া রহিয়াছিল সমুদ্রের তলে অস্তোন্মুখ সূর্য্যের দিকে। আমরা সাধারণতঃ উদয় ও অস্তে যে আকারে সূর্য্যকে দেখিয়া থাকি, সেই সূর্য্যই সমুদ্রে দেখায় প্রকাণ্ড। পাহাড় পরিমাণ নীল ঢেউয়ের উপর সূর্য্যাস্তের প্রকাণ্ড লাল স্তম্ভের আভা পড়িয়াছে, তাহা যেন শত খণ্ডে ভগ্ন।

ঢেউয়ের সাদা সাদা ফেনাগুলি যেন দোলার মত আসা যাওয়া করিতেছে—দর্শন শাস্ত্রের আলোচনায় ডুবিয়া আছেন তাঁহারা। একজন হইলেন দার্শনিক, একজন ভক্ত, বৈষ্ণব আর একজন হইলেন রাজনৈতিক।

এই অপূর্ব্ব প্রকৃতির শোভার মধ্যে শক্তিধর পুরুষদের সম্মেলনের কথা ভাবিয়া মন ছিল একেবারে তন্ময়—এমন সময়ে মন্দিরে সন্ধ্যারতির শঙ্খ, কাঁসর, ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। মোহন্ত আমাদের লইয়া মন্দিরে চলিলেন। আরতির পর মোহন্ত আমাদের প্রসাদ লইয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। ব্রজেন শীল মহাশয় শরীরটা ভাল ছিল না বলিয়া জ্ঞানাঞ্জনকে লইয়া চলিয়া আসিলেন।

আমি ও বিপিনবাবু প্রসাদ পাইবার আশায় রহিয়া গেলাম। মোহন্ত মন্দির-প্রাঙ্গণে ভক্ত অতিথিদের লইয়া বসিয়া গেলেন—একজন ভক্ত সকলের পাতে প্রসাদ বিতরণ করিতে লাগিলেন—ভাত, ডাল, শাক, আর একটি বড় আমকে বিশ টুকরা করিয়া সকলের পাতে পাতে দিয়া গেলেন। এইসব ছিল ভক্তদের ভিক্ষালব্ধ পাঁচ-মিশান চাল-ডাল বালিতে ভরা।

খাওয়ার সময়ে পদে স্বাদে ভাল না লাগিলেও ভাবে ভাল লাগিয়াছিল। কারণ, যাহা আছে তাহা দিয়াই অতিথি-অভ্যাগতের কাছে কোন প্রকার দৈন্য প্রকাশ বা অনুনয় বিনয় না করিয়া প্রাণের প্রাচুর্য্য-রসে পরিবেশন করা—আর আহারে, বিহারে সাম্যের জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিলাম জীবনে সেই প্রথম—হরিদাস বাবাজীর মঠে। আর লক্ষ্য করিলাম বিপিনবাবুর চোখ মুখ এক অপূর্ব্বভাবে ভরিয়া উঠিয়াছে।

একদিন আমরা অক্ষয় বট দেখিতে গেলাম। প্রকাণ্ড মন্দির। মন্দির-প্রাঙ্গণে বকুল তলায় সতের আঠার বৎসরের একটি পাণ্ডা, যাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণের আশায় উচ্চ কণ্ঠে ভাগবৎ পাঠ করিতেছে। মন্দিরের দ্বারে বিশাল ভুঁড়ি বাহির করিয়া একটি পাণ্ডা বসিয়া আছেন। তাঁহার কাজ হইল যাত্রীদের কাছ হইতে পয়সা আদায় করা। পয়সা না থাকায় একটি বৃদ্ধাকে মন্দিরে ঢুকিতে দিল না দেখিয়া, বিপিনবাবু একেবারে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "পয়সা বোল, পয়সা বোল, পয়সা বোল—হরিবোল কিরে—ভগবান দীনের না ধনীর! এর হাতে পয়সা নেই বলে একে মন্দিরে ঢুকতে দিলে না।" দুই চক্ষু একেবারে জলে ভরিয়া আসিল।

মহাপ্রমাদ গণিয়া ছুটিয়া কাছে আসিলাম। সঙ্গে সব মেয়েরা ছিলেন। মন্দিরের ভিতর মোহন্তকে অপমান—না জানি কি ঘটে—কিন্তু দেখিলাম বিপিনবাবুর আবেগ ও তেজপূর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া মোহন্ত যেন একেবারে হতভম্বের মত হইয়া গেলেন। পরে অনেক অনুনয় বিনয় সহকারে আমাদের মন্দিরে ঢুকিতে বলিলেন। বিপিনবাবু গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিলেন, "তোমার মন্দিরে ভগবান নেই, পয়সা আছে"—বলিয়া আমাদের লইয়া চলিয়া আসিলেন। এবং চলিতে চলিতে বলিতে লাগিলেন "ফরাসী বিপ্লবে যেমন পোপ ও গীর্জ্জা সব ধ্বংস করেছিল, আমাদের দেশেও এই সব মন্দির ও মোহন্ত সব ধ্বংস না করলে আর কল্যাণ নেই"—সেই ব্যথা ভরা মুখ আজও মনে পড়ে।

বিপিনবাবু নাই, কিন্তু তাঁর খুঁটিনাটি স্মৃতি এখনও মনের খাতায় আলোর অক্ষরে জল জল করিতেছে।

তবু

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়

জলের বুকে টানলে রেখা
যায় না যেমন ধরা,
তেমন ক'রেই ভুলতে বল
বেদন ব্যথা-ভরা।

আজকে যারে আপন বলি'
জড়িয়ে ধরি পরাণ মেলি',
তুমি ভাব—কাল্‌কে তারে
শক্ত মনে করা?

আজকে দুটো মুখের কথায়
বিদায় যেমন নেবে,
ভাবছ বুঝি ভুলে যাওয়া
তেমন সোজা হবে?

আপন এজন নয়ক' ভেবে
আজকে যারে ঠেলে দেবে,
হিয়ার গোপন-কোণে সে জন
রইবে না কি ধরা?

বিগত বসন্ত

শ্রীনমিতা মজুমদার

ফটিক যখন গ্রামের পড়া শেষ করিয়া কলিকাতার কলেজে পড়িতে আসিল, তখন তার তরুণ মুখে কচি গোঁফের কাল রেখার আভাস সবে সুরু হইয়াছে। বয়সের অনুপাতে দেহটা হঠাৎ দীর্ঘ হইয়া গিয়াছে বলিয়াই কঠিন হইতে পারে নাই! দেহ যতই বাড়ুক—তার বড় চোখ দু'টিতে এমন একটি সরল শ্রী মাখান যাহাতে মন বলে—ছেলেটির মনটি ভিতর হইতে কেবলি ভরিয়া উঠিতেছে; পাকিয়া ওঠে নাই।

বাপ বলিলেন,—আই. এ.-টা এখানেই পড়ুক্ না কেন—সে রকম কলেজ তো সহরে আছেই—সেও বেশী দূর নয়—মাইল কুড়ির মধ্যেই।

মা বলিলেন,—ও-কি আবার একটা কলেজ!

—তা' হ'লে ওখানে যে ছেলেরা আছে; তারা কি কেউই পড়ে না?

মা রাগ করিয়া বলিলেন—অত জানি না—শুধু জানি, ওখানে যারা আছে, তারা সকলেই আমার ছেলে নয়। আমি অত ভাবতে পারি না—এই এক ভাবনাতেই পাগল করে' দেয় যে।

বাপ বলিলেন—তথাস্তু।

মা বিবাহের পূর্বে বাপের ঘরে কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন; তাঁর একটা ধারণা ছিল—কলিকাতায় না পড়িলে, ঠিক মত পড়া হয় না। আর ছেলে যখন কাছেই থাকিল না, তখন কলিকাতায় থাকিতে দোষ কি! তাঁর কাছে কুড়ি মাইল আর দু'শো মাইলে বিশেষ কিছুই তফাৎ নাই।

একটা কলেজ ঠিক করিয়া ফটিক তারই হস্টেলে আসিয়া উঠিল। কলিকাতা তাহার কাছে একেবারে নূতন নয়। ছেলেবেলাটা তার এখানেই কাটিয়াছে, প্রায় বছর দুই বয়স হইতে; বাপ যখন বদ্‌লি লইয়া গ্রামে চলিয়া আসিলেন—তখন ফটিকের বয়স সাত। অবশ্য ইতিমধ্যে আর কলিকাতায় আসিবার মত বিশেষ কোনও কারণ ঘটে নাই।

তাই এই বৃহৎ নগরীকে ফটিকের যেন নূতন বলিয়া বোধ হইল। চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া মনে হইল—কলিকাতার কোথায়ও সবুজের চিহ্নমাত্র নাই, যেটুকু আছে সেও এমনি শ্রীহীন যে, মনে হয় বিদ্রূপ। ছোটবেলাটাও কি এমনি ছিল—এমনি বিশ্রী—কই তখন তো সবুজ নাই বলিয়া মনে পড়ে নাই!

রাত্রে হস্টেলের কোণের খাটে দেহ রাখিয়া কেবলি মনে পড়িতে লাগিল বাড়ীর কথা। মা চোখমুখ ছল্‌ছল্ করিয়া মাথায় হাত বুলাইতেছেন। ছোট বোন দুর্গা নীচু হইয়া প্রণাম করিয়া বলিতেছে—চিঠি দিয়ো দাদা—ভুলে যেওনা যেন। বাবা ডাকিলেন—খোকা, আর দেরী কর' না।

দুর্গা বড় হইয়া উঠিয়াছে—এমন কি বড়? তারও চেয়ে প্রায় দুই বছরের ছোট, তবু না-কি বড় হইয়া গিয়াছে!

সেদিন ওপাড়ার মিত্তিরদের বড় গিন্নী আসিয়া বলিলেন—তাইত দিদি, অনেকদিন আসিনে এদিকে—তোমার দুর্গা তো বেশ বড় হয়ে উঠ্‌ল দেখ্‌চি!

মা তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিলেন—না দিদি, এমন কি বয়েস? একটু বাড়ন্ত গড়ন তাই—ও যে আমার ফটিকের ছোট।

মিত্তিরগিন্নী হাসিয়া বলিলেন—জানি ভাই, তাতো জানিই। কি জানো দিদি, মেয়েরা যেন বেড়ে ওঠ্‌বার জন্যেই জন্মেচে: ওরা যে মা হবে—ওরা জানে ওদের অনেক সইতে হবে—তাই ছেলেদের ছাড়িয়ে ওঠে।

আজ বাড়ীর কথা বড় বেশী করিয়া মনে পড়িতেছে—কিছুতেই থামিতে চায় না।

আসিবার সময়ে লক্ষ্মীটা কিছুতেই দেখা করে নাই। খুব রাগ করিয়া, মুখ ভার করিয়া সেদিন বলিয়াছিল—দেখো ফটিকদা', কল্‌কাতায় যেওনা বল্‌চি—খবরদার্ বল্‌চি।

এই ছোট মেয়েটির এই কিশোর ছেলেটির 'পরে মান-অভিমান, ভৎ'সনা-শাসন, আদর-যত্ন কিছুরই যেন

ত্রুটি নাই। যেন এ তাহার একেবারে নিজের অধিকার। জন্মিবার কালে বিধাতা তাহাকে সহজাত-কবচের মত এটি দিয়া দিয়াছেন—তাই এত সহজে এই ছেলেটির কাছে আপনাকে খুলিয়া ধরে।

—কেন রে? কলকাতার ওপর তোর এত রাগ কেন? সে বুঝি তোর "চোখের বিষ?"

মেয়েটিরও গুণের সীমা নাই। যাহাকে দেখিতে পারে না, তাহার এম্‌নি নামকরণের আর অবধি নাই।

লক্ষ্মী কুলের আচারের কিছুটা মুখে পুরিয়া দিয়া চোখ বুজিয়া চর্বণ করিতে করিতে বলিল, তুমি কিছু জান না ফটিকদা'। ঠাক্‌মা বলছিল কল্‌কাতার কলেজে পড়ে যে ছেলেরা, তারা খেষ্টান হয়ে যায়—ঠাকুর মানে না, দেবতা মানে না। শুন্‌লে আশ্চর্য হবে—ওদের অম্বিকেচরণ, ওই যে ওই ঘোষেদের ছেলে গো—কল্‌কাতা থেকে এসে ষষ্ঠীতলায় দাঁড়িয়ে বল্‌লে—ও আবার ঠাকুর নাকি? ওতো নুড়িতে সিঁদূর-মাখান। মাগো-মা, খেষ্টান নয় ত কি? হাসচো যে—সত্যি বলচি—আমি সেখানে ছিলুম যে! বিশ্বেস করচ না—এই স্বকর্ণে শুনেছি—এই বলিয়া লক্ষ্মী নিজের কাণে হাত রাখিল।

ফটিক শুধু হাসিয়া বলিয়াছিল—দূর পাগলী!

তাহার এত বড় নিষেধ সত্ত্বেও, তাহাকে এমন করিয়া অমান্য করিয়া তারই ফটিকদাদা যে কলিকাতায় পড়িতে যাইবে—সেই দুঃখেই হউক বা অন্য কোনও কারণেই হউক—আসিবার সময়ে লক্ষ্মী দেখা করিতে আসিল না।

এদিকে পাড়া ভাঙিয়া বাড়ীতে আসিয়া ভরিল।

গরুর গাড়ীতে মাইল দু'য়েক যাইবার পর পড়ে রেলের পথ। বাড়ী ছাড়াইয়া, বটতলা পারাইয়া গরুর গাড়ীতে চলিতে চলিতে ফটিকের মনটা কেমন করিতে লাগিল। নদীর ধারটা যখন শেষ হইয়া গেল, তখন যেন ভিতরটা হু-হু করিয়া উঠিল—এখানে তাদের তিনজনের কত দুপুর কাটিয়াছে।

এম্‌নি সময়ে পড়িল ষষ্ঠীতলা—ঐ লক্ষ্মী না? ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলগুলি কাঁধে মুখে বুকে আসিয়া পড়িয়াছে—ডুরে শাড়ীর আঁচলে কি একটা পুঁটুলি করিয়া বাঁধা। ফটিকের চোখ ছলছল করিয়া উঠিল, ছই হইতে মুখ বাড়াইয়া ডাকিল—লক্ষ্মি!

ডাক শুনিয়া মেয়ের কি হইল কে জানে, একেবারে ছুটিয়া গিয়া বড় অশ্বত্থ গাছটার আড়ালে লুকাইল, রাস্তাটা ঘুরিয়া যাইবার সময়ে ফটিক দেখিল, লক্ষ্মী মুখের চুল তুলিয়া এই দিকে চাহিয়া আছে। মন বলিল—যেন ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে—হয় তো কাঁদিতেছে, কিন্তু না ফটিকের এ দেখার ভুল, লক্ষ্মী তো কাঁদিবার মত মেয়ে নয়।

হস্‌টেলের ছেলেদের মধ্যে ফটিক নিজেকে মেলিয়া ধরিতে পারিল না। তাদের আলাপের মধ্যে সুধার চেয়ে, বিষের ভাগ ছিল বেশী। অথচ মনে হয় যেন এই ছেলেটির জন্য তাদের ভাবনার আদি-অন্ত নাই। তাহাকে লইয়া আলোচনা ও তর্কের আর শেষ নাই। ছেলেরা বলে—বাছা, কলকাতায় তো মানুষ হয়ে গেছ, তখনও কি এম্‌নি ছিলে?

হয়তো না—ছেলেবেলার স্বভাবটাই আলাদা, হাতের কাছে যাহা পায়, তাহাকেই আপন করিয়া লইতে বাধে না। নাড়ীর জারক রসটা তখনও শুকায় না। ছোট-বেলায় কলিকাতা তাহার ইঁট-কাঠ, দোকান-বাজার, লইয়া এমন করিয়া পীড়া দেয় নাই।

ছেলেরা যখন তর্কে, চীৎকারে ফাটাইয়া একেবারে আগুন হইয়া উঠিত—তখনও ফটিক চুপ করিয়া থাকিত—ছেলেরা জানিত—কোথায় তার সবচেয়ে মর্মান্তিক আঘাত করিবার স্থান—তাই বাড়ীর কথা উঠিলেই সে চোখমুখ ছলছল করিয়া উঠিয়া আসিত। সহরের ছেলেদের কাছে এও যেন একটা বিশেষ আমোদ বলিয়া বোধ হইত।

কেবল একটি ছেলে তাহাকে চিনিতে পারিল—সে শচীন। শচীন বুঝিল, ছেলেটি তর্ক করিতে পারে না বলিয়াই করে না—তাহা নহে; ভালবাসে না বলিয়াই করে না। তার চেহারায়, আর তার স্বভাবে, শচীনকে যেন বিশেষ করিয়া টানিল।

একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে চুপ করিয়া বসিয়া আছে ফটিক—এমন সময়ে আসিল শচীন। আলো জ্বালাইয়া

বড় স্নিগ্ধ স্বরে বলিল—এমন করে' বসে আছ যে, চল বাইরে যাই।

ফটিক শচীনের মুখে দু'চোখ মেলিয়া ধরিল, তার ঠোঁট দু'টি কাঁপিতে লাগিল,—এমন স্বর সে এখানে শোনে নাই।

শচীন তার হাত ধরিয়া বলিল,—কি ভাবচ? বাড়ীর কথা।

এমনি করিয়া দুইজনে বাড়ীর আলাপ-আলোচনায় মিলিয়া ধীরে ধীরে কেমন করিয়া এক হইয়া গেল!

হস্‌টেলের বাকি ছেলেরা তো অবাক্! শচীনের মত স্কলার ছেলে তার মধ্যে দেখিল কি? তখন তাহারা তাকে লইয়া জোর করিয়া ফিল্‌ম দেখাইয়া, গান শোনাইয়া, দু'আনার টিকেট কাটিয়া ট্রামে ঘোরাইতে লাগিল। যখন তাতেও খুশী করিতে পারিল না—তখন রাগ করিয়া বাঙাল বলিয়া শচীনের রুচিকে ধিক্কার দিয়া গেল।

ছুটীতে ফটিক বাড়ী আসিয়াছে। এবারে লক্ষ্মী আর রাগ করিল না—বড় ভয়ে ভয়ে দেখিতে আসিল—কতখানি বদল হইয়া গেছে। ফটিক যখন তার হাত ধরিয়া বলিল—জানিস্ লক্ষ্মি, কল্‌কাতার চেয়ে আমাদের গাঁ অনেক ভাল, তখন আর তার কলিকাতার উপর কোনও আক্রোশ থাকিল না; এমন কি বসিয়া বসিয়া সে জোর করিয়া কলিকাতার গল্প শুনিতে লাগিল।

সব চেয়ে সান্ত্বনার কথা এই যে, তার ফটিক দাদা অন্য সকলের মত নয়—এমন বিশেষত্বমণ্ডিত যে, তাহার দ্বারা যেন কোনও অপরাধ হইতে পারে না।

তাহারও পরে বছর দুই কাটিতে চলিল। ইতিমধ্যে দুর্গার বিবাহ হইয়া গিয়াছে—চোখ মুছিতে মুছিতে কবে সে চলিয়া গেছে শ্বশুর-বাড়ী। মাঝে মাঝে অনুযোগ করিয়া সে লেখে চিঠি—সকলেই একেবারে ভুলিয়া আছ—ইত্যাদি।

দুর্গার কথায় শচীন চুপ করিয়া নিঃশ্বাস ছাড়ে—বলে, আহা! আমরা ওদের বড় হবার সময়টুকু পর্যন্ত দিই না, আমাদের এমনি তাড়া।

শচীনের সঙ্গে থাকিয়া ফটিকের অনেক বদল হইয়া আসিয়াছে—কলিকাতা আর আগেকার মত বিরাট্ ক্ষুধার পুঞ্জ নয়; আর একটা দিক তার চোখে পড়িয়াছে—সে তার আলোর দিক্।

বাহিরের দিকে চাহিয়া সে এখানকার মেয়েদের সঙ্গে দুর্গাকে লইয়া তুলনা করে—বুকটা যেন ভার হইয়া ওঠে। গ্রামে আমাদের হৃদয়টা পায় ছাড়া, সহরে আমাদের বুদ্ধি!

আই. এ. দিয়া ফটিক আসিল। লক্ষ্মী কেবলি বড় হইবার মুখে বাড়িয়া আসিতেছে; সে দেখিল, ফটিকদাদা যেন দূরে সরিয়া গেছে। ফটিকের চোখে তখন আলো লাগিয়াছে; সে বলিল—লক্ষ্মি, ভাল আছ? কিছুতেই তাহাকে তুই বলিতে পারিল না। দু'জনেই চুপ করিয়া থাকিল—কোনও কথা জমিল না, যেন মিলনের সেতুটা খসিয়া গেছে! লক্ষ্মী উঠিয়া দাঁড়াইয়া চলিয়া যাইতে চাহিল—তারপরে একটু মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইল।

ফটিক বলিল—কি?

—আচার, লক্ষ্মীর গলা কাঁপিয়া গেল।

সেই পূর্বদিনের মত এখনও শাড়ীর আঁচলে কুলের আচারটুকু বাঁধিয়া আনিয়াছে, মনে করিয়া ফটিক হাসিল, বলিল,—লক্ষ্মি, এখনও তুমি ছোটই আছ!

লক্ষ্মী কিছুই বুঝিল না—শুধু একটা অসহ্য যন্ত্রণায় তার গলা বুজিয়া আসিল, মুখের উপর আঁচলটা তুলিয়া দিয়া হাতচাপা দিয়া সে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

আরও কিছুদিন কাটিয়া গেছে। ফটিক বি. এ. পরীক্ষা দিয়া আসিল। দুর্গার ইতিমধ্যে একটি ছেলে হইয়া বছরখানেকের হইয়াছে। লক্ষ্মীও বড় হইয়া উঠিয়াছে, তার দুরন্ত চোখের 'পরে একটি শান্ত শ্রী নামিয়া আসিতেছে। দেখা হইলে, ফটিককে নীচু হইয়া প্রণাম করে। ফটিক হাসে, বলে,—ভাল আছ লক্ষ্মি?

লক্ষ্মী বলে—হাঁ, আপনি ভাল আছেন?

এই সময়ে মা ছেলের কাছে কথাটা তুলিলেন। ফটিকের মনে হয়, লক্ষ্মী যেন এখনও ছোটই আছে। একদিকে সে বাড়িয়া উঠিয়াছে—সে তার হৃদয়ের দিক্, যেখানে সে নারী; কিন্তু আর একদিক্‌টা যে তার শৈশবের আদিম গুহার অভ্যন্তরেই পড়িয়া রহিল, সে তার আলোর

দিক্, যেখানে সে মানুষ। মানুষ তো কেবল নারীকে লইয়াই বাঁচিতে পারে না, শান্তি হয়তো মিলিতে পারে —কিন্তু শান্তিই যদি মানুষের একান্ত কাম্য হয় তো সাধ করিয়া এত দুঃখ সে সাধিয়া লয় কেন?

ছেলে মাকে বলিল—মা, মনটাকে যে এখনও ঠিক্ বুঝতে পারি না।

মা বলিলেন—বাবা, তোমরা পড়তে গিয়ে এমন পড়াই পড়েছ যে, নিজেকেও পড়তে চাও। কিন্তু মন জিনিষটি তো এত সহজ নয়—তাকে বেশী করে' ধরতে গেলে সে কেবলি তলিয়ে যায়। যদি উপরে-উপরে, ভাসা-ভাসা কিছু বুঝে থাক তো তাই বল।

ছেলে তবু বলিল—একথা এখন থাক্। এত তাড়াতাড়ি তো কিছু নেই।

ফটিকের মতে যদি বিশ্বসংসার চলিত তো মেয়ের মা-বাপেরা কিছুকালের জন্য নিঃশ্বাস লইয়া বাঁচিতেন। তবু তাড়াতাড়িই করিতে হইল। লক্ষ্মী বড় হইয়াছে। দূর গ্রামের বেশ ভাল একটি ছেলে দেখিয়া লক্ষ্মীর বিবাহ হইয়া গেল। ছেলেটি বেশী পড়াশোনা করে নাই, কি হইবে বেশী পড়িয়া? দেখিতে শুনিতে ভাল, ঘরে ধান আছে—পুকুরে আছে মাছ, টাকা পয়সাও কিছু আছে—তার উপর আবার ভাল কুলীনের ঘরের ছেলে—তায় অল্প বয়স।

ফটিক তখন কলিকাতায়।

এবারে ছুটিতে ফিরিয়া যেন তার কেমন একটা বিস্বাদ লাগিল। কারণটা খুঁজিতে গিয়া ভিতরে ভিতরে একটা চমক্ লাগিয়া গেল। তাই লক্ষ্মীর কথাটা যতই মনের মধ্যে চাপা দিতে গেল, সে যেন ততই মুখ তুলিয়া দাঁড়াইল।

দুপুরের দিকে ফটিক চুপ করিয়া বসিয়া আছে—এমন সময়ে দুর্গা ছেলে কোলে আসিয়া দাঁড়াইল—দাদা!

—কি?

—কি ভাব্‌চ?

ফটিক হাসিল—কি জানি—হয়তো এমন কিছুই না।

দুর্গা হঠাৎ বলিল—লক্ষ্মীকে যদি বিয়ে করতে তো ভাল কর্‌তে দাদা।

ফটিক বোনের মুখের দিকে তাকাইয়া হাসিয়া কহিল —কেন রে?

দুর্গা বলিল—বিয়ের পরদিন যাবার আগে দেখা করতে গেলুম। পাল্কী এসে দাঁড়িয়েচে উঠোনে। খুঁজে খুঁজে দেখি কনে' সেজে একলাটি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে পুবকোঠাতে, মনে পড়্‌ল কতদিন আচার চুরি করে' এই ঘরটাতে বসে' আমরা তিন জনে খেয়েচি। আমাকে দেখেই ছুটে এলো দু'হাতে গলা জড়িয়ে ধরে' বুকে মুখ রেখে সে—কি কান্না! ওর অত কান্না যে কি করে' চেপে রেখেছিল ভেবে পাইনে। আমার চোখ দিয়ে জল পড়্‌তে লাগ্‌ল—জল মুছে বল্‌লুম—লক্ষ্মি, এমন করে' কাঁদ্‌তে যে নেই বোন্—এতে স্বামীর অকল্যাণ হবে।

এক হাতে চোখের জল মুছে আর এক হাতে আমার গলা ধরে ভাঙা গলায় বল্‌লে,—দুর্গাদিদি, সব যে বদল হয়ে গেল ভাই!

ফটিকের মুখে যেন কে দোয়াতভরা কালি উপুড় করিয়া ঢালিয়া দিল—বুকের ভিতরটা অকস্মাৎ তীব্র যন্ত্রণায় মোচড় খাইয়া উঠিলে যেমন হয়—ঠিক্ তেম্‌নি

ফটিকের বুকের ভিতরটা যখন অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়া আসিল, তখন একে একে সমস্ত ঘটনাগুলি তার মনে পড়িতে লাগিল। বড় বেদনার সঙ্গে মনে পড়িল সেই আচার লইয়া ফিরিয়া যাওয়া, বালিকা হয়তো সে দিনেই তার মূল্যটুকু বুঝিয়াছিল, তাই কাঁদিয়া ফিরিয়াছিল। তার কাণের কাছে বাজিতে লাগিল—ফটিকদাদা, কল্‌কাতায় যেওনা বল্‌চি, খবরদার বল্‌চি।

একবার যখন তার জ্বর হয়—তখন কোথা হইতে অমন দুরন্ত মেয়েটি একেবারে মুহূর্ত্তেকের মধ্যে শান্ত হইয়া গেল। তার শিয়রের কাছটিতে দিবারাত্র চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত আর চোখ বুজিয়া কপালে হাত রাখিয়া উত্তাপ পরীক্ষা করার বৃথা চেষ্টা করিয়া বলিত—ফটিকদাদা, ভয় ক'র না, শীগ্‌গীর সেরে উঠ্‌বে তুমি।

হায় রে ফটিক! এত বড় জিনিষ এত সহজে পাইয়াছিলে বলিয়াই চিনিতে পার নাই—যদি মূল্য দিয়া চিনিতে হইত তো আপনাকে নিঃশেষ করিতে হইত।

দুই হাত জোড় করিয়া বুকে রাখিয়া, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে, যখন চোখ জলে ভরিয়া আসিল—তখন মনে মনে সে বলিল—আহা! সুখী হোক্ সুখী হোক্। স্বামীর স্নেহে ভরিয়া থাক্ তার তরুণ জীবনটি। পূর্বদিনের কোন দাগ, কোন রেখা আর তাহাতে না থাক্। বিধাতার হাতে লক্ষ্মী যাহার আপন হইল সেই যেন তার আপন হয়—আমি তো মাঝখান হইতে দিন কয়েকের মাত্র।

এমনি করিয়া বেদনার সঙ্গে ত্যাগ করিয়া ফটিক যেন শান্ত হইতে চাহিল।

এইবারে তার এম. এ. পড়িবার শেষ বছর। এরই মধ্যে একদিন অসুস্থ হইয়া মেসে শুইয়া পড়িল ফটিক; খবর পাইয়াই আসিল শচীন। আসিয়া দেখে জ্বরে যেন একেবারে আগুন হইয়া আছে—চোখ জ্বলিতেছে—মাথা ছিঁড়িয়া পড়িতেছে। ডাক্তার আসিয়া মুখ ভার করিয়া চলিয়া গেলেন। কলিকাতায় তখন মেনিঞ্জাইটিসের হাওয়া বহিয়াছে।

শচীন শিয়রের কাছে বসিয়া বরফের ব্যাগ হাতে চোখ মেলিয়া রহিল—আর জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকিতে লাগিল ফটিক—মা, তুমিই ঠিক্ বুঝিয়াছিলে—মন জিনিষটা কি অন্তহীন!

কখনও ক্লান্তিতে ভাঙিয়া আসিত গলা—লক্ষ্মি, মাপ ক'র, মাপ ক'র আমাকে।

মাঝে মাঝে বোধহয় যন্ত্রণা যখন বড় তীব্র হইয়া বাড়িয়া ওঠে, তখন পাগল হইয়া বলিয়া ওঠে—দুর্গাদিদি, তার চোখে যে জল পড়েছিল, সে-কি অনেক জল?

ডাক্তারে আর শচীনে এই দুই জনে মিলিয়া ফটিককে বাঁচাইতে পারিল না। এক শেষ রাত্রে বড় বড় চোখ মেলিয়া যেন কাহাকে খুঁজিয়া—ক্লান্ত হইয়া ফটিক চোখ বুজিল—আর খুলিল না।

শ্মশান হইতে যখন ফিরিল শচীন, তখন শূন্য ঘর খাঁ-খাঁ করিতেছে। ঘর যে এত ফাঁকা হইতে পারে, তাহা শচীন কোনদিনও এমন করিয়া জানে নাই।

অস্থির হইয়া ফটিকের ব্যবহৃত সমস্ত জিনিষ নাড়িয়া সে শান্ত হইতে চাহিল। সুটকেসের মধ্য হইতে বাহির হইয়া পড়িল কয়খানি চিঠি। দু'একখানি মায়ের আর একখানা দুর্গার। আর একখানা চিঠি মলিন হইয়া ছিঁড়িয়া আসিয়াছে, বোধ হয় বহু পূর্বেকার লেখা। মনে হয় যেন ভাঁজ খুলিয়া, কেহ বারবার করিয়া চিঠিখানা পড়িয়াছে। যে পড়িয়াছে তার উষ্ণ নিঃশ্বাসের স্পর্শ এখনও ইহাতে লাগিয়া আছে, মনে করিয়া শচীনের চোখ জলে ভরিয়া আসিল। খুলিয়া দেখে রুলটানা কাগজে বড় বড় বাঁকা বাঁকা লেখা—

"ফটিকদা', আমার মাসীর বিয়েতে সহরে গিয়েছিলুম। কি আশ্চর্য শহর—কত গাড়ী-ঘোড়া; তোমার কল্‌কাতাও নাকি অমনি? দুর্গাদিদি বলে, ঢের ঢের বড়। সত্যি কথা তোমাকে বল্‌চি—ফটিকদা', আমার দম যেন ফুরিয়ে আস্‌ছিল, তোমার কথাই ঠিক্—আমাদের এই গাঁ-ই সবচেয়ে ভাল। কি হাওয়া বলো দিকিন্।
তুমি এ সব কথা আর কাউকে ব'লনা যেন
আমার বাপু তাহ'লে ভারী লজ্জা কর্‌বে—তাহ'লে তোমার সঙ্গে জন্মের মত আড়ি।

আর কি জান—মা এবারে খুব ভাল ভাল আচার করেচে—অবিশ্যি আমি খাইনি, তোমার জন্যে চুরি করে' রেখেচি—তুমি কবে আস্‌বে? ইতি লক্ষ্মী।"

চিঠিখানা রাখিয়া শচীন একখানা খাতা খুলিল। ইদানীং ফটিককে লেখারোগে ধরিয়াছিল—একটা পাতা উল্‌টাইতে চোখে পড়িল—

"আমি না হইলাম সহরের, না থাকিলাম গ্রামের। কলিকাতার সমস্ত আলোর দিক্ হইতে শুরু করিয়া তার ইঁট-কাঠ, ধোঁয়া-ধূলা, তার অকারণ কলরব সমস্ত কিছুকে অম্লান হইয়া নিজের করিয়া লইতে পারিলাম না। গ্রামের ভালবাসা, তার সরলতা, পাড়াপড়্‌শী হইতে সুরু করিয়া তার ষষ্ঠীঠাকুর, তার ছোঁয়ানাড়া সব কিছুকেই আর সত্য বলিয়া নির্বিবাদে মানিয়া লইতে পারিলাম না।

আসল কথা—আমি একেবারে পুরো কাহারও হইলাম না। একটা ভাবনা লাগে—মানুষ কি কেবলি শান্তি চায়, না কেবলি জানিয়া বাড়িতে চায়? বোধহয়

কিছুই সত্য নয়—এই দুইটা মিলিয়াই জীবন। যে মানুষ কেবলি বসিয়া আছে, সে বসাও যেমন সত্য নয়; তেম্‌নি যে কেবলি চলিয়াছে, সেও কোন পথ চেনে নাই। এই দুই উল্টাদিকের পদক্ষেপের যে মিলন, সেই সবচেয়ে সত্য। কিন্তু সবচেয়ে বেদনার এই যে—আমরা ঠিক্ সময়ে এই মিলনটাকে মিলাইতে পারি না, যখন আঘাত খাইয়া জাগিয়া উঠি—তখন দেখি, সময় কখন চলিয়া গেছে!"

ফটিকের মা যখন এই খবর পাইলেন, তখন একেবারে আছাড় খাইয়া পড়িলেন; দুর্গা মায়ের হাত ধরিয়া বসিয়া রহিল।

শেষ রাত্রে লক্ষ্মীদের বাড়ীতে একটা তুমুল কান্নার রোল উঠিল। লক্ষ্মী বাপের বাড়ীতে আছে—পরশুদিন খবর আসিয়াছে;—তার স্বামী ম্যালেরিয়া জ্বরে পড়িয়া পড়িয়া ভুগিতেছিল—মারা গিয়াছে। হয়তো তারই শোকটা সহিতে না পারিয়া লক্ষ্মী আজ পুব্‌কোঠার ঘরখানায় গলায় দড়ি দিয়া মরিল।

মাসকয়েক কাটিয়া গেছে। গ্রামটা যেন বেদনায় ফাটিয়া শতখান হইয়া আছে চৈত্রের রৌদ্রে। দুর্গাকে লইবার জন্য শ্বশুরবাড়ী হইতে পাল্কী আসিয়াছে।

কি মনে করিয়া দুর্গা লক্ষ্মীদের পুব্‌কোঠার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। ঘরের কবাটে মুখ রাখিয়া এতদিনের শান্ত-সমাহিত মেয়েটি একেবারে হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সায়াহ্নে

শ্রীনির্ম্মল বন্দ্যোপাধ্যায়

আজি বিজন পুলিনে বসি' নিরজনে
জাগে মনে কত কি যে;
কত ভাব-হিন্দোল দেয় কত দোল
মোর মন-সরসিজে!

একেলা বসিয়া শ্যাম নদীতটে
কত কথা পড়ে মনে;
শ্যাম ছায়া ফেলি' ঘনায় আঁধার
বাটে, তটে, উপবনে।
আঁধারের কম পরশ করুণ
নদীপারে ডাকে ক্রৌঞ্চ-মিথুন
ওরে কোন্ ভুলে হেথা সকলি ভুলিয়া,
গড়িলি ভুলেরি ভবনে
হেথা বাঁধিলি ভুলের ঘর;
রম্য হর্ম্ম্য জাগায়ে তুলিলি
বালুর বাঁধের 'পর।

সাজাতে তাহারে কত না যতন,
কত শত ফেরে, কত আয়োজন,
তাহারে ঘেরিয়া কত না বপন,
কত সাধ, কত স্বপনে!
কবে ভাঙিবে রে তোর ভুল?
কাটিবে রে তোর মোহের এ ঘোর
অকূলে পাইবি কূল?
চিনে ল'বি তুই আপন সে জন
নহে যাহা মায়া, নহে রে স্বপন,
মিটাবি রে তোর তৃষা সে পরম
লভিয়া শরণ চরণে।

গান ও স্বরলিপি

দেশী টোড়ী—ত্রিতাল (মধ্য লয়)

এস প্রিয় আরো কাছে
পাইতে হৃদয়ে হে, বিরহী মন যাচে।
দেখাও প্রিয় ঘন
স্বরূপ মোহন
যে রূপে প্রেমাবেশে পরাণ নাচে ॥ *

কথা—নজরুল ইস্‌লাম্‌ — স্বরলিপি—শ্রীনিতাই ঘটক

স্থায়ী

০   ১   +   ৩
II -া সা রা মপা | জ্ঞরা -জ্ঞমজ্ঞা রা সা | রা -জ্ঞরা -জ্ঞরা -সা | ণ্সা -ণ্সা -া -া I
০ এ স প্রি | য় ০০০ আ রো | কা ০ ০ ০ | ছে০ ০০ ০ ০

-া সা রা মপা | জ্ঞরা -জ্ঞমজ্ঞা রা সা || -া সা মা -রা | মা পা মপা -া I
০ এ স প্রি | য় ০০০ আ রো | ০ পাই তে ০ | হৃ দ য়ে০ ০

-া পা -া মা | ধা পা মা পা | রা -জ্ঞা -ামজ্ঞ সা | -রা ঃজ্ঞরঃ -ণ্সা -ণ্সা II
০ হে ০ বি | র হী ম ন | যা ০ ০ চে | ০ ০ ০০ ০০

অন্তরা

০   ১   +   ৩
II -া মা পা -া | র্সা ণর্সা র্সা র্সা | র্সর্রা র্সর্রজ্ঞা র্রা র্সা | ণর্সা -ণর্সা র্সপা -া I
০ দে খা ও | প্রি য় ঘ ন | স্ব০ রূ০০ প মো | হ০ ০০ ন ০

মা মা পা পধা | মপা -া জ্ঞরা -জ্ঞা | রসা -রা -ণ্সা -ণ্সা | সা মা -রা মা I
যে রূ পে প্রে০ | মা০ ০ বে ০ | শে ০ ০০ ০০ | প রা ০ ণ

পা -ণধা পমা -পা | -মজ্ঞরা -জ্ঞা -সরা -ণ্সা II II
না ০ চে ০ | ০০ ০ ০ ০

---

* গানখানি শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী মহাশয় এইচ্‌. এম্‌. ভি. রেকর্ডে গাহিয়াছেন।

চন্দননগর : ১৬৭৩—১৯৪০

শ্রীহরিহর শেঠ

৩

১৮৩৮—ওগুস্তে বুরগঁয় (Auguste Bourgoin) প্রধান নিযুক্ত হন।

১৮৩৯—বৃটীশদের সহিত চুক্তি অনুসারে ১লা আগষ্ট হইতে লবণের পরিবর্ত্তে বৎসরে ২০০০০৲ টাকা ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের করাসীদের দিবার ব্যবস্থা হয়।

১৮৪১—স্যাস্ত হিলের (St. Hilaire) এড্‌মিনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত হন।

দুর্গাচরণ রক্ষিত মহাশয়ের জন্ম হয় ২৯শে সেপ্টেম্বর।

১৮৪৩—সেণ্ট পোরশাঁন্ (St. Pour Cain) অস্থায়ীভাবে শেফ্ দে সার্ভিস্ নিযুক্ত হন।

১৪৪৪—ল দে ক্লাপেরন (Law de Clapernon) শেফ দে সার্ভিস নিযুক্ত হন।

১৮৪৫—করাসীরা সমস্ত জমির জন্য যে কর দিয়া থাকেন, তাহার সম্পূর্ণ শাসনাধিকারের দাবী বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ২৩শে এপ্রেলের ১০৮৬ সংখ্যার অর্ডার দ্বারা মঞ্জুর করেন।

১৮৪৭—বারাশতের শিবমন্দিরচতুষ্টয় কাশীনাথ শ্রীমানীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৪৮—ভিগনেতি (A. Vigneti) শেফ্ দে সার্ভিস্ নিযুক্ত হন।

১৮৫২—লোকগণনায় স্থির হয় জনসংখ্যা ৩২৬৭০

১৮৫৩—৩১শে মার্চ্চ ইংরাজ ও করাসীর সহিত চন্দননগরের সীমা-নির্দ্ধারণ বিষয়ে চুক্তিপত্র ফ্রান্সের পারীনগরে ফ্রান্সের রাজার পক্ষে ড্রুয়েঁ দে লিস্ (Drouin de Lhuys) এবং ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার পক্ষে কাউলে (Cowley) দ্বারা সম্পাদিত হয়। ইহাতে ইংরাজদের ছাড়িয়া দিতে হয় প্রায় ৩৬ বিঘা এবং তৎপরিবর্ত্তে পায় প্রায় ১৯১ বিঘা। করাসীদের পূর্ব্বে কর দিতে হইত ১৪৬৬৸৫, তাহা হইতে ১৫৮৴১১॥ পাই কমিয়া যায়।

১৮৫৫—লা ক্ল্যাভেরি (La Claverie) অস্থায়ীভাবে শেফ্ দে সার্ভিস্ নিযুক্ত হন। পরে হাই (I. Hayes) পাকা ভাবে নিযুক্ত হন।

১৮৫৬—মারা (Maras) শেফ্ দে সার্ভিস্ নিযুক্ত হন।

১৮৫৭—ল দে ক্লাপেরন্ (Law de Clapernan) শেফ্ দে সার্ভিস পদে পুনর্নিয়োগ।

১৮৬০—হাই (I. Hayes) শেফ দে সার্ভিস্ পদে পুনর্নিয়োগ।

হারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর গঙ্গোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির দ্বারা গড়বাটী বিদ্যালয়টী প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৬২ সেণ্ট মেরিস্ ইনষ্টিটিউশনের (বর্ত্তমান দুপ্লেস্ স্কুল) করাসী বিভাগ Brevet Elementaire পর্য্যন্ত পড়ান প্রথম আরম্ভ হয়।

১৮৬৩—ফাদার বার্থে চন্দননগরে আইসেন।

আশ্বিন মাসে দুর্গোৎসবের ষষ্ঠীর দিন ভীষণ ঝড় হয়।

১৮৬৫—দেরুসা (Derussat) শেফ্ দে সার্ভিস্ পদে নিযুক্ত হন।

মান্দ্রাজের গভর্ণর চন্দননগর ও পণ্ডিচেরীর শাসনকর্ত্তাদের মধ্যে বিনা খরচায় টেলিগ্রাফ-বিনিময়ের অধিকার দেন।

১৮৬৭—কনভেণ্ট বাটীটি এল্‌ফ্রেড কুর্জ্জন (Alfred Curjan) মেয়েদের শিক্ষার্থে দান করেন।

১৮৬৮—এই বৎসরের মধ্যে পর পর তিন জন শেফ্ দে সার্ভিস্ নিযুক্ত হন। প্রথম হেরভে (Herve) অস্থায়ী ভাবে, দ্বিতীয় বাইয়ে (Bayet), তৃতীয় দুরাঁ (Durand.)

১৮৬৯—ডিউক-অব্ কনোট্ ভারতভ্রমণে আসিয়া চন্দননগরে আসেন।

১৮৭১—ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের দ্বারা চন্দননগরের একটী মানচিত্র প্রস্তুত হয়।

ডাক্তার মারশাঁর দ্বারা কতিপয় মহোদয়ের অর্থানুকূল্যে বর্ত্তমান হাসপাতালটী প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়।

চন্দননগরে প্রথম বাঙ্গলা থিয়েটারে "প্রণয়পরীক্ষা" যদুনাথ পালিত মহাশয়ের অধ্যক্ষতায় অভিনীত হয়।

১৮৭৩—ত্রিগুণাচরণ পালিত মহাশয়ের প্রস্তাবে যদুনাথ পালিত, মহেন্দ্রনাথ নন্দী, হরিমোহন সুর প্রভৃতির উদ্যোগে চন্দননগর পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠিত হয়।

উর্দ্দি বাজারের মস্‌জিদ সেখ হামাদু কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৭৪—বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষের প্রভাব এখানেও বিস্তারলাভ করে।

১৮৭৫—গভর্ণমেণ্টের অর্থসাহায্যে, সাধারণের চাঁদা ও লটারিতে প্রাপ্ত অর্থে ফাদার বার্থের (Rev. Father Barthet) উদ্যোগে ব্রাদার জোয়াকীর (Brother Joachim) তত্ত্বাবধানে বর্ত্তমান রোম্যান ক্যাথলিক্ গির্জ্জাটীর নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয়।

ফেরিয়ে (Ferrier) শেফ্ দে সার্ভিস্ নিযুক্ত হন। ইংলণ্ডের রা সপ্তম এডোয়ার্ড যুবরাজরূপে ভারতভ্রমণকালে চন্দননগরে আইসেন।

১৮৭৭—লোকগণনায় স্থির হয় জনসংখ্যা ২২৫৩৯।

১৮৭৮—সেরজাঁ (Sergent) অস্থায়ী শেফ দে সার্ভিস্ নিযুক্ত হন।

১৮৭৯—ফেরিয়ে (E. Feriez) শেফ্ দে সার্ভিস্ পদে নিযুক্ত হন।

১৮৮০—উদেল্ (Endel) শেফ্ দে সার্ভিস্ পদে নিযুক্ত হন।

লে পেতি বেঙ্গলি (Le Petit Bengali) নামে একখানি ফরাসী সংবাদপত্র প্রথম প্রকাশিত হয়। চন্দননগরে মিউনিসিপ্যালিটির সৃষ্টি হয়।

১৮৮১—অক্ষয়তৃতীয়ার দিন বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

১৮৮২—ব্রহ্মের রাজকুমার মাইনগুন বারাণসী হইতে গোপনে পলায়ন করিয়া এইস্থানে আশ্রয় লন।

চন্দননগরের প্রথম সংবাদপত্র 'প্রজাবন্ধু' (সাপ্তাহিক) তিনকড়িনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া প্রথম প্রকাশিত হয়।

হাসপাতালের বর্ত্তমান বাটীতে হাসপাতালটী স্থানান্তরিত হয়।

১৮৮৩—ক্লেমাঁ থোমা (Clement Thomas) শেফ দে সার্ভিস্ পদে নিযুক্ত হন।

লোকগণনায় স্থির হয় জনসংখ্যা ২৬৭১৫।

দীননাথ চন্দ্র মহাশয় প্রথম বাঙ্গালী ম্যার পদে অধিষ্ঠিত হন।

২৬শে জানুয়ারী সেখ আব্দুল পাঁজারি ও হীরু বাগ্দীর প্রাণদণ্ড হয়। ইহাই এখানকার প্রথম প্রাণদণ্ড।

চন্দননগর ইংরাজ-হস্তে যাইবার জনরবে নাগরিকগণ শঙ্কিত হইয়া ১লা মে ফ্রান্সের সাধারণ তন্ত্রের অধিনায়ককে আবেদন করেন, যাহাতে চন্দননগর হস্তান্তরিত না হয়।

১৮৮৪—গির্জ্জাপ্রস্তুত শেষ হইলে কলিকাতার আর্চ্চ বিশপ ডাক্তার পল্ গেথেলস্ (Dr. Paul Gaethals) দ্বারা সেক্রেড্ হার্টের নামে উৎসর্গীকৃত হয়।

১৮৮৫—একোল দুর্গা নামক প্রাথমিক বিদ্যালয়টী দুর্গাচরণ রক্ষিত মহাশয় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাগবাজারের ব্রাহ্ম-উপাসনামন্দির অঘোরচন্দ্র ঘোষ ও কৃষ্ণমোহন দাস মহাশয়েদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। শিবকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের সম্পাদনায় "ধূমকেতু" নামক সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়।

শ্রীশ্রীখুক্তির মহোৎসব গোস্বামী মহাশয়েদের দ্বারা মহাসমারোহে আরম্ভ হয়।

১৮৮৬—দি বীভার (The Beaver) নামক একখানি ইংরাজী পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

১৮৮৭—সারিন (Sarine) শেফ্ দে সার্ভিস্ পদে অধিষ্ঠিত হন।

এই বৎসরই দাক্লাঁ সিবুর (Daclin Sibour) নামে অন্য এক ব্যক্তি এড্মিনিষ্ট্রেটর হইয়া আসেন।

দত্তের ঘাটের উপর ভূকৈলাসের রাণী তারাসুন্দরীর দ্বারা চাঁদনী ও বিশ্রামকক্ষ নির্ম্মিত হয়।

১৮৮৮—কারদিনেল (Le Cardinal) অস্থায়ীভাবে এডমিনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত হন।

পুরাতন পাত্রী সম্প্রদায় চন্দননগর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

চন্দননগর স্পোর্টিং ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। নন্দলাল দত্ত মহাশয় ইহার প্রথম অধ্যক্ষ হন।

১৮৮৯—মসিয়ে বনে (Bonnet) এড্মিনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত হন।

"The Amateur Workshop" নামে একখানি ইংরাজি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়।

১৮৯১—'বঙ্গপ্রভা' মাসিক পত্রিকা অদ্বৈত প্রেসে মুদ্রিত হইয়া বিপিনবিহারী কোলের দ্বারা প্রকাশিত হয়।

দুপ্লে কলেজ প্রথম স্থাপিত হয়।

১৮৯২—প্রোটেষ্টাণ্ট্ গির্জ্জা প্রতিষ্ঠিত হয়।

মসিয়ে ওব্রঁ লেকম্ত (Aubroy Lecomte) এড্মিনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত হন।

"চন্দননগর প্রকাশ" নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়।

১৮৯৪—নরহত্যাপরাধে শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্য নামে এক ব্যক্তির গিলোটীন হয়।

১৮৯৫—লেকস্ত (F. Lecost) অস্থায়ী এড্মিনিষ্ট্রেটর হন।

১৮৯৬—অনাথ আশ্রম (Orphanage) প্রতিষ্ঠিত হয়।

জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় চন্দননগরে প্রথম রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি পান।

মঃ ওরমিয়ের (Ormie'res) এড্মিনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত হন।

দুর্গাচরণ রক্ষিত মহাশয় চন্দননগরে প্রথম শেভালিয়ে লেজিয়ে দনার উপাধি প্রাপ্ত হন।

১৮৯৮—মঃ এসালিয়ে (Echalier) এড্মিনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত হন।

বঙ্গে যে ভূমিকম্প হয়, তাহাতে চন্দননগরেরও বিশেষ ক্ষতি হয়।

দুর্গাচরণ রক্ষিত মহাশয়ের মৃত্যু হয়।

(ক্রমশঃ)
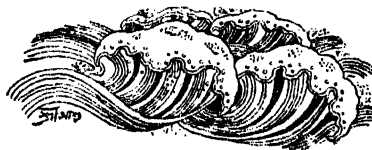
সত্যেন্দ্র-স্মৃতি

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

অনেক দিনের কথা।
ছেঁড়া ন্যাক্‌ড়ার পুঁটুলির মাঝে রয়েছে মৌনব্রতা।
স্মৃতিসত্রের পত্র-আঘাতে
ছিল যা' গোপনে মোর পসরাতে
সহসা কাঁপিয়া ওঠে,
মুখে তার বাণী ফোটে।
শ্রদ্ধাঞ্জলি শেফালির মত ঝরে,
এই বুকে ঢাকা সুনিভৃত কোণে
তোমার সমাধি 'পরে।

ছিল এক মুখ-চোরা
গুপ্ত-উৎস পাষাণের তলে, তখনো পাগ্‌লা-ঝোরা
হয়নি আলুল কুন্তল খুলি'
উপলে উপলে, মর্ম্মর তুলি'
ছোটেনি উর্দ্ধশ্বাসে
ছিল অজ্ঞাতবাসে।
সনেটে জমাট শিলীভূত তার বাণী,
পাথর খুঁড়িয়া আগল ঘুচায়ে
বাহির করিলে টানি'।

বেনামী বোর্‌কা পরি'
বাহির হ'ল সে বন্ধু তোমার দক্ষিণ পাণি ধরি'
স্বদেশী যুগের সে অরুণ রাগ
আকাশে বাতাসে ছড়াল যে ফাগ
তুমি আপনার করে
সে আবীর প্রেমভরে
মাখালে আমার চতুর্দ্দশীর মুখে,
এল সে বাহিরে হোলি খেলিবারে
লুকায়ে ছিল যে বুকে।

কতদিনে কত রাতে
লাজের বাঁধন শিথিল করিয়া দরদী সখার হাতে
খুলেছ আমার কবিতার খাতা,
রুদ্রাক্ষের মালা সম গাঁথা
ছিল সে সনেটগুলি,
একে একে নিলে খুলি'
ছদ্মনামের মুখোসেতে মুখ ঢাকি'
তোমার ঠেলায় ছাপার হরপে
কালির কি স্বাদ চাখি।

তুমি মধুকর ছিলে,
বিশ্ববাণীর মধু আহরিয়া মৌচাক বিরচিলে।
সে সুধার স্বাদ পেয়েছি আমরা
তীর্থ-সলিল আছে ঘট-ভরা
বাংলার ঘরে ঘরে,
তুমি আপনার করে
ভরেছিলে যাহা, নিখিল কবির বাণী
তোমার প্রসাদে বঙ্গভাষার
অমৃত-লিখনে জানি।

শুধু অনুবাদ নয়
ছন্দ-সুরের মধু নিক্কণে নিজ্‌ বাণী মধুময়
শুনায়েছ যাহা, তাঁর সুরধুনী
বহে কলতানে, বিস্ময়ে শুনি
বাংলার মরা গাঙে
শ্মশান-মৌন ভাঙে
অতীতের ধারা আবার ফিরিয়া আসে
সৌম্য শান্ত মূরতি তোমার
মুগ্ধ নয়নে ভাসে।*

* সত্যেন্দ্র সাহিত্যসত্রে পঠিত।

ঢাকাই মস্‌লিনের যুগ

শ্রীশ্রীশচন্দ্র গুহ বি. এল.

প্রাচীনকালে বয়ন-শিল্পে ভারতবর্ষ ভূমণ্ডলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল—তাহা কেহ অস্বীকার করে না। James Stuart Mill তাঁহার ভারতের ইতিহাসে (১৫ পৃঃ) লিখিয়াছেন—"The manufacture of no modern nation can vie with the texture of Hindoostan."

কোন জাতিই হিন্দুস্থানের বস্ত্রের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া উঠিতে পারে না।

সেই যুগের কার্পাস বস্ত্রবয়ন-শিল্পের চরমোৎকর্ষ বাংলার রাজধানী ঢাকাতেই সংসাধিত হইয়াছিল। ঢাকাতেই অদ্ভুত মসলিন বয়ন-শিল্পকলার জন্ম।

আবুল ফজলের আইনী-আকবরী হইতে জানা যায়, ঢাকা ও সোণারগাঁও বন্দরে যেমন উৎকৃষ্ট মস্‌লিন প্রস্তুত হইত তেমন আর কোথাও হইত না। ঢাকার মস্‌লিন এক অভাবনীয়, অচিন্তানীয় জিনিস ছিল। কল্পনাতীত সূক্ষ্ম সূতার দ্বারা মস্‌লিন প্রস্তুত হইত। কলকারখানার যুগেও তেমন সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত করা সম্ভবপর হয় নাই।

মস্‌লিন প্রস্তুতের প্রণালীর বিবরণ, Good old days of Hon'ble Jon Company (Vol. II., p. 431) নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকে আছে যে, মস্‌লিন প্রস্তুতির কার্য্য নানা বিভাগে বিভক্ত ছিল। টাকুয়াতে তরুণবয়স্কা স্ত্রীলোকেরা অঙ্গুলী চালাইয়া সূতা প্রস্তুত করিত। প্রাতের শিশিরে ঘাস ভিজা থাকা পর্য্যন্ত সূতা কাটা চলিত। কারণ রৌদ্রের উত্তাপ বৃদ্ধি পাইলেই সূতা ছিঁড়িয়া যাইত। মস্‌লিনের সূতা এত সূক্ষ্ম ছিল যে, এক রতি তুলাতে ৮০ হাত লম্বা সূতা হইত। এই সূতার তুলা জন্মিত ঢাকার নিকটবর্ত্তী স্থানে। অঙ্গুলীর টিপ ছাড়া ঐ তুলার আঁশে সূতা করা চলিত না।

১৮২০ খৃষ্টাব্দে ঢাকার একজন তাঁতী, চীন হইতে অর্ডার পাইয়া ২০ গজ লম্বা ২ হাত প্রশস্ত দুইখানা মস্‌লিন প্রস্তুত করে। তার ওজন হইয়াছিল মাত্র ১০½ তোলা। দিল্লীর বাদ্‌শাহদের পরিবারস্থ পরিজনের পরিধানের জন্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মসলিন ব্যবহৃত হইত। এই মস্‌লিন এমন মনোরম বস্তু ছিল যে, তাহার নামকরণও তদনুরূপ কবিত্বময় ছিল। কাহারও নাম ছিল 'আবরোয়ান' অর্থাৎ জলপ্রবাহ, কাহারও নাম ছিল 'সেবনেম' অর্থাৎ সান্ধ্য-শিশির। মস্‌লিনের যুগের প্রত্যক্ষকারী ইংরেজের ঐ বিবরণ ও তৎপূর্ব্বের অন্যান্য লেখকের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, মুসলমান বাদ্‌শাহদের পৃষ্ঠপোষকতায় মস্‌লিন-বয়ন-শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। বিলাসিনী বেগমদের বড় সখের সামগ্রী ছিল বলিয়াই উৎকৃষ্ট মস্‌লিন নবাব সরকার অসম্ভাবনীয় উচ্চ মূল্যে খরিদ করিয়া লইত। বাদ্‌শাহ ও নবাবরা রাজকোষ হইতে শিল্পীদিগকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করিতেন। এই সব প্রস্তুতির জন্য বড় বড় কারখানাও ছিল।

সুপ্রসিদ্ধ Bernier ঐ সব কারখানা দেখিয়া লিখিয়াছেন—"খুব বড় বড় ঘরের 'কারখানা' (work-shop) নামক স্থানে শিল্পীরা কাজ করিত। কোন ঘরে জড়ির কারিগরেরা কাজ করিত, কোন ঘরে সোণারূপার শিল্পীরা জড়ি ও সোণারূপার অন্য শিল্প দ্রব্য প্রস্তুত করিত। অপর এক ঘরে হইত কাঠের কারিগরের কাজ, এ রকম ভাবে মিস্ত্রী, দর্জ্জি, চামার, রেশমের বুটিদার কারিগরগণ শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত ছিল।" (Bernier quoted in "India at the Death of Akbar" p. 186).

সিভিলিয়ান Bradlybirt সাহেব বলেন—"ঢাকা বহুকাল মস্‌লিন প্রস্তুতের জন্য বিখ্যাত ছিল। মোগল বাদ্‌শাহদের সাহায্যে ঐ মস্‌লিন ব্যবসার অধিকতর শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। জাহাঙ্গীরের চোখে সৌন্দর্য্যের চমক লাগাইবার উদ্দেশ্যে নুরজাহান নানা রকমের বেশভূষায় সজ্জিত হইতেন। সেই সময়েই ঢাকা হইতে ঢাকায় তাঁতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাপড় প্রচুর পরিমাণে দিল্লীতে প্রেরিত হইত। ("Dacca" p. 181)

ঐ সময়ে জাহাঙ্গীর ঢাকাতে মস্‌লিন বয়নশিল্পের

তত্ত্বাবধানের জন্য একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি ঢাকাতে অত্যুৎকৃষ্ট মস্‌লিন প্রস্তুত করাইয়া দিল্লীতে প্রেরণ করিতেন। (Compos "Portugese in Bengal", p. 118).

সৌখীন মোগল বাদ্‌শাহদের আমলে তাঁহাদের রাজকোষের অনর্গল অর্থসাহায্যে ভারতে যে শিল্প, স্থাপত্যের উন্নতি ঘটিয়াছিল, তাহার নিদর্শন আজও অতুলনীয়। আবুল ফজলের আইনী আকবরীতে আছে যে, এক লাহোর সহরে শাল-প্রস্তুতির এক হাজার কারখানা ছিল। সুতরাং সৌখীন নবাব ও তাঁহাদের বিলাসিনী প্রেমপাত্রীদের সখের মস্‌লিনের প্রস্তুত করার কারখানা যে বহু সহস্র ছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

মস্‌লিনের রকমওয়ারী নাম দেখিল বুঝা যায়, মসলিনের নানা শ্রেণী বিভাগে বিভক্ত একটা বড় ব্যবসা চলিয়াছিল।

(১) আব বোয়ান, (২) সেবনেম, (৩) ঝুনা, (৪) রং, (৫) খাসা, (৬) আলবোল্লা, (৭) তাঞ্জেব, (৮) অঙ্গভূষা, (৯) তরন্দাম, (১০) কুমীন, (১১) নয়নসুখ, (১২) বদন-খাস, (১৩) সরবত্তি, (১৪) ডুরিয়া, (১৫) জামদানী, (১৬) চারখানা, (১৭) মলমল খাস, (১৮) সরকার আলী, (১৯) জলখাস (ঢাকার ইতিহাস ১ম খণ্ড)।

অতি সূক্ষ্ম মস্‌লিনের সূতা প্রস্তুত করিত ৩০ বৎসরের অনূর্দ্ধ বয়স্কা স্ত্রীলোকেরা। তদূর্দ্ধ বয়সের লোকের পক্ষে অত সূক্ষ্ম সূতা কাটা সম্ভবপর হইত না। Taverneir লিখিয়াছেন যে, তিনি ভারতে থাকা কালে পারস্যের দূত মহম্মদ আলী বেগ ভারতে আসিয়া পারস্যের সুলতান শাহকে উপঢৌকন দেওয়ার উদ্দেশ্যে ভারত হইতে ৬০ হাত দীর্ঘ এক খণ্ড মস্‌লিন প্রস্তুত করাইয়া সেখানাকে একটী নারিকেলের খোলের ভিতর পুরিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। কোন বৌদ্ধ ধর্ম্মযাজিকা মস্‌লিন বস্ত্র পরিয়া কলিঙ্গ-রাজের সভায় উপস্থিত হইলে, রাজা তাহাকে উলঙ্গ দেখিয়া লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন এবং তদবধি ধর্ম্মযাজিকাদের মস্‌লিন বস্ত্র পরিধান বারণ করিয়া দেন। (Mrs. Maunings Midaeval India, Vol. II, p. 359).

ঢাকার একজন কারিগর নাকি একখানা মস্‌লিন ঘাসের উপর পাতিয়া রাখিয়াছিল; একটী গরু সেখানে যে মস্‌লিন আছে তাহা বুঝিতে না পারিয়া মস্‌লিনখানা ঘাসের সঙ্গে উদরসাৎ করিল। কারিগরের স্বজাতিরা এই নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য তাহাকে অপদস্থ করিয়াছিল। ঢাকার নবাব আবদুল গণি সাহেব সম্রাট্‌ সপ্তম (Edward VII) এডওয়ার্ডকে (তৎকালে যুবরাজ) উপহার দেওয়ার জন্য ঢাকার তাঁতীদের দ্বারা তিনখানা মস্‌লিন তৈয়ারী করাইয়াছিলেন। এক একখানা দৈর্ঘ্যে ২০ গজ আর প্রস্থে ২ গজ ছিল। তার ওজন ছিল মাত্র ৯ ১/৪ তোলা। (ঢাকার ইতিহাস ১ম খণ্ড)।

মস্‌লিনের সূতা যে কার্পাস হইতে প্রস্তুত হইত, তাহার নাম ছিল কুটী তুলা। সূতার সূক্ষ্মতা ও প্রতাণ (পরিমাণ) সূতার সংখ্যা দ্বারা মস্‌লিনের ভালমন্দ নির্দ্ধারিত হইত। এক গজ চওড়া মস্‌লিনে তিন হাজার পরিমাণও থাকিত (ঢাকার ইতিহাস, ১ম খণ্ড)। মস্‌লিনে ১২ শত হইতে ১৫ শত কাউণ্টের সূতা ব্যবহৃত হইত। সে যে কি সূক্ষ্ম, তাহা বর্ত্তমানে ধারণাতীত।

ঢাকার নবাব জাফর আলী খাঁ সম্রাট্‌ ঔরঙ্গজেবকে প্রতি বৎসর ঢাকা ও সোণারগাঁও আরং হইতে মস্‌লিন পাঠাইতেন। তার একটা তালিকা কোম্পানীর রেসিডেণ্ট সাহেবের নিকট ছিল। সেটা বর্ত্তমানে পাওয়া গিয়াছে। ঢাকার ইতিহাসের ১ম খণ্ডের ১৭০ পৃষ্ঠায় সেই তালিকাটি মুদ্রিত হইয়াছে।

তালিকাটী এই :—

ঢাকার আরং হইতে

১০০ খানা জামদানি ধুতি—২৫,০০০৲
৫০ খানা রেশমী বুটাদার—২০,০০০৲
৬০ খানা রেজা (রূপালী)—২০,০০০৲
সূতার কারুকার্য্য খচিত— ৬,০০০৲
ধোলাই ও ইস্ত্রি খরচ— ১,৪৮০৲

সোণারগাঁও আরং হইতে

১০০ খানা সাদা মসলিন —২০,০০০৲
২০ খানা সরবন্দ — ১,৬০০৲
ধোলাই ও ইস্ত্রি খরচ— ২,৯৫০৲

এই ধোলাই ও ইস্ত্রি খরচ প্রণিধানযোগ্য। তৎসম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল।

বুভুক্ষিত

শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

খানিক দূরে গিয়ে সহরের কালো কলাই করা রাস্তাটা হঠাৎ অভিমান ভরে হন্ হন্ করে নীচে নেমে গেছে। জ্ঞান নেই যদি ঐ টিলাটায় গিয়ে ধাক্কা লাগে, খেয়াল নেই যদি হুমড়ে খাদে গিয়ে পড়ে। সেই খুয়া ঢালা বেলে রাস্তাটা দিয়ে নেমেছি সকালে, হেমন্তের রৌদ্রটি উপভোগ করতে করতে। ঝিঁঝিঁর ঝন্ ঝন্, কন্‌কনে হাওয়ার শন্‌শন্ আর ঝরে-পড়া পাতার মর্ম্মরের অভিনব সঙ্গীত আমাকে মুগ্ধ করছিল। টিলার গায়ে মাথা ঠুকতে গিয়ে সামলে নিয়ে পথটা বাঁক ফিরে ফিরে নেমে গিয়ে উপত্যকায় মিশেছে। দূরে, আশে পাশে, চা-ঝোপ সমুন্নত রেখা রচনা করেছে। যেন কোন Impressionist শিল্পীর আঁকা ছবি, কাছে এলেই সব অস্পষ্ট, মোটা মোটা আঁকা বাকা কতকগুলো সবুজ আর ভূষো রংয়ের ছোপ।

অনেক নীচে নেমে এসেছি; সহরের শীর্ষ দিক্-চক্রবালে মিলিয়ে এসেছে, দূরে উপত্যকায় বক্রগতি স্বচ্ছতোয়া নদীর সফেন প্রবাহ গর্জ্জন, এধারে গভীর খাদ, বড় বড় উত্তীশ আর সরল গাছ। ওদিকে পাহাড়ের গায়ে ধাপ-কাটা, ভুট্টার ক্ষেত। ভুট্টার ফসল শেষ হ'য়ে গেছে কবে। ডাঁটাসার গাছগুলো দাঁড়িয়ে, আধ-রাঙা পাতা। আকাশে ছেঁড়া খোঁড়া মেঘ; শুষ্ক বৃন্তচ্যুত জীর্ণ ছিন্ন পাতা ঘুরে ঘুরে নেমে আসছে কাছে, পথে, পাশে। উপত্যকার মর্ম্মভেদী চাপা-কান্না ফুঁপিয়ে উঠে, ওপরে বাতাসে বিলীন হ'য়ে যাচ্ছে।

ভুট্টা ক্ষেতের মাঝ দিয়ে গাছগুলো ওপড়াতে ওপড়াতে চলেছে লোকটা। পায়ে তার সৈনিকদের পরিত্যক্ত বুট জুতো—তার রংটা বোঝা যায় না—খাকি ফিতে দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। বাঁ হাঁটুতে তালি দেওয়া, ডান হাঁটুতে ছেঁড়া সুতির পাৎলুন, গায়ে মেটে-চিটে পড়া কোট। মাথায় তেল ধরা ময়লা টুপি।

গাছগুলো উপড়ে, গোড়াগুলো থেকে ঝাঁকানি দিয়ে, ঠুকে মাটি ঝরিয়ে ফেলে পাশাপাশি শুইয়ে সে-গুলোকে গাদা করে রাখছে। বড় লম্বাগুলোকে দুমড়ে ভেঙে নিচ্ছে। বিড় বিড় করে বকে যাচ্ছে, কখনও কখনও ঢিল ছুঁড়ে দূরের গাছে বসা শকুন উড়িয়ে দিচ্ছে।

কেমন যেন ম্রিয়মাণ, কাজে যেন তার মন বসে নি। আগে সে উপত্যকার বস্তি থেকে সহরে আলু বয়ে নিয়ে আসত; পুরুষানুক্রমে এই ছিল তাদের কাজ। আজ সহর থেকে সরল রজ্জুপথ নেমে গেছে। চাকার অদ্ভুত এক একটানা কর্কশ শব্দ, কলের চোঙ দিয়ে কালো ধুঁয়া উঠছে ঘন। লোকটা থমকে নীচের বস্তির দিকে তাকিয়ে রইল অনিমেষ। তার তামাটে উঁচু চিবুকে সূর্য্যরশ্মি এসে পড়েছে। রজ্জুতে ঝোলান লৌহ পাটাতনে মাল বহন করে আনছে, দেখল সেদিকে। কি যেন বললে, খানিকটা থু থু ফেললে, বড় একটা ঢিল সেই দিকে লক্ষ্য করে সজোরে ছুঁড়ে দিলে। বাতাস কেটে ঢিলটা শূন্যে রেখাবিহীন বর্ত্তুল কক্ষ রচনা করে নেমে গেল।

তার ত দিন ফুরিয়ে এসেছে, তার ছেলের কি হবে! ভাবে সে। মাটির মাঝে, মোট বহে' যে ছেলে মানুষ হচ্ছিল, সেই ছোট ভাষাবিহীন যার চোখ। গলায় ধুকধুকি ঝোলান, ধূলি-ধূসর আধপরা টুপি, তার থেকে উঁকি মারে কটা খোঁচা চুল। কিছুদিন আগেও বাপের পাশে পাশে তার ছোট্ট নতুন ডোকোটিতে আলু বহে' সে ওপরে উঠেছে। ভাবে, এই জমী, এই উর্ব্বর কালো মাটি, এই তাকে আহার জোগাবে। কেন কি দরকার ছিল ঐ কলের, তারা কি সময়ে আলু জোগাতে অক্ষম হ'য়েছিল? চওড়া পায়ের গোছের পেশী প্রসারিত করে, পিঠে বোঝা নিয়ে সারি সারি উঠতে উঠতে, তারা যে চড়াই পথে ধুঁয়া আর তেলে পাকানো লাঠিতে ভর দিয়ে ক্ষণেক বিশ্রাম নিত; সে কি অক্ষমতার চিহ্ন? হেমন্তের রুক্ষ পরিবেশের মাঝে তাদের এই ওঠা-নামা, এমন ত অশোভন ছিল না কিছু।

দিনে দিনে, কালচক্রের ঘূর্ণনে তাদের মুখের গ্রাস ছোট হ'য়ে এল। একি অভিশাপ! ক্ষেতের কাজ,

কালো মাটি, সবুজ ফসল, এ তাদের পেশা নয়। তারা পুরুষানুক্রমে দেখে এল রাঙা মাটি, রুক্ষ পরিচ্ছদ, তৈলবিহীন কটা মাথা, সরল মাংসপেশী, স্বেচ্ছা-বর্দ্ধিত চওড়া নগ্নপদ, ঈষৎ অবনমিত পিঠে আলুর ডোকো। আজ তারা অর্দ্ধভুক্ত, শুষ্ক পাংশুল মুখ, সঙ্কুচিত পেশী ?

বেলা বেড়েছে, চন্‌চনে রোদ। ঝিঁঝিঁর ঝন্‌ঝনানি বেড়ে উঠছে ক্রমশঃ। হাঁপাতে হাঁপাতে চড়াই ভাঙছি। বিসর্পিল পথের বাঁক ফিরে দেখি সে তখনও দাঁড়িয়ে, সেই পাটাতনবাহী রজ্জুপথের প্রতি বাহু আস্ফালন করে কি যেন বকে চলেছে।

কি খাবে তার ছেলে ? অন্য লোকদের ক্ষেতে দিন মজুরী করবে, কালো মাটি কুপিয়ে ? না, কক্ষনো না !

বাতাসে তার আক্রোশ বিচ্ছুরিত হ'ল। আবার বাঁকের ফাঁকে দেখি, সে চলেছে তার কুঁড়ের দিকে, ধুতরোর বেড়া-দেওয়া মরচেধরা টিনের চালের ঘর। সে পেছন ফিরতেই একদল শকুন এসে বসল ক্ষেতের পরে ; তারা হাড় দেখতে পেয়েছে।

বর্ষা-বিলাস

(মন্দাক্রান্তা ছন্দ অবলম্বনে)

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

সজল আষাঢ়ের ধূমল নভতলে সেজেছে বরষার কাজল মেঘ
নিশসি' ক্ষণে ক্ষণে সে মেঘ দরশনে চপল বহে যায় বায়ুর বেগ।
বিধাতা অভিশাপে দারুণ তাপ সহি' ধরণী তৃষাতুরা হয়েছে আজ,
মাটির মরমেতে কি ব্যথা বেজে ওঠে কি আশা জাগে তার হৃদয় মাঝ !
নবীন জলধর মেলিয়া জটাজাল আকাশ পথে যায় দিগন্তর,
গভীর গরজনে বজ্র গরজিছে বিজলী ঝলকায় নিরন্তর।
মেদিনী মরু সম সূর্য্য তাপে দহি' রুক্ষ তনু তার তপ্তময়
পুবালী হিম বায়ে তৃষিত হিয়াখানি মেঘের মায়া ভরে অক্ষিদ্বয়।
হেরিয়া মেঘ নভে কলাপী কেকা-রবে পুচ্ছ মেলি' নাচে চিত্ত তার,
প্রাণের সাথী বুঝি নয়নে দিল ধরা ঘুচাতে হৃদয়ের দুঃখভার।
চাতক চক্ষের দৃষ্টি দূর নভে দীর্ঘ পিপাসায় সলিল লোভ
কত সে দুঃখের বক্ষ বেদনায় জানালো জলদেরে প্রাণের ক্ষোভ।
নামিল ধারাজল ধরণী হিয়াতলে বরষা - উৎসব চলেছে আজ
বেতস বেণুবন দুলিছে শন শন্ শূন্য গগনের ধূসর সাজ।
সলিল সিঞ্চনে সিক্ত কেয়াবন ব্যাকুল বায়ু সাথে বহিছে শ্বাস,
সজল প্রাবৃটের প্রবল জল-খেলা হেরিয়া জাগে প্রাণে কি উল্লাস !
কদম কেতকীর গন্ধ-মদিরায় উছসে বনতল মৃদুল বায়,
শুভ্র যূথিকার সুরভি-সম্ভার সিক্ত বায়ু যেন বিতরি' যায়।
বাদল-বঁধুয়ার বিলাস - ব্যসনের বিপুল সমারোহ চলেছে আজ
জগত জন যত মুগ্ধ আঁখি মেলি' হেরিছে রূপসীর সাধের সাজ।
বিজন বাসে একা বিরহী দৃষ্টির মৌন বেদনায় ঝরিছে জল
স্মরণ পটে কার হেরি সে মুখছবি উতল করে যেন হৃদয়তল !
কি যেন সঙ্গীত মানস-লোকে মোর নিয়ত রণি' ওঠে হৃদয়-বীণ্
কাহারে হয়ে হারা অসীম লোকে খুঁজি চিত্ত ভারাতুর বেদন-লীন।
সে যে গো প্রিয়া মোর কণ্ঠে বাহুলীনা এমনি আষাঢ়েতে মেলিয়া কেশ
সুরভি-শয্যায় আপনা পাশরিয়া দুহুঁ যে দেখিতাম অসীম দেশ !
আজি সে কাছে নাই, আছে সে স্মৃতিটুকু বাদল দিনে মোর প্রাণের মাঝ
রাখিব সযতনে সে স্মৃতি বুকে ধরি' সজল সন্ধ্যায় ভুলিয়া কাজ।

নির্ব্বাসিত কাইজার

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়

"আমার জীবনের দীর্ঘ ২৩ বৎসরের সুখ-দুঃখের সহিত জড়িত, আমার অতি প্রিয় ডুর্ণেই যেন আমাকে সমাধিস্থ করা হয়"—গত ৪ঠা জুন সকাল ১১-৩০ মিনিটের সময়ে জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্ এই শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া আত্মীয়স্বজনপরিবৃত অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দৌহিত্র, গত মহাযুদ্ধে বহু-নিন্দিত ও বহু-প্রশংসিত তেজস্বী বীর দ্বিতীয় উইল্‌হেল্‌মের ৮২ বৎসর বয়সে জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হওয়ার সাথে জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাটের তিরোভাব হইল।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ২৭এ জানুয়ারী জার্ম্মাণীর ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্ এবং প্রুশিয়ার নৃপতি ফ্রেডারিক্ উইল্‌হেল্‌ম্ ভিক্টর এ্যালবার্ট বার্লিনে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ছিলেন জার্ম্মাণসম্রাট্ তৃতীয় ফ্রেডারিক্ এবং সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রিন্সেস্ ভিক্টোরিয়ার বংশধর।

ডুর্ণ পার্কে ভ্রাম্যমাণ উদাসী নির্ব্বাসিত কাইজার

শৈশবে কাসাল্ জিম্‌নাসিয়াম্ এবং বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথম সৈন্যবিভাগে প্রবেশ করেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে অগাষ্টা ভিক্টোরিয়ার সহিত তাঁহার বিবাহ হয় এবং ইহার এক বৎসর পরে ৬ই মে তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ সন্তান উইল্‌হেলম্ জন্মগ্রহণ করেন। ২৯ বৎসর বয়সে পিতার মৃত্যুর পর তিনি জার্ম্মাণীর সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৫ই জুন, ১৮৮৮)।

রাজশক্তি করতলগত হওয়ার পর প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা বিস্‌মার্কের পদচ্যুতি। ক্ষমতার প্রতি অত্যধিক লোভ এবং আড়ম্বরপ্রিয়তা তাঁহাকে পাইয়া বসায় ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ২০এ মার্চ্চ এই সুদক্ষ এবং সুযোগ্য প্রধান মন্ত্রী (চ্যান্সেলার) কাইজারের অভিরুচি অনুসারে অপসৃত হন। মন্ত্রীর প্রয়োজন কাইজার কোন দিন অনুভব করেন নাই। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ঈশ্বরের হাতে তিনি উপলক্ষ এবং সেই সর্ব্বশক্তিমানের দ্বারাই তিনি পরিচালিত হইবেন; অপরের অভিপ্রায়ে দৃক্‌পাত করিবার প্রয়োজন তাঁহার নাই। সামরিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একনায়কত্বই ছিল দ্বিতীয় উইল্‌হেল্‌মের আদর্শ এবং তিনি সিংহাসনে আরোহণের প্রথম দিন হইতেই এই আদর্শপ্রতিষ্ঠার দিকে তাঁহার সকল শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। ইয়োরোপে শান্তিপ্রতিষ্ঠায় তাঁহার ক্ষমতা অপরিসীম, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া মরক্কো, অষ্ট্রিয়া, আগাদিয় প্রভৃতির ব্যাপারে তিনি বহুবার ইয়োরোপকে আসন্ন সমর-সঙ্কটে টানিয়া আনিয়াছেন।

১৯১৩ সালে জার্ম্মাণীর সামরিক শক্তি ও সৈন্যসংখ্যা যথেষ্ট বর্দ্ধিত হয়। এইবার আর ইয়োরোপ বিপদ এড়াইবার সুযোগ পাইল না। সাম্রাজ্য-বিস্তারের যে নীতি কাইজার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সজ্বর্ষ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। শক্তিতে উদ্ধত কাইজার শেষ পর্য্যন্ত সমগ্র ইয়োরোপে মহাসমরের অগ্নি জ্বালাইয়া দিলেন। সার্ব্বিয়ার আর্কডিউকের হত্যাকাণ্ড হইল এই অভিযানের উপলক্ষ্য মাত্র। অথচ তখনও কাইজার বাহিরে শান্তি-প্রতিষ্ঠায় নিরত! ৩১এ জুলাই রাশিয়াকে মাত্র ১২ ঘণ্টার চরমপত্র প্রদান করিয়া জার্ম্মাণী যখন যুদ্ধ ঘোষণা করিল, ঠিক সেই সময়ে ইংলণ্ডে সম্রাটের নিকট সংবাদ প্রেরিত হইল: এই সঙ্কটজনক চরম মুহূর্ত্তেও আমি যুদ্ধকে এড়াইবার জন্য আমার সাধ্যমত আর একবার শেষ চেষ্টা করিলাম, ইহাই আপনাকে জানাইতেছি!

কিন্তু যে পাশার দান কাইজার নিজে নিক্ষেপ করিলেন,

তাহা শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার অনুকূল হইল না। এক একটি পরাজয়ের সঙ্গে কাইজার সেনাপতি পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন, বিভিন্নপন্থা ও কৌশল অবলম্বন করিলেন, শেষ পর্য্যন্ত যাঁহাকে চু'চক্ষে দেখিতে পারিতেন না, সেই জেনারেল হিণ্ডেনবুর্গকে সমস্ত সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক করিলেন, তবুও ইসারের পরাজয়, ইপ্রেসে শোচনীয় ব্যর্থতা, ভার্দুনের অমার্জনীয় ত্রুটি—সকলে মিলিয়া জার্মাণীর বিশাল বাহিনীকে ব্যর্থতা ও পরাজয়ের আঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিল। জার্মাণীর বিজয় ব্যতীত কিভাবে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হইতে পারে, যে কাইজার একদিন ইহা বুঝিতে অক্ষম ছিলেন, ১৯১৮ সালের ৩০এ অক্টোবর তাঁহাকে অন্তর্বিপ্লব হইতে আত্মরক্ষার্থে সৈন্যসহ বার্লিন পরিত্যাগ করিতে হইল! ৩রা নভেম্বর সমাজতন্ত্রবাদী মন্ত্রীরা তাঁহার পদত্যাগ দাবী করিলেন। ৯ই নভেম্বর রাইখষ্ট্যাগে নব-নির্ব্বাচিত চ্যান্সেলার ম্যাক্স যখন কাইজারের সিংহাসনত্যাগ ঘোষণা করিলেন, কাইজার তখনও পশ্চিম রণক্ষেত্রে! হিণ্ডেনবুর্গ সম্রাট্‌কে জানাইলেন, সৈন্যরা আর তাঁহাকে সমর্থন করিবে না! বিপন্ন কাইজার জানাইলেন—তিনি জার্মাণীর সম্রাট্‌পদ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত, কিন্তু প্রুশিয়ার রাজপদ তিনি ত্যাগ করিবেন না। আসিল—তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে পদচ্যুত করা হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হইয়া গিয়াছে, এবং তাঁহার রাজী হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই। যুদ্ধবিরতি কার্য্যকরী হইবার পূর্ব্বদিন ১০ই নভেম্বর রাজ্যচ্যুত, নির্ব্বাসিত কাইজার হল্যাণ্ডে প্রস্থানকালে সীমান্তপ্রহরীর হস্তে তরবারিখানি প্রদান করিয়া বলিলেন, "এই আমিই জার্মাণসম্রাট্!"
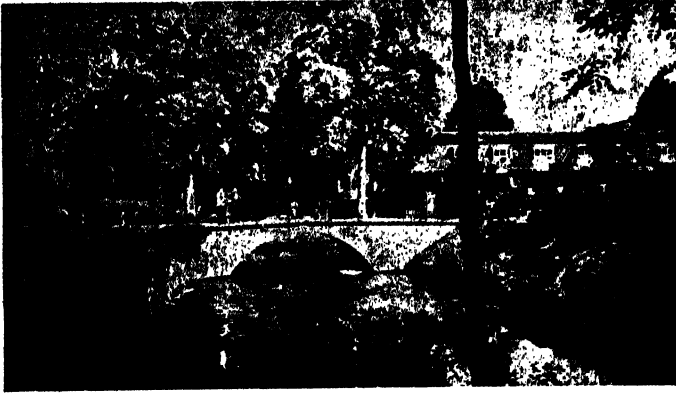
নির্ব্বাসিত কাইজারের ডুর্ণ আবাসভূমি : ডুর্ণ ক্যাসল বাগানের দৃশ্য

নির্ব্বাসিত অবস্থায় কিছুদিন কাউণ্ট বণ্টিঙ্কের অতিথিরূপে বাস করার পর ইয়োরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী উট্রেক্টের নিকটবর্ত্তী ডুর্ণ উদ্যানবাটিকা ক্রয় করিয়া শেষ জীবন সেইখানেই শান্তিতে কাটাইবার সঙ্কল্প করেন। প্রথম কিছুদিন চ্যুত সাম্রাজ্য ফিরিয়া পাইবার আশায় কাইজার ষড়যন্ত্রের প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু এমন কি অন্যান্য সম্রাটদের নিকটও তিনি বিশেষ আশ্বাস না পাইয়া শেষ পর্য্যন্ত এই প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করেন।

এইখানে তাঁহার অতীত জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সাথী তাঁহার প্রিয়তমা এক

ডুর্ণ পার্কে চা খাওয়ার দৃশ্য : কাইজারের সঙ্গে প্রাসাদের তত্ত্বাবধায়ক এবং পুলিশের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তাও চা পান করিতেছেন

বৎসর পরেই তাঁহাকে চিরদিনের মত পরিত্যাগ করিলে ১৯২২ সালে ৫ই নভেম্বর তিনি প্রিন্সেস্ হারমিন্‌কে বিবাহ করেন।

এই নির্ব্বাসিত জীবনযাপন কালে তিনি একদিনের জন্যও তাঁহার স্বদেশকে ভুলিতে পারেন নাই। সুযোগ আসিলেই তিনি জানাইয়াছেন যে, লজ্জাজনক ভার্সাই

শক্তি যেদিন নিষ্ক্রিয় হইবে, জার্ম্মাণীতে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হইয়া যেদিন জার্ম্মাণী আবার যুদ্ধের পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া যাইবে, সেইদিন হইতে জার্ম্মাণীর আবার শান্তিপূর্ণ মঙ্গলময় দিন ফিরিয়া আসিবে। জার্ম্মাণীর ইহুদিবিদ্বেষ পছন্দ না করিলেও একমাত্র নাজীবাদই জার্ম্মাণীকে তাহার পূর্ব্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে পারে, এই বিশ্বাসে তিনি নাজীদের অগ্রগতি আন্তরিকতার সহিত লক্ষ্য করিতেন।

ডুর্ণায় বাসকালে সর্ব্বদা তাঁহার গতি-বিধির প্রতি নাজী-গুপ্তচর-বিভাগের তীক্ষ্ণ নজর ছিল। রাজতন্ত্রবিরোধী লোকেরা বা অন্যান্য শত্রুপক্ষীয়রা যাহাতে তাঁহার কোন ক্ষতি করিতে না পারে, তজ্জন্য সতর্ক নাজী প্রহরীদল তাঁহার বাসস্থান পরিবেষ্টন করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে শত্রুদের বাধা দিতে প্রস্তুত থাকিত। তাঁহার দুধ, প্রহরী প্রভৃতির ব্যয় প্রদান করিত গেষ্টাপো। তাঁহার ক্ষৌর-কার্য্যের ভার ছিল গেষ্টাপোদলের বিশ্বস্ত ব্যক্তির উপর। ফরাসী ভাষায় লিখিত 'পল ক্রেনির' একটি প্রবন্ধ হইতে জানা যায়—কাইজার যে ক্ষুরে কামাইতেন, মূল্যবান্ প্রস্তরখচিত সেই ক্ষুরখানি ইস্তাম্বুলের আবদুল হামিদ কাইজারকে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন।

ব্যক্তিগত চরিত্রে কাইজারের দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ছিল। কিন্তু এই প্রবল আত্মবিশ্বাসই হইয়াছিল তাঁহার সকল সর্ব্বনাশের মূল। দৈহিক শক্তির অপ্রাচুর্য্যবোধ এবং মানসিক ভীরুতা তিনি ইহার দ্বারাই আবরিত রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে Emil Ludwing বলেন—তিনি ছিলেন অলস, দীর্ঘসূত্রী এবং চপল। শিকারে যাইলে লক্ষ্য বস্তুকে তাঁহার এত নিকটে আনা হইত যে, তাঁহার লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া ছিল অসম্ভব। শিকারের পূর্ব্বেই সেখানে একটি প্রস্তরস্থাপনা করিয়া তাহাতে ক্ষোদিত হইত—"Here His Majesty Wilhelm II brought down his 50,000th quarry." (Ludwig).

আজ আর কাইজার নাই, তাঁহার চরিত্রের এই দিকটা আলোচনা করাও নিষ্প্রয়োজন—কারণ "man wars not with the dead." জার্ম্মাণীকে যে অবস্থায় উপনীত করার স্বপ্ন কাইজার নির্ব্বাসিত জীবনে শেষ দিন পর্য্যন্ত দেখিয়াছিলেন, নাজীদের দ্বারাই তাঁহার সেই স্বপ্ন সফল হইতে পারে বলিয়াই তিনি জীবন-সন্ধ্যায় নাজীবাদের বিরুদ্ধে যান নাই; পত্নী, কন্যা, দৌহিত্র প্রভৃতি-পরিবৃত হইয়া শেষ নিঃশ্বাসপরিত্যাগের সময়ে হয়তো এই আশাই ছিল তাঁহার একমাত্র সম্বল, জীবনের হিসাবের খাতার নীচে মোটা রেখা টানার হয়তো সময়ে এই ছিল তাঁহার শেষ সান্ত্বনা। আজ তাঁহার অশরীরী আত্মা ঊর্দ্ধলোক হইতে আকুল আগ্রহে হিটলারের মুখের দিকে হয়তো তৃষিত নয়নে তাকাইয়া আছে কি না কে জানে!

নির্ব্বাসনের কিছুদিন পরে স্বজন বেষ্টিত কাইজার : ডুর্ণে প্রাসাদ
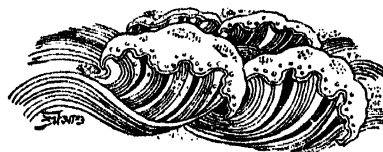
জাতীয় উৎসব

চন্দননগরে প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ শ্রীমন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া উনবিংশ বর্ষ অক্ষয়া তৃতীয়া উৎসব সুসমাপ্ত হইয়াছে। বিগত ১৬ই হইতে ২৮শে বৈশাখ এই দীর্ঘ ত্রয়োদশ দিবসব্যাপী উৎসবে, নানা দিক্ দিয়া যে জাগরণের পরিচয় পরিলক্ষিত হইল, তাহা উপেক্ষার বস্তু নহে। চন্দননগর ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলসমূহের তরুণ ও প্রবীণ এই উৎসবে নানাভাবে অংশ গ্রহণ করিয়া ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন। জাতির জীবনে এই প্রীতি ও সহযোগিতার মূল্য বড় সামান্য নহে।

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ শ্রীমন্দির

এই উৎসব উপলক্ষে সঙ্ঘের শ্রীমন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া উপাসনা, হোম, নগর কীর্ত্তন প্রভৃতির মধ্য দিয়া যে অনাবিল অধ্যাত্মস্রোতঃ প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা নব জাতীয়তার পূত বেদী নির্ম্মাণে অবধারিত সহায়ক হইবে। এই শুভ অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতেই সঙ্ঘসভ্য শ্রীজ্ঞানতরু হালদার সঙ্ঘগুরু কর্ত্তৃক নব পর্য্যায়ে সন্ন্যাস আশ্রমে দীক্ষিত হইয়া সর্ব্বানন্দ নাম গ্রহণ করেন।

উৎসবের সুদীর্ঘ দৈনিক কর্ম্মসূচির প্রত্যেকটীই শিক্ষা ও আনন্দ লক্ষ্য করিয়া সুকল্পিত হইয়াছিল। বাংলার বিখ্যাত মনীষিগণের সুচিন্তিত বক্তৃতামালা সত্যই একটা সাময়িক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোগী চিন্তার খোরাক যোগাইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

১৬ই বৈশাখ অপরাহ্নে এক মহতী সভায় উৎসব-প্রাণ সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল রায় তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় উৎসবের উদ্বোধনবাণী উচ্চারণ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বৈদিক কৃষ্টির মধ্যেই জাতির নব-জাগরণের প্রেরণা আমরা খুঁজিয়া পাইব। এই কৃষ্টি শ্রুতি, স্মৃতি, ন্যায়মূলক; ইহা শিক্ষা-সাপেক্ষ। সমাজের ব্যাপক-জীবনে প্রয়োগ করিতে হইলে তাহার প্রতীকস্বরূপ মন্ত্র, প্রতিমা ও গুরুতত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা অবশ্য-স্বীকার্য্য। হিন্দুজাতি বিভিন্ন মতবাদে বিচ্ছিন্ন-বিভক্ত হইয়া শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে। তাহাকে ভারত-সংস্কৃতির অপৌরুষেয় সত্য পুনরুদ্ধার করিয়া ঐক্যবদ্ধ সংহতি গঠন করিতে হইবে; বাংলার উদীয়মান জাতিকে এই সঙ্কেতই তিনি অনুসরণ করিতে বলেন।

মেলা ও প্রদর্শনীর উদ্বোধন উপলক্ষে স্যার হরিশঙ্কর পাল যে উৎসাহবাণী উচ্চারণ করেন, তাহার মধ্যে যুগপৎ প্রবর্ত্তকসঙ্ঘের প্রতি তাঁহার আন্তরিক প্রীতি ও তৎপরিচালিত শিক্ষা ও বিশেষভাবে বাংলার শিল্প ও আর্থিক সংগঠন-নীতির দিকে তাঁহার গভীর সহানুভূতি ও সহযোগিতার প্রেরণা পরিস্ফুট হইয়াছিল। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের পক্ষ হইতে স্যার হরিশঙ্কর পাল মহোদয়কে একখানি মানপত্রের দ্বারা অভিনন্দিত করা হয়।

ডাঃ কালিদাস নাগের বিশাল প্রতিভার অবদান—ভারতের ঐতিহাসিক সাধনার সুন্দর মর্ম্মপরিচয় এক

অপূর্ব্ব উপভোগ্য ও প্রণিধানের সামগ্রী। অগ্নিমুখী জাতীয়তার চারণ শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর মানবতার অদ্বয় লক্ষ্য ও সাধনার অপরূপ গবেষণা শ্রোতামাত্রেরই মর্ম্মে মর্ম্মে উদ্দীপনার তড়িৎ সঞ্চার করিয়াছিল। প্রসিদ্ধ তন্ত্রযোগবিৎ জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত শ্রীজ্যোতিঃ বাচস্পতির "চিকিৎসায় জ্যোতিষের প্রয়োগ" সম্বন্ধে বক্তৃতায় অভিনব সঙ্কেতপূর্ণ চিন্তা ও আলোচনার সুযোগ মিলিয়াছিল।
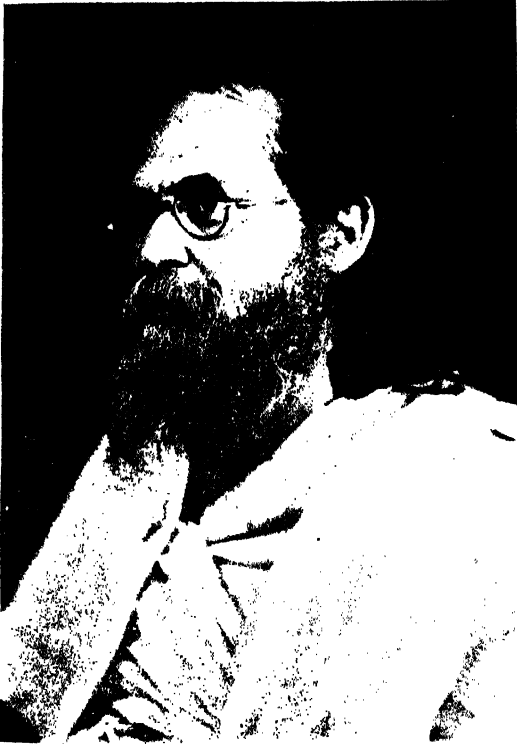
শ্রীমতিলাল রায়

প্রবর্ত্তক সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতি শ্রীমতিলাল রায়ের সাহিত্যের সংগঠনবীর্য্য ও কৃষ্টিময়ী প্রেরণা বিষয়ে নিগূঢ় ইঙ্গিত ছিল। সভায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ৮১তম জন্ম পুণ্যাহ স্মরণ করিয়া একটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঐ দিনের প্রধান অতিথি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহোদয় 'অক্ষয় তৃতীয়া' শীর্ষক একটি সময়োপযোগী কবিতা পাঠ করেন। শ্রীমৃণাল ঘোষ, শ্রীসুক্তিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅজিত ঘোষ, শ্রীনরেন মল্লিক, শ্রীবরেন বসু, শ্রীরামকৃষ্ণ মজুমদার প্রভৃতি তরুণ সাহিত্যিকগণ প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া সাহিত্য সভাটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলেন।

অধ্যাপক নির্ম্মলনাথ চট্টোপাধ্যায়ের দীপালী যোগে 'আগ্নেয়গিরি ও অগ্ন্যুচ্ছ্বাস' শীর্ষক গবেষণামূলক বক্তৃতা সত্যই জ্ঞানগর্ভ ও উপাদেয় হইয়াছিল। শেষদিনে পূর্ণিমা-সম্মেলনে পূজনীয় মতিবাবুর "হিন্দুজাতির পতন ও উত্থান" সম্বন্ধে জ্বলন্ত নির্দ্দেশ ও সেই প্রসঙ্গে সভাপতি শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয়ের প্রীতিমধুর নিবেদন বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয় উৎসব-সমাপ্তি প্রসঙ্গে বলেন:

"ত্রয়োদশদিবসব্যাপী মহোৎসবের আজ শেষদিন। উৎসবের সমাপ্তি-সভান্তে আজকের প্রধান কাজ যা ছিল তা মতিবাবুর বক্তৃতা। * * * আজকের বক্তৃতার যে বিষয় ছিল, সে বিষয়ে মতিবাবুর পাণ্ডিত্য ও গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতার পর বৃথা বাগাড়ম্বরের দ্বারা ধৃষ্টতা প্রকাশ করে'

স্যার হরিশঙ্কর পাল

আপনাদের বিরক্তি উৎপাদন করব না। * * * মতিবাবু সঙ্ঘের কাজ থেকে অবসর নেবার একটা সুর ধরেছেন। তাঁর মনের মধ্যে যে উদ্দেশ্যই থাক, তাঁর সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ কল্যাণ ও সুবিধার সম্ভাবনার কথা থাকতে পারে। নিতান্ত কোন মানসিক বা শারীরিক কারণে বাধ্য না হলে, কোন কর্ম্মী তাঁর প্রিয় কাজ, তাঁর কর্ত্তব্য থেকে অবসর নিতে পারেন, এ বিশ্বাস আমার নাই। * * * মতিবাবু তাঁর কর্ম্মক্ষেত্র হতে বিদায়ের প্রাক্কালেও যখন জাতির দৈন্যের কথা, তাহার পতনের ইতিহাস, ভারত সংস্কৃতির মূল কথা ও তৎসঙ্গে অভ্যুদয়ের উপায় উদ্দীপ্তভাবে শুনাইয়া সমুন্নত মহিমায় দেশকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত

দেখবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন, তখন আমি নির্ব্বিঘ্নাটে নিঃশব্দে কি উপায়ে আমি নিজে অবসর গ্রহণ করতে পারব, সেই কথাই ভাবচি, সেই মহা দিনের প্রতীক্ষায় রয়েছি। * * * আমি চন্দননগরকে ভালবাসি। আমি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রেরই উপাসক। আমার জন্মভূমি চন্দননগরের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পারলেই আমি ধন্য মনে করি। আমি বাঙ্গলা জানি না, ভারত জানি না, শুধু এই চন্দননগরের সেবায় আমি বৃহত্তর দেশমাতার সেবার আনন্দলাভ করে' আত্মপ্রসাদের গর্ব্ব বোধ করি। তাই যাঁরা চন্দননগরের উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন, প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে চন্দননগরের শ্রীসম্পদ্‌বৃদ্ধির সহায়ক হন, চন্দননগরের গৌরব-বৃদ্ধির জন্য আত্মনিয়োগ করেন, তাঁরা আমার নমস্য। আমি মন্দভাগা,

ডক্টর কালিদাস নাগ

তাই সময়ে সময়ে জন্মভূমির কোন কোন সেবকের সঙ্গে একমত হয়ে চলতে পারি না। কিন্তু যখন তাঁদের কাজের মধ্যে দেশসেবার অনাবিল আসক্তি দেখতে পাই, তখন তাঁদের উদ্দেশে আপনা হতেই শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হয়।

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের সঙ্গে কখন নিবিড়ভাবে মিলিত হ'তে না পারলেও, বোধহয় উহার প্রতিষ্ঠাকাল হ'তেই উহার উৎসব আনন্দে এবং অন্য কোন না কোন রকমে আমি উহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছি। আধ্যাত্মিক বিষয়ে সঙ্ঘের সকল কথা আমার সহজবোধ্য না হলেও বা উহার ফিলজফির মধ্যে নিজেকে প্রবিষ্ট করতে না পারলেও, উহার শিক্ষা-প্রচার প্রচেষ্টা, বিজাতীয় ভাববিমুখতা ও জাতীয় কৃষ্টিরক্ষার আগ্রহ, উহার কর্ম্মের আদর্শকে অপর কাহারও অপেক্ষা আমি কম শ্রদ্ধার চক্ষে দেখি না। চন্দননগরের হিতকল্পে উহার উন্নতিসাধনোদ্দেশে উহারা যখন যে কার্য্যে মনোযোগ স্থাপন করেন, কাজে কিছু না পারিলেও আন্তরিকভাবেই তাহার সাফল্যের জন্য অপেক্ষা করি। এখানে একটা কথা আমার স্বীকার করা দরকার, যে দিক্‌টা আমি বুঝি না, সে দিক্‌টা বুঝবার জন্য কখন যে বিশেষ করে চেষ্টিত হয়েছি, এ কথাও বলতে পারি না। তবে এ কথা মুক্ত কণ্ঠে বলা যায়, প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ আজ চন্দননগরের শ্রেষ্ঠ গৌরব, সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম কর্ম্মপ্রতিষ্ঠান। শিক্ষার সহায়তা ও জাতির সংস্কৃতিরক্ষাকল্পে ইহার প্রচেষ্টা, জাতি-গঠনের একটা উদ্যম এর পূর্ব্বে এখানে আর কোন প্রতিষ্ঠানের দেখি নাই। এখানের কথাই বা বলি কেন, প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ আজ শুধু চন্দননগরের নয়, বাঙ্গলার পরিচয়ের বস্তু, ভারতের খ্যাতিপত্র জনহিতকর যে সকল প্রতিষ্ঠান আছে, ইহা তাহাদের অন্যতম। বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানে, এমন কি ভারতের দূরতম প্রদেশের প্রবাসী বাঙ্গালীরাও এই শিক্ষা ও কর্ম্মের বহুমুখী প্রতিষ্ঠানটির সংবাদ রাখিয়া থাকেন। এ হেন

কবিবর শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

প্রতিষ্ঠানের যিনি প্রতিষ্ঠাতা ও স্রষ্টা, সেই সঙ্ঘ-গুরু মতিবাবুর কর্ম্মশক্তি, তাঁহার বিশ্বাস, তাঁহার সৃষ্টিসামর্থ্য, শুধু কথায় নয়, গঠনমূলক কার্য্যে তাঁহার কৃতিত্ব অনেকেরই অনুকরণীয়। অধুনা বহু শ্রম স্বীকার করিয়া তিনি হিন্দুজাতির পতনের নিদান ও অভ্যুত্থানের উপায় সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্বাসের কথা, নব ভারতের কৃষ্টি ও হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্মকথা যেরূপে নানাভাবে ঘোষণা করিতেছেন, তাহা ভাবসম্পদে যেমন সম্পৎশালী, কথনভঙ্গী ও ভাষার মাধুর্য্যে তেমনই মনোহারী। তাঁহার এই সাধনা ব্যর্থ হইবে না। আমি এই কর্ম্মিশ্রেষ্ঠকে আমার অন্তরের অভিনন্দন জ্ঞাপন করি, তাঁহাকে নমস্কার করি। শ্রীভগবান তাঁহার সকল সাধনা সার্থক করুন, তাঁহাকে গৌরবময় সুদীর্ঘ পরমায়ুঃ দিন। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ সর্ব্বপ্রকারে ভারতের আদর্শস্থানীয় হউক।”

এই উৎসবে যে কয়েকটি সম্মেলনের আয়োজন হইয়াছিল, তাহাও খুব প্রয়োজনীয় ও শিক্ষাপ্রদ। চন্দননগরের প্রায় ৩০টি সংহতির প্রতিনিধিবর্গের মিলন-সভায় সভাপতি শ্রীসত্যবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতায় জাতির জীবনে ছন্দোবদ্ধ মিলনেরই আকৃতি সুন্দর ভাবে ও ভাষায় প্রতিফলিত হইয়াছিল। মহিলা-সভায় বিদুষী শ্রীমতী শান্তা দেবীর অভিভাষণ নারী জাতিরই মর্ম্মকথা বহন করিয়া আনিয়াছিল। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের নারীশক্তির তপস্যার পরিচয় শ্রীমতী অমিয়প্রসূন দত্ত ব্যাকরণতীর্থার প্রবন্ধে ফুটিয়াছিল। পল্লী-সম্মেলনে স্থানীয় কিশোর ও তরুণগণ নানা বিষয়ে উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছিল, এবং গ্রন্থাগার কর্ম্মি-সম্মেলনে সভাপতি ডাঃ

অধ্যাপক শ্রীনির্ম্মলনাথ চট্টোপাধ্যায়

নীহাররঞ্জন রায় ও অন্যান্য বক্তাদের অভিভাষণ সবগুলিই চিন্তনীয় বিষয় ছিল।

ইহা ছাড়া, ব্যায়ামবীর শ্রীবিষ্ণুচরণ ঘোষের সদলবলে ব্যায়াম-কৌশল, প্রবর্ত্তক নারীমন্দিরের 'প্রভাস' অভিনয়, গড়বাটি ড্রামাটিক ক্লাবের নাট্যাভিনয় ও কলিকাতার আর্ট সেণ্টার অফ্ দি ওরিয়েণ্টের নৃত্য-সঙ্গীত প্রভৃতি অসংখ্য নরনারীকে যে বিশুদ্ধ আনন্দ বিতরণ করিয়াছিল, তাহাও এই ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখযোগ্য। নৃত্য ও সঙ্গীত প্রসঙ্গে শ্রীযুত রঞ্জিত গুহ ও শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

শ্রীহরিহর শেঠ

মঁ নাভিল (চন্দননগরের পুলিস কমিশনার), শ্রীযুত প্রসাদ দাস মল্লিক, শ্রীযুত সিদ্ধেশ্বর ভাগবৎ ভূষণ, শ্রীযুত বলাইচাঁদ দত্ত প্রমুখ চন্দননগর ও চুঁচুড়ার যে সকল সুধী ও সুহৃৎ বহু সভায় যোগ্যতার সহিত পৌরোহিত্য করিয়াছেন, তাঁহাদেরও কথা শ্রদ্ধার সহিত এই প্রসঙ্গে

উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া দৈনন্দিন উৎসব-স্থচির মধ্যে কলির অর্জ্জুন এ, কে, মুখার্জ্জির ম্যাজিক ও ধনুর্বিদ্যা, বালক যাদুকর দেবকুমার ঘোষালের অদ্ভুত যাদুবিদ্যা প্রদর্শন, সুপ্রসিদ্ধ হাস্যরসিক শ্রীঅমরেশ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক 'হাস্যকৌতুকাভিনয়', প্রবর্ত্তক বিদ্যার্থিভবনের প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দ কর্ত্তৃক "পরিণীতা" অভিনয় এবং শ্রীব্রজেন্দ্রলাল ভদ্র কর্ত্তৃক ছায়াচিত্রযোগে "মাতৃমঙ্গল ও শিশু মঙ্গল" সম্বন্ধে বক্তৃতা উৎসবটিকে যেমনি শিক্ষণীয়, তেমনি আনন্দপ্রদ করিয়া তুলিয়াছিল। সর্ব্বশেষে উৎসব কমিটীর যুগ্ম সম্পাদক স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী ও শ্রীপরেশচন্দ্র চৌধুরী, কার্য্যকরী সভ্যগণ, সংশ্লিষ্ট সঙ্ঘ-সভ্য, প্রবর্ত্তক বিদ্যার্থি ভবনের স্বেচ্ছাসেবক দল, প্রবর্ত্তক কলেজ অব্ কালচার-এর ছাত্রবৃন্দ এবং নারী মন্দিরের অকাতর অবিরাম সেবা ও শ্রম উৎসবের সার্ব্বাঙ্গীণ সাফল্যের গোড়ার কথা বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।

এই বিরাট্ উৎসব ১৯শ বর্ষ হইতে অতঃপর ২০শ বর্ষের মুখে যাত্রা করিল। প্রদর্শনীর চিত্র ও চার্ট, মূর্ত্তি ও দৃশ্যাবলী এবং স্বদেশী দ্রব্যের বিপণিসজ্জা জাতির মানসবিলাস নহে, সত্যই জাগরণেরই ইঙ্গিত ও দ্যোতনাপূর্ণ। যে উৎসব জাতির জীবনে জাগরণের শক্তি ও অনুপ্রেরণাই সঞ্চার করে, তাহাই খাঁটি জাতীয় উৎসব। চন্দননগরের এই উৎসব এই

বালক যাদুকর শ্রীদেবকুমার ঘোষাল

হিসাবে জাতীয় মহোৎসব—ইহা কে না স্বীকার করিবে? আমরা শ্রীভগবানের নিকট এই মহোৎসবের দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর জীবন ও উত্তরোত্তর উন্নতি প্রার্থনাই করি।

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীগঙ্গাধর রায়চৌধুরী

বিংশ শতাব্দীর ভালে দিবাকর তুমি
বঙ্গ-প্রতিভার, সর্ব্ব-চিত্ত-গুপ্ত-কক্ষে
প্রবেশিল নিশা-শেষে নিষুপ্ত ভুবনে
অরুণকিরণ তব, ভাঙাইয়া ঘুম।
দিব্যকান্তি রাজহংস তুমি সঙ্গোপনে
করিতেছ কেলি ভাব-হিমাদ্রির বুকে
মানসের সরোবরে; হে কমল-চারী!
ঝরিতেছে চঞ্চুপুটে মকরন্দ-সুধা
বিশ্ববাসী করে পান সে আনন্দ-কণা।
তোমারি সে তপোভূমি 'শান্তি-নিকেতন'
লীলা-নিকেতন হ'ল বঙ্গ-ভারতীর;
তব পদ-তীর্থ-রূপী 'পঞ্চ-বটী' বনে
শিষ্যদল নব কৃষ্টি করিছে সাধন
কাব্য-গীতি-চিত্রকলা-বিজ্ঞান-দর্শনে।
তোমারি সাধনে দেব! বঙ্গ-ভারতীর
দীনতার অবসান; হেরি আজি তাঁর
বিশ্ব-বাণী-সভা-মঞ্চে রাণীর আসন—
অপূর্ব্ব ঘটনা, মরি, বঙ্গ-ইতিহাসে।
বঙ্গ-কবি-কুল-শিরোমণি তুমি রবি,
জ্যোতির্ম্ময়ী বাণী তব, তোমারেই নমি
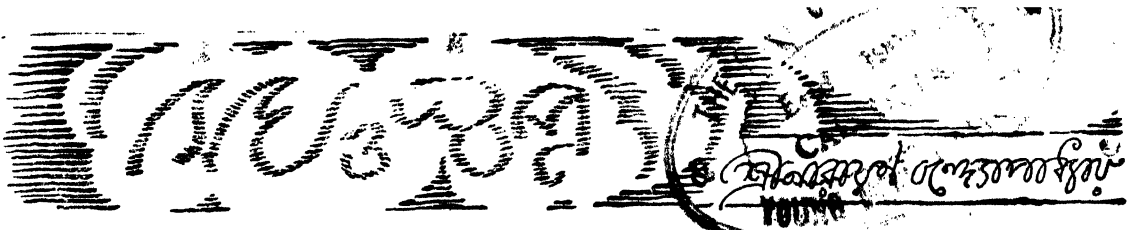
তিন

গার্গী ভেবে দেখেছে এইটাই তার কাছে বেশী ক্লান্তিকর। দিদিমার সংগে তার এই প্রাত্যহিক সম্মুখ-যুদ্ধ! দিদিমাও তাঁর প্রচুর উদ্যম আর উৎসাহ নিয়ে অগ্রসর হ'বেন এবং সীতেশের আরও কয়েকটা কয়লার খনি কেনার সম্ভাবনা আছে কিনা জানাবেন, গার্গীও ছাড়বে না—গার্গীও দিদিমার চোখের সামনে মেলে ধরবে তার এম. এ. ক্লাসের বইগুলো, বল্‌বে "সময় কোথায় দিদা?"

কিন্তু অত্যন্ত বিশ্রী লাগে—অত্যন্ত বিশ্রী লাগে এই অভিনয়! গার্গীর মনে হয় সে যদি একটা নির্জন জায়গায় দিনের পর দিন ব'সে থাক্‌তে পারত! দিনের পর দিন কাটাতে পারত নিরুদ্বেগে! ভাল লাগে না—ভাল লাগে না এই জনতা, কোলাহল, আর তার আগামী জীবনের অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যদ্বাণী। গার্গী যদি একবারও পরিষ্কার করে বল্‌তে পারত, "হে পূজনীয়া দিদিমা, তুমি বৃথাই এতটা চেষ্টা করলে আমার জন্যে—কয়লার খনি আর জমিদারীর সুগঠিত উচ্চতম সম্মানবেদিকায় বসার এতটুকু লোভও আমার নেই।" গার্গী যদি এ কথা বল্‌তে পারত! একদিন—শুধু একদিনের জন্যেও গার্গী যদি সে সাহসকে সঞ্চয় করতে পারত!

কিন্তু পারেনি—পারেনি দিদিমাকে দেখেই, তাঁর দুটী জ্যোতিহীন নিষ্প্রভ চোখের দিকে চেয়ে গার্গীর সমস্ত সংকল্প ম্লান হ'য়ে এসেছে!

আবছা, অস্পষ্ট কোন ধূসর ছবির মত গার্গীর শৈশব-কালকে মনে পড়ে। সেই সব দিনের স্মৃতিগুলোকে গার্গী যত্ন ক'রে যেন সঞ্চয় ক'রে রেখে দিয়েছে। আজও সেগুলি তাকে যথেষ্ট আনন্দ দেয়—সেই ধ্বনিবহুল বর্ষার অবিরাম নির্ঝরণ—মেঘাচ্ছন্ন আকাশের তলায় ঘনতর দুর্যোগের দিনে মার কাছে ব'সে ব'সে গল্প শোনা—তারপর ধীরে ধীরে কেমন ক'রে সে বড় হ'য়ে উঠ্‌ল: পৃথিবীকে অনুভব করতে আরম্ভ করল; সেই সব চিন্তা—অতীত ইতিহাসের সেই সব পুনরুদ্ঘাটন! গার্গীর এক রকম ভালই লাগে। তাই, সময় পেলেই গার্গী সেই সব দিনে ফিরে যায়—সেই সব আলো-ঝলমল শরতের রবিদীপ্ত উজ্জ্বল দিনে—শৈশবের প্রথম আলোয় উদ্ভাসিত পৃথিবীতে!

গার্গীর বাবা তখন সবে এস্. ডি. ও. হ'য়ে যশোরে এসেছেন। গার্গীর মনে পড়ে: যেখানে তারা থাক্‌তো, জায়গাটা বেশ সুন্দর। বাড়ীর পিছনেই একটা ছোটো-খাটো ফুলের বাগান—অনেকখানি জায়গা নিয়ে তাদের বাড়ীটা—তারা মোটে তিন জন; গার্গী, বাবা আর মা। অত জায়গার কোন দরকারই ছিল না, কিন্তু যখন পাওয়া গেছে তখন শেষ পর্য্যন্ত অতখানি জায়গাতেও যথেষ্ট স্থান আছে, এ কথা মনে হ'ল না। দেখতে দেখতে সব অতিরিক্ত জায়গাটাই কাজে লাগল।

বাবার সখ হ'ল গরু রাখবার—মার সখ হ'ল একটা ঢেঁকি ঘর থাকলে ভাল হয়—বাবার আবার সখ হ'ল একটা কুয়ো বাড়ীর মধ্যে কাটান থাকলে মন্দ হয় না কিংবা টিউব ওয়েল—শেষ পর্যন্ত টিউব ওয়েলই করা হ'ল।

অবশেষে দেখা গেল—এতখানি জায়গা থাকাটাই এখন তাঁদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। অতিরিক্ততার কোন বিরক্তি তাঁদের মধ্যে প্রকাশ পাবার আর সম্ভাবনা নেই।

গার্গীও পিছিয়ে পড়েনি—গার্গীরও কোন জায়গায় ছিলো ঢেঁকি ঘর, আর টিউবওয়েল—অবশ্য সেগুলো সে নিজেই তৈরী ক'রে নিয়েছিল।

ভাবতে ভারি ভাল লাগে—তারপর ধীরে ধীরে গার্গী বড় হ'য়ে উঠেছে। ধীরে ধীরে সে সেই শৈশবকালের মোহময় কুসুমাস্তীর্ণ পথ পার হ'য়ে এসেছে—কোথা দিয়ে যে দিনগুলি ক্রমশঃ অপসৃত হ'ল, গার্গী তা' বুঝতেও পারেনি!

তারপর মনে পড়ে যে দিন গার্গী জাগ্‌ল—সমস্ত শরীরে মনে সেই অপূর্ব জাগরণ! গার্গীর দেহের প্রতি

অণুতে অণুতে সেই জাগরণের বার্তা! সন্ধ্যার আগে জান্‌লার ধারে ব'সে আকাশের গায়ে উদাস দৃষ্টি মেলে দেওয়া। কি চমৎকার অনুভূতি! গার্গী তা অনুভব করত। তারপর একদিন এলো আষাঢ় মাস। বর্ষণ-ঘন আষাঢ়ের অন্ধকার দিন। সেই মাসের মাসিকপত্রে গার্গী একটা ছবি আবিষ্কার ক'রেছিল কয়েকদিন আগে। ছবিটার মধ্যে গার্গী যেন নিঃশেষে ডুবে গিয়েছিল। ছবিটা গার্গীকে ছুঁয়েছিল। অতি আধুনিক একজন আর্টিষ্টের আঁকা। বিরহী যক্ষ সম্মুখে উড্ডীয়মান মেঘপুঞ্জকে তার প্রিয়ার উদ্দেশ্যে বার্তা নিবেদন করছে। চোখে মুখে তার সেই করুণ আকুতি। কি সুন্দর! সত্যি কি সুন্দরই যে ছিল ছবিটা!

বর্ষণঘন আষাঢ়ের সেই অন্ধকার দিন। সাম্‌নের দক্ষিণের জান্‌লাটা খোলা—গার্গী তারই ধার ঘেঁসে এসে বসত। চারিদিকেই ঝর-ঝর, ঝম্‌-ঝম্‌ জলের শব্দ ছড়িয়ে পড়ছে; কোথায়, কাছেই হ'বে হয়তো, কতগুলি ব্যাং ডাকৃছে—ঝর্‌-ঝর্‌—ঝর্‌-ঝর্‌, অবিরাম বর্ষার সেই নির্ঝরণ! গার্গী ছবিটা নিয়ে জান্‌লার ধারে ব'সে থাকত। "ওঃ, সকাল থেকে কি বিষ্টিই যে নেমেছে!" মা হয়তো একবার ঘরের মধ্যে ঘুরে গেলেন, "কি রে, চান্‌-টান্‌ করবি না? এমনি ব'সে থাক্‌লেই চলবে?" গার্গী বল্‌ত, "ভারী ভাল লাগছে মা এখানে বস্‌তে, ওঃ ওই দেখ ওদিকের মাঠে কি ভীষণ জোরে বিষ্টি নেমেছে!"

মা, বোধ হয় হাস্‌তেন, মনে মনে ভাবতেন: মেয়েটা একটু অন্য ধরণের—কিছু বল্‌তেন না, আবার নিজের কাজের মধ্যে ডুবে যেতেন।

কিন্তু গার্গী তা' সমস্ত শরীর দিয়ে অনুভব করতে পারত—সমস্ত চেতনা দিয়ে—মন দিয়ে। তার মধ্যে যে ধীরে অতি ধীরে একটা সুন্দর পরিবর্তন নেমে আসছে, গার্গী তা বুঝতে পারত! কেমন একটা লঘু ভাববিলাসিতা, সমস্ত দেহমনের অপূর্ব তৃপ্তি! এই মেঘ, এই জল, এই বর্ষার একান্ত নির্ঝরণ গার্গীকে যেন ধীরে ধীরে অন্য জগতে নিয়ে চলেছে—সে পথ চলায় তার ভীষণ আনন্দ—আগামী দিনের প্রচুর বড় সম্ভাবনা লুকিয়ে র'য়েছে তারই আকাশে বাতাসে, সেই ঘনায়মান মেঘ-পুঞ্জের দিকে চেয়ে তার কি ভালই যে লাগত!

তারপর একদিন সেই অলসতার ভেতরে, সেই আ-মন্থর রসঘন বর্ষার অবচেতনায় গার্গী নিজেকে আবিষ্কার করল। দেখলো তারও আছে যেন এক রামগিরি পর্বত—তারও জন্যে যেন আছে কে! সেই কে, সে যেন অপেক্ষা করছে তারই জন্যে অনন্তকাল! অনন্তকাল তারই ব্যগ্র প্রতীক্ষাকে কেন্দ্র ক'রে গার্গীর যেন আজকের এই অনুভূতি!

কি ভালই যে লাগত গার্গীর—একবার সে দার্জিলিঙ্‌ গিয়েছিল—ওরা যেখানে থাকৃত, সেখান থেকে কাঞ্চনজংঘার বরফমণ্ডিত চূড়া সহজেই দৃশ্যমান—ওপরের নীল আকাশ এসে সেই চূড়াকে ছুঁয়েছে, চারি-দিকেই নীল, নির্জন অবকাশ—মাঝে মাঝে ছেঁড়া মেঘের ইতস্ততঃ পরিভ্রমণশীল শরীর গার্গী কল্পনা ক'রে নিত, কল্পনা ক'রে নিত সেই অদ্ভুত নির্জনতাকে, চারিদিকেই যেন ধু-ধু করা বরফের প্রান্তর—তারই নীচে গভীর বন-বেষ্টিত অরণ্যভূমি—আর সেই পথ বেয়েই গার্গী চ'লেছে—সঙ্গে তার সেই কে!

সমস্ত শরীরে মনে গার্গী যেন সেদিন কাকে অনুভব ক'রেছিল!

সেই কৈশোর এবং যৌবনের অপূর্ব বয়ঃসন্ধি!

তারপর—তারপর গার্গীর জীবন ক্রমশঃ ঘোরাল হ'য়ে উঠেছে। তারপরে হঠাৎই এসেছিল দুর্যোগ, এসেছিল জীবনের দুঃসহতম দুর্দিন। সেই থেকেই গার্গীর এই রকম ভেসে চলা!

সেও বর্ষার এক বর্ষণ-ক্লান্ত শুব্ধ দিন। কি-একটা বিশেষ প্রয়োজনে বাবা অন্য গ্রামে গিয়েছেন। ফিরতে সন্ধ্যা হ'তে পারে। বেলা প'ড়ে এসেছিল, গার্গীর মা কি একটা বই পড়ছেন। সারা দিনই টিপ্‌-টিপ্‌ ক'রে বৃষ্টি পড়েছে—এখন আকাশটা অনেক পরিষ্কার। এমন সময়ে খবর এল!

গার্গীর তখন যে কি রকম মনে হ'য়েছিল, তা ঠিক আজ মনে পড়ে না, তবে ক্রমশঃ তার সমস্ত শারীর-চেতনা যেন অবসন্ন হ'য়ে এসেছিল—মনে হ'য়েছিল পৃথিবীর

মাটীতে সে যেন দাঁড়িয়ে নেই, হয় তো অন্য কোথাও, অন্য কোন অসমতল বন্ধুর জায়গায়। তারপর গার্গী যে কি ক'রেছিলো, একটুও মনে নেই।

অবশ্য পরে গার্গী ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ হ'তে পেরেছিল, কিন্তু অতি ধীরে, অতি শ্লথ গতিতে। তারপর যখন সে প্রকৃতিস্থ হ'ল, তখন সে কান্নায় উচ্ছ্বসিত, সমস্ত শরীরে সে তখন অবশ—সমস্ত দেহ ঘিরে তার জীবনের চরমতম বেদনার প্রবাহ নেমেছে।

বিকেলের আগে হঠাৎই যে বজ্র-নির্ঘোষে তারা চম্‌কে উঠেছিল, সেই নিদারুণ বজ্রপাত তার বাবারই নৌকোর ওপরে ঘটেছে; এবং শেষতম খবর হ'চ্ছে: বাবা নেই!

সেই অকরুণ ম্লানায়মান ধূসরাভ সন্ধ্যা! সমস্ত রাত্রি মা ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে মাটীর ওপরে কাটালেন—সমস্ত রাত্রি তাদের জীবনের ওপর দিয়ে একটা বিভীষিকা সৃষ্টি ক'রে গেল। গার্গী আর মা! তাদের জীবনে সেই একটা বিশেষ রাত্রি!...

কিন্তু দুর্যোগের পরিসমাপ্তি ঐ খানেই ঘটল না। আরও ছিল—আরও দুঃসহতম বেদনাকে অতিক্রম করতে হ'ল তাঁদের, কঠিনতম দুর্যোগ!

মৃত্যুর পরে মা শ্বশুর বাড়ীতেই ফিরে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষ রাজী হন্ নি—হ'তে পারেন না—ছেলের চেয়েও তাঁদের সংস্কৃতি বড়, সামান্য একটা ছেলের জন্যে তাঁরা তাঁদের বিরাট্ সমাজ-সম্মানকে ক্ষুণ্ণ করতে পারেন না। ছেলে মরেছে, এখন সবই গেছে—এখন তো কোন কথাই উঠ্‌তে পারে না—ছেলে থাক্‌লেও তাঁরা অনুমোদন করতেন না, তাঁদের সংস্কৃতির গণ্ডী বড় কঠিন—তার সামান্যতম ত্রুটিও সহ্য করার ধৈর্য তাঁদের রক্তে নেই!

এই ইতিহাস গার্গী জান্‌ত। তাঁ'দের মা আর বাবার বিবাহ তখনকার দিনে প্রায় একটা উপন্যাস বলা যায়, অন্ততঃ রীতিমত দুঃসাহসের পরিচয় যে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই!

সমস্ত সমাজ-চেতনার ওপরে তার বাবাই প্রথম এই ঢেউ এনেছিলেন, এই অস্থির কম্পন! এম.এ. পাস করার পর তিনি কঠিন ভাবে পণ করলেন, তাঁর মতবাদকে ক্রমশঃ দৃঢ়ীভূত করে তুল্‌তেই হ'বে; এবং তা' তিনি দেখালেন। সমাজের চোখের ওপর ব'সেই তা' তিনি দেখিয়ে গেলেন গার্গীর মাকে বিয়ে ক'রে। কিন্তু অ-সবর্ণ বিবাহ সমাজ দেখ্‌তে অভ্যস্ত নয়! তার রক্তচক্ষু বাবার সমস্ত উদ্যমকে ধ্বংস করার যথেষ্ট আয়োজন করল। কিন্তু গার্গীর এখানে মনে হ'ল: বাবার দেহ ঠিক সেই ধাতুতেই গঠিত ছিল না—যা' রক্ত-চক্ষুর অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে গ'লে তরল হ'য়ে যায়—

—বাবা মাথা উঁচু ক'রেই দাঁড়িয়ে রইলেন—মাথার ওপর দিয়ে সমস্ত ঝড়—সমস্ত ঝঞ্ঝাকেই অনায়াসে ব'য়ে যেতে দিলেন।

কিন্তু তার প্রতিক্রিয়াও এল রুদ্র মূর্তিতে। একদা বাবা বঞ্চিত হ'লেন তাঁর পৈতৃক সম্পত্তির যথার্থ অধিকার হ'তে। বাবার বিরুদ্ধে এটাই ছিল তাঁর অভিভাবকদের রূঢ়তম অভিযোগ। তবু বাবা টলেন নি, তিনি ছিলেন, সাধনার যেন একটী সংহত বাণী-মূর্তি! গার্গীর প্রায়ই বাবাকে মনে পড়ে, তিনি বল্‌তেন: আমাদের জাতীয় সংস্কারকে সংশোধন করার মূলে যে গভীরতম দুঃখ আছে—আমি তার সবে প্রথম পাঠ গ্রহণ ক'রেছি—এখনও কত দুর্গম পথ ভাঙ্‌তে হ'বে—এই তো সবে আরম্ভ! হয় তো এই দুঃখ বরণ ক'রেই তিনি একদিন মহীয়ান্ হয়ে উঠ্‌তে পারতেন—হ'য়ে উঠতে পারতেন এক জন সমাজ-নেতা; বলা যায় না—সময়ের প্রভাব মানুষের জীবনে এত গভীর যে, আজ যা' তুমি অসম্ভব ব'লে ঠিক ক'রে রেখেছ, ঠিক কাল নয়, একটা নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে দেখ্‌লে তাই সম্ভব হ'য়ে এসেছে—এই বৈচিত্র্য মানুষের চিরন্তন ধারাবাহিকতার ভেতরে একটা আশ্চর্য অনুভূতি সৃষ্টি ক'রে রেখেছে—একে অস্বীকার ক'রে কোন মানুষই বাঁচতে পারে নি—কোন সমাজই পারে না। তাই হয় তো বাবাও এক দিন জন-নেতা হ'তে পারতেন—মহা-মহিমায় তাঁর সমস্ত সাধনা—সমস্ত প্রচেষ্টা সূর্যের আলোর মত ঝলমল করত। কিন্তু হ'ল না—মৃত্যুর কঠিন আঘাতে তা' ভেঙে চুরমার হ'য়ে পৃথিবীর মাটীতে ছড়িয়ে পড়ল!

সুতরাং পিতৃপক্ষ থেকে যে এ রকম একটা কঠিন প্রতিবাদ আস্‌বে, এ কথা সহজেই বোঝা গিয়েছিল। তবু মা আশা ছাড়েন নি—বল্‌তেন, "আমার থাক্‌বার একমাত্র জায়গাই ওই—সমস্ত লাঞ্ছনা, সমস্ত দুঃখ এবং গঞ্জনা সহ্য ক'রেও আমার ওইখানে থাক্‌বার কথা—ভুল প্রত্যেকেই ক'রে—আজও কি সেই ভুল সংশোধন করবার দিন আসে নি?" কিন্তু তাঁদের সংস্কৃতি বড়—তাঁদের সমাজ-সম্মান অধিকতর সমৃদ্ধ—তার ওপরে তাঁরা নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ, বংশের একটি কুলাংগারের জন্যে যুগ-যুগ-পুঞ্জিত ঘনীভূত পুণ্যরাশির ক্ষয়-সাধন করার অযৌক্তিক দুর্বলতা কেনই বা হ'বে তাঁদের? তাঁদের সে সংযম আছে—এবং আছে ব'লেই তাঁরা আজও সমস্ত জন-সমাজে সম্মানিত!

এ দিক্ থেকেও দিদিমা এসে বাধা দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, "আমার মেয়ে হ'য়ে তুই এই অসম্মান মাথায় ক'রে নিবি এ আমি সইতে পারব না মা, একমাত্র মেয়ে তুই—একমাত্র সন্তান, কে আছে আর? আমরা যে ক'দিন রইলাম—সে ক'দিন আমাদের কাছেই থাক্‌বি, কোন প্রতিবাদ চল্‌বে না—আমি বেঁচে থাক্‌তে তোর এই অসম্মান হবে না—হ'তে দেব না।"

তাই, শেষ পর্যন্ত মা দিদিমার কাছেই ফিরে এসেছিলেন, কিন্তু জীবনে একবার যার ভাঙন আসে, তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা বড় কঠিন—অসম্ভবই হয় তো বলা যায়। সেই ভাঙন মার জীবনেও এসেছিল, দুকুল-প্লাবী উচ্ছ্বসিত বন্যার পরে এখন দু'ধারে জেগে আছে শুধু তীর ভাঙার শব্দ—শীর্ণায়মান শরীর নিয়ে মা এক দিন বিছানা নিলেন।

গার্গীর মনে পড়ে শেষের মাস খানেক মার অসুখ সব থেকে মর্মান্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল—বুকের মধ্যে একটা অসহ্য যন্ত্রণা উঠ্‌ত শির্‌-শির্‌-করে—তারপরে সমস্ত শরীরে সেই বেদনা ছড়িয়ে পড়ত—বেদনায় সমস্ত শরীর যেন নীল হ'য়ে উঠ্‌ত, অসহ্য সেই যন্ত্রণা—গার্গীর আজও মনে পড়লে সমস্ত শরীর অস্থির হ'য়ে ওঠে। এরই মধ্যে মা একটু সুস্থ থাক্‌লে, গার্গীকে ডেকে কাছে বসাতেন, অনেক কথা বল্‌তেন—অনেক আলোচনা! তাঁর অতীত জীবনের ছায়া এসেও তাতে পড়ত মাঝে মাঝে!

এক দিন সেই রকমই এক নিভৃত নির্জন সন্ধ্যায় গার্গী মার কাছে ব'সেছিল। নিস্তব্ধ ঘর—দাদামশাই ওপরে আছেন—দিদিমা ঘরে নেই, বোধ হয় নীচে গেছেন। চাকর ঘরের আলোটা জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে একটু আগে।

হঠাৎই কি কথার ভেতরে মা আস্তে আস্তে গার্গীর একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়েছিলেন, তারপরে সেই রকম আকস্মিক ভাবেই কেঁদে ফেলেছিলেন। গার্গী কিছু বুঝ্‌তে পারেনি, মার কান্না দেখে তারও সমস্ত শরীর কান্নার অবরুদ্ধ আবেগে কেঁপে কেঁপে উঠেছিল। কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে মা কথা বলেছিলেন, বলেছিলেন, "আমি শেষ হ'য়ে এসেছি মা, হয়তো আর বেশীদিন নয়, এর জন্যে আমার দুঃখ নেই—দুঃখ তোকে নিয়েই গার্গি!" মা একবার অতি কষ্টে নিঃশ্বাস ফেল্‌লেন—বল্‌লেন, "তোর জন্যেই তাঁর ভাবনা ছিল বড়—তোকে তিনি নিজের হাতে গড়তে চেয়েছিলেন—তোর মধ্যে তিনি অনুভব করেছিলেন একটা বিশেষ প্রেরণা—"

গার্গী এ-সবের অর্থ যথাযথভাবে বুঝে উঠ্‌তে পারেনি—মার কথায় সে তখন প্রবল কান্নায় উচ্ছ্বসিত!

—"কাঁদিস্‌না, আমার বেঁচে থাকার কোন নিগূঢ় অর্থই নেই—বেঁচে থাকা মানেই আমার আরও যন্ত্রণা সহ্য করা।" মা আবার বল্‌তে আরম্ভ করেছিলেন, "মৃত্যুই আমায় সেই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবে—আমি তাই-ই চাই, তবে তোর জন্যেই—তোর জন্যেই মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় বেঁচে থাকি—তোকে গ'ড়ে যাই"। মা আর একবার অতি কষ্টে নিঃশ্বাস নিলেন, "উনি বল্‌তেন: সমস্ত জাতির বিরাট্ উজ্জ্বল ভবিষ্যতের মূলে র'য়েছে শিক্ষা, জাতির মেরুদণ্ড বলা যায়—সমস্ত সংস্কৃতি—সমস্ত ভবিষ্যৎ তা' থেকেই গ'ড়ে ওঠে মা; এই শেষ দিনে, এই জীবনের সামান্য অবকাশে, তোর কাছে আমার এই অনুরোধই রেখে গেলাম, শেষ পর্যন্ত যাস্—তাঁর ইচ্ছে ছিল তোকে যথেষ্ট লেখাপড়া শেখান—তোকে তাঁর উপযুক্ত কন্যার মহিমায় মহিমান্বিতা দেখেন, তাই আমি বলি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পর্যন্তই যাস্; আর—" মা একটু থেমে বলেছিলেন, "আর নিজেকে বিশ্বাস করিস্ মা, মনে রাখিস্ তোর মধ্যেই তিনি বেঁচে আছেন—আমি বেঁচে আছি। মনে রাখিস্—আত্মবিশ্বাসের মত

নিজেকে পবিত্র রাখার দ্বিতীয় মন্ত্র সমস্ত পৃথিবীতে নেই—নিজেকে জানিস্—নিজেকে চিনিস্—"

"আজ"—একটু জিরিয়ে নিয়ে মা আবার বলেছিলেন, ; সংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন, তার ফল সমস্ত হৃদয় দিয়ে—সমস্ত শরীর দিয়ে তিনি অনুভব ক'রে গেছেন—আমাদের এই অন্ধ জড়তার শেষ হোক, ভাগ্য-বিধাতার কাছে আমার এই একান্ত প্রার্থনা, তাঁর এই প্রচেষ্টার মর্মান্তিক অবমাননা আমি তীব্র ভাবে অনুভব ক'রেছি, লক্ষ্য করেছি : তাঁর সমাজ-বিদ্রোহের অন্তরালে কল্যাণ-দীপ লুকান ছিলো, তার তিনি বহিঃপ্রকাশ হ'তে দিতে পারেন নি—সাধনাতেই সমস্ত জীবনটা ব্যয়িত হ'ল, তুই সে আলোর প্রথম দীপবাহিকা হ'য়ে এগিয়ে যাস্—আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে সফল করিস গার্গি—আমাদের অন্তরের ঐকান্তিক আশীর্বাদ রইল তোর জন্যে।"

তাই গার্গীর প্রায়ই মাকে মনে প'ড়ে। সেই মা! বিছানায় সমস্ত শরীর মিশে গেছে—সমস্ত মুখে চোখে মৃত্যুর ঘন পাণ্ডুর ছায়া এসে ছড়িয়ে প'ড়েছে, সারা শরীর অবসন্ন—তবু মা সেদিন জ্ব'লে উঠেছিলেন দীপ্ত, দৃপ্ত আলোকশিখার মত; মা প্রতিজ্ঞায় ধক্ ধক্ ক'রে উঠেছিলেন ;—শীর্ণায়মান হাত দু'খানিকে প্রসারিত ক'রে গার্গীর অবনত মস্তকে আশীর্বাদ ক'রেছিলেন, বলেছিলেন, "এগিয়ে যাস্ মা, তাঁর সাধনাকে সফল করিস্, সম্মাননীয়া, বরণীয়া হ'য়ে উঠিস্ মানবসমাজে, তোর মধ্যে সে শক্তি আছে—আমি তা' জানি।"

তার পর থেকেই মা আরও ভেঙে পড়েছেন।

তার পরের দিন থেকেই অসুখটা যেন ক্রমশঃ বেড়ে উঠেছিল। দিদিমা এবং দাদামশায়ের আপ্রাণ চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। যার ভেতরে ভাঙন ধ'রেছে দীর্ঘদিন থেকে, তাকে ওপরে সান্ত্বনার প্রলেপ দিয়ে কতদিন কর্মক্ষম রাখা যায়? একদিন সে ভেঙে পড়েই, পড়তেই হয় তাকে। শেষের ক'দিন গার্গীর একটা একটানা দুঃস্বপ্নের মত কেটে গেছে। সব থেকে গার্গীর অসহ্য বোধ হ'ত মার যন্ত্রণা-বিকৃত সমস্ত মুখের করুণ-ছায়া, তাঁর মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণের অসহায়—অসহনীয় ভঙ্গী!

শেষের দিকে মা বিশেষ কথা বল্‌তে পারতেন না। শুধু গার্গীর দু'টী হাত নিজের বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধ'রে রাখ্‌তেন। আর জল পড়ত—মনে হ'ত চোখ বেয়ে তাঁর জীবনের সমস্ত বেদনা যেন অশ্রু হ'য়ে নেমে আস্‌ছে! গার্গী চেয়ে থাকৃত—তারও কিছু যেন বলার নেই—এই জীবনের অপরূপ সায়াহ্নে গার্গীও চোখের জল ফেলে তাঁর যাত্রাপথে যেন ছন্দঃপতন না ঘটায়—গার্গীর চোখ দুটো শুধু জ্বালা করত—মার জীবনের এই করুণতম সন্ধ্যায় শান্তির মধ্যেই নেমে আসুক সেই চরম মুহূর্ত—সেই জীবনের অপূর্ব সমাধান—গার্গী চোখের জল ফেলে তাঁর শান্ত-সমাহিত মৃত্যু-চেতনাকে যেন বিচলিত না করে। তবু গার্গী পারত না—চোখ দুটো অসহ্য রকম জ্বালা করত।

তারপর একদিন অতি ধীরে নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে বলা যায়—মার দেহ ভ'রে সেই মুহূর্ত নেমে এল—মার দুই চোখে তারই ছায়া পড়ল, মেঘান্ধকার বর্ষণ-ঘন বিকালের অস্বচ্ছ আলোয় দেখা মার সেই মৃত্যু-পাণ্ডুর ম্লান মুখ! গার্গীর মনে পড়ে, আজ সবই মনে পড়ে—ছবির মত চোখের ওপরে প্রত্যেকটি ঘটনা দৃশ্যমান।

তারপরে গার্গী পারেনি, মার শিথিল দেহের ওপরে সে লুটিয়ে প'ড়েছিল—সমস্ত দেহ দিয়ে—সমস্ত চেতনা দিয়ে গার্গী সেদিন মার মৃত্যুকে অনুভব ক'রেছিল!

গার্গী বিছানার ওপরে উঠে বস্‌ল।

আর আশ্চর্য, সেইদিন থেকেই গার্গীর জীবন আরম্ভ হ'ল। ম্যাট্রিকে সে বারই গার্গী পেয়েছিল স্কলারশিপ; নূতন দৃষ্টি নিয়ে—নূতনতর ভঙ্গীতে সে পা ফেলেছিল পৃথিবীর পথে; সেইদিন থেকেই গার্গীর মনের মধ্যে জেগেছিল মার সেই মৃত্যুপাণ্ডুর ম্লান মুখ—গার্গীকে দুর্বল হাতে আশীর্বাদ করার অসহায় ভঙ্গী।

ক্রমশঃ

ব্রহ্মসূত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়

(প্রথম পাদ)

শ্রীমতিলাল রায়

ভাবে চোপলব্ধেঃ ॥১৫

ভাবে (কারণের সত্তা থাকিলে) উপলব্ধেঃ চ (কার্য্যের উপলব্ধি হয়)।

অর্থাৎ কারণ থাকিলে, কার্য্যের জ্ঞান হয়। এই হেতু কার্য্যকারণ অভিন্ন বলা যাইতে পারে।

মৃত্তিকা আছে বলিয়াই ঘটের উপলব্ধি; এই জগৎ-কার্য্যেরও তদ্রূপ কারণ আছে। ঘটের সমাপ্তি ও আশ্রয়-স্থান যেমন মৃত্তিকা, তদ্রূপ যাবতীয় সৃষ্টির কারণস্বরূপ অদ্বয় ব্রহ্মই ইহার একমাত্র আশ্রয় ও লয়স্থান।

সত্ত্বাচ্চাচরস্য ॥১৬॥

অচরস্ত (উৎপত্তির পূর্ব্বেও কারণরূপে) সত্ত্বাৎ চ (কার্য্য সত্তায় অবস্থান করে, এই হেতু)।

জগৎ ও ব্রহ্ম এক, অভিন্ন। কার্য্য ও কারণের মধ্যে ভিন্নতা নাই, তাহাই প্রমাণ করার জন্য এই সূত্রগুলি উল্লিখিত হইতেছে। শ্রুতি বলিয়াছেন, 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ'—হে সৌম্য! এ সকল অগ্রে সৎই ছিল। আমরা ঘট দেখাইয়া যেমন অনায়াসেই বলিতে পারি—সৃষ্টির পূর্ব্বে ইহা মৃত্তিকাই ছিল; তেমনই এই যাবতীয় সৃষ্টিপ্রপঞ্চ ব্রহ্মই ছিল বলা যায়। ব্রহ্মই ছিল, তারপর এই সৃষ্টি; অতএব সৃষ্টি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এইরূপ বলিতে পার না। এই সকল অর্থাৎ "ইদং" শব্দ জগতের সমানাধিকরণ্য অর্থে কথিত হওয়ায়, কার্য্য ও কারণের অভিন্নতাই প্রদর্শিত হইয়াছে। যে কার্য্যের যাহা কারণ নহে, তাহা হইতে তাহার উৎপত্তি সিদ্ধ হয় না। মৃত্তিকা হইতে বস্ত্র হয় না; বালু হইতে তৈল নির্গত হয় না; অর্থাৎ কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে কারণের সহিত কার্য্য অভেদ অবস্থায় সুপ্ত থাকে। ব্রহ্ম জগৎকারণ, ইহার শ্রুতিপ্রমাণ আছে; অতএব জগৎ ব্রহ্ম বলিয়া যে অনুভূতি, তাহা যুক্তিযুক্ত।

অসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেন্ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ ॥১৭॥

অসদ্ব্যপদেশাৎ (শ্রুতিতে অসৎ ছিল, এইরূপ উপদেশও আছে) ন (ইহাতেই পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত অসিদ্ধ হইল) ইতি চেৎ (এইরূপ যদি বলি) ন (না, এইরূপ বলিতে পার না) [কেন?] বাক্যশেষাৎ (ঐ শ্রুতির শেষ বাক্য হেতু) ধর্ম্মান্তরেণ (ধর্ম্মান্তরপ্রাপ্তিমূলক অবস্থাবিশেষের বর্ণনা হেতু)।

অর্থাৎ জগৎ যখন অব্যক্ত ছিল, সৃষ্টির এই অব্যক্ত ধর্ম্মকে ব্যক্ত করার ভাষাস্বরূপ অসৎ শব্দের ব্যবহার হইয়াছে।

আত্মা অমর। অতএব কোন দেহী যতক্ষণ শরীর আশ্রয় করিয়া থাকে, তদীয় পত্নীর পতি বিদ্যমান, এই এক অবস্থা। আত্মা বিদেহী হইলে, স্বামিহীনা নারীর অন্য এক অবস্থা। শেষাবস্থায় এই নারীর পতি নাই বলিতে হয়; ইহার অর্থ এমন নহে যে, পতি তাহার ছিল না অথবা একেবারেই নাই। পতিহীনার বেশভূষা দেখিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়—আত্মা যখন অমর, তখন সে একেবারেই পতিহীনা নহে। তাহার পতি বিদেহ হইয়াছে মাত্র। বিষয়বস্তুর ধর্ম্মান্তর বিস্পষ্ট করার জন্য বেশ-ভেদের ন্যায় ভাষা-ভেদও কেন না হইবে? শ্রুতির যে অংশে বলা হইয়াছে, এই সকল অগ্রে "অসৎ" ছিল, তাহার অর্থ এইরূপ নহে যে, এই সকলের অত্যন্তাভাব অর্থাৎ এ সকল একেবারে ছিল না; সৃষ্টির ব্যক্ততা-প্রাপ্তির পূর্ব্বাবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়াই এই অসৎ শব্দের ব্যপদেশ হইয়াছে। ঐ শ্রুতির উপক্রমে অসৎ শব্দের দ্বারা যে সন্দেহ উপস্থিত হয়, শেষে তাহা নিরসিত হইয়াছে। উপক্রমে "ইদমগ্র আসীৎ"—এই কথা বলিয়া

বাক্যশেষে 'তৎসদাসীৎ'—সেই সৎ ছিলেন, এইরূপ বলা হইয়াছে। এই হেতু পূর্ব্বে যে "অসৎ আসীৎ" এই অসৎ আত্যন্তিক অসৎ নহে, ইহা বলাই বাহুল্য। "অসদেব" এই "এব" শব্দের অর্থ 'ইব' বলিয়া গ্রহণ করিলে, সৃষ্টির পূর্ব্বে এই সকল অসতের ন্যায় ছিল, এইরূপ অর্থ হয়। কিছু না থাকা শ্রুতিবাদে বুঝায় না। শ্রুতির উপক্রমে যে অসৎ শব্দের ব্যবহার, তাহা একেবারেই না থাকা অর্থে গ্রহণ করিলে, শ্রুতিবাদ অসিদ্ধ হয়। শ্রুতি একাধিকবার বলিয়াছেন—"তদাত্মানাং স্বয়মকুরুত" অর্থাৎ তিনি আপনি আপনাকে সৃজন করিলেন। সৃষ্টি তাঁহার মধ্যেই ছিল। তাহা না হইলে, কার্য্য হয় কি প্রকারে? আরও যুক্তি আছে—

যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ ॥১৮॥

যুক্তেঃ (যুক্তির দ্বারা) চ (এবং) শব্দান্তরাৎ (অন্যান্য শ্রুতিবাক্য হইতে ইহা প্রমাণ হয়; এই হেতু)।

কি প্রমাণ হয়? উৎপত্তির পূর্ব্বে জগৎ-কার্য্য ব্রহ্ম-কারণে অনুস্যূত থাকে। ব্রহ্ম ও জগৎ কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট বলিয়া এক হইতে অন্য পৃথক্ নহে। নিখিল বেদ-শাস্ত্রে এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রে ব্যাসদেব তাহা ন্যায়ানুগত করিয়া প্রমাণ করিতেছেন।

ব্রহ্ম ও জগৎ যে অভিন্ন, তাহার যুক্তি আছে, শ্রুতি-প্রমাণও আছে। প্রথম, যুক্তির কথা। যদি কেহ দধি প্রস্তুত করিতে চাহে, সে তাহার উপাদানস্বরূপ দুগ্ধই গ্রহণ করিবে। দুগ্ধে দধি অতিশয় হইয়া থাকে অর্থাৎ শক্তিরূপে থাকে। প্রকরণ দ্বারা তাহাই কার্য্যে পরিণত হয়। দুগ্ধে যদি দধিরূপ কার্য্য হওয়ার সম্ভাবনা না থাকিত, তাহা হইলে মৃত্তিকা হইতে যেমন দধি জন্মে না, সেইরূপ দুগ্ধ হইতে দধিসৃষ্টিও অসম্ভব হইত। অতএব যে কারণের যে স্বরূপ, তাহাই কার্য্যে রূপ লইয়া প্রকাশ পায়। প্রশ্ন হইতে পারে—ইহাতে কি কার্য্য ও কারণের অপৃথকত্ব প্রমাণিত হইল? কারণরূপ দ্রব্য দুগ্ধ কার্য্যরূপী দধিতে পরিণত হইলে, তাহাতে কি স্বরূপতঃ দুগ্ধের সমুদয় প্রতীতি জন্মে? আমরা বলিব—না, এরূপ হইলে দুগ্ধ হইতে দধির ভিন্নতা অনুভূত হইত না। দুগ্ধ স্বরূপতঃ দধিতে তাহার সবখানি লইয়া যদি প্রকাশিত হয়, তাহা দুগ্ধেরই নামান্তর হইবে; তাহার হেতু, কারণ-দ্রব্যে কার্য্যরূপী অবয়বী যখন অতিশয় হইয়া থাকে, তারপর যখন তাহা ভিন্ন রূপ লইয়া প্রকাশ পায়, তখন কারণের সবখানি ইন্দ্রিয়গোচর হয় না। এই প্রাকৃত নিয়মই কার্য্যকারণ ভেদ রক্ষা করে। মূলতঃ কার্য্যকারণ অভিন্ন। একত্ব হইতে বহুত্বের দৃষ্টান্ত দিলেই ইহা বিশদ হইবে। বহু যদি একের অভিব্যক্তি হয়, তাহা হইলে বিশ্ববস্তুতে এই একতে খুঁজিয়া বাহির করা সুসাধ্য হয় না; আবার কোন এক বস্তুর জ্ঞানও বহুর জ্ঞানকে সুস্পষ্ট করে না। তাহার হেতু, কারণের সমস্তখানি কোন এক কার্য্যে বিদ্যমান্ থাকে না, কারণের কোন অংশই বস্তুবিশেষের আশ্রয়ক্ষেত্র। ইহা পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে "একাংশেন স্থিতম্ জগৎ"—এ কথারও প্রতিবাদ আছে। ইহাতে এক আপত্তি—সৃষ্টির উপাদান ও নিমিত্ত কারণ অদ্বয় ব্রহ্ম-স্বরূপ হইলেও, মূলতঃ তাহা বহুধা বিচ্ছিন্ন এবং তাহা বহু কারণবিশিষ্ট হইয়া কার্য্যাদি সৃষ্টি করিতেছে। এই হেতু কার্য্য দেখিয়া কারণ-নির্ণয়ে, কার্য্যকারণ-সম্বন্ধের আশ্রয়ে আমরা কিরূপে ব্রহ্মানুভূতি লাভ করিব?

এইরূপ সংশয়ের হেতু নাই। কেননা ব্রহ্ম-কারণ হইতে বহুত্ব-রূপ যে কারণ—যেমন ক্ষিতির কারণ অপ্, আবার তাহার কারণ তেজঃ, এই পর্য্যায়ক্রম ধরিয়া আমরা সর্ব্বকারণের কারণে অনায়াসেই উপনীত হইতে পারি। বহু সূত্র লইয়া বস্ত্র-নির্ম্মাণ হয়, বস্ত্রের কারণ কিন্তু সূত্র। সূত্রের বহুত্ব প্রয়োজনার্থে গৃহীত হইয়াছে। জগতের যাবতীয় বস্তুর বিচিত্র কারণ থাকা সত্ত্বেও, আমরা প্রকরণ-ক্রমে সেই আদিভূত ব্রহ্ম-কারণে উপনীত হই। সৃষ্টির কারণ ব্রহ্ম; তাই সৃষ্টির সহিত ব্রহ্ম অভিন্ন।

কেহ হয়তো বলিবেন, দধির কারণ যেমন দুগ্ধ, কেয়ূর-কুণ্ডলের কারণ যেমন স্বর্ণ, এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্ট বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন কারণ আছে, ঐ সকলের ভেদ লোপ করার কি হেতু আছে? ইহার উত্তরে বলা যায়—কার্য্যরূপে যাহা প্রকাশিত হয়, তাহা পূর্ব্বে থাকে না। কিন্তু কার্য্যোৎপত্তি যখন হয়, তখন বলিতে হইবে—ইহা একটী ক্রিয়াযোগে সম্পন্ন হইল। ক্রিয়া থাকিবে, কর্ত্তা থাকিবে না—এইরূপ কথা সঙ্গত নহে। আবার ঘট-পটাদির ন্যায় উপাদান

কারণ এক, নিমিত্ত-কারণ অন্য, এইরূপ প্রতীতিও স্রষ্টার পক্ষে খাটে না। কেননা, ঘট-পটাদির নিমিত্ত-কারণরূপ কর্ত্তা গোচরীভূত হয়। সৃষ্ট্যাদির উপাদান কারণ অদৃষ্ট, অনির্ব্বচনীয়; নির্ম্মাতাও অব্যক্ত। এই হেতু আমরা অনায়াসেই বলিতে পারি—যখন ক্রিয়া আছে, তখন কর্ত্তাও আছেন। কার্য্য দেখিয়া উপাদানের বিদ্যমানতা-স্বীকারের সঙ্গে নির্ম্মাতাকেও স্বীকার করিতে হইবে। উপাদান-কারণ ও নিমিত্ত-কারণ মূলতঃ অব্যক্ত; অতএব সৃষ্টির আদি কারণ এক অদ্বয় ব্রহ্ম বলায় দোষ হয় না।

ইহার উপরও প্রশ্ন হইতে পারে—সৃষ্টির আকারগত পার্থক্য দেখিয়া কারণ-ভেদ কি হেতু অসঙ্গত হইবে? ইহার উত্তরে বলা যায়—আমরা একই দেহে আকৃতিগত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করি। তাহাতে কি বলা যায় যে, আকৃতিগত পরিবর্ত্তনের জন্য আশ্রয়-তত্ত্বের ভেদ আছে? বটের বীজ ভিন্ন ভিন্ন আকৃতিতে প্রকাশ পায়, তাই বলিয়া কি এই আকৃতিগত পরিবর্ত্তনের জন্য বীজ-স্বরূপ ইহার কারণের ভিন্নতা স্বীকার করিতে হইবে? বস্তু যখন কারণ হইতে উদ্ভূত হয়, তখন তাহা বস্তুর জন্ম। তারপর ক্ষয়-বশতঃ ধীরে ধীরে আমাদের দৃষ্টির অগোচরে যখন তাহা চলিয়া যায়, তখন তাহার বিনাশ হইল বলা যায়। কিন্তু সকল সৃষ্টির উপাদান এক অদ্বয় শাশ্বত ব্রহ্ম। নতুবা সৃষ্টিপ্রবাহ থাকে না। এই হেতু বস্তুর উৎপত্তি ও বিলয় আকৃতিগত পরিণাম-দর্শন, উহা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর ধর্ম্ম। পরন্তু এক অনাদি কারণ হইতেই যাবতীয় বিচিত্র কার্য্যের উৎপত্তি। কার্য্যের বৈচিত্র্য যত থাক, সেই এক মূল কারণ নটের ন্যায় বিচিত্র কর্ম্মের অভিনয় করিতেছে। অতএব উৎপত্তির পূর্ব্বে সৃষ্টির অস্তিত্ব এবং কার্য্যের সহিত কারণের অভিন্নত্ব সিদ্ধ হইল।

এইবার শব্দান্তরের কথা। শ্রুতিতে অসৎ শব্দের উল্লেখ থাকায়, সৃষ্টির পূর্ব্বে কিছু না থাকার প্রতীতি জন্মে। কিন্তু সৎ শব্দের শব্দান্তর থাকায় অসদ্বাদকে খণ্ডন করিয়া সৎই প্রতিষ্ঠা পায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—শ্রুতির "ইদং" শব্দ জগৎকার্য্যের বোধক। আর সৎ-শব্দ ব্রহ্ম-কারণের বোধক। এই দুইটী শব্দের সমানাধিকরণ্য হওয়ায়, কার্য্য-কারণের অভিন্নত্ব প্রতিপাদিত হইল। যদি উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য থাকে না, পশ্চাৎ উহার উৎপন্ন হইয়া কারণে সমবায় হয়, এইরূপ বলা হয়, তাহা হইলে কার্য্য-কারণের ভেদ আছে বলিতে হইবে। এইরূপ হইলে, "যেনাশ্রুতমশ্রুতং ভবতি" এই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ কারণজ্ঞানে কার্য্যের জ্ঞান সিদ্ধ হওয়ার প্রতিজ্ঞা রক্ষা পায় না। এই হেতু যাবতীয় কার্য্য কারণাকারেই থাকে। কোন কার্য্যই কারণাতিরিক্ত নহে। এই হেতু কর্ম্মসূত্র ধরিয়া আমরা পরম কারণে উপনীত হওয়ার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে পারি। ইহা কেবল যুক্তিশাস্ত্র নহে। জীবনদৃষ্টান্তেও ইহা প্রমাণিত হয়।

পটবচ্চ ॥১৯॥

আরও বস্ত্রের দৃষ্টান্তের ন্যায়।

দুগ্ধ হইতে দধি হয়, মৃত্তিকা হইতে ঘট হয়। অবয়ব দেখিয়া অবয়বীকে সর্ব্ব সময়ে জানা যায় না। তাহার সিদ্ধান্ত উপরোক্ত সূত্রে করা হইল। অর্থাৎ একখানি বস্ত্র যদি পুঁটুলি পাকাইয়া রাখা যায়, হয় তো তাহা বস্ত্র বা অন্য দ্রব্য, তাহা বুঝা যায় না। কিন্তু তাহা যদি বিস্তারিত করিয়া ধরা যায়, অনায়াসেই ঐ দ্রব্য যে বস্ত্র এবং উহা সম্বেষ্টিত দ্রব্য হইতে পৃথক্ নহে, তাহাও বোধগম্য হয়। তারপর এই বস্ত্রের কারণ যে সূত্র, তাহাও বিস্পষ্ট হইয়া উঠে; এবং কার্য্য ও কারণ যে ভিন্ন নহে, তাহারও নিশ্চয়-জ্ঞান জন্মে।

যথা চ প্রাণাদি ॥২০॥

যেমন প্রাণ প্রভৃতি।

প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান—এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত প্রাণ ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম করে; কিন্তু যদি এই প্রাণ-বায়ু প্রাণায়াম ক্রিয়ার দ্বারা রুদ্ধ হয়, তবে দেহের আকুঞ্চন, প্রসারণ সবই বন্ধ হইয়া যায়। প্রাণপঞ্চক এক মূল প্রাণে পরিণত হয়। এই প্রমাণের দ্বারা বিচিত্র ব্রহ্ম-কার্য্যের মূলে এক অদ্বয় ব্রহ্মই যে কারণ, তাহাই প্রমাণিত হয়। এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ব-বিজ্ঞান সিদ্ধ হওয়ার শ্রৌত প্রতিজ্ঞা এই প্রমাণে সিদ্ধ হয়।

ইতরব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ ॥২১॥

ইতর-ব্যপদেশাৎ (ইতর জীবের ব্রহ্মত্ব কথন হেতু অথবা ব্রহ্মকে জীব বলিয়া উল্লিখিত হওয়া হেতু) হিতা-

করণাদি দোষপ্রসক্তিঃ (ব্রহ্ম যদি জীবও হয়, তবে সে নিজের অনিষ্ট কি কারণে করে ; এইরূপ অসম্ভব দোষ আসিয়া পড়ে।)

জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা প্রমাণিত হইলে যে দোষ আসিয়া পড়ে, তাহার কথা বলা হইতেছে। চেতন ব্রহ্ম হইতেই জগৎসৃষ্টি। এই উপদেশ শ্রুতি দিয়াছেন। শ্রুতিতে স্পষ্টই আছে, "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি" অর্থাৎ এই জীবদেহে আমি প্রবেশ করিয়া নাম-রূপের প্রকাশ করিব। এইরূপ উক্তি শ্রুতির সর্ব্বত্রই আছে। অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন নহে, ইহাই শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মের ও জীবের সৃষ্টিকর্তৃত্ব সমানই হইবে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে জীবলোকে এমন অহিতকর কার্য্য কি হেতু ঘটিতে পারে? ব্রহ্মই যদি জীব হন, তবে তাঁহার জরা-মরণাদি অসংখ্য প্রকার অনর্থ-সৃষ্টি হয় কেন? ব্রহ্ম স্বাধীন, স্বতন্ত্র; তাঁর বন্ধন-দশা কেন? দুঃখের অশ্রু চক্ষু অন্ধ করে কেন? প্রতি মানুষই সর্ব্ব কর্ম্মে আমি করিতেছি, এইরূপ স্মরণে রাখে। এই স্মরণ স্বয়ং ব্রহ্মেরই; অতএব জীব যদি ব্রহ্মই হন, তখন এমন আত্মঘাতী জীবন-নীতি কেন তিনি আশ্রয় করিবেন? অতএব জীব ও ব্রহ্ম অভিন্নও নহেন এবং জীবের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ ব্রহ্ম হইতেই পারেন না।

এই পূর্ব্বপক্ষীয় যুক্তির খণ্ডনের জন্য পর সূত্রের অবতারণা করা হইতেছে।

অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ ॥২২

(তু শব্দ পূর্ব্বপক্ষনিরাসার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।) ভেদ-নির্দ্দেশাৎ (জীব হইতে ব্রহ্মের ভেদনির্দ্দেশ শ্রুতিতে থাকা হেতু) অধিকম্ (তিনি জীব হইতেও অধিক)।

শ্রুতি ব্রহ্মকে জীবাধিক বলিয়াছেন; অর্থাৎ তিনিই সর্ব্বভূতে, সর্ব্ব জীবে। জীব ব্রহ্মময়। কিন্তু ব্রহ্ম জীবময় নয়, তিনি তাহারও অধিক। জীব—অণু, ব্রহ্ম—বিভু; এ কথা শ্রুতির কথা। শ্রুতি জীবকে স্রষ্টা বলেন নাই, ব্রহ্মকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়াছেন। দুগ্ধ হইতে দধির জন্ম বটে; কিন্তু যেমন দধিতে দুগ্ধের সর্ব্বাবয়ব নাই, তেমনই জীবে ব্রহ্মের পূর্ণত্ব সম্ভব নহে—এই হিসাবে ব্রহ্ম ও জীব নহে। জীবের ধর্ম্ম কাল্পনিক। ব্রহ্মের সেরূপ নহে। অতএব জীব-স্বরূপ দেখিয়া ব্রহ্মের হিতাকরণ দোষ সঙ্গত হয় না। জীবের কারণ-তত্ত্ব ব্রহ্ম। কিন্তু জীবের সহিত ব্রহ্মের সর্ব্বাবয়বগত ঐক্য না থাকায়, শ্রুতি ভেদ-নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—তিনিই অন্বেষণীয় এবং বিচারণীয়। "তত্ত্বমসি"—ভেদ ও অভেদ, এই দুই উপদেশযুক্ত। "তিনিই তুমি"—এই ভেদাভেদ একই বস্তুতে সম্ভব হয় কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়—

আকাশ আর ঘটাকাশ। একই আকাশ ঘট মধ্যে প্রবেশ করায়, ঘটাদির উপাধিযুক্ত হইয়াছে। অতএব অদ্বয় ব্রহ্মবস্তুর উপাধিবিশেষে ভেদাভেদ-নির্দ্দেশ অসঙ্গত কেন হইবে? ঘটাকাশ হইতে আকাশের অধিকত্ব প্রমাণিত হয়। জীব হইতে ব্রহ্মের অধিকত্ব অসঙ্গতও নহে। ব্রহ্ম জীব হইতে নানা উপাধিত্ব হেতু পৃথক্। এই পৃথক্ত্বের বোধ বস্তুতঃ ব্রহ্মবোধ হইতে ভিন্ন নহে। জীবত্ব ব্রহ্মত্ব হইতে মূলতঃ অপৃথক্ বলায়, জীবত্বের হিতাকরণ দোষ হয় কি প্রকারে? এই প্রশ্নও খুব স্বাভাবিক। ইহার উত্তরে বলা যায়—জীবত্ব কোনদিন নিজের অহিত-সাধন করে না; তবে যে স্বর্গ-নরকাদি, সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব-ভোগ জীবে পরিলক্ষিত হয়, তাহা দৃশ্যতঃ দ্বন্দ্ব। জীব সতত আত্মহিতের জন্যই ক্রিয়ারত। উপাধি-বিশিষ্ট জীবত্ব সুখের ইষণায় যে দুঃখের স্পন্দন সৃষ্টি করে, তাহা সীমা-বিশিষ্ট উপাধিরই অভিব্যক্তি, জীবত্বের নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে—ধন-লাভের আয়াস সুখ লক্ষ্য করিয়াই হয়। উপাধিযুক্ত জীব আপনার সীমাকে এতদুদ্দেশ্যে যতটা উপযোগী করিয়া তুলিতে পারে, সেই পরিমাণেই অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, অভীষ্ট-বৃত্তির তারতম্যে কোথাও সুখোৎপত্তি, কোথাও সুখের অভাব হেতু দুঃখের অভিব্যক্তি। জীবের স্পন্দন কিন্তু সুখের লক্ষ্য ব্যতীত তদ্বিপরীতে নহে। এই জন্যই ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন—স্ত্রী যে স্বামীকে ভালবাসে, তাহা স্বামীর সুখের জন্য নহে, নিজের সুখের জন্য। অর্থাৎ আত্মার আনন্দ লক্ষ্যে রাখিয়াই জীবের কর্ম্ম-প্রবৃত্তি। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে,

জীবের হিতাকরণদোষও সঙ্গত নহে। সুখ লক্ষ্যেই জীব-ধর্ম্ম। অহিতসাধন কর্ম্মবৈচিত্র্য, একথা কর্ম্ম-বিজ্ঞানের আলোচনাকালে বলিব। ব্রহ্মই জীব হইয়াছেন। জীব ব্রহ্মের সবখানি নহে, এই হেতু জীব ও ব্রহ্মের ভেদ অবশ্যই স্বীকার্য্য। কিন্তু ব্রহ্মই জীবের হেতু—এই জন্য আত্মহিত লক্ষ্যে রাখিয়াই জীবের গতি। অতএব জীবের হিতাকরণদোষ কাল্পনিক।

অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ॥ ২৩॥

অশ্মাদিবচ্চ (প্রস্তরাদির ন্যায় দৃষ্টান্তেও) তদনুপপত্তিঃ (পূর্ব্বোক্ত দোষের অনুপপত্তি হয়, অর্থাৎ অযৌক্তিকতা প্রমাণিত হয়)

একই প্রস্তর, কিন্তু তাহার বর্ণ-ভেদ, গুণ-ভেদ অসংখ্য প্রকারের। কোন প্রস্তর মূল্যবান্, কোন প্রস্তর অকিঞ্চিৎকর লোষ্ট্র মাত্র। প্রস্তরের উপাদান এক অদ্বিতীয় অর্থাৎ পৃথিবী ভিন্ন অন্য কিছু নহে; তবে এমন গুণপার্থক্য ও রূপপার্থক্য হয় কি প্রকারে? একই অন্ন-রস রক্তাদি ও লোমাদি বিচিত্র পরিণাম ধরে। এই বৈচিত্র্যের হেতু কি? ইহার উত্তর এইমাত্র দেওয়া যায় এই যে, একই প্রস্তরের অথবা অন্নরসের বিচিত্র বিকাশ, ইহার মূলে আছে—মূল উপাদানতত্ত্বের বহুত্বের ইচ্ছা। বহুত্ব একত্বের প্রকাশ। একের আনন্দ বহুত্বের হেতু। এই হেতু এই বৈচিত্র্যের অভিব্যক্তিতে জীবত্বের হিতাকরণদোষ স্থান প্রাপ্ত হয় না।

উপসংহারদর্শান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধিঃ॥ ২৪॥

উপসংহারদর্শনাৎ (কার্য্যনিষ্পাদক সামগ্রীসংগ্রহ দর্শন হেতু) ন (একই জগৎ-সৃষ্টির হেতু, এইরূপ হইতে পারে না) ইতি চেৎ (এইরূপ যদি বলি) ন (না, তাহা বলিতে পার না) হি (কেন বলিতে পারি না?) ক্ষীরবৎ (ক্ষীরাদি দৃষ্টান্ত আছে)।

অর্থাৎ একদিকে যেমন কোন কর্ম্মের কর্ত্তাকে নানারূপ উপকরণ লইয়া কার্য্য করিতে দেখা যায়, সৃষ্টি-কার্য্যে সেইরূপ স্রষ্টার অন্যান্য উপকরণ না থাকিলেও, তাঁহাকে অসহায় বলিতে পার না। কেননা দুগ্ধের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। দুগ্ধ যে দধি হয়, তাহা কি অন্যের সহায়তাসাপেক্ষ? এইরূপ ব্রহ্ম অন্য উপকরণ সংগ্রহ না করিয়াই জগৎ-সৃষ্টি-বিষয়ে অসহায় কেন হইবেন? প্রতিপক্ষ বলিতে পারেন—দুগ্ধ যে দধি হয়, তাহাও একটা সাধনসাহায্যেই সম্ভব হয়। দধির জন্য দুগ্ধের উষ্মা ও দধিবীজের প্রয়োজন হয়। সৃষ্টির মূলে অদ্বয় ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব দুগ্ধের দৃষ্টান্তে প্রমাণিত হয় না। ইহার উত্তরে বলা যায়—দুগ্ধ যে দধি হয়, তাহার কারণ দুগ্ধের মধ্যে দধি-স্বভাব বিদ্যমান থাকে। উষ্মা ও দধিবীজ মৃত্তিকাকে কি দধি করিতে পারে? আরও কথা আছে। বিনা দম্বলে ও উষ্মায় দুগ্ধ যথাকালে দধিতে পরিণত হয়, এ দৃষ্টান্তও প্রত্যক্ষ। উষ্মা ও দম্বল—দুগ্ধের দধিত্বে পরিণত করার ক্ষিপ্রতার জন্যই ঐগুলির ব্যবহার আছে; পরন্তু দুগ্ধের মধ্যে দধিশক্তি অন্য সহায় ব্যতীত দুগ্ধকে দধিতে পরিণত করে। ব্রহ্মও সেইরূপ স্ব-শক্তি প্রভাবে সৃষ্টির কারণ হন। ব্রহ্ম পূর্ণশক্তি; অন্য উপকরণের এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় না। শ্রুতি উদাত্ত কণ্ঠে এই কথাই বলিয়াছেন—

> ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
> ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
> পরাঽস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে
> স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥

অর্থাৎ তাঁহার কার্য্য ও করণ, দুইই নাই। তাঁহার সমান অথবা ততোধিক কিছু দেখা যায় না। শ্রুতিতে তাঁর বিচিত্র শক্তির কথা আছে; তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান-শক্তি ও ক্রিয়া-শক্তির কথা কথিত আছে। এই কথায় বুঝায়—জগৎকারণ ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্ এবং তাঁহা হইতেই সৃষ্টিবৈচিত্র্য উৎপন্ন হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চ

শ্রীতারাকিশোর বর্দ্ধন

বিগত সংখ্যায় আমরা বর্ত্তমান সংগ্রামের কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া জার্ম্মাণীর নববিধানপ্রবর্ত্তনের কল্পনার উল্লেখ করিয়াছি। পৃথিবীতে নববিধান প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, এখন ইংলণ্ড ও আমেরিকার সমবেত শক্তিকে পরাজিত না করিলে চলিবে না। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টও একথা সেদিন জগদ্বাসীকে শুনাইয়া দিয়াছেন। ইংলণ্ডের পরাজয় আমেরিকা সহ্য করিতে পারে না। এইজন্য বিবৃতিতেও তিনি এ প্রকার ইঙ্গিত করিয়াছেন। কিন্তু সহানুভূতি সত্তেও বৃটিশ ও মার্কিণ যুক্তরাজ্যের নৌবহরের পরাক্রমে তাহারা কখনও জার্ম্মাণীর পক্ষ অবলম্বন করিতে সাহস পাইবে না।

জাপানের পররাষ্ট্রসচিব ঘোষণা করিয়াছেন যে, আমেরিকা এই যুদ্ধে জড়িত হইলে জাপানও অক্ষশক্তিবর্গের পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিবে। এই জন্যই প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট
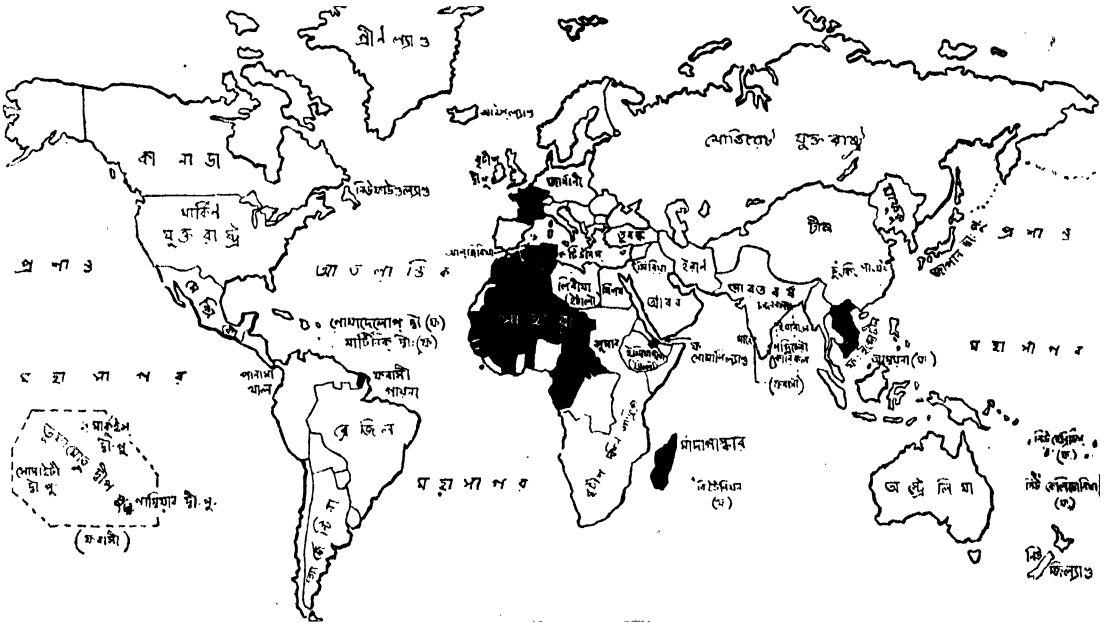
ইংলণ্ডকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে রুজভেল্ট সাহেব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু আমেরিকার যুদ্ধবিরোধী দল তাঁহার এই প্রচেষ্টায় বাধা দিতেছে। তাহারা নিরপেক্ষতা বজায় রাখিবার উদ্দেশ্য জনসাধারণের নিকট প্রচারকার্য্য করিতেছে। এমন মনে করা অসঙ্গত হইবে না যে, আমেরিকায় অবস্থিত বিভীষণ-বাহিনী রুজভেল্টের কর্ম্ম-প্রচেষ্টায় সক্রিয় বাধা জন্মাইবে। এমন কি এই ব্যাপারে আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের অভিনয় না হইলেই ভাল। দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির মতিগতি লক্ষ্য করিলেও একথা বেশ বুঝা যায় যে, উহারা জার্ম্মাণীর নববিধানের প্রতি অধিকতর সহানুভূতিসম্পন্ন। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের পর্য্যস্ত ভাবনায় পড়িয়া গিয়াছেন। দেশের ভিতরে বিভীষণ-বাহিনীর ভয় ও বাহিরে জাপানের যুদ্ধে জড়িত হইবার ভয়—এই উভয় প্রকার ভীতিপ্রদ ব্যাপারের পরিণাম চিন্তা করিয়া রুজভেল্ট সাহেবও সুকৌশলে কথার তরণী বাহিয়া চলিয়াছেন। এত হৈ-হৈ ব্যাপারের পরেও তাঁহার বাণীশ্রবণে ইচ্ছুক জগদ্বাসীর সম্মুখে তিনি যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাকে পর্ব্বতের মূষিক প্রসব বলা চলে। বহিঃশত্রুর সঙ্গে সঙ্গে বিভীষণ-বাহিনীর প্রাদুর্ভাবে জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে নিশ্চয়; কিন্তু ঐ দুরবস্থা অতিক্রম করিবার মত কোনও জরুরী প্রয়াসের লক্ষণ আমরা তাঁহার পরবর্ত্তী কার্য্যকলাপে দেখিতে পাই নাই।

জার্ম্মাণীর হঠকারিতা ব্যতীত তাঁহার যুদ্ধে নামিবার অন্য কোনও কারণ ঘটিয়া উঠিবে কিনা বলা যায় না।

বাজারে গুজব রটিয়াছে যে, জাপান মিত্রশক্তির পক্ষে আসিয়া পড়িবে, মাৎস্কোয়ার বদলে ইংলণ্ডের পক্ষপাতী অন্য মন্ত্রী জাপানের পররাষ্ট্র বিভাগের ভার গ্রহণ করিবেন; রুশিয়া ইরাণ আক্রমণ করিবে; রুশিয়া ও জাপানের মধ্যে উহারা আপোষে চীন দেশ ভাগ করিয়া লইবে—ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব গুজবকে আমরা কোনও আমল দিতে পারি না। পূর্ব্ব এশিয়াতে জাপানের বিশেষ দাবী মানিয়া লইলে, জাপান হয়ত মিত্রশক্তির বিপক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে না, এই ভরসায় এ প্রকার গুজব রটিয়া থাকে। কিন্তু আমেরিকা যুদ্ধে নামিলে, জাপান কিছুতেই বসিয়া থাকিতে পারিবে না। রুশিয়ার কথা আমরা গত সংখ্যায় সবিস্তারে উল্লেখ করিয়াছি। জার্ম্মাণী ও রুশিয়া পরস্পর পরামর্শ না করিয়া কোনও কার্য্য করিবে না।

বিজয়ী হিট্‌লার জনগণের অভিবাদন গ্রহণ করিতেছেন

গ্রীস—

গ্রীসের স্থলভাগ জার্ম্মাণ সৈন্যের দখলে আসিয়াছে, বিগত সংখ্যায় আমরা এ খবর দিয়াছি। তারপর হইতে জার্ম্মাণ সৈন্যদল ইজিয়ান সাগরে গ্রীসের অধিকৃত দ্বীপগুলি একটার পর আর একটা অধিকার করিয়াছে। উহাতে ইজিয়ান সাগরের জলপথে তাহাদের খুব প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিগত বৈশাখ মাসের মধ্যেই একমাত্র ক্রীট দ্বীপ ব্যতীত আর সব দ্বীপপুঞ্জ জার্ম্মাণীর আয়ত্তাধীনে আসিয়াছিল। চলিত জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতেই জার্ম্মাণী ক্রীট আক্রমণ করে। সেখানে পূর্ব্ব হইতেই ইংরাজের ঘাঁটি ছিল। সুয়েজখালরক্ষার জন্যই ইংরাজ ক্রীট ও সাইপ্রাস দ্বীপে খুব শক্ত ঘাঁটি তৈয়ারী করিয়াছিল এবং নৌবহরে দুর্ব্বল জার্ম্মাণীর পক্ষে সমুদ্রবেষ্টিত সুদৃঢ় ক্রীট দ্বীপ দখল করা প্রায় অসম্ভব বলিয়া সকলেই ভাবিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রী চার্চ্চহিল বলিয়াছিলেন যে, ক্রীট-রক্ষায় আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিব। কিন্তু ১২ দিন প্রবল যুদ্ধের ফলে, বিমানবহরের অল্পতা হেতু বৃটিশবাহিনী ক্রীট পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। ক্রীট দখল করায় জার্ম্মাণীর গ্রীস জয় এতদিনে সমাপ্ত হইল।

মধ্য প্রাচ্য—

জার্ম্মাণ-বাহিনীর ক্রীটাক্রমণে এ কথা স্বতঃই মনে হয় যে, তুরস্কের ভিতর দিয়া সিরিয়াতে জার্ম্মাণ-বাহিনীকে যাইবার রাস্তা দেওয়া হয় নাই। কারণ যদি জার্ম্মাণ সৈন্য তুরস্কের ভিতর দিয়া যাইতে পারিত, তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে সুয়েজ খাল দখল করা সহজ হইত এবং সুয়েজ খালের সঙ্গে সঙ্গে জিব্রাল্‌টার অবরুদ্ধ হইলে, ভূমধ্য সাগরে অবস্থিত মাল্টা, ক্রীট ও সাইপ্রাসের বৃটিশ ঘাঁটি মূল্যহীন হইয়া যাইত। এ কারণে আমরা মনে করি যে, তুরস্ক ও জার্ম্মাণীর মধ্যে মিত্রতা সত্ত্বেও, সৈন্যবাহিনীকে রাস্তা দিবার সর্ত্তে, তুরস্ক রাজী হয় নাই। নতুবা ক্রীট দখল করিবার জন্য জার্ম্মাণীর এত রক্তপাত করিবার প্রয়োজন হইত না।

জার্ম্মাণ সৈন্য তুরস্কের ভিতর দিয়া যাইবার অনুমতি না পাওয়ায়, ইরাকের বিদ্রোহী মন্ত্রী রশিদ আলীর পতন ঘটিয়াছে। তিনি তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ সহ ইরাক পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং ইরাকবাসিগণ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে। জার্ম্মাণ সৈন্যদল ইরাকে আসিবার পূর্ব্বেই রশিদ আলীর সঙ্গে ইংরাজের সংঘর্ষ বাধে। উহাই তাঁহার পতনের কারণ। প্রারম্ভেই

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ইরাকে সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এই সুবিবেচনার পরিচয় দিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা এ ক্ষেত্রে জার্ম্মাণীর উপর সাময়িকভাবে হইলেও, কূটনীতির খেলায় জয়ী হইয়াছেন। মিশরের অভ্যন্তরে জার্ম্মাণ-বাহিনী এখন পর্য্যন্ত বেশী সুবিধা করিতে পারে নাই।

ভূমধ্যসাগর—

আমরা বিগত সংখ্যায় উল্লেখ করিয়াছিলাম যে, তুরস্ক যদি রাস্তা না দেয়, তবে জার্ম্মাণী রোডস্ দ্বীপ হইতে সাইপ্রেস অতিক্রম করিয়া জলপথে সিরিয়ায় আসিবে। ক্রীট দখল করায় এই কার্য্য এখন আরও সহজে নিষ্পন্ন হইবে। এখন সাইপ্রাস দখল করিয়াই হউক, অথবা উক্ত দ্বীপের ঘাঁটির পাশ কাটাইয়াই হউক, জার্ম্মাণীর জাহাজগুলি অস্ত্র-শস্ত্র ও সৈনিকে বোঝাই হইয়া সিরিয়াতে আসিয়া অবতরণের চেষ্টা পাইবে এবং তাহাই তাহাদের প্রাচ্য রণাঙ্গনের প্রধান ঘাঁটি বলিয়া পরিগণিত হইবে। কারণ ঐ সিরিয়ায় ঘাঁটি হইলে তাহাদের প্যালেষ্টাইন, ইরাক, সুয়েজ, মিশর, আবিসিনিয়া প্রভৃতি স্থান দখল করিবার উদ্দেশ্যে যাবতীয় ব্যবস্থা-পরিচালনাই সহজসাধ্য হইবে। এই ঘাঁটির গুরুত্ব অপরিসীম। সুতরাং আমাদের বিবেচনায় এই সিরিয়ার ঘাঁটি যাহাতে গড়িয়া না উঠিতে পারে, ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষের অবিলম্বে সেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

জলযুদ্ধ ও আকাশ যুদ্ধ—

আটলাণ্টিক মহাসাগরের জাহাজ-ডুবির লড়াই পূর্ব্বের মতই চলিতেছে। তবে সম্প্রতি "বিসমার্ক"-ডুবির ব্যাপারে বেশ একটু নাটকীয় রসের সঞ্চার হইয়াছে। বিসমার্ক একাকী লড়াই করিয়া ১৮০০ মাইল দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়াছে এবং অতিকায় বৃটিশ রণতরী হুড্ ও আরও কয়েকটী ছোটখাট রণতরী ডুবাইয়া দিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ব্রেষ্ট বন্দর হইতে মাত্র ৪০০ মাইল দূরে বিসমার্কের সলিল-সমাধি হইল অথচ একখানা জার্ম্মাণ বোমারু বিমানও তাহার রক্ষাকল্পে অগ্রসর হয় নাই। ইহাতে ব্যাপারটা অনেকের নিকটই রহস্যজনক মনে হইবে। যাহা হউক, বিমানপোত নিক্ষিপ্ত টর্পেডোই বিসমার্কের ধ্বংসের কারণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। সুতরাং এবার আবার সেই সনাতন প্রশ্ন—নৌবহর বড় না বিমানবহর বড়? বিমানপোত-নিক্ষিপ্ত টর্পেডোর আঘাতে যদি প্রথম শ্রেণীর ব্যাটলসিপ ঘায়েল হয়, তবে তো উহা বৃটিশ নৌবহরের কর্ত্তৃপক্ষকে ভাবাইয়া তুলিবে।

ক্রীটের যুদ্ধেও একথা অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, শ্রেষ্ঠ বিমানবহরের অধিকারীকে একমাত্র নৌবহর বাধা দিয়া উঠিতে পারে না। জার্ম্মাণী অকিঞ্চিৎকর নৌবাহিনী সমভিব্যাহারে প্রবলতর বিমানবহরের সহায়তায় ক্রীট জয় করিয়াছে। আকাশপথেই তাহারা ক্রীটে অবতরণ করিয়াছে। প্যারাসুট দ্বারাও সৈন্য অবতরণ করিয়াছে। যন্ত্রযুগের যাবতীয় আয়োজনে সুদৃঢ় দ্বীপের উপরে নৌবাহিনী ব্যতীত কেবল বিমানবহরের সহায়তায় এরূপ রণজয় অভূতপূর্ব্ব।

ব্রিটিশাধিকৃত জিব্রাণ্টারের দুর্ভেদ্য শৈল-দুর্গ

যাহা হউক, ক্রীটের যুদ্ধ এবং বিসমার্কের ধ্বংস হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি—নৌবহরের সঙ্গে বিমানবহরের যে দ্বন্দ্ব (১), তাহা এতদিনে মীমাংসার পথে আসিয়া বিমানবহরেরই যেন শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে চলিয়াছে।

(১) মৎপ্রণীত "ইউরোপে মহাসমর" নামক গ্রন্থে নৌবহরের সঙ্গে বিমানবহরের দ্বন্দ্বের এইরূপ পরিণতির কথা বহু পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছিল।—লেখক

বৈচিত্র্য

উভচর যান

উভচর যান

মানুষ একরোখা মস্তিষ্কের কসরতে যে কত-দূর এগিয়েছে, তার পরিচয় এই উভচর যানে মিলে। একই যান জলে পড়লে বাষ্পযানের মত জল কেটে চলে, আবার প্রয়োজন হলে হাল গুটিয়ে মাঠ ভেঙ্গে দৌড়ায়। জিনিষটা সস্তা হলে সাধারণের ভারী সুবিধে হবে।

পুষীর সমস্যা

অদ্ভুত জীব

অদ্ভুত জীব

মার্কিণ মুল্লুকে সাধারণতঃ এই তারকা-নাসিকা জীব দেখা যায়। এদেশে সচরাচর ঠিক ইহা দেখা না গেলেও, এই ধরণের জীব অপ্রতুল নয়। নাসিকার উপরেই রঙ-বেরঙের ২২টা ঝুঁটি এর চোখের দৃষ্টি প্রায় আচ্ছন্ন করে' রাখে। মাথাটা তুলে' যখন ইহা চাহে, তখন অনেকটা গর্ব্বিত মুর্গীর মত দেখায়। মুর্গীর মতই নখ দিয়ে মাটি আঁচড়িয়ে মাটির তলাকার পোকামাকড় খেয়ে ইহা জীবন ধারণ করে। এদেশের চিড়িয়াখানায় এই অদ্ভুত জীব থাকলে, দর্শকের বেশ কৌতুককর দ্রষ্টব্য হ'ত না কি?
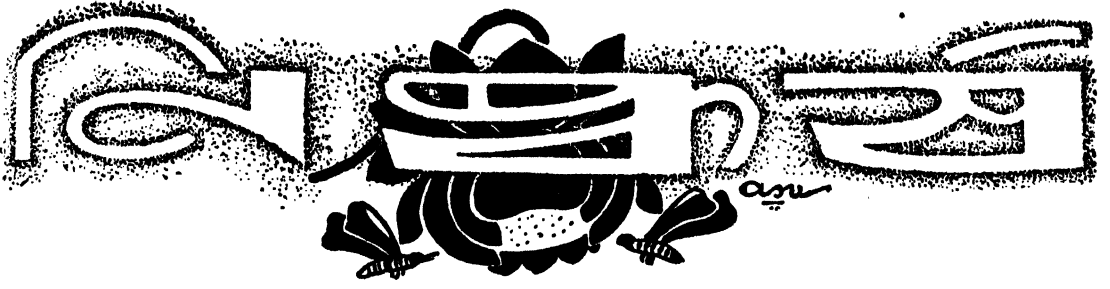
পাশ্চাত্যে বেদচর্চ্চা

বৈশাখের 'শ্রীভারতী' পত্রিকায় শ্রীযুত সতীশচন্দ্র শীল এম. এ., বি. এল. মহাশয় 'পাশ্চাত্যে বেদচর্চ্চা শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা হইতে ইউরোপে বেদের প্রচার ও তাহার আলোচনার ব্যাপকতা সম্বন্ধে কিছু আভাষ পাওয়া যাইবে :

খ্রীষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিখ্যাত ফরাসীলেখক ভল্‌টেয়ার (Voltaire) তাঁহার Essai Sur les Maers el l' E Sport des Nations নামক পুস্তকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রশংসা করেন। নবিলিস (Robertus te Nobilis) নামক একজন ফরাসী পাদরী E Zour Veidam নামক একখানি গ্রন্থ বেদ বলিয়া প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ হইতেই ভল্‌টেয়ারের বেদজ্ঞান। কিন্তু ইহা প্রকৃত বেদ নহে, উক্ত পাদরী সাহেবের জুয়াচুরী মাত্র। তারপর ১৭৮৪ খ্রী° অব্দে এসিয়াটিক সোসাইটী অফ বেঙ্গল প্রতিষ্ঠিত হইলে, উহার পরবৎসরেই কোলব্রুক সাহেব (Colebrooke) Asiatic Researches নামক পত্রিকায় প্রায় ১০০ পৃষ্ঠাব্যাপী "On the Vedas, the sacred writings of the Hindus" নামক একটী প্রবন্ধ লেখেন। কোলব্রুক সাহেবের প্রবন্ধগুলি পরে ২টী খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ইহাতে তিনি বেদবিষয়ক বহু তথ্য লিপিবদ্ধ করেন। ইহার প্রায় ২০ বৎসর পরে কোলব্রুক সাহেব দ্বারা সংগৃহীত বেদের পুঁথিসমূহ হইতে ফ্রেডরিক রোজেন (Friedrich Rosen) ঋগ্বেদ সংহিতা সম্পাদনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি ১৮৩৭ খ্রী° অব্দে মারা যাইবার পরে ১৮৩৮ খ্রী° অব্দে তাঁহার সম্পাদিত ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথমাষ্টক "Rigveda Samhita, liber Primus, Sanskrite et latine", এই নামে প্রকাশিত হয়। তারপর ১৮৪৬ খ্রী° অব্দে বিখ্যাত জার্ম্মাণ পণ্ডিত রুডল্‌ফ্ রোট্ (Rudolph Roth) সাহেব "Zur Litteratur und Geschichte des Veda" নামক বৈদিক গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। এই রুডল্‌ফ্ সাহেব ও বথলিঙ্ক (Bothlingk) সাহেব উভয়ে পরে ৭টি প্রকাণ্ড খণ্ডে বিখ্যাত সংস্কৃত-জার্ম্মান অভিধান যাহা সেণ্ট পিটস্‌ বার্গ অভিধান নামক বিখ্যাত তাহা প্রকাশিত করেন।

ইহাদের পরে আসিলেন বিখ্যাত জার্ম্মান বৈদিক পণ্ডিত ডক্টর বেবর (A. Weber)। তাঁহার ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস যাহা History of Indian Literature নামে মূল জার্ম্মান গ্রন্থ Academische Vorlesungen ub3r Indische Litteratur, Geschichte (ইহা ১৮৫২ খ্রী° অব্দে প্রকাশিত হয়) এর অনুবাদ তাহা মূলতঃ বৈদিক সাহিত্যের যথাসম্ভব পূর্ণ পরিচয়। আর ইঁহার সম্পাদিত Indische Studien নামক পত্রিকায় বেদের ও ভারতীয় দর্শন, ব্যাকরণ প্রভৃতির বহু গবেষণা প্রকাশিত হইয়াছে। তারপর আসিলেন বিখ্যাত জার্ম্মান পণ্ডিত মোক্ষমূলর। তিনিই সর্বপ্রথম প্রায় ২৫ বৎসর যাবৎ সায়ণভাষ্য সমেত ঋগ্বেদ সংহিতা প্রকাশিত করেন। তাঁহার Ancient Sanskrit Literature-এ বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। ইনি Sacred Books of the East (ইহা ৫০ খণ্ডে প্রকাশিত) গ্রন্থমালার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। মোক্ষমূলর সাহেবের পর মুরসাহেব ৫ খণ্ডে Original Sanskrit Texts প্রকাশিত করেন। ইহাকে বৈদিক সংস্কৃত সাহিত্যের মণিরত্নমালা বলা যাইতে পারে।

ইতিমধ্যে মূলগ্রন্থ হইতে বহু অনুবাদও প্রকাশিত হইতে লাগিল। লুডভিগ্ (Ludwig) সাহেব গদ্যে ও গ্রাস্‌মান্ (Grassmann) সাহেব পদ্যে জার্ম্মান ভাষায় ঋগ্বেদের অভিধানও (Worterbuch Zum Rigveda) প্রকাশিত করেন। ইঁহাদের জার্ম্মান অনুবাদের পূর্বে সর্বপ্রথম উইল্‌সন সাহেব ৫ খণ্ডে সমগ্র ঋগ্বেদের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত করেন। ১৮৮০ খ্রী° অব্দে কেগি সাহেবের (Kaegi) ঋগ্বেদের উপর প্রবন্ধসমূহ প্রকাশিত হয় ও ইহা পরে এরোস্মিথ্ সাহেব কর্ত্তৃক বোষ্টন হইতে ১৮৮৬ অব্দে ইংরাজীতে অনূদিত হয়।

তারপর বিখ্যাত জার্ম্মান পণ্ডিত অল্ডেন্‌বার্গ তাঁহার Text kritische und Exegetische Noten নামক গ্রন্থে ঋগ্বেদের প্রতিমন্ত্র কত বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তৎসমুদয় প্রকাশিত করেন ও আরও বহু গ্রন্থ প্রকাশিত করেন।

এইভাবে ক্রমে পিশেল্ (Pischel) ও গেল্ডনার (Geldner) সাহেব কর্ত্তৃক ৩ খণ্ডে Vedische Studien নামক বৈদিক গবেষণা-মূলক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। হুইট্‌নী (Whitney) সাহেব তাঁহার Sanskrit Grammar প্রকাশিত করেন। ইতিমধ্যে American Oriental Society প্রতিষ্ঠিত হইয়া লানমান (Lanmann) ব্লুমফিল্ড (M. Bloomfield) প্রভৃতি সাহেব কর্ত্তৃক বহু গবেষণা-মূলক বৈদিক গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে ব্লুমফিল্ড সাহেবের Concordance to the Rigveda, Rigveda Repetitions, Religion of the Veda প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এইভাবে ক্রমে Bergaigne সাহেবের La Religion Vedique, Hillebrandt-এর Vedische Mythologie and Ritulliteratur প্রভৃতি বহু গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হইয়া সমগ্র পাশ্চাত্য জগতের বৈদিক গবেষণা যে কত গভীর ও উদ্যমের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে ও এখনও হইতেছে, তাহা জগতের সুধীদিগের নিকট বিশেষ ভাবে প্রতিপন্ন করিল। Macdonell ও Keith সাহেব কৃত Vedic Index, Keith সাহেবের Religion and Philosophy of the Vedas (২ খণ্ডে প্রকাশিত) প্রভৃতি বহু গ্রন্থ বৈদিক গবেষণার জন্য সর্বদা প্রয়োজনীয়। ঋগ্বেদের গবেষণামূলক অনুবাদ শেষে Geldner সাহেব আরম্ভ করেন। ইহার ১ খণ্ড তাঁহার জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়।

বেদের যত মূল সংস্করণ, যত গবেষণা-মূলক গ্রন্থ বা প্রবন্ধ জগতে প্রকাশিত হইয়াছে, ফরাসী পণ্ডিত L. Renou সাহেব তাঁহার Biblioghaphie Vedique নামক গ্রন্থে তৎসমুদয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা একটী অমূল্য গ্রন্থ।

বর্ত্তমানে সমগ্র জগতের শিক্ষা-কেন্দ্রে বৈদিক ভারতীয় কৃষ্টিমূলক গবেষণা হইতেছে, আর সুধীসমাজ ক্রমেই ভারতীয় জ্ঞান ও কৃষ্টির গভীরতা, উদারতা ও অসীমতা উপলব্ধি করিয়া স্তম্ভিত হইতেছেন।

মৈত্র্যুপনিষৎ ও বজ্রসূচিকোপনিষৎ—আদিনাথ আশ্রম হইতে শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ব্যাখ্যাত ও প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা।

উপনিষৎ বা বেদান্তবিদ্যা ভারতের পরম সম্পদ্‌। আত্মবিস্মৃত জাতির জাগরণের অব্যর্থ সঙ্কেত ও শক্তি ইহার মধ্যেই নিহিত আছে। তাই সিংহকণ্ঠ স্বামী বিবেকানন্দ তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন—"Let the lion of Vedanta roar"—বেদান্তের কেশরীগর্জ্জন ধ্বনিয়া উঠুক। বর্ত্তমান লেখক এই দুর্ল্লভ উপনিষৎ গ্রন্থ দুইখানি অতি দরদের সহিত মূল, ব্যাখ্যা ও সুবিস্তৃত অবতরণিকা সহ প্রকাশ করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। লেখকের ব্যাখ্যাভঙ্গী পাঠ করিলে, তাঁহার পাণ্ডিত্যের সঙ্গে নিগূঢ় অধ্যাত্মদৃষ্টিরও পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি উপনিষৎ-সাহিত্যে স্বয়ং শ্রদ্ধার সহিত অবগাহন করিয়াছেন ও তাহা নৈপুণ্যের সহিত জিজ্ঞাসু পাঠকপাঠিকার উপযোগী করিয়া পরিবেশন করিতেও সমর্থ হইয়াছেন, ইহা আমরা আনন্দের সহিত বলিব। প্রবীণ ও তরুণ, ভারতীয় শাস্ত্রামৃতের আস্বাদনের জন্য যে কেহ উপনিষৎ-প্রোক্ত ব্রহ্মবিদ্যার সম্যক্‌ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহার কাছে এই উপাদেয় গ্রন্থ দুইখানি প্রভূত উপকার ও সহায়তা করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অবতরণিকায় খণ্ডে খণ্ডে তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যান বিশেষ প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। লেখকের ভাব ও ব্যাখ্যাভঙ্গী দুইই প্রীতিপ্রদ ও প্রশংসনীয়। বইখানি সুসম্পাদিত, ইহা অনায়াসেই বলা যায়। কোথাও কোথাও একটু অস্পষ্টতা আছে, তাহা সংশোধনীয়।

আতঙ্ক—শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত, এম. এ., প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীসত্যচরণ দাস, কমলা পাবলিশিং হাউস, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। পৃঃ সংখ্যা ১২২, দাম বারো আনা।

রোমাঞ্চকর কয়েকটি গল্পের সমষ্টি। আমরা কয়েকটি গল্প পড়িয়া দেখিয়াছি। বিশেষ করিয়া একটা রহস্যের আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া পাঠকের মনকে উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিবার ক্ষমতা লেখকের আছে। বাংলাদেশে ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস বলিতে যে শ্রেণীর পুস্তক প্রথমেই মনে হয়, ইহা তাহা নয়। ইউরোপীয় সাহিত্যে crime stories যে কত উচ্চ শ্রেণীর হইতে পারে, তাহার প্রমাণ স্যাপোর ওপেনহ্যাম প্রভৃতি গ্রন্থকার প্রণীত পুস্তকে মিলে। বাংলাদেশে এই দিক্‌ দিয়া বিশেষ প্রচেষ্টা হয় নাই। সেই হিসাবে বাংলা সাহিত্যে ইহার উৎকর্ষের যথেষ্ট অবকাশ আছে। আমাদের বিশ্বাস, আলোচ্য পুস্তকখানি সাধারণের নিকট আদৃত হইবে।

সমুদ্র—শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক: শ্রীকৃষ্ণধন সিংহ, ১১নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ (সাউথ) কলিকাতা। ৯৫ পৃষ্ঠার বই, দাম এক টাকা।

ছোট গল্পের বই। প্রথম ও দ্বিতীয় গল্প দুইটি প্রশংসাযোগ্য। 'স্মৃতির শিখা' গল্পটিতে মোপাসাঁর ছাপ সুস্পষ্ট। 'ইডেন গার্ডেন' ও 'নেতার মৃত্যু' গল্প দু'টি না দিলেই ভাল হইত। এক পৃষ্ঠার 'টাইপিষ্ট' গল্পে শিল্পকুশলতার পরিচয় পাইলাম না; অবশিষ্ট গল্পগুলি চলনসই। লেখকের ভাষা ও ভঙ্গীর মধ্যে সাবলীলতা আছে। দৃষ্টিভঙ্গীর গভীরতা অর্জ্জন করিতে পারিলে, গ্রন্থকারের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ। গল্পের বইয়ে নিজের ছবি ছাপানো দৃষ্টিকটু হইয়াছে। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই আধুনিক রুচিসম্মত।

জোসেফ ষ্টালিন—বীরেন দাশ, এম. এ. প্রণীত। প্রকাশক: শ্রীসলিলকুমার মিত্র, এস. কে. মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স ১২, নারিকেলবাগান লেন, কলিকাতা। ১৫৫ পৃষ্ঠার বই, দাম এক টাকা।

রাশিয়ার ডিক্‌টেটর মঃ ষ্টালিনের জীবন এখনও রহস্যাবগুণ্ঠিত। পাশ্চাত্য পত্রিকা ও পুস্তকাদির সাহায্যে যেটুকু তথ্য জানা যায়, তাহাও যে সম্পূর্ণতার দাবী করিতে পারে তাহা নয়। বিভিন্ন লেখকের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া লিখিত জীবনীতে নিরপেক্ষতা অপেক্ষা দল-বিশেষের প্রচার কার্য্যই পরিস্ফুট হইয়া ওঠে। আলোচ্য পুস্তকে লেখক ষ্টালিনের জীবনীকে কেন্দ্র করিয়া বলসেভিক রুশিয়া সম্বন্ধে অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ষ্টালিন ও লেনিন নিবন্ধ হইতে এই দুই ডিক্‌টেটরের জীবনী সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করিয়া লইতে কষ্ট হয় না। ট্রট্‌স্কী সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার সবগুলি সমর্থনীয় নহে। বর্ত্তমান যুদ্ধের পটভূমিকায় মঃ ষ্টালিনের জীবনী সম্বন্ধে সাধারণের ঔৎসুক্য কিছুটা আলোচ্য পুস্তকখানি মিটাইতে পারিবে। বইখানির দ্বিবর্ণ প্রচ্ছদপট, ছাপা, বাঁধাই মনোরম।

পৃথিবীর প্রেম—শ্রীঅচ্যুত চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীঅজিত শ্রীমানী কর্ত্তৃক ২০৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

আলোচ্য পুস্তকটি নাতিবৃহৎ উপন্যাস। সুসমঞ্জস চরিত্র-সৃষ্টি এবং নানা ঘটনা-সংস্থানের মধ্য দিয়া আধুনিক প্রগতিশীল সমাজের সহিত রক্ষণশীলতার সংঘর্ষ সুষ্ঠু ভাবে বইখানিতে দেখান হইয়াছে এবং আমরা দেখিয়া আনন্দিত হইলাম যে, ইহাতে লেখক প্রচারকের ভূমিকা গ্রহণ করেন নাই। পুস্তকের বর্ণনা ও সংলাপ নিখুঁত, ভাষাও সহজ এবং সাবলীল। পাঠককে কোথাও গভীরভাবে মর্ম্মোদ্ধার করিতে হয় না। মাঝে মাঝে মুদ্রণপ্রমাদ লক্ষ্যে পড়ে। প্রথম রচনা হিসাবে লেখক বেশ উৎরাইয়াছেন, ইহা অনায়াসে বলা চলে।

চলন্তিকা—সম্পাদক শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, চলন্তিকা পাবলিসিটী সিণ্ডিকেট, জামসেদপুর হইতে প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

একখানি বার্ষিকী। বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের লেখায় সমৃদ্ধ। কবি কালিদাস রায়, নরেন্দ্র দেব এবং রাধারাণী দেবী প্রভৃতি কবিতা দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একটী উপভোগ্য পত্র আছে। প্রবন্ধগুলি সুনির্ব্বাচিত। শ্রীযুক্ত চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের অনুবাদ গল্পটি সুন্দর। সম্পাদক মহাশয়ের কবিতার অনুবাদটী ভাল হইয়াছে।

সাময়িক সাহিত্য
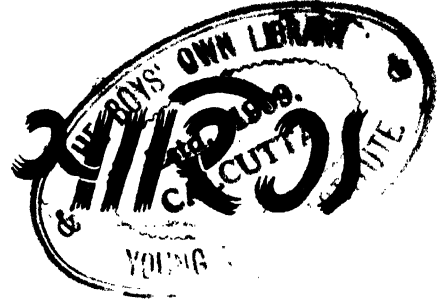
শূলপাণি

প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮—

রবীন্দ্রনাথের 'জীবন' এবং 'পঞ্চম বার্ষিকী' কবিতা দুইটীর আলোচনা নিষ্প্রয়োজন; 'সভ্যতার সংকট'ও বহু আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের 'তৃতীয় পাণিপথ' পড়িয়া প্রচুর আনন্দ পাইলাম, প্রবন্ধটী সময়োপযোগী হইয়াছে।

কিন্তু পর পৃষ্ঠা উল্‌টাইয়া শ্রীসুরুচিবালা সেনগুপ্ত লিখিত 'শেষের পরিচয়' পড়িয়া একেবারে ঘাবড়াইয়া গিয়াছি। ইহা একটী বড় গল্প। পড়িতে পড়িতে সন্দেহ হইল যে, বোধহয় 'সচিত্র মাসিক বসুমতী' পড়িতেছি; উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া ভাল করিয়া দেখিলাম, নাঃ, ইহা জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী'ই বটে! লেখিকা গল্পের চরিত্রগুলি এবং তাহাদের ভাষণ সম্বন্ধে একটু অবহিতা হইলে, গল্পটী 'চলন-সই' হইতে পারিত।

'ওরে পাখী প্রাণ ভরে কাঁদ'—কবিতা, শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, কবিতাটীর মধ্যে একটী বেদনার সুন্দর অনুরণন আছে, কবিতাটী আমাদের ভাল লাগিয়াছে।

বঞ্চনা—কবিতা, শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, কবিতাটীর ছন্দো-মাধুর্য্য প্রশংসনীয়। কিন্তু দ্বিতীয় লাইনেই একটী নিদারুণ ছন্দঃ-পতন ঘটিয়াছে, সম্ভবতঃ ইহা মুদ্রাকর-প্রমাদ। শব্দযোজনা ভাল হইয়াছে। 'কারুর অধরে সুদূরের যৌবন—হঠাৎ দেখেছি যৌবনে উদ্যত' পড়িয়া আনন্দ হয়।

হতভাগা—মোঁপাসার মূল ফরাসী হইতে অনূদিত একটী সচিত্র গল্প; অনুবাদক—শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত। ছবিও তিনি আঁকিয়াছেন। মন্দ হয় নাই, কিন্তু বহু স্থানে ভাষা আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ভাষার সাবলীল গতির দিকে আরও একটু দৃষ্টি রাখার বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

শাশ্বত পিপাসা—উপন্যাস, শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়। বেশ ভালই হইতেছে। যোগমায়ার কথাবার্ত্তাগুলি আকর্ষণীয়, অতীত কালের একটী সুন্দর ছবি ফুটিতেছে ক্রমশঃ।

অসাধারণ—ছোট গল্প, শ্রীফণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। একটী উন্মাদিনী নারীর করুণ কাহিনী। গল্পের বিষয়বস্তুটী সুন্দর। ডায়ালগ্ মন্দ নহে। গল্পটী চলন-সই হইয়াছে।

নীলাঙ্গুরীয়—উপন্যাস—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। প্রথম হইতেই আগ্রহের সহিত পড়িয়া আসিতেছি। মনে হয় বর্ত্তমান বৎসরে যে গুটিকয়েক ভাল উপন্যাস মাসিকে প্রকাশিত হইতেছে, তাহাদের মধ্যে নীলাঙ্গুরীয় অন্যতম। অপর্ণা দেবীকে অদ্ভুত মনে হইতেছে—এ রকম দৃঢ় সংযত চরিত্র বাংলা উপন্যাসে বিরল। আর ভাল লাগিতেছে গল্পের নায়ক শৈলেনকে। 'এতখানি আত্মসচেতনা কম দেখিয়াছি। রাজু বেয়ারা একটী 'টাইপ্', মীরা রহস্যময়ী। তবে ভাষার সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার আছে—এত স্বচ্ছ এবং সুন্দর ভাষা-বিন্যাসের মধ্যে মাঝে মাঝে অতি দুর্ব্বল শব্দ-যোজনায় চারিত্রিক সৌন্দর্য্য অনেক স্থলে ব্যাহত হইতেছে, লেখকের এদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজনীয়।

অসময়—কবিতা—শ্রীভ্রমর ঘোষ এম, এ। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত 'ভারতীয় বিদুষী'র একটী আখ্যায়িকা হইতে কবি বিষয়বস্তুটী সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রেমের জন্য মন্দাররাজ কি ভাবে রাণা কুম্ভের অস্ত্রে প্রাণ দিয়াছিলেন, তাহারই করুণ গাথা। বিষয়বস্তু নির্বাচন কবির মন্দ হয় নাই, কিন্তু এখনও তিনি ঠিক ছন্দঃ এবং শব্দ-সংস্করণ প্রভৃতি বিষয় আয়ত্ত করিয়া উঠিতে পারেন নাই, ফলে বহু স্থলে ছন্দ-পতন-দোষ ঘটিয়াছে। 'কীর্ত্তনশেষে ক্ষীণ অংগন' শুনিতে ভাল লাগিলেও আদৌ কবিতা হয় নাই। কবিতাটী তাঁহার খাতার ভিতরে ফেলিয়া রাখিলেই সুবুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হইত।

নববর্ষের প্রণাম—কবিতা—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে লেখা। কবিতাটী সুন্দর হইয়াছে। প্রত্যেকটী লাইনের মধ্যে একটী তেজোদৃপ্ত সত্তার আভাষ পাওয়া যায়। কবিতাটী চারণ কবির উপযুক্তই হইয়াছে।

'সবলা'—আলোচনা—শ্রীযুগলকিশোর সরকার বি-এ। রবীন্দ্রনাথের 'মহুয়া' কাব্য গ্রন্থের ইহা একটী বিশিষ্ট কবিতা! লেখক তাহারই সম্বন্ধে কিছু বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। আলোচনাটী আমাদের খুব ভাল লাগে নাই।

ভারতীয় নৃত্যে রূপ, রীতি, ধর্ম্ম ও সঙ্গীত—শ্রীমণি বর্দ্ধন। আধুনিক সাহিত্যে নৃত্য ও চিত্রকলা সম্বন্ধে রচনা দুর্লভ হইয়া উঠিতেছে। আলোচ্য রচনায় লেখক শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া নৃত্যের ছন্দোময় আবেদনকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন, ফলে রচনাটি হইয়াছে উপভোগ্য।

রূপ ও রীতি—বৈশাখ, ১৩৪৮—

পরিব্রাজক জলধর—প্রবন্ধ—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। স্বর্গীয় শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের জীবনী লইয়া লেখক কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। ভাষাটী সুন্দর হইয়াছে। পড়িয়া আমরা আনন্দ পাইয়াছি।

অবিনাশ বাবুর মধুপুর-ভ্রমণ—অজিত লাহিড়ী। একটী ছোট ব্যঙ্গ গল্প। গল্পটী আমাদের ভাল লাগিয়াছে। তবে স্থানে স্থানে লেখক একটু বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছেন। হাস্যরসের অবতারণা করিতে হইলে কোথায় কতটুকু জোর দিতে হয়, তাহা এখনও লেখক ঠিক ধরিতে পারেন নাই—চেষ্টা করিলে ভবিষ্যতে পারিবার সম্ভাবনা আছে।

নাটকীয় সংগীতসংযোজনা—প্রবন্ধ—শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত। প্রবন্ধটী খুবই ভাল হইয়াছে। আমাদের নাটকে কি ভাবে অযথা সংগীত সংযোজনা হইয়া থাকে, তাহা লইয়া লেখক সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন। এরূপ প্রবন্ধের আবশ্যকতা আমরা তীব্রভাবে অনুভব করিতেছি।

প্রাগৈতিহাসিক — নাটক — নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। নাটকটী ধারাবাহিকভাবে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। 'চন্দন' চরিত্রটী আমাদিগের ভাল লাগিতেছে, সংগে 'তমুকার'ও বৈশিষ্ট্য আকর্ষণীয়। ক্রমশঃই জমিয়া উঠিতেছে—তবে নাটকীয় গতিভঙ্গীর দিকে তীব্র দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন।

মেণ্ডেলের আবিষ্কার—প্রবন্ধ—রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। মেণ্ডেলের আবিষ্কারের উপর একটী সুলিখিত প্রবন্ধ। ভাষা স্বচ্ছ। বুঝাইবার ধারাটিও ভাল হইয়াছে।

জন্মদিন—কবিতা—ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ। একটু পুরানো ধরণের রাবীন্দ্রিক কবিতা। তবে মোটামুটি মন্দ হয় নাই —ভাষা এবং শব্দাদি প্রয়োগ ভালই হইয়াছে, কবিতায় বেশ একটু সংহত এবং সংযত ভাব আছে।

'কোন্ সে দূরে ঝড় হ'য়েছে' — কবিতা—কুমারী বিয়েট্রিস। কবিতাটীর আরম্ভে আমাদের আশা হইয়াছিল, কিন্তু আগাগোড়া পড়িয়া নিরাশ হইয়াছি। লেখিকা অতি-আধুনিকতার মোহে পড়িয়া একেবারে হাবুডুবু খাইয়াছেন, বার বার সোজা করিয়া, উল্টা করিয়া পড়িয়াও বিশেষ কিছু অর্থ বুঝিতে পারিলাম না—কবি যদি মনে করেন কতকগুলি অদ্ভুত শব্দ প্রয়োগ করিলেই চমৎকার কবিতার সৃষ্টি হইবে, তাহা হইলে তিনি ভুল করিয়াছেন—কবিতা যে শব্দপূরণ-প্রতিযোগিতা নহে, সে কথা তাঁহার মনে রাখা উচিত।

পূর্বাশাতে প্রসুনামার মলম্বাতে
এবার আমি ভুল করি না
স্বরীশ্বরে,

* * *

মম্বাসা, উড়ুম্বর ও কলম্বো—এই কথাগুলি লেখিকা মিস্ করিয়াছেন দেখিতেছি!

পড়িয়া বলিতে ইচ্ছা করিতেছে 'হে বঙ্গ; ভাণ্ডারে তব এ কোন জঞ্জাল?'

রাজরাজেশ্বর—কবিতা—কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত। রচনা সুন্দর ও উপভোগ্য।

মহাসাগর—উপন্যাস—লোকেশ ঘটক। ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে পারিলে ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ। লেখাটি আমাদের ভাল লাগিতেছে।

মাসিক মোহাম্মদী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮—

ধূলি—ফজলুর রহমান। এই মুস্লিম কবির রচনা আমরা বিশেষ উপভোগ করিয়াছি। সুমধুর কাব্যরসের সহিত দার্শনিক চিন্তার মৃদু পরশ কবিতাটিকে প্রথম শ্রেণীর পর্য্যায়ে তুলিয়াছে!

বাংলাসাহিত্যে আলাওলের দান—যামিনীকান্ত সেন। লেখক বলিয়াছেন—বাংলা সাহিত্যে আলোচকগণ বাংলার কাব্যগুলিকে ধর্ম্মবিষয়ক মনে করে' সাহিত্য-যুগগুলিকে বিভাগ করেছেন নানা উপধর্ম্ম, আচার, অর্চ্চনা ও

বন্দনার বিশিষ্টতার দিক্ হতে। এ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। এ কথা অবশ্য সত্য যে, বাংলা সাহিত্যে কেন, ইউরোপীয় সাহিত্যেও একদল সমালোচক আছেন, যাঁরা বিশেষ নীতিবাদ ও ধর্ম্মমতের চশমা পরিয়া সাহিত্যের রসবিচার করেন। সেক্সপীয়র সম্বন্ধে যখন আমরা ডাউডেন বা জারভাইনাসের সমালোচনা পড়ি, তখন সেক্সপীয়রের কাব্যরস আমাদের কাছে অবান্তর হইয়া পড়ে, বিশিষ্ট সমালোচকের ফেনায়িত বাগ্‌বিস্তার, ধর্ম্ম ও আচারগত মতবাদ অনাবশ্যকভাবে সাহিত্যের ঘাড়ে চাপিয়া বসে। আমরা সে কথা বলিতেছি না; আমরা বলিতেছি বাংলার প্রাচীন কাব্য-সাহিত্যের যেটুকু প্রমাণ আজও অবশিষ্ট আছে, তাহার প্রাণবস্তু হইতেছে ধর্ম্ম ও আচারের বিশিষ্টতা, ইহা ভুলিলে চলিবে না। চর্য্যাচর্য্য-এর মধ্যেও যদি লেখক ফৈজির ছন্দঃ, আরব্য রজনীর স্বপ্ন ও তাজের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিতে যান, তাহা হইলে হতাশ হইবেন। অবশ্য কাব্য ও সাহিত্যের ক্ষণস্ফুরণ ইহাতে নাই, তাহা মনে করা ভুল। রসগ্রাহিতা ভাল, রসবিকার বিরক্তিকর, লেখক ইহা মনে রাখিবেন।

নির্ম্মোক—কাজি আফসার উদ্দিন আহমদ। ছোট গল্প। গল্পের মধ্য দিয়া মুশলিম সমাজের যে ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে বেশ একটি বিস্ময়ের ধাক্কা খাইলাম। 'ফরিদ ও পাশের বাড়ীর মেয়ে নূরজাহান। নিভৃত সন্ধ্যায় ফরিদের তেতলার ছোট্ট ঘরখানিতে দিব্য কাব্য-চর্চ্চা সুরু হইয়াছে, অভিসার-রজনীর তীব্র আমেজে বাতাস হইয়া উঠিয়াছে উতলা। নিবিড় স্তব্ধতা, আঁধারের বুকে 'চুক্‌চাক্' গুটিকয়েক শব্দ, নূরজাহানের মাথা ফরিদের কোলে………।' এই সংখ্যায় 'আমাদের কথাসাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে জাহরুল হক্ আক্ষেপ করিয়াছেন—'বিবাহের চেয়ে ভালবাসার সম্বন্ধ আরও বড়, সত্য ও গভীর…… আমাদের মুসলিম সমাজে এই মহাসত্যকে উপলব্ধি করার সুযোগ খুবই সীমাবদ্ধ'……। আমাদের বক্তব্য বিশেষ কিছুই নাই, মৌলানা আক্রাম খাঁ সাহেব কি বলেন?

আমাদের কথা-সাহিত্য—জাহরুল হক্। লেখক বলিতেছেন—'কাব্যে নজরুল ইস্‌লামের স্থান বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পরেই, উপরন্তু কতকগুলি বিষয়ে আমরা নজরুল ইসলামকে রবীন্দ্রনাথের উপরে স্থান দিতে পারি।' হাতে কাগজ ও মৌলানা সাহেবের মত ভাল মানুষ সম্পাদক থাকিতে রাজা-উজির মারা চলিতে পারে, তবে গাঁয়ে মানিবে না, এই যা' ভয়। রবীন্দ্রনাথের পরে সাহিত্যের মসনদ লইয়া একে একে অনেক দাবীদার জুটিয়া যাইতেছেন, ফতোয়াও জারি হইতেছে, আমাদের মনে হয় কাব্য-সাহিত্যের মসনদের এক মাত্র দাবীদার কে, তাহার সন্ধান দিতে পারেন যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয়।

উপরোক্ত লেখক আর এক জায়গায় বলিতেছেন—'সাহিত্য তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) নিকট অনেকটা বিলাসের সামগ্রী—বুর্জোয়া ইন্‌টেলেক্‌চুয়ালের অবসরবিনোদনের একটা উপাদান।' এই ধরণের বহু মন্তব্য আছে। বাংলা সাহিত্যের এই ধরণের খোকা সমালোচকদের জন্য পাঠশালার কড়া দাওয়াই প্রয়োজন। বৃদ্ধ সম্পাদক মহাশয় সেকালের পরীক্ষিত এই নীতিবাক্য ভুলিয়া গিয়াছেন মনে হইতেছে, 'Spare thy rod and spoil the child.'

ছায়াপথ—বৈশাখ, ১৩৪৮—

রবীন্দ্র-জয়ন্তী সংখ্যা। রবীন্দ্রনাথের 'সভ্যতার সঙ্কট' অধিকাংশ নাবালক পত্রিকাকেও পাইয়া বসিয়াছে। অবশ্য সাময়িকের ক্ষেত্রে যাঁহারা পক্ক কেশের দাবী করেন তাঁহারা হুবহু গোটা বাণীটাই তুলিয়া দেন নাই, ইহার উপর নিজেদের টীকা-ভাষ্য জুড়িয়া দিয়া অধিকতর ফলাও করিয়া তুলিয়াছেন।

রবীন্দ্র-যুগ নাকি গিয়েছে—সুধীনকুমার মিত্র। লেখক বিনাইয়া বিনাইয়া অনেক কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার আসল বক্তব্যটা এই আড়ম্বরের মাঝে হারাইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যকে আজ যাহারা সেকেলে বলিয়া উড়াইয়া দিতেছে, তাহাদের গোড়ায় গলদ রহিয়া গিয়াছে। কারণ সমসাময়িক পলিটিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গী—যাহা আজ সমাজ ও জীবন সম্বন্ধে বহুবিধ আদর্শবাদের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার মূল্য কতটুকু? চোখের সামনে বিংশ শতাব্দীর চারটি দশক তো দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল, অথচ ইহার প্রতি অধ্যায়ে স্রোতের মত এই সামাজিক

আদর্শবাদের উত্থান ও পতন তো আমরা দেখিলাম। বহু সাহিত্যই এই স্রোতের উজানে ভাসিয়া আসিতেছে, আবার একদিন ভাটার টানে ইহাদের কোন সন্ধানই মিলিতেছে না। রবীন্দ্র-সাহিত্য এই সাময়িক প্রয়োজনের তাগিদে গড়িয়া উঠে নাই, অথচ এই প্রয়োজনের বেলা-ভূমিতে দাঁড়াইয়াই তিনি যে অপ্রয়োজনের গান গাহিতেছেন, তাহার সুরবিন্যাস দূর শতাব্দীর পরপারেও ধ্বনিত হইবে।

রবীন্দ্রনাথের চোখে 'মরণ'—পুষ্পেন্দু মল্লিক। রচনায় শিশুসুলভ হস্তপদবিক্ষেপেরই পরিচয় পাইলাম।

তুমি—নীতিশচন্দ্র মজুমদার।

সেই ঘুমই বুঝি আমার দৃষ্টিকে
হাত নেড়ে ডাকলে
মেঘের দল আকাশে সুরু করলে
'ব্রীজক্রীস'। (?)
সঙ্গী চাঁদ সেই সঙ্গে তুমিও।

বাংলাভাষা যে এত দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহা আমাদের জানা ছিল না। দিন দিন ভাষা যে রকম cosmopolitan হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে খুব বেশী দিন যে বাংলা পড়িয়া আনন্দ পাইব, তাহা আর মনে হইতেছে না।

তরুণ-তরুণী—বৈশাখ, ১৩৪৮—

যুদ্ধের গতি কোন্ পথে—অঘোরনাথ ঘোষ। বর্ত্তমান যুদ্ধ সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা।

বিজিগীষা—বরেন্দ্রনাথ বসু। উপন্যাস, বর্ত্তমান সংখ্যা হইতে ধারাবাহিকভাবে চলিতেছে। আলোচ্য সংখ্যায় গৌরচন্দ্রিকা হইয়াছে, ইহার পরে আসল ব্যাপার আছে। 'অন্ধকারের মধ্যে দু'টি জ্বলজ্বলে চোখ' দেখিয়া ভাবিয়া-ছিলাম লেখক বোধ হয় কোন রোমাঞ্চকর উপন্যাসের ভূমিকা ফাঁদিয়া বসিয়াছেন, ভুল ভাঙিতে দেরী হইল না। গভীর রাত্রে তরুণের চোখের সার্চ্চ লাইট পাশের বারান্দার দড়ির জাল ছিঁড়িয়া কাহাকে খুঁজিয়া ফিরিতেছে! কিন্তু ভদ্রলোকের বাড়ীর আনাচে-কানাচে এ হ্যাংলা দৃষ্টি কেন? আমাদেরই ভুল হইয়াছে, পত্রিকাটির নাম 'তরুণ-তরুণী' ইহা একেবারেই খেয়াল ছিল না।

পুরুষ ও প্রকৃতি—শ্রীলীলাময় দে। ইঁহাদের উপন্যাস পড়িয়া মনে হয় জগৎটা একটা প্রকাণ্ড ড্রয়িং রুম। এখানে নায়ক নায়িকার গার্জ্জেন বলিতে কেহ নাই। ইঁহারা স্বয়ম্ভূ, আপনাতে আপনি বিকশিত। মেলানেসীয় ও উরুগুয়ের সাহিত্যে ইঁহারা সহজে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচেন। শাড়ি, গাড়ী ও বাড়ি লইয়া ইঁহারা আলোচনা করেন। ইহাদের অতিপরিচিত কোটরের বাহিরে যে বন্ধুর পিচ্ছিল জগৎটা পড়িয়া রহিয়াছে তাহার খোঁজ-খবর রাখা ইঁহারা প্রয়োজন মনে করেন না। অধিকাংশ লেখকই চোখ-বাঁধা অতি পরিচিত জীবটির মত এই vicious circle-এ ঘুরপাক খাইতেছেন। কাজেই লীলাময়ের এ লীলা বোঝা আমাদের সাধ্যে কুলাইতেছে না।

পাহাড়ী নদী—সন্তোষ সেনগুপ্ত। কাব্য সাহিত্যে আবার যদুগোপাল ও মদনমোহনের যুগ ফিরিয়া আসিল না কি?

সুখে দুঃখে—এস্, ওয়াজেদ আলি। ছন্দ, ভাব ও ভাষা তালগোল পাকাইয়া এক অদ্ভুত চীজ সৃষ্টি করিয়াছে।

মুকুল—বৈশাখ, ১৩৪৮—

মুকুল বাংলাদেশের প্রাচীনতম শিশু-পত্রিকা। প্রায় ৪৭ বৎসর পূর্ব্বে পত্রিকাখানি স্বর্গীয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রচেষ্টায় আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল। সে যুগে 'মুকুল' কিশোর-সাহিত্য-পরিবেশনে যে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, তাহা অনেকেরই আজ মনে না থাকিতে পারে। বর্ত্তমানে নবপর্য্যায়ে শ্রীবাসন্তী চক্রবর্ত্তীর সম্পাদনায় পত্রিকাটি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বর্ত্তমান সংখ্যার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। সম্পাদিকা কতকগুলি রোমাঞ্চকর কাহিনী ও আজগুবি কবিতা দিয়া পৃষ্ঠা পূর্ণ করেন নাই। ছোটদের জ্ঞাতব্য কয়েকটি রচনা আমাদের বেশ ভাল লাগিল। তেজেশচন্দ্র সেনের 'শনিগ্রহ', অমলেন্দু ভট্টাচার্য্যের 'পেন্‌সিল', কিশোরদের সাধারণ জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক হইবে। ইহা ছাড়া শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ও শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির রচনা পত্রিকাটির উৎকর্ষবৃদ্ধি করিয়াছে।
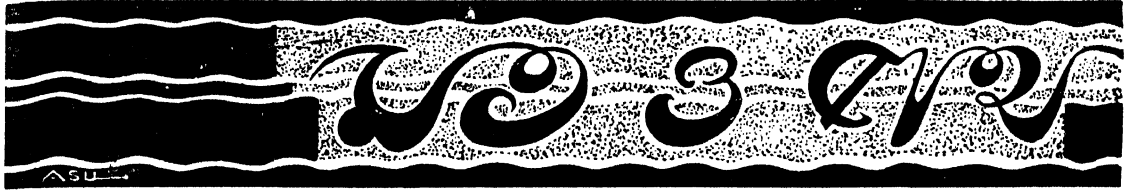
বাংলা বাঙালীর জন্য

বিহার বিহারীর জন্য, উড়িষ্যা উড়িষ্যাদের জন্য, এইরূপ ধ্বনির পাল্টা জবাব হিসাবে নহে, যে কোন দেশবাসীর স্বভাব-সিদ্ধ দাবী বলিয়াই "বাংলা বাঙালীর জন্য" এই ধ্বনি স্পষ্ট ও তীব্র করিয়া তোলার আজ প্রয়োজন আছে। সম্প্রতি "নিখিল-বঙ্গ বাঙালী মুসলমান সমিতি" নামে যে সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য দেখা যায় "বাংলা বাঙালীর জন্য। বাঙালী মুসলমান ও বাঙালী হিন্দুগণই এই প্রদেশের আর্থিক, রাজনৈতিক ও নাগরিক স্বার্থরক্ষা করিবে।" উদ্দেশ্য পড়িয়া মনে হয়, বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত আবহাওয়ায় একটা সুস্থ স্বচ্ছ মনোবৃত্তির জাগরণ ধীরে ধীরে দেখা দিতেছে। প্রতিষ্ঠানটীর কার্য্যপদ্ধতি কি হইবে, তাহা এখনও আমরা জানিতে পারি নাই; কিন্তু উদ্দেশ্য অকপট হইলে, তাহা বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে খাঁটি বাঙালী রূপে আপনাকে জানা ও পাওয়ার মানসিক ক্ষেত্র প্রস্তুত-করণে নিশ্চয়ই যথেষ্ট সহায়তা করিবে। আমরা এই নবজাত প্রতিষ্ঠানকে তাই সানন্দে অভিনন্দন করিতেছি।

লক্ষ্মীবাঈ ও দুর্গাবতীর দেশের মেয়ে

শ্রীমতী কিরণ দুগড় কলিকাতা আর্য্য সমাজে ছাত্রীদের লক্ষ্য করিয়া বলেন—"আমরা লক্ষ্মীবাঈ ও দুর্গাবতীর দেশের মেয়ে। যাহাতে প্রয়োজনমত আত্মরক্ষা করিতে পারি, যাহাতে দুর্ব্বৃত্তদের যোগ্য দণ্ডবিধান করিতে পারি, যাহাতে জাতীয় সঙ্কটের দিনে যে কোনও বিপদের সম্মুখীন হইতে পারি, তাহার জন্য আমাদের প্রস্তুত হইতে হইবে।"

অত্যাচারী দুর্ব্বৃত্তের হাত হইতে আত্মরক্ষার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই শ্রীমতী দুগড় ছাত্রীদের এই উপদেশ দিয়াছেন। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায়, নারীকে আর অবলা নামে তৃপ্ত থাকিলে চলিবে না, তাঁহাদের শক্তির আধার, শক্তিরূপিণী হইয়া দাঁড়াইতে হইবে, ইহা সত্য কথা। কিন্তু শুধু শরীরের কসরৎ বা হাতিয়ারের ব্যবহারই ইহার জন্য যথেষ্ট নহে। রাণী লক্ষ্মীবাঈ বা দুর্গাবতী অস্ত্রশিক্ষায় বা শারীরিক শক্তি-সাধনায় সুনিপুণা ছিলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহারা আর একটা গুরুতর ও গভীরতর বিষয়েও বিশেষভাবে অধিকারিণী ছিলেন, তাহা হইতেছে ভারতীয় শিক্ষা-দীক্ষা-সাধনার অনুশীলন। এই ভারতীয়ভাবে চরিত্র ও আত্মগঠন না করিলে, যথার্থ ভারতের শক্তিমূর্ত্তি তাঁহারা হইতে পারিতেন না।

রাণী লক্ষ্মীবাঈ বা দুর্গাবতীর দেশের মেয়েদের তাই আমরা তাঁহাদেরই মত—সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, সংযুক্তা, ময়নামতীরই মত—খাঁটী ভারতীয় নারীচরিত্রের উত্তরাধিকারিণী হইতেই বলিব। ইহার জন্য যুগের বিলাস ও অনাচার হইতেই সর্ব্বপ্রথমে আত্মরক্ষা করিতে হইবে, লইতে হইবে ভারতের তপস্যায় দীক্ষা। নহিলে আদর্শ শুধু মুখের কথাই থাকিবে, বাহিরেও আত্মরক্ষার শক্তি জাগিবে না।

হিংস ও অহিংস আত্মরক্ষা

ঢাকা, বোম্বাই, আমেদাবাদের লোমহর্ষণ অথচ লজ্জাকর গুণ্ডামীর ঘটনার পর মহাত্মা গান্ধীজী শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই মারফৎ যে পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার বিশিষ্ট ও সুপরিচিত মতবাদেরই পুনরুক্তি হইলেও, ইহার মধ্যে বর্ত্তমান অবস্থায় জনসাধারণের কর্ত্তব্যনির্দ্দেশ অতি বিশদ ও স্পষ্ট করিয়া দেওয়া আছে। গান্ধীজি বলিতেছেন—

"গুণ্ডার ভয়ে ভীত জনসাধারণ তাহাদের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য পলাইয়া যাইবে, ইহা অত্যন্ত অসহনীয়। হিংসা দ্বারাই হউক অথবা অহিংস ভাবেই হউক, গুণ্ডাশাহী

(গুণ্ডারাজ) প্রতিরোধের ক্ষমতা তাহাদের থাকা উচিত। কংগ্রেসের আদর্শের আমি যে ব্যাখ্যা করিয়াছি উহা যদি যথার্থ হয়, তবে কংগ্রেস ও কংগ্রেস-কর্ম্মিগণ কেবল অহিংস ভাবেই প্রতিরোধ করিতে পারে এবং ঐ ভাবে তাহারা নিশ্চয়ই সাফল্য লাভ করিবে। কিন্তু আমাদিগকে যথাসম্ভব সুস্পষ্ট ভাষাতেই জনসাধারণকে বলা উচিত যে, ভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করা কাপুরুষতা। সর্ব্বোত্তম পন্থা অহিংস প্রতিরোধপ্রয়োগে যদি তাহারা অপারগ হয়, তবে হিংসা দ্বারাও গুণ্ডামীর প্রতিরোধ করা জনসাধারণের কর্ত্তব্য।"

যাঁহারা মনে করিতেছেন যে, গান্ধীজি আজ হিংসা দ্বারাও গুণ্ডাশাহীর প্রতিরোধের নির্দ্দেশ দিয়া অভিজ্ঞতার ফলেই তাঁহার পূর্ব্বমতের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের ধারণা ঠিক নহে। গান্ধীজি কোনদিনই কাপুরুষতাকে মানবধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করেন নাই। যাহারা প্রাণের ভয়ে পলায়, স্ত্রী-কন্যার মর্য্যাদারক্ষায় সমর্থ নহে, তাহারা মনুষ্য-পদ-বাচ্য কেমন করিয়া হইতে পারে? বরং সেই ক্ষেত্রে হিংসার দ্বারা অত্যাচারের প্রতিরোধে উদ্যত হইলেও, কথঞ্চিৎ মনুষ্যত্বের পরিচয় দেওয়া হয়। কিন্তু গান্ধীজির মতে, মনুষ্যত্বের সর্ব্বোত্তম পরিণতি—আত্মপ্রত্যয়ীর অহিংস প্রতিক্রিয়ায়। ইহা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির যথেষ্ট পরিস্ফুরণ ও উপলব্ধিরই উপর নির্ভর করে। গান্ধীজির অহিংসাধর্ম্ম—"for the bravest"—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীরেরই জন্য। কিন্তু ইহা সর্ব্বসাধারণে আশা করা যায় না। আমরা এইখানেই তাঁহার মত-প্রয়োগের পরিবর্ত্তন শ্রেয়ঃ মনে করি।

বঙ্গভাষার রাষ্ট্রভাষা হওয়া দাবী

সম্প্রতি মহাবোধি সোসাইটী হলে, কুমার শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহের সভানেতৃত্বে যে বঙ্গভাষা ও সংস্কৃতি সম্মেলন হইয়াছিল, তাহাতে শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক ও মনীষী শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বঙ্গভাষা ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবার একমাত্র উপযুক্ত ভাষা বলিয়া মতপ্রকাশ পূর্ব্বক যে প্রস্তাব উপস্থাপন করেন ও যাহা সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়, তাহা সম্পূর্ণ সমীচিন ও সময়োপযোগী হইয়াছে—আমরা ইহার পূর্ণান্তঃকরণেই সমর্থন করিতেছি।

সভাপতি কুমার বাহাদুরের অভিভাষণে এই প্রস্তাবের অনুকূলে যুক্তিও দেওয়া হইয়াছে। তিনি ঠিকই বলিয়াছেন—"বাংলায় জনসংখ্যা ৫ কোটী হইলে, বাংলা-ভাষা-ভাষীর সংখ্যা বৃহত্তর। এছাড়া ভারতবর্ষের ভাষাগুলিকে যে যে বিভিন্ন পরিবারে বিভাগ করা চলিতে পারে, তার মধ্যে বাংলাভাষার পরিবার সুবৃহৎ—প্রায় ১২ কোটী জনসংখ্যা সে পরিবারের অন্তর্গত।" সংখ্যার বিচারই একমাত্র যুক্তি নহে, তাহা সত্য; কিন্তু রাষ্ট্রভাষার দাবী উপস্থাপন করার পক্ষে এই যুক্তিও কম প্রবল নহে। এই দিক্ দিয়া বঙ্গভাষার দাবী যে উপেক্ষণীয় নহে, তাহাই কুমার বাহাদুর দেখাইয়াছেন। তাহার উপর ভাষার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ও উৎকর্ষের দাবী যে বাংলা ভাষারই সকল ভারতীয় ভাষার মধ্যে বলবত্তম, ইহা তো সর্ব্ববাদিসম্মত।

কিন্তু শুধু উপরোক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত হইলে চলিবে না, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক প্রচারোদ্দেশ্যে সংহতিবদ্ধভাবে উপযুক্ত ব্যবস্থা ও আয়োজনেরও প্রয়োজন আছে, ইহা যেন আমরা বিস্মৃত না হই। হিন্দী ভাষার প্রচারের জন্য ধনকুবেরগণের সহায়তায় ভারতব্যাপী যে সংহতিবদ্ধ প্রয়াস চলিয়াছে, তাহা দৃষ্টান্ত হিসাবে আমাদের সম্মুখে রক্ষা করিয়া এদিকে যোগ্য শক্তির আবির্ভাবই আমরা কামনা করিতেছি।

রাজনীতির হিন্দুকরণ না হিন্দু রাজনীতি?

হিন্দু মহাসভার সভাপতি বীর সাভারকর সেদিন এক বক্তৃতায় হিন্দু তরুণদের বলিয়াছেন—"Hinduise politics"—কথাটা প্রথম পড়িতেই মনে হইয়াছিল—মহাত্মা গান্ধীজির "spiritualise politics" অর্থাৎ রাজনীতির হিন্দুকরণের একটা নবীন পালা আবার আসিতেছে। পরে তাঁহার বক্তৃতার সার মর্ম্ম পড়িয়া বুঝা গেল—তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা অতি উত্তম কথা। হিন্দুজাতিকে হিন্দু ভারতের দৃষ্টি দিয়া বর্ত্তমান রাজনীতির আলোচনা করিতে হইবে—রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যাবতীয়

জাতীয় বা আন্তর্জ্জাতিক সমস্যাগুলি হিন্দু ভারতের স্বার্থ, ভবিষ্যৎ, ভাল-মন্দ লক্ষ্যে রাখিয়াই বিচার ও সমাধানের চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা বলিব—ইহাকেই হিন্দু-ভারতের আদর্শ ও ঐতিহ্যানুযায়ী খাঁটি হিন্দু রাজনীতি বলিতে আপত্তি কি? বলা বাহুল্য, এই খাঁটি হিন্দু রাজনীতির সঠিক মর্ম্মসূত্র খুঁজিয়া পাইতে হইলে, শিক্ষিত হিন্দুকে একবার হিন্দুজাতির দীর্ঘযুগব্যাপী সনাতন কৃষ্টি ও সাধনার গভীর সাংস্কৃতিক স্বরূপ ও ঐতিহাসিক প্রবাহ, উভয়ই বিশেষভাবে আয়ত্ত করিয়া লইতে হইবে। এই তপঃসিদ্ধ দৃগ্‌ভঙ্গী ব্যতীত রাজনীতির হিন্দুকরণের কথা ছাড়িয়া দিয়াও, যথার্থ হিন্দু রাজনীতির মর্ম্ম ও অনুপ্রেরণা-লাভ সম্ভব হইবে না। বীর সাভারকরের এই প্রবৃত্তি কিছু আছে বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি—তিনি হিন্দু তরুণদের দৃষ্টি এই দিকেই মোড় ফিরাইতে সহায়তা করুন।

হিন্দুর ক্ষাত্রবৃত্তি চাই

বীর সাভারকরের বক্তৃতায় "militarisation of Hinduism" কথাটীও অবশ্যপ্রণিধেয় ও সম্পূর্ণ সমর্থন-যোগ্য। হিন্দু-ভারত ক্ষাত্রশক্তির উপেক্ষা কোন দিনই করে নাই। আজ আমরা স্বাধীন ভারতের ক্ষাত্র-সাধনায় বঞ্চিত; কিন্তু বৃটিশের রাজচ্ছত্রতলে মহাযুদ্ধের সুযোগে যেটুকু ক্ষাত্রবৃত্তির সাধনা অধিকার করিতে পারি, তাহা হইতে যেন কোনও যুক্তিবশে বিমুখ না হই। বীর সাভারকরের নেতৃত্বাধীন হিন্দু মহাসভা যেন এই বিষয়ে মহাত্মা গান্ধী-চালিত নিখিল ভারত কংগ্রেসের ন্যায় আভিমানিক অসহযোগ নীতি আশ্রয় করিয়া সুযোগ ও সময় বৃথা হরণ না করেন। আমরাও ভারতের সর্ব্ব প্রদেশের হিন্দু নেতৃগণ ও নিখিল হিন্দুজাতিকে সকল প্রকার সামরিক শিক্ষার কণিকাপরিমাণ সুযোগ পাইলেও, তাহা সুব্যবহারে আনিতে অনুরোধ করিতেছি।

গোয়েঙ্কারের সতর্কতা

ভারতীয় বণিক্ সঙ্ঘের সভাপতি স্যার বদ্রিদাস গোয়েঙ্কারের অভিভাষণ হইতে জানা যায়—১৯৪০-৪১ সালে দেশের রপ্তানী বাণিজ্য পূর্ব্ব বৎসর হইতে ১৭ কোটী টাকা এবং আমদানী বাণিজ্য ৮॥০ কোটী টাকা কম পড়িয়াছে। রপ্তানী বাণিজ্য কমিবার কারণ—ইউরোপের জর্ম্মণ-কবলিত দেশগুলিতে ভারতের কাঁচা মাল যাইতে পারিতেছে না; দ্বিতীয়তঃ, সমুদ্রযাত্রী জাহাজেরও অপ্রাচুর্য্য।

এই বহির্বাণিজ্যের ব্যাপারে স্যার বদ্রিদাস বলিয়াছেন, ভারতের ন্যায় কৃষিপ্রধান দেশে বৈদেশিক বাজারের উপর নির্ভর করিয়া চলা সুনীতি নহে। কারণ এই বৈদেশিক বাজারের উপর স্বরাষ্ট্রের হাত থাকে না। তাঁর মতে, ভারতের মধ্যেই দেশজাত সকল কাঁচা মালেরই উপযোগ করার সম্ভাবনা আছে। ভারত হইতে যে কাঁচা মাল এখনও রপ্তানী হয়, তাহা কোনও স্বাধীন উন্নতিশীল দেশের প্রয়োজনের উদ্বৃত্তের রপ্তানীর মত স্বাস্থ্যকর রপ্তানী নহে; উহা এই দেশের অসংখ্য বুভুক্ষু অধিবাসীর প্রাথমিক প্রয়োজনগুলির উপরেই ভাগ বসাইয়া, জোর করিয়া কাঁচা মাল বাহিরে পাঠান মাত্র। ভারতে উৎপন্ন খাদ্য-শস্য ডাল-কড়াই, লবণ, চিনি, কেরোসিন, কাপড় ও অন্যান্য নিত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য ভারতবাসীই যথেষ্ট পরিমাণ উপযোগ করিতে পায় না। এই সকল দেশজাত কাঁচা মাল দেশেই রাখিয়া, সমধিক পরিমাণে দেশবাসীর ব্যবহারোপযোগী হওয়ার ব্যবস্থা ও সুযোগ সৃষ্টি করা চাই। কাঁচা মালকে এই দেশেই শিল্প-সম্ভারে পরিণত করা চাই। তাহা হইলে আর বহির্বাণিজ্যে আমাদের বর্ত্তমানের ন্যায় সম্পূর্ণ পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে না।

স্যার বদ্রিদাসের ন্যায় অন্যান্য ভারতীয় অর্থনীতি-বিদ্‌গণও সকলেই এই একই ভাবের নীতি ও নির্দ্দেশের কথা বলিতেছেন। ভারতের কাঁচা মাল ভারতেই রাখিবার জন্য দেশীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠান সংগঠন ও পরিবর্দ্ধন করা যে কত আবশ্যক, তাহা বলাই বাহুল্য। যুদ্ধের বর্ত্তমান পরিস্থিতিও ইহার অনুকূল। কিন্তু হইলে হইবে কি, ইংরাজ বণিক্‌গণের স্বার্থের দিকে চাহিয়া, ভারত গভর্ণমেণ্ট এই নীতি যে গ্রহণ করিবেন, তাহার খুব ভরসা পাওয়া যায় না। পূর্ব্ব আফ্রিকার ট্রেড কমিশনার মিঃ এম, এইচ্, ইস্‌মাইল আবিসিনিয়ার স্বাধীনতালাভে তথায় ভারতের নানাবিধ রপ্তানী বাণিজ্যের প্রসারের সুবিধা আসিয়াছে, বলিয়াছেন। ভারতের বাণিজ্যসচিব স্যার এ, রামাস্বামী মুদালিয়াও বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতীয়

শিল্পপ্রতিষ্ঠাতৃগণ উদ্যোগী হইলে, গভর্ণমেণ্ট সহায়তা করিবেন, আশ্বাস দিয়াছেন। কিন্তু ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্য নীতি যত দিন না প্রধানতঃ ভারতীয়দের স্বার্থ লক্ষ্যে রাখিয়া নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, তত দিন এ সকলের কোনটাই কাজের কথা হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। ভারতের রাষ্ট্রনেতৃগণ জাতির সম্মুখে ভারতীয় কৃষ্টিরক্ষার সঙ্গে জাতির ক্ষাত্রশক্তিবৃদ্ধি ও আর্থিক সংগঠন, এইরূপ বস্তুতন্ত্র ইতিমূলক কয়েকটী কার্য্যকরী পরিকল্পনা লইয়া যদি জাতীয় সংগ্রাম ও সাধনা নিয়ন্ত্রিত করিতেন, ভাল হইত। কিন্তু নেতৃগণের রাষ্ট্রচিন্তা আজও অন্য মুখে।

কবীন্দ্র জয়ন্তী

শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী

৮০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গজননীর বক্ষে এক ভাগ্যবতী নারীর গর্ভ হইতে যে শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, সে আজ অশীতি বর্ষীয় প্রবীণ। সেদিন কে জানিত, এই ক্ষুদ্র শিশু একদিন সারা বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করিয়া তুলিবে, তার অমর লেখনীর মধুর সুরে।

সমগ্র জগৎ আজি কবির গান এবং কবিতায় মোহিত! শুধু কবিতা-গানেই নয়, সাহিত্য জগতে, গল্প, নাটক, উপন্যাস ক্ষেত্রেও তাঁর দান অতুলনীয়। সার্থক তাঁর "রবীন্দ্র নাম"। জগতবাসীর অন্তর তাঁর সাহিত্যালোকে উদ্ভাসিত। সকলের চেয়ে আনন্দ বঙ্গবাসীর অধিক। কার্যগতিকে আজ আমরা প্রবাসে বাস করিলেও এ কথা আমাদের ভুলিয়া গেলে চলিবে না—

"আমরা বাঙ্গালী বাস করি
সেই তীর্থ বরদ বঙ্গে।"

এক দিন যার মাটীতে চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ প্রভৃতি জন্ম লইয়াছিলেন, যে মাটীতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন, সেই বাংলা আমাদের দেশ—আর এই বিশ্বপূজ্য কবি আমাদেরই—এ বাঙ্গালীর কত গর্ব্ব! এই পৃথিবীতে কত লক্ষ লক্ষ মানব জন্মগ্রহণ করিতেছে এবং লয় পাইতেছে, কত ফুল ফুটিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, কে তাহার সংবাদ রাখে—কিন্তু যার সুগন্ধ থাকে সে নিজেই তার আবির্ভাব জানাইয়া দেয়, আমাদের কবির জীবন-সৌরভ আজ পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই সুগন্ধে মোহিত হইয়া জাপানের কবি "নোগুচি" তাঁর শান্তি কুটিরে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছেন। বিদেশীর কাছে কবির এই যে সম্মান, বাঙ্গালীর কত আনন্দের, কত গর্ব্বের!

১৯১৩ সালে, কবি সুইডিস একাডেমি হইতে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছিলেন। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ১৯১৫ সালে "Sir" উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯২৪ সালে চীন হইতে "চেন্‌তান্‌" উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯২৬ সালে তিনি গ্রীস্‌ গভর্ণমেণ্ট হইতে 'Commander of the Order Redeemer' উপাধি পান। বর্ত্তমানে এই পরিণত বয়সে Oxford তাঁকে 'Doctor' উপাধি দিয়াছেন। ইহা ছাড়াও বহু উপাধি তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই জগৎ পূজ্য কবির জন্ম দিনে, আজ আমরা সকলে ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করি—বাঙ্গালী যেন তাঁর শতবার্ষিকী জয়ন্তী করিয়া ধন্য হইতে পারে।

বিশ্বেরে ক'রেছ মুগ্ধ, তব বীণা গানে।
প্রণমি তোমারে কবি, তব জন্ম দিনে ॥*

* সাতনায় কবিগুরুর জন্মতিথি বাসরে লেখিকা কর্ত্তৃক পঠিত।

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ ও জাতিগঠন

স্যার হরিশঙ্কর পাল

অক্ষয় তৃতীয়া ভারতের হিন্দুদের এক পুণ্যাহ। নানা শুভ ও স্মরণীয় ঘটনাবলী—যথা সত্যযুগের উৎপত্তি, পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর অবতরণ, মানবের খাদ্যশস্যের প্রথম উৎপাদন ইত্যাদি এই পুণ্য অক্ষয় তৃতীয়াতে হইয়াছে—এই সব কারণে এই তিথিকে হিন্দু ভারতের এক মহাদিনে পরিণত করিয়াছে। এদিকে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের 'যোগ ও ব্রহ্মবিদ্যা মন্দিরের' প্রতিষ্ঠা ঐ শুভ দিনেই হইয়াছে। এই মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া পক্ষকালব্যাপী উৎসব এবং কৃষ্টি ও সংস্কৃতিমূলক বিশাল প্রদর্শনী বাংলার জাতীয় জীবনে এক নুতন আলোড়ন আনিয়া দিয়াছে। এই শুভকর্ম্ম বাস্তবিকই সর্ব্বতোভাবে মহৎ।

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের সহিত আমি বহুকাল হইতে সংশ্লিষ্ট। ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া সঙ্ঘের পরিপুষ্টি হইতেছে। নিষ্কাম কর্ম্ম এই সঙ্ঘের সাধনা। ধর্ম্মের ভিত্তির উপর কর্ম্মের প্রসার দ্বারা সঙ্ঘ জীবনের পূর্ণবিকাশের পথ প্রদর্শন করিতেছে। এই ভাবধারাটী বিশেষ করিয়া সঙ্ঘের প্রতি আমাকে আকৃষ্ট করিয়াছে।

বর্ত্তমান মহাপ্রলয়ঙ্করী যুদ্ধের করাল ছায়া আজ সকল দেশেই পতিত। বাংলাদেশেও তাহা পড়িয়াছে; কিন্তু তাহা ব্যতীত বাংলাদেশ আজ ঘাতপ্রতিঘাতের লীলাভূমি হইয়া উঠিয়াছে। সাম্প্রদায়িক সমস্যা জটিলতর হইয়া জাতীয় জীবনে এক গভীর অমঙ্গলের সূচনা করিয়াছে। তাই বলিতেছি—আমাদেরও আজ বড় দুর্দ্দিন; এই সময়েই প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের ন্যায় শক্তিশালী ও দূরদর্শী প্রতিষ্ঠানের বিশেষ প্রয়োজন। এইরূপ প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মতৎপরতার উপর আমাদের সামাজিক ও জাতীয় জীবনের উন্নতি নির্ভর করিতেছে। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে পবিত্র ভাবধারার প্রবর্ত্তনের দ্বারা বাংলার স্বরূপ বিকাশ করার মহাকর্ত্তব্য আজ সঙ্ঘের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। বাংলাকে রক্ষা করিতে হইবে। বাংলার জাতীয় জীবন ঠিক পথে পরিচালিত করিয়া তাহার প্রাণশক্তি উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। বাংলার স্বরূপ তবে আমরা ফুটাইতে পারিব। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বাঙ্গালী ভালবাসে; তাহাকে ইহার অসারতা উপলব্ধি করাইতে হইবে। ইহার ফলে আমাদের মধ্যে স্বার্থ-সর্ব্বস্বতা, স্বার্থপরতা আসিয়া পড়ে, সেটী সমষ্টি-জীবনে বড়ই ক্ষতিকর। আমাদের ইহা পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে হইবে যে, ব্যক্তিগত জীবনের পূর্ণবিকাশ চাই; কিন্তু আমরা জাতি ও সমাজে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্বের বিকাশ চাই না। আমরা সেই ব্যক্তিত্ব ভালবাসিব, যাহা আমাদের সমাজ ও জাতিকে পুষ্ট করিবে—প্রবৃদ্ধ করিবে। জগতের কাজ মানুষ লইয়া, সমাজ লইয়া—কাজেই জীবনের পূর্ণবিকাশ দ্বারাই আমাদের সকল প্রকার সফলতা আসিবে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়া জাতিসত্তাকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। ইহা কষ্টসাধ্য, শ্রমসাধ্য ও সময়-সাপেক্ষ; তথাপি নিশ্চয় বলিব যে, বাঙ্গালীর জীবনধারা যদি এইভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা হইলে অমঙ্গল, অকল্যাণ ও দুর্গতির হাত হইতে আমরা রক্ষা পাইব। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ ঠিক এই বিষয়ে জাতির হিতকল্পে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। জাতির আত্মপ্রকাশের জন্য পথ নির্দ্ধারণ করিয়া সঙ্ঘ উচ্চকণ্ঠে জানাইয়াছে যে, "ভারতের তথা বাংলার তপস্যা—ত্যাগ নয়, ভোগ নয়—নির্ম্মাণ। বাঙ্গালীকে যে সর্ব্বাগ্রে জাতিরূপে প্রকাশ পাইতে হইবে, ইহা এই সঙ্ঘনেতা বজ্রনিনাদে কেবল ঘোষণা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পরন্তু সঙ্ঘের সমষ্টি-জীবনে সার্থকতা আনিয়াছেন। এই আশ্রম নিজস্ব মন্ত্রবীর্য্যে গড়িয়া তুলিয়া জাতির ব্যাপক জীবনে সেই মন্ত্রশক্তি ছড়াইবার জন্য শিক্ষা-নিকেতন গড়িয়া তুলিয়াছেন ও সঙ্ঘের সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়া এই কঠিন কাজে নিয়োজিত করিয়াছেন। সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতার ব্যক্তিত্ব ও দেশানুরাগ, অগাধ পাণ্ডিত্য ও অফুরন্ত কর্ম্মশক্তি এবং মহান্ চরিত্র ও কর্ম্মকুশলতা প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের প্রাণশক্তির উৎস হইয়া ইহাকে এক অসীম শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান রূপে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। যাহাদের জীবনে প্রবর্ত্তকের বাণী মূর্ত্তি লইয়াছে, সঙ্ঘের সেই সন্ন্যাসীরা আজ নিষ্কাম কর্ম্মশক্তির দ্বারা কেবল সঙ্ঘের নহে, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির পূর্ণতা ও পরিপুষ্টি আনিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়া বিরাট্ কর্ম্মক্ষেত্রে সফলতা অর্জ্জন করিতেছেন—তাহা কাহার প্রেরণায় বলুন দেখি? আবার কাহার প্রেরণায় সঙ্ঘের বহুমুখী প্রকাশ এরূপ অভাবনীয় রূপে সাফল্য লাভ করিতেছে? এ সমস্তই অসামান্য প্রতিভাবান্ সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় মহাশয়ের অলৌকিক তপস্যা ও দূরদর্শিতার ফল।

জীবনের পরিচয় কর্ম্মে এবং সেই কর্ম্ম যদি ন্যায় ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহা হইলে তাহা যে কিরূপ ফলপ্রসূ হয়, তাহা সঙ্ঘ-কর্ম্মীদের দিকে দেখিলেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। 'ধর্ম্ম, ধর্ম্ম' করিয়া আমরা মুখে অনেক রকম কথা বলি; কিন্তু তাহার অর্থ আমরা কয়জন উপলব্ধি করিবার জন্য আগ্রহান্বিত? ধর্ম্ম কিছু নিগূঢ় রহস্যময় দুর্ব্বোধ্য বস্তু নহে, ধর্ম্মের পথ সদাই সরল ও প্রশস্ত। কাজেই আমরা যদি সেই সোজা পথ আশ্রয় করিয়া জীবনের কর্ত্তব্যগুলি এমনভাবে করিতে পারি, যাহাতে উহা কেবল নিজের নহে—পরিবারের, সমাজের ও জাতির উন্নতি বিধায়ক হয়, তাহা হইলেই আমাদের ধর্ম্মাচরণ করা হইবে। জীবন-ধারা যদি স্বাভাবিক গতিতে চলে, এবং উহা জটিল এবং বক্র পথ পরিত্যাগ করিয়া আপন গন্তব্য পথে প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে আমাদের জীবন নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য-সাধনে বিশেষ সহায় হইবে। আধ্যাত্মিক পথে ব্যক্তিগত মুক্তির জন্য এই সঙ্ঘ বিশেষ সচেষ্ট নন—

জাতীয় জীবন গড়িয়া তুলিয়া তাহাকে সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন ও শক্তিশালী করিয়া তোলাই এই প্রতিষ্ঠানের মহান্ উদ্দেশ্য।

বাঙ্গালীকে বাঁচিতে হইবে এবং শক্তির আধার হইয়া স্বাবলম্বী হইয়া বাঁচিতে হইবে। আমরা পরমুখাপেক্ষী, পরানুগ্রহভোগীদের অবর্ণনীয় কষ্ট ও অনন্ত দুর্গতি দেখিতেছি। বাঙ্গালীকে ইহার তাৎপর্য্য মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া জীবন-ধারাকে সুষ্ঠু পথে প্রবাহিত করিতে হইবে। বিধি নিয়ন্ত্রণেই আজ প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের ন্যায় প্রতিষ্ঠান বাংলার জাতীয় জীবন গঠনে আত্মনিয়োজিত করিয়াছে। সঙ্ঘের এই স্বাবলম্বনের আদর্শ দৃষ্টান্তস্থল করিবার জন্য এবং সঙ্ঘ সম্পর্কীয় আশ্রম ও বিদ্যামন্দিরগুলিকে স্বাবলম্বনের আদর্শে অনুপ্রাণিত করিবার জন্যই যেন সঙ্ঘধর্ম্মিরা বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া অর্থক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছেন, ইহা বলাই বাহুল্য। কেবল ব্যক্তিগত বা সঙ্ঘ সমাজগত অর্থ-সঞ্চয়ের উদ্দেশ্য লইয়া তাঁহারা অর্থক্ষেত্রে আসেন নাই। ইহা যেমন উদার ও মহৎ, তেমনি দেশের ইষ্টসম্পাদক। প্রবর্ত্তকের নিজের ভাষায় বলি, "প্রবর্ত্তিত বিশাল সমাজে নূতন প্রাণ ও প্রেরণা সঞ্চার করার উদ্দেশ্যই তাহাদিগকে এই নূতন অভিনব কঠোর জীবন পথে চালিত করিয়াছে। বিপুল সমাজপ্রাণ ইহার ভিতর দিয়া যদি নবজন্ম গ্রহণ করে, তবে সঙ্ঘের জাতি গড়ার স্বপ্ন সফল হইবে।" বাংলার এই দুর্দ্দিনে ইহাপেক্ষা কল্যাণময়ী সারগর্ভ বাণী আর কি হইতে পারে? ধর্ম্মবীর্য্য হীনপ্রভ হইয়াছে, রাষ্ট্রপ্রাণের গভীর স্পন্দন নাই, সমাজ-সংহতি এখনও বাক্য মাত্র। মানুষের মত দাঁড়াইতে হইলে, অতীতের গৌরব ফিরাইয়া আনিতে হইলে—কর্ম্মজীবনে প্রবল উৎসাহ চাই, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি চাই এবং চাই সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া ব্যক্তিগত শক্তিপুঞ্জকে সংযুক্ত ও সংযোজিত করিয়া এক মহাশক্তির অবতারণা। ইহা অবশ্যই সম্ভব, কারণ যে জাতির অতীত এরূপ গৌরবময়, তাহাদের সহজে বিনাশ নাই—আমি ইহা বিশ্বাস করি। অর্থক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা না হইলে, জাতির বা সমাজের সম্যক্ কল্যাণ-সাধন হওয়া দুরূহ ব্যাপার। আবার অর্থক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি ভিন্ন হয় না। এই বিষয়ে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের অক্লান্তকর্ম্মা সাধকদিগের তপস্যায় যে "প্রবর্ত্তক ট্রাষ্ট" গঠিত হইয়াছে, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া নানাবিধ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান জনসেবায় সক্ষম হইয়াছে, প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের পবিত্র অনাবিল কর্ম্মপদ্ধতি ও প্রভূত প্রেরণাশক্তিই ইহার কারণ। যাঁহারা এই সব শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট বা কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ, তাঁহারাই জানেন সেগুলির গঠন, সংরক্ষণ এবং কার্য্যনির্ব্বাহ প্রণালী কিরূপ নির্দ্দোষ ও প্রশংসনীয়। এই বৈজ্ঞানিক যুগে জীবনধারা এক নূতনভাবেই চলিতেছে, নূতন নূতন আবিষ্কারের সঙ্গে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারলাভ অবশ্যম্ভাবী। এই প্রসারের কতটুকু অংশ বাঙ্গালীর দ্বারা হয়, তাহাই বিশেষভাবে দেখিতে হইবে। আমি আজীবন ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিল্পের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছি। মদীয় স্বর্গত পিতৃদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া জাতিকে এই দিকে সেবা দিয়া নিজেকে ধন্য মনে করি। যখনই দেখি—আমার বাংলা ও বাঙ্গালীজাতিকে এই দিক্ দিয়া কেহ সেবা করিতে উদ্যত, তখনই আমার প্রাণে আনন্দের সঞ্চার হয়। আধুনিক সভ্যতার যুগে শিল্প-বাণিজ্যের যে কি প্রয়োজন, তাহা কি কাহাকেও বলিতে হইবে? আমি আজ এই সন্ধ্যায়, এই ধর্ম্মোৎসবে আমার প্রাণের কথা ব্যক্ত করিয়া পরম আনন্দ পাইতেছি—তাই বলি, প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের উদ্যম, সাফল্য ও নৈতিক প্রভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া বাঙ্গালী ব্যবসা ও শিল্পে আরও মনোযোগী হইলে বড়ই গৌরবের বিষয় হইবে। "প্রবর্ত্তক" নামটী যেরূপ নবজাতি গঠনের মন্ত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহার পূর্ণ বিকাশের মাহেন্দ্রক্ষণ আসিয়াছে। বাঙ্গালীর যে একটা নিজস্ব সাধনা আছে, শাস্ত্র আছে, দর্শন আছে, কর্ম্ম আছে, ধর্ম্ম আছে, বীরত্ব ও ইতিহাস আছে—বাংলার প্রতিভা যে সর্ব্বতোমুখী করিতে হইবে তাহা নূতন করিয়া না হউক, জোরের সহিত, উৎসাহের সহিত প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ তাহা ঘোষণা করিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালীর শারীরিক ও মানসিক দৈন্যের উচ্ছেদ সাধন করিতে হইলে, দলভেদ বুদ্ধিকে জলাঞ্জলী দিতে হইবে, সমাজ ও জাতির স্বার্থে নিজ স্বার্থ বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নিমজ্জিত করিতে হইবে, সমষ্টির কল্যাণে ব্যষ্টির কল্যাণ অকল্যাণ ভুলিতে হইবে। তবে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের বাণীর সফলতার বিষয় আমরা ভাবিতে পারিব। আমরা প্রতিদিনই বাংলার হিন্দুদের দুর্দ্দশার কথা শুনিতেছি—নৈরাশ্য আমাদের ঘিরিয়া ধরিয়াছে, মনে হয় আমরা কি অভিশপ্ত? না—আমাদের জীবনের হিসাবে কোথাও বড় একটা ভুল হইয়াছে? আমরাই ত দায়ী—প্রতিকার আমাদের মধ্য হইতেই আবিষ্কার করিতে হইবে। কিছুদিন পূর্ব্বেও আমরা আমাদের ত্যাগের, কর্ম্মশক্তির, বুদ্ধির গৌরবে গরীয়ান্ ছিলাম, হঠাৎ বিগত বিশ বৎসরের মধ্যে আমরা যেন অন্ধকারের মধ্যে পথ খুঁজিতেছি। আমাদের রুদ্ধ প্রাণ জাগ্রত করিতে হইবে আমাদেরই তপস্যায় ও সাধনায়। যে ভুল ও ত্রুটি আমরা বারে বারে করিয়াছি, তাহা নির্ম্মমভাবে সংশোধন করিতে হইবে। এই উৎসবের অন্তরালে শ্রদ্ধেয় মতিবাবু যে শিক্ষার হোমানল প্রজ্বলিত রাখিয়াছেন তাহাই সমস্ত অমঙ্গলের বিনাশ করিবে এবং নবীন জীবনের পরম শুভময় উত্তাপ আনিবে। অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্য লগ্নে আমাদের জাতীয় জীবনে শান্তি-বারি বর্ষিত হউক। আমরা কৃত-কৃতার্থ হই।

পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ লইয়া আমি এই প্রদর্শনীর দ্বার উন্মুক্ত করি। শুভাস্তে পন্থানঃ।*

* ঊনবিংশ বর্ষ (১৩৪৮ সাল) প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ অক্ষয়তৃতীয়া উৎসব মেলা ও প্রদর্শনীর উদ্বোধন সভায় সভাপতির অভিভাষণ

বৈদেশিক সংবাদ

লোকসংখ্যা বৃদ্ধিকল্পে জাপানের চেষ্টা :

আগামী ১৯৪৫ সালের মধ্যে জাপানের লোকসংখ্যা ২০ কোটি বৃদ্ধি করিবার জন্য জাপান জার্ম্মাণীর মত জন্মের হার বৃদ্ধির আশায় বিবাহে অর্থ সাহায্য করিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, একটি বিবাহ সাহায্য ভাণ্ডার হইতে বিবাহেচ্ছু স্ত্রীপুরুষকে সাহায্য করা হইবে।

দশ ঘণ্টায় আটলাণ্টিক পাড়ি :

ওয়াল ষ্ট্রীট জার্ণালের সংবাদে প্রকাশ প্যান আমেরিকান এয়ার ওয়েজ ৯টি অতিকায় বিমান নির্ম্মাণ করিতেছেন। এগুলি মাত্র ১০ ঘণ্টায় ইউরোপে উড়িয়া আসিতে পারিবে।

বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজ ধ্বংস :

২৪শে মে সংবাদ পাওয়া যায় যে, এই যুদ্ধে বৃটিশ ব্যাটল ক্রুজার 'হুড' ধ্বংস হইয়াছে এবং জার্ম্মাণীর বৃহত্তম যুদ্ধ জাহাজ 'বিসমার্ক' ঘায়েল হইয়াছে।

হুড পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম রণতরী। ১৯২০ সালে ইহা নির্ম্মিত হয় এবং ইহা ৪২১০০ টনের রণতরী। ইহার নির্ম্মাণে খরচ পড়িয়াছিল ৫৬৯৮৯৪৬ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় পৌনে সাত কোটী টাকার মত।

বৃটেনে বিমানাক্রমণ :

সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, গত এপ্রিল মাসে যে বিমান আক্রমণ হয় তাহার ফলে ৬০৬৫ জন নিহত হইয়াছে ও ৬৯২৬ জন আহত বা হাসপাতালে স্থানান্তরিত হইয়াছে। যাহারা নিহত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে ২৪১৮ জন স্ত্রীলোক ও ৬৮০ জন বালকবালিকা। যাহারা আহত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে ২৭৪০ জন স্ত্রীলোক এবং ৫১৯ জন বালকবালিকা। ইহা ছাড়া ৬১ জন লোকের কোন খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না।

সহরবাসীর সংখ্যা—এ দেশে ও বিদেশে :

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ জন সহরবাসী। ইংলণ্ড ও ওয়েলসের শতকরা ৮০ জন লোক সহরাঞ্চলে বসবাস করে। উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সহরবাসীর সংখ্যা শতকরা যথাক্রমে ৫০ ও ৪৯ জন। এই বিষয়ে ভারতবর্ষ অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। ভারতের অধিবাসীদের শতকরা মাত্র ১১ জন লোক সহরে বাস করে। ভারতবর্ষের মধ্যে বোম্বে শিল্পপ্রধান দেশ হইলেও সহরবাসীর সংখ্যা মোট লোক সংখ্যার তুলনায় মাত্র ২২ জন।

ইংলণ্ডে চরকার প্রচলন :

যুদ্ধের জন্য ইংলণ্ডে সুতা কাটা ও বস্ত্র বয়ন—এই দুইটি মৃতপ্রায় কুটির শিল্প পুনরুজ্জীবিত হইতেছে। পণ্য মূল্য ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া অধিক সংখ্যক লোক ইহা শিখিতে আগ্রহান্বিত হইয়াছে। প্রাচীন কালের জিনিষ-পত্র বিক্রেতারা পুরাণ চরকা বেশ চড়া দরে বিক্রয় করিতেছে। উচ্চ বিদ্যালয়ের বহু ছাত্রী সুতা কাটা ও বস্ত্র বয়ন শিক্ষা করিতেছে।

বিখ্যাত ঔপন্যাসিকের মৃত্যু :

১লা জুন প্রাতঃকালে বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক স্যার হিউ সেমুর ওয়ালপোলের মৃত্যু হইয়াছে। রুষ দেশের অভিজ্ঞতা লইয়া লিখিত তাঁহার পুস্তক 'দি ডার্ক ফরেষ্ট' বিখ্যাত। শিশু জীবন সম্বন্ধেও তিনি কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছেন।

স্বাদেশিক সংবাদ

আশুতোষের স্মৃতি-তর্পণ :

পুরুষসিংহ স্যার আশুতোষ মুখার্জ্জির সপ্তদশ মৃত্যু-বার্ষিকী উপলক্ষে রবিবার ১১ই জ্যৈষ্ঠ কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে স্মৃতি-সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাহাতে ছাত্র, যুবক, শিক্ষাব্রতী ও কলিকাতার নাগরিকবৃন্দ তাঁহার পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট ও

চিত্তরঞ্জন এভিনিউর মোড়ে স্যার আশুতোষের মর্ম্মর মূর্ত্তির পাদদেশে প্রাতঃকালে অনুষ্ঠিত সভায় স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ও সায়াহ্নে দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংএর দ্বিতলে অনুষ্ঠিত সভায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের স্পীকার স্যার আজিজুল হক সভাপতিত্ব করেন। বাঙ্গালী জাতির নব-জাগরণে নরশার্দ্দুল স্যার আশুতোষের দানের কথা আজ আমরা সশ্রদ্ধ হৃদয়ে স্মরণ করি।

বেতারে বাঙলা গান:

নিখিল ভারত বেতার প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক কিছু কিছু বাঙলা গান ও বক্তৃতা ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে প্রচারের জন্য প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের জেমসেদপুর অধিবেশনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। নিখিল ভারত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য প্রচার সমিতির সম্পাদক শ্রীজ্যোতিষ-চন্দ্র ঘোষ মহাশয় বেতার কর্ত্তৃপক্ষকে এই সম্বন্ধে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। এই সম্পর্কে বেতার কর্ত্তৃপক্ষ যে জবাব দিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমরা যথেষ্ট বিস্মিত হইয়াছি। তাঁহারা বলেন প্রোগ্রামের মধ্যে বাঙলা কোন কিছু থাকিলে অন্য ভাষাভাষীরাও অনুরূপ দাবী করিবে। অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার তুলনায় বাংলাভাষার সমৃদ্ধির কথা বিবেচনা করিলে কর্ত্তৃপক্ষের এই আপত্তি নেহাৎ অযৌক্তিক বলিয়াই মনে হয়।

দার্জ্জিলিংএ মন্ত্রীদের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ:

বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলী দার্জ্জিলিং সহরে এক লক্ষ ২০ হাজার টাকায় ১৮ বিঘা জমির উপর 'উডল্যাণ্ডস্' ভবন ক্রয় করিয়াছেন। পুরাতন বাড়ী ভাঙ্গিয়া তাহার উপর মন্ত্রীদের ও বড় সরকারী চাকুরিয়াদের বিশ্রাম-ভবন ও দপ্তরখানা নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইবে।

নজরুল জন্মতিথি:

কাজী নজরুল ইসলামের ৪৩তম জন্মতিথি উপলক্ষে বিগত ২৫শে মে রবিবার অপরাহ্নে মুসলিম সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে ১১৪ নং লোয়ার সার্কুলার রোডস্থ ডেণ্ট্যাল কলেজ হলে একটি প্রীতিপ্রদ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। কবিবর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

নৃত্য শিল্পীর বিবাহ:

গত ১৫ই মে সন্ধ্যা ছয় ঘটিকার সময় নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করের চতুর্থ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুত রবীন্দ্রশঙ্করের সহিত মাইহার ষ্টেটের ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের কন্যা শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবীর সহিত বিবাহ বৈদিক-অনুষ্ঠান সহকারে সম্পন্ন হয়। অন্নপূর্ণা দেবী একজন উদীয়মানা সঙ্গীতশিল্পী।

বিপিনচন্দ্রের স্মৃতি-তর্পণ

সম্প্রতি কলিকাতার একটি জনসভায় স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পালের স্মৃতি-পূজা করা হইয়াছে। একদিন বাংলাদেশ
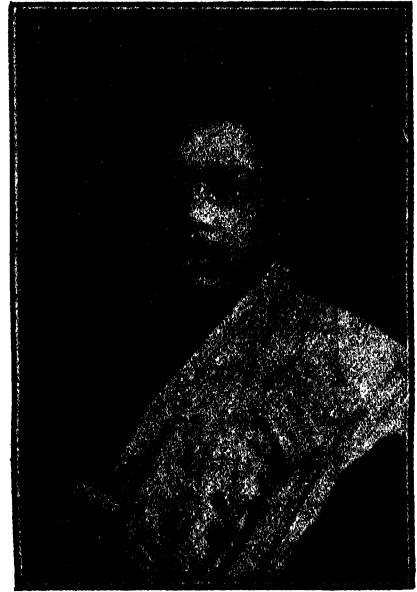
৺বিপিনচন্দ্র পাল

হইতে যে জাতীয়তার প্রেরণা সর্ব্ব ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহার অন্যতম প্রবর্ত্তক ছিলেন বিপিনচন্দ্র। নব্য বাঙ্গলার এই সাধকের স্মৃতি-পূজা উপলক্ষে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

এদেশে দুগ্ধজাত দ্রব্যের উৎপাদন:

এদেশে প্রতি বৎসর ১শত কোটী টাকার ঘি প্রস্তুত হয়। এ ছাড়া নানা প্রকারের যে পরিমাণ জমাট দুগ্ধ বিক্রয় হয় তাহার মূল্যও ৩৯ কোটী টাকা হইবে। ১৩ কোটী টাকার দধি, ১ কোটী টাকার ক্ষীর এবং ২২ কোটী

টাকার অন্যান্য দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রতি বৎসর এ দেশে বিক্রয় হইয়া থাকে।

মিউনিসিপ্যাল গেজেটের রবীন্দ্র-সংখ্যা :

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের রবীন্দ্র-জয়ন্তী সংখ্যা বাহির হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বয়সের বহু উৎকৃষ্ট ফটো ও মূল্যবান তথ্যাদির সাহায্যে আলোচ্য সংখ্যাটিকে সব দিক্ দিয়া সার্থক করিয়া তুলিতে কর্ত্তৃপক্ষের এই সকল প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য সন্দেহ নাই।

বাঁশবেড়িয়া পাঠাগারের সুবর্ণ জয়ন্তী :

গত ১১ই এপ্রিল শুক্রবার হইতে ইং ১৩ই এপ্রিল রবিবার পর্য্যন্ত হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়া পাঠাগারের ৫০ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই সঙ্গে একটি স্বাস্থ্য ও সংস্কৃতিমূলক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা স্থানীয় বিদ্যালয় গৃহে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সংস্কৃতিমূলক প্রদর্শনীতে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের অনেক চার্ট প্রদর্শিত হইয়াছিল। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্রের সভাপতিত্বে এই উপলক্ষে হুগলী জেলা সাহিত্য সম্মেলন ও শ্রীযুত বিনয়রঞ্জন সেন আই.সি.এস. মহোদয়ের পৌরোহিত্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ভিন্ন নানাবিধ শিক্ষণীয় বক্তৃতা এবং নির্ম্মল আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থাও হইয়াছিল। বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার শ্রীযুত সুধীন্দ্রনাথ হালদার মহোদয় এই উৎসবের উদ্বোধন করেন। প্রথম দিবসের অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীযুত হরিহর শেঠ মহাশয় ও উদ্বোধন করেন শ্রীযুত নীহাররঞ্জন রায়, তৃতীয় দিনে উৎসবের সমাপ্তি বাসরে শ্রীমতিলাল রায় ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে যে উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা দেন তাহা উপস্থিত সকলেরই উদ্দীপনা আনয়ন করে। উৎসব সমিতির সভাপতি কুমার মুনীন্দ্রনাথ দেবরায় মহাশয়ের 'বাঁশবেড়িয়া পরিচয়' খুবই সময়োপযোগী হয়।

বাঁশবেড়িয়া পাঠাগারের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব-বাসরে শ্রীমতিলাল রায়

উপাসনা বার্ষিকী :

উপাসনা অধ্যাত্ম জীবনের অমৃত। শুধু সন্ন্যাসীর নহে, গৃহস্থ জীবনেও ইহার প্রয়োজন আছে। নিত্য উপাসনা গৃহস্থের পারিবারিক জীবন প্রীতি, শান্তি ও দেবতার আশীর্ব্বাদে কল্যাণপূত করিয়া তুলে। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের নিত্য উপাসনা-নীতি যে সকল ভক্ত পারিবারিক জীবনে গ্রহণ করিয়া নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন, চন্দননগর বোড়াইচণ্ডীতলা নিবাসী জমিদার শ্রীঅরুণচন্দ্র সোম মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার গৃহে উপাসনার আসন প্রতিষ্ঠার ১১শ বার্ষিক উৎসব ২রা জ্যৈষ্ঠ সুসম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে শুক্র ও শনিবার দুই দিন সন্ধ্যাকালে সঙ্ঘগুরুর পৌরোহিত্যে এক প্রীতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সঙ্ঘের স্থানীয় ও কলিকাতা নিবাসী সকল সভ্য ও কয়েকজন ভক্ত সুহৃদ্ উপস্থিত ছিলেন। প্রবর্ত্তক নারী মন্দিরের মহিলাগণ মাতৃ-কীর্ত্তন করেন। সমবেত কণ্ঠের উপাসনা, প্রশস্তি ও সঙ্ঘ-গুরুর ধীর, গম্ভীর উপদেশবাণী সংযুক্তভাবে এক অপার্থিব প্রীতি-মধুর পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে। ভক্তসাধক শ্রীযুক্ত সোম মহাশয় তাঁহার উপাসনা গ্রহণের যে সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত প্রকাশ করেন, তাহাতে তাঁহার সঙ্ঘ-গুরু ও সঙ্ঘের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও অনুরাগ এবং সুগভীর মর্ম্মানুভূতিরও

পরিচয় পাওয়া যায়। উৎসবান্তে নিমন্ত্রিত ভক্ত ও সাধকমণ্ডলীকে সোম-গৃহিণী শ্রীমতী বিদ্যুল্লতা দেবী পরমানন্দে প্রসাদ বিতরণ করেন।

মূক ও বধিরদিগের উন্নতি-প্রচেষ্টা :

সম্প্রতি শ্রীযুত নৃপেন্দ্রমোহন মজুমদার পূর্ব্ব ভারতীয় বধিরদিগের শিক্ষা-সম্মেলনের পূর্ব্ব ভারতীয় কেন্দ্রের জন্য তৃতীয়বার কর্ম্মাধ্যক্ষ মনোনীত হইয়াছেন। শ্রীযুত মজুমদারের অনলস কর্ম্ম-প্রচেষ্টা ভারতের এই প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানটিকে বর্ত্তমান অবস্থায় উন্নীত হইতে অনেকখানি

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রমোহন মজুমদার

সমর্থ হইয়াছে। ইনি ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে "অল বেঙ্গল এসোসিয়েসন্ ফর দি ওয়ার্কস্ অফ্ দি ডেফ্" নামক প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। মূক ও বধিরদিগের যে প্রদর্শনী সম্প্রতি খোলা হয় তাহাতে মহামান্যা লেডি লিন্‌লিথ্‌গো প্রমুখ বহু মহিলা ও গণ্যমান্য ব্যক্তি প্রদর্শনীতে যোগদান করেন।

পরলোকে প্রফুল্লচন্দ্র :

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের খুলনা নিবাসী গৃহস্থ ভক্ত শ্রীউপেন্দ্রনাথ বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ প্রফুল্লচন্দ্র বসু গত ২রা জ্যৈষ্ঠ পরলোক গমন করেন। প্রফুল্লচন্দ্র আই, এ, পরীক্ষান্তে চট্টগ্রামের প্রবর্ত্তক আশ্রমে কিছুদিন শিক্ষকতা কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এই তরুণ কর্ম্মীর অকাল প্রয়াণে সঙ্ঘ গভীর শোকানুভব ও তাঁহার আত্মার ঊর্দ্ধগতি কামনা করেন। প্রফুল্লের বীর হৃদয় পিতা, তদীয় মাতা ও পরিজনমণ্ডলীকে শ্রীভগবানই সান্ত্বনা দান করুন।

প্রবর্ত্তক বিদ্যার্থী ভবন :

বিগত ১৮ই মে, রবিবার অপরাহ্নে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ বার-এট্-ল, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে প্রবর্ত্তক বিদ্যার্থি ভবনের (চন্দননগর) পারিতোষিক বিতরণোৎসব সম্পন্ন হয়।

ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত নলিনচন্দ্র দত্ত বিদ্যালয়ের ১৯৩৯-৪০ সালের কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। তিনি ইহাতে বিদ্যালয়ের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিতন্ত্র অব্যাহত রাখিয়া, সুকঠিন হইলেও, কিরূপে সত্য, সংযম, সম্বন্ধের ভিত্তিতে বিদ্যার্থিদের প্রাণে (১) ঈশ্বরবিশ্বাসের উদ্বোধন, (২) ইচ্ছাশক্তির জাগরণ, (৩) সৃষ্টি শক্তির পরিস্ফুরণ (৪) মনুষ্যত্বের উন্মেষ ও (৫) উত্তম নাগরিক জীবন গঠন—এই পঞ্চ শক্তির অনুশীলনের সহায়তা করা যায়, তাহার ইঙ্গিত দান করেন। বিদ্যার্থি ভবনের পূর্ণাঙ্গ উন্নতিসাধনের পক্ষে কর্ত্তৃপক্ষ কতখানি অগ্রসর হইয়াছে ও কতখানি সহানুভূতিশীল দেশবাসীর সহায়তা ও শুভ দৃষ্টির উপর নির্ভর করিতেছে, তিনি তাহারও সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রদান করেন।

অতঃপর বিদ্যার্থিগণ বাংলা, ইংরাজী, সংস্কৃত ও ফরাসী ভাষায় যুগোপযোগী স্তোত্র, আবৃত্তি ও সঙ্গীত দ্বারা উপস্থিত জনমণ্ডলীর আনন্দ বিধান করেন। ছাত্রমণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় উদীয়মান তরুণদিগকে স্বাধীন জাতির উপযোগী চরিত্র অর্জ্জন করিতে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি এই চরিত্র সত্য ও সংযমের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া এবং ভারতীয় ভাব ও কৃষ্টির ধারা রক্ষা করিয়াই তাঁহাদের জীবন গঠনের নির্দ্দেশ দেন।

সভাপতি মহাশয় সঙ্ঘগুরু তথা প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও বহুমুখী কর্ম্মধারার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বিদ্যার্থিভবনের পূর্ণাঙ্গ উন্নতি ও কল্যাণেচ্ছা জ্ঞাপনপূর্ব্বক উহার মহৎ উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে তাঁহার আন্তরিক সাহায্য ও সহানুভূতির প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি বিদ্যার্থিগণকে

সাধারণ ও বিশেষ বিষয়ে এবং আবৃত্তি ও খেলা (sports) এর কৃতিত্বের জন্য পুরস্কার বিতরণ করেন।

অতঃপর ধন্যবাদান্তে সভা সমাপ্ত হইলে, বিদ্যার্থিগণ শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত "সংস্কৃতির সংঘর্ষ" নাটিকাখানি সাফল্যের সহিত অভিনয় করে। অভিনয়ে প্রীত হইয়া কলিকাতার 'দি আর্ট সেণ্টার অব দি ওরিয়েণ্ট' দত্তালির ভূমিকার জন্য একটি রৌপ্যাধার এবং শ্রীযুক্ত রাধারমণ চৌধুরী শ্রীমান্ সৌমোন ঘোষকে (সুমন্তের ভূমিকা) একটি পুরস্কার প্রদান করেন।

বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলন:

বিগত ৩রা ও ৪ঠা মে মহাবোধি সোসাইটি হলে বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সম্মেলনের

কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ বাহাদুর

উদ্বোধন করেন এবং কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ বাহাদুর মূল সভাপতিত্ব করেন। অন্যান্য বিভাগীয় সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার (সাহিত্য), ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ ঘোষ (বিজ্ঞান), শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (কাব্য), অধ্যাপক সুকুমার ঘোষ (জনশিক্ষা), শ্রীযুত সুনির্ম্মল বসু (শিশুসাহিত্য) এবং অধ্যাপক মুরারীমোহন ঘোষ আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য (জনস্বাস্থ্য)।

দৈনন্দিন কার্য্যে ও বঙ্গদেশপ্রবাসী অন্যান্য ভাষাভাষীদের সহিত বাঙালীকে বাংলাভাষা ব্যবহার, বঙ্গভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হইবার, প্রগতির নামে দুর্নীতিমূলক গল্প-কবিতার লিখন-পঠনের বিরোধিতামূলক কয়েকটি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব সম্মেলনে গৃহীত হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার মিত্র এই সম্মেলনের সাফল্যের জন্য অনেকখানি দায়ী। বাংলা ও বাঙালী তথা তাহার স্বকীয় সংস্কৃতির প্রতি দরদী যাঁহারা তাঁহারা আশা করি, এইরূপ সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিবেন এবং প্রতিষ্ঠানটিকে স্থায়ী ও কার্য্যকরী করার জন্য সর্ব্বতোভাবে সংযোগিতা করিবেন।

গণশিক্ষা পরিষদ: ঢাকা:

ঢাকায় গণশিক্ষা প্রসারের মূলে শ্রীযুক্তা লীলা রায়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও গঠনমূলক কর্ম্মপ্রতিভার দান প্রচুর। বস্তুতঃ গণশিক্ষা পরিষদও তাঁহারই সৃষ্টি। শ্রীযুক্তা রায় ও তাঁহার জনকয়েক সুযোগ্যা সহকর্ম্মিণী বিগত দশ বৎসর ধরিয়া ঢাকা সহরের অধিকাংশ বালিকা বিদ্যালয়গুলি পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। এই জন্য তাঁহাদের প্রচুর ত্যাগ এবং তপস্যাও বরণ করিতে হইয়াছে। সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে যদি এই সব জনহিতকর প্রতিষ্ঠান সমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তাহা শুধু ঢাকাবাসীর পক্ষেই শোচনীয় হইবে না, পরন্তু বাংলার শিক্ষিত সমাজের পক্ষেই লজ্জাকর হইবে। এদিকে অকৃপণ সহযোগিতার জন্য আমরা দরদী দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

পরলোকে দীনেশরঞ্জন দাশ:

কল্লোল সম্পাদক শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ গত ১২ই মে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার সম্পাদিত 'কল্লোল' পত্রিকা একদিন বাঙ্গলা সাহিত্যে স্পন্দন তুলিয়াছিল। এই 'কল্লোল'কে কেন্দ্র করিয়া যে সাহিত্য সাধনা সুরু হয় তাহার ফলে আমরা সাহিত্যে অনেক সুলেখককে পাইয়াছি। এই দিক্ হইতে দীনেশরঞ্জনের নাম বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে স্থায়ী হইয়া থাকিবে। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

রাজবলহাটে স্মৃতি-পূজা :

১৮ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার অপরাহ্নে হুগলী জেলার অন্তর্গত রাজবলহাট পল্লীতে পণ্ডিতপ্রবর অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন ও অমূল্যচরণ গ্রন্থশালার দ্বারোদ্ঘাটন কার্য্য স্যার মন্মথনাথ মুখার্জ্জির পৌরোহিত্যে সুসম্পন্ন হয় এবং শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের সভাপতিত্বে হেমচন্দ্র-স্মরণোৎসব ও হেমচন্দ্র স্মৃতি-পাঠাগারের
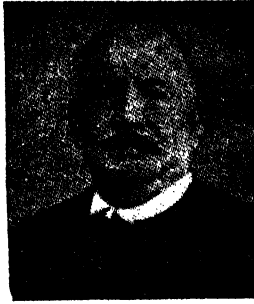
স্যার মন্মথনাথ মুখার্জ্জি

৺অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সপ্তদশ বার্ষিক উৎসব সশ্রদ্ধায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বহু দূর দূরান্তর এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহ হইতে বিপুল লোকসমাগম হয়। স্যার মন্মথনাথ মুখার্জ্জি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অগাধ পাণ্ডিত্য, সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা এবং রাজবলহাট পল্লীর উন্নতির জন্য তাঁহার আপ্রাণ প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেন। বিদ্যাভূষণ-স্মৃতি-পূজা কমিটির পক্ষ হইতে শ্রীযুত মহাভারত ভেরালী এই পল্লীর কল্যাণকল্পে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের এক যুগাধিক অক্লান্ত তপস্যার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রধানতঃ শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদারের উদ্যোগে অমূল্য গ্রন্থশালার প্রতিষ্ঠা হয়। এই সংগ্রহশালায় প্রাচীন মুদ্রা, চিত্র, পুঁথি প্রভৃতি রক্ষিত হইয়াছে। শ্রীযুত পান্নালাল ভড় 'অশ্রু-তর্পণ' শীর্ষক কবিতায় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের স্মৃতির প্রতি অর্ঘ্য প্রদর্শন করেন।

কবিবর হেমচন্দ্রের জীবনচরিতকার শ্রীযুত মন্মথনাথ ঘোষ একটি সুলিখিত নিবন্ধে হেমচন্দ্রের দেশাত্মবোধের সম্যক্ পরিচয় প্রদান করেন। শ্রীযুত জহরলাল ভড় ভূরিভোজনে অভ্যাগতদের আপ্যায়িত করেন। রাজবলহাট পল্লী হইলেও তার উৎসাহী প্রাণের উদ্বুদ্ধতা প্রশংসার যোগ্য ও বাঙালীর অনুকরণীয়।

পরলোকে শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার :

ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভার প্রাক্তন সভাপতি শ্রীযুক্ত এস্, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার ১৯শে মে সকাল সাত ঘটিকায় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি পত্নী, এক পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

তিনি ১৯১৬ হইতে ১৯২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মাদ্রাজের এডভোকেট জেনারেল পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে তিনি কংগ্রেসের গৌহাটী অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন। শ্রীযুত আয়েঙ্গার কলিকাতা কংগ্রেসে নেহেরু রিপোর্টের বিরোধিতা করেন ও পূর্ণ স্বাধীনতার সমর্থন করেন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে লাহোর কংগ্রেসের পর হইতেই তিনি রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি Law and Law Reform এবং Swraj Constitution for India নামক দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

যুগ্ম সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী
প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি-এ কর্ত্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত
এবং প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৫২।৩ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীফণিভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বর্ষার পল্লী : বীরভূম

শিল্পী : শ্রীমহীতোষ বিশ্বাস
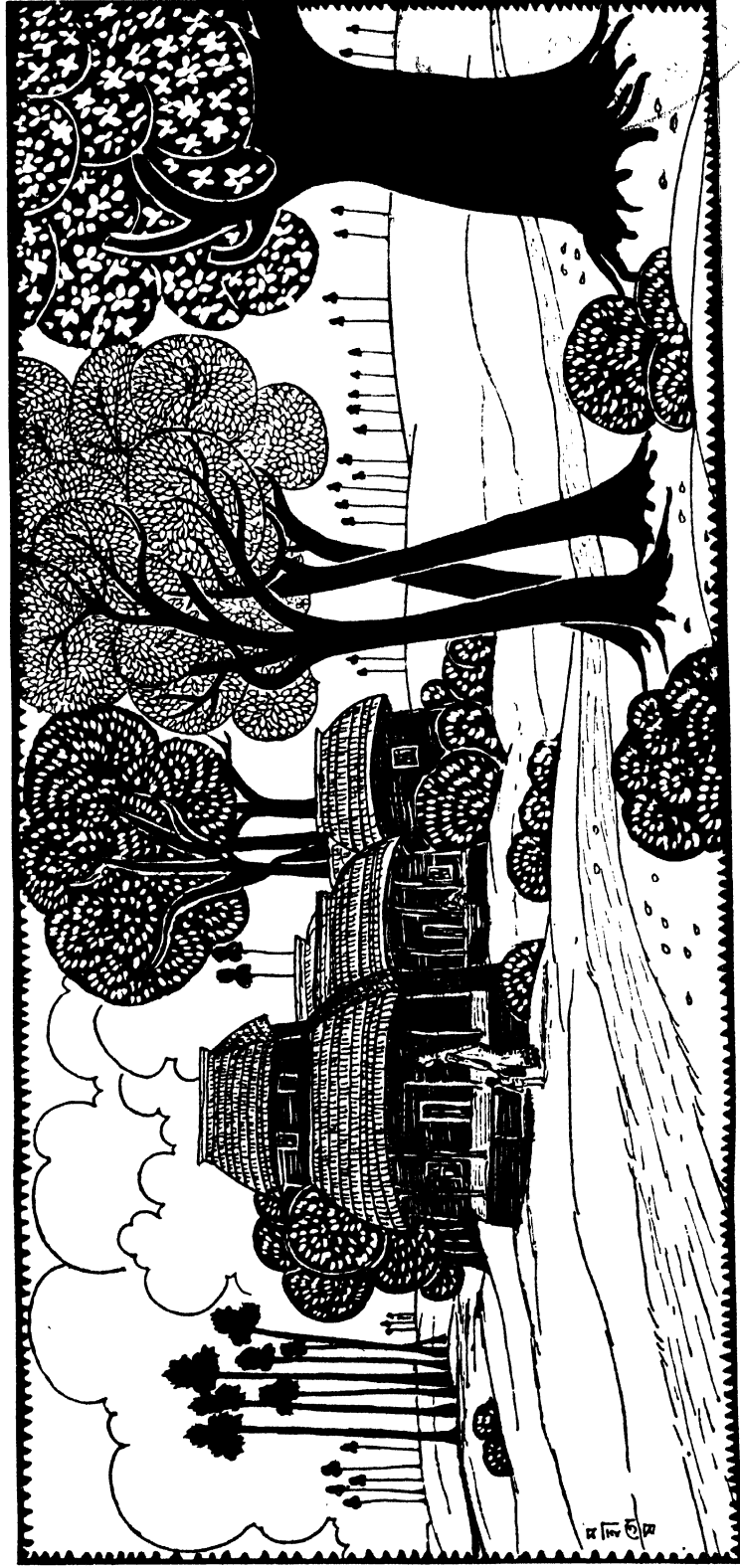
ষড়বিংশ বর্ষ ১৩৪৮ সাল	শ্রাবণ	প্রথম খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা

গড়ার সংগ্রাম

মন্ত্র ব্যর্থ, অর্থহীন—আশ্রয় বিহনে। মন্ত্র-মুখরিত ভারত—ধূর্জ্জটীর মত সে ধৃতিশক্তি কই? মানুষের মত মানুষ হলেই সব বদ্‌লে দেওয়া যায় এক নিমিষে। শিক্ষার বিকার ঘুচে যায়—রাষ্ট্র-শৃঙ্খল খসে' যায়—সম্পদ্, বীর্য্য, সব কিছু অধিকারই আবার ফিরে' আসে। এই মানুষ গড়ার সংগ্রামই আজ বাংলায় আরম্ভ হোক—ভাঙ্গার নয়।

যদি মানুষ পাওয়া যায়, দশ বৎসরে নূতন বাংলা গড়ে' উঠ্‌বে। তোমার আমার প্রাণ যাবে, কিন্তু যে নূতন জীবনস্রোতঃ-সৃষ্টি হবে, তা' রুদ্ধ হবে না কোনদিন। আজ চাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সুদৃষ্টিসম্পন্ন আচার্য্য, মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রে সুচরিত্র, ত্যাগ-বৈরাগ্যবান্ অধ্যাপক, কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞানবিৎ শ্রমিক, বাণিজ্যক্ষেত্রে ধর্ম্মপ্রাণ ব্যবসায়ী। উত্তম শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী যদি বিদ্যালয়ে থাকে, ছাত্র-ছাত্রী পায় নূতন জীবন। রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম্ম—উত্তম লোকের অভ্যুত্থানে উত্তম হয়ে উঠে। নগরে নগরে, প্রতি পল্লীকেন্দ্রে দেশ ও জাতি যাদের নিয়ে, তারা যদি সৎ ও সতী হয়, তাদের জীবনের অভিব্যক্তিই নূতন বাংলার বীর্য্যস্বরূপ হবে। অন্ততঃ এমন হাজার দুই মানুষ মন্দিরে, তীর্থে, আশ্রমে সর্ব্বহারা হয়ে, দেশে শুভ্র চেতনা জাগ্রত করবে। কোটী কোটী মানবের জ্যোতিঃ-কেন্দ্র হবে ইহারাই। এ স্বপ্ন আমার ব্যর্থ হবে না কিছুতেই।

—শ্রীম

সমষ্টি-সাধনা

জাতির অভ্যুত্থান-যুগে ব্যক্তিগত সাধনার চেয়ে সমষ্টির সাধনার ওপর বেশী ঝোঁক দিতে হয়। কারণ, কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির ব্যক্তিগত তপস্যার প্রভাবে জাতির সাধনা কতক দূর অগ্রনীত হইলেও, তাহাতে সমষ্টির স্বতঃ-প্রসূত শক্তি উদ্বুদ্ধ হইয়া সংযুক্ত না হইলে, সেই নেতার অন্তর্দ্ধানের সহিত সংহতির চেতনা ঝিমাইয়া পড়ে—ক্রমে সংহতি হয় ভাঙ্গিয়া যায়, নয় বহুধা বিভক্ত হইয়া ক্ষীণ, দুর্ব্বল, প্রভাবহীন হয়—আদর্শেরও বিকৃতি সাধন করে। ব্যক্তির ব্যষ্টিগত সাধনাও সমষ্টি বিনা পূর্ণতা লাভ করে না। তাহার সাধনার সিদ্ধি বা ফলটুকুই শুধু সমষ্টির জন্য নয়, সাধনার উপরও সমষ্টির প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া যথেষ্ট বর্ত্তমান। প্রত্যেক সাধকের ব্যক্তিগত জীবনেও কম-বেশী পারিপার্শ্বিক সহায়তা ও আনুকূল্যের প্রয়োজন আছে। কিন্তু সঙ্ঘ-সাধনা বা জাতি-সাধনা সর্ব্বতোভাবে সঙ্ঘের বা জাতির জন্যই। ব্যক্তি এই ক্ষেত্রে সমষ্টির প্রতীক বা শক্তি-কেন্দ্রে পরিণত হয়। সাধনা করে সমষ্টি স্বয়ম্।

সমষ্টির প্রাণ আছে, গতি আছে। সমষ্টি-সাধনায় প্রত্যেক ব্যষ্টি-সাধক সেই প্রাণ, সেই গতি নিজের মধ্যে স্ফুট, জাগ্রত করিয়া ধরে। সমষ্টির ভাব তাহার মধ্যে বাণী পায়, ভাষা পায়—সমষ্টির কর্ম্ম, শক্তি, ঐশ্বর্য্য তাহার মধ্য দিয়া হয় রূপস্থ, সমৃদ্ধ, উপচিত। সমষ্টি-প্রাণ কখনও কোনও ব্যক্তি-সাধককে অগ্রে করিয়া কিছু দূর অগ্রসর হয়; আবার ভিন্ন স্তরে, ভিন্ন অবস্থায় আর একজনকে করে নির্ব্বাচন—প্রয়োজন-ভেদেই এই আশ্রয়-ভেদ, এইটুকু জানিলেই আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারি। সাধকের সহিত সাধকের ভাব-ভেদের তখন আর কোনও কারণ থাকে না। সঙ্ঘ বা জাতি-সাধনার ক্ষেত্রে এই কর্ম্মবিজ্ঞান না জানা থাকিলেই অনর্থের উৎপত্তি

সমষ্টি-সাধনা সমষ্টির জন্য। কিন্তু ব্যক্তির জীবনোৎসর্গ তাই বলিয়া ব্যক্তিগত ভাবেও নিষ্ফল হয় না। ব্যক্তির আত্মায় সমষ্টি-স্বরূপের স্ফুরণই এক অসাধারণ ব্যক্তিগত সাফল্য। ব্যক্তি সমষ্টিকে পাইয়া ধন্য হয়, পূর্ণও হয়। আসলে ব্যক্তি মাত্রেই যে সমষ্টি বা বিশ্ব-প্রাণেরই অভিব্যক্তি। প্রতি মানবে বিশ্বমানবই বিগ্রহান্বিত, লীলারত। অন্য ভাষায়, ব্যক্তি ও সমষ্টি, জীব ও জগৎ উভয়েই এক তৃতীয়, অনাদ্যনন্ত, পরাৎপর পরমেরই দ্বিধাবিন্যস্ত আত্মপ্রকাশ। সেই পরমের আত্মপরিচয় বিরাট্ বা বিশ্বপুরুষের মধ্য দিয়াই ব্যক্তি-পুরুষে সঞ্চারিত ও প্রসারিত হয়। সমষ্টি ও ব্যষ্টি, জগৎ ও জীব, ব্রহ্মাণ্ড ও পিণ্ড—এই ক্রম ধরিয়া দেখিলেই জীবনদর্শন সঠিক হয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণ যেমন বলিতেন—"গঙ্গারই ঢেউ, ঢেউ-এর গঙ্গা নয়।" এই সরল, অনুপম উপমার সাহায্যেই আমরা অনায়াসে বুঝিতে পারিব—"চাচা আপন প্রাণ বাঁচা" বা "আপনি বাঁচলে বাপের নাম"—এসব নীতি স্বার্থান্ধ, আত্মঘাতী মানুষেরই আপনাকে বঞ্চনা। আসল কথা, সমষ্টি বা স্বজাতি না বাঁচিলে ব্যষ্টিও বাঁচে না, কেহই বাঁচিতে পারে না। স্বজাতি-প্রেম বা জাতীয়তার দরদ এই মর্ম্ম-সত্য উপলব্ধি করিলে অকাট্য দার্শনিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, শুধু ভাবপ্রবণের কুহেলিকাময় হৃদয়োচ্ছ্বাস বলিয়া উপেক্ষা করা যায় না। স্বার্থের যথার্থ প্রতিষ্ঠাই তাই পরমার্থে—সমষ্টির মধ্যেই প্রত্যেকের পূর্ণতা বিশেষ ও পূর্ণতরভাবে। আপনার মধ্যে জাতি, জাতির মধ্যে আপনাকে না দেখিলে ও পাইলে, জাতির সেবা করিতে পারি, কিন্তু খাঁটি জাতি-সাধনার অধিকার লাভ হয় না।

ব্যক্তি সমষ্টির অভিব্যক্তি হইলেও, ব্যষ্টি-মানুষ অচেতন যন্ত্র মাত্র নহে। সমগ্রের সে সজাগ, মুখর বিগ্রহ; এই জ্ঞান ও চেতনা তাহার প্রতি চিন্তা ও কর্ম্ম স্পন্দিত করিয়া তুলে। সমষ্টির সেবায় ও সাধনায় তার নিজ বিশেষ শক্তি ও প্রতিভা ফুটিয়া উঠে। এই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকতা কোনও কারণে চাপা পড়িলেও, একেবারে

নিশ্চিহ্ন হইবার নয়। এইভাবে সমষ্টিকে ধারণ করে ব্যক্তি, উহাকে সে উপলব্ধি ও আস্বাদন করে এই বিশেষত্বের মধ্য দিয়া। ব্যক্তির দায়িত্ব-বোধের মূল কেন্দ্রও এইখানেই। একই সঙ্ঘ-জীবনে বা জাতি-জীবনে বিভিন্ন সমষ্টি-সাধকের তপস্যায় যে ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ চিন্তামণ্ডল ও কর্ম্মক্ষেত্র গড়িয়া উঠে, তাহা এই কারণেই। যে রাষ্ট্র বা সমাজ এই ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ উন্মেষিত করিয়া বিচিত্র বিভব সৃষ্টি করে, তাহার বৃদ্ধি ও প্রগতি অনিবার্য্য। অন্যথা দায়িত্বের উৎস-রস শুকাইলে, সে সমষ্টি-জীবন ঊষর, মরু-শ্মশানতুল্য হয়।

এই বৈশিষ্ট্য কিন্তু সমষ্টির মূল সত্তা হইতে বিচ্ছিন্ন ও বিযুক্ত আত্মস্বাতন্ত্র্য নহে। স্বাতন্ত্র্যের জীবন-নীতি ও গতি শুধু বিচিত্র নহে, বিভিন্ন। যে ব্যক্তি সংহতির মূল তন্ত্র বা জীবনের অনুশাসন না মানিয়া, আত্মবৈশিষ্ট্যের নামে যথেচ্ছ নীতি ও আচার অনুসরণ করে, সে সমষ্টির জীবন-বেদীই ভগ্ন করে। এমন অনাচারী বা স্বৈরাচারী বিদ্রোহী সত্যই পরিত্যজ্য। সমষ্টির আমূল জীবন-তন্ত্র সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করিয়া, অথচ বিশিষ্ট দরদ ও দায়িত্ব লইয়া যে চিন্তা ও কর্ম্মসৃষ্টির বিচিত্র ভঙ্গী, তাহাই খাঁটি, সরস ও সংহতির পরিপোষক ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ত্তি। এই ব্যক্তিত্বের পূর্ণ হইতে পূর্ণতর বিকাশেই সমষ্টিরও উত্তরোত্তর পরিণতি।

'ইজমের' সংঘাত

ইঙ্গ-জর্ম্মণ যুদ্ধে দুইটী আদর্শবাদের সংঘাত চলিতেছিল—ইহার উপর মহারুষের অন্তর্প্রবেশে আদর্শগত সংগ্রাম আরও বিমিশ্র, ঘোরাল হইয়া উঠিল। সমরক্ষেত্রে সাময়িক জয়-পরাজয়ে এই আদর্শের সংগ্রাম নিবৃত্ত হইবে না। এক আদর্শের পূজারী অন্য আদর্শের পূজারীর কাছে যদি চরম নতি স্বীকার করিয়া আত্মাদর্শ পরিত্যাগ করে, তবেই আদর্শের পতন ও পরাজয় এবং ইহাই সংগ্রামেরও পরিসমাপ্তি। অন্যথা যুদ্ধানল সাময়িক নিভিলেও, আবার জ্বলিয়া উঠিবে। প্রথম যুধ্যমান দুই পক্ষের মধ্যে ফ্রান্সের রণাঙ্গনে জর্ম্মণীর জয় ও ইঙ্গ ফরাসী প্রমুখ মিত্রবাহিনীর সামরিক পরাজয় ঘটিলেও, একমাত্র ফরাসী গভর্ণমেণ্ট ছাড়া আর কোনও মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রশক্তির আদর্শ-মূলক পরাভব ঘটে নাই। বেলজিয়ম, হল্যাণ্ড, ক্ষুদ্র লাক্সেমবার্গ এবং পোল্যাণ্ড, নরওয়ে, যুগশ্লাভিয়া, গ্রীস শক্তিবর্গ যুদ্ধে হারিলেও, কেহই রাষ্ট্র হিসাবে আদর্শের পরাভব বা নতি স্বীকার করে নাই। একমাত্র ফরাসী শাসনশক্তির সামরিক পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে আদর্শেরও ভাঙ্গন বা বিকার দেখা দিয়াছে। ইহাই এই মহাসমরের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। গত মহাযুদ্ধে বিজয়ী ও বিজিত কোনও পক্ষে এই আদর্শের অপলাপ ঘটে নাই—এমন কি বিজিতও বিজেতার কাছে যুদ্ধান্তে আদর্শের দৈন্য অনুভব করে নাই। অগ্রে রুষ, পরে জর্ম্মণীতে অবশ্য অত বড় দুর্য্যোগের সুযোগে রাজতন্ত্র ভাঙ্গিয়া সঙ্ঘতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রবিপ্লবের সূচনা হইয়াছিল; সে একটা নূতন পরিবর্ত্তন, বিজেতার চরণে বিজিতের নতজানু হইয়া আদর্শের সমর্পণ ও পরিবর্ত্তে বিজয়ীর আদর্শই অনুগ্রহ-দানরূপে গ্রহণ করা নহে। বর্ত্তমান ফ্রান্সের শাসকবর্গের এই শোচনীয় দুর্দ্দশাই ঘটিয়াছে।

মিত্রপক্ষ গণতন্ত্র আদর্শবাদের জয়ধ্বজা উড়াইয়া যুদ্ধে নামিয়াছে। আদর্শের সঙ্গে স্বার্থ বিজড়িত নাই, তাহা নহে। পৃথিবীতে কোন্ আদর্শবাদী সম্পূর্ণ পার্থিব-স্বার্থলেশহীন? বিশেষতঃ, এক একটা বিপুল জাতির পক্ষে এই মর্ত্ত্য-জীবনে তাহা আপাততঃ সম্ভব নহে, ইহা আমরা গণ্য করিয়া লইতে পারি। মিত্রপক্ষীয় অনেকগুলি জাতিরই অধীনে বিশাল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য আছে। বিশেষভাবেই বৃটনের দিগন্তহীন বিরাট্ সাম্রাজ্য শত্রু-মিত্র সর্ব্ব জাতিরই ঈর্ষ্যা-স্থল। ইংরাজ নিজ স্বার্থ বিনা, কি ভারত, কি অন্যান্য অধীন রাজ্যে গণতন্ত্রের আদর্শ-প্রয়োগে কুণ্ঠিত, উদাসীন, এমন কি সাধ্যপক্ষে অনিচ্ছুক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তত্রাপি ইংরাজের কণ্ঠে গণতন্ত্রের জয়-ধ্বনি আমরা একান্ত নিরর্থক মনে করি না। ইংরাজ প্রমুখ মিত্রপক্ষ স্ব-স্ব স্বাধীনতার সঙ্গে গণতন্ত্রেরই আদর্শবাদ লক্ষ্য-স্বরূপ সম্মুখে রাখিয়া ক্লান্তিহীন সংগ্রাম করিতেছে। মর্ত্ত্যের স্বার্থ ও দুষ্টবাসনা যখন সম্যক্ অতিক্রম করা সাধ্যায়ত্ত না হয়, তখনও কত অধ্যাত্ম-

সাধকের 'আমার মন বুঝেছে, প্রাণ বুঝে না' গোছের সঙ্গতিহীন অবস্থা হয়—ইহা কে না উপলব্ধি করিয়াছেন! গণতন্ত্রবাদী যুদ্ধরত জাতি ও রাষ্ট্রগুলি এবং তৎপক্ষীয় আমেরিকা আজ সর্ব্বক্ষেত্রে আদর্শের প্রয়োগে সমর্থ না হইলেও, আমরা ধরিয়া লইব তাহারা গণতন্ত্রেরই পতাকা ধারণ করিয়াছে। এই দিক্ দিয়া মিত্রপক্ষের আদর্শ বুঝা কষ্টকর নয়, উহা অস্পষ্টও নয়।

মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে অক্ষশক্তির আদর্শও আজ আর একটুও অস্পষ্ট বা দুর্ব্বোধ্য নয়। জর্ম্মণীর ভার্সাই-সন্ধির পর হইতে পুনরায় কাম্পিয়ন অরণ্যের রণ-ক্ষান্তি-চুক্তি পর্য্যন্ত তাহার যে যুদ্ধাভিযান, তাহার মূলে যে প্রতিহিংসার প্রতিক্রিয়া, তাহা শেষ হইয়াছে। এই প্রতিহিংসা-পর্ব্বের পর, যে আসল জর্ম্মণীর আদর্শ বা লক্ষ্য, তাহাই জয়-পরাজয়ের ধূমরাশি বিদীর্ণ করিয়া আজ রক্তরাগে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই বিশ্ব-সাম্রাজ্যের স্বপ্ন লইয়াই ভূতপূর্ব্ব জর্ম্মণসম্রাট্ কৈজার রাজমুকুট বলি দিয়াছেন—এই বিশ্ব-জয়ের অতৃপ্ত ক্ষুধাই জর্ম্মণীর বর্ত্তমান মুকুটহীন ডিক্টেটর হিটলারকে উদ্বুদ্ধ ও প্রমত্ত করিয়াছে। ইহারই জন্য অতিমানুষের অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছিলেন উন্মাদ দার্শনিক নীট্‌সে—তাঁহার দুরন্ত বাণীর ইন্ধন দিয়া। এই মহাকালীর একনিষ্ঠ উপাসনায় বরদৃপ্ত হিটলারের নবীন জর্ম্মণী আজ দুর্দ্ধর্ষ তেজে অনুপ্রাণিত ও বৈদ্যুতিক গতিবেগে চালিত হইয়া আসমুদ্র ইউরোপ দলিত, মথিত, লুণ্ঠিত ও সমগ্র জগৎ সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে। জর্ম্মণীর আদর্শই অক্ষশক্তির আদর্শ—উহার ধ্যানে বিশ্বসাম্রাজ্যের স্বপ্ন, উহার মূলমন্ত্র—নিউ-অর্ডার—শক্তিমানের নব-বিধান।

এই আদর্শদ্বয়ের সংগ্রামের সহিত আমরা কথঞ্চিৎ পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলাম। বৃটন প্রমুখ মিত্রপক্ষের গণতন্ত্র আদর্শ এবং জর্ম্মণ-নিয়ন্ত্রিত অক্ষ-পক্ষের নবতন্ত্র আদর্শ—উভয়ই স্পষ্ট, উভয়ই পরিচিত। এই উভয় শক্তিব্যূহের জীবননীতি ও রাষ্ট্রনীতি আবার পরস্পর বিরোধীও বটে। সাম্রাজ্যবাদী উভয়ই—সাম্রাজ্যবাদ বাহিরের কাঠাম। এই সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূলে যে আদর্শ, তাহাই উভয়ের মতি ও গতি আজ উভয়তঃ বিরুদ্ধ ও পরস্পরঘাতী করিয়া তুলিয়াছে। এই সন্ধিক্ষণে মহারুষের আবির্ভাব—নবীন আদর্শ ও অভিনব জীবনতন্ত্র লইয়া। রুষ এখনই মহাহবে প্রবিষ্ট হইতে চাহে নাই—দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পরস্পর হানাহানি করিয়া নির্জ্জীব, ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া পড়িলে, তখনই সোভিয়েট রুষিয়ার নব স্বপ্নপ্রচারের সুসময় আসিত। এই কল্পনা ও গণনা লইয়াই রুষ আত্মশক্তি-বর্দ্ধনে সমাহিত ছিল। কিন্তু হিটলার যে দুর্ব্বার অশ্বমেধের ঘোড়া ছুটাইয়া দিল, তাহা না ধরিলে নাৎসিবাদই ইউরোপের সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়। রুষ প্রাণ ও স্বপ্ন, উভয়েরই দায়ে আজ এই ঘোড়া ধরিয়া লড়াই করিতেছে। ঘটনার জটিল বিধিচক্রই তাহাকে আজ গণশক্তির সমপক্ষে ও প্রধান অক্ষশক্তির প্রতিকূলে স্থাপন করিয়াছে।

ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, এই পক্ষ-গ্রহণ কিন্তু স্বাভাবিকই হইয়াছে। যতই হউক ইঙ্গ-মার্কিণ ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যের মূলে যে গণতন্ত্রের আদর্শপূজা আংশিক মর্ম্মরক্ষা করিতেছে, তাহার সহিত মহারুষের শ্রেণীহীন সমাজ ও সঙ্ঘতন্ত্রের একটা দূরগত সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধ খুব দূরবর্ত্তী হইলেও, তত্রাপি সগোত্রীয়। নাৎসিবাদের সহিত তাহার সখ্য-বন্ধনই বরং ছিল অসবর্ণ, সম্পূর্ণ বিষমগোত্রীয়। সে বন্ধন হিটলারই টুটাইয়াছেন। গণতন্ত্র আজ সঙ্ঘতন্ত্রের কর-পীড়ণ করিতেছে। ইহা বিধাতার নির্ব্বন্ধ ছাড়া আর কি বলিব! শক্তির সন্নিবেশ স্ব-স্ব অন্তর্নিহিত ধর্ম্মেরই নির্দ্দেশে অবধারিত ক্রমেই ঘটিয়া গিয়াছে।

ভারত আজ কোন পক্ষে সহায়তা করিবে, এই প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন। যুগশক্তির রঙ্গমঞ্চে ভারত আজ অন্তরে উদাসীন। তাহার জীবন-দান কিন্তু মিত্রপক্ষেই বাধ্য হইয়া চালিত হইতেছে। এ দান-রোধের ক্ষমতা তাহার নাই। বিধাতার অভিপ্রায় কি, তাহা এখনও বুঝা যায় না। তাঁহার ইচ্ছা হইলে, ইংরাজের সাধ্য নাই যে, যুগসাধনায় ভারতকে তাহার যথানির্দ্দিষ্ট স্থানাধিকারে বাধা দিতে পারে। বিধাতার অব্যর্থ বিধানে আবিসিনিয়া ইংরাজেরই সহায়তায় স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিল। স্ব-স্ব 'ইজমের' জন্য তিনটী মহাশক্তি আজ রণাঙ্গনে শক্তিপরীক্ষায় সন্নিবদ্ধ। একদিকে ধনতান্ত্রিক গণশক্তিবাদ ও শ্রেণীহীন নিরীশ্বর সঙ্ঘতন্ত্র, অন্যদিকে এক-নায়ক বা এক-জাতিক

কর্তৃতন্ত্র তথা জর্ম্মণীর অদম্য বিশ্বজয়পিপাসা। ভারতে এই সকল খণ্ড আদর্শই তাহার দীর্ঘ ইতিহাসে সুপরীক্ষিত হইয়া গিয়াছে। ধনতন্ত্রের মূল রসায়ণ—ভারতেই। সুদূর অতীতে অত্যাচারী বেণরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তৎপুত্র পৃথুর রাজ্যাভিষেক হইতে বাংলায় গোপালদেবের মহারাষ্ট্রমণ্ডলের অধিনায়করূপে নির্ব্বাচন-যুগ পর্য্যন্ত গণশক্তির জাগরণ ও তাহার রাষ্ট্রীয় পরীক্ষার উজ্জ্বল ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তও আমরা প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করিতে পারি। নিরীশ্বর সঙ্ঘতন্ত্রের পরীক্ষাও এই ভারতেই ধর্ম্মক্ষেত্রে একবার হইয়া গিয়াছে—কিন্তু সে পরীক্ষা আমরা জানি—ঈশ্বর ও বেদে অপ্রতিষ্ঠ বলিয়াই ভারতের জাতীয় প্রতিভা স্বীকার করে নাই ও শেষে তাহা ভারত হইতে সাড়ম্বরে পরিণামে নির্ব্বাসিতই হইয়াছিল। আর আপস্তম্বের রাষ্ট্র-সূত্র—"রাজা সার্ব্বভৌমঃ অশ্বমেধেন যজেত নাপ্যসার্ব্বভৌমঃ"—ইহাতে এই কথাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ভারতই বিশ্বসাম্রাজ্যের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সত্যতীর্থ, অন্যত্র যুগে যুগে তাহারই ব্যর্থ অনুকরণ মাত্র হইয়াছে।

আদর্শের জন্য আজ প্রত্যেক বীরজাতিই রক্ত দিতে প্রস্তুত। শোণিতের মূল্যেই 'ইজমে'র জয় দিতে তাহারা অগ্রসর। শক্তিই আদর্শ রচনা করে—জাতির অন্তর্নিহিত প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া। আজ যুগ-সমস্যায় ভারতবর্ষ ঈশ্বর-তন্ত্রের মহাদর্শ বুকে লইয়াই স্থির, ধীর, অব্যাকুল চিত্তে যোগাসনে সমাহিত। এই ঈশ্বর-তন্ত্রেই সর্ব্বতন্ত্রের শুধু সমন্বয় নহে, প্রকৃত মুক্তি। ভারতই এই চতুর্যুগে ভগবানের চিহ্নিত যুগপীঠ—মহামানবের মুক্তিতীর্থ। ভারতের প্রেরণা—কোনও খণ্ড মানববুদ্ধিকল্পিত পৌরুষেয় আদর্শবাদ নহে, অপৌরুষেয় বেদাদর্শ—ঈশ্বরতন্ত্র, দিব্য-জীবন, দিব্যজাতি ও ধর্ম্ম-সাম্রাজ্যের সুপ্রতিষ্ঠা। এই লক্ষ্যসাধনে যাহা প্রকৃত সহায়ক হইবে, তাহাই ভারতের অন্তঃপ্রকৃতি সুনির্ব্বাচন করিবে—শক্তি স্বয়ং সেই লক্ষ্যে সহায়তা করিবে। যুধ্যমান বীরজাতিদের আজিকার জয়-পরাজয় আপাত ঘটনা মাত্র—শেষ জয়ী সেই হইবে, যে ভারতের কিছু পরিমাণ করুণালাভে ধন্য হইবে। আমরা এই শক্তিসাধনার স্বতঃ-সন্নিবেশ শুদ্ধ-চিত্তে পরিদর্শন ও অনুধাবন করিয়া চলিব, আর জয়-কামনা করিব সেই পক্ষেরই, আপাততঃ যত বাধা ভিতরে ও বাহিরে থাকুক, সকল অন্তরায় অতিক্রম করিয়া বিধাতার অব্যর্থ বিধানে যে ভারতের সমুচ্চ বিশ্বকল্যাণ-ব্রতেরই যন্ত্রস্বরূপ প্রকৃত ও বস্তুতন্ত্র সহায়তা করিবে।

হিন্দু শাস্ত্রে হিংসা ও অহিংসা

বারাণসীধামে পরম শাস্ত্রবিশ্বাসী ও নিষ্ঠাবান্ হিন্দু, বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ মালব্যজী মহাশয় মহাত্মাজীর অহিংসা-মন্ত্র সম্বন্ধে সম্প্রতি যে সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমাদের বহু-কথিত কথারই সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়াছে। শ্রদ্ধেয় মালব্যজী বলিয়াছেন—"মহাত্মাজীর সহিত আমার নিবিড় অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব সত্ত্বেও, আমি তাঁহার অহিংস মত সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতে পারি না—এই মত সম্পূর্ণ হিন্দুশাস্ত্রসম্মত নহে—মনু মহারাজ ও বেদব্যাস ইহার সমর্থন করেন না।" আমরা এই কথা কত দূর সত্য, তাহা হিন্দুশাস্ত্রের আলোকেই একবার বিচার করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিব।

মহাত্মাজীর অহিংসা প্রেরণা রুষ-মনীষী টলষ্টয়ের নিকট হইতে প্রত্যক্ষ-লব্ধ, ইহা আপাত সত্য হইলেও, অহিংসার বাণী ভারতেরই বাণী, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ। ভারতের সাধন-জগতে অহিংসার বিশেষ অনুশীলন গৌতম বুদ্ধেরও বহু পূর্ব্বে সূচিত হইয়াছে। আদি মনুর ৪র্থ পুরুষ সম্রাট্ ঋষভ প্রথম যখন বেদের কর্ম্মকাণ্ডে বিরোধ করিয়া জৈন মতের প্রবর্ত্তন করেন, তখন হইতেই অহিংসাবাদ ভারতের ধর্ম্মসাধনায় অধিক প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। ইহা লইয়া ভারতে ঘোর রাষ্ট্রবিপ্লবও হইয়াছে। কিন্তু পরিণামে বেদসম্মত নীতিই এখানে জয়ী হইয়াছে। এ সকল কথার বিস্তৃত আলোচনার ইহা ক্ষেত্র নহে।

ঋষি পতঞ্জলি তাঁহার বিখ্যাত যোগদর্শনে অহিংসাকে সার্ব্বভৌম মহাব্রতের অন্তর্গত অন্যতম ব্রত বা যমাঙ্গ-রূপে স্থান দিয়াছেন; অষ্টাঙ্গযোগের ইহা একটি ক্ষুদ্র প্রত্যঙ্গ মাত্র। "অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ"—

এই ফলশ্রুতি পতঞ্জলিরই উপলব্ধি-লব্ধ সঙ্কেত। অহিংসা-সাধনে যে সিদ্ধি লাভ করে, তাহার সমীপে আর বৈর-ভাব কাহারও থাকে না।

স্পষ্টই বুঝা যায়, এই কারণে অহিংসা ভারতের বেদ-বিধানে রাষ্ট্র ও সমাজক্ষেত্রে অনুমোদিত হয় নাই। ইহা যোগিজনের সাধনীয়। ভারতের ব্রাহ্মণ—যুগপৎ জাত-ব্রাহ্মণ ও গুণ-ব্রাহ্মণ—অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিলেও, অস্ত্রধারণ স্বয়ং করিতেন না। কিন্তু ব্রহ্মবীর্য্য প্রয়োজন হইলেই সশস্ত্র ক্ষাত্রশক্তির সৃষ্টি করিয়া লইত। ইহার উদাহরণ ভারতের পুরাণে ও মহাভারতে আছে। ঋষি বশিষ্ঠ পারদ-পহ্লব অসংখ্য সশস্ত্র সেনা-বাহিনী গঠন করিয়া সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বৈর-নিগ্রহ করিয়াছিলেন। জাত-ব্রাহ্মণ কিন্তু গুণ-ক্ষত্রিয় ভার্গব পরশুরাম ও দ্রোণ বা কৃপাচার্য্য স্বয়ং অস্ত্রবিদ্যার অনুশীলন ও পরিচালনাও করিতেন। এ সকল সংবাদ সর্ব্বত্র সুবিদিত।

মানবসমাজের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান সংগঠক মহারাজ মনু তাঁহার মানবধর্ম্মশাস্ত্রে চাতুর্ব্বর্ণ্যের গুণ ও কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিষ্ণুসংহিতায়ও দেখা যায়—"বৃত্ত্যুপক্রমে'ক্ষত্রিয়াণাং ক্ষিতিত্রাণমিতি' বিষ্ণুণোক্তত্বাৎ দ্বিজাতিধর্ম্মোপক্রমে ক্ষত্রিয়স্য শস্ত্রনিত্যতেতি তেনৈ-বোক্তত্বাচ্চ।" ক্ষত্রিয়কে বৃত্তি হিসাবেই ক্ষিতিত্রাণ-ব্রত গ্রহণ করিয়া নিত্য শস্ত্রধারণ করার বিধান অনুসরণ করিতে হয়। ইহা তাহার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার ও কর্ত্তব্য। ক্ষত্রিয় এই অধিকার ও কর্ত্তব্যপালনে বিমুখ হইলে বা উপেক্ষা করিলে, সমাজ ও রাষ্ট্রে ধর্ম্ম-বিপর্য্যয়েরই হেতু হয়।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে রাজধর্ম্মপ্রকরণে "চৌর-পারদারিক-মদ্যপাদি-নিগ্রহরূপ-দুষ্ট-দমনং--শিষ্ট-পালনং"—রাজার বিশেষ কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত হইয়াছে; এবং তাহার অন্যতম অঙ্গস্বরূপ "ন্যায্যদণ্ডত্বম্" উক্ত হইয়াছে। সুশাসনের জন্যই এই বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই দুষ্ট-দমন ও ন্যায্য দণ্ডদান যে অহিংস ভাবেই সর্ব্বত্র ও সর্ব্বথা সিদ্ধ হইবেই, এমন কোন বিধি-নির্দ্দেশের উল্লেখ কুত্রাপি দেখা যায় না।

বেদব্যাস স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রেরই মতোদ্ধার গীতায় করিয়াছেন। গীতায় পার্থ শ্রীকৃষ্ণের নিকট যে পরম যোগ লাভ করিয়াছেন, তাহাতে অহিংসার নির্দ্দেশ কোথায়? পার্থ নিজে কৃপাপরবশ অহিংস হইতে চাহিলে, বরং শ্রীকৃষ্ণ গুরুস্বরূপ তাঁহাকে তীব্র তিরস্কার করিয়া নির্ম্মম ও নিরহঙ্কার চিত্তে, যোগস্থ হইয়াই অতি দারুণ হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হইতে আদেশ করিয়াছিলেন। পরে বিশ্বরূপ-প্রদর্শন-চ্ছলে তিনি দেখাইয়াছেন—এ হত্যা প্রকৃতভাবে অর্জ্জুন বা কোনও মানব-কৃত নহে, স্বয়ং শ্রীশ্রীভগবানই কাল-স্বরূপ লোক-সংহার করিয়া রাখিয়াছেন—"ময়ৈব তে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব"—অতএব অর্জ্জুনের নিমিত্ত মাত্র হওয়া ছাড়া আর উপায়ই থাকে নাই। এই বিরাট্ সংহার-যজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মরাজ্যপ্রতিষ্ঠারই অপরিহার্য্য অঙ্গীভূত হইয়াছিল।

শ্রুতি স্বয়ং অধিকারভেদে "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" "অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেতে" ইত্যাদি বলিয়া নিবৃত্তি-মার্গাবলম্বী মুমুক্ষুদিগের জন্য হিংসা সামান্য বর্জ্জন ও বৈধ হিংসাতিরিক্ত হিংসারই নিষেধ করিয়াছেন। এই বৈধ হিংসা ত্রিবিধ কথিত হইয়াছে—"পারলৌকিক দুঃখবিশেষানুৎপাদ্য সুখাদ্যতরসাধনাত্মধর্ম্মরূপা, বৃত্তিরূপা আততায়ি-নিগ্রহরূপা।" আততায়ীর নিগ্রহ-বিধান—ইহা ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্ত্তব্য তো বটেই—'ক্ষত্রিয়াণাং ধর্ম্ম্যযুদ্ধে রিপুহননম্'; কিন্তু মহাভারত ইহাও বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মবীর্য্য মৃদু এবং ক্ষত্রিয় বীর্য্য দুর্ব্বল হইলে, অধর্ম্ম-নিবারণার্থ সর্ব্ব বর্ণই অস্ত্র ধারণ করিবে—গো, ব্রাহ্মণ, রমণী ও শিশু এবং শরণাগত জনমাত্রকেই রক্ষা করিবে।

আততায়ি-নিগ্রহও আমাদের শাস্ত্রে চারি প্রকার কথিত হইয়াছে—স্বধর্ম্মরক্ষার্থ, স্বপ্রাণ-রক্ষার্থ, স্বদ্রব্য-রক্ষার্থ এবং স্ব-যশের রক্ষার্থ। ধর্ম্মাপহরণ, প্রাণাপহরণ, দারাপহরণ এবং খলতার দ্বারা বৃত্তিহরণে উদ্যত ব্যক্তিগণই আততায়ী। যেরূপেই হউক, তাহাদের নিগ্রহ করিয়া আত্মধর্ম্মাদি রক্ষা করা বিধেয়। মনু স্পষ্টই বলেন—"নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন"—আততায়ি-হননে হন্তাকে হিংসাদোষ স্পর্শ করে না।

হিন্দুর এই ধর্ম্মবিধান—লোক-রক্ষা, সমাজ-ধর্ম্ম-রাষ্ট্র-রক্ষারই জন্য। অহিংসার সাধন ও সিদ্ধি হিন্দু ধর্ম্মে ও

সমাজে অতি উচ্চ; কিন্তু তাহা বিশিষ্ট শ্রেণীরই জন্য। যাঁহারা নিবৃত্তিধর্ম্মাবলম্বী যোগী, তাঁহারাই অহিংসা জীবন-ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিবেন। তাঁহাদের ত্রিসংসারে বৈর-বৃদ্ধি কোথাও নাই—বৈর-জয়ের জন্য রাষ্ট্র ও সমাজে লৌকিক প্রযত্নও করিতে নাই। চাতুর্ব্বর্ণ্যশাসিত হিন্দু সমাজ তাই হিংসা-অহিংসার বিধান শ্রুতি-স্মৃতি হইতেই গ্রহণ করেন। মালব্যজী হিন্দুর শাস্ত্র-নীতির কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। আমরাও দেখিতেছি—হিন্দুর শ্রুতি-স্মৃতি-সংহিতা মালব্যজীরই কথার সমর্থন করে, মহাত্মাজীর কথার নহে। মহাত্মা স্বয়ং কর্ম্মযোগী। তাঁহার যোগ-ধর্ম্মের অনুশাসন বেদ-স্মৃতি-সংহিতা-পুরাণ-শাসিত, মনু-বেদব্যাস-ব্যাখ্যাত, শ্রীকৃষ্ণ-প্রচারিত ও তাঁহারই দৃষ্টান্তানুপ্রাণিত বিরাট, সনাতন, অনাদ্যনন্তকাল-স্থায়ী হিন্দু সমাজ রাষ্ট্র ও সমাজ-রক্ষায় কেমন করিয়া নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিতে পারে, তাহা আমরা দেখিতে পাইতেছি না।

নারীর বৃত্তিশিক্ষা

এদেশে নারীর শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত, এ সম্বন্ধে নানা মনীষী নানা প্রকার আলোচনা ও মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায়, পুরুষের শিক্ষার ন্যায় নারীর শিক্ষাও বৃত্তিমূলক হওয়া আবশ্যক, এই কথাও অনেকের মনে জাগিয়াছে এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এই দিক্‌ দিয়া ব্যবস্থা করার জন্য যত্নশীল হইয়াছেন ও হইতেছেন। আমাদের দুর্দ্দশা এমনই হইয়াছে যে, পুরুষেরা নারীজাতির যথাযোগ্য ভরণপোষণে দিন দিন অক্ষম হইয়া পড়িতেছেন। তাহা ছাড়া, অনেক গৃহস্থ-সংসারে, উপার্জ্জনক্ষম একজন পুরুষের স্কন্ধে বিপুল পরিবারের প্রতিপালনভার ন্যস্ত থাকায়, সেই স্বল্প আয়ের সংসারে কতকটুকু সহায়তা করার জন্যও নারীকে উপায়ের পথ অন্বেষণ করিতে হয়। এই সঙ্গে দুশ্চরিত্র স্বামীর বা অন্যবিধ নির্য্যাতনে উৎপীড়িতা লাঞ্ছিতা রমণীর অথবা পতিহারা অসহায়া বিধবাদের কথাও ভাবিতে হয়। এই সব ক্ষেত্রেই নারীর আত্মরক্ষা ও পারিবারিক সমস্যার দিক্‌ দিয়া চিন্তা করিলে, নারী-জাতিকে আত্মনির্ভরশীল করার কথা স্বতঃই মনে উঠে এবং ইহার জন্য তাহাদের বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও উপার্জ্জনের পথ সম্বন্ধে ভাবনাও অত্যন্ত স্বাভাবিক। আমরা এই বিষয়ে দুই একটা ভাবনার কথাই তুলিতেছি।

কিছু দিন পূর্ব্বেও বাংলার পল্লী-সংসারে, কুলললনাগণ সংসারের কাজ সারিয়া ঘুন্‌সির, জরীর কাজ, সুপারি কুচান, ধান ভানা প্রভৃতি ছোট বড় শ্রমশিল্পে কিছু কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিত। সর্ব্বত্র না হইলেও, অন্ততঃ পল্লীর তন্তুবায়গৃহে চরকার প্রচলন ছিল। আলিপনা, পটের ছবি আঁকা, কড়ির ধামা, ঝিনুকের বা মাছের আঁশের ফুল, নারিকেল-কুঁচির খেল্‌না—এসব প্রত্যক্ষ অর্থকরী না হইলেও, সুকুমার কারুশিল্পরূপেও গ্রাম্য মহিলাদের অনুশীলনের বস্তু ছিল। ইহার পর আসিল উল বা পশম লইয়া ক্রুশকাটির বুনন, সেলাই ও কাটাই, চামড়ার কাজ—কতক কারুকলা, কতক অর্থকরীরূপে। অধুনা বহু বালিকাবিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে এই সকল কারু-শিক্ষাও দেওয়া হইয়া থাকে। নারীদের বৃত্তিমূলক শিক্ষা আজ এই ভাবেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহ কেহ আরও অগ্রসর হইয়া মেয়েদের বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানরচনাও করিয়াছেন।

পুরুষের ন্যায় নারীর আত্মমর্য্যাদা রক্ষাপূর্ব্বক স্বাধীন বৃত্তিমূলক শিক্ষাগ্রহণের অধিকার আছে কিনা, সে প্রশ্ন আমাদের নয়। যুগ-প্রয়োজনই সে প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং দিবে। আমাদের উহার জন্য মাথা-ব্যথার প্রয়োজন নাই। আমাদের কথা, শিক্ষা সকলেরই অন্তরের ধর্ম্ম, পুরুষের ন্যায় নারীরও হৃদয়-মন মার্জ্জিত, সুশিক্ষিত হওয়ার প্রয়োজন, ইহা যেমন সকলেই স্বীকার করিবেন, তেমনি এই অন্তরোন্নতির সঙ্গে যদি বাহিরের প্রয়োজনের দিক্‌ দিয়াও নারীজাতি অনেকখানি আত্মনির্ভরশীলা হইয়া উঠিতে পারে, তাহাতে কাহার কি বলিবার বা আপত্তি করার থাকিতে পারে?

একটা কথা কিন্তু এইখানে ভুলিলে চলিবে না। তাহা এই যে, নারীর স্বচ্ছ, সুন্দর ও পরিপূর্ণ জীবন-প্রকাশ

তাহাদের ভিতরের মূল সুরটী বিকৃত করিয়া কখনও সম্ভব নহে। নারী শুধু সমাজের অর্দ্ধাঙ্গ নয়, জাতির প্রাণশক্তি-রূপিণী। এই প্রাণশক্তি যাহাতে অভাবের নিষ্পেষণে, অত্যন্ত বহির্ম্মুখী আকর্ষণে, একান্ত বিহ্বলা হইয়া আত্ম-কেন্দ্র হইতে বিচ্যুতা ও স্বধর্ম্মভ্রষ্টা না হয়, সেই দিকে সতর্কতা বাঞ্ছনীয়। নারীর স্বাধীন বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা হউক, কিন্তু সে ব্যবস্থা নারীর আত্মক্ষেত্র যে অন্তঃপুর, তাহার মূল ধর্ম্মটী বজায় রাখিয়া—অর্থাৎ অন্তঃপুরের এবং নারীধর্ম্মেরই উপযোগী করিয়া। নারীজাতি পুরুষের প্রতিপক্ষ ও প্রতিযোগিনী হইবে, এই ভাব ও আদর্শ লইয়া যেন আমরা কি শিক্ষা, কি সমাজ-রাষ্ট্র-সেবা, কি অর্থ-ক্ষেত্র, কোথাও নারীকে পুরুষের পার্শ্বে টানিয়া না আনি—উভয়ের মধ্যে যে নৈসর্গিক ধর্ম্মভেদ ও কর্ম্মভেদ, একটা অবিমৃষ্য অত্যুদার সাম্যবাদপুষ্ট প্রেরণা বা আয়োজনের দায়ে তাহাকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া আমরা যেন সমস্ত একাকার করিয়া না তুলি।

আমাদের মনে আছে, বহু বর্ষ পূর্ব্বে স্যার আশুতোষ চৌধুরী কোনও স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক আলোচনা-সভায় বলিয়া-ছিলেন—'এদেশের মেয়েদের শিক্ষা বাংলাভাষায় ও বাংলা ধরণেই হওয়া উচিত, যাহাতে তাহারা বৈদেশিক আদর্শে মর্ম্মহারা হইয়া এক একটা মেম-সাহেব বনিয়া না উঠে।' আজিকার দিনেও শুধু সাধারণ শিক্ষা নয়, বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রেও স্যার আশুতোষের সেই সতর্ক-বাণী বিশেষভাবে স্মরণীয় ও চিন্তনীয়। বাংলাদেশের মেয়েরা আধা দেশী, আধা ইংরাজ এংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েদের মত সওদাগরী বা রেল ওয়ে অফিসের কেরাণী অথবা ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর এজেণ্ট হইতে দলে দলে ছুটিবে, বৃত্তিশিক্ষার নামে এমন একটা উদ্ভট কল্পনাও যদি কাহারও থাকে, তাহার সহিত অধিকাংশ অভিভাবকগণই যে একমত হইবেন না, তাহা আমরা জানি ; কিন্তু আমরা শুধু এইটুকু সতর্কতার কথাই বলিতেছি না। বাংলার নারী-জীবন রক্তের বিশুদ্ধ মহিমা, তাহার স্মৃতি-সংস্কার-আদর্শ সম্পূর্ণ অবিকৃত রাখিয়া কেমন করিয়া সতর্ক পদক্ষেপে যুগ-সমস্যারও পূরণ করিতে পারে, সেই কথাই আমরা ভাবিতেছি—দেশকেও গভীর চিত্তে ভাবিতে বলিতেছি।

নারীর স্বরাজ্য জাতির অন্তঃপুর, এইখানেই সে যখন মহীয়সী, সম্রাজ্ঞীস্বরূপিণী। হিটলার যেদিন জার্ম্মাণীর নারী-প্রগতির মোড় ফিরাইয়া "Kirche. (church) kinder (children) ও kuches (kitchen)" অর্থাৎ ধর্ম্ম-মন্দির, সন্তান-পালন ও অন্নক্ষেত্র, এই ত্রিক্ষেত্রেই আবার তাহাদের গতি নির্দ্দেশ করিলেন, বীর নেতার সে বজ্র-সঙ্কেতের অঙ্গুলীহেলন নবীন জর্ম্মণী সম্ভবতঃ অবহেলা করিতে পারে নাই। আমরা ভারতীয় যুগ-প্রগতির স্রোতঃ এইভাবে গৃহমুখী করার স্পর্দ্ধা রাখি না, এখনই তাহা সম্ভবও মনে করি না। যুগচরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার মাত্রা ইউরোপের ন্যায় এখানে এখনও সেই তীব্রতম পরিণতি পায় নাই। কিন্তু জাপানের ন্যায়, বর্ত্তমানের সকল প্রয়োজন-বেগই আমরা জাতীয় বৈশিষ্ট্যের সহিত সঙ্গত ও শ্রেয়োবুদ্ধির অনুগত করিয়াও ত চরিতার্থ করিতে পারি।

নারীর শিক্ষা আমরা চিরদিন গৃহ-সংসারের মধ্যেই করিয়া আসিয়াছি। অতীত যুগের ন্যায় এই সেদিন পর্য্যন্তও ঘরে বসিয়াই বেদ, পুরাণ, কাব্য প্রভৃতি সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যে উচ্চ শিক্ষা পাইয়া বাংলার বহু কুল-মহিলা সাধারণ গৃহসংসারই আলোকিত করিয়া তুলিতেন। যুগ প্রবাহে স্কুল-কলেজ আসিয়াছে, বৃত্তিশিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে। এই সকল স্বীকার করিয়াও আমরা জাতীয় ধর্ম্মে ও চরিত্রে আস্থাপরায়ণ নারী-পুরুষদের প্রগতির মূলগত ভিত্তিরক্ষায় অবহিত হইতে অনুরোধ করিব।

এই ভিত্তি হইতেছে—চরিত্র। নারীর স্বাধীন জীবন-বৃত্তির যদি প্রয়োজন হয়, সে এই চরিত্রের জন্যই—অসহায় অবস্থায়ও সসম্মানে, সমর্য্যাদায় আত্মরক্ষাপূর্ব্বক জীবন-যাপনের জন্য। বাংলার সমাজে, গৃহস্থ-সংসারেও, পুরুষের শিক্ষা-বিভ্রাটের সঙ্কটে আজ এই দিকে দৃষ্টি কতখানি শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, তাহা অভিজ্ঞের অবিদিত নাই। সমাজ যেখানে পচিয়াছে, সেখানে প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন এই পূতিগন্ধদুষ্ট আবহাওয়া কথঞ্চিৎ পরিশোধন করিয়া, একটা বিশুদ্ধতর অবস্থা ও ব্যবস্থায় অন্ততঃ দেশের মহা-প্রাণরূপা এই নারী-শক্তিকে অন্তরে ও বাহিরে সংগঠিত ও প্রস্তুত করিয়া তোলার জন্য। পবিত্রতার হোমানল জ্বালিয়াই নারীর সাধারণ শিক্ষার বেদী রচনা করিতে হইবে, এই পবিত্রতার অনল-শিখা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই তাহার বৃত্তিশিক্ষারও সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে। তাহার কি পন্থা, তৎসম্বন্ধে বারান্তরে বিশদ আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল।

২৬

শ্রীঅরবিন্দ নিজের কথা নিঃসঙ্কোচে ব্যক্ত করিতেন। অরুণও তাহা সবই লিখিয়া পাঠাইত। সেই ১৯২১ খৃষ্টাব্দেই শ্রীঅরবিন্দ তাঁর ইন্দ্রিয়গুলির রূপান্তর প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন—চক্ষু পূর্ব্বের ন্যায় বিষয় প্রত্যক্ষ করে না। একটা অখণ্ডের অসংখ্য রূপ, গুণ ও ক্রিয়া তাঁহার নয়নে প্রতিভাত হয়। কর্ণ যে শব্দই শ্রবণ করুক, তাহার মধ্যে শব্দের সাকল্যের সুর কর্ণে প্রতিধ্বনি তুলে (totality of sound)। শব্দ-স্পর্শাদির মধ্যে এই সাকল্য, এই অখণ্ডত্ব ও পূর্ণত্ব যখন ইন্দ্রিয়ে ধরা পড়ে, তখন একটা গোলাপ ফুলেরও রূপ ও সৌরভ শুধু নয়, ইহার প্রতি দলে অনন্তের যে গুণ, যে উজ্জ্বল চেতনা ও উল্লাস, তাহারই উপর ভোগাধিকার জন্মে। শ্রীঅরবিন্দ সোল্লাসে বলিতেন "ইহাই ভাগবত ভোগ। প্রত্যেক কর্ম্মের মধ্যে অনন্তের সবখানি শক্তি, চৈতন্য ও আনন্দ প্রবাহিত আছে। এই দৃষ্টি লইয়াই যে কর্ম্ম, তাহাই আসল নিছক ভাগবত কর্ম্ম।"

শ্রীমান্ অরুণচন্দ্রের পত্রের ছত্রে ছত্রে শ্রীঅরবিন্দের উপদেশ-বাণী চন্দননগরে আসিয়া পৌঁছিত; আর আমি উহা লইয়া সকলকে পরিবেশন করিয়া দিতাম। মুগ্ধ-চিত্ত হইয়া কত সময় যে এই ভাবে অতিবাহিত হইত, তাহার নিরাকরণ থাকিত না; কিন্তু আমাদের এই রস-বোধের বড় বাধা ছিল দৈনন্দিন কঠোর কর্ম্ম। আর এই কর্ম্মের দায়িত্ব পরিশেষে যাঁহার উপর গিয়া ন্যস্ত হইত, তিনি নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের এই অধ্যাত্মস্বপ্নলোকের মহাভাব ভঙ্গ করিয়া দিতেন। একটা দৃষ্টান্ত এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—স্বতঃপ্রবাহিত কর্ম্মস্রোতে আমায় ভাসিতে হইয়াছিল। কর্ম্মের পশ্চাতে কোন সুচিন্তিত ছক অন্তরজগতে দানা বাঁধিয়া উঠে নাই। প্রেরণার অজস্র বর্ষণের মধ্যে যে প্রবল স্রোতের সৃষ্টি হইত, সেই স্রোতে গা ভাসান দিয়া চলা ছাড়া আমার আর গত্যন্তর ছিল না। বিচিত্র এই—আমার জীবন-প্রবাহে নিজের দাবীর অপেক্ষা পারিপার্শ্বিক জীবনের স্রোতোবেগে আমি ফুলিয়া ফুলিয়া মহাপ্লাবন সৃষ্টি করিতে বাধ্য হইতাম। সর্ব্বাপেক্ষা বড় দাবী ছিল শ্রীঅরবিন্দের। সে বিশাল দাবী পূরণ করার যোগ্যতা আমার ছিল না; তাঁর যে কত বৃহত্তর দাবী, সে বিচার-শক্তি আমলেই আনিতাম না। তিনি ওজন করিয়া যে দাবীটুকু আমার ঘাড়ে চাপাইতেন, তাহার বহনসামর্থ্য আমার আছে, ইহা বুঝিলেই আত্মশক্তি উছলিয়া উঠিত। আমার সাধ্যের পরিমাপ ছিল না, সাধ্যাতীত কর্ম্মে অগ্রসর হওয়াই ছিল আমার স্বভাব। ইহাই আমার সত্য, আমার স্ব-ধর্ম্ম। শ্রীঅরবিন্দের উচ্চ গ্রামের সাধনতত্ত্ব মর্ম্ম দিয়া অনুভব করিতাম, অমৃতেরও আস্বাদ পাইতাম; কিন্তু আমায় কর্ম্ম সিদ্ধ করিতে হইত প্রতি স্নায়ু-পেশী, প্রতি ধমনীর রক্তবিন্দুর সাহায্যে—কি অধ্যাত্মসাধনায়, কি বস্তুতন্ত্র জীবনযাপনের ক্ষেত্রে কোথাও এই নীতির ব্যত্যয় হয় নাই।

বিদ্যাপীঠ খুলিলাম, বিদ্যাপীঠের ভবনে যে সকল ছাত্র আসিল, প্রথম প্রথম তাহাদের অনেকেই নিজ নিজ বাড়ী হইতে খরচ পাইত। বিদ্যাপীঠে যেরূপ শিক্ষা-প্রবর্ত্তনের গৌরচন্দ্রিকা করা হইয়াছিল, অর্থহীন হওয়ায় তাহার দিক্ দিয়াও যাওয়া হইল না। বড় আশায় যে কয় জন অধ্যাপক জুটিয়াছিলেন, তাঁহারা পাগলের খেয়াল দেখিয়া একে একে বিদায় লইলেন, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। রহিলাম আমি, আর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিদায়ী জন ৫০ ছাত্র। প্রাতঃকাল হইতে শয়নকাল পর্য্যন্ত ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া মর্ম্ম চিরিয়া কথা আর অবকাশে ছুটাছুটী, দৌড়াদৌড়ি, জলে ঝাঁপ দিয়া সাঁতার কাটা—বিদ্যাঙ্গনের এই ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই রহিল না। এই অবস্থা দেখিয়া ছাত্রদের অভিভাবকেরা টাকা দেওয়া

বন্ধ করিলেন ; তাহাতে নব বিদ্যাপীঠ বন্ধ হইল না। এই সকল বিদ্যার্থীর শিক্ষার মধ্যে দুইটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে—একটী আমার মুখের বাণী, যাহা তাহাদের অন্তরকে নব নব আশায় ও সৃষ্টিপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ রাখিত ; আর একটী প্রতিদিনের জীবনযাপনের অসাধারণ তপস্যা, যাহা তাহাদের ভবিষ্যতে স্বাবলম্বনের সাধনায় সিদ্ধি দিয়াছিল।

আমার বাণী ছিল শ্রীঅরবিন্দেরই কণ্ঠনিঃসৃত বাণীর প্রতিধ্বনি—তাহাই দিত বিদ্যাপীঠের ছাত্রদের জাগ্রতে সমাধি। কিন্তু তাহাই যদি হইত বাস্তব জীবনের একমাত্র নির্ভরযোগ্য আশ্রয়, তাহা হইলে কি হইত বলিতে পারি না ; তবে সে জীবন বর্ত্তমান জীবনের তুলনায় বৃহত্তর বলিয়া আমার চিত্তে বিন্দুমাত্র দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে না।

আমরা বেদ, উপনিষদাদি ও রামপ্রসাদ, শ্রীচৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দের পরিবেশিত তত্ত্বালোচনায় ভাবজগতে প্রচুর রসসঞ্চয় করিতাম। কিন্তু যে ভূমি পদাগ্রে অধিকৃত হইয়াছে, সেই স্থান হইতে পুনরাবর্ত্তন করিতে না হয়, তাহার জন্য ছিল কঠোর বস্তুতন্ত্র জীবন-সংগ্রাম। ইহার জন্য সহায় ছিল উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে স্থির দৃষ্টি, প্রত্যুৎপন্নমতি, শরীরের স্বাস্থ্য, অন্তরের অধ্যবসায়, সর্ব্বাবস্থা বরণ করার মত তিতিক্ষা। যখন দেখিলাম—ছাত্রাবাস নাই, অধ্যাপনার গৃহ নাই, ছাত্রগণের অভিভাবকদের নিকট হইতে দৈনন্দিন খরচের টাকাও আসে না, তখনও আমরা কেহ নিরাশ হইলাম না। শ্রম ও অধ্যবসায় ছিল আমাদের অন্তরে উৎসাহ। আর নিজের মাথার উপর ঋণভার বাড়াইয়া সমস্ত প্রয়োজন মিটাইবার ব্যবস্থা করিলাম। সেদিন শতকরা ১২ টাকা সুদে এক টাকা করিয়া হাজার টাকার উপর ঋণ করিয়াছিলাম। উহা যে ঋণ এবং সুদ সহ পরিশোধনীয়, তাহা জানিতাম। তবুও বিদ্যাপীঠকে ব্যর্থ হইতে দিলাম না। যে কয়টী ব্যবসা চলিতেছিল, তাহার উপর অন্য দাবী করিয়া অর্থ শোষণ করিলাম না। অতি বড় দুর্দ্দিনে কি জানি কোন শক্তির প্রভাবে ছাত্রেরা অটল চিত্তে এই অভাবনীয় জীবনযাত্রার পথে দিনের পর দিন চলিতে লাগিল।

বাহিরে দুর্দ্দিনের প্রবল ঝটিকাবর্ত্তে অন্তরে শান্তির নির্ঝর রুদ্ধ হয় নাই ; তাহা না হইলে, এই সকল ছাত্রেরা কিসের আনন্দে শয়ন-ভোজনের অসংখ্য প্রকার দুরাবস্থার মধ্যে আমায় পরিত্যাগ করিল না! এমন দিন গিয়াছে, মৃৎপাত্রে ভোজন করিয়া, উহা পুনরায় ধৌত করিয়া, তাহারা দিনের পর দিন ভোজন সমাধা করিয়াছে।

তাহাদের চরম দুঃখের দিক্ তো আমার লক্ষ্যে ছিল না ; আমি ছিলাম নিষ্ঠুর সেনানায়কের ন্যায় মৃত্যু-সংগ্রামে সৈনিকদের আগাইয়া দিতেই পটু ও দক্ষ। জাতির ভবিষ্যৎ ইহার মধ্য দিয়াই পাইতে পারে শক্ত দেহ ও মন, এ পরিচয় আজ প্রত্যক্ষ। কিন্তু ইহাদের পশ্চাতে ছিল স্নেহশীতল নয়নের দৃষ্টি, নতুবা কেন মাঝে মাঝে দেখিতাম—দারিদ্র্যপীড়িত ইহাদের রন্ধনশালায় মাতৃশক্তির সমুজ্জ্বল আবির্ভাব? কেন দেখিতাম—এই দৈন্যকে আতিশয্যময় করিয়া ইহাদের ভোজনাগারে অন্নপূর্ণার করুণাস্পর্শ? কখনও দেখিতাম—সঙ্ঘজননীর আদেশে আশ্রমকন্যারা ইহাদের রন্ধনশালা পরিষ্কার করিয়া দিয়া আসিতেছে, কখনও বা রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে, কখনও বা দেখিতাম তিনি স্বয়ং তাঁর ছাত্র-সন্তানদের নিমন্ত্রণে তাঁর অধ্যাত্মতনয়াদের সহিত, পরিবেশনতৎপর সন্তানদের প্রাণে উৎসাহ সঞ্চার করিয়া ভোজনে উপবিষ্টা হইয়াছেন। তাঁর শুভাবির্ভাবে আমার হাতে নিপীড়িত দারিদ্র্যলাঞ্ছিত বিদ্যাপীঠ উচ্ছ্বসিত পুলকিত হইয়া উঠিত। এমন করিয়া দীর্ঘ দিন তিনি সন্তানদের দুঃখ-নিবারণের এই ব্যবস্থা দীর্ঘতর করিলেন না ; যে দিন শুনিলেন—বুভুক্ষু নবযুগপ্রবর্ত্তকেরা রন্ধনশালায় গিয়া প্রস্তুত অন্নপাত্রটী খুঁজিয়া পাইতেছে না, আর শুনিলেন সেই অন্নপাত্রটী লইয়া বনাকীর্ণ স্থানে শৃগালের দল ভোজনানন্দে তুমুল নিনাদে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতেছে, সেইদিন হইতেই তিনি বিদ্যাপীঠের রন্ধনশালার শ্রাদ্ধকর্ম্ম সমাপন করিয়া স্বগৃহে নিজ হস্তে সন্তানপালনের ভার গ্রহণ করিলেন। অব্যক্ত আনন্দে আমার বুক দুলিয়া উঠিল। আমি নিঃশব্দে দেখিলাম—বিজয়িনী অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি। এইখানেই জীবন-সঙ্গিনীর সহিত আমার পরিচয়ের দৃঢ় রেখা দৃঢ়তর হইল।

বিদ্যার্থিভবনের ছাত্র ও সঙ্গে সঙ্গে মৃণালিনী বস্ত্রবয়নের কর্ম্মে নিয়োজিত একদল তরুণ কর্ম্মী—এই সকলকে লইয়া

গৃহদেবী এক বৃহৎ সংসার পাতিয়া বসিলেন। শ্রমের সীমা রহিল না। নিত্য যজ্ঞশালায় অতিথি-সমাগম অধিক হইতে লাগিল। শান্তিনিকেতনের বিদেশী অতিথিগণ এই সময় হইতেই চন্দননগর ঘুরিয়া যাইতেন। বিশেষ করিয়া পরলোকগত মিষ্টার পিয়ার্সন ও মিষ্টার এমহার্ষ্ট বহু বার চন্দননগর আশ্রমে আসিয়া আমাদের সহিত বহু বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেন। এই সকল সম্মানার্হ অতিথিদের জন্ম আমার কোন চিন্তা ছিল না। সম্পূর্ণরূপে অন্তঃপুরচারিণী হইয়াও গৃহদেবীই এই সকল বিদেশী অতিথিগণের তত্ত্বাবধান করিতেন। কোথা হইতে কাঁটা, চামচ, ছুরি, ডিস্ সংগ্রহ করিতেন, তাহা তিনিই জানিতেন। তাঁহাদের যথাযোগ্য পানভোজনাদির সহিত বাসস্থানের ব্যবস্থাভারও তাঁর উপর ন্যস্ত হইত। আমি তাঁর অতিথিসৎকারে প্রীত হইয়া অন্তরে গর্ব্ব অনুভব করিতাম। মিঃ পিয়ার্সন প্রমুখ বিদেশী বন্ধুরাও আশ্রমের আতিথ্যে বিশেষ পরিতুষ্ট হইতেন। আমি আনন্দে বিহ্বল হইয়া পত্নীর হস্ত চুম্বন করিয়া বলিতাম—"সত্যই তুমি লক্ষ্মীর প্রতিমূর্ত্তি। আমার এই দরিদ্র সংসারে অতিথি-সৎকারের এমন রাজোচিত আয়োজন তোমারই মহিমা!"

তিনি কুণ্ঠিত হইয়া বলিতেন,"—সংসার করিতে আনিয়াছিলে, সে সংসার এমন মূর্ত্তি ধরিবে তাহা জানিতাম না!"

আমার পরিতৃপ্ত হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার বিনিময়ে তাঁর নয়নের কোলে কোলে অশ্রু জমিয়া উঠিত, সে ব্যথা দূর করার ছিল না। তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল—আমি যেন জানিতাম, তাঁহাকে ক্রমে ক্রমে এই বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রে আসিতে হইবে, অথচ তাঁকে ইহার জন্ম প্রস্তুত করিয়া তুলি নাই; সুযোগ পাইলেই এই অভিমান বড় করুণ দুঃখের সহিত তিনি প্রকাশ করিতেন। আমি কথা চাপা দিয়া অন্য প্রসঙ্গ তুলিতাম; কিন্তু তিনি কর্ম্মোপযোগী আপনার অপূর্ণতার কথা ভুলিতেন না, সময় পাইলেই খোঁটা দিয়া বলিতেন, "এই সব কাজের জন্যই যদি আমায় ঘরে আনিয়াছিলে, তাহার জন্য আমায় প্রস্তুত করিয়া তুলিলে না কেন?"

যাহাকে ভালবাসি, যে আমার কর্ম্মের সত্যসঙ্গী, তাহাকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতে হইবে, এ চিন্তা কোন দিন করি নাই। যাহার যে কাজ, তাহার উপযোগী চরিত্র লইয়াই তাহার জন্ম হয়। আমার পত্নী যদি উচ্চশিক্ষিতা হইতেন, তাহা হইলেই যে তিনি আজিকার এই সৃষ্টির বনিয়াদ-রচনার অধিকতর শক্তি ও বুদ্ধি প্রয়োগ করিতে পারিতেন, এই ধারণা আজও আমার নাই। কিন্তু পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব তাঁহাকে সর্ব্বদাই ক্ষুণ্ন করিত। তিনি স্বামীর কাজকে অতিকায় বৃহৎ করিয়া দেখিতেন; তাহার জন্য যেরূপ যোগ্যতার প্রয়োজন, তাহা হইতে ইচ্ছা করিয়া তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছি—এইরূপ একটা ধারণায় তিনি প্রায় ম্রিয়মাণা হইয়া পড়িতেন। কিন্তু এমন কোন কাজ নাই, যাহা তাঁহার সুনিপুণ হস্তে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত না। তাঁহার জীবদ্দশায় ভারতীয় ও অভারতীয় বহু বরেণ্য পুরুষ আসিয়া আশ্রমের অতিথি-সৎকারের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মমন্দিরের, আশ্রমের, নারীমন্দিরের, নিখিল প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠার যুগে তিনি যে নৈপুণ্য দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা অমর হইয়া থাকিবে—ইহা কি তাঁহার অযোগ্যতার পরিচয়? তবুও তাঁর চক্ষে ব্যথার যে অশ্রুকণা দেখিয়াছি, তাহার অর্থ আমি ধীরে ধীরে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি; সে অর্থ যতই আমার নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠে, ততই আমার কর্ত্তব্যের দিক্ হইতে তাহা আমার সমস্ত হৃদয় আকুল করিয়া তুলে। সে অশ্রুর প্রতি বিন্দুটী বাঙ্গালী নারীর মর্ম্মব্যথার আকুতি ভিন্ন তো আর কিছু নহে! প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের নারীমন্দির-রচনার স্বপ্ন যতটুকু মূর্ত্তি লয়, উহা কি সেই অশ্রুরই দাবীমূর্ত্তি নহে? কিন্তু সে উচ্ছ্বাসপ্রকাশের ক্ষেত্র ইহা নহে, আমি ১৯২১ খৃষ্টাব্দের জীবন-কথাই ব্যক্ত করিতেছি।

জীবনের অতি গভীর স্তরে ফল্গুধারা বহিতেছিল খরপ্রবাহে। উপরে তাহার অভিব্যক্তি ছিল না। কোন এক ঘটনায় এই অন্তরপ্রবাহিনীর সহিত পরিচয় মিলিত; অধিকাংশ সময়েই আমি থাকিতাম উপরের কর্ম্মসমস্যার সমাধানক্ষেত্রে। কাজ, কাজ আর কাজ, আর শ্রীঅরবিন্দের সহিত পরিপূর্ণ যুক্তির তপস্যায় আমার একাগ্রচিত্ত এই নিত্যসঙ্গিনীর খোঁজ বড় রাখিত না।

যাহা অপরিত্যজ্য, তাহা ঔদাসীন্যেও সুবিস্তৃত মরু লঙ্ঘন করিয়া জীবন যে জুড়িয়া বসে, সে পরিচয় আমার জীবনে ভাল করিয়াই মিলিয়াছে। বার বার যাহাকে ছাড়িতে চাহিয়াছি, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় বহু বার যাহার নিকট হইতে বহু দূরে চলিয়াছি বলিয়া মনে হইয়াছে, এক দিন সহসা চাহিয়া দেখিয়াছি—সেই চিরসঙ্গিনী আমার উপেক্ষায় এক পাও পিছাইয়া পড়ে নাই। স্ব-মহিমায় আরও নিকটতর হইয়া আমার সবখানিকে সে অধিকার করিয়া লইয়াছে।

জীবনসঙ্গিনী লিখিতে বসিয়া আমি তাঁহার কথা কতটুকু বলিতেছি! যে অবস্থার কথা লিখিতেছি, সে অবস্থায় তিনি কতটুকু আমার চিত্তে স্থান করিয়া লইতে পারেন? ১৯১০ খৃষ্টাব্দে হইতে এই ১৯২১ খৃষ্টাব্দ দ্বাদশ বর্ষ আমি শ্রীঅরবিন্দময় হইতে চাহিয়াছি। এই সময়েও আমার সত্তার সহিত অচ্ছেদ্য হইয়াই তিনি বিরাজ করিতেন; তাই এই সময়ের জীবনকথায় তাঁহার প্রচ্ছন্ন জীবনই অনুস্যূত আছে। সে জীবন সত্যই অদৃশ্য ফল্গুপ্রবাহ; তাহাকে বাহিরে টানিয়া আনার অপপ্রচেষ্টা আমার নাই।

শ্রীঅরবিন্দের সহিত যুক্তিপ্রচেষ্টার মর্ম্ম শুধু একক জীবনের হইলে, সাধনা অন্য প্রকারের হইত। আমরা ছিলাম এক বৃন্তে যুগল ফুলের ন্যায় সমপ্রাণ। একটী ছিঁড়িলে আর একটীর অস্তিত্বই থাকে না; ইহার নিষ্ঠুর প্রমাণ জীবনের দৃষ্টান্তেই মিলিবে, কথার প্রয়োজন কি?

কর্ম্মময় জীবনকে জাগ্রত করার জন্য অরুণের লোভনীয় পত্রগুলির প্রতীক্ষার সঙ্গে উৎকণ্ঠাও বাড়িতেছিল, কেন না যে সময়ে আমি এখানে এক দল তরুণকে লইয়া সঙ্ঘ-চক্রের পরিধিবিস্তারে উদ্বুদ্ধ, সেই সময়েই কয়েকজন সঙ্ঘের মানুষ শ্রীঅরবিন্দের নিকট আমার বিষয় লইয়া অতিশয় অপ্রিয় অসত্য আলোচনা সুরু করিয়াছিল—এই সকল সংবাদ অরুণের পত্র যতই বহন করিয়া আনিতেছিল, আমি ততই আড়ষ্ট হইয়া পড়িতেছিলাম। যাহাদের সহিত একত্র শয়নভোজন অত্যন্ত আপনার জন জ্ঞানে দিবারাত্রি আলাপনে কাটিয়াছে, তাহাদের এই কপট আচরণ আমার বড় অসহ্য মনে হইতেছিল। যাহারা শ্রীঅরবিন্দ ও বারীন্দ্রকুমারের নিকট প্রতিদিন চন্দননগরের বিষয় লইয়া নানা প্রকার মিথ্যাবাণী প্রচার করিত, তাহাদের পত্রাদির বিবরণ যে আমি সবই জানিতে পারিতেছি, একথা তাহারা জানিত না। আমার সহিত তাহাদের পূর্ব্বের ন্যায় মৌখিক আচরণ বিসদৃশ মনে হইত। উপরে আপনার জন, ভিতরে সতত ইহার অন্যথাচরণ, এরূপ গৃহশত্রু লইয়া কোন বৃহত্তর কর্ম্ম করা কিরূপ দুঃসহ যন্ত্রণাময়, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই বুঝিবেন। শ্রীঅরবিন্দ প্রথম প্রথম এইরূপ ষড়যন্ত্র-মূলক আচরণ প্রশ্রয় দিতেন না। একজন চন্দননগর হইতে পণ্ডিচারী যাইতে চাহিলে, তিনি তাহাকে মাদ্রাজ হইতেও ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। বারীন্দ্রকুমারকেও তিনি স্পষ্ট করিয়াই লিখিয়াছিলেন, "… …মতিদের কথা। মতিলাল যাহা আমার কাছে পেয়েছে, সে আমার যোগের প্রথম প্রতিষ্ঠা, ভিত্তি—আত্মসমর্পণ, সমতা ইত্যাদি। তাহারই অনুশীলন করে' আসছে। সম্পূর্ণ হয় নি। এই যোগের একটি বিশিষ্টতা এই যে, সিদ্ধি একটু উপরে না উঠলে, ভিত্তিও পাকা হয় না। এখন মতিলাল আরও উঁচুতে উঠতে চায়। তার আগে অনেক পুরাতন সংস্কার ছিল, কয়েকটী খসেছে, কয়েকটী এখনও আছে। আগে ছিল সন্ন্যাসের সংস্কার—অরবিন্দ-মঠ করতে চেয়েছিল (মতিলালের চিঠি আজ পেয়েছি, সে বলছে সে সঙ্কল্প তার কখনও ছিল না, ভুল বোঝা হয়েছে)—এখন বুঝি মেনেছে সন্ন্যাস চাই না, প্রাণে কিন্তু সেই পুরাতনের ছাপ এখনও একেবারে মুছে যায় নি, সে জন্য সে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হতে বলে। কামনাত্যাগের আবশ্যকতা বুঝেছে—কামনাত্যাগ ও আনন্দভোগের সামঞ্জস্য পূর্ণভাবে করতে পারে নি। আর আমার যোগটা নিয়েছিল—যেমন বাঙ্গালীর সাধারণ স্বভাব—তেমন জ্ঞানের দিক্ থেকে নয়, যেমন ভক্তির দিকে, কর্ম্মের দিকে। জ্ঞান কতকটা ফুটেছে, অনেক বাকি আছে, আর ভাবুকতার কুয়াসা dissipated হয় নি; তবে যেমন নিবিড় ছিল, তেমন আর নাই। সাত্ত্বিকতার গণ্ডী পুরোমাত্রায় কাটাতে পারে নি; সাত্ত্বিক অহং এখনও আছে। এক কথায় তার development দ্রুত চলছে, পূর্ণ হয় নি। আমারও কোন তাড়াতাড়ি নেই; আমি তাকে নিজের স্বভাব অনুসারে develop করতে দিচ্ছি। এক ছাঁচে সকলকে চাই না। আসল

জিনিষটা সকলের মধ্যে এক হবে, তবে নানা ভাবে নানা মূর্ত্তিতে ফুটবে। সকলে ভিতর থেকে grow করছে, বাহির থেকে গঠন করতে চাই না। মতিলাল মূলটা ধরেছে ও পেয়েছে, আর সব আসবেই।

তুমি বল্‌ছ মতিলাল বেশ পুঁটলী বাঁধ্‌ছে, তার explanation আমি দিচ্ছি। প্রথম কথা, তার চারিদিকে কয়েক জন লোক জুটেছে, যারা তাকে ও আমাকে জানে। সে যা পেয়েছে আমার কাছে, তারাও পাচ্ছে। তারপর আমি প্রবর্ত্তকে 'সমাজ-কথা' বলে' একটা ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখেছিলাম, তার মধ্যে সঙ্ঘের কথা বলেছিলাম—ভেদ-প্রতিষ্ঠ সমাজ চাই না, আত্মপ্রতিষ্ঠ, আত্মার ঐক্যের মূর্ত্তি সঙ্ঘ চাই। এই idea-কেই মতিলাল নিয়ে দেবসঙ্ঘ নাম ধার করেছে। আমি বলেছিলাম ইংরাজীতে "Divine life"এর কথা। নলিনী তার অনুবাদ করে দেব-জীবন। যারা দেব-জীবন চায়, তারাই দেব-সঙ্ঘ। মতিলাল সেইরূপ সঙ্ঘের বীজস্বরূপ চন্দননগরে স্থাপন করে' দেশময় ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে। এইরূপ চেষ্টার উপর অহংএর ছায়া যদি পড়ে ত সঙ্ঘ দলে পরিণত হয়। এই ধারণা সহজে হতে পারে, যে যে-সঙ্ঘ শেষে দেখা দেবে এটাই তাই, সব হবে এই একমাত্র কেন্দ্রের পরিধি, যারা এর বাহিরে, তাহারা ভিতরকার লোক নয়, হলেও তারা ভ্রান্ত—ঠিক আমাদের যে বর্ত্তমান ভাব, তার সঙ্গে মিলে না বলে'। মতিলালের এই ভুল যদি থাকে—কতকটা থাকবার কথা, তবে আছে কিনা আমি জানি না—বিশেষ ক্ষতি নাই। সে ভুল টিকবে না। তার দ্বারা আর তার ক্ষুদ্র মণ্ডলীর দ্বারা আমাদের অনেক কাজ হয়েছে আর হচ্ছে, যা আর কেউ এ পর্য্যন্ত করতে পারছে না। মতির মধ্যে ভাগবত শক্তির খেলা চল্‌ছে, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই।

মতিলালের চিঠি পেয়েছি, তাতে আর কয়েকটা circumstances বুঝলাম। তার আর……দের মধ্যে যে misunderstanding-এর ছায়া পড়ছে, সে মনোমালিন্যে পরিণত হতে পারে। আমাদের মধ্যে এরূপ হওয়া নিতান্ত অনুচিত। মতিলালকে এ সম্বন্ধে লিখবো। তুমি …কে বলো যেন সাবধান হয়, যেন এরূপ breach বা rift-এর লেশ মাত্র কারণ না থাকে। কে মতিলালকে বলেছে যে, …লোককে জানাচ্ছে, impression দিচ্ছে যে, প্রবর্ত্তকের সঙ্গে অরবিন্দ ঘোষের কোনই সম্পর্ক নাই। এরূপ কথা নিশ্চয়…বলেনি; কারণ প্রবর্ত্তক আমাদেরই কাগজ, আমি স্বহস্তে লিখি বা না লিখি, আমারই ভিতর দিয়ে ভগবান মতিলালকে শক্তি দিয়ে লেখাচ্ছেন; Spiritual হিসাবে আমারই লেখা, মতিলাল তার মনের রং দেয় মাত্র। হয়…… বল্‌ছে—প্রবর্ত্তকের প্রবন্ধগুলো তার নিজের লেখা নয়! তাও বলার দরকার নাই, তাতেও লোকের মনে wrong impression হতে পারে।"

এই পত্রাংশ প্রসিদ্ধ মুদ্রিত পণ্ডিচারী পত্রের অমুদ্রিতাংশ। এই লেখাটুকুর কথা বারীন্দ্রনাথ আমায় জানান নাই; শ্রদ্ধেয় উপেনদাদা স্বহস্তে টুকিয়া আমায় পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের এই পত্রাংশ হইতেই তাঁহার সহিত আমার বিচ্ছেদ-সৃষ্টির কি গভীর ষড়যন্ত্র চলিয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু একদিকে শ্রীঅরবিন্দের অপরিসীম স্নেহ, সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি, অন্যদিকে আমারও তাঁর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও নতি চক্রান্তকারীর উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিতে পারে নাই; আমি নিষ্ঠুর দুর্ভাগ্য বরণ করিয়াছি। যোগ সঙ্গী; ভগবান সম্মুখে!

(ক্রমশঃ)

ভজন

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র চৌধুরী

অভিমানে কাঁদে উতলা এ রাতি
শুকায় ফুলের মালা।
সাথীহীনা বাতি জ্বলে একা একা
মথুরায় গেছে কালা।

জীবন-যৌবন বিফলে গেল গো
সে বিনে সকলি মিছে,
শূন্য এ ব্রজপুর নিশীথ শয়নে
কেবলি কাঁটার জ্বালা।

চন্দননগর : ১৬৭৩—১৯৪০

শ্রীহরিহর শেঠ

৪

১৯০১—বুচার (Bouchard) অস্থায়ী এড্‌মিনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত হন।

আলেক্স দেভিল (Alex Deville) পাকাভাবে এড্‌মিনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত হন।

"স্বাস্থ্য-সখা" নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

এই বৎসরের সেন্সাস্ বিবরণী হইতে জানা যায় চন্দননগরে বৃটীশ প্রজা ছিল ১০৯৯৯ জন।

সেণ্ট মেরিস্ ইনস্‌টিটিউশন্ এই নাম পরিবর্তিত হইয়া দুপ্লে কলেজ নাম হয়।

১৯০২—ম্‌ঁসিয়ে বেরনার্ (V. Bernard) এড্‌মিনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত হন।

১৯০৩—মঃ এলবার্ট (F. Albert) অস্থায়ী এড্‌মিনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত হন।

১৯০৪—ম্‌ঁসিয়ে বেরনার পুনরায় এড্‌মিনিষ্ট্রেটর হন।

প্লেগ চিকিৎসার জন্য স্বতন্ত্র অস্থায়ী চিকিৎসাগার প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯০৫—ডক্টর মারাত্রে (Dr. Maratray) অস্থায়ী এড্‌মিনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত হন।

১৯০৬—পঁজ (E. Ponge) এড্‌মিনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত হন।

১৯০৭—মঃ গিজোনিয়ে (H. Guizonnier) এড্‌মিনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত হন।

নাগরিকগণের নৈতিক, আর্থিক, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যবিষয়ক ইষ্ট এবং রাজনৈতিক ও অন্যান্য স্বত্ব ও স্বার্থরক্ষার্থ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে চন্দননগর রেপুব্‌লিকাঁ রাদিক্যাল্ সভা (Comite Republicain Radical de Chandernagor) প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই বৎসর হইতে কমিতে দে বিঁয়্যাথেসাজের ম্যার সভাপতি হন।

১৯০৮—দুপ্লে কলেজের এফ, এ, ক্লাস উঠাইয়া দেওয়া হয়।

চন্দননগরের কানাইলাল দত্তের ফাঁসী হয়।

১৯০৯—মঃ লাগ্রুয়া (H. Lagroua) এড্‌মিনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত হন।

"মাতৃভূমি" নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়।

১৯১০—শ্রীচারুচন্দ্র রায়, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি মহাশয়দিগের উদ্যোগে নকুড়চন্দ্র কর মহাশয়ের বাগবাজারস্থ বাগানবাড়ীতে বাগদেবীর পূজা উপলক্ষে একটী উৎসব ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। উহার নাম দেওয়া হইয়াছিল সারস্বত উৎসব।

কালীচরণ দাস ৩০,০০০্ ব্যয়ে স্বনামে "কালীদাস চতুষ্পাঠী" প্রতিষ্ঠা করেন। ইতিপূর্ব্বে শিক্ষার্থে এখানে এত অধিক টাকা দান কেহ করেন নাই।

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের আগমন ও শ্রীমতিলাল রায়ের তত্ত্বাবধানে কিছু দিন চন্দননগরে থাকিয়া পণ্ডিচেরীগমন।

১৯১১—মঃ গিজোনিয়ে দ্বিতীয়বার এড্‌মিনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত হন।

শ্রীযোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কতিপয় ভদ্রলোকের চেষ্টায় কালীশ্বরী পাঠশালা নামক বালিকাদের জন্য একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

চন্দননগর স্পোর্টিং ক্লাব ট্রেডস্ কাপ পায়।

বোড় নামক অঞ্চলের অধিবাসীদের স্বার্থরক্ষার্থ বোড় পলিটিক্যাল্ ইউনিয়ন্ নামে একটী সভা প্রতিষ্ঠা হয়।

১৯১২—ম্‌ঁসিয়ে বার্‌বিয়ে (J. Barbier) এড্‌মিনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত হন।

জলের কল প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯১৩—ম্‌ঁসিয়ে লাগ্রুয়া দ্বিতীয়বার এড্‌মিনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত হন।

"দর্শক" নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়।

১৯১৪—মঃ ভেরনল (Vergnol) এড্‌মিনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত হন।

গোন্দলপাড়া অনাথভাণ্ডার স্থাপিত হয়।

১৯১৫—মঃ ভ্যাঁসা (C. Vincent) এড্‌মিনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত হন।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ নায়েক মহাশয়ের সম্পাদনায় "প্রবর্ত্তক" নামে একখানি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ হয়।

কর্ম্মিজীবনকে আদর্শ করিয়া দেশসেবার উদ্দেশ্য লইয়া শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্তের দ্বারা "সন্তান-সঙ্ঘ" প্রতিষ্ঠা হয়।

স্থানীয় প্রধান বিচারপতি ম্‌ঁসিয়ে দেলরিয়ে (Delrieu)র প্রস্তাবে সরকারী ও বেসরকারী স্থানীয় কতিপয় ভদ্রলোকের চেষ্টায় দুপ্লে কলেজ-ভবনে ইউরোপের মহাযুদ্ধে আহত সৈনিকদিগের সাহায্যার্থে এক্সপোজিসিঁয় দে চন্দননগর নাম দিয়া একটী প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। বাঙ্গলার গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল ও ফরাসী-ভারতের গভর্ণর ম্‌ঁসিয়ে মার্তিনো প্রদর্শনীতে আসেন।

১৯১৬—৬ই এপ্রেল কুড়ি জন বাঙ্গালী সন্তান ইউরোপের মহাযুদ্ধে ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসৈনিকরূপে যাত্রা করেন। শতাব্দীর জড়তা ভঙ্গ করিয়া ইহারাই প্রথম বাঙ্গালী যুদ্ধে যান।

প্রথম বাঙ্গালী যোগীন্দ্রনাথ সেন ইউরোপের মহাযুদ্ধে ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে সৈনিকরূপে প্রাণদান করেন।

"ভাকুণ্ডা সাহায্যভাণ্ডার সমিতি" প্রতিষ্ঠিত হয়।

"চন্দননগর সমাজভুক্ত তিলিজাতি হিতৈষী সভা" স্থাপিত হয়।

১৯১৮—শ্রীহরিহর শেঠের দ্বারা মেডিকেল রিলিফ কমিটীর প্রতিষ্ঠা ও তাহার কার্য্য আরম্ভ হয়।

শ্রীহরিহর শেঠের অর্থানুকূল্যে ডুপ্লে কলেজ পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিষয় স্থির হইয়া ৩১শে আগষ্ট "জুর্ণাল অফিসিয়ালে" গভর্ণরের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয়।

১৯১৯—চন্দননগর ইংরাজ গভর্ণমেণ্টকে হস্তান্তরিত করিবার জনরবে অধিবাসিগণ ফ্রান্সের সাধারণ তন্ত্রের সভাপতিকে তাঁহাদের অনিচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

চাউল দুর্মূল্য হওয়ায় ম্যারের সভাপতিত্বে শ্রীহরিহর শেঠের দ্বারা চাউল সরবরাহ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯২০—জাইয়ে (Jaillet) এড্‌মিনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত হন।

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ কর্ত্তৃক সাপ্তাহিক "নবসঙ্ঘ" পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়।

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ কর্ত্তৃক "Standard Bearer" নামে একখানি ইংরাজী সাময়িক পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়।

সহকারী ম্যার নির্ব্বাচন লইয়া প্রথম তালিকার সভ্যগণের সহিত দ্বিতীয় তালিকার সভ্যগণের মতানৈক্য হওয়ায় শ্রীহরিহর শেঠ, ডাঃ যোগেশ্বর শ্রীমানী প্রমুখ ছয়জন দ্বিতীয় তালিকার সভ্য একযোগে পদত্যাগ করেন।

শ্রীহরিহর শেঠের দ্বারা চন্দননগর পুস্তকাগারের জন্য ও সাধারণের ব্যবহারের জন্য একটী হল-সমন্বিত নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দির নামক ভবন তাঁহার পিতৃনামে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মন্দির স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা উদ্বোধন হয় এবং মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সভাপতিত্বে চন্দননগর পুস্তকাগারের গৃহপ্রবেশ হয়।

"দুঃস্থ ব্রাহ্মণ সাহায্যসভা" প্রতিষ্ঠিত হয়।

শ্রীমতিলাল রায় মহাশয় দ্বারা "প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ" প্রতিষ্ঠা হয়।

১৯২১—মঃ ক্লেস্ঁা (Clayassen) এড্‌মিনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত হন।

লোকগণনায় জনসংখ্যা স্থির হয় ২৫৪২৩।

শ্যামাচরণ রক্ষিত মহাশয় দ্বারা চৌধুরী ঘাটের উপর তাঁহার পিতা দুর্গাচরণ রক্ষিত মহাশয়ের নামে চাঁদনী ও সাধারণের স্নানের সুবিধার্থ কক্ষ নির্ম্মিত হয়।

১৯২২—শ্রীহরিহর শেঠের দ্বারা নৃত্যগোপাল শেঠ প্রাথমিক বিদ্যালয় নামে একটী অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং গভর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পিত হয়।

শ্রীননীগোপাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসাতকড়ি সুর প্রভৃতি কতিপয় ভদ্রলোকের চেষ্টায় দশভুজা সাহিত্যমন্দির প্রতিষ্ঠা হয়।

তন্তুবায় জাতির হিতসাধনার্থ তন্তুবায়সমিতি স্থাপিত হয়।

অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য শম্ভুচন্দ্র সেবাশ্রম নামে সহরের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে দুইটী দাতব্য চিকিৎসালয় ও মধ্যস্থলে একটী নারীচিকিৎসা বিভাগ শ্রীহরিহর শেঠের দ্বারা তাঁহার পিতামহের নামে প্রতিষ্ঠিত হয়।

নাগরিকদিগের স্বার্থ লক্ষ্য করিয়া প্রজাপ্রতিনিধিদের পরামর্শ-দান, স্বত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা এবং নূতন অধিকারলাভের চেষ্টা করার উদ্দেশ্য লইয়া প্রজাসমিতি নামে এক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

"নারায়ণী থিয়েটার" নামে স্ত্রীলোক লইয়া প্রথম পেশাদারী থিয়েটার কৃত্তিবাস ঘোষের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯২৩—অক্ষয়তৃতীয়ার দিন প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের দ্বারা স্বর্ণমণ্ডিত ওঁকার অঙ্কিত রজত ঘট প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রধানতঃ কালীপ্রসন্ন বসু মহাশয়ের চেষ্টায় কায়স্থ সভা স্থাপিত হয়।

১৯২৪—শ্যাম্পিয় (V. Champion) এড্‌মিনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত হন।

এই বৎসর প্রথম বৈদ্যুতিক আলোর প্রবর্ত্তন হয়।

১৯২৫—শ্রীহরিহর শেঠ কর্ত্তৃক অঘোর নাথ শেঠ অবৈতনিক প্রাথমিক বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয় ও গভর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পিত হয়।

পাক্ষিক "নবসঙ্ঘের" নব পর্য্যায় আরম্ভ হয়।

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ কর্ত্তৃক অক্ষয়তৃতীয়া মেলা ও প্রদর্শনী মহোৎসব আরম্ভ হয়।

এই বৎসর প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের আমন্ত্রণে মহাত্মা গান্ধী প্রথম চন্দননগর আগমন করেন।

১৯২৬—শ্রীকৃষ্ণলাল দাস প্রমুখ কতিপয় ভদ্রলোকের চেষ্টায় ভোলা-নাথ দাস মহাশয়ের বাটীতে লালবাগান বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

শ্রীহরিহর শেঠ কর্ত্তৃক তাঁহার মাতৃনামে কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। ইহাই হুগলী জেলার মধ্যে প্রথম মেয়েদের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়।

১৯২৭—"মাতৃভূমি" নব পর্য্যায়ে প্রকাশিত হয়।

১৯২৮—মঁসিয়ে প্যারন (J. Pernon) অস্থায়ী এড্‌মিনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত হন। পরে পুনরায় শ্যাম্পিয় এড্‌মিনিষ্ট্রেটর হন।

"শম্ভুচন্দ্র সেবাশ্রম" বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

১৯২৯—বৃটিশ পুলিস দ্বারা গোন্দলপাড়া রেড্‌ সাধিত হয়।

শ্রীহরিহর শেঠ পিতামহের নামে "শম্ভুচন্দ্র সেবাশ্রম" নামে অতিথি-ভবন প্রতিষ্ঠা করিয়া চন্দননগর মিউনিসিপ্যালিটীকে তাহা দান করেন।

পাক্ষিক "নাগরিক" প্রথম প্রকাশিত হয়।

দ্বিতীয় বার মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তক সঙ্ঘে আগমন করেন।

ডুপ্লে কলেজ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়।

"The Prabartak" নামে ইংরাজী মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়।

১৯৩১—মঁসিয়ে ভান্দম্ (H. Vendome) এড্‌মিনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত হন। পরে এইখানেই মারা যান।

১৯৩২—মঃ ব্যার্থে (R. Bertheux) এড্‌মিনিষ্ট্রেটর হন।

পাক্ষিক "সেবক" পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

১৯৩৩—পুলিশ কমিশনর মঃ কাঁ আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।

কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষামন্দির সংলগ্ন "তারকদাসী নারী-কল্যাণ সদন" শ্রীহরিহর শেঠের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। ফরাসী ভারতের গভর্ণরপত্নী মাদাম জুতার্ন কর্ত্তৃক দ্বারোদ্ঘাটন হয়।

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তক বিদ্যার্থিভবন প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৩৪—সুপসনাতন আদর্শ শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

শ্রীশরৎচন্দ্র কুণ্ডু পিতৃনামে "মেঘনাথ পান্থশালা" প্রতিষ্ঠা করেন।

মঁসিয়ে হেরু (R. Herou) এড্‌মিনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত হন।

শ্রীহৃষীকেশ রক্ষিত মহাশয় প্রথম ডি, এস্-সি উপাধি প্রাপ্ত হন।

১৯৩৬—শাম্ব (J. Chambon) এড্‌মিনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত হন।

শ্রীযোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পিতৃস্মৃতিরক্ষার্থে অম্বিকাচরণ চট্টোপাধ্যায় স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৩৭—বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ উদ্বোধন করেন। শ্রীহরিহর শেঠ অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি হন। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

"সেবক" নব পর্য্যায়ে প্রকাশিত হয়।

১৯৩৭—মঁসিয়ে বার্‌ঁ (C. F. Baron) এড্‌মিনিষ্ট্রেটর পদে নিযুক্ত হন।

"প্রজাশক্তি" নামে একখানি পাক্ষিক পত্রিকা প্রজাসমিতির মুখপত্র রূপে প্রথম প্রকাশিত হয়।

১৯৩৮—মঁসিয়ে মেনার (A. Menard) এড্‌মিনিষ্ট্রেটর পদে নিযুক্ত হন।

১৯৪০—মঁসিয়ে বার্‌ঁ (C. F. Baron) পুনরায় এড্‌মিনিষ্ট্রেটর হইয়া আইসেন।

প্রবর্ত্তক পত্রিকার রজত জয়ন্তী মাসিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

মঃ মাসুতিয়ে (M. J. M. Massoutier) এড্‌মিনিষ্ট্রেটর পদে নিযুক্ত হন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মঁসিয়ে পেতাঁ্যার (M. Petain) অধিনায়কত্বে ফ্রান্স জার্ম্মাণীর সহিত যুদ্ধে বিরত হইলে, জেনারেল্ মঁসিয়ে দে গল্ (De Gaulle) বৃটীশের সহযোগিতার জন্য যে ফরাসীস ন্যাসন্যাল্ কমিটি গঠন করেন, ভারতে ফরাসী উপনিবেশসমূহের গভর্ণর বাহাদুর মঁসিয়ে বঁভ্যা (M. Bonvin) সেই কমিটীর সংযোগিতা করিবেন, এই ঘোষণা ১৭ই সেপ্টেম্বর চন্দননগরের এড্‌মিনিষ্ট্রেটর মহোদয় প্রজাপ্রতিনিধি প্রভৃতিদের জানাইয়াছিলেন।

দুই বৎসর পূর্ব্বে যে আয়করের ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা সত্ত্বেও ১৯৪১ হইতে প্রবর্ত্তিত হইবার জন্য আয়করের বিশেষ আইন বিধিবদ্ধ হয়।

সরিষাপাড়ানিবাসী ৺কান্তিপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের দৌহিত্র আনন্দময় গঙ্গোপাধ্যায়ের যক্ষ্মারোগে মৃত্যু হইলে, স্বহস্তে ক্ষুর দ্বারা কণ্ঠনালী ছেদন করিয়া স্ত্রী দুর্গারাণী দেবী সহমৃতা হন ও শ্মশানে দম্পতি এক চিতায় ভস্মীভূত হন। [সমাপ্ত]

উমার অধিবাস*

শ্রীজনরঞ্জন রায়

ঢল ঢল আজি উমার মু'খানি, তুরু তুরু হিয়া মধুর ভাষ,
লাজ-জড়িত চরণ দু'খানি, নয়নে মুগ্ধ মৌন হাস।
বিশ্বনাথের মণিকার তার নাম লেখা দু'টি নূপুর গড়েছে মনোহর,
ঐ মধুসখা এসে বলে' গেল মধু আনিতেছে অধিবাস;
শুনি বসন-ভূষণ আনিতেছে কত সুন্দরী
ডালা লয়ে আসে অপ্সরী, কত কিন্নরী,
অশোকে কিংশুকে রচিয়া আনিছে সুন্দর কিবা বাস,
ফাগের রঙের ওড়না আনিছে বসন্ত সাঁঝের পারা।
আমি ভাবিয়া হই গো সারা—মায়ের অঙ্গে বসনভূষণ কোথায় পরাবে তারা
অঙ্গ যাঁহার আপন শোভায় আপনি আছেরে মুঞ্জরি'
যার চরণ পরশে ফুটেরে কমল, ভ্রমর উঠে গুঞ্জরি।
রতন-ভূষণ তাহার অঙ্গে হবে যে রে পরিহাস!

* নবদ্বীপে শিবের বিবাহোৎসবে বাসন্তী দশমীতে গীত। এই উৎসব কাশী ব্যতীত শুধু নবদ্বীপেই অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবের গান-রচয়িতা হিসাবে শ্রীজনরঞ্জন রায়ের এবং বাসরপ্রস্তুতকারী শ্রীশচীনন্দন গোস্বামীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা নবদ্বীপের অন্যতম প্রসিদ্ধ উৎসবে পরিণত হইয়াছে।—প্রঃ সঃ।
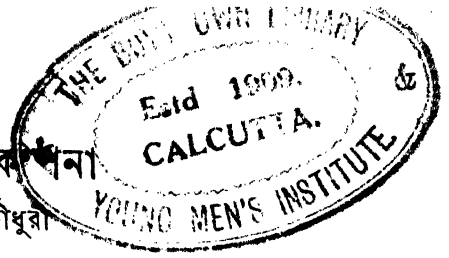
তন্ত্রের আদ্যাশক্তি কল্পনা

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

তন্ত্রের বিচার অতি সূক্ষ্ম এবং তন্ত্রোক্ত জগদ্ব্যাপারের রহস্যোদ্ঘাটন অতি নিপুণ ও বিধিবদ্ধ চিন্তাশক্তির সৃষ্টি। ধারাবাহিকভাবে শক্তির অঙ্কুর, পল্লব ও মুকুলাদির সূক্ষ্মতম বিচার আর কোথাও দেখ্‌তে পাওয়া যায় না।

সূক্ষ্ম তত্ত্বের দিক্ হ'তে পরাবিন্দু শব্দব্রহ্ম প্রভৃতির কঠিন বিচার যেভাবে হয়েছে, তেমনি ভক্তদের জন্য রসযুক্তভাবে নানা রূপক প্রভৃতির সাহায্যে এক একটি তত্ত্বের প্রতিমাও কল্পিত হয়েছে। এ সমস্ত প্রতিমা এক একটি চিন্তাস্রোতকে মূর্ত্তিমান্ করে' তুলেছে।

কুণ্ডলিনীই শক্তির উৎস—সহস্রারে স্থিত কুণ্ডলিনী শিববিন্দুতে বেষ্টিত হয়ে এই শক্তির নানা বিভব প্রকট করে। কুণ্ডলিনীর একটি আবর্ত্ত "বিন্দু" সৃষ্টি করে—দু'টি আবর্ত্ত পুরুষ ও প্রকৃতি; তিনটি আবর্ত্ত ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া এবং তিনটি গুণ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ সূচিত করে। এমনিভাবে বহু আবর্ত্তে শক্তির বহু বিভব সূচিত হয়। বস্তুতঃ কুণ্ডলিনীতেই শক্তির সার্ব্বভৌম রূপ প্রকটিত হয়। অতি সূক্ষ্মতম অবস্থা হ'তে স্থূলতম জগচ্চক্র কুণ্ডলিনী হ'তেই শক্তি আহরণ করে। তন্ত্রে আছে :—

"সা প্রসূতি কুণ্ডলিনী শব্দব্রহ্মময়ী বিভুঃ
শক্তিঃ ততো ধ্বনিঃ তস্মাৎ নাদঃ তস্মান্নিরোধকঃ
ততোঽর্দ্ধেন্দুঃ ততো বিন্দু তস্মাৎ আসীৎ পরা তথা।"

পরাবিন্দু ত্রিধা হয় তিন বিন্দুরূপে এবং তাতে করে'ই ত্রিকোণ যন্ত্র সৃষ্ট হয়, যাকে কামকলা বলা হয়। "মহেশ্বরী সংহিতা"র মতে এই তিন বিন্দুর প্রতীক হচ্ছে সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র তিনটি রেখার সৃষ্টি করে।

"ত্রিপুর সিদ্ধান্তে" আছে—এই কলা হচ্ছে কামেশ্বর ও কামেশ্বরীর বহিপ্র্রকট অবস্থা—এজন্য তাঁকে কামকলা বলা হয়। 'কাম' শব্দের মানে হচ্ছে ইচ্ছা—অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তি। এই দেবী হচ্ছেন ত্রিপুরাসুন্দরী। তন্ত্রের মতে ইনিই আদ্যাশক্তি। নৃসিংহানন্দনাদ এই দেবীকে স্তব করতে গিয়ে অতি পরিস্ফুটভাবে এঁর রহস্যরূপ উদ্ঘাটিত করেছেন। তিনি বলেন :—"দেবীর তিনটি পুর আছে—অর্থাৎ তিন বিন্দু, তিন রেখা, তিন কোণ, তিন অক্ষর ইত্যাদি। এই দেবীই আদ্যাশক্তি—ত্রিত্বভাবে সর্ব্বত্রই দ্যোতিত—এজন্য তাঁকে ত্রিপুরাসুন্দরী বলা হয়।

শক্তির দু'টি দিক্ আছে। একটি হচ্ছে ধ্বংসের, অন্যটি সৃষ্টির। তন্ত্রে শক্তিকে কুল বলা হয়—এঁর বর্ণ হচ্ছে লোহিত। আর শিবকে বলা হয় অকুল। কুল হচ্ছে দ্বিবিধ—কালীকুল ও শ্রীকুল। যারা কালীকুলের উপাসক, তারা শক্তির প্রলয় ও ধ্বংসের দিক্‌কে আরাধনা ও ধ্যান করে। প্রলয় বা ধ্বংস চিরন্তন নয়—ধ্বংসের ভিতর দিয়ে সৃষ্টি—ভাঙ্গার সাহায্যে গড়া। দু'কাজই জগদ্ব্যাপারে চলছে—প্রতি মুহূর্ত্তেই সৃষ্টি ও প্রলয়ের চক্র ঘূর্ণিত হচ্ছে। শক্তিবাদের প্রতিষ্ঠাতা তন্ত্রকারেরা তাই শুধু সংহারের বাণীই ধ্বনিত করেননি। যদি তা' করতেন, তবে সমগ্র তন্ত্রবিচার অপূর্ণ ও অঙ্গহীন হ'ত।

যারা শক্তির শ্রীকুলের উপাসক, তারা আরাধনা করে জগতের creative aspectকে। এই মহাদেবী কল্পিত হয়েছেন ত্রিপুরাসুন্দরীরূপে। এই দেবী দশ মহাবিদ্যার "ষোড়শী"। এই মহাবিদ্যার প্রতিমা বিশেষভাবে অনুধারণের বিষয়। তন্ত্রের এবং বিশেষভাবে ভারতীয় সাধকদের চরম কল্পনা এই মূর্ত্তিতে স্বপ্রকাশ হয়েছে।

ইংরাজ ভাবুক মিঃ উড্‌রফ "কামকলা"কে "triangle of divine desire" এবং "creative will with its first subtle manifestation" বলেছেন। মহাদেবী ত্রিপুরাসুন্দরী-প্রতিমায় এই তত্ত্ব কি ভাবে দ্যোতিত হয়েছে, তা' ভাবলে বিস্মিত হ'তে হয়। জগতের আর কোন সভ্যতায় এরূপ তত্ত্বকে একটি সৌন্দর্য্যের অপরূপ আধারে ন্যস্ত করতে পারেনি।

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্রের কল্পনা সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের সহিত অনুস্যূত—এই ত্রিদেবাত্মক জগতের পরিধি বেদান্তের মায়াস্থানীয়। শ্রীঅরবিন্দ এই জগৎকে over-mental consciousness-এর পরিধির ভিতর স্থান দিয়েছেন।

অপরদিকে ঈশ্বর ও সদাশিব বেদান্তের সগুণ ব্রহ্ম বা শ্রীঅরবিন্দের supermental consciousnessএর দ্যোতক।

অপরদিকে পরমশিব বেদান্তের মতে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্থানীয়। শ্রীঅরবিন্দ একে transecndental consciousness বলে' থাকেন। এই transcendental consciousness-এর সহিত শ্রীঅরবিন্দের supreme power অচ্ছেদ্যভাবে একীভূত। এই শক্তি সমগ্র সৃষ্টির আদিম। বস্তুতঃ তন্ত্রের ত্রিপুরাসুন্দরী মূর্ত্তির ভিতর এইভাব যেরূপ প্রভূতভাবে প্রকাশ পেয়েছে, এমন আর কোথাও নয়। এজন্য "জ্ঞানার্ণব" তন্ত্র বলেছে :—

"প্রথমা সুন্দরী নিত্যা মহাত্রিপুরসুন্দরী"।

"জ্ঞানার্ণবে" আরও আছে :—

"ত্রিপুরা ত্রিবিধা দেবী ত্রিশক্তিঃ পরিগীয়তে।"

"প্রপঞ্চসারে" আছে :—

"ত্রিমূর্ত্তিসর্গাঃ পরাভবত্বাৎ
ত্রয়ীময়ীত্বাচ্চ পরৈব দেব্যাঃ।
লয়ে ত্রিলোক্যামপি পুরণত্বাৎ
প্রায়োঽম্বিকায়াস্ত্রিপুরেতি নাম॥"

দশমহাবিদ্যার ষোড়শীই ত্রিপুরাসুন্দরী। এই দেবীর পাদপীঠস্থানীয় হয়েছে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র—ঈশ্বর ও সদাশিব। তার উপর মহাদেব শায়িত আছেন—তাঁর নাভি হ'তে উত্থিত পদ্মের উপর ত্রিপুরাসুন্দরী বা ষোড়শীর রূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। কাজেই তন্ত্রের দিক্ হ'তে সমগ্র কল্পনাটি সুসম্পন্ন হয়েছে বল্‌তে হয়।

প্রাচীন দর্শনকারগণ অতি কঠিন, রুক্ষ ও অতীন্দ্রিয় তত্ত্বকে যেভাবে রূপ দিয়েছেন, তা' দেখে' বিস্ময় জন্মে।

ত্রিপুরাসুন্দরী বর্ণনার কিছু প্রসঙ্গ অবতারণা না করলে, আদ্যাশক্তি কল্পনার ঐশ্বর্য্য প্রস্ফুট হবে না। "তন্ত্রসার" বল্‌ছেন :—

"কহ্লারোৎপল নাগকেশর সরোজাখ্যাবলীমালতী
মল্লীকৈরবকেতকাদিকুসুমৈ রক্তাশ্বমারাদিভিঃ।
পুষ্পৈর্মাল্যাভরেণ বৈ সুরভিণা নানারসস্রোতসা,
তাম্রাম্ভোজনিবাসিনীং ভগবতীং শ্রীসুন্দরীং পূজয়ে।"

অর্থাৎ হে ভগবতি শ্রীসুন্দরি, আপনি রক্তপদ্মবাসিনী, কহ্লার, উৎপল, নাগকেশর, পদ্ম, মালতী, মল্লিকা, কৈরব, কেতকী, রক্তকরবী প্রভৃতি বিবিধ পুষ্প ও নানা রসপূর্ণ সুরভি মাল্য দ্বারা আপনাকে পূজা করছি। শ্রীসুন্দরি, মাংসী, গুগ্‌গুলু চন্দন, অগুরু, কর্পূর, শিলাজতু, মধু, কুঙ্কুম ও ঘৃত দিয়ে সুরকামিনীগণ যে ধূপ তৈরী করেছে—সেই ধূপ তোমার প্রীতিবর্দ্ধন করুক। মহাদেবীর বসনের বর্ণনা অতি চমৎকার :—

"গন্ধর্ব্বামরকিন্নর প্রিয়তমাসন্তান হস্তাম্বুজ-
প্রস্তারৈ র্ধ্রিয়মাণমুত্তমতরং কাশ্মীরজপিঞ্জরম্।
মাতর্ভাস্বরভানুমণ্ডলগলং কান্তিপ্রদানোজ্জ্বলং
চৈনং নির্ম্মলমাতনোতু বসনং শ্রীসুন্দরিত্বম্মুদে॥"

শ্রীসুন্দরি, কুঙ্কুমরসে রক্তবর্ণ। অতি উত্তম বসন এনেছি—দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণের প্রিয়তমাগণ হস্তপদ্ম প্রসারিত ক'রে ঐ বসন ধারণ ক'রে আছেন; ঐ বসন হ'তে প্রভাতের উজ্জ্বল সূর্য্যবিগলিত কান্তি নির্গত হচ্ছে। অলঙ্কারাদির বর্ণনাও আছে :—

"স্বর্ণাকল্পিত কুণ্ডলে শ্রুতিযুগে হস্তাম্বুজেমুদ্রিকা
মধ্যে সারসনা নিতম্বফলকে মঞ্জীরমঙ্‌ঘ্রিদ্বয়ে
হারো বক্ষসি কঙ্কণৌ ক্বনরণৎকারৌ করদ্বন্দ্বকে
বিন্যস্তং মুকুটং শিরস্যনুদিনং দত্তোন্মুদং স্তূয়তাম্॥"

তোমার দুই কর্ণে স্বর্ণের কুণ্ডল। হস্তপদ্মে অঙ্গুরীয়ক, নিতম্বদেশে উত্তম চন্দ্রহার, পদযুগলে নূপুর, বক্ষে হার, দু' করে কঙ্কণ রুণু রুণু বাজ্‌ছে, মস্তকে মুকুট দেওয়া হয়েছে। আবার—

"সর্গাঙ্গনে বেণুমৃদঙ্গশঙ্খভেরীনিনাদৈরুপগীয়মানা।
কোলাহলৈরাকুলিতা তবাস্ত বিদ্যাধরী নৃত্যকলা সুখায়॥"

স্বর্গপ্রাঙ্গণে বিদ্যাধরী তোমার আনন্দের জন্য নৃত্য করছেন, চারিদিকে কোলাহল উঠ্‌ছে, শঙ্খ, মৃদঙ্গ, বেণু ও ভেরীনিনাদের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত হচ্ছে।

ভাষার চূড়ান্ত প্রয়োগ দ্বারা যে দেবীর বর্ণনা হচ্ছে, সে দেবী যে বর্ণনাতীত, এমনও বার বার বলা হয়েছে। ষোড়শী মন্ত্র সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

"ষোড়শীয়ং হি সুগোপ্যা স্নেহাদ্দেবি প্রকাশিতা
অস্যা মাহাত্ম্যমতুলং জিহ্বাকোটিশতৈরপি-
বক্তুং ন শক্যতে দেবি কিং পুনঃ পঞ্চভির্ম্মুখৈঃ
অপি প্রিয়তমং দেয়ং সুতদারধনাদিকম্
রাজ্যং দেয়ং শিরো দেয়ং ন দেয়া ষোড়শাক্ষরী।"

শিব বলছেন :—
ষোড়শী মন্ত্র অতিশয় গোপনীয়, কেবল তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ প্রকাশ করছি। শতকোটি জিহ্বা দ্বারাও এর মাহাত্ম্য-বর্ণন হয় না—পঞ্চমুখে আমি তার কি বর্ণনা করব! প্রিয়তম পুত্র-দার-ধন-রাজ্য, এমন কি মস্তকও দেওয়া যায়, কিন্তু ষোড়শী-মন্ত্র প্রদান করা যায় না।

শাস্ত্রকারগণ দেবীকে অন্যত্র শাম্ভবী শক্তি বলে' উল্লেখ করেছেন :—

"যা সৃষ্টি-পালনলয়ং কুরুতে ত্রিমূর্ত্ত্যা
সা শাম্ভবী বিজয়তে জগদেকমাতা।৫ —তন্ত্রসার

"সারদাতিলক" তন্ত্রে আছে :—"দেবীর অভাবনীয় তেজঃ অজ্ঞানতিমির নষ্ট করে, সংসারসাগর হ'তে উত্তীর্ণ করে।" দেবীর ধ্যানে যে রূপ-বর্ণনা আছে, তা'তে সংস্কৃত ভাষার চরম প্রয়োগ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। দেবীকে পদ্মনিভ, প্রভাত সূর্য্যকিরণের মত কান্তিযুক্ত, জবা, দাড়িম্ব, পদ্মরাগমণি ও কুঙ্কুমের মত অরুণবর্ণা, উজ্জ্বল মুকুটে মণিযুক্ত, কিঙ্কিণীজালশোভিত বলা হয়েছে। দেবীর চূর্ণ-কুন্তল ভ্রমরশ্রেণীর মত কৃষ্ণবর্ণ ও হিল্লোলিত, কর্ণে উজ্জ্বল সুবর্ণ কুণ্ডল, তাম্র ও প্রবালের মত রক্তবর্ণ ওষ্ঠ, শঙ্খের মত গ্রীবাদেশ, মৃণালের মত বাহু, রক্তপদ্মের মত নখজ্যোতিঃ উরুযুগল কদলীস্তম্ভের মত কোমল, শতচন্দ্র কিরণের মত দেহকান্তি, পরিধানে রক্তবস্ত্র, হাতে পাল, অঙ্কুশ, পঞ্চবাণ ধনু। পরিশেষে "তন্ত্রসার" দেবীর গুণাবলী উল্লেখ করেছে :—

"জগদাহ্লাদজননীং জগদ্রঞ্জনকারিণীম্
জগদাকর্ষণকরীং জগদকারণরূপিণীং
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ীং নিত্যাং সর্ব্বশক্তিময়ীং শিবাং॥"

বস্তুতঃ ত্রিপুরাসুন্দরীর এই বর্ণনা সার্থক।

ফ্যালাসি

নায়েক শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এ.

ভাবিয়া দেখিনু মীড় টানা দায় চীড়-খাওয়া বেহালায়,
জীবনের ছকে পাশারা ছত্রছান্—
প্রাক্‌পুরাণিক ইতিহাস টানে বর্তমানের রেখা—
ঃ ভবিষ্যতের ভারবাহী সম্মান!
ক্লৈবিক প্রেমে আত্মম্ভরী আত্মনমস্কার—
চোখের সুর্‌মা কালের আহুতি গোণে,
পিচ্ছিল পথে জীবনের বেদী,—আক্ষেপ-গৌরবে
সোনালি চক্ষু স্বপ্নের জাল বোনে।

মন্থরতায় এখানে আকাশ অনেক যোজন বড়
দখিনা বাতাসে সাগরের কল্লোল—
মাটি ও মানুষে ডায়েলেক্‌টিক্ শেষ ইতিহাস লেখা
—নৈর্ব্যক্তিক কালের পিঁজরাপোল।
সর্পিল পথে শিবিরে শিবিরে শেষের রাত্রি এলো
গত বসন্ত নব বসন্ত নয়
মনের বিকারে জুয়ারী চিন্তা তন্দ্রায় এলোমেলো
—পদ্মপত্রে যৌবন-সঞ্চয়।

রায় বাহাদুর

শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

দেবীর বিবাহে বরযাত্রী চলিয়াছি বিদেশে। দেবী আমার বন্ধু ও সহপাঠী। লোকজনের সংখ্যা একটু অতিরিক্তই হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে আমার অসুবিধার কোন কারণ নাই। দেবী যখন বর এবং আমি যখন তাহার অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু, তখন আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি প্রসারিত হইয়া থাকা স্বাভাবিক, আর তাহা ছিলও।

ট্রেণে উঠিয়া দেখিলাম, দাদুও আমার সুখ-সুবিধার প্রতি নজর রাখিতেছেন। কারণ, দাদু নিজেই তাঁহার নিকটে আমার জন্য স্থান করিয়া লইয়া সেখানে ডাকিয়া বসাইলেন। দেবী আমার মুখামুখি হইয়া বসিল। একে একে দেখিলাম, অনেকেই দাদুর নিকটতর আসনের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছে।

দেবী আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, দাদু কেমন জমায় দেখিস্ না!

দেবীর এই দাদুটিকে আমার দুই একবার দেখিবার সৌভাগ্য ইতিপূর্ব্বে হইয়াছে বটে, কিন্তু মিশিবার সুযোগ কখনও হয় নাই। দেবীর পিতার মাতুল হন সম্পর্কে তিনি। নাম তাঁহার কেশব চাটুয্যে। আলিপুরে ওকালতি করিতেন, এখন অবসর গ্রহণ করিয়াছেন—পসারের অভাবে নয়, সামর্থ্যের অভাবেই। কেশব চাটুয্যের এককালে পসার বেশ ভালই ছিল। খাটিয়া ওকালতি করা যাহাকে বলে তাহা তিনি কোনদিনই করেন নাই, কিন্তু বুদ্ধি খাটাইয়া যে ওকালতি তাহা তিনি করিয়াছেন। বয়স এখন তাঁহার পঞ্চাশ'র উর্দ্ধে। কিঞ্চিৎ স্থূলকায়, যদিও দীর্ঘাঙ্গ। শরীর বাতে কথঞ্চিৎ পঙ্গু। রং এখনও উজ্জ্বল গৌর, যদিও দেহে এবং মুখে বয়সোচিত নানা রেখাপাত হইয়াছে। তবে মুখের পানে চাহিলেই কেমন সুখী ও সৌখীন পুরুষ বলিয়া মনে হয়। আর মুখে হাসিটি সদা লাগিয়াই আছে।

দেবীর কথা শুনিয়া দাদুর পানে একবার চাহিয়াই মনে হইল, হ্যাঁ, জমাটী লোক বই কি!

দেবীর কথা শুনিয়া দাদু ঝুলানো কোঁচাটি কোলের উপর তুলিয়া লইয়া একটু মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, দাদুর আর জমাবার কোন right নেইরে, এখন থেকে যে জমাবার সেই এসে জমাবে। দাদুকে পেসাদ দিস্, বুঝলিরে হতভাগা?

দেবী মাথা নিচু করিল।

দাদু বলিলেন, আ ম'লো যা! এরই মধ্যে লজ্জা? পরের মেয়েতো আর চুরি করতে যাচ্ছিস্ না, যাচ্ছিস্ বিয়ে করতে, বীরদর্পে যাবি—আলবৎ!

শ্রোতৃবর্গ সকলেই এক সঙ্গে দাদুর কথার ভঙ্গীতে হাসিয়া উঠিল, কিন্তু দেবীর মুখের চেহারাটা নিতান্তই কাহিল হইয়া পড়িল। দেবী তাড়াতাড়ি তাই দাদুকে থামাইবার জন্য বলিল, দাদু, আমাকে নিয়ে আজ পড়লে কেন? দয়া ক'রে সেই তোমার হাকিমদের নিয়েই পড়ো না। দশজনে শুনে খুসি হবে।

দাদু হ্যা-হ্যা-হ্যা করিয়া এক ঝোঁক হাসিয়া লইয়া বলিলেন, হাকিম ঘায়েলের ব্যবসাই যখন ছেড়ে দেওয়া গেচে তখন আর তাদের নিয়ে প'ড়ে কি হবে বল্ না? এখন তাদের নিয়ে পড়বে ঐ আমাদের তুলসী। ছোক্‌রা উকিল—ওদেরইতো উৎসাহ উদ্যম। কি বলো হে তুলসী?

তুলসী নূতন ওকালতি পাশ করিয়া ব্যাঙ্কশাল কোর্টে সবে যাতায়াত সুরু করিয়াছে। তুলসী দেবীর জ্যাঠতুতো ভাই। তুলসী দাদুর কথা শুনিয়া বলিল, কিন্তু দাদু, আপনাদের সে-কালের ওকালতি আর আমাদের এ-কালের ওকালতিতে অনেক তফাৎ।

দাদু অমনি বলিলেন, হুঁ, তফাৎ। নিশ্চয় তফাৎ। তোরা হ'লি নেক্‌টাই-হ্যাট্ চাপানো উকিল, আর আমরা

ছিলাম চাপকান-চড়ানো উকিল। হাকিমদেরও তেমনি হাল-চাল গেচে বদলে। তবে মোদ্দা কথাটা হ'লো এক। আমাদের কালেও হাকিমের মন যুগিয়ে কাজ হাসিল করতে হ'তো, এ-কালেও করতে হচ্ছে তাই। কিন্তু মন গেচে পাল্টে, কি বলিস্ তুলসী?

তুলসী বলিল, তা বই কি! এখন কি আর কোন' হাকিমকে 'ইয়োর্ রায় বাহাদুরশিপ্' ক'রে কাজ হাসিল ক'রে নিয়ে আসা যায়—অসম্ভব!

দাদু প্রাণ ভরিয়া এক চোট হাসিয়া লইলেন। দাদুর এত হাসির মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিতে না পারিয়া মন বড়ই খারাপ লাগিতেছিল, কাজেই বলিয়া ফেলিলাম, কি, কি, 'ইয়োর্ রায় বাহাদুরশিপ্' ব্যাপারটা কি দাদু শুনি?

দাদু সঙ্গে সঙ্গে অমনি কাপড়ের খুঁট দিয়া চোখ দুইটা একটু রগ্‌ড়াইয়া লইয়া বলিলেন, না, না, সে এমন নয়রে বাপু। ও তুলসীর কথা, ও বেটা অমন ব'লেই থাকে।

বলিয়া দাদু আর একটু হাসিলেন।

তুলসী বলিল, কিন্তু চমৎকার! ইয়োর রায় বাহাদুর-শিপের আর তুলনা হয় না।

শুনিবার জন্য অত্যুগ্র কৌতুহল হইতেছিল। কাজেই বলিয়া ফেলিলাম, কিন্তু আমরা শুনিনি, আমাদের শোনাতেই হবে।

দাদু মৃদু হাস্য সহকারে বলিলেন, জ্বালালি তুলসী, জ্বালালি! আচ্ছা, ব'লেই ফেলি। শোন্ তবে—

বলিয়া এমনভাবে দাদু আহ্বান করিলেন যে, সকলেই প্রায় একসঙ্গে তাঁহার দিকে ফিরিল দেবী ও তুলসীও শুনিবার জন্য কাণ বাড়াইল।

দাদু বলিতে লাগিলেন, ঘনশ্যাম বাঁড়ুয্যে আমাদের আলিপুরের এস্-ডি-ও ছিলেন। আজকের কথা নয়—সেই সুরেন মল্লিক ম'শায়ের আমলে। এক মামলার আসামীদের হ'য়ে সুরেন মল্লিক ম'শায় করলেন এস্-ডি-ওর কাছে জামিনের প্রার্থনা, সঙ্গে অবশ্য আরও বড় বড় দু'চারজন উকিল ছিলেন। ঘনশ্যাম বাঁড়ুয্যে সব শুনে বললেন, No! ব্যস্, আর 'হ্যাঁ' বলায় কার সাধ্য! দরখাস্ত না-মঞ্জুর হ'য়ে গেল। আসামীদের পক্ষের তদ্বির-কারেরা দু'দিন পরে এসে হাজির আমার কাছে। বললে, পারেন জামিন ক'রে দিতে? বললাম, খুব পারি, পারবে দু'শো টাকা দিতে? তখুনি তারা রাজি। 'জয় মা কালী' বলে ঝুলে পড়লাম। ঘনশ্যাম বাঁড়ুয্যেকে ঘায়েল করতেই হবে। জুনিয়রকে ডেকে বললাম, লেখ এক দরখাস্ত। জুনিয়র কি সব বাঁধা গৎ লিখতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে বললাম, ওসব ওকালতি ভুলে যা, এখন যা বলি তাই লেখ্, যেমন পুজো তার তেমন নৈবিদ্যি। ব্যস্, দরখাস্ত নিয়ে গিয়ে হাজির। মাম্‌লার নাম যেই না করা, আর যেই না জামিনের কথা বলা, অম্‌নি ঘনশ্যাম বাঁড়ুয্যে এই মারেতো মারে আর কি! বললেন, আমি এর আগেইতো জামিনের দরখাস্ত reject ক'রে দিয়েচি। বললাম, সেতো দেবেনই Sir, দেওয়াইতো উচিত হয়েচে। সে দরখাস্তে কোন' ground ছিল না, আর এতে ground আছে। Shall I read the petition?

—আচ্ছা, পড়ুন! ব'লে নিতান্ত অনিচ্ছায় যেন মত দিলেন। অম্‌নি পড়তে সুরু করলাম,—In the Court of Rai Bahadur—তিনবার পড়লাম ঐ একটা লাইন। তারপরেই চেয়ে দেখি, ঘনশ্যাম বাঁড়ুয্যে চোখ দু'টো মস্ত ক'রে চেয়ার থেকে পিঠ আল্‌গা ক'রে বসেচেন। বুঝলাম, ওষুধ কাজ করচে। গদগদ হ'য়ে বললে, Is it there in the petition কেশব? বললাম, আরও আছে স্যার, শুনুন,—

Most respectfully sheweth :—

Your Rai Bahadurship—

—ঘন ঘন কয়েকবার Your Rai Bahadurship আওড়াতেই হুজুর একেবারে টেবিলের ওপর হুম্‌ড়ি খেয়ে প'ড়ে বললেন, দেখি, দেখি!

—ব'লে লম্বা ক'রে একেবারে হাত বাড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে বললাম, এ ছাড়াও আরও আরও grounds আছে স্যার্ এবং শেষে আছে,—And for this kind act of Your Rai Bahadurship etc.,—ব'লে দরখাস্তখানা হুজুরের হাতে তুলে দিলাম। দরখাস্তখানা হাতে নিয়ে ঘনশ্যাম বাঁড়ুয্যে মহা খুসি হ'য়ে বললেন, এসব grounds তো কই মিষ্টার মল্লিক সেদিন একটিও বলেন নি—bail granted, Rs. 200/- each.

ব্যস্, নাচতে নাচতে একেবারে লাইব্রেরীতে ফিরে এলাম।

সকলেই একসঙ্গে একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া হাসিয়া উঠিল। আমি সাশ্চর্য্যে প্রশ্ন করিলাম, ground কি সত্যিই কিছু লেখা ছিল নাকি?

দাদু সর্ব্বাঙ্গ দুলাইয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, আবার কষ্ট ক'রে grounds লিখবে, ফাঁকা, একেবারে ফাঁকা। Your Rai Bahadurshipই একমাত্র ground!

আবার উচ্চ হাসি। হাসি আর যেন কাহারও থামিতে চাহে না। সবার হাসি থামিলে দাদু আবার বলিলেন, এখন বলি তবে শোন, এ মোক্ষম groundটি সংগ্রহ করা গেল কোত্থেকে। ঘনশ্যাম বাঁড়ুয্যে আমাদের পাড়াতেই বাড়ী করেছিলেন এবং বাড়ী করার পরেই ঠিক রায় বাহাদুর উপাধি পান। বাড়ী করার দরুণ কিছু ধার ছিল দোকানে। বিল নিয়ে লোক তাগাদায় আসতো। একদিন ঘনশ্যাম বাঁড়ুয্যে ম'শায়ের বাড়ীর সাম্‌নে দিয়ে যাচ্ছি, দেখি, এই রকম একটা লোকের সঙ্গে বাঁড়ুয্যে ম'শাই খুব চটাচটি করচেন। কি ব্যাপার, এগিয়ে গিয়ে দেখি, বাঁড়ুয্যে ম'শাই বলচেন, ব্যাটা, এ বিল আমার হ'তেই পারে না, কেমন ক'রে হবে, এই কি আমার নাম নাকি?

তারপরেই আমাকে কাছে পেয়ে বললেন, দেখোতো হে কেশব, এ বিল কি আমার নামে নাকি?

বিলটি হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ দেখলাম, কিন্তু বাঁড়ুয্যে ম'শায়ের বিল না হওয়ার কোন কারণই তো খুঁজে পেলাম না। নামও ঠিক আছে, বাড়ীর নম্বরও ঠিক আছে। হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল, তাইতো হুজুর যে রায় বাহাদুর খেতাব পেয়েচেন। অমনি আদায়কারীকে বললাম, আপনাদের কি আক্কেল শুনি ম'শাই? এ বিল আমাদের হুজুরের হ'তে যাবে কেন শুনি? হুজুরকে আমাদের গভর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত খাতির করচেন, আর আপনাদের একটু আক্কেল নেই? এ বিল হুজুরের নামে দিলে যে জেল হ'য়ে যাবে আপনাদের। যান, দোকান থেকে বিল ঠিক ক'রে নিয়ে আসুন গে', ঘনশ্যাম ব্যানার্জ্জি আর লিখবেন না, লিখবেন, রায় বাহাদুর ঘনশ্যাম ব্যানার্জ্জি।

রায় বাহাদুর খুসী হ'য়ে বললেন, you are a bright youngmen কেশব, তোমার আর তুলনা হয় না।

বললাম, একটু কৃপার চক্ষে রাখবেন।

পরে শুনেচি, বিল বদল ক'রে আনার জন্য সেদিন রায় বাহাদুর একসঙ্গে পঁচিশ টাকা দিয়ে ফেলেছিলেন, কিন্তু দশ টাকার বেশী এর আগে একসঙ্গে তিনি কোনদিনই দেন নি। সেই দিন থেকেই groundটা তোলা ছিল মনে মনে, সুবিধে পাওয়া কি অম্‌নি কোপ্। পরে সুরেন মল্লিক ম'শায় শুনে কি হাসি আর হাসি! সেই থেকে ঘনশ্যাম বাঁড়ুয্যের কোর্টের নামই হ'য়ে গেল, ইয়োর্ রায় বাহাদুরশিপের কোর্ট।

হাসিয়া সকলে তখন লুটাইয়া পড়িতেছিল। দাদু কিন্তু গম্ভীর হইয়া নীরব হইলেন।

কেশব চাটুয্যে একবার সুরু করিলে আর কথা নাই, হাকিমদের কীর্ত্তি-কাহিনীতেই রাতের পর রাত কাটাইয়া দিতে পারেন। কাহিনীর পর কাহিনী চলিতে লাগিল। আমরা যে ট্রেণে চাপিয়া দূরদেশে রাত্রিকালে পাড়ি দিতেছি, তাহা প্রায় ভুলিয়াই গেলাম। সঙ্গে কয়েক জোড়া তাস নেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু কাহারও সে কথা আর মনেই হইল না। দাদু পথশ্রম আমাদের প্রায় ভুলাইয়াই রাখিলেন।

কথায় কথায় অনেক রাত হইয়া গেল। শেষে দাদু ক্লান্ত হইয়া এক সময় বলিলেন, হতভাগারা সব একটু ঘুমিয়ে নে এ ওর পিঠে মাথা রেখে; নইলে কাল সকালে গিয়ে সেখানে পৌছে যে সব ঢুলতে হবে।

কথাটা সত্য, কিন্তু আগ্রহ যে কাহারও বিশেষ আছে তাহা মনে হইল না। কারণ, একে স্থানাভাব তাহাতে রাত ভোর হইতেও বেশী আর বিলম্ব নাই। ওদিকে সকলেই প্রায় ক্লান্তি ও অবসাদে থাকিয়া থাকিয়া ঝিমাইয়া পড়িতেছিল।

দাদু রীতিমত ক্লান্ত হইয়া চোখ বুঁজিয়া আরাম করিতে লাগিলেন, আর থাকিয়া থাকিয়া নিদ্রালস ভঙ্গীতেই হাতের ধরানো সিগারেটে নিষ্প্রয়োজনের টান দুই একটা দিতে থাকিলেন।

ভোর বেলা যথাস্থানে পৌছিয়া ট্রেণ হইতে নামিতেই কন্যাপক্ষীয়েরা আমাদের আসিয়া ঘিরিয়া ধরিল।

দেবীর প্রতি নজরটা সবারই একটু অতিমাত্রায় তীক্ষ্ণ। সকলেই তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল, দাদুও লক্ষ্য করিলেন। লক্ষ্য করিয়া সকলেই নীরব ছিল, কারণ দেবীই বর, দেবীর প্রতি সকলের নজর কিছু প্রখর হওয়াই স্বাভাবিক। দাদু কিন্তু নীরব থাকিতে পারিলেন না, কন্যাপক্ষীয়ের একজনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমাদের দিকেও একটু নজর দেবেন স্যার্, আমরাও নিতান্ত ফেল্না নই, হাকিম না হ'তে পারি—হাকিমের চাপরাশিতো!

ভদ্রলোক বিব্রত হইয়া বলিলেন, আহা, কি যে বলেন স্যার্!

দাদু চমৎকার একটু হাসিয়া বলিলেন, কি যে বলি নয় স্যার্, অভিজ্ঞতার কথাই বলচি। হাকিম হাত করতে হ'লে তার চাপরাশি-পেশ্‌কার আগে হাত করতে হয়। ওকালতি-শিক্ষার প্রথম ভাগে সেই কথাই লেখা আছে ম'শায়।

ভদ্রলোক বে-কায়দা দেখিয়া দাদুর নিকট হইতে সরিয়া পড়িল।

মোটরে চাপিয়া সব বিবাহ-বাড়ীর পাশের একটা বাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। বাড়ীর সম্মুখের গেটের একধারে পাথরের ফলকে লেখা রহিয়াছে দেখিলাম, Rai Sashisekhar Mukherjee Bahadur; এবং গেটের অপর দিকে আর একটি পাথর ফলকে লেখা—'মন্দাকিনী'। রায় বাহাদুরের পত্নীর নামই হয়তো হইবে, এখন বাড়ীর নামে দাঁড়াইয়াছে।

দাদুও তাহা লক্ষ্য করিলেন এবং আমার প্রতি চাহিয়া নীরবে একটু হাসিয়া বলিলেন, এখানেও যে ইয়োর রায় বাহাদুরশিপ্‌রে অনাদি, গভর্ণমেণ্ট কত ছড়িয়েচে বলতো?

দাদুর কথার ভঙ্গীতে না হাসিয়া আর পারিলাম না।

'মন্দাকিনী'র গেটে দাঁড়াইয়া যিনি আমাদের আপ্যায়িত করিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন, পরে জানিলাম, তিনি দেবীর জ্যাঠ্ শ্বশুর। ভদ্রলোক দেখিতে অতি সুপুরুষ। দেবীর শ্বশুরেরা তিন ভাই। দেবীর শ্বশুর তাঁহাদের মধ্যে মেজ। একে একে তিন ভাইই আসিয়া আমাদের সাদর সম্ভাষণ জানাইলেন, কিন্তু বড়র উপস্থিতি ও প্রাধান্য সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করিয়া।

দেবীর শ্বশুর আসিয়া বলিলেন, আপনাদের জন্য রায় বাহাদুর স্বয়ং রইলেন। যার যা দরকার তখনি বলবেন রায় বাহাদুরকে।

বলিয়া রায় বাহাদুর অর্থাৎ দাদাকে দেখাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। দেবীর খুড়্‌শ্বশুরও যথারীতি রায় বাহাদুরকে দেখাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

দাদু ব্যাপারটা প্রথম লক্ষ্য করিলেন এবং মোলায়েম একটু হাসিয়া আস্তে করিয়া বলিলেন, আবার রায় বাহাদুরশিপের পাল্লায় পড়া গেল রে অনাদি। ভাইয়েরা কেউ দাদা বলে না যেরে, লক্ষ্য কর্‌লি?

বলিলাম, হুঁ, তা'তো লক্ষ্য করলাম।

ক্রমেই দেখা গেল, যে আসে সেই বলে, ও রায় বাহাদুর স্বয়ংইতো রয়েচেন এখানে।

কাজেই আর কাহারও থাকিবার যেন প্রয়োজন বা অধিকার নাই। আর কেহ কেহ আসিয়া রায় বাহাদুরকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাইয়া 'কেমন আছেন' 'ভাল আছি' করিয়া আমাদের প্রতি একটা সলজ্জ দৃষ্টি হানিয়া আবার চলিয়া গেল। এ যেন রায় বাহাদুরকে খুসি করিবার জন্যই আসা একবার, নহিলে বিদেশাগত বরযাত্রীদের পরিচিত হইবার কোন বাসনাই নাই।

দাদু শেষে চটিয়া গিয়া বলিলেন, আঃ ম'লো যা! বেটারা রায় বাহাদুর পর্ব্ব শেষ ক'রেই যে যার স'রে পড়ে যে!

দাদুর কথাটা রায় বাহাদুরের কাণে গেল কিনা কে জানে! একটু বিব্রত হইয়া বলিলাম, আঃ, যেতে দিন দাদু!

দাদু বলিলেন, যেতে দেব কি রে? এসেচি নাতির বিয়েতে বরযাত্রী, এখানে এসেও কি ইয়োর্ রায় বাহাদুরশিপ্ করতে হবে নাকি?

বলিলাম, আঃ, চুপ্, চুপ্ দাদু!

বিবাহ-কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হইল। আমাদের আদর আপ্যায়নের কোন প্রকার ত্রুটিই হয় নাই।

রায় বাহাদুর লোকটি অষ্ট-প্রহর আমাদের তত্ত্বাবধানে ব্যস্ত, কোন প্রকার অসুবিধাই তিনি আমাদের অনুভব করিতে দেন নাই, বরং একটু বাড়াবাড়ি করিতেছেন বলিয়াই মনে হইয়াছে। দাদুর সঙ্গে রায় বাহাদুরের ইতিমধ্যে খুবই জমিয়া গিয়াছে এবং সময়ে সময়ে দাদু আমাদের প্রতি চোখ নাচাইয়া রায় বাহাদুরকে 'ইয়োর্ রায় বাহাদুরশিপ্' বলিয়াও সম্ভাষণ করিতে ছাড়িতেছেন না। ব্যাপারটা আমাদের কাছে খুবই উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে এবং হাসি আমরা অতি কষ্টে যেন চাপিয়া আছি।

বিবাহ রাত্রির পরের দিন অপরাহ্নে শহরের কয়েকজন গণ্যমান্য ভদ্র ব্যক্তি ও দুই ভ্রাতার সমভিব্যাহারে রায় বাহাদুর আমাদের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। কারণ, রাত্রের ট্রেণেই আজ আমাদের আবার ফিরিতে হইবে।

দাদু একটা তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়া, কাৎ হইয়া, একটা সিগারেট বেশ আরাম করিয়া টানিতেছিলেন, কিন্তু আগন্তুকদের দেখিয়া সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, এই যে—আসুন, আসুন, ইয়োর্ রায় বাহাদুরশিপ্! আপনার কথাই ভাবছিলাম। এই বয়েসে আমাদের জন্যে কি করাটাই না করলেন!

রায় বাহাদুরের সঙ্গে সকলেই আসিয়া দাদুর নিকটবর্ত্তী হইয়া বসিল। দাদুই সকলের স্থান করিয়া দিয়া বসাইলেন।

রায় বাহাদুর বসিয়া বলিলেন, যাক্, আপনাদের সবার সহযোগিতা আর শুভেচ্ছায় যে নির্ব্বিঘ্নে হরেনের কাজটা শেষ হ'য়ে গেল, সেইটিই সুখের কথা।

দাদু অমনি বলিলেন, নির্ব্বিঘ্নে এখনই বলবেন না। ইয়োর্ রায় বাহাদুরশিপ্ তো নির্ব্বিঘ্নে এখানকার কাজ সেরে নিলেন, কিন্তু আমাদের বাড়ী ফিরে কি হালটা হয়, আগে দেখি। কারণ, এই বয়েসে যে অত্যাচারটা আপনাদের দশজনের অনুরোধে।

রায় বাহাদুরের বন্ধু প্রিয়বাবু বলিলেন, আচ্ছা, চাটুয্যে ম'শাই, আপনি রায় বাহাদুরকে 'ইয়োর্ রায় বাহাদুরশিপ্' ব'লে বহুবার সম্বোধন করছেন, আজ দু'দিন ধ'রেই তা' লক্ষ্য করচি, কিন্তু কেন জানতে পাই কি?

দাদু হাসিয়া কথাটা উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন, না, না, ও এম্‌নিই। রায় বাহাদুরের সঙ্গে আমার সুবাদই যে ঠাট্টার!

রায় বাহাদুর বলিলেন, হুঁ, তা বই কি, তা বই কি! ও যেতে দাও প্রিয়।

প্রিয়বাবু ছাড়িবার পাত্র নয়, বলিলেন, না হে রায় বাহাদুর; চাটুয্যে ম'শাই অতি রসিক লোক, কাল খেতে ব'সেই আমি তা টের পেয়েচি। একটা কিছু আছে নিশ্চয়ই।

দাদু বলিলেন, ও আমাদের আলিপুরের এক হাকিমের কাহিনী। With due apologies to Rai Bahadur, আপনারা শুনতে চাইলে অবশ্য শোনাতে পারি।

প্রিয়বাবু বলিলেন, হুঁ, আমরা শুনতে চাই বই কি!

দাদু একবার আমাদের দিকে চাহিয়া 'ইয়োর্ রায় বাহাদুরশিপ'—কাহিনী পূর্ব্বাপর সরলভাবে বর্ণনা করিয়া গেলেন।

বর্ণনা শেষ হইলে রায় বাহাদুর স্বয়ং হাসিয়া একেবারে গড়াইয়া পড়িতে চাহিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে মুখের চেহারাটাও তাঁহার কেমন যেন একটু ম্লান হইয়া গেল। রায় বাহাদুরের দুই ভ্রাতার মুখে কিন্তু হাসি একেবারে ফুটিল না।

প্রিয়বাবু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হাসিয়া শেষে হাসিতে হাসিতেই বলিলেন, ইয়োর্ রায় বাহাদুরশিপই হ'ল আপনার একমাত্র ground?

দাদু বলিলেন, আবার কি! ওর চেয়ে আর ভাল ground কি হ'তে পারে! কিন্তু রায় বাহাদুরকে শেষ বয়সে দেখেছি, নিত্য গীতা আর চণ্ডীপাঠ করচেন।

কাশ্মীর

শ্রীদুর্গাশঙ্কর মহলানবীশ

পৌরাণিক, হিন্দু, বৌদ্ধ এবং মোগল যুগের কত স্মৃতি যে কাশ্মীরে ছড়াইয়া রহিয়াছে, সংক্ষেপে লিখিয়া শেষ করা যায় না। শীতকালে এসব দেখা সম্ভবও নয়। বরফ পড়িয়া যানবাহন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। হিন্দুর পূত তুষারতীর্থ অমরনাথ আমি দেখি নাই। তের হাজার ফুট উচ্চ শৃঙ্গে চির-তুহিন এক বিস্তৃত গুহায় অমরনাথের বিগ্রহ। শ্রীনগর হইতে প্রায় ৯৫ মাইল দূর। শ্রাবণ পূর্ণিমার দিন পুণ্যকামী হিন্দুযাত্রিগণ অমরনাথকে দর্শন করিতে আসেন। শুনিলাম একটী ঝরণার জল শীতে জমিয়া অমরনাথের এই লিঙ্গ-বিগ্রহ সৃষ্ট হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ এখানে আসিয়াছিলেন। প্রাচীন কীর্ত্তি এবং নৈসর্গিক দৃশ্যের মধ্যে অনন্তনাগ, ভেরিনাগ, আচ্ছাবল মার্ত্তণ্ড, বাওয়ান, অবন্তীপুর, পায়েক, কাঠিয়ার, নরসিংহ মন্দির, সোনামার্গ, গুল্‌মার্গ, কোলাহি তুষার-নদী, পরিয়াসপুর প্রভৃতি দেখিবার আছে।

পরিয়াসপুরের কাহিনী বাঙ্গালীর বীরত্বের এক গৌরবময় অধ্যায়। কহ্লণের রাজতরঙ্গিণীতে ইহার একটী চমৎকার বর্ণনা আছে। কাশ্মীরের নৃপতি প্রথম ললিতাদিত্য (৬৯৫—৭৩২) পরিহাসপুরে (বর্ত্তমান পরিয়াসপুর) রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়া "পরিহাস-কেশব" এবং "রামস্বামিন্" নামে দুইটী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। পরিহাস-কেশব তাঁহার বড় প্রিয় ছিলেন। পরিহাস-কেশবকে মধ্যস্থ রাখিয়া একদা তিনি গৌড়েশ্বরকে কাশ্মীরে আমন্ত্রণ* করেন। গৌড়পতি ত্রিগামিনীতে পৌঁছিলে, ললিতাদিত্য দেবতার নিকট যে প্রতিশ্রুতি করিয়াছিলেন, তাহা ভাঙ্গিয়া গুপ্তঘাতক দ্বারা রাজ অতিথিকে হত্যা করেন। অনতিবিলম্বে এই নির্ম্মম সংবাদ বাংলায় পৌঁছিল। গৌড় নৃপতির অনুচরগণ এ অপমান সহ্য করিলেন না। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া দেবদর্শনের অছিলায় তাঁহারা কাশ্মীর যাত্রা করিলেন। পূর্ব্বেই ললিতাদিত্য রাজধানী ছাড়িয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং গৌড়ের বীর সন্তানগণ পরিহাসপুরে তাঁহাকে না পাইয়া, তাঁহার প্রিয় দেবতা পরিহাস-কেশবকে চূর্ণ করিয়া প্রতিহিংসা লইতে চাহিলেন। ভুলে পরিহাস-কেশবের পরিবর্ত্তে রামস্বামিনের মূর্ত্তিটী ধ্বংস হইল। ইতিমধ্যে রাজসৈন্য আসিয়া পড়ে। দূরাগত মুষ্টিমেয় অনুচর সৈন্য-দলের সহিত বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া একে একে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। বাঙ্গালীর রণশৌর্য্যে মুগ্ধ কহ্লণ দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—সে বীরত্ব কাশ্মীরে আজ আর দেখিতে পাওয়া যায় না!

স্বপ্নমধুর পপ্‌লার বীথি

রাজতরঙ্গিণীতে নিহত গৌড়েশ্বরের নামোল্লেখ নাই। গৌড়পতির সহিত কি সূত্রে ললিতাদিত্যের শত্রুতা হয়, তাহাও অনিশ্চিত। এই বৈরিতা দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। পরে আমরা দেখিতে পাই, ললিতাদিত্যের বংশধর রাজা

* গৌড়েশ্বর প্রতিশ্রুতি পাইয়া আসিয়াছিলেন। আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন কিনা উল্লেখ নাই। কহ্লণের বর্ণনা পড়িয়া মনে হয়, আমন্ত্রিত হইয়াই আসিয়াছিলেন।—লেখক

জয়াপীড় বাংলার রাজকুমারী কল্যাণ দেবীর পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। মন্ত্রীর ষড়যন্ত্রে রাজ্য হারাইয়া কাশ্মীরাধিপতি ছদ্মবেশে পুণ্ড্রবর্দ্ধনে আসেন। তখন কার্ত্তিকেয়ের মন্দিরে দেবদাসীর নৃত্য হইতেছিল। জয়াপীড় মুগ্ধ হইয়া নৃত্য দেখিতে লাগিলেন। আগন্তুকের অসাধারণ অঙ্গসৌষ্ঠব নর্ত্তকী কমলার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া নিজ গৃহে লইয়া যায়। পুণ্ড্রবর্দ্ধন তখন বাংলার রাজা জয়ন্তের শাসনাধীন। জয়াপীড়ের পরিচয় পাইয়া জয়ন্ত তাঁহার সহিত কন্যা কল্যাণ দেবীর বিবাহ দেন। পরে জয়াপীড় হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া কমলা ও কল্যাণ দেবীর সহিত কাশ্মীর যাত্রা করেন। কল্যাণ দেবী জয়াপীড়ের যে প্রিয় মহিষী ছিলেন, তাহাও দেখিতে পাই। কল্যাণ দেবীর পুত্র সংগ্রামপীড় ৭৯৭ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করেন।

পূর্ব্ব ভারতের সহিত কাশ্মীরের এই ঘনিষ্ঠতা শুধু যে একটা ঘটনা-চক্রের যোগাযোগ তাহা নহে। আসামের রাজকুমারী অমৃতপ্রভাকেও কাশ্মীররাজ মেঘবাহন বিবাহ করিয়াছিলেন। কাশ্মীর এককালে শিক্ষায় ও সমৃদ্ধিতে ভারতের এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। বাঙ্গালী ছাত্রেরা কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে আসিত।* আরও দেখিতে পাওয়া যায়—কাশ্মীরের কুশান মুদ্রা বঙ্গদেশে চলিত। অনুরূপ তিনটী স্বর্ণমুদ্রা রাজসাহীতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

শ্রীযুত রঞ্জিৎ সীতারাম পণ্ডিত "রাজতরঙ্গিণী" ও "দেশোপদেশের" উপর নির্ভর করিয়া সে সময়ের বাঙ্গালীর চেহারাকে কাল (dark) বলিয়াছেন। কহ্লণ গৌড়ের নিহত অনুচরদের বর্ণনায় "শ্যাম" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। সুতরাং মনে হয়, বাঙ্গালীর এখনও যে রং, ১২শত বৎসর পূর্ব্বেও তাহাই ছিল। বঙ্গের এই শ্যামলাঙ্গী রমণীদের কাশ্মীর নৃপতিগণ বিবাহ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই, কিন্তু দাক্ষিণাত্যের প্রতি তাঁহাদের ঘৃণা ছিল (তরঙ্গ ৪, শ্লোক ১৮০)।

তখন কাশ্মীরীদের বর্ণ কিরূপ ছিল, তাহারও উল্লেখ পাই রাজতরঙ্গিণীতে। একস্থানে তাহাদিগের অনাবৃত দেহের রং হরিতালের ন্যায় বর্ণিত আছে। একজন নৃপতির অঙ্গ "সরোজকর্ণিকা-গৌর" অর্থাৎ পদ্মের বহিরাবরণের ন্যায় মলিন। আধুনিক কাশ্মীরীদের বর্ণের বহু খ্যাতি শুনিয়াছি, কিন্তু আমার চোখে তাহারা তাম্রাভ, পীতাভ, বাদামী, গৌর প্রভৃতি নানা রঙে প্রতিভাত হইয়াছে। কাশ্মীরী রমণীদের সৌন্দর্য্যের খ্যাতিও অসাধারণ। আমি তাহাদের গঠনশ্রীতে অসাধারণত্ব খুঁজিয়া পাই নাই। Encyclopædia Britannica খুলিয়া দেখিলাম—"এত রূপের খ্যাতি সঙ্গত নয়।" কিন্তু ব্যার্ণিয়ে* মেয়েদের রূপসী আখ্যায় ভূষিত

কাশ্মীরী গৃহশ্রী

করিয়াছেন। তিনি পারস্য দেশীয় বর সাজিয়া কনের খোঁজে বাহির হইয়াছিলেন, নিশ্চয়ই সাজ-সজ্জায় পরিশোভিত অনেক মেয়ে দেখিয়াছেন। আমি স্কুল-গামিনী প্রাপ্তযৌবনা কুমারীদের দেখিয়াছি, মুগ্ধ হই নাই। পথে ঘাটে যে সব মেয়েদের দেখা যায়, তাহারা কুৎসিত না হইলেও, সুন্দরী বলিব না। অপরিচ্ছন্নতায় কাবুলীদের হার মানায়। কদাচিৎ দুই একজন সত্যই সুন্দরী, ইহাদের গঠন ইহুদীর মত।

কাব্যে, কল্পনায়, অনুপ্রাসে কাশ্মীর রূপ নীহারিকায় বিকশিত এক অপূর্ব্ব দেশ। ব্যার্ণিয়ে† ইহাকে

* ক্ষেমেন্দ্রের "দেশোপদেশ" হইতে শ্রীরঞ্জিৎ সীতারাম পণ্ডিত কর্ত্তৃক উল্লিখিত।

* French physician Francois Bernier.

† ফরাসী ডাক্তার Francois Bernier ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরে আসিয়াছিলেন।

"Paradise of the Indies"—বিশাল ভারতের স্বর্গ বলিয়াছেন। শুধু ব্যার্ণিয়ে নয়, বহু বিদেশী কাশ্মীর দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। কেহ কেহ এখানে বাইবেলে বর্ণিত মূশার প্রিয় ইহুদী জাতির লুপ্ত বংশ এখন দেখিতে পান—রাখাল মেষপাল লইয়া সবুজ বনের ধারে এখনও চরিয়া বেড়ায়। কাশ্মীরী রমণী কারণে অকারণে রূপসীর আখ্যা পাইয়াছে। কুহু-কূজন, বনবীণা, যৌবন, বসন্ত, মনসিজ—কিছুরই বুঝি অভাব কাশ্মীরে নাই! নাগ, নাগিনী, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, পরী, অপ্সরা, কিন্নরী, ডাইনী, দৈত্য, দানবের প্রিয় ভূমি এই ভূ-স্বর্গ। ইহারই চারিদিকে বিক্ষিপ্ত প্রাকৃতিক প্রাচুর্য্যের আশে-পাশে—হ্রদের ধারে, গিরিপ্রপাতে, ঝরণায়, ঝিলে, জঙ্গলে অর্দ্ধ-নর-মূর্ত্তি অপদেবতারা সব বাস করে। ফুলের পরিমল, প্রভাতী শিশির প্রভৃতি খাইয়া ইহারা আনন্দে বিচরণ করে, মানুষের সুখদুঃখের সন্ধান লয়। হীন-যোনিরা আবার বীভৎসভোজী, নিশাচারী। কাশ্মীরীরা এখনও এসব বিশ্বাস করে।*

কাশ্মীরের জন্মকথার ইতিহাসেও আছে এমনি একটা রাক্ষসের উপাখ্যান। পুরাকালে কাশ্মীর ছিল একটা প্রকাণ্ড হ্রদ।† শ্রীনগরের "ডাল হ্রদ" এই প্রাচীন হ্রদেরই লুপ্তাবশেষ। জলোদ্ভব নামক একটা রাক্ষস এই হ্রদে বাস করিত। হ্রদের নিকটবর্ত্তী জনপদের লোকজন সে খাইয়া ছারখার করিয়া ফেলিতে লাগিল। একদা কশ্যপ মুনি তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইয়া কাশ্মীরের দুর্দ্দশা দেখিয়া ব্যথিত হইলেন। তিনি সহস্র বৎসর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের তপস্যা করিলে, অনন্তরূপী বিষ্ণু বরাহমূলে (আধুনিক বরামুল্লা) পাষাণ প্রাচীর ভাঙ্গিয়া হ্রদের জল বাহির করিয়া দিলেন। জলোদ্ভব উপায়হীন হইয়া ধূমাবরণে আপনাকে আচ্ছাদিত করিল। তাহা দেখিয়া বিষ্ণু রবি-শশী দুই হাতে লইয়া ধূম্রজাল বিকীর্ণ করিয়া ফেলিলেন, কিন্তু রাক্ষস একটা জলাশয়ে গিয়া ডুব দিল। কশ্যপের প্রার্থনায় পার্ব্বতী সুমীর পর্ব্বতের একটা খণ্ড দ্বারা জলোদ্ভবকে সংহার করেন। আজকাল "ডাল হ্রদের" পারে যে হরি-পর্ব্বত দেখা যায়, উহাই এই সুমীর পর্ব্বতের ভগ্নাংশ এবং হিন্দুর কাছে পবিত্র। কশ্যপের নাম হইতে এই প্রদেশের নাম কশ্যপপুর হইয়াছিল, পরে কাশ্মীর হইয়াছে।

কাশ্মীর একদিন ছিল আর্য্যদের নর্ম্মভূমি, এখন ঐস্লামিক পাকিস্থানের স্বপ্ন। ইহার উপর দিয়া কত ঝঞ্চা যে বহিয়া গিয়াছে, তাহার ইতিহাস নাই। সম্রাট্
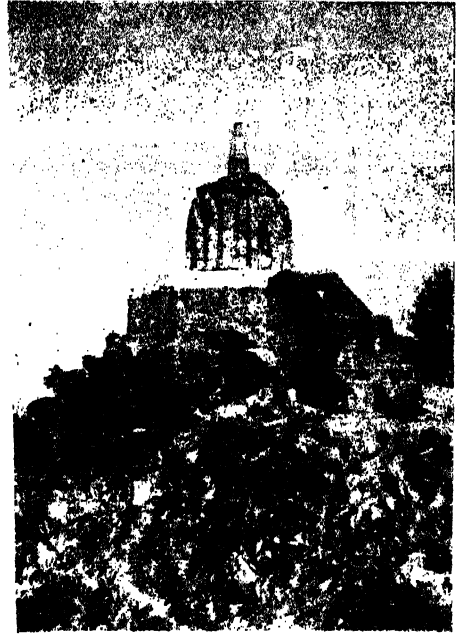
প্রসিদ্ধ শিবমন্দির: শঙ্করাচার্য্য পাহাড়

অশোককেই আমরা প্রথম দেখি ঐতিহাসিক শ্রীনগরীতে। এই নাম তাঁহারই দেওয়া। বর্ত্তমান শহর হইতে তিন মাইল দূরে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "শ্রীনগরী" ছিল, এখন তাহার অবশিষ্ট আছে "পান্দ্রেথান" বা পুরাণাধিষ্ঠান। প্রবরসেন দ্বিতীয় শতাব্দীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া আধুনিক শ্রীনগরের সূচনা করেন। কণিষ্ক এখানে তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসভা আহ্বান করিয়াছিলেন, বোধিসত্ত্ব নাগার্জ্জুন এখানেই তথাগতের মহামন্ত্র প্রচার করেন। তারপর ধীরে ধীরে বৌদ্ধ প্রভাব ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন-সং, যু-কং প্রভৃতি আসিয়া এই অবনতি

* শুনিয়াছি, রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষদের আত্মা এখনও মাছের ভিতর আছে, তাই জম্মুর তায়ী নদীর অংশ বিশেষে মাছ ধরা নিষিদ্ধ।

† ভূ-তত্ত্ব বিশেষজ্ঞেরা এ কথা স্বীকার করেন। কাশ্মীর কোটী কোটী বৎসর সাগর তলে ছিল। আনুমানিক ৪০ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে বহু ঘাতপ্রতিঘাতের পর ইহার শেষ জন্ম হয়। —লেখক।

বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন। গজনীর মামুদ যখন ১০১৫ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীর লুণ্ঠনে অগ্রসর হন, তখনও কাশ্মীরে হিন্দু গৌরব লুপ্ত হয় নাই। মামুদ সিদ্ধকাম হইতে পারেন নাই। তারপর আরও তিনশত বৎসর হিন্দুর শাসন কাশ্মীরে অক্ষুণ্ণ ছিল। রাণী কোটা-ই ইহার শেষ হিন্দু শাসিকা। তাহার মুসলিম উজীর আমীর শা ১৩১৯ খৃষ্টাব্দে তাহাকে হত্যা করিয়া সামসুদ্দিন নামে সিংহাসনারোহণ করেন। ইহাই কাশ্মীরে মুসলিম রাজত্বের প্রারম্ভ। আকবর কাশ্মীর মোগল সাম্রাজ্যান্তর্ভুক্ত করেন ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দে। কাশ্মীরের নানা স্থানে যে সকল সুশোভিত বাগান, মস্‌জিদ্ প্রভৃতি এখনও আমরা দেখিতে পাই, তাহার অধিকাংশই সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের কীর্ত্তি।

জম্মু শহরে সূর্য্যোদয়

পরবর্ত্তী আফগান রাজত্ব কাশ্মীরের এক ভয়াবহ ইতিহাস। তাহাদের প্রভুত্ব মাত্র ৬৯ বৎসর, কিন্তু এই অল্প কালেই কাশ্মীরে হিন্দুর উপর যে নিষ্ঠুরতার অভিনয় হয়, তাহা পৃথিবীতে বিরল। এই সময়ে সমস্ত হিন্দুকে নির্ম্মম-ভাবে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া আফগান শাসকগণ নৃসংশতার এক বিষম ইতিহাস রাখিয়া গিয়াছেন। ফলে কাশ্মীরের ৩৩,২০,৫১৮ অধিবাসীর মধ্যে আজ মাত্র ৬,৯২,৬৩১ হিন্দু এবং ৩৭,৬৩৫ জন বৌদ্ধ অবশিষ্ট আছে।

তারপর ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিং আফগানদের পরাভূত করিয়া কাশ্মীর অধিকার করেন। তাঁহার প্রিয় সেনানী গোলাপ সিংকে তিনি জম্মুর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান। রণজিতের উত্তরাধিকারী সের সিং আলিওয়ালের যুদ্ধে ইংরাজদের হাতে পরাজিত হইলে যে সন্ধি হয়, তাহাতে গোলাপ সিংকেই তাহারা কাশ্মীরের রাজা বলিয়া মানিয়া লয় (১৮৪৬)।

গোলাপ সিং রাজপুত। কাশ্মীরের বর্ত্তমান রাজবংশ গোলাপ সিংএর বংশধর। গোলাপের পর ক্রমান্বয়ে রণবীর সিং ও প্রতাপ সিং রাজত্ব করেন। বর্ত্তমান মহারাজা স্যার হরি সিং প্রতাপ সিংএর দত্তক পুত্র।

কয়েক দিন ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানগুলি দেখিয়া দেখিয়া কাটিল। একাকী বসিয়া আর ভাল লাগিতেছিল না। লোকাভাবে হোটেলগুলি প্রায় সবই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আমার হোটেলের তেতলায় আমি একাকী, দোতলায় আরও দুইটী প্রাণী ছিলেন; তাঁহারা দর্শক নহেন, কাজে আসিয়াছেন। বরফ পড়িয়া দূরের দৃশ্যগুলি দুরধিগম্য হইয়া উঠিয়াছে। সঙ্গী খুঁজিতেছিলাম ইহারই কোন একটা দুর্গম যাত্রার উদ্দেশ্যে। সিন্ধু গভর্ণমেণ্ট একজন বিশেষজ্ঞকে পাঠাইয়াছিলেন কাশ্মীরের মৌমাছির চাষ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিতে। তিনি কাশ্মীরের কিছুই দেখেন নাই। তাঁহাকে বলিলাম, "চলুন, মোটরে এক দিনে যাওয়া যায়, এমন কোন একটা জায়গায়।" তিনি রাজী হইলেন না। অগত্যা সব মোটর আফিসে খবর দিলাম, কেহ দূরে যাওয়ার জন্য গাড়ী ভাড়া করিতে আসিলে আমাকে যেন টেলিফোন করে।

ভয়ানক শীত পড়িয়াছে, আর কিছু দিনের মধ্যেই জম্মুর রাস্তা বরফে ঢাকিয়া যাইবে। কাশ্মীর গভর্ণমেণ্ট পূর্ব্বেই আমলা-কর্ম্মচারীসহ জম্মুতে নামিয়া গিয়াছেন। শীতের সহিত আসন্ন যুদ্ধের আশঙ্কায় বাকী নাগরিকেরা নানাভাবে অগ্নির পূজা সুরু করিয়া দিয়াছে। আব্‌হাওয়ার আফিসে টেলিফোন করিয়া জানিলাম, তাপমান যন্ত্রের পারা ২৮° ডিগ্রীর ঘরে।

একদিন খবর আসিল একখানি মোটর বাস গুল্‌মার্গ যাইতেছে একটা কণ্ট্রাক্টের কাজে। গুল্‌মার্গ অর্থাৎ গোলাপ-ময়দান শ্রীনগর হইতে ২৮ মাইল দূরে। ৮,৭০০

ফুট উচ্চ পাহাড়ের উপর ইহা একটি মনোরম উপত্যকা, সাহেবদের প্রিয় গ্রীষ্মাবাস। শ্রীনগরের উচ্চতা মোটে ৫,২১৪ ফুট। সেখানকার শীতই অনেকের কাছে অসহনীয়। গুল্‌মার্গে এ সময়ে লোক থাকিতে পারে না। আমি বাসের সামনের সীটটী রিজার্ভ করিয়াছিলাম, স্থির ছিল, পরদিন সকাল ৯ টায় গাড়ী ছাড়িবে।

সে দিন শনিবার। ভোরে উঠিয়াই স্নানাহার সারিয়া মোটর আফিসে চলিলাম। গিয়া দেখি বাসের নামে দেখা নাই। ম্যানেজার বাবু বলিলেন, "বসুন, মাল আনতে গেছে, এক্ষুণি আসবে।" ১০টা বাজিয়া গেল, কেহ আসিল না। শীতে হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছিল, রাস্তায় নামিয়া পাইচারী করিতে লাগিলাম। একটু পরে বাসের ঠিকাদার খবর দিল, সে দেখিয়াছে বাস মাল লইয়া ছাড়িয়া যাইতে। বিরক্ত হইলাম, আফিসের লোকদের সাথে জোর কথা কাটাকাটি হইল। ভাড়া ফেরৎ লইয়া সবে হোটেলে ফিরিয়াছি, একটা লোক ডাকিতে আসিল, বাস আসিয়াছে। আবার গেলাম, বাস তখনও ছাড়িল না। গ্যারেজ হইতে খটাখট্ শব্দ আসিতেছিল, বোধ হয় মেরামতের শব্দ, কিন্তু আমাকে তারা কিছুই বলিল না। অবশেষে বেলা এগারটার পরে এখানে সেখানে গাঁয়ের সস্তা যাত্রী সংগ্রহ করিতে করিতে বাস চলিতে সুরু করিয়া দিল। একজন লোকের যাওয়ার কথা ছিল, ৩।৪ মাইল দূরে গিয়া ড্রাইভার তার জন্যে বাস রাখিয়া কোথায় যে অন্তর্হিত হইল, ৪৫ মিনিটের আগে তার আর দর্শন পাওয়া গেল না। সে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া আবার আসিয়া ইঞ্জিনে ষ্টার্ট দিল। কিন্তু গাড়ী অচল। নামিয়া দেখিলাম, দুই পাশের দুইটি টিউবই ছিদ্রযুক্ত, পুটীনজাতীয় পদার্থ দিয়া জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, খুলিয়া গিয়াছে। শনি ঠাকুরকে কোন দিন মানিতাম না, কিন্তু দেখিতেছি—তিনি এ যাত্রায় ভাল করিয়াই ঘাড়ে চাপিতে সুরু করিয়াছেন। অতি কষ্টে আবার পুটীন দিয়া গাড়ী চলিল। প্রায় অর্দ্ধেক রাস্তা যাইতে যাইতেই আরও দুই বার গাড়ী খারাপ হইল। ড্রাইভারকে বলিলাম—"বেলা থাকৃতে ট্যাঙমার্গ না পৌছিলে, চড়াই উতরাই করার সময় থাকবে না। তা'হলে আমার কিছুই দেখা হবে না।" ফিরিয়া আবার কথাটা মনে মনেই রাখিলাম, তাহাকে আর বলিলাম না। ড্রাইভার উত্তর দিল,—"কুছ্ পরোয়া নেহি।" ভাল করিয়াই জানিতাম, গুলমার্গ হইতে রাত্রে ফিরিতে না পারিলে, আমার দুঃসাহসিক ভ্রমণ কাহিনীটী কেহই জানিবে না।

মোটরের চড়াই সুরু হইয়াছে। আর্ত্ত চীৎকার করিয়া ইঞ্জিন ব্যর্থতা জানাইতেছিল। দুই চারিবার দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া তাহার হৃদ্‌যন্ত্র বন্ধ হইয়া গেল। ট্যাঙমার্গের এখনও ৬ মাইল রাস্তা বাকী। গাঁয়ের লোক একে একে নামিয়া যে যাহার গন্তব্য স্থলে চলিয়া গিয়াছে।

গুল্‌মার্গের পথে লেখক

বাকী দুই চারিজন যাহারা ছিল, তাহাদের নিকটেই বাড়ী, বিদেশী আমি একা। সমস্ত মালপত্র নামাইয়া ফেলা হইল। ড্রাইভার যন্ত্রপাতি বাহির করিয়া পিতলের পাত মুড়িয়া ছিদ্র বন্ধ করিবার জন্য প্রাণপাত করিতেছিল। তাহারও একটা দায়িত্ব আছে। পাশ দিয়া ঝরণার জল বহিয়া চলিয়াছিল। গ্রামের মেয়েরা তার পাশে খেলার ভাণ করিয়া আমাদের কাণ্ড দেখিতে লাগিল। প্রায় ১॥০ ঘণ্টা চেষ্টার পর আবার গাড়ী জীবন পাইল। ১০।১২ মণ জিনিষপত্র ফেলিয়াই আমরা ট্যাঙমার্গ গিয়া পৌছিলাম। ট্যাঙমার্গ পাহাড়তলী। গুল্‌মার্গ এ স্থান হইতে ৪ মাইল

চড়াইর পথ, মোটর যায় না। শীতকালে ইহার কুত্রাপি রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা নাই, আহার্য্যও অঘট। দূরে একজন সহিস একটা ঘোড়ায় চড়িয়া আর একটা ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া তূর্ণবেগে ছুটিয়া আসিতেছিল। সে আসিয়া আমাকে সেলাম দিল। ইহারা ভাড়ার আশায় গ্রাম হইতে ঘোড়া লইয়া আসে, সন্ধ্যায় ফিরিয়া যায়। তখন তিনটা বাজিয়া গিয়াছে। ড্রাইভার বলিল—এক ঘণ্টার মধ্যে ৮ মাইল পাহাড়ে ওঠানামা ও উপত্যকার যা কিছু দেখার সব শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিতে হইবে। গাড়ীর অবস্থা জানা ছিল, আপত্তি না করিয়া ঘোড়ায় চড়িলাম। ক্ষুধা পাইয়াছিল, সাথে খাবারও ছিল, পড়িয়া রহিল।
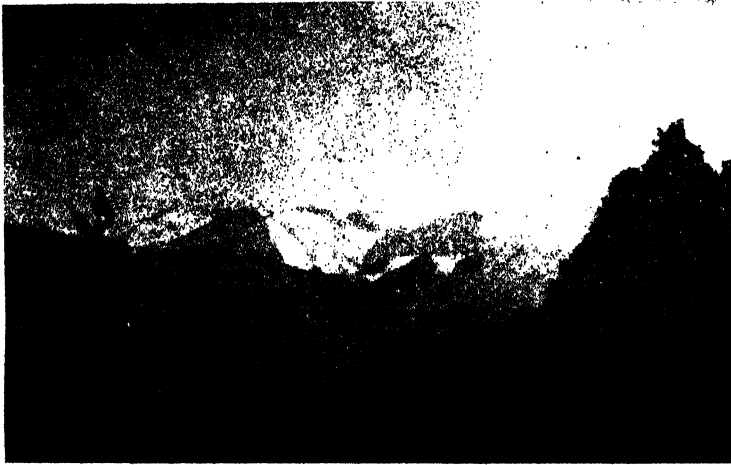
গুল্‌মার্গের মনোরম দৃশ্য

আমি একাকীই গুল্‌মার্গের যাত্রী। ক্রমাগত চড়াই ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিতেছি, পাশে সহিস পথ দেখাইয়া চলিয়াছে। সামনে ঘন-সন্নিবিষ্ট দেওদার (পাইন জাতীয় গাছ) গাছের নিবিড় অরণ্য। তাহারই ভিতর দিয়া রাস্তা গিয়াছে পাহাড়ের উপর। নিকষ ছায়াময় বনবীথি; দেওদারের সতেজ সজীবতায় আমার শ্রান্ত দেহ মন ভিজিয়া গেল। দুর্জ্জয় প্রাণ! চারিদিকের তুষার-স্তূপের মাঝে দাঁড়াইয়া শ্বেত ভূমিকায় শ্যাম দ্রাবকে লিখিয়া দিয়াছে "মাভৈঃ"। দেখিয়া চক্ষু স্নিগ্ধ হইল। শ্রীনগরের পত্র-পল্লবহীন মরণ-পাংশুতার চিহ্নমাত্র এখানে ছিল না। যতই উপরে উঠি, ধবল অদ্রিগুলি আমারও চরণতলে আসিয়া সন্নত শ্রদ্ধার্ঘ্য দিতে চাহে। বীরপূজার এই বুঝি রীতি! সহিসের সতর্ক বাণী কাণে পৌঁছিল, ফিরিতে হইবে। গুল্‌মার্গের গোলাপ বাগান দেখিলাম না। উপত্যকার কুটীরগুলি (ইংরাজী কটেজ, ভারতীয় পর্ণকুটীর নয়) লোকজন ছাড়িয়া গিয়াছে, মড়ক লাগিয়া পুষ্করা পাওয়া পুরীর মত। ছয় মাস এই বাড়ী ঘর বরফের নীচে থাকিবে। মনে হইল—কম্যাণ্ডার বার্ডের * মত এই পাতাল-রাজ্যে শীত ঋতুটা কাটাইতে পারিলে জীবনের একটা বড় আবিষ্কার হইত। ভঙ্গুর দেহটা আসিয়া বেদনা জানাইল, ঝরণার একটু জল পান করিয়া ফেরার রাস্তা ধরিলাম।

ফিরিয়া আসিয়া দেখি—গাড়ী প্রস্তুত। ড্রাইভারের ভাবনাহীন মুখ লক্ষ্য করিয়া আশ্বস্ত হইলাম। একটা স্রোতস্বতীর পাশে বসিয়া সামান্য জলযোগের পর গাড়ী ছাড়িল। ঘড়িতে তখন ৫টা বাজিয়াছে। রাস্তায় বিপর্য্যয় না ঘটিলে ১২॥০টার মধ্যে গুল্‌মার্গে পৌঁছিতাম, চার পাঁচ ঘণ্টা বেড়াইবার সময় হইত। শ্রীনগরে ফিরিতে ঘণ্টাখানেকের বেশী লাগিত না। যাক্, এখনও গিয়া নগরের দেবালয়ে শাঁখ-ঘণ্টা শুনিতে পাইব।

আসিবার সময়ে ইঞ্জিনের সর্ব্বাঙ্গে বাঁচিবার ব্যর্থ কাতরতা দেখিয়াছিলাম। ফিরিবার পথে সে তাহার অজেয় প্রাণের পরিচয় না দিয়া ছাড়িবে না দেখিতেছি! ঢালু ঋজু পথ দিয়া গাড়ী ৪০ মাইল বেগে ছুটিল। ড্রাইভার আমাকে উত্তরে নাঙ্গাপর্ব্বত দেখাইল। এইখানে

* ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে কমাণ্ডার বার্ড দক্ষিণ মেরুতে একটী পরিবীক্ষণ কুটীরে—৬০° ডিগ্রী (minus—60°) শীতে বরফের নীচে ৪ মাস বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করেন। তাঁহাকে যখন উদ্ধার করা হয়, তখন তাঁহার দুইটী বেতার যন্ত্রই নষ্ট হইয়া গিয়াছে, ষ্টোভ-পাইপ এবং পেট্রোল ইঞ্জিনের বিষাক্ত ধূমে ভগ্ন-স্বাস্থ্য হইয়া তিনি আসন্ন মৃত্যুর অপেক্ষায় রহিয়াছেন। —লেখক

বৎসর দুই আগে জার্ম্মাণ অভিযানকারী দল বরফ স্তূপে সমাধিলাভ করে। এক সঙ্গে এতগুলি প্রাণ এই উলঙ্গ নগরাজ ছাড়া আর কেহ চাহে নাই।

একটা গ্রামে যাত্রী লইতে হইবে, গাড়ী থামিল। এবার মাল ছিল না, গ্রাম্য লোকেই বাসখানি ভরিয়া গিয়াছে। বিস্মিত হইয়া দেখিলাম গাড়ী ষ্টার্ট লইতে চাহে না। পথের দৃশ্যে বিমনা ছিলাম, এখন দেখিলাম ঢালু রাস্তা দিয়া বিনা ইঞ্জিনেই এতক্ষণ গাড়ী চলিয়াছে। দ্রুত অন্ধকার নামিয়া আসিতেছিল। ক্যাণ্ডেল জ্বালাইয়া ড্রাইভার জোড়াতালি দিয়া গাড়ী চালাইল। কিন্তু আর চলে না, মাইল দুই গিয়াই আবার স্তব্ধ। দুইটী ক্যাণ্ডেল পুড়িয়া নিঃশেষ হইয়া গেল। সকলে নামিয়া পিছন দিক্ হইতে ঠেলিয়া কোন রকমে এবারও চালাইয়া দেওয়া হইল। আরও দুই তিন মাইল গিয়া আর না, একেবারে স্থাণুর মত অচল। মশাল জ্বালিয়া জ্বালিয়া মশাল ফুরাইল, দিয়াশলাইর বাক্স গেল, ৯ গ্যালন পেট্রোলও পুড়িয়া গেল। উপায় নাই। শ্রীনগরে না গেলে সাহায্য পাওয়া যাবে না। মাইল পোষ্ট দেখিয়াছিলাম, মনে পড়ে ১৪।১৫ মাইল বাকী ছিল। জনহীন প্রান্তরে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া কয়টী প্রাণী। হিমানী সানু-শিখর ছাড়িয়া রাস্তায় বাহির হইয়াছে, প্রাণের ভিতর রক্তের দারুণ চেষ্টাকে সে তুহিন-স্পর্শে স্তব্ধ করিয়া দিতেছিল। শ্রীনগরে ২৮° ডিগ্রী শীতের কথা মনে পড়িল, এখানে হয়ত ১৮° ডিগ্রীতে নামিবে। জামা-কাপড় যাহা আছে, তাহাতে প্রহর রাতের শীতই মানে না। তাহার উপর খোলা মাঠ। অন্ধকার রাস্তায় ৫।৭ মাইল গেলে এক আধটা গাঁও মিলিতে পারে। কিন্তু পল্লীবাসীরা নিতান্ত নিঃস্ব। এক জোড়া কাপড়-জামার বেশী কারো নাই। তাহাই তারা একদিন কিনিয়া পরে, আর শতছিন্ন, অচর্ব্য না হইলে খোলে না। একখানি ঘরেই হয়ত একটী সংসার চলে। তাদের নিকট সাহায্য প্রত্যাশা করার চেয়ে আমার পরিধেয় যাহা আছে, তাহার অংশ ন্যায়তঃ তারা পাইতে পারে। সহযাত্রী যারা ছিল, তাহারা গরীব, তাদের মত আশ্রয় তারা খুঁজিয়া লইবে। অপরিচিত জায়গায় আমার কিছুই করা সম্ভব নয়। ভাবিলাম—সীমান্ত প্রহরীর মত আমার এই দেহখানিও হয়ত কাল প্রাতে জমিয়া থাকিবে। সাথে পয়সার অভাব ছিল না, কিন্তু আজ রাত্রে নগরের ১৪ মাইল দূরে অর্থ আমার কাছে মূল্যহীন। পায়ে হাঁটিয়া শ্রীনগর যাওয়াও অসম্ভব।

ছাতাবল সেতুবন্ধ : শ্রীনগর

নিরুপায় হইয়া বসিয়া আছি। দূরে একটা সার্চ্চ লাইটের মত আলো দেখা গেল। কয়েক মিনিট পরেই একখানি মোটর ট্রাক জঙ্গল হইতে খুঁটি বোঝাই করিয়া শ্রীনগর ফিরিয়া যাইতেছিল। ট্রাকখানি এমনভাবে বোঝাই যে, আর তিল-ধারণের স্থান নাই। পিরামিডের মত উচু খুঁটির স্তূপ শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। ড্রাইভারের পাশেও জায়গা ছিল না। যেটুকু ব্যবস্থা সম্ভব ছিল, তাহাও কয়েকটী লোক আসিয়া ইতিমধ্যেই দখল করিয়াছে। আমার ভদ্রবেশ দেখিয়া অথবা বিদেশী বলিয়া, আমাদের চালক ট্রাকের ড্রাইভারকে অনুরোধ করিল আমাকে শ্রীনগরে পৌছিয়া দিতে। সে আমাকে দক্ষিণ পাশে উঠিতে বলিল। বসিবার জায়গা ছিল না,

ফুটবোর্ডে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। একহাতে সামান্য জিনিষ-পত্র, আর এক হাত দিয়া কোনমতে হর্ণ ধরিলাম। চলন্ত গাড়ী বাতাস কাটিয়া ছুটিয়াছিল, চোখে, মুখে, কাণে, হাতে, তীরের মত ঠাণ্ডা হাওয়ার শত দংষ্ট্রা বিঁধিতে লাগিল। ক্ষণপরে অনুভব করিলাম হাত শিথিল হইয়া গিয়াছে। প্রতি মিনিটেই পড়িপড়ি আশঙ্কা। এক একটী বাঁক ফিরিবার সময় প্রাণপণে নিজেকে বাঁচাইতে চেষ্টা করি, কিছুই যেন আর আমার বশে নাই। এক মাইল, দুই মাইল করিয়া, মাইল গুণিতেছি, যদি কিছু দুর্ঘটনা হয়, শহরের কাছে হইলে, মরিয়া বাঁচিয়া পায়ে হাটিয়া শহরে উপস্থিত হইতে পারিব। হায়রে মানুষের দুরাশা! জীবনে একদিন অনুভব করিলাম এই দেহটার পরিরক্ষণ-ক্ষমতা—হৃৎপিণ্ড, শ্বাসযন্ত্র, স্নায়ুকেন্দ্র, কশেরুকা, গ্রন্থী সকলেই সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করিয়া ঢালিতেছিল। শহরে যখন পৌছিলাম, শরীর কাঠের মত শক্ত হইয়া গিয়াছে, চলিতে পারি না। হোটেল দরজা বন্ধ করিবার উপক্রম করিতেছিল, কোনমতে গিয়া শুইয়া পড়িলাম। পরদিন শুনিলাম—শহর হইতে আর একখানি বাস গিয়া বাকী লোকদের লইয়া আসিয়াছিল।

দুই দিন বিরাম-শয্যায় শুইয়া শুইয়া কত কথাই ভাবিলাম। কিসের সন্ধানে আসিয়াছিলাম, কেনই বা ফিরিয়া যাইতেছি? সারাটী জীবন ভরিয়াই দেখিলাম—অজানার মায়া আমার পিছু পিছু নিত্যই ডাকাডাকি করে। জীবনময় তাই এই ছুটাছুটি নিখিল-পণ্যস্থলীর পসরায় পসরায়, অনাবিষ্কৃত মানস-প্রহেলিকা-গহনে। পৃথিবীময় দেখি এই যতিহীন সংবেগ—শিশু ছুটিয়াছে জগতের হেঁয়ালীর পশ্চাতে, পুরুষ খুঁজিয়া ফেরে প্রকৃতির সন্ধানে, নারী চাহে পুরুষের রহস্য-মরীচিকা উদ্ঘাটন করিতে। এই যে সমাপ্তি-হীন ছুটাছুটি, ইহার ভিতর দিয়াই সীমা যুগযুগান্ত চলিয়াছে অসীমের পানে। "ওই শুন, দিশে দিশে তোমা লাগি' কাঁদিছে ক্রন্দসী"—এই চিরন্তন ক্রন্দন, আশায় আকাঙ্ক্ষায়, অশ্রুতে হাসিতে, মানুষের অজানাকে জানিবারই শাশ্বত চেষ্টা, রূপের লীলা অরূপের যবনিকায়।

শ্রীনগর আমায় মুগ্ধ করিল না।

বিরহী যক্ষ —শিল্পী: শ্রীমৃণাল ঘোষ এম. এ.

উত্তর মেঘ

সূর্য্যকুমার

ওগো মেঘ, থামো—
ওগো উত্তর মেঘ,
আষাঢ়ের স্রোতে উচ্ছ্রিত চলো ভেসে
চক্ষুতে দেখি বিদ্যুৎ ওঠে হেসে,
আমার দিকেও তাকালে না অবশেষে—
ওগো মেঘ, শোনো ওগো উত্তর মেঘ;
বেদনা আমার ছুঁয়ে ছুঁয়ে বনভূমি,
ঝ'রে ঝ'রে গেছে কালের চরণ চুমি'
এখন আমার চরম শরণ তুমি,
—চারি দিকে কাঁপে তারি কান্নার বেগ,
ওগো মেঘ, থামো
ওগো উত্তর মেঘ!!

গুপ্তচর ফেলিক্স

শ্রীতারাকিশোর বর্দ্ধন

১

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের পৃথিবীব্যাপী মহাসমরে আমি পূর্ব্ব-প্রান্তস্থ (Russian Front) জার্ম্মাণ-বাহিনীর গুপ্তচর বিভাগের একজন বড় কর্ত্তা ছিলাম। আমার নামটা পাঠকগণকে নাই বলিলাম। আমার এজেন্টগণের মধ্যে জনৈক রুশিয়ার সেনাপতি ব্যতীত ফেলিক্স নামক পোল এজেন্ট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাহার স্ত্রী জেনিয়াও তাহার সঙ্গে একই কার্য্য করে। জেনিয়ার মত এত সুচতুরা ও কার্য্যকুশলা এজেন্ট কমই পাওয়া যায়। তা'দের কথাই এখন বলিব। রুশীয় সদর ঘাঁটির গুপ্ত খবর জ্ঞাত হইয়া বুঝিতে পারিলাম যে, শত্রুপক্ষ একটা প্রবল আক্রমণের পরিকল্পনা করিতেছে। এজন্য বেনারভেলি নামক স্থানে গোলা বারুদের ভাণ্ডার স্থাপন করা হইয়াছে। উহা নষ্ট করা চাই। ফেলিক্স বলিল যে, সে এই কার্য্য সহজে করিতে পারিবে, কিন্তু জেনিয়া তাহার সঙ্গে যাইবে। জেনিয়াও তাহার সঙ্গে যাইবার জন্য জিদ্ করায় আমরা উভয়কেই পাঠাইতে রাজী হই। একটা গুপ্ত ইস্তাহার বিলি করার অপরাধে পোলাণ্ডের তৎকালীন রুশ-গবর্ণমেণ্ট ফেলিক্সের পিতাকে ফাঁসী দেয়। এইজন্য রুশিয়ানদের উপর তাহার বিজাতীয় বিদ্বেষ। যাহা হউক, আমাদের সীমান্ত ঘাঁটি পার করিয়া তাহাদিগকে রুশিয়ায় প্রেরণ করা হইল। প্রধান সেনাপতি পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে, এভাবে শত্রুর দেশের ভিতরে উহারা যাইয়া সফলতা অর্জ্জন করিতে পারিবে। কিন্তু দুই দিন পর একখানা এরোপ্লেন আসিয়া প্রথম খবর দিল যে, বেনারভিলের অস্ত্রাগার উড়িয়া গিয়াছে। তার দুই দিন পর উহারা নিরাপদে ফিরিয়া আসিল। জেনিয়াকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—সে ভয় পায় নাই। সে বলিল, —"বিস্ফোরণের সময়ে আমরা দৌড়িয়া একটা জঙ্গলে পৌছিলাম। দিনের বেলায় জঙ্গলে ঘুমাই, রাত্রি বেলায় চলিয়া আসিয়াছি।" সেনাপতি বলিলেন—"জেনিয়া দুঃসাহসিকা রমণী।"

এই ঘটনার কয়েকদিন পর আমাদের সিগন্যাল ডিপার্টমেণ্ট খবর দিল যে, শত্রুপক্ষ একটা নূতন বেতার ষ্টেশন করিয়াছে। খুব সম্ভব তাহা ওডেসা নগরে হইবে। সেখানের গুপ্তবার্ত্তার পাঠোদ্ধার করিয়া জানা গিয়াছে যে, শত্রুপক্ষ অষ্ট্রিয়া আক্রমণের জন্য জমায়েত হইতেছে। খবরটা ভাল নয়। জেনিয়াকে পাঠান সাব্যস্ত হইল। এগার দিন পরে সে রাত্রিতে আসিয়া বলিল, "ভাল খবর লইয়া আসিয়াছি স্যার, ওখানে চারিটি বৃহৎ সৈন্যদল সমবেত হইয়াছে। তাহাদের সৈন্যসংখ্যা ও রেজিমেণ্ট নম্বর সব টুকিয়া আনিয়াছি। উহারা চারি সপ্তাহের মধ্যেই অষ্ট্রিয়ার জেনারেল ব্রাসিলফ্কে আক্রমণ করিবে। ফেলিক্স বাড়ী আছে কি?" আমি বলিলাম, "না সে একটা বার্ত্তাবাহী কপোতের ষ্টেশন করিতে গিয়াছে। চার দিন পর ফিরিয়া আসিবে।" তাহাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীর দিকে আসিতেছি, তখন সে বলিতে লাগিল কি করিয়া সে ওয়ারশ'র বাসিন্দা পোলিশ রমণী পরিচয় দিয়া ওডেসায় যায়। তারপর কি করিয়া একটি যুবক লেফ্‌টানেণ্টের সঙ্গে প্রণয়ে পড়ে, তাহার সঙ্গে বিবাহের সম্মতি আদায়ের জন্য জেনিয়া তাহার কল্পিত পিতামাতার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য সেণ্টপিটার্সবার্গে যাইতে চায়, কি করিয়া সেই যুবক সেনাপতি তাহাকে সেণ্টপিটার্সবার্গের টিকিট কিনিয়া ষ্টেশনে তুলিয়া দেয় —কি করিয়া তাহার নিকট হইতে সব খবর আদায় করে—ইত্যাদি। তাহার বিবরণ শুনিয়া আমি তাহাকে "আশ্চর্য্য বালিকা" বলিয়া অভিনন্দিত করিতেছি, ঠিক এমন সময়ে আমার হাত ধরিয়া সে বলিল, "ঐ দেখুন স্যার, সেই লোকটি—ও রুশিয়াতেও আমার অনুসরণ করিতেছিল......।" আমি লাফ দিয়া অগ্রসর হইলাম, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। ইতিমধ্যে সে সরিয়া পড়িয়াছে। জেনিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল "ঐ লোকটা আমার প্রণয়-যাচ্ঞা করিয়াছিল কিন্তু আমি তাহাকে ঘৃণা করি। তাহার ফরমাইস মত আমি ভালবাসিতে পারি না। আঃ, দশদিন রুশিয়াতে কর্ত্তব্য

কার্য্য শেষ করিয়া আসিয়াই তাহার দর্শনে আমি যেন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি, কিন্তু সে আমার উপর প্রতিহিংসা লইবে; আমরাও তাহাকে ছাড়িব না।" আমি জেনিয়ার বিশ্রাম ও যত্নের ক্রটীহীন ব্যবস্থা করিয়া বাড়ী ফিরিলাম।

২

দিন চারি পরে ফেলিক্স ফিরিয়া আসিয়াছে। সে আমার অফিস ঘরে আসিয়া ওদিকের জানালায় চাহিয়াই বলিয়া উঠিল, "লেফ্‌ট্‌নেন্ট, তাড়াতাড়ি।" আমি তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া জানালার নিকট গেলাম। সে রাস্তায় খাকি-ওভারকোট-পরা একটী লোককে দেখাইয়া বলিল, "ঐ লোকটীকে দেখুন, সে টুপীটা চোখের উপর পর্য্যন্ত টানিয়া দিয়াছে। তাকে আমি রুশিয়ায় দেখিয়া আসিয়াছি নিশ্চয়; আমায় অনুসরণ করিতেছিল।" দশ মিনিটের মধ্যে আমার মিলিটারী পুলিশম্যান ঐ লোকটির নিকট উপস্থিত হইয়া কথা বলিতে লাগিল। ফেলিক্স ও আমি জানালায় দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতেছিলাম। ঐ লোকটিরও ইউনিফরম্ পরা ছিল। আমি তাহাকে হাত উঠাইতে দেখিলাম। ফেলিক্স বলিয়া উঠিল, "লেফ্‌ট্‌নেন্ট, ওযে হাত মুখে দিলে।" আমি বলিলাম, "ভাবনার কারণ নাই।" তারপরই আমার লোকজনের সঙ্গে উহার ধ্বস্তাধ্বস্তি এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বাছাধনকে আমার ঘরে উপস্থিত হইতে হইল। সে আসিয়া বলিল, "এখানে কেন আমাকে আনা হইল?" আমি বলিলাম, "তুমি রুশিয়ার গুপ্তচর, এইজন্য। তা যাক্ তুমি কিছু গিলিয়া ফেলিয়াছ কি?" সে সরাসরি অস্বীকার করিল। আমি ষ্টাফ্ সার্জ্জনকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। তিনি সব শুনিয়া আমাকে দুইটী পাউডার দিয়া বলিলেন, "ইহা খাওয়াইয়া দিলে কুড়ি মিনিটেই ফল পাইবেন।" লোকটী খাইতে অস্বীকার করায় জোর করিয়াই পাউডার দুইটী তাহাকে খাওয়ান হইল। ফলে উহার ভেদ বমি হইতে থাকে এবং দশ মিনিটের মধ্যেই উহার পেটের ভিতর হইতে বাহির হইল একটা ছোট এল্যুমিনিয়ামের ক্যাপস্যুল। উহা খুলিয়া ভিতরে এক টুক্‌রা চিরকুট পাওয়া গেল, তাহাতে রুশিয়ার গুপ্তচর বিভাগের নম্বর লিখা ছিল। এখন সে আর অস্বীকার করিল না। আমি বলিলাম, —"তুমি বুঝিতে পারিয়াছ তোমাকে গুলি করিয়া মারা হইবে। তবে যদি এখানকার রুশিয় এজেন্টগণের হদিস দিতে পার, তবে ছাড়িয়া দিব।" সে বলিল, "ছেড়ে যে দেবেন, তার গ্যারেন্টী কি?" আমি বলিলাম, "একজন প্রুশীয় লেফ্‌ট্‌নেন্টের কথাই যথেষ্ট গ্যারান্টি নয় কি?" অতঃপর সে চারিজন রুশীয় গুপ্তচরের নাম ও ঠিকানা বলিয়া দিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার সাঙ্কেতিক কথাটি (Pass word) কি?" সে বলিল, "উইণ্ড্" (wind)।

তাহাকে সযত্নেই কারাগারে রাখা হইল।

আমরা তারপর উক্ত চারিটী রুশীয় এজেন্টদের বন্দী করিবার ব্যবস্থা করিলাম। আমার নিকটে একটী রুশীয় সেনাপতির ইউনিফরম্ ছিল এবং রুশ ভাষায় আমি অনর্গল বকিয়া যাইতে পারিতাম। রুশীয় উচ্চারণ আমার এত পরিস্কার যে, গত চারি বৎসর যাবত হাজার হাজার লোককে জেরা করিয়া আমি একবারও ধরা পড়ি নাই। ফেলিক্স উল্লিখিত সাঙ্কেতিক কথাটীর বলে রুশিয়ার প্রথম গুপ্তচরের সঙ্গে দেখা করিয়া বলিল যে, একজন রুশীয় জেনারেল তাহাকে দেখা করিবার জন্য আদেশ দিয়াছেন। সে ফেলিক্সের সঙ্গে সঙ্গে আমার নিকট চলিয়া আসিল। আমি সিভিলিয়ানের পরিচ্ছদ খুলিয়া ফেলিলাম এবং রুশীয় জেনারেলের পোষাক পরিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। সে অভিবাদন করিলে পর আমি বলিলাম, "তোমার কার্য্যের রিপোর্ট চাই।" সে সরল ভাবে সব খুলিয়া বলিল—ঐ রিপোর্ট লিখা হওয়া মাত্রই আমাদের পুলিস আসিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিল। আমার নিকট তাহার নিজের স্বীকারোক্তিই ট্রাইবিউনেলের বিচারে তাহার প্রাণদণ্ডের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। ঠিক এই ভাবে পর পর বাকি তিনজন এজেন্টকেই আমরা সাবাড় করিলাম। তারপর সেই প্রথম বিশ্বাসঘাতককে বলিলাম যে, এখন তাহাকে অন্তরীণে আবদ্ধ থাকিতে হইবে। যুদ্ধের পর অবশ্যই সে মুক্তি পাইবে। এজেন্ট চারিজনের কি হইয়াছে, সে জানিতে চাহিলে

আমি বলিলাম যে, তাহাদের গুলি করিয়া মারা হইয়াছে। সে এই সংবাদে শিহরিয়া উঠিল। আমি বলিলাম, "কিন্তু তোমার তো ভাবিবার কিছু নাই, কারণ তারা এজন্য কাহাকে ধন্যবাদ দিবে, তাহা জানিতে পারে নাই।" আমার বিদ্রূপে সে একটু মুসড়াইয়া পড়িল। পরদিন এই হতভাগ্যদের মৃতদেহ তাহারই ঘরে বীমের সঙ্গে দড়িতে ঝুলিতেছে, সে দেখিল।

৩

এখন বার্ত্তাবহ কপোতের কথা কিছু বলিব। শত্রুর দেশে পায়রা লইয়া যাওয়া এবং পায়রা দ্বারা খবর পাঠান খুব গুরুতর কাজ। সঙ্গে পায়রা দেখিলেই পুলিসের সন্দেহ হইবে। তাহা ছাড়া গুপ্ত খবর অণুবীক্ষণ হরফে খুব পাতলা কাগজে ফটো করিয়া, ছোট এল্যুমিনিয়ামের ক্যাপ্সুলে পুরিয়া পায়রার ঠ্যাংএ বাঁধিয়া পাঠান যে-সে কাজ নয়। কাজটী করিতে হয় রাত্রিতে। প্রথমে পায়রাগুলি সর্পিল গতিতে আকাশে উড়ে। এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ পায়রা উড়িতে দেখিলেই কোথা হইতে তাহারা উড়িয়াছে, তাহা বলিয়া দিতে পারিবে। সুতরাং এমন নির্জ্জন স্থান বাছিয়া লইতে হইবে, যেখানে পাড়া-প্রতিবেশী নাই। শত্রুর দেশে পায়রা লইয়া যাইতে হইলে আঁকাবাঁকা পথে যাইতে হয় এবং খুব সুচতুর লোক ভিন্ন উহাতে বিপদের সম্ভাবনাও বেশী। আবার পায়রা যখন তীরবেগে আকাশে উড়িয়া যায়, তখন উভয় পক্ষের সৈন্যদল হইতে উহাদিগকে গুলি করিয়া মারিবার চেষ্টা হয়। ফলে শতকরা ৩০টা পায়রাই মারা পড়ে। সেই জন্য প্রত্যেকটী খবরই দুই কপি করিয়া দুইটী পায়রার মারফৎ পাঠান হয়। যাহাতে একটী মারা গেলেও খবরটা আসে। অনেকে হয়ত বলিবেন—"বাপু, পায়রার যখন এত বিপদ্, তখন পায়রার বদলে মানুষ গুপ্তচর দিয়াই কাজ করাও না কেন?" কিন্তু কথা এই যে, বিরাট্ রণস্থলের সর্ব্বত্র খবর সংগ্রহের জন্য এত বেশী বিশ্বাসী লোক কোথায় পাওয়া যাইবে? তাহা ছাড়া মানুষের অপেক্ষা পায়রা কুড়ি গুণ অধিকতর দ্রুতগামী। একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে: রুশিয়ার ১৯ নং সেনাদল সুবিখ্যাত। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে হঠাৎ একদিন ঐ বাহিনীর উপর তৎক্ষণাৎ ট্রেণে চাপিবার আদেশ আসিল এবং ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে অল্পমাত্র অষ্ট্রীয়রক্ষী পরিবেষ্টিত মিটান সহরের মধ্য দিয়া অষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যে প্রবেশ করিবার ভার তাহাদের উপর পড়িল। এই ব্যাপারের জন্য রুশীয় গবর্ণমেণ্ট যতদূর সম্ভব গোপনতা অবলম্বন করিয়াছিল। সীমান্তে অধিক সংখ্যায় গুপ্তচর টহল দিতে থাকে, রেডিও ষ্টেশন বিনা ঘোষণায় বদলান হয় এবং খবর গোপন রাখিবার জন্য অতি মাত্রায় সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। আমাদের গুপ্তচর যদি লোক মারফত এই খবর পাঠাইত, তাহা হইলে ৩০টী ঘণ্টা ব্যয়িত হইত এবং ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে যদি ৩০ ঘণ্টা খবর আসিতে কাটিয়া যাইত, তবে বাকি ছয় ঘণ্টার মধ্যে কি উহার প্রতিকার করা সম্ভব হইত? কিন্তু আমাদের পারাবত গুপ্তচর ২ ঘণ্টার কম সময়ে এই খবর লইয়া আসে। আমাদের এজেণ্ট এই জরুরী খবরটী তিনটী পায়রা দ্বারা পাঠায়। দুইটী পায়রা পথে গুলির আঘাতে মারা যায়। তৃতীয়টী খবর লইয়া চলিয়া আসে। সে তিনটী পায়রা না পাঠাইলে কি অবস্থা হইত? খবর পাইয়া আমরা কন্ফারেন্স আহ্বান করি এবং যথা সময়ে ঐ স্থানে অধিক সংখ্যায় সৈন্য সংস্থাপন করা হয়। ফলে রুশিয়ার ১৯নং সেনাদল বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়। এখন দেখুন একটী পায়রার মূল্য কত?

৪

কয়েকদিন পরে খবর পাইলাম যে, রুশ-বাহিনী আবার নূতন প্ল্যান করিয়া আক্রমণ করিবে। বেতারের খবর কয়েকদিন যাবৎ পাওয়া যাইতেছিল না। তার মানে—বেতার ষ্টেশন আবার বদল করা হইবে। এই সময়ে পারাবতী গুপ্তচর পাঠাইবার আশু প্রয়োজন উপস্থিত হইল, বিলম্বে কার্য্যহানি হইবে। ফেলিক্সকে কালই পাঠাইব। তার সঙ্গে বিশ্বস্ত লোক দেওয়া হইবে। তার দুইদিন পর জেনিয়াও যাইবে। সে মনস্লিফ শহরে রুশীয় অফিসারদের সঙ্গে মিশিয়া যাইবে এবং খবর পাঠাইবে। এবারে জেনিয়াকে বড় বিমনা দেখিলাম। তাহাকে এরূপ মলিন আর কখনও দেখায় নাই। জিনিয়া বলিল যে,

তাহার মা দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছে। তাহার শ্বেতবসনা মূর্ত্তির চারিদিকে অনেকগুলি মোমবাতি জ্বলিতেছে—এমন একটী স্বপ্ন না কি তাহার মা দেখিয়াছেন এবং এবারে তাহাকে রুশিয়ায় যাইতে নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু সে নাকি এ সব বিশ্বাস করে না। আমি বলিলাম, "বেশত নাই-বা গেলে এবারে। আমরা অন্য লোক পাঠাইতেছি। কিন্তু সে যাইবে বলিয়া জিদ করায় অগত্যা তাহাকেই পাঠাইতে হইল। "ভগবান তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন, জেনিয়া" —আমি এই কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে সে অন্ধকারে মিশিয়া গেল। রাত্রির পর রাত্রি আমি তাহার পথ চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতেছি।

কিন্তু সে আর ফিরিয়া আসিল না।

কয়েকদিন পরে ফেলিক্স সফলতার সহিত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ফিরিয়া আসিল। সে বলিল, "এবারে কাজ সহজ হয় নাই। একবার প্রহরীর সামনে পড়িয়া গিয়াছিলাম। কবুতরের টুক্‌রী লুকাইতে হইয়াছিল। ভাগ্যিস্ পায়রাগুলি বকম্ বকম্ করে নাই, তাহা হইলেই গিয়াছিলাম আর কি? কি ভয়টাই না পাইয়াছিলাম—বাপ্‌রে!" ইহার পর হইতে ক্রমাগত ষোল দিন পর্য্যন্ত ফেলিক্স ও আমি জেনিয়ার প্রত্যাগমন আশায় বিফল প্রতীক্ষা করিয়াছি। আমি বলিলাম, "একটা কিছু হইয়াছে নিশ্চয়।" ফেলিক্স বলিল, "সে বাঁচিয়া নাই; নতুবা আসিত নিশ্চয়ই।" সে একদিন আমাকে বলিল, "স্যার, আমি বিশ্বস্তভাবে আপনার কাজ করিয়াছি। এখন আমাকে পনর দিনের ছুটী দিন।" আমি বলিলাম, "তথাস্তু"। সে চলিয়া গেল এবং তিন সপ্তাহ পরে ফিরিয়া আসিল।

এইবারে তাহার চুলগুলি উস্ক-খুস্ক, চক্ষু লাল, রং বিবর্ণ ও চেহারা বিকট। সে বলিল, "জেনিয়াকে ফাঁসী দেওয়া হইয়াছে, তাহার ঐ শত্রু এবারে প্রতিহিংসা লইয়াছে। মন্‌স্ক্রিফ শহরে গিয়া জনৈক ইহুদি বণিকের নিকট জানিতে পারিলাম যে, প্রায় দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে একটা সুন্দরী জার্ম্মাণ স্পাই-এর ফাঁসী হইয়াছে। আমি তাহাকে একশত টাকা দিয়া আরও খবর চাহিলাম। সে আমাকে স্থানীয় কোর্ট মার্শেলের একজন বৃদ্ধ কেরাণীর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিল। সেই বৃদ্ধের নিকট জানিতে পারিলাম যে, সে-ই জেনিয়া। তাহার তরুণ বয়স ও সৌন্দর্য্যের জন্য বিচারকগণও নাকি অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সরকারী উকিলের পরামর্শ মত আসামী সাংঘাতিক লোক বলিয়া তহাকে দয়া দেখান যাইতে পারে নাই। সুতরাং বিচারকগণের মর্জ্জি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তথাপি ট্রাইবিউনেলের প্রেসিডেণ্ট বলিয়াছিলেন, "জেনিয়া, তুমি গবর্ণমেণ্টের মার্জ্জনা ভিক্ষা কর, তাহা হইলে সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত হইতে পারিবে।" জেনিয়া বলিয়া উঠে যে, সে সাইবেরিয়ার চাইতে ফাঁসীকাষ্ঠকে অধিকতর ভালবাসে। ফাঁসীর সময়েও সে এতটুকু বিচলিত হয় নাই। একটুকু চাঞ্চল্য বা কোনও প্রকার দুর্ব্বলতা সে প্রকাশ করে নাই। ছোট্ট জেনিয়ার জীবন-প্রদীপ এইভাবে নিবিয়া গিয়াছে।

আমি তাহার দিকে চাহিয়া বলিলাম, "তুমি এখনও সব বল নাই ফেলিক্স।" সে বলিল, "আজ্ঞে হাঁ"—তারপর সে তাহার কাহিনী বলিয়া যাইতে লাগিল:

"আমি আমার সেই ইহুদি বন্ধুর মারফতে জানিতে পারি কোন বিশ্বাসঘাতক লোকটী জেনিয়াকে ধরাইয়া দিয়াছিল। তাহার নাম বুডিনিস্কি। সে জেনিয়াকে বিবাহের প্রস্তাব করে এবং জেনিয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করে। এই আক্রোশবশতঃ সে জেনিয়ার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। সে কোথায় থাকে, তাহা খবর লইয়া জানিয়া লইলাম। গবর্ণমেণ্ট হইতে এই ব্যাপারে যে পুরস্কার পায়, তদ্দ্বারা সে খুব মদ খায়। প্রথমে আমি ভাবিলাম, তাহাকে গুলি করিয়া হত্যা করিব, কিন্তু সে তো উহার সুখের মৃত্যু; এতটুকু বিলাসিতার উপযুক্ত সে নয়। আমি তাহার মত কুকুরের উপযুক্ত মৃত্যুর ব্যবস্থা করিবার জন্য আরও তিনজন বন্ধুর সাহায্য পাইলাম। কৃত্রিম দাড়ি গোঁফ লাগাইয়া চেহারা এমন বদলাইয়া ফেলিলাম, যাহাতে সে চিনিতে না পারে। আমাদের প্ল্যান একেবারে নিখুঁত। একটী অন্ধকারময়ী রজনী বাছিয়া লইলাম—বর্ষায় অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছে। প্রথমে উক্ত রুশিয়ার বিশ্বাসঘাতকের নিকট যে সাঙ্কেতিক কথা "উইণ্ড্" আমরা পাইয়াছিলাম, এবারে তাহা

কার্য্যে লাগান হইল। আমার এক বন্ধু বুডিনিস্কের হোটেলে উপস্থিত হইয়া তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইল। বুডিনিস্ক বাহির হইয়া আসিল। তাহার মুখে মদের উগ্র গন্ধ, তাহার ঘর হইতে মেয়েমানুষের গলার স্বর ভাসিয়া আসিতেছিল। এই সাঙ্কেতিক কথাটী বলিয়া আমার বন্ধু তাহাকে বাহিরে লইয়া আসিল। জনহীন শস্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়া রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। আমরা তিনজন কিছু দড়ি, কয়েকটী কোদাল ও একটী হাতগাড়ী লইয়া একটা ঝোঁপের আড়ালে লুকাইয়াছিলাম। সে কাছে আসিতেই তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া, তাহার মুখে কাপড় গুঁজিয়া হস্তপদ বদ্ধ অবস্থায় তাহাকে গাড়ীতে চাপাইয়া গ্রামের প্রান্তভাগে জঙ্গলের সীমানায় আনিয়া ফেলিলাম। এখানে তাহাকে দাঁড় করাইয়া বলিলাম —"আমি ফেলিক্স, জেনিয়ার স্বামী—যে জেনিয়াকে তুমি ফাঁসীতে তুলিয়াছ।" সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখের উপর টর্চ্চের আলো ফেলিলাম। দেখিলাম, ভয়ে তাহার মুখমণ্ডল মৃতের মত বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। তারপর বলিলাম, "তুমি জেনিয়াকে শাসাইয়াছিলে যে, তাহার উপর বড় রকমের প্রতিশোধ লইবে। তাহা তুমি লইয়াছ। এবারে কিন্তু আমার পালা। আমি চোখের বদলে চোখ এবং দাঁতের বদলে দাঁত লইব—মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও। দড়ি দিয়া ঝুলাইলেও তোমাকে যথেষ্ট দয়া দেখান হয়।" সঙ্গীদের বলিলাম: "বন্ধুগণ, উহাকে আমরা জীবন্ত সমাধিস্থ করিব, উহাই তাহার উপযুক্ত শাস্তি।"

তাহার চোখের সামনেই আমরা গর্ত্ত খুঁড়িতে লাগিলাম। গর্ত্ত খুঁড়া শেষ হইলে ঐ সাড়ে ছয় ফুট লম্বা গর্ত্তের মধ্যে তাহাকে শোয়াইয়া দিলাম। তারপর এক এক কোদাল মাটি ধীরে ধীরে তাহার উপর ফেলিতে লাগিলাম। সে পায়ে বাধা দিবার চেষ্টা করিলেই তাহার মাথায় কোদালের এক ঘা দিয়া তাহাকে শায়েস্তা করিতে লাগিলাম। ক্রমে তাহার নড়াচড়া বন্ধ হইয়া গেল। গর্ত্ত ভরিয়া আসিল। তারপর আমরা চারিজনে পাড়াইয়া, মাটীগুলি চারিদিকে ক্ষেতের সঙ্গে সমান করিয়া উহার উপর পূর্ব্বের মত ঘাস পুঁতিয়া দিয়া আমরা চলিয়া আসিলাম।

ফেলিক্সের কাহিনী শুনিয়া আমি কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক্ স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলাম, কিন্তু ইহার পর হইতে তাহাকে আর তো কখনও হাসিতে দেখিলাম না।*

* সত্য ঘটনামূলক ইংরেজী গল্পাবলম্বনে।

ভাবিবার কথা

শ্রীজহরলাল বসু

আমাদিগের দেশে ইদানীং একটা ঝোঁক দেখিতে পাওয়া যায়—দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁচে গড়িয়া তুলিবার। দেশের যে সকল মাতব্বর লোকের হাতে এই ভাঙ্গাগড়া নির্ভর করে তাঁহারা কিন্তু একটুও ভাবিয়া দেখেন না যে, পাশ্চাত্য দেশে যেটা সম্ভব আমাদিগের দেশে সেটা সম্ভব নয়। তাঁহাদিগের সমাজ আর আমাদিগের সমাজ মোটেই এক নয়, এক হইতেও পারে না। আমাদিগের দেশের প্রাচীন কালের গুরু-গৃহে অধ্যয়ন—যাহার বর্ণনা পুরাণ-উপনিষদাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়—এখন কোন্ স্বপ্নরাজ্যের কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যাহার স্পষ্ট ধারণাও এখন আমরা করিতে পারি না। তারপরে বৌদ্ধ যুগের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার রীতি—যাহার নিখুঁত বর্ণনা চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-এন্-সাঙের অমর তুলিকা স্পর্শে আমাদিগের মন হইতে এখনও একেবারে মুছিয়া যাইতে পারে নাই—তাহাও তো ইহারা গ্রহণ করিতে রাজি নহেন। বিবেচনা করা উচিত—বিলাতের যখন রাত আমাদিগের তখন দিন; বিলাতের সঙ্গে আমাদিগের দেশের কিছুই মেলা সম্ভব নয়। তাহাদিগের নৈতিক সূত্র আমাদিগের দেশে কখনই গ্রহণীয় হইতে পারে না; যদিও অন্ধ মোহের বশে কেহ কেহ সেই সকল নৈতিক সূত্রকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া আমাদিগের দেশে অধুনা চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন বটে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতে পারা যায় যে, প্রসিদ্ধ মনীষী Bertrand Russel তাঁহার সুচিন্তিত ও সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক "On Education"-এ যে পঠনপাঠনের ধারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা কি সর্ব্বাংশে অপরিবর্ত্তিতরূপে আমাদিগের দেশে গৃহীত হইতে পারে? দেশভেদে আচার ব্যবহারেরও প্রভেদ ঘটিয়া থাকে এবং সেই প্রভেদানুযায়ী দেশে শিক্ষাপ্রণালীরও ধারা নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। যে সকল দেশের আচার ব্যবহার আমাদিগের দেশের আচার ব্যবহার হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, সে সকল দেশের শিক্ষা-প্রণালীর ছাঁচে আমাদিগের দেশের শিক্ষাপ্রণালীকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিলে চলিতে পারে না।

তাহাদিগের দেশে যাহা শিষ্টাচারের নিদর্শন, আমাদিগের দেশে তাহা তাহার বিপরীত বলিয়া প্রতীত হয়। তাহাদিগের দেশে যে সকল চিত্র-বর্ণন উপন্যাসের উৎকর্ষ সাধনকর বলিয়া বিবেচিত হয়, আমাদিগের দেশে ঠিক সেইগুলিই অপকর্ষবিধায়ক। অধুনা উপন্যাসে 'বস্তুতান্ত্রিকতাবাদ' বলিয়া যে একটা ধূয়া উঠিয়াছে, সেটা ক্রমে ক্রমে আমাদিগের সমাজিক স্তরে স্তরে কি বিষম বিষ ছড়াইয়া দিতেছে, তাহা বোধ হয় অনেকে প্রণিধান-সহকারে ভাবিয়া দেখেন না।

সাহিত্যই প্রকৃতপক্ষে দেশের প্রাণশক্তির পরিচায়ক। যুগে যুগে দেশ এবং জাতিকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখে সাহিত্য। জাতীয় অতীত জীবনের জলন্ত নিদর্শন পাওয়া যায় একমাত্র সাহিত্যেরই মধ্যে এবং জাতির ভাবী জীবন গড়িয়া তুলিতে পারে সাহিত্য। সাহিত্য হইতেই জাতির শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন উর্ব্বর ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন বৃক্ষ সাধারণতঃ তেজালই হয়, তেমনি বলিষ্ঠ মনঃপ্রসূত সাহিত্য বলিষ্ঠই হইবে; অপর পক্ষে পঙ্গু মনঃপ্রসূত সাহিত্য পঙ্গুতারই পরিচয় দান করিবে। এ জিনিষটা প্রায় সকল দেশে সকল সময়েই দেখিতে পাওয়া যায়। একমাত্র সাহিত্যই জাতির উৎকর্ষ বিধান, জাতির জাগরণ আনয়ন করিতে পারে।

যে দেশ যত উন্নত, সে দেশে সাহিত্যেরও গৌরব তত অধিক; এ কারণ সাহিত্যকে জাতীয় সম্পদের মানদণ্ড বলা যাইতে পারে। যে কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক প্রেম-বিলাস বা 'মশারি-দৃশ্য' বর্ণনা এখন বাঙ্গালার কথা-সাহিত্যে দিন দিন প্রসারলাভ করিতেছে, তাহার ফলে বাঙ্গালার সৃজনী-শক্তিতে ভাঁটা পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। নিকষিত হেম সদৃশ অমলিন প্রেমের বর্ণনায় বাঙ্গালার বৈষ্ণব-সাহিত্য চির প্রসিদ্ধ; এই বহ্নিবিশোধিত প্রেমের বর্ণনার জন্যই বৈষ্ণব সাহিত্যের এত আদর। কিন্তু বাঙ্গালার অতি আধুনিক কথা-সাহিত্যিকেরা সে প্রেমের চিত্রকে অতি পুরাতন বলিয়াই হউক অথবা বৈদেশিক আপাতঃ চমকৃদার রক্তমাংস সম্পর্ক সম্বলিত কামকলা কাহিনী বর্ণনের প্রতি অনুরাগাধিক্য বশতঃই হউক, অনর্গল অতৃপ্ত দৈহিক বুভুক্ষা বর্ণনে তাঁহাদিগের সর্ব্ব শক্তি নিয়োগ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা স্থির চিত্তে একবার ভাবিয়াও দেখেন না যে, উহাতে মনের সূক্ষ্ম অনুভূতি তাঁহাদিগের ভাব ও ভাষার বিলাসে ভাসিয়া যায়; আর সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যকে আর্টের রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দেয়।

নব যুগের এই কথাসাহিত্যিকদিগের মূল নীতি realism বা naturalism; কিন্তু ইঁহারা স্থির চিত্তে কখনও অনুধাবন করিয়াও দেখেন না যে, কামোদ্দীপনা প্রকৃত প্রেমের উপাদান হইতে পারে না এবং তাহা সাহিত্যের মধ্যে স্থান লাভ করিবার যোগ্যতাও দাবী করিতে পারে না। অভিভাবকগণের অনুপস্থিতি কালে চায়ের টেবিলে বসিয়া বা সঙ্গোপনে পরিভ্রমণে বাহির হইয়া প্রেমের বেসাতি করা মনের অস্বাভাবিক বৈক্লব্যের পরিচয় দেয়। ইলিয়ড বা রামায়ণ মহাভারতীয় বীরত্ব-ব্যঞ্জক দৃশ্যের মহিমা আর ইঁহাদিগের মনে উৎসাহের প্রবাহ সঞ্চার করে না; ইঁহাদিগের গতিবিধি সতর্ক তস্করের মত, আর মনোবৃত্তি কণ্ডূয়ন লিপ্সার অনুকূল। ভীষ্মদেবের মত অম্বা, অম্বিকা বা অম্বালিকাকে লইয়া যাইবার সাহস ইহাদের নাই।

একনিষ্ঠ সাধক ভগীরথের মত কোন শুচিমান্ লেখকের আবির্ভাব না হইলে, দেশের এ ক্লেদ পঙ্কিলতাকে কেহ স্রোতোবিধৌত করিতে পারিবেন না। বঙ্কিমের মত শক্তিমান্ উদ্ধারকর্ত্তার এখন বিশেষ প্রয়োজন—যিনি আবার বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে রূপ দান করিয়া তাহার পরতে পরতে নব তাড়িৎপ্রবাহ সঞ্চার করিয়া দিতে পারিবেন।

এরূপ মহা প্রভাবসম্পন্ন ব্যক্তির আবির্ভাব অচিরে না হইলে নব সাহিত্যের এ পঙ্কিল আবর্ত্ত বিদূরিত হইবে না, কালিকলমের কলঙ্ককালিমা শুভ্র শুচিতায় স্নিগ্ধতা লাভ করিতে পারিবে না। বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যিকগণের রচনায় প্রায়ঃশই না আছে উচ্চ কল্পনা, না আছে প্রকৃত সত্যানুভূতি, না আছে সুস্থ ও বলিষ্ঠ মনের পরিচিতি।

সাহিত্যের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে পাঠকপাঠিকাগণের রুচিরও অধোগতি ঘটিয়াছে। এখন আর রামায়ণ-মহাভারত পাঠে পূর্ব্বের মত অনুরাগ পরিদৃষ্ট হয় না। এখনকার পাঠক পাঠিকারা চাহেন শুধু স্নায়ু শিহরণকারী চটুল সাহিত্য। কিন্তু রোগী কুপথ্য চাহিলেও গৃহস্বামী তাহা সরবরাহ করিবেন কেন, ডাক্তারই বা তাহার অনুমোদন করিবেন কেন? সাহিত্যিকের হস্তে থাকিবে সামাজিক চাবুক। উদ্যত বেত্রযষ্টি সাহিত্যিক এই সকল দুরাত্মাকে কশাঘাতে সাহিত্য ক্ষেত্র হইতে অপসারিত করুন; সঙ্গে সঙ্গে পাঠকপাঠিকারাও স্ব স্ব রুচির ধারা পরিবর্ত্তিত করুন; সাহিত্যে শুচিতার পুনঃ প্রবর্ত্তন ঘটুক।

এই সম্বন্ধে আর দুইটি বিষয় বলার প্রয়োজন। প্রথম কথা—বাঙ্গালার বর্ত্তমান বানান-সমস্যা। অনেক আন্দোলন আলোচনার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তো বানানের একটা বাঁধাধরা নিয়ম বা রীতি নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেটা আজও সর্ব্বগ্রাহ্য হইতে দেখিলাম না। অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকে এ রীতির ব্যতিক্রম দেখিলে তত ক্ষুব্ধ হই না, যত ক্ষুব্ধ হই খোদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত বাঙ্গালা পুস্তকে এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিয়া। দৃষ্টান্তস্বরূপ ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত মদীয় সতীর্থ ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' নামক পুস্তকের উল্লেখ করিতে পারি। এ সম্বন্ধে স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে অনেক কিছু বলা যাইতে পারে। এখানে শুধু এই কথা মাত্র বলিব—'ভট্টাচার্য্য' লিখিতে গেলে কেহ বা অজ্ঞাতসারে 'য' ফলা লিখিয়া কাটিয়া দেন, কেহ বা তাহাও দেন না; বস্তুতঃ শুধু রেফ পর্য্যন্ত দিয়া যেন লেখনীর রাশ টানিয়া রাখা যায় না। এইরূপ 'সূর্য্য', 'আর্য্য', 'বর্ত্তমান', 'কর্ত্তৃক' প্রভৃতি শব্দ-লিখন কালেও নূতন বানানপদ্ধতি ব্যাপকভাবে অনুসৃত হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। আর, যে সব বিভিন্ন বিষয়ক পারিভাষিক শব্দ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যত্ন ও প্রচেষ্টায় জন্মলাভ করিয়াছে, সেগুলিও অদ্যাপি সাধারণের জ্ঞানগোচর হয় নাই। ইহারও বহুল প্রচার একান্ত বাঞ্ছনীয়।

প্রবন্ধের আরম্ভ বিশ্ববিদ্যালয় লইয়া। মাঝখানে কথাসাহিত্যের আলোচনাটা একটু অবান্তর দেখাইলেও, এ আলোচনার সামঞ্জস্য আছে। বিশ্ববিদ্যালয় এখন বহু পুস্তক নিজেরাই প্রকাশিত করিতেছেন। সুতরাং তাঁহারাও মনে করিলে হয়তো বানান-সমস্যার মত এবম্প্রকার রচনা-ধারাকেও নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন। এই হেতুই এখানে এ প্রসঙ্গের আলোচনা।

আর দ্বিতীয় কথা—ভাষার প্রকাশভঙ্গী (যাহাকে ইংরেজিতে বলে style) পরিবর্ত্তনশীল হইলেও, ইহার মধ্যে যথেচ্ছাচারিতা অমার্জ্জনীয়। প্রকাশ-ভঙ্গী চিরদিনই এক থাকিবে—ইহা আমি বলিতে চাহি না। বাঙ্গালা গদ্যের প্রথমাবস্থার মৃত্যুঞ্জয় যে style ব্যবহার করিয়াছিলেন বা তৎপরে যথাক্রমে যে-যে style ব্যবহৃত হইয়াছে—কোনটারই সমগ্রভাবে চলন এখন আর নাই; কিন্তু সকলেরই অল্পবিস্তর প্রভাব অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়।

তবে এখনকার বিশেষ লক্ষণীয় জিনিষ এই যে—আটপৌরে চল্‌তি ভাষা আর সংস্কৃত লিখিত ভাষা দুইয়েরই পাশাপাশি চলন এখন দেখা যায়। দুইয়ের মধ্যে প্রচলনের কম-বেশী অবধারণ করাও কঠিন। তবে, বীরবলী ভাষার ব্যবহার যার-তার হস্তে শোভা পায় না; প্রমথবাবুর মত ক্ষমতাবান্ সব্যসাচীর হস্তেই শোভা পায়। পরমপন্থা কোনটারই ভাল নয়। আটপৌরে ভাষা নিতান্ত খেলো হইলে যেমন খারাপ দেখায়, পণ্ডিতী ভাষাও নিতান্ত আড়ষ্ট ভাবাপন্ন হইলেও ঠিক তেমনি বেমানান হইয়া পড়ে। বাংলা সাহিত্যে এই সব বিষয় বর্ত্তমানে ভাবিবার কথা।

ত্রিবেণীর প্রাচীন ইতিহাস

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র পাল, প্রত্নতত্ত্ববিদ্

ত্রিবেণী প্রাচীন সপ্তগ্রামের অন্তর্গত একটী হিন্দুদিগের তীর্থস্থান। এই স্থানে যমুনা ও সরস্বতী নদী ভাগীরথীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। এই ত্রিবেণী এক সময়ে ঋষিগণের সাধনাস্থল ছিল। ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বৃন্দাবন দাস "চৈতন্য-ভাগবত" রচনা করেন। এই ভাগবতে ত্রিবেণীর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"সেই সপ্তগ্রামে আছে সপ্ত ঋষিস্থান।
জগতে বিদিত সে ত্রিবেণী ঘাট নাম॥"

প্রাচীন কাহিনীতে জানা যায়—চম্পানগরে বিখ্যাত বণিক চাঁদ সওদাগরের পুত্র নখিন্দ বিবাহ রজনীতে সহসা সর্পাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। নববধূ বেহুলা মৃত স্বামীকে কলার ভেলায় করিয়া ভাগীরথী অতিক্রম পূর্ব্বক ত্রিবেণীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তথায় এক ধোপানীর কুটীরে আশ্রয় লইয়াছিলেন। ধোপানী সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মন্ত্রপ্রভাবে নখিন্দকে পুনর্জ্জীবিত করে। আজিও সেই ধোপানীর ব্যবহৃত প্রস্তরখানি পরিদৃষ্ট হয় এবং স্থানীয় ধোপারা ইহাকে পূজা করিয়া থাকে।

প্রত্নতত্ত্বের গবেষণার প্রভাবে ত্রিবেণীতে বহু প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ত্রিবেণীতে একটী প্রাচীন মসজিদ ও সমাধিক্ষেত্র জাফর খাঁ গাজীর স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই স্থানে গাজী জাফর খাঁ, তাঁহার প্রিয়তমা এবং পুত্রগণের শবদেহ সমাহিত হইয়াছে। মসজিদের দক্ষিণাংশে জাফরের শিলালিপি পাঠে অবগত হওয়া যায়—তুরস্ক জাতীয় জাফর খাঁ হিজিরার ৬৯৮ অব্দে (১২৯৮ খৃষ্টাব্দে) অবিশ্বাসিগণের মস্তক বল্লম বিদ্ধ করিয়া প্রকৃত বিশ্বাসিগণকে প্রভূত ধনরাশি দানে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। (১) জাফর খাঁ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সাহ সফিউদ্দীনকে লইয়া ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। (২) ফিরোজ সাহের রাজত্বকালে যখন জাফর খাঁ বঙ্গদেশে অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময়ে সপ্তগ্রামের অন্তর্গত পাণ্ডুয়া নগরে এক ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মহানাদের রাজা পাণ্ডু বা পাণ্ডবের অধীনে পাণ্ডুয়া নগর ছিল। পাণ্ডুয়ায় বহু হিন্দুর বাস তন্মধ্যে মাত্র পাঁচজন মুসলমান পরিবার বাস করিত। এক সময়ে কোন মুসলমান পরিবার তাহাদের পুত্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে একটী গো বধ করে। ফলে হিন্দুগণ উক্ত মুসলমান পরিবারের উপর অত্যাচার করে, এমন কি সেই শিশুপুত্রকেও হত্যা করে। শোকার্ত্ত পিতা মৃত শিশু-পুত্রকে লইয়া দিল্লী নগরে গমন করিয়া বাদশাহের নিকট অভিযোগ করিল। বাদশাহ এই ব্যাপারে বিশেষরূপে ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রাতুষ্পুত্র সুলতান শাহ সুফীকে সৈন্য সমভিব্যাহারে পাণ্ডু রাজার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। বাদশাহের আদেশে সুলতান শাহ সুফী পাণ্ডুয়ায় আসিয়া পাণ্ডুরাজার সহিত যুদ্ধ করেন এবং যুদ্ধে পাণ্ডুকে পরাজিত করিয়া পাণ্ডুয়া বাদশাহের রাজ্যভুক্ত করেন। (৩) তাঁহার নির্ম্মিত পাণ্ডুয়ার মিনারটী আজিও একটী ঐতিহাসিক নিদর্শন স্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে বলিতে পারা যায় যে, জাফর খাঁ গাজী সাহেব সম্ভবতঃ শাহ সুফী সুলতানের একজন সেনানায়ক ছিলেন। পাণ্ডুয়া যুদ্ধের পর শাহ সুফী সুলতান ত্রিবেণী অধিকার করেন এবং বাদশাহের নামানুসারে ত্রিবেণীর নাম 'ফিরোজাবাদ' রাখেন। কিছুদিন পরেই তিনি জনৈক ভৃত্যের হস্তে নিহত হন। (৪) তাঁহার মৃত্যু হইলে জাফর খাঁ গাজী সাহেব ফিরোজাবাদের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

(১) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. No. 7-এ লিপিবদ্ধ আছে।

(২) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. XV, পৃঃ ৩৯৫।

(৩) মেছাম্লেক মুন্সী মহির উদ্দীন ওস্তাগর সাহেবের প্রণীত "শাহ সুফী সুলতান" নামক পুস্তক পাঠে অবগত হওয়া যায়।

(৪) ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে Calcutta Asiatic Observer-এ লিখিত আছে।

এক্ষণে জাফর খাঁ সাহেব হিন্দু প্রজাগণের প্রতি যথোচিত সদ্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি সপ্তগ্রামের অন্তর্গত ব্রাহ্মণনগরের রাজা মুকুট রায়ের কন্যা চম্পাবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন (৫)। চম্পাবতীর সংসর্গে থাকিয়া জাফর খাঁ গঙ্গার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি হিন্দুগণের সহিত গঙ্গাস্নান ও গঙ্গাস্তোত্র পাঠ করিতেন। তবে তাঁহার স্তোত্রে সংস্কৃত সাহিত্য ও পারস্য ভাষার সংমিশ্রণ দেখা যায় :—

"হরেঃ কাপি কুঞ্জে তবাঙ্গে স্থনিয়া,
ববৌ দব্দিয়ারজ ববীনং চকোবা।" ইত্যাদি।

জাফর খাঁ কিছুকাল সুখে অতিবাহিত করিবার পর বৃদ্ধ বয়সে ভুদিয়ারাজের সহিত যুদ্ধে নিহত হন (৬)। তাঁহার মৃত্যু হইলে, শবদেহ আস্তাগার মধ্যেই উচ্চ বেদী নির্ম্মাণ করিয়া সমাহিত করা হইয়াছিল।

ত্রিবেণীর মস্‌জিদ ও জাফর খাঁর সমাধিতে হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শন আবিষ্কার করিয়া মিঃ এ, মণি সর্ব্বাগ্রে ত্রিবেণীকে সাধারণের গোচরীভূত করেন (৭)। প্রফেসর ব্লকম্যান সাহেব এই স্থানের হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি বর্ণনা করিয়াছেন (৮)। খ্যাতনামা প্রত্নতত্ত্ববিদ্ স্যার জন মার্শালের মতে এখানকার মস্‌জিদ হিন্দুদিগের প্রাচীন শ্রীকৃষ্ণের মন্দির ভাঙ্গিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় ১৭৬৯-৭০ অব্দে Mr. Stravornius নোয়া সরাই হইতে পদব্রজে ত্রিবেণীতে আসিয়াছিলেন। তিনি এখানকার মস্‌জিদ ও সমাধিক্ষেত্র দর্শনে লিখিয়াছেন :—

"About an hour before we came to Torboonoo, we entered another wood, into which having advanced a little, we met with an ancient building, of large square stones, which seemed as hard as iron, for whatever pains we took, we could not with a hammer break any pieces off. The building was an oblong square 30 feet in length and 20 in breadth. The walls were 13 or 14 feet in height. It had no roof, and within it were three tombs, four feet above the ground made of a blackish kind of stone and polished, with here and there some Persian character engraved upon them. About 40 paces further was a large but very ruinous building, the roof of which consisted in five domes or cuplus which had been adorned with sculptured imagery, but which was much obliterated."

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে উড়িষ্যায় গজপতি বংশীয় রাজারা রাজত্ব করেন। এই বংশের শেষ রাজা মুকুন্দরাম হরিচন্দন ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে ত্রিবেণী অধিকার করেন। তিনি গঙ্গাস্নানের নিমিত্ত একটী ঘাট নির্ম্মাণ করেন এবং ঘাটের অনতিদূরে শ্রীশ্রী৺বেণীমাধব জীউর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন (৯)। এই সময় হইতেই ত্রিবেণীতে পুনরায় দেব-দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। বৎসরের প্রতিদিনই ত্রিবেণীতে বহু যাত্রীর সমাগম দেখা যায়। প্রতি বৎসর ১লা মাঘ "উত্তরায়ন্তী" নামে এখানে এক মহোৎসব হইয়া থাকে।

এক কালে ত্রিবেণী সপ্তগ্রামের অন্তর্গত একটী সংস্কৃত-চর্চ্চার কেন্দ্রস্থলও ছিল। তৎকালে এখানে বহু পণ্ডিত বাস করিতেন। ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে এই পবিত্রভূমিতে খ্যাতনামা পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয় জন্ম গ্রহণ করেন।

বর্ত্তমান ত্রিবেণীকে কেন্দ্র করিয়া চন্দহাটীর "কপিলাশ্রম", ডুমুরদহের "উত্তমাশ্রম" এবং "কালীদহ" প্রভৃতি কতিপয় স্থান বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। বস্তুতঃ ত্রিবেণী সেই সুপ্রাচীন কাল হইতে আজিও এক পবিত্র ঐতিহাসিক স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ।

(৫) 'ইসলামপ্রচারক'—৯ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা।

(৬) Hunter's Statistical Account of Bengal, Hooghly District, Page 311.

(৭) Journal of the Asiatic Society of Bengal Vol. XVI, Part I.

(৮) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. XXXIX, Part I—1870.

(৯) Orissa—Sterling.

খ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি

অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য এম. এ.

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে খ্রীষ্টধর্ম্মমূলক দ্বিতীয় মাসিক পত্ররূপে "খ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি" প্রকাশিত হয়। ইহা শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় মুদ্রিত। প্রতি সংখ্যার মূল্য ⁄০। আকার ৭½" × ৪⅞" ইঞ্চি। প্রতি সংখ্যায় ৮ পৃষ্ঠা করিয়া থাকিত। উক্ত পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় সর্ব্বাগ্রে নিম্নের কয়েক পংক্তি মুদ্রিত হইয়াছে। "সকলকে জানান যাইতেছে এই পত্র প্রতিমাসে শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপা করিবার বাসনা আছে, অতএব যে কোন খ্রীষ্টিয়ান মণ্ডলীর কোন সমাচারপ্রকাশের আবশ্যকতা বোঝেন তাহা এখানে পাঠাইলে এই পত্রে ছাপান যাইবেক।" ইহার সম্পাদক কে ছিলেন, জানিতে পারি নাই। আলোচ্য পত্রিকার রচনাভঙ্গী হইতে সম্পাদক যে জনৈক ইউরোপীয় মিশনরি ছিলেন, তাহা অনায়াসে বুঝা যায়। এই পত্রিকার মাত্র ৪ সংখ্যা দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা—১৮২২ মে, ১ম খণ্ড ১০ম সংখ্যা—১৮২৩ ফেব্রুয়ারী, ১ম বর্ষ ১৪শ সংখ্যা—১৮২৩ জুন, ও দ্বিতীয় খণ্ড ১ম সংখ্যা—১৮২৪ জানুয়ারী। যদি প্রতি মাসে নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ২০ সংখ্যায় অর্থাৎ ২০ মাসে ১ম খণ্ড শেষ হইয়াছে এবং ২১ সংখ্যক মাস হইতে দ্বিতীয় খণ্ড আরম্ভ হইয়াছে। এই পত্রিকা কতদিন স্থায়ী হইয়াছিল, তাহাও জানা যায় নাই। ইহাতে শুধু খ্রীষ্টধর্ম্মমূলক প্রস্তাবই মুদ্রিত হইত। সুজনপুর, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম ও দিল্লী প্রভৃতি স্থানে খ্রীষ্টধর্ম্মবিস্তারের জন্য যে চেষ্টা হইয়াছিল, তাহার বিবরণ, আনন্দ চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক দেশীয় খ্রীষ্টিয়ানের জীবনী, ইংলণ্ডের 'সোসৈয়িটীর' বিবরণ প্রভৃতি প্রকাশিত হয়*। উক্ত পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় পত্রিকাপ্রচারের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া যে বিজ্ঞপ্তি মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে আংশিক উদ্ধৃত হইল। যথা:—

"লোকেরদিগের মন পরিবর্ত্তন করণার্থে তুমি আপন টাকা ব্যয় কিছু কর। এবং মূর্খেরদিগের শিক্ষা করাণের এবং ধর্ম্মপুস্তক ও তদ্বিষয়ক ক্ষুদ্র পুস্তক ব্যয় করার ও ধর্ম্ম শিক্ষা ঘোষণা করিতে লোক নিযুক্ত করার আবশ্যকতা আছে কিন্তু ইহা ধন বিনা হইতে পারে না অন্য ২ খ্রীষ্টিয়ানেরা ইহা বোধ করিয়া ইহার কারণ অনেক ধন ব্যয় করিয়াছে বঙ্গদেশীয় খ্রীষ্টিয়ানেরদিগের সেই মত কর্ত্তব্য। হে প্রিয় বঙ্গদেশীয় খ্রীষ্টিয়ানেরা অন্যলোকের দানের অধীন যে তোমরা

খ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি। ১১০৮

মাসিক সমাচার পত্র

মাস মে। সন ১৮২২ সাল। ১ সংখ্যা

সকলকে জানান যাইতেছে এই পত্র প্রতিমাসে শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপা করিবার বাসনা আছে অতএব যে কোন খ্রীষ্টিয়ান মণ্ডলীর কোন সমাচার প্রকাশের আবশ্যকতা বোঝেন তাহা এখানে পাঠাইলে এই পত্রে ছাপান যাইবেক।

খ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি পত্রিকার ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যার লেখা ও ছাপার নমুনা

* নিম্নে এই পত্রিকার যে চারি সংখ্যা দেখিয়াছি তাহার প্রবন্ধসূচী মুদ্রিত হইল। এই চারি সংখ্যা রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটী অব বেঙ্গল গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে।

প্রথম খণ্ড প্রথম সংখ্যা—পৃথিবীর মনুষ্যেরদিগের বিষয়
ভারতবর্ষের মঙ্গল সমাচারের আবশ্যকতা

প্রথম খণ্ড দশম সংখ্যা—পাঠকরণের বিষয়
আনন্দ খ্রীষ্টিয়ানের চরিত্র
আনন্দ খ্রীষ্টিয়ানের দেশ ভ্রমণের বিবরণ
আনন্দ খ্রীষ্টিয়ানের মঙ্গল সমাচার প্রাপ্তি বিবরণ

প্রথম খণ্ড চতুর্দ্দশ সংখ্যা—ইংলণ্ডের সোসৈয়িটীর বিবরণ
সুজনপুর, দিনাজপুর, দক্ষিণ সমুদ্র উপদ্বীপ,
অকলডুম্বর বৃক্ষ, সহমরণ

দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম সংখ্যা—বেথেল নামে জাহাজীয় লোকেরদের সম্প্রদায়
চট্টগ্রাম, দিল্লী

হও ইহা বুঝি তোমারদের ইচ্ছা হইতে পারিবে না এবং তোমরা কেবল গ্রাহক যে হইতে চাহ সে নয় কিন্তু ব্যয়কারীও হইতে চাহ। খ্রীষ্টের সম্ভ্রমার্থে ও পাপিরদিগের ত্রাণার্থে তোমারদের সর্ব্বস্ব দান করা কর্ত্তব্য ঈশ্বরের অনির্ব্বাচ্য অনুগ্রহ তোমারদের প্রতি যে আছে তাহার স্বীকার চিহ্নের কারণ তোমারদের ইহা করা কর্ত্তব্য। তোমরা যখন দেবাশ্রয়ে ছিলা তখন যাহারা ঈশ্বর নয় তাহারদের সেবাতে তোমারদের নিত্য ব্যয় হইত এখন যাহার আশ্রয়ে তোমরা রক্ষা পাও এমন সত্য ঈশ্বরের সেবার নিমিত্ত কি কিছু ব্যয় করিবা না। তোমরা খ্রীষ্টের মঙ্গল সমাচারে এই শিক্ষা পাইবা যে যদি ঈশ্বরের সম্ভ্রম ও মানুষের উপকার বৃদ্ধি না হয় তবে উচ্চপদ ও অধিক জ্ঞান ও ধন অল্প কিম্বা অধিক ইহাতে কিছুই ফল নাই যদি তোমারদের ধনে কাহারো উপকার না হয় সে ধন তোমারদের পরিশ্রমের যোগ্য নহে কিন্তু যদি তোমারদের ধনদ্বারা একটী প্রাণী পরিত্রাণ পায় তবে বহুতর পরিশ্রম করিলেও বিফল হয় না ইহা বিস্মৃত হইও না।

অন্য ২ দেশে খ্রীষ্টিয়ান লোকেরা কিরূপ পাপির-দিগের পরিত্রাণার্থে প্রার্থনা করে ও মঙ্গল সমাচার ঘোষণা করিতে ও লোকেরদিগকে শিক্ষা করিতে কিরূপ পরিশ্রম করে ও অন্য লোকদ্বারা মঙ্গল সমাচার ঘোষণা করিতে আপনারা কত টাকা ব্যয় করে ও ঈশ্বর তাহারদিগের প্রার্থনা কিরূপ শ্রবণ করেন ও তাহারদের ক্রিয়ার ফল দেন। এই সকল তোমারদিগকে জ্ঞাত করার কারণ মাসে ২ এই মত পুস্তক ছাপা হইবে। তাহাতে নানা দেশীয় ভাল সমাচার দেওয়া যাইবেক এই পুস্তক বিষয়েতে যে লাভ হইবে তাহা ভাল ২ পুস্তক ছাপাইয়া ধর্ম্মজ্ঞানার্থে হিন্দুর-দিগকে দিতে এবং তাহারদিগকে পরিত্রাণের পথ শিক্ষা করাইতে ব্যয় করা যাইবেক। আমরা এই ভরোসা করি যে তোমরা এ বিষয়ে আমারদিগের সহায়তা করিবা ও মাস ২ কিছু ২ করিয়া দিবা ও প্রভু যিশুখ্রীষ্টের মঙ্গল সমাচার ঘোষণা করণার্থে বাঙ্গালি খ্রীষ্টিয়ানের মধ্যে এক দল কর। যখন শ্রীযুত মেস্তর ম্যাক সাহেব ইংগ্লণ্ড ছাড়িলেন তখন কতক গরিব চাকরেরা একত্র হইয়া বাঙ্গালি কোন কেতাব ছাপাইয়া বাঙ্গালি লোককে দিতে ৫ টাকা দিল তাহারা বাঙ্গালি লোকেরদিগকে প্রেম বোধ করিয়া টাকা দিল এই পাঁচ টাকার দ্বারা আমরা এক পুস্তক আরম্ভ করিব এবং এই ভরোসা করি যে তোমরা ক্রমে ২ ইহা বৃদ্ধি করিবা।" [পৃ ৪-৬]

খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারমূলক এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় "ভারতবর্ষের মঙ্গল সমাচারের আবশ্যকতা" শীর্ষক এক ক্ষুদ্র নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে 'সত্য ঈশ্বরের' সেবা-বিমুখ হিন্দুদের দুরবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া, ইহারা সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিলে কতটুকু শান্তি পাইবে, তাহার এক চমৎকার বর্ণনা দেওয়া আছে। নিম্নে আলোচ্য নিবন্ধটী সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইল।

"ভারতবর্ষের মঙ্গল সমাচারের আবশ্যকতা। অনুমান হয় যে হিন্দুস্থানের মধ্যে প্রতি বৎসরে দুই হাজার স্ত্রী সহগমনে খুন হয় এবং সহস্র ২ লোক তীর্থ যাত্রাতে গমন করিয়া অনাহারে কিম্বা পীড়াতে মারা পড়ে এবং সহস্র ২ লোককে মরণের পূর্ব্বে গঙ্গাপ্রাপ্তির কারণ তীরে আনিয়া রৌদ্র ও শীত ও জলপান ও জলে নামানেতে মারিয়া ফেলে। এবং লোকেরা এমন অজ্ঞান যে সত্য ঈশ্বরের সেবা না করিয়া কাষ্ঠ ও মৃত্তিকার পূজা করে এবং সত্য ঈশ্বরের সেবার্থে হিন্দুরদিগের একটা মন্দিরও নাই এবং তাবদ্ভারতবর্ষের মধ্যে স্ত্রীলোকের শিক্ষার্থে একটা স্কুলও নাই জ্ঞান অভাবে এত সর্ব্বনাশ হইতেছে তবে কত বড় আবশ্যকতা আছে যে প্রভু যিশু খ্রীষ্ট আসিয়া এ লোকেরদিগকে রক্ষা করেন যে হেতুক যখন এই দেশে সর্ব্বত্র খ্রীষ্টের রাজ্য স্থাপন হইবে তখন এই সকল স্ত্রী অগ্নি হইতে রক্ষা পাইবে ও এই সকল যাত্রিকেরা পথ পরিশ্রম ও আপদ হইতে মুক্ত হইবে ও গঙ্গাতীরে দুঃখ ভোগিরা খ্রীষ্টের মরণে ত্রাণ পাইয়া আহ্লাদ মৃত্যু পাইবে ও যাহারা এখন কাষ্ঠ ও মৃত্তিকার পূজা করে তাহারা ঈশ্বর বিষয়ক সত্য জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরের ঘরে মিলিয়া স্তব ও প্রার্থনা ও সুশিক্ষা নিত্য পাইবে ও আবালবৃদ্ধ বণিতা সকলে সত্য বিদ্যা পাইবেক ও অতি সুখে কালক্ষেপণ করিবেক।" [পৃ ৮]

এই পত্রিকার প্রত্যেকটী প্রবন্ধে কোন না কোনরূপে খ্রীষ্টধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং এদেশীয়দিগের খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণের

প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত হইয়াছে। উক্ত পত্রিকার প্রথম বর্ষের চতুর্দ্দশ সংখ্যায় "সহমরণ" শীর্ষক বিবরণের শেষে যে মন্তব্য করা হইয়াছে, তাহা ভাষা ও ভাবের দিক্ দিয়া অনবদ্য সন্দেহ নাই। নিম্নে 'সহমরণ' হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল।

"পরে দুই প্রহর এক ঘণ্টা রাত্রির সময়ে ঐ স্ত্রী গঙ্গাতীরে গেল। গমন কালে দীন দুঃখিরদিগকে স্বহস্তে অনেক ধন বিতরণ করিয়াছে সেই স্থানে বিচারকর্ত্তা সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইল এবং সাহেব অনেক মিষ্ট বাক্যেতে তাহাকে ফিরাইবার কারণ অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাহাতে কিছু ফল হইল না। পরে মাজিস্ত্রেট সাহেব অগত্যা আজ্ঞা দিলেন। অতএব বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে যাহারদের জ্ঞানের মালিন্য প্রভু যিশুখ্রীষ্ট দ্বারা না গিয়াছে এবং যে সকল রক্ষক হীন মেষ অদ্যাপি ভ্রমেতে ভ্রমিতেছে তাহারদের কি দুরবস্থা। হে ঈশ্বর তোমার রাজ্য শীঘ্র আইসুক এবং তিমিরাবৃত ও শয়তানের শৃঙ্খলাতে বদ্ধ যে সকল মরণীয় পাপী তাহারদিগকে মুক্ত কর।"

এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধাদির লেখকের নাম জানা যায় নাই। তবে যে সকল পত্র মুদ্রিত হইয়াছে তাহার লেখকের সন্ধান জানা যাইতেছে। পত্রলেখকদের মধ্যে এদেশীয় ও ইউরোপীয় উভয় সম্প্রদায়ের লোকই আছেন। সুজনপুর ও চট্টগ্রাম হইতে প্রেরিত পত্রদ্বয়ের লেখক ইউরোপীয়। প্রথম খানি "মেং ডগলিস" ও দ্বিতীয় খানি "মেং যোহনস্" সাহেব লিখিত। দিনাজপুরের পত্রখানির লেখক "নিধিরাম খ্রীষ্টিয়ান"।

এই পত্রিকায় দেশী খ্রীষ্টানদের জীবনচরিত প্রকাশিত হইত। প্রথম খণ্ড দশম সংখ্যায় আনন্দ খ্রীষ্টিয়ানের চরিত্র মুদ্রিত হইয়াছে। আনন্দ ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া "এক দিবস আপন পৈতা লইয়া তাহার অর্দ্ধ সুতাতে হুকাবন্ধন করিলেন আর অর্দ্ধ সুতাতে জুতা মেরামৎ করিয়া কহিলেন আমার গলায় কি ভারি শয়তানের জিঞ্জির ছিল প্রভু যিশু খ্রীষ্ট আমাকে রক্ষা করিলেন এই কথা কহিয়া প্রার্থনা করিলেন।"

এই পত্রিকার গদ্যরীতি সরল ও অনাড়ম্বর। ইহাতে "ক্রমশঃ" শব্দের পরিবর্ত্তে "ইহার শেষ বিবরণ আগামি মাসিক কাগজে দেওয়া যাইবে।"—এরূপ লিখা আছে।

আমাকে কেহই বাসেনি ভাল

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মরু-সাহারার ধূসর বক্ষে সোণালী বালুর উষর পথে
সারি-দেয়া ক্রম-ক্ষীণায়মান সে ক্যারাভান-পদ-চিহ্ন আঁকা—
রেখা রাখিয়াছে আমারো জীবনে;
মরীচিকা-মায়া ভুলিনি আজো;
মরু-জীবনের অসহায় সেই দিনগুলি আমি বেসেছি ভালো।

পাহাড়ের গায়ে আঁধার গুহায় নিরবলম্ব জীবনটুকু—
বৈশাখী ঝড়ে বন-মর্ম্মরে পাইনের যত প্রলাপ-কথা,
বর্ষা-আবেগে পাহাড়-চূড়ার পৃথিবীর পথে গড়িয়ে পড়া,
নিশীথ রাত্রে পশু-চীৎকার—আমার জীবনে লেগেছে ভাল।

সাগর-কিনারে জুলিয়ার ছোট জীর্ণ কুটীরে থেকেছি আমি;
অমাবস্যার ভীষণ উর্ম্মি, ফস্‌ফরাসের প্রসিত ফেনা,
অসীম আকাশে সাগর-পাখীর উদ্দেশহীন ভাসিয়া যাওয়া—
উড়ায়ে নিয়েছে আমারো আত্মা;
সে পরিবেশেও বেসেছি ভাল।

পৃথিবী আমাকে ভাল লাগিয়াছে;
ভালবাসিয়াছি জীবনটাকে;
ভাল বাসিয়াছি ধূলি-লুণ্ঠিত শুষ্ক, জীর্ণ পত্রকুটীরে;
ভাল বাসিয়াছি দিনের দীপ্তি, নিশীথ রাতের নিবিড় ছায়া;
প্রহেলি-মাখানো রমার দৃষ্টি বাসিয়াছি ভাল আত্মা দিয়ে।

প্রতিদানে আমি পৃথিবীর কাছে পরমাণুতম পাইনি আলো;
অদাতা জীবন, অকরুণা রমা,—আমাকে কেহই বাসেনি ভালো।

ছবির প্রাণবস্তু কল্পরূপ না প্রতিরূপ ?

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মল্লিক

আধুনিক কালে একদল লেখক বলতে সুরু করেছেন, বর্ত্তমানের চিত্রকররা যেন বস্তুবাদী না হয়ে কল্পবাদী হয়ে পড়ছেন। কথা কয়টীর গুরুত্ব যথেষ্ট থাকলেও, প্রথমতঃ প্রশ্ন ওঠে, চারুকলার আবির্ভাব কোন্ উপাদানকে অবলম্বন করে', বস্তুগত বাস্তব জীবনের হুবহুবতার প্রতিকৃতি—না, মনোজগতের চৈতন্যময় অনুভূতির—যার প্রকাশে স্পন্দিত আকাশ, কম্পিত বাতাস, চঞ্চল হৃদয়াবেগের স্নায়ুতন্তু ছন্দোবিভঙ্গিত হয়ে, আলোতে, গানে, সুরে, আমাদের জড়-চৈতন্যকে, গতিমান, আকৃতিমান করে' তুলেছে—পারিপার্শ্বিক দুঃখ, দৈন্য, ক্লেশ, চাঞ্চল্যের মাঝে হাঁপিয়ে ওঠা মনকে,—ফুল্ল-মাধবীবল্লরীর মধু-গন্ধে, প্রকাশিত নবারুণের সোণালি রৌদ্রে, ক্ষণেক তরে অন্তরে এসে প্রবেশ করছে—মিলে যাচ্ছে, আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক কোলাহলপূর্ণ জৈবিক জীবনের মাঝে—বহে আনছে আনন্দের সঙ্গীত-ধ্বনি; চৈতন্যের মাঝে এঁকে দিচ্ছে রূপলোকের আলিম্পনা—তারই অনুকৃতি ?

বস্তু আর কল্পনা—একটা বলে, আরটা চলে। যে চলে—সে শুধু চলতে থাকে, বাঁধা নিয়মের গণ্ডীর বাহিরে—অন্তরের আবেগে। সেই, গতিমান ছন্দঃ চলে তরঙ্গ-ভঙ্গীতে রসলোকের সন্ধানে, নানা দেশের নানা লোকের, নানা যুগের, রকমারী পসরা নিয়ে; কল্পলোকের অলিতে গলিতে—অমৃতের সন্ধানে। সে কখনও হাসে—হাসায়; কাঁদে—কাঁদায়। কখনও নাচে, কখনও নাচায়। অনন্তকাল ধরে' শুধু চলে—চিরকালের চির নূতন। আর যে বলে, সে যেন অফিসের মালিকের মত। স্থির হয়ে বসে কাজ চালায়। হিসেব দেখে, আড়ৎদারীর সময়ের হিসেবেই তার দর; তাই হয়ে পড়ে সাময়িক। আজ যাকে আমি বলবো এটা ঠিক, মুহূর্ত্ত পরে অন্য বস্তুর আবির্ভাবে সে হবে অচল।

হুবহুর প্রতিরূপ পাই আমরা দেহতত্ত্বের বইএর পাতায়। সেখানে বিভাগ করে', দেহের প্রতি অঙ্গের সঙ্গে ঠিকঠাক মিল করে', অঙ্ক কষার মত নিখুঁত অনুকরণে। তাতে লেখা হ'ল যা—তা আমাদের বাহিরের বস্তুগত খবর। সে লেখা থেকে জ্ঞান লাভ করি, শিক্ষা দান হয়, ঐতিহ্য মেলে। কিন্তু রূপকার যখন লিখল সেই মানুষকে, সে হয়তো দেহতত্ত্বের হুবহুবতার সঙ্গে মিল্‌ল না অনেকখানি। তবু দেখি সেই রূপক মানুষ, কথা কয়ে উঠল, নেচে উঠল, নাচিয়ে দিলে আমাদের জড়গ্রস্ত চৈতন্যকে। বদ্ধ দুয়ারের অন্ধকূপে থেকে তাকে টেনে আনলে উদার আকাশের নীলিমার তলে—যেখানে চঞ্চলিত মধুলিহের গুঞ্জনে গুঞ্জরিত বনস্থলী। আত্মার মাঝে এক বিরাট্ রসলোকের সন্ধান; রূপকারের তুলির মৃদঙ্গের বোলে পথ দেখিয়ে দিল।

আমরা দেখতে পাই—ছবি, কবিতা, এরা হ'ল প্রাণের মধ্যে যে চেতনা বিশ্ব-সৃষ্টির সৃজনী ছন্দে নিরন্তর নৃত্য করছে, যে রসলোকের ভৃঙ্গার পূর্ণতার অনুকল্পে বেজে উঠছে, তারই সঙ্গে একত্বলাভের স্তুতি। এরা সম্পূর্ণ অন্তর্লৌকিক। তাই দেখি, ভাবপূর্ণ কল্পরূপের ছবি, কবিতা যুগ যুগ ধরে' অনুভূতিকে উৎফুল্ল করছে। রসস্বাদগ্রহণের সুযোগ দিয়ে এরা চলেছে—আমাদের অন্তরলোকের রম্যকক্ষের পরিধির অন্তপুরে।

এখানে কথা উঠতে পারে—যে সাময়িক ঘটনা ঘটে চলেছে আমাদের পার্শ্বে, তারা কি চিত্রবস্তু হয়ে আমাদের রসের যোগান দিতে পারে না? এই জৈবিক দুঃখ, দৈন্য, হীনতা—এদের মাঝে কি শিল্পীর দৃষ্টি দিয়ে সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করে, ভোজ্য বস্তু হ'তে পারে না? এর উত্তর—হতে পারে। গল্প বা উপন্যাসে, যা' চলতে পারে, তা' ছবিতে প্রকাশ করলে—ছবির ছন্দঃপতন অবশ্যম্ভাবী। জগতের মধ্যে যে অব্যক্ত ছন্দঃ লীলায়িত ভঙ্গীতে আমাদের প্রাণধারার মাঝে প্রবাহিত হচ্ছে, তাকে প্রকাশের জন্য হয়তো সামান্য কোন একটী অবলম্বন গ্রহণ করে' সে বিকাশের পথ খুঁজে নেয়। কিন্তু হুবহু প্রতিরূপের পরিবেষ্টনে যদি সেই অরূপ লোকে রূপ

দিতে হয়, তা'হলে সেই ছবিকে ধিক্কার দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। কারণ ছবি হ'ল এমন একটা বস্তু, যার নিজস্ব বিকাশের ভঙ্গীই হ'ল তার একমাত্র ধর্ম্ম। কাব্যে যাকে বলা হয় ছন্দঃ, ছবিতে তাই হ'ল তার প্রতিরূপ-সৃষ্টির রূপক অনুভূতি। যেমন কাব্য যদি শুধু ছন্দঃ হয়, তা'হলে তাকে কাব্য বলা যেমন কঠিন —তেমনি ছবি যদি শুধু বস্তুধর্ম্মী হয়, তার প্রতিও সেই একই অনুযোগ ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। ধরা যাক একটা নজীর—কোনও এক বাদলা রাতে একটী মেয়ে বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে। ঘটনা এইটুকুমাত্র, কিন্তু এই ঘুমের বিষয়টী ততক্ষণ আমাদের অন্তরে কাঁপন ধরাবে না, যতক্ষণ না তাকে অনুভূতি দিয়ে গ্রহণ করব। তাকে কি রঙের ছন্দে, কি কথার ছন্দের মাঝে ফেলা যাবে না, যে বিষয়টী আমাদের নিত্যকালের, কল্পলোকের বেণুতে বেজে চলেছে, আত্মায় তারই পরশ, তারই অনুভূতি যতক্ষণ না পাব? সেই অনুভূতি এমন একটী পরম ব্যাপার, এমন লোকাতীত ঘটনা, যা' আজিকার মহাযুদ্ধের চেয়েও বিস্ময়কর, তুলনায় অনিত্য। কবি তাঁর তানপুরায় এই সামান্য ঘটনাই ঝঙ্কৃত করে' তুললেন—

"রজনী সাঙন ঘন, ঘন দেয়া গরজন
ঝিমি ঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়নে রঙ্গে বিগলিত চীর-অঙ্গে
নিদ যাই মনের হরিষে।"

রূপকার রঙের ছন্দে, অম্বরে ঝঙ্কার জাগিয়ে তুললে। অথচ দেখা গেল বস্তুগত ঘটনা কিছুই নয়। কল্পনা—ছন্দের তালে নিয়ে গেল অবস্তুর সন্ধানে।

বস্তুগত প্রতিরূপ, চিরকালই একই জায়গায় রয়ে যায়। সে হয়ে পড়ে ইতিহাসের শুষ্ক প্রবীণতা—ছন্দোহীন। ব্যবসায়ীর হিসাবের খাতার মত তা' প্রাণহীন। রূপকার অব্যবসায়ীর মত, অজ্ঞানীর মত সরস চঞ্চল প্রাণের বেগে কল্পলোকের ছবি আঁকে। তার চরম উদ্দেশ্য ইতিহাস নয়। খুসি—যে খুসি আমাদের কান্তি-রস-বোধকে জাগ্রত করে—তারই বিশেষ উদ্বোধন।

এই সব কাল্পনিক ছবিতে হয় তো আমাদের জৈব দৈন্যতার অভাব রয়ে যায়। বেশ জাগ্রত বোধের আভাষ মেলে না; শিক্ষা দেবার সদাব্রত খোলে না। কিন্তু তার রঙ, রেখা, মাধুর্য্যের ছন্দে নাড়া খেয়ে—দোলা লেগে সচকিত চৈতন্য সাড়া দিয়ে বলে' ওঠে—হ্যাঁ, এইতো বটে! তাই দেখি, এই সব ছবির মধ্যে বরাবরের মত একটা সচলতার বেগ রয়েই গেল—যা হুবহুর নকল ছবির খাঁটি খবরের চেয়ে নাড়া দেয় বেশী।

আব্‌হাওয়া অফিস খবর দিল বর্ষা এসেছে। আকাশের কোণায় কোণায় জমেছে কালো মেঘ। বনভূমি রূপ ধরেছে গাঢ় শ্যামলিমা। হুবহুর প্রতিকৃতিপন্থীর কাছে এর বেশী বলতে গেলেই ধমক দেবে। কারণ বস্তুতঃ এর বেশী ঠিক্-ঠিক্ আর কি বর্ণনা করা যাবে? কিন্তু চিত্রকর তার রঙের ছন্দে, তুলির স্বরগ্রামে সুর ধরলেন—"মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমাল-দ্রুমৈঃ।" শিল্পী মনের প্রথম বর্ষার সংবেগ চড়ে' বসল কল্পনার পক্ষীরাজের পিঠে; চিরকালের মন হরণ করতে—তাকে কি বলব ভুল করছে? চিত্রসৃষ্টির গোড়ার কথাই হ'ল এই। তার রেখায়, কল্পনায়, ভাবে, রঙে —এক একটী সামঞ্জস্যবদ্ধ, সাজাই-বাছাই—যা' প্রতিরূপ নয়, স্বরূপ। তার উদ্দেশ্য রিপোর্ট দাখিল করা নয়—উদ্দেশ্য চৈতন্যকে কবুল করিয়ে নেওয়া।

মানুষের মনের মধ্যে যে মনের মানুষ রয়েছে, তাকে পাবার আকাঙ্ক্ষা চিরকাল ধরে' মানুষ করে এসেছে। জীবনের হুবহুর প্রতিরূপ যদি তার কামনা হ'ত, তা'হলে কবি বা শিল্পীর প্রয়োজন জগতে থাকত কি না সন্দেহ। আমরা চাই আমাদের অন্তরজগতের চির নির্ব্বাসিত কল্পনাকে দেখতে। তাই দেখি, বিরহী যক্ষ, শকুন্তলা, রাধা, অরূপলোকের রাজকন্যা, দয়িতা ঘুরে' ঘুরে' বেড়াচ্ছে চেতনার গুপ্ত পথে। চাই না ট্র্যাজেডি, যা' ঘটছে নিত্য জীবনের মাঝে। আমাদের চির-দয়িতের প্রতিরূপের প্রতিচ্ছবি পেতে চাই একান্ত ভাবে।

বস্তুগত প্রতিকৃতি আমাদের কিছুক্ষণের তরে বিহ্বল করে' দেয়। কল্পলোকে রূপচ্ছবি আমাদের আনন্দ দেয়। চিরকালের রূপকন্যাকে চাবার, পাবার ছন্দই জড়ত্বানুভূতির না পাওয়ার অভাবকে পূর্ণ করতে ভাবের ময়ূরপঙ্খীতে চড়ে' শিল্পী ছুটে অনন্ত যাত্রার পথে।

রূপ-সৃষ্টির বিষয় যদি হয় বিশ্ব, তবে রূপক-র বিষয়ই বা কেন হবে না চিত্র? যে বিদ্যুৎকণা তাপ দেয়, আলো দেয়, তা' থেকে কোন রূপ উপলব্ধি হয় না। আবার ঐ বিদ্যুৎ যখন চৈতন্যে আঘাত দিয়ে, ঘন মেদুর অম্বর সচকিত করে' তোলে, তখন তাই হয়ে ওঠে রূপক। একদিন সৃষ্টির সৌন্দর্য্যলোকে এই রহস্য প্রকাশ পেয়েছিল মানুষের শিল্পসৃষ্টির প্রকাশে। তাই দেখি ঐতেরেয় ব্রাহ্মণ বলছেন—"শিল্পানি শংসন্তি দেবশিল্পানি।" মানুষের সব শিল্পই দেবশিল্পের স্তব করছে। "এতেষাং বৈ শিল্পানামনুকৃতীহ শিল্পম্ অধিগম্যতে—" বিশ্বশিল্পের রহস্য অনুসরণ করেই মানবশিল্প।

উপসংহারে শুধু এই কথা বলতে চাই—ছবির একটা দিক্ আছে, যেটাকে বলা যেতে পারে কৌশল। এর চেয়ে বড় হচ্ছে সৌষ্ঠব। তার মধ্যে বাহাদুরী নেই, সমগ্র চিত্রের মধ্যে যে আত্মবিস্মৃত নিবেদন—তার মাঝে এর উদ্ভব। ছবি দেখতে গিয়ে যদি এর অভাব দেখি, তা'হলে ছবির দিক্ দিয়ে ধিক্কার দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। আমাদের দেহটার প্রতি যন্ত্রই আশ্চর্য্য সৃষ্টি; স্রষ্টা তাদের স্বাতন্ত্র্য দিয়েও ঢাকা দিয়েছেন। দেহ তাদের ব্যবহার করে, কিন্তু প্রকাশ করে না। যখন প্রকাশ হয়, যকৃত বৃহৎ হয়ে দেখা দেয়—তখন দেহ তার লাবণ্য হারায়। তেমনি বস্তুগত উপাদান যেমন প্রয়োজন, কিন্তু তার প্রাধান্য ঠিক তেমনি অপ্রয়োজন। ছবির সার্থকতা—তার ভাব, কৌশল, কল্পনা, সাজানো, রঙ ও রেখার বিকাশে। এবং সেই ছবিই হয় চিরন্তন, যে ছবি সাময়িক বস্তুবাদের গণ্ডী ছাড়িয়েছে।

কালিদাস-প্রশস্তি

শ্রীশ্যামধন বন্দ্যোপাধ্যায়

নাহি জানি স্বপ্নাতীত কোন্ সে অতীতে
সজল-জলদ ঘন-বরষাপ্রভাতে
আকাশের পানে চেয়ে কা'র মর্ম্মবাণী
শুনেছিলে তুমি কাণে;—যা'র প্রেরণায়
লিখে গেছ "মেঘদূত"—
চির বিরহীর তপ্ত আঁখি-জল ঢালি'।
লুব্ধ ভ্রমরের মত আজও বিশ্ববাসী
যে অমৃতচক্র ঘিরে' করিছে গুঞ্জন
বিন্দুমাত্র কাব্য-রস-সুধার সন্ধানে।
তুমি মহাকবি, এই মাত্র শুনেছি আমরা।
নাহি কোন প্রতিকৃতি, মর্ম্মরে বা পটে—
উপচার সহ, দিব যা'র গলে পূত পুষ্পহার;
কিংবা, জীর্ণ হস্তলিপি কিছু লুকানো কোথাও
মৃত্তিকার তলে, যথা হ'তে করিয়া উদ্ধার
দেখাইতে পারে কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্;
যাহারে প্রতীক ভাবি' পরম উল্লাসে,
আজিকার মত কোন এক আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
কাব্যামোদী সুধীবৃন্দ দিবে শ্রদ্ধাঞ্জলি।
কোথা সে অবন্তী? বিক্রমের নবরত্নসভা?
যার মধ্যমণি হ'য়ে তুমি একদিন
ছিলে এই আর্য্যাবর্ত্তে? বাল্মীকির পরিত্যক্ত বীণা
তুলে' নিয়ে করে গেয়েছিলে অপূর্ব্ব রাগিণী;
অনুপ্রাস-শব্দ-লহরীতে, ক্ষণে ক্ষণে তুলিয়া মূর্চ্ছনা;
দেবী ভারতীর প্রিয় স্নেহের দুলাল—
চিরজয়ী প্রতিভা তোমার—
আজিও রয়েছে দীপ্ত—অম্লান অক্ষয়—
কাব্য-সরসীর বুকে শ্বেত শতদল।
হে মহান্! অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য তব করিয়া স্মরণ—
আজি এই মহাদিনে, তোমার উদ্দেশে—
করিলাম শ্রদ্ধা নিবেদন।

বাঙ্গালার তথা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে "ব্যাস ও পরাশর ব্রাহ্মণ"

শ্রীনীরদবরণ মিশ্র-চক্রবর্ত্তী

১

বঙ্গাব্দ ১৩৪৬ সালের কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যা "ভারতবর্ষে" (১) কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিকতা, (২) আদিশূরের ব্রাহ্মণ আনয়ন, (৩) **বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণের উৎপত্তি,** (৪) কৌলীন্য ও (৫) কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিকতা শীর্ষক পাঁচটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার, এম-এ, পি-এইচ্-ডি মহাশয় প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছেন। তিনি "বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণের উৎপত্তি" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—

(ক) "কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ পঞ্চকের আগমনের পূর্ব্বে এদেশে যে সমুদয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, কুলগ্রন্থে তাঁহারা সাতশতী ব্রাহ্মণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।"

পুনশ্চ :— (ভারতবর্ষ, পৌষ, ১২৬ পৃষ্ঠা)

(খ) "কিন্তু এই [কান্যকুব্জ] ব্রাহ্মণেরা আসিবার পূর্ব্বেও বঙ্গদেশে [বিভিন্ন শ্রেণীর] ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহাদের ইতিহাস সম্বন্ধে কুলগ্রন্থ হইতে বিশেষ কোন সাহায্য পাওয়া যায় না। কেবল সপ্তশতী ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে কিছু কিছু বিবরণ কুলগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।"

—(ভারতবর্ষ, পৌষ, ১২৭ পৃষ্ঠা)

শ্রদ্ধেয় মজুমদার মহাশয়ের প্রথম লেখা হইতে জানা যায় যে, কনোজ ব্রাহ্মণদের আগমনের পূর্ব্বে গৌড়-বঙ্গে যে সমুদয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহারা "কেবল সপ্তশতী বা সাতশতী" নামে খ্যাত ছিলেন ; এবং তাঁর দ্বিতীয় লেখা হইতে জানা যায় যে, পূর্ব্বে গৌড়-বঙ্গে "কেবল সাতশতী" নহে, অন্যান্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণও ছিলেন। কুলগ্রন্থে সাতশতীর কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু অন্যান্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণের বিশেষ বিবরণ পাওয়া না গেলেও, তাঁহাদের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি প্রবন্ধ মধ্যে কেবল কুলশাস্ত্রের সাহায্যে রাঢ়ী, বারেন্দ্র, পাশ্চাত্য-বৈদিক, দাক্ষিণাত্য-বৈদিক, সাতশতী ও গ্রহবিপ্র- (আচার্য্য)গণের উৎপত্তির পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গালার প্রাচীন "অন্যান্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণের" উৎপত্তির আলোচনা করেন নাই।

মজুমদার মহাশয় ভারতবর্ষের ১২৯।১৩০ পৃষ্ঠায় ষোড়শ শতাব্দীর ঘটকাচার্য্য নুলোপঞ্চানন (চট্টোপাধ্যায়) ও তাঁর "গোষ্ঠীকথা" কারিকার এবং উনবিংশ শতাব্দীর লালমোহন বিদ্যানিধি ও তাঁর সম্বন্ধ-নির্ণয় গ্রন্থের উল্লেখ তথা শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। নুলোপঞ্চানন ও বিদ্যানিধি উভয়েই স্ব স্ব কারিকায় ও গ্রন্থে "সাতশতী" ব্যতীত গৌড়-বঙ্গের প্রাচীন "ব্যাস" ও "পরাশর" শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরও উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

"পঞ্চগোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই তা ছাড়া বামন নাই।
যদি থাকে দুই এক ঘর **সাতশতী** আর **পরাশর** ॥
* * * *
পুরোহিত **ব্যাস সাতশতী** ॥
এক জাতি পুরোধা নহে ব্যাসের জ্ঞাতি ॥
ব্যাস আর **সাতশতী** বেদজ্ঞানহীন।
তাই তারা সমাজে এতাদৃশ ক্ষীণ ॥ (গোষ্ঠীকথা)।

—(সম্বন্ধ-নির্ণয়, পরিশিষ্ট, ৩৮৭।৩৮৮ পৃষ্ঠা) ।

মজুমদার মহাশয় ১৩৪৬ শারদীয় সংখ্যা "সোণার বাঙ্গালায়" পরাশর ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। সপ্তশতীগণ রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র সমাজে মিশিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানে সারা বাঙ্গলার মধ্যে উত্তরবঙ্গে মাত্র ১৯ জন সাতশতী ব্রাহ্মণ আছেন (১)। পরাশরগণ উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে ও আসামে এবং ব্যাসগণ পশ্চিম, মধ্য ও দক্ষিণ বঙ্গে বাস করেন। ব্যাস ও পরাশরগণই বর্ত্তমানকালে "আদ্যগৌড়" বা "গৌড়াদ্য বৈদিক" ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে নূতন দিল্লীস্থ "অখিল ভারতবর্ষীয় গৌড় ব্রাহ্মণ মহাসভা"র অন্তর্ভুক্ত (Affiliated)। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে পঞ্চনদ প্রদেশের পূর্ব্ব প্রান্তস্থ ব্যাসনদীতীরস্থ কাঙ্গড়া প্রদেশ, কুরুক্ষেত্রের দৃষদ্বতী (ঘর্ঘড়া বা গোগ্‌ড়া) নদীতীরস্থ গুড়দেশ, দিল্লীর দক্ষিণ যমুনাতীরস্থ গুড়্‌গাঁও প্রদেশ, গঙ্গা-যমুনার মধ্যদেশ এবং কোশলের সরযূনদীতটস্থ গৌড়দেশ হইতে আসাম-বাঙ্গলায় উপনিবিষ্ট। ব্যাসগণ সামবেদীয় কৌথুম-শাখাধ্যায়ী এবং পরাশরগণ শুক্লযজুর্ব্বেদীয় কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন শাখাধ্যায়ী। ইহাদের সংখ্যা প্রায় ৭৫০০০ (পঁচাত্তর হাজার) এবং ৩৩টি গোত্র ও ৫৮টি উপাধি বা পদবী আছে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের বাঙ্গালার সেন্‌সাস্ রিপোর্টের ১ম ভাগে ৪৬১-৪৬২ ও ৪৯৩ পৃষ্ঠায় "গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণের" বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহারা "গৌড়" বা "গৌড়ীয়" ব্রাহ্মণ নামেও খ্যাত। (২) ব্যাস ও পরাশর ব্রাহ্মণ সমাজ শুধু বাঙ্গলাদেশে নহে, সমগ্র ভারতবর্ষে বাস করেন। তিনটি প্রবন্ধে তাহা প্রমাণিত হইতেছে।

---

(১) ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের বাঙ্গালার সেন্‌সাস্ রিপোর্ট ১ম ভাগ, ৪৯৩ পৃঃ।

(২) ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের বাঙ্গালার সেন্‌সাস্ রিপোর্ট, ১ম ভাগ, ৪৬১-৪৬২ ও ৪৯৩ পৃষ্ঠা।

উত্তর, পূর্ব্ববঙ্গে ও আসামে আদ্যগৌড়ের শাখা পরাশর ব্রাহ্মণ :—

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরের ৺ভগবতীচরণ প্রধান প্রণীত "ব্রাহ্মণ-সংহিতা" (৩), ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলার হাবাসপুর স্কুলের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুদর্শনচন্দ্র বিশ্বাস প্রণীত "বঙ্গীয় পুরোহিত" (৪) এবং ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ঢাকা জেলার দোগাছী নিবাসী পণ্ডিত ৺বসন্তকুমার রায় এম.এ, বি-এল প্রণীত "মাহিষ্য-বিবৃতি" (৫) গ্রন্থে কামরূপের পরাশর, পূর্ব্ববঙ্গের পরাশর বা গৌড়ের আদ্য-বৈদিক বা গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববঙ্গের যাদব দাশ রাজগণের সাবর্ণ্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ মন্ত্রিগণ (গঙ্গা-যমুনার) মধ্যদেশ হইতে প্রাচীনকালে আসিয়া পশ্চিমবঙ্গের উত্তর রাঢ়ের সিদ্ধল গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। পরে পূর্ব্ববঙ্গে যাইয়া যাদব দাশ রাজগণের মন্ত্রী, সান্ধিবিগ্রহিক হইয়া বহু ভূসম্পত্তি লাভ করেন। (৬) যাদবরাজ শ্যামল বর্ম্মার প্রথম শাকুন সত্রে উক্ত সাবর্ণ্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ যোগদান করেন। রামভদ্র কৃত "বৈদিক-কুল-দীপিকা"-কারিকায় ইহাদিগকে "গৌড়ীয় বিপ্রা" বা গৌড় ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে। (৭) এই সাবর্ণ্য গোত্রীয় গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণ আদিশূরানীত সাবর্ণ্য গোত্রীয় কনোজ ব্রাহ্মণ নহেন। (৮) ইহারা পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য-বৈদিকের আগমনের পূর্ব্ব হইতে গৌড়-বঙ্গে বাস করিয়া আসিতেছেন। আর ইহারা কনোজবংশধর রাঢ়ী-বারেন্দ্রও নহেন। কারণ হলায়ুধ মিশ্রের "ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব" গ্রন্থে উৎকল (দাক্ষিণাত্য), পাশ্চাত্য, রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র ও "ইত্যাদি" (প্রভৃতি) ব্রাহ্মণের পৃথক পৃথক উল্লেখ আছে। (৯) এখানে "ইত্যাদি" শব্দে নিশ্চয়ই "পরাশর" বা "আহীর গৌড়" বা "গৌড়াদ্য-বৈদিক" ব্রাহ্মণকে বুঝাইতেছে।

মৈমনসিংহ কোর্টের উকীল যাদবচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় "কুলকালিমা" গ্রন্থে রাজা বল্লাল কর্ত্তৃক উৎপীড়িত ও লাট-বক দ্বীপের মাহিষ্য রাজগণ কর্ত্তৃক আশ্রিত সাবর্ণি গোত্রজ পরাশর ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে। এই ব্রাহ্মণগণের অনেকে অন্যান্য কৌলীন্যপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণগণের সহিত যৌন সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হন। (১০) ৺হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদ্যাবিনোদ মহাশয় "ভ্রান্তি-বিজয়" গ্রন্থে কনোজিয়া কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজের সহিত গৌড়াদ্য পরাশর ব্রাহ্মণ সমাজের বিবাহের একটি তালিকা প্রদান করিয়াছেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় আরও লিখিয়াছেন—"ভবদেব ভট্ট যে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। হরিবর্ম্ম দেবের রাজধানী পূর্ব্ববঙ্গে ছিল এবং তাঁহার সভাতেই পাশ্চাত্য বৈদিকগণের আদিপুরুষ গঙ্গাগতি ভবদেব ভট্ট প্রভৃতি গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণকে সচিবরূপে দেখিয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণ আজ পর্য্যন্ত সাবর্ণ্য গোত্রীয় পরাশর ব্রাহ্মণ বলিয়া পৃথক্ সমাজের সৃষ্টি করিয়া আছেন। (১১)"

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে প্রথম মহীপাল হস্তীপদ (হস্তিনা) গ্রাম হইতে আগত পরাশর গোত্রীয় যজুর্ব্বেদান্তর্গত কাণ্ব-বাজসনেয় শাখাধ্যায়ী (গৌড় ব্রাহ্মণ বংশধর) কৃষ্ণাদিত্য শর্ম্মাকে শাসনী ভূমি দান করিয়াছিলেন। (১২) এই কৃষ্ণাদিত্যের বংশধর অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র বিদ্যারত্ন (তরফদার) মহাশয় এখনও বগুড়া জেলার নারায়ণপাড়া গ্রামে বাস করিতেছেন। ইনি একজন পরাশর বা গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণ।

(৩) ব্রাহ্মণ-সংহিতা। (৪) বঙ্গীয় পুরোহিত—৭-৮, ২৮পৃঃ

(৫) মাহিষ্য-বিবৃতি—২৪১, ২৪৫-৪৬ পৃঃ।

(৬) ভোজ বর্ম্মার বেলাবলিপি ও ভবদেব ভট্টের ভুবনেশ্বর প্রশস্তি দ্রষ্টব্য।

(৭) বৈদিক-কুল-দীপিকা, ৩৪ ও ৩৭ শ্লোক।

(৮) শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ, গৌড়রাজমালা, ৫৯ পৃষ্ঠা।

(৯) ৺নগেন্দ্রনাথ বসু, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণ কাণ্ড, তৃতীয়াংশ, রচনা—২ পৃঃ। (১০) কুলকালিমা, ৩৬ পৃষ্ঠা।

(১১) ভ্রান্তি-বিজয়, ১১৯ ও ১৮৫-৯০—পৃষ্ঠা।

(১২) বাণগড়লিপি—গৌড়লেখমালা, ৯৭ পৃঃ।

ডাঃ মজুমদারের বক্তব্য

উপরোক্ত প্রবন্ধে ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধ সম্বন্ধে যেটুকু উল্লেখ আছে, তৎপ্রসঙ্গে ডক্টর মজুমদারের বক্তব্যটুকু আমরা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—"আমার প্রবন্ধ হইতে (ক) ও (খ) শীর্ষক দুইটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া লেখক যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, 'ক' অংশে আমার কুলগ্রন্থের মত উদ্ধৃত করিয়াছি মাত্র, পরাশর বা অন্যান্য ব্রাহ্মণ ছিলেন না, এরূপ কোন ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশ করি নাই। বস্তুতঃ এইরূপ ব্রাহ্মণশ্রেণীর অস্তিত্ব যে আমি স্বীকার করিয়াছি, তাহা পরে লেখক নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। এই সমুদয় ব্রাহ্মণশ্রেণী সম্বন্ধে আমি "ভারতবর্ষে" বিশেষভাবে আলোচনা করি নাই, তাহা সত্য; কারণ কুলগ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা করাই আমার প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল। বঙ্গদেশীয় সমগ্র ব্রাহ্মণের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না।"

ব্রহ্মসূত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়

(প্রথম পাদ)

শ্রীমতিলাল রায়

দেবাদিবদপি লোকে ॥২৫॥

লোকে (সংসারে) দেবাদিবদপি (দেবতা প্রভৃতির মতও)।

অর্থাৎ ব্রহ্ম একক ও অসহায় বলিয়া সৃষ্টি-সাধনে অসমর্থ বলা যায় না। কেননা দেবতাদিরও দৃষ্টান্ত আছে, তাঁহারাও বিনা সাধনে অন্য উপকরণের অপেক্ষা না করিয়া সৃষ্টি করিতে পারেন।

পূর্ব্বে যে দুগ্ধের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, সে দৃষ্টান্তে দুগ্ধের ন্যায় একক ব্রহ্মের সৃষ্টি-সাধন প্রমাণিত হয় না; কেননা দুগ্ধ ব্রহ্মের সম-স্বভাব-সম্পন্ন নহে, দুগ্ধ অচেতন বস্তু। শ্রুতি ব্রহ্মকে চেতন বলিয়াছেন। পৃথিবীতে কোন চেতন পদার্থ কি কোন সৃষ্টি বিনা উপকরণে সম্ভব করিতে পারিয়াছে? কুম্ভকার যে ঘট নির্ম্মাণ করে, কুলাল, মৃত্তিকা প্রভৃতি তাহার উপকরণ। এইরূপ ঈশ্বর মৃত্তিকাদির ন্যায় হয় অচেতন উপকরণ, নতুবা তিনি শ্রুতির মতে যদি চেতন হন, তাহা হইলে কুম্ভকারের ন্যায় তিনি সৃষ্টির নিমিত্তকারণ। ঈশ্বরকে এই হেতু জগৎ-সৃষ্টির উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ, দুইই বলা যায় না।

প্রতিপক্ষের এইরূপ প্রতিবাদের উত্তরে উপরোক্ত সূত্র উক্ত হইয়াছে। ইন্দ্রাদি দেবগণ অদৃশ্য, তবুও তাঁহাদের অস্তিত্ব আছে—শ্রুতি ইহার প্রমাণ। তাঁহারা সঙ্কল্পমাত্র বিনা উপকরণে সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন করেন। মন্ত্রে, অর্থবাদে, পুরাণে, ইতিহাসে ইহার প্রমাণ-যোগ্য নানা কাহিনী কথিত হইয়াছে। তবে ব্রহ্ম কি হেতু স্ব-মহিমায়, বিনা উপকরণে জগৎ-সৃষ্টিতে অসমর্থ হইবেন? এইখানে কেহ বলিবেন—ঈশ্বরের ন্যায় দেবতারা যখন উপলব্ধিগম্য নহেন, তখন তাঁহাদের কথা কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে। ইহার উত্তরে সেই পূর্ব্ব কথারই পুনরুক্তি করিতে হয়। যে ক্ষেত্রে শ্রুতি অবিশ্বাস্য, সে ক্ষেত্রে ব্রহ্মসূত্র লইয়া আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। ঈশ্বর-বিশ্বাসী জাতির নিকটই এই যুক্তি-শাস্ত্র উপস্থিত করা হইয়াছে। প্রতিপক্ষের বাদ খণ্ডন করার জন্য মনের অগোচর অনির্দ্দেশ্য ঈশ্বরতত্ত্বের প্রমাণ কোন দৃষ্টবিষয়াবলম্বনে সম্ভব নহে; তাই অপৌরুষেয় শ্রুতি-প্রমাণেই প্রতিপক্ষের বাদ খণ্ডন করার বিধি গ্রাহ্য করিতে হইবে।

শ্রুতি পিতৃলোক, ঋষিলোক ও দেবতাদিগের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করিয়াছেন। ইহারা অভিধ্যান করিয়া সৃষ্টি রচনা করিয়াছেন—শ্রুত্যুক্ত এই প্রমাণ উল্লেখ করিয়া ঋষি বাদরায়ণ বলিতেছেন—দেবতাদিগের ন্যায় ঈশ্বরও স্ব-মহিমায় সৃষ্টির উপাদান ও নিমিত্তকারণ, দুইই হইয়াছেন।

বিনা উপকরণে দুগ্ধ দধি হয়, দুগ্ধ অচেতন বস্তু বলিয়া এই দৃষ্টান্ত যদি চেতন ব্রহ্মের স্বাত্মসৃষ্টির প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য না হয়, তাহা হইলে চেতন ঊর্ণনাভ, বকপক্ষী বা পদ্মিনীর দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। তন্তুনাভ বিনা উপকরণে স্বীয় মুখ হইতে সূত্র সৃষ্টি করে। বক বিনা সঙ্গমে গর্ভধারণ করে। পদ্মিনীও এক জলাশয় হইতে অন্য জলাশয়ে বিনা উপকরণে প্রস্ফুটিত হয়। এইরূপ হইলে, সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের পক্ষে বিনা উপকরণে সৃষ্টি অসম্ভব কেন হইবে?

বাদী হাসিয়া বলিবেন—এই সকল লৌকিক দৃষ্টান্ত এই ক্ষেত্রে প্রযুজ্য হইতে পারে না। কেননা, ঊর্ণনাভ নানা জীব চর্ব্বণ করিয়া সেই উপকরণ হইতে সূত্র সৃষ্টি করে। বকের গর্ভ-সৃষ্টিও মেঘগর্জ্জন-রূপ উপকরণের সাহায্যে ঘটে। পদ্মিনীও যে সরোবরান্তরে যায়, তাহাও কোন চেতন বস্তুর সহায়েই ঘটিয়া থাকে। অতএব অচেতন দুগ্ধের দৃষ্টান্তের ন্যায় এই সকল চেতন দৃষ্টান্তে ব্রহ্মের বিনা উপকরণে সৃষ্টি-শক্তি প্রমাণ করা সম্ভব হইল না।

ইহার উত্তরে বলা যায়—এক বস্তুর দৃষ্টান্ত অন্য বস্তুর দৃষ্টান্তে সর্ব্বাংশে সিদ্ধ হয় না। এইরূপ হইলে, বস্তুভেদ

হইবে কেন? সুন্দর মুখের সহিত চন্দ্রের দৃষ্টান্ত অর্থে চন্দ্র ও মুখ দুই কি তুল্য হইতে পারে? এইরূপ দুগ্ধ, তন্তুনাভ প্রভৃতির দৃষ্টান্ত অংশতঃ ব্রহ্মের বিনা উপকরণে সৃষ্টিশক্তির প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিতে হইবে। দেবতাদের দৃষ্টান্তও এই অর্থে গ্রহণীয়।

আমাদের মনে রাখিতে হইবে—কোনরূপ লৌকিক দৃষ্টান্তের সাহায্যে ঈশ্বর-কর্ম্ম প্রমাণগ্রাহ্য হইবে না। প্রমাণ অর্থে যখন সৃষ্টবস্তুই অবলম্বনীয়, তখন সৃষ্টাদির অতীত অনির্ব্বচনীয় ভাগবৎ কর্ম্ম এই সকল প্রমাণে সিদ্ধ হইবে কি প্রকারে? তবে ক্ষিতির কারণ যেমন জল, জলের কারণ যেমন তেজঃ, এইরূপ কারণের কারণ ধরিয়া পেঁয়াজের খোসা ছাড়াইতে গিয়া যেমন দেখা যায় অবশেষ কিছুই থাকে না, অথচ পেঁয়াজের অস্তিত্ব অস্বীকার্য্য নয়, তদ্রূপ সৃষ্ট বস্তুর মূলে অব্যক্ত অসৎ বলিয়া শ্রুতিপ্রসিদ্ধ যাহা পাওয়া যায়, তাহাও অনাদি ঈশ্বর-তত্ত্ব বলিয়া অবশ্যই গ্রহণ করিতে হয়। এই তত্ত্বই স্ব-মহিমায় সৃষ্ট্যাদির কারণ হইয়াছে, এই তত্ত্বই উপাদান ও নিমিত্তকারণ দুইই, কেননা উপাদান ও কর্ম্মকর্ত্তা দুইই এখানে অব্যক্ত।

কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দকোপো বা ॥২৬॥

কৃৎস্নপ্রসক্তি (ব্রহ্মের সবখানি জগৎ-রূপে পরিণত হওয়ায়, ইহাতে ব্রহ্মভাব দোষযুক্ত হইতেছে। কেন?) নিরবয়বত্ব শব্দ (শ্রুতিতে ব্রহ্মকে নিরবয়ব বলা হইয়াছে) কোপঃ বা (ঐরূপ হইলে, শ্রুতিবাক্য ব্যর্থ হইয়া যায়)।

অর্থাৎ শ্রুতি ব্রহ্মকে 'নিষ্কলম্, নিষ্ক্রিয়ম্' প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। ব্রহ্মকে বহু ক্ষেত্রে "স এষ নেতিনেত্যাত্মাস্থুলমনণু" অর্থাৎ 'তিনি ইহা নহেন, তাহা নহেন, স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন।' আবার বলা হইয়াছে 'তাঁহাকে জানিবে, দেখিবে' প্রভৃতি। এই অবস্থায় ব্রহ্ম আবার জগৎ হন কি প্রকারে? এবং তাঁহার সবখানি সৃষ্টির উপাদান হইলে, কে কাহাকে দেখিবে এবং জানিবে? প্রতিপক্ষের এইরূপ সংশয়ের দূরীকরণার্থে পরবর্ত্তী সূত্রের অবতারণা করা হইতেছে।

শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ॥২৭॥

(তু শব্দ পূর্ব্বপক্ষ-পরিহারের জন্য) শ্রুতেঃ (বিকার ব্যতিরেকে অর্থাৎ জগৎ-সৃষ্টি হইতে ব্রহ্মের অবস্থিতি শ্রুতি স্বীকার করেন) শব্দমূলত্বাৎ (শব্দপ্রমাণ হেতু ব্রহ্মের কৃৎস্নপ্রসক্তি দোষের অভাব হইতেছে)।

অর্থাৎ শ্রুতি ব্রহ্ম হইতে জগদুৎপত্তির কথা বলিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মের উহা অংশ-প্রকাশ; ব্রহ্মের সবখানি জগৎ হইয়াছে, একথা শ্রুতিতে নাই। ইহা ব্যতীত ব্রহ্ম শব্দ-প্রমাণের প্রমেয়। শব্দার্থে যখন বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্মের একাংশে জগৎ, তখন ব্রহ্মের সবখানি জগৎ হইয়াছে, এই কৃৎস্নপ্রসক্তি দোষ তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছে না।

প্রতিপক্ষ তথাপি বলিতে পারেন, ব্রহ্ম নিরবয়ব, তবে আবার তাঁর কোন এক অবয়ব দিয়া সৃষ্টি হইল, ইহা কি প্রকারে সম্ভব হয়?

সৃষ্টির পূর্ব্বে এই সমুদয় অসৎ ছিল, এই কথা কিছু না থাকার অর্থ যেমন প্রকাশ করে না, 'না থাকার ন্যায়' এই অর্থই প্রকাশ করে, তদ্রূপ তাঁহার নিরবয়বত্বও এইরূপ অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁর একাংশে জগৎ-সৃষ্টি, অতএব জগৎ তাঁর সর্ব্বাবয়ব নহে। জগতের চক্ষে ব্রহ্ম নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ বলিয়া যদি প্রতিভাত হয়, তাহা দোষের হয় না! মায়াবাদীরা বলেন—ঈশ্বরের তনু নাই, সৃষ্টিপ্রকাশ ভ্রান্তি ও অজ্ঞান; এই অজ্ঞান দূর হইলে, নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ ব্রহ্মই থাকেন, সৃষ্টি থাকে না। কিন্তু এ কথা শ্রুতির নহে। শ্রুতি পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন—"সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা, অনেন-জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি ইতি তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ। পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি, ইত্যাদি।" অর্থাৎ 'সেই দেবতা আলোচনা করিলেন, এই তিন দেবতাত্মক আমি জীবাত্মরূপে প্রবেশ করিয়া নামরূপের বিকাশ করিব। এই সব যাহা উক্ত হইল, তাহা সবই পুরুষের মহিমা। তিনি সমুদয় হইতে শ্রেষ্ঠ। এই চরাচর ভূতাদি তাঁহার এক পাদ। অপর ত্রিপাদ স্বর্গে অমৃত।' ইহাতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, ব্রহ্মের সবখানি জীবের জ্ঞাতব্য নয় বলিয়া, অচিন্ত্য নিরাকার বলিয়াই আমরা তাঁহার উপাসনা করি। পরন্তু তিনি বিরাট্ ও চক্ষু-মনের অগোচর হইলেও, তাঁর নামরূপ আছে। প্রতিপক্ষের মুখ বন্ধ করিবার জন্য 'জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য' মায়াবাদীর এই

যুক্তি ভিত্তিহীন। সর্পে রজ্জুভ্রমের ন্যায় এই জগৎ যদি হয়, তাহা হইলে জগদুপাদান ব্রহ্ম, শ্রুতির এই প্রতিজ্ঞা অর্থহীন হয়। সৃষ্টি মিথ্যা নহে। রজ্জুতে সর্পভ্রমের তুলনায় ব্রহ্মে জগৎ-সৃষ্টি নাকচ হয় না। রজ্জু ও সর্প, দুইই সৃষ্ট বস্তু; একের সহিত অন্যের ভ্রম হইতে পারে, তাই বলিয়া ব্রহ্মে জগৎ-ভ্রম সত্য নহে। চক্ষের পলকে রজ্জুতে সর্পভ্রম দূর হয়, কিন্তু রজ্জু বা সর্প নির্দ্দিষ্ট আয়ুঃ লইয়া স্থির থাকে। প্রতি সৃষ্ট বস্তুরই স্থিতি ও লয়ের মাত্রা আছে, এই মাত্রা অতিক্রম করিয়া কোন বস্তুর ভ্রান্তি-সম্পাদন ইন্দ্রজালে সম্ভব নহে। গুণ ও কর্ম্মে নিয়ন্ত্রিত নির্দ্দিষ্ট আয়ুঃ লইয়া নিখিল সৃষ্ট বস্তু ব্রহ্মসত্তায় জল-বুদ্বুদের ন্যায় প্রকাশ ও লয় পাইতেছে—উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় জগৎ-সৃষ্টির সনাতন নীতি—মায়াবাদীর ভ্রান্তি-প্রসঙ্গ ব্রহ্মসূত্রে নাই, বেদেও নহে।

আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চহি ॥২৮

আত্মনিচ (আত্মাতেও) এবং (এই প্রকার) বিচিত্রা (অনেক আকার সৃষ্টি দেখা যায়) চ হি (এইরূপ পাঠ হেতু)।

ব্রহ্ম এক, অথবা অসংখ্য প্রকার সৃষ্টি হয় কি প্রকারে? ইহার উত্তর পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। স্ব-মহিমায়। তাঁহার বহু হওয়ার আলোচনাই এইরূপ হওয়ার মূল কারণ। স্বপ্ন-দ্রষ্টার আত্মা এক, বহু নহে। তবুও সে বিচিত্র স্বপ্ন সন্দর্শন করে। প্রতিপক্ষ বলিবেন—ইহা স্বপ্ন, বাস্তব সৃষ্টি নহে। ইহার উত্তর পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—এক বস্তুর দৃষ্টান্তে অপর বস্তু সর্ব্বাংশে প্রমাণিত হয় না, ভাব মাত্র গ্রহণ করিয়া বিষয়ের উপলব্ধি হয়। স্বপ্নদ্রষ্টা নিদ্রাবস্থায় বিচিত্র সৃষ্টি রচনা করে, কিন্তু স্বয়ং অবিকৃত থাকেন—এই দৃষ্টান্তে বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্ম এইরূপ এক ও অবিকৃত থাকিয়া আত্মসঙ্কল্প পূর্ণ করিতে বহু হইয়াছেন।

স্বপক্ষদোষাচ্চ ॥২৯॥

স্বপক্ষদোষাৎ চ (কৃৎস্নপ্রসক্ত্যাদি দোষ বাদীর পক্ষে থাকা হেতু এ দোষ অন্য পক্ষে অন্যায্য) অর্থাৎ ব্রহ্মের সবখানি লইয়া সৃষ্টি, এই কথা বলিলে ঈশ্বর সসীম হইয়া পড়েন—ব্রহ্মের অথবা বাস্তব সৃষ্টির উপাদান ব্রহ্ম বলিলে, ব্রহ্মের পরিচ্ছিন্ন অবয়ব থাকার ভাব আসিয়া পড়ে—ইহাতে শ্রুতির সুমহান্ ব্রহ্মপ্রসঙ্গের হানি হয়। বাদীকে লক্ষ্য করিয়া বাদরায়ণ বলিতেছেন—এই দোষ সর্ব্ববাদেই আছে। সাংখ্যের তত্ত্ব নিরবয়ব ও সর্ব্বব্যাপী; কিন্তু উহা জগৎকারণ হওয়ায়, সাংখ্যের প্রধানও সাবয়ব-গুণযুক্ত হইয়া পড়িতেছে। এই পক্ষেও প্রধানের এই সাবয়বত্বে তাহার নিরবয়বত্বপ্রতিপাদক শব্দের কৃৎস্নপ্রসক্তি দোষ অর্পিত হইতেছে। পরমাণুবাদীরাও ইহা হইতে মুক্ত নহেন। তাঁহারা পরমাণুকে নিরবয়ব বলিয়া, পুনরায় সৃষ্টির উপাদানরূপে এক পরমাণুর সহিত অপর পরমাণুর সংযুক্তির কথা বলিয়াছেন। পরমাণুর নিরবয়বত্ব প্রসঙ্গ এই প্রকরণে কৃৎস্ন-প্রসক্তি দোষযুক্ত হইতেছে—কেননা এক পরমাণু অন্যের সহিত সংযুক্ত হইলে, পরস্পরের কৃৎস্ন-সংযোগ ভিন্ন তাহা সম্ভব হয় না। অতএব সকল পক্ষেই এই একই দোষ প্রযুক্ত হয়। তত্ত্বের অসীমত্ব বজায় রাখিয়া তত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্টিপ্রকরণ, তৎপক্ষে শ্রুতি-স্মৃতিতে এই যে সদ্যুক্তি, তাহাই যথেষ্ট। ব্রহ্মতত্ত্বের একাংশেই জগৎ—জগৎ কৃৎস্ন তত্ত্বে প্রকট নয়। কৃৎস্নপ্রসক্তি দোষ সর্ব্ববাদীর পক্ষেই যখন প্রযুজ্য, তখন বাদরায়ণ এই কুতর্ক পরিহার করিতেই চাহিয়াছেন।

সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ ॥৩০॥

সর্ব্বোপেতা (সর্ব্বশক্তিসম্পন্না) [কুতঃ] দর্শনাৎ) (শ্রুতিতে ইহার প্রমাণ থাকা হেতু)।

শ্রুতি বলেন "পরম ব্রহ্ম সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ" প্রভৃতি; অতএব এক অদ্বয় ব্রহ্ম হইতে বিচিত্র সৃষ্টি অযুক্ত নহে।

বিকরণত্বান্নেতি চেত্তদুক্তম্ ॥৩১॥

বিকরণত্বাৎ (নিরিন্দ্রিয়ত্ব হেতু) ইতি চেৎ (এইরূপ যদি বলি?) তদুক্তম্ (ইহার উত্তর বলা হইয়াছে)।

শাস্ত্র বলেন 'অচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগমনাঃ'—তাঁহার চক্ষুঃ নাই, তিনি অশ্রোত্র, অবাক্ ও অমনাঃ। অতএব ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিযুক্ত হইলেও, কার্য্য করিবেন কি দিয়া? ইহার উত্তর পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। শ্রুতিও কি একথা বলেন নাই:

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ?

তাঁহার হস্ত-পদ নাই, তবুও তিনি গ্রহণ ও গমন

করেন ; চক্ষু-কর্ণ নাই, তবুও তিনি দেখেন ও শোনেন ? মানুষের দৃষ্টান্তে ঈশ্বরের এই অলৌকিক শক্তিতে প্রত্যয়-হীন ব্যক্তির নিকট তর্ক-প্রমাণ অনর্থক। শ্রুতি-প্রমাণই ইহার একমাত্র প্রমাণ। অতএব পরম ব্রহ্ম বিচিত্র সৃষ্টির একমাত্র হেতু।

ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ ॥৩২॥

ন (ব্রহ্ম জগৎ রচনা করেন নাই) [কুতঃ ? (কেন ?)] প্রয়োজনবত্ত্বাৎ (কার্য্যের প্রয়োজনবুদ্ধি থাকা হেতু)।

অর্থাৎ কিছু করিতে হইলেই প্রয়োজনবশতঃই তাহাতে প্রবৃত্তি জন্মে। ঈশ্বরকে আমরা নিত্য তৃপ্ত মনে করি। ব্রহ্ম আপ্তকাম, তাঁহার সৃষ্টির কি প্রয়োজন ? এইজন্য প্রতিপক্ষ বলেন—এ বিশ্ব ব্রহ্ম সৃজন করেন নাই।

লোকবত্তু লীলাকৈবল্যং ॥৩৩॥

(তু শব্দ পূর্ব্বপক্ষের যুক্তিপরিহারের জন্য।) লোকবৎ (লৌকিক দৃষ্টান্তের জন্য) লীলাকৈবল্যম্ (ইহা ঈশ্বরের লীলামাত্র)।

পূর্ব্বপক্ষের প্রশ্নোত্তরে ঋষি বাদরায়ণ বলিয়াছেন—ঈশ্বর আপ্তকাম, নিত্যতৃপ্ত বটে ; তাঁহার কিছুরই প্রয়োজন নাই। তবুও এ সৃষ্টি তাঁরই। লোকেরা সংসার ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করে, সংগ্রাম করে ; শোক-দুঃখে অভিভূত হয়, এই সবের মূলে আছে ঈশ্বরেচ্ছা। এই যে বিচিত্র সৃষ্টি ও বিচিত্র ঘটনাদি, তাহা তাঁহার বিচিত্র লীলারই অভিব্যক্তি। আচার্য্য শঙ্কর এই সূত্রোক্ত সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া মায়াশক্তির আবিষ্কার করিয়াছেন। জীবের কর্ম্মপ্রেরণার মূলে ঈশ্বরের অভিসন্ধি থাকা তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই। তিনি তাই বলিয়াছেন—মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ করার ন্যায়, ঈশ্বরলীলার কোনরূপ উদ্দেশ্য বা অভিসন্ধি নাই। উহা স্বভাবশক্তির সহজ অভিব্যক্তি। "স্বভাবাদেব কেবলং লীলারূপা প্রবৃত্তির্ভবিষ্যতি" অর্থাৎ স্বভাবের বশে কেবল লীলারূপে এই সব হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, শ্বাস-প্রশ্বাস বিনা প্রয়োজনে নিষ্পন্ন হয় না। ঈশ্বরকে আমরা নিজেদের মত করিয়াই দেখিতে চাহিয়াছি। আর বস্তুতঃ মানব ঈশ্বরেরই বিগ্রহ-তুল্য অথচ জীবের কর্ম্মচ্ছন্দে ঈশ্বরের ইচ্ছা আমরা সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিবশতঃ দেখি না। যাহা ঈশ্বরেচ্ছা নহে বা যাহার মধ্যে তাঁহার লীলা-চাতুর্য্য নাই, তেমন কিছু জগতে ঘটিতেই পারে না। তিনিই অদ্বিতীয় স্রষ্টা ও কর্ত্তা। সর্ব্বপ্রকার বিকাশ এই মূল উৎস হইতেই নিষ্পন্ন হয়। ঈশ্বর-স্বভাব জীবদেহে অনুস্যূত বলিয়াই এই আত্মস্বভাবের সূত্র ধরিয়া অংশ হইতে বিভু পরম ব্রহ্মের ভাব আমরা অনুভব করিতে পারি। দেহীর পরিমিত স্বভাবের সহিত ব্রহ্মের অনন্ত স্বভাবের তুলনা হয় না ; এইজন্য মানবের কর্ম্মই আমরা প্রয়োজনের তাগিদে হয়, এইরূপ মনে করি—পরন্তু এই প্রয়োজনবোধটা আমরা মূলতঃ ঈশ্বরচৈতন্য হইতেই পাই। তিনি বহু হইতে চাহিলেন, তিনি আলোচনা করিলেন—এই সকল শ্রুতিবাক্য অর্থহীন নহে। মানুষের ক্ষুদ্র প্রয়োজনের তুলনায় ঈশ্বর-প্রয়োজন তুলিত হয় না, তাই বলিয়া তাঁহার সৃষ্টিশক্তির স্ফুরণ বিনা প্রয়োজনে হয় নাই। আপ্তকাম ঈশ্বরের প্রয়োজন থাকা অসদৃশ মনে হয়, তাই ব্যাসদেব প্রকারান্তরে বলিলেন—শ্রীভগবান পূর্ণানন্দ, তবুও তিনি যে কর্ম্ম করেন, তাহা লীলা মাত্র। ঈশ্বরের জগৎকর্ত্তৃত্ব যখন শ্রুতিসিদ্ধ, তখন তাঁহার কর্ম্মের মূলের অভিসন্ধি না থাকিবে কেন ? শ্রীভগবানের কর্ত্তৃত্ব থাকার কথায় সসীম মানবের কর্ত্তৃত্বের তুলনায় তাঁহাকে যদি আমরা অপূর্ণ ও অসিদ্ধ মনে করি, তাহা হইলে ঈশ্বরত্ব আমাদের বুদ্ধির মাপকাটীর অনুযায়ী স্থির করি বলিতে হইবে। ইহা সমীচিন নহে। যাহা মানুষের স্বভাবে, তাহাই ঈশ্বরে, এ কথা মানুষ ভাবিতে, ভয় পায় ; কেননা, সে ভগবান হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখে। এক সৎ, চিৎ ও আনন্দই নানা আকারে লীলায়িত হইয়াছে বিচিত্র আশ্রয়ে—একই সূর্য্য যেমন নানা ক্ষেত্রে নানা মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হয়—গুণ-কর্ম্মে এক অদ্বয় ভাগবত স্বভাবই নানা মূর্ত্তি ধরে মানুষে—শুভ, অশুভ, সুন্দর, অসুন্দর, দয়া, নিষ্ঠুরতা, সে যে রূপই হউক, সবই তাঁর লীলা।

বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাত্তথাহি দর্শয়তি ॥৩৪

বৈষম্য (বিষমের ভাব) নৈর্ঘৃণ্যে (অতিক্রূরত্ব) ন (না) [কেন নহে ?] সাপেক্ষত্বাৎ (কর্ম্মসাপেক্ষ হেতু) তথাহি (শ্রুতি ও স্মৃতি) দর্শয়তি এইরূপ বলিয়াছেন।

অর্থাৎ কেহ উত্তম, কেহ অধম—সৃষ্টির মধ্যে এই যে বৈষম্যদোষ, ইহাতে কি দয়াময় ঈশ্বরে নৈর্ঘৃণ্যদোষ স্পর্শ করে না? অর্থাৎ তিনি কাহাকেও সুখী, কাহাকেও দুঃখী করেন, এইরূপ পক্ষপাতিত্ব ঈশ্বরের পক্ষে প্রযুক্ত হইতে পারে কি? এমন হইলে, মানুষের সহিত তাঁহার পার্থক্য রহিল কি? উত্তরে বলা হইতেছে—এই যে সৃষ্টিবৈষম্য এবং এই হেতু যে নৈর্ঘৃণ্য, এই সকল দোষ তাহাতে সম্ভব নহে। কেননা, শ্রুতি ও স্মৃতি বলেন—জীব পুণ্য কর্ম্মে উত্তম ও পাপ কর্ম্মে অধম অবয়ব প্রাপ্ত হয়। এইরূপ হইলে অবশ্যই সব কিছু কর্ম্মসাপেক্ষ হওয়ায়, ঈশ্বর উপরোক্ত উভয় দোষ হইতে মুক্ত হইলেন বলিতে হইবে।

কিন্তু কথা হইতেছে, সৃষ্ট্যাদি ব্যাপার যদি কর্ম্ম-সাপেক্ষই হয়, তাহা হইলে আবার ঈশ্বরের অস্বাতন্ত্র্য, কর্ত্তৃত্বের অনুপপত্তি দোষ আসিয়া পড়ে। সৃষ্টি কিন্তু কর্ম্মানপেক্ষ হইলে, সৃষ্টিকর্ত্তা বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ হইতে মুক্ত হন না। এই আশঙ্কায় আচার্য্য শঙ্কর একটু ঘুরাইয়া বলিলেন—সৃষ্টিবৈষম্য নিমিত্তান্তরপ্রযুক্ত হয়। অর্থাৎ এই নিমিত্ত জীবেরই ধর্ম্মাধর্ম্ম। ঈশ্বর ইহার জন্য দায়ী নহেন। সৃজ্যমান জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মে যদি ঈশ্বরের সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব নাই রহিল, তবে তাঁহাকে সর্ব্বনিয়ন্তা বলিয়া স্বীকার করা যায় না। আচার্য্য শঙ্কর নূতন কথা বলেন নাই। মনু বলিয়াছেন—সৃষ্টিকাল হইতেই বীজাঙ্কুরের ন্যায় ধর্ম্মাধর্ম্মবিশিষ্ট জীবের প্রবাহ চলিয়াছে। সৃষ্টিবৈষম্য অনাদিকালের, ইহা কর্ম্ম-নিমিত্ত। মধ্বাচার্য্য বলেন—'পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি, পাপেন পাপম্' অর্থাৎ ঈশ্বরের ফলদাতৃত্বের শক্তি আছে, এই কথা স্বীকার করিয়া লইলে, তাঁহার সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব বজায় থাকে অথবা তাঁহাতে পূর্ব্বোক্ত বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্য দোষ স্পর্শ করে না।

মানব এই সকল কথার প্যাঁচে সান্ত্বনা পায় না। সংসার অনাদি, কর্ম্মও নিমিত্তক, :অনাদি কাল ধরিয়া সুখ-দুঃখের প্রবাহ চলিয়াছে—ইহার যখন প্রাথম্য নাই, তখন ঈশ্বরকে ইহার জন্য দায়ী করা চলে না। এইরূপে যুক্তি শ্রীভগবানের প্রতি আচার্য্যগণের নিরতিশয় ভক্তির পরিচয়, ইহা স্বীকার করিয়াই বলিব—এই বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ অন্য যুক্তির দ্বারাই খণ্ডনীয়। তাহা হইতেছে—যে বৈষম্য দেখিয়া আমরা ভগবানকে পক্ষপাতিত্বদোষে দোষী করিতেছি, তাহা অহেতুক; কেননা, এই বৈষম্য জীবজগতেই পরিলক্ষিত হয়, সীমাহীন বিরাট্ ঈশ্বর-চৈতন্যে সাম্যই বিদ্যমান। যেমন যখন এক রুদ্ধ কক্ষের পূতিগন্ধময় বায়ু বিস্তৃত বায়ুমণ্ডলে ছড়াইয়া পড়ে, তখন রুদ্ধ বায়ুর পূতিভাব বিদূরিত হয়, উহা গন্ধ-তন্মাত্রে পরিণত হয়—এইরূপ বিভু চৈতন্য অণু হইয়াছেন, তজ্জন্য মানুষের যে উত্তম-অধম, সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব, তাহা বিরাট্ ঈশ্বরচৈতন্যে আনন্দ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। আনন্দের প্রয়োজনেই তাঁর সৃষ্টিবৈচিত্র্য, আনন্দের মাত্রা কোথাও হ্রাস, কোথাও বৃদ্ধি করিয়া তিনি একই আনন্দের বিচিত্র আস্বাদ উপভোগ করিতেছেন। তিনি পুরুষ হইয়াছেন, নারী হইয়াছেন, আবার নপুংসক হইয়াছেন—সুগঠিত সুন্দর তনুর সহিত বিকৃতাঙ্গ কুৎসিৎমূর্ত্তিও ধরিয়াছেন—যেমনটী করিলে একই উপাদানে বিচিত্র সৃষ্টি সম্ভব হয়, তদনুযায়ী গুণ ও কর্ম্মের সমাবেশে তদাকার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন। আনন্দই এ সবের হেতু। সসীম জীবের অনুভূতির ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া যে বৈষম্যদর্শন এবং তাহার জন্য তাঁহার প্রতি নৈর্ঘৃণ্যদোষের আরোপ, ইহা মানববুদ্ধির সঙ্কীর্ণতা। আপ্তকাম পুরুষ যেখানে যেমন সাজিলে আনন্দলাভ করেন, তিনি তেমনটী হইয়াছেন। আমাদের এই উক্তির সমর্থনই পরবর্ত্তী সূত্রগুলিতে পাইব।

ন কর্ম্মবিভাগাদিতিচেন্নাহনাদিত্বাৎ ॥৩৫॥

ন (না) [কিনা?] কর্ম্মবিভাগাৎ (সৃষ্টির পূর্ব্বে কর্ম্ম-বিভাগ ছিল না, এই হেতু) ইতি চেৎ (এইরূপ যদি বলি) ন (না, তাহা বলিতে পার না) [কেন বলিতে পার না?] অনাদিত্বাৎ (সংসারের অনাদিত্ব হেতু)।

অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষ বলিবেন—সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি এক অদ্বয় ছিলেন। এইরূপ বৈষম্যমূলক কর্ম্মই ছিল না। অতঃপর যখন উত্তমাধম বিষম সৃষ্টি ঘটিল, তখন ঈশ্বরকে নির্দ্দোষ বলা যায় কি প্রকারে? কেননা, শ্রুতিও বলিয়াছেন—হে সৌম্য, সৃষ্টির পূর্ব্বে এক সৎই ছিল। তদুত্তরে ব্যাসদেব বলিয়াছেন—এই যে সৎ ছিল, ইহা চিরদিনই ছিল এবং যাহা ছিল, তাহারই প্রবাহ বর্ত্তমানে আছে, অনন্ত যুগ থাকিবে। অতএব বৈষম্যদোষদুষ্ট

ঈশ্বর নহেন। বৈষম্যই সৃষ্টির অনাদি রহস্য। এই বৈষম্যের মূলে আনন্দভূত ব্রহ্মই বিদ্যমান। প্রশ্ন উঠিতে পারে—সৃষ্টি যে অনাদি, তাহার প্রমাণ কি? তাহার উত্তরে বলা হইতেছে—

উপপদ্যতে চোপলভ্যতে চ ॥৩৬॥

উপপদ্যতে চ (সংসারের অনাদিত্ব যুক্তিসঙ্গত) অপি (আরও) উপলভ্যতে চ (শ্রুতি-স্মৃতিতে ইহার প্রমাণ আছে)।

শ্রুতি বলিতেছেন—"সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ" অর্থাৎ বিধাতা পূর্ব্বকল্পনানুরূপ চন্দ্র-সূর্য্য সৃষ্টি করিলেন। স্মৃতিও বলিতেছেন—"ঈশো যতো বা গুণদোষসত্ত্বে স্বয়ং পরোঽনাদিরাদিঃ প্রজানামিত্যাদি" যেহেতু ঈশ্বর গুণ দোষ সত্ত্বে স্বয়ং পর ও অনাদি; জীবেরও আদি।"

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সৃষ্টি-বীর্য্যই গুণকর্ম্মান্বিত, বীজাঙ্কুরের ন্যায় উহা নানা ছন্দে ও আকৃতিতে অভিব্যক্ত হইয়া চলিয়াছে; এই হেতু সৃষ্টিকর্ত্তাকে অপরাধী করা মানব-মনের দুর্ব্বলতা-সঙ্কীর্ণতা ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ॥৩৭॥

সর্ব্বধর্ম্মঃ (যে যে ধর্ম্ম কারণে প্রসিদ্ধ, সেই সকল ধর্ম্মই) উপপত্তেঃ চ (একমাত্র ব্রহ্মেই সঙ্গত হয়)।

ব্রহ্ম নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, এই নিশ্চয় বেদার্থ বিকৃত করার সর্ব্বপ্রকার কুতর্ক পরিহার করিয়া উপসংহার-শ্লোকে ব্যাসদেব বলিতেছেন, যত কিছু গুণ ও ধর্ম্ম জগতে পরিদৃষ্ট হয়, এ সবই ব্রহ্ম-কারণ হইতে উদ্ভূত। ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ও অনন্ত। তাঁহার বহু হওয়ার প্রবৃত্তি অনাদিকালের। সৃষ্টিবৈষম্য বহু হওয়ার অভিসন্ধিকেই সফল করিয়াছে, মানুষ সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বধর্ম্মের কারণীভূত ব্রহ্ম-যুক্তি পাইলে, সৃষ্টির উপাদান ও নিমিত্ত কারণ তাঁহাকে স্বীকার করিয়া সর্ব্বপ্রকার বৈষম্যের মধ্যেও ব্রহ্মানন্দের অনুভূতি লাভ করিয়া ধন্য হইবে। জীবের চক্ষে তাঁহার বৈষম্য বিচারসঙ্গত নহে। এক অদ্বয় ব্রহ্মচৈতন্যই সৃষ্টিপ্রকরণে, একই আনন্দের নানা ছন্দঃ সৃষ্টি করিয়াছেন। বৈষম্যের মধ্যেও তিনি, অতএব ভোক্তা যখন অন্যে নহে, তখন নৈর্ঘৃণ্যদোষ ঈশ্বরবিযুক্ত জীবেরই প্রশ্ন, যুক্ত জীবের নহে। মানুষ ব্রহ্মযুক্তির উপর দাঁড়াইয়াই সমস্যার সমাধান পাইবে।

[ইতি দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথম পাদ সমাপ্ত] (ক্রমশঃ)

বর্ণাশ্রম

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

কি চাও ভৃত্য?
প্রভুর বিত্ত, তাঁহার সুখেই সুখ!
কি চাও কৃষক?
শস্যশীর্ষ ফলভারে নতমুখ!
কি চাও বণিক্?
ধনী, সজ্জন, প্রতিবেশী, বান্ধব!

কি চাও ক্ষত্র?
মিত্রের জয়, শত্রুর পরাভব!
কি চাও বৈদ্য?
ব্যাধিমন্দির করিতে সুনির্ম্মল!
কি চাও বিপ্র?
বিরত চিত্ত, তথাগত নিঃসম্বল!

গান ও স্বরলিপি

সিন্ধু ভৈরবী—কাওয়ালী (ঢিমা)

বেদনা কারাগারে স্মৃতির তুলি দিয়ে
বিরহী আঁকে ছবি নয়নজলে।
দুখের দুখী সম বাদল ঝর-ঝর
ঝরিয়া অহরহ ধরা উছলে॥

সুখের খেলাঘরে প্রেমের ক্ষণছায়া
আঁধার বুকে রচে করুণ মায়া।
সে মায়া হাহাকারে, প্রাচীর ঘিরে ঘিরে,
জাগায়ে রাখে প্রিয়ে সমাধিতলে॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীধীরেন্দ্রকুমার সরকার

০ ১ + ৩
II সা দা দা -া | পদা -পমা মপদা মপা I জ্ঞা -া -রজ্ঞা -মপা | -জ্ঞমা -া -া -া |
বে দ না ০ | কা০ ০০ রা০০ গা০ রে ০ ০০ ০০ | ০ ০ ০ ০ |

রা জ্ঞা মা -া | রা -জ্ঞা সা রা I সা -া -া -রা | -ণ্‌সা -া -া -দ্‌া |
স্মৃ তি র ০ | তু ০ লি দি য়ে ০ ০ ০ | ০০ ০ ০ ০ |

দ্‌া সা সা -রা | -ণ্‌া -জ্ঞা -া -রা I সা -জ্ঞা জ্ঞা -রা | -সা -রা জ্ঞা -রজ্ঞা |
বি র হী ০ | ০ ০ ০ ০ আঁ ০ কে ০ | ০ ০ ছ ০ |

মা -া -া -া | ণা দণা দপা মা I জ্ঞা -রা -সা -রা | -জ্ঞা -া -া -া II
বি ০ ০ ০ | ন য়০ ন০ জ লে ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০

০ ১ + ৩
II সজ্ঞা মা দা -মা | মা দা ণা -র্সা I দণা -র্সা -ণা -দা | -পা -মা -া -া |
দু খে র ০ | দু খী স ০ ম০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ |

মা দা ণা -র্সা | র্জ্ঞা -র্রা র্সা র্মজ্ঞা I র্রর্সা -া -া -া | র্সা ণা র্রা -া |
বা দ ল ০ | ঝ ০ র ঝ০ র০ ০ ০ ০ | ঝ রি য়া ০ |

র্রজ্ঞা -র্রসা ণর্সা র্সর্রা | র্রর্সা -ণা -া -া I র্সা ণা দা পা | মা -জ্ঞা -রা -সা |
অ০ ০০ হ০ র০ | হ০ ০ ০ ০ ধ রা উ ছ | লে ০ ০ ০ |

-দা -া -া -া | -জ্ঞা -মা -া -া I -সরা -সপা -া -া | -া -া -া -া II
০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০

০ ১ + ৩

II {সা ণ্া -া সা | সমা -া মা মা I জ্ঞমা -া -া -া | জ্ঞমা মা মা -া |
সু খে ০ র | খে০ ০ লা ঘ রে০ ০ ০ ০ | প্রে০ মে র ০ |

মপা মজ্ঞা মা -জ্ঞা | দা -া -া -মা I মা মা দা -দা | র্সা -া পা ণা |
ক্ষ০ ণ০ ছা ০ | য়া ০ ০ ০ আঁ ধা রে ০ | বু ০ কে র |

পা -া -মা -দা | জ্ঞা সরা ণ্সা দণ্া I সা -জ্ঞা -া -সরা | -সা -া -া -া} |
চে ০ ০ ০ | ক রু০ ণ০ মা০ য়া ০ ০ ০০ | ০ ০ ০ ০ |

দা পা মা -র্সা | ণা -র্সা র্রা র্সা I র্রা -া -া -র্সা | র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা -া |
সে মা য়া ০ | হা ০ হা কা রে ০ ০ ০ | প্রা চী র ০ |

জ্ঞর্মা -া র্মা র্মা | র্জ্ঞা -র্রা -র্সা -া I র্সা ণা র্রা -া | র্সা -দা পা ণা |
ঘি০ ০ ঘি রে | রে ০ ০ ০ জা গা য়ে ০ | রা ০ খে প্রি |

মা -া -া -া | সা সা রা জ্ঞা I মা -া -া -সা | -জ্ঞা -া -া -া II
য়ে ০ ০ ০ | স মা ধি ত লে ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ |

নহে অপূর্ণ

শ্রীতপতী সেন

ফাগুনে সেদিন মোর কিংশুক বনে
গোধূলির মেঘ বুঝি, শুধু অকারণে
ঝরাল কনকধূলি।
নিল' দিগন্ত আলোক-কিরীট তুলি'
নত তার শির' পরে···।

দিনের দুয়ারে, করাঘাত যবে করে
ব্যাকুল সন্ধ্যাতারা;
সে মহালগনে, ক্ষণতরে দিলে ধরা
মোর আহ্বান গানে।
তারাদলে মিলি, মিলনোৎসব পানে
দিল অভিনন্দন।
অজানা রাগিণী, পরাল হিয়ায় ক্ষণিকের বন্ধন।

পথের প্রান্তে শুধু থেমেছিল রথ;
ডেকে নিল তারে পথ—
নবীন সুরের লোকে?
অন্ধছায়ায় আবার স্বপন-বোনা, মুগ্ধ নীরব চোখে।
ফাল্গুনে তবু মোর কিংশুক বনে,
থেমেছিল অকারণে।
কনকধূলির বক্ষে সে গান লেখা:—
নহে অপূর্ণ, ক্ষণিকের এই দেখা।

রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চ

শ্রীতারাকিশোর বর্দ্ধন

বিগত ২২শে জুন তারিখে জার্ম্মাণী রুশিয়া আক্রমণ করায় বিশ্ববাসী বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছে। মহাসমরের রঙ্গমঞ্চে উহা মাত্র পট-পরিবর্ত্তন। রাষ্ট্রীয় কূট-নীতির এই বিস্ময়কর পরিবর্ত্তনের আকস্মিকতায় দর্শক বিশ্ববাসী হতবুদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু এই মহাসমরের মূল কারণ অনুসন্ধান করিয়া কূটনীতি পরিচালনার ইতিহাস অধ্যয়ন করিলে, উহাতে বিস্ময়ের কারণমাত্র থাকে না। এই রণতাণ্ডবের মূল কারণের বিষয় আমরা পূর্ব্বেও উল্লেখ করিয়াছি। ভার্সেলিস্ সন্ধি-সর্ত্তের ব্যবস্থায় ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইউনাইটেড ষ্টেট্স্, এই তিনটি শক্তি তাহাদের অতুলনীয় সম্পদের (finance capital) বলে
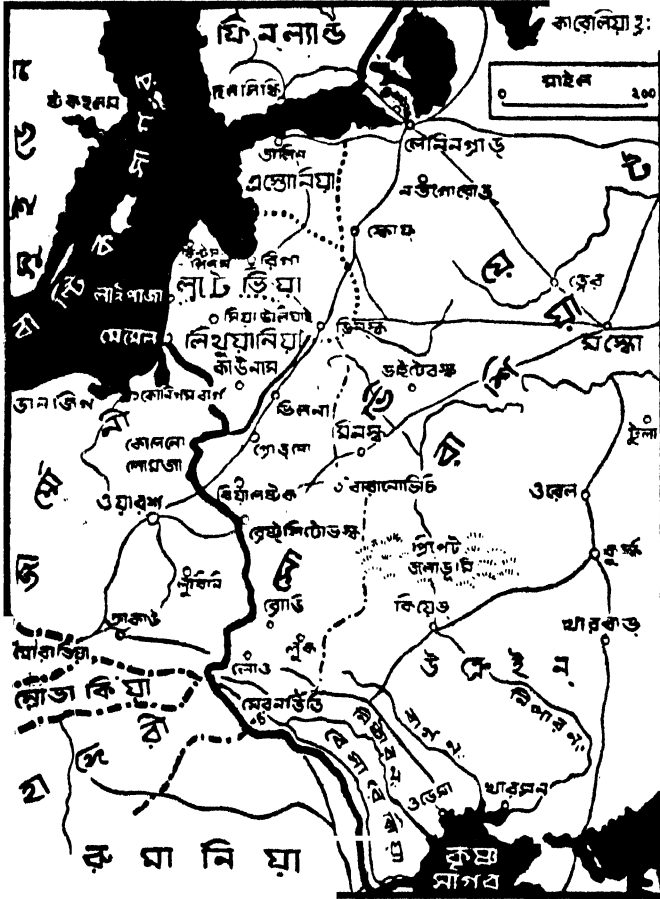
পৃথিবীর নেতৃত্ব করিতেছে। ঐ আধিপত্যের বিপক্ষে চারিটি দেশে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, যথা:—জার্ম্মাণী ইটালী, জাপান ও রুশিয়া। উহারা প্রত্যেকেই বর্ত্তমান জগদ্ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া জগতে নব বিধান (new order) প্রণয়নে বদ্ধপরিকর। তবে ভবিষ্যতের নব বিধানের স্বরূপটা কি হইবে, সে-সম্বন্ধে ইটালী, জার্ম্মাণী, ও জাপানের মত মোটামুটি এক প্রকার এবং রুশিয়ার মত ভিন্ন প্রকার। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবপথে রুশিয়ার রূপান্তর ঘটিয়াছে। তারপরেও দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে কিন্তু রুশিয়া জগদ্ব্যবস্থায় বিপ্লোৎপাদনে সাহসী হয় নাই। বিগত ১৯৩৩ সাল হইতে জার্ম্মাণীতে হিটলারের অভ্যুদয় হওয়া বিশ্ববাসী বুঝিতে পারিয়াছিল যে, হিটলারের নেতৃত্বে নববলদৃপ্ত জার্ম্মাণজাতি বর্ত্তমান জগদ্ব্যবস্থার বিঘ্ন উৎপাদন করিবার অভিপ্রায়ে ক্রমশঃ দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিতেছে রুষিয়াও এই পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইতেছিল।

হিটলারের অভ্যুদয়ের ফলে রাষ্ট্রীয় জগৎ তিনটি প্রধান দলে বিভক্ত হয়। প্রথম দলে থাকে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইউনাইটেড ষ্টেট্স এবং তাহাদের সমর্থনকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব রাজ্য। উহাদের মত এই যে, জগতে বর্ত্তমান বিধান মান্য করিয়া চলিতে হইবে এবং তাহাতেই বিশ্ববাসীর মঙ্গল হইবে; অন্যথা নাৎসী-বর্ব্বরতা অথবা কমিউনিষ্ট বর্ব্বরতায় জগতে সভ্যতা বিনষ্ট হইবে। দ্বিতীয় দলে থাকে ইটালী, ও জাপান এবং তাহাদের তাঁবেদার স্পেন প্রমুখ কয়েকটি রাষ্ট্র। উহাদের মতবাদ এই যে, গণতন্ত্রবাদী রাষ্ট্রসমূহ এখ দুনিয়ার নেতৃত্ব করিতেছে; কিন্তু গণতন্ত্র জাতীয় জীবনে

দুর্ব্বলতা সঞ্চার করে। একনায়কত্বে জাতীয় শক্তি ও কর্ম্মপটুতা (efficiency) বৃদ্ধি হয়। সুতরাং জগতে একনায়কত্ব-মূলক নব বিধান তাঁহারা প্রবর্ত্তন করিবেন এবং তাহাতে জার্ম্মাণী ও তাহার বন্ধুগণ নেতৃত্ব করিবেন। তৃতীয় দলে আছে শুধু সোভিয়েট্ রুশিয়া। রুশিয়ার পক্ষে অন্য রাজ্য না থাকিলেও, পৃথিবীর প্রত্যেক রাজ্যের জনসাধারণের একটি বড় অংশ মনে প্রাণে সোভিয়েট্ রুশিয়ার মতবাদ সমর্থন করে এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবপথে পৃথিবীর রূপান্তর ঘটাইবার আকাঙ্ক্ষা করে।

উপরিলিখিত এই তিনটী দলের প্রত্যেকেই শক্তিশালী এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ বিজয় সম্বন্ধে আশাবাদী। কিন্তু এই তিনটি শক্তির ঘাত প্রতিঘাতে ইউরোপে ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে একটি অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং উহার সুযোগ লইয়া বিদ্যুতের ন্যায় তীব্র গতিতে হিট্লার বিনা যুদ্ধেই ইউরোপের মানচিত্র বদ্লাইয়া ফেলিতে লাগিলেন। অষ্ট্রিয়া, সুদেতেনল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, মেমেল প্রভৃতি তিনি ক্রমে ক্রমে গ্রাস করেন। অবশেষে পোল্যাণ্ডের নিকট ড্যানজিগ ফিরাইয়া পাইবার দাবী করায়, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বর্ত্তমান মহাসমরের অবতারণা হয়। এই সময় হইতে ত্রিধাবিভক্ত রাষ্ট্রীয়দলের কূটনীতি পরিচালনা অনুধাবন করিলেই বর্ত্তমান রুশ-জার্ম্মাণ পরিস্থিতি সম্যক্ উপলব্ধি করা সহজ হইবে। পোল্যাণ্ড দখলের পূর্ব্বে যে রুশ-জার্ম্মাণ মিতালী প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাতে এমন মনে করা সহজ হইবে যে, রুশিয়া জার্ম্মাণীকে জগতে জার্ম্মাণ-বিধান (German order) প্রবর্ত্তন করিবার জন্য আমমোক্তার-নামা লিখিয়া দিয়াছে। বস্তুতঃ তিনটি দলের প্রত্যেকেই স্বীয় স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করিবার চেষ্টায় প্রাণপণ করিতেছিল। ইংলণ্ড প্রথম হইতেই এই আশা করিতেছিল, যাহাতে রুশিয়া ও জার্ম্মাণীর মধ্যে বিরোধ বাধিয়া উভয়েই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং ভার্সে'লিসের বিধানই জগতে স্থায়ী হইয়া থাকে। কিন্তু ঘটনাচক্রে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে যে রুশ-জার্ম্মাণ মিতালী হয়, তাহাতে উভয় পক্ষ এই ঘোষণা করে যে, আমরা ইংলণ্ডের লাভের জন্য পরস্পর যুদ্ধ করিব না (we shall not fight their battles)।

রুশিয়ার কূটনীতি যাঁহারা পরিচালনা করেন, তাঁহাদের কূটনৈতিক চিন্তাধারা মোটামুটি এইরূপ ছিল যে, ইঙ্গ-জার্ম্মাণ যুদ্ধে তাহারা জার্ম্মাণীর পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে না, কারণ ফ্যাসিষ্ট জার্ম্মাণী তাহাদের চিরশত্রু। অপরদিকে ইংলণ্ডের পক্ষ অবলম্বন করিলেও, পশ্চিমে জার্ম্মাণী এবং পূর্ব্বে জাপান, এই দুই শত্রুর বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে হইবে; অধিকন্তু ইংলণ্ড হইতে কোন সহায়তা পাইবারও পথ থাকিবে না। সুতরাং যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকিয়া বিব্রত জার্ম্মাণীর নিকট হইতে যতটুকু সাহায্য বিনা যুদ্ধে পাওয়া যায়, তাহাই লাভ। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যাহাতে উভয় পক্ষই যুদ্ধে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যায়, তাহাই করিতে হইবে।

আসন্ন যুদ্ধের পূর্ব্বে সলা-পরামর্শ

এই প্রকারের নীতি-পরিচালনায় রুশিয়া একদিকে জার্ম্মাণীকে নানাপ্রকারে সাহায্য করিয়াছে, অন্যদিকে

যুগোস্লাভিয়া, গ্রীস ও তুরস্কের ব্যাপারে কূটনৈতিক চাল দিয়া জার্ম্মাণীর শক্তিক্ষয়ও করিয়াছে। কারণ মিত্রশক্তিপুঞ্জের জয়ও রুশিয়ার কাম্য নয়, এজন্য সে জার্ম্মাণীকে সহায়তাও অনেক করিয়াছে। আবার জার্ম্মাণী যদি জয়ীও হয়, তাহা হইলেও যাহাতে সে জয়ের ফল ভোগ করিতে না পারে, সে বিষয়েও রুশিয়া সজাগ ছিল। কারণ জার্ম্মাণী জগতে তাহার ফ্যাসিষ্ট নববিধান প্রতিষ্ঠা করিবে অথচ রুশিয়া তাহাকে সাহায্য করিবে—এমন আশা করা মূঢ়তা।

অপর পক্ষে জার্ম্মাণ কূটনীতির গতি ছিল এই যে, বিগত মহাসমরে পূর্ব্ব ও পশ্চিম, এই উভয় প্রান্তে যুগপৎ সংগ্রাম করায় তাহারা অসুবিধায় পড়িয়াছিল। সুতরাং পশ্চিম প্রান্তে ফ্রান্সকে যুদ্ধ হইতে বিরত না করা পর্য্যন্ত রুশিয়াকে তোয়াজ করিয়া নিরপেক্ষ রাখাই ছিল জার্ম্মাণীর স্বার্থ। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রুশিয়া, এই তিনটি রাষ্ট্রই উদীয়মান জার্ম্মাণীর পথের কাঁটা। অথচ সকলের বিপক্ষে এককালে সংগ্রাম করাও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাই তাহাদের মধ্যে ভেদসৃষ্টি করিয়া একের সঙ্গে লড়াই করার পন্থাই জার্ম্মাণী গোড়া হইতে লইয়াছিল। এই নীতির অনুসরণ করিয়া জার্ম্মাণী রুশিয়ার নিরপেক্ষতা ক্রয় করে। তাহার ফলে পোল্যাণ্ড বিজয়ের অর্দ্ধেক লভ্যাংশ সহ ল্যাট্‌ভিয়া, লিথুনিয়া, এস্তোনীয়া এবং বেসারোবিয়া রুশ-ভল্লুকের উদরে প্রবেশ করিতে দেখিয়াও জার্ম্মাণীকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। গরজ বড় বালাই। তাহা ছাড়া ফিনল্যাণ্ডের সম্পৎশালী অংশবিশেষ রুশিয়া যুদ্ধ করিয়া দখল করে। বাল্টিক অঞ্চলে যে সব জার্ম্মাণ-পরিবার কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বসবাস করিতেছিল, তাহাদিগকেও জার্ম্মাণীতে ফিরাইয়া আনিতে হইয়াছিল। এই সব করা হইয়াছে রুশিয়াকে তুষ্ট করিবার জন্য। কিন্তু পশ্চিম প্রান্তে ফ্রান্সের পতনের পর হইতে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুন ফ্রান্সের পতন ঘটে। তারপর হইতে জার্ম্মাণী এক বৎসর যাবৎ অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ারী করিয়াছে, পরাজিত ফরাসীর সঙ্গে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। পশ্চিমদিকে ফ্রান্সের নিকট হইতে কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই বুঝিতে পারিয়া ঠিক এক বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুন জার্ম্মাণী রুশিয়া আক্রমণ করিয়াছে।

রুশ-জার্ম্মাণ যুদ্ধ :

রুশিয়া ও জার্ম্মাণীর যুদ্ধে কোন পক্ষ দোষী এবং কে নির্দ্দোষ, তাহার আলোচনায় ফল নাই। কারণ সুযোগ পাইলে যে কোনও পক্ষই প্রথমে আক্রমণ আরম্ভ করিতে পারিত। অনেকে অনুমান করেন যে, জার্ম্মাণী ইংলণ্ড আক্রমণ করিলে, রুশিয়া পশ্চাদ্দিক্ হইতে জার্ম্মাণীকে আক্রমণ করিত। যাহা হউক, আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করিতে চাহি না। কারণ রাষ্ট্রনীতিতে উহা অবান্তর। উভয় রাষ্ট্রের কূটনৈতিক উদ্দেশ্য আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। বিগত ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত রুশিয়া কোন প্রকার আক্রমণমূলক কার্য্য করিতে সাহসী হয় নাই; কিন্তু জার্ম্মাণ-যুদ্ধ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই সে পোল্যাণ্ড, ফিন্‌ল্যাণ্ড ও অন্যান্য বাল্টিক রাষ্ট্রের উপর আক্রমণ চালাইয়াছিল। সুতরাং দোষগুণের প্রশ্ন উঠে না। একমাত্র প্রশ্ন সুযোগের। রুশিয়াকে প্রথমে আক্রমণের সুযোগ না দিয়া হিট্‌লারই প্রথমে রুশিয়া আক্রমণ করিয়াছে। রুশিয়া ও জার্ম্মাণী, উভয় রাষ্ট্রই প্রবল শক্তিশালী এবং প্রত্যেকেই স্ব স্ব স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন। সুতরাং এইযুদ্ধে নাৎসীবাদ ও সাম্যবাদ, এই উভয়ের মধ্যে কে বেশী শক্তিশালী, তাহা সাধারণ্যে প্রকাশ পাইবে। স্থলযুদ্ধের সামরিক ইতিহাসে এইরূপ দেড় হাজার মাইলব্যাপী ফ্রন্ট, এই বিপুল সৈন্য-সমাবেশ, এমন সামরিক সজ্জা সত্যই অভূতপূর্ব্ব!

ত্রিকোণ সংগ্রাম (Tricornered fight) :

এই রুশ-জার্ম্মাণ সমরকে অন্যান্য যুদ্ধের মত দুইটী পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বলিতে পারি না। ইহা ত্রিকোণ সংগ্রাম। ইংলণ্ডের পক্ষে জার্ম্মাণী ও রুশিয়া অর্থাৎ ফ্যাসিজম্ ও কমিউনিজম উভয়েই তাহার শত্রু। লড়াই করিয়া উভয়েই অবসন্ন হইয়া পড়িলে, ইংলণ্ডের লাভ। অন্যথায় যদি একপক্ষ বিজয়ী হইয়া পৃথিবীময় ফ্যাসিজম বা কমিউনিজম্ ছড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে

আবার ইংলণ্ডের সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। রুশিয়ার পক্ষেও ইংলণ্ড বা জার্ম্মাণী উভয়েই তাহার শত্রু। জার্ম্মাণীকে পরাস্ত করিলেও, তাহাকে ইংলণ্ডের সঙ্গে লড়াই করিতে হইবে, নতুবা তাহাকে বিগত ভার্সেলিসের সন্ধির মতই ইংলণ্ডের প্রভাবাধীন জগদ্বিধান মানিয়া চলিতে হইবে। জার্ম্মাণী তো ইংলণ্ড ও রুশিয়া, উভয়কেই পরাস্ত করিয়া তাহার নব বিধান প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াস পাইতেছে। জার্ম্মাণীর প্রবল শক্তির সংঘাতে ইংলণ্ড ভাবিতেছে যে, ফ্যাসিষ্ট দস্যুগণ এত খারাপ যে, তাহার তুলনায় কমিউনিষ্টও ভাল। আবার সেইজন্যই রুশিয়াও ভাবিতেছে যে, ফ্যাসিষ্টগণ এত খারাপ যে, তাহার তুলনায় সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজও ভাল। অবস্থার বিপর্য্যয়ে আজ সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ ও সাম্যবাদী রুশিয়া এক শয্যায় শয়ন করিতে বাধ্য হইয়াছে। "Misfortune makes strange bed-fellows" অনেক বামপন্থী মনীষী এই প্রকারের সন্দেহও প্রকাশ করিয়াছেন যে, সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ কমিউনিষ্ট-বিদ্বেষে প্রণোদিত হইয়া জার্ম্মাণীর সঙ্গে সন্ধিও করিয়া বসিতে পারে। তাহাদের এই কথায় ইহাই প্রমাণিত হয় যে, এবারে ত্রিকোণ সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বে আমরা যে তিনটী রাষ্ট্রীয় দলের উল্লেখ করিয়াছি, ইহা তাহাদেরই প্রাধান্য মূলক সংগ্রাম।

কিন্তু বামপন্থিগণ যাহাই বলুন না কেন—তাহাদের কোনও কথাই এবারে সত্যে পরিণত হয় নাই—এমন কি ইংলণ্ড ও জার্ম্মাণী মিতালী করিয়া রুশিয়াকে পরাস্ত করিবে, তাহাদের এই যে ধারণা, তাহাও সত্যে পরিণত হইবে না। জার্ম্মাণী যদি দুর্ব্বল বা অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িত, তাহা হইলে এই প্রকারের অবস্থা হইতে পারিত ; কিন্তু ঘটনা অন্য প্রকার। প্রধান মন্ত্রী চার্চ্চিল তাহা সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়াই ব্যক্তিগত কমিউনিষ্ট-বিদ্বেষ সত্ত্বেও রুশিয়াকে সর্ব্ব প্রকারে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আবার রুশিয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রতি খুব সন্তুষ্ট নয়, এজন্য সেও তাহাদের নিকট কোনও সাহায্য প্রথমে প্রার্থনা করে নাই। অবশেষে অবস্থার বিপর্য্যয়ে উভয় দেশ মিতালী বন্ধনে আবদ্ধ হইলেও, ইহা আইনতঃ কতখানি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সে সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশিত হইয়াছে। উভয়ের যুদ্ধের উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। এমতাবস্থায় সাহায্যদাতা ও সাহায্যগ্রহীতার মধ্যে আন্তরিক মিলন স্থায়ী হইতে পারে না। এই কারণে ইহাকে আমরা "ত্রিকোণ যুদ্ধ" এই সংজ্ঞায় অভিহিত করিতে পারি।

সংগ্রাম-তরঙ্গের গতি :

বর্ত্তমান যুদ্ধের মূল কারণগুলির সংক্ষেপে আমরা আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে রণক্ষেত্রের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিব। বিগত ২২শে জুন তারিখে ইউরোপের উত্তর প্রান্ত ফিনল্যাণ্ড হইতে কৃষ্ণ সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ১৫০০ মাইল স্থান জুড়িয়া রুশ-জার্ম্মাণ রণক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়াছে। তাহা ছাড়া ইংলণ্ডের সঙ্গে জার্ম্মাণীর যুদ্ধ এখনও পূর্ণ বেগে চলিয়াছে। রুশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিয়াও ইংলণ্ডের উপরে বিমান-আক্রমণ বা আটলান্টিকের জাহাজ-ডুবি প্রভৃতি কার্য্য হইতে জার্ম্মাণী বিরত হয় নাই। মিশরের পশ্চিম প্রান্তেও উভয়ের মধ্যে লড়াই চলিতেছে। কিন্তু দু'গলে প্রমুখাৎ ইংরাজ সৈন্য সিরিয়া আক্রমণ করায়, ভিসি গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে তাহাদের এক পর্ব্ব যুদ্ধ সিরিয়াতে হইয়া গেলে। ইহাও কম বিস্ময়ের সঞ্চার করে নাই। এক

আধুনিক যুদ্ধে বড় বড় নগর বিধ্বংসী কামান

বৎসর পূর্ব্বের মিত্র কি ভাবে কূটনীতির খেলায় ধীরে ধীরে শত্রুতায় প্রবৃত্ত হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত এই ফরাসী গবর্ণমেণ্টের ব্যবহারে আমরা দেখিতে পাইয়াছি।

বিগত ১৯১৪ সালের মহাসমরে জার্ম্মাণীর প্ল্যান ছিল, প্রথমে ১৫।২০ দিনের মধ্যে ফরাসী দেশকে পরাজিত এবং উহাকে যুদ্ধ হইতে অপসারিত করিয়া তারপর সর্ব্বশক্তি সংহত করিয়া রুশিয়াকে চূর্ণ করা। অবশেষে

জার্ম্মাণীর বিমান-সচিব ক্যাপ্টেন গোয়েরিং: গুজব রুশিয়ার আক্রমণ লইয়া হিটলারের সহিত তাঁহার মতপার্থক্য হইয়াছে

ইংলণ্ডের সঙ্গে শেষে লড়াই করা। কিন্তু ১৯১৪ সালে জার্ম্মাণ সেনাপতি মনট্কি ভুল চাল দিয়া ফরাসীকে পর্য্যুদস্থ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন এবং ১৯১৫ সালে জার্ম্মাণ সেনাপতি ফকেন-হাইন অস্থির মতির পরিচয় দিয়া রুশিয়াকে একেবারে নিঃশেষে পরাজিত করিতে গিয়া বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন। "ইউরোপে মহাসমর" নামক পুস্তকে ইহা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছি। এবারের যুদ্ধও জার্ম্মাণীর শ্লিফেন প্ল্যান অনুসারেই ধার্য্য হইয়াছে এবং তাহাতে হিটলারের পরিচালনায় কোনও ত্রুটি এখনও হইতে পারে নাই।

জার্ম্মাণীর পক্ষে ফ্রান্স ও রুশিয়া, উভয়কে একে একে পরাজয় করিতে পারিলেই ইউরোপে অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব! সেই অনুসারে কার্য্য পরিচালিত হইয়াছে। যুদ্ধের প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের মধ্যেই জার্ম্মাণগণ রুশ-বাহিনীর উপর বিমান-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। বাল্টিক সাগর হইতে কৃষ্ণ সাগর পর্য্যন্ত ১৫০০ মাইল বিস্তৃত রণাঙ্গনের সর্ব্বত্রই জার্ম্মাণীর অগ্রগতি শ্লথ হইলেও, অব্যাহত রহিয়াছে। ইউক্রাইন, ল্যাটভিয়া এবং বাল্টিক ও কৃষ্ণ সাগরের তীর দিয়া জার্ম্মাণগণ অগ্রসর হইতেছে। মস্কৌ হইতে জার্ম্মাণ সৈন্য আজ পর্য্যন্ত ২০০ মাইল দূরে আছে। হয়ত মস্কৌর শীঘ্রই পতন ঘটিবে। লেলিনগড়েরও পতন-সম্ভবনা আসন্ন।

জাপানের মতিগতি এখনও বুঝা যাইতেছে না। তবে তাহার প্রভাবাধীন চীন দেশের একটা বিরাট্ অংশ ব্যাপিয়া একটি তাবেদার (নানকিন্) গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই নানকিন গবর্ণমেণ্টকে জার্ম্মাণী, ইটালী, স্পেন, হাঙ্গেরী ও বুলগেরিয়া মানিয়া লইয়াছে। ইংলণ্ড, আমেরিকা ও রুশিয়া এই তাঁবেদার গবর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিবে না। অথচ ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রভূত ধনসম্পদ্ এই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ব্যবসায়ে খাটিতেছে। সুতরাং এই উপলক্ষে নানকিন গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিবাদ বাধিতে পারে। অথবা জার্ম্মাণীর মিত্র হিসাবে জাপান রুশিয়ার পূর্ব্ব প্রান্তও আক্রমণ করিতে পারে। জাপান তাহার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তির একজন হওয়া জাপানের আকাঙ্ক্ষা—কেবলমাত্র ফাঁকির কৌশলে এত বড় স্বপ্ন সিদ্ধ হইতে পারে না। এজন্য তাকে শক্তির পরিচয় দিতে হইবে। পশ্চিমের কোন প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রের সঙ্গে করমর্দ্দন করিলেই জাপানের শক্তিপরীক্ষা প্রমাণিত হইবে।

বৈচিত্র্য

ঘরের আরাম   রণাঙ্গনের সৈনিক   যুদ্ধাবসানে

বিভিন্ন অবস্থায় মনের ও বেশের বৈচিত্র্যজনিত একই মানুষের মুখাবয়ব

বিজয়বার্ত্তা শ্রবণে উৎফুল্ল হিটলারের বিভিন্ন ভঙ্গী ও মুদ্রা-বৈচিত্র্য ঃ বর্ত্তমান জগতে সবচেয়ে ব্যস্ত, চিন্তিত ও কর্ম্মময় জীবন এই জর্ম্মন-ডিক্টেটরের

দিগ্বিজয়-স্বপ্নবিভোর হিটলারের উদ্‌ভ্রান্ত সামরিক নৃত্য ঃ মুখে ক্রূর হাসি

বাংলা দেশে গড়পড়তা আয়ুষ্কাল

বাংলা দেশের গড়পড়তা আয়ুষ্কাল ও মৃত্যুর হার সম্বন্ধে যে সাধারণ ধারণা প্রচলিত তাহাতে একটা ভ্রান্তি ও অসত্য নিহিত আছে। আষাঢ় সংখ্যার 'স্বাস্থ্য' পত্রিকায় ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত এম, ডি, মহাশয় "অকাল মৃত্যু ও দারিদ্র্য" শীর্ষক প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে কয়েকটি জ্ঞাতব্য কথা বলিয়াছেন :

বাংলা দেশের গড়পড়তা আয়ু বড় অল্প ; এ কথা অনেকেই জানেন, কিন্তু তাহার কারণ কি তাহা অনেকেই জানেন না। ইংলণ্ডে সাধারণ লোকের গড়পড়তা আয়ুষ্কাল ৫৩, এখানে ২৩ এইরূপ বলা হইয়া থাকে। কিন্তু এই কথায় একটা (fallacy) অসত্য নিহিত আছে, তাহা জানা উচিত।

আমাদের দেশের ১০০০ নবজাত শিশুর প্রায় ২০০।৩০০ এক বৎসরের মধ্যে মারা যায়। এতগুলি শিশুর মৃত্যু গড়পড়তার ভিতর গণনা করা হয় বলিয়া আমাদের দেশের মৃত্যুর হার এত অধিক দেখায়। শিশুমৃত্যু যদি কম হয়, তাহা হইলে এদেশে গড়পড়তা আয়ু ইংলণ্ড অপেক্ষা বিশেষ কম হয় না। অর্থাৎ বৎসরে ১০০০ শিশুর মধ্যে ২৫০।৩০০ শিশু না মরিয়া যদি ৭০।৮০ মাত্র মরিত, তাহা হইলে বঙ্গদেশের সাধারণ আয়ু ৪০।৫০ হইয়া পড়ে।............ইংলণ্ডে শিশু-মৃত্যুর হার ১০০০-এ ৭০। নিউজিল্যাণ্ডে, সেই ইংরাজ অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করে, সেখানে শিশুমৃত্যুর হার মাত্র ১৫।২০। মাদ্রাজ প্রদেশের ৪টি সহরের ২ লক্ষ লোকের মধ্যে ৭৩০০ শিশুর জন্ম সংক্রান্ত সংবাদ অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে, যাহাদের আয় মাসে ৫০৲ টাকার বেশী, তাহাদের মধ্যে শিশু মৃত্যু মাত্র ৮৪, কিন্তু যে সকল পরিবারের আয় মাসে ২৫৲ টাকা মাত্র তাহাদের মধ্যে শিশু মৃত্যুর হার ২২০! অর্থের স্বচ্ছলতার সহিত শিশু মৃত্যুর হারের এত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ।

ইংলণ্ডে সকল পরিবারের আয় মাসে ১০০৲ টাকার বেশী। এমন কি, যাহারা বেকার তাহাদিগকেও মাসে ১১০৲ টাকা ভাতা দেওয়া হয়। কাজেই ইংলণ্ডে যে শিশুমৃত্যু কম হইবে, তাহা বিচিত্র কি ? এদেশে যদি সাধারণ পরিবারের মাসিক আয় মাত্র ১৫।২০৲ টাকা না হইয়া মাসিক ৫০৲ টাকা হইত অর্থাৎ সকলেই যদি খাইতে পাইত, তাহা হইলে আমাদের শিশুমৃত্যু অর্দ্ধেক হইত।........

একটু নিরপেক্ষ বিচার করিলেই দেখা যাইবে যেখানে ঘন বস্তী, যেখানে দারিদ্র্য সেইখানে শিশুমৃত্যু। এত স্পষ্ট প্রমাণ সত্ত্বেও এদিকে লক্ষ্য না করিয়া অনেকেই কতকগুলি অবান্তর কথার অবতারণা করিয়া থাকেন। ক্ষয়রোগের কথা বলিতে গেলে, বাল্যবিবাহ বা অবরোধ প্রথার দোষ দেন। শিশু মৃত্যুর উল্লেখ করিলে, দেশের সূতিকাগৃহের ও বাল্য বিবাহের দোষ দেওয়া হয়।......এইরূপ অসংলগ্ন কথা বলা এমনই নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার যে, শিক্ষাভিমানী লোকের মনে এইরূপ ধারণা আছে যে, গ্রামে পরিস্কৃত পানীয় জলের ব্যবস্থা না করিয়া কেবলমাত্র দেশের লোকের বদভ্যাসের নিন্দা করিলেই স্বাস্থ্যপ্রচার কার্য্য হয়। অথচ Malta, Chile, Rumania প্রভৃতি দেশে কুপ্রথা থাকিবার সম্ভাবনা না থাকিলেও, কেবল মাত্র খাদ্যাভাব ও অর্থাভাবে যে ভারতের মতই দুর্দ্দশাগ্রস্ত তাহা উল্লেখ করা হয় না।

আধুনিক কবিত্ব

বৈশাখের 'প্রবাসী' পত্রিকায় শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় 'আধুনিক কবিত্ব' নামক প্রবন্ধে কাব্যে আধুনিক গদ্যরীতির সমালোচনা করিয়া যে মন্তব্য করিয়াছেন, একাধিক কারণে তাহা উল্লেখযোগ্য। উক্ত প্রবন্ধের অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত হইল :—

অল্প, ক্ষুদ্র, অকিঞ্চিৎকর, দৈনন্দিন ঘরোয়া উপাদান যে কাব্যের মধ্যে থাকতে পারে না, তা' নয়। কাব্যের মধ্যে তা যথেষ্ট থাকতে পারে, কিন্তু কবির মধ্যে, কবি-চেতনায় সে জিনিষ অর্থাৎ শুধুই সে জিনিষ থাকলে চলবে না—কবিচেতনাকে আর একটা জিনিষ দিয়ে গড়তে হয়। প্রাচীন মনীষীরা কবি-চেতনাকে ঋষি-দৃষ্টির সঙ্গে একীভূত করেছিলেন অর্থাৎ যে দৃষ্টি সব জিনিষ দেখে তাকে আনন্ত্যের ছাঁচে ফেলে।

আধুনিকেরা এই জিনিষটাও মানছেন না। অনন্তের জন্ম তাঁরা ব্যস্ত নন, কাব্যরসের জন্ম তার আবশ্যকতাও তাঁরা অনুভব করেন না, কি স্বীকার করেন না। তাঁদের পদ্ধতি অন্য রকমের। গদ্যময় বস্তুকে গ্রহণ করলাম, কিন্তু তাকে গদ্যময় ধারায় ব্যবহার করা ছাড়া আর একটু বেশী কিছু করার দরকার—নতুবা কাব্যে আর গদ্যে কোনই পার্থক্য থাকে না—দুইই এক জিনিষ হয়ে দাঁড়ায়।

চার
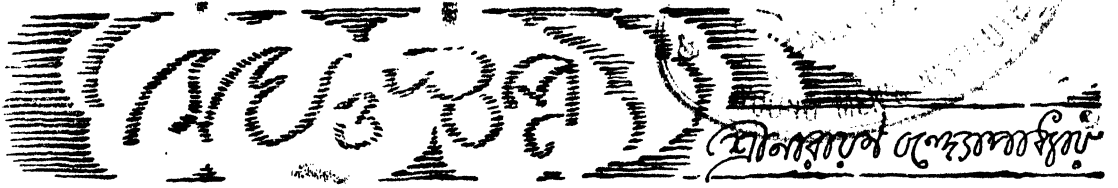
পূবদিকের জানলাটা খোলা ছিল—অন্ধকার একটু আগেই তরলায়িত হ'য়ে এসেছে—মুঠো মুঠো আলো জান্‌লার মধ্যে দিয়ে এসে সমস্ত ঘরে ছড়িয়ে প'ড়ছে। সমস্ত পূর্বদিগঙ্গণ নূতন দিনের আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত। গার্গীর ঘুম ভেঙে গেল।

কি টক্‌টকে লাল সূর্য্য! গার্গী বিছানার ওপরে উঠে বস্‌ল, কাল আর মশারিটা পর্য্যন্ত টানানোর সময় হয়নি—কখন যে তার সমস্ত গা ভ'রে ঘুম নেমে এসেছিল তা গার্গী মোটেই বুঝ্‌তে পারেনি। উঃ—মাগো—গার্গী নিজের সমস্ত অবসন্ন দেহের ক্লান্তি অপনোদনের ভংগী করল। আজ ছুটী আছে কিন্তু গার্গীর অনেকগুলো কাজও প'ড়ে র'য়েছে—ইউনিভার্সিটীর এমন সুন্দর ছুটীটা সে উপভোগ করবে পারল না।

তখনও সমস্ত অন্ধকার একেবারে নিঃশেষে তরল হ'য়ে ওঠেনি—একবার মনে হোল লেকের দিক থেকে খানিকটা ঘুরে এলে মন্দ হয় না—ভোরবেলা ভালোই লাগ্‌বে বেড়াতে। গার্গী উঠে দাঁড়াল—সমস্ত রাত্রির ক্লান্তি এখনও যেন তার সমস্ত শরীর ছেয়ে র'য়েছে।

"দিদি—"

বন্ধ দরজার ওপার থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল। গার্গী ততক্ষণে আপনার শ্লথ বেশবাস ঠিক ক'রে নিতে আরম্ভ ক'রেছে, উত্তর দিলে "কে?"

"আমি—"

গার্গী এগিয়ে গিয়ে দরজার খিলটা খুলে দিলে, "ওমা, কি আশ্চর্য্য! তুমি!—দিনটা আমার নিশ্চয়ই খুব ভাল কাট্‌বে—এস, এস! গার্গী হেসে অভ্যর্থনা করল।

"হুঁ—কি যে বলেন আপনি" অলকেন্দু আস্তে আস্তে এসে ঘরে ঢুকল, "বাস্তবিক, এত সকালে এসে আপনার ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম—এই জন্তেই তো ভোরে আমি আস্‌তে চাইনি; কিন্তু ও কি শোনে?—"

"বা—রে" গার্গী আবার হেসে উঠ্‌ল, "এত ভোরে আস্‌বে ব'লেই তো তোমার জন্যে সেই কখন থেকে জেগে ব'সে আছি।"

"যান্‌—আপনার সব তাতেই ইয়ে, মানে সত্যি আমি ভারী লজ্জিত এর জন্যে—"

"বেশ তো, শুনে সুখী হ'লাম" গার্গী বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, বল্‌লে, "বসো একটু, পালিও না যেন, আমি এখুনি আস্‌ছি।"

গার্গী দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

টেবিলের ওপরে ছোট একটা এ্যালবাম প'ড়েছিল—অলকেন্দু সেটা নিজের কাছে টেনে নিলে, গার্গী যেবারে শিলংয়ে বেড়াতে গিয়েছিল সেইবারের তোলা কতগুলি সুন্দর ফটো এর মধ্যে ঝক্‌-ঝক্‌ করছে। চমৎকার উঠেছে ফটোগুলি। অলকেন্দু পাতা উল্‌টে গেল। একটা ছবির কাছে সে এসে থম্‌কে দাঁড়াল, ছবির নীচে লেখা র'য়েছে, "চেরাপুঞ্জির গায়ে"। বার বার নামটা প'ড়ে অলকেন্দুর ভারী হাসি এল। কত রকম কায়দাই যে হ'য়েছে আজকাল! ফটোর মধ্যে প্রায় সবাইকেই অলকেন্দু একে একে চিন্‌তে পারল, কিন্তু,—এই, ঠিক্‌ মাঝখানে শার্ট প'রে একটী ভদ্রলোক, অলকেন্দু যেন কোথায় দেখেছে—অথচ কিছুতেই মনে করতে পারছে না—অলকেন্দু খুব ভাল ক'রে ভদ্রলোককে চিন্‌বার চেষ্টা করতে লাগ্‌ল: আশ্চর্য্য—অলকেন্দুর মনে হয় বহুবার যেন সে তাকে দেখেছে—অথচ নামটা—নামটা—

"কি ব্যাপার, কি দেখ্‌ছ অত?" গার্গী এসে ঘরে ঢুক্‌ল, "কার ফটো?"

অলকেন্দু মাথা তুল্‌লে, "ঈশ্‌—স্নান ক'রে এলেন নাকি এর মধ্যে?"

গার্গী হাস্‌ল—"না, স্নান ঠিক নয়—এই গা আর মাথাটা ধুয়ে নিলাম একটু।"

"এত ভোরে? মানে—ঠাণ্ডা টাণ্ডা যদি লেগে যায়?"

"পাগল—আমার আবার ঠাণ্ডা লাগবে! আর তা' ছাড়া এ আমার অনেক দিনের অভ্যেস কিনা"—গার্গী অলকেন্দুর চোখের দিকে চাইলে। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে গার্গীকে, কপালের পাশ থেকে কাণের ওপরে কয়েকটা সুন্দর চুলের থাক নেমে এসেছে—শাড়ীটাকে ভারী চমৎকারভাবে সমস্ত শরীরে জড়িয়েছে, চুলের থেকে ভেসে আস্‌ছে ভারি মিষ্টি একটী মোহময় গন্ধ!

"কার ফটোর ওপরে এমন ঝুঁকে পড়েছ দেখি?"

গার্গী অলকেন্দুর একেবারে গায়ের কাছে এসে দাঁড়াল।

অলকেন্দু ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। "আরে বস—বস, উঠ্‌লে কেন, কি মুস্কিল" গার্গী হাত ধ'রে অলকেন্দুকে বসিয়ে দিলে।

অলকেন্দু ফটোটা আঙুল দিয়ে দেখালে, বল্‌লে, "এর মধ্যে আপনাদের সবাইকেই তো বেশ চিন্‌তে পারছি, কিন্তু এই ভদ্রলোক—এই যে মাঝখানে শার্ট প'রে দাঁড়িয়ে আছেন, মানে অনেকবার এঁকে দেখেছি মনে হ'চ্ছে—"

গার্গী এবারে একেবারে হাসিতে টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে ছড়িয়ে পড়্‌ল, সে হাসির বেগ যেন সহজে থামবে না, "কি আশ্চর্য্য! চিন্‌তে পারলে না মোটে! দেখ—দেখ, ভাল ক'রে ফের দেখ" ব'লেই গার্গী আবার হাসিতে ফেটে পড়্‌ল।

অলকেন্দু তখন রীতিমত অপ্রস্তুত হ'য়ে প'ড়েছে—কি যে করবে, ঠিক করতে পারলো না।

গার্গী তখনও সেইভাবে হাসিতে কেঁপে কেঁপে উঠছে, সমস্ত মুখ চোখ ওর লাল হ'য়ে উঠেছে—"চিন্‌তে পারলে না?—আরে ও যে আমাদের আভা—আভা! ভদ্র মহিলা কি ভদ্রলোক সেজে ফটো তুল্‌তে পারে না কোনদিন?"

"এঁ্যা!"—বিস্ময়ে অলকেন্দু একেবারে একটা অস্বাভাবিক শব্দ ক'রে উঠ্‌ল।

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ—দিন রাত তো ওই মুখখানি বুকের মধ্যে আঁকড়ে রেখে দিয়েছ—তবু ধরতে পারলে না?"

লজ্জায় অলকেন্দু মাথা নীচু করলে—সত্যি দিদি মাঝে মাঝে এমন একেকটা কথা বলেন—ছি-ছি অলকেন্দু এ্যালবাম উল্‌টে চল্‌ল।

গার্গীর হাসি তখন অনেকটা ক'মে এসেছে। বল্‌লে, "আভা শুন্‌লে কি বল্‌বে বল দেখি?"

অলকেন্দু আর যে সহজে মাথা তুল্‌বে, সে-রকম কোনও লক্ষণই পাওয়া গেল না, এ্যাল্‌বামের পাতাগুলোই যেন আজকের এই অপ্রস্তুত হওয়ার বড় কারণ—কি যে করবে অলকেন্দু তখনও ঠিক করতে পারল না।

খানিকটা সময় কাট্‌ল।

গার্গী আরও কাছে এগিয়ে এল, হাতটা ধ'রে কোলের কাছে টেনে এনে বল্‌লে, "রাগ কর্‌লে ভাই?"

"কি হল তোদের আবার—" আস্তে আস্তে আভা এসে ততক্ষণে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে, "কে রাগ কর্‌ল হঠাৎ?"

আভাকে দেখে গার্গী আবার হাসিতে ফেটে পড়ল—অলকেন্দু ততক্ষণে গার্গীর হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়েছে, বল্‌লে, "না—না, দেখ না দিদির যত সব কাণ্ড—হুঁ:, রাগ করতে যাব কেন?" অলকেন্দু সোজা হ'য়ে চেয়ারটার ওপরে বস্‌লে। "এই দিদি যত সব মিছি মিছি ক'রে বল্‌ছেন আর কি?"

"বা-রে" গার্গী অলকেন্দুর দিকে চাইলে, "সত্যি বল্‌ছ তুমি রাগ করোনি? আর সেই জন্যেই বুঝি চুপ ক'রে ছিলে এতক্ষণ?"

আভা বল্‌লে, "ব্যাপার কি, এখানে এসেই রাগারাগির পালা আরম্ভ ক'রে দিয়েছে নাকি?—দেখিস্, অনুরাগ নয়তো এটা, কিংবা পূর্ব্বরাগ?"

গার্গী হো-হো ক'রে হেসে উঠ্‌ল, বল্‌লে "যা বলেছিস, রাগারাগি ঠিকই, তবে অনুরাগ কি পূর্ব্বরাগ এখনও প্রমাণ হয় নি—"

"যা—ও, তোমরা ভারী ইয়ে—মানে আপনি দিদি, —আপনাদের সংগে সত্যি, আর কথা বলাই চল্‌বে না দেখ্‌চি।"

গার্গীর তখনও হাসি থামেনি, আভা বল্‌লে "খালি হাস্‌ছিস্‌ই তো—ব্যাপারটা কি?"

"আরে তোর সেই শিলংয়ের ফটোটা রে, সেই চেরা'তে গিয়ে যেটা তুলিয়েছিলি!"

আভা এবারে সমস্ত ব্যাপারটা প্রায় আন্দাজ ক'রে নিয়েছে, বল্‌লে, "ও ধরতে পারেনি বুঝি ?"

"সেই কথা বল্‌তেই তো এত রাগ বাবুর" গার্গী আবার হেসে ফেল্‌লে। আভাও হাস্‌তে আরম্ভ ক'রেছে ততক্ষণে।

"বলেছিলুম—" গার্গী বল্‌লে, "দিনরাত ওই মুখখানাই তো বুকের মধ্যে আঁকড়ে রেখেছ, ধর্‌তে পারলে না অলক ?—আর যায় কোথা ?"

"না—দিদি, আপনি সব যা-তা বল্‌ছেন, সত্যি আমি একটুও রাগ করিনি" অলকেন্দু উঠে দাঁড়াল। "আচ্ছা এখন যাই—একবার ভবানীপুরে যেতে হ'বে কিনা—"

"আরে রাখ তোমার ভবানীপুর" গার্গী অলকেন্দুর হাত ধ'রে আবার বসিয়ে দিলে, "কটায় ট্রেণ আগে তাই বল—সেই হিসেবে ছাড়া পাবে এখান থেকে।"

"সে দিকে তোর সুবিধে আছে গার্গী" আভা বল্‌লে "সকালের ট্রেণে আর হল না—দুপুরেরটাতেই যাচ্ছি।"

"ব্যস্‌—তবে তো আর কথা নেই—ব'স চুপ ক'রে—চা আস্‌ছে তোমার জন্যে—"

"না, সত্যি দিদি—আপনি বুঝ্‌ছেন না; একটা এন্‌গেজমেণ্ট আছে কিনা—না গেলে সত্যিই—" অলকেন্দু এখন কোন রকমে বাইরে এসে দাঁড়াতে পারলে বাঁচে।

"থাকবে তোমার এন্‌গেজমেণ্ট—এতদিন এখানে রইলে—কদিন আমার কাছে এসেছ বল দেখি ?"

"না—না, সত্যি—আচ্ছা, আমি কাজটা সেরেই এখানে আস্‌ব—আমাকে বিশ্বাস করুন।"

গার্গী হেসে ফেল্‌লে, বল্‌লে, "ঠিক বল্‌ছ ?"

"ঠিক—"

"আচ্ছা যাও—কথাটা মনে থাকে যেন শেষ পর্য্যন্ত।"

"খুব থাক্‌বে—দ্রুত পাদবিক্ষেপে অলকেন্দু রাস্তায় এসে দাঁড়াল।"

গার্গী বিছানার ওপরে এলিয়ে পড়ল, বল্‌লে, "ভারী লাজুক—আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, কি ক'রে যে তুই ওর সংগে আছিস্‌, আশ্চর্য্য লাগে খুব!"

"মোটেই নয়—" আভা বল্‌লে, "ওর গৃহভ্যন্তরের মূর্তি যদি দেখ্‌তিস্‌, তা'হলে এ কথা ভাব্‌তেও পারতিস্‌ না। বাবাঃ—একদিন আমার হাতটা ধ'রে টেনে নিয়ে হঠাৎই বল্‌ল—'আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরি ?—' আমি তো অবাক্‌, এর মধ্যেও কবিতা আছে, এ কথা কি ঘুণাক্ষরেও আগে জান্‌তে পেরেছি ? ওদের জাতের মধ্যে ও একটা 'টাইপ'—বাইরে ওই রকম ভিজে বেড়াল বটে, কিন্তু ভেতরে, উঃ—"

"উপমাটা কিন্তু খুব সম্মানজনক হল না"

"রাখ তোর উপমা, সারাটা দিন যতক্ষণ কাছে থাক্‌বে, কি জ্বালাতনই যে করবে তার সীমা নেই! তার জন্যে আবার বেছে বেছে ভাল উপমা বের করবে—তুইও যেমন! হ্যাঁ তারপর" আভার প্রয়োজনীয় কথাটা মনে পড়ল, "পড়েছিলি চিঠিটা ?"

গার্গীর সমস্ত মুখে যেন একটা ম্লান, নিষ্প্রভ ছায়া নেমে এল, একটু চুপ ক'রে থেকে বল্‌লে, "পড়লাম—কিন্তু ও আলোচনায় আর কি হ'বে বল ?"

"কিছু হ'বে বলে'ই তো প্রসংগটা উত্থাপন করলাম, ব্যাপারটা কতখানি ঘোরাল, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিস্‌?"

"কিন্তু আমার মনে হয়, যা হ'বেই তাকে নিঃসংশয়ে হ'তে দেওয়াই ভাল। অনর্থক কতগুলো অসার চিন্তা ক'রে সময়কে হত্যা না করাটাই যুক্তিপূর্ণ মনে হয়।"

"কথাটা ও-রকম ঘোরাস্‌নি, ও যাচ্ছে কবে ?"

"চৌঠা সেপ্টেম্বর—"

"হুঁ, এখন সম্পূর্ণ-ই হাতের বাইরে—"

"হাতের মধ্যে থাক্‌লেও আমি এই রকম সহজে ওকে ভাস্‌তে দিতাম—কারও মতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার লোভ আমার নেই আভা!"

"সে জানি—জানি বলেই তো এই ভয় ক'রে এসেছি এতদিন—"

"তুই ভাবিস্‌ না" গার্গী উঠে দাঁড়াল, "দাঁড়া, চা-ট নিয়ে আসি—" তারপর একটু থেমে বল্‌লে, "ভেবে যখ কিছুই হবে না, তখন অনর্থকই নিজেদের আমরা কষ্ট দিই এই সহজ বোধ—এই সহজ আত্মচেতনা থাকাটায়ই বিশে প্রয়োজন আমাদের—পশ্চিম দিগন্তের ক্ষণকালীন রঙী

মেঘের মতই ও চিন্তা ব্যর্থ—আমি বলি, যখন অতি সহজেই আমি নিজে এ জিনিষটাকে পার হ'য়ে আস্‌তে পার্‌লাম, তখন তুইও ছাড়—কেন এই মানসিক অশান্তি? সমস্ত পৃথিবীতে আমার অনেক কাজ ছড়িয়ে আছে—অনেক কর্তব্য—দুদিনের মোহ এসে যদি তাকে ভেঙে দেয়, তবে তা'র থেকে অগৌরবের কিছু থাক্‌বে নাকি আমাদের জীবনে?"

"সবই বুঝলাম" আভা একটু ম্লান হাস্‌লে, "কিন্তু যত সহজে তোর পরিকল্পনা গঠিত হ'ল, ঠিক তত সহজেই তা কর্মক্ষম হ'বে কিনা, সেইটাই বিচার্য্য!"

"সে কথা ঠিক—কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি হ'তেই বা দেবো কেন সেই একই কারণে?" গার্গী উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না ক'রেই সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল।

সে-কথাও আভা বোঝে! তার গার্গীর সংগে এই দীর্ঘ দিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে, আভা বরং অতি সহজেই গার্গীকে ধ'রে ফেলেছে—তার মন, তার চিন্তা, কিছুই আভাকে এড়িয়ে যেতে পারবে না—কোনদিনও না। কিন্তু আজকের গার্গীর এই ঔদাসীন্য, এই ঘোরাল ভাষণ, আভাকে একটু সন্দেহের মধ্যে ফেল্‌লে, হয়তো এত সহজে না হোক, অপেক্ষাকৃত সহজে গার্গীর মনে এই ঔদাসীন্য জেগেছে—এর জন্যে অবশ্য গার্গীর অস্থিরমতি মনই দায়ী, কিন্তু সে দোষও কি তাকে দেওয়া যায়? শেষ পর্য্যন্ত গার্গী রক্তমাংসে গঠিত মানুষই তো! এ রকম হওয়াই স্বাভাবিক—সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলা যায়!

কিন্তু তবু আভা গার্গীর মত অত সহজে চিন্তাটাকে এক পাশে সরিয়ে রাখার কথা ভাব্‌তে পারলে না। তবু তার মনে হল গার্গী এখানে একটু অভিনয় করেছে—মনে প্রাণে তার এই একমাত্র অন্তরের কথা নয়—তারও নীচে, তারও গভীরে কোন এক অকথিত বাণী নিরন্তর ফেনোচ্ছ্বাসে গর্জমান; যে-কোন মুহূর্তেই, সুযোগ এলেই হয়তো তা' ফেটে পড়বে!

তবে একটা সুবিধে, গার্গীর সেই অন্তর্দাহী রূপ সকলের চোখে পড়বে না। ওপরটা সে ভারী চমৎকার একটা কঠিন আবরণ দিয়ে ঘিরেছে—জ্ব'লে পুড়ে সে ভেতরেই নিঃশেষ হ'য়ে যাবে—মুখে তার তখনো সেই হাসি লেগে থাক্‌বে—সেই হাসি! আভার মনে হ'ল এটাই মর্মান্তিক—এর থেকে গার্গী যদি বাইরে চোখের জল ফেল্‌তে পারত, তা'হলে অনেকটা ভাল ছিল, অনেকটা সান্ত্বনার বিষয় হ'ত, ভেতরে ভেতরে নিরন্তর এই জ্বলে যাওয়াটাই কেমন পাশবিক—কেমন ভয়াবহ!

গার্গী চা নিয়ে ফিরে এল। টেবিলের ওপরে ট্রেটা নামিয়ে বল্‌লে, "মিছিমিছিই নিজেকে কষ্ট দিচ্ছিস্ আভা, যা ভাঙলোই, তাকে আবার জোড়া দিয়ে একটা কলঙ্ক-রেখা সৃষ্টির প্রয়াসের মূল্য কি? নে ধর—" গার্গী একটা কাপ আভার দিকে এগিয়ে দিলে।

"আজ সমস্ত পৃথিবীর মাটীকে অনুভব করবার দিন এসেছে আভা, আকাশচারী মন আর রঙীন স্বপ্ন নিয়ে এই ঘোরাল রাজপথের পথ চলার বিপদ আজ আমরা বুঝতে শিখেছি—যে কোন মুহূর্তেই আমাদের জীবন মোটরের চাকায় আত্মসমর্পিত হ'তে পারে। কিন্তু সেই সম্ভাবনাকে নাই বা প্রশ্রয় দিলাম আমরা" একটু থেমে গার্গী বল্‌লে "কয়েক দিন থেকেই কথাটা আমার মনে জেগেছে—কয়েক দিন থেকেই কথাটার মধ্যে একটা সুগভীর তৃপ্তি পাচ্ছি, তুই আমাকে জানিস্—অন্তর দিয়েই জানিস্, আমাকে ভুল বুঝবার মত ভুল তোর হবে না, এ নিশ্চয়ই আশা করি।" গার্গী চায়ের কাপে ঠোঁট ছোঁয়াল, "জীবনে কত ঝড়—কত ঝঞ্ঝাই তো আস্‌বে—এই বয়েস থেকেই যদি সেই ঝড় আর ঝঞ্ঝায় ক্ষয় হ'তে থাকি, তাহ'লে আরও কতদিন আমাদের পৃথিবীতে থাকা সম্ভব হবে? এত দুর্বল, এত ভঙ্গুর আমরা নই, এটা মনে রাখিস্!"

"সবই বুঝতে পারছি" আভা হঠাৎ কথা কইলে, "তবু তোকে বাঁচতে হ'বে, তার জন্যেও একটা পথ দরকার—একটা অবলম্বন—তোর যে হাঁট্‌তে হ'বে গার্গী?"

"ভাবছিস্ আমার তা' নেই?" সে সঞ্চয় আমি অনেক দিন থেকেই ক'রে রেখেছি—অনেক দিন থেকেই এর আয়োজন আমার সম্পূর্ণ—সমস্ত জীবনটাকে আমি রেখায়িত ক'রে নিয়েছি—যথাসময়ে, যথাযথভাবে পদপাত ক'রে অগ্রসর হ'লেই চল্‌বে।—হ্যাঁ ভাল কথা" গার্গী হঠাৎ কথাটা ঘোরালে, "তোর তো সকালে যাওয়া

হ'লই না—কুমারীকল্যাণের আজ দশটায় একটা সাধারণ অধিবেশন আছে—মঞ্জুদি তোকেও নিয়ে যেতে বলে-ছিলেন—অবশ্য যদি সময় হয়।"

"মঞ্জুদি ফিরেছেন এর মধ্যে ?"

"সে তো অনেক দিন—দিল্লীর কাজ খুব ভালভাবে শেষ ক'রে এসেছেন—এখন কাশীতে আর একটা শাখা গড়বার কথা চল্‌ছে—সেইটের জন্যেই আজকের জরুরী অধিবেশন, ওমা তোকে বল্‌তেই ভুলে গেছি একেবারে, দিল্লীর ওখানকার তত্ত্বাবধায়িকা তুই, তোকেই ঠিক ক'রেছেন!"

"মঞ্জুদির পাগলামী আজও গেল না দেখচি—" আভা হেসে ফেললে—বল্‌লে, "আমাকে এখনও সঙ্ঘের মধ্যে রাখার কোন সামান্য অর্থও আছে নাকি ?"

"নিশ্চয়ই আছে—মঞ্জুদির নির্বাচনে তোর আজও সংশয় আছে আভা ?"

"না—তা' বল্‌ছি না ঠিক—তবে আমার সময় কোথায় বল ? যতদিন বন্ধনমুক্ত ছিলাম, ততদিন প্রাণপণেই কাজ ক'রে এসেছি—আজ আমার সাম্‌নে যে তার থেকে আরও বড় দায়িত্ব পথ রোধ ক'রে দাঁড়িয়েছে—তাকে অস্বীকার ক'রে আমার সময় ক'রে নেওয়ার অস্বাচ্ছন্দ্য আছে গার্গী।"

"কিন্তু তুই না এলে এ কাজ অসম্পূর্ণ থাক্‌বে—অবশ্য তোর সংগে শিপ্রাও সহযোগিতা করতে পারবে—সে ত আজকাল ওখানে আছে কিনা—কিন্তু তুই না হ'লে কি ক'রে চল্‌বে বল—" অনুনয়ে গার্গী যেন একবার মুহূর্তের জন্যে শিথিল হ'য়ে পড়ল "মঞ্জুদিকে অপমান করিস্‌ না আভা—"

এবারেও আভা হাস্‌ল, বল্‌লে, "তা' আমি প্রাণ থাক্‌তে হ'তে দিতে পারব না—তাঁর অসম্মান আমি যেন কোন দিনই সহ্য করতে না পারি—তবে হয়তো যত ভালভাবে আমার করবার শক্তি আছে, ঠিক তত ভালভাবেই আমি ক'রে উঠ্‌তে পারব না—তার জন্যে মঞ্জুদি নিজেই দায়ী।"

গার্গী চুপ ক'রে রইল কিছুক্ষণ, তারপরে হেসে বল্‌লে, "এতখানি অপবাদ দিচ্ছিস্‌ আভা ?"

"অপবাদ নয়, অপভাষণ বল্‌তে পার—তাঁর নামে অপবাদ দেওয়ার সাধ্য আমার কোনদিনই হ'বে না।"

"নে, চা-টা যে ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল" গার্গী চায়ের কাপটা আভার দিকে এগিয়ে দিলে—"যদি যাস্‌, তা' হ'লে আর বেশী সময় নেই কিন্তু" একটু থেমে বল্‌লে, "তুই বস্‌, আমি আস্‌ছি কাপড়টা বদ্‌লে।"

গার্গী সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল। (ক্রমশঃ)

ফাঁকি

শ্রীস্মৃতিময়ী দেবী

বল্‌ব ভাবি অনেক কথা,
পারি না তা' বল্‌তে ;
চল্‌ব ভাবি অনেক দূরে
পারি না আর চল্‌তে।

করব ভাবি অনেক কিছু
কেমনে তা' করব।
সমস্যাতে কেমন করে'
মায়া-মৃগ ধরব।

যাবার দিনে দেখ্‌ব চেয়ে
বাকি সবই রইল,
বুঝ্‌ব তখন জীবনটা মোর
ফাঁকির বোঝা বইল।

জ্যোতিষীর দৃষ্টিতে হের হিটলার

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী, জ্যোতিষ সিদ্ধান্তাচার্য্য

জগতে কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইয়া উত্তম, মধ্যম ও নিকৃষ্ট—সাধারণতঃ এই তিন প্রকার তারতম্য দেখা যায়। আবার এই তিন প্রকার তারতম্য—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালের সংযোগ হইতে প্রকাশ পায়। অতএব এই সকল জগৎ কালের অধীন। আবার এই কাল—সূর্য্য, চন্দ্র ও পৃথিব্যাদির সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইয়া উহাদের পরস্পর গতি-বিশেষ হইতে উৎপন্ন হয়। এই সূর্য্য-চন্দ্রাদি গ্রহ বিশ্বশক্তির নিয়মে নিয়ন্ত্রিত।

ঈশ্বর সৃষ্টি বিষয়ে যেরূপ স্বতন্ত্র, জীবও তদ্রূপ আপন কার্য্য বিষয়ে স্বতন্ত্র হয়। জীব যেরূপ কার্য্য করে, তদ্রূপ ফল ভোগ করিয়া থাকে। ইহাই সৃষ্টি-ক্রম বলিয়া জগতের গতি-নিয়ামক হইয়া থাকে।

অতএব বিশ্বনিয়মে ছন্দায়িত হইয়া গ্রহচক্র জীবের শুভাশুভ কর্ম্মফল নির্ণয় করে। এক কথায় জ্যোতির্বিজ্ঞান সাহায্যে মানুষের ভবিষ্য জীবন যেমন নিখুঁতভাবে বলা সম্ভব হয়, তেমন আর কিছুতেই সম্ভব নয়।

জার্ম্মাণ রাজ্যের বর্ত্তমান রাষ্ট্রনায়ক এড্‌লফ্ হের হিটলারের স্বরূপ জানিতে হইলে জ্যোতিঃশাস্ত্রকে কেন্দ্র করিতে হইবে। কারণ জ্যোতিষ-বিদ্যা স্বরূপজ্ঞানের প্রধান উপায়। প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রভৃতি দ্বারা যাহা জানা যায় না, জ্যোতিঃশাস্ত্র দ্বারা উহা জানা যায়। "হিটলার" স্বয়ং এই জ্যোতিষ বিদ্যার তাৎপর্য্য জানিয়া ইহার সাহায্যে রাজনীতির পরিচালনা করিয়া থাকেন। অতএব আর্য্য জ্যোতিঃশাস্ত্রের সাহায্যে তাঁহার জন্মকুণ্ডলী এখানে বিচার করা হইতেছে।

হিটলারের জন্ম-সময়

শকাব্দ ১৮১১ বঙ্গাব্দ ১২৯৬ খৃষ্টাব্দ ১৮৮৯ তাঃ ২০শে এপ্রেল, ৮ই বৈশাখ সন্ধ্যা ৬।২২ মিনিট। জন্মস্থান—ব্রাউনাউ (অষ্ট্রীয়া) অক্ষাংশ ৪৭°২৯′ উঃ দেশান্তর ১১°৩০′ পূঃ।

হিটলারের জন্মকালীন লগ্ন ও গ্রহগণের অবস্থান

লগ্ন ৬।৩।১০ র ০।৮।৩২ চ ৮।১৪।১৮ ম ০।২৪।৬ বু ০।৩।২৩ বৃ ৮।১৫।৫৮ বক্রী শু ০।২৪।২৫ শ ৩।২১।১০ রা ২।২৩।৪৭।

জন্মকালীন ভোগ্য নাক্ষত্রিকী রাশি ও দশা

কৃষ্ণপক্ষে রবির হোরায় জন্মহেতু নাক্ষত্রিকী দশার মধ্যে বিংশোত্তরী দশাধিকারে ফলচিন্তা করাই শাস্ত্রসঙ্গত। এতদনুসারে শুক্রের ভোগ্য দশা ১৮ বৎসর ৬ মাস ১৮ দিন। অর্থাৎ খৃঃ ১৯০৭ অব্দের ৮ই নবেম্বর পর্য্যন্ত ছিল।

অষ্টোত্তরী-রাশি দশা অর্থাৎ নবাংশ দশা অনুসারে মেষের ভোগ্য দশা ৮ বৎসর ২৬ দিন। অর্থাৎ খৃঃ ১৮৯৭ অব্দের ১৬ই মে পর্য্যন্ত ছিল।

ষন্নবতি—রাশিদশা অর্থাৎ চর পর্য্যায় দশানুসারে মেষের ভোগ্যদশা ৬ বৎসর ৩ মাস ১০ দিন। অর্থাৎ খৃঃ ১৮৯৫ অব্দের জুলাই পর্য্যন্ত ছিল।

নেপোলিয়নের সহিত হিটলারের প্রভেদ

নেপোলিয়ন বোনাপার্টের মৃত্যুর ৬৭ বৎসর ১১ মাস ১৫ দিনের পর হিটলারের জন্ম হয় এবং উভয়েরই এক লগ্ন এবং শনি এক রাশিতে অবস্থিত। বোনাপার্টের রবি, মঙ্গল এবং বুধ ও শুক্র পৃথক্ রাশিতে ছিল। কিন্তু হিটলারের উক্ত চারি গ্রহ এক রাশিতে থাকিয়া যোগজ ফলের সৃষ্টি করিয়াছে। বোনাপার্টের রবি স্বক্ষেত্রে মঙ্গলযুক্ত ছিল; হিটলারের মঙ্গল স্বক্ষেত্রে উচ্চস্থ রবিযুক্ত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে তদপেক্ষা বলবান্ হইয়াছে।

বোনাপার্টের মন্ত্রণাধিপতি শনি ব্যয়পতি বুধযুক্ত ও লগ্নে বৃহস্পতি বিশাখা নক্ষত্রে থাকায় জীবনে শেষ মন্ত্রণা সিদ্ধি হয় নাই। কিন্তু হিটলারের মন্ত্রণাধিপতি শনি পৃথক্ ভাবে অবস্থিত এবং বৃহস্পতি স্বক্ষেত্রে থাকায় তদ্রূপ হইবার সম্ভাবনা নাই; ইঁহার জয়-পরাজয় নির্ভর করে যোগজ শক্তির উপর।

হিটলারের যোগজ ফল

হিটলারের যোগজ ফলই তাঁহার জীবনকে এত দূর প্রভাবশালী করিয়াছে। একমাত্র রাহু ভিন্ন অপর ৮টী গ্রহই যোগজ ফলদাতা, এইজন্য যোগজ বা পুঞ্জীকৃত শক্তিই তাঁর জয়লাভের একমাত্র কারণ। মন্ত্রণাধিপ শনি স্বতন্ত্রভাবে পুষ্যা নক্ষত্রে অর্গলযুক্ত থাকায়—শনি একাই যোগজ ফল দাতা হইয়াছে। কারণ—

পুষণমিয়ং বৈপুষেরং হীদং সর্বং পুষ্যতি
যদিদং কিঞ্চ। মাধ্যঃ ১।৪।১২
অথ যদ্রশ্মিপোষং পুষ্যতি তৎ পুষা ভবতি।
নিরুক্ত ১২।১৬।২

উল্লিখিত শ্রুতি-প্রমাণের অভিপ্রায় এবং বিচার-সঙ্কেত সকলের বোধগম্য না হইলেও, বোনাপার্টের অপেক্ষা ইঁহার শনি বলবান্ জানিতে হইবে। অপ্রকাশ্য সঙ্কেত হেতু যদি শনির বলবত্তা ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলেও নিম্নোক্ত বিশিষ্টতা আছে।

বর্ত্তমানকালের রণদেবতা বা দৈত্য-শক্তির প্রকাশ

লগ্নপতি শুক্র আত্মকারক হইয়া নৈসর্গিক আত্মকারক বলবান্ রবিযুক্ত—রবি স্বপ্রকাশস্বরূপ হয়। অতএব এতাদৃশ শুক্র স্বক্ষেত্রস্থ মঙ্গলযুক্ত হইয়া পুনরায় উক্ত মঙ্গলের মুখ্যক্ষেত্র বৃশ্চিক রাশির নবাংশে অবস্থিত থাকায়, দৈত্যাচার্য্য শুক্রের পূর্ণশক্তির বিকাশ হইয়াছে। আবার ঐ শুক্র দেবগ্রহ রবিযুক্ত এবং বৃহস্পতি-দৃষ্ট;—এইজন্য ইঁহার অদম্য প্রকৃতি, প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়তা, কর্ত্তব্যকার্য্যে হৃদয় পাষাণের ন্যায় দুর্ভেদ্য, রণে উল্কার ন্যায় এবং শত্রুনাশে দুর্দ্ধর্ষ শক্তির প্রকাশ হইবে। কারণ আত্মকারক গ্রহ রাজার সমান এবং অমাত্যকারক গ্রহযুক্ত হইয়া আত্মকারক গ্রহরাজের বলবৃদ্ধি করিয়াছে। আবার ঐ আত্মকারক গ্রহ বৃশ্চিক রাশির নবাংশে অবস্থিত। "বৃশ্চ" ধাতুর উত্তর "কিকন্" প্রত্যয় করিয়া বৃশ্চিক শব্দ সিদ্ধ হয়।

"বৃশ্চতি ইতি বধ কর্ম্মসু পঠিতম্।"
নির্ঘণ্টুঃ ৩।১০।৪

"ব্রশ্চতি বধতীতি বৃশ্চিকঃ" অর্থাৎ সংগ্রামে বিস্তৃত ভাবে হননশীল সামর্থ্য থাকায় বৃশ্চিক নাম হইয়াছে; ইহা রাশিচক্রের নিধনগত রাশি। এইজন্য ইঁহার আদেশ মাত্রেই বহু লোক জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া নরমেধ যজ্ঞের আহুতিস্থানীয় হইবে এবং ইনি বহু লোকের নাশকারী হইবেন। উক্ত আত্মকারক গ্রহ শুক্র নিধনপতি হওয়ায়, সংগ্রাম হেতু তিনি স্বয়ংও নিধনপ্রাপ্ত হইবেন। মারক বিচারে অমাত্যকারক মঙ্গল প্রাণী রুদ্ররূপে নির্দ্দিষ্ট হইবে।

গ্রহগণের অবস্থানভেদে শুভাশুভ যোগের বিবরণ

শনি এবং রাহু ভিন্ন অপর সাতটী গ্রহ তৃতীয় ও সপ্তম স্থানে যোগ করিয়াছে। অতএব "তৃতীয়ে চান্নদা মতা" এবং "দেবজ্ঞেয়াশ্চ সপ্তমে" ইত্যাদি পরাশরোক্ত বচনানুসারে তৃতীয় ও সপ্তমস্থানস্থ যোগ "অন্নদা" এবং "দেব" নামক শুভফলদাতা। উহার মধ্যে রবি, মঙ্গল, বুধ ও শুক্র, এই চারি গ্রহ সপ্তম স্থানে মেষ রাশিতে থাকায় ফল এই যে—

মেষ ইতি ভূতোপমা—"মেষোভূতো-
ভিয়ন্নয়ঃ" (ঋগ্বেদ ৫।৭।২৪।৫) মেষো
মিষতেঃ তথা পশুঃ পশ্যতে"
নির্ঘণ্টুঃ ৩।১৬।৭

অর্থাৎ উক্ত চারি গ্রহ মেষ রাশিতে থাকায়, ইঁহার জীবনের প্রত্যেক কার্য্য ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির উপর নির্ভর করে এবং স্বয়ং দ্রষ্টৃস্বরূপ হইয়া দৃশ্য কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিবেন—অপরকেও করাইবেন। এতদ্ভিন্ন চন্দ্র, বৃহস্পতি ও কেতু, এই তিন গ্রহ ধনু রাশিতে থাকিয়া যোগকারী হইয়াছে। ইহার ফল—

ধনুর্ধন্বতে গতি কর্ম্মণঃ, বধকর্ম্মণোবা,
ধন্বন্ত্যস্মাদিষবঃ। নিরুক্ত ৯।১৬।২

অর্থাৎ তৃতীয়-পতি বৃহস্পতি ও দশম-পতি চন্দ্র কেতু সহ ধনু রাশিস্থ হওয়ায়, ইঁহার চিন্তাশক্তি অত্যন্ত তীব্র এবং কার্য্যশক্তি অতীব দ্রুতগতিসম্পন্ন ও শত্রুনাশ অত্যন্ত স্বাভাবিক হইয়া থাকে।

প্রধান যোগ

হিটলারের জন্মলগ্নের দশমপতি চন্দ্র বৃহস্পতিযুক্ত হইয়া জীব-চন্দ্র যোগ হইয়াছে এবং ঐ বৃহস্পতি অমাত্য-কারক মঙ্গলকে দৃষ্টি করায় প্রধান যোগ হইয়াছে। আবার আত্মকারক গ্রহ—কারক গ্রহযুক্ত থাকায় তীব্র বুদ্ধি ও সেনাধীশ যোগ করাইয়াছে।

গ্রহগণের যোগজ অবস্থান দ্বারা লোমশোক্ত পুষ্কল-লাভযোগ, রাজভৃত্য, চম্পূক, অমাত্য, দারুণ কর্ম্ম, রাজ-যোগ, পত্নীহীন যোগ, ভাগ্য ব্যয়, ভূমিদ্রব্য, ঋণব্যয় এবং বিত্তহানি ইত্যাদি ক্রমে দ্বাদশ প্রকার যোগ হইয়াছে।

এই সকল যোগের মধ্যে—ভাগ্যব্যয়, ঋণব্যয়, বিত্তহানি ও দারুণ কর্ম্ম প্রভৃতি অশুভ যোগ থাকায়, জীবনের প্রথম ভাগে দুঃখ বা দুর্দ্দশা ভোগ হইয়াছে। কিন্তু অমাত্যাদি শুভযোগ থাকায়—জীবনের মধ্যভাগ হইতে লোকসমাজে ক্রমশঃ তাহাপেক্ষা সম্মান ও প্রতিষ্ঠালাভেরও সুযোগ হইয়াছে। যথা—

স্বক্ষেত্রেঽথ চ মধ্যে বা বার্দ্ধক্যে দ্বিজসত্তম।
ক্রমেণ ভাগ্যবৃদ্ধিঃ স্যান্নৃপবেশোঽথবা ভবেৎ।

উল্লিখিত দ্বাদশ যোগের অন্তর্গত রাজযোগ ভিন্ন স্বতন্ত্র রাজযোগ এবং মহারাজযোগ আছে। যথা—

লগ্নারূঢ়ং দারপদমিথঃ কেন্দ্রগতং যদি।
ত্রিলাভেবা ত্রিকোণেবা তথা রাজাঽন্যথাধমঃ।

অর্থাৎ লগ্নারূঢ় ও জায়ারূঢ় উভয়েই কেন্দ্রস্থানে থাকায় রাজযোগ হইয়াছে।

ভাগ্যেশাৎকারকে লগ্নে পঞ্চমে সপ্তমেঽপি বা।
রাজযোগ প্রদাতারৌ গজবাজিধনৈরপি।

নবমপতির স্থিত রাশি হইতে পঞ্চমে কারক লগ্ন হওয়ায়—হস্তী, অশ্ব ও ধনাদিবিশিষ্ট রাজযোগ হইয়াছে।

হিটলারের লগ্ন দ্বিতীয় ও একাদশপতি কেন্দ্রে থাকায় "সদাফল" নামক যোগ হইয়াছে। এই যোগ লাভদায়ক হয়। এতদ্ভিন্ন শ্রীবৎস পদ্মরাগ এবং কামধেনু নামক যোগ—রাজযোগের অন্তর্গত। "সার্ব্বভৌম" যোগ মহারাজযোগ-সূচক। এতদ্ভিন্ন বশিষ্ঠজাতকোক্ত স্বতন্ত্র মহারাজযোগ আছে। যথা—

লগ্নেঽথ সপ্তমে বাপি লগ্নেশে সপ্তমাধিপে।
পুত্রাত্মকারকৌ বিপ্র। লগ্নে বা সপ্তমেঽপি চ।
সম্বন্ধে বীক্ষিতে তত্র দৃষ্টেৎবং পঞ্চমাধিপে।
উচ্চাংশে বা নীচাংশেস্থে শুভগ্রহ নিরীক্ষিতে।
মহারাজেতি যোগাঽয়ং সৈবজাত সুখী নরঃ।
গজবাজিরথৈর্যুক্তো সেনাসঙ্ঘসনেকধা।

ইহা পারাশার ও জৈমিনী সূত্রের বচন। অর্থাৎ চন্দ্র পুত্রকারক এবং শুভ গ্রহ বৃহস্পতি উপগ্রহ (মাতৃকারক) যুক্ত হইয়া সপ্তমস্থ লগ্নপতি ও সপ্তমপতিকে দৃষ্টি করায় মহারাজযোগ হইয়াছে। "বিচার্য্যমান পদার্থস্ত দৃষ্ট্যাত্মকং জ্ঞেয়ম্" ইতি ন্যায়াৎ যে ভাবের বিচার করা যায়, সেইভাবে যে গ্রহ দৃষ্টি করিবে, সেই দৃষ্ট্যাত্মক ফলও জানিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন আত্মকারক গ্রহ অমাত্যকারক গ্রহযুক্ত হওয়ায়, আত্মকারক গ্রহ অধিক বলবান্ হইয়াছে।

মহারাজযোগ সত্ত্বেও রাজ্যভোগের অভাব

পঞ্চমপতি ও নবমপতি গ্রহ পরস্পর সম্বন্ধ করিয়া ৩।৪টী বর্গবলে বলী না হইলে বাহুবলে রাজ্যলাভ করিলেও, স্বয়ং ভোগ করিতে সমর্থ হওয়া যায় না। কিম্বা পঞ্চমপতি ৩।৪ বর্গবলে বলী হইলে রাজ্যভোগ হয়—নতুবা হয় না। এই জন্য হিটলারের উক্ত যোগের অভাব হেতু তাঁহার পক্ষে দেশজয় করিয়া আত্মসাৎ করা সম্ভব নহে এবং করিলেও উহা আশু বিনষ্ট হইবে। অতএব দেশ জয় করিয়া তত্তৎ দেশবাসী লোকদিগকে অধীন করা তাঁহার গ্রহগণের প্রতিকূল কার্য্য হইবে।

অসাধারণ বাগ্মিতাযোগ

বাক্পতি মঙ্গল অমাত্যকারক হইয়া কেন্দ্রে স্বক্ষেত্রে রবিযুক্ত এবং নৈসর্গিক বাক্পতি বৃহস্পতি দ্বারা দৃষ্ট, আবার ঐ বাক্পতি মঙ্গল, লগ্নপতি শুক্র আত্মকারকের সহিত যুক্ত এবং উক্ত আত্মকারক শুক্র বাক্স্থানের নবাংশে অবস্থিত থাকায়, ইঁহার বাক্য সকল তেজঃপুঞ্জ; এবং প্রত্যেক শব্দ স্পন্দনবিশিষ্ট ও প্রত্যেক শব্দে আত্ম-শক্তির স্ফুরণ জন্য গভীর এবং অন্যের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া আকৃষ্টকরণে সক্ষম হয়। অথচ বাক্য পরিমিত। কিন্তু অল্প কথায় গভীরবিষয়বোধক। এই জন্য ইনি যখন যে বিষয় লইয়া বক্তৃতা করিবেন, শ্রোতৃবর্গের তখন সেই বিষয়ই মনের স্তরে আঘাত করিবে এবং সেই ভাব তখন জাগিয়া উঠিবে।

কখন পরামর্শসভার আহ্বান করিলে, উহাতে স্বীয় প্রভাবেরই স্ফুরণ হইবে। সুতরাং উহা কেবল দেশ বা জাতীয়তাসূত্রে সাধারণের তৃপ্তি বা সন্তোষার্থেই অনুষ্ঠিত হইবে। এইরূপ প্রত্যেক কার্য্যেই স্বতন্ত্র ভাব প্রকাশ পাইবে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, পঞ্চমপতি শনি একাই সর্ব্ব প্রকার যোগের কারক হইয়াছে। এই জন্য যে কোন বিষয় লইয়াই তর্কযুক্তি উপস্থিত হউক না কেন—উহা

অল্প সময়ের মধ্যেই সিদ্ধান্ত করিতে সক্ষম হইবেন। কিন্তু পৃথিবীর যে কোন মনীষী ব্যক্তির যুক্তি, পরামর্শ বা উপদেশ নিজের অনুপযোগী হইলে, উহার খণ্ডন করা স্বাভাবিক হইবে।

স্বকৃত কর্ম্মই ইঁহার বন্ধুস্থানীয় এবং বাক্যই ইঁহার চির-সহচর হইবে। শরীর, মন ও বাক্য, এই তিনই কর্ম্মক্ষম ও ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন। অতীত কার্য্যে ইঁহার সম্পূর্ণ তৃপ্তি হইবে না। ভাবী কার্য্যে বিশেষ আগ্রহ এবং বৃহৎ হইতে বৃহত্তর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য অগ্রসর হইতে থাকিবেন। কর্ম্ম চাই; যে মুহূর্ত্তে ইঁহার কর্ম্মের অভাব বোধ হইবে, সেই মুহূর্ত্তে অশান্তি বোধ হইবে। শয়ন, স্বপ্ন, গমন, ভোজন ও উপবেশন প্রভৃতি সকল অবস্থাতেই কর্ম্মচিন্তা ওতঃপ্রোতভাবে মনের মধ্যে তরঙ্গের ন্যায় প্রবাহিত হইবে।

নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান্ ভাবিলেও এবং শক্তি সঞ্চয় করিলেও, তিনি স্বয়ং সেই শক্তির পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন না, এই জন্য সর্ব্বদা শক্তিসঞ্চয় এবং উহার বৃদ্ধি-কার্য্যে তৎপর হইবেন। যখন যেরূপ কার্য্য করিবেন, তখন সেই কার্য্যের পক্ষে সেই পরিমাণ শক্তি অবগত হইবেন, এই জন্য ইনি একটী স্থান অধিকার করিলে, ইহা যথেষ্ট নহে—এই ভাবিয়া অপর স্থানাধিকারে লক্ষ্য হইবে এবং যে কার্য্য করিবেন, ইহা সামান্য ভাবিয়া উহাপেক্ষা বৃহৎ কার্য্যে মনোযোগ করিবেন। এই প্রকার ক্রমগতি এইরূপ জীবনে স্বভাবসিদ্ধ হয়।

বর্ত্তমান শুভ দশা ও তাহার ফল

বিংশোত্তরী দশানুসারে খৃঃ ১৯৪১ অব্দের জুলাই হইতে ৩রা আগষ্ট পর্য্যন্ত রাহুর দশায় কেতুর অন্তর্দ্দশা ও শুক্রের বিদশা থাকিবে।

চরপর্য্যায় দশানুসারে ২রা আগষ্ট পর্য্যন্ত তুলার দশায় মিথুনের অন্তর্দ্দশায় বৃশ্চিক ও ধনুর বিদশা থাকিবে। অতএব উভয় দশানুসারে এই সময়ে যোগজ শুভ ফল থাকায় হিট্‌লার কোন দেশ আক্রমণ করিতে পারেন। জন্মস্থান হইতে পূর্ব্বদিকের কোন অংশ হইতে পারে।

বিংশোত্তরী দশানুসারে পূর্ব্বোক্ত সময়ের পর ২২শে আগষ্ট পর্য্যন্ত রবির, ২৩শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত চন্দ্রের এবং ১৫ই অক্টোবর পর্য্যন্ত মঙ্গলের বিদশা থাকিবে। এই সকল সময়ে যোগজ ফলের দ্বারা দেশজয়ের ভাব জাগ্রত হইয়া দেশবিশেষ আক্রমণ করিতে পারেন।

নবাংশ দশানুসারে ১৭ই আগষ্ট হইতে ৮ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত কন্যার দশায় সিংহের অন্তর্দ্দশা ও সিংহের বিদশা থাকিবে এবং ২৪শে অক্টোবর হইতে ৮ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বৃশ্চিক ও ধনুর বিদশা শুভ যোগজ ফলদাতা হইবে।

চরপর্য্যায় দশানুসারে ২৬শে সেপ্টেম্বর হইতে ১৩ই অক্টোবর পর্য্যন্ত তুলার মহাদশায় মিথুনের অন্তর্দ্দশা ও মেষের প্রত্যন্তর থাকিবে। সুতরাং ১৭ই আগষ্ট হইতে ক্রমশঃ যোগজ ফলগুলি পর পর আরম্ভ হইবে।

নবাংশ দশানুসারে খৃঃ ১৯৪১ অব্দের ১৭ই আগষ্ট হইতে ১৯৪২ সালের ১৬ই মে পর্য্যন্ত কন্যার দশায় সিংহের অন্তর্দ্দশা থাকিবে এবং চরপর্য্যায় দশানুসারে খৃঃ ১৯৪১ অব্দের নবেম্বর হইতে ১৯৪২ সালের জুলাই পর্য্যন্ত তুলার দশায় কর্কটের অন্তর্দ্দশা থাকিবে। এই সময় পর্য্যন্ত যোগজ ফল বলবান্ থাকিবে।

ভবিষ্যৎ অশুভ দশা ও ইহার ফল

বিংশোত্তরী দশানুসারে খৃঃ ১৯৪৩ সালের ১৫ই নবেম্বর হইতে ১৯৪৪ সালের ৯ই এপ্রেল পর্য্যন্ত প্রত্যারি দশা রাহুর মধ্যে শুক্রের অন্তর্দ্দশা রাহুর বিদশা কাল অশুভসূচক।

নবাংশ দশানুসারে খৃঃ ১৯৪৩-এর ১৬ই অক্টোবর হইতে ১৯৪৪ সালের ১৬ই এপ্রেল পর্য্যন্ত বিছার দশায় ধনুর অন্তর্দ্দশা থাকিবে।

চরপর্য্যায় দশানুসারে খৃঃ ১৯৪৩ অব্দের নবেম্বর হইতে হইতে ১৯৪৪ সালের জুন পর্য্যন্ত বিছার দশায় ধনুর অন্তর্দ্দশা থাকিবে। অতএব হিট্‌লারের ৫৫ বৎসর বয়সের সময়ে যে প্রবল যুদ্ধ হইবে, উহাতে হিটলারের জীবনাশঙ্কা হইতে পারে। যদি এ সময় উত্তীর্ণ হয়, তাহা হইলে তিনি ৫৭ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায়। ভারতবর্ষ মকর রাশির অধিকৃত এবং ঐ মকর রাশি হিটলারের চতুর্থ হইয়া তদধিপতি শনি উহার বিপরীত ভাগে অবস্থিত থাকায়, ভারতবর্ষ হিট্‌লারের অধিকৃত হওয়া সম্ভব নহে।

উপবাস ও আরোগ্য

শ্রীকুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

১

জীবনের পথে শ্রম ও বিশ্রাম হাত ধরাধরি করিয়া চলে। পরিশ্রমে দেহের ব্যাটারি হইতে যে শক্তির অপচয় হয়, বিশ্রাম শক্তির সেই শূন্য পাত্র ভরিয়া দেয়। এই বিশ্রাম দেহ যদি না পায়, তবে দেহ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

সমস্ত দেহের ন্যায় পরিপাক-যন্ত্রও বিশ্রাম চায়। উপবাসই পরিপাক-যন্ত্রের বিশ্রাম। অথবা সমস্ত দেহের পক্ষে যেমন নিদ্রা, পরিপাক-যন্ত্রগুলির পক্ষে উপবাসই তাহাই। সুনিদ্রার পর মানুষ সবল ও সুস্থ হয়। পরিমিত উপবাসের পরও পাকস্থলী ও অন্ত্র সবলতা ও কার্য্যক্ষমতা ফিরিয়া পায়।

এই জন্য পৃথিবীর সকল দেশেই বিভিন্ন সময়ে উপবাস দিবার ব্যবস্থা আছে এবং উপবাসকে অবশ্যপালনীয় করিবার জন্য ইহাকে ধর্ম্মকার্য্যের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। আমাদের দেশে পূজা-পার্ব্বণে ও বিভিন্ন তিথিতে উপবাসের নিয়ম আছে। মুসলমানেরা রোজার সময়ে দিনে উপবাস করিয়া রাত্রে অল্পাহারে থাকেন। রাত্রে তাঁহাদের এরূপ আহার করার বিধি—যেন রাত্রির আহারজনিত উদ্গার দিনের বেলা বাহির না হয়। বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান এবং ইহুদীদিগের ভিতরেও নির্দ্দিষ্ট দিনে উপবাসের ব্যবস্থা আছে।

এইরূপ উপবাসে পরিপাক-যন্ত্রগুলি বিশেষভাবে উদ্দীপনা লাভ করে। তাহাতে পাকস্থলী ও অন্ত্রের পরিপাক ও রসশোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, দেহে যথেষ্ট রূপ নূতন রক্ত তৈয়ারী হয় এবং তাহার ফলে স্বাস্থ্যই বিশেষভাবে উন্নতি লাভ করে। এইজন্য উপবাস সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের অঙ্গ। কারণ শরীর ঠিক করিয়া লওয়াই ধর্ম্ম-সাধনার প্রথম কাজ।

উপবাসের দ্বারা স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। আবার বিভিন্ন রোগ হইতেও দেহকে মুক্ত রাখা যায়। কতকগুলি প্রাকৃতিক অবহাওয়ায় আমাদের পরিপাক-যন্ত্রগুলি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তখন অত্যধিক খাদ্য গ্রহণ করিলে, পাকস্থলী তাহা হজম করিতে পারে না। ঐ আবহাওয়ায় উহা পাকস্থলীর ভিতর সুদীর্ঘ সময় পড়িয়া থাকে এবং কুপিত (fermented) হইয়া উঠিয়া অমৃতের পরিবর্ত্তে বিষে পরিণত হয়। ঐ বিষের দ্বারা না হইতে পারে, দেহের এমন ক্ষতি নাই। আমাদের দেশে একাদশী প্রভৃতি তিথিতে যে উপবাসের ব্যবস্থা আছে, তাহার প্রধান কারণ ইহাই।

আষাঢ় মাসে ঘন বৃষ্টির সময়ে আমাদের হজম-শক্তি নিষ্প্রভ বাতিটির মত ক্ষীণ হইয়া আসে। এইজন্য এই সময়ে তিন দিন উপবাস দিয়া অম্বুবাচি পালন করার বিধান আছে।

সূর্য্যের সহিত পরিপাকক্রিয়ার অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্ত্তমান। সমস্ত জীবনীশক্তির মূল উৎসই সূর্য্য। সূর্য্য যখন আমাদের দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া যায়, তখন আমাদের দৈহিক যন্ত্রগুলির ক্ষমতাও ক্ষীণ হইয়া আসে। জৈনেরা সূর্য্যাস্তের পর যে খাদ্য গ্রহণ করে না, এই জন্য ইহা অতি যুক্তিযুক্ত ব্যবস্থা। বর্ষাকালেও এই জন্যই পশ্চিম ভারতের বহু হিন্দু এক বেলা মাত্র আহার করিয়া থাকেন।

যথেষ্টরূপ আহার্য্য গ্রহণ করিলেই যে দেহের যথেষ্ট উপকার হয়, তাহা মনে করা ভ্রম। যখন পাকস্থলীর খাদ্য পরিপাক করার মত অবস্থা থাকে না, তখন খাদ্যগ্রহণ অপেক্ষা উপবাসেই উপকার হয় বেশী।

কিন্তু উপবাসে সর্ব্বাপেক্ষা উপকার হয় এই জন্য যে, ইহা দেহের বিভিন্ন যন্ত্রকে দেহ পরিষ্কার করিতে অবসর দেয়। আমরা যাহা আহার করি, তাহা হজম করিতে দেহকে যথেষ্ট শক্তি নিয়োগ করিতে হয়। যখন আমরা আহার বন্ধ করিয়া দেই বা অতি লঘু পথ্য গ্রহণ করি, তখন সেই শক্তি দেহস্থিত বিভিন্ন বিষ ও দূষিত পদার্থ দেহের বিভিন্ন দ্বার দিয়া বাহির করিয়া দিতে বা দেহের ভিতর ধ্বংস করিতে সক্ষম হয়।

আমাদের আয়ুর্ব্বেদে আছে, জ্বরাদৌ লঙ্ঘয়েৎ পথ্যং জ্বরান্তে লঘু ভোজনং—জ্বরের আদিতে না খাইয়া থাকিবে এবং জ্বরের শেষে খুব লঘু পথ্য আহার করিবে। আয়ুর্ব্বেদ জ্বর সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা দিয়াছেন, অধিকাংশ তরুণ রোগ (acute disease) সম্বন্ধে তাহাই প্রযুজ্য। কোন কঠিন রোগ আরম্ভ হইবার কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতেই ক্ষুধা কমিয়া যায় এবং রোগের আক্রমণের সময়ে ক্ষুধা মাত্রই থাকে না। প্রকৃতপক্ষে ইহা প্রকৃতির অন্যতম আত্মরক্ষামূলক সক্রিয় ব্যবস্থা মাত্র। প্রকৃতি তখন ক্ষুধা নষ্ট করিয়া অর্থাৎ ভিতরে নূতন খাদ্য না আনিয়া দেহ পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে চায়। তখন উপবাস দিলে প্রকৃতির সেই শুভ প্রচেষ্টাকেই সাহায্য করা হইয়া থাকে।

প্রকৃতপক্ষে উপবাস দেহকে সর্ব্বতোভাবে পরিশোধিত করে। আমরা যাহা আহার করি, নিঃশ্বাসবায়ুর সহিত গৃহীত অক্সিজেনের সংযোগে দগ্ধ হইয়া তাহা দেহের কাজে আসে। আমরা যখন উপবাস দেই, তখন শরীরে যে অক্সিজেন গৃহীত হয়, নূতন খাদ্যের অভাবে তাহা পুরাতন খাদ্যাবশিষ্ট এবং দেহের দূষিত পদার্থই ধীরে ধীরে দগ্ধ করিয়া ফেলে। এইজন্য অধিকাংশ পুরাতন রোগ কেবল উপবাস দ্বারাই আরোগ্য করা যাইতে পারে।

তরুণ রোগে সাধারণতঃ এক হইতে তিন দিন উপবাস দিলেই যথেষ্ট হয়। তাহার পর কেবল লঘু পথ্য গ্রহণ করিলেই চলিয়া যাইতে পারে।

কিন্তু পুরাতন রোগে দীর্ঘদিনের জন্য উপবাস দিবার আবশ্যক হইয়া থাকে। রোগ যত কঠিন হয়, তত দীর্ঘ সময় উপবাস দিবার প্রয়োজন হয়। সাধারণতঃ দশ হইতে চৌদ্দ দিনের উপবাসেই অধিকাংশ পুরাতন রোগে আশানুরূপ ফল লাভ করা যায়।

উদরাময় প্রভৃতিতে রোগ হইলেই উপবাস দিতে হয়। কিন্তু পুরাতন রোগে যে দীর্ঘ উপবাসের প্রয়োজন হয়, হঠাৎ কখনও তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে নাই। এই দীর্ঘ উপবাসের জন্য ধীরে ধীরে প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক।

প্রথম মাঝে মাঝে ফল, ফলের রস ও কাঁচা আনাজের ব্যঞ্জন (salad) খাইয়া তিন চারি দিন অর্দ্ধ উপবাসে থাকা যাইতে পারে। ইহাতে দেহ ও মন দীর্ঘ উপবাসের জন্য অভ্যস্ত হয়। তাহার পরে উপবাস দিবার পুর্ব্বে একদিন এক বেলা ভাত এবং অপর বেলা ফল প্রভৃতি খাইয়া থাকা কর্ত্তব্য। পরের দিন দুই বেলাই ফল ও স্যালাড প্রভৃতি এবং তৃতীয় দিন কেবল ফলের রস খাইয়া চতুর্থ দিন হইতে উপবাস দেওয়া চলিতে পারে।

দীর্ঘ উপবাসের যাহা কিছু কষ্ট সাধারণতঃ প্রথম দুই তিন দিনই হইয়া থাকে, তাহার পর ইহা কমিয়া যায়। এই কয়দিনই খাদ্যগ্রহণের ইচ্ছা অত্যন্ত কষ্ট দেয়। কিন্তু প্রথম কয়দিন আহারের নির্দ্দিষ্ট সময়ের পুর্ব্বে যথেষ্টরূপ জল পান করিলে, ক্ষুধাবোধ তেমন প্রবল কখনও হইতে পারে না।

অনেকের ইহা ধারণা যে, উপবাস নির্জ্জলা হওয়া চাই। ইহার মত ভুল ধারণা আর নাই। সর্ব্বপ্রকার উপবাসেই লেবুর রস সহ প্রচুর জল পান করা কর্ত্তব্য। উপবাসে দেহের ভিতর যে দূষিত পদার্থ দগ্ধ হয়, জল তাহা ধোয়াইয়া লইয়া যায়। কিন্তু একেবারে কখনও অনেকটা জল পান করিতে নাই। বরং বার বার এমন কি প্রতি ঘণ্টায় এক গ্লাস করিয়া জল পান করা যাইতে পারে।

আহার বন্ধ করিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সর্ব্বদাই স্বাভাবিক মল ত্যাগ বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু যে নর্দ্দমা দেহের অধিকাংশ দূষিত পদার্থ বাহির করিয়া লইয়া যায়, তাহাই যদি বন্ধ থাকে, তবে উপবাসের দ্বারা ফললাভ হওয়া অত্যন্ত কঠিন হইয়া থাকে। এইজন্য দীর্ঘ উপবাসের সময়ে একদিন অন্তর একদিন ডুস দিয়া রোগীর কোষ্ঠটি পরিষ্কার করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। আহার গ্রহণের পরও কোন কোন সময় কয়েক দিন পর্য্যন্ত ডুস লইবার আবশ্যক হইয়া থাকে।

উপবাসে দেহের যে দূষিত পদার্থ দেহের ভিতর দগ্ধ হয়, রক্তই তাহা বিভিন্ন পথে দেহ হইতে বাহির করিয়া দেয়। এইজন্য সাময়িক ভাবে রক্তদুষ্টি হওয়ায় ঐ সময় দেহে কতকগুলি রোগলক্ষণ প্রকাশ পায় এবং দেহ দোষমুক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ঐগুলি কাটিয়া যায়।

সময়ে সময়ে রোগীর মাথাধরা আসে। রোগীর মাথা ধরিলে, ঐ সময় প্রচুর জল পান করা কর্ত্তব্য। উষ্ণ জলে ডুসও এই অবস্থায় বিশেষ ফলপ্রদ। তাহা ব্যতীত পরিপুর্ণ বিশ্রাম ও নিয়মিত নিদ্রা গ্রহণ করিলে, মাথাধরা সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয়।

দেহের দূষিত পদার্থ দগ্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই পাকস্থলীটি দূষিত গ্যাসে পূর্ণ হইয়া উঠে। পাকস্থলীটি স্ফীত হইয়া উঠিলে অনেক সময়ে তাহা হার্টের উপর চাপ দেয় এবং তাহার ফলে হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু দুই এক গ্লাস উষ্ণ জল পান করিয়া বিশ্রাম করিলেই এই লক্ষণ অন্তর্হিত হয়।

যদি রোগীর মাথা ঘুরায় এবং মাথা ঠাণ্ডা থাকে, তাহা হইলে তাহার শয্যা এমন ভাবে রচনা করা কর্ত্তব্য যেন মাথার দিক্ পায়ের দিক্ হইতে নীচে থাকে।

উপবাসের প্রথম অবস্থায় কোন কোন সময়ে রোগী একটু জ্বর বোধ করে। দেহকে বিশুদ্ধ করিবার ইহা প্রকৃতির অন্যতম চেষ্টা মাত্র। উপবাস অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই ভাব এবং অন্যান্য রোগলক্ষণ আপনিই অন্তর্হিত হয়।

উপবাসের প্রথম অবস্থায় একটু মৃদু পরিশ্রম করা আবশ্যক। এই সময়ে ভ্রমণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যায়াম। রোগী ইচ্ছা করিলে গৃহকার্য্যও করিতে পারে। কিন্তু উপবাস যত অগ্রসর হয় পরিশ্রম তত কমাইয়া দেওয়া উচিত। যদি রোগী অত্যধিক দুর্ব্বলতা বোধ করে, তবে পরিপুর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। রোগীর যথাসম্ভব দীর্ঘ সময় মুক্ত স্থানে অবস্থান করা আবশ্যক এবং প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে স্নান করাও কর্ত্তব্য।

সাধারণতঃ উপবাস করিবার দুই এক দিনের ভিতর জিহ্বা লেপাবৃত এবং শ্বাসপ্রশ্বাস ও মুখ দুর্গন্ধযুক্ত হয়। এই সমস্ত লক্ষণ ইহাই প্রমাণ করে যে, দেহে যথেষ্ট দূষিত পদার্থের সঞ্চয় রহিয়াছে এবং উপবাসের সুযোগ পাইয়া প্রকৃতি সর্ব্বপ্রকার পথেই উহা বাহির করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে বুঝিতে হয়—ঐ রোগীর পক্ষে উপবাস একান্ত ভাবে আবশ্যক ছিল। যতদিন দেহ দোষমুক্ত না হয়, ততদিন এই অবস্থাটা চলিতে থাকে। তাহার পর কিছু দিন উপবাস চালাইবার পর দেহ যত নির্ম্মল হইতে থাকে, ধীরে ধীরে জিহ্বা তত রক্তাভ হইয়া আসে, শ্বাসপ্রশ্বাস তত নির্ম্মল হয় এবং প্রভাতের আলোর মত ক্ষুধার একটা অনির্ব্বচনীয় মধুর অনুভূতি নামিয়া আসে। তখন বুঝিতে হয়—দেহ দোষমুক্ত হইয়াছে এবং উপবাসভঙ্গ করা যাইতে পারে।

উপবাসভঙ্গ করিবার পুর্ব্বে এই অবস্থাটা একান্ত ভাবে আসা চাই। এই অবস্থা আসিবার পুর্ব্বে উপবাসভঙ্গ করিলে উপবাসের সত্যকার ফল লাভ হয় না, কেবল অনর্থক কষ্ট করাই হয়।

কিন্তু কৃত্রিম ক্ষুধাকে যেন স্বাভাবিক ক্ষুধা বলিয়া ভ্রম না করা হয়। ক্ষুধা একটা দুর্ল্লভ অনুভূতি। বহু লোক জীবন ভরিয়া জানিবার সুযোগ পায় না, ক্ষুধা জিনিষটা কি? প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট আহারের সময়ে যে খাওয়ার ইচ্ছা জাগে অথচ ক্ষুধা থাকে না, তাহাকে আমরা ক্ষুধা বলিয়া ভ্রম করি। উপবাসের সময়ে এইরূপ কৃত্রিম ক্ষুধার উদয় হইলে জল পান করিয়া অথবা অন্য দিকে মন সরাইয়া দিয়া, ঐ ইচ্ছাকে দূর করা কর্ত্তব্য। জিহ্বা প্রভৃতি পরিষ্কার হইবার পর যে সত্যকার ক্ষুধার প্রকাশ হয়, তাহাকেই কেবল ক্ষুধা বলিয়া গণ্য করা উচিত।

৩

দীর্ঘ উপবাস আরম্ভ করা অত্যন্ত সহজ ব্যাপার, কিন্তু উপবাসভঙ্গ করা অত্যন্ত কঠিন কথা।

দীর্ঘ দিন কাজ না করিবার জন্য দীর্ঘ উপবাসের শেষে পাকস্থলীটি সাময়িক ভাবে শক্ত হইয়া যায়। ঐ অবস্থায় প্রথমেই অনেকগুলি পথ্য দিলে যে-কোন বিপদ হইতে পারে। এইজন্য পাকস্থলীটিকে তখন ধীরে ধীরে পুনরায় খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত করাইয়া লইতে হয়।

উপবাসের পর প্রথম কয়েক দিন কেবল তরল পথ্য গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। প্রথমবার অল্প অল্প গরম জল পান করিয়া উপবাস ভঙ্গ করিতে পারিলে খুব ভাল হয়। তাহার পর দুই তিন দিন কেবল কমলা লেবুর রস অথবা আঙুরের রস অথবা কেবল দুগ্ধ চা চামচে করিয়া ধীরে ধীরে পান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহাও প্রথমেই একবারে অনেকটা গ্রহণ করা উচিত নয়। প্রথম কয়েকটা দিন অল্প অল্প করিয়া বারে বারে খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। দুই দিন এই ভাবে তরল খাদ্য গ্রহণ করিবার পরে ভাত প্রভৃতি শক্ত খাদ্য (solid food) খুব অল্প করিয়া এক বেলা গ্রহণ করা যায়। তাহার পর আরও দুই এক দিন অপেক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হয়।

উপবাস ভঙ্গের পর সর্ব্বদাই একটা রাক্ষুসে ক্ষুধা উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু কয়দিন খাওয়া হয় নাই বলিয়া এখন দ্বিগুণ খাইতে হইবে, ইহা মনে করা কখনও উচিত নয়। অতিরিক্ত খাদ্যগ্রহণের প্রবৃত্তি ইচ্ছাশক্তির দ্বারা দমন করা কর্ত্তব্য এবং সর্ব্বদাই ক্রমশঃ অল্প করিয়া খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা আবশ্যক। উপবাসের সময়ে যেমন জল পান করা প্রয়োজন, উপবাসভঙ্গের পরেও তেমনি যথেষ্টরূপ জল পান করা কর্ত্তব্য।

দীর্ঘ উপবাসের প্রথমে শরীর সর্ব্বদাই দুর্ব্বল ও কৃশ হইয়া যায়। কিন্তু আহারগ্রহণের কয়েকদিন পর হইতেই দেহ দ্রুত পুষ্ট হইতে থাকে এবং অল্প কয়েকদিনের ভিতরই শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল হইয়া যায়। তাহা ব্যতীত সর্ব্বাপেক্ষা উপকার হয় ইহাই যে, দেহ সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মল, দোষশূন্য ও নীরোগ হয়।

যে সমস্ত রোগ অন্য কোন ভাবেই আরোগ্য হয় না, বহু অবস্থায় এইরূপ পদ্ধতি অনুযায়ী উপবাসে তাহা আরোগ্য হইয়া থাকে। বাতব্যাধি, অজীর্ণ, যকৃতের রোগ, বহুমূত্র, পাথুরি, হাঁপানি, চর্ম্ম-রোগ ও মৃগী প্রভৃতিতে মানুষ জীবন ভরিয়া কষ্ট পায়। কিন্তু মাত্র কয়েকটি দিনের উপবাসে এই সকল দুরারোগ্য রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করা যাইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে সকল দুরারোগ্য রোগেই উপবাসে উপকার হয়। কারণ আমাদের যে-কোন রোগই হউক, দেহ-সঞ্চিত বিভিন্ন বিষাক্ত ও দূষিত পদার্থই তাহার মূল কারণ। যখন দীর্ঘ উপবাসে এই বিষ দগ্ধ হইয়া যায়, তখন সকল রোগেই আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে।

তথাপি যাহারা স্থূলকায় এবং যাহাদের দেহে মেদের সঞ্চয় অত্যন্ত অধিক, দীর্ঘ উপবাস তাহাদের পক্ষেই বিশেষভাবে উপযোগী। যে সকল লোক অত্যন্ত কৃশ, দুর্ব্বল অথবা যক্ষ্মা প্রভৃতি ক্ষয় রোগে ভুগিতেছে, যাহাদের রক্তশূন্যতা, হিষ্টিরিয়া অথবা স্নায়বিক রোগ আছে এবং যাহারা গর্ভবতী, তাহাদের কখনও দীর্ঘ উপবাস দেওয়া উচিত নয়। জ্বর রোগেও যদি বুঝা যায় যে, জ্বর দুই চারি দিন মাত্র থাকিবে, যেমন ইনফ্লুয়েঞ্জা ও ডেঙ্গু প্রভৃতিতে হয়, তাহা হইলে যথাসম্ভব উপবাস দেওয়া কর্ত্তব্য; কিন্তু জ্বর যদি টাইফয়েড ও যক্ষ্মা প্রভৃতির মত দীর্ঘ-দিন থাকিবে বুঝা যায়, তবে রোগীর কখনও উপবাস দিতে নাই, বরং দেহের সবলতা রক্ষার জন্য বার বার অল্প করিয়া খাদ্যগ্রহণ করাই কর্ত্তব্য।

বর্ষা-মঙ্গল

শ্রীরমণ

গগনের পূর্ব্বাঙ্গনে আষাঢ়ের হেরি জটাজাল,
বিদ্যুৎ চমকে ঘন, নিঃশ্বাসেতে কদম্ব সুবাস;
মন্থর বায়ুর বেগ আপনারে করিছে উত্তাল—
বর্ষার সজল ছন্দে দৃষ্টি মোর আকুল উদাস।
জীবনের তীর্থক্ষেত্রে তপঃ লাগি' আমি তীর্থঙ্কর,
বর্ষার মঙ্গল-গাথা দিনু তাই লহ শুভঙ্কর ॥*

* নবদ্বীপ বর্ষা-মঙ্গল উৎসবে পঠিত।

সাময়িক সাহিত্য

শূলপাণি

ভারতবর্ষঃ আষাঢ়, ১৩৪৮—

বৈদিক-প্রসঙ্গ—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ

লেখক বৈদিক-প্রসঙ্গ অত্যন্ত সহজ ও সরলভাবে আলোচনা করিয়াছেন। সাধারণ পাঠককে কৌতূহলী করিয়া তুলিবার পক্ষে এই ধরণের আলোচনার একটা সত্যকারের সার্থকতা আছে। আধুনিক যুগে তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যেও দেখিয়াছি—এ সম্বন্ধে সীমাহীন অজ্ঞতা; দেখিয়াছি—সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রগুলির আলোচনা পাঠকেরা সযত্নে এড়াইয়া চলেন। ইহার জন্য তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ দোষী করা চলে না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষায়তনগুলিতে ধর্ম্মশিক্ষার দিক্‌টি একান্তভাবে অবহেলিত, ফলে শিক্ষা শেষ করিয়া যখন আমরা বৃহত্তর জীবনের সম্মুখীন হই, তখন সবিস্ময়ে দেখি—জাতির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মূলধারাটি আমাদের জীবনে বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া, বিভিন্ন পত্রিকায় ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে যে আলোচনা দেখা যায় তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিরর্থক পাণ্ডিত্য ও 'কোটেশন'-কণ্টকিত হইয়া পাঠকের নিকট দুর্ব্বোধ্য হইয়া ওঠে। ধর্ম্মালোচনার ক্ষেত্রে পাণ্ডিত্যের এই gymnastic আমরা দেখিয়াছি। ধর্ম্ম সহজবোধ্য সাহিত্য-ধর্ম্মী ভাষায় আলোচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

হিন্দু ধর্ম্মেই পূর্ণ সত্য আছে—লেখকের এই মন্তব্য তুলনামূলক দার্শনিক বিচারের পটভূমিতে আরও বিশদ হওয়া উচিত মনে করি।

কলঙ্কিনীর খাল—শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়। আমরা ইতিপূর্ব্বেই এই উপন্যাসটি সম্বন্ধে বলিয়াছি। লেখক সহজ ও সুপরিচিত আবেষ্টনীর মধ্যে যে চিত্র আঁকিয়া চলিতেছেন, তাহার মধ্যে রসানুভূতির একটা স্নিগ্ধ পরশ আছে।

ঝড়-পূর্ণিমা—কেশবচন্দ্র গুপ্ত। লেখকের 'বাঘমারা' ভূতের গল্প পড়িয়া কিছু বিস্মিত হইয়াছি। আষাঢ়ের ভারতবর্ষে বেশ একটি অচল চলিয়া গিয়াছে। রসিকতার মধ্য দিয়া কাফিখানার বেসুরা উল্লাসই ভাসিয়া আসিতেছে। 'সুরেশ বল্লে—ভো কাট্টা, মধুর ধ্বনিতে আলকাতরা'—এই ধরণের বস্তিসুলভ রসিকতা আছে। সম্পাদক মহাশয়কে জিজ্ঞাস্য, ইহা বন্ধুপ্রীতি, আশ্রিতবাৎসল্য না আর কিছু?

ভাঙা-গড়া—মনোজ গুপ্ত। লেখকের হাত মিষ্ট, সাধারণ ঘটনার মধ্য দিয়া তিনি রসসৃষ্টি করিয়াছেন।

প্রথম বরষা—শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত। ভারতবর্ষে এ মাসে যতগুলি কবিতা ছাপা হইয়াছে, তাহার মধ্যে এইটিই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছে। কবি প্রথম বরষার ধারাপাত প্রাণ-মন দিয়া উপভোগ করিয়াছেন। সদ্যক্ষান্ত বর্ষার অভিজ্ঞতা টুকরা ছবির আকারে ফুটিয়া উঠিয়াছে, ইহার মধ্যে শুধু কবিত্বই উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে নাই, তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ ও অনুভূতি-শীলতায় কবিতাটি হইয়া উঠিয়াছে উপভোগ্য।

বিধবা—কাদের নওয়াজ।

> যৌবন-নিধুবন-উন্মন চঞ্চল
>
> এইত সেদিন ছিল, উড়েছিল অঞ্চল।

এই লাইন দুইটিতে বুদ্ধদেবের এককালের অতিনিন্দিত ও বহু আলোচিত একটি কবিতার প্রতিধ্বনি জাগিয়াছে।

মিসিং লিঙ্ক—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ। লেখকের রচনায় W. H. Hudson-এর My friend Jack নামক গল্পের ছায়া পড়িয়াছে। অথচ গল্পটিকে অরিজিন্যাল বলিয়া চালান হইয়াছে। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন

যুদ্ধ—অধ্যাপক মণীন্দ্র দত্ত, এম-এ। গল্পটি মোটের উপর মন্দ নয়, শেষের দিকে ব্যর্থপ্রতীক্ষার হতাশা ও বেদনার একটি মৃদু গুঞ্জন pathos সৃষ্টি করিয়াছে।

বৈষ্ণব কবিতা—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন। বিশেষ নূতন কোন কথা বলা হয় নাই। সমস্ত অধ্যাত্ম-ব্যঞ্জনা বাদ দিলেও, বৈষ্ণব কবিতায় যে বাস্তব রসের প্রাচুর্য্য প্রবাহিত হইয়াছে, তাহাই ইহার অনন্যসাধারণ

উৎকর্ষের একটি প্রধান হেতু—লেখক এই কথাটি বুঝাইতে চাহিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিতার একশ্রেণীর ভক্ত সমালোচক আছেন, যাঁহারা ইহার আধ্যাত্মিক দিকটি ছাড়া আর কিছু দেখিতে পান না। ইঁহাদের কাছে বৈষ্ণব কবিতায় মানব-মানবীর প্রাণের আশা-আকাঙ্ক্ষার দিকটি, যাহা আমাদের মতে সত্যকারের সাহিত্যের দিক্, তাহা মিথ্যা হইয়া গিয়াছে।

চল্‌তি ইতিহাস—শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়। বর্ত্তমান যুদ্ধ সম্বন্ধে ধারাবাহিক আলোচনা—উপভোগ্য।

উত্তরা ঃ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮—

পঞ্চদশ বর্ষকাল উত্তরা বাংলার বাহিরে বাঙালীর সাহিত্য-প্রীতিকে একটি প্রণালীবদ্ধ পথ ধরিয়া চলিতে সাহায্য করিয়াছে। বাংলা সাময়িকের ইতিহাসে ইহা সুদীর্ঘকাল বলিতে হইবে। স্বর্গীয় অতুলপ্রসাদ, জাষ্টিস্ লালগোপাল, সুরেন্দ্রনাথ সেন, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি খ্যাতনামা লেখকের রচনায় উত্তরার পৃষ্ঠা সমৃদ্ধ হইয়াছে। আগামী বর্ষে উত্তরা সাহিত্যসম্পদে হইয়া উঠিবে আরও আকর্ষণীয়—এ আশ্বাস সম্পাদক মহাশয় দিয়াছেন।

শ্রীযুত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার পত্রে বলিয়াছেন—'উত্তরা তার ব্রত সমাপ্ত করেছে। সে যদি আর এ দেহে নাও থাকে, প্রবাসী বাঙালীর সাহিত্য-সাধনার ইতিহাসে সে থাকবে এবং সেই সঙ্গে তার উত্তরসাধকও।'

মনে হয় লেখকের বক্তব্যের মধ্য দিয়া উত্তরার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা অনিশ্চয়তার ছায়াপাত হইয়াছে। আমরা বলি, প্রবাসে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রচারে উত্তরার যে কর্ম্মপ্রচেষ্টা, তাহার প্রয়োজন আজও শেষ হয় নাই, বরং বাড়িয়াছে। তবে নিঃসঙ্গ পথযাত্রার যে গ্লানি ও হতাশা, তাহার সবটুকু ভোগ করিলেও, এই কৃচ্ছ্রসাধনের ফল ফলিয়াছে। এই পথে আজ একটি একটি করিয়া আগন্তুকের আবির্ভাব হইতেছে।

আর এক জায়গায় তিনি বলিয়াছেন, 'এখন আমি দীর্ঘপথযাত্রী, বোমা যদি বৈতরণী পার করে' দেয়, অনেকটা এগিয়ে যাওয়া যায়'।

কেদারনাথ রসসাহিত্যিক, তাঁহার হাতে পড়িয়া এই সৃষ্টিছাড়া বস্তুটিকে নাস্তানাবুদ হইতে হইবে দেখিতেছি। চিত্রগুপ্ত মহাশয়ের বিরুদ্ধেও যে এক নম্বর ঠুকিবার ষড়যন্ত্র চলিতেছে, এই সুযোগে তাহা তাঁহাকে চুপি চুপি জানাইয়া রাখি, আখেরে সুবিধা হইতে পারে। বোমাকে বাহন করিয়া তিনি পাড়ি জমাইতে চান, আমাদের মনে হয় বাহনটির বাছাই বিশেষ ভাল হয় নাই। বৈজ্ঞানিক বলেন, তার একটা timingও নাকি আছে, আর তা' ছাড়া ও বস্তুটিকে বহু জায়গায় বোবা মারিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে। কাজেই ও জিনিষটা ঠিক সময়ে service দিবে বলিয়া মনে হয় না। আর একটা কথা, শুনিয়াছি চিত্রগুপ্ত মহাশয় নাকি বাঙালী, হিসেব-জ্ঞান তাঁহার টনটনে থাকিলেও তিনি আজকাল একটু বেহিসাবী। ইদানীং বাঙালী ছেলের কাঁচা মাথাটার উপর নজর তাঁহার একটু বেশী, সে দিক্ দিয়াই আমাদের যাহা কিছু ভরসা। আমরা প্রার্থনা করি, তাঁহার দীর্ঘপথযাত্রা দীর্ঘতর হউক।

বন্দনা ঃ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮—

প্রবাসী বাঙালী পরিচালিত পত্রিকা, লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশিত হইতেছে। কয়েকটি ভাল ভাল রচনা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অধ্যাপক বীরেশ্বর সেন এম-এ রচিত 'ডলি পুতুল' সুন্দর হইয়াছে। একটি বেদনার অশ্রুমুখর আলেখ্য, মনকে নাড়া দেয়।

অধিকাংশ রচনা সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশিত হইয়াছে, ফলে সবগুলিতে বিষয়বস্তুর প্রতি মর্য্যাদা দেওয়া হয় নাই।

সর্ব্বাপেক্ষা চমৎকার শ্রীসমর সেন রচিত কবিতা 'চক্রান্ত', কিসের চক্রান্ত এবং চক্রান্তই বা কেন, সমস্তই ধোঁয়াটে রহিয়া গেল। লেখক বলিতেছেন—সদরে এসে কিবা ফল? সত্যই ফল নাই—অন্দরে থাকাই নিরাপদ্। কারণ পাঠক বেচারীরা গো-বেচারা হইলেও তাহাদেরও সহ্যের একটা সীমা আছে। একটা কেলেঙ্কারী ঘটাও অসম্ভব নয়; কাজেই লেখকের 'সদরে এসে কিবা ফল?' লেখক শুধু কবি হিসাবেই Realist নন, যথেষ্ট practicalও বটেন!

স্মৃতি—শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। কবিতা রচনাটি উপভোগ্য হইয়াছে, তবে দ্বিতীয় stanzaতে ছন্দের একটু গোলমাল কানে লাগে।

জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্রের 'বংশগত' ভিত্তি—ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদারের প্রবন্ধটিতে জানিবার ও চিন্তা করিবার মত বস্তু আছে।

শ্যামলীঃ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮—

শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীহারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে লেখক মহাভারতের উপর ভিত্তি করিয়া শ্রীকৃষ্ণচরিত্র আলোচনা করিতেছেন। লেখকের যুক্তির সবগুলিই আমাদের ভাল না লাগিলেও, শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের কয়েকটি দিক্ মনোরম হইয়া উঠিতেছে। অবশ্য এক্ষেত্রে সবই ভক্ত ও ভগবানের ব্যাপার। হৃদয়াবেগের furnace-এ যেখানে ভক্তিরসকে ভিয়ানে চাপান হয়, সেখানে বলিবার কি থাকিতে পারে?

স্বপ্ন-বিলাস—অনামী রচনা, পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে একস্থানে দৃষ্টি আপনা হইতেই আটকাইয়া গেল। লেখক জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ভদ্র সাহিত্যিকের চিত্ত পরস্ত্রীর চিন্তায় অধীর হওয়া কি বাঞ্ছনীয়? প্রশ্নটি যত সহজ আপনারা ভাবিতেছেন তত সহজ নয়, উত্তর দিতে গিয়া ঘামিয়া উঠিয়াছি। পাঠশালার কথা মনে পড়িতেছে, এবং মনে হয় সেদিনও এত বিহ্বল হইয়া উঠি নাই। খোঁজাখুঁজি করিতে করিতে প্রশ্নের উত্তরও মিলিয়া গেল, হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। লেখক বলিতেছেন,

"কাব্য পড়ে যেমন ভাব, কবি তেমন নয় গো!"

মর্ম্মবাণী—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য। কবিতা। লেখকের রচনা আমরা উপভোগ করি, ইদানীং ছন্দের দিক্ দিয়া তাঁহার রচনা বৈচিত্র্যহীন হইতেছে, ইহা লক্ষ্য করিয়াছি। অবশ্য তাঁহার রচনার যে pensive মর্য্যাদা, তাহাকে ক্ষুণ্ণ করিয়া নৃত্যচটুল ছন্দের অনুবর্ত্তী হইতে হইবে, একথা আমরা বলি না। তথাপি মনে হয়—তাঁহার রচনায় ছন্দঃ ও ভাবের বৈচিত্র্যসাধনের অবকাশ এখনও আছে।

পল্লী-প্রভাত—শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত। একটি ভাল কবিতা।

বন্ধন-না-মুক্তি—শ্রীশচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (ডাক্তার)। স্থানে স্থানে মাত্রাধিক্য ঘটিলেও, গল্পটি ভাল হইয়াছে।

বর্ত্তমানে বাংলা সাময়িকের ক্ষেত্রে শিশু-সাহিত্য-রচনার দিকে যেরূপ ঝোঁক চাপিয়াছে, তাহাতে মনে হয় সাহিত্যপ্রীতিই ইহার একমাত্র প্রেরণা নয়। উদ্দেশ্য অবশ্য খাঁটি বস্তুতান্ত্রিক, বুঝিতে কষ্ট হয় না। মাসিকের নীতি বলিয়া একটা বস্তু থাকা উচিত। বর্ত্তমানে গতানুগতিকতার স্রোতঃ দৈনিক, সাপ্তাহিক ছাড়াইয়া মাসিকে পৌছিয়াছে। কাজেই শ্যামলীর এই শিশুবিভাগটি দেখিয়া বিস্মিত হই নাই, এইরূপই যেন আশঙ্কা করিতেছিলাম।

অলকাঃ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮—

জড়বাদী ও মায়াবাদীর অস্বীকৃতি—শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত শ্রীঅরবিন্দের বিখ্যাত গ্রন্থ "Life Divine"এর কয়েকটি পরিচ্ছেদের উপর ভিত্তি করিয়া আলোচনা করা হইয়াছে। লেখক বিষয়টি সহজভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেও, স্থানে স্থানে একটা অস্পষ্টতা রহিয়া গিয়াছে। অবশ্য সাধারণভাবে একটা ধারণা করিতে কষ্ট হয় না। শ্রীঅরবিন্দের বাণী—"We seek a larger and completer affirmation"—সমগ্র রচনাটি এই ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়াইয়া আছে। লেখক কয়েকটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন—"কেবল ভগবানের পানে মানবের আস্পৃহা বুঝিলে চলিবে না, মানবের পানে চিরপ্রসারিত ভগবানের দৃষ্টিকেও বুঝিতে হইবে। রাধার প্রেম, কৃষ্ণের প্রেম দুই না বুঝিলে বিশ্বব্যাপার যথাযথ বোঝা হইল না।"

তুলসী—শ্রীভূপেন্দ্র মজুমদার—তুলসী বৈষ্ণবী 'গাঁয়ের ছোকরাদের কাঁচা বয়সের উত্তর দিয়ে যেন প্রেমের পান্সি ভাসিয়েছে'। অবশ্য দু' একবার বানচাল যে হয় নাই তাহা নয়, তাহারও নজির আছে। প্রথমে মনে হইয়াছিল—ইনি বুঝি শরৎচন্দ্রের কমলের বেনামদার হইয়া আসিয়াছেন; কিন্তু ব্যাপারটি অত সহজ মনে করা আমাদের উচিত হয় নাই। গগন বাবাজীর আখড়াকে শুধু আখড়া মনে করিলে ভুল হইবে, এখানে বহু জিনিষের বেসাতী চলে এবং আখড়া বয়কট হইলেও, এখানে 'কারবার' ফেল পড়ে না। শেষের দিকে একটু নাটকীয়ভাবে বৈষ্ণবীর পূর্ব্বপক্ষের প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণের সমারোহে রোমাঞ্চিত

হইয়াছি। ইহার পরেও কি আপনাদের বলিয়া দিতে হইবে যে, সত্যই গল্পটি হইয়াছে পড়িবার মত।

নাম্নীর নামে—শ্রীঅসিতকুমার হালদার। 'নাম্নী'তে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মানসীদের বিচিত্র রূপে ও বিচিত্র নামে আমাদের রসানুভূতির আঙ্গিনায় হাজির করিয়াছেন। কবির অশীতিতম জয়ন্তী উপলক্ষে শিল্পী অসিতকুমার হালদার তাঁহাদের কয়েকটিকে রূপ ও রেখায় চিত্রিত করিয়াছেন এবং এই প্রসঙ্গে যে কাব্যরসের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইয়াছে উপভোগ্য।

বিদুষী ভার্য্যা—শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

সহযাত্রিণী—শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু।

উপন্যাস দুইটি ধারাবাহিকভাবে চলিতেছে। এবং আমাদের মনে হয় ভালই হইতেছে।

চতুরঙ্গ—অজিত লাহিড়ী। গল্পের নাম চতুরঙ্গ, কিন্তু ইহা কোন রঙ্গই হইয়া ওঠে নাই। বর্ত্তমান সংখ্যায় গল্পের প্রথম কিস্তি দেওয়া হইয়াছে। পরবর্ত্তী দফায় যে লেখক কিস্তিমাৎ করিবেন, তাহার কোন আভাষ অন্ততঃ পাইতেছি না। 'এঁটো পাতার মত' শিপ্রা দেবীকে ফেলিয়া যাইবার মত প্রবৃত্তি হইল কেন বুঝিলাম না; ইহা যদি রসিকতার নমুনা হয়, তাহা হইলে লেখক বদরসিক বলিতে হইবে।

শীশ্-মহল—আষাঢ়, ১৩৪৮—

ইসলাম ও চিত্রকলা—এস, ওয়াজেদ আলি। রচনাটি আমরা উপভোগ করিয়াছি। সঙ্গীত ও চিত্রকলায় সে যুগের মুসলমান শিল্পীদের দান অসামান্য। আধুনিক যুগে মুসলিম কালচারের এই দিকটা উপেক্ষিত হইতেছে। লেখকের তথ্যবহুল রচনায় মুসলমান সমাজের এই সমস্যার দিকটায় আলোকপাত হইয়াছে।

মুসলিম কৃষ্টির বৈশিষ্ট্য—এম্, আকবর আলি। ইহা আর একটি ভাল রচনা। একটি প্রসারিত দৃষ্টির ইঙ্গিত আছে।

ইহা ছাড়াও কয়েকটি ভাল গল্প, কবিতা ও ভ্রমণ-কাহিনী পত্রিকাটির বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

ভাই-বোন—আষাঢ়, ১৩৪৮—

পত্রিকাটি ইতিমধ্যেই কিশোর পাঠকমহলে নিজস্ব স্থান করিয়া লইয়াছে। বিশেষ করিয়া নজরে পড়ে রচনা-নির্ব্বাচনপটুতা। গল্পে, কবিতায় ও প্রবন্ধে বর্ত্তমান সংখ্যা উপভোগ্য হইয়াছে। স্বাস্থ্যবিভাগটি ভাল হইয়াছে, তবে স্থানাভাবে ইহার কলেবর এক পৃষ্ঠায় আসিয়া ঠেকিয়াছে। বর্ত্তমানে বাংলার নবজীবনের পতাকাবাহী কিশোরের দল একটা স্বাস্থ্যহীন, দূষিত আবহাওয়ার মধ্যে বাড়িয়া উঠিতেছে। বাংলার শিশু-পত্রিকাগুলির উচিত স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি ইহাদের গোচর করা। ভাই-বোনের আসর সম্বন্ধে আমাদের একটু বক্তব্য আছে। সম্পাদক মহাশয় এই বিভাগের মধ্য দিয়া শিশু-চিত্তের সহিত একটি মধুর আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়িয়া তুলিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহাদের নবজাগ্রত কৌতুহলী মনের প্রতি সব সময়ে সুবিচার করা হইতেছে না, ইহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি।

শিব

শ্রীইন্দু গুপ্ত

মিত্র যার যক্ষপতি, শ্বশুর হিমালয়,
তবু যার দিক্-বস্ত্র পরিধানে রয়ঃ
সুধাকন্দ চন্দ্র কাছে—ভক্ষ্য তবু বিষ,
কনক বরণ গৌরী যার অঙ্গে অহর্নিশ,
ডাকিনীর সঙ্গ যার, দৈবী সে অক্ষয়—
ভক্তগণে যশঃ দানি' শিব নাম তাঁর হয়

* প্রাকৃত পিঙ্গল ১, ১২৬-এর অনুবাদ

মহাভারতী—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রণীত। প্রকাশক: প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১২৭, দাম: দেড় টাকা। দ্বিতীয় সংস্করণ।

'মহাভারতী'—কবির খ্যাতনামা কাব্যগ্রন্থ, এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুস্তকটিকে ১৯৪৩ সালের বি.এ. (পাশ কোর্স) পরীক্ষার্থীদের জন্য বাংলা Second Language-এর প্রথম পেপারের পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত করিয়াছেন।

কবিতাগুলি সম্বন্ধে বলিতে হইলে প্রথমেই মনে হয়, ইহার মর্য্যাদা ও সৌন্দর্য্যের শিল্পকুশল ব্যঞ্জনা কতকগুলি কবিতাকে classical-এর পর্য্যায়ে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। মহাভারতের সুস্তম্বরূপ বহু চরিত্রের সুনিবিড় পরিচয় এই কাব্যে পাইয়াছি—অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ পরিচয়। সৌন্দর্য্যের আলোকধৌত প্রভাতে যেন ইহাদের সহিত পরিচয় হইল নবরূপে একটা নূতনতম পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে। পাঠ করিয়া মনে হইল যেন আমাদের চিত্তের দিগন্তরেখা বহুদূর প্রসারিত হইয়া গিয়াছে। এই বিকারগ্রস্ত আধুনিকতার যুগে ইহার মধ্যে সাধারণ পাঠক সহজে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবেন। পাঠকগণ প্রচুর আনন্দ ও রসের খোরাক পাইবেন। মহাভারতীর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রমাণ করে যে, বইখানি খুবই সমাদৃত হইয়াছে। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই উপহারযোগ্য।

বাংলার ধর্ম্মগুরু (২য় খণ্ড)—রায় সাহেব শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি-এ সঙ্কলিত। মূল্য ২৲ মাত্র।

বাংলার পুণ্যশ্লোক ধর্ম্মগুরুগণের এই পবিত্র চরিত-গ্রন্থমালার দ্বিতীয় খণ্ডখানি প্রথম খণ্ডেরই মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, ইহা অনায়াসেই বলা যায়। এই খণ্ডে সাধক রামপ্রসাদ, বামা ক্ষ্যাপা, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদেশ্বরী দেবী (দুইজন ভক্ত সহ), স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মচারী বালানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ ও পরমহংস নিগমানন্দ সরস্বতী—এই কয়জন প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের জীবন-কথা সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। রাজেন্দ্রবাবুর ভাষা ও ভাব প্রাঞ্জল, গভীররূপে মহিমাবুদ্ধির উদ্রেক করে। উদীয়মান জাতি তাঁহার বইগুলি পড়িয়া ধর্ম্ম ও উচ্চজীবনে শ্রদ্ধা সঞ্চয় করিবে—আমরা এই আশাই করি। ইহা সর্ব্বজন-সমাদৃত হউক, এই প্রার্থনা।

বঙ্গবীর সুরেশ বিশ্বাস—৷✓০, **ছোটদের নদীয়া** ৷১০, **আশানন্দ** ৷৷০—শ্রীচণ্ডীচরণ দে প্রণীত।

বাঙালী শুধু চিন্তাবীর নয়, কর্ম্মবীরও; এমন কি বাহুবলে ও সমরক্ষেত্রেও বাঙালী সুযোগ পাইলে উচ্চ কীর্ত্তি অর্জ্জন করিতে পারেন। ইহার দুইটী জ্বলন্ত উদাহরণস্বরূপ—আশানন্দ ও কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাসের জীবনাখ্যায়িকা গ্রন্থকার অঙ্কন করিয়াছেন। বাঙলার স্কুল-সমূহের ছাত্রছাত্রীগণের প্রত্যেকের এই বীর-কাহিনী জানা উচিত, পড়া উচিত। লেখাও সুখপাঠ্য।

ছোটদের নদীয়া—বিশেষভাবে নদীয়া জেলাবাসীর ছেলেদেরই জন্য। প্রত্যেক জেলার এইরূপ বই হওয়া চাই। গ্রন্থকারের উদ্যম প্রশংসনীয়।

চাবুক—শ্রীসরোজনাথ ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক: দাশগুপ্ত এণ্ড কোং, ৫৪।২, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃঃ সংখ্যা ২২২; দাম: দুই টাকা চারি আনা।

ছোট গল্পের সমষ্টি। চাবুক গল্পটি পড়িলাম, ইহার বিষয়বস্তু ও ব্যাখ্যানের মধ্যে একটা হাস্যকর অস্বাভাবিকতা আছে, যাহা শিল্প-রুচিবোধকে আহত না করিয়া পারে না। আধুনিক পাঠক শুধু গল্প শুনিতে চায় না, ছোট গল্পে লেখনীকে তুলীর কাজ করিতে হয় বেশি। মাত্রাজ্ঞান, ব্যাখ্যান-কৌশল ও suggestiveness—ইহাই ছোট গল্পের প্রাণ। 'চাবুক' গল্প পড়িয়া সেই দিক্ দিয়া হতাশ হইয়াছি। 'নিমন্ত্রণরক্ষা', 'মায়ের ডাক' ও 'দশম গ্রহ' পড়িয়া আনন্দ পাইলাম। ইহা ছাড়াও পাঠকের ভাল লাগিবার মত আরও কয়েকটি গল্প আছে। ছাপা ও বাঁধাই চমৎকার।

বন্ধন ও মুক্তি—শ্রীমতিলাল দাশ প্রণীত। প্রকাশক: দাশগুপ্ত এণ্ড কোং, ৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃঃ সংখ্যা ২০৬, দাম: দুই টাকা।

ছোট ছোট কতকগুলি গল্প লইয়া লেখক সুন্দর রসসৃষ্টি করিয়াছেন। সেইজন্য ছোট গল্পের বই হইলেও, পাঠক ইহা আগ্রহের সহিত পড়িবেন। শেষের দিকে লেখকের একটি ছোট উপন্যাসও আছে। ভাষা সহজ, সুন্দর স্বচ্ছগতিতে বহিয়া চলে, পড়িতে ক্লান্তি বোধ হয় না। গল্পগুলির মধ্যে কুশলী শিল্পীর পরিচয় আছে। বিশেষ করিয়া 'বন্ধনমুক্তি', 'বালুচরের ডাক' ও 'যাহা কাব্য নহে' আমাদের ভাল লাগিয়াছে। 'পথের বার্ত্তা' উপন্যাসটি পড়িলাম, নিশীথ ও ধীরার

চরিত্র মনে হয় আর একটু ফুটিলে ভাল হইত। উপন্যাসের দীর্ঘবিস্তৃত পটভূমি ইহাতে নাই, ফলে উপন্যাসটির গতি হইয়া উঠিয়াছে সীমাবদ্ধ এবং ইহার যা দোষ-ত্রুটি, তাহা এই উপন্যাসে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ছাপা ও বাঁধাই মনোরম।

Marxism and the Indian Ideal—By Sjt. Brojendra Kishore Roy Chowdhury. Published by Thacker, Spink & Co. (1933) Ltd. Calcutta. Price Re. 1/-

আলোচ্য পুস্তকে লেখক মার্কস্‌বাদের প্রকৃতিগত অসামঞ্জস্য ও অসম্পূর্ণতা লইয়া গভীর বিশ্বাসের সহিত আলোচনা করিয়াছেন। এই ধরণের আলোচনায় লেখকের যুক্তিবাদ ও আদর্শগত বিশ্বাস বিচারের সমগ্রতার দিক্‌টিকে পঙ্গু করিয়া তোলে। পুস্তকটির স্থানে স্থানে এই ধরণের ত্রুটি লক্ষ্য করিয়াছি। মার্কস্‌বাদের বস্তুতান্ত্রিক আদর্শবাদ—যাহা অর্থনীতিক নিরিখে মানুষের মূল্য যাচাই করে, তাহার বিরুদ্ধে লেখক বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদ তুলিয়াছেন এবং আমাদের মনে হয়, লেখকের সুবিন্যস্ত চিন্তাপ্রণালী এইদিকে যথেষ্ট আলোকপাত করিয়াছে। মার্কস্‌বাদের সমাজতান্ত্রিক আদর্শ বিরাট্‌, ভাষ্য ও সমালোচনা কণ্টকিত হইয়া এই সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে সীমাহীন মহাসাগরের মত। আলোচ্য পুস্তকের সীমাবদ্ধ পৃষ্ঠার মধ্যে ভারতের বহু যুগাগত সংস্কারের সহিত ইহা কতকটা খাপ খায়, তাহা লেখক দেখাইয়াছেন। ছাপা ও বাঁধাই নিখুঁত।

Hindusthani Music (Its History and Technique) By Sjt. Birendra Kishore Roy Chowdhury M. L. C., Gouripore (Bengal).

ভারতীয় সঙ্গীতের প্রচারে ও গবেষণায় লেখকের খ্যাতি আজ দূর-বিস্তৃত। বর্ত্তমান পুস্তকে লেখক ভারতীয় সঙ্গীতের—প্রাচীন পটভূমিকার সহিত পাঠকসাধারণের পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন। বেদ ও পুরাণ হইতে প্রমাণপ্রয়োগ দ্বারা ভারতীয় সঙ্গীতের পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা হইয়াছে সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী। ভারতীয় সঙ্গীতের এই ঐতিহাসিক পুরাতত্ত্ব ও কিম্বদন্তীমূলক আলোচনার মধ্যেও একটি ধারাবাহিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছে, যাহার ফলে সাধারণ পাঠকও ইহার মধ্যে জ্ঞাতব্য বহু বিষয় পাইবেন। ইংরেজীতে রচিত হইলেও, পুস্তকটির ভাষা সরল ও হৃদয়গ্রাহী।

অপৌরুষেয়—শ্রীঅবনীনাথ রায় প্রণীত। প্রকাশক: ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা। পৃঃ সংখ্যা: ১৮৯, দাম: দেড় টাকা।

কয়েকটি ছোট গল্পের সমষ্টি। লেখক ছোটগল্প রচনার টেক্‌নিকটি জানেন, ফলে গল্পগুলি ছোট হইলেও একটি পরিপূর্ণ সাহিত্যরসের আভাষ ইহাতে পাওয়া যায়। ভাষা ও শব্দযোজনা-কৌশলে রচনার যে মর্য্যাদা গড়িয়া ওঠে, তাহার পরিচয় আছে আলোচ্য গ্রন্থে। লেখক বলিয়াছেন: "এই বইখানির অধিকাংশ গল্পগুলিতে সুপারন্যাচারাল বা অতিপ্রাকৃত কতকগুলি ঘটনার বর্ণনা দিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।" অতিপ্রাকৃত ঘটনাকে সাহিত্যের বিষয়বস্তু করিতে হইলে একটি সংস্কারহীন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন, অন্যথায় সাহিত্যবস্তুটি মারা পড়ে। এই ধরণের কয়েকটি ঘটনায় লেখকের গভীর বিশ্বাস তাঁহার সাহিত্যিক নিরপেক্ষতাকে স্থানে স্থানে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে মনে হইল। ইহা সত্ত্বেও পুস্তকটি সম্বন্ধে ইহাই আমাদের একমাত্র বক্তব্য নয়। তাঁহার মিষ্ট হাতের পরিচয় ও গল্প বলিবার কৌশলে প্রত্যেকটি গল্পই পরিস্ফুট হইয়াছে, ফলে পুস্তকটি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই ভাল। আমরা পুস্তকটির প্রচার কামনা করি।

বৃহত্তর সম্ভাবনা—বরেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। প্রকাশক: প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ। পৃঃ সংখ্যা: ১২৪, দাম: এক টাকা।

পুস্তকটির দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে, ইহাতে গল্পগুলি যে পাঠকের ভাল লাগিয়াছে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। লেখকের ভাষা ঝরঝরে, ঘটনার মধ্যেও নূতনত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। কাজেই গল্পগুলি যে পাঠকের নিকট আকর্ষণীয় হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই রুচিসঙ্গত। প্রচ্ছদপটটী বেশ suggestive হইয়াছে। সাধারণ পাঠকের নিকট বইখানি ভাল লাগিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। গল্প রচনায় লেখকের ভাবী সম্ভাবনার প্রমাণ আমরা বইখানিতে পাইয়াছি।

খেয়া-গীতি—শ্রীঅবনীমোহন সান্যাল প্রণীত। গাইবান্ধা 'তারা প্রেস' হইতে শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায় দ্বারা মুদ্রিত। প্রকাশকের নাম নাই। প্রথম সংস্করণ, মূল্য বার আনা।

গীতিকার 'সপ্তদশ বর্ষে পদার্পণ করেই' এই গানগুলি রচনা করিয়াছিলেন। ভূমিকায় জানাইয়াছেন যে, সুধীসমাজে এগুলিকে আনিয়া তিনি ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়াছেন। বিনয় সত্ত্বেও আমাদের মনে হয়, চেষ্টা থাকিলে কাব্য রচনায় তাঁহার কম বেশী সার্থক হইবার আশা আছে, তাহার কিছু কিছু প্রমাণও বইখানির মধ্যে পাইয়াছি। তবে অনভিজ্ঞতার যাহা কিছু দোষত্রুটি তাহাই আলোচ্য কবিতাগুলির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পুস্তকটির ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই সাধারণ।
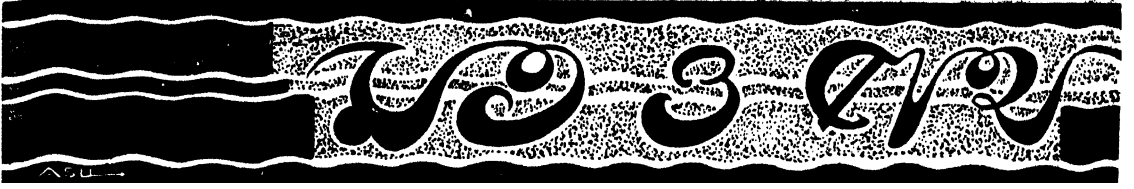
সাম্প্রদায়িকতার ঔষধ

সিন্ধুদেশ সাম্প্রদায়িক দুর্ব্ব্যাধির অন্যতম প্রতিকার যে পৃথক্ নির্ব্বাচনপ্রথার উচ্ছেদ, এ বিষয়ে দৃঢ় ঘোষণা ইতিপূর্ব্বেই করিয়াছে। সম্প্রতি পঞ্চনদ হইতে হাকিম সিকন্দর খিজির এক বিরাট্ জনসভায় পঞ্চ সহস্র নরনারীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন যে, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা দূর করিতে হিন্দু-মুসলমান নেতৃগণকে প্রাণবিসর্জ্জনেও প্রস্তুত হইতে হইবে; কিন্তু তাহাতেই দাঙ্গার মূল কারণ দূর হইবে না। সেই মূল কারণ, তাঁহার মতে, সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনপ্রথা, যাহারই ফলে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে পরস্পর মনোমালিন্য বৃদ্ধি পাইতেছে। হাকিমজী রোগের বিধান ঠিকই ধরিয়াছেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ঔষধের সন্ধান তো মিলিয়াছে, এখন তাহা প্রয়োগের সুযোগ পাওয়া গেলেই দেশ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে। এ সুযোগসৃষ্টির উপায়—সমবেত প্রয়াস ও তজ্জন্য প্রবল জনমত-গঠন, এ কথাও হাকিমজী অবশ্য বলিয়াছেন। এই দিক্ দিয়া কে কতটুকু কার্য্যকরীভাবে অগ্রসর হইতে পারেন, তাহাই এখন বিবেচ্য।

পৃথক্ নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে আশঙ্কা

পৃথক্ নির্ব্বাচনের লোপ অর্থে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের পৃথক্ অস্তিত্বের বিলোপ নহে, ইহাও এখানে মনে রাখা দরকার। জিন্না সাহেবের ন্যায় অতি-সাম্প্রদায়িক নেতৃগণের ধারণা—পৃথক্ নির্ব্বাচন প্রথা উঠিয়া গেলে, সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম ও কৃষ্টিগত স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত হইবে। ইহাই "Islam in danger" ধুয়ার মূল সূত্র। ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় কলিকাতার এক সভায় এরূপ আপত্তির নিরসনকল্পে বলিয়াছিলেন—এক সম্প্রদায়ের অন্য সম্প্রদায়ের সমাজ-সংস্কার বিষয়ে কোন ভোটাধিকার থাকিবে না। হিন্দু ও মুসলমান স্ব স্ব ভাষা, লিপি, শিক্ষা, বিবাহ ও সম্পত্তির অধিকার বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবে। নিছক রাজনৈতিক ব্যাপারে ভারত-শাসন বিধির সংশোধন করিয়া, এমন ভাবে যুক্ত নির্ব্বাচনপ্রথার প্রবর্ত্তন সম্ভবপর কিনা, হইলে কি ভাবে তাহা হওয়া উচিত, এ বিষয়ে ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের ন্যায় চিন্তাশীল মনীষিগণ আরও বিশদভাবে আলোচনা ও সর্ব্বসাধারণের কাছে আলোকপাত করিলে, ক্রমশঃ এ বিষয়ে জনমত সংগঠিত ও সুদৃঢ় হইয়া উঠিতে পারে। হিন্দু ও মুসলমান অথবা কোনও ধর্ম্মপ্রাণ সম্প্রদায়ই রাষ্ট্র-নীতির অনুশাসনে স্বীয় ধর্ম্ম-সমাজ-কৃষ্টি ক্ষুণ্ণ বা বিপন্ন করার কামনা নিশ্চয়ই করে না। ভারতে জাতীয়তা-গঠনে এই আত্মবৈশিষ্ট্যের চৈতন্য অব্যাহত রাখিয়াই রাষ্ট্র-সাধকগণকে মিলনসূত্র আবিষ্কার করিতে হইবে। তীব্র দেশাত্মবোধ ও বিশুদ্ধ ঈশ্বরপ্রেম থাকিলে, ইহা ভারতে পূর্ব্বেও অসম্ভব হয় নাই, এখনও হইবে না।

শ্রীযুক্ত মুন্সীর কংগ্রেস-ত্যাগ

হিংস ও অহিংস আত্মরক্ষা সম্বন্ধে কংগ্রেস-নেতা মহাত্মা গান্ধীজির পুনরুচ্চারিত অভিমত লইয়া আমরা গত বারে আলোচনা করিয়াছি। যাহা একান্ত উচ্চ আদর্শ, সাধারণের নাগালের বাহিরে, তাহা কোনও বস্তু-তান্ত্রিক কর্ম্মপ্রতিষ্ঠান, বিশেষতঃ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সার্ব্বজনীন নীতি হইতে পারে না। হইলে, সমস্যা জটিল হয়। সত্যনিষ্ঠা কঠিন হয়, নয় সত্যনিষ্ঠার দায়ে বা মিথ্যাচারে প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গিয়া পড়ে।

মিঃ মুন্সী কংগ্রেস-ত্যাগের কৈফিয়ৎ দিয়াছেন—"আমি বহু বৎসর যাবৎ নিজ প্রদেশের আখড়া-আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট। কাজেই আমি গান্ধীজির সর্ত্ত মানিয়া লইয়া তাহাকে অনুসরণ করিবার ভান করিতে পারি না। হিংস আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার্থে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে বাধা দেওয়ার নীতিতে সহায়তা করা; উহার জন্য চেষ্টা করা বা উহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ বা প্রচার করা অন্যায়—এরূপ প্রতিশ্রুতিতে আমি আবদ্ধ থাকিতে পারি না।"

মহাত্মাজীর সর্ত্ত ছিল দুইটী—এক, "Those (congress-men) who favour violent resistance (by way of self-defence) must get out of the Congress and shape conduct just as they think fit and guide others accordingly.

এবং অপরটী—

"A Congress-man may not directly or indirectly associate himself with gymnasia where training in violent resistenc is given."

মুন্সীজি মনে প্রাণে এই সর্ত্ত মানিতে না পারিয়াই কপট আত্মবঞ্চনা বা মিথ্যাচারের চেয়ে কংগ্রেসত্যাগই শ্রেয়ঃ করিয়াছেন। এই সত্যনিষ্ঠার জন্য মহাত্মাজী তাঁহাকে অভিনন্দিতই করিয়াছেন।

মিঃ মুন্সী কংগ্রেসের মধ্যে থাকিয়াই, কংগ্রেসের মূলনীতি সংশোধন করিয়া লইতে পারিতেন কি না, এ প্রশ্ন আমাদের নহে। কংগ্রেস আদর্শবাদী গান্ধীজির অনুসরণে নিছক আদর্শবাদীই হইবে, ইহা আশা করা সমীচিন। কিন্তু অহিংসা আদর্শ ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শ নহে, অন্ততঃ ইহা গীতা, মহাভারত, এমন কি মনু-প্রবর্ত্তিত রাষ্ট্রনীতি নহে—এই কথাই এখানে ভাবিবার ও বলিবার আছে—অশোকের ভারতই একমাত্র ভারত নহে, এমন কি স্বয়ং বুদ্ধও রাষ্ট্রক্ষেত্রে অহিংসামন্ত্রের প্রয়োগ সম্বন্ধে বিশিষ্ট উপদেশ দিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না।

কংগ্রেস তথা হিন্দু ভারতকে আমরা ভারত-জাতীয়তার মূল ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রবীর্য্যের সন্ধান লইতে বলিব।

স্যার হরি সিং গৌরের অপমান

স্যার হরিসিং গৌর লণ্ডনে বোমাপাতের ফলে আশ্রয়চ্যুত হইয়া কোন হোটেলে আশ্রয় লইতে যাইলে, হোটেলের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে "কালা আদ্মী" বলিয়া তথায় স্থান দেন নাই। ইহা লইয়া বিলাতে পার্ল্যামেণ্টে প্রশ্নোত্তর হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে কোনই ফল হয় নাই। হোটেলের মালিকের পক্ষ হইতে না ক্ষতিপূরণ, না ক্ষমাভিক্ষার কোন লক্ষণই এ পর্য্যন্ত খবর পাওয়া যায় নাই।

স্যার হরিসিং-এর ইংরাজ-বধূ আছেন। তিনি স্বয়ং ইংরাজী শিক্ষিত, ইংরাজেরই মন্ত্রশিষ্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু দাঁড়কাকের ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় এ সবই যে ভূয়া, আসল আভিজাত্যের যাচাই-এ তাহার মূল্য কাণাকড়িও নহে, এই চৈতন্যোদয় অপমানের কষাঘাতে তাঁহার ন্যায় মনীষীরও হইবে কি না, আমাদের সন্দেহ আছে। হয়ত এই ঘটনা লইয়া আমরা প্রতিহিংসা ও প্রতিবিধিৎসারই আন্দোলনে ইন্ধন যোগাইব—কিন্তু খাঁটি আভিজাত্যের মূল কোথায়, উহার সন্ধানরত হইব না—দেশের হাওয়া দেখিয়া ইহাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। মহাকবি মধুসূদনের কথাই মনে পড়ে—

"ওরে বাছা মাতৃকোষে রতনের রাজি
এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি!"

মিস্ রাথবোর্ণ ও রবীন্দ্রনাথ

যে শ্রেণীর ইংরাজ স্যার হরিসিং গৌরের অপমান করে, সেই শ্রেণীরই ইংরাজদের একজন কুল-কুমারী মিস্ রাথবোর্ণ ভারতবাসীকে লক্ষ্য করিয়া যে মিঠে-কড়া ইস্তাহার পাঠাইয়াছিলেন, মহাকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রোগশয্যা হইতে তাহারই উত্তরে কড়া কথা শুনাইয়াছেন, ইহা আজ মাস পূর্ব্বের ঘটনা। ইহার পর মিস্ রাথবোর্ণ আবার কৈফিয়ৎ-পত্র পাঠাইয়াছেন—তাহাতে লিখিয়াছেন, মহাকবি রুগ্ন বলিয়া কুমারীর লেখা বোধ হয় ভাল করিয়া পড়েন নাই! কারণ রবীন্দ্রনাথও লিখিয়াছিলেন কি না—এই মিস্ রাথবোর্ণটি কে, তাহা তিনি চিনেন না।

অবশ্য ইতিমধ্যে কুমারী রাথবোর্ণের পরিচয় কিছু মিলিয়াছে। তিনি পার্ল্যামেণ্টের মহিলা মেম্বর, আর তিনিই মিস্ মেয়োর সহচরী, আবার তাঁহারই পূর্ব্বপুরুষ নাকি ছিলেন রাজা রামমোহন রায়ের জনৈক ভক্ত। এ সব পরিচয় নিশ্চয়ই বিশেষ কাজের নহে।

আমাদের মনে হয়, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ এই প্রগল্ভা ইংরাজ-নারীকে এতখানি গৌরব না দিলেই ভাল করিতেন। ইহা সত্য যে, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু জেলে থাকায়, তাঁহার অনুপস্থিতিতে এই চোরা-গুপ্তি শব্দ-বাণের একটা পাল্টা জবাব তিনি কর্ত্তব্য-বুদ্ধির

অনুরোধেই না দিয়া পারেন নাই ; কিন্তু এই কর্ত্তব্যটুকু আর কেহ তাঁহার চেয়ে ঢের ছোট মানুষ করিলেও চলিত। রবীন্দ্রনাথের এই লঘুতায় আমরা একটু ব্যথিতই হইয়াছি। মিস্ মেয়োর সহচরীর প্রচার-ব্রত ইহাতে আশাতীত সাফল্য লাভ করিয়াছে।

ভারতবাসীর "Prosperity"

ভারতসচিব মিঃ আমেরী তাঁহার বক্তৃতায় বর্ত্তমান ভারতের সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। এ কথার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন আছে বুঝিয়াই সম্ভবতঃ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি স্যার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা সরকারী রিপোর্ট হইতেই তথ্য সংগ্রহ করিয়া এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, ভারতবাসীর জনপ্রতি মাসিক আয় ৪৲ টাকা ও দৈনিক আয় ৵০ আনা মাত্র। কেন্দ্রীয় রাজস্ব বোর্ড হইতে প্রকাশিত নিখিল ভারত ইন্‌কম ট্যাক্স বা আয়-কর বিবরণ হইতে জানা যায় যে, ভারতে ২০০০৲ আয়কর ছাড়া জনসংখ্যা মাত্র ২,৮৫,২৪০ জন অর্থাৎ শতকরা ১/১০ মাত্র অর্থাৎ একের দশম ভগ্নাংশও নহে। এখানে বাষিক ৫ লক্ষাধিক টাকা উপার্জ্জন করে মাত্র ৯ জন। বৃটেনের বা অন্য দেশের সহিত এই সব অঙ্কের আমরা তুলনা করিব না। স্যার রহিমতুল্লার এই শেষ কথাটুকুই মিঃ আমেরীর কাণে গেলে আমরা একটু খুসী হইব—"গ্রেট বৃটেনে বর্ত্তমানে দূরদর্শী রাজনীতিকের অভাব ঘটিয়াছে।"

নারীর শিক্ষা ও বিবাহ

পঞ্জাব গভর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগ সম্প্রতি এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, বালিকাবিদ্যালয়গুলির শিক্ষয়িত্রী ও পরিদর্শিকারা যতদিন অবিবাহিতা থাকেন, ততদিন তাঁহারা বেশ মন দিয়া কাজ করেন ; কিন্তু বিবাহ করার পর, তাঁহাদের নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বা শিক্ষা-দান কার্য্যে শৈথিল্য ও অবহেলাই পরিলক্ষিত হয়।

পক্ষান্তরে, আমরা শুনিয়াছি যে, কলিকাতার বেথুন কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ বিবাহিতা ছাড়া অবিবাহিতা মহিলাকে শিক্ষয়িত্রীরূপে গ্রহণ করিতেই প্রস্তুত নহেন। ইহার কারণ, বোধ হয়, তাঁহারা মনে করেন যে, অবিবাহিতা কুমারীদের মনের চাঞ্চল্য যত বেশী হয়, বিবাহিতাদের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে, কারণ জীবনের একটা নোঙ্গর তাঁহারা খুঁজিয়া পাইয়াছেন, সেই স্থির-ভূমির উপর দাঁড়াইয়া কি সংসারে, কি শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁহাদের অধিক গুণপণা সর্ব্বত্রই আশা করা যায়।

এই উভয় মতের দ্বন্দ্বে আমরা শেষোক্ত মতটাই আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার সহিত বেশী মিলিয়া যায়, দেখিতে পাই। নারী-হৃদয় আকর্ষণের কেন্দ্র চায়, কেন্দ্র স্থির হইলেই তাহার হৃদয়-পদ্ম স্বভাব-ধর্ম্মে প্রস্ফুটিত ও প্রতিভাও বিকশিত হয়। কিশোরীর জীবনেই এই কেন্দ্র-প্রতিষ্ঠা ভারতীয় বিধান। বর্ত্তমান শিক্ষা ও সমাজনীতি এই বিধান উপেক্ষা করিয়াই বহুতর চাঞ্চল্যসৃষ্টি ও তজ্জাত সমস্যারও উৎপত্তি ঘটাইয়াছে। পঞ্জাব গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা-বিভাগ যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কোথাও নিশ্চয় একটা গলদ থাকিয়া গিয়াছে বলিয়াই আমাদের ধারণা। নতুবা পঞ্জাবের সামাজিক পরিস্থিতি কি বাংলার সামাজিক পরিস্থিতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন হইতে পারে ?

চাউলের দর

বাংলার মন্ত্রিমণ্ডল পাটের দর নিয়ন্ত্রিত করিতে গিয়া সফল হইয়াছেন বলিয়া আমরা শুনি নাই। তাঁহারা চাউলের দর-নিয়ন্ত্রণেও খোলাখুলি অপারগতা জানাইয়াছেন। এই বিষয়ে তাঁহাদের তিন দফা যুক্তি এই :—

(১) এবার ধান অল্প জন্মিয়াছে, গত পূর্ব্ব বৎসরের চেয়ে বাংলায় শতকরা ৩০ ভাগ কম, নিখিল ভারতে ২৫ ভাগ। চাউলের আমদানীও কম হইতেছে। তাই দর বাড়িতেছে।

(২) দর বাঁধিয়া দিলে ত মজুত চাউলের পরিমাণ বাড়িবে না—ফলে তার চলাচলে বাধা পড়িবে, বাংলায় অন্যত্র হইতে চাউল আসিবে না।

(৩) চাউলের দর বাড়িলে, ধান্যোৎপাদক কৃষক-শ্রেণীরই সুবিধা, তাহারাই বাংলায় সংখ্যাধিক্য।

আরও তাঁরা বলিয়াছেন, চাউলের দর বাড়ায়, অন্য খাদ্যশস্যের মূল্য বাড়িবার সম্ভাবনা নাই।

আমরা এই সকল কথার মর্ম্ম বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।

আমাদের প্রশ্ন—ধান অল্প জন্মিবার কারণ কি চাষীরা মন্ত্রীদেরই কথায় ধানের পরিবর্ত্তে অধিক লাভের আশায় পাট বেশী বুনিয়াছে বলিয়া নহে? জাহাজের অভাবে চাউল রেঙ্গুন হইতে কম আসিতেছে, কিন্তু বিভিন্ন সমর-ক্ষেত্রে কি চাউল রপ্তানী ঐ কারণে কম পড়িয়াছে? তাহা যদি না হয়, তবে চেষ্টা করিলে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট বর্ম্মা হইতে চাউল আনাইবার ব্যবস্থা করিতে কি পারেন না? তাঁহাদের তৃতীয় যুক্তিও ভিত্তিহীন—কেন না, মন্ত্রিদেরই কথায় ভুলিয়া চাষীরা বেশী পাট বুনিয়াও বেশী দরও পায় নাই, উপরন্তু তাহাদেরই ঘরে ধান না থাকায়, তাহাদিগকে বেশী দরে চাউল কিনিতে হইতেছে। আর খাদ্যশস্যের দর যে চাউলের দরের সঙ্গে সমান হারেই প্রায়শঃ বাঁধা থাকে, এই সাধারণ সত্যটার ব্যতিক্রম ঘটিবার কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ তো আমরা মন্ত্রিদের ইস্তাহারে খুঁজিয়া পাইলাম না। প্রতি মাসের খাদ্যশস্যের শঙ্ক-সংখ্যা মিলাইয়া দেখিলেও, এ বিষয়ে চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন অনায়াসেই হইতে পারে।

আমরা দেশের ভাগ্যবিধাতৃগণকে দেশের বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে আরও একটু দরদের সহিত পরিচয় গ্রহণ ও রক্ষা করিতে অনুরোধ করিতেছি। বাংলায় দুর্ভিক্ষের অবস্থা ধীরে ধীরে চরমে উঠিয়া স্থায়িত্ব লাভ না করে, তদ্বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি আর কেমন করিয়া দেশবাসী আকর্ষণ করিতে পারে?

ডাঃ লাহার সতর্ক-বাণী

আমরা গত সংখ্যায় স্যার বদ্রিদাস গোয়েঙ্কারের আর্থিক সতর্কতা-বাণীর আলোচনা করিয়াছি। সম্প্রতি বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্সের ত্রৈমাসিক অধিবেশনের সভাপতি ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহাও সময়োপযোগী আলোচনায় গভর্ণমেণ্ট ও দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। যুদ্ধান্তের অর্থনৈতিক সমস্যা-গুলি লইয়া চিন্তা ও সমাধানের জন্য গভর্ণমেণ্ট যে পুনর্গঠন কমিটী নিযুক্ত করিতে মনঃস্থ করিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত করিয়া বস্তুতন্ত্রভাবেই সমস্যাগুলিকে গ্রহণ করিতে হইবে। যুদ্ধকালীন শিল্পগুলিই দেশের একমাত্র শিল্প নহে। এই সঙ্গে মুদ্রাবিনিময় সমস্যা, সরকারী ঋণ নীতি, বিনষ্ট রপ্তানী বাজারের পুনরুদ্ধার ও শুল্করক্ষণ নীতি, মূল্যনিয়ন্ত্রণ, বেকার সমস্যা প্রভৃতি বহু প্রশ্ন একত্র বিজড়িত। এই সকল প্রশ্নই যুদ্ধাবসানের সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখে উপস্থিত হইবে।

গত যুদ্ধকালে এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট উদাসীন থাকায়, সুচিন্তিত পরিকল্পনার অভাবে আমাদের বিশ্বশক্তির নিরুপায় ক্রীড়ণকে পরিণত হইয়াছিল। বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে এখনই যে আর্থিক বিশৃঙ্খলা সুরু হইয়াছে, তাহা ভয়াবহ। সুতরাং এখন হইতেই সুগঠিত পরিকল্পনা লইয়া প্রস্তুত না থাকিলে, পরিণাম আরও ভয়ঙ্কর হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ডক্টর লাহার প্রত্যেক কথাটাই বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি দিয়া দর্শনীয় ও চিন্তনীয়। যাঁহাদের তিনি সতর্ক করিতে চাহিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিলেই আমরা আশ্বস্ত হইব।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের আহ্বান

বরিশাল, ভোলা, চাঁদপুর ও নোয়াখালীর ঝটিকা-বিধ্বস্ত অঞ্চলের দুর্গত নরনারীর সাহায্যের জন্য ডাঃ শ্যামা-প্রসাদ মুখোপাধ্যায় যে বিবৃতি ও আবেদন প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে প্রত্যেক সহৃদয় দেশবাসীর সাড়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তিনি গভর্ণমেণ্টকে জনপ্রতিনিধিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাদের বর্ত্তমান নীতি সংশোধন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "জীবনধারণোপযোগী খাদ্য ও গৃহনির্ম্মাণের ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। সঙ্গে সঙ্গে কৃষক, অকৃষক, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র সর্ব্ব শ্রেণীর লোকদের আর্থিক জীবন পুনর্গঠনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সমবায়ভিত্তিতে কি ভাবে কুটীর-শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। দুঃস্থ ব্যক্তিগণ যাহাতে পুনরায় নিজেদের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারে, এই ভাবেই সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

বিধ্বস্ত বিদ্যালয়সমূহ ও নিরুপায় ছাত্রদের জন্যও তাঁহার দরদী হৃদয় যে সহানুভূতির ডাক দিয়াছে, আশা করি, গভর্ণমেণ্ট ও দেশ, উভয়েই সে সহানুভূতির সমুচিত কার্য্যতঃ পরিবেশনে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা করিবে না।

মরণ মলিন রাতে

শ্রীসত্যব্রত মুখোপাধ্যায়
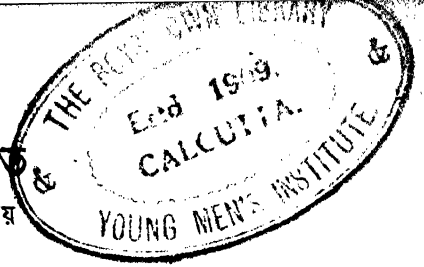
সারা সহরটাকে আঁধার যেন বুকের তলায় চেপে রেখেছে। নৈশ অন্ধকারে বাতাস বয়ে যায় বিধবার তপ্তশ্বাসের মত। লণ্ডন সহরের উপর মৃত্যুর মতন স্তব্ধতা। সন্ধ্যার পর অধিবাসীরা উৎকর্ণ হয়ে বাস করে—এই বুঝি বিমানাক্রমণের সঙ্কেতধ্বনি মরণের আহ্বান জানিয়ে দিল।

আমার ছোট ঘরখানিতে আজ যেন মৃত্যুর বিভীষিকা ফুটে উঠেছে। সারাদিন জীনাকে নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি চল্‌ছে। ডাক্তার বিকেলের দিকে একবার এসেছিল। মুখে যদিও তিনি ভরসা দিয়ে গেছেন, কিন্তু কথাগুলি বলার সময়ে তাঁর মুখে কোন আশার আলো আমি দেখ্‌তে পাইনি। আমার খোকা লরেলটা এমনি দুষ্টু হয়েছে যে, তাকে আগ্‌লাতেই একজন লোকের দরকার। কয়দিন ধরেই লরেলটাকে আগ্‌লান ও জীনার পরিচর্য্যা আমি একাই করছি।

রাত্রি প্রায় দশটায় লরেল ঘুমিয়ে পড়ল। আমি জীনার কাছে গিয়ে বসলাম। জীনার সুন্দর দেহখানি রোগ-যাতনার নিষ্ঠুর আঘাতে বিছানায় একেবারে নেতিয়ে পড়েছে। কথা সে বড় একটা বল্‌তে পারে না; আমাকে ডাকার দরকার হলে চারিদিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়। রাত্রিতে বিমানাক্রমণের ভয়ে আলো জালা নিষেধ—তাই তার কাছে কাছেই থাকি, কখন কি দরকার হয়।

পাশে বসে তার হাতে হাত বুলাতে বুলাতে ডাকলাম—"জীনা— !"

মনে হ'ল সে যেন অতি কষ্টে আমার দিকে মুখ ফিরাল। তার বুকের ভিতর সাঁই সাঁই শব্দ করছিল। আমি বললাম—"জীনা, তোমার বুকের ভিতর অমন সাঁই সাঁই করছে কেন? খুব কষ্ট হচ্ছে?" বুকভাঙ্গা একটা তপ্ত দীর্ঘশ্বাসের উত্তাপ আমার মুখে লাগল।

—"জীনা, শ্বাস নিতে কি তোমার খুব কষ্ট হ'চ্ছে?"

"হ্যাঁ...।..।" কণ্ঠ তার অতি ক্ষীণ।

জীনার স্বর শুনে আমার বড় ভয় হ'ল। অজানিত শঙ্কায় বুকের ভিতর হু-হু করে' উঠল। দোর-জানলা বন্ধ করে' দেশলাইয়ের একটা কাঠি জাললাম। জীনার মুখ যেন কাগজের মত শাদা হ'য়ে গেছে। চোখের তারা স্থির। আমি কি করব, ঠিক করতে পারলাম না। আমার বুক ফেটে কান্না পাচ্ছিল—জীনাকে যদি সত্যিই হারাই, আমি কেমন করে বাঁচব? লরেলকে কার হাতে তুলে দিয়ে আমি পেটের ধাঁধাঁয় ঘুরে বেড়াব? নাঃ—আর ভাবতে পারি না। চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল দু'ফোঁটা অশ্রু।

মনে পড়ল মালিশটার কথা। ডাক্তার বলে' গিয়েছে, বুকের যন্ত্রণা বাড়লে ঔষধটা বুকে মালিশ করে দিতে। আঁধারে তাকের উপর ঔষধ খুঁজতে গিয়ে হাত লেগে একটা শিশি পড়ে' চুরমার হ'য়ে গেল। তাড়াতাড়ি দেশলাই জেলে দেখলাম, তাকের আর সব ঠিকই আছে, শুধু মালিশের শিশিটাই মাটিতে পড়ে' ভেঙ্গে গেছে। আমার ধিক্কার হ'ল কেন ঔষধ ভাঙ্গার আগে দেশলাই জাললাম না।

জীনার কপালে একটা চুমু খেয়ে আদর করে' বুঝিয়ে বললাম—একা থাক, আমি ছুটে গিয়ে ডাক্তার ডেকে আনি?"

উঠতে গিয়ে সার্টের হাতায় টান লাগল। আমি আবার বসে পড়ে' জীনাকে জিজ্ঞাসা করলাম—"কি জীনা, আমায় যেতে নিষেধ করছ?"

জীনা মুহ্যমান কণ্ঠে অতি কষ্টে জবাব দিল—"না...তু...মি...যে ও...না...। আ...মা...র...ভয়...ক...রে...।"

"অবুঝ হয়ো না জীনা, এইত পাশেই ওয়ালেস্ ষ্ট্রীট্। আমি যাব আর আসব, একটুও দেরী হ'বে না। একটু ধৈর্য্য ধরে' থাক।"

জীনার তরফ হ'তে এবার আর কোনও প্রতিবাদ এলো না। শ্বাসটা যেন ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে বুকের ঘড়ঘড়ানিও বাড়ছে বলে' মনে হ'ল। দাঁড়িয়ে ভাববার সময় নেই। দোর খুলে সবে একটি পা বাইরে দিয়েছি, অমনি লরেল খুঁৎ খুঁৎ করে উঠল। বাধ্য

হ'য়েই ফিরতে হ'ল। হাত দিয়ে দেখলাম সে প্রস্রাব করে তারই উপর উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। বিছানা বদলে ঘুম্ পাড়িয়ে দিলাম। জীনার বুকের ভিতর তখন যেন তুমুল তুফান চ'লেছে। আমি এক রকম ছুটেই বেরিয়ে গেলাম।

করণ্ ষ্ট্রীটের গীর্জ্জার পাশ দিয়ে পাগলের মত ছুটে চলেছি। গীর্জ্জার অঙ্গন হ'তে সাবধানী বাঁশী আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে দিলে মরণের বাণী। অমনি গুপ্তস্থান হ'তে শত শত সন্ধানী আলো লণ্ডনের আকাশকে দিনের মত আলোকিত করল। ক্ষণিক দাঁড়িয়ে একবার আকাশের দিকে চাইলাম। মনে হ'ল, ঊর্দ্ধ আকাশচারী একদল শকুনি গলিত শবের লোভে নীচের দিকে চেয়ে আছে। আমার দাঁড়াবার অবসর কোথায়—আবার ছুটতে লাগলাম

গলির মোড়ে একজন 'ডিফেন্স' খপ্ করে আমার হাত ধরে বলল—"এই অমন করে ছুটছ যে? মরবে নাকি?"

"কে—ভেলেট? আমায় ছেড়ে দে ভাই, ডাক্তার ডাকৃতে যাচ্ছি। দেরী করলে আমার জীনা যে মরে যাবে। ছেড়ে দে—ছেড়ে দে—।"

আমাদের শত শত বিমান-বিধ্বংসী কামান গর্জ্জে উঠল। তাদের অনল গর্জ্জন কাণের পর্দ্দা যেন ছিঁড়ে দিতে চায়। ভেলেট তার কাণ দু'টো ঢেকে দিয়ে উপর দিকে ইঙ্গিত করে দেখাল। চেয়ে দেখলাম, জার্ম্মাণ বিমানগুলি অনেক নীচে নেমে এসেছে। এক একবার দু' তিনখানা করে বিমান ছোঁ মারার ভঙ্গীতে বিদ্যুদ্বেগে নীচের দিকে নেমে আসছে। একে বিমানবিধ্বংসী কামানের গর্জ্জন, তার উপর আবার অতি বিস্ফোরক বোমা ফাটার শব্দ মৃত লণ্ডন সহরকে যেন যৌবনের কোলাহলে জাগিয়ে তুলেছে। আগুনের জ্বলন্ত ফুল্‌কী-গুলি যেন মরণের মহোৎসবে মেতেছে। আবার আমি ছুট্‌তে লাগলাম। মরার ভয় করলে চলবে না, যতক্ষণ বেঁচে আছি জীনাকে বাঁচাবার চেষ্টা আমাকে করতেই হবে। আর যদি মরেই যাই—সব কিছুই শেষ হয়ে গেল।

গলির মোড়েই যেন একটা বোমা পড়ল। দালানগুলি ভূমিকম্পের স্পন্দনের মত একবার কেঁপে উঠল। বসন্ত বাতাসে ঝরা পাতার মত ইটগুলি ঝরে পড়তে লাগল। বড় বড় লোহার বীমগুলি বেঁকেচুরে রাস্তায় ছিটকে পড়ল। মাঝে মাঝে মানুষের আর্ত্তনাদও আসছিল; কিন্তু এ মহা ধ্বংসনাদের মধ্যে তা' জীনার কণ্ঠের চেয়েও অনেক ক্ষীণ, অনেক দুর্ব্বল। আমার চারিদিকে ইটকাঠ ছুটে পড়ছিল; কিন্তু আমি মরলাম না।

তখনও আমি ছুটছি। গুড়ুম···আবার বোমা! ঐ যে দু'খানা বাড়ীর পরের বাড়ীতেই পড়ল। টাটকা গরম রক্ত মাখা এক তাল মাংস আমার মুখে থ্যাপ্ করে কাদার মত এসে লাগল। আচম্‌কা খানিকটা রক্ত আমার মুখের ভিতর গেল। ইস্···কি নোস্তা!

চারিদিকে বোমা পড়তে লাগল। বোমা ফাটার অতি উগ্র আলোর দৃষ্টি ক্ষণিকের জন্য অচল হ'য়ে উঠে। তার পরই দৃষ্টি মেলে দেখতে হয় আশে-পাশে কোথাও বড় একটা খাদ না হয় ইটের একটা স্তূপ বা এমনি একটা কিছু।

যাক্ বাঁচা গেল—এই যে ওয়ালেস্ ষ্ট্রীট। সাম্‌নের মোড়টা পার হ'লেই ১৪ নং বাড়ী। প্রাণপণে ছুট্‌তে লাগলাম। কিন্তু মোড়ের মুখে গিয়ে দেখলাম, কোথায় ১৪ নং নম্বর! একটা বিরাট্ খাদ, আর তার পাশে ইটের স্তূপ দৃষ্টিকে অবরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। পাশের বাড়ীর দোরে গিয়ে কড়া নাড়তে লাগলাম। একজন বুড়ো একটু বিরক্ত হ'য়েই দোরটা খুলল। হাঁপাতে হাঁপাতে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "ডাঃ স্কটের কোনও খবর জানেন?"

বুড়ো ইটের স্তূপের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করে দোর বন্ধ করে দিল। আমি দোর গোড়ায় থপ্ করে বসে পড়লাম।

বোমা বর্ষণ বন্ধ হ'য়ে গেছে। দমকল ও ডিফেন্সদের গাড়ী রাস্তায় রাস্তায় ছুটে বেড়াচ্ছে। আমার পা যেন আর চল্‌তে চায় না, হতাশায় শরীর যেন শিথিল হ'য়ে আসছে। না, এ অবসাদও আমার শোভা পায় না! আমার লরেল আর জীনা? যদি জার্ম্মাণ বিমান আমাদের বাড়ীও বাদ না দিয়ে থাকে? তবে?

আমি ফিরে চাইলাম; কিন্তু আগের মত ততটা সহজে চল্‌তে পারলাম না। কিছুদূর পরে পরেই বড় বড় খাত

আর ইট্, কাঠ, লোহার গাদা রাস্তার উপর জড় হ'য়ে আছে। আঁধারে ইটের স্তূপগুলি সন্তর্পণে পার হ'য়ে যেতে লাগলাম। ওকি—! থম্‌কে দাঁড়ালাম। শিশুর কান্নার শব্দ না? হ্যাঁ—তাই ত। কান্নার অনুসরণ করে' খানিকটা এগিয়ে দেখি, কার দু'তিন মাসের এক দুগ্ধপোষ্য শিশু ইটের স্তূপের উপর পড়ে' আছে। হতভাগাকে বুকে তুলে নিলাম। মনে পড়ল লরেলের কথা—সেও হয়ত তার মা-বাবাকে না দেখে পথিকের দয়ার প্রত্যাশা করে' আছে।

কিন্তু এ শিশুটিকে কি করি? ভাল, আসবার সময়ে ভেলেটকে গীর্জ্জার পাশে গলির মোড়ে পাহারা দিতে দেখে এসেছি, তাকেই শিশুটা দেব, যা' হয় একটা কিছু ব্যবস্থা সেই করবে। গীর্জ্জায় তখন আগুন ধরে' গেছে। দমকলের লোকেরা প্রাণপণ আগুন নিবাতে চেষ্টা করছে। খানিকটা দূর হ'তে গীর্জ্জার আগুনের আলোকে দেখলাম, ভেলেট যেন ফুট্‌পাতে বসে একটু ঝিমিয়ে আরাম করে' নিচ্ছে। মাথাটা তার বুকের উপর ঝুলে পড়েছে। কাছে গিয়ে ডাকলাম,—"ভেলেট—!"

কোনও জবাব এল না।

গায়ে একটু ধাক্কা দিয়ে আবার ডাকলাম "ভেলেট—!

ভেলেটের লাস ফুটপাতে টলে' পড়ল। বুকে হাত দিয়ে দেখি—সব শেষ! লাসটানা গাড়ী পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, হাত দেখিয়ে থামালাম। দু'টো লোক নেমে এল। আমি ভেলেটকে দেখিয়ে দিলাম। তারা তাকে গাড়ীতে পুরে ড্রাইভারের পাশে চাপতে গেল। আমি শিশুটিকে একজনের কোলে দিয়ে বললাম—"কুড়িয়ে পেয়েছি—করণ্ ষ্ট্রীটের শেষের দিক্‌টায়, যদি হতভাগার কেউ বেচে থাকে ত, তাকে দেবেন।"

লোকটি ধন্যবাদ জানিয়ে গেল। গীর্জ্জা পার হ'য়ে বাড়ীর রাস্তায় মোড় ফিরতেই দু'চোখে যেন কিছুই দেখতে পেলাম না—কেবলই আঁধার, গাঢ় আঁধার। ভাবলাম, এতক্ষণ আগুনের আলোকে ছিলাম, তাই চোখে ধাঁধা লেগেছে। বেশ করে' চোখ দু'টো রগ্‌ড়ে কয়েক পা চললাম। কিছু দূর পরেই লোহার বীমে হোঁচট খেয়ে পড়ে' গেলাম সাত-আট হাত নীচু এক খাতে। খাত—! এমনিটি তো এখানে ছিল না! বুঝতে বাকী রইল না। অজানা শঙ্কায় প্রাণের ভিতর হাহাকার করে' উঠল—আর যে দু'তিনখানা বাড়ী পরেই আমার বাড়ী। অন্ধকারে হামা দিয়ে উঠতে লাগলাম। মাথা ফেটে রক্ত পড়ছিল। শরীরে কোনও অনুভূতি আমার ছিল না; খাত, হ'তে উঠে প্রাণপণে ইটের স্তূপ বেয়ে উঠ্‌তে লাগলাম।

স্তূপের মাথায় সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে আমার বাড়ী দেখ্‌তে চেষ্টা করলাম। কিন্তু কৈ? যত দূর দৃষ্টি চলে, একখানা বাড়ীও যে দাঁড়িয়ে নাই। আমাদের দোরের সামনের বাড়ীর থামটি তেমনি দাঁড়িয়ে আছে; কিন্তু বাড়ী?

পাগলের মত কোনও বাধা না মেনে বাড়ীর থাম লক্ষ্য করে' গেলাম। লণ্ডনের আঁধার আকাশে আমার আর্ত্তনাদ ছড়িয়ে দিল বিষাদ। চোখের সামনে ফুটে উঠল শ্মশানের ছবি। আঁধার ভেদ করে' বাতাস কাঁপিয়ে দিল আমার কণ্ঠ—"জী···না···। জী·· না··· !!"

ক্ষিপ্তের মত দু'হাতে ইট সরাতে লাগলাম। টপ্ টপ্ করে' কপাল বেয়ে পড়ছিল ফোঁটা—তা' রক্ত, স্বেদ, না অশ্রু অথবা তিনেরই সংমিশ্রণ, তা' ভাববার মত মনের অবস্থা নয়। কাণে আমার তখনও বাজছিল অতি ক্ষীণ একটি পরিচিত স্বর—"তু···মি···যে···ও···না···। আ···মা···র···ভয়···করে!"

* * * *

ভোরের পূরবী আভা ধ্বংসস্তূপের উপর অট্টহাসি করে' যেন ছড়িয়ে পড়ল। আবছা আলোকে দেখলাম, দু'তিন হাত দূরে জীনার শতচ্ছিন্ন প্রাণহীন নিস্পন্দ দেহ-পিণ্ড। তার মুখখানা যেন ধ্বংস-দানব সযত্নে রক্ষা করেছে। মুখের উপর আঁকা রয়েছে ব্যথার নির্ম্মম ছবি। আর জীনার কপালে কপাল লাগিয়ে মাংস-পিণ্ড আঁকড়ে ধরে' লরেল একটু আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে। অশ্রুর দুটি ফোঁটা ভোরের ঝরা শিউলির মত চোখের পাতে ফুটে রয়েছে। লরেলকে টেনে কোলে তুলে' নিলাম। আচমকা জেগে সে বড় বড় চোখ দুটি মেলে তার মায়ের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল—"পাপ্পা, মাঃ!"

বৈদেশিক সংবাদ

ভারতীয় সেনার বীরত্ব :

খার্টুমের এক সংবাদে প্রকাশ, সুদান-রক্ষায় ভারতীয় সেনা যে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছে, তজ্জন্য সুদান গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষকে এক লক্ষ পাউণ্ড দান করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে আফ্রিকায় সুকৌশলী সংগ্রাম-পরিচালনা কৃতিত্বের জন্য প্রেমিন্দ্র সিং ভগৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সামরিক সম্মান ভিক্টোরিয়া ক্রশ (V. C.) লাভ করিয়াছেন। ইনিই সর্ব্বপ্রথম ভারতীয়—যিনি এই সম্মান লাভ করিলেন।

বৃটেনে বিমান হানা :

বৃটেনের উপর বিমানাক্রমণে মে মাসে মোট ৫৩৯৪ জন নিহত ও ৫১৮১ জন আহত হইয়াছে। ইহা ছাড়া ৭৫ জন নিখোঁজ; ইহারাও নিহত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস। নিহতদের মধ্যে ২৫১২ জন পুরুষ, ১৯৯৪ জন স্ত্রীলোক এবং ৭৫৩টি ১৬ বৎসরের নিম্নবয়স্ক বালক-বালিকা। মে মাসে এপ্রিল অপেক্ষা হতাহতের সংখ্যা দুই সহস্রাধিক হ্রাস পাইয়াছে দেখা যায়।

সাম্যবাদিনী লা পাসিওনারিয়া :

সম্প্রতি ফ্রাঙ্কো গবর্ণমেণ্টের বিচারে স্পেনের সাম্যবাদী দলের নেত্রী লা পাসিওনারিয়ার একক্রমে ১৫ বৎসর নির্ব্বাসন এবং পঁচিশ কোটি 'পেস্টা' (স্পেনীয় ডলার) অর্থদণ্ড হইয়াছে। লা পাসিওনারিয়ার প্রকৃত নাম সিনোরিটা ডলোরেস্ ইবারুই গোমেজ্। স্পেনের অন্তর্বিপ্লবের সময়ে ইনি ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে শুধু যে জনসাধারণকে তাঁহার অগ্নিগর্ভ বাগ্মিতায় উত্তেজিত করিয়াছেন তাই নয়, তিনি নিজেও সেই যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে এই নারীর অসমসাহসিকতায় মুগ্ধ হইয়া জনসাধারণ তাঁহাকে স্পেনের 'যোয়ান অফ আর্ক' আখ্যায় ভূষিত করিয়াছে।

জাহাজডুবির মাসিক খতিয়ান :

সরকারী ভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, মে মাসে বৃটিশ ও মিত্রপক্ষীয় ৯৮খানি জাহাজ (৪৬১৩২৮ টন) বিনষ্ট হইয়াছে। মার্চ্চ বা এপ্রিল মাস অপেক্ষা মে মাসে অনেক কম জাহাজ বিনষ্ট হইয়াছে, বিনষ্ট জাহাজগুলির মধ্যে ৭৩খানিই হইল বৃটিশ জাহাজ (৩৫৫০০০ টন); অবশিষ্টের মধ্যে মিত্রপক্ষের ২০ খানি (৯২০০০ টন) এবং নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের ৫ খানি (১৪০০০ টন)।

পরলোকে তরুণ বৈমানিক কালিপ্রসাদ :

লণ্ডনে জার্ম্মাণ বিমানাক্রমণ প্রতিরোধ করিতে গিয়া তরুণ বাঙ্গালী বৈমানিক কালীপ্রসাদ চৌধুরী অকালমৃত্যু বরণ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়স মাত্র ২৫ বৎসর হইয়াছিল। ইনি ব্যারিষ্টার ৺কুমুদনাথ চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র ও স্যার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের ভ্রাতুস্পুত্র। এই বীর বাঙ্গালীর মৃত্যুতে আমরা যুগপৎ দুঃখ ও গৌরব অনুভব করিতেছি।

স্বাদেশিক সংবাদ

বাংলার লোকগণনার হিসাব :

সম্প্রতি ইউনাইটেড প্রেস অবগত হইয়াছে যে, বাংলাদেশের লোকগণনার হিসাব সম্ভবতঃ জুলাই মাসের মাঝামাঝি প্রকাশ করা হইবে। বাংলা গভর্ণমেণ্ট প্রায় শেষ মুহূর্ত্তে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিরক্ষর ও শিক্ষিতের সংখ্যা প্রকাশ করিতে মনঃস্থ করিয়াছেন।

পরলোকে স্যার সি, ওয়াই চিন্তামণি :

এলাহাবাদের 'লীডার' পত্রিকার সম্পাদক স্যার সি, ওয়াই, চিন্তামণি গত ১লা জুলাই অপরাহ্নে পরলোকগমন করিয়াছেন। হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায়, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। স্যার চিন্তামণি একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিৎ ছিলেন।

পরলোকে শ্রীযুত গুরুসদয় দত্ত :

গত ২৫শে জুন প্রাতঃ ৬ ঘটিকার সময়ে ব্রতচারী আন্দোলনের প্রবর্ত্তক শ্রীযুত গুরুসদয় দত্ত, আই, সি, এস (অবসর প্রাপ্ত) তাঁহার বালিগঞ্জ ষ্টোর রোডের বাসায় পরলোকগমন করিয়াছেন। গত তিন মাস যাবৎ তিনি প্যাঙ্ক্রিয়াস্ ক্যান্সার রোগে ভুগিতেছিলেন।

শ্রীযুত গুরুসদয় দত্ত ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত বীরশ্রী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায়

৺গুরুসদয় দত্ত

দ্বিতীয় এবং এফ-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তিনি ইংলণ্ডে যান এবং ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সরকারী চাকুরীকালেও তিনি যে আত্মস্বাধীনতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা ভারতীয় আই-সি-এস-এর মধ্যে খুব কমই দেখা যায়। শ্রীযুত দত্ত সুলেখক ও সাহিত্যিক হিসাবেও খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। শিশুদের জন্য তিনি যে ছড়া ও কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা সাধারণের নিকট বিশেষভাবে আদৃত হইয়াছে। গত ডিসেম্বর মাসে জামশেদপুরপ্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্যসম্মেলনের তিনি মূল সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। পল্লীসংস্কার ও ব্রতচারী আন্দোলনে গভীর কর্ম্মনিষ্ঠা এবং বাংলা ও বাঙালীর প্রতি সত্যকারের মমত্ববোধ তাঁহার জীবনে ওতঃপ্রোতভাবে বহিয়া চলিয়াছিল। আমরা তাঁহার মৃত্যুতে স্বজন-বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করিতেছি।

পরলোকে প্রবীন সাহিত্যিক :

গত ১২ই জুন বৃহস্পতিবার সাহিত্যিক শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় ৭২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি কবি দ্বিজেন্দ্রলাল ও শিক্ষাব্রতী প্যারীচরণের জীবনীকার। তিনি 'তর্পণ', 'পথহারা', 'সরযূ' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তিনি ইংরাজী সাহিত্য ও ইতিহাসে বিশেষ সুখ্যাতি এবং একজন প্রসিদ্ধ সমালোচক ছিলেন। তাঁহার রচনা 'সাহিত্য', 'প্রয়াস', 'প্রদীপ' প্রভৃতি তদানীন্তন পত্রিকা-গুলিতে নিয়মিত প্রকাশিত হইত।

ভারতীয় ডাকবিভাগ :

ভারতীয় ডাক বিভাগের এক কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশ যে, ১৯৩৯—৪০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগ পর্য্যন্ত ১লক্ষ ৫৮ হাজার মাইলের বেশী রাস্তায় ডাক চলাচল করিয়াছে। ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যে যে বিমান-ডাক চলাচল করিয়াছে, তাহার মধ্যে পূর্ব্বগামী বিমান-ডাক-চলাচলের সংখ্যা ২১৫টি এবং পশ্চিমগামী বিমান ডাক চলাচলের সংখ্যা ২১৯টি। আলোচ্য বৎসরে ৭ কোটি ২২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার সাধারণ ডাকটিকিট এবং ১ কোটি ১৩ লক্ষ ১৯ হাজার টাকার সার্ভিস-ষ্ট্যাম্প বিক্রয় হইয়াছে।

বাধ্যতামূলক টীকা :

প্রকাশ, বাংলা সরকার ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় টীকা আইন সংশোধন করিয়া বাধ্যতামূলকভাবে টীকা লওয়ার জন্য একটি বিল বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদে উত্থাপন করিবেন।

প্যারাসুটনির্ম্মাণে বাঙলার রেশমী বস্ত্র :

বাঙ্গালার হস্তচালিত তাঁতে প্রস্তুত রেশমী বস্ত্র দ্বারা প্যারাসুট নির্ম্মাণ করা যায় কিনা, তৎসম্পর্কে ভারত গভর্ণমেণ্ট এক পরীক্ষাকার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

স্যার সুরেন্দ্রনাথের প্রতিমূর্ত্তি :

প্রকাশ, ব্রোঞ্জে নির্ম্মিত স্যার সুরেন্দ্রনাথের একটি প্রতিমূর্ত্তি কলিকাতার কার্জ্জন পার্কে স্থাপন করা হইবে। ১৪ ফুট উচ্চ ইতালীয় শ্বেতপাথরের একটি বেদীর উপর ঐ মূর্ত্তিটি স্থাপিত হইবে। কলিকাতার কোন এক
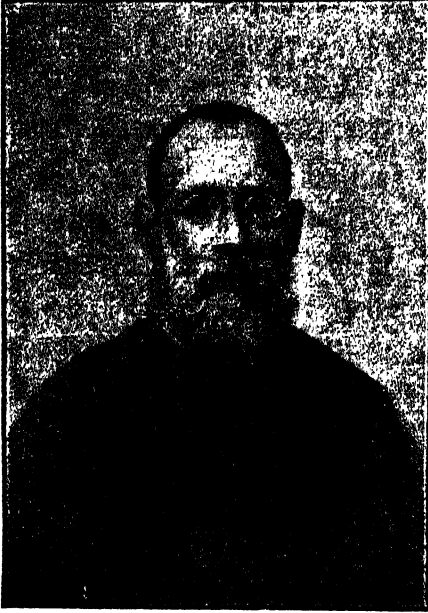
স্যার ৺সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি

বিখ্যাত বাঙ্গালী ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্ম্মের উপর এই প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করার ভার দেওয়া হইয়াছে। মাদ্রাজ সরকারী শিল্প ও কারু বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুত দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী এই মূর্ত্তিনির্ম্মাণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আগামী আগষ্ট মাসে স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু এই প্রতিমূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করিবেন।

অতিরিক্ত মুনাফা কর :

১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত অতিরিক্ত মুনাফা কর বাবদ প্রায় এক কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ভারত গভর্ণমেণ্ট আদায় করিয়াছেন। আশা করা যায়, সমস্ত মুনাফা কর আদায় হইলে, প্রায় ২ কোটি টাকা দাঁড়াইবে।

দেশবন্ধু মৃত্যুবার্ষিকী :

গত ১৬ই জুন সোমবার কলিকাতায় বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ষোড়শ স্মৃতি বার্ষিকী অনুষ্ঠান হয়। কলিকাতার নাগরিকবৃন্দ প্রাতে কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে এবং অপরাহ্নে কলিকাতা টাউনহল ও অন্যান্য সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া লোকান্তরিত প্রিয় জননায়কের প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করেন।

প্রধান সহরগুলিতে দৈনিক দুগ্ধের কাট্‌তি :

কতিকাতায় দৈনিক ৩৪৫৪ মণ দুগ্ধের ব্যবহার হয়, বোম্বাই-এ দৈনিক দুগ্ধের কাট্‌তি ৩,৭৫০ মণ, মাদ্রাজে দৈনিক মোট ১,২৬৫ মণ দুগ্ধের ব্যবহার হয়।

মহিলার পিএইচ্, ডি, ডিগ্রী লাভ :

ভারত গভর্ণমেণ্টের সরবরাহ বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারী মিঃ একরামউল্লা, আই, সি, এস্-এর পত্নী মিসেস্ শায়েস্তা একরামউল্লাকে লণ্ডন ইউনিভার্সিটি হইতে পিএইচ, ডি ডিগ্রী প্রদান করা হইয়াছে। উপন্যাস ও ছোটগল্পের বিশেষ উল্লেখ সহ উর্দ্দু সাহিত্যের সূক্ষ্ম পর্য্যালোচনা তাঁহার থিসিসের বিষয়বস্তু ছিল।

পাটের নূতন ব্যবহার আবিষ্কার :

জনৈক ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের গবেষণার ফলে পাটের নূতন ব্যবহার আবিষ্কৃত হইয়াছে। যতটুকু জানা গিয়াছে তাহাতে মনে হয় যে, পাট হইতে রাসায়ণিক প্রক্রিয়ার বলে এক প্রকার মণ্ড প্রস্তুত করা হইবে এবং এই মণ্ড হইতেই ঢেউ তোলা টিনের মত (Corrugated Iron sheet) এক প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হইবে। এইগুলির দ্বারা ঘরের ছাদ, বেড়া ইত্যাদি অনায়াসেই প্রস্তুত করা যাইবে। সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা এই যে, এইগুলি দামেও অনেক সস্তা হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়-সংবাদ :

১৯৪০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে ৭৯টি কলেজ ছিল; তাহাদের মধ্যে ১১টিতে কেবল মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। দুইটি কলেজে মেয়েদের জন্য ভিন্ন বিভাগ আছে এবং ১৬টি কলেজে ছাত্র ও ছাত্রী একত্র শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। মোটের উপর ৭৯টি কলেজের মধ্যে ২৯টিতে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এই বৎসর সর্ব্বসমেত ৩৬৮২১ জন

ছাত্র ও ২৫৭৫ জন ছাত্রী (মোট ৩৯৩৯৯ জন) কলেজগুলিতে অধ্যয়ন করেন।

চন্দননগরের নূতন মেয়র :

প্রকাশ, শ্রীযুত তুলসীচরণ রক্ষিত পদত্যাগ করায়, তাঁহার স্থলে ফরাসী ভারতের গভর্ণর মহোদয় চন্দননগরের অন্যতম সহকারী মেয়র মঃ ডি, কুণ্ডুকে মেয়র মনোনীত করিয়াছেন।

কলিকাতায় নারী ও পুরুষ :

১৯৪১ খৃষ্টাব্দের লোক-গণনায় কলিকাতা সহরে নারী ও পুরুষের সংখ্যায় বিরাট্ অসাম্য পরিলক্ষিত হইয়াছে। মোটামুটি হিসাবে দেখা যায় যে, কলিকাতার মোট ২১১০০৫১ জন অধিবাসীর মধ্যে ১৪৫৫৮৭১ জন পুরুষ এবং ৬৫৬১৮০ জন নারী। পূর্ব্ববর্ত্তী লোকগণনায় পুরুষের সংখ্যা অধিক হইলেও, এত অসাম্য পরিলক্ষিত হয় নাই।

বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিঃ :

শেয়ার মার্কেট এতকাল পর্য্যন্ত সাহেব ও মাড়োয়ারীদের একচেটিয়া ছিল। অতি অল্পদিন হইল বাঙালী শেয়ার মার্কেটে কাজ করিতেছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই বাঙালী সেখানে প্রচুর প্রতিপত্তি বিস্তার ও সম্মান অর্জ্জন করিয়াছে। কলিকাতা ষ্টক্ এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েসন লিমিটেডের প্রেসিডেণ্টরূপে মিঃ জে, এম, দত্ত মহাশয়ের নির্ব্বাচন তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আগামী জুলাই মাস হইতে সিণ্ডিকেটের গৃহনির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইবে। আমরা এই বাঙালী প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

ভারতে জাহাজনির্ম্মাণের কারখানা :

গত ২১শে জুন ভিজাগাপট্টম বন্দরে ডাক্তার রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভারতের প্রথম জাহাজনির্ম্মাণের কারখানার ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ সিন্ধিয়া ষ্টীম্ নেভিগেশন কোম্পানী এই কারখানার প্রতিষ্ঠাতা। কারখানাটি প্রথমে কলিকাতায় খুলিবার কথা হয়, কিন্তু শ্বেতাঙ্গ প্রভাবাধীন কলিকাতার পোর্ট কমিশনার প্রতিষ্ঠান বিরূপ হওয়ায়, মাদ্রাজে স্থান নির্ব্বাচন করিতে হয়।

ভারতীয়ের সম্মানলাভ :

জাপানে আন্তর্জ্জাতিক সংস্কৃতিসম্মেলনের পক্ষ হইতে কাকুসাই সিন্‌কোকোকির প্রবর্ত্তিত আন্তর্জ্জাতিক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ষড়বিংশ অধিবেশনে (The 26th. Centennial International Essay Contest Competition) দুইজন ভারতীয় বিশিষ্ট সম্মানের অধিকারী হইয়াছেন। ডাঃ সুকুমার দত্ত, প্রিন্সিপাল রামদাস কলেজ, দিল্লী এবং মিঃ দিগম্বর কাশীনাথ পাণ্ডে, নাগপুর যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার পাইয়াছেন।

দেশবন্ধুর মর্ম্মরমূর্ত্তি :

গত ১৫ই জুন রবিবার অপরাহ্ণে মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে চিত্তরঞ্জন স্মৃতিসৌধে পরলোকগত দেশবন্ধু দাশের একটি আবক্ষ মর্ম্মরমূর্ত্তির

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

আবরণ উন্মোচন করেন। কলিকাতার প্রাক্তন মেয়র মিঃ এ, আর, সিদ্দিকি এই প্রতিমূর্ত্তিটি প্রদান করিয়াছেন। বাংলার প্রথিতযশা শিল্পী শ্রীযুত কে, সি, রায় এই প্রতিমূর্ত্তিটি তৈয়ার করিয়াছেন।

কচুরীপানা হইতে কাগজপ্রস্তুতি :

বাংলা গভর্ণমেণ্টের শিল্পবিভাগের শিল্পগবেষণাগারে মিঃ এম, এ, আজম কচুরীপানা হইতে কাগজ ও প্রেসড্ বোর্ডনির্ম্মাণের জন্য যে গবেষণা করিতেছিলেন, তাহার সন্তোষজনক ফল পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানা যায়।

বঙ্গীয় বিক্রয়কর বিল :

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বিগত অধিবেশনে যে বঙ্গীয় বিক্রয়কর বিল পাস হইয়াছিল, বড়লাট ঐ বিলে সম্মতি

দিয়াছেন। ১লা জুলাই হইতে ঐ আইন বলবৎ হইয়াছে। এই আইন অনুসারে যে সকল আমদানীকারী, প্রস্তুতকারী ও উৎপন্নকারীর বার্ষিক বিক্রয়ের পরিমাণ মোট দশ হাজার টাকা এবং অন্য যে সকল ব্যবসায়ীর বার্ষিক মোট আয় পঞ্চাশ হাজার টাকা—তাহাদিগকে প্রতি টাকায় এক পয়সা হারে কর দিতে হইবে। কৃষিজাত ও অন্যান্য পণ্যসমেত ৩১ রকমের জিনিষ এই আইনের আমলে আসিবে না বলিয়া নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

মিঃ জে, সি, মুখার্জ্জীর পদত্যাগ :

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মসচিব মিঃ জে, সি, মুখার্জ্জী জামসেদপুরের

মিঃ জে, সি, মুখার্জ্জি

প্রধান টাউন-সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুত মুখার্জ্জীর কর্ম্মদক্ষতা কলিকাতার বহু উন্নতিকর কার্য্যের জন্য দায়ী।

ফেডারেল কোর্টের নূতন বিচারপতি :

এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, পরলোকগত স্যার শাহ সুলেমানের স্থানে ফেডারেল কোর্টের বিচারপতি পদে ভারত সরকারের আইন-সচিব স্যার জাফরুল্লা খাঁর নিয়োগ ভারতসম্রাট্ অনুমোদন করিয়াছেন।

রামকৃষ্ণ মিশনে দান :

পরলোকগত ডাক্তার বারিদবরণ মুখার্জ্জির বিরাট্ গ্রন্থাগার রামকৃষ্ণ মিশনকে দান করা হইয়াছে। এই গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা ছিল ৫০,০০০ ও ইহার আনুমানিক মূল্য দেড় লক্ষ টাকা।

প্রবর্ত্তক আশ্রমে স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি :

রায়না প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের সাদর আহ্বানে মণ্ডলেশ্বর স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজ বিগত ৭ই জ্যৈষ্ঠ অপরাহ্নে স্থানীয় আশ্রম কেন্দ্রে শুভাগমন করেন। প্রথমেই তিনি উপাসনামন্দিরে গমন করিয়া মাতৃপ্রতিমার ধ্যান ও পূজা করেন এবং তৎপরে সমাগত উৎসুক জনমণ্ডলীর সম্মুখে প্রায় এক ঘণ্টাকাল ধর্ম্ম সম্বন্ধে এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন: "আত্মসমর্পণ সিদ্ধ হইলে যে জীবন-লাভ হয়, তাহাই ভারতের কাম্য এবং ভারতের সত্যকার কল্যাণ ও মুক্তি, এইরূপ ঈশ্বরপ্রতিষ্ঠ মুক্ত জীবন-লাভের উপরই নির্ভর করে। এই লক্ষ্যেই প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের সকল কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত বলিয়া তাঁহারা আজ 'প্রবর্ত্তক' নামে অভিহিত।" তিনি উপস্থিত সকলকে আশ্রমের নিত্যনৈমিত্তিক উপাসনায় নিয়মিত যোগদান করিতে উপদেশ দান করেন।

স্বাধ্যায় ও সেবাপ্রতিষ্ঠান :

১৯৪০ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম. এ. মহোদয়ের উদ্যোগে Upanishadic Board of Study and Service অর্থাৎ উপনিষদের তত্ত্বমূলক স্বাধ্যায় ও সেবাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। স্বাধ্যায়প্রতিষ্ঠানের কার্য্য প্রতি বুধবার সন্ধ্যাকালে শ্রীযুত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ৩নং শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীটস্থ গোপালভবনে সুচারুরূপে চলিতেছে। এই স্বাধ্যায়-প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য প্রতি চিন্তার ও বাক্যের মধ্য দিয়া নিজেকে প্রবুদ্ধ করা।

সম্ভাব্য বিমানাক্রমণ :

সম্ভাব্য বিমানাক্রমণের ফলে কলিকাতার জল-সরবরাহ বন্ধ হইবার আশঙ্কায় বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে নলকূপখননের যে ব্যবস্থা করিতেছেন তাহার সমস্ত ব্যয় ১৬০০,০০০ টাকা ভারত গভর্ণমেণ্ট বহন করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। বর্ত্তমানে ২৫০০ নলকূপের খননকার্য্য চলিতেছে।

৺প্রাণকৃষ্ণ সাধুখাঁ :

গত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ন ৬ ঘটিকার সময়ে সুবিখ্যাত ব্যবসায়ী ৺প্রাণকৃষ্ণ সাধুখাঁ তাঁহার রিষিড়াস্থ বাসভবনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে
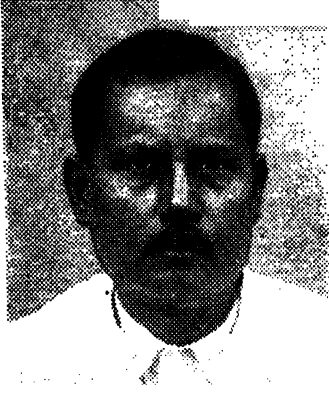
৺প্রাণকৃষ্ণ সাধুখাঁ

তাঁহার বয়স ৫১ বৎসর হইয়াছিল। বঙ্গেশ্বরী কটন মিল প্রভৃতি নানা ব্যবসায়প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট থাকিয়া বাঙালীর ব্যবসাপ্রচেষ্টাকে অনেকখানি সফল করিয়া গিয়াছেন।

পরলোকে কবিরাজ সতীশচন্দ্র শর্ম্মা :

খ্যাতনামা কবিরাজ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিভূষণ মহাশয় বিগত ২০শে আষাঢ়, শুক্রবার রাত্রি ১২৷৷০টার সময়ে তাঁহার বেহালা—সাহাপুরস্থিত 'শর্ম্মা হাউসে' পরলোকগমন করিয়াছেন।

চিকিৎসা ব্যবসায় ছাড়া তাঁহার সাহিত্যিক প্রচেষ্টাও উল্লেখযোগ্য ছিল। তিনি বঙ্গভাষায় 'চরক'-এর অনুবাদ করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি খ্যাতনামা সাহিত্যিকগণের সমসাময়িক ও বন্ধু ছিলেন।

সাত বৎসর পূর্ব্বে তিনি বিপত্নীক হইয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি সুযোগ্য চারি পুত্র, দুই কন্যা ও বহু পৌত্র পৌত্রী রাখিয়া গিয়াছেন। কবিরাজ মহাশয়ের মৃত্যুতে তাঁহার পরিবারবর্গের অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে আর বাংলাদেশও সে-যুগের একজন সত্যকারের সদাশয় হৃদয়বান্ ব্যক্তিকে হারাইল। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

কুস্তি-প্রতিযোগিতায় সম্মানলাভ :

সিমলা ব্যায়ামসমিতির শ্রীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দে বালি কুস্তি-প্রতিযোগিতায় ৯ ষ্টোন বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হইয়াছিলেন। এ বৎসরও ইনি বালিতে
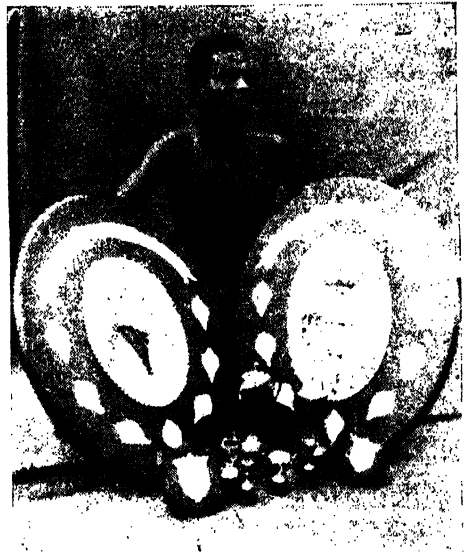
শ্রীযুত কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয় কুস্তি-প্রতিযোগিতায় ১০ ষ্টোন বিভাগে বিজয়ী মল্লকে পরাজিত করিয়া চ্যাম্পিয়ন্‌শিপ্ লাভ করিয়াছেন। বাঙালী তরুণের এ কৃতিত্বে বাঙালী গৌরবান্বিত।

হিন্দু মহাসভায় প্রত্যক্ষ সংগ্রাম স্থগিত :

শনিবার ১৪ই জুন ভবানীপুর আশুতোষ কলেজ প্রাঙ্গণে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভা কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হয়। মহাসভার মাদুরা প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করিয়া বড়লাট ও বীর সাভারকরের যে পত্রালাপ চলিয়াছিল, সেই সম্পর্কে ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য এই অধিবেশনের অনুষ্ঠান হয়। ১৫ই জুন রবিবার প্রাতে দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন হয়। প্রায় তিনঘণ্টা

আলোচনার পর মাদুরা অধিবেশনের প্রস্তাবিত সংগ্রাম স্থগিত রাখিবার জন্য ডাঃ মুঞ্জে যে প্রস্তাব করেন, তাহা ৬১-১০ ভোটে গৃহীত হয়।

কালনা সাহিত্যবাসর:

কালনা সাহিত্যবাসরের সভ্যবৃন্দের উদ্যোগে গত ৩১শে জ্যৈষ্ঠ কলিকাতা ১২৪।বি, বিবেকানন্দ রোডে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষ সম্পাদক শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম. এ. মহোদয় সভাপতি এবং 'প্রবর্ত্তক' যুগ্ম সম্পাদক শ্রীযুত রাধারমণ চৌধুরী বি. এ. মহাশয় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। সভায় শ্রীযুত জগদীশচন্দ্র রায়, শ্রীযুত দেবনারায়ণ গোস্বামী, শ্রীযুত বীর্য্যেন্দ্রকুমার মল্লিক ও শ্রীযুত মহীতোষ বিশ্বাস রচনা পাঠ করেন। কবি অপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুত বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত সভার কার্য্যে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভাপতি ও প্রধান অতিথি মহাশয় সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। কবিরাজ শ্রীবীরেন্দ্রকুমার মল্লিক মহাশয় সকলকে জলযোগ দ্বারা আপ্যায়িত করেন।

যক্ষ্মা রোগের প্রসার:

(১) কলিকাতায় যক্ষ্মারোগীর সংখ্যা ... ৩০,০০০ জন।
প্রতিদিন মারা যায় ... ৮ জন।
(২) কোন প্রকার চিকিৎসার সুযোগ পায় না ... ২৭,০০০ জন।
(৩) বাৎসরিক মৃত্যুসংখ্যা ... ৩,০০০ জন।
(৪) যক্ষ্মা-নিবারণী সমিতির চিকিৎসা-কেন্দ্রে রোগীর সংখ্যা প্রায়··· ৫০০ জন।
(৫) হাসপাতালে এবং অন্যান্য স্থানে রোগীর থাকার ব্যবস্থা আছে প্রায় ৩০০ জনের।

সংক্ষেপে যক্ষ্মারোগ সম্বন্ধে—ইহাই আমাদের প্রধান সমস্যা।

রাধেয় তীর্থ:

গত ১৯শে মে রবিবার চন্দননগর গোস্বামিঘাটে যে নূতন ঘাট প্রতিষ্ঠার শুভানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়, তাহাতে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমতিলাল রায় মহাশয় ভিত্তি-স্থাপন করেন। ঐ দিন পল্লীস্থ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং চন্দননগরের শ্রদ্ধেয় শ্রীহরিহর শেঠ, ডাঃ আশুতোষ দাস, শ্রীযুত ভোলানাথ শেঠ, শ্রীযুত ভূষণচন্দ্র পাল, কবিরাজ মহেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রভৃতি মাননীয় ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া সভার আয়োজন করেন। ডাঃ আশুতোষ দাশ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পণ্ডিত কালিদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ মহাশয় উদ্যোক্তৃগণের পক্ষ হইতে সুললিত সংস্কৃত ছন্দে শ্রদ্ধেয় রায় মহাশয়কে নিম্নের মানপত্রখানি প্রদান করেন:

অখণ্ড সচ্চিদানন্দমবাঙ্ মানস গোচরং।
বাঞ্ছা কল্পতরুং নুমঃ সর্ব্ব বিঘ্নোপশান্তয়ে॥

শ্রীধর্ম্মগোপ্ত-প্রবরং মনুষ্যাং
মনস্বিনং ত্বমধিগত্য নূনং।
তিথৌ মহত্যাং শুভ পৌর্ণমাস্যাং
লাবণ্যজ্যোতিঃস্ফুরিতঙ্গবেশম্॥
লগ্নে মনোজ্ঞে জগদীশ তীর্থে
বাধাবিহীনামিহ প্রার্থয়ন্তে।
স্বস্তিংস্তু পূর্ণে কলিকালসন্ধৌ
"রাধেয় তীর্থং" খলু গঙ্গাতীরে॥
পুরা হি ত্রেতাযুগে গাধিপুত্রঃ
চকার ভূমৌ নবীন প্রয়াসং
বীর্য্যেন লব্ধা কিল ব্রহ্মসিদ্ধিং
জুঘোষ চোচ্চৈস্তু'নকর্ম্মবৃত্তিম্।
তথৈব ক্ষাত্রং প্রথমং প্রকট্য
ততশ্চ ব্রাহ্মং সুপবিত্র বোধম্।
কালে বিপন্নে ধৃতবৈশ্যবৃত্তৌ
গুণাকান্তি ত্বয়ি বদ্ধসখ্যাঃ।
স পর্য্যাবিধিজ্ঞো ভবান সর্ব্বধর্ম্মবিশারদঃ।
বিস্তারতাং জনৈঃ সর্ব্বৈ বর্ণাশ্রম: শরীরবান্।

শ্রীমতিলাল রায়

আগামী সংখ্যা হইতে বাণী বসুর (ঘোষ) রোমাঞ্চকর সন্তরণ-কাহিনী বাহির হইবে

যুগ্ম সম্পাদক: শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী
প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি-এ কর্ত্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত এবং প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৫২।৩ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীফণিভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

—প্রবর্ত্তক—

ভাদ্র, ১৩৪৮

২৬শ বর্ষ

১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা
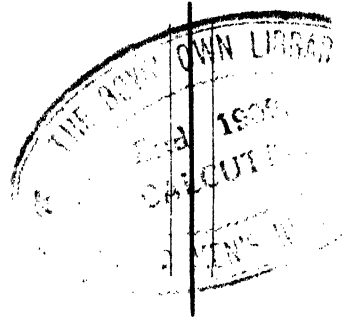
কল্যাণীয়াসু

সেদিন যখন গান গেয়েছি
আপন মনে নিভৃতে
বিনা কাজে দিন গিয়েছে চলে
তখন আমি চোখে তোমার
হাসি দেখেছি যে
চিনেছিলে আমায় সাথী বলে।
তোমার ধূলো, তোমার আলো
চোখে আমার লাগত ভালো,
শুনেছিলুম উদাস করা বাঁশি,
বুঝেছিলে সে ফাল্গুনে
আমার সে গান শুনে শুনে
তোমারো গান আমি ভালবাসি॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১ আষাঢ়
১৩৪৫

শ্রীলীলাবতী দেবীর সৌজন্যে।

সম্পাদকীয়

বিশ্ববরেণ্য মহাকবি মনীষী রবীন্দ্রনাথ নাই! নিখিল জাতির রুদ্ধ হৃদয়-বেদনা আজ আর্ত্তরোলে উচ্ছ্বসিত, তরঙ্গায়িত। শুধু বাংলা নয়, ভারত নয়, প্রাচ্য নয়, উভয় ভূমণ্ডলব্যাপী ধরণীর বিপুল মানবজাতি অশ্রুসাগরে অভিষিক্ত।

এই সেদিন বাঙালী দেশবন্ধু ও দেশপ্রিয়কে হারাইয়াছে। বাংলার শত বৎসর অগ্রে জাত সুসন্তান—রামমোহন, রামকৃষ্ণ, বঙ্কিমচন্দ্র, গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ—ইঁহাদের শত-বার্ষিকী পূজার শেষ পূর্ণাহুতি পড়িতে না পড়িতে—মর্ম্মের ক্ষত শুকাইতে না শুকাইতে বঙ্গজননী আবার মর্ম্মহারা হইলেন। এই কবিবিয়োগ-দুঃখ, ব্যথা ও অশ্রুর যেন ভাষা নাই, কূল-কিনারা নাই, সান্ত্বনা নাই। কে জানে এই করুণ-সুন্দর, এই স্বচ্ছ, অমল অশ্রুসায়রে সিনান করিয়া বাঙালী আজ কোথায় চলিয়াছে! তবুও আজ ভিতর হইতে কে যেন সেই প্রাচীন ঋষিদের মতই হুঙ্কার দিয়া গর্জ্জিয়া উঠে—শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ!

—না, আমাদের কবির ত মৃত্যু নাই! মহাকবি রবীন্দ্রনাথ আজ মরণের পর-পারে দাঁড়াইয়া সমগ্র বাঙালী জাতির জীবন জুড়িয়া প্রেমের রাজ্য পাতিয়া বসিয়াছেন। বাংলার প্রিয়তম কবির পুণ্যস্মৃতি আজ দেহ ছাড়িয়া, তাঁহারই অশরীরী আত্মাকে ঘেরিয়া জাতির হৃদয়-গলা অশ্রুরূপে প্রবাহিত। বাংলার কবি স্বয়ং তাঁর দীপ্ত বাণীমন্ত্রে একদিন এই মৃত্যুঞ্জয়ী দীক্ষাই স্বজাতিকে দিয়া গিয়াছেন। কবি ছিলেন সত্যের দ্রষ্টা ও উপাসক :

> ওরে ভীরু, ওরে মূঢ়, তোল তোল শির—
> আমি আছি, তুমি আছ, সত্য আছে স্থির।

স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ

কবি—কবি, তিনি কেন কর্ম্মী হইতে চাহিলেন—এ কথা কতবার কত জনের না মনে হইয়াছে! আমরা জানি—কবির নিজের মনেও কত দিন না এমন সংশয় খেলিয়াছে! স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ শুধু রস-স্রষ্টা, কাব্য-স্রষ্টা, সাহিত্য-স্রষ্টা হইলেই ত ভাল হইত, তাঁহার কর্ম্মলিপ্সা, আশ্রম গঠন লিপ্সা, বিশ্বভারতীপ্রতিষ্ঠা—এসব কবি-ভাব-বিরুদ্ধ মনোবৃত্তি কেন? কবিকে তাঁহার নিভৃত সাধনার কোণ হইতে এক অদৃশ্য ভাগ্যদেবতা নিষ্ঠুর আকর্ষণে টানিয়া আনিয়াছে, তাঁহাকে বিশ্বের রাজদরবারে বসাইয়াছে বিশ্বমনীষীরূপে—এ কথা সত্য হইলেও, সম্পূর্ণ সত্য নয়। জাগ্রত আত্মার উপর বাহিরের আকর্ষণও নিতান্ত বাহিরের কারণেই হয় না—হইতে পারে না। কবি সৃষ্টির আনন্দেই যেমন ভাবকে সুরে ও ছন্দে ভাষা দিয়াছেন, রসকে রূপ দিয়াছেন—তেমনি একই সিসৃক্ষার আনন্দেই তিনি কর্ম্ম ও প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করিয়াছেন। স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ পরিপূর্ণ স্রষ্টা—তিনি একাধারেই ভাবস্রষ্টা ও কর্ম্মস্রষ্টা। এই নিখুঁৎ সৃষ্টি-মূর্ত্তিই আমরা রবীন্দ্রনাথে ফুটন্ত, লীলায়িত হইতে দেখিয়াছি। কোথাও তাঁর সাফল্য অধিক, কোথাও অল্প হইতে পারে, কিন্তু তাঁর কল্পনার এই সত্যনিষ্ঠা, তাঁর এই বস্তুতন্ত্র পরিপূর্ণতার পিপাসা যে কতখানি ওতঃপ্রোতঃ ছিল, তাহা তাঁহার দীর্ঘজীবন অনুধ্যান করিলেই স্পষ্ট বুঝা যায়। যিনি বলিয়াছেন—রবীন্দ্রনাথ ছিলেন শ্রীভগবানের একটা পূর্ণ সৃষ্টি, তিনি ঠিক কথাটাই ধরিয়াছেন। মানবের এই কবি-কর্ম্মীর মিলিত রূপ, এই বিদ্যা ও অবিদ্যা, অধ্যাত্ম ও অধিভূতের সমন্বিত বিগ্রহই প্রাচীন বৈদিক ভারতের, ঋষি-মানবের সম্পূর্ণ আদর্শ ছিল : অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে। কবীন্দ্রের জীবনে এই কল্প-বিগ্রহেরই আত্মপ্রকাশ আমরা লক্ষ্য করিয়াছি।

আর ইহাই তো উত্তম জীবন-শিল্প। উপনিষদে আত্মার পূর্ণ স্বরূপ বলা হইয়াছে—"কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ"—কবি যিনি, তিনিই মনীষী, আবার পরিভূ ও স্বয়ম্ভূ। কবি নিজ অন্তরের সুরেই জীবনবীণা বাঁধিয়া শিশুকাল হইতে গান গাহিয়া চলিয়াছেন—গান গাহিতে গাহিতেই তিনি আপনাকে আবিষ্কার করিয়াছেন, আবিষ্কার করিয়াছেন আপনার দীপ্তিময়ী কবি-প্রতিভা, আপনার উদার-অসীম-বিচিত্র বহুমুখী কল্পনা ও মনীষা, আপনার সৃষ্টিশক্তি, আপনার স্বপ্রতিষ্ঠ বিরাট্ জাতীয় ও আন্তর্জাতীয় মহিমা। "স্বে মহিম্নি রাজতে"—কবি আত্মার মহিমায় আপনি বিরাজিত হইয়া ফুটিয়াছেন—স্তরে স্তরে আপনাকে আবিষ্কার করিয়াই জাতির আত্মাকে

পাইয়াছেন—বিশ্বমানবকে পাইয়াছেন। কবি চিরদিন সুরেরই পূজারী—তাঁহার সমগ্র জীবন এই সুরশিল্প ভিন্ন আর কিছু নয়। রবীন্দ্রনাথ আসলে এই জীবনশিল্পীই—তিনি স্বয়ংসাধক ও স্বয়ংসিদ্ধ লীলার কবি। তন্ময় চিত্তে আপনার জীবনদেবতাকেই আপূর্ণ অনুসরণ করিয়া, তিনি নিজের ও জাতির জীবনে অধ্যাত্মজাগরণের ছন্দঃ মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছেন। মানুষ যদি অন্তর-দেবতার নির্দ্দেশ অনুসরণ করিয়া চলে, সেই চলাই সুন্দর হয়, সার্থক হয়। সকল কাব্য-কলা-রসসৃষ্টির ইহাই একমাত্র সত্য ও শ্রেষ্ঠ নীতি। বুদ্ধি নয়, আত্মার, অন্তরপ্রকৃতির অন্তস্তম প্রেরণা—ইহা সকল শিল্পেরই মূল, ইহাই জীবন-শিল্পের রসায়ণ। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ও কলায়, তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের চিত্র-সাধনায় পর্য্যন্ত এই সহজ সুন্দর স্বতঃস্ফূরণীয় স্বভাবপ্রেরণারই লীলা-নৃত্য আমরা পরিদর্শন করি।

জাতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রজীবন এক অখণ্ড পরিপূর্ণ মানবজীবন—তার অসংখ্য দিক্, অসংখ্য ভঙ্গী। তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্যের ন্যায় তাঁহার জীবনশিল্পের পূর্ণ রসাস্বাদ ও মূল্য-নির্ণয় ভবিষ্যৎ মানব জাতিই করিবে। তিনি বিশ্বকবি, কিন্তু আমাদের তিনি জাতীয় কবি। এই জাতীয়তার দায়ভারই তিনি বাঙালীকে দিয়া গিয়াছেন। কবি রবীন্দ্রনাথ একদিন "স্বদেশাত্মার বাণীমূর্ত্তি" বলিয়া তরুণ দেশসাধক শ্রীঅরবিন্দকে সম্বোধন করিয়াছিলেন—বন্দনাচ্ছলে গাহিয়াছিলেন—"অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার"। তিনি যে সেদিন দেখিয়াছিলেন, অরবিন্দকে আশ্রয় করিয়া জাতির অন্তরকামনাই মুক্তি চাহিতেছে, মূর্ত্তি চাহিতেছে।

কবি এই "দেশের হইয়া" দেশের চাওয়াকে পূর্ণ করার তপস্যাকে কত বড় করিয়া, আপন করিয়া বুঝিয়াছিলেন ও চিনিয়াছিলেন—তাহা আমাদের আজ বুঝিবার ও চিনিবার প্রয়োজন আছে। কবি নিজেও আমরণ এই দেশের চাওয়ারই পুণ্য প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। তিনি সত্যই স্বয়ং "স্বদেশাত্মার বাণীমূর্ত্তি"—বাঙালীর জাগরণ রবীন্দ্রনাথের জীবনেতিহাসে ওতঃপ্রোতঃ সংজড়িত, সংমিশ্রিত। শ্রীঅরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, দেশপ্রিয়, সুভাষচন্দ্র—যেখানে যখন যতটুকু দেশের চাওয়া ফুটিয়াছে, কবি তাঁহার পূজার, শ্রদ্ধার, আশ্বাসের, সহানুভূতির, সমপ্রেরণার অর্ঘ্য লইয়া ছুটিয়াছেন। দেবর্ষির বীণার তারে জাতীয়তার রাগিণী ক্ষণে-অক্ষণে অহর্ণিশি বাজিয়াছে।

> "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
> তবে তুই একলা চল রে।"

কবি ছিলেন বিপ্লবী তরুণেরও বিপদের বন্ধু, শোকে সান্ত্বনা, আবার অপথ ও বিপথ হইতে ফিরাইয়া স্বচ্ছ, অনাবিল, প্রেম ও সেবায় দেশমুক্তির নব পথ আবিষ্কার করার প্রেরণায় তাহাদের সহৃদয় সতর্ককারী উপদেষ্টা। কবি বাঙালীকে মায়ের ডাকে মিলিতে আকূতি জানাইয়াছেন কত ছলে কত ছন্দে—"ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই, ভেদ নাই"। আর তাদের হাতে প্রেমের মিলনের রাখী-সূত্র বাঁধিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে প্রার্থনার ঋক্-ধ্বনি তুলিয়াছেন—"বাংলার ঘরে যত ভাই বোন—এক হোক, এক হোক, এক হোক হে ভগবান"। কবীন্দ্রের জাতীয় সঙ্গীতগুলি একটি অখণ্ড জাতীয় জাগরণের প্রেরণাময়ী ঋক্-মালা। কবির জাতীয়তার এই মৌলিক সুরই আমাদের কাণে—শুধু আমাদের কেন, প্রতি দেশপ্রেমিক দেশ সেবকেরই প্রাণে চিরদিন অমৃত-সঙ্কেত বহন করিবে। "আমার জীবনে লভিয়া জীবন"—কবির জীবনে নবজীবন লাভ করিয়া, আমরা তাঁহার সংন্যাস্ত জাতীয়তার—স্বদেশ-সমাজের—বঙ্গব্যাপী শান্তি-নিকেতন ও শ্রীনিকেতন রচনার গুরু দায়ভার উত্তরাধিকার-সূত্রে বহন করিতে আজও পরিপূর্ণরূপে প্রস্তুত হইব না কি? কবির অমর আত্মা তবেই উর্দ্ধলোক হইতে আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন—আমরা তাঁহার দেহপ্রতিমার বিসর্জ্জনেও আবার তাঁহাকেই—তাঁর সত্য, নিত্য, শাশ্বত স্বরূপটিকেই মহাশক্তিরূপে ফিরিয়া পাইব। কবির বিসর্জ্জন পাইবে অমর প্রতিষ্ঠা জাতির জীবনে।

প্রবর্ত্তক আশ্রমে ঋষি রবীন্দ্রনাথ

কবীন্দ্র-পরিচয়ে

শ্রীমতিলাল রায়

প্রকৃতির অশ্রুবর্ষণ এখনও শেষ হয় নাই। সমীরণ এখনও হাহাকার করিতেছে। বিশ্বগৌরব রবীন্দ্রনাথ মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। শোকার্ত্তনাদে মানব-কণ্ঠই শুধু কাতর নহে; বিশ্বপ্রকৃতিও কাঁদিয়া আকুল হইয়াছেন।

১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ সোমবার রাত্রিশেষে কলিকাতা রাজনগরীতে জগদ্বরেণ্য মহামানব আবির্ভূত হইয়াছিলেন যে ক্ষেত্রে, ১৩৪৮ সালের ২২শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্নে তাঁর জন্মক্ষেত্র সেই ঠাকুরবাড়ীতেই তিনি ধরাধাম পরিত্যাগ করিলেন। অশীতিবর্ষ দুই মাস কবির আয়ুষ্কাল। আমাদের দেশে ইহা অল্পায়ুঃ নহে; কিন্তু কবিকে হারাইতে হইবে, এই ধারণা আমরা করিতে পারি নাই। তাঁর বার্দ্ধক্য-পীড়িত শরীর আশ্রয় করিয়া চির নবীন আত্মারই ঋদ্ধমন্ত্রে আমরা সঞ্জীবিত ছিলাম। এই মন্ত্রশক্তি হইতে বঞ্চিত হওয়ার ইচ্ছা আমাদের কোন কালেই হইবে না; কিন্তু তাঁর নশ্বর শরীর-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে কবির কণ্ঠগীতি আর আমাদের কর্ণ-কুহরে অমৃত বর্ষণ করিবে না। এই কথা যতই চিন্তা করি, ততই কবির দেহাবসান গভীর শোকের কারণ হয়; চক্ষে অশ্রু উথলিয়া উঠে।

কবির সহিত আমাদের পরিচয় ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট। ১২৯৩ সালের কলিকাতা-কংগ্রেসে পঞ্চবিংশতি বর্ষীয় তরুণ—"আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে" স্বরচিত এই গানটী গাহিয়া ভারতের প্রতিনিধিবর্গকে উল্লসিত করিয়াছিলেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট এই গান গাহিয়া আমরাও পথে পথে বেড়াইয়াছি। সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন রাষ্ট্রগুরু। আমরা তাঁর রাষ্ট্রপ্রাণের পরিচয় এখানে দিব না। আমাদের ধর্ম্মপ্রাণে অগ্নিসঞ্চার করিয়াছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথ। চলিত ১৩৪৮ সালের ৭ই আগষ্ট আমাদের পুনঃ স্মরণ করাইয়া দেয় ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্টের সেই জাতীয় জাগরণ-যুগ :

ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই, ভেদ নাই।
এক দেশ, এক ভগবান,
এক জাতি, এক মন প্রাণ—

আমরা কবির এই মর্ম্ম-সঙ্গীত গাহিয়া ৩০শে আশ্বিন রাখী-বন্ধন উৎসবে কি প্রেরণা, কি উৎসাহই না পাইয়াছি! রবীন্দ্রনাথ একাধারে বাংলার গৌরব, ভারতের ভাস্বর সূর্য্য, বিশ্বমানবের পথপ্রদর্শক। এত বড় মানুষ কত যুগ ভারতে জন্মেন নাই! বাংলা আজ সত্যই নিঃস্ব হইল। বাংলার গৌরব-রবি অস্তমিত হইলেন।

অতীতের স্মৃতি মন আকুল করিয়া তুলে। ১৩১৪ সালের

অগ্রহায়ণ মাসে কবির একবার সাক্ষাৎ-দর্শন মিলিয়াছিল। তাৎকালীন প্রতিষ্ঠিত সৎপথাবলম্বী সম্প্রদায়ের এক সাম্বৎসরিক অধিবেশনে তাঁহাকে পৌরোহিত্য করার নিমন্ত্রণ করিতে গিয়াছিলাম। জোড়াসাঁকোর বাড়ীতেই তাঁর দ্বিতল বিশ্রামকক্ষে তাঁহার সহিত আমাদের প্রথম পরিচয়। কি সুন্দর মূর্ত্তি! কি মধুর হাস্য! স্থির কণ্ঠের কি অমিয়-নির্ঝর বাণী! পৌষ মাসে তিনি পাবনা রাষ্ট্রীয় সভার পৌরোহিত্য করিতে গিয়া অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়েন। দ্বিতীয় বার সাক্ষাৎকারে তিনি আমাদের নিমন্ত্রণ এই কারণে প্রত্যাখ্যান করেন। সেদিন তাঁহার কণ্ঠে কি কাতরোক্তি বাহির হইতে শুনিয়াছি—কি করুণ দীন কণ্ঠে সে যাত্রা তাঁহাকে অব্যাহতি দিবার অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। নিজেকে এই জন্য তিনি কত অপরাধী মনে করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলেও আজ বিস্ময়ে অভিভূত হই। মেঘমুক্ত রবির ন্যায় আভিজাত্যের আবরণ কবিকে কোথাও প্রচ্ছন্ন রাখে নাই। তিনি ছিলেন দেশের কবি—আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার আদরের নিধি। তাঁর অকৃপণ হৃদয় সকলের জন্যই বিস্তৃত থাকিত।

ইহার পর দীর্ঘদিন কবির সাক্ষাৎ-দর্শন হইতে বঞ্চিত ছিলাম। স্বদেশী যুগের রাষ্ট্রগত নানা বিঘ্নে চন্দননগরে দীর্ঘ দিন এক প্রকার বন্দী ছিলাম। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে মুক্তি পাইয়া শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হই; কবি তখন বিদেশে। দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের আতিথ্যে কবির কুটীরে আশ্রয় পাই। তৃণাচ্ছাদিত দাওয়ার এক পার্শ্বে উচ্চ বেদীর উপর বসিয়া কবি সূর্য্যোদয় দর্শন করিতেন, আর শান্তিনিকেতনের সুশীতল বৃক্ষচ্ছায়ায় ছাত্রদের লইয়া কবি বিচরণ করিতেন, শান্তি-নিকেতনের সুদৃশ্য কাচ-নির্ম্মিত উপাসনামন্দিরে তিনি উপাসনা করিতেন। এই সকল স্থান পুণ্য তীর্থের ন্যায় দর্শন করিলাম। তীর্থমাহাত্ম্য অনুভব করিয়া সেবার কবির ভাবময় বিগ্রহ পূজা করিয়াই প্রত্যাবর্ত্তন করি।

১৩৩৪ সালের ৫ই মে ১৩১৪ সালের প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করিলেন সঙ্ঘের ৫ম বার্ষিক অক্ষয়া তৃতীয়া উৎসবে। এই বৎসর তিনি ইহার উদ্বোধন-সভার পৌরোহিত্য করেন। এই সঙ্গে কবিকে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের আশ্রম-প্রাঙ্গণে বসাইয়া আমরা এক উপাসনা-মন্দির-রচনার কল্পস্বপ্ন আঁকিয়াছিলাম। তিনি এই ভবিষ্যৎ মন্দির-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যে উদ্বোধন বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে বর্ণে বর্ণে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। কবির এই বাণীমূর্ত্তি প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ চিরস্থায়ী করিয়া রাখিবে। কবির সেই উদ্বোধন-বাণীর কিয়দংশ এইখানে উদ্ধৃত করিতেছি:
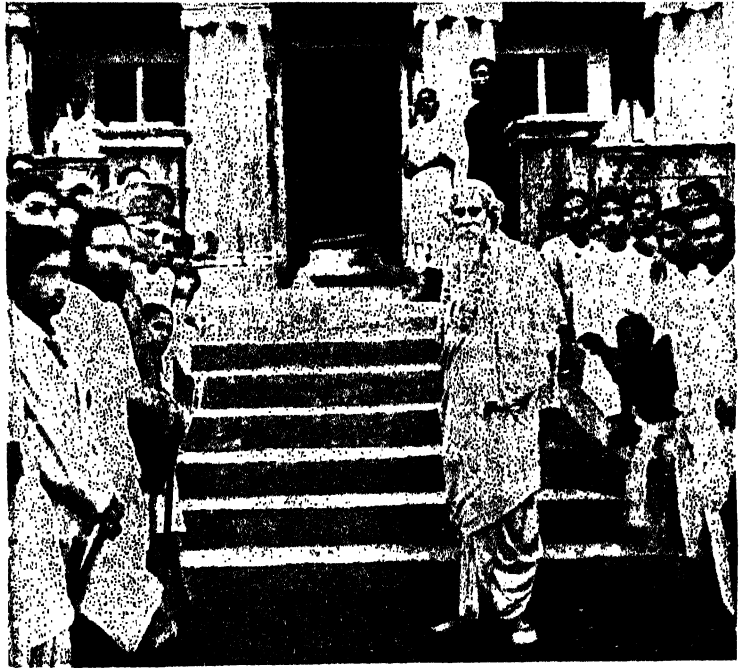
সঙ্ঘসভ্য পরিবেষ্টিত হইয়া প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘে রবীন্দ্রনাথ

"আমার উপর ভার দিয়েছেন আশ্রম-মন্দির স্থাপন করবার, এ বিষয় মন যা বলছে, তাই বলি। বনস্পতিকে বাইরে থেকে দেখি ভালপালা,

পত্রপুষ্প। যেটাকে দেখি না, সেটা তার প্রাণদেবতা। তাকে ধরা যায় না। গাছের মর্ম্মস্থলে সে থাকে। তাকে ত্যাগ করলে গাছ মরে' যায়। যেটা দেখতে পাই, সেটা ফুল, ফল, পত্র, কাষ্ঠ, সেইটাই দেখি। যেটা দেখা যায় না, তার যে সার্থকতা আছে, তা' মনে হয় না। বাইরের কাজ যা কিছু, তার কর্ম্মসূচি আছে, অনুষ্ঠান-পত্র আছে, আসবাবের বহুলতা আছে; কিন্তু তার অন্তরের মধ্যে প্রাণদেবতাকে যদি উপলব্ধি না করা যায়, তা' হলে ভুল হয়। সেই প্রাণদেবতাকে ধরবার চেষ্টা করবেন—সিদ্ধির দিকে লক্ষ্য করবেন না। সিদ্ধিও মায়াজাল বিস্তার করে' মন ভোলায়। এই আশ্রমের যাঁরা শিক্ষাগুরু, তাঁরা স্বীকার করেছেন—কর্ম্মকে নয়, কর্ম্মের মধ্যে যে বিশ্বদেবতা আছেন তাঁরা তাকে মানেন। উপনিষদে ইঁহাকে বিশ্বকর্ম্মা বলা হয়েছে—

এষ দেবঃ বিশ্বকর্ম্মা......
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ
হৃদা মনীষা মনসাভিকৢপ্তো য
এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।

এই যে বিশ্বকর্ম্মা, ইনি কি হাতুড়ি হাতে ক'রে কাজ করেন—মজুরের মত? যেমন মূর্ত্তিকর পাথর ভেঙ্গে মূর্ত্তি গড়েন, সেই রকম কি? হৃদয়ের মধ্য থেকে যিনি কর্ম্ম করেন, তিনিই বিশ্বকর্ম্মা। বাইরে থেকে যারা কাজ করে, তারা মজুর। হে বিশ্বকর্ম্মা, তোমার plan বুঝ্‌তে দাও, তুমি কি চাচ্ছ আমাকে বল, হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট হয়ে ভিতর থেকে বল। তোমার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে জানতে দাও—তুমি কি চাও। যাঁরা হৃদয়ের দিক্ দিয়া একান্ত মনের দ্বারা অনুভব করেছেন, তাঁরাই অমৃত।

এই আশ্রম আপনাকে আপনার দ্বারা উপলব্ধি করতে চায়—বিশ্বকর্ম্মাকে উপলব্ধি করতে চায়। কর্ম্মকে লক্ষ্য করে' যারা কাজ করেন, তাঁদের আমরা চিনি না। রাষ্ট্র-নীতি, সমাজ-নীতি প্রভৃতি অনেক নীতি অবলম্বন করে' যাঁরা কাজ করেন, আমরা তাঁদের চিনি না। আমরা জানি আনন্দ—অন্তহীন রূপের মধ্যে যে আনন্দ সেই অমৃতত্বকে প্রকাশ করছে।

এখানে এই কর্ম্মস্থলের মধ্যে যে মন্দির প্রতিষ্ঠা করবার ইচ্ছা করছেন, মাটীতে, ইটেতে, কাঠেতে যেন ইহার শেষ না হয়। সাধনার বিশুদ্ধিতে আত্ম-নিবেদনের উপর ইহার ভিত্তি সুদৃঢ় হউক। সব বাধা অতিক্রম করে' ইহার সিংহদ্বার বিশ্বের কাছে উদ্‌ঘাটিত হউক। এস তোমরা, সকল দিক্ থেকে তোমরা এস—কেবল দেশের কাছ থেকে নয়, কেননা এখানে যাঁর মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তিনি বিশ্বকর্ম্মা। যদি এই বাণী সত্য হয়, আত্ম-নিবেদনের মধ্য দিয়ে আপনিই আপনাকে প্রকাশ করবে। সে ইতিহাস হয়ত আজ প্রচ্ছন্ন আছে—একদিন প্রকাশ পাবে। সত্যের উপর যার শ্রদ্ধা আছে, সে সীমার মধ্যে অসীমাকে দেখতে পায়, যে মন্দিরের সত্যের উপর প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, নিত্যকালের জন্য, শাশ্বত কাল থেকে শাশ্বত কাল পর্য্যন্ত যাঁর বিধান, তাঁর আশীর্ব্বাদে—এ ধর্ম্মনিকেতনের সাধনা সার্থক হোক। একান্ত মনে সাধনা করি, অভিনন্দন করি। যাঁরা এই কার্য্যের সাধক, তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি; তাঁরা জয়যুক্ত হোন—বাইরে থেকে নয়, অন্তর থেকে সার্থক হউন। তাঁদের জীবন ধন্য হউক, এই কামনা করি।"

রবীন্দ্রনাথের এই আশীর্ব্বাদ সঙ্ঘের জীবনে সার্থক হইয়াছে। তিনি নারীমন্দিরপ্রতিষ্ঠার দিনে চন্দননগরের ভাগীরথীবক্ষে বজরায় অবস্থানকালে যে আন্তরিক বাণী প্রেরণ করেন, তাহাও সঙ্ঘের ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে:

ওঁ

নূতন দুয়ার নারীমন্দিরে
করি দিনু উন্মীলন।
অলোকের আলোকে ভিতরে বাহিরে
হোক শুভ সম্মিলন।।

১ আষাঢ়
১৩৪২
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Let a new window be opened
in the Temple of the Woman
for the inner and the outer lights
to unite there.

June 16,
1935
Rabindranath Tagore

কেবল তিনি সঙ্ঘের সংস্কৃতির দিক্‌টাই দেখিয়া পরিতৃপ্তি পান নাই, সঙ্ঘের অর্থনীতিক সাধনার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কত যে সহানুভূতিপূর্ণ, আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলিতেন "আপনার পালে হাওয়া লেগেছে, আপনি মানুষ গড়েছেন!"

যাহা কিছু শুভ, যাহা কিছু প্রাণবন্ত, রবীন্দ্রনাথ সেইখানেই শ্রদ্ধার্ঘ্য হস্তে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি শ্রীঅরবিন্দের জীবনপ্রভাতে অরবিন্দবন্দনায় মুখর-কণ্ঠ হইয়াছেন। মহাত্মাজীর অধ্যাত্মজাগরণ-যুগে তিনি সেখানেও পূজারীর ন্যায় উপস্থিত হইয়াছেন। দেশ ও জাতির প্রতি তাঁহার মমত্ববোধের অন্ত খুঁজিয়া পাই না। তিনি প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের জুটমিল-সংস্থাপন কার্য্যের প্রারম্ভে যে উৎসাহ-বাণী প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাও এইখানে লিপিবদ্ধ করিলাম:

প্রবর্ত্তকসংঘ যে লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া
কাজের [illegible] প্রবৃত্ত
তাহা সর্ব্বথা উক্ত সংঘেরই উপযুক্ত।
বিশ্বহিতব্রতী ত্যাগের উদ্দেশে [illegible]-
প্রবর্ত্তকের এই উদ্যোগটি সাধনায়
যেমন মহৎ সিদ্ধিতেও তেমনি
মহৎ ফলদায়ক হউক এই আমি
কামনা করি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭ই ফাল্গুন
১৩৪২

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের সহিত তাঁহার সুনিবিড় পরিচয়ের কথা দীর্ঘ করিব না। চন্দননগরের সহিত তাঁর আত্মিক সংযোগের কথাই কিছু উল্লেখ করিব। রবীন্দ্রনাথের জন্মক্ষেত্র কলিকাতা। কর্ম্মক্ষেত্র শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন। কিন্তু তাঁর কবিজীবনোন্মেষের তীর্থ-ক্ষেত্র এই চন্দননগর। তিনি বিগত ২০শ "বঙ্গীয়-সাহিত্য সভার" উদ্বোধনবাণী প্রসঙ্গে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, এই চন্দননগরেই তার কবিজীবনের প্রথম উদ্বোধন। চন্দননগরের পক্ষে ইহা বড় কম গৌরবের কথা নহে। চন্দননগরবাসী কবির এ গৌরব যথাসাধ্য রক্ষা করিবে। সুদীর্ঘ ৮১ বৎসর বয়ঃক্রমে কবি আমাদের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। জন্মিলে মরিতে হয়; এ কথা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু কবিকে আমরা কেমন করিয়া আমাদের মধ্যে অমর করিয়া রাখিতে পারি, এই কথাই চিন্তা করিতেছি।

হাজার বৎসর ধরিয়া আমাদের দুর্দ্দিন চলিয়াছে। পরাধীন জাতির জীবন কত যে ঘৃণ্য, কত অপদার্থ, তাহা এই হাজার বৎসরের ইতিহাস প্রমাণ করিবে। এই দুরবস্থার দিনে আমাদের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিরক্ষার জন্য বহু মহাপুরুষের আবির্ভাব আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। আমরা সেদিনও রামমোহন, রামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতির শতবার্ষিক উৎসব সম্পন্ন করিলাম। রবীন্দ্রনাথেরও স্মৃতি-উৎসব মহাধূমে চলিবে। মহামানবের পুণ্যস্মৃতির কালটুকু লইয়া এই অভিনয় আমাদের আর ভাল লাগে না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এই সকল মহামানবের মধ্যে যে অমর প্রাণদেবতা আছেন, তাঁরই উদ্দেশ্যে যদি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদিত হয়, তবেই আমরা ধন্য হইতে পারিব।

রবীন্দ্রনাথ উপবীত ধারণ করার কাল হইতে আর এই ৮০ বৎসর ২ মাস কাল জাতির প্রাণদেবতাকে জাগাইতেই চাহিয়াছেন। তাঁর চক্ষে রাষ্ট্র, ধর্ম্ম, সমাজ সকলই তুচ্ছ মনে হইত—যদি তিনি এই সকলের মধ্যে প্রাণদেবতার সন্ধান না পাইতেন। তাঁর সুদীর্ঘ জীবন শুধু জাতির বাহ্যাড়ম্বরের প্রতিবাদস্বরূপ আমাদের চক্ষে প্রতিভাসিত হয়। তিনি নিজেকে কোনদিন মানুষের চেয়ে বড় মনে করেন নাই। মানুষ হইয়াই এই অতি-মানবের বিগ্রহ বিংশ শতাব্দীতে জাতিকে জীবনের পথেই চালাইতে চাহিয়াছেন; সে জীবন দিব্য ভাগবত, সে জীবন অমৃতের।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট বাঙ্গালী সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়াছিল। সে দিন তিনি বাঙ্গালীর প্রাণ-দেবতাকে জাগাইবার জন্য নব নব ঋক্ রচনা করিয়া-ছিলেন। আজ ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট দিবাকর যখন মধ্যাহ্নগগনে দীপ্তিমান, রবীন্দ্রনাথ সেই ক্ষণে সীমার বাঁধন টুটাইয়া নিখিল বাঙ্গালীর মধ্যে বিরাটরূপে কি নব জন্ম পরিগ্রহ করিলেন না? আমরা কবির মহাপ্রয়াণের মধ্যে এই পুনরাবির্ভাবের লক্ষণই দৃষ্টিগোচর করিতেছি।

হে বিশ্ববরেণ্য বিশ্বকবি, শত সহস্র বৎসরের জাতীয় তপস্যার বিগ্রহমূর্ত্তি! ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের নোবল প্রাইজ পাওয়ার পর বাংলার মনীষিবৃন্দ তোমাকে অভিনন্দিত করার জন্য উপস্থিত হইলে তুমি যে তাঁহাদের প্রতি অভিমানের কথা বলিয়াছিলে, তাহার জন্য কতই না তীব্র সমালোচনা তোমায় সহ্য করিতে হইয়াছে। কেহ তো বুঝে নাই—দেশাত্মবোধের কি অপার্থিব দরদ বুকে লইয়া জাতির চৈতন্যোদ্রেকের হিতবাণীই তোমার কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্যের জয়টীকা তোমার ললাটে দেখিয়া যে জাতি তোমায় গৌরব দিতে চাহিয়া-

ছিল, সে জাতির দাস-মনোবৃত্তির উপরই তোমার কটাক্ষ কষাঘাত করিয়াছিল। সে কথা সেদিন আমরা বুঝি নাই, আজও আমরা ভ্রান্ত, পথহারা—রাষ্ট্র চাই বিদেশী রাষ্ট্রশক্তির শাসন-সংস্কারের অনুসরণে। আমাদের শিক্ষা, সমাজ, এমন কি ধর্ম্মক্ষেত্রেও পরানুকরণপ্রিয়তার বীভৎস মূর্ত্তিই আমরা আশ্রয় করি। তুমি রবীন্দ্রনাথ, ভারত-সংস্কৃতির মূর্ত্ত প্রতীকের ন্যায় আজীবন বিশ্বকর্ম্মার উপাসনা করিয়াছ। কর্ম্ম হইয়াছে তোমার আশ্রয়। জ্ঞান অমৃতই আহরণ করিয়াছ। তুমি অবতারের আসন গ্রহণ কর নাই; নেতৃত্বের অভিমান রাখ নাই; অতিমানব হওয়ার স্বপ্নে আত্মহারা হও নাই। তুমি একজন বাঙ্গালী, ভারতের বৈদিক সভ্যতার প্রতীক—তুমি আমাদেরই একজন। কোন আকর্ষণে তুমি মুগ্ধ হও নাই। কর্ম্ম ও জ্ঞানের তীর্থভূমি ভারতের হৃৎপিণ্ড বাংলার বুকে দাঁড়াইয়া আজীবন অপ্রতিবাদে প্রচার করিয়া গিয়াছ—'আত্মানাং সততং বিদ্ধি'। এই আত্মার জাগরণের জন্য তোমার জীবনে অভিনয়চাতুর্য্য একদিনও হেঁয়ালি সৃষ্টি করে নাই। তোমার জীবনে একবিন্দু ইন্দ্রজাল নাই। তুমি একটি পরিপূর্ণ মানুষ। জীবনকালে মানুষের পূজা লইয়া তুমি কখনও গর্ব্ব কর নাই। তাই হে মহামানব, আজ শুধু বাঙ্গালী নয়, ভারতবাসী নয়, নিখিল বিশ্ববাসীর অঞ্জলী-বদ্ধ অর্ঘ্য তোমার চরণে নিবেদিত হইতেছে। তুমি যে জাতির, যে দেশের, হে মহামানব, তুমি কি সেই দেশ ও জাতির অন্তরে অন্তরে নব জন্ম লইয়া বিশ্বভারতীর স্বপ্ন বাংলায় মূর্ত্ত করিবে না? কবি, আমরা তোমায় বিদায় দিব না; সশ্রদ্ধচিত্তে বলিব "পুনরাগমনায়চ"; আমাদের মধ্যে মহাপ্রাণের বিগ্রহ ধরিয়া আবার আবির্ভূত হও। ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি, হরি ওঁ।

মর্ম্মোচ্ছ্বাস

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

মাটির এ খেলাঘরে পেয়েছিলে বঙ্গমাতা মাণিক রতন,
হারায়ে গিয়েছে তাহা, কাঁদো মাগো, কাঁদো আজি, পাবে কি তাহারে?
শিরোপরে নীলাকাশ চেয়ে দেখ ভাসিতেছে অশ্রু-পারাবারে,
কোনদিন ভালো করে' তারে তুমি করনি যতন।
বহু যুগ সাধনার পুণ্যফলে এসেছিল কুটিরে তোমার,
কত ব্যথা সহিয়াছে দুখিনীর দশা দেখি' ধরণীর মাঝে।
কহিয়াছে যত কথা, পুষ্প হয়ে সবি মাগো মর্ম্মে তব রাজে,
সে নহেক কালিদাস ভবভূতি বাল্মিকী তোমার।
সবাকার ঊর্দ্ধে তার অসীমের উপচার চির অভিনব,
আলোকের রথে তার পেতেছে আসনখানি কালের দেবতা,
যুগে যুগে গ্রহে গ্রহে তারি গান বেজে ওঠে ছন্দে নব নব,
রবির কিরণধারা সঞ্জীবিত করে সৃষ্টিলতা।
দিনের দেবতা আসি' রাতের কিনারে তব গেয়ে গেছে গান,
তুমি ছিলে অনাদরে অপমানে লাঞ্ছনায় পরাধীনা মেয়ে।
তোমারে যে সমাদরে বসায়েছে বিশ্বভূমে,—দেখেছ কি চেয়ে?
তুমি তার জন্মভূমি নিখিলের পুণ্য পীঠস্থান।

কাঁদো মাতা বঙ্গভূমি সে কি কভু ফিরিবে গো বহু দূর হ'তে,
যে জন চলিয়া যায় সে তো আর ফিরেনাক ধরণীর কোলে,
বিরহের বালুচরে নিরালায় তারি ছায়া তারি স্মৃতি দোলে
তাহারি পূজার ফুল নেচে ওঠে জীবনের স্রোতে।
হতাশের সুরে সুরে শ্রাবণের ধারা নামে তব আঙিনায়,
অস্তগিরি পারে বুঝি দেখা যায় মেঘদীপ,—কাঁদে বনপাখী
খেলাঘর ভেঙে দিয়ে' এতদিন পরে রবি দিল তোরে ফাঁকি,
কি সুরে গাহিবে গান সন্ধ্যাবেলা এ ভাঙা-বীণায়।
মেঘের মতন আসে গভীর ভাবনা মাগো বেদনার সনে,
জীবনের জমি 'পরে প্রাণের মঞ্জরী আর হবেনাক সোণা,
ফুলের সমাধি-বুকে প্রেতায়িত পথচারী করে আনাগোনা
বিভীষিকা চারিভিতে, তাই মাতা ভীতি জাগে মনে।
শত শত জোনাকিরা জ্বলিতেছে অন্ধকারে,—কোথা গেল রবি?
কাঁদো মাতা বঙ্গভূমি হৃদয়ের চিতা তব নিভিবে কি আর?
কোন্ দেশে প্রভাতের আনন্দের আলো-রেখা দেখা যায় তার,
কেবা জানে—শুধু ধ্যানে হেরি তার ছবি।

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

সারাটি জীবন যা'র মহাকাব্য সহজ সুন্দর—
আনন্দের উদ্বেলিত অভিব্যক্তি—অমৃত-নির্ঝর,
কালের করাল স্পর্শে তারও এই শেষ পরিণাম !
যে দেহ লভিল তা'র দিনশেষে বাঞ্ছিত বিশ্রাম,
তারে নিয়ে শোক মিছে—ধরার ধুলায় সে যে গড়া !
কিন্তু যে অমরাবতী-কীর্ত্তি তা'র লভিল এ ধরা,
স্বর্গের অমরাবতী তারও কাছে কাম্যতর নয়।
তাইতো মৃত্যুরে তুমি জীবনে করনি কভু ভয়
হে কবি, হে চিরঞ্জীব ! মহাকাল বন্ধুসম হেসে
তোমারই জয়ের মাল্য সসম্ভ্রমে তুলে' নিল কেশে !

মর্ত্ত্যের গঙ্গোত্রী-ধারা যদি শুকাইয়া থাকে আজি,
সত্যশিবসুন্দরের ভস্মমাখা জটাজালরাজি
মন্দাকিনীসম তারে রক্ষিবে একান্ত সযতনে—
মানবের মুক্তি লাগি' তপস্যার পুণ্য-তপোবনে।

কবিগুরুর উদ্দেশে

শ্রীকালিদাস রায়

চিরঞ্জীব কবিগুরু, চিতা-যজ্ঞে হইয়া আহুত
যা কিছু তোমার জীর্ণ অশাশ্বত হ'লো ভস্মীভুত।
ভৌতিক সত্তার ইহা অনিবার্য্য শেষ পরিণতি
বিরিঞ্চি ইন্দ্রেরো নাই ইহা হ'তে কভু অব্যাহতি।
তোমার আত্মিক সত্তা চলে গেল অজানা আহ্বানে,
লোকে লোকে নিত্য পথে নব নব উদয়াদ্রি পানে।
তোমার চিন্ময় সত্তা দেহবন্ধ হ'তে মুক্তি লভি'
নিখিলের চিদাকাশে জ্বলে আজ মেঘমুক্ত রবি।

সুন্দরের অভিসার

রায় বাহাদুর শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম.এ.

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনে সুন্দরকেই বরণ করিয়াছিলেন। সৌন্দর্য্যের দেবতা তাঁহার নয়নে এমন এক অঞ্জন পরাইয়া দিয়াছিলেন যে, তিনি জীবনে সুন্দর ব্যতীত আর কিছুই কামনা করেন নাই। বিধাতা তাঁহাকে সুন্দর রূপ দিয়াছিলেন, সুন্দর কণ্ঠ দিয়াছিলেন, সুন্দরের উপাসনায় তাঁহার কবিপ্রকৃতিকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এমন সুন্দরের পূজারী আর কোথায়ও দেখা যায় নাই। প্রত্যেক কবিই সুন্দরের উপাসক। কিন্তু সুন্দরের মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহার ধ্যানমূর্ত্তিকে হৃদয়ে ধারণ করিবার সৌভাগ্য সকলের হয় না। রবীন্দ্রনাথ এই জন্যই কবিগুরু ছিলেন।

চিরসুন্দরের আসন পড়িয়াছিল তাঁহার জীবনের অনুরাগরক্ত সহস্রদল কমলে। সেই সুন্দরের ধ্যানে তিনি তন্ময় হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কথাবার্ত্তায়, গল্পে হাসিতে, সন্দর্ভে বক্তৃতায় এই সুন্দরের বাণীই শুনিতে পাওয়া যাইত। সৌন্দর্য্য সৃষ্টির কামনা তাঁহার কবিহৃদয়কে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল বলিলে ঠিক বলা হইবে না। তিনি সৌন্দর্য্যের উৎস-সন্ধানে ছুটিয়াছিলেন; তটিনী যেমন অনন্ত সাগরের দিকে ধাবিত হয়, অভিসারিণী যেমন প্রণয়াস্পদের জন্য সকল ভুলিয়া ছুটিয়া যায়—এ যেন তেমনি এক অনির্ব্বচনীয় সর্ব্বগ্রাসী আকর্ষণ। যে আকর্ষণ যুগযুগান্ত তারায় তারায় স্পন্দিত হয়, যে মিলনস্পৃহা সুরের সঙ্গে সুরের যোগ সাধন করিয়া সঙ্গীতের সৃষ্টি করে, যে ঝুলন-দোলা অনাদি অতীত হইতে জীবন-মরণকে এক অচ্ছেদ্য ডোরে বাঁধিয়াছে, তাহারই অনুরণন কবির প্রাণে পুলক সঞ্চার করিয়াছিল। তাই তিনি যখন গান করিতেন, তাঁহার সঙ্গীতে সুরের ঝর্ণাধারা ঝরিত; তিনি যখন কবিতা লিখিতেন, তখন তাহাতে আলোকপ্রপাত ঝরিয়া পড়িত, মাধুর্য্যের উৎস ছুটিত। আজ তাঁহার কণ্ঠরুদ্ধ, তাঁহার লেখনী স্তব্ধ। যে চিরসুন্দরের উপাসনা তিনি সারা জীবন করিয়া গিয়াছেন, সে উপাসনার, সে আরাধনার কি মৃত্যুতেই শেষ? অথবা এখনও সুন্দরের জন্য তাঁহার সে অভিসার অনবচ্ছিন্ন ভাবে চলিতেছে?

এখন কি শেষ হ'য়েছে প্রাণেশ
যা'-কিছু আছিল মোর?
যতো শোভা, যতো গান, যতো প্রাণ,
জাগরণ, ঘুমঘোর?

কবির এ সংশয় ক্ষণিক। তিনি নিজেই এ সমস্যার সমাধান করিয়াছেন তাঁহার কবিতায়—

মৃত্যুরে করি না শঙ্কা। দুর্দিনের অশ্রুজলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি'—তারি মাঝে যাবো অভিসারে
তা'র কাছে—জীবন সর্ব্বস্বধন অর্পিয়াছে যারে
জন্ম জন্ম ধরি'।

তাঁহার অভিসার সার্থক। সারা জীবন তিনি যে সুন্দরের অভিসারে চলিয়াছেন, মরণের স্তিমিত আলোকেও সেই অভিসারই চলিয়াছে। তাঁহার একখানি পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলেই কবির নিজের মনের আশা ও বিশ্বাস পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে:—

"আমি অনেকবার ভেবে দেখেছি, প্রকৃতির মধ্যে যে এমন একটা গূঢ় গভীর আনন্দ পাওয়া যায় সে কেবল তার সঙ্গে আমাদের একটা সুবৃহৎ আত্মীয়তার সাদৃশ্য অনুভব করে'—এই নিত্য সঞ্জীবিত সবুজ সরস তৃণলতাগুল্ম, এই জলধারা, এই বায়ু-প্রবাহ এই সতত ছায়ালোকের আবর্ত্তন, এই ঋতুচক্র, এই অনন্ত আকাশপূর্ণ জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর প্রবহমান স্রোত, পৃথিবীর অনন্ত প্রাণী-পর্য্যায় এ সমস্তের সঙ্গেই আমাদের নাড়ীর রক্তচলাচলের যোগ রয়েছে—সমস্ত বিশ্বচরাচরের সঙ্গে আমরা একই ছন্দে বসানো……প্রকৃতির সমস্ত অণু পরমাণু যদি আমাদের সগোত্র না হতো, যদি প্রাণে সৌন্দর্য্য এবং নিগূঢ় একটা আনন্দে অনন্তকাল স্পন্দমান না থাক্‌তো, তা হলে কখনই এই বাহ্যজগতের সংসর্গে আমাদের এমন একটা আন্তরিক আনন্দ ঘট্‌তো না। * * * আমার সঙ্গে এই বিশ্বের ক্ষুদ্রতম পরমাণুর কোন জাতিভেদ নেই, সেই জন্যই এই জগতে আমরা একত্রে স্থান পেয়েছি, নইলে আমাদের উভয়ের জন্য দুই ভিন্ন জগৎ সৃজিত হ'য়ে উঠ্‌তো। আমি যখন মাটির সঙ্গে মাটি হ'য়ে যাবো, তখনও আমার অনন্ত প্রাণময় বিশ্বাত্মীয়ের সঙ্গে বন্ধন ছিন্ন হবে না, আমি আমার নিজের ভিতরকার সহজ আনন্দ থেকে এইটে অনুভব করি।"

এখানেই কবির হৃদয় ভারতবর্ষের যুগযুগান্ত ব্যাপী সাধনার ধারার সহিত এক সুরে বাঁধা। 'ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব'। সমুদয় জগৎ সূত্রে গ্রথিত

মণিগণের ন্যায় এক পরম নিগূঢ় শাশ্বত সত্তায় বিরাজ করিতেছে। সেই জন্যই এক অখণ্ড আনন্দের মহাসিন্ধু সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতির উপর দিয়া ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে। এই উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথকে সমস্ত ক্ষুদ্রতা হইতে রক্ষা করিয়াছে। আনন্দকে খণ্ড খণ্ড করিয়া তিনি দেখেন নাই, সুন্দরকে মঙ্গলের বিরোধী করিয়া তিনি অঙ্কিত করেন নাই—এই জন্য তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টি দেশকালপাত্রের সীমা উপেক্ষা করিয়া সকলের মনোহরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ভারতীয়েরা দেখিয়াছে, তাহাদের সাধনার মূর্ত্ত প্রতীক, ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাসের নবীন মূর্ত্তি; আর পাশ্চাত্যগণ দেখিয়াছে ভারতীয় চিন্তধারার মহামহিমময় বিকাশ। যাহা ভূমা, যাহা অখণ্ড, তাহা বিশ্বজনীন।

রবীন্দ্র-প্রয়াণে

শ্রীহরিহর শেঠ

আজ যে মহামানবের তিরোধানে শোক প্রকাশ করছি তাঁর সুদুর্লভ চরিত্র বা গুণাবলীর বিশেষ আলোচনার এ সময় নয় এবং সে লোকোত্তর প্রতিভার সম্যক্ পরিচয় দিতে পারি সে সামর্থ্যও আমার নাই। তাঁর চরণ-সান্নিধ্যে আসবার আমার যে কয়েকবার সৌভাগ্য হয়েছে, প্রতি-বারই তাঁর দেশবাসীর উপর দুর্জ্জয় অভিমানজনিত মর্ম্ম-ব্যথার কথা তাঁর কাছে শুনেছি। তাঁর জাতি ও স্বদেশ-বাসীর কাছ থেকে পাশ্চাত্যের তুলনায় হয়ত আশানুরূপ শ্রদ্ধা সম্মান বা তাঁর প্রাণাপেক্ষা প্রিয় বিশ্বভারতীর সহায়তা পান নাই, কিন্তু সে দিনের মহানগরীর অপূর্ব্ব ভাব ও দৃশ্য দেখে আজ সেই প্রসঙ্গে সদাই মনে হচ্ছে, তাঁর দেশবাসীর হৃদয়ে শুধু ভক্তি ও সম্মানের নয়, কি প্রগাঢ় অনুরাগের আসনই না তাঁর জন্য প্রতিষ্ঠিত ছিল! উর্দ্ধলোক হতে তা দেখে নিশ্চয়ই তিনি পরিতৃপ্ত হচ্ছেন। যাদের ভালবাসা যায়, যাদের আপনার জন মনে করা যায়, তাদের উপরই অভিমান আসে। তিনি তাঁর জাতিকে অত্যন্ত আপনার ভাবতেন, তাই আশানুরূপ সক্রিয় প্রতিদানের পরিচয় অভাবে তিনি বেদনা পেতেন। কিন্তু তাঁর দেশবাসী অকৃতজ্ঞ নয়। কোন দেশের কোন মনীষীকে এর অপেক্ষা বড় মর্য্যাদা, বড় সম্মান দিতে পারে বলে কল্পনা করতে পারি না।

রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণে আজ বাঙ্গলা কি অমূল্যনিধি হারাল তা বুঝবার দিন এসেছে। বাঙ্গলার এমন দুর্দ্দিন বুঝি আর কখনও আসে নি। আদিকাল হতে কি না, তা বলতে না পারলেও ইতিহাস যে সাক্ষ্য দেয়, তা হতে জানা যায়, এত বড় প্রতিভাসম্পন্ন মহামনীষীর উদ্ভব বাঙ্গলায় এর পুর্ব্বে আর কখনও হয় নি। অধুনাতন যুগে বাঙ্গালীর চিন্তা করবার জন্য যে ভাব, যে উপাদান, আকণ্ঠপুরিয়া পান করবার জন্য যে অপূর্ব্ব কাব্যামৃতের সাগর, সঙ্গীতের জন্য যে গান, এমন কি কথা কহিবার জন্য যে ভাষা—এ তাঁরই দান, এ কথা বললে বেশি বলা হয় না। তাঁকে হারিয়ে আজ বাঙ্গালী দিশাহারা হয়েছে।

আমরা আত্মীয়-বিয়োগ-ব্যথায় আপন স্বার্থ হারিয়ে আজ উদ্‌ভ্রান্ত। আজ যে রবি অস্তমিত তাঁর দীপ্ত মহিমোজ্জ্বল আলোকে শুধু ভারত নয় সমগ্র বিশ্বের আকাশমণ্ডল আলোকিত ছিল। তাঁর তিরোধানে দেশমাতৃকা অবিনশ্বর কীর্ত্তিবিমণ্ডিত একটি শ্রেষ্ঠ সন্তানকে হারালেন। তিনি বাঙ্গলা সাহিত্যকে বিশ্ব-সাহিত্যের মধ্যে সম্মানের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন বললেই তাঁর ঠিক পরিচয় দেওয়া হয় না। বাংলা তথা ভারতের জাতীয় জীবনে তাঁর প্রভাব কতটা, তিনি কি ঐশ্বর্য্য আমাদের দিয়ে গেছেন, তা নিরাকরণের সময় এলে ভবিষ্যৎ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁর যথার্থ পরিচয় পাওয়া যাবে। বিশ্বের দরবারে তিনিই ভারতের প্রধানতম প্রতীকরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বর্ত্তমান জগতের চিন্তাধারার সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র স্থাপন করেছেন। তাঁর প্রতিভাবলে সাহিত্যের মধ্যে তিনি যে অবিনশ্বর কীর্ত্তি স্থাপন করেছেন তা যেমন অপূর্ব্ব, পল্লীসংগঠন, শিক্ষাবিস্তার

স্বদেশী শিল্পোন্নতি প্রভৃতির দ্বারা জাতীয় জীবনের সর্ব্ববিধ উন্নয়ন প্রচেষ্টা তেমনই অসাধারণ। মানব সংস্কৃতির অতি উচ্চ আদর্শ হতে সাধারণ জনগণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অন্ন সংস্থানের উপায়-চিন্তা একাধারে এরূপ সমাবেশ দেখা যায় না। পৃথিবীতে এতাবৎ সঙ্কটকালে জাতিকে পথ প্রদর্শনের জন্য যে সকল মহামানবের উদ্ভব হয়েছে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। শুধু ভাবজগতে নয়, অসাধারণ সৃজনীপ্রতিভার দ্বারা ধর্ম্মজগতেও তাঁর দান অতুলনীয়।

বিগত শতাব্দীতে যখন পাশ্চাত্যের নবাগত মোহময় ভাবধারার সংঘর্ষে আমাদের বৈশিষ্ট্য, জাতীয় সংস্কৃতি বিপন্ন হতে চলেছিল তখন জাতিকে রক্ষা করবার জন্য যে সকল শক্তিমান্ মহাপুরুষ আত্মনিয়োগ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এই শতাব্দীর শেষাংশে যখন বাঙ্গালীর জীবনে নব জাগরণের বন্যা এসেছিল, তার উচ্ছ্বাসে যে সকল মনীষার প্রাচুর্য্য দেখা দিয়েছিল, তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জীবনই সর্ব্ববরেণ্য, বহু দিক্ দিয়ে সম্পূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ। তাঁকে অবলম্বন করে যে যুগ গড়ে উঠেছে, অন্ততঃ আর একশত বৎসরের মধ্যেও তার প্রভাব ম্লান হবে না।

অন্যের কাছে হয়ত নিতান্ত ছোট কথা হলেও, রবীন্দ্র-প্রতিভার সঙ্গে আমাদের এই সামান্য সহরের যে পূত সম্বন্ধ তা চিরদিন একে বিশেষ গৌরবে গৌরবান্বিত করে রাখবে। সে গৌরবের অধিকার আর কারও কোনদিন হবে না। রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়—কবি। গঙ্গাতীরে এই নগরের এক প্রান্তেই তাঁর কবিজীবনের উদ্বোধন। তিনি যখন জগৎসমীপে অখ্যাত অজ্ঞাত ছিলেন, তখন এখানকার প্রকৃতিই তাঁকে অভ্যর্থনা অভিনন্দন প্রথম জ্ঞাপন করেছিল। কবি নিজ মুখেই এখানকার বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের প্রকাশ্য সভায় বলেছিলেন, সেটা ছিল তাঁর জীবনের সত্য ও সহজ উদ্বোধন। বিশ্বপ্রকৃতি এইখানেই বালক রবীন্দ্রনাথকে কাণে কাণে বলেছিলেন "তোমার বাঁশীটি বাজাও"। এসব গৌরবের স্মৃতি চন্দননগরবাসী চিরদিন গর্ব্বের সহিত হৃদয়ে গেঁথে রাখবে।

বিধির বিধান মেনে লওয়া ভিন্ন মানুষের আর উপায় কি আছে? বাংলার বুকের উপর দিয়ে কত সুখের দিন এসেছে গিয়েছে; আবার হয়ত কত আসবে। কিন্তু বাঙ্গালী যে নিধি হারালে, তার মেঘপূর্ণ আকাশ হতে যে রবি অস্তমিত হল, তা কি আর কোন দিন ফিরবে? বাংলার সকল সম্পদের উৎস আজ নিরুদ্ধ। বাঙ্গালী তাঁরই দেওয়া ভাষা, ছন্দে ও গান নিয়ে অবনত মস্তকে চিরদিন তাঁকে স্মরণ করবে।

অধুনালুপ্ত মোরাণ সাহেবের বাগানবাড়ী : চন্দননগর

"উদ্বোধন এই কথাটি শুনে আমার মনে আর একদিনের কথা এল। সেই সময়ে এই সহরের এক প্রান্তে একটা জীর্ণপ্রায় বাড়ী ছিল; সেইখানে আমি আমার দাদার সঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিলেম। তারপর মোরাণ্ সাহেবের বিখ্যাত হর্ম্মে আমাকে কিছু দীর্ঘকাল যাপন করতে হয়েছিল। বস্তুতঃ এই গঙ্গাতীরে, এই নগরের এক প্রান্তেই আমার কবি-জীবনের উদ্বোধন। সেটা ছিল আমার জীবনের সত্য ও সহজ উদ্বোধন।"

(১৩৪৩ সালে চন্দননগরে অনুষ্ঠিত বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথের উদ্বোধন-বাণী।)

অস্তমিত

ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার

রবি অস্তমিত। প্রতিভার আলোক অর্ঘ্য নিবেদন করে', ছন্দের মূর্চ্ছনায় বিশ্ব পুলকিত করে' রবীন্দ্রনাথ মহাপ্রয়াণ করেছেন। যে প্রজ্ঞা ও কবি-প্রতিভা তাঁকে সমুজ্জ্বলিত ও সমুল্লসিত করেছিল, মৃত্যুর শান্ত-স্পর্শে তা অমৃতলোকের তেজোদীপ্ত। তাঁর মৃত্যু—মৃত্যু নয়, মৃত্যুঞ্জয়ের আহ্বান। তাঁর তেজোময় পুরুষকে অভিবাদন করি।

রবীন্দ্রনাথের বিরাট্ অবদানের সম্যক্ বিচার করবার সময় আজ নয়। তাঁর গুণমুগ্ধ দেশ হয়ত একদিন তাঁর কাব্যে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, চিত্রকলায়, দার্শনিকতায়, তাঁর সৃষ্টির ওপর আলোকসম্পাত করবে। জাতির যাঁরা গুরু, তাঁদের জীবনের সাথে তাঁদের সব শেষ হয় না। তাঁরা যুগে যুগে মানুষের অন্তরে আলোকবর্ত্তিকা জ্বালাইয়া রাখেন। কল্যাণ ও শ্রেয়ের পথের ইঙ্গিত করেন।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের মূলে ছিল কতকগুলি স্বাভাবিক অনুভূতি। তাঁর সত্তার স্বচ্ছতা দিয়েছিল তাঁর অপরূপ বিষয়ানুপ্রবেশ। তিনি অনুভবশক্তিতে ছিলেন গরীয়ান্। ক্ষুদ্র হ'তে বিরাট্ ছিল তাঁর মানস-প্রত্যক্ষের কাছে সুস্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের মননশক্তির চেয়ে অনুভূতি-শক্তি ছিল তীব্র। বিশ্বের অন্তরের ছন্দ ও সুর তাঁকে যেন আশ্রয় করেই প্রকাশিত হত। বিশ্বাতীত সত্যের চেয়ে বিশ্বের অন্তরের সত্যের সহিত তাঁর ছিল বিশেষ পরিচয়। অব্যক্ত যেখানে সুর ও ছন্দকে নিয়ে সৃষ্টির স্তরে স্তরে অবতরণ করে, রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রতিষ্ঠা সেখানে। এই জন্যই তাঁর লেখায় ছন্দ ও সুরের বৈপুল্য।

সত্য বিশ্বাতীত হলেও বিশ্বে বিকাশ হবার জন্য সতত প্রযত্নশীল। এই বিকাশপ্রচেষ্টা, রবীন্দ্রনাথের অনুভূতিতে, সত্যের আনন্দ-স্ফূর্ত্তি। আনন্দ সত্যের সুরে ও ছন্দে অভিব্যক্ত। অচঞ্চলের চঞ্চল স্ফূর্ত্তি। চঞ্চল বলতে বিক্ষিপ্ততা বুঝব না। ছন্দোবদ্ধ শক্তিশীলতা এর স্বরূপ। এর সাথে রবীন্দ্রনাথের ছিল সুপরিচিতি। এই পরিচয় দিয়েছে তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্য। ছোট হ'তে বড় তাঁর নিপুণ দৃষ্টি সর্ব্বত্রই আনন্দের উন্মেষকে আবিষ্কার করেছে। জীবনের প্রত্যেক স্পন্দনে, প্রতি প্রকাশে, ছন্দে, গন্ধে, বর্ণে রবীন্দ্রনাথের সজাগদৃষ্টি অনুভব করত আনন্দের হিল্লোল—এই বিশ্ব তাঁর কাছে ছিল আনন্দের জীবন-যজ্ঞ। তিনি একদিন আমাকে বলেছিলেন যে, "সৃষ্টিসম্ভার আমাকে এত আনন্দ দেয় যে, আমি একে অতিক্রম করতে চাইনে।" এই উপলব্ধি তাঁকে করেছিল অসীম সৃষ্টির অধিকারী। সৃষ্টি পরিবর্জ্জনরূপ বৈরাগ্যের সাধক তিনি ছিলেন না। তিনি ভাবতেন সৃষ্টির ভেতর আছে যে বন্ধুরতা, যে অসৌন্দর্য্য, যে ক্লেশ, তাকে অতিক্রম করবার উপায় পরিবর্জ্জন নয়, গভীরতররূপে পরিগ্রহ। সত্য রূপে পরিগ্রহ হলে সৃষ্টির ছন্দের সহিত পরিচয় হয়—যেখানে আনন্দই আছে, ক্লেশ নাই। যে অসমতা, যে তামসিকতা, যে অনমনীয়তা আছে দুঃখের মূলে, তাকে জয় করতে হবে জীবন-গঙ্গোত্রীর স্বচ্ছ নির্ম্মলধারাকে আহ্বান করে'। পূর্ণ জ্ঞান সঞ্চারে ক্লেশের মূল হয় উৎপাটিত। দুঃখকে দুঃখরূপে দেখাই তার মিথ্যা রূপ দেখা। দুঃখ আছে আনন্দের অনুসন্ধান দেবার জন্য—দুঃখের উচ্ছেদ হয় আনন্দেরই অনুবর্ত্তনে। গতি ছন্দোধৃত হলেই এ বিশ্ব-বিকাশ হয় আনন্দের অভিব্যক্তি। ছন্দোবদ্ধ জীবনে দুঃখ কোথায়?

সত্য আনন্দাভিব্যক্তি ভিন্ন নিজের স্বরূপে অব্যক্ত, শান্ত; বিশ্বাতীত, শাশ্বত, তেজোময়, জ্যোতির্ম্ময়, জ্ঞানস্বরূপ। সত্যের এ স্বরূপের মানস-পরিচয় সম্ভব নয়—এ স্বরূপ মনের ও বুদ্ধির অতীত। রবীন্দ্রনাথের মতে, মানসানুভূতি অতিক্রম না করতে পারলে এ অবস্থার প্রত্যয় হয় না। এ কল্পনালোকের অতীত। সত্য এখানে 'স্বেমহিম্নিস্থিত'। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অখণ্ড, অনন্ত রূপই এই সত্যের একমাত্র স্বরূপ বলে মনে করতেন না। ইহা প্রত্যক্ষ সত্যের নিজস্ব রূপের দৃষ্টি হলেও, সৃষ্টিকে বাদ দিয়ে দেখলে সত্যের একাংশের পরিচয় হয়। সত্য স্বরূপ ও প্রকাশ নিয়ে অখণ্ড। প্রকাশ বাদ দিলে সত্যের আনন্দ সংবেগের হানি হয়। এরূপে খণ্ডিত করে দেখাই রবীন্দ্রনাথের কাছে ছিল মায়া। সত্য জ্ঞানস্বরূপ হয়েও অনন্ত সজীবতা ও গতির আশ্রয়। এই গতিই প্রকাশ হয় শ্রীতে, সৌন্দর্য্যে, শক্তিতে—জীবনের নব নব ছন্দে, নব নব রূপে।

রবীন্দ্রনাথের গতি-ছন্দের প্রকাশের বাহুল্য সকলকেই আকৃষ্ট করত। অন্তর নৃত্য করে উঠ্‌ত। এ গতিকে তিনি জীবনে এমন রূপে বরণ করে নিয়েছিলেন যেন মনে হত, তিনি গতিরই উপাসক। জীবনাবেগের অফুরন্ত গতি তার কর্ম্ম ও লেখনীর ভেতর দিয়ে বিচিত্র রূপে প্রকাশ পেয়েছে। এ বিষয়ে তাঁর অনুভূতি ছিল তীব্র। অনুভূতির বিশ্ব-কেন্দ্রহীন-স্বরূপতার স্ফূর্ত্তি তাতে সুস্পষ্ট। অনেক সময় মনে হয়, তিনি বুঝি ছিলেন জীবনবাদের ঋষি। তিনি জীবনের গতির ভেতর পরম স্থিতিকে, সত্যকে অনুভব করতেন। অনুভূতির বিশ্বকেন্দ্ররূপী স্বরূপ ছিল তাঁর বিদিত। তাঁর সৃষ্টিতে সত্য কেন্দ্রস্থ হয়েও নিত্যই কেন্দ্র-অপসারিত। অনুভূতি দুইটি স্বরূপেই দেয় সত্যের এই রূপের পরিচয়। স্থিতির অনুভূতির সহিত গতির অনুভূতি সংমিশ্রিত। লীলার ছন্দের, অনন্ত উন্মেষের ভেতর তিনি লীলাময়কেই দেখতে পেতেন, যদিও স্থান বিশেষে তিনি গতিকে অপরূপ রূপ দিয়েছেন। বন্ধনহীন অফুরন্ত জীবন-গতিতে তিনি যেমন ছিলেন মুগ্ধ, তেমনি ধ্যানের প্রশান্তিতে তিনি সন্ধান পেতেন সমতার, স্থিতির, প্রকাশের। সনাতন তাঁর দৃষ্টির বহির্ভূত ছিল না, যদিও নবীনের উন্মেষ তাঁর চিত্তকে করত আকৃষ্ট।

এ সনাতনকে স্পর্শ করতে সুরই ছিল তাঁর প্রধান উপায়। কবিতার ছন্দ হতে সুরের ছন্দ চিত্তকে স্পষ্টতঃ অনুভূতির দিকে ধাবিত করায়। এ কথা তিনি প্রায়ই বলতেন।

এই সুর-তরঙ্গ মনকে অতিক্রম করে অতিমানস তত্ত্বের পরিচয় করিয়ে দেয়। সুর অনাহত শব্দে পর্য্যবসিত হয়। অনাহত শব্দ অব্যক্তে লয় হয়। রবীন্দ্রনাথের গভীরতম অনুভূতির প্রতিষ্ঠা ছিল এই অব্যক্তে। এই জন্যই তিনি সুর ও শব্দ সাধনা করতেন। মরমী রবীন্দ্রনাথের ইহাই সত্য পরিচয়। তাঁর অশেষ ভাববিকাশের ভেতর ভাবুকতার উচ্ছ্বাস কখনও ছিল না। কারণ, তাঁর ভিত্তি ছিল শান্ত-সাধনায়, সে সাধনা তাঁকে দিত অব্যক্তের স্পর্শ। এখানে তিনি যুক্ত হতেন পরমাত্মায়। অনুভূতির নানা স্তর অতিক্রম করে' এস্থানে উপনীত হতে' হয়। এ ধ্যান নয়, এ রমণীয় আস্বাদ নয়—হৃদয়াবেগের অবসানে এ প্রাপ্তি সম্ভব। ইহা ব্রহ্মের শান্ত স্বরূপের অনুভব, অদ্বৈতের আস্বাদ।

রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মের শিবরূপ ও অদ্বৈতরূপের প্রতি উদাসীন ছিলেন না। যে আনন্দ-গতি সুরের পুলকে নৃত্য করে, তাই নিজস্বরূপে, অদ্বৈতরূপে আবার নিজকে অনুভব করতে চায়। সত্যের কল্যাণ-রূপ একটি বিশিষ্ট রূপ। এ রূপে বিশ্বময় প্রকাশ শুধু আনন্দেই স্ফূর্ত্ত নয়—মহিমা, মঙ্গল, পরমশুদ্ধির প্রকাশ এখানে। সত্য দেয় পরমস্থিতি, আনন্দ দেয় ছন্দোবদ্ধ গতি, শুদ্ধি দেয় শুভ্রতম বিধৃতি। এই শিবরূপের সাধনায় বিশ্ব দিব্য কুশলসম্পন্ন হয়।

অদ্বৈত-সাধনায় রবীন্দ্রনাথের নির্বিশেষ অদ্বৈতস্থিতি ছিলনা, তিনি তা চাইতেন না। কিন্তু প্রেমে যে অদ্বৈতের আস্বাদ হয়, তাতে তিনি ছিলেন অবহিত। জীবের পরসূক্ষ্মানুভূতি ব্রহ্মস্পর্শে—সেই স্পর্শের গভীরতায়, আনন্দের আতিশয্যে কখনও কখনও আমাদের জীবত্ব ব্রহ্মে আত্মহারা হয়ে নিমগ্ন হয়। তার ভেদ ভাব অপসারিত হয়—আনন্দ গুহায় নিমজ্জিত হয়। ইহাই অদ্বৈতের সাধনা ও অনুভূতি। এ অনুভূতিতে আমাদের চেতনা দেশে, কালে অভিব্যক্তিকে অতিক্রম করে' ব্রহ্মানন্দ রসপানে নিমগ্ন হয়। এই আনন্দরস সঞ্জীবিত হলে জীবত্বের ব্যক্তির স্ফুরণ প্রশমিত হয়। ইহাই পরমানুভূতি। এই পরম রস। রসের ঘনীভূতাবস্থা। রবীন্দ্রনাথ অধ্যাত্মযোগে এই রসেও উজ্জীবিত হতেন। আনন্দ ছিল তাঁর সাধনা, আনন্দানুভূতি ছিল তাঁর সাধ্য। এখানে যা' সাধনা, তাই সাধ্য। আনন্দের বৈচিত্র্যের ভেতর দিয়ে রসাস্বাদ ঘনীভূত আনন্দের দিকে লইয়া যায়। বৈচিত্রের লয় হয়—থাকে আনন্দমাত্র উপলব্ধি।

তাঁর জীবন আনন্দরসে ও আনন্দের বৈচিত্র্যে মগ্ন থাকত। তাঁর কবিত্বে, সঙ্গীতে দ্বিতীয়টির বিকাশ, তাঁর অনাহত সুর সাধনায় প্রথমটির বিকাশ। প্রথমটি বাক্-মনের ও প্রকাশের অতীত বলেই তাঁর প্রকাশ বাহুল্য সম্ভব ছিলনা ও হয়না।

এই ঋষি-চরিত্র আজ লোকচক্ষুর অন্তরালে। তিনি দিব্য শাশ্বত অয়নে সেই লোকে উপনীত যাহা দিব্য সুরধারায় সিঞ্চিত, অপার্থিব আলোকে অভিষিক্ত, আনন্দরসে মগ্ন।

অস্তমিত রবির নিত্যালোকধামে নবীন উদয়।

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

রবীন্দ্রনাথ, মনে পড়ে ছেলেবেলায় শ্রাবণের শেষে শরতের আগমনী স্বপ্নভরা এমনি ক্ষান্তবর্ষণ দিনে আলোকোজ্জ্বল কোন শুভক্ষণে মায়ের ঘর হতে হঠাৎ মোহিত-সেন-সম্পাদিত তোমার কাব্যগ্রন্থ পেয়েছিলুম পরশ পাথরের মত; চলে গেলুম ছাদের ছোট ঘরে নিরালায় পড়তে; কবিতার পর কবিতা পড়ে চল্লুম, সব কথা বুঝতে পারলুম না, শুধু শরতাকাশের ক্ষণিক আলোক, ক্ষণিক বৃষ্টিধারায় গভীর অজানা সুর বাজতে লাগলো, কিশোর চিত্তের অব্যক্ত ব্যাকুলতা অগাধ বাসনা অসীম আশা ভাষা পেল---সেদিন তোমার মূর্ত্তি কল্পনা করতে চেষ্টা করেছিলুম, ভেবেছিলুম, তুমি আমাদের মত মর্ত্ত্যলোকের অধিবাসী নও, কোনও দেবলোকে তুমি বাস কর, সেখানে প্রভাতে সন্ধ্যায় অমল করুণ সঙ্গীত বাজে, রঙ্গীন মেঘদলের মত অপরূপ ছবি ও গান ভেসে চলে, অপরূপা মানসীর সোনার তরীতে বসে তুমি রম্য বীণা বাজাও, সেই দিব্য সঙ্গীত-লোক হতে মাঝে মাঝে এক-একটি গান ও কবিতা বুঝি খসে পড়ে' আমাদের পৃথিবীতে পৌছায়, যেমন আকাশ হতে শুষ্ক তৃষিত পৃথিবীর মাটিতে ঝরে পড়ে শ্রাবণের ধারা, প্রভাতের আলোক, নিশীথ রাতের চন্দ্রমার চাউনি

তারপর শুনলুম, তুমি থাক বোলপুরে, আমাদেরি মত মানুষ, খুব সুন্দর দেখ্‌তে। সুবিধা হলেও বহুদিন গেলুম না তোমায় দেখ্‌তে, কৈশোরের স্বপ্ন ভাঙতে ইচ্ছা হল না।

তোমার সত্যিকার রূপ প্রথম দেখলুম ফাল্গুনীর রঙ্গমঞ্চে, অনিন্দ্য সুন্দর কান্তি, অপূর্ব্ব মূর্ত্তি। আমার সুখ সন্দেহ দ্বন্দ্ব বেদনা ভরা প্রথম যৌবনের সন্ধান-পথে তুমি হলে সর্দ্দার চন্দ্রহাস, তুমিই হলে পথ প্রদর্শক বাউল, কৈশোর যৌবনের স্বপ্নবিলাসময় প্রদোষের অন্ধকার তোমার গানের সুর-প্রদীপ জ্বালিয়ে দীপ্ত করে' দিলে। ঘনিয়েছিল বাণী আমার মনে, তোমার আনন্দ বীণা ঝঙ্কারে সে জাগল। তোমার সাহিত্যের কনকখনি হতে মুঠা মুঠা স্বর্ণ আহরণ করে মনের তাপে গলিয়ে আমিও লেগে গেলুম বঙ্গসরস্বতীর নব নব আভরণ-সৃষ্টির সাধনায়।

তারপর জীবনে কত রূপে কতবার তোমাকে পেয়েছি। তোমার মুখে শুনেছি সত্যের আহ্বান, মুক্তধারার জয়গান। দয়াহীন সংসারে ব্যর্থতায় বেদনায় অশ্রুজলে যখন অন্ধকার আকাশের দিকে প্রশ্ন করেছি, তখন শুনেছি তোমার বাণী—হবে জয়, হবে জয়, এ আঁধার হবে ক্ষয়, জয়ী প্রাণ, চির প্রাণ! জয়ী জ্যোতির্ম্ময়!

তারপর রুদ্ধক্রন্দনক্ষুব্ধ ম্লান নয়নে দেখলুম, সে অনিন্দ্যসুন্দর দেহ নিস্পন্দ, শুভ্রপুষ্পমাল্যভারাচ্ছন্ন, বেদনাচঞ্চল বঙ্গযুবকজনতাবাহিত; দেখলুম প্রস্তর গঠিত বিরাট্ সূর্য্য-মূর্ত্তিসম সে দেহ অস্তগামী অরুণের সকরুণ আলোকে সন্ধ্যার গঙ্গাতীরে দীপ্ত অগ্নিশিখাবেষ্টিত।

শ্রাবণের সজল আকাশের ওপর শরতালোকের জ্যোতির দিকে চেয়ে ভাবছি, আজ তুমি সত্যই মর্ত্ত্যলোকে নেই, কিন্তু, একদিকে যেমন তুমি অরূপলোকে মুক্ত, যেখানে নিত্যকাল জ্যোতির্ম্ময়ের আনন্দ-সঙ্গীত ধ্বনিত হচ্ছে, অপরদিকে তুমি আমার স্বপ্নবেদনাময় অন্তর-লোকে বন্দী।

আমার কল্পচিত্ত-ভূমিতে, যেখানে বাল্মিকী সুমধুর স্বরে রামায়ণ গান করছেন, কালিদাসের মন্দাক্রান্তা ছন্দের ধ্বনি উঠছে, সেক্সপিয়রের বিচিত্র নরনারীদলের নাট্যলীলা চলেছে, গেটে বাহির হয়েছেন ফাউষ্টের সঙ্গে চিরযৌবনের সন্ধানে, যেখানে তমসা শিপ্রা টেমস্ পদ্মা নিত্যকালের রসসমুদ্রে এক হয়ে গেছে, সেই নিভৃত আনন্দলোকে তুমি চিরপ্রতিষ্ঠিত।

আমার প্রণতি গ্রহণ কর।

শিল্পী-দরদী রবীন্দ্রনাথ

শিল্পাচার্য্য শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন শিল্পী, রূপের পূজারী। তাঁর তিরোধানে শিল্পীরা একজন প্রকৃত দরদী হারাল।

আমার মনে আছে—বোধ হয় দশ-বারো বছর আগেকার কথা। রবীন্দ্রনাথ আমাদের 'সোসাইটিতে' এলেন। আমি তখন ছবি আঁকছি—রাধাকৃষ্ণের ছবি। রবীন্দ্রনাথ কাছে এলেন; অনেকক্ষণ দেখলেন ছবিখানা। পরে বল্লেন "কি আঁকছো? রাধাকৃষ্ণ! বেশ বেশ। আচ্ছা তুমি অনেক রাধাকৃষ্ণের ছবি এঁকেছো, আমি যেমন বলি একখানা সেই রকম আঁকো দেখি।" আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম, কি বলেন, কি তাঁর মনের কথা, কি রকম রূপ দেবেন ছবিতে এই জানবার জন্য।

কবি বল্লেন, "দেখ, আঁকো শুধু ঘোর নীল আকাশ আর তাতে দাও একটা বিদ্যুতের রেখা।" মনে ছিল একথা অনেক দিন। কিন্তু, আঁকবো আঁকবো করেও আঁকা আর আজও হয়ে ওঠেনি।

অনেক সময় কথায় কথায় কবি আমাকে ব'লতেন, "তুমি গুণী, শিল্পি, এখানে থেকে কি হবে, চল আমার কাছে শান্তিনিকেতনে, দেখবে অনেক ভাল লাগবে।" কিন্তু যাইনি, যাওয়া হয়ে উঠেনি। সোসাইটিতেই কেটে গেল অনেকদিন।

কবিগুরু তাঁর শেষ কথা দেশবাসীকে জানিয়েছেন—অবনীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান করবার জন্য। সাধারণে এর জন্য কি করবে জানি না, তবে আমাদের শিল্পিদের মধ্যে যেমন নন্দবাবু, মুকুলবাবু, অসিতবাবু সকলকে নিয়ে এবং আমাদের যে সব ছাত্র আছে তাদেরকে নিয়ে, বেশ ভাল করে জন্মোৎসব অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। শ্রাবণ মাসে অবনীন্দ্রনাথের জন্ম। এখন থেকে সমস্ত দেশবাসীকে আর একবার স্মরণ করিয়ে দিতে হবে, যাতে সকলের সাহায্য পাওয়া যায়। এ কাজ একলার নয়—সকলের। সকলকেই চাই। আমাদের দেশে অনেকের জন্মোৎসব অনুষ্ঠান হচ্ছে, সাধারণে অবশ্য করছে—ভাল করছে; কিন্তু শিল্পির দিকে বিশেষ কারও দৃষ্টি নেই। চিত্রশিল্পী আজ যেন অপাংক্তেয়, একধারে পড়ে আছে। ভারতের শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ আজ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন। চিরকালই তিনি ভাবুক, তাঁর মনের যে শিল্পী, সে যেন পাগল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের তিরোধান তাঁকে আরও পাগল ক'রে দেবে।

দেবী দুর্গার একখানা ছবি আঁকছিলাম, প'ড়ে আছে, শেষ করতে পারছি না। কেমন যেন লাগছে, মনকে কোথায় হারিয়ে ফেলেছি। যখন অবনীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ আসতেন সোসাইটীতে আমার ছবি দেখতে, তখন ছাত্র ছিলাম, বেশ ছিলাম। তখন কত আনন্দে কেটেছে। নন্দবাবু আরও ভেঙ্গে পড়েছেন। গেল শীতকালে শান্তিনিকেতন গিয়েছিলাম। নন্দবাবু ভাল রকম ব্যবস্থা সব করে দিলেন। কিন্তু কবির সঙ্গে দেখা করলাম না। নন্দবাবু বললেন, "কি হবে বিরক্ত করে, আজকাল আর ভাল দেখতে পান না, ভাল শুনতে পান না, কেমন যেন হ'য়ে গিয়েছেন। বুঝতে পারছি আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে, আর ভাল লাগছে না, কটা বছর থাকবো।"

রবীন্দ্র-প্রয়াণে শান্তিনিকেতনের যে ক্ষতি হ'লো তা আর পূরণ হবার নয়। লোক সেখানে যেতো, যেমন দেবতা দেখতে আর তার সঙ্গে মন্দির দেখতেও যায়, কিন্তু এখন শুধু মন্দির রইল, দেবতা নেই।

রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি কি শিল্পী ছিলেন না, তাঁর দৃষ্টি ছিল সকল দিকে। তিনি বাণীর বরপুত্র ছিলেন। রূপের পূজারী ছিলেন। গুণীর আদর তিনি করতেন—শিল্পীদের ছিলেন তিনি দরদী-বন্ধু।*

* রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শিল্পাচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের আলোচনার সারাংশ। শিল্পী মহীতোষ বিশ্বাস কর্ত্তৃক অনুলিখিত

মৃত্যুবিজয়ী হে নীলকণ্ঠ, তোমারে প্রণাম করি !

বাঙলার রবি তুমি, জগতের কবি ;
বিশ্বপটে রেখে গেলে বিমোহন ছবি।

—শ্রীজহরলাল বসু

এইতো এখনি চুপি চুপি এসে কত কথা গেলে বলি'
বিশ্বমনের হে অধিনায়ক হৃদয়-গগন ভরি'।
আজি তুমি নাই, তবু ভুলে যাই তুমি গেছ দূরে চলি'
মৃত্যু-বিজয়ী হে নীলকণ্ঠ ! তোমারে প্রণাম করি !

—শ্রীরণজিৎকুমার সেন

একান্ত করিয়া যেই মৃত্যুহীন প্রাণ গেলে রাখি'
পৃথিবীর প্রিয়তম, প্রাণগুরু, রবীন্দ্র আমার !
ফুটায়ে তুলিতে তাহা অপূর্ণিত প্রাণ মোর বাকি
প্রেরণার প্রাতে লহ সে প্রাণের নম্র নমস্কার।

—শ্রীপূর্ণেন্দু গুহরায়

কর্ম তোমার ফুলের মতোই
গন্ধ বিলায় ছন্দ মলয়
যাত্রা তোমার অমরলোকে,
মর্ত্যে তুমি মৃত্যু-বিজয় !

—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সাহা

চলে গেছো মহাকবি, আছে কথা গান
মানুষের ইতিহাসে কালজয়ী দান।
লহ মম অঞ্জলি পূত-নিবেদন
বরণীয় স্বর্গত ভারত-তপন।

—শ্রীদেবনারায়ণ গোস্বামী

স্বপ্নময়ী প্রকৃতির স্নেহ-সিক্ত পুষ্পিত বিস্ময়
অন্তর্গূঢ় সৌন্দর্য্যের চির নব প্রমূর্ত্ত প্রকাশ—
বাণী-বীণা-বিনিঃসৃত সুললিত ঝঙ্কার উদাস ;
হে রবি, প্রশান্ত-দ্যুতি বিচ্ছুরিত তব বিশ্বময়।

—শ্রীভুবনচন্দ্র বিজলী

কোথায় আজিকে আমাদের কবি,
কোথায় লুকালে ভারতের রবি।

—কুমারী সংযুক্তা বর্দ্ধন
(বয়স ১৩)

হে বরেণ্য মহাঋষি ! বিশ্ব গেলে জিনি'
তব দান-রত্নে তুমি করে গেলে ঋণী !

—শ্রীসুরবালা বিশ্বাস

স্বার্থ লোলুপ জগৎজনেরে শোনালে শান্তিবাণী.
কাব্য তোমার সেবিল মোদের স্বর্গের সুধা আনি'।
জীবনদেবের ওগো পূজারিন্, লুটায়ে প্রণাম করি,
ক্ষুদ্র কবির মস্তকে তব অশীষ পড়ুক ঝরি'।

—শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

কাব্যলোক উৎস ধারায় যে মধু সঙ্গীত তব
বিশ্বের অন্তরতলে তুলিয়াছে সুর অভিনব,
স্তব্ধ সে সঙ্গীত আজি। আমি তার ছন্দ সুর লভি'
ব্যথাতুর অন্তরের শ্রদ্ধা দিই হে মহান্ কবি !

—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

যত দূরে যাও যেথা তুমি রও
আমারে ছাড়িতে পারো কি ?
আঁখি-ছাড়া যদি হৃদি-ছাড়া নও
ছাড়াছাড়ি হবে ভাবো কি ?

—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ নাথ

রাঙ্গিয়ে এলে রাঙ্গিয়ে গেলে ওগো অরুণ রবি,
"বলাকা" যে কাঁদে আজি হারিয়ে তোমায় কবি !
এলে যদি সুর বাজাতে সকল সুর একতারাতে
শেষ প্রণতি শেষ না হতে মিলাল ঐ ছবি।

—কাজী গোলাম আকবর

অস্ত গেছে রবি, শোকরক্ত স্মৃতির আকাশে,
ম্লানপাণ্ডু গোধূলির আলো ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসে,
অন্তহীন সাগরের পারে
অমরত্ব লভি'।

—শ্রীমোহনলাল মজুমদার

রেখে গেলে তুমি আজ অশ্রুভরা আঁখি,
তোমার বিয়োগে কবি স্মৃতিপুঞ্জ রাখি'।

—কুমারী মীরা মুখোপাধ্যায়
(বয়স ১০)

লোকান্তরে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের পরলোক প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সম্বন্ধে কোন কিছু বলা বা লেখা হয়ত সহজ নয়। তাঁর মৃত্যুর স্মৃতি এখনো বড়ই কাঁচা—তা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা কঠিন। এই প্রগাঢ় শোকের মুহূর্ত্তে তাঁর সম্বন্ধে কোন কথা বলতে গেলে সর্ব্বপ্রথম ভয়ই হল তাঁর সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলার সম্ভাবনা—তিনি এতই বড় ছিলেন এবং তাঁর তুলনায় আমরা যে কেউই ছিলাম এত ছোট যে, এ প্রলোভন আসবে অতি স্বাভাবিক ভাবেই, কিন্তু এই প্রলোভনকে অতিক্রম করতে না পারলে, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমরা কিছুই লিখতে বা বলতে পারবো না। কিন্তু এখনো আসেনি সে সময়।

সূর্য্যের মতো তিনি ছিলেন স্বপ্রকাশ মহিমায় উজ্জ্বল, অভ্রলেহী গিরিশিখর থেকে আরম্ভ করে তুচ্ছ তৃণ গুচ্ছটির ওপর পর্য্যন্ত আবারিত ধারায় এসে পড়েছে তাঁর দ্যুতি। তৃণের জীবন ভরে উঠেছে হয়ত তাতে সফলতার সঞ্চয়ে, কিন্তু সে কাহিনী সগৌরবে ব্যক্ত করার নয়। তা ধরবে স্পর্দ্ধার আকার, মহৎকে তা ছোটই করবে।

তাঁর মৃত্যুতে ব্যথিত হয়েছি, সকলের অগোচরে বার বার বিহ্বল বেদনায় করেছি অশ্রুপাত—সে কথা বলারই বা সার্থকতা কি? চিরস্থায়ী রসের সঞ্জীবনী ধারায় যিনি প্রাণবন্ত করে গেছেন বাংলার জীবন ও সংস্কৃতিকে, বাঙালীর নির্ব্বাক মুখে যিনি দিয়ে গেছেন চিরদিনের অম্লান ভাষা, সেই অনন্যকর্ম্মা ভাব-ভগীরথের মৃত্যুতে উচ্ছ্বাস করার জন্যে গলা বাড়িয়ে দেবার বিশেষ কি অধিকার আমার আছে? সে কথা বলাও ত আত্মপ্রচারের মতো। তাই আমি সেই লোকান্তরিত মহান আত্মার উদ্দেশে শুধু শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেই ক্ষান্ত হবো। তার আগে আমারি মতো আর সকলকে অনুরোধ করবো—রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুকে মূলধন করে আমরা, তাঁর অগণিত শিষ্য-সেবক ও অনুরাগীরা, যেন প্রবল উৎসাহে আত্মঘোষণা করতে উদ্যত না হই। এ হল গভীর নৈঃশব্দ্যে অন্তর দিয়ে অনুভব করবার ঘটনা—ভাষা দিয়ে একে ব্যক্ত করে আমরা যেন মহাকবিকে খর্ব্ব করতে না যাই।

রবীন্দ্র-প্রয়াণে

শ্রীক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী

রবীন্দ্রনাথ নাই! একথা সত্য বলে মেনে নিতে মন যে কিছুতে রাজী হচ্ছে না! কিন্তু যা সত্য তাকে মিথ্যা বলে প্রমাণিত করার কোনও মন্ত্রইত আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। বিধাতার দণ্ড অলঙ্ঘনীয়। এই নিষ্ঠুর দান আমাদের মাথা পেতে গ্রহণ করতেই হবে।

আজ লেখনীর মুখরতা গেছে থেমে। মর্ম্মন্তুদ বেদনায় অন্তর স্তব্ধ হয়ে আছে। নিত্য নবীন প্রাতে অরুণকিরণ-সম্পাতে কত লাখো লাখো অঙ্কুর অন্ধকার মৃত্তিকা গর্ভ হতে জন্মলাভ করে, কত শত পুষ্পমঞ্জরী গন্ধে বর্ণে বিকশিত হয়ে ওঠে, কে তার সংখ্যা গণনা করতে পারে? তেমনিই রবীন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ প্রতিভার দীপ্তস্পর্শে, কত সহস্র লেখক কবি-অকবি জ্ঞানে-অজ্ঞানে, অন্তরে প্রেরণা পেয়েছে, তাঁর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছে, কে তার খবর রাখে? আজ আমাদের সেই নিত্য নব নব চাওয়া ও পাওয়া চিরতরে শেষ হয়ে গেল; কিন্তু যে কাব্যসুধা তিনি অঞ্জলি ভরে আমাদের দিয়ে গেছেন তার বুঝি শেষ কোনও যুগে নেই। জগতে চিরদিন কেউ থাকে না ও চিরকালের জন্য কাউকে ধরে রাখা যায় না। যখন এবং যতটুকুর জন্য যা পাওয়া যায় তাই হাসিমুখে গ্রহণ করা শ্রেয়ঃ। সুদূরের জন্য ব্যাকুলতা নিতান্ত অশোভন। এই সত্যটুকু তিনি ভাবে, রসে, গানে ও সুরে গেঁথে, অতি দরদভরে আমাদের হাতে তুলে দিয়ে গেছেন:

> "ফুরায় যা দেরে ফুরাতে—
> ছিন্ন মালার ভ্রষ্ট কুসুম, ফিরে আনেনাকো কুড়িতে।
> ......যখন যা পাস, মিটায়ে নে আশ
> ফুরাইলে দিস্ ফুরাতে—"

মানুষ রবীন্দ্রনাথকে আমরা হারিয়েছি বটে, কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথ অমর হয়ে আমাদের কাছেই আছেন। ওগো ঋষি কবি, তুমি আমার প্রণাম নাও।

বন্ধু রবীন্দ্রনাথ

অধ্যাপক ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার

রবীন্দ্রনাথের নশ্বর দেহের প্রতি শেষ প্রণতি জানাইয়া নিমতলা হইতে ফিরিতেছি, এমন সময় সাহিত্যের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক সম্প্রতি ব্যাঙ্কের পরিচালক এক অন্তরঙ্গ জনের সহিত দেখা হইল। তিনি ম্লান হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বন্ধুকে শেষ দেখা দেখে এলে?" এই প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাদের সত্যকারের সম্বন্ধটী বিদ্যুচ্চমকের মতন সহসা মনের মধ্যে প্রকটিত হইল। তাইতো, এই যে অগণিত নরনারী অশ্রুসজল নয়নে হায় হায় করিতে করিতে কবিগুরুর শবানুগমন করিতেছে, এ তো বন্ধুর প্রতি বন্ধুর আন্তরিক ভালবাসার অভিব্যঞ্জনা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ আমাদের গুরু, উপদেষ্টা, জননায়ক, যুগপ্রবর্ত্তক সত্য, কিন্তু সবার উপরে তিনি আমাদের বন্ধু। শ্রীকৃষ্ণ যেমন ব্রজজনের— আর্ত্তিহর, ত্রাণকর্ত্তা, সম্পদে বিপদে একমাত্র অবলম্বন এবং সর্ব্বোপরি তিনি গোপগোপী সকলের প্রিয়তম বন্ধু, তেমনি রবীন্দ্রনাথের সহিত আমাদের বন্ধুত্বের সম্বন্ধ আর সকল সম্বন্ধকে অনাবৃত করিয়া রাখিয়াছে।

সংস্কৃত প্রবচনে আছে, উৎসবে, ব্যসনে, রাজদ্বারে ও শ্মশানে যিনি সঙ্গে থাকেন তিনিই বন্ধু। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়া আমরা কোন প্রকার উৎসব করার কথা কল্পনাও করিতে পারি না। প্রণয়-নিবেদন, পূর্ব্বরাগ, অভিসার, মিলন-উৎসব, সভা-সমিতি, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সব কিছুতেই আমরা তাঁহার ভাষায় কথা বলি, তাঁহারই গান গাহিয়া হৃদয়ের ভাবকে ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাই, তাঁহারই কল্পনার রক্তরাগে কামনা-বাসনাকে অনুরঞ্জিত করি। দুর্ব্বল হইয়াও প্রবল রাজশক্তির সমক্ষে বুক ঠুকিয়া দাঁড়াইবার সাহস দিয়াছেন তিনিই; ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির মর্ম্মকথা ব্যাখ্যা করিয়া তিনিই আমাদের আদর্শকে উঁচু পর্দ্দায় বাঁধিয়া দিয়াছেন; সর্ব্বাধিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে অকুতোভয়ে প্রতিবাদ করিবার প্রেরণাও পাইয়াছি আমরা তাঁহারই নিকট হইতে। তাঁহার গীতিকবিতায় অধ্যাত্ম জীবনের পরম সম্পদ্ আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছি। রবীন্দ্রনাথের অসীম অবদানে আজ আমরা সম্পদ্শালী। চিন্তায়, ভাবে রবীন্দ্রনাথ এ শতাব্দীর মহনীয় প্রতীক্। এমন নিকটতম আত্মীয় ও বন্ধু হারাইয়া বাঙালী সত্যই আজ অনাথ হইল।

সিদ্ধপুরুষ রবীন্দ্রনাথ

কবিরাজ শ্রীবিমলানন্দ তর্কতীর্থ

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী", এই মহাবাক্যের সত্যতা কবির জীবনে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কৈশোরে প্রারব্ধ শব্দব্রহ্মের সাধনা যৌবনে মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিলেও প্রৌঢ়ে তাহার পৃথিবীব্যাপী প্রচার ও প্রকাশ হয়; বার্দ্ধক্যেও তাহার প্রবাহ ছিল অবিচ্ছিন্ন। সেই শব্দব্রহ্মের সাধনার তরঙ্গে তিনি সমগ্র জগৎকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাই পরাধীনতার বন্ধনে আবদ্ধ ভারতের একজন পরাধীন অধিবাসী হইলেও তাঁর সে সাধনার গতিকে কেহ রোধ করিতে পারে নাই।

বিজয়ী পাশ্চাত্যের নব সভ্যতার গর্ব্বোদ্ধত বাণী বিজিত জাতির কবির নিকট আসিয়া ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তি আধ্যাত্মিকতার পরিচয় পাইয়া কুণ্ঠার সহিত অবনত মস্তকে ফিরিয়া গিয়াছে। তাই আমরা আজ পরাধীন হইলেও বিশ্বের দরবারে নগণ্য নহি, মৃত নহি।

ভারতের প্রাচীন ও নবীন সভ্যতা গঙ্গাযমুনার মতই রবীন্দ্রনাথে সম্মিলিত হইয়া তাঁহাকে "ত্রিবেণীর" ন্যায় মূর্ত্তিমান্ তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিল, তাই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত হইতে তাঁহার সাধনার নিকেতন 'শান্তি-নিকেতনে' বিশ্ববাসী ছুটিয়া আসিতেন।

যে সত্যের আস্বাদ তিনি পাইয়াছিলেন—তাঁহাকেই শিব ও সুন্দর রূপে স্থায়ী করিবার একান্ত আগ্রহই তাঁহার শান্তিনিকেতন পরিকল্পনায় পরিস্ফুট হইয়াছিল। শান্তি-নিকেতনের এই "শিব ও সুন্দর" মূর্ত্তি অটুট করিতে পারিলেই সেই ব্রহ্মলীন আত্মার প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা দেখান হইবে।
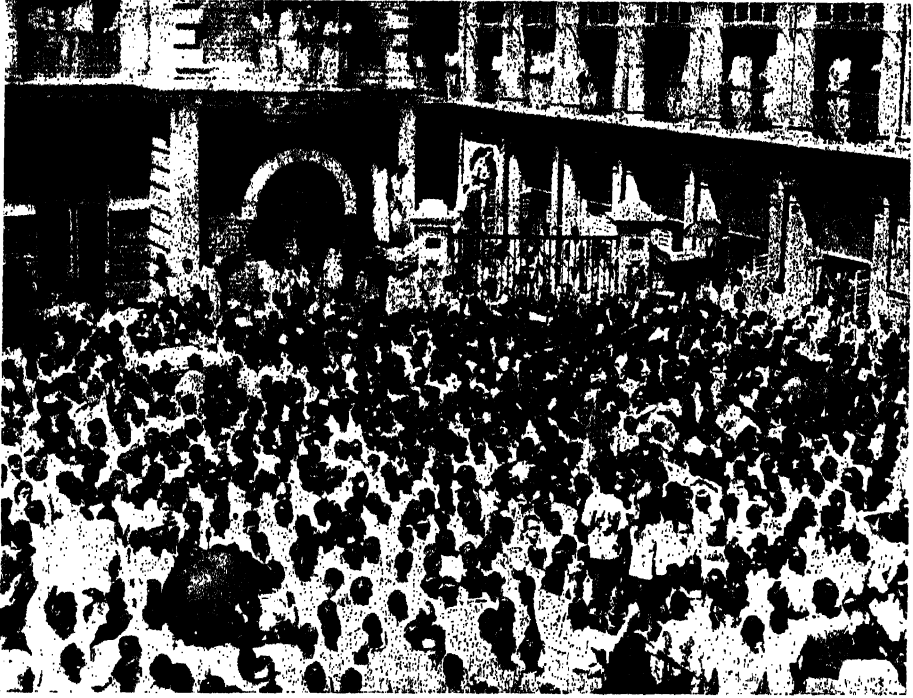
ঠাকুরবাড়ীর প্রাঙ্গণে আকুল উদ্‌গ্রীব দর্শনপ্রার্থীর ভীড় ফটো : ডি. রতন

অস্তগামী রবি

শ্রীঅক্ষয়কুমার রায়

জোড়াসাঁকোর প্রাসাদতুল্য পৈতৃক বাসভবনেই রবীন্দ্রের উদয় আর অস্ত। শান্তিনিকেতনের দিগন্ত বিস্তৃত নির্জ্জন প্রান্তর-বুকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সাধ আর কবির পূর্ণ হইল না।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের যে বড় অসুখ করিয়াছিল, তাহার পর হইতেই স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবার ফলে চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে কলিকাতা শান্তি-নিকেতনে আসা-যাওয়া করিতে হইত। এবারে কিন্তু তাঁহার কলিকাতা আসিবার তেমন ইচ্ছা না থাকিলেও চিকিৎসার সুবিধার জন্য অবশেষে তাঁকে আসিতে হইল। সেবা পরিচর্য্যা করিবার জন্য প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী অধ্যাপকদের মধ্যেও জনকয়েক সঙ্গে আসিলেন। অনেক ধনী পরিবারে দেখা যায়, অসুখের সময় বেতনভুক্ পারদর্শী পরিচর্য্যাকারিণীরা সেবাযত্ন করিয়া থাকেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সম্বন্ধে তাহা কোনদিনই পছন্দ করিতেন না। যাঁহাদের সঙ্গে অন্তরের যোগ ছিল এমন অন্তরঙ্গজনের নৈকট্যই তাঁর প্রিয় ছিল।

ডাক্তারদের নির্দ্দেশানুসারে, রবীন্দ্রনাথের দর্শনপ্রার্থীদের সম্বন্ধে কড়াকড়ি ব্যবস্থা সত্ত্বেও আত্মীয়স্বজন ও অনুরক্তদের আসা-যাওয়া, খবরাখবরের ভীড় অনবরতই লাগিয়াছিল। তাঁহারা আসিয়া সাধারণতঃ বসিতেন "বিচিত্রায়" (দোতলার বড় হল), তাহা ছাড়া অন্যান্য ঘরেও যে যাঁহার ভাবে বসিয়াও আলাপ-আলোচনা করিতেন। পাশের একটি ঘরে সর্ব্বদার জন্য একজন টেলিফোন ধরিয়া বসিয়া থাকিতেন। "বিচিত্রা এবং রবীন্দ্রনাথের ঘরটি একটি রেলিংঘেরা 'ওভার ব্রিজের' দ্বারা সংযুক্ত ছিল। শেষের ক'দিন ঘনায়মান আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠা সারা আবহাওয়ায় অনুভূত হইত। ৩০শে জুলাই অস্ত্রোপচারের পর সমস্ত দিনটা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় কাটাইয়া সন্ধ্যা হইতে তিনি একটু ভাল বোধ করিতে লাগিলেন। আশার আলোয় সকলেরই মুখচোখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। দিন দুই পরেই পুনঃ কবির তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থা দেখা দিল এবং তাহাই ক্রমে অজ্ঞান অবস্থায় পরিণত হইল।

৬ই আগষ্ট হইতেই কবির অবস্থা দ্রুত খারাপের দিকে চলিল। চিকিৎসকেরা নিরাশ হইলেন। বৈকালের দিকে দেখি শ্রীযুত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর "বিচিত্রার" এঘর ওঘর ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, কোথাও স্থির হইয়া বসিতে পারিতেছেন না। এক একবার কবির ঘর পর্য্যন্ত যান আর ফিরিয়া আসিয়া বলেন, "এ কী বিপদ হল! দেখতেও ইচ্ছা করে, এ অবস্থা কী আর দেখা যায়?" একটি ঘরে আমি ও নন্দলাল বসু মহাশয় বসিয়া আছি, এমন সময়ে অবনীন্দ্রনাথ আসিয়া ব্যাকুল উৎকণ্ঠার সহিত বলিয়া উঠিলেন, "সূর্য্যগ্রহণ তো আরম্ভ হল!"

৭ই আগষ্ট। শ্রাবণের পরিচ্ছন্ন পূব গগন রাঙিয়ে একদিকে সূর্য্যোদয় হইতেছে, অপর দিকে বাঙালীর হৃদয়াকাশে বাংলার গৌরব-রবি জীবনের অপার মহিমার রং ছিটিয়ে অস্ত যাইতেছে। সে এক মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য! উৎকণ্ঠিত আত্মীয় - স্বজন - পরিজন - অনুরাগী - ভক্ত-শিষ্য সমাগমে বিস্তৃত ঠাকুর বাড়ী গম্ গম্ করিতে লাগিল। আকুল উদ্‌গ্রীব দর্শনপ্রার্থীর ভীড় বেলা ৯৷১০টার মধ্যেই অবারণীয় হইয়া উঠিতে লাগিল।

অমরলোকযাত্রী রবীন্দ্রনাথের ঘরটির পূর্ব্ব দিকের বারান্দায় ছিলেন মহিলারা, পশ্চিমের লম্বা বারান্দা ও অন্যান্য সব ঘর ভর্ত্তি পুরুষেরা আকুল উৎকণ্ঠমান। নিরাভরণ গৃহ—রোগ-শয্যার খাট ভিন্ন কবীন্দ্রের ঘরে আর কোন আসবাব ছিল না। খাটের পাশেই মেঝের উপর বসিয়াছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বিধুশেখর শাস্ত্রী প্রমুখ অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগণ। মীরা দেবী (কবির কন্যা) ও প্রতিমা দেবী (পুত্রবধূ) দেওয়ালে ভর দিয়া নিশ্চল পাথরের মূর্ত্তির মত বসিয়া। কবিবরের দীর্ঘায়ত সুঠাম সুগৌর তনু শয্যালীন—কণ্ঠে ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস। কবির শুষ্ক কণ্ঠ সিক্ত করিতেছিলেন অমিতা দেবী (নাতিবৌ); দুই চক্ষু উপচিয়া তাঁর অশ্রুর বান ডাকিয়াছে।

১১টা.... ১২টা ... পূর্ব্বদিকের বারান্দা হইতে একটি মহিলা অশ্রুসজল কণ্ঠে গান ধরিলেন:

> "তোমারি ইচ্ছা হোক পূর্ণ, করুণাময় স্বামী।
> তোমারি প্রেম স্মরণে রাখি, চরণে রাখি আশা,
> দাও দুঃখ, দাও তাপ, সকলি সহিব আমি।..."

পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী আবৃত্তি করিলেন:

> "অসতো মা সৎগময়
> তমসো মা জ্যোতির্গময়
> মৃত্যোমাং অমৃত গময়—

বিমূঢ় বিহ্বল অন্তরে ঘরের একটি কোণে দাঁড়াইয়াছিলাম, কিন্তু আর পারিলাম না। নাঃ—সে মৃত্যুকরুণ দৃশ্য অসহনীয়! অভিভূতের মতই বাহির হইয়া পড়িলাম।

প্রিয়-হারার সে নিদারুণ নিষ্ঠুর বারতা যখন ঘোষিত হইল তখন মধ্যাহ্ন ১২টা ১০ মিনিট।

চলে গেল সোণার দুলাল —

— শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী কবিরত্ন, বি.এ.

একে একে বঙ্গমার চলে গেল সোণার দুলাল!
দেশবন্ধু, দেশপ্রিয়, দেশপ্রাণ অতি অসময়
চলে গেল, ভেঙ্গে দিয়ে বাঙালীর কোমল হৃদয়
শোক-সিন্ধু বঙ্গবুকে প্রবাহিত তরঙ্গে উত্তাল

বরাভয় আশুতোষ চলে গেল, অসমাপ্ত কাজ
জগদীশ চলে গেল কাঁদাইয়া এই ত সেদিন
বাঙালীর চিত্তখানি শোকে তাপে শুধু চির-লীন
কত আর হারানিধি খুঁজে পাই শোক-সিন্ধু-মাঝ!

বঙ্গমার প্রিয় পুত্র প্রায় শেষ শ্রেষ্ঠ যে সন্তান
ভারতীর একনিষ্ঠ সেবাব্রতী প্রেমের তাপস
কণ্ঠে যার গীত হয় চির সত্য অপূর্ব্ব সাহস
সেই রবি আজি হায় অস্তমিত। নীরব সে গান।

বাঙালীর আশাস্থল, যে আশ্রয়, সে-ও গেল আজ
এ জাতির শক্ত শিরে আর কত পড়িবে রে বাজ!

অন্তিমশয়নে রবীন্দ্রনাথ

ফটো: ডি. রতন

অস্ত গেল রবি
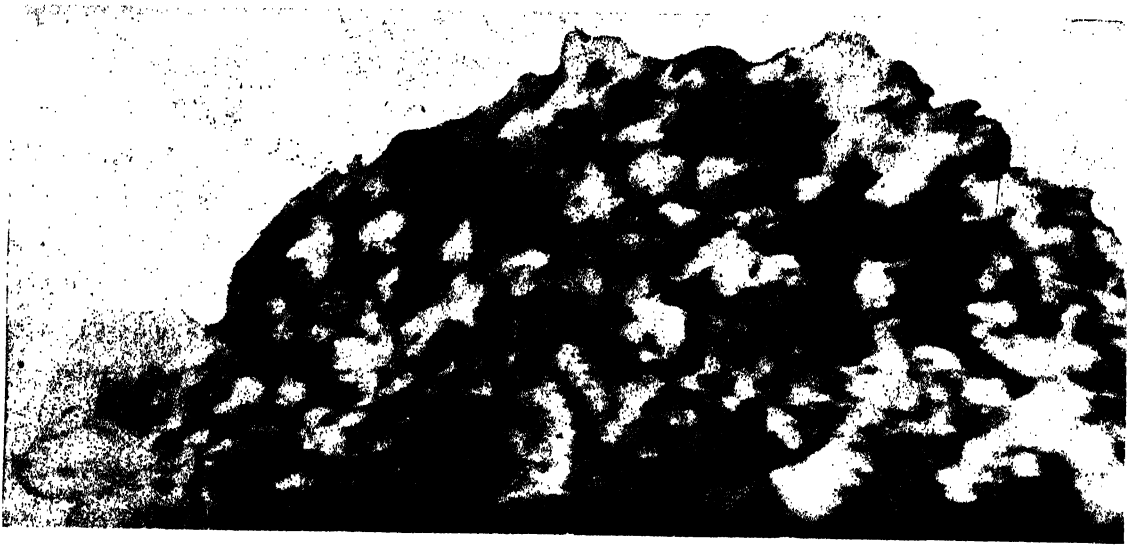
শ্রীসুকৃতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

অস্ত গেল রবি। দেখিতে দেখিতে এ সংবাদ কলিকাতার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত ছড়াইয়া পড়িল। ঠাকুরবাড়ীর বাহিরের উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষমান অগণিত জনতার তরঙ্গায়িত বেদনা-বিক্ষোভ আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিল। চারিদিকের রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত করা মাত্র ঝঞ্ঝার মত জনারণ্য প্রিয় কবিকে এ জীবনের মত একবার শেষ দর্শন করিবার জন্য পড়ি-মরি করিয়া ছুটিল। ঠাকুরবাড়ীর লৌহ দ্বার সে শোকোন্মত্ত জনতার ভার সহিল না। বেতারের সাহায্যে ভারতের সর্বত্র এবং পৃথিবীময় এ সংবাদ প্রচারিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার সংবাদপত্রসমূহের বিশেষ সংখ্যায় চতুর্দ্দিকে সেই সংবাদ ছড়াইয়া দিল। সর্ব্বত্র বিষাদের ছায়া। অফিস, স্কুল, কলেজ ইত্যাদি বন্ধ হইল। দলে দলে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নরনারী কবির প্রতি তাহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা-নিবেদন করিবার জন্য পথে ঘাটে, জানালায়, ছাদে, যেখানে তিলমাত্র স্থান ছিল, সেইখানে আসিয়া ভীড় করিল। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! একজন কবির মৃত্যুতে সমগ্র দেশের মর্ম্মস্থলে এত গভীর বেদনাবোধ ইতিপূর্ব্বে বিশ্বের বোধহয় আর কোথাও জাগে নাই। সারা দিনরাত্রি রেডিওর কর্ত্তৃপক্ষ রবীন্দ্রনাথের মৃত আত্মার সম্মানার্থে তাঁরই অনুপম আবৃত্তি ও শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতগুলি শোনাইবার ব্যবস্থা করেন এবং অসংখ্য জনতা উহা অধীর আগ্রহে শোনেন। রেডিওতে শোভাযাত্রা ও শশ্মান দৃশ্যের করুণ বর্ণনা অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল।

কবির মৃত্যুপাণ্ডু সোণার তনু গোলাপ-জলে স্নান করাইয়া চন্দনচর্চ্চিত করা হইল। শ্রীযুত নন্দলাল বসুর পরিকল্পিত শ্বেত-বস্ত্রাচ্ছাদিত ষ্ট্রেচারে তুষারশুভ্র গরদমণ্ডিত কবির দেহ বিপুল পুষ্পস্তবকসমাচ্ছাদিত হইয়া এবং নির্ব্বিচারে জনগণ কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া প্রায় পৌনে ৪টার সময় শোভাযাত্রা বাহির হইল। বিবেকানন্দ রোড, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলুটোলা, কলেজ ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, গ্রে ষ্ট্রীট, বটকৃষ্ণ পাল এভিনিউ হইয়া নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট ধরিয়া নিমতলা শশ্মানঘাটের দিকে শোভাযাত্রা অগ্রসর হইতে লাগিল। বিশ্ববিদ্যালয় এবং অগণিত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথের শবাধারে স্তবক ও পুষ্পাঞ্জলি দান করা হয়। বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের নরনারী, উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন, এমন কি পুরাঙ্গনা বধূ ও অশীতিবর্ষের বৃদ্ধা অবধি তাহাদের প্রিয় কবিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করিবার জন্য ছুটিয়া আসে। কিন্তু বিশৃঙ্খল জনারণ্যের শোভাযাত্রার জন্য অনেককেই ব্যর্থকাম হইতে

হইল। শোক-যাত্রার পথের দুই ধারে, বাড়ীর বারান্দা, জানালা, ছাদ হইতে কবির ভক্ত ও অনুরাগীগণ শ্রদ্ধাঞ্জলিস্বরূপ পুষ্প-লাজ ও বারি-বর্ষণ করিতে লাগিলেন। জাতীয়-পতাকা সহ 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করিতে করিতে শোকযাত্রা অগ্রসর হইল।

দেখিতে দেখিতে বিদায়-সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। পুণ্যতোয়া গঙ্গার তীরে নিমতলা ঘাটে, যেখানে প্রতিদিন মানবজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রিয়তম সম্পদকে মানুষ চিরদিনের মত রাখিয়া আসে, যেখানে শত শত অনাথ, দারিদ্র্যক্লিষ্ট, উপবাসী, পতিতা ও সতী, তস্কর ও সন্ন্যাসী, জ্ঞানী ও মূর্খ এক হইয়া নিঃশেষে মিশিয়া যায়, সেই জনসাধারণের অতি পরিচিত তীর্থে মানবতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব মহিমান্বিত দেহখানি চিতায় তুলিয়া দেওয়া হইল। রথীন্দ্রনাথ অসুস্থ থাকায় শ্রীযুক্ত সুবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মুখাগ্নি করিলেন (৮-১৫ মিঃ)। সেই চিতা-শয্যার চতুর্দ্দিকে, গঙ্গার উপর নৌকা করিয়া, প্রাচীরের উপর দাঁড়াইয়া, সাঁতারে কাটিয়া চতুর্দ্দিকে যে জন-সমাগম হইয়াছিল তাহা দেখিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। এই নিদারুণ বৈজ্ঞানিক যুগেও কাব্য এবং মনীষার স্থান যে কোথায়, রবীন্দ্রনাথের শেষ নির্ব্বাণ দৃশ্যে তাহার প্রমাণ পাইলাম। দেখিতে দেখিতে চন্দন কাষ্ঠসজ্জিত চিতা লেলিহান শিখা বিস্তার করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। যে জ্বলন্ত দুঃখ অন্তরে বহিয়া প্রবঞ্চিত উপেন্দ্র দুই বিঘা জমির জন্য দেশ দেশান্তরে ঘুরিয়াছিল, যে কল্যাণময়ী ভারতের মাটীকে গোরা আপনার মাতৃ আসনে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, সেই লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত ভারতের হতভাগ্য জনসাধারণের কবি, আধুনিক যুগের মন্ত্রদাতার নশ্বর দেহ দেখিতে দেখিতে জ্বলিয়া ভস্মরাশিতে পরিণত হইল। শূন্য বুকে মর্ম্মন্তুদ হাহাকার লইয়া শ্মশান হইতে ফিরিলাম।

রবীন্দ্রনাথের শেষকৃত্য

শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ যে বিশ্বমানবের বিশেষভাবে জাতীয় আত্মার মূর্ত্ত বিগ্রহ ছিলেন, সে পরিচয় তাঁর জীবনকালে তেমন করিয়া ধরিতে পারি নাই, যেমনটি পারিয়াছি তাঁর অমূর্ত্ত হইবার পরে। কবীন্দ্রের নশ্বর দেহত্যাগের একাদশাহে ৩২শে শ্রাবণ রবিবার প্রাতে শান্তিনিকেতন তথা বাংলা ও ভারতের সর্ব্বত্র সমবেত অথবা ব্যক্তিগত-ভাবে গভীর শ্রদ্ধাসহকারে কবির ইচ্ছানুযায়ী বিনাড়ম্বরে যে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে তাহা বিশ্বের অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাসে সত্যই অভূতপূর্ব্ব।

ঐ দিন শ্যামগান মুখরিত শান্তিনিকেতন প্রাচীন ঋষি ভারতের তপোবনের এক নবতর রূপশ্রী ধারণ করিয়াছিল। সারারাত্রির মেঘ-মেদুর আকাশ ভোরের সঙ্গে সঙ্গে অশ্রুভারে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। আশ্রমচারণের কণ্ঠে "ভেঙ্গেছে দুয়ার, এস জ্যোতির্ম্ময়, তোমারি হউক জয়" সঙ্গীত-রাগিণী শ্রাবণের অজস্র বারি-বর্ষণ-ধ্বনির সহিত মিলিয়া সমগ্র প্রকৃতি যেন এক বাঙ্ময় আবেদনে মুখর হইয়া উঠিল। বায়ুবেগের শন্-শনানিতে সম্মিলিত চিত্তের অশ্রুসজল কারুণ্য যেন কথা কহিয়া উঠিল। এমনি এক পরিবেশের মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাধন বেদীর সন্নিকটে ছাতিম তলায় শিল্পী নন্দলাল বসু ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ করের পরিকল্পিত শ্বেত পুষ্পশোভিত শ্রাদ্ধমণ্ডপে বৈদিক মতে শ্রাদ্ধকার্য্য আরম্ভ হয়। রথীন্দ্রনাথ শ্রাদ্ধে বসিলে কবির ইচ্ছানুযায়ী তাঁহার শেষ সঙ্গীত 'সমুখে শান্তিপারাবার' গানটি প্রথমেই গীত হয়। গুচ্ছ গুচ্ছ আম্রপল্লব, পূর্ণকুম্ভ ও কদলীবৃক্ষ মণ্ডপের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিল। মঞ্চোপরি শ্বেত ও রক্তপদ্ম, রজনী-গন্ধার স্তবক, প্রজ্জ্বলিত ঘৃতদীপের সারি এবং সুসজ্জিত ধূপাধার প্রভৃতি বিবিধ উপচার।

শ্রাদ্ধমণ্ডপের সম্মুখে আর একটী সুপ্রশস্ত মণ্ডপে প্রত্যূষ হইতে আশ্রমবাসী, অভ্যাগত ও নিকটবর্ত্তী পল্লী অঞ্চল হইতে আগত শ্রদ্ধাকুল নরনারী সমবেত হইতে থাকে। সহস্রাধিক দর্শকের উপস্থিতি সত্ত্বেও অনুষ্ঠানে অদ্ভুত প্রশান্তি ও নীরবতা বিরাজ করিতেছিল।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের আরম্ভে 'তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী' গানটী গীত হয়। তৎপরে পুরোহিত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় কঠোপনিষদ হইতে "যম ও নচিকেতা"র কথোপকথন উদ্ধৃত করিয়া দুরূহ মৃত্যু-তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর সমস্বরে উপনিষদের "কস্মৈ দেবায় হবিষাবিধেম" সূক্তটী গীত হয়। তৎপরে শ্রাদ্ধকর্ত্তা শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্যে এক মর্ম্মস্পর্শী প্রার্থনা করেন যে, তিনি যে লোকেই থাকুন,

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হইতেছে

আমাদের প্রতি প্রসন্ন থাকুন। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী এবং পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় সম্মিলিত স্বরে শেষ ঋক্-মন্ত্রটী পাঠ করেন :

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বী নঃ সন্তোষধীঃ॥
মধু নক্তম্ উৎষষো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ!
মধুমান্ যো বনস্পতি র্মধুমা অস্তু সূর্য্যঃ।

অতঃপর "তোমারি অসীমে, প্রাণমন লয়ে" গানটী ছাত্রছাত্রীগণ কর্ত্তৃক সকরুণ সুরে সুরে গীত হইবার পর অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

সর্ব্বশেষে ছাত্রছাত্রী ও অভ্যাগতবৃন্দ ছাতিম বৃক্ষের তলায় সমবেত হইয়া, "কর তাঁর নাম গান, যতদিন রহে প্রাণ" গানটী গাহিয়া স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রিয় উপাসনা বেদীটী প্রদক্ষিণ করেন। ঐদিন শান্তিনিকেতন অতিথি, অভ্যাগত এবং তিন সহস্রাধিক কাঙালীকে ভোজন করান হয়।

শেষ প্রণাম —

— শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বাণীকণ্ঠ

ছ'দশ বর্ষ গাহিল যে জন গান
প্রেমে আনন্দে পুলকে পূরিল প্রাণ
সে কবিগুরুরে জানাও হে মোর দেশ
জানাও শেষ প্রণাম!
চিত্ত যাঁহার রসলোক করি' সৃষ্টি
নিখিল চিত্তে আনিল রসের বৃষ্টি
রসরাজ সেই কবিরে জানাও দেশ
জানাও শেষ প্রণাম!
নিখিলজনের হৃদয়ে বসতি যাঁর
অমর সে জন,—মৃত্যু কি আছে তাঁর?
তাঁহারে আজিকে জানাও বিশ্বজন
জানাও শেষ প্রণাম!

হে কবিগুরু, চিরজয়ী তুমি হও
ব্রহ্মলোকে চির আনন্দে রও
আশার মন্ত্র অন্তরে তুমি কও—
লহ শেষ প্রণাম!
তোমারে হারায়ে রিক্ত হ'ল এ দেশ
গৌরব-রবি চিরতরে হল শেষ
তোমারে জানাই ওগো মহামহীয়ান্
প্রাণের শেষ প্রণাম!
তোমারে মানব ভুলিবে না কোনদিন
তব বীণা হৃদে ঝঙ্কবে রিণিরিণ—
ওগো যুগগুরু তব কাছে চির ঋণ,
লহ শেষ প্রণাম!

সিংহলের গৌরবময় যুগের একটী অধ্যায়

শ্রীঅজিত ঘোষ

সে আজ অনেক দিনের কথা। আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে, গৌতম বুদ্ধ যখন ভারতীয় জীবনধারায় ধর্মনীতির নববিধানের সূত্রপাত করিলেন, ঠিক সেই সময় বাঙলাদেশ হইতে রাজকুমার বিজয়সিংহ সমুদ্রপথে নিরুদ্দেশ-অভিযান করিয়াছিলেন।* বিজয়ের সে নিরুদ্দেশ-যাত্রার কারণ এখনও রহস্যাবৃত। তবে একথা সত্য যে, নিতান্ত অকারণ তিনি তাঁর সৈন্যসম্ভারপূর্ণ অর্ণবপোতগুলি বঙ্গোপসাগরের জলে ভাসাইয়া দেন নাই। অবশ্য এই নিরুদ্দেশযাত্রার অন্তর্নিহিত সত্য খুঁজিয়া বাহির করা সহজসাধ্য নয়। মাত্র পিতার সহিত বিরোধের ফলেই যে তিনি রীতিমত তোড়জোড় করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন, একথা কখনই স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না। একটা কিছু তাঁর লক্ষ্য ছিল, এরূপ সন্দেহ অনেকেই হয়তো করিয়া থাকিবেন।

ট্রয়যুদ্ধের অবসানে রণশ্রান্ত গ্রীকবীর ইউলেসিস্ যেমন প্রত্যাবর্তনের পথে সমুদ্রে নিশানা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন, বিজয়ের ভাগ্যে অনেকটা সেই রকম অবস্থা ঘটিয়াছিল। ভারত-মহাসাগরের জলের উপর দিয়া ঘুরিয়া তিনি আরব্যোপসাগরে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু পারস্য পর্যন্ত গিয়া তাঁহাকে ফিরিতে হয়। তার পর বোম্বাইএর উপকূল দিয়া চলিতে চলিতে সহসা এক দিন তিনি লঙ্কাদ্বীপের তীরে আসিয়া পড়িলেন। এখানেই তাঁর অভিযান শেষ হইল। ইহার পূর্বে তাঁকে রাজ্যজয়ের জন্য বিশেষ উৎসাহিত হইয়া উঠিতে দেখা যায় নাই। এখানেই তাঁর রাজ্যজয়ের ইচ্ছা প্রবল হইয়া দেখা দিল। নবীন উত্তেজনায় সসৈন্য তিনি নামিয়া পড়িলেন। অপর পক্ষে লঙ্কার অধিবাসীরাও তাঁকে যথাশক্তি বাধা দিতে পরাঙ্মুখ হইল না। বিজয়ের বঙ্গীয় বাহিনীর সহিত তাদের ভীষণ যুদ্ধ হইল এবং পরিণামে বিজয় তাহাতে জয়ী হইলেন। বিজিত রাজ্যে বাঙলার নিশান উড়িল। বিজয় তাঁর উপনিবেশ স্থাপন করিলেন।

এ পর্যন্ত লঙ্কাদ্বীপ 'লঙ্কা' নামেই খ্যাত ছিল। বিজয়ের অভ্যুদয়ে উহা 'সিংহল' নামে পর্যবসিত হইল। তাঁর লঙ্কাজয়ের পরই সিংহলে নবযুগের সূচনা হয়। ইহার পূর্বে সিংহলদেশ সভ্য ছিল, না অসভ্য ছিল, এমন একটা স্থিরসিদ্ধান্ত করা সম্ভবপর নহে। তবে 'রামায়ণে'র ঘটনাকে যদি সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে অসভ্য কোন মতেই বলা যাইবে না। কারণ সংস্কৃতির ক্রমপ্রগতি থাকিবেই। রামায়ণের যুগে লঙ্কা শৌর্যপূর্ণ ও সঙ্গতিসম্পন্ন দেশ ছিল। তাহার পর কয়েক শতাব্দীকাল ধরিয়া সেই সংস্কৃতির যে ক্রমপ্রগতি চলে নাই তাহাই বা কেমন করিয়া বলা চলে!

যাহা হউক, বিজয়ই সর্বপ্রথম সিংহলে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে টানিয়া আনিলেন। সিংহলে তিনি তাঁর ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিলেন বটে, কিন্তু পরিণামে তাহা স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। মহাবংসে বলা হইয়াছে, সিংহলে রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার পর নিজের ও অনুচরদের বিবাহের জন্য তাঁকে ভারত হইতে অনেক রমণী আনিতে হইয়াছিল। হয়তো হইয়াছিল, কিন্তু সে স্বাতন্ত্র্য বেশী দিন বজায় থাকে নাই—সিংহলীদের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া পরে তাহা এক হইয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে সিংহলে নূতন সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিতে লাগিল,

* ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিজয়কে 'লাট' অর্থাৎ গুজরাত দেশের কোন রাজকুমার বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁর মতে, বিজয় গুজরাত হইতেই সরাসরি সিংহলে আসিয়াছিলেন। কিন্তু বস্তুতঃ, বিজয়কে লাট অর্থে গুজরাতের রাজকুমার বলা চলে না। প্রাচীন বাঙলায় দুইটী রাজ্য ছিল—একটী গৌড়, অপরটী রাঢ়ায় সিংহপুর। বিজয় রাঢ়ায় সিংহপুরেরই রাজকুমার। এই রাঢ়দেশই 'মহাবংসে' 'লাঢ়' নামে অভিহিত হইয়াছে—লাটের অপভ্রংশ লাঢ় নহে। কেহ কেহ হুগলী জেলার অন্তর্গত সিঙ্গুরকে প্রাচীন সিংহপুর বলিয়াছেন। যাহা হউক, বিজয় যে বাঙালী ছিলেন এ প্রমাণের অভাব নাই। মহাবংসে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। ভারতীয় সাহিত্যে, প্রাচীন শিল্পে এবং কোন কোন লিপিতেও তাহার সন্ধান পাওয়া যায়।

আর সিংহলের ইতিহাসে সেই সভ্যতার আদিপুরুষ ও প্রবর্তকরূপে বিজয় প্রখ্যাত হইলেন। বিজয়ের অভ্যুদয়ের ফলেই সিংহলের সহিত ভারতের একটা যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছিল। বিজয়ের সিংহলাভিযান, সিংহলে অবতরণ, যুদ্ধজয়, রাজদণ্ডধারণ প্রভৃতির একটা ধারাবাহিক চিত্র অজণ্টার ভিত্তিচিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের সহিত সিংহলের যোগাযোগ না থাকিলে এই চিত্রসমষ্টি
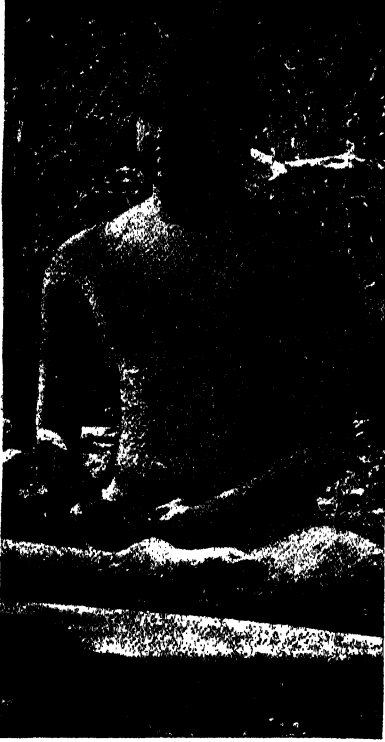
অনুরাধপুর-ধ্বংসাবশেষ হইতে প্রাপ্ত ধ্যানী বুদ্ধের একটী সুবৃহৎ মূর্তি (৫'. ৯") : বর্তমানে কলম্বো মিউজিয়মে রক্ষিত

আঁকা সম্ভবপর হইত না—সেগুলি মাত্র মহাবংস-দীপবংসের কাহিনী হইয়াই থাকিত।

বিজয় বৌদ্ধ ছিলেন না। সুতরাং তখনও সিংহলে বৌদ্ধধর্মের প্রবেশলাভের কোন প্রশ্ন ওঠে নাই। বৌদ্ধধর্মের প্রবেশের পূর্বে সিংহলীরা যে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল এমনও কোন শক্তিসম্পন্ন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে জৈন, আজীবক ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্মগুলির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হইত এরূপ উল্লেখ মহাবংসে আছে। সুতরাং এই ধর্মগুলি যে অল্প-বিস্তর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল তাহা মনে করা অসঙ্গত নহে। প্রাচীন সিংহলী সাহিত্যের বর্ণনাসমূহ হইতে স্থির করা যায় যে, বিজয় সিংহলকে একটা সুনিয়ন্ত্রিত সুসভ্য রাজ্যে পরিণত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সেই রাজ্য শাসনের জন্য উত্তর-সিংহলে তিনি তাঁর মুখ্যনিবেশ স্থাপন করেন।

সিংহলী সভ্যতার এই আদিকেন্দ্র বিজয়ের রাজধানী কোথায় ছিল? মহাবংসে বলা হইয়াছে, বিজয়ের অন্যতম মন্ত্রী অনুরাধ বিজয়ের সহিত বঙ্গদেশ হইতে আসিয়াছিলেন; তিনি কদম্বনদের নিকট 'অনুরাধগাম' প্রতিষ্ঠা করেন। এইখানে থাকিয়াই রাজকুমার এবং পরবর্তী প্রসিদ্ধ নরপতি পাণ্ডুকাভয়ের মাতামহের ভ্রাতা অনুরাধ উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই দুই জন অনুরাধ নিশ্চয় একই ব্যক্তি। দীপবংসেও দেখা যায়, অনুরাধ নামে এক জন নৃপতি অনুরাধপুর নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মহাবংসে আছে, অনুরাধের নিকট হইতে পাণ্ডুকাভয় বা অভয় অনুরাধপুর লাভ করেন এবং তথায় রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পূর্বে রাজধানী ছিল—উপতিস্‌সগাম। 'চূলবংস' হইতে আমরা জানিতে পারি, প্রাচীন পুলস্তিনগর বা পোলোন্নারুয় এবং এই উপতিস্‌সগাম অভিন্ন। সুতরাং স্বভাবতঃ মনে হইতে পারে, উপতিস্‌সে বিজয়ের রাজধানী ছিল। কিন্তু তাহা মনে করিবার সঙ্গত কারণ নাই। অনুরাধ বিজয়ের সমসাময়িক ও মন্ত্রী। বিজয়ের মৃত্যুর পর তাঁর হাতেই সম্ভবতঃ এক রকম রাজ্যশাসনভার আসিয়া পড়ে। বিজয়ের যেখানে শাসনকেন্দ্র ছিল সেখানেই অনুরাধ নিজ নামানুসারে উপনিবেশ স্থাপন করেন। অতঃপর পাণ্ডুকাভয় বা অভয় তাহা অধিকার করিয়া নিজ রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। ঠিক শ্রীকৃষ্ণের জন্মের ও তাঁর রাজ্যলাভের অনুরূপ অভয়ের জন্ম ও রাজ্যারোহণের একটা কাহিনী আছে। তিনি মাতুলদের নিহত করিয়া রাজা হন। নিশ্চয়ই এই মাতুলরা ছিলেন অনুরাধের উত্তরাধিকারী। অতঃপর নিশ্চয়ই বৃদ্ধ অনুরাধের অভয়কে রাজ্য ছাড়িয়া দেওয়া ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না।

যাহা হউক, সিংহলের ইতিহাসে অনুরাধপুরের গৌরবের তুলনা নাই। বিজয়ের উপনিবেশস্থাপনের

পর হইতে দেড় সহস্র বৎসরেরও অধিক ইহা সিংহলের রাজধানী ছিল। এই অনুরাধপুরেই সিংহলের সভ্যতার ও সংস্কৃতির যে চরম পরিণতি ঘটিয়াছিল তাহার তুলনা বিরল। বস্তুতঃ দেখিতে গেলে বঙ্গীয় সভ্যতার প্রভাবেই সিংহলে অনুরাধপুর-সংস্কৃতির সূচনা হয় এবং পরে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাবে উহার সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়িয়া ওঠে।

যে অনুরাধপুরে সেযুগের সিংহলী সভ্যতা ও সংস্কৃতি কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল, তাহার প্রতিষ্ঠাতা পাণ্ডুকাভয়কেই বলা যাইতে পারে। বিজয় রাষ্ট্রের পত্তন করেন বটে, কিন্তু রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ও সংস্কৃতির মূলে এক রকম পাণ্ডুকাভয়কেই গৌরব দেওয়া যায়। 'জয়বাপি' ও 'অভয়বাপি' নামে তিনি দুইটী বিরাট্ কৃত্রিম হ্রদ খনন করিলেন। অভয়বাপির চারি দিকেই রাজধানী গড়িয়া ওঠে। মূল নগর ছাড়াও তিনি চারিটী উপনগর বা শহরতলী ও সাধারণ শ্মশান-ভূমি এবং হাঁসপাতাল, প্রসূতিগৃহ, রাজকর্মচারি-গণের বাসগৃহ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেন। নগর-পরিষ্কার, শববহন প্রভৃতির জন্য নিয়োজিত অন্ত্যজগণের বাসোপযোগী পল্লীও স্থাপিত হইল। এছাড়া তিনি পূজার্চনার জন্য মন্দিরসমূহের প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং জৈন, আজীবক, পরিব্রাজক, হিন্দু প্রভৃতি সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য স্বতন্ত্র বাসস্থান নির্মাণ করিয়া দিলেন। নগররক্ষার জন্য যাহা কিছু ব্যবস্থার প্রয়োজন তাহারও কিছু তিনি বাদ দিলেন না।

বিজয়ের পরবর্তী সিংহলী সভ্যতার ইহাই প্রথম উন্মেষ। ইহা খ্রীস্টপূর্ব ৫ম শতকের কথা। এই সভ্যতাকে আবার একটী নূতন রূপ দেন মহারাজ দেবানাংপিয় তিস্স। তিস্স মহারাজ অশোকের সমসাময়িক। মহারাজ অশোকের সহিত তাঁহার সকল বিষয়েই একটা সামঞ্জস্য আছে। এজন্য তাঁহাকে সিংহলেরও অশোক বলা হয়। অশোকেরই মত তিনি ছিলেন বৈরাগী রাষ্ট্রনায়ক এবং বৌদ্ধ-সঙ্ঘে জীবন উৎসর্গ করিয়া তাহার প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় তিনি নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। নিজেও তিনি ছিলেন অশোকের বন্ধু। অশোকের পুত্র ভিক্ষুরূপী মহীন্দ তাঁহাকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দেন। সম্ভবতঃ তিস্সই তাঁহাকে মগধ হইতে আনাইয়াছিলেন, অবশ্য মহাবংসে তাহা স্বীকার করা হয় নাই। মহীন্দের পরে তিনি অশোকের কন্যা ও মহীন্দের অনুজা ভিক্ষুণী সঙ্ঘমিত্রাকে এবং তাঁহার সহিত গয়ার যে বোধিবৃক্ষের তলে সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন তাহার একটী শাখা আনান। এই শাখা সিংহলের ইতিহাসে 'দলদ' নামে প্রসিদ্ধ এবং এই দলদ-আনয়ন-ব্যাপার সিংহলের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বৌদ্ধসঙ্ঘের কেন্দ্রস্থাপনের জন্য মহীন্দকে তিনি আপনার প্রমোদ-উদ্যান মহামেঘবন উৎসর্গ করেন এবং

থূপারাম দাগব : পবিত্র বুদ্ধাস্থি এখানে রক্ষিত হইয়াছিল

সঙ্ঘমিত্রাকে একটী অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া দেন। মহীন্দ-প্রমুখ ভারতীয় ভিক্ষুগণ পুরুষদের দীক্ষাকার্যে এবং সঙ্ঘমিত্রা-প্রমুখ বার জন ভারতীয় ভিক্ষুণী রমণীদের দীক্ষা-কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। রাজপারিষদবর্গ, রাজপুরুষগণ, রাজরমণীগণ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রজাসাধারণ সকলেই দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তিস্সের ধর্মরাজ্যের স্বপ্ন সফল করিয়া তুলিয়াছিলেন।

সিংহলে বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য মহারাজ তিস্স বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ও বহু হর্ম্য নির্মাণ করিয়া সম্রাট্ অশোকেরই মত কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিলেন। অনুরাধ-পুরেই তিনি দশটী হর্ম্য নির্মাণ করেন। তাঁর এই দশটী কীর্তির মধ্যে থূপারাম দাগব সর্বাধিক প্রসিদ্ধ এবং ইহাই

অনুরাধপুরের সর্বপ্রাচীন স্থাপত্যনিদর্শন। সিংহলের 'দাগব' ভারতীয় বৌদ্ধ 'ধাতুগর্ভে'র অনুরূপ। দন্তপুরী হইতে আনীত বুদ্ধের পবিত্র বাম শৌবন-দন্ত থূপারাম দাগবে বা স্তূপে রক্ষা করা হয়। বুদ্ধের দক্ষিণ স্কন্ধাস্থিও এখানে রাখা হইয়াছিল। এই দাগবটী তিন শত ফুটেরও বেশী উচ্চ ছিল, কারণ ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এখনই উচ্চতা ৩০৭ ফুট। একটা ১৮ ফুট উচ্চ চাতালের উপর উহা নির্মিত হয়। এখনও মাথার চৈত্যের উচ্চতা ৭০ ফুট এবং দাগবের ব্যাস ৬০ ফুট। চাতালটীর চারি দিক্ ২৬ ফুট উচ্চ অনন্যসংলগ্ন স্তম্ভশ্রেণীদ্বারা বেষ্টিত। একটী বিশেষ আদর্শেই তিস্‌স এরূপ করিয়াছিলেন। আদর্শ এই যে,

রুয়ন্ বেলি দাগব

স্তম্ভগুলি থূপারামের মাথার উপর একটী কাল্পনিক চন্দ্রাতপ ধারণ করিয়া আছে। দাগবটী যে মাথায় তন্দ্রাতপ দিয়া আচ্ছাদিত, স্তম্ভগুলি তাহারই প্রতীকস্বরূপ। প্রিয়দর্শী অশোকের কীর্তিনিচয়ে এরূপ সমবধারণার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলির স্তম্ভ প্রায়ই একক। সেক্ষেত্রে তিস্‌সের এই কীর্তি জগতে অনন্যসাধারণ বলিতে হইবে।

থূপারাম ব্যতীত তিস্‌সের আর একটী বিশেষ কীর্তি ইস্‌সরমুনি বিহার বা ইসিভুজঙ্গনম্। অনুরাধপুরের নিকট একটী গ্রানাইট পাথরের পাহাড়ে ইহা নির্মিত হয়। যে সমুদয় অভিজাত ও রাজপুরুষগণ বৌদ্ধসঙ্ঘে প্রবেশ করিতেন তাঁহাদের বাসের জন্যই তিস্‌স এই বিহারটী নির্মাণ করেন। পাহাড়ের গায়ে গুহা কাটিয়া বিহারটী নির্মিত হয়। তাহাতে দুইটী গুহা করা হইয়াছিল—একটী পাহাড়ের ঠিক মাঝামাঝি, আর একটী মাথার দিকে। এছাড়া তিস্‌স সেখানে বিহারবাসীদের জন্য জলাশয় ও চৈত্যও নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

'দলদ' অর্থাৎ বোধিবৃক্ষের শাখা মহামেঘবনে স্থাপন করা হইয়াছিল। ধীরে ধীরে ঐ বৃক্ষ বিরাট্ মহীরুহে পরিণত হয়। এখনও গাছটী আছে। এত প্রাচীন গাছ জগতে আছে কি-না সন্দেহ। অধিকন্তু প্রাচীন ঐতিহাসিক বৃক্ষের নিদর্শনস্বরূপ ইহাই জগতে একমাত্র দৃষ্টান্ত। এই বৃক্ষটীকে কেন্দ্র করিয়াই সিংহলের সহস্রাধিক বর্ষের সংস্কৃতি গড়িয়া ওঠে। তিস্‌স ইহার পার্শ্বে একটী বিহারও নির্মাণ করিয়াছিলেন।

তিস্‌সের মৃত্যুর পর যথাক্রমে সাত ও আট বৎসর পরে মহীন্দ ও সঙ্ঘমিত্রার মৃত্যু হয়। মহীন্দের চিতাভস্মের অর্ধাংশ তাঁহার মৃত্যুস্থান মহীন্তলে ও অর্ধাংশ থূপারামে রক্ষিত হয়। তিস্‌সের মৃত্যুর পর কয়েক বৎসর রাজ্যে বেশ শান্তি ছিল। কিন্তু হঠাৎ দাক্ষিণাত্য হইতে তামিলরা সিংহল আক্রমণ করিয়া অনুরাধপুর দখল করিয়া বসে। এক শত বর্ষ উত্তর-সিংহল তামিল-রাজশক্তির অধীন ছিল। অতঃপর দুট্ঠগামণী দক্ষিণ-সিংহল হইতে অভিযান করেন এবং অনুরাধপুর আক্রমণ করিয়া তামিলদিগকে পরাস্ত করেন। এই সময় তামিলরাজ এলার অনুরাধ-পুরের অধিপতি ছিলেন। রাজধানীর উপকণ্ঠে গামণীর সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে এলার নিহত হন। এই সময় গামণী এক অনন্যসাধারণ মহত্ত্ব দেখান—এলারের প্রতি তিনি রাজকীয় সম্মান দেখাইতে পরাঙ্মুখ হইলেন না। বিরাট্ আড়ম্বরের সহিত বোধিবৃক্ষসন্নিধানে এলারের মৃতদেহ পোড়ান হয় এবং সেই চিতাভস্মের উপর তিনি একটী স্মৃতিমন্দির নির্মাণ করেন। এছাড়া যেখানে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইয়াছিল সেখানেও একটী বিজয়স্তম্ভ নির্মিত হইল। অধিকন্তু গামণী আদেশ দিলেন, এলারের স্মৃতিমন্দিরের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ কেহ গীতবাদ্য করিয়া তাহার পার্শ্ব দিয়া যাইতে পারিবে না। এখনও সেই অনু-

শাসনের প্রতি সিংহলীদিগকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে দেখা যায়।

গামণী মহাবংসের নায়ক ও এক জন বীর। সমগ্র মহাবংসে তাঁহার বীরত্ব ও কীর্তির তুলনা নাই। অনুরাধপুর-বিজয়ের সপ্তম দিবসে তিনি তিস্‌সবাপিতে এক জলোৎসবের অনুষ্ঠান করেন। এই উৎসব সমাপ্ত হইলে তিনি 'মরিচবট্‌ঠি' স্তূপ নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহাতে তিস্‌স-মহারামের ভিক্ষুগণ-প্রদত্ত বুদ্ধাস্থি রক্ষিত হয়। মহাবংসে উল্লিখিত হইয়াছে, যেখানে মরিচবট্‌ঠি নির্মিত হয় সেখানে গামণীর বর্শা এরূপ তীব্রভাবে প্রোথিত হইয়াছিল যে, সেই বর্শা কেহই টানিয়া তুলিতে পারে নাই।

গামণীর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি 'লোহপাসাদ' ও 'মহাথূপ'। মরিচবট্‌ঠি, লোহপাসাদ ও মহাথূপ ব্যতীত তিনি আরও ৯৯টী বিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন। লোহপাসাদ নির্মাণ করিতে গামণীর ৩০ কোটি মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল। এই প্রাসাদে নয়টী তল ছিল এবং স্তম্ভ ছিল ১৬০০টী। ছাদগুলি ব্রোঞ্জধাতুতে নির্মাণ করা হয়, এজন্য এই প্রাসাদটীকে ব্রোঞ্জের প্রাসাদও বলা হইত। সিংহলীদের নিকট এই বিহার 'লোয়-মহ-পয়' নামে প্রসিদ্ধ। গামণীর পরবর্তী নৃপতিদিগকে ইহার সংস্কার করিতে দেখা যায়; তাঁহারা প্রয়োজনানুসারে কিছু কিছু অদল-বদলও করিয়াছিলেন। এখন ইহার ধ্বংসস্তূপে মাত্র অগণিত স্তম্ভের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়—সেগুলি গ্রানাইট পাথরে তৈয়ারী।

মহাথূপ লোহপাসাদকেও ছাড়াইয়া যায়। সিংহলীদের নিকট ইহা 'রুয়ন্‌ বেলি' নামে পরিচিত। পালিভাষায় ইহার নাম 'হেমবলি'। ইহার নির্মাণকার্যে গামণী এরূপ বিরাট্‌ আয়োজন ও পরিকল্পনা করিয়াছিলেন যে, ফলে ইহা সমগ্র বৌদ্ধজগতে শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যনিদর্শনগুলির মধ্যে অন্যতম হইয়া উঠিয়াছে। বৈশাখী পূর্ণিমায় ভগবান্‌ বুদ্ধের জন্মদিনে গামণী ইহার নির্মাণকার্য আরম্ভ করেন। এই স্তূপটীর নির্মাণকার্যের শুভসূচনায় যে উৎসবানুষ্ঠান হইয়াছিল, সিংহলের ইতিহাসে সেরূপ উৎসব খুব কমই দেখা যায়। যখন নির্মাণের আয়োজন চলিতেছিল, তখন অনেকগুলি নক্সা রচিত হইয়াছিল এবং সেগুলির সব কয়টীই বিচার করিয়া একটী সুনির্দিষ্ট নক্সার পরিকল্পনা গৃহীত হয়। নাগদেশের অর্হৎ সোণুত্তরের নিকট হইতে প্রাপ্ত বুদ্ধাস্থি অতুলনীয় আড়ম্বরের সহিত এখানে রক্ষিত হইয়াছিল। এত করিয়াও কিন্তু গামণী ইহার নির্মাণকার্য শেষ করিতে পারেন নাই, নির্মাণশেষের পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার অনুজ মহারাজ সদ্ধা তিস্‌স তাহা সমাপ্ত করেন। মহাবংসে বলা হইয়াছে, মহাথূপের নির্মাণকার্যে সর্বসমেত বিশ বৎসর সময় লাগিয়াছিল এবং ইহাতে ব্যয় হইয়াছিল এক সহস্র কোটি মুদ্রা। এই অতি ব্যয়সাপেক্ষ স্থাপত্যনিদর্শনের জন্যই সিংহলীরা ইহাকে বলে 'সোনার ধূলি দিয়া গড়া দাগব'।

মহাথূপের প্রাচীরের আলঙ্কারিক প্রসাধনচিত্র-নিদর্শন : পদ্ম ও কিন্নর

মহাথূপের যে ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে উহার উচ্চতা পাওয়া গিয়াছিল অধিষ্ঠানচত্বরের উপর হইতেও ১৮৯ ফুট। এখনও সমগ্র বৌদ্ধজগতে এই স্তূপটীকে বিশেষ শ্রদ্ধা করা হইয়া থাকে। মহাবংসের পাঁচটী অধ্যায়ে এই দাগবের বর্ণনা করা হইয়াছে; এত বেশী স্থান অন্য কোন দাগব বা বিহারের বর্ণনায় দেওয়া হয় নাই। ১২১৪ খ্রীস্টাব্দে মলবরগণ ইহার অনেকটা ধ্বংসসাধন করিয়াছিল। এখন ইহার মোট উচ্চতা ২০৪ ফুট এবং গম্বুজের ব্যাস ২৫৮ ফুট। এই দাগবটীর একটী বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, অধিষ্ঠানচত্বরটীর চারি দিক্‌ উদ্‌গত হস্তিমুণ্ডের সারিতে শোভিত; এমনভাবে সেগুলির

সমাবেশ করা হইয়াছে যে, দেখিলেই মনে হয় হস্তিযূথের পৃষ্ঠের উপর সমস্ত দাগবটী রক্ষিত।

দুটুঠগামণীর পরে মহারাজ বট্টগামণীর নাম করা যাইতে পারে। দুটুঠগামণীর মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে তামিলরা আবার অনুরাধপুর অধিকার করিয়া বসে। রাজবংশীয়েরা তখন পর্বতীয় স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে। এখান হইতে বট্টগামণী শক্তিসঞ্চয় করিয়া বীরবিক্রমে তামিলদের আক্রমণ করেন এবং অনুরাধপুর অধিকার করিয়া পুনরায় জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা খ্রীস্টপূর্ব ১ম শতকের প্রথম দিকের কথা। উক্ত বিজয়ের নিদর্শনস্বরূপ বট্টগামণী

মহাথূপের প্রাচীরে অঙ্কিত একটী বামনের চিত্র

বিরাট্ 'অভয়গিরি' দাগব নির্মাণ করিলেন। অভয়গিরির পার্শ্বে একটী বিহারও নিমিত হইল। অভয়গিরির বিরাটত্ব মহাথূপকেও ছাড়াইয়া যায়। বস্তুতঃ ইহাই অনুরাধপুরের উচ্চতম বিরাট্ স্থাপত্য-নিদর্শন। নির্মাণশেষে ইহার উচ্চতা দাঁড়ায় ৪০৫ ফুট—এখনও ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ইহার উচ্চতা ২৪০ ফুট। যে চাতালের উপর চৈত্যটী নির্মিত উহারই উচ্চতা ২৩১ ফুট; দাগবের ব্যাস ৩৭০ ফুট এবং গম্বুজের ব্যাস ৩২২ ফুট। দাগবটী ত্রিতল এবং সেদিক্ দিয়াও ইহা সিংহলের অনন্যসাধারণ স্থাপত্য। আগাগোড়া ইহা ইটের তৈয়ারী—এখন ধ্বংসাবশেষটী একটী ছোটখাটো ইটের পাহাড়ের মত মনে হয়। সিংহলের প্রাচীন স্থাপত্য-নিদর্শনে ইহার গুরুত্ব এখন খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। সিংহলের প্রাচীন স্থাপত্যগুলির মধ্যে ইহা দর্শককে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে।

বট্টগামণীর রাজ্যকাল পর্যন্তই এক রকম অনুরাধপুরের শ্রেষ্ঠ ও প্রধান স্থাপত্যনিদর্শনগুলি নির্মিত হইয়াছিল। তাঁহার পরবর্তী নৃপতিগণ এক রকম সেগুলির সংস্কারে ও অলঙ্কারসমাবেশে ব্যাপৃত ছিলেন। খ্রীস্টীয় ৪র্থ শতকের মধ্যভাগে মহারাজ মহাসেন 'জেতবনারাম' নির্মাণ করেন, তবে তাঁহার পুত্র কীর্তিশ্রী মেঘবর্মা তাহা সমাপ্ত করেন। এই স্তূপটী তৈয়ারী করিতে সর্বসমেত আট বৎসর লাগে। অনুরাধপুর নগরের একেবারে উত্তরসীমায় ইহা নির্মিত হয়। এখনও ইহার ধ্বংসাবশেষের উচ্চতা ২৪৯ ফুট; দাগবের ব্যাস ৩৫৫ ফুট এবং গম্বুজের ব্যাস ৩১০ ফুট। ভূমিতল হইতে চাতালের উচ্চতা ১৫ ফুট এবং পরিধি ৭২০ ফুট। চৈত্যটী ইটের তৈয়ারী, কিন্তু চাতলটী প্রস্তরনির্মিত। জেতবনারামের পূর্বে অবশ্য 'লঙ্কারাম' বিহার নির্মিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা পূর্বোল্লিখিত স্থাপত্য-নিদর্শনগুলির মত উল্লেখযোগ্য নয়।

খ্রীস্টীয় ৪র্থ-৫ম শতকে অনুরাধপুর বৌদ্ধ-সংস্কৃতির একটী প্রধান কেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে—বৌদ্ধ বিহারগুলি জগতের অন্যতম প্রধান বিদ্যাপীঠের গৌরব অর্জন করিতে সমর্থ হয়। নানা দেশ হইতে শিক্ষার্থিগণ দলে দলে এখানে আসিতে থাকে। এই সময়েই খ্রীস্টীয় ৫ম শতকের ২য় হইতে ৪র্থ দশমাব্দের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্যকার বুদ্ধঘোষ এখানে আসিয়াছিলেন। বুদ্ধঘোষ উত্তর-ভারতে বুদ্ধ-গয়ার নিকটবর্তী ঘোষ নামক গ্রামের অধিবাসী এক জন ব্রাহ্মণ। অনুরাধপুরে আসিয়া তিনি রেবত-কর্তৃক বৌদ্ধ-ধর্মে দীক্ষিত হন। এখানে তিনি ঘণ্টাকর বিহারে থাকিতেন এবং এই বিহারে থাকিয়াই তিনি সিংহলী ভাষায় রচিত ত্রিপিটকের ভাষ্য অথকথার পালি অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার সিংহলে অবস্থানকালেই রাজধানী ও শহরতলীগুলিতে জল-সরবরাহের সুব্যবস্থা করা হয়। ইহার জন্য মহারাজ ধাতুসেন এমন একটী বিরাট্ জলাশয়

খনন করিয়াছিলেন যাহার পরিধি ছিল ২৫ ক্রোশ। ৫ম শতকের প্রথম ভাগেই সুপ্রসিদ্ধ চীনা শ্রমণ ফা-হিয়ান্ সিংহলে আসেন। অনুরাধপুরের বিদ্যাপীঠে শিক্ষালাভের ও সিংহলের সংস্কৃতির অভিজ্ঞতালাভের জন্য এবং পঠিত পুস্তকগুলির অনুলিপিগ্রহণের জন্যই তিনি অনুরাধপুরে আসিয়াছিলেন। এখানে তিনি দুই বৎসর ছিলেন। তিনি তাঁহার বর্ণনায় অনুরাধপুররাষ্ট্রের সংস্কৃতি ও সমৃদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

এই যুগের পর হইতেই অনুরাধপুরের পতনের সূচনা হয়। সিংহাসন লইয়া ও প্রাধান্য লইয়াই এই পতনের সূত্রপাত হয়। ফলে আবার তামিলদের অভ্যুদয় হইল। আবার খ্রীষ্টীয় ৯ম শতকের প্রথম দিকে শিলামেঘসেন জাতীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিন্তু পুনরায় দক্ষিণ-ভারত হইতে পাণ্ড্যরাজ শ্রীমার আসিয়া শিলামেঘকে পরাজিত করিলেন এবং রাজধানী লুণ্ঠন ও বিধ্বস্ত করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিলেন। শিলামেঘসেন উপায়বিহীন হইয়া পুলস্তিপুরে (পোলোন্নারুয়ে) গমন করিলেন; সেখানে পরে নূতন রাজ্যের পত্তন হইয়াছিল। যাহা হউক, এদিকে অনুরাধপুর একবার এক পক্ষের আবার অন্য পক্ষের হাতে গিয়া পড়িতে লাগিল। নামেই মাত্র ইহা রাজধানী রহিল। এইভাবে আরও কয়েক শত বর্ষ চলিয়া প্রায় ১৩০০ খ্রীস্টাব্দে ইহা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়। খ্রীষ্টীয় ১১শ শতকে একবার দাক্ষিণাত্যের চোলেরা সিংহল আক্রমণ করিয়া তদানীন্তন অনুরাধপুররাজ বিজয়বাহুকে ভীষণভাবে পরাজিত করিয়াছিল। কিন্তু বিজয়বাহু পর্বতীয় স্থানে আশ্রয় গ্রহণান্তর আবার শক্তিসঞ্চয় করিয়া চোলদিগকে হারাইয়া সগৌরবে রাজধানীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বোধি-বৃক্ষকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র অনুরাধপুরের সমৃদ্ধি ও সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। মোটামুটি দেখিতে গেলে, প্রায় সকল নৃপতিই অল্পবিস্তর ইহার রক্ষার ও সুব্যবস্থার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রায়ই ইহাকে কেন্দ্র করিয়া বড় বড় উৎসবানুষ্ঠান হইত। খ্রীষ্টীয় ২য় শতকে নৃপতি কুহুনরাজ বৃক্ষতলের বেদীর প্রস্তর-সোপান নির্মাণ করেন। আভাসেন আবার বেদীটী শ্বেতপ্রস্তর দিয়া বাঁধাইয়া দেন। ইহার পর রাজা গোথাভয় সংলগ্ন মহাবিহারের আরও সমৃদ্ধিসাধন করিলেন। বোধিবৃক্ষের চারি দিকে একটী সুন্দর প্রাচীর নির্মিত হইয়াছিল, গোথাভয় উহারও সংস্কারসাধন করেন। মহারাজ কীর্তিশ্রী মেঘবর্মা মহাবিহারের শীর্ষদেশ একটী দস্তার পাত দিয়া মুড়িয়া দেন। নানা নৃপতি রাশি রাশি বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। সব কিছুর পরিচয় দেওয়া অল্প কথায় সম্ভবপর নহে। কিন্তু মহাবিহারের একটী শিল্প-

মহীথূপের দ্বাররক্ষক : মূর্তিশিল্পের একটী সুন্দর নিদর্শন.

নিদর্শনের পরিচয় না দিয়া উপায় নাই। মহাবিহারের ভিতর দিয়াই বৃক্ষসন্নিধানে যাইতে হয়। মহাবিহারের প্রবেশদ্বারপথে সোপানতলে রক্ষিত একটী অর্ধবৃত্তাকার প্রস্তরনির্মিত 'চন্দ্রমণি' সম অনুরাধপুরের, এমন কি সমগ্র সিংহলের শ্রেষ্ঠ শিল্পনিদর্শনগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। চন্দ্র-মণিটীতে তিনটী অর্ধবৃত্তাকার শ্রেণীতে শিল্পকর্ম করা হইয়াছে। পদ্ম ও উহার বিভিন্ন অবস্থার চিত্র (যেমন কুঁড়ি—প্রস্ফুটিত হইবার পূর্বে, ও পরে বিকশিত) ও লতা-পাতা অঙ্কিত। ঠিক মধ্যভাগে পবিত্র হংসের সারির

চিত্র এবং উহার বাহিরে অশ্ব, হস্তী, সিংহ ও ব্রাহ্মণী বৃষের একটী সারি সন্নিবেশিত।

অনুরাধপুর খ্রীষ্টীয় ১৩শ শতকের শেষভাগে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইলেও বৌদ্ধ সাঙ্ঘিকরা বৃক্ষটী পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দীর্ঘকাল ধরিয়া জনসমাজের অন্তরালে থাকিয়া অনুরাধপুর যখন ধীরে ধীরে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়া ঘনজঙ্গলাকীর্ণ হইল, তখনও তাঁহারা বৃক্ষটী ত্যাগ করেন নাই। অতি যত্ন ও নিষ্ঠার সহিত তাঁহারা বংশানুক্রমে অরণ্যের মধ্যেও বৃক্ষটী

প্রাচীর-গাত্রে নাগমূর্তি-শোভিত তক্ষণশিল্পের একটী নিদর্শন

রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। ইঁহার জন্য মাত্র সিংহলীরা নহে, সমগ্র বৌদ্ধ-সম্প্রদায় তাঁহাদের নিকট ঋণী।

সিংহলে যখন বৌদ্ধধর্মের প্রবেশলাভ ঘটে নাই, অর্থাৎ মহারাজ তিস্‌সের পূর্বে এবং বিশেষতঃ পাণ্ডুকাভয়ের রাজ্যকালে সকল ধর্মেরই মন্দির অনুরাধপুরে নির্মিত হইয়াছিল। এগুলি রাজসরকার হইতে সাহায্য পাইত, কাহারও উপর বিশেষ পক্ষপাতিত্ব করা হইত না। এতদ্ব্যতীত সাধারণ উদ্যান, স্নানাগার প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছিল। ইহাদের পরে, নৃত্য ও গীতবাদ্যের জন্য প্রমোদ-ভবন, পরিব্রাজক ও শ্রমণদিগের জন্য অতিথিশালা এবং অনাথ-আশ্রম বা দরিদ্রশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। মাত্র নাগরিকদিগের জন্যই যে হাঁসপাতাল ছিল তাহা নহে, পশু-হাঁসপাতালও ছিল। এক এক জন নৃপতি পশুদের খাদ্যের জন্য সহস্রটী ক্ষেত্রের উৎপন্ন শস্য নির্দিষ্ট রাখিতেন। রাজকীয় হস্তী, অশ্ব ও সর্পের চিকিৎসার জন্য নিযুক্ত চিকিৎসককে রাজসরকার হইতে বিশেষ ব্যবস্থা দেওয়া হইত। হস্তী, অশ্ব ও সর্প রাখিবার জন্য বিশেষ বিশেষ নির্দিষ্ট স্থানও ছিল। নগরের পূর্বদিকে বলা হইত 'জোতিয়'। সরকার-কর্তৃক জোতিয়গণের জন্যও স্বতন্ত্র বাসগৃহের ব্যবস্থা ছিল। হাঁসপাতাল, প্রসূতিগৃহ প্রভৃতি রাজসরকারের ব্যয়ে পরিচালিত হইত। দিবাভাগে ও রাত্রিকালে পর্যায়ক্রমে নগরের অভিভাবকস্বরূপ নগর পরিদর্শন করিবার জন্য দুই জন কর্মচারী নিযুক্ত থাকিতেন, তাঁহাদিগকে বলা হইত 'নগরগুত্তিকা'। 'চণ্ডাল'গণ নগর পরিষ্কারের ও শববহনের জন্য নিযুক্ত থাকিত। শ্মশান-ক্ষেত্রে যাহারা নিযুক্ত থাকিত তাহাদিগকে বলা হইত 'নীচি-চণ্ডাল'। রাজপথগুলিতে দোকান ও বাজারসমূহ ছিল। কোনও উৎসবের অনুষ্ঠানকালে নাপিতগণ ও দর্জিরা নাগরিকদিগকে সাহায্য করিবার জন্য প্রত্যেক নগর-তোরণে উপস্থিত থাকিত। ফা-হিয়ান্ তাঁহার বর্ণনায় বলিয়াছেন—তিনি যখন সিংহলে ছিলেন, তখন রাজধানীতে অভিজাতবর্গ, বহু বিচারক ও বিদেশীয় বণিক্ ছিলেন। সাধারণ প্রাসাদগুলি খুব সমৃদ্ধ ও অলঙ্কৃত ছিল। রাজপথগুলি ছিল প্রশস্ত ও সমতল। প্রত্যেক রাজপথেই ধর্মপ্রচারের ও 'বন'-পাঠের জন্য উপাশ্রয়গৃহ ছিল। সমগ্র সিংহলদ্বীপে বৌদ্ধ ভিক্ষুর সংখ্যা ছিল ৫০ হইতে ৬০ হাজার। ইঁহারা সাধারণের সহিত আহার করিতেন এবং এরূপ আহারে কোনও বাধা ছিল না। ইঁহাদিগের মধ্যে ৫।৬ হাজার ভিক্ষু রাজসাহায্য পাইতেন। পবিত্র উৎসব-দিবসগুলিতে বুদ্ধের পবিত্র দন্ত রাজধানীতে সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করা হইত। এক বিরাট্ উৎসবানুষ্ঠান-সহকারে শোভাযাত্রা করিয়া এই দন্ত নিকটবর্তী পর্বতীয় স্থানে (সম্ভবতঃ মহীন্তলে) লইয়া যাওয়া হইত। স্বয়ং নৃপতি ও প্রধান পুরোহিত এই শোভাযাত্রা পরিচালনা করিতেন। এই ব্যাপারে শোভাযাত্রার পথ সুগন্ধিযুক্ত ও

পুষ্পদ্বারা আচ্ছাদিত করা হইত। এই উৎসবে রীতিমত বেশভূষা করিয়া ও দৃশ্যপট ব্যবহার করিয়া বুদ্ধ-জীবনের বিবিধ ঘটনা অভিনয় করিবার রীতি ছিল।

অনুরাধপুরের এই সমাজ-ব্যবস্থা, রীতিনীতি, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা এবং তদুপরি শৌর্য, বীর্য, সমৃদ্ধি ও সংস্কৃতির বিষয় বিবেচনা করিলে, সিংহলের এই যুগটীকে সাধারণ পর্যায়ে ফেলা যায় না। এমন কি, অনুরাধপুর-ইতিহাসের দেড় সহস্র বৎসর সিংহলের স্বুবর্ণ-যুগ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শিল্পকলা ও স্থাপত্যের দিক্ দিয়াও অনুরাধপুর বিশেষ-ভাবে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। বিরাট্ স্থাপত্যের পরিচয় পূর্বেই সংক্ষিপ্তাকারে দেওয়া হইয়াছে। ছোটখাটো স্থাপত্য-নিদর্শনের দৃষ্টান্ত অসংখ্য। তক্ষণ-শিল্প বা প্রস্তরের কারুশিল্প অশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। ভাস্কর্য ও মূর্তিশিল্পেও সে-যুগের সিংহলী শিল্পীরা বেশ সমতা রক্ষা করিয়াছেন। নানাবিধ প্রমাণ হইতে নির্ধারণ করা হইয়াছে যে, অনুরাধপুরের আয়তন ছিল সর্বসমেত ৩০০ বর্গ-মাইল। সিংহলের উত্তর-মধ্য প্রদেশে অরণ্যানীর মধ্যে অনুরাধপুরের বিস্তৃত ও পর্যাপ্ত ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্থানীয় গবর্নমেণ্টের চেষ্টায় ধ্বংসাবশেষের রীতিমত আবিষ্কারকার্য চলিয়াছে এবং খননকার্যও চলিতেছে—প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণাও যথেষ্ট হইতেছে।

মোটামুটি দেখিতে গেলে, যেটুকু ভূভাগের মধ্যে অনুরাধপুরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মাটি এক রকম ইটের গুঁড়ায় লাল হইয়া গিয়াছে। বৃষ, হস্তী প্রভৃতির মূর্তি ও অগণিত মনুষ্যমূর্তি চতুর্দিকে জঙ্গলের মধ্যে বিক্ষিপ্ত। মনুষ্যমূর্তিগুলির মধ্যে বুদ্ধের মূর্তিই বেশী। অনেক স্থানে বেশ বড় বড় প্রস্তরমূর্তিও পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে একটী প্রকাণ্ড ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উহার উচ্চতা ৫ ফুট ৯ ইঞ্চি—এখন উহা কলম্বো মিউজিয়ামে রক্ষিত হইয়াছে। স্তম্ভের সংখ্যাই সর্বাধিক; এত অগণিত স্তম্ভ অন্য কোথাও দেখা যায় না। বোধিবৃক্ষের চতুর্দিকে নিকটবর্তী ভূভাগের মধ্যেই অধিকাংশ স্থাপত্য ও শিল্পনিদর্শন দেখা যায়। বোধিবৃক্ষকে কেন্দ্র করিয়া যে সে-যুগের শিল্প ও সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, ইহা তাহারই দৃষ্টান্ত। ক্রমে এই শিল্প-সংরক্ষণ উত্তর দিকে বিস্তৃত হইতে থাকে। লোহপাসাদের নিকটে একটী প্রস্তর-নির্মিত বৃহৎ জলাধার পাওয়া গিয়াছে—উহা একটীমাত্র প্রস্তরে তৈয়ারী। মহাথূপের ঠিক পূর্বে সুবৃহৎ কূপের ধ্বংসাবশেষ আছে; উহা ১১০ ফুট গভীর ও উহার পরিধি ১৮৮ ফুট—বরাবর নিম্নদেশ পর্যন্ত উহা পাথর দিয়া বাঁধান। মহাথূপ ও অভয়গিরির মাঝামাঝি জায়গায় একটী ছোট স্রোতস্বতী ছিল, বর্তমানে স্রোতস্বতীটী নাই—উহার উভয় তীরই পাথর দিয়া বাঁধান। থূপারামের বেষ্টনীর মধ্যেই সঙ্ঘ-মিত্রার সমাধিমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। এইরূপ অগণিত স্থাপত্য ও অন্যান্য শিল্পনিদর্শন যে কত আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

অনুরাধপুরের আর একটী শিল্পের পরিচয়ও ইহার সহিত দেওয়া প্রয়োজন। ইহা চিত্রশিল্প। চিত্রশিল্পের অনেক নিদর্শন এখানে পাওয়া গিয়াছে। ভারতীয় প্রাচীন চিত্রকলার ন্যায় ইহার চিত্রও প্রাচীরগাত্রে অঙ্কিত হইয়াছিল। সিগিরিয়ার চিত্রাবলী সিংহলদ্বীপের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পসম্ভার বটে, কিন্তু অনুরাধপুরের চিত্র তাহার তুলনায় বিশেষ হীন নহে। সিগিরিয়া যেমন ভারতীয় প্রভাবে অলঙ্কৃত হইয়াছে, তেমনি অনুরাধপুরের চিত্র-শিল্পও ভাস্কর্যশিল্পের সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রভাব লাভ করিয়াছিল। মহাথূপের পূর্ব দিকের একটী বিচ্ছিন্ন প্রাসাদ-প্রাচীরে এইরূপ কয়েকটী চিত্র পাওয়া গিয়াছে।

অনুরাধপুরের শিল্পনিদর্শনগুলি পর্যবেক্ষণ করিলে সহজেই স্থির করা যায় যে, উহা সম্পূর্ণরূপেই ভারতীয় প্রভাব লাভ করিয়াছিল। রাষ্ট্রে ও সমাজে যে ভারতীয় প্রভাব সম্পূর্ণরূপে ছিল, তাহার প্রমাণ তুলিবার আর কোনই প্রয়োজন নাই। শিল্প-ব্যাপারে অনুরাধপুরে দ্রবিড় সংস্কৃতির প্রভাবই বেশী। দাক্ষিণাত্যের শিল্পের সহিত তাহার বেশ একটা সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। কিন্তু দক্ষিণ-ভারতের শিল্প যদি বঙ্গীয় প্রভাবে প্রভাবিত হয়, তাহা হইলে অনুরাধপুরের শিল্পে বঙ্গীয় প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। চিত্রকলায় অজণ্টার শেষ দিকের শিল্পপদ্ধতির প্রভাবই সর্বাধিক। সম্ভবতঃ অজণ্টা হইতে অজণ্টার চিত্রশিল্প-পদ্ধতি দক্ষিণ-ভারতে সিত্তনবশল হইয়া সিংহলে গিয়াছিল। ইহা অবশ্য খ্রীষ্টীয় ৭-৮ম শতকের ঘটনা। অজণ্টায়ও বঙ্গীয় প্রভাবের প্রশ্ন আছে। সেক্ষেত্রে, অনুরাধপুরের এই চিত্রগুলিতে বঙ্গীয় প্রভাবের প্রশ্ন তুলিলে অসঙ্গত হইবে না।

সরকার-পুকুর

(জনপ্রবাদমূলক গল্প)

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

১

তিন চারিশত বৎসর পূর্ব্বে, হুগলীর তিনক্রোশ দক্ষিণে গঙ্গার পশ্চিম কূলে, ভদ্রেশ্বর নামক স্থানে, "সরকার" উপাধিধারী এক ধনবান্ ও প্রাচীন সদ্গোপ পরিবারের বাস ছিল। ইহাদের কৌলিক উপাধি ছিল "ঘোষ," কিন্তু পাঠান রাজত্বকালে এই বংশের একজন পূর্ব্বপুরুষ গৌড়ের পাঠান বাদসাহের নিকট হইতে "সরকার" উপাধি লাভ করাতে, তাঁহার বংশধরগণ রাজপ্রদত্ত উপাধিই বংশাবলী-ক্রমে ব্যবহার করিয়া আসিতেছ। এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, পাঠান সাম্রাজ্যের পতনের সময়ে, যখন এ দেশের প্রত্যেক পরাক্রমশালী ভূস্বামীই আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করিতেন, সেই সময়ে এই সরকার-বংশজাত এক জন ক্ষমতাশালী ব্যক্তিও স্বাধীন "রাজা" হইয়াছিলেন। সে সময়ে বঙ্গদেশে বিশেষতঃ রাজধানী গৌড় হইতে দূরে অবস্থিত পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গে এইরূপ শত শত বালখিল্য স্বাধীন রাজ্য দেখা দিয়াছিল। পাঠান-শক্তি ধ্বংসোন্মুখ, মোগল-শক্তি তখনও বঙ্গে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই, কে কর আদায় করিবে? জমিদারেরাই বা কাহাকে কর দিবেন? সুতরাং যে কোন পরাক্রান্ত জমিদার দুই পাঁচ শত লাঠিয়াল বা তীরন্দাজ যোগাড় করিতে পারিলেই, আপনাকে স্বাধীন নৃপতি বলিয়া ঘোষণা করিতেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, চন্দননগরের পশ্চিমে খলিসানি নামক গ্রামে একজন ধীবর "রাজা" হইয়াছিলেন। সুতরাং ভদ্রেশ্বরের বিত্তশালী ও শক্তিশালী সদ্গোপ-বংশজ সরকার উপাধিধারী কোন ব্যক্তি যে স্বাধীন রাজা হইয়াছিলেন, তাহা বিস্ময়ের বিষয় নহে।

প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে, ভদ্রেশ্বরের এই সরকার-বংশে, নয়নসুখ সরকার নামে একজন ধর্ম্মভীরু ও শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। সে সময়ে সরকার-বংশের বিশেষ কিছু ছিল না, প্রচুর নগদ টাকা ও ব্যবসায় ছিল। এক সময়ে নয়নসুখের মনে সন্দেহ হইল যে, পৈতৃক সম্পত্তির যেরূপ অংশ তাঁহার পাওয়া উচিত, তিনি ঠিক তাহা পাইতেছেন না। যখন তাঁহার এই সন্দেহ দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হইল, তখন তিনি জ্ঞাতিগণের সহিত এক বাটীতে বাস করিয়া নিত্য সম্পত্তির অংশ লইয়া বিবাদ-বিসংবাদ করা অপেক্ষা পৃথক্ বাটীতে স্বাধীন ভাবে শান্তিতে বাস করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিলেন। জ্ঞাতিগণের নিকটে তিনি এই সঙ্কল্পের কথা প্রকাশ করিলেন এবং যথাকালে হিসাবনিকাশের পর, তিনি নগদ তিন লক্ষ টাকা লইয়া ভদ্রেশ্বর পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক ক্রোশ উত্তরে চন্দননগরে বাগবাজার নামক পল্লীতে আসিয়া বাস করিলেন।

তখন চন্দননগরের সৌভাগ্যসূর্য্য মধ্যাকাশে বিরাজ করিতেছিল। চন্দননগরে ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধি ডুপ্লেক্সের চেষ্টায় পশ্চিম বঙ্গে চন্দননগর প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। নানা দেশ হইতে হইতে ব্যবসায়ীরা আসিয়া চন্দননগরে সমবেত হইয়াছিলেন। ভাগীরথীর উপরে চন্দননগরই তখন প্রধান বন্দর ছিল। সে সময়ে বঙ্গোপসাগর হইতে হুগলী পর্য্যন্ত ভাগীরথী সুনাব্য থাকাতে, অর্ণবপোতসমূহ হুগলী পর্য্যন্ত যাইতে পারিত। চন্দননগরের সেই উন্নতির সময়ে নয়নসুখ সরকার মহাশয় চন্দননগরের বাসস্থান নির্ব্বাচন করিলেন। তিন মহল প্রকাণ্ড অট্টালিকা, বাসগৃহের সংলগ্ন বাগানে তিনটা পুষ্করিণী, অট্টালিকার সম্মুখে রাজপথের অপর পার্শ্বে শিবের মন্দির প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি সপরিবারে সেই নবনির্ম্মিত ভবনে বাস করিতে লাগিলেন। ইহা ব্যতীত বাটীর পশ্চিম দিকে প্রায় ত্রিশ বিঘা একটা বাগান এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরও অনেক ভূসম্পত্তি করিয়াছিলেন। চন্দননগরের দক্ষিণ প্রান্তে কৃষ্ণবাটী বা কৃষ্ণপটী নামক স্থানেও দশ পনের বিঘা ভূমি ক্রয় করিয়া তিনি তন্মধ্যে একটি প্রকাণ্ড জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত

ব্যবসায়-সম্বন্ধ স্থাপন করেন। তাঁহার এই ইচ্ছার কথা তিনি তাঁহার একমাত্র পুত্র গোপীনাথের নিকটে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ফরাসীদিগের সহিত ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে হইলে, ফরাসী ভাষা শিক্ষা করা আবশ্যক, সেইজন্য নয়নসুখ পুত্রকে ফরাসী ভাষা শিখাইবার জন্য একজন শিক্ষকও নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। গোপীনাথ ধনবানের একমাত্র পুত্র, বংশের দুলাল, আশৈশব জনক-জননীর অতিরিক্ত আদরে লালিত-পালিত, তাঁহার চঞ্চল চিত্ত লেখা পড়ার দিকে না গিয়া আমোদ প্রমোদের পশ্চাতে ধাবিত হইল। অসৎ কার্য্যে উৎসাহদাতা বন্ধুনামধারী চাটুকারের প্রভাবে পড়িয়া গোপীনাথ যৌবনে উন্মার্গগামী হইলেন। এই সময়ে নয়নসুখ ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সে-কালে, পুরুষসমাজে চরিত্রের শিথিলতা দোষ বলিয়া গণ্য হইত না, বরং ধনবানেরা অনেক সময়ে ইহা ধনবত্তার লক্ষণ বলিয়াই মনে করিতেন। গোপীনাথ ধনবানের সন্তান, অল্প বয়সে পিতৃহীন হওয়াতে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া বিলাসস্রোতে গা ভাসাইয়া দিলেন। নয়নসুখ পুত্রের সাহায্যে সম্পত্তি বাড়াইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই পুত্র পিতার মৃত্যুর পর দুই হাতে পৈতৃক সম্পত্তি উড়াইয়া দিতে লাগিলেন। পিতৃ-বিয়োগের পর কয়েক বৎসরের মধ্যে গোপীনাথ প্রায় দুই লক্ষ টাকা সৎ এবং অসৎ কার্য্যে ব্যয় করিয়াছিলেন।

গোপীনাথের দুইটি পুত্র হইয়াছিল, জ্যেষ্ঠ বৈদ্যনাথ, কনিষ্ঠ নীলকণ্ঠ। গোপীনাথ স্বয়ং বিদ্যাশিক্ষার প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিলেও, পুত্রদ্বয়ের লেখাপড়ার প্রতি উদাসীন ছিলেন না। সেকালে বিদ্যাশিক্ষা অর্থে লোকে বুঝিত হয় রাজভাষা পার্শী, না হয় দেবভাষা সংস্কৃতশিক্ষা। চন্দননগরে মাদ্রাসা ছিল, চতুষ্পাঠী ছিল, বাংলা শিখিবার জন্য গুরুমহাশয়ের পাঠশালাও ছিল; কিন্তু ইংরাজী বা ফরাসী ভাষা শিক্ষার জন্য এখনকার মত স্কুল ছিল না। ফরাসী বা ইংরাজী শিখাইবার ভার গৃহশিক্ষকের উপর অর্পিত হইত। গোপীনাথও পুত্রদ্বয়ের ইংরাজী ও ফরাসী শিক্ষার ভার একজন ফরাসী শিক্ষকের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন।

বৈদ্যনাথ ও নীলকণ্ঠ উভয় ভ্রাতার মধ্যে নীলকণ্ঠ সমধিক বুদ্ধিমান্ ও মেধাবী ছিলেন। তিনি কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইংরাজী ও ফরাসী ভাষাতে যেরূপ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন, জ্যেষ্ঠ বৈদ্যনাথ সেরূপ না হইলেও চলনসই ইংরাজী ও ফরাসী শিখিয়াছিলেন। তাঁহারা, বিশেষতঃ নীলকণ্ঠ শুনিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের স্বর্গীয় পিতামহ, ব্যবসায় দ্বারা ধনবৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু গোপীনাথের অবহেলায় তাঁহার সে ইচ্ছা ফলবতী হয় নাই। নীলকণ্ঠ পিতামহের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য উৎসুক হইলেন।

গোপীনাথের মৃত্যুর পর নীলকণ্ঠ অগ্রজের সম্মতি লইয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমে তিনি সামান্য মূলধন লইয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। সেটা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ সময়। তখন চন্দননগরের বাণিজ্যগৌরব লুপ্তপ্রায়, কলিকাতা অতি দ্রুত উন্নতিশিখরে আরোহণ করিতেছিল। কলিকাতার সেই উন্নতির প্রারম্ভে নীলকণ্ঠ কলিকাতায় আসিয়া নিজনামে এক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা সওদাগরী অফিস স্থাপন করিলেন।

২

কলিকাতায় আসিয়া নীলকণ্ঠ নিজের নামে অর্থাৎ "নীলকণ্ঠ, সরকার এণ্ড কোম্পানী" নামে একটি অফিস খুলিয়া আমদানী ও রপ্তানীর কার্য্য আরম্ভ করিলেন। প্রধানতঃ তিনি ফ্রান্সের ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অংশীদারদিগের সহিতই পণ্যের আদান প্রদান করিতেন। ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তখন মুমূর্ষু অবস্থা। চন্দননগরে তখন ফরাসী দুর্গ ছিল, শাসনপ্রণালী ছিল, পুলিস ছিল, কেবল ছিল না বাণিজ্য। ফরাসী রাজপুরুষগণের, বিশেষতঃ ডুপ্লেক্সের যে অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও ব্যবসায়-বুদ্ধি চন্দননগরকে পশ্চিম বঙ্গের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত করিয়াছিল, সেই প্রতিভা ও ব্যবসায়বুদ্ধি উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গদেশে ফরাসীকে ছাড়িয়া ইংরাজকে আশ্রয় করিয়াছিল। বঙ্গদেশে উৎপন্ন পণ্য তখন চন্দননগরের পরিবর্তে কলিকাতা হইতে ইউরোপে প্রেরিত হইতেছিল। ফ্রান্সের ব্যবসায়ীরা তখন বাজারের

কার্পাস বস্ত্র, নীল, রেশম, তণ্ডুল প্রভৃতি ক্রয় করিবার জন্য কলিকাতার বণিক্‌দের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। সেই সময়ে নীলকণ্ঠ কলিকাতায় অফিস করিয়া ফ্রান্সে পণ্যদ্রব্য চালান দিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার অফিসের প্রায় সমস্ত কার্য্যই ফ্রান্সের ফরাসী বণিক্‌গণের সহিত হইত বলিয়া তাঁহার অফিসের চিঠিপত্র ও হিসাব প্রভৃতি ফরাসী ভাষাতে লিখিত হইত।

চার-পাঁচ বৎসরের মধ্যে বাণিজ্যে আশাতীত উন্নতি হইল। সুশৃঙ্খলায় কার্য্যনির্ব্বাহ করিবার জন্য নীলকণ্ঠকে ফরাসী কর্ম্মচারী রাখিতে হইল। চন্দননগরের ফরাসী কুঠীরে সাহেবেরা পূর্ব্বে স্থানীয় বাঙ্গালীদিগকে কেরাণীর কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন; বাঙ্গালী নীলকণ্ঠ নিজের অফিসে সাহেব কর্ম্মচারী নিযুক্ত করাতে লোকে চমৎকৃত হইল। তাঁহার পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালী কোন শ্বেতাঙ্গকে নিজের কার্য্যালয়ে কেরাণীর কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় না। বাণিজ্যসূত্রে নীলকণ্ঠের খ্যাতি ফ্রান্সেও এরূপ বিস্তৃত হইয়াছিল যে, কোন ফরাসী ফ্রান্স হইতে প্রথমে বঙ্গদেশে আসিবার সময়ে নীলকণ্ঠের নামে পরিচয়পত্র সংগ্রহ করিয়া আনিতেন। ফ্রান্সে সকলেরই ধারণা ছিল যে, কলিকাতাপ্রবাসী কোন ফরাসীর নীলকণ্ঠ থাকিতে কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই, এবং কাহারও কোন বিপদ্ ঘটিলে নীলকণ্ঠ তাঁহাকে যথোচিত সাহায্য করিবেন। নীলকণ্ঠের এই খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অবশেষে তাঁহাকে ফ্রান্সের বণিক্-সমাজে "পাপানীলু" (পিতা-নীলু) নামে পরিচিত করিয়াছিল। ব্যবসায়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নীলকণ্ঠ কলিকাতা বাগবাজারে একটি সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় বাস করেন। তখন কলিকাতায় এত অধিক লোকের বাস ছিল না, জমিও এখনকার মত অগ্নিমূল্য ও দুষ্প্রাপ্য ছিল না। নীলকণ্ঠ স্বীয় আবাসের সংলগ্ন প্রায় দুই বিঘা জমি ক্রয় করিয়া তাহাতে উদ্যানরচনা এবং একটি পুষ্করিণী খনন ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

ফ্রান্সের বণিক্-সমাজে যাঁহার এইরূপ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল, পণ্ডিচেরী ও চন্দননগরের রাজপুরুষগণও যে তাঁহাকে যথোচিত শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন, ইহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। একালে, ফ্রান্সে ও ফরাসী উপনিবেশসমূহে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা রহিত হইয়াছে, নরহত্যার অপরাধে আজকাল প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে দ্বীপান্তর-বাস দণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে। সেকালে এরূপ ছিল না, নরহত্যাকারীর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইত। এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, নীলকণ্ঠের সময়ে কোন ব্রাহ্মণসন্তান চন্দননগরে নরহত্যার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয় নাই। কোন ব্রাহ্মণ নরহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত এবং তাহার অপরাধ সপ্রমাণ হইলে, নীলকণ্ঠ কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে তাহার প্রাণ ভিক্ষা করিতেন এবং কর্ত্তৃপক্ষ নীলকণ্ঠের প্রার্থনাপূরণে কখনও ইতস্ততঃ করিতেন না। এইরূপ তিনি তিন জন নরহত্যাকারী ব্রাহ্মণকে ফাঁসী-মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়া দ্বীপান্তর-বাসে পাঠাইয়াছিলেন।

নীলকণ্ঠ ব্যবসায়-বাণিজ্য লইয়া সপরিবারে কলিকাতায় বাস করিতে লাগিলেন। তাহার অগ্রজ বৈদ্যনাথ চন্দননগরে পৈতৃক বাটীতে থাকিয়া গৃহদেবতার পূজা ও অতিথিসৎকার প্রভৃতি সাংসারিক কর্ত্তব্য পালন করিতে লাগিলেন। নীলকণ্ঠ অর্থ উপার্জ্জন করিয়া অগ্রজের হস্তে প্রদান করিতেন, বৈদ্যনাথ অকাতরে সেই অর্থ সৎকর্ম্মে ব্যয় করিতেন। বাটীর সম্মুখে নয়নসুখ যে শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, প্রতি বৎসর শিবরাত্রি ও চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষে তথায় মহাসমারোহ হইত। সেই শিবস্থানে চৈত্রমাসব্যাপী উৎসব হইত। ইহা ব্যতীত দোল, দুর্গোৎসব, কালীপূজা, রাস প্রভৃতি ব্যাপারে সহস্র সহস্র ব্যক্তি ভূরিভোজে পরিতৃপ্ত হইত। নীলকণ্ঠ কলিকাতায় থাকিতেন, তখন কলের গাড়ী ছিল না, কলিকাতা হইতে শ্রীরামপুর, চন্দননগর, চুঁচুড়া, হুগলী প্রভৃতি নগরে যাইতে হইলে নৌকাযোগে যাইতে হইত। সপরিবারে জলপথে গমনাগমন করিবার জন্য ধনবান্‌দিগের বজরা ছিল। নীলকণ্ঠেরও বজরা ছিল, তিনি দুই তিন মাস অন্তর কলিকাতা হইতে চন্দননগরে যাইতেন। বৃদ্ধদিগের মুখে শুনিতে পাওয়া যাইত যে, নীলকণ্ঠ প্রতিবার কলিকাতা হইতে বাটী যাইবার সময়ে কলিকাতার উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন পাঁচ সাত মণ সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন এবং বাটীতে

গিয়া প্রতিবাসিদিগের বাটীতে তাহা পাঠাইয়া দিতেন, আবার চন্দননগর হইতে কলিকাতায় ফিরিবার সময়ে বজরা পূর্ণ করিয়া বাগানের আম, কাঁঠাল প্রভৃতি ফল লইয়া আসিতেন এবং কলিকাতার প্রতিবেশীদিগের মধ্যে বিতরণ করিতেন। বৈদ্যনাথ এবং নীলকণ্ঠ উভয় ভ্রাতাই বদান্যতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। সে সময়ে চন্দননগরে বৈদ্যনাথ "বড়বাবু" এবং নীলকণ্ঠ "ছোটবাবু" বলিয়া অভিহিত হইতেন।

ব্যবসায়ের জন্য কলিকাতাবাস হেতু কলিকাতার বহু সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য ব্যক্তির সহিত নীলকণ্ঠের আলাপপরিচয় এবং বন্ধুতা হইয়াছিল। সে কালের ধনবান্‌গণ সাধারণতঃ অত্যন্ত বিলাসী ছিলেন। নীলকণ্ঠ ঐ সকল বিলাসী ব্যক্তির সংশ্রবে আসিয়াও আপনাকে সম্পূর্ণ বিলাস-বিমুখ করিয়া রাখিয়াছিলেন। যখন ব্যাবসায়ে তাঁহার বাৎসরিক লক্ষাধিক টাকা আয় ছিল, তখন তিনি বাটীর সন্নিহিত পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া নিজের সিক্ত বস্ত্র নিংড়াইয়া নিজেই রৌদ্রে শুষ্ক করিতে দিতেন। একদিন তাঁহাকে স্নানান্তে ঐরূপ নিজের বস্ত্র কাচিতে দেখিয়া তাঁহার কোন বন্ধুপুত্র বলিয়াছিলেন "আপনার বাটীতে আট দশ জন দাস-দাসী রহিয়াছে, আপনি নিজে কাপড় কাচেন কেন? আপনি হুকুম করাইলেই ত তাহারা আপনার আপনার কাপড় কাচিয়া দেয়!" ইহার উত্তরে নীলকণ্ঠ বলেন "বাবা, ভগবান মানুষকে হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি দিয়াছেন ব্যবহার করিবার জন্য। যে এই সকল অঙ্গের ব্যবহার না করে, সে ভগবানের নিকট অপরাধী হয়। যে কাজ নিজে অক্লেশে করিতে পারিবে, সে কাজ পরকে দিয়া করান উচিত নয়, করাইলে পাপ হয়।"

নীলকণ্ঠ বাল্যকাল হইতেই শারীরিক পরিশ্রম করিতে ভালবাসিতেন। বাল্যে ও যৌবনে যখন তিনি চন্দননগরে জনকজননীর স্নেহক্রোড়ে লালিতপালিত হইতেছিলেন, সে সময়েও তিনি স্বহস্তে উদ্যানের কার্য্য করিতেন। উত্তরকালে, যখন তিনি কলিকাতায় বাণিজ্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন স্বহস্তে উদ্যানের কার্য্য করিবার অবসর না পাইলেও, তাঁহার ফলোদ্যান ও পুষ্পোদ্যানের প্রতি আকর্ষণ কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। তিনি নানা স্থান হইতে নানা প্রকার ফল ও ফুলের কলম আনাইয়া তাঁহার কলিকাতার ও চন্দননগরের বাগানে রোপন করাইয়াছিলেন এবং সেই সকল গাছের পরিচর্য্যার জন্য সুদক্ষ মালী নিযুক্ত করিয়া প্রত্যহ বাগানের তত্ত্বাবধান করিতেন।

৩

চন্দননগরে-সরকার বাটীর অদূরে একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক গ্রামান্তর হইতে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। এই চিকিৎসক মহাশয় বৈদ্যনাথ ও নীলকণ্ঠের অনুগত ছিলেন, উভয় ভ্রাতাই তাঁহাকে স্নেহ করিতেন। চিকিৎসক মহাশয় সরকার-ভ্রাতৃদ্বয় অপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট হইলেও, বৈদ্যনাথ ও নীলকণ্ঠ তাঁহার সহিত বন্ধুবৎ ব্যবহার করিতেন। অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় এই চিকিৎক মহাশয়কে উপলক্ষ করিয়া অতি সামান্য কারণে বৈদ্যনাথের সহিত নীলকণ্ঠের বিরোধ হইল।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে, ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্বনামপ্রসিদ্ধ দেওয়ান রাজা ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর বংশধরগণের অবস্থা অত্যন্ত হীন হইয়া পড়িয়াছিল। ইন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর বৎসর ক্লাইভ চন্দননগর আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। লুণ্ঠনকারী ইংরাজ সেনারা ইন্দ্রনারায়ণের প্রাসাদ লুণ্ঠনপূর্ব্বক নগদ টাকা ও রত্নালঙ্কারে অন্যূন পঁয়ষট্টি লক্ষ টাকা হস্তগত করিয়া প্রস্থান করে। এই ঘটনার পর হইতেই চৌধুরীবংশের অধোগতির সূত্রপাত হয়। কিন্তু ধনসম্পত্তিতে হীন হইলেও, তাঁহাদের সামাজিক মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণই ছিল। ইন্দ্রনারায়ণের প্রপৌত্র চন্দ্রনাথ আর্থিক অবস্থায় মধ্যবিত্ত গৃহস্থ হইলেও, চন্দননগরে ব্রাহ্মণসমাজের গোষ্ঠীপতি ও দলপতি ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে অকারণে বা সামান্য কারণে যে কোনও ব্যক্তিকে সমাজচ্যুত করিতে পারিতেন। দলপতির এই দণ্ডাদেশ সেকালে সকলকেই মাথা পাতিয়া লইতে হইত, ইহার আর আপীল ছিল না।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সেকালে ধনবান্‌গণের চরিত্রদোষ লোকে কর্ত্তব্য বলিয়াই মনে করিত না, বরং বড়-মানুষীর অঙ্গ বলিয়া মনে করিত। হিন্দু সন্তান মুসলমানীকে রক্ষিতারূপে রাখিলেও সকল সময়ে সমাজ তাহা উপেক্ষা করিত। উপরে যে চিকিৎসক মহাশয়ের কথা লিখিত হইয়াছে, তিনি অথবা ব্রাহ্মণ সমাজপতি চন্দ্রনাথ এই দোষ হইতে মুক্ত ছিলেন না। এইরূপ কথিত আছে যে, ঐ চিকিৎসক মহাশয়ের এক মুসলমানী প্রণয়িণী ছিল, চন্দ্রনাথ সেই মুসলমানীকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হওয়াতে চিকিৎসক মহাশয়ের উপর জাতক্রোধ হইলেন এবং তাঁহাকে লাঞ্ছিত করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কয়েক মাসের মধ্যেই সেই সুযোগ উপস্থিত হইল।

সরকার-বাটীতে প্রতি বৎসর কালীপূজা উপলক্ষে বিশেষ সমারোহ হইত। কালীপূজার রাত্রিতে এবং তৎপর দিন প্রায় এক হাজার লোককে ভূরিভোজনে পরিতৃপ্তি করা হইত। এই সকল অনুষ্ঠানে বৈদ্যনাথই সকলকে নিমন্ত্রণ করিতেন, কারণ নীলকণ্ঠের উপার্জ্জন অধিক হইলেও, তাঁহার অগ্রজ বৈদ্যনাথই সংসারের কর্ত্তা ছিলেন এবং তিনি বার মাস চন্দনগগরেই থাকিতেন। কিন্তু বৈদ্যনাথ দুর্ব্বলচিত্ত ও নির্ব্বিরোধ লোক ছিলেন, কোন বিষয়ে প্রতিবাদ করা তাঁহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ ছিল। নীলকণ্ঠ তাঁহার অগ্রজের এই দুর্ব্বলতার বিষয় সম্যক্ অবগত ছিলেন। সেই জন্য তিনি ক্রিয়া-কর্ম্মের পূর্ব্বে বাটীতে গিয়া সংবাদ লইতেন যে, যাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিবার কথা তাঁহাদের সকলকে যথারীতি নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে কি না; কাহারও নিমন্ত্রণ বাকী থাকিলে, তিনি অবিলম্বে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিবার ব্যবস্থা করিতেন। একবার কালী-পূজার পূর্ব্বদিন, নীলকণ্ঠ কলিকাতা হইতে বাটীতে গিয়া অগ্রজের সহিত সাংসারিক বিষয়ে আলোচনাকালে সহসা জিজ্ঞাসা করিলনে—"দাদা, পাড়ার সকল লোককে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে ত?"

বৈদ্যনাথ বলিলেন "হাঁ ভাই, আমি নিজে প্রত্যেকের বাড়ীতে গিয়া বলিয়া আসিয়াছি, কেহই বাদ পড়ে নাই।"

অনন্তর নীলকণ্ঠ ভোজের মিষ্টান্ন, দধি প্রভৃতির বায়না দেওয়া হইয়াছে কি না, কোন্ দ্রব্যের জন্য কাহাকে বায়না দেওয়া হইয়াছে প্রভৃতি সংবাদ লইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্ব্বিঘ্নে কালীপূজা এবং রাত্রিতে ব্রাহ্মণভোজন শেষ হইল। পরদিন মধ্যাহ্নকালে স্বজাতীয়, কুটুম্ব, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীদিগকে খাওয়াইবার ব্যবস্থা ছিল। যে সকল নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ শূদ্রের বাটীতে ভোজন করিতেন না, তাঁহাদের বাটীতে ময়দা, ঘৃত ও দধি মিষ্টান্ন প্রেরিত হইল। চন্দ্রনাথ চৌধুরী ব্রাহ্মণসমাজের দলপতি, তিনি শূদ্রের বাটীতে ভোজন করিতেন না, তাঁহার বাটীতেও যথারীতি ভোজ্য এবং তৎসহ দেবীর নিকট উৎসর্গীকৃত বলিপ্রদত্ত একটি ছিন্নশীর্ষ ছাগ প্রেরিত হইল। যে সকল ব্রাহ্মণ শূদ্রের বাটীতে ভোজন করিতেন না, তাঁহারাও নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য সরকার-বাটীতে পদধূলি প্রদান করিতে আসিলেন, চন্দ্রনাথও উপস্থিত হইলেন।

চন্দ্রনাথ বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, পূর্ব্বোক্ত চিকিৎসক মহাশয় বৈঠকখানায় বসিয়া গল্প করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই চন্দ্রনাথ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"একি ব্যাপার? হিন্দুর পূজাবাটীতে মুসলমান কেন?" এই কথা বলিয়াই তিনি বৈদ্যনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বড়বাবু, আপনি এই মুসলমানকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন কি?"

চন্দ্রনাথ যে কাহাকে মুসলমান বলিলেন, বৈদ্যনাথ তাহা বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন "না, আমি ত কোন মুসলমামকে নিমন্ত্রণ করি নাই!"

চন্দ্রনাথ উক্ত চিকিৎসককে দেখাইয়া বলিলেন "যে মুসলমানীকে গৃহিণী করিয়াছে, মুসলমান-বাটীতে অন্নগ্রহণ করে, সে মুসলমান নহে ত হিন্দু নাকি? হয় সে এখান হইতে চলিয়া যাক, নতুবা আমি চলিলাম।" বৈদ্যনাথ দেখিলেন—সর্ব্বনাশ! ব্রাহ্মণসমাজের দলপতি ও গোষ্ঠীপতি যদি ক্রোধভরে তাঁহার বাটী হইতে চলিয়া যান, তাহা হইলে সকল ব্রাহ্মণই তাঁহার

অনুসরণ করিবেন, কাহারও এত সাহস নাই যে, দলপতির আদেশের প্রতিবাদ করেন। চন্দ্রনাথের দলস্থ ব্রাহ্মণগণ যদি সরকার-বাড়ী হইতে চলিয়া যান, তাহা হইলে সরকার-পরিবারকে সমাজচ্যুত হইতে হইবে, কোন ব্রাহ্মণই এমন কি সরকারদের কুল-পুরোহিত পর্য্যন্ত সরকারবাটীতে প্রবেশ করিবেন না। এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য বৈদ্যনাথ ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না যে কি করিবেন, আর ভাবিবার সময়ই বা কোথায়? তখনই তাঁহাকে যাহা হয় একটা কিছু করিতেই হইবে। এই অবস্থায় নিরুপায় হইয়া বৈদ্যনাথ বলিলেন "আপনি চিকিৎসক মহাশয়ের কথা বলিতেছেন? উনি নিমন্ত্রিত হইয়া এখানে আসেন নাই, আমার পুত্রের সর্দ্দি হইয়াছে, তাই তাহার চিকিৎসার জন্য আসিয়াছেন। উনি প্রায় প্রত্যহই আমার বাড়ীতে আসেন, আমাদের বাড়ীর সকলেরই রোগে উনি চিকিৎসা করেন। আমি পূজা উপলক্ষে উঁহাকে নিমন্ত্রণ করি নাই।"

বৈদ্যনাথ যে সমস্যায় পড়িয়াছিলেন, তাহা হইতে আপাততঃ নিষ্কৃতিলাভের জন্য তাঁহাকে এই মিথ্যা কথা বলিতে হইল। তিনি তখন কল্পনাও করিতে পারেন নাই যে, তাঁহার এই মিথ্যাভাষণের জন্য সরকার-পরিবারে কি অশান্তির আবির্ভাব হইবে। বৈদ্যনাথ পূর্ব্বদিন প্রাতঃকালে নিজে চিকিৎসক মহাশয়কে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু চন্দ্রনাথের ভয়ে যখন তাহা অস্বীকার করিলেন, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সম্মুখে বলিলেন যে তিনি চিকিৎসক মহাশয়কে নিমন্ত্রণ করেন নাই, তখন চিকিৎসক মহাশয় ক্ষোভে ও লজ্জায় অধোমুখে সরকারবাটী হইতে প্রস্থান করিলেন।

যে সময়ে বহির্ব্বাটীতে এই ব্যাপার হয়, সে সময়ে নীলকণ্ঠ তথায় উপস্থিত ছিলেন না, তিনি অন্তঃপুরে কার্য্যান্তরে ব্যস্ত ছিলেন। চিকিৎসক মহাশয় বড় বাবুর দ্বারা লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত হইয়াছেন, এই সংবাদ পাইবামাত্র তিনি সত্বর বহির্ব্বাটীতে উপস্থিত হইয়া অগ্রজকে জিজ্ঞাসা করিলেন "দাদা, ব্যাপার কি? আপনি নাকি চিকিৎসককে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন? তিনি কি করিয়াছিলেন?"

বৈদ্যনাথ তখন আনুপূর্ব্বিক প্রকৃত ঘটনা আদ্যোপান্ত বিবৃত করিলে, নীলকণ্ঠ সেখানে কিছু না বলিয়া অগ্রজকে লইয়া বাটীর ভিতরে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে নির্জ্জন কক্ষে লইয়া গিয়া বলিলেন, "আপনি নিজে গিয়া যাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে চন্দ্রনাথের ভয়ে, নিজের বাটীতে অপমান করিয়াছেন। আপনি কি চন্দ্রনাথকে চেনেন না? ওর মত দুশ্চরিত্র লম্পটকে আপনার এত ভয়? স্বর্গীয় ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর বংশধর বলিয়া কি উহার সকল কার্য্যেরই সমর্থন করিতে হইবে? ধৃষ্টতারও একটা সীমা আছে, চন্দ্রনাথের ধৃষ্টতা আজ সেই সীমা অতিক্রম করিয়াছে। আপনি তাহা সহ্য করিতে পারেন, কিন্তু আমি তাহা পারি না। আমি আজ এখনই এই বাড়ী ত্যাগ করিয়া যাইতেছি। এই বাড়ী ও বাগানের অংশ আমি স্বেচ্ছায় আপনাকে ছাড়িয়া দিলাম, ইহাতে আমার বা আমার বংশধরগণের এই মুহূর্ত্ত হইতে আর কোন অধিকার নাই। এখন বাড়ীতে বহু নিমন্ত্রিত সমবেত হইয়াছেন, তাঁহাদের সম্মুখে আর এসব ব্যাপারের উল্লেখ করিবেন না। আমি আর সদর-বাটীতে যাইব না, খিড়কী দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছি। আপনি যাহা করিলেন, তাহার জন্য নিমন্ত্রিতদিগের নিকটে আমার মুখ দেখাইতে লজ্জাবোধ হইতেছে।"

এই বলিয়াই নীলকণ্ঠ অগ্রজকে প্রণামপূর্ব্বক পদধূলি গ্রহণ করিয়া তথা হইতে অপসৃত হইলেন। বৈদ্যনাথ বজ্রাহতের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন এবং ক্ষণকাল পরে সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার মনে হইল, বুঝি একটা দুঃস্বপ্ন দেখিতেছেন। প্রায় আধঘণ্টা পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া একজন ভৃত্যকে বলিলেন, "ছোট বাবু কোথায়? তাহাকে একবার এইখানে আসিতে বল।"

ভৃত্য ক্ষণপরে আসিয়া বলিল, "ছোট বাবু ছোট-মা আর খোকা বাবুকে নিয়ে খিড়কী দিয়ে বেরিয়ে গেছেন, কোথায় গেছেন, কাউকে বলে' যান নি।"

"শীঘ্র গিয়ে দেখ দেখি—ঘাটে তাঁর বজরা আছে কিনা?"

ভৃত্য দ্রুতপদে প্রস্থান করিল এবং আধ ঘণ্টা পরে আসিয়া বলিল, "ছোট বাবুর বজরা পালতুলে হাটখোলা পার হয়ে চলেছে, এতক্ষণে বোধহয় গোন্দলপাড়া ছাড়িয়ে গেল।"

বৈদ্যনাথ নীরবে বসিয়া রহিলেন।

* * * *

কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। নীলকণ্ঠ কলিকাতাতেই বাস করিতে লাগিলেন, চন্দননগরে আর আসিলেন না। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি সংবাদ পাইলেন যে, চন্দননগর বাগবাজারে ফরাসীদের যে সামরিক হাসপাতাল আছে, তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সেই হাসপাতাল-বাটী নীলামে বিক্রয় হইবে। তিনি আর কাল বিলম্ব না করিয়া চন্দননগরে লোক পাঠাইয়া সেই বাটী ক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিলেন। এই হাসপাতাল-বাটী তাঁহার পৈতৃক আবাসের পূর্ব্বদিকে অনতিদূরে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর অবস্থিত। বাটী ক্রয় করিয়াই তিনি ঐ বাটীর কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া বাসোপযোগী করিলেন এবং একটি "ঠাকুরদালান" নির্ম্মাণ করাইয়া শুভদিনে নবগৃহে প্রবেশ করিলেন। চন্দননগর-পরিত্যাগের সময়ে তিনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, যেরূপেই হউক, চন্দ্রনাথের ধৃষ্টতার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতেই হইবে। এখন চন্দননগরে আসিয়া তিনি তাঁহার বন্ধুগণের সহিত পরামর্শে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার বাটীর অদূরে বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় নামক এক তেজস্বী ও ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি নীলকণ্ঠকে বলিলেন, "আপনার কোনও চিন্তা নাই, আমি যথাসাধ্য আপনাকে সাহায্য করিব।" বিশ্বনাথ স্বয়ং স্বভাবকুলীন ছিলেন; চন্দননগরে সে সময়ে যে কয় ঘর নিকষ কুলীনের বাস ছিল, সকলেই বিশ্বনাথের সহিত কুটুম্বিতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। বিশ্বনাথ সেই সকল কুলীন ব্রাহ্মণকে স্বীয় মতানুবর্ত্তী করিয়া চন্দ্রনাথ চৌধুরীর দল হইতে ভাঙ্গাইয়া লইলেন এবং ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ সহোদর রাজারাম চৌধুরীর প্রপৌত্র সরিষাপাড়ানিবাসী রামনারায়ণ চৌধুরীকে গোষ্ঠীপতি* করিয়া তাঁহার দ্বারা নূতন দল গঠন করাইলেন। ইহার অল্প দিন পরে চন্দননগরের একজন ধনবান্ তিলির আদ্যশ্রাদ্ধে, মাল্যচন্দনের সভাতে, চন্দ্রনাথের পরিবর্ত্তে রামনারায়ণ চৌধুরীকে সর্ব্বাগ্রে মাল্য-চন্দন প্রদান করিয়া, নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণবর্গের দ্বারা রামনারায়ণকে দলপতি ও গোষ্ঠীপতি বলিয়া স্বীকার করাইলেন। তদবধি চন্দননগরের ব্রাহ্মণ সমাজ দুইজন গোষ্ঠীপতির অধীনে দুই দলে বিভক্ত হইল। ইহার প্রায় একশত বৎসর পরে, খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, চন্দ্রনাথের বংশ বিলুপ্ত হওয়াতে, এখন সরিষাপাড়ায় চৌধুরী বংশই গোষ্ঠীপতিত্বের সম্মানে সম্মানিত হইতেছেন। বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় এবং নীলকণ্ঠ সরকারের জন্যই সরিষাপাড়ার চৌধুরী বংশ গোষ্ঠীপতিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

চন্দননগরে আসিয়া নীলকণ্ঠ শেষ জীবন নিশ্চিন্ত হইয়া যাপন করিবেন বলিয়া আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে আশা ফলবতী হয় নাই। নূতন বাটী ও তৎসংলগ্ন বাগানে একটি প্রকাণ্ড পুষ্করিণী তিনি প্রথমে ক্রয় করিয়া তাহা প্রাচীরবেষ্টিত করিলেন। কিছুদিন পরে, তাঁহার বাটী ও বাগানের সংলগ্ন উত্তর দিকে অন্যূন চৌদ্দ বিঘা একটা বাগান ক্রয় করেন। এই বাগান ক্রয় করাতে তাহার বাটী ও বাগানের চারিদিক চারিটি পাকা রাস্তা দ্বারা বেষ্টিত হইল। উত্তরে ষ্টেশনের রাস্তা (তখন রেলপথ বা ষ্টেশন ছিল না) পূর্ব্ব দিকে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড এবং দক্ষিণ ও পশ্চিমে বিবির হাটের রাস্তা; চন্দননগরের কেন্দ্রস্থলে, চারিদিকে চারিটি প্রধান রাজপথ, এরূপ সুন্দর স্থানে চন্দননগরে কোন লোকের বাটী ছিল না এবং এখনও নাই।

* রাজা ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীও চন্দননগরের গোষ্ঠীপতি ছিলেন না, হালদারপাড়ার হালদার মহাশয়েরাই গোষ্ঠীপতি ছিলেন। হালদার গোষ্ঠীর তদানীন্তন কর্ত্তা বাবু ছকড়ি হালদার মুর্শিদাবাদেরই নবাব সরকারের অধীনে কার্য্য করিবার সময়ে-কয়েক লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করাতে নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ ছকড়িবাবুর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করেন। ইন্দ্রনারায়ণ সেই কথা জানিতে পারিয়া ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা অনুরোধ করাইয়া ছকড়িবাবুর প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। ছকড়িবাবু কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ ইন্দ্রনারায়ণের পুত্র লালমোহনকে কন্যাদান পূর্ব্বক স্বীয় গোষ্ঠীপতিত্বের সম্মান লালমোহনকে যৌতুক দিয়াছিলেন। তদবধি লালমোহনই পুত্রপৌত্রাদি-ক্রমে ঐ সম্মান ভোগ করিয়া আসিতেছেন। সরিষাপাড়ার চৌধুরী বংশের রামনারায়ণ চৌধুরী কিঞ্চিদধিক একশত বৎসর পূর্ব্বে নীলকণ্ঠ ও বিশ্বনাথের উদ্যোগে গোষ্ঠীপতিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রামনারায়ণের প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী চন্দননগরের বর্ত্তমান গোষ্ঠীপতি।

কিন্তু বিধাতা নীলকণ্ঠের অদৃষ্টে শেষ জীবনে কষ্ট লিখিয়াছিলেন। নূতন বাটী ও বাগানক্রয়ের কয়েক বৎসর পরে তাঁহার ব্যবসায়ে ক্ষতি হইতে আরম্ভ হওয়াতে অবশেষে তিনি সর্ব্বস্বান্ত ও ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার কলিকাতার বাটী ও বাগান বিক্রীত হইয়া গেল, অফিস উঠিয়া গেল, সেই সুযোগে অফিসের কোন কোন অসাধু কর্ম্মচারী প্রভুর সর্ব্বনাশ করিয়া আপনাদের স্বার্থ-সিদ্ধি করিল। যিনি আজন্ম সুখের ক্রোড়ে লালিত হইয়াছিলেন, বার্দ্ধক্যে তিনি গভীর দারিদ্র্যপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার অগ্রজ বৈদ্যনাথ পূর্ব্বেই লোকান্তরিত হইয়াছিলেন।

বৈদ্যনাথের বংশে তাঁহার দুই তিনটি প্রপৌত্র এবং নীলকণ্ঠের এক পৌত্র বিশ্বেশ্বর ও কয়েক জন প্রপৌত্র জীবিত আছেন। নীলকণ্ঠের নূতন বাটীর ঠাকুর-দালান ও অন্তঃপুরের কোন কোন অংশ ভগ্নাবস্থায় পতনোন্মুখ হইয়া কালের প্রতীক্ষা করিতেছে। নীলকণ্ঠ যে চৌদ্দ বিঘা বাগান ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশ হস্তান্তরিত হইয়া গিয়াছে। এই বাগানের কিয়দংশের (বাইশ কাঠা) উপর "নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দির ও চন্দননগর পুস্তকাগার" প্রতিষ্ঠিত হইয়া চন্দননগরের সুসন্তান, দানবীর, খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয়ের পিতৃভক্তি ও স্বদেশানুরাগের সাক্ষ্য দিতেছে, আর ঐ স্মৃতিমন্দিরের দক্ষিণে নীলকণ্ঠের ঠাকুর-দালানের ভগ্নাবশেষ জীর্ণ কঙ্কালের মত, পার্থিব বৈভবের নশ্বরতা সপ্রমাণ করিতেছে। চন্দননগরের দক্ষিণাংশে, কৃষ্ণবাটী বা কৃষ্ণপটী নামক পল্লীতে নয়নসুখ সরকারের প্রতিষ্ঠিত পুষ্করিণী এখনও "সরকার-পুকুর" নামে পরিচিত হইয়া অতীতের সাক্ষী-স্বরূপ আজও বর্ত্তমান।

কালিদাস

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

নমঃ, নমঃ, নমঃ ভারত-বিভূতি,
নমঃ কালিদাস কবি!
নমঃ হে পেলব, কান্ত, মধুর
প্রেম-সুষমার ছবি।
নমঃ মানবের মনের গোপন
কক্ষের অধিকারী;
শত রুচি, আশা, বাসনা ও রস
ফুটাইলে মনোহারী।
নারী-হৃদয়ের ভাবনা-বিলাস,
তাহার দেহের ভাতি,
তারি কৌতুক, বাক্য-পীযূষ,
তারি রীতি, তারি কাঁতি
ললিত ছন্দে, মধু-কৌশলে
প্রকাশিলে মধুময়,
ভারত-দেবতা ধূর্জ্জটি আর
নগরাজ হিমালয়।

ভারতের ক্ষেম, শৌর্য্য ও ক্ষমা,
ত্যাগ, শান্তি ও প্রীতি
তোমারি কাব্যে ফোটে অপরূপ
ভারত-ধর্ম্ম-নীতি।
ওগো ভারতের ভারতী-দুলাল,
তুমি ছাড়া কেবা আর
হয়েছে এমন নিপুণ শোভন
ভারত-চিত্রকার?
কত শতাব্দী কেটে গেছে, কবি,
হেরি' আজও তোমা' পানে
নিরখি অতুলা জননী ভারত
চলে চঞ্চল প্রাণে।
নমঃ, নমঃ, নমঃ, ভারত-বিভূতি,
নমঃ কবি কালিদাস!
নমঃ প্রেমরূপ, নমঃ ক্ষেমরূপ,
নমঃ হাসি, উল্লাস।

বিহারীলালের অতসী ও দিদিমা

শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু

একুশ বছরের বিহারীলালের সখটা সত্যই অদ্ভুত। লোকে কুকুর পুষিয়া থাকে, গরু পুষিয়া থাকে, পাখীপক্ষীও সযতনে পালন করে। কিন্তু পুরুষ মানুষ হইয়া বিহারীলাল যে কি করিয়া বিড়াল পুষিবার সখটা আয়ত্ত করিল, তাহা আজ পর্য্যন্ত চিন্তা করিয়াও বিশেষ কোনও হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বেচারা চাকুরীজীবী মানুষ। সকাল সাড়ে নয়টায় পান চিবাইতে চিবাইতে বাহির হয়। দুপুরে টিফিনের ছুটি পায় কিছুক্ষণ। এই সময়ের মধ্যে তাহার একবার বাড়ীতে আসা চাই-ই। আদরের বিড়ালটার আবার সখ করিয়া নাম রাখা হইয়াছে অতসী। এই অতসীকে ছুটির ফাঁকে একবার দেখিয়া না গেলে, বিহারীলালের কাজে মন বসে না।

শ্রাবণ মাস। কয়দিন ধরিয়া টিপ্-টিপ্ করিয়া ক্রমান্বয়ে বর্ষণ হইতেছে। সন্ধ্যার মুখে বিহারীলাল অফিস হইতে বাড়ী ফিরিল। পায়ের জুতা-ভর্ত্তি পথের কাদা। ফটকের চৌকাঠ ডিঙাইলে দক্ষিণ ভাগে যে ছোট চূণের ঘরখানা আছে, সেইখানে অতসী শুইয়াছিল। বিহারীর পদশব্দে সে মিটু-মিটু করিয়া চাহিয়া বার দুই 'মিউ-মিউ' করিয়া ডাকিল। ভাবটা এই যে, আমাকে আজ চূণের গাদায় আশ্রয় লইতে হইয়াছে, ইহার ব্যবস্থা কর।

বিহারীলাল নত হইয়া অতসীকে কোলে তুলিয়া লইল। তাহার মাথায়, গায়ে এবং ল্যাজে হাত বুলাইয়া কাণে কাণে কহিল, আজ তোকে এত শুরু দেখাচ্ছে কেন রে?

অতসী ইহার জবাবে বার কতক 'মিউ-মিউ' করিয়া চুপ্ করিল।

বিহারীলাল কহিল, ক্ষিধে পেয়েছে?

—মি-উ-উ...

—বাড়ীর লোকে মেরেছে?

—মি-উ-উ!

—মেরেছে?

অতসী আবার মিটু-মিটু করিয়া বিহারীলালের মুখ পানে চাহিল। মনে হইল, অসহায় প্রাণীটির দুই চোখে অশ্রু জমিয়া উঠিয়াছে। করুণ-দৃষ্টিতে প্রহারের যাতনা মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে, বিহারীলাল অনুভব করিল।

—আচ্ছা দেখাচ্ছি একবার! অতসীর গায়ে হাত! হাত মটু-মটু ক'রে ভেঙ্গে দেবো! আমায় চেনে না? রাগলে বিহারীলাল বংশের কুলাঙ্গার!

আপন মনে বকিতে বকিতে বিহারীলাল অতসীকে নামাইয়া দিল। তাহার পর পার্শ্বের সিঁড়ি বাহিয়া সশব্দে উপরে উঠিতে উঠিতে বেশ জোরে জোরেই বলিতে লাগিল, বুঝেছি—এ কাজ কার আমি বুঝেছি। ভেবেছে—ধরতে পারবো না! ভারী ই-য়ে হয়েছে! একটা অবলা প্রাণীর গায়ে হাত! ধর্ম্মে কখনও সইবে না, তা' আমি ব'লে রাখছি।

সিঁড়ির চাতাল পার হইলে বাম পার্শ্বে যে ঘরখানা পড়ে, তাহারই ভিতর হইতে একটি সচল মূর্ত্তি বাহির হইয়া আসিলেন। ইনি বিহারীলালের দিদিমা। বয়েস হইয়াছে বেশ। বেঁটে-খাটো, থুরথুরে মানুষটি। মাথার পাকাচুলে এবং গায়ের গৌরবর্ণে যেন পাকা আমটি।

—অত চেঁচামেচি কিসের জন্যে রে বেহারী?

বিহারী জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, ন্যাকা মাগী জানো না? অতসীকে আজ ঠেঙিয়েছে কে শুনি?

দিদিমা মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, খবরদার বলছি বেহারী—গালমন্দ আমায় ক'রবি নে!

—ক'রবো না—খুব ক'রবো। হাজার বার গালমন্দ ক'রবো। গাল দিয়ে ভূত ভাগাবো। ডাইনী মাগী, রাক্কুসে মাগী, কাঁকুড়া মাগী!

—ফের? ভাল হবে না কিন্তু বেহারী!

—না হোক্ ভাল! আমার অতসীকে কেন মেরেছ?

দিদিমা দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন, বেশ ক'রেছি মেরেছি! তোর আদুরে অতসীকে ভাল শেখাতে পারিস্ নে?

যেমন তুই হতভাগা পেটসর্ব্বস্ব—তেমনি পোড়া বেড়ালটাও জুটেছে!

বিহারীলাল পাশ কাটাইয়া ঘরে ঢুকিল। জামা ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল, ধর্ম্মে সইবে না কিন্তু! ঐটুকু একটা প্রাণীর গায়ে হাত?

—আজ তো পাখাপেটা ক'রেছি। এবার চেলাকাঠ পিঠে ভাঙবো!

—ভেঙে একবার দেখ না, কেমন মজা!

দিদিমা হাত নাড়িয়া কহিলেন, কি ক'রবি তুই—হ্যাঁ কি ক্'রবি?

বিহারীলাল পায়ের জুতাটা একপাশে রাখিয়া বলিল, গলা ধাক্কা দিয়ে বাড়ী থেকে বের ক'রে দেবো!

দিদিমা আর কোনও কথা বলিলেন না। ধীরে ধীরে নিজের ঘরে মধ্যে ঢুকিলেন। কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরে আবার এককাণ্ড ঘটিল;—আদুরে অতসী চুণের গাদা হইতে উঠিয়া আসিয়া দিদিমার আধসের জাল দেওয়া খাঁটি দুগ্ধের বাটিটা অর্দ্ধেক নিঃশেষ করিয়া চোরের মত সরিয়া পড়িতেছিল। দিদিমা কি একটা কাজে রান্নাঘরের বাহিরে গিয়াছিলেন, আর সেই অবসরে অতসী এই কাণ্ড বাধাইয়াছে।

একে ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে অতসী ভাজা মাছ রেকাবী হইতে তুলিয়া লইয়া চম্পট দিয়াছিল, এবং অতসীকে সামান্য মাত্র প্রহার করায় শ্রীমান্ নাতির কাছ হইতে দিদিমাকে কটুবাক্য শুনিতে হইয়াছিল, তাহার উপর আবার বেশীক্ষণ সময় যাইতে না যাইতে বিড়ালটার এই বেহায়াপনা! বৃদ্ধা ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না! 'উনুন' নামাইবার একটা সরু লোহার শিক তুলিয়া লইয়া সপাসপ্ ঘা' কতক অতসীর পিঠে বসাইয়া দিলেন।

মার খাইয়া বিড়ালটা প্রথমে উর্দ্ধশ্বাসে একটা লাফ দিল, তাহার পরেই কেঁউ-কেঁউ শব্দে সিঁড়ি দিয়া তীরবেগে উপরে উঠিয়া গেল।

বিহারীলাল বেড়াইতে গিয়া রাত্রে যখন বাড়ী ফিরিল, তখন আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। নিজের শুইবার ঘরে আসিয়া জামাটা খুলিয়া আলনায় রাখিয়া দিল। তাহার পর বিছানায় বসিয়া জুতার ফিতা খুলিতে লাগিল।

—মি-উ-উ...

বিহারী চাহিয়া দেখিল, অতসী ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়া তাহার পা ঘেঁষিয়া বসিয়াছে। বিড়ালটা কাছেই যেন কোথায় ছিল, বিহারীর জুতার শব্দে পিছন লইয়াছিল।

মি-উ-উ...অতসী ল্যাজ্ নাড়িতে লাগিল।

—কি, কেঁদে মরছিস্ কেন আবার?

বিড়ালটা একবার মুখ তুলিয়া বিহারীলালের দিকে পিট্-পিট্ করিয়া চাহিল। বেচারার চোখ দুইটি বেদনায় ভরিয়া উঠিয়াছে। বার দুই সামনের পায়ের সাহায্যে চোখ দুইটি রগড়াইয়া অতসী আনতমুখে নীরবে বসিয়া রহিল।

এবার অতসীকে কোলে তুলিয়া লইতেই উহার পিঠে লম্বা লম্বা দাগ দেখিয়া বিহারিলাল মনে মনে অসম্ভব জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কোনও কথা কহিল না। আদর করিয়া গায়ে হাতও বুলাইল না। পরন্তু অতসীকে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

রাত্রে ভাত খাইবার জন্য ডাকাডাকি করিয়া দিদিমা হার মানিয়া গেলেন। বিহারীর কোনও সাড়া শব্দ নাই। অবশেষে বকিতে বকিতে দিদিমা উপরে উঠিয়া ঘরে আসিয়া দেখেন—শ্রীমান্ উপুড় হইয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া বিছানায় পড়িয়া আছে।

—এই বেহারী, খাবি চল্।

এই বলিয়া দিদিমা নাতির গায়ে হাত দিয়া আস্তে ঠেলিয়া দিলেন।

কিন্তু বিহারীলাল সাড়া দিল না। একটু নড়িল না পর্য্যন্ত। যেমনি শুইয়াছিল, তেমনি শুইয়া রহিল।

—আরে এই হতভাগা, ওঠ্ না! তোর জন্যে হেঁসেল আগলে কত ক্ষণ বসে থাক্‌বো, এ্যাঁ? শরীরে একটু দয়া-মায়া পর্য্যন্ত নেই! বুড়ো মানুষ আমি! কোথায় বৌ এনে আমার সেবা ক'রবি, তা' না—আমাকেই উদয়-অস্ত গতর খেটে তোমার সেবা ক'রতে হচ্ছে। বাবারে বাবা—কি অধর্ম্মেরই ভোগ আমার! পোড়া যমও কি আমাকে ভুলে আছে?

দিদিমা তবুও কোনও জবাব পাইলেন না। শ্রীমান্ নড়েও না, চড়েও না। যেন পাষাণ—পাষাণের মত পড়িয়া আছে।

দিদিমার বয়স হইয়াছে যথেষ্ট। আগেকার মানুষ, তাই এখনও শরীরে সামর্থ্য আছে প্রচুর, কাজকর্ম্ম করিতে পিছাইয়া যায় না; কিন্তু বয়সের জন্য অনেকেরই যেমন অনাবশ্যক 'বক্-বক্' করা একটা বেয়ারাম হইয়া দাঁড়ায়, দিদিমাও সেই বেয়ারাম হইতে অব্যাহতি পান নাই। বাপ-মা-মরা নাতিটিকে তিনিই শিশুকাল হইতে মানুষ করিয়া আসিতেছেন। লোকে বলে, বুড়ী আদর দিয়া নাতিটির মাথা জন্মের মত খাইয়া শেষ করিতেছেন। এ কথা কাণে আসিলে, দিদিমা কাঁদিয়াই খুন হন। বিশ বছর পূর্ব্বের ঘটনা তাঁহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে—একমাত্র মেয়ে যখন শিশুপুত্রটিকে মার হাতে তুলিয়া দিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

মেয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল বটে, কিন্তু এই শিশুটিকে লইয়া আজ পর্য্যন্ত নিঃশ্বাস লইবার তাঁর অবকাশ আর মিলিল না।

দিদিমা আবার সুরু করিলেন : আরে এই হতভাগা পাজি ছুঁচো! ভালয়, ভালয় উঠ্‌বি? না গায়ে গরম জল ঢেলে দেবো, হ্যাঁ? ঢের-ঢের ছেলে দেখেছি বাবা, কিন্তু তোমার মত জগতে আর তু'টি নেই। মেয়ে কি কারুর মরে না। আমার এ কি পোড়ার ভোগ দেখ্ দিকিন্! একটু নিঃশ্বাস নেবারও সময় দিবি নে?

—মি—উ—উ···

অতসী বোধকরি, প্রহারের যাতনা এতক্ষণ ভুলিয়াছে। রাগ ভাঙাইবার জন্যই যেন সে খাটের তলা হইতে বাহির হইয়া, দিদিমার পায়ে গা' ঘেঁষিয়া, ল্যাজ্ উঁচু করিয়া আপ্যায়ন জানাইতে লাগিল।

—দূর্ হ'—দূর্ হ'। আবার সোহাগ ক'রে আপ্যায়িত করা হচ্ছে! মরণ আর কি!

এই বলিয়া দিদিমা বিড়ালটাকে পা দিয়া একটু দূরে ঠেলিয়া দিলেন।

কিন্তু ইহাতে ফল হইল বিপরীত! এই প্রাণীটি বোধকরি বুঝিল যে, বুড়ী দিদিমার অনিষ্ট করাটা নিতান্তই অন্যায় হইয়া গিয়াছে। বুড়ীর কাছ হইতে ইহার জন্য শাস্তি ভোগ করিলেও, এই প্রাণীটি হয়ত মনে মনে ভাবিল—দিদিমার কাছ হইতে ক্ষমাপ্রার্থনা করাই ঠিক্। তাই সে উপেক্ষিত এবং বিতাড়িত হওয়া সত্ত্বেও পুনরপি একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিল এবং একবার মুখটা উঁচু করিয়া করুণ ক্ষমাপ্রার্থনার চক্ষে দিদিমার মুখপানে চাহিয়া তাঁহার একখানা পায়ের উপর নিজের একখানা হাত রাখিল। (হাত নয় কি?)

—ওরে বাবারে—মুখপুড়ি হতচ্ছাড়ি আবার আঁচড়ে দেবে নাকি! ওরে অ বেহারী? দেখ্ তোর বেড়ালের কাণ্ড দেখ্!

বিহারীলাল ঘুমায় নাই! নিদ্রার ভাণ করিয়া পড়িয়াছিল মাত্র। সে বিছানার উপর বিদ্যুৎস্পর্শিতের ন্যায় সহসা উঠিয়া বসিল। একবার মুখ নীচু করিয়া দেখিল, অতসী দরজার পাশে চুপ্‌টি করিয়া বসিয়া আছে। কিন্তু ইহাতে বিহারী আরও চটিয়া উঠিল। তড়াক্ করিয়া মাটিতে নামিয়া আলমারীর পাশ হইতে একটা সরু বেত টানিয়া লইয়া অতসীর পিঠে সপাসপ্ বসাইতে লাগিল। বেচারী অতসী ইহার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না। তাহার যত্নের তিলমাত্রও ত্রুটি হইলে যে লোক ঝগড়া করিয়া বাড়ী মাথায় করে, সেই লোকের কাছ হইতে প্রহার! অতসী কিছুক্ষণ পড়িয়া পড়িয়া মার খাইল। কিন্তু আর সে পারিল না, যাতনায় চীৎকার করিতে করিতে পলাইয়া গেল।

নাতির রকম দেখিয়া দিদিমা তো অবাক্! অতসীর প্রতি বিহারী যে এতটা নির্দ্দয় হইয়া উঠিতে পারে, দিদিমা তা' কল্পনাও করিতে পারেন না!

—বড্ড মেরেছিস্ বেহারী।

বিহারী কোন কথা বলিল না, হাতের বেতটা যথাস্থানে রাখিয়া দিল।

—আহা বড্ড নেগেছে রে! কথা বলবার শক্তি নেই, তাই—

বিহারীলাল একবার কামানের মত গর্জ্জিয়া উঠিল—বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও বলছি তুমি আমার সামনে থেকে! রাক্ষুসী, ডাইনী মাগী—যেখানে যাবে, সেখানেই আগুন ধরিয়ে দেবে! দূর হও, দূর হও এক্ষুনি।

এই বলিয়া সে নিজেই দিদিমাকে ঘরের বাহিরে

ঠেলিয়া দিল এবং পরক্ষণেই খিল্ দিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

পরদিন হইতে অতসীকে কেহ এ বাড়ীতে দেখিতে পাইল না! বিহারী কোন কথা বলে না। তবে দিদিমা নাতির মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারেন, সেইদিনকার প্রহারের জন্ম শ্রীমানের বুকখানা পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে।

সুতরাং একদিন খাওয়াইতে বসিয়া দিদিমা বলিলেন, বাড়ীটা কেমন খাঁ-খাঁ কর'ছে রে!

বিহারী খাইতে খাইতে কহিল, কেন ?

দিদিমা একটু চুপ্ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, অতসীটা ছিল, তবু একটা···

শ্রীমানের খাওয়া বন্ধ হইল। কহিল, ফের ও-কথা মুখে আন্‌ছ ? শেষকালে বুড়োবয়সে আমার হাতে তোমার মরণ আছে দেখছি!

—তা' থাকুক! কিন্তু অতসীটা যে পোয়াতি! বেচারাকে এমনভাবে মারলি! মরে গেলে, তুই হতভাগা যে পাপে হাঁপানিতে ভুগে মরবি!

—মরি মরবো। তুমি তো আর দেখতে আসবে না। তোমার আয়ু ক' দিন!

এই বলিয়া বিহারী পুনশ্চ আহারে মনোনিবেশ করিল।

অভাবে দেখা গেল, বাড়ীতে ইঁদুরের উপদ্রব বাড়িয়াছে। বাড়িয়াছে বড় আশ্চর্য্য রকম। দিদিমার এখন আর এক জ্বালা! বিড়ালটা তবু প্রহারের ভয় করিত; কিন্তু খেরিপট ইঁদুরগুলা রান্নাঘরে, ভাঁড়ার ঘরে এবং প্রায় সমস্ত বাড়ীটায় হুড়াহুড়ি আর দৌরাত্ম্যি করিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের শাসন করিবার মত ক্ষমতা দিদিমার নাই। অতসীটা থাকিতে তবু এই উৎপাত হইতে নিস্তার ছিল। কিন্তু এখন সে বিদায় লইয়াছে। ইঁদুরগুলো আবার যা' চালাক! এই সেই দিন ইলেকট্রিকের কেস বাহিয়া একটা ইঁদুর ঘরের আলিসায় উঠিয়া গর্ত্ত করিতেছিল। শব্দ হওয়ায় দিদিমা এতটুকু একটা সরু লাঠী লইয়া ঘরে আসিয়া দেখেন—ইঁদুরটা কাণ দুইটা খাড়া করিয়া নীচের দিকে চাহিয়া তাঁহাকে বেশ করিয়া নিরীক্ষণ করিতেছে। তিনি হুস্-হাস করিয়া মাটিতে বারকতক লাঠির শব্দ করিলেন। ইঁদুরটা খড়্-খড়্ করিয়া কেস বাহিয়া নামিয়া আসিতেই এক ঘা' দিলেন পিঠে বসাইয়া। ইঁদুরটা মাটিতে পড়িয়াই নিস্তব্ধ, নিশ্চল। মরিয়া গিয়াছে ভাবিয়া যেমনি দিদিমা লাঠীর একটা খোঁচা দিয়াছেন, অমনি ইঁদুরটা তড়াক্ করিয়া উঠিয়া একেবারে দিদিমার দৃষ্টির বাহিরে তীরবেগে দৌড়!

কিন্তু একদিন বোধকরি ইঁদুরের শত্রু আসিয়া হাজির হইল। আসিল অন্য একটা বিড়াল—অতসী নহে। এই বিড়ালটার রং অদ্ভুত রকমের কালো। দেখিতে বড় কদাকার। দিনের বেলা দেখিলেও কেমন যেন ভয় হয়।

দিদিমা অতসীর কথা ভুলেন নাই। বেচারা মার খাইয়া অভিমানে কোথায় গেল! হয়তো এবাড়ীতে আর আসিবে না। হয়তো এবাড়ীর মানুষের ছায়া প্যর্যন্তও দেখিতে সে চায় না। জানোয়ার হইলে কি হয়—তাহারও তো অনুভূতি আছে!

কালো বিড়ালটা বড় উৎপাত সুরু করিয়া দিল। একদিন আলমারীটা খুলিয়া দিদিমা কি একটা কাজে নীচে নামিয়া গিয়াছিলেন। কাজ শেষ হইলে উপরে আসিয়া দেখেন—সেই কালো বিড়ালটা আলমারীর ভিতর আশ্রয় লইয়াছে। তাড়াইতে গেলে সে এমন গর্জ্জন করিয়া দাঁত খিচাইয়া উঠিল যে, দিদিমা ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। বিহারীলাল শুইয়াছিল, চীৎকার শুনিয়া উঠিয়া আসিল এবং ব্যাপারটা উপলব্ধি করিয়া বিড়ালটকে এমন প্রহার করিল যে, বেচারার একটা ঠ্যাং গুরুতরভাবে জখম হইল। আলমারীর ভিতর হইতে বিড়ালটা বাহির হইয়া আসিল বটে, কিন্তু বাড়ী হইতে বিদায় লইল না।

আর একদিন দেখা গেল, কালো বিড়ালটা একেবারে বিহারীলালের বিছানায় আশ্রয় লইয়াছে। রাত্রে শুইতে আসিয়া বিহারীলাল এই কাণ্ড দেখিয়া রাগে একেবারে আগুন! বিড়ালটার কি স্পর্দ্ধা! অতসী এত আদর পাইয়াছে, কিন্তু একদিনের তরেও তো তাহার এমনি দুঃসাহস হয় নাই!

এমনিধারা কত উৎপাত উপদ্রব অত্যাচার চলিতে

লাগিল। বিড়ালটাকে মারিয়া আধমরা করিলেও, হতভাগী এবাড়ী ত্যাগ করিতে চাহে না। দিদিমা চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। ইঁদুরের অত্যাচার বরং ছিল ভাল। অতসী যে কত নিরীহ ছিল, এই কথা এখন তিনি পুনঃপুনঃ অনুভব করিতে লাগিলেন।

সেদিন প্রত্যুষে দিদিমা ছাদে উঠিয়াছেন। চিলেকোঠা হইতে ঘুঁটে আনিতে গিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। ছোট্ট ঘরের একটি কোণে সেই কালো বকলেস্ বাঁধা সাদা ধব্‌ধবে অতসী। লম্বা হইয়া বাঁ-হাতের উপর মাথাটা ঈষৎ কাৎ করিয়া আরামে চোখ বুঁজিয়া আছে। আর তার পেটের কাছে ক্রীড়ারত বিচিত্র রংয়ের গোটা তিনেক বিড়ালছানা।

অতসী এতদিন পরে বুঝি অভিমান ত্যাগ করিয়াছে।

সুন্দর বাচ্চাগুলিকে দেখিয়া দিদিমার স্নেহপ্রবণ অন্তর আনন্দে উথলিয়া উঠিল। সব ভুলিয়া গিয়া তিনি দুই হাতে দুইটি বাচ্চাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। ফোঁস্ শব্দে গর্জ্জন করিয়া উঠিয়াই বুঝিবা অতসী দিদিমাকে চিনিতে পারিল। আর সঙ্গে সঙ্গে ভু-র্-র্ ম্যাউ শব্দ করিতে করিতে তাঁহার পায়ের কাছে সরিয়া আসিয়া মহোল্লাসে ল্যাজ্ নাড়িতে লাগিল।

দুইদিনও লাগিল না। ইহার মধ্যেই দিদিমা অতসীর বাচ্চাগুলার থাকিবার জন্য স্বহস্তে একটি সুন্দর কাঠের বাক্স তৈয়ারী করিয়া ফেলিলেন। দেখিয়া শুনিয়া বিহারীলালের বিস্ময়ের অন্ত রহিল না। তাহার ভারী আনন্দও হইল। দিদিমার মন ফিরিয়াছে দেখিয়া সে অত্যন্ত পুলকিত হইয়া উঠিল।

কিন্তু একটা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অতসীর ফিরিয়া আসার পরদিন হইতেই ইঁদুরের উৎপাত তো কমিয়া গেলই, এমন কি সেই দুষ্টু কালো বিড়ালটা যে কোথায় গা ঢাকা দিল, তাহার আর হদিস্ পাওয়া গেল না।

কালিদাস-স্মরণে

শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু

আষাঢ় এসেছে ঘুরে—দূরে বাজে ব্যথিত ক্রন্দন,
অবুঝ বিক্ষোভে আজো বন্দী যক্ষ কাঁদে থাকি থাকি'
নিবিড় অশ্রুর বাষ্পে আকাশেরো ছল-ছল আঁখি ঃ
সুদূর সীমান্ত হ'তে উড়ে আসে মেঘের নিঃস্বন।

আজো ত' রয়েছে মেঘ—ভরে' আছে উতল অম্বর,
অলকাপুরীর প্রান্তে নিয়ে যায় বিরহ-বারতা,—
যেখানে যক্ষের প্রিয়া পুষ্পবনে কুড়ায় শূন্যতা ঃ
বোবা বেদনায় যেথা সচকিত পল্লব-মর্ম্মর।

এখানে নেমেছে ঢল—সমারোহে এসেছে আষাঢ়,
তটিনীর কলরোলে জাগিয়াছে চঞ্চল আহ্বান।
অতীতের তীর হ'তে রূপায়িত চির অপরূপ
এস তুমি মহাকবি, দীপ্ত স্তবে ভরি' চারিধার।
বিহ্বল দিগন্তে ওই বাজে শোন বৈতালিক গান ঃ
আষাঢ়ে উঠুক ফুটে ছন্দোময় তোমার স্বরূপ।

হিন্দু-সংগঠন-সমস্যা

শ্রীনলিনীরঞ্জন ঘোষ এম. এ., বি. এল

হিন্দুজাতির একটা বিশিষ্টতা আছে; আছে তার একটা বিশেষ সংস্কৃতি। সেই বৈশিষ্ট্য এতই স্পষ্ট এবং চিহ্নিত যে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ থেকে বর্ণাক্ষরহীন, আচারভ্রষ্ট অন্ত্যজ হিন্দুর মধ্যেও কম বেশী তার একটা সুস্পষ্ট ছাপ মিলে। একটা অপার্থিব ভাবধারা জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে প্রতি হিন্দুর বাক্যে এবং কর্ম্মে, তাহার চিন্তায় এবং স্বপ্নে, তাহার মনের অণুপরমাণুকে এক বিশিষ্ট রংএ রাঙ্গিয়ে দেয়, যার ফলে শুধু ঋষির প্রেমপূত দৃষ্টিতে নয়, সাধারণ হিন্দুর চোখেও নিখিলবিশ্ব মধুময় হয়; ভূমানন্দের স্পর্শ তার জীবনকে সার্থক করে। আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে, জগতের মধ্যে জগদীশ্বরকে অনুভব করবার একটা সহজ প্রেরণা তার মধ্যে আছে। হিন্দুর দৃষ্টিভঙ্গী স্বভাবতঃ সংকীর্ণতাবর্জ্জিত, ধর্ম্মের বিশ্বজনীন মূর্ত্তি তার কাছে স্বতঃই প্রকাশ পায়। বেদ, উপনিষৎ থেকে পুরাণ, পাঁচালী, কথকতায়, ঠাকুরমার গল্পে, কুমারীর ব্রতকথায়, একটা অখণ্ড যোগসূত্র আছে এবং সেইটাই হিন্দুর মর্ম্ম কথা। হিন্দুধর্ম্মে শাসন-পদ্ধতি আছে। কোন বাঁধাধরা নিয়মের দ্বারা সত্যের অনুভূতিকে সে কখন গণ্ডীবদ্ধ করবার চেষ্টা করেনি। সত্যবস্তুর সাক্ষাৎকার নিয়েই কথা, প্রণালী বাহ্য বস্তু। হিন্দুর শাস্ত্রসমূহে মানুষের সহজ মনকে অত্যন্ত উচ্চাসন দেওয়া হইয়াছে—

> লোকানুবর্ত্তনং ত্যক্ত্বা, ত্যক্ত্বাদেহানুবর্ত্তনং।
> শাস্ত্রানুবর্ত্তনং ত্যক্ত্বা স্বাধ্যাসোপনয়নং কুরু॥

হিন্দু শাস্ত্রেই অন্ধের মত শাস্ত্রানুবর্ত্তন করবার নিষেধ আছে। হিন্দু জন্মান্তর বিশ্বাস করে, কর্ম্মফল মানে, সাধনার ক্রমপর্য্যায় এবং স্তরভেদ স্বীকার করে। সে পরিপূর্ণরূপে পরমাত্মাকে পেতে চায় নানারূপে নানাভাবে। সে সুখকরকেও নমস্কার করে, কল্যাণকরকেও নমস্কার করে, মঙ্গল এবং চরম মঙ্গল উভয়ই তার তুল্য প্রণতির বস্তু—সে কিছুই প্রত্যাখ্যান করবার নির্দ্দেশ পায়নি, তাই সে সার্থক ভাবে বলতে পারে, নমঃ শিবায় শিবতরায়।

হিন্দুর এই জীবনবেদ তাকে যুগে যুগে বাঁচিয়ে রেখেছিল। যখনই ধর্ম্মের গ্লানি এসেছে, জাতির জীবনে দুর্গতি এসেছে, তখনই জাতীয় জীবনের পরিস্থিতি এবং পরিবেষ্টনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সে একটা বোঝাপড়া করে' নিয়েছে। নতুনকে সে অন্ধভাবে প্রত্যাখ্যান করেনি। তাকে সে আপন ছাঁচে ঢেলে, অঙ্গীভূত করে' আবার নববলে বলীয়ান্ হয়ে জয়যাত্রা সুরু করেছে।

আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি পরমবিত্ত, অপার্থিব সম্পদ্। আমাদের বেদ, উপনিষদ্, গীতা সত্যের মণিমঞ্জুষা, সমগ্র মানবজাতির চলার পথের অভ্রান্ত দিক্‌দর্শন। তবুও আমরা ধ্বংসের পথে যাচ্ছি কেন? অলক্ষিতে কোথায় এবং কখন মরণের বীজ হিন্দুর সমাজদেহে প্রবেশ করেছে? আমরা ভারতবর্ষকে শুধু আমাদের জন্মভূমিরূপে দেখি না। ভারতবর্ষ আমাদের পিতৃভূমি—ভারতবর্ষ আমাদের দেবভূমি। ভারতবর্ষ হিন্দুধর্ম্মের এবং হিন্দু সংস্কৃতির প্রতীক। দেশ হিসাবে ভারতবর্ষ হিন্দুর সর্ব্বস্ব। কিন্তু এই ভারতবর্ষে হিন্দুর এত অধঃপতন, এত দুর্দ্দশা কেন? হিন্দু কেন আজ ধ্বংসোন্মুখ হয়েছে? হিন্দু সংস্কৃতির পাদপীঠ তক্ষশিলায় ভ্রমণকালে ক্রোশের উপর ক্রোশের মধ্যে আমি কোন হিন্দুর বসতি দেখতে পাইনি। গান্ধারে আজ আর হিন্দুর চিহ্ন দেখি না। একদা হিন্দু-বিভূষিত ভূস্বর্গ কাশ্মীরে অধিকাংশ অধিবাসিগণ আজ মুসলমান। চট্টগ্রামে চন্দ্রনাথ তীর্থের ত্রিসীমানার মধ্যে হিন্দু খুঁজে পাওয়া কঠিন। হিন্দু এবং বৌদ্ধ সভ্যতার বিখ্যাত কেন্দ্র পাহাড়পুরে আজ হিন্দু নেই বললেও চলে।

এর কারণ হয়তো অনেকেই বলবেন, ভিন্ন ধর্ম্মী রাজা বলপূর্ব্বক হিন্দুগণকে নিজের ধর্ম্মে দীক্ষিত করেছিল। হিন্দু রাজ্যের অবসানে অসহায় হিন্দুসমাজ নিজেকে রক্ষা করিতে পারেনি। কাশ্মীর এবং আরও কয়েকটী স্থান সম্বন্ধে ইহা মুখ্যতঃ সত্য হলেও, বহু স্থানে ইহা মাত্র আংশিকভাবে সত্য। এ সম্বন্ধে বাংলা দেশই

প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মুসলমান রাজত্বকালে বাংলায় মুসলমানের সংখ্যা নামমাত্র ছিল, শতকরা দশজনও ছিল কিনা সন্দেহ। এমন কি ময়মনসিংহ জেলাতেও ৭০ বৎসর পূর্ব্বে শতকরা ৭৫ জন হিন্দু ছিল। ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে জলপাইগুড়ি জেলায় মুসলমানের সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয়। বাংলা দেশে হিন্দুর সংখ্যা অত্যধিক হ্রাস পেয়েছে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে, গত শতাব্দীর মধ্যে। এই সময়ে ধীরে ধীরে হিন্দুসমাজের এক বিরাট্ অংশ মুসলমান সমাজের মধ্যে প্রবেশ করেছে।

এর প্রথম ও প্রধান কারণ আমরা আমাদের ধর্ম্মের মূল শিক্ষা,—মূল সূত্র যা' তা' ভুলে গিয়েছিলাম। আমাদের কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্তই আমরা করছি। জাতির যে প্রাণবান্ এবং বেগবান্ শক্তি সব কিছুকে আয়ত্ত এবং অঙ্গীভূত করে' নেয়, যে উদার দৃষ্টিভঙ্গী জাতিকে সব কিছু assimilate করার প্রেরণা এবং শক্তি দেয়, সেই dynamic শক্তি তার অন্তর থেকে অন্তর্হিতপ্রায় হয়েছিল। ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে, বাংলা দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্লাবন বয়ে গিয়েছিল এবং এর বিশেষ প্রাধান্য ছিল উত্তর এবং পূর্ব্ববঙ্গে। যখন বাংলা দেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়, তখন সেই বিরাট্ বৌদ্ধসমাজকে ঘৃণাভরে আমরা দূরে ঠেলে দিয়েছিলাম। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে রচিত "শূন্যপুরাণ" নামক গ্রন্থে দেখতে পাই।

"ধর্ম্ম হইল যবনরূপি, মাথা এত কাল টুপি
হাতে শোভে ত্রিকচ কামান।"

এই বিরাট্ বৌদ্ধ সমাজ সামান্য প্রলোভনে, সামান্য প্ররোচনায়, সামান্য চাপেই মুসলমান সমাজের মধ্যে প্রবেশ করেছে। ধর্ম্মে মুসলমান হলেও, তাদের অনেকে হিন্দুর বহু আচার এখনও পরিত্যাগ করেনি। হিন্দুর মেয়েরই মত মুসলমান মেয়েরা হাতে শাঁখা এবং কপালে সিন্দুর ব্যবহার করত এবং এখনও অনেকে স্থানে করে' থাকে। এই মুসলমান সমাজের একটা পৃথক্ জাতীয়তাবোধ, অন্ততঃ হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি একটা বিরুদ্ধ মনোভাব এতদিন পরিস্ফুট ছিল না এবং দীর্ঘ দিন ধরে' দুই সম্প্রদায় পাশাপাশি বন্ধুভাবেই বাস করছিল। কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়েছে। কেন পরিবর্ত্তন হ'ল, সে সম্বন্ধে আলোচনা করা বর্ত্তমানে আবশ্যক নাই। যেটা বিশেষ প্রণিধাণযোগ্য সেটী হচ্ছে যে, এই মনোভাব-পরিবর্ত্তনের ফলে আমাদের ভিতরকার দুর্ব্বলতা ধরা পড়েছে। হিন্দুরা জমির মালিক, হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষিত লোক বেশী, আর্থিক অবস্থাও হিন্দুদের অপেক্ষাকৃত উন্নত, তবুও মুসলমানপ্রধান স্থানে, এমন কি কোন কোন হিন্দু-প্রধান স্থানেও, হিন্দুর ধর্ম্মাচরণ, হিন্দুর সংস্কৃতি-রক্ষা কঠিন হয়ে পড়েছে। হিন্দুর মধ্যে একটা পরাভবের মনোবৃত্তি যেন ক্রমপ্রাধান্য লাভ করেছে।

উত্তর এবং পূর্ব্ববঙ্গের গ্রামের পর গ্রাম অতিক্রম করলেও, অনেক সময়ে হিন্দুর বসতি দেখা যায় না। যেখানে ২।১ ঘর হিন্দু বাস করে, তারা যেন নিজেদের লুকিয়ে রাখতে চায়, তারা যেন ভাবে যে হিন্দুত্ব তাদের একটা ভীতির, একটা পরাজয়ের চিহ্ন। সিন্ধু এবং সীমান্ত প্রদেশের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী আমাদের চোখের সামনে। পশ্চিম বঙ্গের যেখানে হিন্দুধর্ম্মীর প্রতি এই বিরুদ্ধ মনোভাব প্রকট হয়েছে, সেখানেও হিন্দুর ধর্ম্মাচরণ বাধা পেয়েছে, তাদের অধিকার সঙ্কুচিত হয়েছে এবং নতি স্বীকার করতে হয়েছে হিন্দুকে।

অনেকে হয়ত বলবেন যে, মুসলমানের যেখানে সংখ্যাধিক্য, সেখানে হিন্দুর অসহায় অবস্থা দুঃখের হলেও, বিস্ময়ের নয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বহুস্থানে বৃহৎ হিন্দু পল্লীর মধ্যে মাত্র ২।১ ঘর মুসলমান বাস করলেও, (অবশ্য হিন্দুর সংস্কৃতি, হিন্দুর যুগযুগান্তের সংস্কার অন্য ধর্ম্মীকে, শুধু ধর্ম্মের পার্থক্যের জন্যই, আঘাত করতে বাধা দেয়), এমনিই তাদের মধ্যে একটা আত্মপ্রত্যয় আছে যে, তাদের মুখে কোন ত্রাসের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। তারা সগৌরবে নিজেদের মুসলমান বলে' পরিচয় দেয়। হিন্দুরাজ্য কাশ্মীরে আমি সর্ব্বত্র মুসলমানের প্রাধান্য দেখেছি, এবং মুসলমান রাজ্য হায়দ্রাবাদে যেখানে শতকরা ৮০ জনেরও উপর হিন্দু, সেখানেও আমি মুসলমানের গর্ব্বোন্নত শির লক্ষ্য করেছি। দুই প্রদেশেই হিন্দুরা যেন অনুগ্রহপ্রার্থী। হিন্দুর সংস্কৃতি কি ভাবে আঘাত পাচ্ছে, তার একটা উদাহরণ আমি হায়দ্রাবাদে দেখেছি। সেখানে আরবী অক্ষরে লেখাপড়া তো

করিতে হয়ই, তা'ছাড়া আমি কোন কোন হিন্দুকে লালফেজও পরতে দেখেছি।

খ্রীষ্টান এবং মুসলমান সমাজে অন্য ধর্ম্মাবলম্বীকে নিজ ধর্ম্মে দীক্ষিত করা বহুদিন থেকেই প্রচলিত আছে। হিন্দু সমাজে এই প্রথা কয়েক শতাব্দী হতে লুপ্ত হয়ে গিয়াছে। জলপাইগুড়ি প্রভৃতি কয়েকটি জেলায় অলক্ষিতে কত হিন্দু যে মুসলমান হয়ে গিয়েছে এবং এখনও যাচ্ছে নানা কারণে—তাহা যাঁহারা এসম্বন্ধে অনুসন্ধান রাখেন, তাঁহারা ভালভাবেই জানেন। উত্তর এবং পূর্ব্ববঙ্গের অনেক জেলাতেই ইহা ঘটছে। হিন্দু-সমাজ কিছুদিন পূর্ব্বেও এবিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। এখন এই উদাসীনতার সামান্য কিছু হ্রাস হয়েছে মাত্র। আমি একটা উদাহরণ দিব। ১৫।১৬ বছর আগে আমি এই ঘটনাটির সংবাদ পাই। জইপাইগুড়ি জেলায় একজন দরিদ্র হিন্দু চাষী এক স্ত্রী, ৪টী ছেলে এবং ২টী মেয়ে রেখে মারা যায়। ছেলেমেয়েগুলি ছিল অল্পবয়স্ক এবং শিশু। জীবিকানির্ব্বাহের জন্য বিধবাটী এক প্রতিবাসী মুসলমানের বাড়ীতে কাজ করত এবং পরে অভাবের চাপে সেই বাড়ীতেই খেত। ঐ মুসলমানটীর নিজেরও স্ত্রী এবং পুত্রকন্যা ছিল। হিন্দু সমাজ অনায়াসে ধরে নিল যে, ঐ বিধবা এবং তাহার সন্তানগণ সকলেই মুসলমান হয়ে গিয়েছে। অবশেষে সমাজ উহাদের পরিত্যাগ করল। স্ত্রীলোকটীকে পরে ঐ মুসলমানটি নিকা করল এবং ঐরূপে এই পরিবারের সকলেই মুসলমান সমাজের অঙ্গীভূত হল। ছোট বড় সামাজিক অপরাধের জন্যও বহু হিন্দুকে হিন্দুসমাজ থেকে বের করে' দেওয়া হয়। এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত জলপাইগুড়িতে ঘটতে দেখেছি।

হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুদর্শন, হিন্দু সংস্কৃতি আমাদের গর্ব্বের বিষয় হলেও, আমাদের সমাজে একটা অখণ্ড বিরাট্ হিন্দুজাতিগঠনের চেষ্টা কখনও হয়েছে কি না, সন্দেহ। ঋষির কণ্ঠে জাতিগঠনের যে মূলমন্ত্র বৈদিক যুগে উচ্চারিত হয়েছিল, পরবর্ত্তী যুগে সে মন্ত্র আমরা নিশ্চিন্তই ভুলে গিয়েছিলাম। কোন্ অতীত যুগে ঋগ্বেদের ঋষি উদাত্ত কণ্ঠে গেয়েছিলেন—

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম্।
দেবভাগং যথাপূর্ব্বে সঞ্জানানা উপাসতে॥
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাং।
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়েবঃ সমানেন বা হবিষা জুহোমি॥
সমানীব আকুতি সমানা হৃদয়ানি বঃ
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুহাসতি।

তোমরা সংযুক্ত হও, তোমাদের স্তুতি, তোমাদের বাক্য, তোমাদের মন্ত্র, তোমাদের সংকল্প, তোমাদের মন এবং হৃদয় এক হউক। হিন্দু যদি জাতীয় জীবনে এ মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করত, তবে আজ জগতের মাঝে সে হ'ত সব চেয়ে শক্তিমান্ আর সব চেয়ে বরণীয়। মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে জ্ঞান, বিদ্যা এবং সর্ব্ববিধ সাধনায় উৎকর্ষ থাকলেও, সমগ্র জাতির মধ্যে যদি এক প্রবল জাতীয়তাবোধ না থাকে, তবে কোন জাতিই জীবনসংগ্রামে টিকতে পারে না, বড় হতে পারে না। এই "ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে" শুনতে খুব মধুর, কিন্তু এর অপব্যাখ্যা আমাদের অনেক অনিষ্ট করেছে। একটা জাতিকে তুলতে হলে, তাকে শক্তিমান করতে হ'লে, তাকে করতে হবে সঙ্ঘবদ্ধ। তাকে প্রথমেই বিশ্বপ্রেমের বুলি শোনানো নিরর্থক। যেখানে সমাজের গ্লানি উপস্থিত হয়, সেখানেই এক মহা-পুরুষের আবির্ভাব হয়। কার্ল মার্কসের দর্শন মানুষের অনেক কল্যাণ সাধন করছে; কিন্তু ইউরোপের ধনিক-শ্রমিকের সমস্যা এবং ভারতবর্ষের সমস্যা বর্ত্তমানে ঠিক এক নহে। দুনিয়াকা মজদুর, পৃথিবীর সর্ব্বহারাগণ, বুলি (slogan) হিসাবে বেশ মুখরোচক, কিন্তু ভারতের বর্ত্তমান অবস্থানুসারে জাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করবার পক্ষে এগুলি বড় অন্তরায়। বাতাস ঘনীভূত (Compressed) হ'লেই তার মধ্যে প্রচণ্ড শক্তির সঞ্চার হয়। একটা প্রণালী না পেলে জলের প্রবাহ সৃষ্টি হয় না। জলবিন্দু সমস্ত জনপদে ছড়িয়ে না পড়লে সিন্ধু-জাহ্নবীর সৃষ্টি হ'ত না। জলপ্রবাহ যখন নদীপথে ধাবিত হয়, তখনই সে করে দেশকে উর্বর শস্যশ্যামল; তাতেই হয় তার পরম সার্থকতা; পরিশেষে সে পড়ে সমুদ্রে। এই পড়াটাই তার সবটুকু নয়। এই পরিণতির জন্যও তাকে একটা সীমাবদ্ধ খাতের সাহায্য নিতে হয়। জাতিহিসাবে

বাড়্‌তে হলে সমাজ-মানুষের দৃষ্টি প্রথমে তার নিজের জাতির দিকেই দেওয়া আবশ্যক। জাতিগঠনে জাতীয়তার মন্ত্রই একমাত্র সার্থক মন্ত্র। যাদের ভিতর জাতীয়তাবোধ সম্যক্ প্রকাশ এবং পরিণতি লাভ করেনি, তাদের মুখে বিশ্বপ্রেমের বুলি বুলিমাত্র। নিজের জাতির প্রতি যে সম্যক্ কর্ত্তব্য করে নাই, "স্বদেশো ভুবন ত্রয়ং" বলবার পক্ষে সে সম্পূর্ণ অনধিকারী। যে উচ্চগ্রামে পৌছলে মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য থাকে না, সেটা ব্যক্তিগত সাধনার বিষয়। তার সঙ্গে রাজনীতি বা সমাজনীতির কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই। জার্ম্মাণীর প্রবল জাতীয়তাবোধ তাকে বড় করেছে, সংঘবদ্ধ এবং শক্তিমান্ করেছে। ইংরেজের জাতীয়তাবোধ এতই প্রবল যে, পৃথিবীর যেখানেই সে থাকুক না কেন, সে কায়মনোবাক্যে ভাবে এবং কখনও ভোলে না যে সে ইংরেজ। অবস্থাধীন হয়েই সোভিয়েটের বর্ত্তমান কালের প্রত্যেক কার্য্যটী জাতীয়তার ভাবের (nationalism) দ্বারা ভাবিত। পাশ্চাত্য জাতির আন্তর্জাতিকতার বুলি হয় কপটতাপূর্ণ, নয় অর্থশূন্য। তারা যখন internationalism কথা তোলে, তখন মানবজাতি বলতে প্রকৃতপক্ষে শ্বেতকায় জাতিকেই বোঝে। প্রকৃতপক্ষে ইউরোপে কোন জাতিই Internationalism as a practical creed হিসাবে বিশ্বাস যে করে, এ বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে।

সংঘশক্তিঃ কলৌযুগে! পাঞ্জাবের হিন্দুগণের উপর যখন মুসলমান শাসকের নৃশংস অত্যাচার চলছিল, তখন আত্মরক্ষার দায়েই হিন্দুকে সঙ্ঘবদ্ধ হ'তে হয়েছিল। সে সময়ে তারা কোন স্মৃতির ব্যবস্থার জন্য অপেক্ষা করেনি। একটা জলন্ত বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়ে সমাজের সমস্ত কৃত্রিম অন্তরায়গুলি দু'হাতে ছুড়ে ফেলে দিয়ে যখন "জাগিয়া উঠিল শিখ নির্ম্মম নির্ভীক", তখন সেই মুষ্টিমেয় লোকের জলন্ত বীর্য্যের শক্তি হয়েছিল প্রচণ্ড এবং দুর্ব্বার। সংঘশক্তি জয়যুক্ত হ'ল। বৈদিক ঋষির মন্ত্র সাধকের সাধনায় হ'ল প্রাণবান্ এবং সার্থক।

হিন্দুকে বাঁচতে হলে, পুনঃ এই মন্ত্রে দীক্ষিত হতে হবে। সঙ্ঘমন্ত্র সাধনায় যদি কোন অন্তরায় থাকে, সে অন্তরায় আমাদের দূর করতে হবে। এই বৃহৎ স্বার্থের নিকট—এই জীবনমরণ সমস্যার সামনে কোন ত্যাগস্বীকারই বৃহৎ নহে।

বাস্তব জীবনে ঋষিকথিত বাক্য-মন-সমিতি এক হওয়ার পক্ষে আমরা পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছি। ভারতের ধর্ম্ম ও জাতীয়তা এককালে পুষ্টিলাভ করেছিল তার আশ্রমচতুষ্টয়ে এবং তার বর্ণধর্ম্মে—এখন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অস্তিত্ব নাই। বর্ত্তমানে আছে এক তথাকথিত জাতিভেদ। হিন্দুসমাজে জাতিভেদের উৎপত্তি কি, এবং কোন যুগে তার সম্যক্ উপযোগিতা বা সার্থকতা ছিল, এবং জাতিভেদ সামাজিক ব্যবস্থা হিসাবে ভাল কি মন্দ, তাহার আলোচনা বর্ত্তমানে নিরর্থক। এ কথা খুবই সত্য যে, বর্ত্তমানে শাস্ত্রীয় জাতিভেদ নেই অর্থাৎ গুণ বা কর্ম্মবিভাগানুসারে আজ কখনও জাতিনির্ণয় হয় না এবং জাতির নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থাও শাস্ত্র অনুসারে অনুসৃত হয় না। তবুও বর্ত্তমান যুগে জাতিভেদের দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান আমাদের অখণ্ড জাতিসৃষ্টির পক্ষে প্রবল বাধা হচ্ছে। রামচন্দ্রের সহিত গুহকের মিতালী যেখানে ছিল আদর্শ, যার শাস্ত্রের শিক্ষা ছিল, পিতা মহেশ্বর আর মাতা পার্ব্বতী, সেই সমাজে অস্পৃশ্যতা উচ্চনীচভেদ কেমন করে' স্থান পেল, জানি না। যে হিন্দুসমাজে পঞ্চপাণ্ডব সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন, ব্যাস হয়েছিলেন বেদব্যাস, যে সমাজে পঞ্চকন্যা এখনও প্রাতঃস্মরণীয়—মানুষ হিসাবে মানুষের যেখানে ছিল পূর্ণ পরিচয়, যে সমাজের সাধক-কবি সে দিনও গেয়েছিলেন "সবার উপরে মানুষ সত্য", সেই জীবন্ত হিন্দুসমাজ কেমন করে' এত অনুদার, এত সংকীর্ণ হ'ল তা' সত্যই ভাব্‌বার। সজীব প্রাণবান্ সমাজে সর্ব্বশ্রেণীর সর্ব্বস্তরের লোকের স্থান থাকে, তার সার্ব্বাঙ্গীন উন্নতির সুযোগ থাকে। আমাদের সমাজ কোনদিনও অচলায়তন ছিল না। দেশকালের উপযোগী করে' নূতন ব্যবস্থা হত, নূতন অনুশাসন হত। কোন রীতি, কোন কর্ম্মপদ্ধতিই চিরকালের জন্য উপযোগী থাক্‌তে পারে না। কালচক্র অবিরাম ঘুরে চলেছে। সনাতন বিধির দোহাই দিয়ে তার পথরোধ করে' দাঁড়ানো মরণের বুদ্ধি ছাড়া আর কি হতে পারে?

পঙ্গু সমাজেই পদে পদে সনাতন বিধির দোহাই দিয়ে থাকে। জাতিকে খণ্ড খণ্ড করবার কোন বিধানের

স্বপক্ষে যদি কোন অনুষ্টুপ শ্লোক থাকে, তাহা হলে তার কুলীনত্ব বিচার না করে' পরিহার করাই সঙ্গত। কারণ একদা যা' সত্য ছিল, আজ তা' অনুপযোগীও হতে পারে। এরূপ বিধানকে অন্ধভাবে আঁকড়ে ধরা ধ্বংসের পথই পরিষ্কার করে। হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় অলম্বুষ বা ঘটোৎকচের বোধহয় দুর্গতির সীমা থাকত না। তাদের মাতামহের গোত্র বা প্রবর নিয়ে টানাটানি করলে বেচারারা হয়ত সন্তোষজনক উত্তর দিতেই পারত না। পুরাতন হিন্দুসমাজের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল উদার এবং বলিষ্ঠ। বর্ত্তমানে মুসলমান সমাজেও মানুষকে মানুষ হিসাবে মর্য্যাদা দেয়—মানুষ হিসাবে বেড়ে উঠবার কোন বাধা সে সমাজ থেকে পায় না। উত্তর আসামের বহুদূরবর্তী একটী স্থানে এক আপাদমস্তক মুসলমানের পরিচয় আমি পেয়েছিলাম। সে মুস্লিম লীগের একজন উগ্র সভ্য এবং স্থানীয় বহু মুসলমানের নেতা, এমন কি তাঁহার নাকি আসামের প্রধান মন্ত্রীর নিকটেও আনাগোনা আছে। এ সবের মধ্যে কোন অসাধারণত্ব বা কোন বিশিষ্টতা নাই, কিন্তু বিশিষ্টতা আছে তার জন্মপত্রিকার। মৈমনসিংহ বা ঐরূপ কোন স্থান থেকে আমদানী কোন এক মুসলমান তার পিতা এবং স্থানীয় মিকির জাতীয় একটী হিন্দু রমণী তার মাতা। দার্জ্জিলিং জেলায় এবং শিলংএ এরূপ বিবাহের বহু উদাহরণ আছে এবং এইভাবে ঐসব স্থানে এক প্রভাবশালী মুসলমাস সমাজ আজ গড়ে' উঠছে। অনুরূপ অবস্থায় হিন্দুরা বিবাহের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পরাঙ্মুখ—এ যেন কাপুরুষতার এবং লজ্জার কাহিনী। আমাদের সমাজব্যবস্থাই তার জন্য দায়ী। সমাজে চিরকালই পবিত্র এবং সংযমের উচ্চ আদর্শ থাকবে; কিন্তু আদর্শ চিরকালই আদর্শ। সমাজের প্রত্যেকেই সেই আদর্শে পৌছতে পারে না। কিন্তু সে সমাজ প্রকৃত সমাজ নামধেয় হ'তে পারে না, যেখানে সর্ব্বশ্রেণীর লোকের স্থান নাই। জীবনসংগ্রামে আমাদের বেঁচে থাকতে হ'লে, আমাদের প্রাচীন কালের জীবন্ত সমাজের উদার মনোভাব গ্রহণ করতে হ'বে।

জাতিকে বড় হ'তে হ'লে তার জাতীয় আদর্শবাদ, তার ideology জাতির মনের পুরোভাগে স্থাপন করতে হবে ধ্রুব তারার মত। যে সব লোকের ধারণা যে, ভারতবর্ষ শুধু পৃথিবীর লোককে মোহমুদ্গরের শ্লোক শোনাবার জন্য বেঁচে আছে এবং এইটীই তার একমাত্র বাণী, ভারতবর্ষের ধর্ম্মের সঙ্গে তাদের সত্য এবং সম্যক পরিচয় হয়নি। এই সমস্ত উচ্চকথা অধিকার-ভেদে তামসিক অপপ্রয়োগ এনেছে সমাজে। জীবনের পঙ্গুত্ব, জড়ত্ব এবং তামসিক অদৃষ্টবাদ কর্ম্মে অনুৎসাহ সূচনা করে। জাতিকে বাঁচিয়ে রাখে, বড় করে তার রাজসিক ধর্ম্ম; তার সাত্ত্বিক চেতনা তাকে সংযত এবং পবিত্র করে। তবেই মানব সার্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতালাভের অধিকারী হয়। নীট্‌সের অতিমানবের মধ্যে শক্তি আছে, কিন্তু সমন্বয় নাই; তবুও তাতে জীবনের বীজ আছে। বিশুদ্ধ রাজসিক প্রবৃত্তি বিনাশপ্রাপ্ত হ'লে জাতির হয় নিশ্চিত মৃত্যু।

হিন্দুর নিষ্কম্প উজ্জ্বল জীবনপ্রদীপ হচ্ছে তার গীতা। আমরা গীতার ধর্ম্ম থেকে বিচ্যুত হয়েই অধঃপতিত হয়েছি। ফলনিরপেক্ষচিত্তে নিষ্কামভাবে অন্যায়কে প্রতিরোধ করবার অবিচলিত মনোবৃত্তি হচ্ছে গীতার শিক্ষা। "যুদ্ধস্ব" এই যোদ্ধার মনোবৃত্তি মানুষকে বড় করে, অতিমানুষ করে। ক্লৈব্য চিরকালই ঘৃণার্হ, "মরণাদতিরিচ্যতে"। গীতায় ভগবান ক্লৈব্যকে তিরস্কার করেছেন। ব্যবহারিক জীবনে ক্ষমা শুধু সেই করতে পারে, যে শাস্তি দিতে সমর্থ। দীর্ঘদেহ বলবান্ কাবুলীওয়ালার লাঠীর আঘাত সয়ে কঙ্কালসার প্লীহাগ্রস্ত কোনব্যক্তি যদি বলে, হে কাবুলীওয়ালা, আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম—সেটী হ'বে হয় নিছক আত্মপ্রতারণা, নয়তো অবিমিশ্র ন্যাকামী।

আর্ত্তকে রক্ষা করার জন্য, দেশের এবং দশের কল্যাণের জন্য যে যুদ্ধ তা' ধর্ম্মযুদ্ধ। আজ জার্ম্মাণীর পশুবলের নিকট ইংরাজ মস্তক অবনত করে নাই। দেশ আর স্বাধীনতারক্ষার জন্য তারা প্রাণপণ যুদ্ধ করছে। ন্যায়ের জন্য, ধর্ম্মের জন্য মৃত্যুকে তুচ্ছ করে' অকুণ্ঠিত ভাবে যুদ্ধ করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম এবং এতেই তার পরম শ্রেয়ঃ। সে কখনও Oswald Spenglerএর animal of prey ব'লে নিজেকে মনে করবে না। নিম্নস্তরে সাধারণ ভাবে সে শুনবে "হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভক্ষ্যসে

মহীং"; উচ্চাধিকারীর সম্বন্ধে আবার সেই একই ব্যবস্থা, শুধু দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্ন—

সুখে দুঃখে সমেকৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবপাপমবাপ্স্যসি॥

জাতির জীবনে ইহা পরম কথা। এক্ষেত্রে "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" এই উপদেশের স্থান নেই—এ অবস্থায় মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা নীতি প্রযুজ্য কি না, সে বিষয়ে মনে সন্দেহ জাগে। অহিংসা ধর্ম্ম অতি উচ্চাঙ্গের ধর্ম্ম, কিন্তু সে দেশকালপাত্র হিসাবে প্রযুজ্য। জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ করতে গেলে, ইহার অপপ্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী। অধিকারিভেদে অবস্থানুসারে ইহা আচরণীয়। সমাজের সকলেই এক স্তরের লোক নহে। অপরকে আঘাত না ক'রে মৃত্যুবরণ করবার উচ্চ আদর্শ, যীশুখ্রীষ্টের মত অবতার বা মহাত্মা গান্ধীর মত অতি-মানবেরা আচরণ করতে পারেন; কিন্তু সাধারণ লোকে ইহার প্রকৃত মর্ম্ম, ইহার স্বরূপ প্রায়শঃই ধরতে পারে না। তা'রা সহজসাধ্যভাবে অত্যাচারের নিকট মাথা নত করতেই অভ্যস্ত। অহিংস নীতির এই তামসিক অপপ্রয়োগে মানুষ হয় নির্ব্বীর্য্য এবং ক্লীবভাবাপন্ন। ঐ একই কারণে বোধ হয় অত বড় মহান্, অত সুন্দর গৌরাঙ্গের প্রেমধর্ম্ম অধিকারভেদে আচরিত না হওয়ায় সমাজদেহকে দুর্ব্বল করেছে। অধিকন্তু হিন্দুর অপরূপ অপৌরুষেয় তাত্ত্বিক পটভূমিকায়ও এই নিবীর্য্য অহিংসা-বাদের কোন স্থান নেই।

হিন্দুর বর্ত্তমান দুরবস্থা সত্ত্বেও হিন্দুর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার মনে কোন নৈরাশ্য বা সন্দেহ নাই। হিন্দু ধর্ম্ম যদি কোন শিক্ষা দিয়ে থাকে, সে শিক্ষা এই যে, আমরা অমৃতের পুত্র, আমরা মরব না। সত্য ও সুন্দরের কখনও ধ্বংস হ'তে পারে না। যতদিন বেদ-বেদান্ত-ই আছে, ততদিন ভারতবর্ষ টিকে থাকবে। এই ধর্ম্মকে আশ্রয় করে'ই আমরা আবার জেগে উঠব। যদি আমাদের ধর্ম্মে আবার জলন্ত বিশ্বাস ফিরে আসে, যদি ভারতবর্ষের প্রতি ধূলিকণা আমাদের কাছে পবিত্র ব'লে মনে হয়, যদি আমরা অটল বিশ্বাসে দৃঢ়ভাবে বলতে পারি যে, আমাদের বাক্য-মন-সংকল্প এক, আমরা কোন ভেদ স্বীকার করি না, যদি আমাদের লক্ষ্য থাকে ধ্রুব, সাধনা হয় একাগ্র, তাহা হলে সমাজদেহে আমাদের যে জঞ্জাল জুটেছে, ক্ষণিকের মধ্যেই তা' দূরীভূত হ'বে। যে নৈরাশ্য, যে অবসাদ, যে অন্ধকার জাতির মনকে আজ ম্লান করেছে, আচ্ছন্ন করেছে, আদিত্যবর্ণ পরম পুরুষের জ্যোতিঃকণা-স্পর্শে নিমেষে তা' আলোকিত হবে। এ ছাড়া আর কিছু চেয়ে আমরা ছোট হ'ব না। আমরা চাইব, ভারতের পরিপূর্ণ সত্তা স্বপ্রকাশ হোক, ভারত আত্মস্থ ও স্বপ্রতিষ্ঠ হোক।

এই স্বপ্রতিষ্ঠ মহিমান্বিত ভারত হবে জগতের পরম সম্পদ্, তখনই হবে জ্ঞান-কর্ম্ম ভক্তির সমন্বয়, জাতিতে-জাতিতে, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে, ধনিকে-শ্রমিকে, উচ্চ-নীচের মধ্যে সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান, সমস্ত সমস্যার সমাধান। ভারত মুক্তি আনবে শুধু ভারতের জন্য নয়—আনবে জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সমগ্র মানবজাতির জন্য, ত্রিভুবনের জন্য; অতীত কুলকোটী জীবের জন্য। তখন হবে তার সার্থক অঞ্জলি—যে মন্ত্রে সে আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত বিশ্বচরাচরকে তর্পণ করে, সেই হবে তার সিদ্ধ মন্ত্র। 'যো বৈ ভূমা' —তিনিই হবেন তার মন্ত্রের দেবতা। তখনই ভারত পূর্ণ অধিকারে সার্থক ভাবে বলতে পারবে বিশ্ব মানবকে ডেকে:—হে বিশ্ববাসী, অমৃতের পুত্র আমি, জ্যোতির্ম্ময় পরমপুরুষকে জেনেছি—নান্যে সুখমস্তি, নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়।

স্কট্‌ল্যাণ্ডে কয়েকদিন

শ্রীমতিলাল দাশ

মানুষ চায় স্বস্তি। তার জন্য চলে তার স্বস্ত্যয়ন। কিন্তু মানুষের স্বভাবের ব্যতিক্রমও আছে, তাই দুর্গ্রহ তাহাকে স্বৈর করিয়া তোলে। সে চায় না আরাম, সে চায় না বিরাম, সে স্বল্পকে ত্যাগ করিয়া বৃহৎকে সন্ধান করিতে চলে। কয়দিনেই লণ্ডন পরিচিত বন্ধুর মত হইয়া উঠিয়াছিল। যত্র তত্র সেখানে স্বদেশীয়ের দেখা মিলে। তাই বিচিত্রের আবাহন আসে। স্কট্‌ল্যাণ্ড-ভ্রমণে সত্যই একদিন বাহির হইয়া পড়িলাম।

স্কট্‌ল্যাণ্ড এবং ইংলণ্ডের মধ্যে ঐতিহ্যের ও নৈসর্গিক ভেদ আছে। স্কট্‌ল্যাণ্ড পর্ব্বতসঙ্কুল উচ্চ দেশ। কবির ভাষায়ঃ

Land of brown heath and shaggy wood ;
Land of the mountain and the flood.

স্কট্‌ল্যাণ্ডের স্বাভাবিক দু'টি ভাগ—হাইল্যাণ্ডস্‌ এবং লো ল্যাণ্ডস্‌। ইহার নিম্নভূমির সহিত ইংলণ্ডের কিছু সাদৃশ্য আছে। আমাদের দেশে শৈশবে জননীরা শিশুকে চাঁদ দেখান আর বলেন—চাঁদের মা বুড়ী বসিয়া বসিয়া চড়কায় সুতা কাটিতেছে। ইহা চাঁদের কবিত্বময় বর্ণনা। স্কচেরা তাহাদের দেশকে এমনই একটা তুলনায় রূপ দেয়। তাহারা বলে স্কট্‌ল্যাণ্ড যেন বুড়ী—তাহার পিঠে কুঁজ, সে যেন মাটীতে বসিয়া হাত দুটি বাড়াইয়া আগুনে হাত গরম করিতেছে। যাঁহারা কল্পনাপ্রিয়, তাঁহারা স্কট্‌ল্যাণ্ডের আকারের সঙ্গে ইহা মিলাইয়া দেখিবেন।

আচারে, ব্যবহারে এবং চরিত্রেও স্কচেরা ইংরেজদের হইতে পৃথক্‌। ইংরেজদের মুখে যে লাবণ্যললিত সুষমা আছে, স্কচদের তাহা নাই। তাহারা তাহাদের দেশের মতই রুক্ষদর্শন। সাবধানী, কষ্টসহিষ্ণু, ক্ষুরধার বুদ্ধি স্কচ অল্পে দমিয়া পড়ে না, সে ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া আশাতুর চিত্তে কাজ করিতে পারে। তাই পৃথিবীর নানা দেশে সে সৌভাগ্যের অন্বেষণে বাহির হইয়া পড়িতে পারিয়াছে। অতীতকে শ্রদ্ধা করে বলিয়াই স্কচ জাতির অভিমান প্রখর। সঙ্গীত ও কাব্য তাহার প্রিয়, রসিকতাকে সে ভালবাসে; কিন্তু সে মূলতঃ ধর্ম্মপরায়ণ এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠ। তাই তাহার বহিঃপ্রকৃতিতে একটা বিরস গাম্ভীর্য্য আছে।

সোমবার প্রাতরাশ শেষ করিয়া ইউষ্টন ষ্টেশনে স্যুট্‌কেস হাতে বাহির হইলাম। Flying Scotsman—দ্রুতগামী এক্সপ্রেস। সঙ্গে পড়িবার জন্য একখানি কাগজ কিনিলাম। গাড়ীতে একটি ইজিপ্ট-ফেরত বুড়ীর সহিত আলাপ হইল। বুড়ী ইংরেজ, বিবাহ করিয়াছে স্কচ্‌ম্যানকে, ইজিপ্তে ব্যবসায় উপলক্ষে থাকে। হাতে পাথর-বসান তিন চারিটি আংটি। বুড়ীর সঙ্গে নানাবিধ আলাপ হইল।

চলিতেছি—চোখে পড়ে নিসর্গের ধাবমান ছবি—শ্যামতৃণাবৃত বনভূমি, গুল্মবিরল বনস্পতির কানন—পাহাড়, উচ্চ ও নীচ ভূমি—এই নিসর্গ-ছবির সর্ব্বত্রই যেন কেমন সুষীমতা। ইহার সহিত আমাদের প্রাকৃতিক শোভার তুলনা হয় না। বাংলাদেশের সতেজ মৃত্তিকা পড়িয়া থাকিলেই আগাছা জন্মায়, মানুষ কর্ম্মোদ্যমহীন, তাই আমাদের বনশ্রী যেন সুসঙ্গতিহীন।

এই দীর্ঘ রেলপথভ্রমণে কেবল বুড়ীর সঙ্গে আলাপ হইল। অপর কেহ আলাপ করিল না—কেহ শব্দ করিল না—কেহ হৈ-চৈ করিল না, সমস্তই যেন নীরবে চলিতে লাগিল। আমাদের রেলগাড়ীতে চলিতে চলিতে এতখানি নিঃশব্দতা আমরা হজম করিতে পারি না। আমাদের সঙ্গের শিশুরা ক্রন্দনে আসর গরম করে, যুবকেরা হল্লা করে, বুড়ারা গল্প করে। তাহা ছাড়া হরেক রকম পণ্যবিক্রেতার সরু মিহি নানা সুরের আবেদন কর্ণকুহরে বিরাম দেয় না। তারপর প্রতি ষ্টেশনে আসিলে শুনি বিকট হৈ-চৈ—অফুরন্ত জনকোলাহল—কারণ ও অকারণের শব্দ-সমবায়।

ইহারা যেন নীরবতাকে ভালবাসে, ইহাদের ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে অনর্থক হুড়াহুড়ি পড়ে না—সমস্তই যেন নীরবে সম্পন্ন হয়। বুড়ী সহানুভূতির সঙ্গে প্রশ্ন করিল—"তুমি নিশ্চয়ই গৃহ-পীড়া অনুভব করছ?" বুড়ার মুখে

সরল হাস্য, চোখে চতুরতার দীপ্ত লীলা। অস্বীকার করিতে পারি না, বলি "তা' করছি বই কি, অর্থ নাই, তাই প্রিয়জনদের পিছনে ফেলে একাই চলতে হচ্ছে—।" বুড়ী বলিল—"ভারতবর্ষকে আমি শ্রদ্ধা করি, একবার যাব তোমাদের দেশ দেখতে"। আমি বলিলাম—"যাবেন, কিন্তু আমার ভয় হয়, আপনি ভারতবর্ষকে দেখতে পাবেন না—"

বুড়ী জিজ্ঞাসা করিল—"কেন ?" বলিলাম "থাকবেন য়ুরোপীয় হোটেলে, মিশবেন তাদের সঙ্গে, কাজেই দেখবেন ভারতবর্ষের ধ্বংসাবশেষের রূপ—ভারতবর্ষের যে সভ্যতা তার অনন্ত বৈচিত্র্য নিয়ে লোকালয়ে প্রতিফলিত, তার সংস্পর্শে আসতে পারবেন না—" বুড়ী বলিল—"তা সত্যি, কিন্তু উপায় কি ?"

বিদেশে বারংবার এই কথাই আমায় বেদনা দিয়াছে। বিদেশী বহু পরিচিত বন্ধু এবং অপরিচিত বন্ধু ভারতবর্ষের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাইয়াছেন—ভারতবর্ষকে দেখিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সাদর আমন্ত্রণ করিলেও একথা মনকে পীড়া দিয়াছে যে, বিদেশীকে আশ্রয় দিবার, যত্ন করিবার আমাদের কোনও আয়োজন নাই, কোনও প্রতিষ্ঠান নাই।

সংস্কৃতিগত প্রতিষ্ঠান গড়ুক বা না গড়ুক, ব্যবসায়গত অনুষ্ঠানের একান্ত প্রয়োজন। বিদেশী ধনকুবেরগণ যখন এদেশে আসেন, তখন তাঁহারা যে অর্থ ব্যয় করেন, তাহার অধিকাংশ আমাদের হাতে আসিতে পারে। বিদেশীদের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় ও আলাপে আমরা অর্থের দিক্ দিয়া, সামাজিক সৌহৃদ্যের দিক্ দিয়া লাভবান্ হইতে পারি। আজিকার বেকার সমস্যার দিনে যদি উৎসাহী যুবকগণ মিলিয়া দেশনেতৃগণের সহায়তায় একটী ভ্রমণ-প্রতিষ্ঠান গড়েন, তাহা হইলে দেশের একটী সত্যকার কল্যাণ হয়। টমাস কুকের যেমন জগৎ-জোড়া ব্যবসায়, পৃথিবীর বৃহত্তম সহরে সহরে তাহার কেন্দ্র, তেমনই এই বন্ধুবান্ধবপ্রতিষ্ঠানের শাখা নগরে নগরে স্থাপিত করিতে হইবে। চাকুরির ক্ষেত্র দিনে দিনে সংকীর্ণ হইতেছে—বুদ্ধিমান্ ও উৎসাহী যুবকেরা সামান্য বেতনের আশায় দ্বারে দ্বারে ধর্ণা দিতেছে—উদ্বৃত্ত অর্থপ্রয়োগের ক্ষেত্র কমিতেছে, কাজেই নূতন নূতন ব্যবসায় গড়িয়া না তুলিতে পারিলে দেশবাসীর আর্থিক দুরবস্থা কমিবে না।

লণ্ডন হইতে স্কট্ল্যাণ্ড পৌছিবার তিনটি পথ আছে—এল, এন, ই আর ইংলণ্ডের পূর্ব্ব উপকূল বাহিয়া গিয়াছে, এল, এম, এস লাইন মধ্যভাগ দিয়া ও পশ্চিম উপকূল দিয়া গিয়াছে। এই লাইনগুলির সহযোগিতার ফলে যে কোন পথ দিয়া গিয়া যে কোনও পথ দিয়া ফেরা যায়। আমি এল, এম, এস লাইন দিয়া গিয়াছিলাম। সাড়ে পাঁচটায় এডিনবরা পৌছিলাম।

অপরিচিত নগর, বন্ধুহীন পুরী। আশ্রয় কোথায় মিলিবে, তাহার ভাবনাই ব্যাকুল করিয়া তুলিল। এখানকার Y. M. C. A. পরিচালিত হোটেলে ভারতীয় ছাত্রদের আড্ডা—তাহার ঠিকানা আনিয়াছিলাম। তাহারই সন্ধানেই চলিলাম। গাড়ীতে বা ষ্টেশনে একজন বলিল—স্থানটি বেশী দূর নয়। কাজেই ট্রামে বা বাসে না উঠিয়া, স্যুটকেস বহন করিয়া চলিলাম। অনেকটা দূর, বিশেষ কষ্টই হইল। দরজা বন্ধ—অনেক ডাকাডাকিতে দরজা খুলিল—কিন্তু পরিচালিকা মিস্ টমসন না থাকায়, সত্বর কোনও ব্যবস্থা হইল না।

কয়েকটী ভারতীয় ছাত্র বিলিয়ার্ড খেলিতেছিল, তাহাদিগের মধ্যে 'হংসো মধ্যে বকো যথা' নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহারা বিশেষ সাদর সম্ভাষণ করিল না। গরজ বড় বালাই, আমিই অগ্রসর হইয়া প্রশ্ন করিয়া অনেক কিছু জানিয়া লইলাম। বহু পরে জানিলাম, একটী ছেলের ঘরে আমার স্থান হইয়াছে! সেখানে গিয়া সমস্ত জিনিষপত্র গুছাইয়া নীচে নামিলাম। আহারাদি শেষ করিয়া সিনক্লেয়ার দম্পতীর সহিত আলাপ করিতে গেলাম। মিঃ সিনক্লেয়ার স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। এম-এ ক্লাসে তাঁহার দান্তে অধ্যাপনা শুনিতে গিয়াছিলাম। বন্ধুবর ভূপেন তাঁহার নিকট চিঠি দিয়াছিল। আমি যখন গেলাম, দম্পতী সান্ধ্য আহার-শেষে তাঁহাদের বসিবার ঘরে ছিলেন। অধ্যাপক পড়িতেছিলেন এবং অধ্যাপকপত্নী সেলাই করিতেছিলেন। দুই ঘণ্টা ধরিয়া আলাপ চলিল।

প্রথমে ভূপেনের কুশল-সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন।

পরে আমি কেন বিলাত আসিয়াছি, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম—"আমি তীর্থযাত্রী—আমার চিত্ত বিক্ষিপ্ত—নানা শাস্ত্র পড়েছি কিন্তু সত্যের সন্ধান পাইনি—ভারতীয় আধ্যাত্মিকতাকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু সে আধ্যাত্মিকতা যখন ভারতকে মুক্তি দেয়নি, তখন নিশ্চয়ই তার কোথাও ত্রুটি আছে—তাই এসেছি বীর্য্যবান্ শক্তিমান্ য়ুরোপের কাছে, যদি এখানে প্রাণের মন্ত্র পাই।" উভয়ে হাসিলেন, বলিলেন—"সত্যকে কি এত সহজে পাওয়া যায়?" তাহা ঠিক। দেশে দেশে, কালে কালে নানা পন্থা মানুষ আবিষ্কার করিয়াছে। কিন্তু কিছুতেই মানুষ তৃপ্ত নহে।

বিজ্ঞান বিপুল সাধনা করিয়াছে, তাহার ফলে জীবন-যাত্রার চারিদিকে নবতর সৌন্দর্য্য ও শ্রী ফিরিতেছে, কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে মানুষের অগ্রগতি হইতেছে না। দেশে দেশে যন্ত্রের ব্যবধান কমিতেছে, কিন্তু হৃদয়ের আড়াল ভাঙ্গিতেছে না। আমরা যে অচলায়তন রচনা করিয়া আছি, তাহার সমস্ত দ্বার নিরুদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিয়াছি।" আমি স্বচ্ছ হৃদয়ের ও মনীষার পরিচয় জানিতে চাই শুনিয়া অধ্যাপক বলিলেন—"এখন ত সবাই ভ্রমণে গেছে; আর তা' ছাড়া আমি ত একরকম ভারতবাসী, তবে আমার উকিল মিঃ ক্লার্কের সঙ্গে তোমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেব, তা' হলে তুমি আমাদের আইন সম্বন্ধে অনেকটা জ্ঞান লাভ করতে পারবে।"

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া রাত্রি দশটায় বাসায় ফিরিলাম।

(ক্রমশঃ)

আলোচনা

বাঙ্গালার তথা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে "ব্যাস ও পরাশর ব্রাহ্মণ"

[শাণ্ডিল্য শ্রীনীরদবরণ মিশ্র চক্রবর্ত্তী, গৌড়]

(২)

ইহার পূর্ব্ব প্রবন্ধে উত্তর ও পূর্ব্ব বাঙ্গালা এবং আসাম প্রদেশে আদ্য-গৌড়ের শাখা পরাশর ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কতক প্রমাণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে পশ্চিম, মধ্য ও দক্ষিণ বাঙ্গলার আদ্যগৌড়ের শাখা ব্যাস ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আরও কতকগুলি প্রমাণ প্রদত্ত হইতেছে।

হাওড়া জেলার আমতা থানার অন্তঃপাতী ঝিকুরা গ্রামে নকুলচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বাটীতে আবিষ্কৃত ১৭১৫ শকাব্দের (১২০০ সাল) "গউড়িয় ব্যাস ব্রাহ্মণের গোত্র নির্ণয়" নামক তুলট কাগজে হাওড়া, হুগলী, পূর্ব্বার্দ্ধ বর্দ্ধমান ও নদীয়া জেলার ১২টী গোত্রের ও বাসস্থানের নাম লিখিত আছে। এই পত্রে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় গৌড়ীয় ব্যাস ব্রাহ্মণগণের আদিবাস (পাঞ্জাবের গুড়্গাঁও জেলার) "হোদল-মান্‌ছিরি" (মান্‌শ্রী বা ঝিরুকা মাস্‌লি), তৎপরবর্ত্তী বসবাস "কাটোয়ার নিকট মেটিলী গ্রাম" (নদীয়া জেলা) এবং হালি (৪০০ শত বৎসরের) বসবাস (হাওড়া জেলার) "ঝিকুরা" লিখিত আছে।[১৩] বঙ্গাব্দ ১২৪৯ সালে ঝিখিরার "সরখেল" পদবীধারী রাঢ়ী ব্রাহ্মণগণের সহিত জাইগীরদার দুর্ব্বার খাঁ রায়-চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত জয়চণ্ডী দেবীর সেবার মালিকত্বরূপে দখল ও নৈবেদ্যাদি গ্রহণ লইয়া তৎবংশীয়গণের যে দেওয়ানী মোকর্দ্দমা (নং ৭২।১৮৪১) হুগলী কোর্টে হইয়াছিল, তাহার ১৮৪২, ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখের রায়ে (ফয়শালায়) সদর আমীন ভৈরবচন্দ্র বসু মহাশয় লিখিয়া গিয়াছেন:—"আসামীগণ রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আর ফরিয়াদি পুরোহিতগণ ব্যাস শ্রেণীর ব্রাহ্মণ।"[১৪] ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে হুগলী জেলার খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত বেড়াবাড়ী গ্রামে চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কারের কন্যা দ্রবময়ী দেবী পিতার ছাত্রগণকে শাস্ত্রাধ্যাপনা করিতেন। চণ্ডীচরণ "ব্যাস" (ব্যাসোক্ত) ব্রাহ্মণ ছিলেন।[১৫]

শতাব্দীতে মেদিনীপুর জেলার কুতুবপুর পরগণার গড় নিশ্চিন্দপুরের (জালবাঁদী) জমিদার গোবর্দ্ধনচন্দ্র সিংহচৌধুরী ধর্ম্ম-কর্ম্মের শাস্ত্রসঙ্গত বিধি-ব্যবস্থা প্রদানের জন্য ১১৬৮ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠ শুকদেব তর্কভূষণ ভট্টাচার্য্য নামক "ব্যাস-বৈদিক" ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মোত্তর সনন্দ (নং ৪৮) দান করেন।[১৬] তমলুক পরগণার গোপালপুরের "সিংহ"-জমিদারগণের ষ্টেটের জেনারল ম্যানেজার বাবটু হাব্‌বী সাহেব ১২৮১ সালের ১১ই চৈত্র শিবনারায়ণ ভট্টাচার্য্য নামক "ব্যাস-বৈদিক" ব্রাহ্মণকে ব্যবস্থা প্রদানী সনন্দ দান করেন। এই সনন্দে আরও লিখিত আছে যে ১১৫১ সাল হইতে পর পর রাজদত্তা সনন্দ ক্রমে 'ব্যাস-বৈদিক" শ্রেণী ব্রাহ্মণই এতাবৎকাল পর্য্যন্ত নিযুক্ত থাকিয়া

(১৩) পত্রের প্রতিলিপি, গৌড়প্রভা, ১৩৩২, চৈত্র, পৃষ্ঠা—৪২।

(১৪) প্রতিলিপি, গৌড়প্রভা, ১৩৩৬, বৈশাখ, পৃষ্ঠা—৬০।

(১৫) সম্বাদ-ভাস্কর, ১৮৫১, ১৯এ এপ্রিল; প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৩৮, পৃষ্ঠা—৬৫৪।

(১৬) প্রতিলিপি, গৌড়প্রভা, ১৩৩৩, ভাদ্র।

প্রজাবর্গের শাস্ত্রোক্ত মতে বিধি ব্যবস্থা প্রদান করিয়া আসিতেছেন।১৭ ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে ময়নার রাজা গোবর্দ্ধনানন্দ বাহুবলীন্দ্রের পুনঃ রাজ্যাভিষেক কালে উৎকল হইতে পঞ্চ গোত্রীয় পাঁচটি ব্রাহ্মণ এবং ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে কাশীজোড়া পরগণার ক্ষত্রিয়রাজ যামিনী ভানু রায় ভুঞা আমুখণ্ডী-দীঘি প্রতিষ্ঠা কালে উৎকলের যাজপুর হইতে দুই সপুত্রক ব্রাহ্মণকে আনয়ন করেন। উক্ত ব্রাহ্মণগণ ও তদ্বংশীয়গণ মেদিনীপুরের "গৌড়াদ্য ব্যাস" ব্রাহ্মণগণের সহিত মিশিয়া "ব্যাস-বৈদিক" আখ্যা প্রাপ্ত হন। ১৬শ শতাব্দীর গদাধর ভট্টের কুলগ্রন্থে উক্ত দুইটী বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। তাহাতে "গৌড়াদ্যৈ", "ব্যাস-বৈদিকা", (২০৮ শ্লোক), "গৌড়াদ্যকুলমধ্যতঃ" (২১৫), গৌড়ীয়ানাং ব্যাস দ্বিজানাং" (২২১), "ব্যাসাখ্যাং" (২৩৫), "গৌড়াদ্যৈ", "ব্যাসাখ্যাং" (২৬৪) শব্দগুলির প্রয়োগ আছে।১৮ মহিষাদলের কনোজ ব্রাহ্মণবংশীয়া রাণী জানকী দেবী ১১৮২ সালের ৯ই শ্রাবণ অভিরাম বিদ্যালঙ্কার মিশ্র অধিকারী নামক "গৌড় বৈদিক" শ্রেণীর ব্রাহ্মণকে চারিবিঘা জমি ব্রহ্মোত্তর দান করেন। এই বংশীয় রাজা রামনাথ গর্গ বাহাদুর ১২৪৮ সালের ১৬ই মাঘ নারায়ণ তর্কচূড়ামনি নামক "গৌড়াদ্য-বৈদিক" শ্রেণীর ব্রাহ্মণকে ভট্টাচার্য্যগিরি-ব্যবস্থা প্রদানী সনন্দ (নং ২৮) প্রদান করেন।১৯

উত্তর ও পূর্ব্ব বাঙ্গলার ও আসামের "পরাশর" এবং পশ্চিম, মধ্য ও দক্ষিণ বাঙ্গলার "ব্যাস" ব্রাহ্মণগণ স্কন্দপুরাণের সহ্যাদ্রিখণ্ডে উল্লিখিত পঞ্চগৌড় ব্রাহ্মণের মধ্যবর্ত্তী "গৌড় বা আদিগৌড়" ব্রাহ্মণের দুইটি শাখা মাত্র। মধ্যবঙ্গে ইহারা শুধু "গৌড় ব্রাহ্মণ নামেই খ্যাত আছেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে সেরিং সাহেব "হিন্দুজাতি ও সম্প্রদায়" গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে দিল্লীর চতুষ্পার্শ্বস্থ ও বাঙ্গালার বিশেষতঃ মধ্যবর্ত্তী জেলাগুলির গৌড় ব্রাহ্মণের উল্লেখ করিয়াছেন।২০ ইবেট্‌সন্ সাহেবও স্বীয় গ্রন্থে পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ ও বাঙ্গলার গৌড় ব্রাহ্মণগণের উল্লেখ করিয়াছেন।২১ দিল্লীর চতুষ্পার্শ্বস্থ এবং যুক্ত-প্রদেশের পশ্চিমার্দ্ধের অনেক গৌড় ব্রাহ্মণ রাজা জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞে বাঙ্গালাদেশ হইতে নিমন্ত্রিত হইয়া তদ্দেশবাসী হইয়াছেন বলিয়া স্বীকার করেন।২২ পাঞ্জাবের শিরমুর রাজ্যের রাজধানী "নাহান" নিবাসী রাজগুরু ও রাজ-পুরোহিতবংশীয় পণ্ডিত রাঘবানন্দ গৌতম "দিল্লিস্থ অখিল-ভারতবর্ষীয় গৌড় ব্রাহ্মণ মহাসভার" কার্য্যকরী সভার জনৈক সদস্য। তিনি ১৯৩৮ সালের ১লা ফেব্রুয়ারীর পত্রে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণ বাঙ্গলা দেশের যশোহর জেলা হইতে প্রথমতঃ রাজপুতানার জৈশলমীর রাজ্যে, তথা হইতে নাহান রাজ্যে গমন করিয়াছেন।২৩ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন—"সপ্তশতী প্রভৃতি এখানকার আদি ব্রাহ্মণগণই প্রাচীনতম গৌড়-ব্রাহ্মণ সন্তান বলিয়া অনুমিত হয়।" কিন্তু তিনি সপ্তশতীগণকে "সারস্বত ব্রাহ্মণ" বলায়, সপ্তশতীগণ গৌড় ব্রাহ্মণ নহেন, প্রমাণিত হইয়াছে।২৪ সুতরাং "প্রভৃতি এখানকার আদি ব্রাহ্মণগণই প্রাচীনতম গৌড়ব্রাহ্মণ সন্তান।" এখানে "প্রভৃতি" শব্দে "ব্যাস" ও "পরাশর" ব্রাহ্মণকে বুঝাইতেছে। অতএব ব্যাস ও পরাশরগণ আদি-গৌড় ব্রাহ্মণ। গুধাতু+ডক্ প্রত্যয়ে গুড় শব্দ উৎপন্ন, গুড়+ষ্ণ্য=গৌড়, আবার গুড় ধাতু+ক প্রত্যয়ে গুড় শব্দ উৎপন্ন, গুড়+ষ্ণ্য=গৌড়। প্রথমটির অর্থ ঐক্ষব (মিষ্ট বিশেষ), আর দ্বিতীয়টির অর্থ রক্ষক বা যোদ্ধা। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র "মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিতে" ব্রাহ্মণ মুচিরামের "গুড়" শব্দের অর্থ "মিষ্ট বিশেষ নহে" বলায় ইহার অর্থ "ধর্ম্মরক্ষক" বা "ধর্ম্ম যোদ্ধা" ব্রাহ্মণ হইয়াছে। মুচিরামও গৌড় ব্রাহ্মণ।

বাঙ্গলা, আসাম ও বিহারের রাজা ও মহারাজ প্রদত্ত দেবোত্তর-ব্রহ্মোত্তর ভোগ

বাঙ্গলা ও আসামের ব্যাস ও পরাশর বা গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণগণ জমিদার, রাজা ও মহারাজগণের প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর মন্দিরের সেবাইত ও পূজারী আছেন এবং তাঁহাদের প্রদত্ত দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর ভূমি ভোগ করিতেছেন। ব্যাস ও পরাশর ব্রাহ্মণগণ পশ্চিম বঙ্গের হুগলী জেলার ৺তারকেশ্বরের মঠের অধীন সন্তোষপুরের ৺বিশালাক্ষী ও ৺দশভূজা দেবীর, ঐ জেলার গুড়িয়া গ্রামে বর্দ্ধমানাধিপতির ৺বিশালাক্ষীর, হাওড়া জেলার রসপুর গ্রামে কায়স্থ জমিদারগণের ৺গড়চণ্ডী দেবীর, মেদিনীপুর জেলার কাশীজোড়া পরগণায় ক্ষত্রিয় রাজগণের ৺সিদ্ধেশ্বরীর, এই রাজগণের বাটীতে ৺মদনগোপাল জীউর, ঐ বংশীয় জিতেন্দ্র নারায়ণ বাহাদুরের ৺গোবর্দ্ধনধারীর, যশোহর জেলার রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ মহারাজ মুকুটরাম রায় চৌধুরীর বালিয়াডাঙ্গা গ্রামে ৺কালী মন্দিরের (এই মন্দির এক্ষণে নড়াইলের জমিদারীর অধিকার ভুক্ত), নলডাঙ্গার রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ মহারাজ মহেশচন্দ্র দেও রায়ের গল্লার গ্রামে ৺কালী মন্দিরের, রংপুর জেলার ব্রাহ্মণডাঙ্গার রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ জমিদারগণের ৺কালীমাতার, রাজসাহী জেলার সতীরহাট গ্রামে বলিহারের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ মহারাজগণের ৺সিদ্ধেশ্বরীর সেবাইত ও পূজারী আছেন। নাটোরের রাণী ভবানী, সত্যবতী, রাজা রামজীবন, বলিহারের মহারাজ কৃষ্ণেন্দ্র রায়, ব্রাহ্মণডাঙ্গার রায়চৌধুরী জমিদারগণ, নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, ক্ষিতীশচন্দ্র, শিবচন্দ্র, যশোহরের রাজা সীতারাম রায়, মুকুটচন্দ্র রায় চৌধুরী, নড়াইলের জমিদারগণ, নলডাঙ্গার মহারাজ মহেশচন্দ্র দেওরায়, ২৪ পরগণা মুড়াগাছার জমিদার কেশবচন্দ্র রায় চৌধুরী, মেদিনীপুরের মহিষাদল রাজ রামনাথ গর্গ ও রাণী জানকী দেবী, হাওড়া জেলার গড়ভবানীপুরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়, মেদিনীপুর কাশীজোড়ার ক্ষত্রিয়রাজ হরিনারায়ণ দেব বর্ম্মা, জিতেন্দ্র নারায়ণ, বর্দ্ধমানাধিপতি কীর্ত্তিচন্দ্র রায়, মানভূম জেলার কাশীপুরের ক্ষত্রিয় রাজগণ প্রভৃতি এই ব্যাস-পরাশর বা গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণগণকে ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তর প্রদান করিয়াছেন। এইরূপে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের এবং আসামের রাজা, মহারাজ ও জমিদারগণও ব্রহ্মোত্তর দান করিয়াছেন। প্রয়োজন হইলে ঐ ভূমির তায়দাদ নম্বর ও শাসন প্রাপ্ত ব্রাহ্মণগণের নাম ধাম দেওয়া হইবে। এইরূপ বহুল ঘটনা দ্বারা গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণগণের অস্তিত্ব ও ব্রাহ্মণ্য-তেজের অলন্ত প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে।২৫

(১৭) প্রতিলিপি গৌড়প্রভা, ১৩৩৩, ভাদ্র।

(১৮) গদাধর ভট্টের কুলাজী, প্রকাশচন্দ্র সরকার প্রণীত মাহিষ্য প্রকাশ, ১৯১১, পৃঃ ২১৯—২৩১।

(১৯) ফটো ও প্রতিলিপি, গৌড় ব্রাহ্মবাণী, ১৩৩৬, আশ্বিন, পৃঃ ৩৭—৪০, Plates Nos. I & II.

(২০) M. A. Sherrings' Hindu Tribes and Sects, 1881. Vol. II, P.

(২১) Ebetson's Out-lines of Panjab Ethnography.

(২২) Census Report of N. W. P. 1865

(২৩) গৌড়প্রভা, ১৩৪৪, কার্ত্তিক, পৃঃ ১২৪।

(২৪) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণ কাণ্ড, ১ মাংশ, মুখবন্ধ—।/০ পৃষ্ঠা ও ৭৫ পৃষ্ঠা এবং রাজন্য কাণ্ড ১০৮ পৃষ্ঠা।

(২৫) জাতিবিজয়, ১৩শ অধ্যায়, ১৫৯—১৭০ পৃঃ।

সন্তরণে আমার অভিজ্ঞতা

বোস (ঘোষ)

শৈশবের সীমা ছাড়িয়ে সবেমাত্র কৈশোরে পদার্পণ করেছি। কুমারটুলি ভাগীরথী তীরে আমাদের বাসা। প্রত্যহ গঙ্গায় বাবার (শ্রীযুত দেবেশচন্দ্র ঘোষ) সঙ্গে সাঁতার কাটতাম। বাবা আমায় সাঁতার শেখাতেন। সে কি আনন্দ আর কৌতুক! এখনও সে স্মৃতি সুস্পষ্ট। কিন্তু বাবার অভিপ্রায় তখনও বুঝিনি।

পরবর্ত্তী কালে সৌভাগ্যক্রমে সন্তরণবীর প্রফুল্ল ঘোষ হলেন আমার শিক্ষাগুরু। বাবা ছিলেন পুরোপুরি স্বদেশী। বাঙালী প্রীতিতে তাঁর ছিল অন্তর ভরা। সন্তরণক্ষেত্রে যাতে আমি বাঙালীর মুখোজ্জ্বল করতে পারি, সে বিষয়ে তিনি আমায় সর্ব্বদা উৎসাহ দিতেন। ফলে বয়োবৃদ্ধির সহিত আমার ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব উপচিয়ে এই বৃহত্তর স্বপ্ন আমায় পেয়ে বসলো।

শ্রীবাণী বোস (ঘোষ)

বাঙালী-মেয়েকে শক্তি-সামর্থ্য সব দিক্ দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে হবে। সাঁতার, লাঠী-খেলা, তলোয়ার ও ছোরা-খেলা প্রভৃতি বহু রকম শরীরচর্চ্চায় কৃতিত্বও অর্জ্জন করলাম। জীবনের এই স্বল্প পরিসরে কত বিভিন্ন স্থানে, কত প্রতিযোগিতায় যে যোগ দিয়েছি, তার ঠিক নাই। ১৯৩৬ সালে নিখিল ভারত সন্তরণপ্রতিযোগিতায় মেয়েদের মধ্যে আমি তিনটি বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (Triple All India Olympic championship) সম্মান লাভ করলাম।

বাবার ইচ্ছা—আমি ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে মেয়েদের মধ্যে পৃথিবীর রেকর্ড স্থাপন করি। এতে বিশ্ব-নারীর আসরে বাঙালী অবলার মর্য্যাদা ও সম্মান বাড়বে। আমিও খুবই উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। স্থির হল, এর পূর্ব্বে আরব সাগরের এ্যালিফ্যাণ্ট রক (Elephant Rock) হ'তে গেট অব ইণ্ডিয়া (Gate of India) এই ১৩।১৪ মাইল লবণাক্ত সমুদ্রে সাঁতার কেটে আগে ভয়টা ভেঙ্গে নেওয়ার দরকার। অবশ্য পূর্ব্বপ্রস্তুতি হিসাবেও এর প্রয়োজন ছিল।

১৩ই সেপ্টেম্বর (১৯৩৬ সাল) অমৃত-বাজার পত্রিকায় এ উদ্যোগ - অভিপ্রায়ের সংবাদ বের হ'ল। ২০শে অক্টোবর আমরা কলিকাতা হতে রওনা হলাম। সঙ্গে বাবা ও সন্তরণগুরু প্রফুল্ল ঘোষ। পথিমধ্যে শুনলাম, উত্তাল তরঙ্গ আর ঝটিকাবিক্ষুব্ধ আরব সাগরে এখন সাঁতার দেওয়া বিপজ্জনক। আমি সাহস করলেও, বাবার স্নেহ-প্রবণ মন সায় দিলে না। মাসখানেক আরও অন্ততঃ অপেক্ষা করার প্রয়োজন। কথা হল, দিন কয়েক সমুদ্রের জলে সাঁতার কেটে সইয়ে নেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে। বোম্বে তখন দাঙ্গা-হাঙ্গামা পুরোদমে চলেছে বলে' আমরা পুরীতে এসে আস্তানা গাড়লাম।
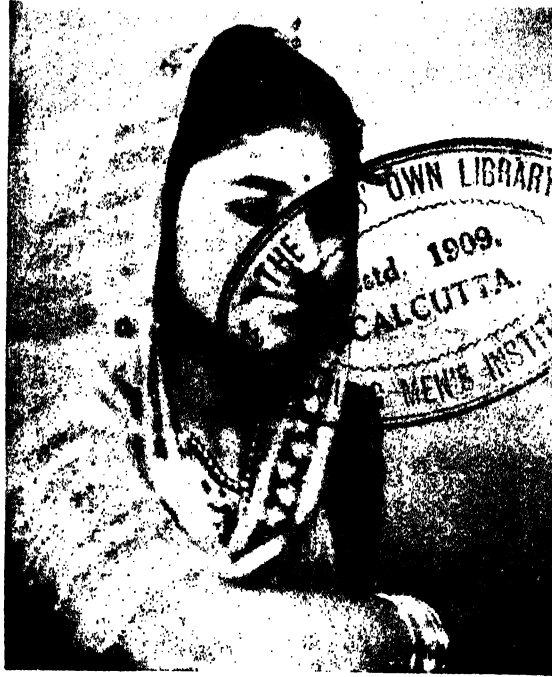
পুরীতে বেশ আছি। দু'বেলা সাঁতার কাটা আর মনের আনন্দে যথেচ্ছা বেড়ানো। ৪।৫ দিন পরেই পুরীর রাজার আহ্বান এল। বাবার সঙ্গে রাজপ্রাসাদে গেলাম। রাজার আদর, আপ্যায়ন ও অমায়িকতায় মুগ্ধ হলাম। তিনি প্রস্তাব করলেন—আমাকে একদিন 'শো' (show)

দিতে হবে। বাবা রাজী হলেন এবং উল্টে প্রস্তাব করলেন যে, বাছাই পাঁচ জন হুলিয়ার সঙ্গে প্রতিযোগিতা হলে 'শো' জমবে ভাল। এই স্পর্দ্ধায় রাজা মনে হ'ল খুবই বিস্মিত হলেন। হ'লেও, তিনি রাজী হ'য়ে সানন্দে সব ব্যবস্থার নির্দ্দেশ দিলেন।

অক্টোবরের শেষাশেষি। পুরীর বিখ্যাত নরেন্দ্র সরোবরের তীরে প্রকাণ্ড সামিয়ানা খাটানো হয়েছে। পুরীর রাজা, উড়িষ্যার গবর্ণর স্যার জন হ্যাবাক্ ও লেডি হ্যাবাক্, বহু সামন্তরাজন্যবৃন্দ, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী এবং স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত নরনারীর সম্মুখে আমি প্রথম লাঠী-খেলা, ছোরা-খেলা প্রভৃতি দেখালাম। সকলেই মুহুর্মুহু করধ্বনিতে প্রশংসা জ্ঞাপন করলেন। তারপর সাঁতারের পোষাকে আমি ও আমার সন্তরণগুরু প্রফুল্ল ঘোষ জলে নামলাম। অগণিত দর্শকবৃন্দ মুগ্ধ বিস্ময়ে বিচিত্র সন্তরণ-কৌশল দেখতে লাগলেন। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় সরোবরের এপার-ওপার করা, ঐ অবস্থায়ই নিস্তরঙ্গ স্রোতোহীন জলে চীৎ-সাঁতার কাটা ও চীৎ হয়ে ঘুমুনো, পায়ের শৃঙ্খলে গুঁটির সুতো বেঁধে নিশ্চল ভাসমান শরীরের ভারকে ৪০।৫০ গজ টেনে আনা প্রভৃতি ব্যাপার দর্শকের বিমুগ্ধ বিস্ময় ও অজস্র প্রশংসার্জ্জন করলে।

এই সব ব্যাপারে প্রায় এক ঘণ্টা কাটলো। এর পরেই হুলিয়াদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা। বিনা বিশ্রামেই আমায় যোগ দিতে হ'ল।

নরেন্দ্র সরোবর কলিকাতা কলেজ স্কোয়ারের প্রায় দ্বিগুণ হবে। লম্বায় ২২০ গজ। কথা হ'ল এপার থেকে ঐ পাড়ের সিঁড়ি ছুঁয়ে আবার ফিরে আসতে হবে। মোটের উপর ৪৪০ গজ অথবা এক চতুর্থ মাইল সাঁতার কাটতে হবে। পাথরের বাঁধানো সিঁড়ি সারি সারি গ্যালারীর মত উঠে গেছে। তারি উপর সকলে এসে বসেছেন। জলের কিনারার শেষ সিঁড়িটায় পাঁচ জন হুলিয়া সারবন্দী প্রস্তুত। আমি এক পাশে। গবর্ণর 'ষ্টার্ট' দিবেন, এমনি সময়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কি ধরণের (method) সাঁতার দিতে হবে?

হুলিয়ারা কোন ধরণ (method) জানে না; স্থির হ'ল যার যা খুসী এবং যে যেমনটিতে অভ্যস্ত। গবর্ণর 'ষ্টার্ট' দিতেই হুলিয়ারা জল-তোলপাড় করে' সরোবরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। আমি নিঃশব্দে হাত-পা না-নেড়ে শুধু শরীরের গতিতে (glide) সকলের অলক্ষ্যে জলের ভিতরে চল্‌লাম। উড়ন্ত পাখীদের শূন্যে গ্লাইড করতে অনেকে লক্ষ্য করে' থাকবেন। পাখা ও পুচ্ছ টান করে' পাখীরা শুধু শরীরের ভারে সময়ে সময়ে শূন্যে ভেসে চলে। পলায়নপর মাছেরাও এই রীতিই অনুসরণ করে' থাকে। এতে খুব দ্রুত যাওয়া সম্ভব হয়। বস্তুতঃ আমারও তাই হ'ল। জল থেকে মাথা তুলে দেখি—সর্ব্বাগ্রের হুলিয়াটা প্রারম্ভের প্রথম ডুবেই প্রায় ৩।৪ গজ পেছনে পড়ে' গেছে।

হুলিয়ারা সন্তরণ-বিজ্ঞান (scientific swimming) শেখেনি। তবে শক্ত জান্। প্রাণপণে এলোধাপাড়ি সাঁতার কাট্‌তে লাগলো। আমি 'ফ্রী ষ্টাইলে' সাঁতার কাট্‌তে লাগলাম। লম্বা দূরত্বের (long distance) সন্তরণের পক্ষে ইহা উপযোগী। 'ফ্রী ষ্টাইলের' যে ধরণ আমি নিলাম, তাকে ইংরেজিতে six bit double tarzan croll বলে। অর্থাৎ একবার হাত ফেলার সঙ্গে তিনবার পায়ের ধাক্কা (kick) দিতে হয়। তিনবারের মধ্যে একটা বড় রকম (major) আর দু'টা ছোট রকম (minor)। তা' হ'লে ডাণ ও বাম, এই দুই হাতে জল টানার সঙ্গে সঙ্গে পায়ের ধাক্কাও দ্বিগুণ হয়ে যেতে লাগলো।

এ সত্ত্বেও ২২০ গজ অতিক্রম করে' ঐ পাড়ের সিঁড়ি ছুঁয়ে মোড় ফিরতেই দেখি—সর্ব্বাগ্রের ভীমকায় ও শক্তিমান্ হুলিয়া আমার মাত্র ১৫।২০ হাত তফাতে আছে। ফিরবার মুখে কি জানি বা সে আমার আরও কাছেই হয়তো এসে পড়ে' থাকবে। সরোবরের চারি-দিকে লোকারণ্য। সহস্র কৌতূহলী চক্ষু আমাদের উপর। আর সব চেয়ে আশ্চর্য্য যে, খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি হারিয়ে পাড়ের জনতার মধ্যে ইতিমধ্যেই দলাদলি সুরু হয়ে গেছে। শতকণ্ঠ আমায় সম্বোধন করে' বলতে লাগলো—বাণী, জেনো তুমি হারলে বাঙালীর মুখে চুণকালি পড়বে। করতালি ও চীৎকার ধ্বনিতে সরোবরের আব্‌হাওয়া শব্দায়মান হয়ে উঠ্‌লো। উড়িষ্যাবাসীরাও অনুরূপ উৎসাহ হুলিয়াদের দিতে লাগলো।

সন্তরণের পূর্ব্বে ঘণ্টাখানেক কসরতের ফলে আমি একটু পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। অনুভব করলাম, বাঙালীর ব্যগ্র-আকুলতা আমায়ও যেন পেয়ে বস্‌লো। ভাবলাম, যদি সত্যিই পরাজয়ই হয়, তবে এ মুখ নিয়ে কি করে' বাঙালীর মধ্যে গিয়ে উঠবো! আগাগোড়া স্নায়ু-শিরা-উপশিরায় উত্তেজনার বিদ্যুৎ খেলে গেল। সামনে আর দেড়শো গজ মত বাকী। আমার পেছনের নুলিয়াটা প্রায় কাছিয়ে এসেছে। মরণপণে সাঁতার কাট্‌তে লাগলাম। তীরে পৌঁছে যখন শেষ খুঁটি (finishing post) স্পর্শ করলাম, তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রায় ৫০।৬০ গজ দূরে।

তারও পেছনে বাকী চার জন।

গভর্ণর খুব খুসী হলেন। সানন্দে সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসে আমায় করমর্দ্দন করে' তিনিই প্রথমে আমায় জল থেকে উঠালেন এবং তাঁর গলার মালা আমায় পরিয়ে দিলেন। তারপর হাত ধরে' লেডি হ্যাবাকের কাছে নিয়ে গেলেন। তিনিও তাঁর গলার মালা আমায় পরিয়ে দিয়ে করমর্দ্দন করলেন। রাজাও আমায় মাল্যভূষিত করলেন। উপস্থিত বাঙালী নারী-পুরুষের মুখে দীপ্ত বিজয়োল্লাস!

এই প্রসঙ্গে গভরর্ণর মহোদয় একখানা সার্টিফিকেটও দেন: "His Excellency, the Governor was greatly struck by the exhibition of swimming and lathi play given by you at Puri on October, 22nd, 1936."

কিন্তু ব্যাপারটা দাঁড়ালো হিতে বিপরীত। এ আনন্দ-সমারোহ হ'ল তিক্ততায় পর্য্যবসিত। স্বদেশবাসী নুলিয়ার পরাজয় রাজা যেন সহিতে পারলেন না। এ পরাজয়ের গ্লানিমা তাঁকে ব্যথাতুর করে' তুল্‌লো। তিনি যেন একটু উত্তেজিত হয়েই মন্তব্য করে' বসলেন, যদি বাণী এই নুলিয়াদের সমুদ্রে হারাতে পারে, তবেই তাদের হবে সত্যিকার পরাজয়। এ স্থির পুকুরের জলে তারা সাঁতার কাট্‌তে অভ্যস্ত নয় বলেই তিনি আজকের এই ঘটনাকে ঠিক পরাজয় বলে' স্বীকার করতে রাজী নন।

আমি নিজেও লবণাক্ত তরঙ্গসঙ্কুল সাগরে সাঁতার কাট্‌তে অভ্যস্ত নই। অন্তরটা একটু কেঁপে উঠলো। দেশ, জাতি ও বাঙালীর মর্য্যাদার কথা মনে হ'ল। ক্ষণিকের ইতস্ততার ঘোর কাটিয়ে মুখ দিয়ে বের হয়ে এল—হ্যাঁ, আমি চ্যালেঞ্জ এ্যাক্‌সেপ্ট (challange accept) করলাম।

হ্যাণ্ডবিল, সংবাদপত্রে ও মুখে মুখে সংবাদ ঘোষিত হল:

Swimming Competition

Swimming competition open for all from Swarga-dwar to B. N. R. Hotel by Miss Bani Ghose, on Sunday, the 25th October 1936 at 4-30 P. M.

আমার বয়স তখন পনের বছর। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি। বঙ্গোপসাগরের উত্তাল তরঙ্গভঙ্গের মাঝে সে রোমাঞ্চকর সঙ্কট-কাহিনী বারান্তরে বলবার ইচ্ছা রইলো।

দুটী রাজহাঁস

কাদের নওয়াজ

পুকুরের জলে ভাসে দুটী-রাজহাঁস,
বুকে মুখে তাহাদের ঝরে উল্লাস।
ঠোঁটে ঠোঁট্ দিয়া—
দুজনে জানায় প্রীতি, পুলকিত হিয়া।
কভু কাছে আসি—
সোহাগে ঢলিয়া পড়ে, দোঁহে ভালবাসি।
দেখি মনে হয়,
ধরায় মানুষ কভু এত সুখী নয়!
তাই ভাবি মনে—
মানুষে মানুষে কবে প্রীতির বাঁধনে;
বাঁধা রবে, ঐ দুটী রাজহাঁস-সম,
স্বরগ হবে, হবে অনুপম।

চিন্তা ও চিত্র

জাতির পতন হয় কেন?

মানুষের আকৃতি ও প্রকৃতি দেখিয়া হিন্দু অথবা বাঙ্গালী বলিয়া ক্রমেই মানুষকে চিনিয়া লওয়া কঠিন হইয়া পড়িতেছে। কেন এমন হয়? তাহার উত্তরে বলা যায়,—প্রথম কথা, আমরা জাতীয় শিক্ষায় বঞ্চিত হইয়া জাতীয় মস্তিষ্ক হারাইতেছি। যদৃচ্ছ আচারে চলিতে থাকিলে, একই জাতি ও একই সংস্কৃতির মধ্যে বিজাতীয় পার্থক্য লক্ষিত হয়। কোন স্বাধীন জাতির এইরূপ অবস্থা সম্ভব নহে।

জাতি পরাধীন হয় কেন? জাতীয় সংস্কৃতির সিদ্ধান্তে দ্বিধা উপস্থিত হইলে—জাতির মধ্যে বিচিত্র ধর্ম্ম তত্ত্বের প্রচারে—স্বাধীনতার হেতু সম্বন্ধে আস্থাহীনতায় বিভিন্ন মতবাদের প্রাবল্যে। মত-ভেদে বুদ্ধি ভেদ হইয়া সামান্য কারণে প্রত্যেকে নিজ নিজ মতসৃষ্টির দ্বারা নিজ নিজ আচার গ্রহণ করিলেই জাতি ঐক্যশক্তিহীন হয়। এই অবস্থায় পরাধীনতার পীড়ন অবশ্যম্ভাবী।

বিচিত্র ধর্ম্ম-তত্ত্বের প্রচারে জাতি পরাধীন হয়

পুনরুত্থানের পথ আছে কি?

জাতির পতন হয় পূর্ব্ব কারণে। অভ্যুত্থানও হয় ঐ সকল কারণের চরম পরিণতি ঘটিলে। জাতির মতভেদে, বুদ্ধিভেদে, যথেচ্ছ পথে চলার ফলে পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ও কর্ম্মবিপর্য্যয় উপস্থিত হইলে, জাতীয় চৈতন্য আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবহৃত হয়। জাতির দুঃখ তাহার লক্ষণ। ক্ষেতের ধান তারা খাইতে পায় না; ব্যাধির ঔষধ মিলে না। জাতীয় আন্দোলনে পরস্পর-বিরোধী হইয়া তারা বাহিরের উপদ্রব ডাকিয়া আনে এই চরম অবস্থায়।

বাক্য, মন ও কর্ম্ম—এই তিনের ব্যবহার স্বজাতির দুঃখই বাড়ায়। এই দুঃখের চরম অবস্থায় জাতির সত্তা যদি ঈশ্বরের নিগূঢ় অভিসন্ধি-সাধনার আশ্রয় হয়, পুনরুত্থানের সূচনা এই চরম দুর্দ্দশার ক্ষেত্র হইতেই সুরু হইতে থাকে।

অভ্যুত্থানের ক্রম

জাতির উন্নতি চাই, মুক্তি চাই ; কিন্তু তাহা আমাকে কেন্দ্র করিয়াই ঘটিতে হইবে, নতুবা নহে—এই অহঙ্কৃত সৃষ্টি করে, তখন ভাবে থাকে মুক্তির মরীচিকা, কিন্তু প্রত্যক্ষক্ষেত্রে উৎসন্নের পথই পরিষ্কৃত হয়। সে সময়ে পর পর নিম্নলিখিত অবস্থার ক্রম দেখা যায়—

চিত্রে অভ্যুত্থানের ক্রম-রূপ

মনোভাবের প্রেরণায় যখন বাক্যের দ্বারা পরনিন্দা, মনের দ্বারা বিদ্বেষপোষণ ও কর্ম্মের দ্বারা পরের অনিষ্ট-সাধন, এই ত্রিবিধ দোষ জাতির মধ্যে পরস্পরবিরুদ্ধ বীভৎস দলাদলি

নিষ্ঠুর ব্যর্থতার পর জাতি-সত্তা অবসাদে ভাঙ্গিয়া পড়ে। কিন্তু জাতীয় আত্মা অমর। কর্ম্মবিমুখতায় মুক্তির বিচার চলিতে থাকে। বিচারের ফলে বৈরাগ্যের

উদয়। বৈরাগ্য অহং বর্জ্জন করিয়া চিত্তকে দোষমুক্ত করে। স্বজাতি-প্রীতি এই অবস্থায় জাগ্রত হয়। তারপর জাতি-গঠনের জন্য প্রেম ও ঐক্যের সাধনায় ব্যক্তিগত

মতভেদ দূর করার প্রচেষ্টা

মতভেদে—বুদ্ধিভেদ। বুদ্ধিভেদে—বাক্যে, মনে ও কর্ম্মে অনৈক্য। সংহতিহীন জাতি চরম দুর্দ্দশার পর

জাতীয় সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারে নব-বেদব্যাসের আবির্ভাব

অথবা বৈদেশিক মতামত ত্যাগ করিয়া জাতীয় সংস্কৃতির প্রচার চলে। জাতি এইরূপে জাগ্রত ও সংগঠিত হইলেই উহার অভিব্যক্তি হয় মুক্তি।

উত্থানের সূচনায় জাতীয় সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারে প্রবৃত্ত হয়। যুগে যুগে তাই নব বেদব্যাসের আবির্ভাব। এই বেদব্যাসই স্বজাতির ধর্ম্মপ্রচার-সংহতি সৃষ্টি করেন।

প্রাচীন ভারতে নহুষ, বেণ, যবনতনয়, সুদাস, সুমুখ, নিমি প্রভৃতি ভারতের মতবাদ উপেক্ষা করেন। পক্ষান্তরে পৃথু, মনু প্রভৃতি ভারতসত্তার বিগ্রহ ব্যাস-প্রচারিত ভারত-সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারে জাতি রক্ষা করেন। পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও সুমন্ত যথাক্রমে ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ববেদের প্রচারক। জৈমিনি কর্ম্মকাণ্ডের মীমাংসা ও ব্যাস স্বয়ং বেদের জ্ঞানকাণ্ডের মীমাংসা করেন। ভারতের এই প্রাচীন সংস্কৃতি আমরা কি গ্রহণ করিব?

জাতীয় উত্থানের গোড়ার সমস্যা

এক মতের মানুষ চাই। মতই পথ আবিষ্কার করে। এক-পথযাত্রী ঐক্যবদ্ধ হয়। আমরা কোন মত গ্রহণ করিব? প্রাচীন ভারত-সংস্কৃতি? আমাদের জাতীয় আদর্শ? না বিশ্বের অন্যান্য জাগ্রত জাতির পরকীয় মতবাদ? আজ ইহাই বিচার্য্য। যদৃচ্ছা গতি মুক্তি দিবে না। কোনও শক্তিশালী মানুষের মতে বিপুল সংহতি গড়িয়া উঠিলে, কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে। মত গৃহীত হইলে, পালিত হওয়া চাই। আমরা ভারতের জাতীয় আদর্শের পক্ষপাতী। সে মতের উত্থান-পতন আছে বলিয়া কোন যুগে ত্যজ্য হয় নাই। কোন্ মতের ও পথের উত্থান-পতন নাই? বরং ভারতীয় সংস্কৃতি সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবী।

ভারতীয় সংস্কৃতি কি?

যে পথে মানুষ শ্রেয়ঃ লাভ করে রাষ্ট্রে, সমাজে, শিক্ষায়, বাণিজ্যে—জাতির সংস্কৃতি তাহাই। এই সংস্কৃতি আশ্রয় করিয়া জাতি মরে নাই। সংস্কৃতিরক্ষায় উদাসীন হওয়ায় জাতির পতন। উহার পুনর্গ্রহণেই আমরা জাতীয় ঐক্য পুনঃপ্রাপ্ত হইব। যে জাতি একই সংস্কৃতিতে সম আচারপরায়ণ হইয়া ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহারা পুনরায় দিগ্বিজয়ী হইবে।

বাক্যের সহিত মনের, মনের সহিত কর্ম্মের ঐক্য চাই। জন্মকাল হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত জাতি যদি একই আচার পালন করে, তাহাদের আকৃতি-প্রকৃতির বৈষম্য দূর হইবে। ইহার অন্তরায় কি? পরস্পর বিদ্বেষ, অন্যের অনিষ্টচিন্তা ও ঈশ্বরে অবিশ্বাস—এই তিনটী মনের দোষ। চুরি, অবৈধ হিংসা, ব্যভিচার—এইগুলি অশুভ কর্ম্ম। এই সকল হইতে মুক্তিলাভ করিলে জাতির অভ্যুত্থান অনিবার্য্য।

প্রাচীন সংস্কৃতিগ্রহণ কি সম্ভব?

বৈদেশিক আদর্শবাদ ভারতের ত্রিশকোটী নরনারীর মধ্যে প্রবর্ত্তন করা যদি সম্ভব হয়, জাতীয় সংস্কৃতির পুনর্গ্রহণ তাহা হইতেও কি দুরূহ ব্যাপার? আমরা নিজেদের রক্তের ইতিহাস যত সহজে উপলব্ধিগম্য করিব, ভিন্ন জাতীয় রক্তধারার অনুসরণ করা কি তদপেক্ষা সহজ হইবে? বিশেষতঃ, আত্মসংস্কৃতি যদি পুনরুত্থানের পক্ষে কার্য্যকরী হয়, পরশিক্ষার প্রভাবে তাহা হইতে বিমুখ হওয়া চিরমৃত্যুর আশ্রয়।

আমরা গতিসম্পন্ন হইব। ক্ষমতাবান্ হইব। নিরহঙ্কার হইব। নির্লোভ হইব। স্বাস্থবান্ হইব। ইন্দ্রিয়জয়ী হইব। স্বধর্ম্মনিরত হইব। বেদ-বিশ্বাসী হইব। সত্যপরায়ণ হইব। অক্রোধী হইব। ভারত-সংস্কৃতি যতই দুর্ব্বোধ্য হউক, এই সকল গুণ তারই লক্ষণ। আর ইহাই কি মানবতার ধর্ম্ম নয়? এই অসাধারণ চরিত্র গড়ার উপরই জাতিগঠন সম্ভব হইবে। আমরা আত্মগঠনের দিকেই পতিত জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করি। *

* প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব উপলক্ষে, ১৯শ বর্ষীয় মেলা ও প্রদর্শনীতে "জাতীয় সমস্যা" বিষয়ক এই চার্টগুলি প্রদর্শিত হয়। জাতীয় সমস্যা ও চিন্তার চিত্ররূপ দিয়াছেন প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীনরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

বৈচিত্র্য

মনোজগতের তথ্য নিরূপণ-করা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার

ধ্বংসকরী না হয়ে আধুনিক বিজ্ঞান যদি মানবকল্যাণে নিয়োজিত হত, তবে এ দুঃসময়ে জগতের চেহারা আজ অনেকটা বদলে যেত। মনোজগতের অলক্ষ্য ব্যাপারসমূহ আয়ত্তাধীনে আনার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্রপাতিও এই বৈজ্ঞানিক মানুষই আবিষ্কার করেছে। ফরাসী অধ্যাপক কজ্জম্যালি সীসা-ঝালান অবরুদ্ধ কক্ষে (পার্শ্বের চিত্র) এইরূপ মনস্তত্ত্বমূলক পরীক্ষা দ্বারা বহু নূতন তথ্য আবিষ্কার করেছেন। মস্তিষ্ক হতে যে বিদ্যুৎকণা নির্গত হয়, তা' পরীক্ষাধীন ব্যক্তির মস্তকোপরি আড়া-আড়িভাবে রক্ষিত একটি তাম্রপাতে ধরা পড়ে। এই লিখা থেকে বৈজ্ঞানিকেরা মনোজগতের অনেক কিছু অজানা বিষয় আবিষ্কার করে' মানস-ব্যাধির প্রতিকারের পন্থা বের করেছেন।

কথা ও কণ্ঠস্বরকে রেকর্ড করা হচ্ছে

পৃথিবীতে মানুষ যা' করে বা বলে, তার কিছুই নষ্ট হয় না। আকাশে-বাতাসে তা' চিরকাল অমর হয়ে বেঁচে থাকে। বৈজ্ঞানিকেরা একে আবিষ্কার করবার মত উপযুক্ত যন্ত্রপাতি (উপরের চিত্র) আবিষ্কার করেছেন। মানুষের কথা, বক্তৃতা, কণ্ঠস্বর প্রভৃতিকে চিরন্তনের মত লিখে রাখবার পরীক্ষাগারের দৃশ্য উপরের চিত্রে দেখা যাবে।

ব্রহ্মসূত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়

(দ্বিতীয় পাদ)

শ্রীমতিলাল রায়

কেবল দার্শনিক মতবাদ নয়, ব্যবহারিক কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মীদের মধ্যে যদি মতভেদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও পরস্পরের মধ্যে বাক্য, মন ও কর্ম্মজনিত ভেদ-সৃষ্টি হইবে। এই অবস্থায় সমবেতভাবে কোন কর্ম্ম কোন জাতি সিদ্ধ করিতে পারে না। দর্শন শাস্ত্র হইতেই ব্যবহারিক কর্ম্মবিধির প্রবর্ত্তন হয়। এই দার্শনিক ক্ষেত্রে মতভেদ থাকিতে, এক দেশ ও এক জাতির মধ্যে ঐক্য-প্রতিষ্ঠা হয় না। কিন্তু যে কোন কারণেই হউক, আমাদের প্রাচীন পুরুষেরা বহু মতবাদ প্রশ্রয় দিতে কার্পণ্য করেন নাই। আজও আমরা যত মত, তত পথ বলিয়া গর্ব্ব করি। কিন্তু ধর্ম্মের সহিত রাষ্ট্রের সম্বন্ধ অবিভাজ্য হইলে, এইরূপ প্রশ্রয় শ্রেয়ঃ নহে। ধর্ম্মরাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার প্রেরণা যে যুগে কুরুক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়াছিল, সেই যুগে বেদব্যাস ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক মতবাদ খণ্ডন করার চেষ্টা করিয়াছেন, ব্রহ্মসূত্র তাহার দৃষ্টান্ত। দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ ইহার সাক্ষ্য দিবে।

ব্রহ্মসূত্রের পূর্ব্বাধ্যায়ে ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে ঈশ্বরের স্রষ্টৃত্ব সপ্রমাণ হইয়াছে। অতঃপর ইহার প্রতিকূল মতবাদ নিরাকৃত করার প্রযত্ন হইতেছে। উপনিষদাদি আস্তিক্য-দর্শনে সৃষ্ট্যাদির উপাদান ও নিমিত্ত কারণ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু বলা হয় নাই। শ্রুতি যুক্তিশাস্ত্র নহে, অনুমানের স্থানও ইহাতে নাই। যুক্তি ও অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ঈশ্বর-তত্ত্ব নির্ণয় করা যায় না; অতীন্দ্রিয় বস্তুর প্রমাণ এই হেতু শ্রুতি-নিরপেক্ষ নহে। ব্রহ্ম-নিরূপণের একমাত্র উপায় শ্রুতি-প্রমাণ শাস্ত্রাদি। শাস্ত্র শ্লোক মাত্র নহে। বেদমূলক শ্লোকই প্রমাণ-স্বরূপ গ্রহণ করিতে হইবে।

জগৎ-কারণ ব্রহ্ম; ইহা শ্রুতির কথা। এই মতবাদের প্রতিকূলে যে সকল মতবাদ, তাহা যতই যুক্তিযুক্ত ও অনুমানসিদ্ধ হউক না কেন, ব্রহ্মসূত্রকার সেইগুলি খণ্ডন করিতে না পারিলে, শ্রুতিসিদ্ধ মতবাদের প্রতিষ্ঠা হয় না। ব্যাসদেব এই হেতু সর্ব্বপ্রথমে মহামতি কপিলের জগৎকারণ প্রধান, এই দার্শনিক মতবাদ নিরাকৃত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইহা বিদ্বেষ নহে, পরন্তু যে মতবাদের উপর একটা বিপুল জাতির ঐহিক ও পারত্রিক শ্রেয়ঃ নির্ভর করে, সেই মতবাদের বিরুদ্ধ পক্ষকে নিস্তব্ধ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। মহামতি কপিল জগৎ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া দেখাইয়াছেন—ঘটাদির উপাদান মৃত্তিকার ন্যায় সুখ-দুঃখ-মোহ, এই ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিই যাবতীয় সৃষ্টির উপাদান। সাংখ্যমতে এই প্রকৃতি অচেতন। ইনি প্রধান নামেও আখ্যাত। ইনি আত্মস্বভাব-বশে বিচিত্র জগৎ-রূপে পরিণত হন। সৃষ্ট্যাদি ব্যাপারে বহু চেতন পুরুষের প্রয়োজন স্বীকৃত হইলেও, কোন অখণ্ড চেতন স্রষ্টার প্রয়োজন সাংখ্যমতে স্বীকৃত হয় নাই। ব্রহ্মসূত্রকার কপিলের এই মতবাদ খণ্ডন করিতে নিম্নোক্ত সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন :—

রচনানুপপত্তেশ্চানুমানম্ ॥১॥

অনুমানম্ (অনুমানলব্ধ প্রধান) ন (জগৎ-কারণ নহে) [কেন ?] রচনানুপপত্তেঃ (এমন হইলে, জগৎ-রচনা সম্ভব হয় না) চ (চ শব্দে প্রধানের জগৎ-কর্ত্তৃত্বের প্রমাণাভাব প্রদর্শিত হইতেছে)।

সাংখ্যবাদী বলিয়াছেন—জগৎ-কারণ অচেতন প্রধান; এই মতবাদের যে যুক্তি নাই, তাহা নহে, ইহা অনুমান-সিদ্ধ। কিন্তু ইহা আপ্তবাক্য নহে অর্থাৎ শ্রুতিসিদ্ধ নহে। যাহা আপ্তবাক্য নহে, তাহা আর্য্যভারত স্বীকার করে না। পূর্ব্বেও বলিয়াছি—ঈশ্বর-যুক্তিও অনুমানের গণ্ডীতে ধরা পড়ে না—তাঁহার প্রমাণ অপৌরুষেয় বেদ। কপিলাদির অনাপ্ত মতবাদ পূর্ব্বেও নিরাকৃত হইয়াছে; কিন্তু সাংখ্যবাদ যুক্তিযুক্ত ও বিজ্ঞানসঙ্গত বলিয়া বিজ্ঞজনেরা বিশেষভাবে এই মতবাদের উপর আস্থা স্থাপন করেন—ব্রহ্মসূত্রকার তাই এই পাদে উক্ত মতবাদ বিশেষরূপে খণ্ডন করিতে

প্রয়াসী হইয়াছেন। ঈশ্বরানপেক্ষ অচেতন প্রধান যদি জগৎ-কারণ বলিয়া গৃহীত হয়, অদ্বয় ব্রহ্ম জগৎ-কারণ বলিয়া যে শ্রুতি-প্রমাণ, তাহা নাকচ করিতে হয়। ভারতের হিন্দু বেদবাদী; কাজেই বেদ-প্রমাণ-বিরুদ্ধ সাংখ্যবাদ তাহাদের খণ্ডন করিতে হইবে, নতুবা জাতির মধ্যে মতভেদে ঐক্যপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। কারণ-তত্ত্ব সত্য ও শাশ্বত, তাহা যুক্তি ও অনুমানসিদ্ধ করার প্রচেষ্টা মানুষের পক্ষে সঙ্গত হইলেও, উহাতেই তাহার চরম প্রমাণ হয় না। আচার্য্য ভর্ত্তৃহরি একটী দৃষ্টান্তসহকারে এইরূপ প্রচেষ্টার বৈফল্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

হস্তস্পর্শাদিনাঽন্ধেন বিষমে পথি ধাবতা।
অনুমানপ্রধানেন বিনিপাতো ন দুর্ল্লভঃ॥

হস্ত-স্পর্শের দ্বারা বন্ধুর-পথযাত্রী অন্ধ পথের কিয়দংশের সমতা অনুমান করিয়া যদি ধাবিত হয়, তাহার দুর্গতির সীমা থাকে না।

অনুমান প্রমাণের ন্যায় যুক্তির সীমাও পরিমিত। অতএব ঘট-কলসাদি বিচিত্র মৃৎপাত্রের কারণ যেমন মৃত্তিকা, যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের কারণ তেমনই গুণাদি-বিশিষ্ট অচেতন প্রধান, এই অনুমান ও যুক্তি তত্ত্ব-নিরূপণের পক্ষে যথেষ্ট নহে। ঘট ও কলসীর কারণ মৃত্তিকার পশ্চাতে বুদ্ধিমান্ শিল্পীর হস্ত যেমন পরিলক্ষিত হয়, গুণাদির পশ্চাতে তদ্রূপ স্রষ্টার বিদ্যমানতা আছে। বেদান্তবাদী এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন। সাংখ্যবাদী এই চেতন অখণ্ড সত্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। সৃষ্ট বস্তুর বিবিধ প্রকার বিকারপ্রবর্ত্তনের কারণ প্রধানের স্বতঃস্বভাব, ইহাই তাঁহাদের অভিমত। জগৎ-রচনার পশ্চাতে কোন এক চেতন শিল্পীর হস্ত যদি না থাকে, অচেতন প্রধানের স্বভাবই যদি ইহার কারণ হয়, তবে এমন সৃষ্টিনৈপুণ্য সম্ভব হয় কি প্রকারে? এই প্রশ্ন বেদান্তবাদীরই। যদিও ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি সৃষ্ট্যাদির কারণস্বরূপ হয়, তাহা হইলেও প্রশ্ন উঠে—কোন বিষয়-বস্তুতে কি সুখ-দুঃখাদির অনুভব হয়? সুখ-দুঃখাদির বোধ অন্তঃস্থ অর্থাৎ বস্তুর অন্তশ্চেতনায় অনুভূত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ। আবার দেখা যায়—একই বিষয়বস্তু কোথাও সুখ, কোথাও দুঃখের অনুভূতি সৃজন করে বৈকারিক বিষয়-সংসর্গে; যদি উৎপত্তি-ভেদ স্বীকার করা হয়, উহা সর্ব্বত্র তুল্য অনুভূতির সৃষ্টি করে না কেন? একই বিষয়-সংস্পর্শে কোথাও সুখ, কোথাও দুঃখ যখন অনুভূত হয়, তখন ইহা জীবের সচেতন ভাবনার ভেদানুযায়ী উৎপন্ন হয়, ইহা অস্বীকার করা যায় না। অতএব জগৎ-কারণ চেতন ব্রহ্ম। একই ভাব নির্ম্মাতার রচনা-নৈপুণ্যে নানা প্রকারে অভিব্যক্ত হয়। সুখ, দুঃখ ও অজ্ঞান, এই ভেদত্রয় সৃষ্টি-কৌশলে এক অখণ্ডভাবকে বিচিত্ররূপে প্রকাশ করে। একই সুরের মূর্চ্ছনা যেমন সপ্তগ্রামে অভিব্যক্ত হয়, তদ্রূপ এক অখণ্ড চেতন ব্রহ্মই আপনার লীলাবৈচিত্র্য প্রকাশ করেন। ইহাই বেদমূলক মতবাদ। সাংখ্যবাদকে নিরাস করার জন্য আরও যুক্তি আছে।

প্রবৃত্তেশ্চ ॥২॥

চ-শব্দে পূর্ব্ব সূত্রের অনুপপত্তি-পদের সহিত এই সূত্রের প্রবৃত্তি-শব্দের যুক্তি রহিয়াছে। প্রবৃত্তি-শব্দের অর্থ কার্য্যোন্মুখতা। অচেতনের পক্ষে রচনা-প্রবৃত্তি অসম্ভব। বিশিষ্ট বিন্যাস ব্যতীত রচনা হয় না; ইহার জন্য যে ইচ্ছা-সম্বলিত যত্ন, তাহা চেতন পক্ষেই সম্ভব। প্রধানেরও প্রবৃত্তি আছে, এই কথা যদি স্বীকারও করা যায়, তাহা হইলেও বলিতে হইবে—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ত্রিগুণের বিষম অবস্থাই এই প্রবৃত্তি। অচেতন প্রধানের এই গুণবৈষম্য কর্ম্মাভিমুখতাসম্পন্ন কিনা, তাহাও বিচার্য্য। প্রবৃত্তি-শব্দের অর্থই হইতেছে ইচ্ছাসম্ভূত গতি। সাংখ্যকার স্বয়ং বলিতেছেন—প্রধান অচেতন এবং সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের সাম্যাবস্থাই প্রধান। এই অবস্থায় কোন চেতনের সংসর্গে প্রধান না আসিলে, তাহার প্রবৃত্তি-প্রকাশ হইতে পারে না। সাংখ্য বলেন—বৈষম্য প্রধানের প্রবৃত্তি-লক্ষণ। ইহা ব্যতীত দ্রষ্টা পুরুষেরই বা প্রবৃত্তি-লক্ষণ কোথা? অচেতন প্রধানের আশ্রয়েই প্রবৃত্তির প্রকাশ হয়; অতএব প্রবৃত্তি পুরুষের, প্রকৃতির নহে, ইহা কি প্রকারে যুক্তিযুক্ত হইবে? উত্তরে বলা যায়—কেবল চেতন প্রবৃত্তি-লক্ষণহীন বটে, আবার কেবল অচেতনও এই একই লক্ষণাক্রান্ত। যেমন মৃত দেহ অচেতন, তাহার চৈতন্য-লক্ষণ নাই। নিরবয়ব আত্মাও প্রবৃত্তিলক্ষণহীন।

কিন্তু কাষ্ঠে অগ্নি সংযোগ করিলে যেমন অগ্ন্যুৎপত্তি দেখা যায়, তদ্রূপ চেতন-সংসর্গ হইলে, অচেতনে প্রবৃত্তি-লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়। অতএব প্রবৃত্তি চেতনের। সাংখ্য বলিবেন—চেতনে অচেতন, অথবা অচেতনে চেতন পরস্পর সংযুক্তির ফলে যখন প্রবৃত্তি-লক্ষণ স্ফুরিত হয়, তখন প্রবৃত্তি-লক্ষণ চেতনের কি অচেতনের, ইহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। আমরা যদি বলি—অচেতনেরই প্রবৃত্তি, দোষ হইবে কেন? বেদান্তবাদী বলিতেছেন—না, অচেতনে যে প্রবৃত্তি-লক্ষণ, চেতনই তাহার কারণ। ইহার শ্রুতি-প্রমাণ আছে—যথা,

পয়োঽম্বুবচ্চেত্তত্রাপি ॥৩॥

চেৎ (যদি) পয়োঽম্বুবৎ (দুগ্ধ ও জলের দৃষ্টান্তে প্রধান স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ক্ষরিত বা স্যন্দিত হয় বলি) তত্রাপি (তাহা হইলেও বলিব—ইহাও চেতনাধিষ্ঠিত হইয়া প্রবর্তিত হয়)।

জাগ্রত সৃষ্টির মূলে প্রবৃত্তির কথা যদি বল—সাংখ্য-বাদী বলেন, তবে অচেতনেরও প্রবৃত্তি আছে। অচেতন দুগ্ধ বৎস-মুখে ক্ষরিত হয়, অচেতন জল বৃষ্টিরূপে পতিত হয়; ঠিক এইরূপেই প্রধান মহৎ-তত্ত্বাদি কারণে পরিণমিত হইতে পারে—সৃষ্টির জন্য চেতনের প্রবৃত্তি প্রয়োজনীয় হয় না। তত্রাপি-শব্দের দ্বারা সূত্রকার বলিতেছেন—এই লৌকিক দৃষ্টান্তও সাংখ্যমতের অনুকূল নহে। কেননা, ঐরূপ স্থলেও চেতনের অধিষ্ঠান অনুমিত হয়। আর এই অনুমান শ্রুতি-প্রমাণসিদ্ধ। শ্রুতি বলিতেছেন "যোঽপ্সু তিষ্ঠন্নদ্ভ্যোঽন্তরোযময়তি, এতস্যবাঽক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি, প্রাচ্যোঽন্যা নদ্যঃ স্যন্দত", অর্থাৎ যিনি জলে অবস্থান করেন অথচ জল হইতে ভিন্ন, যিনি জলের অন্তরে থাকিয়া জলকে নিয়মিত করেন, হে গার্গি, এই অক্ষর-ব্রহ্মের প্রশাসনেই পূর্ব্ববাহিনী নদী সকল প্রবাহিত হইতেছে। অতএব সর্ব্বত্র সকল কর্ম্মই ঈশ্বরসাপেক্ষ; অচেতনের স্ফুরণ ঈশ্বর-প্রবৃত্তিমূলক—শ্রুতিপ্রমাণে ইহা সিদ্ধ হইল।

ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ ॥৪॥

ব্যতিরেক অনবস্থিতেঃ (প্রধান ব্যতিরিক্ত প্রবর্ত্তক বা নিবর্ত্তক অস্তিত্ব কিছু না থাকায়) অনপেক্ষত্বাৎ চ (প্রধানের নিরপেক্ষত্ব হেতুও)।

অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিন গুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রধান। এই প্রধান ব্যতিরিক্ত প্রবর্ত্তক বা নিবর্ত্তক সাংখ্যমতে যখন কিছুই নাই, তখন প্রধানের অনপেক্ষত্ব হেতু কি উপায়ে তাহার মহদাদি পরিণাম সম্ভব হয়? প্রধান অনপেক্ষ, তবুও তাহার সৃষ্টি-প্রবৃত্তি যদি স্বীকারও করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলেও অনাদিকাল সৃষ্টি করাই তাহার স্বভাব হইবে, তবে আবার লয়-লক্ষণ প্রকাশ পায় কেন?

সর্ব্বনিরপেক্ষ প্রধান কখনও পরিণত হইবে, কখনও প্রলয়গত হইবে, এমন খামখেয়ালী ভাব স্বভাব-ধর্ম্মে নাই। ব্রহ্মবাদীর মতে এইরূপ হওয়ায় কিন্তু অসঙ্গতি দৃষ্ট হয় না। কেননা "ঈশ্বরস্তু সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ সর্ব্বশক্তিমত্বাৎ" অর্থাৎ বেদান্তের ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁর সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব স্বীকার করা হইয়াছে—সৃষ্টি-স্থিতি-লয় তাঁর ইচ্ছাধীন।

অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ ॥৫॥

অন্যত্রাভাবাৎ (অন্য ক্ষেত্রে অভাব হয়, এই হেতু) তৃণাদিবৎ ন (তৃণাদির দৃষ্টান্তে প্রধানের স্বাভাবিক পরিণতি স্বীকার করা যায় না)।

সাংখ্যবাদী আরও বলিতে পারেন—তৃণাদি আপন স্বভাবে ক্ষীরাকারে পরিণত হয়; প্রধানও এইরূপে মহৎ-তত্ত্বাদি রূপে পরিণত কেন হইবে না? এইরূপও হইতে পারে না। তৃণাদি যদি স্বভাবতঃ দুগ্ধে পরিণত হইত, তাহা হইলে ধেনু কর্ত্তৃক ভক্ষিত হওয়ার প্রতীক্ষা রাখিত না। আবার বৃষাদি-ভক্ষিত তৃণও দুগ্ধ প্রসব করিত। তৃণের দুগ্ধ হওয়াও নিরপেক্ষ নহে, পরন্তু সাপেক্ষ। সুতরাং এই দৃষ্টান্ত প্রধানের অনপেক্ষ সৃষ্টি প্রমাণ করে না।

অভ্যুপগমেঽপ্যর্থাভাবাৎ ॥৬॥

অভ্যুপগমেঽপি (প্রধানের স্বতঃপ্রবৃত্তি স্বীকার করিয়া লইলেও) অর্থাভাবাৎ (ইহার প্রয়োজনাভাব হয়, এই হেতু)।

অর্থাৎ যদি ইহাও স্বীকার করিয়া লওয়া হয় যে, প্রধানের সৃষ্টি করার স্বতঃপ্রবৃত্তি আছে। তাহা হইলেও তাহার প্রয়োজন স্বীকার করিতে হইবে। প্রধান যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সৃষ্টি করে, ইহার পশ্চাতে কি প্রয়োজনের

তাগিদ নাই? সাংখ্যবাদীরা বলেন বটে—"প্রধানঃ পুরুষ-স্যার্থং সাধয়িতুং প্রাবর্ত্তত"—প্রধান পুরুষের প্রয়োজন সাধন করিতে প্রবর্ত্তিত হয়; সাংখ্যের এই প্রতিজ্ঞা—প্রধান কাহারও অপেক্ষা রাখে না, এ কথায় নাকচ হইয়া যায়। এই স্ব-মত-বিরোধ দোষ হইতে সাংখ্য মুক্ত হয় না। যদিও ধরিয়া লওয়া হয় যে, পুরুষার্থ-সাধন প্রধানের লক্ষ্যে, তাহা হইলেও পুরুষের সেই প্রয়োজন কি, তাহা বিচার্য্য। সাংখ্যমতে পুরুষ নিগুর্ণ, নিষ্ক্রিয়; তাঁহার প্রয়োজন কিরূপে সম্ভব হইবে? এই অবস্থায় পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ, কিছুরই প্রয়োজন নাই। যদি বল—পুরুষ নিষ্ক্রিয় নিগুর্ণ বটে, কিন্তু প্রধানের সান্নিধ্যে তাঁহার ভোগ অথবা অপবর্গের এক প্রকার ঔৎসুক্য জন্মে; পুরুষের এই ঔৎসুক্যের অভিব্যক্তিই প্রধানের কর্ম্মযোজনার হেতু হয়—ইহাও যুক্তিবিরুদ্ধ। ইচ্ছা-বিশেষের উৎপত্তির নাম ঔৎসুক্য। সাংখ্যের মতে, পুরুষ নিগুর্ণ, নিষ্ক্রিয় ও নির্ম্মল; তাঁহাতে এই ইচ্ছা স্ফুরণ হইবে কি প্রকারে? আর সাংখ্যের প্রধান জড় অচেতন, তাহারই বা ঔৎসুক্য প্রকাশ করার চাঞ্চল্য আসে কেমন করিয়া?

পুরুষাশ্মবদিতি চেৎ তথাপি ॥৭॥

পুরুষ অশ্মবৎ (পুরুষ ও পাষাণের ন্যায়) ইতি চেৎ (এইরূপ যদি বলি), তথাপি (তাহা হইলেও দোষ হইবে)।

সাংখ্যবাদী বলিতেছেন—পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অসঙ্গত হইবে কেন? পঙ্গু পুরুষ বা অয়স্কান্ত পাষাণের দৃষ্টান্তে প্রধানের প্রবৃত্তি-কল্পনা অসম্ভব হয় না। সূত্রকার বলিতেছেন—না, তাহাতেও দোষ আছে। অর্থাৎ পঙ্গু পুরুষ প্রবৃত্তিকে প্রবর্ত্তিত করিতে পারে, ইহা সত্য। চুম্বক পাষাণও স্বয়ং অপ্রবর্ত্তমান হইয়া, লৌহকে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে। এই দুই দৃষ্টান্তও সাংখ্যবাদের অনুকূল হয় না—কারণ ইহাতে তাহার স্বীকৃতি-হানি দোষ হইতেছে। সাংখ্য নিজেই স্বীকার করিয়াছেন—পুরুষ উদাসীন, নিষ্ক্রিয় ও নিগুর্ণ, পঙ্গু ঠিক এইরূপ নহে; অতএব এই পুরুষ প্রধানকে প্রবর্ত্তিত করিতে পারে না। চুম্বকের দৃষ্টান্ত যদি ধরা যায়, তবে দেখা যাইবে—চুম্বক সব সময়ে লৌহকে আকর্ষণ করে না, অবস্থা-বিশেষের উপর আকর্ষণ-ক্রিয়া নির্ভর করে—যেমন চুম্বক যদি মার্জ্জিত না হয় অথবা সম-সূত্রে ঋজুস্থানে উহা রক্ষিত না হয়, চুম্বকের লৌহাকর্ষণের শক্তিপ্রকাশ হয় না। পুরুষ কিন্তু এইরূপ নহেন। পুরুষ নিত্য, তাঁহার সন্নিধান সর্ব্ব সময়ে সমান—এই হেতু প্রধানের সকল সময়েই তুল্য অবস্থায় থাকা উচিত; কিন্তু ইহার অন্যথা যখন হয়, তখন উপরোক্ত দৃষ্টান্ত এই ক্ষেত্রে প্রযুজ্য হইল না। সাংখ্যমতে প্রধান অচেতন এবং পুরুষ উদাসীন। পুরুষের সান্নিধ্যে প্রধানের যোজনা যদি স্বীকার করি, উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ-সৃষ্টির তৃতীয় কারণ বিদ্যমান থাকা চাই; কিন্তু ইহার অভাব পূরণ হওয়ার সঙ্কেত সাংখ্যে নাই। এই অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত সকল দৃষ্টান্তই অযৌক্তিক হইল। আর এক কথা—সত্ত্ব, রজঃ ও তমো-গুণের সাম্যাবস্থাই প্রধান। ঐ গুণত্রয়ের একটী হইতে আর একটী বলবত্তর হইলে, সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটে। ইহাও যুক্তিযুক্ত নহে; কেননা, তিনটী গুণের স্ব-স্ব প্রাধান্যের অপলাপ অর্থে একটীকে অঙ্গী, অপর দুইটীকে অঙ্গ হইয়া যাইতে হইবে। এমন হইলে, গুণত্রয়ের স্ব-স্ব প্রধান ভাবের অভাবে গুণগুলির প্রত্যেকের যে নিজ নিজ স্বরূপ আছে, তাহা অস্বীকার করিতে হয়। অথবা সাংখ্যবাদী গুণাতিরিক্ত এমন কোন বস্তুরও অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, যাহার প্রভাবে গুণ-সাম্য বিচলিত হয় বা উহারা স্ব-স্ব স্বরূপ হারাইয়া বৈষম্যময় হইতে পারে।

এই শ্লোকের ভাষ্যরচনায় মায়াবাদী দার্শনিক—ব্রহ্ম উদাসীন, ইহা প্রমাণ করার চেষ্টা করিয়াছেন—মায়াশক্তির প্রভাবেই সৃষ্টির প্রবর্ত্তন, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া ব্রহ্মকে মুক্তি দিয়াছেন। কিন্তু বেদের ব্রহ্ম উদাসীন নহেন—উপনিষৎ, স্মৃতি ও পুরাণে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। বেদের ব্রহ্ম অপৌরুষেয়, তাহার কারণ সৃষ্টির প্রাথম্য নিরাকরণ করা যায় না; কিন্তু তাই বলিয়া তিনি একান্ত নিগুর্ণ বা উদাসীন নহেন। শ্রুতিই যখন একমাত্র ব্রহ্ম-প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তখন জগৎকে মায়ার সৃষ্টি বলিয়া ব্রহ্মকে স্বাস্থ্য করার কুযুক্তি গ্রহণীয় নহে। ইহাতে সাংখ্যের পঙ্গু পুরুষের ন্যায়, ব্রহ্মও পঙ্গু হইয়াই পড়েন। আর এইরূপ মতবাদের সুদূর ফলে, ব্রহ্মবিশ্বাসী জাতিরও

পঙ্গুত্ব অবশ্যম্ভাবী। গুণত্রয়ের বৈষম্য বা বিক্ষোভ অকারণ নহে, এই সিদ্ধান্ত পরবর্ত্তী সূত্রে উক্ত হইতেছে।

অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ ॥৮॥

অঙ্গিত্ব (গুণগুলির পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাব) অনুপপত্তেঃ (অসিদ্ধ, যুক্তিযুক্ত নয়)।

অর্থাৎ সাংখ্য যে বলেন—গুণগুলি পরস্পর সাহায্যে সৃষ্টি করে, ইহা অনুপপন্ন। কেন? সাংখ্যমতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সমান ও স্বরূপ অবস্থাই প্রধান। গুণের অঙ্গাঙ্গী ভাব অস্বীকার্য্য। গুণসাম্য নিত্যও নহে। সাম্যাবস্থা-ভঙ্গেই সৃষ্টি অথচ গুণাতিরিক্ত অন্য কিছুর স্বীকৃতি সাংখ্যে নাই। এই দোষক্ষালনের জন্য বলা হইয়াছে।

অন্যথানুমিতৌ চ জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ ॥৯॥

অন্যথা অনুমিতৌ (গুণত্রয়ের পরস্পর অনপেক্ষ স্বভাব নহে, এইরূপ অনুমান করিলেও) জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ (চৈতন্যশক্তি না থাকা হেতু জগৎ-রচনা সম্ভব হয় না)।

অর্থাৎ সাংখ্যবাদী যদি বলেন—গুণত্রয় পরস্পর আপেক্ষিক স্বভাবসম্পন্ন এবং একান্ত কূটস্থ নহে, অতএব ইহারা কর্ম্মাভিমুখী হইতে পারে এবং স্বভাব-বশেই বৈষম্যের দ্বারা সৃষ্টিরচনা করে—তদুত্তরে বলা যায় যে, এমনও যদি হয়, তবুও প্রধানের জ্ঞানশক্তি না থাকায় প্রধানের জগৎ-রচনার অনুপপত্তি-দোষ অপনীত হয় না। গুণসকল যদি স্বভাবতঃই কর্ম্মাভিমুখী হয়, এবং গুণ-বৈষম্যের কারণ যদি কিছু না থাকে, তাহা হইলে গুণের সাম্যাবস্থা কল্পনা মাত্র হয়। গুণের নিত্য বৈষম্যই স্বীকার করিতে হইবে। এই হেতু প্রধান সৃষ্ট্যাদির কারণ অস্বীকৃত হইল।

বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ ॥১০॥

চ (আরও) বিপ্রতিষেধাৎ (শ্রুতি-স্মৃতি নানা রকমের বিরুদ্ধতা হেতু) অসমঞ্জসম্ (সাংখ্যমতেও সামঞ্জস্য নাই।)

শ্রুতি-স্মৃতি সাংখ্য-বিরোধী। সাংখ্যবাদীদের মধ্যেও মতভেদ আছে। 'কচিৎ সপ্তেন্দ্রিয়ানি' অর্থাৎ কেহ বলেন ইন্দ্রিয় সাতটী। আবার কেহ বলেন—ইন্দ্রিয় একাদশ। কোন সাংখ্যবিৎ পণ্ডিত বলেন—'ত্রীণ্যন্তঃকরণানি'—অন্তঃকরণ তিনটী। 'কচিদেকম্'—কেহ বলেন একটী। স্বমতাবলম্বীদের মধ্যে এইরূপ উক্তিও সাংখ্যবাদে অনাস্থার কারণ হয়।

সাংখ্যবাদী বলিতে পারেন—বেদান্তদর্শনও সামঞ্জস্য-পূর্ণ নহে। ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মক ও সর্ব্বপ্রপঞ্চের কারণ। ব্রহ্মই সর্ব্বোপাদান বলিয়া বেদান্তদর্শনে স্বীকৃত হইয়াছেন। আবার ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশও তাহাতে করা হইয়াছে। সবই যখন ব্রহ্ম, তখন কে কাহার জ্ঞান লাভ করিবে? বেদান্তে জল বীচি, তরঙ্গ, ফেন, এই সকল দৃষ্টান্তের দ্বারা যতই আত্মপক্ষের সমর্থন থাকুক, ঐ সবই জলের ভঙ্গী ভিন্ন অন্য কিছু নহে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। ব্রহ্মই যখন জীব ও জগৎ, তখন আবার ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজন স্বীকার করিলে, স্বমত-বিরোধ দোষের অসদ্ভাব এ পক্ষেও যে নাই ইহা কিরূপে বলা যায়। ইহার উত্তর দিতে গিয়া মায়াবাদী ভাষ্যকারগণ ব্রহ্ম ও জগৎ, এই দুইয়ের মধ্যে ব্যবহারিক ভেদের কথা স্বীকার করিয়া, এই ভেদ আসলে সত্য নহে, উহা ভ্রান্তি বা মায়া, এরূপ প্রমাণ করার চেষ্টা করিয়াছেন। অজ্ঞান দূর হইলে, এক নিগূঢ় ব্রহ্ম মাত্রই অবশিষ্ট থাকেন। কিন্তু আমাদের মতে, এই ব্যাখ্যা ব্রহ্মসূত্রের অনুসরণ করে না। নিদ্রাভঙ্গে স্বপ্নদৃষ্ট দৃশ্যাদির ন্যায় এই জগৎ অলীক বা মায়া, এ কথা বেদান্তের নহে।

বৈদিক ঋষিগণ ব্রহ্মই সৃষ্টির উপাদান বলিয়াছেন। সাংখ্যবাদীরা সৃষ্টির উপাদান ঈশ্বর না বলিয়া প্রকৃতি বা প্রধান বলিয়াছেন। বৈশেষিকেরা বলিয়াছেন—সৃষ্টির উপাদান ব্রহ্ম বা প্রধান নহেন—জগৎ-কারণ পরমাণু-সমষ্টি। ব্রহ্মসূত্র সাংখ্যবাদ ও বৈশেষিকবাদ খণ্ডন করিয়া আত্মমতপ্রতিষ্ঠায় যত্নবান্ হইয়াছেন। বেদান্ত উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছেন যে, ব্রহ্মই জগৎ, জগৎই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ও জগৎ দুই অভিন্ন। বেদে, উপনিষদে ও পুরাণে সর্ব্বত্র এই কথাই আছে। পুরাণকার বলিতেছেন—

> বিষ্ণোঃ সকাশাৎ সম্ভূতং জগৎ তত্রৈব সংস্থিতম্।
> স্থিতি-সংযমকর্ত্তাসৌ জগতোঽস্য জগচ্চ সঃ॥

অর্থাৎ বিষ্ণু হইতে জগৎ সম্ভূত হইয়াছে, তাঁহাতেই সংস্থিত রহিয়াছে, তিনিই এই জগতের স্থিতি ও সংযমের কর্ত্তা। শুধু তাহাই নহে, তিনিই জগৎ।

এক পক্ষের কথা—এই সবই প্রধান। অন্য পক্ষের কথা—এই সবই পরমাণু-সম্ভূত। কিন্তু ব্রহ্মবাদী বলিতেছেন—জগৎ ব্রহ্মই। সাংখ্যবাদীর প্রধান অচেতন। বৈশেষিকের মতেও পরমাণু জ্ঞানশক্তিহীন। স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে—এই সৃষ্টি-চাতুর্য্যের মূলে জ্ঞানের স্থান কি নাই? সৃষ্টির উপাদান যে ব্রহ্ম, তিনি জ্ঞানস্বরূপ—ব্রহ্মবাদীই এই কথা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন।

ব্রহ্ম জগৎকারণ, আর সেই জগৎ নিত্য, এ কথা স্বীকার করিলে, মোক্ষবাদ নিরর্থক হয়—এই হেতু মায়াবাদী ভাষ্যকারগণ জগৎকে স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছেন এবং সৃষ্টির মূলে চেতনের প্রবৃত্তিকে নানা অর্থে ধূমাচ্ছন্ন করিয়া ব্রহ্ম মণির ন্যায় স্বয়ং অপ্রবর্ত্তমান অথচ তাঁহার প্রবর্ত্তন-শক্তিতে মায়াপ্রপঞ্চের সৃষ্টি, এইরূপ অর্থে সাংখ্যের মতই ঈশ্বরের অস্তিত্বকে এক প্রকার শূন্যেই পরিণত করিয়াছেন। আমরা বলি—জগৎ-সৃষ্টির প্রবৃত্তি ব্রহ্মের, অচেতন প্রধানের নহে, এই স্পষ্ট উক্তি ব্রহ্মসূত্রে যখন পাইতেছি এবং উপনিষদাদিতেও যখন ব্রহ্মের সিসৃক্ষু স্বভাবের পরিচয় পাইতেছি, তখন ব্রহ্মকে শুধু স্থাণু, অচল, সনাতন প্রমাণ করার প্রবৃত্তি মোক্ষবাদীর জিদ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? আমরা প্রত্যক্ষ করি—প্রবৃত্তিহীন প্রস্তরাদি জড় পদার্থ চৈতন্যবিশিষ্ট শিল্পীর রচনা-প্রবৃত্তিতেই সুরম্য অট্টালিকায় যেমন পরিণত হয়, সেইরূপ বিচিত্রবিন্যাসপটু, প্রবৃত্তিশীল ব্রহ্ম সাংখ্যের অচেতন প্রধানের উপাদানে অথবা বৈশেষিকের পরমাণু-সমষ্টির সমবায়ে যদি বিচিত্র সৃষ্টির বিধাতৃপুরুষ হন, তাহা হইলে সেই বিরাট্ অলক্ষ্য পুরুষের সঙ্কল্প, প্রবৃত্তি প্রভৃতি গুণ ও গুণ-শক্তি থাকিলে, আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে কোন বাদেরই মস্তিষ্কে স্থানাভাব হইবে না। ঈশ্বরের রচনাকৌশল আছে, প্রবৃত্তি আছে, তাঁর ক্রিয়াশক্তিও আছে; কিন্তু তাহা এত প্রচুর, যাহা আমাদের বুদ্ধি-মন পরিমাপ করিতে পারে না। মানব-বুদ্ধির প্রকৃষ্টতর উৎকর্ষতায় আমরা প্রধানবাদ, পরমাণুবাদ, ক্ষণিকবিজ্ঞান-বাদ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছি—ঈশ্বরবাদ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য বলিয়াই আমরা এইখানে শ্রুতি-প্রমাণই সার করিয়াছি। সৃষ্টিবাদ ন্যায় ও বিচারের অন্তর্ব্বর্ত্তী করিয়া দেখিতে হইলে, আমরা সাংখ্য অথবা বৈশেষিকের মতবাদের সীমা ছাড়াইতে পারি না। পরন্তু শ্রুতি আপ্তবাক্য। শ্রুতি বলিতেছেন—জগতের উপাদান ব্রহ্ম। ইহা প্রত্যয় করিয়া লইলে, আর বিচারের প্রয়োজন নাই। বিশ্বাসের জন্য আপ্তবাক্যই যথেষ্ট। তত্রাপি শ্রুতির অনুকূল বিচার আবার এই আপ্তবাক্যকে অনেকখানি সংশয়মুক্ত করে; এই জন্যই ব্রহ্মসূত্রের অবতারণা।

মানুষ ঈশ্বরেরই প্রতিরূপ। মানুষের মধ্যে যত গুণ, সবই ঈশ্বর-গুণ। বৈচিত্র্য ঈশ্বরেচ্ছা; নতুবা মনু মহারাজ বলিবেন কেন—

> কর্ম্মণাঞ্চ বিবেকার্থং ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ব্যবেচয়ৎ।
> দ্বন্দ্বৈর যোজয়চ্চেমাঃ সুখদুঃখাদিভিঃ প্রজাঃ॥

অর্থাৎ কর্ম্মসকলের বিভেদ হেতু ধর্ম্মাধর্ম্ম বিভাগ করিয়া সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বে তিনি প্রজাদের নিযুক্ত করিলেন।

স্রষ্টা যিনি, তিনিই সৃষ্টির উপাদান। এ কথা অস্বীকার করিলে, ব্রহ্ম ব্যতীত বস্তু স্বীকার করিতে হয়। যখন তিনিই স্রষ্টা এবং তিনিই সৃষ্টি, তখন সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব তাঁহারই ইচ্ছাভূত—তাহা না হইলে, জীবের মধ্যে হিংসাহিংসা, ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন গুণের অভিব্যক্তি অন্য কোথা হইতে আসিল? এই সৃষ্টি আদ্যন্তহীন। মায়াবাদী শ্রুতি-স্মৃতি ন্যায়, এই তিনের আশ্রয়ে জোর করিয়া আত্মমতপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করিয়াছেন। পরন্তু মোক্ষবাদ প্রস্থান ত্রয়ের লক্ষ্য নহে। স্মৃতির এই উক্তিই তাহার দৃষ্টান্ত—

> যন্তু কর্ম্মাণি যস্মিন্ স ন্যযুঙক্ত প্রথমং প্রভুঃ।
> স তদেব স্বয়ং ভেজে সৃজ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ॥

অর্থাৎ যে কর্ম্মে যাঁহাকে সেই প্রভু আদিতে নিযুক্ত করিলেন, সে সৃজ্যমান হইয়া পুনঃ পুনঃ স্বয়ং সেই কর্ম্মে নিযুক্ত রহিল।

কথাটা সাংঘাতিক। স্মৃতির এই শ্লোক স্বীকার করিলে, মোক্ষবাদের ভিত্তি-রক্ষা হয় না। এই শ্লোকার্থে সহজেই অনুমান হয় যে, সৃষ্টিকর্ত্তা যখন যাহাকে যে কর্ম্মে সৃষ্টির আদিতে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সে যখন কল্পান্তকাল সেই কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিবে, তখন করিবার আর কি আছে? বন্য কুক্কুট ডিম্ব প্রসব করে, সেই ডিম্বস্থিত বন্য কুক্কুটের ভ্রূণ যেমন স্বভাববশে স্বতঃই

প্রস্ফুটিত হয়, জীবও সেইরূপ আদি-স্বভাব স্বতঃই স্ফুরণ করিয়া চলিয়াছে। অতএব প্রাচীন ঋষিগণের শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ পথের বিচার-বিশ্লেষণ, বিধি-নিষেধ প্রভৃতি নীতি-প্রবর্ত্তনের কি প্রয়োজন? জীব যখন সৃষ্টির প্রথমেই স্ব-স্ব ধর্ম্মে প্রবর্ত্তমান, তখন নিষেধে কে স্বধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইবে? কেই বা শাস্ত্র-বিধির প্রতীক্ষা রাখিবে? এক পক্ষে সত্যই কিছু বলিবার নাই। কিছুর খ্যাতি বা কিছুকে নিন্দা করিবার কি থাকিতে পারে? সবই স্বভাব-স্বধর্ম্মে লীয়মান হইয়া চলিয়াছে। এক মন্বন্তরে সপ্তর্ষি, দেবতা ও পিতৃগণ অন্য মন্বন্তরে প্রবহমান হন—এরূপ বিবৃতি পুরাণ খুলিলেই চক্ষে পড়ে।

যথা সূর্য্যস্ত মৈত্রেয় উদয়াস্তময়াবিহ।
এবং দেবনিকায়াস্তে সম্ভবন্তি যুগে যুগে॥

পুরাণকার স্পষ্টই বলিতেছেন—

হে মৈত্রেয়! সংসারে সূর্য্যের উদয়াস্তের ন্যায় দেবসকল যুগে যুগে সম্ভূত হন।

সৃষ্টি-প্রবাহ এইরূপেই চলিয়াছে। কল্প কাল পর্য্যন্ত স্রষ্টা এইরূপই হইতে চাহিয়াছেন। লয়-লক্ষণও এই হওয়ারই পরিবর্ত্তনক্রম মাত্র। জীবন যখন ঈশ্বর ব্যতীত বস্তু নহে, তখন 'আর হইব না, মোক্ষ লাভ করিব', এই আদর্শ, এই আকাঙ্ক্ষা শ্রৌত বা স্মার্ত্ত মত নহে।

বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রয়োজন আছে। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে যে প্রকরণ-ভেদ, তাহাও অনুধাবন করিতে হইবে। দেবতা, যক্ষ, রক্ষ, মানব, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, তরু, লতা, স্থাবর, জঙ্গম সবই সৃষ্টি, ইহারা স্রষ্টা নহেন। গো, মনুষ্য, এই সকল আকৃতির যে নিত্যপ্রবাহ চলিয়াছে, ইহাদের মধ্যে যে ধর্ম্ম গোড়ায় নিহিত হইয়াছে, তাহার অন্যথা হইবে না। স্রষ্টা এই সকল আকৃতির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ও সেই আকৃতির ধর্ম্মে আবিষ্টচিত্ত হইয়া যথানির্দ্দিষ্ট আয়ুষ্কাল ভোগ করেন। গো-জাতি বৈদিক যুগেও দুগ্ধ দিয়াছে, আজও দিবে। সৃষ্টির আদিতে সর্প ফণা তুলিয়াছে, আজও সে দংশনোদ্যত হইবে। রাবণ, হিরণ্যকশিপুর আশ্রয়ও যেমন চিরযুগ আছে, তেমনি রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধের প্রবাহ নিঃশেষ হইবে না। শাস্ত্রোপদেশ, তপস্যা, বৈরাগ্য দেহের জন্য নয়। দেহী আকৃতিবিশিষ্ট হইয়া, দেহ-ধর্ম্মে আত্মসংবিৎ হারাইয়া ফেলেন; আবার সেই পরম সংবিতের অনাহত মূর্চ্ছনা তিনিই রক্ষা করেন বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে, ঋষির কণ্ঠে। এই জন্যই আকৃতি হইতে আকৃতিতে দেহী অধিরোহণ করিয়া চলেন। যেখানে বেদের ঋক্ অস্পষ্ট হয়, সেখানে দেহীর অবতরণও দ্রুত হইয়া থাকে। আসলে স্রষ্টাই সৃষ্টি হইয়া লীলারূপে অভিহিত। ব্রহ্মসূত্রকার তাই জগৎ-কারণ ও জগৎ-নিয়ন্তা ব্রহ্ম, এই কথা ন্যায় ও বিচারের দ্বারা যত না হউক, শ্রুতি-বাক্য আশ্রয় করিয়া প্রমাণ করিতেছেন। এইরূপে সাংখ্যবাদ নিরাস করিয়া তিনি অতঃপর বৈশেষিক মতবাদ নিরসন করিবেন।

(ক্রমশঃ)

গান

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

যে পথ ধ'রে তুমি ওগো!
চ'লছ দিবস রাতি,
আমায় প্রিয় নাওহে ক'রে
সেই পথেরই সাথী।

অসার মম জীবন তবে
চ'লবে ব'য়ে হায় নীরবে
তোমার সঙ্গে নিত্য ওগো
আনন্দেতে মাতি'॥

সংসারের মিথ্যে মায়ায়
জড়িয়ে পলে পলে,
স্বপ্নে যেন ক্ষণে ক্ষণে
কোন্‌খানে যাই চ'লে!

তোমার পথের পথিক ক'রে
নাও যদি মোর হাতটী ধ'রে,
হয়ত মোহ ঘুচ্‌বে তবে,
নিভ্‌বে দুখের বাতি॥

মেঘ ও রৌদ্র

শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পাঁচ

ট্রাম থেকে নেমে বেশ খানিকটা সুদীর্ঘ পথ পার হ'তে হোল। গলিটা খুবই সরু—তিনজন লোক পাশাপাশি চল্‌তে পারে না—দুধারে হিমালয়ের মত বাড়ীগুলো আকাশ লক্ষ্য ক'রে ওপরের দিকে উঠে গেছে। চল্‌তে চল্‌তে খাইবার অথবা বোলান গিরি-পথকে মনে পড়ে। ওপরের একফালি আকাশ থেকে ঝল্‌সে পড়া খানিকটা আলোয় গলির নিরন্ধ্র অন্ধকারটা অপসৃত হ'য়েছে—কোনো রকমে পথ চলা যায়।

এরই মধ্যে একপাশে আবার ছোট একটা ড্রেণ। এক জায়গায় একটা মরা বেড়াল আর কতক আবর্জনা স্তূপীকৃত হ'য়ে র'য়েছে;—মরা বেড়ালের অসহ্য গন্ধে আভা নাকে রুমাল চাপা দিলে। বল্‌লে, 'এর থেকে কি আর ভাল রাস্তা ছিল না রে?—ছি ছি, মানুষে আসে এখানে?"

"শুধু আসেই না—রীতিমতো বাস করে, স্ত্রী-পুত্র কন্যাদি সহ, বুঝ্‌লি?" গার্গী চল্‌তে চল্‌তে উত্তর দিলে।

"হ্যাঁ, সে তো বুঝ্‌লাম—" আভা কথাটাকে একটু সাম্‌লে নিতে চেষ্টা ক'রলে, "মানে আমি বল্‌ছিলাম, অন্য কোনো একটা পরিষ্কার পথ যদি থাক্‌তো—এঃ এই নোংরার মধ্যে—"

"তা হ'লেই হ'য়েছে—" গার্গী মুখ টিপে একটু হাস্‌লো, "এই সামান্য আবর্জনাকে যার সহ্য ক'রতে নাকে রুমাল চাপা দিতে হয় তার পক্ষে সমস্ত জাতীয় আবর্জনাকে সহ্য করা—"

"থাম্‌ তুই—" আভা হঠাৎই গার্গীকে বাধা দিলে, "তোর এই কথা ঘোরানো দেখ্‌লে আমার সমস্ত শরীর জ্বলে যায় গার্গী—আমি কি বল্‌লাম, আর তুই কি বুঝলি।"

দুজনে ততক্ষণে সেই অপরিষ্কৃত আবর্জনা বহুল গলিত গলিটা পার হ'য়ে অপেক্ষাকৃত বড়ো একটা রাস্তার ওপরে এসে প'ড়েছে। এই মোড় থেকে আরও একটা রাস্তা অন্য দিকে বেরিয়ে গেছে। গার্গী রাস্তার ওপরে এসে থম্‌কে দাঁড়ালো, বল্‌লে, "সাতাত্তর নম্বর বাড়ীটা—এই বিভূপদ লেনেই—মঞ্জুদি ডিরেকশান্‌ দিয়ে দিয়েছেন—কিন্তু—"

"তুই আসিস্‌নি এখানে, এর আগে?"

"না তাঁরা আবার এই কিছুদিন হ'ল বাড়ী বর্জন ক'রেছেন কি না।" গার্গী কথা বল্‌তে বল্‌তে এগিয়ে চল্‌লো।

খানিকটা দূরে একটা স্যাকরার দোকান। সাম্‌নে অনেকখানি সিমেণ্ট করা প্রশস্ত লাল রক। একপাশে জনকয়েক তরুণ ব'সে রীতিমত জটলা করছে, তাদের আলাপ এখান থেকেই অল্প অল্প শোনা যায়। সম্প্রতি তাদের মধ্যে হিট্‌লার এবং ষ্ট্যালিনের মনোভাব নিয়ে দ্বন্দ্ব ঘটেছে, তার আভাস বেশ স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারা যাচ্ছে—গার্গী আভাকে নিয়ে সেই লাল রকটার দিকে এগিয়ে গেল। হিট্‌লার এবং ষ্ট্যালিনের মনোভাবের মধ্যে ডুবে থাকলেও তাদের প্রত্যেকেরই চোখ যে গার্গী এবং আভার ওপরে ছিল এটা গার্গী অনেক আগে থেকেই লক্ষ্য রেখেছিলো··· আর একটু এগিয়ে আস্‌তে ওদের রাজনীতি চর্চ্চা যেন মৃত হ'য়ে উঠ্‌লো—যারা ষ্ট্যালিনের ভক্ত তারা একটু গলা ঝেড়ে প্রতিপক্ষের মতবাদকে দূরিভূত করবার জন্যে সোজা হ'য়ে বস্‌ল। যারা হিট্‌লারের পক্ষে তাদের একজন গর্জন ক'রে উঠ্‌ল, "তুমি তাই বলো মণ্টু, নেপোলিয়ানের থেকে বেশী কীর্তি রেখে যাবে হিট্‌লার—এ তুমি দেখে নিও—আজেবাজে একটা যা তা কথা বল্‌লেই হোল!"

একজন প্রায় হাঁটুর ওপরে কাপড় গুটিয়ে বসেছিল—তাড়াতাড়ি কাপড়টাকে টানাটানি ক'রে সংযত হ'য়ে বস্‌লো।

"সাতাত্তর নম্বরটা কোন্‌ দিকে পড়বে বল্‌তে পারেন—?"

"সাতাত্তর নম্বর ?" ষ্ট্যালিন-ভক্ত ছেলেটী রকের ওপরে উঠে দাঁড়িয়েছে—বল্‌লে, "সাতাত্তর নম্বর ? মানে ওই কুমারী কল্যাণ—না—কি ?"

গার্গী মাথা নাড়ল—"হ্যাঁ, সেইটাই !"

"ও—সে তো আমাদের বাড়ীর কাছে !" গার্গী এবং আভার অতর্কিত আগমনে নিজের শালীনতা নিয়ে যিনি সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠেছিলেন, তিনি লাফিয়ে উঠ্‌লেন, "চলুন না,—আমি দেখিয়ে দিচ্ছি—"।

গার্গী একটু হেসে বল্‌লে—"ধন্যবাদ !"

ছেলেটী তাড়াতাড়ি রাস্তায় নেমে এল, "আসুন এই গলিটার মধ্যে দিয়ে যেতে হ'বে।"

গার্গী আর আভা এগিয়ে চল্‌লো—পিছনের সেই বিরাট্ আলোচনাসভায় এখন যেন যুগান্তের শুব্ধতা নেমে এসেছে—কোথায় ষ্ট্যালিন—আর কোথায় বা হিট্‌লার !

"এই যে এসে গেছি আমরা"—ছেলেটী পথের এক-পাশে থমকে দাঁড়ালো—বড় বড় ক'রে 'কুমারী কল্যাণ সঙ্ঘ' লেখা সাইন বোর্ডটার দিকে আঙুল তুলে বল্‌লে, "ওই ওপরের ঘরে অফিস্, আর এই যে" ছেলেটি একটু এগিয়ে গেল, "এই খান দিয়ে এন্‌ট্রান্স—"

আভা এতক্ষণে কথা কইলে, বল্‌লে, "অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে—আমাদের জন্যে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করলেন আপনি।"

"না—না, কি যে বলেন—কি যে বলেন, এই তো সামান্য এইটুকু পথ—এ আর আসতে কি ?—বরং আপনাদের যে একটু সামান্য উপকারও করতে পারলুম—আপনাদের সঙ্গে আলাপ হল—"

গার্গী হেসে বল্‌লে, "আচ্ছা নমস্কার—"

ছেলেটী তাড়াতাড়ি দুটী হাতের মধ্যে নমস্কারের ভংগী আনমিত ক'রে আন্‌লে, বল্‌লে "নমস্কার—"

দরজাটা পার হ'য়ে বেশ খানিকটা অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে গিয়ে ওপরে যাবার সিঁড়ি। সিঁড়িটা কাঠের, উঠ্‌তে রীতিমত জুতোর শব্দ হয়।

গার্গী বল্‌লে, তরুণটিকে বল্‌লে, "আমার পায়ের থেকে জুতোটাও খুলে দিত বোধ হয়—"

আভা হাস্‌লে, বল্‌লে, "যা :—ভারী ইয়ে তুই—বেচারী তোকে এমন ক'রে সহানুভূতি দেখাল, সাহায্য করলো, আর তুই তাকে জুতোর সম্মান দিলি ?"

"ওদের এ-ছাড়া আর কি ই বা দিতে পারি ?" গার্গী একটু হাস্‌লো, বল্‌লে, "নিজেদের ওরা সেই ভাবেই যে বিজ্ঞাপিত করে—দোষটা বিচার্য্য !"

ওপরে এসে দুজনে হাঁপ ছাড়ল, গার্গী বল্‌লে, "এমন জায়গা যে শেষকালে মঞ্জুদি কি ভেবে মঞ্জুর করলেন সেইটাই আশ্চর্য্য লাগে—আমি তো হাঁপিয়ে উঠেছিলুম একেবারে।

খানিকটা গিয়েই ডান দিকে একটা ছোট হলের মত, তারই মধ্যে সভা বসেছে—সমস্ত হলটাই প্রায় পূর্ণ। প্লাটফরমের ওপরে মঞ্জুদি দাঁড়িয়ে আছেন।

"আরে", মঞ্জুদি তাড়াতাড়ি প্লাটফরম্ থেকে নেমে এলেন, "ভাবলাম, তোমরা আর আস্‌বে না শেষ পর্য্যন্ত।"

"তা' একরকম সত্যি মঞ্জুদি, এমন জায়গা ঠিক করেছ যে, আমরা আস্‌তেই পারতাম না বোধ হয়—নেহাৎ একটি তরুণ দয়া ক'রে"—গার্গী থামল।

"এস, এস", মঞ্জুদি দু'জনের হাত ধ'রে প্লাটফরমের ধারে নিয়ে গেলেন—দুখানা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে বল্‌লেন, "বস—খুব দরকার ছিল তোমাদের সঙ্গে—"

ঘড়িতে সাড়ে নটা বেজে গেল।

সমস্ত সভার মধ্যে কিছুক্ষণ হ'তে অস্পষ্ট গুঞ্জন আরম্ভ হ'য়েছে—সঙ্ঘ-সভ্যাদের মধ্যে কারও বয়সই তিরিশের বেশী বলে মনে হয় না। অধিকাংশই কলেজের অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। দু'জন মাত্র কলকাতার কোনও বিখ্যাত কলেজের অধ্যাপিকা আছেন—এক জন হ'চ্ছেন সঙ্ঘের সভানেত্রী শ্রীমতী মঞ্জু সেন, অন্য জন মল্লিকা মল্লিক।

মঞ্জুদি প্লাটফরমের ওপরে এসে দাঁড়ালেন। সমস্ত সভাকে লক্ষ্য করে' বল্‌লেন, "এইবার আমাদের সভার কাজ আরম্ভ হ'বে। তার আগে আপনাদের সঙ্গে আমার অন্যতম সহকর্মিণী শ্রীমতী আভা রায়ের পরিচয় করিয়ে দিই। এঁকে বোধহয় আপনারা অনেকেই দেখেননি। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয়, আজ এই সঙ্ঘের উন্নতির মূলে প্রথমে এঁরা দুজনেই ছিলেন" বলে মঞ্জুদি গার্গীর দিকে চাইলেন—তারপরে বল্‌লেন, "শ্রীমতী আভা দেবী সম্প্রতি আমাদের থেকে সাংসারিক কোন কারণেই একটু বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়েছেন—কিন্তু তা' হলেও আপনারা শুনে আনন্দিতা হবেন যে, ইনি দিল্লীতে কাজ করবার ভার নিতে স্বীকৃতা হ'য়েছেন এবং আমরা সঙ্ঘের পক্ষ থেকে তার জন্যে এঁর কাছে যথেষ্ট কৃতজ্ঞ।"

সমস্ত সভার মধ্যে আর একবার অস্পষ্ট গুঞ্জন উঠ্‌ল—তারপরে মৃদু হাততালির শব্দ শোনা গেল। মঞ্জুদি চেয়ারের ওপরে বস্‌লেন। আভা ততক্ষণে দু'হাত যোড় করে' সমস্ত সভাকে নমস্কার জানালে।

(ক্রমশঃ)
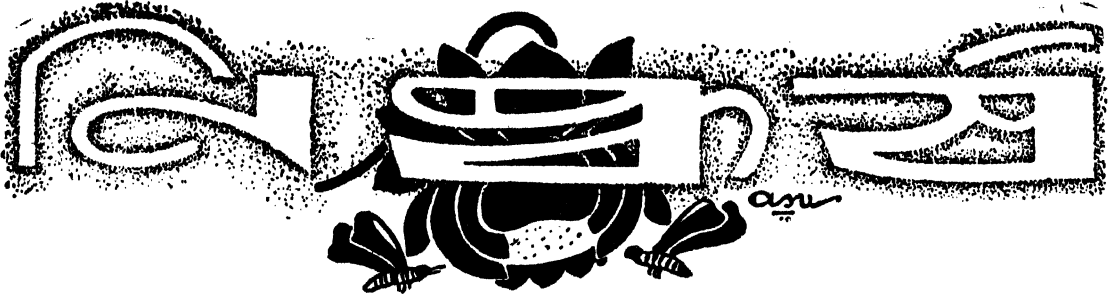
উপাসনার প্রভাব

সম্প্রতি খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসক ডক্টর এ্যালেক্সিস্ ক্যারোল 'রিডার্স ডাইজেষ্ট' নামক পত্রিকায় 'উপাসনাই শক্তি' শীর্ষক প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা এ যুগে বিশেষ অনুধাবনীয়।

সঞ্চারী গ্রন্থিসমূহের (secreting glands) প্রভাব আমরা আমাদের দেহে মনে অনুভব করি, উপাসনার প্রভাবও এইভাবে মানুষের দেহে ও মনে নির্দ্দেশ করা সম্ভব। উপাসনার শক্তি বোঝা যায় আমাদের বর্দ্ধিত প্রাণপ্রাচুর্য্যের মধ্য দিয়া। উপাসনা চিত্তবৃত্তিকে বিকশিত করে, নৈতিক শক্তিকে দৃঢ় করিয়া তোলে। মানুষের সহিত মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধের নিগূঢ় তাৎপর্য্য বুঝি আমরা ইহারই সাহায্যে পাই।

উপাসনাই একমাত্র শক্তি, যদ্দারা আমরা প্রকৃতির নিয়মের (laws of nature) ব্যতিক্রম করিতে পারি বলিয়া মনে হয়। যে ক্ষেত্রে উপাসনা দ্বারা হঠাৎ এই রকম কিছু করা সম্ভব হয়, সে ক্ষেত্রে আমরা ইহাকে বলি 'miracles'; কিন্তু মানুষের দেহে ও মনে প্রতি মুহূর্ত্তে নিরবচ্ছিন্নভাবে যে ইন্দ্রজাল ঘটিতেছে, তাহা এই উপাসনাদ্বারাই সম্ভব হয়। উপাসনা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে শক্তির যোগান দেয়, তাহাই আমাদের বাঁচিবার সামর্থ্য আনে......

বিশ্বের যে কেন্দ্রশক্তি এই জগৎটাকে পরিচালিত করে, উপাসনার মধ্য দিয়া আমরা যেন তাহারই স্পর্শ অনুভব করি। আমরা প্রার্থনা করি, সেই শক্তির স্ফুলিঙ্গ যেন আমাদের প্রয়োজনকে সার্থক করে।

ব্যক্তিত্ব গড়িয়া তুলিতে হইলে, নিয়মিত উপাসনা করার দরকার। সকালে আমরা প্রার্থনা করি আর সারাদিন অমানুষী কার্য্যকলাপে দিন কাটাইয়া দিই—ইহা অর্থহীন।

আজ ব্যক্তি ও জাতির পক্ষে উপাসনার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। ধর্ম্মের দিক্‌টাকে দীর্ঘকাল এড়াইয়া আজ আমরা ধ্বংসের প্রান্তঃসীমায় পৌঁছিয়াছি।

ভারতীয় চিকিৎসাপদ্ধতি ও স্বরাজ

মাদ্রাজের গোখলে হলে ডাঃ জর্জ্জ এস আরুণ্ডেল 'ভারতীয় চিকিৎসাপদ্ধতি ও স্বরাজ' সম্বন্ধে যে সুচিন্তিত বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে অয়ুর্ব্বেদের মহিমা সম্বন্ধে এদেশবাসীরও চোখ খুলিবে। অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

"আমাদের মুস্কিল হইয়াছে এই যে, জীবনের সর্ব্ব বিভাগেই আমরা দাস-মনোবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিয়া আসিতেছি। আমাদের দৃঢ়বদ্ধ ধারণা, পাশ্চাত্ত্যের যাহা কিছু সবই আমাদের পক্ষে ভাল; আমাদের ধারণা, পাশ্চাত্ত্যের দ্বারপথ দিয়া যাহা আসিতেছে, সবই সভ্যতার দ্যোতক। এই দাসমনোবৃত্তির ফলে ভারতের বহু গৌরবের বস্তুকে আজ আমরা উপেক্ষা করিতেছি।

যখন আমরা ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা মনে করি এবং এই শাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা ও স্রষ্টা ঋষিদের কথা চিন্তা করি, তখন স্বভাবতঃই মনে হয়, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের মহামন্ত্রগুলি আসিয়াছে চিন্তাজগতের ঊর্দ্ধ লোক হইতে। এই মহামনীষিগণ জীবনরহস্যের শাশ্বত মন্ত্রগুলি আমাদের বোধগম্য করিয়া দিয়াছেন।

পাশ্চাত্য চিকিৎসাতন্ত্র অপেক্ষা ভারতীয় চিকিৎসাপদ্ধতি আমার কাছে শ্রেষ্ঠতর ও অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত বলিয়া মনে হয়। মানুষের দেহযন্ত্রের যে অবস্থাগুলি ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র গ্রহণ করিয়াছে, তাহার অধিকাংশই আজ ইউরোপ কর্তৃক পরিত্যক্ত। ইউরোপ যদি আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রকে গ্রহণ করিত, তাহা হইলে অধিকতর স্বাস্থ্যসম্পন্ন হইতে পারিত বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। নিজের দিক্ হইতে বলিতে পারি, আমি কোন দিন এলোপ্যাথির হাতে নিজের দেহটাকে সমর্পণ করিব না।

ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়, ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসাপদ্ধতির প্রচুর সুযোগ ও সম্ভাবনা রহিয়াছে। প্রথমতঃ পরিচ্ছন্নতার দিক্ দিয়া ইহার তুলনা নাই। পাশ্চাত্য চিকিৎসায় আমরা কি গলাধঃকরণ করিতেছি, তাহার বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিয়া যায়। ভারতীয় ঔষধ ভেষজপ্রধান, প্রকৃতিজাত—ইহার বিশুদ্ধতা ও পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবসর থাকে না।

প্রাণিদেহের উপর চূড়ান্ত নিষ্ঠুরতা—ব্যবচ্ছেদের অমানুষিকতা পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের প্রথম কথা। আমি আশা করি, ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ এই পদ্ধতি গ্রহণ করিবে না। বিশুদ্ধতা, চিকিৎসার সহজ প্রণালী, ঔষধের অকৃত্রিমতা আয়ুর্ব্বেদের বৈশিষ্ট্য। এই দিক্ দিয়া এলোপ্যাথি অপেক্ষা ইহার উন্নতি ও প্রসারের যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রবীন সাংবাদিক শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মহাবোধি সোসাইটি হলে প্রসঙ্গক্রমে যে সব কথা বলিয়াছিলেন তাহা নানা দিক্ দিয়া উল্লেখযোগ্য। উক্ত বক্তৃতার একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত হইল:—

সাহিত্য মানুষের অন্তরের পূর্ণ বাহ্য প্রকাশ। প্রগতি-সাহিত্যের যাঁহারা ভক্ত, তাঁহারা বলিতে পারেন—রুচিবাগীশেরা তাঁহাদের (প্রগতিবাদীদের) self-expression করিতে দেন না। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'বাংলা ভাষা পরিচয়' গ্রন্থে যাহা বলিয়াছেন, তাহা অনুধাবন করা কর্ত্তব্য। তিনি লিখিয়াছেন—যাতে মানুষকে পশুর মত করে, সেই "স্ব" দ্বারা প্রকৃত self-expression বা আত্মপ্রকাশ হয় না। সাহিত্য মানুষের অন্তরের পূর্ণ বাহ্যপ্রকাশ বলিয়া রাষ্ট্র, অর্থনীতি, সমাজনীতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিষয়ে পূর্ণ আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতার উপর সাহিত্যের উৎকর্ষ নির্ভর করে।"

মুক্তির সন্ধানে ভারত—ভারতের নব-জাগরণের ইতিবৃত্ত—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত। প্রকাশক—এস্, কে, মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স, ১২ নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা। পৃঃ সংখ্যা ৪৮৪, দাম আড়াই টাকা।

মুক্তির সন্ধানে ভারত—ভারতবর্ষের শতাব্দীকালের ইতিহাসের একটি মনোজ্ঞ পরিচয়। উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা হইতে ভারতের জাতীয় জীবনে সংস্কৃতিগত যে দ্বন্দ্ব জাগিয়া ওঠে, তাহারই বিচিত্র তরঙ্গ-লীলা এ যুগের ইতিহাসকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবে। ১৮০০ সালে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সংস্পর্শে আসিয়া বাঙালীর মনীষা এক শক্তিশালী সংস্কৃতির মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইল। ইহার পর জাতির ইতিহাসে সুরু হইল গ্রহণ ও সামঞ্জস্যের যুগ। লেখক এই সময়টাকে রেনেসাঁ নবজাগরণের যুগ বলিয়াছেন। ইংরেজের ভারতে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে যে রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়, তাহার সঙ্গে তাল মিলাইয়া মিশনরীগণ কর্ত্তৃক যে সামাজিক ও শিক্ষামূলক প্রচারকার্য্য সুরু হইল, তাহাতে বাঙ্গালী হইল অগ্রগামী। রাষ্ট্র, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, ললিতকলা—সব দিকেই জাতির হৃৎস্পন্দন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। এই রেনেসাঁকে পুরাপুরি গ্রহণ করিয়া বাঙালী কি পাইয়াছে এবং কি হারাইয়াছে, তাহার হিসাব নিকাশের দিন আজ আসিয়াছে।

এই পুস্তকে লেখক ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত ভারতের প্রধান প্রধান ঘটনা ও ভাবধারা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। পুস্তকটি আদ্যোপান্ত পড়িয়া মনে হইল, লেখক গ্রন্থরচনায় যে শ্রমশীলতা ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়াছেন তাহা সার্থক হইয়াছে। সাধারণ পাঠক দেশ ও জাতিকে জানিবার মত অনেক কিছুই ইহাতে পাইবে। তথ্য ও ইতিহাস একত্র মিলিত হইয়া পুস্তকটিকে সত্যকারের উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা নজরে পড়ে লেখকের ভাষা। তাঁহার সরল ও বেগবান্ ভাষার সংস্পর্শে আসিয়া ঐতিহাসিক বহু তথ্য মনোরম হইয়া উঠিয়াছে। প্রবন্ধ-লেখকের পক্ষে ইহা কৃতিত্বের কথা। এই সুদীর্ঘ পুস্তকটি পড়িবার পর আমাদের মনে হইয়াছে, লেখকের এই কৃচ্ছ্র সাধন সার্থক হইয়াছে; জাতির ভবিষ্যৎ জীবনের একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ইহাতে পাইয়াছি। আমরা পুস্তকটির প্রচার কামনা করি।

ভারতের দেব-দেউল—শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পৃঃ সংখ্যা ২৪৪, মূল্যের উল্লেখ নাই।

ভারতীয় শিল্পের প্রাচীন ইতিহাসে গৌরব করিবার মত বস্তুর অভাব নাই। ইলোরা, অজন্তা, বুদ্ধগয়া, বৃন্দাবন, মথুরাপুর, আবুপাহাড় প্রভৃতি স্থান ভারতের শিল্প-প্রতিভার নিদর্শন। দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্য-ঐশ্বর্য্য আধুনিক যুগের কল্পনাকে পর্য্যন্ত পরাস্ত করিয়াছে। ভারতের এই প্রাচীন শিল্পকৌশল ধর্ম্মমন্দির ও সাধনকেন্দ্রকে ঘিরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। হিন্দু স্থাপত্য-শিল্পের ইহাই বোধহয় বিশেষত্ব ছিল। আধুনিক যুগের বিজ্ঞানী দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ভারতের এই অপূর্ব্ব শিল্প-সমারোহের অনুসন্ধান চলিতেছে। আলোচ্য পুস্তক এই প্রচেষ্টাকে অবলম্বন করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। লেখক অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে ভারতের অগণিত দেব-দেউল ও শিল্পরীতি সম্বন্ধে পাঠকের সহিত একটা পরিচয় করাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং আমাদের মনে হয় অনেকাংশে সার্থকও হইয়াছেন। ভারতীয় শিল্প ও স্থাপত্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণের মত উদ্ধার করিয়া তিনি তাঁহার বক্তব্যকে পরিস্ফুট করিয়াছেন, ফলে technicalities বাদ দিয়াও পুস্তকটি সাধারণ পাঠকের নিকট পরম উপভোগ্য হইয়াছে। এই ধরণের বহু পুস্তকপ্রচারের ফলে বাঙালীর চিরাগত art-blind মনোবৃত্তি দূর হইতে পারে। পুস্তকটির ছাপা কাগজ ও বাঁধাই নিখুঁত।

সম্বন্ধনির্ণয়—প্রথম পরিশিষ্ট, প্রথম খণ্ড, শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বংশাবলী ও কুল-পরিচয়। চতুর্থ সংস্করণ, মূল্য পাঁচ সিকা। ২। সম্বন্ধনির্ণয়—দ্বিতীয় পরিশিষ্ট, প্রথম খণ্ড, ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বংশাবলী ও কুল-পরিচয়, চতুর্থ সংস্করণ। মূল্য একটাকা বার আনা। ৩। সম্বন্ধনির্ণয়—তৃতীয় পরিশিষ্ট, প্রথম খণ্ড, কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বংশাবলী ও কুল-পরিচয়, চতুর্থ সংস্করণ, মূল্য এক টাকা আট আনা। ৺পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি প্রণীত এবং ৯৩।৪ হরিঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৺পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি রচিত সম্বন্ধনির্ণয় বাংলা ভাষায় সুপরিচিত গ্রন্থ। বংশাবলী ও কুলপরিচয় সম্বন্ধে এই ধরণের গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা আজ অত্যন্ত বেশী। Geneology সম্বন্ধে যে অসংখ্য পুস্তক ইউরোপে প্রকাশিত হইয়াছে, সামাজিক বিবর্ত্তনের ইতিহাসে তাহার মূল্য কত বেশী, ইহা তাহাই সূচিত করে। বাংলা দেশের আধুনিক যুগে বংশাবলী ও কুলপরিচয়ের ধারাবাহিকতা লইয়া গবেষণা করিবার প্রচেষ্টা খুব কমই হইয়াছে। এই দিক্ দিয়া এই গ্রন্থের যথেষ্ট মূল্য আছে। বর্ত্তমানে বাংলার কুলপঞ্জীর সংরক্ষক ঘটক সম্প্রদায় অনাদৃত, তাহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। আলোচ্য পুস্তকে বহু অর্থব্যয় ও শ্রমস্বীকার করিয়া বংশাবলী পরিচয় সংগ্রহ করা হইয়াছে। ভবিষ্যৎ ইতিহাসকার ইহার মধ্যে বাংলার খাঁটি সমাজ-জীবনের যে পরিচয় পাইবেন, তাহার বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা তাঁহাকে বিস্মিত করিবে। প্রকাশক সম্বন্ধনির্ণয়ের ঐতিহাসিক ভাগ পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জ্জিত করিয়া পৃথক্‌ভাবে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থটিকে ছাপা, কাগজ ও বাঁধাইয়ের দিক্ দিয়া আরও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দেখিলে আমরা সুখী হইব।

রামকৃষ্ণ—(শতাব্দী জয়ন্তী) রাজা শ্রীপূর্ণেন্দু গুহ রায়, বাণী-বিনোদ প্রণীত। প্রকাশক:—শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ, বাণী-কুঞ্জ, পোঃ—নূরনগর, খুলনা। পৃঃ সংখ্যা ২৬, দাম চার আনা।

রামকৃষ্ণদেবের শতবার্ষিকী-জয়ন্তী উপলক্ষে রচিত কবিতা। রচনার মধ্য দিয়া একটি ভক্তিনত চিত্তের পরিচয় পাইয়াছি। ভাষা ও ছন্দের গাম্ভীর্য্য বিষয়বস্তু ও উপলক্ষ্যের সহিত খাপ খাইয়াছে ভাল। আমরা কবিতাটি উপভোগ করিয়াছি।

২৭

স্মরণ রাখিতে হইবে, আমি ১৯২১ খৃষ্টাব্দের কথা বলিতেছি। এই সময়ে আমার যে ভাব ও প্রকৃতি, তাহারই পরিচয় দিতেছি এবং এই আত্মস্বভাবের পরিচয় দিতে গিয়া শ্রীঅরবিন্দের সহিত আমার যে নিগূঢ় পরিচয় ঘটিয়াছিল, তাহারই ছবি আঁকিতেছি।

চন্দননগরে সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিতেছিল। আমি খুব আশা করিয়াছিলাম—বারীন্দ্রকুমার এই সঙ্ঘকে শ্রীঅরবিন্দেরই ন্যায় আপন করিয়া লইবেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাহা সত্য হয় নাই। বারীন্দ্র এবং আমার মধ্যে শ্রীঅরবিন্দও যথেষ্ট ঐক্যপ্রতিষ্ঠার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু অন্তরের যোগ থাকা সত্ত্বেও পরস্পরের জীবন-নীতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের ছিল। নানা দিক্ লইতে এই জন্য আমাকে বেগ পাইতে হইত। আমি চাহিতাম ঐক্য; বিনিময়ে আমার বিরুদ্ধে নানা ভিত্তিহীন অভিযোগ পৌঁছিত। এমন কি বারীন্দ্রকুমার কর্ত্তৃক পরিচালিত "বিজলী" পত্রিকায় চন্দননগরের প্রতি বিদ্রূপাত্মক লেখাও বাহির হইয়াছিল। আমার অভিমান এই সকল কারণে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিত, আমি নিজেই ইহাতে আহত হইতাম। এই সময়ে একটা কথায় আমি বড় বিচলিত হইতাম—সর্ব্বত্র প্রচার হইত যে, আমি শ্রীঅরবিন্দের নাম ভাঙ্গাইয়া আপনাকে বড় করিয়া তুলিতেছি। কথাটা এত কটু বলিয়া মনে হইত যে, মধ্যে মধ্যে মনে করিতাম, শ্রীঅরবিন্দ হইতে স্বতন্ত্র হইয়াই কর্ম্ম করিব। এই ইচ্ছার মূলে ইন্ধন যোগাইবার নানা হেতুও উপস্থিত হইয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দ হইতে আমি যাহাতে স্বতন্ত্র হই, জাতির এক শ্রেণীর বুদ্ধি এই ক্ষেত্রে সহায়রূপে দেখা দিত। উপেন দাদা আমার অবস্থা দেখিয়া দরদের সহিত বলিতেন "মতি-দা! অরবিন্দ-অরবিন্দ করিয়া তোমার চারিদিকে যখন এত ফেউ লাগিয়াছে, তখন অরবিন্দকে ছাড়িয়াই তুমি দাঁড়াও; এরূপ হইলে তোমার কর্ম্ম যে যোগ-প্রকাশ, তাহা প্রমাণ হইবে।" এই সকল কথায় আমার অহমিকা পুষ্টি পাইত। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দকে দূরে রাখিয়া আমার কি কর্ম্ম থাকিতে পারে, সে সময়ে তাহা অনুসন্ধানও করিতে পারিতাম না। বৈষ্ণব কবির গান মনে করিয়া সান্ত্বনা লইতাম—

কাজ কি তোদের শ্যামের কথা কহিয়ে—
আমি আপনি করেছি প্রেম আপনি বুঝিয়ে।
আমি যদি করি মান
শ্যাম আমার রাখে মান—
হই হব অপমান শ্যামের লাগিয়ে।

এই ভাবপ্রবণ মনোবৃত্তি লইয়া সর্ব্বপ্রকার বিরুদ্ধতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমি শ্রীঅরবিন্দকে কেন্দ্র করিয়াই সঙ্ঘ-চক্র বৃদ্ধি করিতেছিলাম। কিন্তু অভিমান যে কত বড় শত্রু, তাহা প্রত্যেক সাধকেরও যেমন বুঝা উচিত, তেমনি অধ্যাত্ম সম্বন্ধসৃষ্টিরক্ষেত্রে সহযোগীদেরও এই দিকে সতর্ক থাকার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের কথা বহু দূরে গিয়া পৌঁছিয়াছিল। মীরা দেবী তাঁহার ভ্রাতাকে এই কথা জানাইয়াছিলেন। তিনি একজন উচ্চ ফরাসী কর্ম্মচারী। তিনি আমাদের কথা শুনিয়া আনন্দের সহিত সঙ্ঘের সাফল্য কামনা করিয়াছিলেন; তবে আমাদের অর্থনৈতিক ব্যাপ্তির দিক্‌টা দেখিয়া এই সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন যে, capitalistic society-র (ধনিক সম্প্রদায়ের) ভিতর থেকেই এই সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিতেছে, এই হেতু ভয়ের কথাও আছে। শ্রীঅরবিন্দ সে কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন "সত্যই এখানে ভয়ের কথা আছে, তবে উপায় নাই। আমাদের এখন বাহিরের capitalistic market ব্যবহার করিতে হইবে।" আমরা বলিতাম, সঙ্ঘের মধ্যে ধনিকের প্রভাব নাই। এই কথা শুনিয়া শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছিলেন, "capitalistic spirit অর্থাৎ ধনতন্ত্রবাদীর ভাব নাই।

তবে যখন টাকার কারবার করিতে হইতেছে, আর টাকা বাহির হইতে লওয়া হইতেছে, তখন ভয় আছে বৈকি! আমরা এই সময়ে ঋণ করিয়া কর্ম্মের জন্য পুঁজির ব্যবস্থা করিতেছিলাম। শ্রীঅরবিন্দ তখন আমাদের আর্থিক ভিত্তি গড়ার জন্য এই সব করার দরকার স্বীকার করিয়াছিলেন। রুশিয়ার বলশেভিক অর্থ-নীতি সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সংশয় প্রকাশ করিতেন। ইংলণ্ড হাজার গুছাইয়া-গাছাইয়া চলিলেও, সেই একই কুণ্ডে পড়িতে চলিয়াছে; তবে পৃথিবীর অর্থনীতি এখন কোথাও বাঁধা পড়ে নাই। সঙ্ঘের অর্থনীতিক আদর্শ সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, সঙ্ঘ হইবে self-contained unit অর্থাৎ আত্মপুষ্ট সমষ্টি। আপনার সমস্ত অভাব নিজ নিজ শিল্পকর্ম্মে পূরণ করিয়া লইতে হইবে। উৎপন্ন পণ্যের বাজারও সঙ্ঘ নিজেই হইবে। এইরূপ এক সঙ্ঘের সহিত অপর সঙ্ঘ পরস্পর অভাবপূরণ ও আদান-প্রদান করিবে। তবে এখন ইহা সম্পূর্ণরূপে হওয়ার বিঘ্ন (difficulty) আছে। সঙ্ঘ তাহার সকল অভাব উপস্থিত নিজে নিজে পূরণ করিতে পারিবে না।

তাঁর এই অর্থনীতিক স্বপ্ন কর্ম্মক্ষেত্রে দূরগত আদর্শ-রূপে লক্ষ্যে রাখিয়া, বাণিজ্য অর্থে বাহিরের সহিত বিকি-কিনির পথেই এখন আমরা চলিব—এই কথা শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন "উহা ন্যাশান্যাল স্কেলের কথা। যেমন ভারতবর্ষ। এ দেশের এমন ঐশ্বর্য্যশক্তি আছে, যাহাতে জাতি নিজের মধ্যেই আত্মরক্ষার উপায় করিতে পারে এবং তাহার পর ভারতবাসী বাহিরের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া জাতীয় অর্থাগমের পথ আরও প্রশস্ত করিতে পারে।" এই সকল কথা শ্রবণীয় ছিল। স্বাবলম্বনের সাধনায় সঙ্ঘের অর্থনীতিক ভিত্তি দৃঢ় করার প্রয়োজনের দিকেই আমার লক্ষ্য ছিল। আত্মসমর্পণের ছন্দেই এই নীতি আবির্ভূত হইয়াছিল—এই বিষয়ে আমার মধ্যে কোন দ্বন্দ্বই ছিল না। আমি জানিতাম, এবং এখনও আমার দৃঢ় প্রত্যয় আছে যে, কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া চলা আমার ধর্ম্ম নহে। ঈশ্বর যাহা করেন, তাহাই আমার ধর্ম্ম। ভাল-মন্দ বিষয় ঈশ্বরপ্রেরণার পথ রুদ্ধ করে। সঙ্ঘের অর্থনীতিক সাধনার প্রথম পর্ব্বে সুযুক্তি কুযুক্তির অন্ত ছিল না; আজও ইহার উপসংহার হয় নাই। সে দিন শুনিতাম সঙ্ঘ পুঁজি সংগ্রহ করিয়া বাণিজ্য সৃষ্টি করিলে, শ্রমিকের উপর ব্যষ্টি-ধনিকের ন্যায় সমষ্টি-ধনিকেরই সৃষ্টি হইবে। আজও শুনি, সঙ্ঘ ধনিকের স্থান অধিকার করিয়া ধন-সমস্যা জটিলতর করিতেছে। শ্রীঅরবিন্দ সঙ্ঘের অর্থনীতিক নবগতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করার সুযোগ পান নাই, বরং তিনি নানা বিরুদ্ধ বাদই শুনিতে পাইতেন—তবুও তিনি এই সম্বন্ধে আমায় অতিশয় উৎসাহ দিতেন। তিনি অর্থ-সম্বন্ধীয় আদর্শবাদ যখন উল্লেখ করিতেন, তখন বরং আমি একটু বিচলিত হইতাম—কিন্তু আমি জানিতাম বাস্তব কর্ম্ম ও কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইলে যাহা করিতে হয়, ভগবান আমায় লইয়া তাহাই করিতেছেন; বিশ্ব-চৈতন্যের উপর দাঁড়াইয়া ধনিক ও শ্রমিক, মহাজন ও অধমর্ণ, জমিদার ও প্রজা, এই সকলের মধ্যে যে বিরোধ ও সমস্যা, কেমন করিয়া তাহার মীমাংসা হইবে, কর্ম্মেই তাহা বিহিত হইবে। ভাগবত কর্ম্মের পরিণতি কখন অশুভ হইবে না। আত্মসমর্পণ-যোগে আমি পাইয়াছিলাম আত্মচৈতন্যের অমৃত। আর উহাই ছিল কর্ম্মের আশ্রয়। সমস্যার সমাধানে আমার কর্ম্ম নয়, জীবনের অভিব্যক্তিই কর্ম্ম। নিরলস বাস্তব কর্ম্মই অর্থে পরিণত হয়। এই কর্ম্মবিজ্ঞান অজ্ঞাত রাখিয়া ধন-সাম্যের আদর্শ কালে ব্যর্থ হইবে। শুধু কর্ম্ম জীবনকে জড় করে—জীবন ভারগ্রস্ত হয়। আবার শুধু আত্মজ্ঞানের জীবন সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অবস্থার মধ্য দিয়া লয়ের পথেই মানুষকে লইয়া চলে। জ্ঞান ও কর্ম্মের সামঞ্জস্য রক্ষা হইতে পারে অকপট আত্মসমর্পণে। কর্ম্মাকর্ম্ম, পাপ-পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিয়া নির্ণীত হয় না। আত্ম-সমর্পণে ঈশ্বরেচ্ছা প্রকাশ পায় জীবনে। এই সাধন আমার জীবনে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে নাই। শ্রীঅরবিন্দ অমৃত পরিবেশন করিতেন অকৃপণ হইয়া। সে স্মৃতি আমি মুছিতে পারি না। তিনি বলিতেন—"সমষ্টি আত্মার (Group-soul) পরিবর্ত্তে সমষ্টিচৈতন্য (Group-consciousness) শব্দ এ যুগে সহজবোধ্য হইবে। এই সমষ্টি-চৈতন্য

বহু বিশেষ ব্যক্তির সমাহার মাত্র নয়। আমাদের মন উল্টা দিক্—বহুর দিক্, বাহিরের দিক্ হইতেই দেখিতে অভ্যস্ত। কিন্তু সত্য হইতেছে এক সমষ্টি চিৎভাব, যার স্বরূপ হইতেছে অধ্যাত্ম-চৈতন্য। যেমন ব্যক্তির পিছনে আছে—মানব-চৈতন্য, একটা চিন্ময় জীব, তেমনি দেশেরও পিছনে আছে এইরূপ জাগ্রত চৈতন্যশক্তি। এই শক্তিই দেশ-মাতৃকা—জাতির মাতৃশক্তি। বঙ্কিম এই মাকে দেখিয়াছিলেন—তিনি তাঁহার যে ধ্যানরূপ ভাষায় আঁকিয়াছিলেন, তাহা কিছুমাত্র কল্পনা নহে।"...এই সকল কথা অন্তরের সহিত মিলাইয়া পাইতাম; আনন্দে হৃদয় মাতিয়া উঠিত। আমার কর্ম্মে ক্লান্তি ছিল না; অন্তরেও দ্বন্দ্ব ছিল না। শ্রীঅরবিন্দ এই সময়ে কিছু কিছু রাষ্ট্র-চিন্তাও করিতেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তিনি ভাবিয়াছিলেন, ৬০ বৎসর পরে জাতি মুক্তিলাভ করিবে। কিন্তু তাঁহার সে আশা সফল হয় নাই। দেশে যে তিনটী রাষ্ট্রীয় আদর্শ প্রকট ছিল, সেইগুলি বিশ্লেষণ করিয়া তিনি বলিতেন—একটী পাশ্চাত্য কনষ্টিটিউসন (constitution)। এই আদর্শটীর এক ছটাক শিকড়ও দেশের জীবনে বসে নাই। দ্বিতীয়টী হুবহু অতীতে ফিরিয়া যাওয়া। প্রথমটী ইউরোপের বুদ্ধি দিয়া ইউরোপকে জয় করার অপপ্রচেষ্টা। ঐরূপ বুদ্ধি আমাদের ধাতে নাই। উহাদের মধ্যে শুধু বুদ্ধি নহে, আছে ভিতরে প্রত্যেক জাতির একটা প্রবল vital intuition (প্রাণিক প্রেরণা)। যেমন ইংরাজের strong national intuition; ফরাসীর rational idealism—কিন্তু আমাদের তা কৈ? আমাদের ভরসা অধ্যাত্ম জাগরণ। ইহাই মুরারির তৃতীয় পন্থা। তিনি এই পথেই মুক্তি প্রেরণা সফল করার আশা রাখিতেন। ইহার জন্য গোটা মানুষটা, সমাজটা না জাগিলে কিছুই হইবে না। চিরদিন এই পথেই এ জাতি বাঁচিয়াছে, আত্মরক্ষা করিয়াছে। কিন্তু আজ সকলে বিপথগামী। প্রকৃতির পথেই সকলের যাত্রা। সব গোলমেলে গতি। কেহ জানে না—ঠিক কোথায় চলিয়াছে। রাষ্ট্র-স্বাধীনতা সকলেই চায়। কিন্তু সকলেই চায়, অতি ক্ষিপ্রনীতি। ঋষির ধীর মন্থর নিশ্চিত পদক্ষেপ কেহই চায় না। তাঁর উপদেশ ছিল: "Withdraw within and find the national soul" অর্থাৎ "অন্তর্ম্মুখী হও, জাতীয় সত্তার সন্ধান লও"। শ্রীঅরবিন্দের এই কল্প-দৃষ্ট কর্ম্ম সিদ্ধ করার প্রেরণাই আমার অন্তরে তীব্র সংবেগ সৃষ্টি করিয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দ ইহাতে ইন্ধন দিতেন। বারীনদাও প্রথম প্রথম আমায় খুব উৎসাহ দিতেন। শ্রীঅরবিন্দের কর্ম্ম ক্ষিপ্রতার সহিত সিদ্ধ করার জন্যই মনে হইত—বারীনদার সহিত পূর্ণ ঐক্যের প্রয়োজন। কিন্তু ইহার বিনিময়ে বারীনদার নিকট হইতে দার্শনিক উপদেশ পাইতাম। তিনি বলিতেন—"বিজ্ঞানে না উঠিলে, মিলন হইবে না। তুমিও আমি, দুটাই শক্তির আধার। বিজ্ঞানের নীচের স্তরে মিলিলে দু'জনেরই শক্তি ক্ষুণ্ণ হইবে।"

এই সকল কথা লইয়া বারীনদার সহিত আমার দীর্ঘ পত্রাদির আদানপ্রদান হইত। আজও সেই পত্রগুলি আমায় বলে, "ভায়া, শিবদৃষ্টি লাভ না করিলে, সত্য মিলন সম্ভব নয়।" অবশ্য ইহা শ্রীঅরবিন্দেরই কথার মর্ম্ম বলিয়া তিনি আমায় বলিতে কুণ্ঠিত হইতেন না! বলিতেন—"তোমার মধ্যে নৃত্যপরা কালীর নৃত্য চলিয়াছে। তোমার মধ্যে বাংলা চৈতন্যের পূর্ণযোগ পাচ্ছে; তুমিই বাংলার বার আনা।" আমার খুব অভিমান হইত। কথার চেয়ে ভাব, সাধনার চেয়ে কর্ম্মের আশ্রয়ে মানুষের সহিত মানুষের মিলন অতি আসন্ন হয়, ইহার পরিচয় আমার প্রত্যক্ষ ছিল, কিন্তু এই ক্ষেত্রে সে সুযোগ পাই নাই। বারীনদার প্রেমালিঙ্গনে আমার অভিমান ভাসিয়া যাইত; কিন্তু অনুভূতির ক্ষেত্রে তাঁহাকে আমি কোনদিন খুঁজিয়া পাইতাম না। আমি এই ক্ষুদ্র লেখনীমুখে সেদিন বারীনদার সহিত মিলিয়া ঐক্যবদ্ধভাবে কর্ম্ম করার জন্য কিরূপ ব্যস্ত হইয়াছিলাম তাহা ব্যক্ত করিতে পারিব না। বারীনদার কথা বড় মিষ্ট লাগিত—তিনি বলিতেন, "আমি এক সঙ্গে গুড়গুড়ে খুদেরাম। আবার যেন ফর্দ্দাফাই একটা কি! তোমার আশীর্ব্বাদ থাকে তো তোমার পাশে দাঁড়াবার যোগ্য হব। তুমি, মীরা আর ঐ মাথা-খেকো খোক্কসটা আমার ভরসা।" খোক্কস অর্থে শ্রীঅরবিন্দ! চন্দননগরের কর্ম্মীদের তিনি "বেক্কুড়" বলিতেন, আমার নাম দিয়াছিলেন "টু-ডে" (To-day)। আর এইগুলো ছিল তাঁর চক্ষে "টু-মরো" To-morrow)।

অতীতের এই মরীচিকাভ্রান্ত মৃগের দৃষ্টি-চিত্র বিস্তৃত করিয়া ধরার প্রয়োজন নাই। মানুষের অন্তঃকরণের দাবী ঘটনার দায়ে বিচিত্র আকার ধরে। অন্তর্য্যামী অনুসরণ করেন অদৃষ্টের। এই জন্যই গীতার উপদেশ—স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হওয়া। আত্মকর্ম্মই মানুষকে কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে স্ব-স্ব ধর্ম্মে, তাহাই পরবর্ত্তী ঘটনায় পরিস্ফুট হইবে।

(ক্রমশঃ)

সাময়িক সাহিত্য

শূলপাণি

প্রবাসী ঃ শ্রাবণ, ১৩৪৮—

রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী—ব্যক্তিগত হইলেও, সমসাময়িক ঘটনার প্রতিক্রিয়া কবিচিত্তে কি ভাবাবেগ ও চিন্তার সৃষ্টি করিয়াছে, জানিতে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। পত্রাবলীর মধ্য দিয়া রাজনৈতিক, সাহিত্যিক এবং কবির ব্যক্তিগত ইচ্ছানিচ্ছার দিক্‌টি ফুটিয়াছে ভাল।

রাণীর অপমৃত্যু—শ্রীমনোজ বসু। ছোটগল্প। দীর্ঘকাল প্রবাসীর পৃষ্ঠায় তেমন ভাল ছোটগল্পের সাক্ষাৎ পাইতেছি না। ইদানীং বাংলা সাময়িকের ক্ষেত্রে ভাল গল্প ও উপন্যাসের যেন দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। নামকরা যাঁহারা লিখিতেছেন, দেখিতেছি খ্যাতির অনতিস্ফীত পুঁজিটুকু ভাঙ্গাইয়া তাঁহারা পথ অতিবাহন করিতেছেন, কাজেই এই স্বল্পায়ুঃ মূলধনের শেষটুকু যে দিন ফুরাইয়া আসে, সে দিন কথার মালা গাঁথা ছাড়া আর উপায় থাকে না।

'রাণীর অপমৃত্যু' গল্পে সবই আছে, শুধু নাই দরদের সেই সূক্ষ্ম পরশ, যা' মনকে দোলা দেয়, জানাইয়া দেয় একটা সত্যকারের ভাল কিছু পড়িলাম। 'রাণীর অপমৃত্যু' গল্পে লেখক কতকগুলি Situations, অনুভূতির কয়েকটি দিক লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যাহার বহু ব্যবহার হইয়াছে। ঘটনার বহু ব্যবহারটাই হয়তো শিল্পসৃষ্টির বড় কথা নয়, যদি তাহার মধ্যে লেখকের কল্পনা ও অনুভূতির সচল গতিবেগ পরিপূর্ণ, ও অখণ্ডিত সাহিত্যভঙ্গিমায় আত্মপ্রকাশ না করে। গল্পটি সম্বন্ধে এইটুকুই আমাদের বলিবার আছে।

বিপ্লবী রবীন্দ্রনাথ—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। একটি খিঁচুড়ি প্রবন্ধ। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সৃষ্টির কয়েকটি দিক দেখাইতে গিয়া লেখক ল্যাস্কি, নিটসে, হ্যাভলক্ এলিস্, ই তিন ভদ্রলোককে একঘাটের পানী খাওয়াইয়াছেন। নিজের বক্তব্যের হাঁড়ী যেখানে বাড়ন্ত, সেখানে দু'চার দিন ধার করিয়া চালাইতে হয়। ইহা আমরা জানি। তবে বেশ বোঝা যায়, প্রবাসীর রবীন্দ্রপ্রীতির খিড়কি দরজা দিয়া প্রবন্ধটি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, নচেৎ এই ধরণের প্রবন্ধপ্রকাশের সার্থকতা বোঝা কঠিন।

লেখকের রচনার এই কয়েকটী লাইন পড়িয়া বেশ কৌতুক বোধ করা গেল—

'ম্যান্তামুখো নিরীহ প্রকৃতির সাধু মানুষদের অভাব নেই। তাদের সংখ্যা প্রচুর। মিথ্যা কথা বলে না, চুরি করে না, মদ খায় না, পরস্ত্রীর মুখের দিকে তাকায় না ইত্যাদি'।

ইদানীং প্রবাসীর সুশুভ্র কেশের উপর তারুণ্যের কলপ পড়িতেছে। যৌবন তাহার জয়ডঙ্কা বাজাইয়া আসিল, কিন্তু বড় দেরীতে। আপনারা বলিতে পারেন Better late than never. যৌবনের চাঞ্চল্য বোঝা যায়, কিন্তু নিঃশেষিত সূর্য্যরশ্মির তীক্ষ্ণতা অসহনীয়।

লেখক এক জায়গায় বলিতেছেন, এদিক্ দিয়ে দেখতে গেলে আমরা অনায়াসে বলিতে পারি—রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের ইবসেন্! ধন্য রবীন্দ্রনাথ! ততোধিক ধন্য লেখক!

কুসুমের প্রার্থনা—শ্রীভূপেন্দ্র মজুমদার। একটি ভাল গল্প। জায়গায়, জায়গায় লেখক এমন সূক্ষ্ম কারিগরীর পরিচয় দিয়াছেন যাহা অনেক তথাকথিত Veteran দের রচনায়ও দুর্লভ।

'পূজাও তো আরম্ভ হইয়া গেল। কৈলাসের হঠাৎ মনে পড়িল, বউকে একটা রাঙ্গাপেড়ে শাড়ী কিনিয়া দিতে হইবে।" চমৎকার! উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীত আলাপের মধ্যে শিল্পীর কোমল করস্পর্শ যখন আমাদের রসানুভূতির দুয়ারে আবেদন জানায়, তখন এমনই উল্লসিত হইয়া উঠিতে হয়। বাহবাটা আপনিই বাহির হইয়া পড়ে। উচ্চশ্রেণীর গল্পরচনাতেও তাহাই, লেখককে আমরা অভিনন্দিত করি।

প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—'দৈনিক মশায়রা মাসিকগুলিকে বাস্তবিক মনে মনে উপেক্ষা করেন না। অনুকরণ সমাদরের কপটতম বাহ্য লক্ষণ। দৈনিকদের বাহ্য ব্যবহার যেমনই হোক, তাঁরা মাসিকগুলির মনোরঞ্জক ও আবশ্যক বিশেষত্ব স্বীকৃত করেছেন।'

আজকাল দৈনিক ও মাসিকগুলির মধ্যে একটা অসহযোগিতার সম্বন্ধই গড়িয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমানে অনেক দৈনিকে Magazine Section বলিয়া একটা বস্তু চলিয়া যাইতেছে। আসলে তাহা মাসিক ও সাপ্তাহিকের অনুকরণ ছাড়া আর কিছু নয়। ইহাদের বিদেশী মাসিক হইতে বহু প্রবন্ধ না বলিয়া আত্মসাৎ করিতে দেখা গিয়াছে, কারণ অবশ্য পরিষ্কার, সেক্ষেত্রে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা কম। বাংলা সাময়িকের ধার দিয়াও ইঁহারা যান না। ইহাও হইতে পারে যে, বাংলা সাময়িকের ভাণ্ডার হইতে ধার করিলে আভিজাত্য বজায় থাকে না এবং না বলিয়া লইবার অসুবিধাটাই এক্ষেত্রে বড় কথা। দৈনিকপত্রে মাসিকের Review কদাচিৎ দেখা যায় এবং তাহাও বিস্তর তদ্বির তাগাদার পর। এ সম্বন্ধে 'প্রবাসী' দীর্ঘকাল অভিযোগ করিয়া আসিতেছেন এবং এই অভিযোগের সত্যতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বঙ্গশ্রী ঃ শ্রাবণ, ১৩৪৮—

বঙ্কিমচন্দ্র ও বাঙ্গালী মুসলমান—শ্রীব্রজেন্দ্রসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি-এল। বর্ত্তমানে বঙ্কিম-সাহিত্যের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ বেশ উগ্র হইয়া উঠিয়াছে। ইহা লইয়া বাদ-প্রতিবাদ করিবার মত অমর্য্যাদাও আর নাই। এদেশে সবই সম্ভব, বিদেশী সাহিত্যে এই ধরণের অভিযোগের কথা কেহ কল্পনাও করিতে পারিত না। তাহা যদি না হইত, তবে Kipling আজ সাহিত্যক্ষেত্রে অপাঙক্তেয় হইয়া থাকিতেন। অবশ্য ভারতবর্ষের কথা আলাদা, এখানে রাজনৈতিক সুবিধাবাদ ও বাঁধাবুলির কষ্টিপাথরে সাহিত্যের বিচার চলে।

বিশ্ব-সৃষ্টি—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য। কবিতা। লাইনের পর লাইন আখরের ঠাসবুনানী চলিয়াছে, ইহার যেন শেষ নাই। মোক্ষম বাছা বাছা শব্দগুলি সঙ্গীণধারী সৈনিকের মত পথ আগলাইয়া খাড়া রহিয়াছে। অবশ্য লেখকের একটি থিয়োরী কাব্য-রচনার তোড়ের মুখে বেফাঁস হইয়া গিয়াছে। কবি বলিয়াছেন—'শব্দের সমষ্টি ভিন্ন নহে কিছু নিখিল জীবন'। এ জীবনটা যে বাক্-সর্ব্বস্ব হইয়া উঠিয়াছে, তাহা তো হাড়ে হাড়েই বুঝিতেছি। কিন্তু পাঠকের উপর অত্যাচারের কথাও তো একটু ভাবিতে হয়। আবার শুনিতেছি—এ যুগে না কি লিরিক অচল, সাম্প্রতিক হওয়াই সুবিধা। লেখক এদিকে চেষ্টা করিলে, তাঁহার হাত খুলিবে ভাল।

অজিতার মৃত্যু—শ্রীলীলাময় দে। বহুদিন পর গল্প পড়িবার সাধ জাগিয়াছিল, আক্কেল সেলামী হইল মন্দ নয়। এধরণের গল্প সাময়িক পত্রে ছাপার অক্ষরে বাহির হয়, জানা ছিল না, বঙ্গশ্রীর কল্যাণে তাহাও জানা গেল। লেখকের কলমের কসরতে বি-এ পাস সঞ্জয় রিক্সা পর্য্যন্ত টানিল, অজিতা মরিয়া বাঁচিল। লেখকপুঙ্গবের গরীব পাঠকদের উপর এ নেকনজর কেন? ইঁহাদেরই লক্ষ্য করিয়া স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় বলিয়াছিলেন 'অহিরাবণ লেখক'!

মরণ-বাসর—শ্রীহীরেন্দ্র নাথ বসু এম-এ। রসরচনা, আরম্ভটা হইয়াছিল ভাল, কিন্তু শেষরক্ষা হয় নাই। তথাপি গতানুগতিক রচনার ভীড়ের মধ্যে ইহা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আমি যা লয়ে যাই—শ্রীমতী প্রমীলা রায় চৌধুরী। বর্ত্তমান যুগে সিনেমার গানের এক আধ লাইন তুলিয়া গল্পের নামকরণ হইতেছে। কি দেখিয়া রচনাটি মনোনীত করা হইয়াছিল, বুঝিতে পারিতেছি না। তবে পাঠকের lacrimose gland এ সুড়সুড়ি দিয়া কার্য্য উদ্ধার করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে, বুঝিতে পারা যায়। সম্পাদক মহাশয়কে আর একটু নির্ম্মমভাবে কাঁচি চালাইতে হইবে; নচেৎ বঙ্গশ্রীর শ্রীটুকু বাঁচাইয়া রাখা চলিবে না।

যাত্রা—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। একটি তথ্যপূর্ণ ভা[illegible] রচনা।

প্রাচীন বাঙ্গলা বাক্যে ভোজন বিলাস ও রন্ধন বিলাস—শ্রীস্বদেশরঞ্জন চক্রবর্ত্তী। প্রায় এই রকমের একটি

রচনা ইতিপূর্ব্বে সাময়িকের পৃষ্ঠায় বাহির হইয়াছে। তথাপি, অধিকন্তু ন দোষায়। বাঙ্গালী ভোজনবিলাসী। তবে 'এক সের চেলের অন্ন এক গ্রাসে খাই'—এ সুনাম আর বাঙ্গালীর নাই। সেকালের সেই অতিকায় বাঙ্গালীর দল লোপ পাইয়াছে। ইদানীং আহারটা তাহার পেট-পুরিয়া জুটুক আর না জুটুক, নিমন্ত্রণের নাম শুনিলে রসনা লালাসিক্ত হইয়া ওঠে। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের কবিরা রসিক ব্যক্তি, তাহাদের কাব্যে 'পঞ্চাশ ব্যঞ্জন' ও পায়স পিঠার মোচ্ছব যেন লাগিয়াই আছে। এ যুগের বাঙ্গালী কবিরা সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বিষয় লইয়া নাড়াচাড়া করেন, কাজেই ভোজনব্যাপারের মত স্থূল জিনিষটা লইয়া ইতরামী করিতে তাঁহারা নারাজ।

রন্ধন ও সুরসাল খাদ্যাদির বর্ণনায় ভারতচন্দ্র ও মাণিক গাঙ্গুলীর হাত-যশ বেশী। রায়গুণাকরের—

বাচার করিলা ঝোল, খয়রার ভাজা
অমৃত অধিক বলে অমৃতের রাজা।
বড়া কিছু সিদ্ধ, কিছু কাছিমের ডিম্
গঙ্গাফল তার নাম অমৃত অসীম।

বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে।

কবি বিজয়গুপ্ত এ ব্যাপারে কবিরাজী বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। আহার ও ঔষদের বর্ণনা 'নেক্ টু নেক্' চলিয়াছে।

পাটায় ছেঁচিয়া নেয় পোলতার পাতা
বেগুণ দিয়া রাঁধে ধনিয়া পোলতা।
জ্বর-পিত্ত আদি নাশ করার কারণ
কাঁচকলা দিয়া রাঁধে সুগন্ধা পাঁচন।

কবি জ্বর-পিত্ত বলিয়াই সারিয়াছেন। বায়ুর কথাটা ইচ্ছা করিয়াই দেন নাই আমরা জানি। কারণ সে যুগের সাহিত্যে উনপঞ্চাশ বায়ুর প্রকোপ এখনকার মত এত প্রবল হয় নাই।

মন্দিরা ঃ শ্রাবণ, ১৩৪৮—

কর্ত্তৃপক্ষ বর্ত্তমান সংখ্যাকে 'সোভিয়েট সংখ্যা' নামকরণ করিলে ভাল করিতেন। কারণ একখানি ছোট পত্রিকার পক্ষে এতগুলি কমিউনিজম্-মার্কা রচনা নিশ্চয়ই তারিফ করিবার মত। প্রলিটারিয়ানের প্রীতি যাঁহাদের রক্তে টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতেছে, তাঁহারা ইহাকে বাহবা দিয়া মাথায় তুলিয়া লইবেন। তাঁহারা মহাপুরুষ ব্যক্তি। কিন্তু আমাদের মত নগণ্য পাঠক যাহারা, তাহাদের পক্ষে সোভিয়েটপ্রীতির এই অত্যাচার সহ্য করিবার মত নয়। রচনানির্ব্বাচনে এই একদেশদর্শিতার ফলে আলোচ্য সংখ্যার বৈচিত্র্য হ্রাস পাইয়াছে। বিবিধ রচনা-নির্ব্বাচনে ভারসাম্য রক্ষিত হয় নাই। সাহিত্যপত্রিকার মতবাদপ্রচার মুখ্য বিষয় নয়।

অতীতের ছবি—শ্রীমতী বীণা দাস। একটি ভাল রচনা। ভ্রমণকাহিনী বর্ণনার পক্ষে লেখিকার হাত বেশ মিষ্ট। বিশেষ করিয়া তাহার observationsগুলি, যাহা তাঁহার নিজস্ব চিন্তার ফল, বিশেষ উপভোগ্য। কিন্তু হইলে কি হইবে, দুইটি সাম্যবাদী রচনার মধ্যে sandwitched হইয়া ইহার দুর্গতিই হইয়াছে বেশী।

অদাপা—শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ। লেখকের বয়স কত আমরা জানি না, তবে কাব্যিয়ানা ভাষা ও ভাবের বাষ্পীভূত বিস্ফোরণ এ সম্বন্ধে একটা হদিস দিতে পারে। রচনার নামকরণ ঠিক হয় নাই। ভাষা ও ভাব পরস্পরের গলাগলি হইয়া যেরূপ দাপাদাপি জুড়িয়া দিয়াছে, তাহাতে 'টাইটেলটি' যথেষ্ট misnomer। লেখক ভবিষ্যতে এ ভ্রম সংশোধন করিবেন।

মহাযুদ্ধ—শ্রীসুরজিৎ দাশগুপ্ত। চমৎকার কবিতা! কাব্যরোগ অত্যন্ত ছোঁয়াচে, দেখিতেছি কলমের ডগায় হুহু করিয়া কবিতা আসিয়া যাইতেছে, কাজেই—

সব সহ্য হয় বন্ধু
কিন্তু সহ্য হয় না ধাপ্পাবাজি,
ক্যাক্‌টাস্ আর ফণীমনসার
মত যা আজ সাহিত্যে
উঠেছে গজিয়ে।
ম্যানারহাইম, স্পিটফায়ার, মেজারমিন্ট্
সোভিয়েট, ক্যাপিট্যালিজ্‌ম্,
ভোলার প্লাবন। এ্যাকিলিসের
মৃত্যু, আর কাননবালার বিয়ে
—যাই বলনা কেন বন্ধু
সব ছাপিয়ে ওঠে
তোমাদের অন্তরের
দৈন্য—যা দেখে
কাঁদে আস্তাকুঁড়ের শেয়াল কুকুর।

বয়ঃসন্ধি—কুমারী রেখা। একটি ভাল কবিতার সন্ধান পাইয়া পড়িয়া বাঁচিলাম!

ফিলজফার স্বামীই যদি ওঠে
আপনভোলা ভোলানাথের মত;
কিংবা কচি সাহিত্যিকও জোটে—
খোকার মত ঘুরছে যারা [illegible]।

খালি একটি সন্দেহ [illegible] যাইতেছে এই কচিকাঁচার দল ঘোরে কিসের পিছু?

বিদায়-বেলায়

শ্রীমাণিকলাল রীত

চাকুরীতে জবাব হইবার পর সস্ত্রীক দাদার অন্ন ধ্বংস করিতেছিলাম এবং দাদার পয়সাতেই ডাক খরচ করিয়া আমি দেশে বিদেশে চাকুরার দরখাস্ত পাঠাইতেছিলাম। প্রায় এক বৎসর এইভাবে চলিবার পর হঠাৎ সে দিন বিদেশ হইতে এক চিঠি আসিল—'ইণ্টারভিউ' দিতে যাইতে হইবে।

ভবিষ্যতে চাকুরীটা পাইতে পারি, এই ভাবিয়া প্রাণে একটু আনন্দের উদ্রেক হইল এবং সেই আনন্দে দুর্গা নাম করিয়া যথাসময়ে 'ইণ্টারভিউ' দিয়া আসিলাম।

সে দিন দুঃখটা যেমন হঠাৎ আসিয়াছিল, তেমনি হঠাৎ আজ হারাণ সুখটা ফিরিয়া আসিল।···

সকালের ডাকে এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট-লেটার পাইলাম। চিঠিখানি পাঠ করিতে চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল ভবিষ্যতের সুখচ্ছবি। মন-প্রাণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।···

একদিন·· দুই দিন···তিন দিন চলিয়া গেল কালের তপ্ত নিঃশ্বাসে ঘুরপাক খাইতে খাইতে; এর পর আসিল সেই দিন, যে দিন তল্পীতল্পা লইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিতে হইবে, নচেৎ দিনের দিন যথাসময়ে কর্ম্মস্থলে পৌছান যাইবে না।

সকাল হইতেই আয়োজন করিতে লাগিলাম। আয়োজন বিশেষ কিছুই নয়। স্ত্রীকে আপাততঃ কিছু দিনের জন্য এখানে রাখিয়া একেলাই যাইতে হইবে, কাজেই একটা ছোটখাট বিছানা, খান চার-পাঁচ জামা-কাপড়, একখানা 'গামোছা', আর আর্শী-চিরুণী, খান চার পোষ্টকার্ড-খাম, কালী, কলম ইত্যাদি। তারপর চুল ছাঁটা, দাড়ি কামান, জুতা জোড়ার ধূলা ঝাড়িয়া কালী মাখান।···বেলা এগারোটার মধ্যে সব কিছুই ঠিক হইয়া গেল।···

হাওড়া হইতে গাড়ী ছাড়ে সন্ধ্যা সওয়া ছয়টায়, সে এখনও অনেক দেরী।···আহারান্তে কি যে করিব, আর কি যে না করিব, কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া বিছানায় দেহটা এলাইয়া দিলাম।···চোখে ঘুম আসিল না, কতকগুলি অতীত স্মৃতি এলোমেলোভাবে মনের পর্দ্দায় ভাসিয়া উঠিয়া ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাইল। মনে পড়িল, এই তক্তাপোষের উপর মা'র স্নেহশীতল কোলের মধ্যে জন্মাবধি চৌদ্দ বৎসর কাটাইয়াছি। তারপর মারা গেলেন মা। সেই একদিন গিয়াছে, যে দিনটির কথা এ জীবনে ভুলিব না—ভুলিতে পারিব না। এক দিকে অর্থের অভাব, আর এক দিকে মা'র রোগের শুশ্রূষা করিবার লোকের অভাব ·প্রায় চিকিৎসার ও শুশ্রূষার অভাবে হৃদ্‌যন্ত্রের রোগ হইতে মা'র মুক্তি মিলিল না, দীর্ঘ দুই মাস দুঃসহ রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিবার পর একদিন তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

মৃত্যুকালে তিনি আমার একখানি হাত দাদার হাতের মধ্যে দিয়া অশ্রুছলছল চোখে দাদাকে বলিয়াছিলেন,—আমার কাঙাল কানাইকে তোর হাতে দিয়ে গেলুম হেম, একে তুই মানুষ করিস্। উঃ! তখন আমার মন-প্রাণের অবস্থা যে কি হইয়াছিল, তাহা বলিয়া বুঝান শক্ত।···

মায়ের সেই শেষ আদেশ দাদা প্রাণ দিয়া পালন করিয়া আসিতেছেন, কোন দিন এতটুকু অবজ্ঞা করেন নাই।

আর বৌদি!···এমন বৌদি কেহ কখনও পাইয়াছে কিনা জানি না—স্নেহময়ী, শান্তিরূপিণী দেবী যেন তিনি! কোন দিনই তিনি আমাকে কোন অভাব বোধ করিতে দেন নাই এবং আমার অভাব, অভিযোগ, অত্যাচার মা'র মত হাসি-মুখেই সহ্য করিয়াছেন ও করিতেছেন।

কাকু!···

পাশ ফিরিয়া দেখি, এক খিলি পান লইয়া প্রভাত দাঁড়াইয়া আছে। কহিলাম, কে দিল রে?

মা; এই নাও।

পানের খিলিটি লইয়া মুখে দিলাম, পরে দুই বাহু দিয়া তাহাকে আমার বুকের উপর তুলিয়া লইয়া তাহার গণ্ডে একটি চুমা দিলাম।

অন্য দিন প্রভাত এক গাল হাসিয়া আমার গণ্ডে একটি চুমা বসাইয়া দিত ভালবাসার নিদর্শন দেখাইতে, কিন্তু আজ সে তাহার ব্যতিক্রম করিয়া উস্‌খুস্ মুখে কহিল,—তুমি চ'লে যাবে কাকু?

সত্য কথা বলিলে সে কাঁদিয়া উঠিবে, এই ভয়ে আমি কহিলাম,—না রে, না, তুই ঘুমো।

পাশে তাহাকে শোওয়াইয়া দিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলাম।...

বালক প্রভাত অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িল! আমি তাহার ঘুমন্ত মুখখানির পানে অনেকক্ষণ অপলক নেত্রে চাহিয়া থাকিলাম; চাহিয়া থাকিয়া প্রাণটা কেমন করিতে লাগিল। প্রিয় প্রভাতকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে!...

ক্রমশঃ সময় সংক্ষেপ হইয়া আসিতে লাগিল।...

দেওয়াল-ঘড়িটায় চারিটা বাজিতেই মুখ হাত ধুইতে যাইবার জন্য উঠিয়া পড়িলাম। অন্ততঃ পাঁচটার সময়ে বাড়ী হইতে বাহির হওয়া আবশ্যক, নচেৎ যথাসময়ে হাওড়া ষ্টেশনে পৌছিয়া ট্রেণ ধরিতে পারিব না।..

বিদেশে চাকুরী করিতে যাইতেছি, এ সংবাদ আস-পাশের বাড়ীতে পৌছিয়াছে এবং পৌছিয়াছে বলিয়াই ইতিমধ্যে কয়েক জন বর্ষীয়সী বিধবা ও সধবা আমাদের বাড়ী আসিয়া রান্নাঘরে বৌদি'র কাছে বসিয়াছেন।

রোয়াকের উপরকার কলটায় মুখ-হাত ধুইতে বসিয়া তাঁহাদের সকলকার কথা কিছু কিছু কাণে আসিল। বুঝিলাম, বিদেশে চাকুরী করিতে যাইতেছি বলিয়া বৌদির প্রাণ কাঁদিতেছে, আর প্রতিবেশিনীরা বৌদির সেই ক্রন্দনরত প্রাণকে সান্ত্বনা দিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

বিলম্ব করিলাম না, তাড়াতাড়ি মুখ-হাত-পা ধুইয়া ঘরে আসিলাম।

স্ত্রী অনিলা ঘরের মধ্যে কি যেন করিতেছিল, আমার আগমন বুঝিতে পারিয়া সে তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। আমি কিন্তু তাহার পথ-রোধ করিয়া কহিলাম,—চ'লে যাচ্ছ যে অনিলা?

অনিলা বিষণ্ণ মুখে আমার পানে চাহিল। চাহনিটি তাহার বেদনা-ভরা।...

প্রথমবার চাকুরী পাইবার মাস তিন পরে দাদা ও বৌদি' উভয়ে মিলিয়া এই অনিলার সহিত আমার বিবাহ দিলেন। অনিলাকে স্ত্রীরূপে পাইয়া সত্যই বড় সৌভাগ্যবান্ মনে করিতাম নিজেকে। অনিলা খুব সুন্দরীও নয়, তেমন শিক্ষিতাও নয়। তবু যেন বারজীবী ঘরের মেয়েদের মধ্যে একটু অসাধারণ সুশ্রী সে। অন্ততঃ এ সমাজের মেয়েদের মধ্যে যে গুণগুলি প্রায়ই দেখা যায় না, সেইসব গুণে অনিলা গুণবতী। যাক্ এসব কথা...

কহিলাম,—তোমাকে রেখে যাচ্ছি ব'লে তোমার মনে কষ্ট হ'চ্ছে, না?

হওয়াটাই ত স্বাভাবিক।

সত্যি কথা, কিন্তু অনিলা, সেখানে যেয়ে তাড়াতাড়ি একটু ব্যবস্থা ক'রে নিতে পারলেই ত তোমাকে নিয়ে যাব।...

জানি তা, কিন্তু তবু—

মন বোঝে না, এই ত? আচ্ছা, আমি সেখানে গিয়েই তোমাকে চিঠি লিখব, আর তোমাকে সেখানে না নিয়ে যাওয়া পর্য্যন্ত খুব ঘন ঘন চিঠি দেব, তাহ'লে হবে ত?

অনিলা চুপ করিয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না;—বোধহয় আমার কথাটা তাহার মনঃপূত হয় নাই।

এমন সময়ে ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ী ঘড়-ঘড় করিয়া আসিয়া সদর-দরজায় দাঁড়াইল। অনিলাকে কহিলাম—মোট-ঘাট ক'টা গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসি চট্ ক'রে, তুমি যেও না।

আচ্ছা দাঁড়াও একটু, পায়ের ধুলো নিয়ে নিই এই সুযোগে।

দাঁড়াইলাম। অনিলা নতজানু হইয়া আমার পদধূলি গ্রহণ করিল! দুর্ভাগ্য আমার! আমি তাহার এ পরিশ্রমের মূল্য দিতে যাইয়াও দিতে পারিলাম না, দর-দালানে কাহার পদশব্দ আমাকে হতাশ করিল।...

মোট-ঘাট কয়টা গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া ঘরে আসিয়া দেখিলাম, ঘরের মধ্যে অনিলা নাই, চা ও জলখাবার লইয়া বৌদি' বসিয়া আছেন।

আমাকে আসিতে দেখিয়া বৌদি' কহিলেন—খেতে ব'সো ঠাকুরপো।

এই খানিক আগে ভাত খেয়েছি, এখুনি আবার কি বৌদি'?—আমি কহিলাম।

বৌদি' বোধহয় চোখের কোণ আঁচলে মুছিয়া কহিলেন,—যা খেতে পার, তাই খাও; হ্যাঁ, চা-টা আগে খেয়ে নাও ভাই, জুড়িয়ে জল হ'য়ে গেল।

বৌদি'র পাশে বসিয়া চায়ের কাপে ঘন ঘন চুমুক দিতে লাগিলাম।...

চা-পান শেষ হইলে, জলখাবারের থালাটা আমার কোলের কাছে সরাইয়া দিয়া বৌদি' কহিলেন—খাও।

খাইতে খাইতে কহিলাম—বিদেশে যাচ্ছি ব'লে আপনি এত ভাবছেন কেন বৌদি', বিদেশে তো নিত্য কত লোক যাচ্ছে, আসছে, তার ইয়ত্তা নেই। এই ত দেখুন না, নানা দেশের লোক আমাদের দেশে এসে চাক্‌রী ক'রছে,—মানুষ হ'চ্ছে। আজকাল বিদেশে না গেলে উন্নতির কোন আশাই নেই যে বৌদি'।...

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে বৌদি আর্দ্রকণ্ঠে কহিলেন, সেই জন্যেই তোমাকে যেতে দিচ্ছি, না হ'লে যেতে দিতুম না; তোমাদের নিয়ে যেমন সুখে-দুঃখে আমাদের দিন কাটছে, তেমনি সুখে দুখেই কাটাতুম। কি ব'লব ঠাকুরপো, তোমায় কোলে-পিঠে মানুষ ক'রে তোমার ওপর সন্তানস্নেহ জন্মেছে অনেকখানি; তার জন্যেই আমার প্রাণ চাচ্ছে না তোমাকে বিদেশে যেতে দিতে। আজ যদি তোমার মা থাকতেন ঠাকুরপো, তবে তাঁর কি এই অবস্থা হ'ত না? নিশ্চয়ই হ'ত। তবেই দেখ ঠাকুরপো, সেই মায়েরই সমান ত আমি, আমার ভাবনা না হবে কেন?

কিছু বলিতে পারিলাম না, নীরবে খান তিনেক পরোটা খাইয়া উঠিয়া গেলাম।... ...

জামা কাপড় পরিতেছি, এমন সময়ে অনিলা সেই বিষণ্ণ মুখে আসিয়া বিনা ভূমিকায় কহিল,—সাবধানে যেও, সাবধানে থেক, বুঝলে?

কহিলাম,—তা' বুঝলাম, কিন্তু তোমাদের এত বেশী ভাবনার কারণ কিছু বুঝলাম না। চাকরী ক'রতে বিদেশেই না হয় যাচ্ছি, জার্ম্মাণীর সঙ্গে লড়াই ক'রতে ত যাচ্ছি না। আর তাই যদি যেতাম, তাতেই বা এত ভাববার ছিল কি? সে কালের ভারতললনাদের কথা বইয়ে পড়নি অনিলা? তাঁরা নিজেরা ত যুদ্ধ ক'রেছেনই, উপরন্তু তাঁরা হাসিমুখে তাঁদের স্বামী-পুত্রকে যুদ্ধসাজে সাজিয়ে দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

যাও যাও, এ সময়ে ওসব তামাসা ভাল লাগে না। তামাসা করা হ'ল?

জানি না।

অভিমান করিয়া অনিলা চলিয়া গেল, আমি মনে মনে হাসিতে হাসিতে জামা-কাপড় পরা শেষ করিয়া দাদার কাছে আসিলাম।

দাদা খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন, আমি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে তিনি কাগজ রাখিয়া কহিলেন,—সময় হ'য়ে গেল নাকি কানাই?

কহিলাম,—হ্যাঁ; পায়ের ধুলো দিন। দাদার পদধূলি লইবার জন্য নত হইলাম।

থাক্ ভাই থাক্, হ'য়েছে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, যেন তিনি তোমার শরীর সুস্থ আর মন ভাবনা-শূন্য রাখেন।

পদধূলি লইয়া দাঁড়াইতে দেখিলাম, কোঁচার খুটে দাদা চোখের জল মুছিতেছেন। কহিলাম,—আপনিও কাঁদছেন নাকি দাদা, আপনাদের সকলের কান্না দেখে আমারও মন কেমন ক'রছে।

কি ক'রে চোখের জল আট্‌কে রাখি বল, কানাই? আমাদের কাছ ছেড়ে তুই বিদেশে গেলেও আমাদের তুই ভুলবি না, বা আমাদের পর ক'রেও দিবি না, জানি; তবু...না থাক্, চল্ তোকে ঘোড়ার গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসি।...

ঘড়িতে ঢং-ঢং শব্দে পাঁচটা বাজিল।...

বৌদি ও আগত প্রণম্য প্রতিবেশীদের প্রণাম সারিয়া তাড়াতাড়ি গাড়ীতে আসিয়া বসিলাম।

রাস্তায় ও রোয়াকে স্বজন-পরিজন ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে। সকলেই আছে, কেবল দেখিলাম না অনিলাকে। বেচারী অনিলা...একটা অসহ্য বিয়োগান্তক আব্‌হাওয়া।

গাড়োয়ান গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। ওদিকে বাড়ীর মাঝ্য প্রভাত চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। আমিও কাঁদিয়া ফেলিলাম। জীবনের পঁচিশ বৎসরের স্মৃতি-বিজড়িত বাড়ীখানির, গ্রামখানির ও আত্মীয়স্বজনের কথা ভাবিয়া এই করুণ বিদায়-বেলায় অশ্রু সংবরণ করি[illegible] পারিলাম না। মোড় ফিরিতেই দেখি গবাক্ষমুখে অ[illegible] দাঁড়াইয়া। বুকে তার অব্যক্ত বেদনা আর চো[illegible] করুণ-বেদনা। নীরব নিঃশব্দ দৃষ্টিবিনিময়ের মধ্যে [illegible] গোপন আলাপন অন্তরে আমার মুখর হইয়া উঠিল, তাহ[illegible] সারা পথ আমায় মগ্ন করিয়া রাখিল।
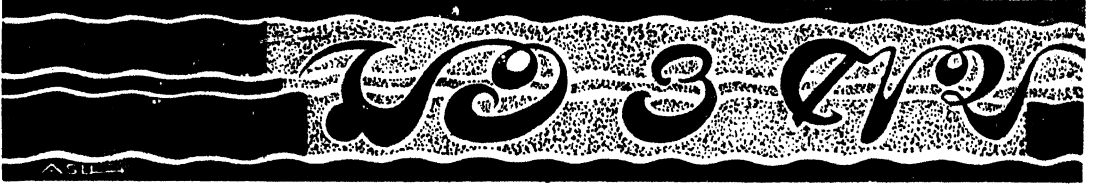
শাসন-পরিষৎ-সম্প্রসারণ

সিমলার সরকারী ইস্তাহারে ঘোষণা করা হইয়াছে—যুদ্ধ সম্পর্কে কার্য্যের চাপ-বৃদ্ধি হওয়ায়, আইন, সরবরাহ, বাণিজ্য ও শ্রম-সংক্রান্ত দপ্তরগুলি স্বতন্ত্র করার প্রয়োজনে, বড়লাটের শাসন-পরিষৎ-পরিবর্দ্ধনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। বর্ত্তমানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমি ও প্রবাসী ভারতবাসী সংক্রান্ত চারিটি বিভাগে বিভক্ত করিয়া প্রচার ও দেশ-রক্ষা নামে দুইটী পৃথক্ দপ্তর সৃষ্টি করা হইয়াছে। শাসনপরিষদের ঐ পাঁচটী নূতন পদে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ভারতসম্রাটের আদেশে নিযুক্ত হইয়াছেন:—(১) সরবরাহ-সচিব—স্যার হরমসজী পি মোদী কে-বি-আই; (২) প্রচার-সচিব—রাইট অনারেবল স্যার আকবর হাইদারী পি-সি; (৩) দেশরক্ষা-সচিব—মিঃ রাঘবেন্দ্র রাও; (৪) শ্রম-সচিব—মালিক স্যার ফিরোজ খাঁনুন কে,-সি-আই-ই; (৫) প্রবাসী ভারতীয় বিভাগ—শ্রীযুক্ত মাধব শ্রীহরি আণে।

অতঃপর, স্যার মহম্মদ জাফর উল্লা খাঁ ও স্যার গিরিজা-শঙ্কর বাজপেয়ী নূতন পদ গ্রহণ করিলে, তাঁহাদের শূন্য আসন গ্রহণ করিবেন স্যার সুলতান আহ্মেদ—আইনসচিব ও শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার—শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি-সচিব।

উক্ত সরকারী ঘোষণায় ইহাও প্রকাশ যে, এই সম্প্রসারিত পরিষদের নূতন ও পুরাতন সদস্যগণের প্রত্যেকের বেতন বার্ষিক ৮০০০০৲ টাকার পরিবর্ত্তে ৬৬০০০৲ নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

এই পরিবর্দ্ধিত শাসনপরিষৎ অসাম্প্রদায়িক ও অরাজনৈতিক বলিয়া বিবৃতিতে উল্লিখিত হইয়াছে। দেখা যাইতেছে যে, বর্ত্তমানে বড়লাট ও জঙ্গীলাট ভিন্ন ৪ জন সিভিলিয়ান অর্থাৎ সরকারী ও ২ জন বে-সরকারী অর্থাৎ সাধারণ সদস্য আছেন; কিন্তু নূতন ব্যবস্থানুসারে সিভিলিয়ান সভ্য মাত্র ৩ জন ও বে-সরকারী অসিভিলিয়ান সভ্য ৭ জন হইবেন অর্থাৎ যেমন পরিষদের মোট সদস্য-সংখ্যাও একদিকে বৃদ্ধি পাইতেছে, তেমনি উহাতে বে-সরকারী সদস্যের সংখ্যাগত প্রাধান্যও পরিলক্ষিত হইবে। কিন্তু ইহার ফলে বড়লাটের শাসন-পরিষৎ বোম্বাই কন্‌ফারেন্সের দাবী-মত সম্পূর্ণ বে-সরকারী হয় নাই। তাহা ছাড়া, স্বরাষ্ট্রবিভাগ, দেশরক্ষাবিভাগ ও অর্থ-বিভাগ 'যথাপূর্ব্বং তথাপরং' অর্থাৎ এগুলি সম্পূর্ণ আমলা-নিয়ন্ত্রিতই রহিয়া গেল। সেই দিক্ দিয়া বড়লাটের শাসন-পরিষদের পরিধি একটু বাড়িল বটে এবং যোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারাই সচিব-পদ পূর্ণ করা হইয়াছেও বটে; কিন্তু তত্রাপি তাহার দ্বারা ভারতবাসীর স্বায়ত্তশাসনের দাবী ও আশা পূর্ণ হওয়ার কোনও লক্ষণই প্রকাশ পায় নাই। ঘোষণাপত্রে এ কথাও স্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছে যে, বর্ত্তমান সামরিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া ও ভারত-শাসন আইনের কাঠামোর ভিতরেই যেটুকু নূতন ব্যবস্থা প্রয়োজনীয়, সেইটুকুই করা হইয়াছে—ভবিষ্যৎ শাসন-তান্ত্রিক সমস্যার সমাধান কল্পে কোনও ব্যবস্থা করা হয় নাই।

এইরূপ খোলাখুলি স্বীকারোক্তির পর, এই প্রসঙ্গে শাসনতন্ত্র-সংক্রান্ত কোন প্রশ্নের আলোচনাই নিরর্থক হইয়া পড়ে। অতএব, নিযুক্ত সদস্যগণ দেশের হিন্দু-মুসলমান রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠানের প্রনিনিধি হইলেন কিনা, সে কথাই আমরা তুলিব না।

মিঃ গার্ণারের রিপোর্ট

বঙ্গীয় ভূমি-রাজস্ব কমিশনের মূল প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে বিচার ও সিদ্ধান্ত করিবার জন্য বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট স্পেশ্যাল অফিসার মিঃ ডবলিউ গার্ণারকে নিযুক্ত করেন—সম্প্রতি তিনি তাঁহার রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন।

এই রিপোর্টের ৪টী ভাগে, যথাক্রমে ভূস্বত্বক্রয়ের সুপারিশ, ... আইনের খসড়া, এতৎসংক্রান্ত সমস্যা-

গুলির বিশদ আলোচনা, কৃষিমূলক আয়করের উপর মন্তব্য এবং রায়তরী প্রথার সংস্কারবিষয়ক কয়েকটি প্রস্তাবের আলোচনা দেখা যায়।

মিঃ গার্ণার তাঁহার রিপোর্টে বাংলার এডভোকেট জেনারেলের অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ফ্লাউড কমিশনের যে অন্যতম প্রশ্ন ছিল—জমিদারী স্বত্ব-ক্রয় বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত কি না, সে বিষয়ে স্পেশ্যাল অফিসার কোন স্পষ্ট উত্তর দেন নাই, বরং কৌশলে প্রশ্ন এড়াইয়া বলিয়াছেন যে, ইহা উৎকট বাদানুবাদের ব্যাপার—এ সম্বন্ধে কোনও সর্ব্বজনগ্রাহ্য সংশোধিত প্রস্তাব উত্থাপন করা সহজসাধ্য নহে।

উক্ত কমিশনের প্রস্তাবগুলি অর্থনৈতিক দিক্ দিয়া বিচার করিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, উহার অর্থনৈতিক মূল্য অতি সামান্যই এবং ঐ ব্যবস্থাগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে যদি উপযুক্ত পরিমাণে সম্পত্তি দখল করা না হয়, তাহা হইলে যে আর্থিক লাভের আশায় ব্যবস্থাগ্রহণ, উহা বহু বৎসরের জন্য কল্পনামাত্রই থাকিয়া যাইবে। তাঁহার আশঙ্কা, রাজশক্তি জমিদারী সত্ব ক্রয় করিলে, খাজনা-প্রদানকারিগণ সরাসরি রায়ত হওয়ায় তাহাদের রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি পাইবে বটে, কিন্তু একুনে খাজনা বৃদ্ধি না পাইয়া হ্রাস পাইবে। এমন কি শুধু খাজনা-সত্ব ক্রয় করিলেও, এইরূপই পরিণামের আশঙ্কা আছে। অবশ্য মিঃ গার্ণারের মতে, "প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পূর্ণ মূল্য পাইতে হইলে, দেশকে এই গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।"

জমিদারী স্বত্বক্রয়ের বৈকল্পিক ব্যবস্থাস্বরূপ যে কৃষিমূলক আয়-করের প্রস্তাব ফ্লাউড কমিশন করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে মিঃ গার্ণারের অভিমত এই যে, এই প্রস্তাবে ভূস্বামিগণের সহিত অপেক্ষাকৃত সহজে আপোষ করা যাইতে পারে। তিনি স্বীকার করেন যে, এই করজনিত আয় অল্প হইলেও, নীতি হিসাবে ইহার একটা নিজস্ব মূল্য আছে। কৃষিজাত আয়করের নিম্নতম হার সম্বন্ধে ফ্লাউড কমিশনের ১০০০৲ টাকার পরিবর্ত্তে বিহার প্রদেশের আইনানুযায়ী ৫০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত আয়করযোগ্য হওয়া উচিত নহে বলিয়াই রিপোর্টে মন্ত...

আমরা এই শেষোক্ত মন্তব্য সমীচিন মনে করি। মিঃ গার্ণারের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অর্থনীতিক বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক আরও সবিস্তারে আলোচনা হওয়া কর্ত্তব্য।

পাবলিক সার্ভিস কমিশন

গত ১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত প্রাদেশিক সার্ভিসের পদপ্রার্থীদের পরীক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে বঙ্গীয় পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের মন্তব্যসহ বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে, ১৯৩৯ সালের পরীক্ষায় মাত্র ২৯ জন প্রার্থী শতকরা ৫০ বা তদূর্দ্ধ নম্বর পাইয়াছেন। ইহার তুলনায় পূর্ব্ব বর্ষে ৮৭ জন পরীক্ষার্থী ঐ প্রকার কৃতিত্বের অধিকারী হইয়াছিলেন। এই ফল নিশ্চয়ই আশাজনক নয়।

কমিশনের মন্তব্য হইতে জানা যায় যে, পরীক্ষার্থীদের সাধারণ জ্ঞান অতিশয় কম, অনেকেই আন্দাজী উত্তর ছাড়া সঠিক উত্তর একেবারেই দিতে পারে নাই, এমন কি, অধিকাংশের শুদ্ধ ও যোগ্য ভাষাজ্ঞান পর্য্যন্ত নাই। অথচ এই সকল গুণ না থাকিলে, সরকারী চাকুরীর যোগ্যতার কোনই মূল্য থাকে না।

বাংলায় সরকারী চাকুরীর এই শোচনীয় অবনতির কারণ কি, তাহা অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য। অবশ্য বিভিন্ন সার্ভিসে প্রবেশার্থীদের পূর্ণ যোগ্যতাসম্পন্ন হইতে হইবে এবং সাম্প্রদায়িক অনুপাত সত্ত্বেও যোগ্যতার মান হ্রাস না পায়, তদ্বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশ আছে। গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে কমিশনের সাহায্যও চাহিয়াছেন। কিন্তু এই যোগ্যতার দুর্ল্লভতার অন্যতম হেতুই যদি এই হয় যে, সাম্প্রদায়িক অনুপাত থাকায় যথেষ্ট সংখ্যক উপযুক্ত গুণবান্ প্রার্থী এক সম্প্রদায় হইতে পাওয়া যাইতেছে না, কাজেই অনুপাত বজায় রাখিতে গিয়াই অযোগ্যতার সংখ্যা-বৃদ্ধি হইতেছে—তাহা হইলে গোড়ায় গলদ যে থাকিয়া যাইতেছে, ইহাতে আর সন্দেহ থাকে না। শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক অনুপাতের শোচনীয় পরিণাম সম্বন্ধে যা ইতিপূর্ব্বে বাংলাদেশ অভিজ্ঞতা পাইয়াছে, তাহাতে আমাদের পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কা অমূলক নাও হইতে পারে। আমরা কমিশনের দৃষ্টি এই দিকেও আকর্ষণ করি।

সাময়িকী

বৈদেশিক সংবাদ

পরলোকে লর্ড উইলিংডন:

মঙ্গলবার ১২ই আগষ্ট অপরাহ্ণে ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড উইলিংডন পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি কিছুদিন যাবৎ নিউমোনিয়া রোগে ভুগিতেছিলেন। ১৯১৩ সালে তিনি বোম্বায়ের গবর্ণর ও ১৯১৯ সালে মান্দ্রাজের গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৯২৬ সালে তিনি কানাডার গবর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন ও ১৯৩১ সালে ম্যাক্‌ডোনাল্ড গবর্ণমেন্টের আমলে তাঁহাকে বড় লাটের পদে নিযুক্ত করিয়া ভারতে পাঠান হয়।

গত মহাযুদ্ধের ভাতার পরিমাণ:

গত ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধে আহত ব্যক্তিকে ও মৃত ব্যক্তির পরিবারবর্গকে যে ভাতা দেওয়া হইয়াছে তাহার মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১,৩৯৯,০০০,০০০ পাউণ্ড। সম্প্রতি কমন্স সভায় স্যার ওয়াল্টার উমার্সলি (Minister for pensions) এ বিষয়ে উল্লেখ করেন।

লণ্ডনের পূর্ব্বাঞ্চলে মস্‌জিদ নির্ম্মাণ:

লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ, ঐশ্লামিক সংস্কৃতি ও ধর্ম্ম-সাধনার কেন্দ্রস্বরূপ লণ্ডনের পূর্ব্বাঞ্চলে যে মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল, সম্প্রতি মিশরের রাজদূত কর্ত্তৃক তাহার দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে।

ইন্দোচীন ও জাপ-ভিসি চুক্তি:

ইন্দোচীন সম্পর্কে ভিসি গবর্ণমেণ্টের সহিত জাপ গবর্ণমেণ্টের এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই চুক্তির বলে ২৯শে জুলাই হইতে জাপানীরা দক্ষিণ ইন্দোচীনের বিমান ও নৌ-ঘাঁটিগুলি দখল করিতে ও সৈন্য মোতায়েন করিতে সুরু করিয়াছে। ইতিমধ্যে জাপ প্রিভি-কাউন্সিলের এক অতিরিক্ত বৈঠকে জাপ-ইন্দোচীন 'যুক্ত দেশ-রক্ষা চুক্তি' অনুমোদিত হইয়াছে। চুক্তি অনুযায়ী জাপানীদিগকে সাইগন ও সিয়েমরীপ বিমানঘাঁটি সহ আটটি বিমান ঘাঁটি ব্যবহার করিতে দেওয়া হইয়াছে।

জাহাজ-ডুবির খতিয়ান:

সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, গত বৎসর জানুয়ারী মাস হইতে এই বৎসর জুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত আনুমানিক ৪১,৯০০ বৃটিশ বে-সামরিক প্রজা নিহত এবং ৫২,৬৭৮ জন আহত হইয়াছে।

নৌ-বিভাগের এক ইস্তাহারে জানান হইয়াছে যে, যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে এতাবৎ ১৭৩৮ খানা বাণিজ্য-জাহাজ ধ্বংস হইয়াছে; তন্মধ্যে ১০৭৮ খানা বৃটিশ জাহাজ, ৩৩৪ খানি মিত্রপক্ষীয় জাহাজ এবং ৩২৬ খানা নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের জাহাজ। এ্যাক্সিসপক্ষীয় ধৃত, ধ্বংসপ্রাপ্ত ও স্বয়ং নিমজ্জিত জাহাজের মোট টনেজ ৩২৯৯০০০ হইবে।

স্বাদেশিক সংবাদ

রবীন্দ্র-প্রয়াণে:

বাংলা ও বাঙালীর মুকুট-মনি বিশ্ববরেণ্য কবি ও ঋষী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহাপ্রয়াণে সমগ্র দেশের সাথে আমরাও তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী দান করিতেছি। এই উপলক্ষে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের কেন্দ্র চন্দননগরে, চট্টল ও ময়মনসিংহ প্রবর্ত্তক আশ্রমে এবং সঙ্ঘের বিভিন্ন কেন্দ্রে উপাসনাদির মধ্য দিয়া বিশেষ নিয়ম ও সংযম সহকারে কবীন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদত্ত হয় এবং শোক-সভা অনুষ্ঠিত হয়। শান্তিনিকেতনের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুত নেপালচন্দ্র রায়ের পৌরোহিত্যে গত ১৩ই আগষ্ট প্রবর্ত্তক কর্ম্মি-সঙ্ঘের সভ্যগণ বিশেষ নিবিড়তার সহিত এক স্মৃতি-সভায় কবিগুরুর জীবন মাহাত্ম্য আলোচনা ও শ্রদ্ধা-তর্পণ করেন। সঙ্ঘে কবিগুরুর স্মৃতি রক্ষারও ব্যবস্থা হইতেছে।

চন্দননগরে শোক-সভা :

বিগত ১০ই আগষ্ট অপরাহ্নে নৃত্যগোপাল স্মৃতি-মন্দিরে শ্রীমতিলাল রায় মহোদয়ের পৌরোহিত্যে রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ উপলক্ষে এক বিরাট্ শোক-সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় নবীন-প্রবীণ নির্ব্বিচারে চন্দননগরবাসী উপস্থিত হইয়া বিগত আত্মার প্রতি সশ্রদ্ধ শ্রদ্ধাঞ্জলী প্রদান করেন এবং তাঁর জীবন-মাহাত্ম্য কবিতা, প্রবন্ধ এবং বক্তৃতার দ্বারা আলোচনা করেন।

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ শতবার্ষিকী :

২রা আগষ্ট শনিবার অপরাহ্নে শ্রীমতিলাল রায়ের পৌরোহিত্যে বর্দ্ধমান টাউন হলে শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ শত-বার্ষিকীর উদযাপন-সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ শেঠ, শ্রীযুত তুলসীদাস কর এবং শ্রীযুত নারায়ণ-দাস ভট্টাচার্য্য প্রমুখ ব্যক্তিগণ গোস্বামীজীর অসাধারণ জীবনের বিভিন্ন দিক্ আলোচনা করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় গোস্বামী প্রভুর জীবন ও সাধনার গূঢ় গভীর মর্ম্ম-পরিচয় প্রদান করিয়া ভবিষ্য জাতিগঠনে তাঁর দান, স্থান ও সার্থকতা কি, তাহারই দিগদর্শন করান। সভায় সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তি ও গোস্বামীজীর বহু ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুত রায় সপারিষদ শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ সামন্ত মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করেন।

প্রবর্ত্তক কলেজের সমাবর্ত্তন :

"জ্ঞান অমৃত আর কর্ম্মই জীবনের আশ্রয়। তরুণ জাতিকে শিক্ষা ও সাধনার মধ্য দিয়া এই অমৃত ও আশ্রয়েরই সন্ধান দিতে হইবে। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের কর্ম্মিগণ এই কলেজে সেইরূপ শিক্ষারই সার্থক সূচনা করিয়াছেন, ইহাতে আমি পরিতৃপ্ত। ছাত্রগণ এই শিক্ষার মর্য্যাদা রক্ষা করিবে, ইহা আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি।"

উপরোক্ত উদ্দীপনাময়ী ভাষণের পর সঙ্ঘ-গুরু শ্রীমতিলাল রায় মহাশয় প্রবর্ত্তক কালচারল্ কলেজের সমাবর্ত্তনোৎসবে ছয়টি উত্তীর্ণ ছাত্রকে যোগ্যতাপত্র প্রদান করেন।

ছয়মাস পূর্ব্বে গত শ্রীপঞ্চমীর পুণ্য তিথিতে প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের উদ্যোগে ১০টি ছাত্রকে লইয়া প্রবর্ত্তক কলেজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হয়। ছয় মাসের শিক্ষাক্রম সমাপনান্তে গত ২৭শে জুলাই রবিবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় প্রবর্ত্তক বালিকাবিদ্যালয় হলে মনীষী ডাঃ কালিদাস নাগের নেতৃত্বে এই উৎসব সুসম্পন্ন হয়।

কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত যে অনুষ্ঠানপত্র পাঠ করেন, তাহাতে জানা যায়—কলেজের বর্ত্তমান 'সেশান' বৎসরব্যাপী হইবে এবং তাহার জন্য একটি উপযুক্ত কার্য্য-পরিচালকমণ্ডলী গঠিত হইয়াছে। এই অভিনব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন বর্দ্ধমানের মহারাজা-ধিরাজ শ্রীবিজয়চাঁদ মহাতব বাহাদুর, মৈমনসিংহের মহারাজা বাহাদুর, স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার ও দেশশ্রী শ্রীহরিহর শেঠ। কলিকাতার বহু প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ও বিশিষ্ট সুধীবর্গ এই কলেজে বিবিধ বিষয়ে বক্তৃতা দিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। উৎসবে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সমাগত ভদ্র মহোদয়গণের পক্ষ হইতে নিখিল বঙ্গ শিক্ষকপরিষদের সম্পাদক শ্রীযুত মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন।

কুসুম এঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্ :

"বেকার-সমস্যা-পীড়িত মধ্যবিত্ত ঘরের শিক্ষিত বাঙালী তরুণের সম্মুখে 'কুসুম এঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্' একটা নবতর আদর্শ সৃষ্টি করল। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের সহানুভূতি ও সহযোগিতায় শ্রীমান্ বিশ্বনাথ দত্ত আজ যে শ্রমসাধ্য কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করলেন, আরম্ভ তার যত নগণ্যই হোক, কর্ম্মীর সততা ও কর্ম্মনিষ্ঠাই একদিন এই প্রতিষ্ঠানকে বৃহৎ করে' তুলবে। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের এই নূতন অভিযান সঙ্ঘসীমা ছাড়িয়ে জাতির মধ্যে বিসর্পিত হওয়ারই নিদর্শন।"

উপরোক্ত মন্তব্য সহকারে প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রীযুত কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় গত ২৮শে জুলাই ১৪১।২এ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটস্থ কুসুম এঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্-উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে পূজা এবং উপাসন উপস্থিত সঙ্ঘসভ্য এবং দর্শকবৃন্দ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়।

যুগ্ম সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী
প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি-এ কর্ত্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত
এবং প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং [illegible] কলিকাতা হইতে শ্রীফণিভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ষড়বিংশ বর্ষ ১৩৪৮ সাল	আশ্বিন	প্রথম খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা

জ্ঞান ও কর্ম্ম

বাংলায় কর্ম্মী চাই। ধর্ম্মহীন জীবন এদেশে কর্ম্মের অধিকার পায় না। ধর্ম্মপ্রাণ সংহতিই জাতির স্বাধীনতা বহন করে' আন্‌বে। রাষ্ট্র, সমাজ, সবই হবে ধর্ম্মতত্ত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত। অক্ষয় প্রাণশক্তিই ধর্ম্মের প্রকৃত লক্ষণ।

সংগ্রহ কর বিশ্বাস, সংগ্রহ কর শক্তি, সংগ্রহ কর অনাবিল প্রেম—এই দিয়ে সংহতিবদ্ধ কর শত জন মানুষ, যারা হবে নিষ্কাম, নিরলস কর্ম্মী। কর্ম্মই দিব্যজীবনপ্রাপ্তির কষ্টিপাথর—সে কর্ম্ম যোগযুক্ত—ঈশ্বরেচ্ছার মূর্ত্ত বিগ্রহ। তোমাদের জীবন হউক ভগবানের জন্য। এই অমৃতবিন্দুই জীবনের সার্থকতা। তোমাদের কর্ম্ম আজ লোকচক্ষে যতই ক্ষুদ্র হউক, ইহাই উদীয়মান জাতির মুক্তি ও কল্যাণের হেতু। যোগসিদ্ধ জীবন ভগবানের আশীর্ব্বাদস্বরূপ—এই তৃপ্তি, এই আত্মপ্রসাদই নবজাতিকে সর্ব্বজয়ী করবে। এই জ্ঞান অমৃত। এই কর্ম্ম আশ্রয়স্বরূপ। অমৃতের অভিষেকে অন্তর উজ্জ্বল ও রসপূর্ণ কর। কর্ম্মের আশ্রয়ে দৃঢ়চরিত্র ও বিজয়ী প্রেরণাশক্তি ফুটে উঠুক। ভগবানকে কেন্দ্র করে'ই ভারতের জীবনবেদ সিদ্ধ হবে। বেদ-প্রতিষ্ঠ ভারতের নব-সমাজ, নব-রাষ্ট্রের সূচনা এইখানেই।

—শ্রীম

ধর্ম্মরাষ্ট্র

ধর্ম্ম কথা নয়, শক্তি। ধর্ম্ম বস্তুতন্ত্র জীবন। ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা রাষ্ট্রে। ইহা প্রাচীন ভারতের সনাতন জীবন-প্রেরণা। স্বাধীন যুগের ভারত এই প্রেরণাকেই তাহার জীবনে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় রূপ দিয়া আসিয়াছে—ভারতের ইতিহাসই তাহার প্রমাণ। প্রায় হাজার বছরের পরাধীনতার চাপে ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রেরণা তাহার মূল উৎসের সন্ধান হারাইয়া ক্রমশঃ ভিন্নমুখী হইয়া পড়িতেছে। আমরা আজ ধর্ম্ম বলিতে নানা অবাস্তব কল্পনাকে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিয়া ধর্ম্মের বস্তুতন্ত্র জীবন-প্রেরণা হইতে বহু দূরে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছি। ভারতের ধর্ম্ম কোনও দিনই রাষ্ট্রহারা থাকে নাই ; ভারতের রাষ্ট্রশক্তিও কোনও দিন ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত, বিযুক্ত কল্পিত হয় নাই। এ জাতির ধর্ম্মগুরু ও রাষ্ট্রগুরু একাধারে বা স্বতন্ত্র আধারে আবির্ভূত হইয়া যুগে যুগে ধর্ম্মরাজ্যপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নই আমাদিগের সম্মুখে ধরিয়াছেন। যুগে যুগে রাষ্ট্রে ও সমাজে ধর্ম্মগ্লানি উপস্থিত হইলে, ভগবানই যুগাবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়া দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে পুনরায় ধর্ম্মসংস্থাপনই করেন।

ধর্ম্মের মূর্ত্তি জীবন। নিরাকার আত্মাকে লইয়াই ধর্ম্ম নহে। আত্মার ধর্ম্মই জীবনগতির মধ্য দিয়া রূপ-গ্রহণ করে। ইহা তাহার স্বেচ্ছাকৃত প্রয়োজনবশেই অপরিহার্য্য। আত্মার মূর্ত্তিগ্রহণ কখনও নিরর্থক হইতে পারে না, মিথ্যা বা মতিভ্রম হইতে পারে না। জীবন থাকিলে তাহার সর্ব্বৈশ্বর্য্যই থাকিবে—সাহিত্য, শিল্পকলা, সমাজ, শিক্ষা, ব্যবসায়-বাণিজ্য, রাষ্ট্র ইহার কোনও অঙ্গ বাদ দিয়া আত্মার জীবনসাধনা পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না। ধার্ম্মিক যিনি, তিনি এই সকল ক্ষেত্রেই নবীন প্রাণ, নবীন বীর্য্য সঞ্চার করিবেন, তবেই তাঁহার ধর্ম্ম-জীবন সত্য সত্য সিদ্ধ ও সার্থক হইবে।

প্রত্যেক ব্যক্তির ন্যায়, এক একটী সমষ্টিরও আত্মা আছে। সেই আত্মার বিশেষ ধর্ম্মই সেই সমষ্টির বিশিষ্ট জীবনে রূপায়িত হইবে। জাতির ইহাই জাতীয় ধর্ম্ম। আধুনিক পরিভাষায় ইহাকেই বলা যায় জাতীয়তা বা ন্যাশ্যানালিজম্। বর্ত্তমান কালে বিশ্বজাতির এই জাতীয়তার পরিণতি যুগই চলিয়াছে, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রত্যেক জাতির জাতীয়তাই স্ব-স্ব জীবনে বিশেষ সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় রূপ গ্রহণ করিতে উৎকট তপস্যারত। এক জাতীয়তার সহিত অপর জাতীয়তার ঘোরতর ধর্ম্ম-বিরোধ যদি থাকে, তাহার ফলেই পরস্পর সাংঘাতিক সংঘর্ষ অনিবার্য্য। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ এইরূপ সংঘর্ষেরই ভীষণ পরিণতি। এক একটী নেশনের ন্যাশ্যানালিজম্ বা জাতির জাতীয়তা আজ নিজ নিজ কৃষ্টি ও ধর্ম্মকেই মূল করিয়া ভয়ঙ্কর জীবনসংগ্রামে মাতিয়া উঠিয়াছে। সকলেরই কঠিন পণ—স্বধর্ম্মে মরণং শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্মঃ ভয়াবহঃ। যত মত, তত পথ—এই নীতি আজ জাতীয়তার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ফুটন্ত।

ভারতের জাতীয়তাও পরিপাকের পথেই চলিয়াছে। তাহার সপ্ত শত বর্ষের পরাধীনতা জাতির অন্তর্নিহিত বহু দুর্ব্বলতার লক্ষণ-স্বরূপ ফুটিয়া উঠিলেও, আখেরে ভারতাত্মা এই নিরুপায়ের উপায় বরণ করিয়াও আপনার গভীর গূঢ় স্বধর্ম্মই সিদ্ধ করিয়া তুলিবে। গোড়াতে এই বিশ্বাসটুকুই আমাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে, তাই আমরা ভারতের মুক্তি লক্ষ্যে সম্পূর্ণ আস্থাবান্ হইতে পারিয়াছি। ভারতের রাষ্ট্র-স্বাধীনতা এই জন্যই তাহার দীর্ঘ ঐতিহাসিক সমষ্টি-সাধনার অনিবার্য্য পরিণতি-স্বরূপ আমরা প্রত্যয় করি। কিন্তু তাহার জাতীয়তার এই রাষ্ট্ররূপ তাহার জাতীয়াত্মারই সম্পূর্ণ অনুরূপ হওয়া চাই। আমাদের পরাধীন যুগে, পর-জাতীয়তার আপীড়নে প্রভাবে আত্মধর্ম্মের অনুভূতি যতই মাঝে মাঝে ম্লান হই[illegible] পড়ুক, ভিতর হইতে অপরিমেয় শক্তিস্রোতঃ উৎস্থত হইয়া [illegible] নব জাগরণের প্রবাহ যুগে যুগে বহিয়া আনিয়াছে।

অন্ধকার যতই ঘনীভূত হইয়াছে, তার পরেই দেখা যায় আসিয়াছে ততোধিক নব-জীবনের জ্যোতির্ম্ময় উপাদান-সঞ্চয়। আজ ভারতের সর্ব্বাধিক অন্ধকার-যুগ যদি আসিয়া থাকে, বুঝিতে হইবে—ইহার পরক্ষণেই আসিতেছে নূতন সূর্য্যের জ্যোতিরুদ্ভাসিত উজ্জ্বলতম প্রভাত—নব অরুণোদয়ের আগমনী-শঙ্খধ্বনিই তাই আমাদের অন্তরে অন্তরে আজ অগ্নিবর্ণে উদ্বেলিত হইয়া উঠে। ভারতের উদীয়মান তরুণদের এই অন্তরুত্থিত জাতীয়াত্মার জাগরণ-বাণীই আজ অন্তর দিয়া প্রণিধান করিতে হইবে। ইহার জন্য যে তপস্যা, তাহা বরণ করিতে কুণ্ঠা করিলে তাহাদের চলিবে না।

আজ গরল-সমুদ্র মন্থন করিয়াই অমৃতের উদ্ভব হইবে। বিজাতীয় শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে যে রাজনীতি-চর্চ্চা, তাহার দিন ক্রমেই ফুরাইয়া আসিতেছে। দীর্ঘ দুই যুগের অভিজ্ঞতাস্তূপে দাঁড়াইয়া জাতীয়াত্মা আজ চাহিতেছেন—ছায়া ছাড়িয়া কায়ায়, প্রভাব হইতে স্বভাবে ফিরিয়া আসিতে। আজ ভারত তাহার বিশিষ্ট আত্ম-বস্তুকে অনুভব করিয়াই তাহার শিক্ষা, সমাজ, অর্থ, রাষ্ট্র, সর্ব্বক্ষেত্রে জাতীয়তার প্রকাশ-নীতি অবধারণ করিয়া লইবে। এই প্রকাশ স্বধর্ম্মেরই আত্মপ্রকাশ। তাহার শিক্ষা, সমাজ, অর্থ ও রাষ্ট্রসাধনা হইবে আপনার আসল জাতীয় স্বরূপধর্ম্মেরই আদর্শে অনুপ্রাণিত, বিশিষ্ট স্ব-প্রেরণায় নিয়ন্ত্রিত—কোনও বাহিরের পীড়নে বা প্রভাবে নহে। ভারতের শিক্ষা হইবে জাতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির শিক্ষা। ভারতের সমাজ হইবে—সেই কৃষ্টি ও সংস্কৃতিমূলক নব জাগ্রত সমাজ—নিজ অধ্যাত্মপ্রেরণায় সজীব ও চঞ্চল—নিজস্ব প্রতিভায়, শাস্ত্রমর্ম্মে, সদাচারে সঞ্জীবিত, প্রবুদ্ধ। ভারতের অর্থনীতি, ভারতের রাষ্ট্রনীতি ভারতাত্মাকেই অনুসরণ করিবে—তদনুযায়ী নূতন ছাঁচ, যথাযোগ্য সিদ্ধমূর্ত্তি গড়িয়া লইবে।

আজ রাষ্ট্রহারা ধর্ম্মের অভ্যুত্থান তাই আমরা পরিকল্পনা করিতে পারি না। যেমন নিরন্ন নিঃস্ব ধর্ম্মও নাই, তাহা সত্য ধর্ম্ম নহে, তেমনি নিরস্ত্র, দুর্ব্বল, পরাধীন বা পরকীয় আদর্শের অনুবর্ত্তী রাষ্ট্রীয় অবস্থা লইয়াও ভারতের জাগ্রত ধর্ম্মশক্তি চিরদিন বিমূঢ় হইয়া থাকিবে না। ভারতে ধর্ম্মের জাগরণ অর্থে তাহার সার্ব্বাঙ্গীণ জাতীয় জীবনেরই অভ্যুত্থান। ভারতের নবীন ধর্ম্মযুগে তাই আমরা নিখুঁৎ পূর্ণাঙ্গ নবীন ধর্ম্মরাষ্ট্র, দিব্য সাম্রাজ্যেরই কল্পবিগ্রহ তরুণ জাতির সমুজ্জ্বল আদর্শরূপে তাহাদের সম্মুখে স্থাপন করিতেছি।

কর্ম্মবাদ

ভারত কর্ম্মবাদী। আরও বিশেষ করিয়া বলিতে হইলে, ভারতের হিন্দুধর্ম্মীই কর্ম্মবাদী মহাজাতি। জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মীও কর্ম্মবাদী—তাঁহারা কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের স্বাভাবিক নিয়মে বিশ্বাসী, কিন্তু কর্ম্মতত্ত্বের দার্শনিক ব্যাখ্যা দেন না। কিন্তু হিন্দুর কর্ম্মবাদ পরিপূর্ণ দার্শনিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন লোকায়ত বা আধুনিক জড়বাদিগণ যেটুকু কর্ম্মবাদে প্রত্যয় করেন, তাহা শুধু জড় শরীরের গণ্ডীর মধ্যেই নিবদ্ধ; সুতরাং কোনও [illegible]ঙ্গ কর্ম্মবাদ তাঁহাদের নিকট প্রত্যাশা করা যায় না। [illegible]রা শাস্ত্র-সাহায্যে এবং সহজ জ্ঞান ও যুক্তিযোগে [illegible] ভারতের কর্ম্মবাদের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে এখানে যৎকিঞ্চিৎ [illegible]লোচনা করিব।

আমরা কর্ম্ম করি, অতএব কর্ম্ম আমাদের শক্তিজাত আমাদের কর্ম্মের মূলে আছে প্রবৃত্তির বা নিবৃত্তি শক্তি—ইহাই আমাদের জৈব-স্বভাব-জাত কর্ম্ম। আমাদের দেহ-ধারণ, দেহের জন্ম, মৃত্যু, আয়ুঃ ও ভোগ, এই সকল ঘটনা কিরূপে, কি নিয়মবশে সংসাধিত হয়, তাহারই বিচার, আলোচনা এবং তৎসম্বন্ধে সিদ্ধান্তই কর্ম্মবাদ ও কর্ম্মতত্ত্ব।

কর্ম্ম নানা প্রকার। তন্মধ্যে জৈব ও অজৈব ভেদে বিচারের জন্য দুইটী মূল বিভাগ করা যাইতে পারে। অজৈব কর্ম্ম ভৌতিক ও যান্ত্রিক। জৈব কর্ম্ম প্রাণীর স্বভাবজাত ইচ্ছার বিকাশ বা তাহার উপর শক্তির প্রতিক্রিয়া। স্বেচ্ছাধীন কর্ম্মকেই আমরা বলি পুরুষকার; আর আরোপিত বা প্রতিক্রিয়ামূলক কর্ম্মই অদৃষ্ট বা দৈব কর্ম্ম।

ইচ্ছাধীন কর্ম্মই মৌলিক কর্ম্ম। ইচ্ছা কর্ম্মে পরিণত হয়। জ্ঞানজন্যা ভবেদিচ্ছা—ইচ্ছার মূলে আছে জ্ঞান।

কর্ম্মবিজ্ঞান জানিতে হইলে, এই ইচ্ছার মূল আত্মজ্ঞানের স্বরূপ অবগত হইতে হয়। এই জ্ঞান আত্মজ্ঞান—যেহেতু "আমি জানি", এই আত্মবোধের উপরই প্রত্যেক জীবের সকল জ্ঞান স্বভাবতঃ আশ্রিত। সে আমি কিরূপ? কি কি ভাব বা উপাদান লইয়াই বা আমাকে কর্ম্ম করিতে হয়? এইগুলিই অতঃপর বিচার্য্য।

আমরা দেহধারী জীব, অতএব দেহই আমাদের প্রথম ও প্রত্যক্ষ অংশ। দেহ সজীব, প্রাণময়—প্রাণশক্তিই ইহাকে আশ্রয় করিয়াছে, ধারণ করিয়া রহিয়াছে, ইহাকে চালনাও করিতেছে। এই প্রাণের পঞ্চবিধ রূপ ও ক্রিয়া আমরা বিশ্লেষণে পাই—যাহা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ বা অণু-পরমাণুকে অখণ্ড বোধে একত্র সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে, যাহা আভ্যন্তরীণ শারীর ধাতুগুলিকে স্ব-স্ব আন্তরিক বৈশিষ্ট্যবোধে ধারণ করিয়া আছে, যাহা দেহের চলনশীল অংশগুলিকে সঞ্চালিত করিতেছে, যাহা অপ্রয়োজনীয় উপাদান পরিত্যাগ করিতেছে ও যাহা এই সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রাণক্রিয়ার মধ্যে সুসামঞ্জস্য রক্ষা করিতেছে। প্রাণ, উদান, ব্যান, অপান ও সমান—দেহের মধ্যে এই পঞ্চভাগে বিভক্ত জীবনীশক্তি আত্মচেতনার একটী প্রধান ও স্থায়ী অংশ।

এই প্রাণময় দেহের মধ্য দিয়া যে ইন্দ্রিয়গুলি কার্য্য করে, তাহা দুই শ্রেণীর। প্রত্যেক শ্রেণী আবার পঞ্চ-সংখ্যক। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—ইহারা আত্ম-চেতনার দ্বিতীয় অংশ। ইন্দ্রিয়গুলি ভিতর ও বাহিরের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন ও রক্ষা করে। আত্মচেতনার তৃতীয় অংশ—অন্তঃকরণ। এইখানেই আমিত্বের মূল আশ্রয়। চিত্তবৃত্তি, সঙ্কল্প-বিকল্প, অহং-বুদ্ধি—এই সকল ইহার উপকরণ।

উপরোক্ত অন্তঃকরণ ও বহিঃকরণগুলির সম্মিলিত চেতনাই জীবের আত্মচেতনা এবং এই সচেতন জীব উহাদের আশ্রয় করিয়াই কর্ম্ম করে। কর্ম্মের মধ্য দিয়া সে এক অবস্থা হইতে অপর অবস্থায় উপনীত হয়। অতএব চেতনার সক্রিয় পরিণামশীলতাকেই কর্ম্মের স্বরূপ বলিলে অন্যায় হইবে না।

কর্ম্ম মাত্রেই পরিণামী। এই পরিণামের অনুভূতি আছে। আমাদের ক্রিয়া ও জ্ঞান, কখনও ব্যক্ত বা পরিস্ফুট থাকে, কখনও বা অব্যক্ত অর্থাৎ নিগূঢ় প্রচ্ছন্ন হইয়া অবস্থান করে। ক্রিয়া ও জ্ঞানের এই অব্যক্ত সংস্কাররূপে অবস্থিতিও জীবপ্রকৃতির অন্তর্গত গুণবিশেষ বলা যাইতে পারে।

জীবপ্রকৃতির এই ত্রিলক্ষণই ভারতের সাংখ্যশাস্ত্রে ত্রিগুণ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। মহর্ষি পতঞ্জলিদেবও তাঁহার যোগশাস্ত্রে এই ত্রিগুণ স্বীকার করিয়া তাহাদের প্রকাশ, স্থিতি ও ক্রিয়াস্বভাবের পরিচয় স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির কর্ম্ম অন্যতম প্রধান গুণ অর্থাৎ ক্রিয়া স্বভাব রজোগুণ। তাহার একদিকে প্রকাশ-স্বভাব সত্ত্ব অর্থাৎ জ্ঞান এবং অপরদিকে স্থিতি-স্বভাব তমঃ, যাহা সূক্ষ্ম সংস্কার বা বীজশক্তি। ভারতের কর্ম্মবাদ এই তত্ত্ববিচার অর্থাৎ প্রকৃতি-বিজ্ঞানেরই উপর প্রতিষ্ঠিত। এই দার্শনিকতা নিছক যুক্তি ও বিচারমূলক —ইহার মধ্যে অবৈজ্ঞানিক উপপত্তি কিছুই নাই।

কর্ম্ম করেন প্রকৃতি; ইহা প্রকৃতিরই ধর্ম্ম। ভারতে ধর্ম্মজীবন তাই কোনও দিন কর্ম্মনিরপেক্ষ নহে। কর্ম্ম জীবের প্রকৃতিসিদ্ধ ধর্ম্ম। কর্ম্ম না করিয়া কেহ ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। কর্ম্মহীন জীবন অবৈজ্ঞানিক, অবাস্তব। নৈষ্কর্ম্ম্য কখনও জীবনের ধর্ম্ম হইতে পারে না। অতএব তাহা জীবেরও ধর্ম্ম নহে। কোনও মানুষ বা জাতি নৈষ্কর্ম্ম্য বরণ করিলে, তাহার জীবন প্রকৃতি-বিরুদ্ধ হওয়ায়, প্রকৃতি তাহাকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবেন বা তমোগুণে ডুবাইয়া অশেষ দুর্গতিগ্রস্ত করিবেন, ইহা অবধারিত। ভারতে সন্ন্যাস, ভৈক্ষ্য বা নৈষ্কর্ম্ম্যবাদের প্রচলনই ভারতবাসীর অধোগতির কারণ, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

প্রাচীন ভারতে কোনও প্রামাণিক শাস্ত্রে নৈষ্কর্ম্ম্যবাদের সমর্থন নাই, প্রশংসাও নাই। "পশ্যেম শরদঃ শতং", "বয়ম্ জীবেম শরদঃ সবীরাঃ" "কুর্ব্বন্নেব হি কর্ম্মাণি জীজিবিষেৎ শতং সমাঃ"—ইত্যাদি শ্রুতিমন্ত্র সনাতন কর্ম্মবাদেরই পরিপোষক। প্রত্যেক ঋষিই জীবনবাদী, কর্ম্মশীল হইয়া তাঁহারা স্বয়ং শতায়ুঃ জীবন কামনা করিতেন। দাতাকে তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করিতেন—"দাতা শতং জীবতু" বলিয়া। ধর্ম্ম ও কর্ম্মকে স্বতন্ত্র করার প্রথা

পাশ্চাত্ত্য জাতি ও সমাজের মধ্যেই বরং দেখা যায়—কারণ সেখানে ধর্ম্ম অর্থে রিলিজন, ভগবৎ-স্তুতি, প্রার্থনা, গির্জ্জায় ধর্ম্মযাজকের বক্তৃতা শুন। এইগুলিই ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণ্য—কোথাও কোথাও ইহার সহিত দান, দয়া প্রভৃতি নৈতিক পুণ্যকার্য্যগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় মাত্র। তাহাদের এই "রিলিজন" ও "মর‍্যালিটি" ছাড়া জীবনের অন্যান্য অধিকাংশ কর্ম্মই ধর্ম্মাধর্ম্মবহির্ভূত অর্থাৎ তাহা ধর্ম্মও নহে, পুণ্যও নহে, কর্ম্ম মাত্র। ভারতের প্রাচীন আর্য্যজাতি এইরূপ ধর্ম্ম-কর্ম্ম-ভেদ মানিতেন না। তাঁহাদের জীবনই ছিল ধর্ম্মক্ষেত্র। সংসার, পরিবারপালন গার্হস্থ্য-জীবন—ইহা ধর্ম্মই। শস্য উৎপাদন করা, অর্থোপার্জ্জন করা, দেশরক্ষা করা, সমাজ-রাষ্ট্র-রক্ষার জন্য ধর্ম্মযুদ্ধ করা—এ সকলও ধর্ম্মজীবনেরই অঙ্গীভূত, বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন ধর্ম্ম। এই সনাতন ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়াই আমরা হয় পাশ্চাত্ত্য আদর্শে প্রভাবিত, নয় একান্ত তমসাচ্ছন্ন ও হতবুদ্ধি হইয়াই ধর্ম্মকে নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণযুক্ত, মোক্ষনামক একটা অনির্দ্দিষ্ট শূন্যতার অভিমুখে অভিযান বলিয়াই ধারণা করিয়া লইয়াছি। এই বুদ্ধিভ্রংশ হইতেই আমাদের মুক্তি লইতে হইবে।

যাহা একান্ত স্বার্থ-মূলক নহে, সেই কর্ম্মই ধর্ম্ম। ইহার অর্থ ব্যক্তির আত্মজীবন থাকিবে না তাহা নহে; স্বার্থ ও পরার্থ মূল পরমার্থে স্থান পাইবে, উভয়ই ভূমার স্পর্শে বিশুদ্ধ ও ঋতময় হইয়া উঠিবে। কর্ম্মে ছোট, বড় কিছু নাই—কর্ম্ম যখন যজ্ঞ হয়, তখন ব্যক্তির স্বার্থসেবন দেবতার প্রসাদে পরিণত হয়; পরার্থও আর পর-সেবা বলিয়া মনে হয় না, তাহা হয় "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি"—সর্ব্বব্যাপী বাসুদেবেরই পূজার নামান্তর। ইহাই "ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"—এই বেদ-বাক্যের নিগূঢ় মর্ম্ম। এই যজ্ঞ-স্বরূপ ব্রহ্ম-কর্ম্ম সাধন করিয়াই ভারতের ঋষি-শাসিত আর্য্যসমাজ ও আর্য্য জাতি অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স্ লাভ করিয়াছিল। এই সনাতন ধর্ম্ম পুনর্জ্জাগ্রত হইলেই আমরা আবার মহীয়ান্ ও মুক্তস্বরূপ হইব।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি—কর্ম্মের এই দ্বিবিধ গতি কর্ম্ম-বিজ্ঞানেই জ্ঞেয় ও অনুসরণীয়। নিবৃত্তির স্থান বুদ্ধি, প্রাণ ও ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির ক্ষেত্র। বুদ্ধিযোগে আমরা অন্তরে সর্ব্ব স্বার্থ ও আসক্তি ত্যাগ করিয়া নির্লিপ্ত হইব। বুদ্ধি হইবে চিৎ-স্বরূপ শ্রীভগবানের আজ্ঞাবধারণের শুদ্ধ যন্ত্র। তাঁহার চিন্ময়ী প্রবৃত্তি যাহা করিতে চাহেন, তাহাই বুদ্ধি বিমল স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় আপনাতে প্রতিফলিত করিয়া ধরিবে ও প্রাণেন্দ্রিয়গুলিকে সেই ঊর্দ্ধের আদেশ জ্ঞাপন করিবে। বিশোধিত ইন্দ্রিয় ও প্রাণযন্ত্র সেই ঈশ্বরাজ্ঞাই জীবনে লীলায়িত, বস্তুতন্ত্র করিবে। ইহাই ভারতের কর্ম্মবাদে ভোগ ও মুক্তির সমন্বয়। অন্তরে চির মুক্তি ও শান্তি, অসীম জ্যোতিঃ ও আনন্দ; বাহিরে প্রকৃতি-নির্দ্দিষ্ট সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-লীলা—এইখানেই সেই কর্ম্মবাদের নিগূঢ় বিজ্ঞান, উত্তম রহস্য।

নারীর বৃত্তিশিক্ষা (২)

নারীর উপায়ক্ষম হওয়ার প্রয়োজন যুগের তাগিদেই আসিয়াছে, ইহা আমরা দেখিয়াছি। ইহার জন্য যে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা, তাহা নারীর মূলধর্ম্মকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে, গত পূর্ব্ব সংখ্যায় আমরা এই কথাটি এই প্রসঙ্গে ব্যক্ত করিয়াছি। জাতির অন্তঃপুর-[illegible]ক্ষার ভার নারীশক্তির উপরেই স্বয়ং বিধাতা অর্পণ [illegible]রিয়াছেন। শিক্ষার দোষে তাহা কলুষিত না হয়, সেই [illegible]কে অতিশয় সতর্কতা বাঞ্ছনীয়। এখানে নারী ও পুরুষের অধিকার মূলতঃ সমান নহে এবং কোনও কারণেই এইরূপ দাবী নারী বা পুরুষ কাহারও পক্ষ হইতে আম[illegible] শ্রেয়স্কর মনে করি না। সামাজিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এইরূপ নির্ব্বিচার তুল্য অধিকারবাদের দাবী নর-নারী উভয়কেই লজ্জিত ও লাঞ্ছিত করে, সত্যকার স্বাস্থ্য ও কল্যাণ দেয় না। নারী ও পুরুষ সমাজের অবিভাজ্য অঙ্গ—যে অঙ্গের যে ধর্ম্ম, তাহা যদি পূর্ণাঙ্গ হয়, তবেই জাতি ধন্য হইবে।

তাই বলিয়া সমাজের রক্ষা ও কল্যাণের জন্য পুরুষ ও নারী কাহারও দায়িত্ব বিন্দুমাত্র কম নহে। উভয়কেই তুল্যভাবে দায়ী হইতে হইবে; কিন্তু সেই-দায়িত্ব বহনের ক্ষেত্র ও ভূমি পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন। উপযুক্ত

আধ্যাত্মিক ও মানসিক শিক্ষায় নর এবং নারী প্রত্যেকে যাহাতে স্ব স্ব বিশিষ্ট আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে, একদিকে তাহার জন্য যেমন সুচিন্তিত কল্পনা ও আয়োজন করিতে হইবে, তেমনি তাহাদের বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থার এই প্রকৃতিগত বৈষম্যের প্রতিও উদাসীন থাকিলে চলিবে না। বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাগ্রহণে নারী জাতি যে মেধা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছে, তাহা স্বীকার করিয়াও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ক্রমশঃ অভিজ্ঞতাবর্দ্ধনে ছাত্র ও ছাত্রীদের শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে যেরূপ একটা বৈশিষ্ট্যরক্ষণে উদ্যোগী হইতেছেন, বৃত্তিশিক্ষার ব্যাপারেও নারীদের উপযোগী স্বতন্ত্র ক্ষেত্র ও সুযোগসৃষ্টির জন্য আমাদের ততোধিক মনোযোগী হইতে হইবে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, পূরণাত্মক সম্বন্ধই সমাজে শুভকর ও প্রয়োজনীয়। বাহিরে সাম্য-সৃষ্টির উত্তেজনাময় কল্পনা যতই মনোমোহকর হউক না কেন, সে আদর্শ ভারতের নহে, এবং আমাদের বিশ্বাস, বহু বিষময় অভিজ্ঞতার পর একদিন প্রমাণিত হইয়া যাইবে যে, সে আদর্শ মানবজাতিরও কল্যাণকর নহে।

আমরা পরাধীন জাতি বলিয়া আমাদের এই ক্ষেত্রে সমস্যা আরও জটিলতর। সেইজন্যই অধিকতর সতর্কতা ও দায়িত্ব লইয়াই এ বিষয়ে আমাদের চিন্তায় ও কর্ম্মে অগ্রসর হইতে হইবে। এ জাতি আজ বাঁচিবার জন্যই নারীকেও উপায়ক্ষম করার চিন্তা ও চেষ্টা করিতেছে। আমরা বলিব—সমাজের রক্ষণ ও পোষণমূলক কর্ম্মে নারী যদি নিয়োজিত হয়, উহা সমাজকে পূরণ করিয়া নারীকে যুগপৎ আত্মরক্ষায়ও সমর্থ করিয়া তুলিবে। নারীর অন্তঃপুরেই এমন সব শ্রমের ক্ষেত্র আছে, যেখানে মর্য্যাদার সহিত শ্রম দিয়া নারী যুগের দায় অতিক্রমপূর্ব্বক নূতন সমাজগঠনেও অভিনব শক্তি সঞ্চার করিতে পারে।

পুরুষের ন্যায় নারীর বেকার - সমস্যাকেই আজ পুরোভাগে ধরিয়া চলিয়া আমরা ব্যর্থ হইব। উহা রোগের লক্ষণ ধরিয়া চিকিৎসা, রোগ-নিদানের প্রতিকার নহে। আজ এই ব্যবহারিক সমস্যার ঘোরপ্যাঁচে নিরুপায় পুরুষও যেমন হাঁকপাক করিয়া মরিতেছে, নারীও মরিবে শুধু মরিবে না, নারীর স্থান সমাজের মূল মর্ম্মে বলিয়া আরও বিষময় অবস্থা সৃষ্টি করিয়া জাতিকে অতল নিরয়ে ডুবাইবে। আমরা নারীজাতির কল্যাণশক্তিকেই সর্ব্বাগ্রে বিকশিত করিয়া তুলিতে চাই—সমাজ-সেবা, সমাজের পালন ও পোষণের মধ্য দিয়া নারীর বিশ্বপালিনী অন্নপূর্ণা ও জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তিই আজ আমরা প্রত্যক্ষকামী।

শিক্ষিতা নারী অন্তঃপুরের মধ্যে ও অন্তঃপুরের সংলগ্ন ক্ষেত্রে বহু শ্রম-শিল্পে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন। তাঁহারা পল্লীকুটীরেই হস্তে বা যন্ত্রশিল্পের সাহায্যে গার্হস্থ্য জীবনের অনেক প্রয়োজন পূরণ করিতে পারেন। আমরা তাই নারীজাতিকে সরাসরি অর্থোপার্জ্জনের প্রলোভন হইতে মুখ ফিরাইয়া বলিব—তাঁহারা ঢেঁকিকে সংস্কার করিয়া ধানভানার ব্যবস্থা করুন; যাঁতায় ডাল, কড়াই, আটা, গম পেষণ করিয়া ও করাইয়া তাঁহারা সংসারে বিশুদ্ধ খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদনে সহায় হউন। পরিবার-মণ্ডলীর প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি চরকা ও তাঁতের সাহায্যে নারীই বয়ন ও সংস্থান করুন। জামা, গেঞ্জি, আসন, গামছা, শতরঞ্চ—এই সকল গৃহশিল্পরূপেই নারীর হস্তে উৎপন্ন হইয়া প্রত্যেক গৃহস্থের ব্যবহার্য্য সঙ্কুলান করিতে সমর্থ। পল্লীগৃহ-সংলগ্ন অকর্ষিত অঙ্গনে বা ভূখণ্ডে নারী শাক-সজ্জী উৎপাদন করিতে পারেন। পল্লীর বড় সম্পদ্ গোধন—সেই গোপালন ও গোদুগ্ধজাত খাদ্যদ্রব্য নারীকেই প্রস্তুত করিতে হইবে।

আমরা বুঝিতেছি—যুগের শিক্ষা ও সভ্যতার নিরিখে আমাদের এই সকল প্রস্তাব আদরণীয় হইবে না। ইহার মধ্যে সৌখীন সভ্যতার পরিচয়, বিলাসলীলার উপকরণ নাই, উহা নিছক শ্রম-শিল্প। কিন্তু শ্রমবিমুখ জাতির প্রাণ যেখানে অভাবের পেষণে বিশীর্ণ, বিমূঢ়, সেখানে শ্রমের সাধনাই পুনরায় ফিরাইয়া আনিলে, তবে আমাদের জাতি-জীবনে স্বাস্থ্য ও সম্পদ্ দুইই সঞ্চারিত হইবে। বাংলার পল্লী আজ বীভৎস মরু-শ্মশান। সমাজে শ্রী নাই, স্বাস্থ্য নাই। পুরুষ হাল ছাড়িয়াছে, মরণের স্রোতে আকণ্ঠ ডুবিতেছে —সঙ্গে সঙ্গে নারীকেও একই দুর্গতির স্রোতে সে টানিয়া অতলে ডুবাইতে চাহে। ইহা জীবনের পথ নহে। আজ পুরুষ ও নারী উভয়কে স্ব-স্ব উপযোগী শ্রমের ক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিয়া শ্রমই দিতে হইবে। উদয়াস্ত শ্রমের তপস্যা

জাতিকে ঋদ্ধিমান্ করিবে। পুরুষের শ্রম ব্যবসায়-বাণিজ্যে, কলে-কারখানায়, জগতের হাটে নানা কার্য্যে। নারীর শ্রম গৃহাঙ্গনে, পল্লী-কুটীরে। জাপানের সাত কোটী অধিবাসী নারীশক্তির সহযোগে আজ দিগ্বিজয়ে বাহির হয়। শ্রমই তাহাদের মূলধন। পাঁচ কোটী বাঙালীও উপযুক্ত শ্রমবিভাগে জাতির নবজীবন আনয়ন করিতে পারে। এই দিকেই আমরা বাংলার সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে মাতৃ-জাতিরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি

যুগতীর্থ ভারতবর্ষ

শ্রীমতিলাল রায়

কত হাজার বৎসর আমাদের এই দেশ ও জাতির বুকের উপর দিয়া জলস্রোতের ন্যায় বহিয়া গিয়াছে, কাল-প্রবাহে ভাসিয়া আসিয়াছে যুগে যুগে কত মহাপুরুষের জীবন-শতদল; কিন্তু আমরা এমনই আত্মহারা আত্ম-বিস্মৃত, ঈশ্বরের এই অযাচিত দানকে জীবনের প্রয়োজনে প্রয়োগ করিতে পারি নাই, এই হাজার বৎসরের ইতিহাস তাই ব্যর্থতার ইতিহাস—একটা বিপুল জাতির মৃত্যু-দুর্ঘটনা!

এই শোকাবর্ত্তের মধ্যেই শাশ্বত অমৃতমূর্ত্তি আমাদের সম্মুখে পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হইয়াছেন—মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রে আমাদের নব জন্ম দিতে চাহিয়াছেন। রিক্ত, সর্ব্বহারা সন্ন্যাসীর কণ্ঠেই পুনঃ পুনঃ শিবের বিষাণ গর্জ্জন তুলিয়াছে—কিন্তু আমরা যে তিমিরে, সে তিমিরেই থাকিয়া যাই। ইহার অর্থ কি?

হিন্দু ভারতের কর্ম্মবাদই ইহার জন্য দায়ী। এই কর্ম্মবাদ আমরা নানা মতবাদে অস্বীকার করিয়া অন্ধতম পথে ধীরে ধীরে আত্মসম্বিৎ হারাইয়া ফেলিতেছি। আমরা যে নিজেদের হিন্দু বলি, তাহার হেতুবাদ পর্য্যন্ত বিস্মৃতির প্রলেপে মুছিয়া যাইতেছে। যুগে যুগে এই সকল [illegible]পুরুষদের আবির্ভাব যদি না হইত, হিন্দুর নাম পর্য্যন্ত [illegible]প পাইত। কিন্তু শুধু নাম-রক্ষার সহায়-রূপেই [illegible]পুরুষ ও মহাত্মাদের স্মৃতি-পূজা আর যথেষ্ট নহে [illegible]লিয়াই মনে হয়; যেমনটি হইলে আমরা হিন্দুত্বের অমৃ[illegible] [illegible]ভিষিক্ত হইতে পারি, হিন্দুগৌরব রক্ষা করিয়া আমাদের রক্তের ইতিহাস অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারি—সেইদিকে আমাদের অবহিত হইতে হইবে। মহাপুরুষের পূজার শুভদিনে যদি আমাদের অন্তর-চেতনা উদ্বুদ্ধ না হয়, তবে অনুষ্ঠানসমূহ হইবে কেবল একটা বিলাস, জীবন-সংগ্রামের মধ্যে আরামের অবসর মাত্র। মহাকালের এমন অপমান আমরা করিব না।

হিন্দু একটা বিশেষ জাতি, নিখিল মানবজাতি বলিয়া যে কল্পনা, তাহা ভবিষ্যতের স্বপ্ন হইতে পারে, কিন্তু বস্তুতন্ত্র সত্য নহে। ঈশ্বরের সৃষ্টি অমান্য করে হঠকারী, ভারতের হিন্দুসত্তা অসীমের মধ্যেই সীমার সত্য স্বীকার করিবে। আমরা হিন্দু—হিন্দু বলিয়াই পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারীর স্মৃতি-সভায় সমবেত হইয়াছি, এবং তাঁহাকে সম্মুখে রাখিয়াই আমরা যে কারণে হিন্দু, সেই কারণটীকে বুকে অগ্নিময় অক্ষরে লিখিয়া লইতে হইবে।

আমাদের শাস্ত্র বেদ। বেদ আমাদিগকে জ্ঞানের অমৃতে অভিষিক্ত করে, কর্ম্মের আশ্রয়ে জীবন-গতি অক্ষুণ্ণ রাখে। জ্ঞান ঈশ্বর-জ্ঞান। কর্ম্ম ঈশ্বর-কর্ম্ম। এই বিশ্বের উপাদান ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কিছু নহে। আমরা তাই উদাত্ত কণ্ঠে বলিব "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। আমাদের নব বিধান সনাতন বিধান, আমরা বহু মত-বাদে, বুদ্ধি, কর্ম্ম ও বাক্যভেদে আজ ছন্নছাড়া; আমরা পুনরায় স্বধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠিত হইব। অপৌরুষেয় বেদ আমাদের জীবনের ভিত্তি হইবে। লোকবাদে প্রলুব্ধ হইয়া আমরা তি[illegible] সংহতি-শক্তি হারাইয়াছি; আমাদের

পরিচ্ছন্ন মতবাদ পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিয়া আবার সংহতিবদ্ধ হইতে হইবে। সমাজে ও রাষ্ট্রে তবেই আমরা জয়শ্রী-মণ্ডিত হইব। আমাদের মনে রাখিতে হইবে—হিন্দুধর্ম্ম বেদ-প্রবর্ত্তিত। ভারতের মহাপুরুষ তিনি, যিনি বেদ-বিশ্বাসী। এই বেদ—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ, দুইভাগে বিভক্ত। মন্ত্র দেয় জ্ঞান, ব্রাহ্মণ কর্ম্ম-প্রেরণা জাগ্রত করে। জ্ঞান-শাস্ত্র উত্তরমীমাংসা। কর্ম্মের বিজ্ঞান পাই পূর্ব্বমীমাংসায়। কর্ম্ম ও জ্ঞানের তীর্থ ভারতবাসীর বুদ্ধি অবৈজ্ঞানিক অযৌক্তিক নহে। ভারতের ধর্ম্মশাস্ত্র মন্থন করিয়া কুরু-ক্ষেত্রে যে গীতার প্রচার হইয়াছে, সেই গীতামন্ত্রের দীক্ষা "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"। আমরা ধর্ম্ম-সমন্বয় বুঝি না। মত-পথের পার্থক্য স্বীকার করি না। আমরা বেদাশ্রয়ী, ঈশ্বর আমাদের লক্ষ্য। আমরা এই একের শরণে যে জীবন পাইব, সেই জীবন-মন্ত্রকে অক্ষর মাত্র মনে করিয়া উপেক্ষা করিব না। আমরা বেদাধ্যয়নে অসমর্থ হই, ক্ষতি নাই; মন্ত্র যদি স্মরণে রাখি, এই মন্ত্র-সূত্রেই বেদের আবিষ্কার হইবে। মন্ত্রময় বেদ, ইহাতো শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। আমরা ভাগবতজীবনের জন্য গুরুশক্তিকে স্বীকার করিব। মন্ত্র যেমন বেদ বা শ্রুতি, তেমনি গুরুই আমাদের ন্যায়ের বিগ্রহ। গুরুর অপর নাম ইষ্ট। তিনি আমাদের অনিষ্ট করিতে পারেন না। গুরু ব্যতীত এই সংসার-মরীচিকায় কে আমাদের ঋতময় পথ প্রদর্শন করিবে? কে আমাদের শ্রেয়ের পানে পরিচালিত করিবে? মন্ত্রকে যেমন আমরা অক্ষর বলিয়া-অবহেলা করিব না, তেমনই গুরুকে আমরা মানুষ বলিয়া আত্মঘাতী হইব না। ঠাকুর নরোত্তম সত্যই বলিয়া-ছিলেন "গুরুকে মানুষ জ্ঞান করে যেই জন, দারুণ নরকে তার হয় নিপতন।" তারপর প্রতিমার কথা। আমরা এই স্থাবরজঙ্গমময়ী পৃথিবীকে জড় প্রকৃতি বলিয়া তুচ্ছ করিব না। আমরা বনস্পতির কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা, পত্র-পুষ্প দেখিয়া বিমূঢ় হই না। আমরা দেখি তার স্বরূপশক্তি। আমরা বনস্পতিকে দেব-প্রতিমা বলিয়া পূজার্ঘ্য প্রদান করি। আমরা গঙ্গোত্রী-ধারাকে জলপ্রবাহ-রূপে দেখিয়াই ক্ষান্ত হই না; আমরা মকর-বাহিনী দেবীমূর্ত্তি সন্দর্শন করি। আমাদের [illegible] প্রত্যে যে অধ্যাত্ম মূর্ত্তির অধিষ্ঠান, আমরা তাহা দেখিয়াছি বলিয়াই আমাদের মন্দিরে মন্দিরে প্রতিমা। আমাদের শ্রী, সৌন্দর্য্য, শিল্প, কলা, আয়ুঃ, বিদ্যা, প্রতিভা—সবেরই অধ্যাত্মরূপ আছে। আমরা সবিতার পশ্চাতে সাবিত্রীকে দেখিয়াছি। আমরা বিদ্যার পশ্চাতে বীণাপাণি, রাষ্ট্রের পশ্চাতে দশভুজা, ধন-সম্পদের পশ্চাতে মহালক্ষ্মী, প্রেম ও ঐক্যবদ্ধ সমাজের পশ্চাতে বৃন্দাবনের রাধারাণীকে দেখিয়াছি বলিয়াই তো হিন্দু-সংস্কৃতি-রক্ষার জন্য তীর্থে তীর্থে মন্দির-নগরী গড়িয়া তুলিয়াছি। হিন্দুজাতি প্রতিমাকে দারু-মৃত্তিকা-পাষাণ বলিয়া যেদিন বিদ্রূপ করিতে শিখিয়াছে, সেইদিনই তো আমাদের অধঃপতনের সূচনা। আমাদের রাষ্ট্র গিয়াছে, সমাজ ভাঙ্গিয়াছে। হিমালয়-শিখরে আছেন আজিও বদরী-নারায়ণ। আছে আমাদের কাশী। আছে রামেশ্বর, চন্দ্রনাথ। সবও যদি যায়, আছে গঙ্গা, যমুনা, নর্ম্মদা। চিরকাল থাকিবে ঐ গৌরীশৃঙ্গ। ঐ ধবল-তুষারমণ্ডিত কৈলাস। ঐ সূর্য্যকরোজ্জ্বল হিমগিরির কাঞ্চন-শৃঙ্গ। আমরা হিমালয়-দুহিতা পার্ব্বতীকে ভুলিব না। আমাদের রক্তধারায় আজিও মূর্ত্তি লইয়া ভাসিতেছেন, আঙ্গিরস, পুলস্ত্য, ক্রতু, গৌতম, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ঋষি। তাই উদাত্ত কণ্ঠে বলি—শ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায়-প্রতিষ্ঠিত এই অমর জাতি বেদ, প্রতিমা ও গুরুকে আশ্রয় করিয়া আত্ম-সংস্কৃতির উপর দৃঢ় ভিত্তি রচনা করিবে। অসংখ্য পুরুষবাদ নাকচ করিয়া অপৌরুষেয় বেদ-বাদাশ্রয়ের জন্য, শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য কোটী কণ্ঠে উচ্চারণ করিবে "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

আমি স্ব-কপোল-কল্পিত মতবাদ প্রচার করিতেছি না! কোন পুরুষবাদ প্রচার করার দুষ্প্রবৃত্তি আমার জিহ্বায় নাই। আমি এই অপৌরুষেয় বেদ-বাদের আশ্রয় লওয়ার জন্য হিন্দুকে সাধনত্রয় আশ্রয় করিতে বলি। আমরা সম্বন্ধে রসায়নে অভিষিক্ত হইব। সত্য, সংযম, সম্বন্ধের সাধ[illegible] সিদ্ধিলাভ করিলে, আমরা শ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায় ভারত-সংস্কৃ[illegible] এই অমর প্রস্থানত্রয়ের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিব[illegible] [illegible]মরা বুঝিব মন্ত্র-মহিমা, গুরু-মাহাত্ম্য ও হিন্দুর মন্দির-প্রতিমার অসামান্য শক্তি। অনেকে হয়তো সাধনার কথা

শুনিয়া বিচলিত হইবেন। দুর্ভাগ্য-পীড়িত বাংলার ঘরে ঘরে শুধু পেটের খোরাক যোগাইবার জন্য যে অন্তহীন শ্রম-চিন্তার আবর্ত্ত দেখা যায়, এই সাধনা তদপেক্ষা অধিক কৃচ্ছ্রসাধ্য নহে। আমরা সকলেই গৃহহারা সন্ন্যাসী নহি। আমাদের গার্হস্থ্য-জীবনের অমৃতই মহা-পুরুষদের স্মরণোৎসবে আহরণ করিতে পারিলে আমরা কৃতার্থ হইব।

আমরা সত্যকে আশ্রয় করিব। এই বস্তুতন্ত্র সংসার-জীবনে সত্যের সাধন কেমন করিয়া করিব, তাহারও একটু নির্দ্দেশ দিলে এ ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমাদের মনু মহারাজ ক্ষেত্রবিশেষে সত্য বলিতে নিষেধ করিয়াছেন। আমি সত্যের সাধনার জন্য এই কথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি—বীজের পরিচর্য্যায় যেমন অঙ্কুরোৎপত্তি, অঙ্কুর হইতে ক্রমে ক্রমে বৃক্ষ যেমন পরিণত মূর্ত্তি ধরে, এই সত্যভ্রষ্ট জাতিকে আজ সত্যের বীর্য্য রক্ষাই করিতে হইবে। আমরা যেমন বিচার করিয়া খুঁজিয়া পাই—আমাদের প্রত্যেকের এমন একটী ক্ষেত্র আছে, এমন একটা মনের মানুষ আছে, যে ক্ষেত্রে সর্ব্বস্ব হারাইতে হইলেও আমরা মিথ্যা বলিব না। আমাদের মধ্যে এমন মানুষ যদি দশ জনও হইয়া থাকেন, বলিব—জাতির পুনরুত্থান আরম্ভ হইয়াছে। এইরূপে এক ক্ষেত্রে যে সত্যাশ্রয়ী, সে ধীরে ধীরে ঋতময় জীবন লাভ করিবে, এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সংযম বলিতে আমি বুঝি—যে ব্যক্তি যে রূপে প্রচারিত, সেই রূপের মর্য্যাদারক্ষাই সংযম। আমি অবিবাহিত কুমার, সমাজে এই প্রচারই করি—কৌমার্য্যরক্ষাই সংযম। কুমারী ব্রহ্মচারিণী। বিধবা স্বামীর অমর আত্মা আশ্রয় করিয়া তপস্বিনী। বিবাহিতা নারী সাধ্বী পতিপরায়ণা। বিবাহিত পুরুষ এক-পত্নীরত। আমরা যাহা, ঠিক তাহা হইয়াই সমাজে যদি অব্যভিচারী সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে পারি, বুঝিব—[illegible]তর সংযম-সাধনা সিদ্ধ হইয়াছে। সম্বন্ধই ঐহিক ও [illegible]ত্রিক জীবনের সর্ব্বোত্তম ভিত্তি। ভৃত্য প্রভুর [illegible]গ্রহ-প্রার্থী। সুহৃৎ অনুরাগ, পুত্র স্নেহ, পত্নী প্রেম [illegible]র্থনা করে। কেহ মানুষের সঙ্কীর্ণ স্বার্থ-কলুষিত অন্তরের অবদান চাহে না। আমরা যদি ঈশ্বর-সম্বন্ধে পরমামৃত হইতে বঞ্চিত হই, সমাজে দিব কি? সংসার-ধর্ম্মে কেহ কি চরিতার্থ হইবে নন্দলালার অপ্রাকৃত প্রেমের অনাস্বাদে? আমরা ভালবাসি, সে ভালবাসায় ঈশ্বর-প্রেমের স্পর্শ যদি না থাকে, তবে তাহার মূল্য কি? সতী—শিবসুন্দরকেই চায়। সত্যের বিগ্রহ-পুরুষ রক্ত-মাংসের নশ্বর যৌবন চাহে না, চাহে দিব্য প্রকৃতির অনিন্দ্য অমৃতাস্বাদ। আমাদের সমাজ সম্বন্ধের তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত। সেই সম্বন্ধের প্রবাহের মূল উৎস যদি শ্রীভগবানচন্দ্র না হন, তবে আমাদের গার্হস্থ্যাশ্রমের শ্রী ও সৌন্দর্য্য, আনন্দ ও ঐশ্বর্য্য কেমন করিয়া স্থায়ী হইবে? ভারতের আশ্রম-ধর্ম্ম এই অপূর্ব্ব ঈশ্বর-সম্বন্ধেরই জয়শ্রী। আমাদের প্রতিভায় ঈশ্বরের আবির্ভাব যদি না হয়, সে ব্রহ্মণ্য-জ্ঞানের মূল্য কতটুকু? হৃদয় যদি বৃন্দাবন না হয়, সে বুকের স্পর্শে মানুষ তো ধন্য হইবে না, জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইবে। প্রাণ যদি ভাগবত-শক্তিপূর্ণ না হয়, আমাদের অর্থ অনর্থই সৃষ্টি করিবে। এ দেহ যদি নারায়ণের পদরজে পবিত্র না হয়, আমাদের সেবা লইয়া মানুষ ধন্য হইবে কেন? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রেরই নামান্তর জ্ঞান, শক্তি, প্রেম, সেবা। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মা যুক্তি পাইলে, বুদ্ধি, মন, প্রাণ, দেহে চাতুর্ব্বর্ণ্য পূর্ণভাবে সর্ব্বত্র লীলায়িত না হউক, কোন এক ক্ষেত্রে ঈশ্বর-গুণই মূর্ত্তি লইবে। এই হেতু চাই ঈশ্বর-সম্বন্ধ। আমাদের জীবন হইবে যোগ-জীবন। ঈশ্বর-সম্বন্ধের অমৃতেই আমরা সনাতন সমাজ পুনঃ প্রবর্ত্তন করিতে পারি।

ভারতের ধর্ম্ম-বিগ্রহকে যদি যথার্থভাবে পূজা দিতে হয়, কেবল আচার ও অনুষ্ঠান তাহার জন্য যথেষ্ট নহে, আমাদের অন্তর-সাধনাকে তদনুযায়ী উপযোগী করিয়া লইতে হইবে। ঈশ্বরের সহিত যুক্ত-জীবনের তপস্যাই তিনি করিয়া গিয়াছেন জীবনে। সেই লক্ষ্যেই আমরা জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া মর্ত্ত্যে সেই রাজ্যই নামাইয়া আনিব, যে রাজ্য-প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন আমাদের অবতারী পুরুষ পাঞ্চজন্যে গাহিয়া গিয়াছেন কুরুক্ষেত্রে, আর যে জীবনলাভের সাধনায় এই পাঁচ হাজার বৎসর ত্যাগ-বৈরাগ্যের নিশান উড়াইয়া ভারতের অসংখ্য মহাপুরুষ শোভাযাত্রায় চলিয়াছেন। অন্তর্নিহিত নির্দ্দেশ অন্য কিছু

নয়—অর্জ্জুনের মতই সাধন-সিদ্ধ অন্তঃকরণে আমাদের বলিতে হইবে—

নষ্টোমোহঃ স্মৃতির্লব্ধা তৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥

—হিন্দু-ভারতের অভ্যুত্থানকল্পে আত্মনিবেদনের মন্ত্রই কণ্ঠে কণ্ঠে উচ্চারিত হউক। আমরা যেন ভারতের সংস্কৃতির উপর দাঁড়াইয়া জয় দিতে পারি হিন্দুভারতের। ইহা সঙ্কীর্ণতা নহে। ইহাই ভারত-ভারতীর আদি বীর্য্য। এই বীর্য্যেই জগৎকে দীক্ষা লইতে হইবে। ভারত যে বিশ্বের যুগ-তীর্থ! ওঁ হরিঃ ওঁ !!*

* রিষড়ার প্রেমমন্দিরে অনুষ্ঠিত ব্রহ্মচারী পূর্ণানন্দ-স্মৃতিবাসরের উদ্বোধন-বক্তৃতা।

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

শ্রীসন্তোষকুমার দে, এম.এ., এইচ্, ডিপ্, এড্, (ডবলিন)

ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর মা-বাবা গেলেন মারা। সংসারে আর আপনার বলে' কেউ থাকল না—না সাহায্য করবার, না পরামর্শ দেবার! সংসারের ভার বলে' অবশ্য কিছুই ছিল না; কিন্তু ছিল পড়বার অদম্য বাসনা। দূর-সম্পর্কীয় এক মামার আশ্রয় মিললো। মামাদের অবস্থা মন্দ নয়—ভালই বলা যেতে পারে। কত বি-এ, এম-এ পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে জেনারেল লাইনে না গিয়ে সার্ভে পড়ার পরামর্শ মামা দিলেন। যাক্ মন্দের ভাল, তবু পড়তে ত পাওয়া যাবে। কিছুদিনের জন্যে অন্ততঃ ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবে অস্থির হ'তে হবে না! যে কথা, সেই কাজ। যথাকালে পাসও করা গেল।

তারপর এল চাকরীর ভাবনা। অবশ্য বিবাহের জন্য ব্যতিব্যস্ত হতে হয়নি, যেহেতু সংসারে দরদী কেউ ছিল না। এই অবস্থায় কলির ভীষ্মদেব হবার সঙ্কল্প ও আত্ম-সান্ত্বনা সহজভাবেই খুঁজে পেয়েছিলাম।

অকালপক্ক যে ছিলাম না, তা' নয়। বিদ্যা ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত হ'লেও, পড়াশুনাটা চিরদিনই করতাম। অবশ্য সাধারণ নাটক-নভেলই বেশী পড়তাম; কিন্তু তার ফাঁকে ফাঁকে সিরিয়াস্ ষ্টাডিও যে না করতাম, তা' নয়। উদ্দেশ্য, বন্ধুমহলে পণ্ডিত বলে' খ্যাতি নেওয়া! কাজেই রোলাঁ, ইবসন, শ', ওয়েলস্-এর সঙ্গে পড়েছিলাম ফ্রয়েড্, য়ুং, এডলার, হ্যাবলক, ইলিস প্রভৃতি। নিজস্ব বলে' কিছুই ছিল না, মস্তিষ্কটায় ভরা ছিল মতবাদের একটা অদ্ভুত জগা-খিঁচুড়ি। হ্যাভলক ইলিসের কথা "Marriage hardly ever leads even to moderate satisfaction and happiness" মনের মধ্যে বড়ই গেঁথে গিয়েছিল; কাজেই ঠিক করেছিলাম, বিবাহ-বন্ধনের মধ্যে কিছুতেই যাওয়া হবে না। জীবনটা কাটিয়ে দেব চলার আনন্দে পথে আর পান্থশালায়।

হিন্দু বাঙ্গালীর চাকরী পাওয়া দুর্ঘট হলেও, ভাগ্য ছিল আমার সুপ্রসন্ন। এক টাকায় মাত্র ষোলখানা দরখাস্ত করে' এবং কতকটা মামা-বাবুর চেষ্টায় ৪৫৲ টাকা মাহিনার একটি চাকরী মিললো। তাও আবার আকৈশোরের স্বপ্নভরা দার্জ্জিলিং জেলায়! আনন্দে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নৃত্য জুড়ে' দিল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে কাজে যোগ দিলাম। যৌবনের উদ্দীপনায় এবং চাকরীর পরম উৎসাহে খাটুনিকে খাটুনি বলে মনে হ'ল না। পরম উৎসাহে কাজ করে' চললাম। শীতের দেশ। ঘুম থেকে উঠতে, দাড়ি কামাতে, আর খেতেই সকালটা যায় কেটে। দুপুর কাটে কাজের ভীড়ে, বিকেল কাটে বেড়িয়ে আর গল্প-গুজব করে'। তারপর রাত কাটে গল্প-উপন্যাস পড়ে, ব্রীজ খেলে আর ঘুমিয়ে মোটের উপর বেশ আনন্দেই দিনগুলো কাটতে লাগলো। দিন আসে, দিন যায়। বেপরোয়া, বেহুঁসিন জীবন। জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন! বন্ধু বান্ধব জুটলো অনেক—বাঙালী, পাহাড়ী। সমস্ত দিনরাত যেন

কাজ আর আমোদ আহ্লাদ দিয়ে ঠাস বোনা—তার মাঝে কোথাও বুঝি এতটুকু ফাঁক নেই! জীবন বয়ে যায় একটানা নদীর স্রোতের মত। মনে হ'ত এইত জীবন! এই ত জীবনের সার্থকতা!

এক এক করে' দু'টি বছর বেশ কাটলো। ক্রমে অনুভব জাগে, যেন জীবনের কোথায় একটা ফাঁক রয়ে গেছে, কোথায় যেন একটা অদৃশ্য ব্যথা, একটা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা লুকিয়ে অশ্রুমোচন করছে। কোথায় সে ব্যথা, কি সে আকাঙ্খা বুঝি না। মাঝে মাঝেই অকারণ বিমর্ষ হ'য়ে পড়ি। আজকাল পাহাড়ের নীচে নিরালা ঝরণার ধারে জলে ধোয়া ক্ষয়ে-যাওয়া পাথরটার উপর গিয়ে প্রায়ই বসি। মুগ্ধ হ'য়ে দেখি, উপ্‌চে-যাওয়া, ছিটকে-পড়া জল, চার পাশের শ্যামল বনানী, সঙ্কীর্ণ পার্ব্বত্য পথ, আর মেঘে ঠেকা উঁচুনীচু পাহাড়ের চূড়া। রাস্তার এই দিক্‌টা অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন। বস্তি ও চা-বাগানের পথ এই দিক্‌ দিয়েই গিয়েছে; কাজেই এই রাস্তা দিয়ে চলে রাস্তার লোকেরা, আর চা-বাগিচার কুলিরা। সহরের বাবুরা এদিক্‌টায় বড় আসে না। পথ দিয়ে যারা প্রত্যহ আনাগোনা করে, তারা সকলেই চেনা হ'য়ে গিয়েছে। পাহাড়ী কুলিমেয়েরা, মজুররা, কাজের পর দল বেঁধে গান গাইতে গাইতে মনের আনন্দে যায় এই পথ দিয়ে। তাদের গানের ভাষা বোঝা যায় না; কিন্তু ভাবটা যেন অনেকটা অনুমান করা যায়। অর্থহীন দৃষ্টিতে কতদিন চেয়ে দেখেছি তাদের পানে—ফলে কেউবা অপাঙ্গ দৃষ্টিতে দুষ্টু হাসি হেসে চ'লে গিয়েছে; কিন্তু মনের বিকার কেউ কোনদিন আনতে পারেনি।

এমনি একদিন অভ্যাসমত গিয়ে বসে' আছি সেই চিরপরিচিত ঝরণাটির ধারে। অনেকক্ষণ পরে দূর থেকে কাণে ভেসে আসতে লাগল সেই পরিচিত পাহাড়ী [illegible]রর গান, আর তারই ফাঁকে ফাঁকে হাস্য-কোলাহল। [illegible]ম সারাদিনের পরিশ্রমের পর কুলিরা চলেছে আপন [illegible]ন ঘরের পানে—গান গেয়ে; গল্প করে' পথ [illegible] পরিশ্রমটা হালকা করে' নিচ্ছে। খানিক পরে [illegible]পরের পথে দেখা দিল সেই পরিচিত দলটা, তার তারা ক্রমে পাশের রাস্তায় এসে পড়ল, তারপর নীচের পথটায়। সর্ব্বাগ্রে একটি অচেনা তরুণী, আজ সেই হয়েছে গানের সর্দ্দারণী। পরণে একটা লাল রঙের সাড়ী পেঁচিয়ে পরা; কিন্তু ময়লায় রংটা তার দাঁড়িয়েছে গাঢ় খদিরবর্ণ, গায়ের পশমী জামাটার হাত কব্জিতে নেমে এসেছে—দু'গাছা কাল গাটাপার্চ্চার চুড়ির কিনারা পর্য্যন্ত। চুলগুলো একটা বেণী করে', কাপড়ের ভেতর দিয়ে জামার ওপর দোলান। কাণে পুঁতির লাল ঝুম্‌কো দুলছে। একটা শক্ত বেতের ঝুড়ি কপাল থেকে ফিতে দিয়ে ঝুলিয়ে পিঠের উপর ফেলা। রংটা তার অন্য নেপালী মেয়ের চেয়ে ফর্সা, আর সব চেয়ে লক্ষ্য করবার বিষয় হ'ল তার চোখ দুটো! নাক তার বাঁশীর মত না হলেও পাহাড়ী মেয়েদের মতন খেঁদা একেবারেই নয়, আর চোখও বিরল পল্লবযুক্ত মোঙ্গলীয় ধাঁচের নয়। কাজেই বকের দলের মধ্যে হাঁসের মতন স্বভাবতঃই সে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে প্রথমে। অবাক্‌ হ'য়ে চেয়ে আছি তার নৃত্যশীল গতিভঙ্গীর দিকে, দলের মধ্যে তাকেই মনে হ'ল সব চেয়ে বেশী সুন্দরী। বিস্ময় আমার আরও বেড়ে গেল যখন লক্ষ্য করলাম, মেয়েটি হঠাৎ দল ছেড়ে একেবারে ঠিক আমারই সামনে এসে হাজির হ'ল। এসেই সোজা জিজ্ঞাসা করলে, "বাবু, আপনার কাছে দেশালাই আছে?" এই অপ্রত্যাশিত আগমন এবং ততোধিক অপ্রত্যাশিত এই নীরস প্রশ্নের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। দেশলায়ের কি দরকার হ'তে পারে? মনে হ'তেই নজর পড়ল তার হাতের দিকে—দুই আঙ্গুলের ফাঁকে ধরা একটা সিগারেটের ওপর। প্রথমটা কি জবাব দেব ঠিক করতে পারলাম না। অজ্ঞাতসারেই দুটো হাত কোটের পকেট খুঁজতে সুরু করে' দিলে। কিন্তু মেয়েটিকে অনিচ্ছায়ই নিরাশ করতে হ'ল। বললাম "দেশলাই ত নেই!" "ওঃ, আচ্ছা" বলে' যেমন লঘুগতিতে সে এসেছিল, তেমনি লঘুগতিতে গিয়ে যোগ দিল দলের সঙ্গে। দলের মধ্যে একটা চাপা হাসির গুঞ্জন উঠলো। মন অহেতুক একটা স্বপ্নজাল বুনে চললো; মেয়েটি যেতে যেতে নিশ্চয় ফিরে তাকাবে, হয়ত বা পায়ে কাঁটা ফুটবে, পাথরে চোট লাগবে, নয়ত এমন একটা কিছু বিপদ্‌ ঘটবে, যাতে তাকে [illegible] খানিক দাঁড়াতেই হবে এবং হয়ত বা

আমাকেই আবার 'শিভ্যালরি' দেখাতে যেতে হবে। ফলে আসবে কৃতজ্ঞতা, তারপর পরিচয়—পরিচয় থেকে পূর্ব্বরাগ, ক্রমে প্রেম, বিরহ! তারপর? আর ভাবতে পারলাম না। কিন্তু কিছুই ঘটল না। তারা চ'লল পথ ধ'রে। ও দিক্ থেকে আসছিল একটি পাহাড়ী যুবক। রাস্তাটা বাঁক ঘুরে' ঝরণার ২৫ ফুট নীচু ঢালুতে যেখানটা গড়িয়ে পড়েছে ঠিক সেইখানটাই দেখলাম, ছেলেটির মুখের জ্বলন্ত সিগারেট থেকে মেয়েটি তার দুটী ওষ্ঠাবৃত সিগারেট্‌টা ধরিয়ে নিচ্ছে।

ব্যবধান মাত্র সিগারেটের দূরত্ব। তারপর নির্ব্বিকার-চিত্তে যে যার বিপরীত পথ ধরলো। কিন্তু নিরর্থক মনটা আমার অভিমানে ফুলে' ফুলে' উঠতে লাগলো। কতক্ষণ যে বসেছিলাম, ঠিক নেই। দ্বন্দ্বজড়িত মনে বাসায় ফিরে অনাহারেই শয্যাগ্রহণ যখন করলাম, তখন ঘড়িতে ঢং-ঢং শব্দে ১০টা বাজলো।

ঘটনা অতি তুচ্ছ। একটী বাঙ্গালী পাহাড়ী মেয়ে। অপরিচিত নাম-ধাম, জাতি-কুল। ক্ষণিকের দৃষ্টিবিনিময়, মুহূর্ত্তের আলাপ; কিন্তু জের তার সহজে মিটল না। ঘুরে ফিরে সেই চঞ্চল হরিণীর কথাই মনে পড়ে—দেখতে ইচ্ছে হয়। আলাপের বাসনা জাগে। যেন কত-দিনের গভীর পরিচয়। কেন—তা' বুঝি না। বুঝাবার চেষ্টা করে'ও পারি না। এ দুর্দ্দমনীয় মানসিক কৌতূহলকে জোর করে' দমন করবার সঙ্কল্প করলাম। নিজেকে নানা কাজের মধ্যে ডুবিয়ে দিলাম, আর ঐ ঝরণার ধারে যাওয়াটাই একেবারে ছেড়ে দিলাম।

মাস তিনেক পরে। মনের উত্তাপ অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। দার্জ্জিলিঙের আট মাইল দূরে একটা বস্তিতে সরকারী জরীপ শেষ করে' ফিরছি। মনোরম পরিবেশ। অশ্বারোহণে মানসিক একাগ্রতা ছিন্ন হয়। মাঝপথে জিনিষপত্রসহ সহিসকে বিদায় দিয়ে পদব্রজেই চলেছি। দু'পাশে যেদিকে চোখ ফেরানো যায় প্রকৃতির অফুরন্ত সমারোহ। আমি যেন আমিহারা হয়ে গিয়েছি। থরে থরে সাজানো পাহাড়ের চূড়ায়-চূড়ায়, মেঘে-মেঘে, ফিকে কুয়াশায় ভেসে ভেসে হাল্‌কা মন চলেছে। কি নিবিড় অনুভব! চিত্তে কোথাও এতটুকু চাঞ্চল্য নেই। ধ্যান-[illegible] এক বুড়ীর প্রশ্নে: "বাবু, পত্রখানা পড়ে' দিন!" বয়সের ভারে বুড়ীর কোমর হতে মাথা পর্য্যন্ত ঝুঁকে পড়েছে।

চিঠিখানা হাতে নিলাম। ইংরাজীতে লেখা চিঠি। বললাম, "কলকাতা থেকে মহিমবাবু লিখেছেন যে, তাঁর বাড়ীটা পরিষ্কার করে' রাখতে। চিঠির উত্তর পেলেই তাঁরা বেড়াতে আসবেন।"

—"বাবু মেহেরবানি করে' জবাবটা লিখে দিন। আজকালের মধ্যেই আমি সব ঠিক্ করে ফেলবো। ঐ আমাদের আস্তানা। কাগজ-কালি-কলম সবই আছে।"

বুড়ীর মিনতি ক্লান্ত হ'লেও এড়াতে পারলাম না।

জীর্ণ কাঠের বাড়ী। গোটা দুই কুঠরী। ঢাকা বারান্দার সামনে খানিকটা খোলা জায়গা। গোধূলির ম্লান আলো তখনও অস্পষ্ট হয়নি। বললাম, "কি লিখতে হবে বল?"

—"চা খাবেন বাবু"—বুড়ী অনুরোধ করলে।

—"না, তোমার কাজটা সেরেই উঠব, আমার খুব তাড়া।"

চিঠি লেখা ও খামের ওপর ঠিকানা লেখা শেষ করে' মুখ তুলতেই দেখি সামনে একটি মেয়ে কাঁচের গ্লাস ভর্ত্তি চা-হাতে দাঁড়িয়ে। যৌবনের জোয়ার অযত্নপালিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উপচিয়ে পড়েছে। বিমূঢ় আনন্দবিহ্বলতায় অন্তর আলোড়িত হয়ে উঠলো। ঘন ঘন কম্পিত হৃদ্‌পিণ্ডের শব্দ কাণে বাজতে লাগলো। একেবারে অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎকার। সেই মেয়েটি—ঝরণার ধারে যার প্রথম দেখা পাই—আজও মন যাকে সময়ে অসময়ে অন্বেষণ করে' বেড়ায়। প্রত্যাখ্যান করতে পারলাম না। চায়ের গ্লাসটি নিয়েই বললাম, "এটা বুঝি তোমাদের বাড়ী!"

ঠোঁটে সহজ হাসির রেখা টেনে মেয়েটি ঘাড় নেড়ে নির্ব্বাক্ সম্মতি জানালে।

নিঃশেষিত গ্লাসটা নিয়ে অচঞ্চল মেয়েটি যেমনি এসেছিল, তেমনি চলে' গেল। কোন কাজ নেই, তবু মনে হল কি যেন অসমাপ্ত রয়ে গেল। পা চলতে না। শরীরও যেন ওঠে না। এ অশোভন অব[illegible] অস্বস্তি থেকে বুড়ীই মুক্তি দিলে। নিজে হতেই আদ্যোপান্ত তার জীবনের যে ইতিহাস সুরু করলে, মোটামুটি এই:

"লোকে ভাবে তারা নেপালী, কিন্তু আসলে খাঁটি সিকিমি। কুড়ী বছর আগে স্বামী-স্ত্রীতে এখানে আসে। সঙ্গে একমাত্র কন্যা রুকুয়া। চা-বাগানে চাকুরী মিললো তরুণী রুকুয়া বাঙ্গালী ম্যানেজারের সুনজরে পড়লো। রুকুয়ার গা-ভর্ত্তি অলঙ্কার। বাঙালীবাবুর স্নেহদৃষ্টিতে অল্পদিনের মধ্যেই স্বামী হল সর্দ্দার। কাঁচা পয়সায় তার মদের মাত্রা গেল বেড়ে। বাবুর অহেতুক অনুগ্রহে রুকুয়া বিবেক-বিচার হারালো। ফলে হল ঐ (ঘরের মধ্যকার মেয়েটির দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করে') হতভাগী শৈলীর আবির্ভাব।"

বুড়ীর বুকফাটা আর্ত্তনাদ তার বিকৃত স্বরে অনুভব করলাম। খুব খানিকটা কেশে বুড়ী পুনরায় বললো:

"কিন্তু ক' দিন? শৈলীর জন্মের পর থেকেই রুকুয়ার আদর গেল কমে'। তা' তার মলিন পোষাক-পরিচ্ছদেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। রুকুয়া মুখ ফুটে সে অভিযোগ কোনদিন করেনি। একদিন বাঙালীবাবু রুকুয়ার হাতে দু'খানা দশ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে সেই যে মাসখানেকের জন্যে কলকাতায় গেল, আর ফিরলো না। ব্যর্থ আশা-নিরাশার মধ্যে দীর্ঘ দু' দুটি বছর শয্যালীন রুকুয়া কোন রকমে কণ্ঠাগতপ্রাণ হয়ে ছিল। তারপর একদিন 'বাবু' 'বাবু' করতে করতেই রুকুয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে।"

বুড়ী যেন হাঁপিয়ে উঠেছিল। একটু দম নিয়ে তারপর আরম্ভ করলে:

"তারপর দীর্ঘ পনরটি বছর শৈলীকে কোলে পিঠে করে' মানুষ করেছি। বুড়ো নেশা-ভাং করে' যা পায় উড়িয়ে দেয়। কি কষ্ট করে'ই যে সংসার চালাই, তবুও শৈলীকে আর চা-বাগানের পাতি-তোলার কাজে যেতে দিই না। ভয় হয় আবার কোন ভদ্র বাবু তার সর্ব্বনাশ করে' বসে": মনে হ'ল শৈলী ঘরের মধ্যে একটু নড়ে-চড়ে উঠলো: "হ্যাঁ বাবু, আপনাদের বাঙালী জাত কি এমনি বিশ্বাসঘাতক?"

এ অভিযোগের কি উত্তর দিব? নিজেকেই অপরাধী মনে হতে লাগলো। ফিরবার জন্য উঠে দাঁড়াইতেই দেখি—বুড়োটা নেশায় চুর হয়ে আঙিনায় এসে দাঁড়ালো। 'সেলাম সাহেব' জড়িত কণ্ঠে উচ্চারণ করে' সে টলতে টলতে ঘরে ঢুকলো।

উঠলাম। বুড়ী যেন কৃতজ্ঞতায় ভেঙ্গে পড়লো। আমার অন্বেষণরত দৃষ্টি বৃথাই ফিরলো। আর কেহই চোখে পড়লো না। বুড়ো-বুড়ী-রুকুয়া-শৈলী! একটা অজ্ঞাত পাহাড়ী পরিবারের এই মর্ম্মন্তুদ করুণ কাহিনী মনের খাতায় যে লেখা লিখে গেল, তা' আর কিছুতেই মুছলো না। সেই পরিচিত প্রিয় ঝরণার ধারে আর যাই না, যেতে ইচ্ছা হয় না। ও-পথ মাড়াতেও যেন কেমন বাধো-বাধো ঠেকে। অকারণ একটা লজ্জাকর আড়ষ্টতা মনটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। কিন্তু অপ্রত্যাশিত একটা ঘটনায় অঘটন ঘটিয়ে তুললো।

ভাদ্রের অপরাহ্ণ। ছুটির দিন, রবিবার। বেড়াতে বেরিয়েছি। শরতের চলন্ত মেঘ মাথার উপরে থমকে দাঁড়িয়ে যেন ভেঙ্গে পড়লো। বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা পড়তেই জাপানী ঝোপালো পাইন গাছটার নীচে আশ্রয় নিলাম।

"বাবুজি, এখানে দাঁড়িয়ে ভিজ্‌ছেন?" বুড়োর সহৃদয় কণ্ঠস্বর: "চলুন গরীবের ঐ ডেরায়। এই পাহাড়ের পথ বেয়ে সোজা পাঁচ মিনিটের পথ।"

ছাগলের বাচ্চাটা কোলে করে' বুড়ো খাড়া টীলার ওপর উঠতে লাগলো, আমি বিনা প্রতিবাদে তার অনুসরণ করলাম। অজস্র বারিবর্ষণে ভিজে গেলাম। ঘরে ঢুকতেই বুড়ো দড়ির খাটিয়াটা এগিয়ে দিল বসতে। দরিদ্র পরিবারের অতি তুচ্ছ আস্‌বাব। কুলুঙ্গীতে সিঁদুর মাখানো কি এক দেবতার মূর্ত্তির দু'ধারে দুটো মোমবাতি জ্বলছে। সামনে রঙ্গীন কাগজের একটা নিশান ঝুলানো। অস্পষ্ট দীপালোকে শৈলীর দৃষ্টির বিনিময় হ'তেই সে মাথা নীচু করলে। আমার আগমনে তার হাবভাবে কোন অভিনন্দন প্রকাশ পেল না। অনর্থক যেন ক্ষুন্নতায় অন্তরটা ভরে উঠলো। ভাবলাম, হয়তো না এলেই ভাল হ'ত।

বুড়ী ঘরের একটি কোণে বসে কাঠ-কয়লার আগুন তাপাচ্ছিল। দেখলাম, শৈলী আগুনের মালসাটা আমা

পায়ের কাছে রেখে নির্ব্বাকে ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের কুঠুরিতে চলে' গেল। বুড়ী অবিরাম তার সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা বকে যেতে লাগলো। কিন্তু সে কথায় আমার কাণ ছিল না। এই দুর্ব্বোধ্য মেয়েটির কোমল-কঠিন আচরণ আমার অন্তর বাহির আলোড়িত করে' উঠলো।

এমনি কতক্ষণ কেটেছে ঠিক নেই। শৈলী এক সময়ে বুড়ীকে লক্ষ্য করে ডেকে বললে, "মা, বৃষ্টি ত অনেকক্ষণ থেমে গেছে।"

ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। বিনা ভূমিকায়ই উঠে দাঁড়ালাম। নিজেকে এই প্রথম অতি সামান্য মনে হ'ল। এত অপমানিত নিজেকে এর পূর্ব্বে আর কোনদিন বোধ করিনি। কাঠের ফ্রেমে আঁটা টিনের দরজা ঠেলে বাইরে আসতেই দেখি, শৈলী ছাতা হাতে দাঁড়িয়ে। বললে, "বাবু, ছাতাটা নিয়ে যান।"

বললাম, "বৃষ্টি তো থেমে গেছে, ছাতা আবার কি হবে?"

—"থেমে তো গেছে, কিন্তু গাছের জল-পড়া এখনও বন্ধ হয়নি। তাছাড়া আবার যদি বৃষ্টি পড়ে তো গাছতলায় দাঁড়িয়ে ভিজতে হবে তো?" শৈলীর কণ্ঠস্বরে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ।

অভিমানের সুরেই বললাম, "ছাতা নিয়ে তো আবার ফেরত দিতে আসতে হবে?"

—"কি দরকার, বুড়ো গিয়ে নিয়ে আসবে। ভদ্রলোকের বেশী যাতায়াত ভাল নয়। পাড়ার লোকে মন্দ ভাববে।"

আমার উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই শৈলী ফিরলো। এই নিরপেক্ষ পাহাড়ী মেয়েটার সতর্ক-বাণীতে যেন আত্মসম্বিত ফিরে পেলাম। সারাপথ কেবলই মনে হতে লাগলো, সত্যই ত কেন আমার এত মোহ? এই অহেতুক দরদ! আমারও আত্মীয়-স্বজন-সমাজ আছে। তবে!

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। পারতপক্ষে ওদের গৃহমুখী আর হইনি। ওদের সঙ্গে মাঝে মাঝে হাটে, পথে, ঘাটে দেখা হয়। বুড়ো-বুড়ী সেলাম জানায়, কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু শৈলীর কথা ভ্রমেও কোনদিন তারা আমায় মুখ ফুটে বলেনি আর আমিও জিজ্ঞাসা করতে ভরসা পাইনি। শৈলীকে কতদিন লক্ষ্য করেছি, হাট থেকে ফিরছে, নয়তো দোকান থেকে সওদা নিয়ে চলেছে কিম্বা থাবা-পিঠে জল-খাটতে যাচ্ছে; কিন্তু কোনদিন তার মুখেচোখে ভাবান্তর দেখিনি—আমায় চেনে এমন ভাববার অবসরও সে কখনও দেয়নি। আশ্চর্য্য মেয়ে শৈলী!

ভাবি, হয়তো পাহাড়ী মেয়ের এমনি পাষাণ হিয়াই হয়। তবুও তো বাঙ্গালীর রক্তধারা ওর শিরায় বইছে! নাঃ, এই দুর্ব্বলতার পথেই মানুষ পঙ্কে নামে। ভেতরটা আমার সজাগ হয়ে ওঠে।

আরও বছরখানেক পরে। শৈলী এখন অন্তরের অবচেতনার মাঝে প্রায় তলিয়ে গেছে। কখন-সখন স্মৃতি জাগে; কিন্তু তেমন উগ্র উত্তপ্ত নয়। খাই-দাই, ঘুরে' বেড়াই। নিঃসঙ্গ একাকী জীবন গা-সওয়া হয়ে এসেছে। সেদিন জীবনের একটা স্মরণীয় রবিবার। সকালে বেড়িয়ে ফিরছি। উত্তুঙ্গগিরিবেষ্টিত অতল গহ্বরে কালো মেঘ জমাট বেঁধে যমপুরীর বিভীষিকা সৃষ্টি করছে। 'ভিক্টোরিয়া ফলে'র একটু ওধারে খাড়াই ভেঙ্গে রাস্তায় পড়লাম। ইচ্ছা রামকৃষ্ণ আশ্রম হয়ে, নেপালী মন্দিরের আরতি দেখে ষ্টেশনে পৌছাব। বাঁক ঘুরতেই সবিস্ময়ে চোখে পড়লো, সেই ঝরণা আর তারই পাশে প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ শৈলী দাঁড়িয়ে। পিঠে তার একরাশ মোটঘাট। অদূরে চলেছে বুড়া আর বুড়ী। থমকিয়ে দাঁড়ালাম। দৃষ্টিবিনিময় হ'তেই শৈলী যেন স্বপ্ন-ভাঙ্গা ঘুম থেকে জেগে উঠলো। নিঃসঙ্কোচ চরণপাতে সে আমারই দিকে এগিয়ে এল। বললে, "বাবু, দেশ যাচ্ছি।"

—"দেশ; কোথায়, সিকিম?"

—"হ্যাঁ, বাবু।"

—"কবে ফিরবে?"

—"আর ফিরবো না। চিরকালের জন্য বিদায় নিয়ে চললাম।"

"কেন বিদায় নিচ্ছ?"

—"না নিয়ে যে উপায় নেই। বুড়ার নকরী গেছে। বুড়ীর কাজ করার সামর্থ্য নেই। আর আমাকেও চা-বাগানে চাক্‌রী করতে দেবে না, অনাহারে কতদিন চলে! দেনার দায়ে বুড়া আস্তানাটুকুও বেচে দিলে!" অশ্রু-করুণ কণ্ঠে শৈলী এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে' গেল।

সহানুভূতির সুরে বললাম, "কই দেনার কথা একদিনও তো আমায় বলনি।"

"কোন্ অধিকারে বলবো, বাবু?" উদ্গত অশ্রু শৈলী হাতের তালু দিয়ে মুছলে।

উত্তর দেবার কিছু নেই। প্রশ্ন করলাম, "সিকিমেই কি তোমাদের ঘরবাড়ী আছে আর, সেখানেই যে কাজ মিলবে তারই বা নিশ্চয়তা কি?"

ব্যথিত কণ্ঠেই শৈলী প্রত্যুত্তর করলে, "কাজ না মেলে জুম (চাষ) করে' একভাবে পেট চলবেই।"

—"এ জায়গা ছেড়ে যেতে একটুও মায়া হচ্ছে না, শৈলী?"

—"গরীবের আবার মায়া!" ব'লেই শৈলী কথাটা ফিরিয়ে নিল। "তা' আর হবে না বাবু, এ আমার জন্মভূমি, এখানকার আকাশ-বাতাস, প্রতিটি বৃক্ষ-লতা আমার পরিচিত।" শৈলীর দু'চোখ ছাপিয়ে অশ্রুর বান ডাকলে।

একটা আত্মবিহ্বলতার মধ্যেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়লো, "আমি যদি নিয়ে যাই শৈলী, যাবে আমার সঙ্গে কলকাতায়?"

শৈলী একটু কি যেন ভাবলে। বললে, "তা' কি করে হয় বাবু, আমি কে যে আপনি আমায় নিয়ে যাবেন! আর আমিই বা কেন যাব বুড়োবুড়ীকে ফেলে'।"

সত্যিই তো কে—কেন? গোত্রহীন, পরিচয়হীন বিজাতীয় পাহাড়ী মেয়ে শৈলী। আমার সমাজ-শাসন বিধি-নিষেধের দুর্লঙ্ঘ্য আবেষ্টনীর মধ্যে সে সঙ্গত শোভন হবে না। মনের স্বপ্ন বাস্তবতার পীড়নে হয়তো একদিন যাবে যাবে, হয়তো শৈলীর মায়ের জীবনের শোচনীয় বিয়োগান্ত পরিণাম শৈলীর ভাগ্যেও জুটবে। চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতে অন্তর কেঁপে উঠলো। এমনিভাবে কতক্ষণ কেটেছে জানি না, অশিক্ষিতা সহজ-সরলা শৈলী

আমায় মুক্তি দিল। বললে, "বড় সমস্যায় পড়েছেন—নয়? আমরা গরীব হলে'ও, লোভী নই। বনের ফুল বনেই শোভা পায়, সখের ফুলদানিতে তা' ম্লানই দেখায়। আমার মায়ের জীবনের এ শিক্ষাটি আমি ভুলিনি।"

নিজেকে বড় সামান্য মনে হ'ল। বললাম, "শৈলি, তুমি কি আমাকে বিশ্বাস কর না? তুমি কি ভাব আমাকে শঠ, প্রবঞ্চক?"

মুহ্যমানা শৈলী মিনতির সুরে বললে, "আজ বিদায়ের দিন, ও কথা কেন ওঠাচ্ছেন?"

ব্যথিত কণ্ঠে বললাম, "শৈলি, কোনদিন তোমায় এমন একান্তে পাইনি। মনের অসীম বেদনাভরা সংগোপিত কাহিনী ব্যক্ত করার অবসর জোটেনি। তা'হলে জানতে—বুঝতে পারতে তোমাকে কেন্দ্র করে' আমার যে অন্তরের স্বপ্ন তা' কত সত্য। সত্যিই আমি তোমায় ভালবাসি। ভালবাসি তোমার ঐ নৃত্য-চঞ্চল প্রাণের ছন্দঃ ও বিকাশকে। কিন্তু তা' তোমার এই সহজ নৈসর্গিক পরিবেশ হিমগিরির বন্ধুর মাতৃক্রোড়েই শোভা পায়। তোমার অনাঘ্রাত কুসুমপেলব তন্বী তনু, নিষ্পাপ জীবন এই বিরাট্ গিরিরাজেরই অর্ঘ্য হতে পারে। সত্যই অসুরের ভোগ্য তুমি নও। আমাদের সভ্য সঙ্কুচিত সর্পিল জটিল আবেষ্টনীর মাঝে আমি তোমার দেহটাকে পেতে পারি, পাব না তোমার সহজ-সুন্দর স্বতঃস্ফূর্ত্ত জীবনধারাকে। আমি তাই তোমাকে ঠকিয়ে নিজে বঞ্চিত হতে চাইনি। সব বাঙালীই বিশ্বাসঘাতক নয়, শৈলী।"

—"তা' জানি। আমার আত্মা তা' অনুভব করেছে। বাঙালীর রক্তধারা আমার ধমনীতে প্রবাহিত। তবে ভব্য ও ভদ্রবেশের আবরণকে আমার বড় ভয় করে": শৈলী আরও সরে' এসে আমার প্রায় গা-ঘেঁষে দাঁড়াল। কম্পিত কণ্ঠে বলে চলল: "হ্যাঁ, আপনি দুঃখু করবেন না বাবু। বুড়ীকে আপনার হয়ে আমিই বলবো যে, সব বাঙালীই বিশ্বাসঘাতক নয়। দেবতাও তাদের মধ্যে আছে এবং এমনি এক দেবতার সংস্পর্শ ক্ষণিক হলেও আমার সৌভাগ্যে হয়েছে। এ সান্ত্বনা আমার ভাবী জীবনের……"

শৈলী আর কথা বলতে পারলে না। অশ্রুরুদ্ধ তার কণ্ঠ। ডাগর ডাগর চোখ দুটো তুলে' সে আমার দিকে চাইলে।

উচ্ছ্বসিত আবেগে শৈলীর হাত দু'খানি ধরে' বললাম, "তোমার সঙ্গে আমার এ অসাধারণ পরিচয় জীবনের পথে চিরদিন পাথেয় হয়ে থাকবে শৈলী। আজকের এই মিলন-বিচ্ছেদের পরম মুহূর্ত্তটি আমাদের চিরস্মরণীয়।"

নির্ব্বাক্ ভূনত হয়ে বাঙালীর মেয়ের মতই শৈলী আমার পদস্পর্শ করলে। এই তার প্রথম এবং শেষ প্রণাম। আমি তার মস্তিষ্ক স্পর্শ করে' আশীর্ব্বাদ করলাম। শৈলীর দু'চোখ বেয়ে অশ্রুর ঝর্ণা নেমেছে। গায়ের অর্দ্ধমলিন উড়ুনীর প্রান্ত দিয়ে অশ্রু মুছে এবং আর একটি কথাও না বলে' সে পথ ধরলো।

উদাস অনিমিখ আঁখি মেলে হতভম্বের মত চেয়ে রইলাম ঐ আঁকাবাঁকা পথে চলমানা স্বপ্নমূর্ত্তির দিকে। শৈলীর ক্রমবিলীয়মান দেহ ক্রমে বিন্দুতে পরিণত হল, অবশেষে বিন্দুও লীন হয়ে গেল কুহেলীর দিগন্তে। চেতনার আকাশে অবশিষ্ট রইলো একটা অস্তিত্ববোধমাত্র।

গান ও স্বরলিপি

মালকৌশ—একতালা

ওহে সুন্দর, তুমি আসিবে কি মম অন্তর-পুর-ভবনে ?
তারি ইঙ্গিত যেন সঙ্গীত সম ঝঙ্কারে মৃদু পবনে।
রচি' বন্দনা গীতি-মালা,
প্রেম-চন্দনে ভরি' থালা ;
মনোমন্দিরে আমি সঞ্চিত করি' সাজায়ে রেখেছি গোপনে।
তব চঞ্চল পদধূলি,
ল'ব অঞ্চল দিয়া তুলি' ;
মম শঙ্কিত হিয়া রঞ্জিত হবে ও চরণ-ধূলি-লেপনে।

কথা, সুর ও স্বরলিপি—সঙ্গীত-সুধাকর শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র রায়

স্থায়ী

০ ১ ২´
।। {-মজ্ঞা -মজ্ঞা | মদা -ণর্সা ণা | র্সা র্সজ্ঞা র্সা I ণর্সা ণর্সা ণদা |
০ও ০হে সু০ ০০ ন্দ র তু মি আ০ সি০ বে০

৩ ০ ১ ২´
দমা মা মা | জ্ঞমা -জ্ঞমা জ্ঞা | সা ণদা ণা I সা মা জ্ঞমা | -া}
কি০ ম ম অ০ ০০ ন্ত র পু০ র ভ ব নে০ ০

```
                 0                    ১                    ২´
মা     মা  |  সা    -মা    মা  |  মা    মদা    জ্ঞা  I  মা    -ণদা    ণা  |
তা     রি   |  ই      ০      ঙ্গি  |  ত     যে      ন        স     ০ ০     ঙ্গী  |

৩                    0                      ১                  ২´
দণর্সা   র্সা   র্সা  |  র্সা   -জ্ঞজ্ঞা   র্সা  |  ণা   দা   মা  I  মণা   দণা   দা  |  -মা
ত ০ ০    স     ম   |  ঝ     ০ ০      ঙ্কা  |  রে   মৃ    দু      প ০   ব ০   নে  |  ০
```

অন্তরা

```
                    0                    ১                        ২´
-মজ্ঞা   -মজ্ঞা  |  মা   -জ্ঞা   মা  |  -ণদা   -ণদা   ণা  I  দণা  -দণঃর্সঃ  র্সা  |
০ র     ০ চি    |  ব     ০      ন্দ  |  ০ না    ০ গী   তি       মা০    ০ ০ ০     লা  |
০ ত     ০ ব     |  চ     ০      ঞ্চ  |  ০ ল    ০ প    দ        ধূ০    ০ ০ ০     লি  |

৩                  0                     ১                  ২´
-া    র্সা    ণা  |  র্সা   -জ্ঞা   র্সা  |  ণা   দা   দা  I  মদা   -দণা   দণা  |
০     প্রে     ম  |  চ      ০      ন্দ  |  নে   ভ    রি      থা ০   ০ ০    লা ০  |
০     ল      ব  |  অ      ০      ঞ্চ  |  ল    দি   য়া      তু ০   ০ ০    লি ০  |

৩                  0                    ১                        ২´
-া    সা    ণা  |  র্সা   -র্মা   র্মা  |  জ্ঞর্মা   জ্ঞা   র্সা  I  মজ্ঞা   -মা   -ণদা  |
০     ম     ন  |  ম      ০     ন্দি  |  রে ০    আ    মি       স      ০    ০ ঞ্চি  |
০     ম     ম  |  শ      ০     ঙ্কি  |  ত ০    হি    য়া       র      ০    ০ ঞ্জি  |

৩                   0                      ১                  ২´
ণা    র্সা    র্সা  |  র্সা   জ্ঞজ্ঞা   র্সা  |  ণা   দা   মা  I  মণা   দণা   দা  |  -মা
ত     ক     রি  |  সা     জা ০     য়ে  |  রে   খে   ছি      গো০   প ০   নে  |  ০
ত     হ     বে  |  ও      চ ০      র  |  ণ    ধূ    লি      লে ০   প ০   নে  |  ০
```

রবীন্দ্র-স্মরণে

শ্রীমনুজচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী

যা তোমার মাঝারে হারায়ে গিয়াছে
সাধনার সন্ধান—
শুনি কাণ পেতে ভুবনে ভুবনে
তোমারি আরতি-গান।

মহাভারতের মহাভারতীকে
আসন দিয়েছ তুমি দিকে দিকে;
হে রবি, তোমার পরশে হয়েছে
উজ্জ্বল সব প্রাণ।

রাজেন্দ্র-প্রয়াণে

শ্রীমতিলাল রায়

মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয়চাঁদ মহতাব্ বাহাদুর অকস্মাৎ ইহ-জগৎ হইতে বিদায় লইয়াছেন। এই সংবাদে আমরা মর্ম্মাহত হইলাম। মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয়চাঁদ আমাদের পরম সুহৃৎ ছিলেন। সেদিনও তিনি আমাদের 'কলেজ অফ্ কালচারের' পৃষ্ঠপোষক হইয়া উৎসাহ দিয়াছেন। কবীন্দ্র রবীন্দ্র-নাথের বিয়োগ-ব্যথা মিলাইতে না মিলাইতে বৰ্দ্ধমানাধিপতি স্যার বিজয়চাঁদের মৃত্যু আমাদের অন্তরে পুনরায় শেল বিদ্ধ করিয়াছে।

বৰ্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ ৺বিজয়চাঁদ মহতাব

মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করিলেন। ৬০ বৎসর দীর্ঘায়ুঃ নহে, আমরা তাঁহার আরও অধিক দিন জীবিত থাকার আশা করিয়াছিলাম। বিধাতার বজ্র সে আশা নির্ম্মূল করিল। মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয়চন্দ্রের কৈশোর ও যৌবন-যুগের সংবাদ যাঁহারা রাখেন, তাঁহারা এই ছদ্মবেশী রাজর্ষির পরিচয় পাইবেন। তিনি লোকচক্ষে স্যার বিজয় চাঁদ কে-সি-আই-ই,
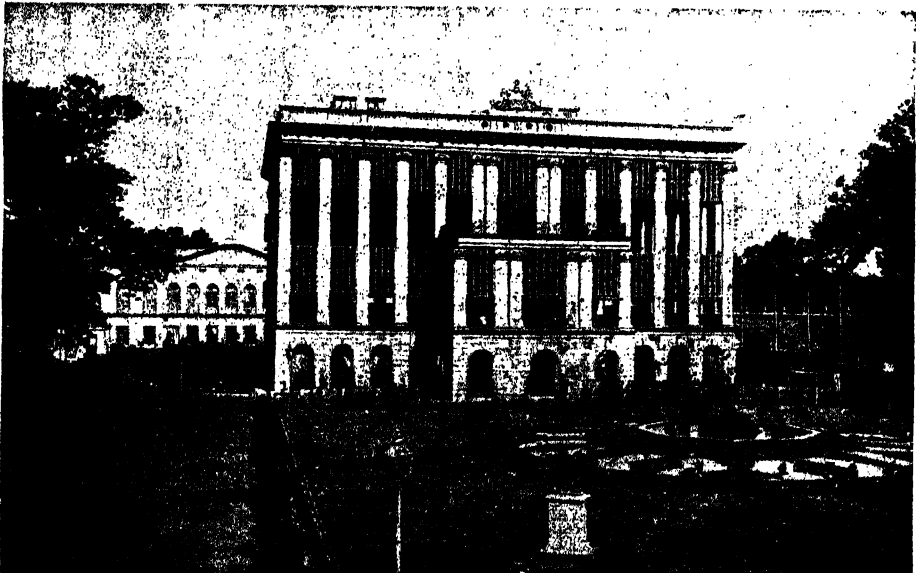
মহতাপ মঞ্জিল: মহারাজাধিরাজের বাসভবন

বৰ্দ্ধমান রাজপরিবারের পুরুষানুক্রমিক রাজপুরুষগণ

দিলখোস : বৰ্দ্ধমান

কে - সি - এস্ - আই ও জি, সি, আই-ই ; কিন্তু আমাদের চক্ষে তিনি ভাসিতেছেন গৈরিক পরিচ্ছদে বিজয়ানন্দ ব্রহ্মচারীরূপে। তাঁহার বড় সাধের সাধন-কাননের প্রতি বৃক্ষটী ইহার সাক্ষ্য দিবে।

স্যার বিজয়চন্দ্র মহাতাব বাহাদুরের উত্তুঙ্গ হিমালয়ের ন্যায় ব্যক্তিত্বের ছায়ায় আমায় যাইতে হয় নাই। আমি তাঁর অন্তর-স্বরূপের প্রেম-শীতল মন্দাকিনী-তীরে দাঁড়াইয়া, তাঁর স্বচ্ছ প্রেম-প্রবাহের অমৃত আস্বাদ করিয়াছি। এই বিজয়চন্দ্রকে চিনিবার উপায় ছিল না। তিনি রাজর্ষির স্বধর্ম্ম অতি সতর্কতার সহিত প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, কখনও ইম্পিরিয়াল ব্যবস্থাপক সভার সভ্য, কখনও

বা বাংলার ব্যবস্থাপক সভার, কখনও বা বাংলার শাসন-বিভাগের অন্যতম কর্ত্তৃপক্ষরূপে দেশশাসনে যোগ্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। ভারত গভর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহার

মহারাজা বিজয়চাঁদের হস্তলিপি : লেখককে লিখিত পত্র

সহযোগিতার ইতিহাস অস্পষ্ট নহে। তিনি কেম্ব্রিজ ও এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এল, এল, ডি, উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি পঞ্চম জর্জ্জের পার্ষদরূপেও প্রতিষ্ঠা-অর্জ্জন করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যেও তাঁহার যশঃসৌরভ কম নহে। তাঁহার 'বিজয়-গীতিকা' স্বীয় জীবনের অধ্যাত্ম-পরিচয়-সমন্বিত। স্যার বিজয়চাঁদের বহুমুখী প্রতিভা ও কর্ম্ম-জীবনের প্রখর রশ্মিজাল বিদীর্ণ করিয়া তাঁহার স্বরূপের সন্ধান করা খুবই দুরূহ ছিল।

সে এক বৎসর, স্যার আশুতোষের সাম্বাৎসরিক স্মৃতি-সভার অধিবেশনে তিনি ছিলেন সভাপতি, আমি ছিলাম প্রধান বক্তা। আশুতোষ হলে সেই আমাদের প্রথম পরিচয়। তারপর মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয়চাঁদ মহাতাব্ বাহাদুরের সহিত যে অপার্থিব সম্বন্ধের বন্ধন উভয়কে সম্মিলিত করিয়াছিল, তাহা আমি ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিব না। তিনি ছিলেন বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূম্যধিকারী। তাঁহার আভিজাত্যের মহিমাধ্বজা গগন স্পর্শ করিত। তাঁহার ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য, ধন ও সমুচ্চ বংশগৌরব। রাষ্ট্রক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ একজন অধিনায়ক ও দেশপ্রতিনিধি। তিনি বাগ্মী, দেশীয় রাজন্যবৃন্দের অগ্রগামী নেতা, বাংলার মাথার মণি। আর আমি উলঙ্গ সন্ন্যাসী। ধন, জ্ঞান, বংশ প্রভৃতিতে মর্য্যাদাহীন, নগণ্য দেশব্রতী—ঈশ্বর-পথের যাত্রী। এই ধনকুবের, ইন্দ্রতুল্য মহামানবের সহিত আমার এই অন্তরঙ্গ পরিচয় এক অপূর্ব্ব ইন্দ্রজালের ন্যায় বিস্ময়কর ব্যাপার। তবুও মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দ্রের সহিত আমার আত্মিক সংযোগ হইয়াছিল। তাঁহার নিকট হইতে দূরে থাকিয়াও আশ্রম-মন্দিরে তাঁর বিদায়-নিবেদন আমার কাণে পৌঁছিয়াছিল; আমি তাঁর আত্মার উপস্থিতি অনুভব করিয়াছিলাম।

স্যার বিজয়চাঁদ মহাতাব্ বাহাদুর ১৩৩৯ সালের ২২শে পৌষ আমার জন্মতিথি উৎসবসভার পৌরোহিত্য করিয়া আমায় গৌরব দান করেন। সেদিন কি গভীর আন্তরিকতার সহিত জ্ঞান, শক্তি, প্রেম, এই ত্রিবেণী-সঙ্গমের তীর্থরূপে প্রবর্ত্তক আশ্রমের বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহা আজও আমাদের কর্ণে বাজিতেছে। তিনি তাঁর অমায়িক ব্যবহারে শুধু সহৃদয়তার পরিচয় দেন নাই, তাঁর অধ্যাত্মজীবন-রহস্যের সহিত প্রবর্ত্তক সঙ্ঘকে এক করিয়া লইয়াছিলেন—সে ইতিহাস বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ঝুলন-পূর্ণিমায় বর্দ্ধমানে প্রবর্ত্তকের রজত-জয়ন্তীর অনুষ্ঠান হইয়াছিল। তিনি ছিলেন ইহার প্রধান পুরোহিত। আমি হইয়াছিলাম তাঁহার প্রাসাদে অতিথি। আতিথ্যের সদয় ব্যবহার শুধু নহে, সেই আত্মিক সম্মিলনের পুণ্য রজনীর স্মৃতি আমাদের প্রেম ও ঐক্যকে চিরায়ুঃ করিয়া রাখিবে।

জয়ন্তী উৎসবদিনে রাজপ্রাসাদে অতিথিরূপে উপস্থিত হইলাম। পবিত্র প্রদোষে মহারাজাধিরাজের সুরম্য কক্ষে দুইজনে বসিয়া অন্তরবিনিময় করার সুযোগ হইয়াছিল। আকৃতিপূর্ণ। সেই একটী কথায় তিনি আমায় আরও নিবিড় অধ্যাত্মচেতনায় টানিয়া লইলেন। প্রকাশ্য জনসভায় সেই অপার্থিব মিলনের অনুভূতি ভুলিবার নহে।

সভাভঙ্গ হইল। জনগণবেষ্টিত হইয়া সভাক্ষেত্র হইতে সহসা বিদায় লওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হইল না। মহারাজাধিরাজ ভীড় ঠেলিয়া, আমার কাঁধে তাঁর বিপুল হস্তখানি প্রসারিত করিয়া বলিলেন, "রায়জী, মনে রাখিবেন আমার সেই মালাটীর কথা।"
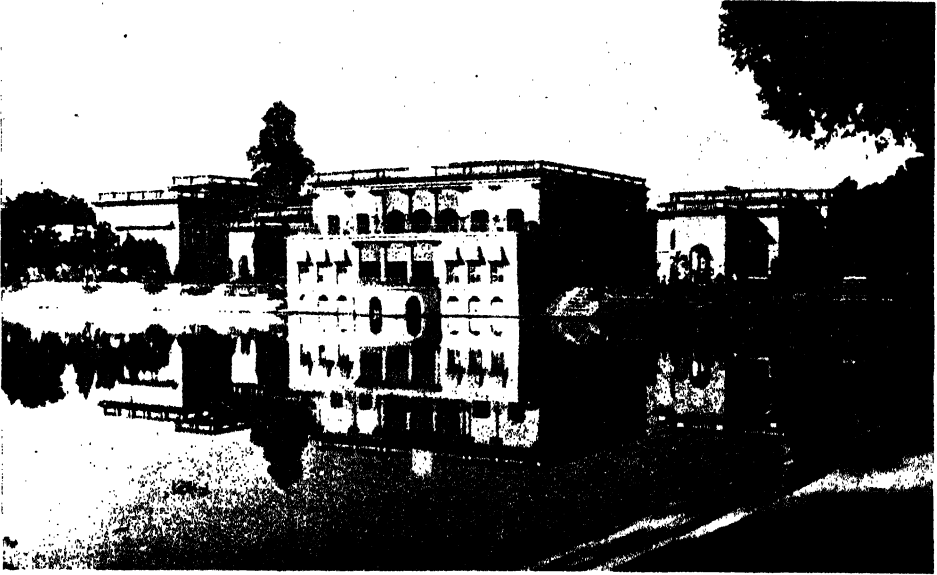
দিলখোস বাগান : মানস-সরোবরের পাড়ে দিলবাহার : বর্দ্ধমান

আমি আশ্রম হইতে তাঁহার জন্য একটী ফুলের মালা লইয়া গিয়াছিলাম; ভ্রমবশতঃ অন্য স্থানে আমার অন্যান্য সহতীর্থদিগের নিকট তাহা থাকিয়া গিয়াছিল। মহারাজাধিরাজ সে কথা শুনিয়া অতি ধীরে, তাঁহার স্বভাবসুলভ গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "রায়জী, এই মালাছড়াটী আমার চাই।"

টাউনহলের সভায় তিলধারণের স্থান ছিল না। সভাপতির সম্ভাষণে আমাদের পরিচয়-রহস্য তিনি নিজ ভাষণেই প্রচার করিলেন। সেই ঝুলন-পূর্ণিমার রাত্রিতে সেই স্নেহ-কণ্ঠে অনুজ-সম্ভাষণ যেমন করুণ, তেমনি

অনেক অনুসন্ধানের পর মালা বাহির হইল। শ্রাবণের আকাশ সেদিন মেঘশূন্য, পূর্ণচন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণে রাজ-প্রাসাদ বিধৌত। অতিথিভবনের সহিত মহারাজাধিরাজের প্রাসাদ এক সুবিস্তীর্ণ লনের ব্যবধান। আমি মালাটী সযত্নে মহারাজাধিরাজের নিকট পাঠাইয়া দিলাম। মহারাজ পাঠাইয়া দিলেন তাঁর স্বরচিত সাহিত্যসম্ভার। সে বিচিত্র কাব্য-সাহিত্যের কিছু পরিচয় গত বর্ষের "প্রবর্ত্তকে" বাহির হইয়াছে।

সে মধুর রজনীতে শুধু আমিই নিদ্রাহীন নহি— আমার সেই ফুলের মালাটী লইয়া মহারাজাধিরাজও

আমাকে আকর্ষণ করিতেছিলেন বিনিদ্র হইয়া। আকাশ-বাতাসের ব্যবধান সে মিলনকে বাধা দিতে পারে নাই। লোকের নিকট এ কাহিনী অতি বড় বিস্ময়কর; কিন্তু প্রভাতে চারি চক্ষের মিলনে আমাদের উভয়ের নয়ন অশ্রুসিক্ত হইল। সে দিন বিজয়ানন্দের স্বরূপ দেখিলাম। স্যার বিজয়চাঁদ মহাতাব্ হাসিয়া বলিলেন "কেমন রায়জী, রাত্রিটা কেমন গেল ?"

দূরকে নিকট করে যে যোগশক্তি, স্যার বিজয়চন্দ্র তাহার সন্ধান জানিতেন। তিনি বলিলেন "রায়জী, আমার লুপ্ত সম্বিৎ পুনঃ জাগ্রত হইয়াছে আপনার ফুলের মালার সহায়ে। মালাটী সারা রাত্রি আমার বুকেই ছিল।"

শ্রীমতিলাল রায়

মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ

কুমার অভয়চাঁদ

অনুরাগে ও আনন্দে আমার চক্ষু ছল-ছল করিতেছিল। আমি গদগদ কণ্ঠে বলিলাম, "আপনি রাজর্ষি, সাধন-কাননের স্বপ্ন আর কতদিন ভুলিয়া থাকিবেন ?"

কতক কথায়, কতক চক্ষের দৃষ্টিতে যে অলৌকিক ইতিবৃত্তের পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান হইল, তাহার প্রকাশ অবাঞ্ছনীয়। রাজকুমার অভয়চাঁদ অল্পভাষী। তাঁহাকে পিতার অনুগামী মনে হইল। তিনি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন। গৌরবে তাঁর মুখমণ্ডল কান্তিময় হইয়াছিল।

মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দ্র আমার কোন ডাক উপেক্ষা করেন নাই। এক বিন্দু স্বার্থ আমাদের মধ্যে এই পবিত্র সম্বন্ধকে আবিল করিতে পারে নাই। নিতান্ত অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি প্রবর্ত্তক জুট মিলের উদ্বোধন-সভায় পৌরোহিত্য করিয়াছেন। আমার প্রতি কর্ম্মে তিনি সমর্থন-বাণী প্রেরণ করিয়া আমায় উৎসাহ দিয়াছেন।

এক বৎসর পরে—আবার ঝুলন-পূর্ণিমা। কয়েক দিন হইতেই অন্তরে একটা দুর্ভাবনার মেঘ সঞ্চিত হইতেছিল। অত্যন্ত প্রয়োজনবোধ না হইলে, মহারাজাধিরাজের সহিত পত্র-ব্যবহার করিতাম না। সংবাদপত্রে তাঁহার অসুস্থতা-বার্ত্তা পাইয়া নীরব থাকা গেল না; তাঁহাকে দেখিবার অনুযোগ জানাইলাম। সুযোগও সঙ্গে সঙ্গে মিলিল। গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণের শতবার্ষিকী উৎসবের সূচনা করিয়া আসিয়াছিলাম ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ঝুলন-পূর্ণিমায়। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে তাহার উদ্‌যাপন-সভায় পৌরোহিত্য করার ডাক আসিল বর্দ্ধমানের নাগরিকগণের পক্ষ হইতে। মহারাজাধিরাজ বৈকালিক জ্বরে অতিশয় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। চিকিৎসকেরা তাঁহার সহিত কাহারও সাক্ষাৎকার নিষেধ করিয়াছিলেন। মহারাজাধিরাজ তবুও দুই ছত্রে আমায় জানাইলেন "রায়জী, আমি বড় দুর্ব্বল, বেশী লিখিতে পারিলাম না, সকালে আসিবেন। দুই চারি মিনিট সাক্ষাৎ দর্শনে আনন্দলাভ করিব।" ১৭ই শ্রাবণ, ২রা আগষ্ট গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণের শতবার্ষিকী উৎসবের উদ্‌যাপনসভা সমাপন করিলাম। পরদিন প্রভাতে দেখি—মহারাজাধিরাজ তাঁহার নিজের 'কার' তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারীকে দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন। বর্ষার প্রভাতে ফুলও মিলিল না। গৃহস্থের গৃহ-প্রাঙ্গণে টগর ফুল এবং

কয়েকটা মল্লিকা ফুটিয়াছিল; মুঠা করিয়া তাহাই লইয়া স্যার বিজয়চাঁদ মহাতাবের নিকট উপস্থিত হইলাম।

রাজোচিত বিপুল কলেবর শয্যাধার আশ্রয় করিয়া—মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ রোগ ভোগ করিতেছেন। তাঁহার পার্শ্বে গিয়া বসিতেই তিনি বাহু বিস্তার করিয়া আমায় আকর্ষণ করিলেন। আমি ফুলগুলি ঈশ্বরের আশীষপূত কল্পনা করিয়া মহারাজের হস্তে প্রদান করিলাম। তিনি ঐগুলি দ্রব্যাধারে রাখিয়া সশ্রদ্ধভাবে নাড়াচাড়া করিতে করিতে তাঁহার অবস্থার কথা বলিতে লাগিলেন। লইয়া উপাধানে হেলান দিয়া উন্নতগ্রীব হইলেন—উৎসাহ-দীপ্ত-নয়নে বলিলেন—"আমারও ত আর সময় নাই রায়জী, শরীর ভাঙ্গিয়াছে, আমি যেন জালবদ্ধ সিংহ (caged lion)!" তারপর আমার মুখের দিকে চাহিলেন। সে করুণ মর্ম্মদৃষ্টি আমার অন্তরেই রহিল। আজও মনে হইল—ইনি শাপভ্রষ্ট রাজর্ষি। যে শক্তি, যে প্রতিভা, যে বুদ্ধির প্রাখর্য্য থাকিলে দেশ-শাসনের অধিকার মানুষের থাকে, সে শক্তি স্যার বিজয়চন্দ্রের ছিল; কিন্তু এ যাত্রা তিনি বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূম্যধিকারী ব্যতীত আর
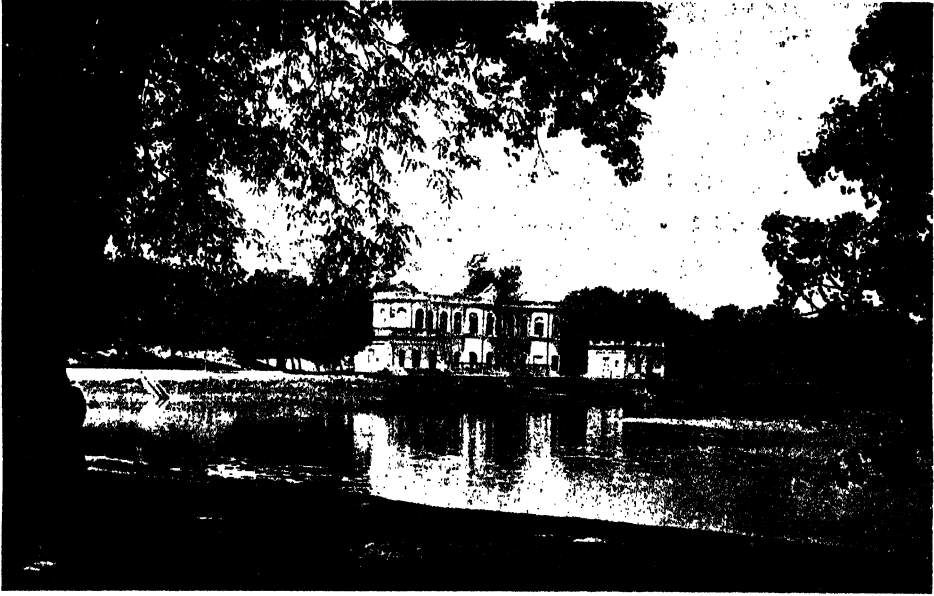
বর্দ্ধমানের প্রসিদ্ধ কৃষ্ণসায়র ও তার পাড়ে আফতাব্ নিবাস

দুর্ভাবনার দিন আর নাই, তিনি আরোগ্যের পথে! কথা কহিতে কহিতে তিনি প্রসন্ন হইলেন। আত্মপ্রসঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া, লোক, রাষ্ট্র, শিক্ষা, সমাজ সকল প্রসঙ্গই হইল। সে কক্ষে আর কেহ ছিল না। উভয়ের মধ্যে অন্তর-বিনিময়ের অমৃত উথলিয়া উঠিল। দেশ ও জাতির কথায় কেবল বলিলেন—"আমি নিরাশ হইয়াছি রায়জী। যে মনের বল ও দূরদৃষ্টি থাকিলে রাষ্ট্রক্ষেত্রে আমাদের গৌরব ও মর্য্যাদা থাকে, তা' অবস্থার দায়ে নিস্তেজ হইয়া আসে।" মহারাজাধিরাজকে অধিকক্ষণ কথা কহিতে দেওয়া সঙ্গত মনে হইল না। তিনি রোগ-কাতর দেহ কিছুই নহেন। বিদায় লইলাম। তাঁহার দক্ষিণ হস্তখানি করপুটে গ্রহণ করিয়া আমি ও তিনি দুইজনেই ক্ষণেক স্তিমিতনয়ন হইলাম। বাহিরে আসিয়া দেখি—রাজকুমার অভয়চাঁদ দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার অমায়িকতাপূর্ণ সশ্রদ্ধ ব্যবহার বড় হৃদয়াকর্ষক। তিনি নীচে আসিয়া আমায় গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। এই আমার শেষ বিদায়।

১২ই ভাদ্র শুক্রবার অষ্টমী তিথি, অনুরাধা নক্ষত্র, সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্বে বর্দ্ধমানরাজবাড়ীতে মহারাজাধিরাজের জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছে। মৃত্যুর দুই ঘণ্টা পূর্ব্বেও তিনি আমায় স্মরণ করিয়া প্রবর্ত্তক কলেজ

অব্ কাল্‌চারের প্রতি শুভাশীষ বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন। কর্ম্মক্ষয়ের পর যে অমৃত-সঞ্চয় হইয়াছে, আমরা বিজয়ানন্দ ব্রহ্মচারীর পুনর্ব্বিকাশ তাই রাজর্ষি-মূর্ত্তিতে দেখার আকুতি রাখি। মহারাণী কাশীধামে। তাঁর অন্তিমশয্যাপার্শ্বে রাজ-কুমারদ্বয় উপস্থিত ছিলেন। রাজকুমারগণের সহিত একাত্ম হইয়া আমরা এই শোকসন্তপ্ত পরিবারের সহিত তুল্যভাবেই শোকার্ত্ত। আমরা তাঁর স্বর্গত আত্মার শান্তি কামনা করি।

মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দ্র মহাতাব্ যে মর্ম্মকথা স্বহস্তে লিখিয়া তাঁর চিরস্মৃতি আমাদের মধ্যে জাগ্রত রাখিয়া গিয়াছেন, তার অনুলিপি প্রদান করিলাম। উপসংহারে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি—এই পতিত জাতির মধ্যে হে বরণীয় পুরুষসিংহ, তুমি নবমূর্ত্তিতে পুনরাগমন করিও।

ওঁ শান্তি !

ঐতিহাসিক মহামানব শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীসাহাজী

কংস-বধের পর মথুরার রাজা কৃষ্ণেরই হইবার কথা এবং সেইটাই দস্তুর। কিন্তু কার্যতঃ তাহা না হওয়ায়, সকলেই তখন অতিমাত্র বিস্মিত হন। এবং এমন কি, তাঁহার বীর্যবত্তা সম্বন্ধে জরাসন্ধ প্রভৃতি অনেকেরই মনে সন্দেহ জন্মে ॥৫০। বিষ্ণু। হরিবংশ॥ এবং সেটা অস্বাভাবিকও নয়। কেননা, তিনি মথুরা হইতে আজন্ম নির্বাসিত; সুতরাং, যাদবগণের উপর তাঁহার প্রভাবটা তখনও অনিশ্চিত। পক্ষান্তরে, জরাসন্ধ এবং উগ্রসেন উভয়ে বৈবাহিক। জরাসন্ধ তেইশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিনায়ক এবং আর্যাবর্তের একচ্ছত্র সম্রাট্ ॥৫০।১০ ভাগবত। এমত ক্ষেত্রে, মথুরার রাজা না হওয়া আত্ম-রক্ষার্থ তাঁহার একটা রাজনৈতিক চালবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়, এইরূপ ঠাওরানো তাঁহাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। বলিতে কি, বাহুবলে বহু কষ্টে কোন রাজ্য জয় করিয়া সেই রাজ্যটা যে কেহ অপরকে দিতে পারেন, তেমন কথা সেকালের রাজাদের পক্ষে বিশ্বাস করা মোটেই সম্ভব নয়।

কিন্তু এ সম্বন্ধে একটা কথা এই যে, তিনি যে শুধু কংসবধের পরই উগ্রসেনকে বলিয়াছিলেন—"আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই, আমার সে আকাঙ্ক্ষাও নয়। যদু-কুলের উপহাসস্বরূপ কংসকে আমি বধ করিয়াছি, জ্ঞাতি-হিতার্থ, রাজ্যলোভে নয়। আপনি আমার মান্য কুলের নায়ক; সুতরাং এ রাজ্য আপনারই"—তাহা নয়; পরন্তু চক্রমুষল যুদ্ধজয়ের পর রুক্মিণী-স্বয়ম্বরে ইন্দ্র-দূত চিত্রাঙ্গদ কর্তৃক বিশ্বকর্মা নির্মিত সিংহ-চিহ্নিত আসনে সমবেত রাজন্যগণের সম্মুখে রাজচক্রবর্তিপদে অভিষিক্ত হইয়াও তাঁহাকে তিনি ঠিক সেই কথাই বলিয়া-ছিলেন, দেখা যায়—"আমি ধনের আশায় আপনার দুই পুত্রকে (কংস ও সুনামা) সংহার করি নাই। কংস-নাশ জন্য মনোগত ভয় এবং সন্তাপ দূর করুন এবং আমার বাহুবল আশ্রয় করিয়া শত্রু জয় করুন।" ৩৯, ৪৩, ৫০, ৫৪। বিষ্ণু। হরিবংশ। সুতরাং, দেখা যাইতেছে, পূর্বাপর তাঁহার কথায় এবং কোনরূপ বিরোধ বা বৈসাদৃশ্য নাই। তিনি যখন মথুরায় সদ্যপ্রত্যাগত, তখনও তাঁহার যে কথা, যে কায, পরে যখন ঐ রাজ্যে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত, তখনও তাঁহার সেই কথা—সেই কায।

তাঁহার জীবনের সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য—আভিজাত্যগর্বী ক্ষত্রিয় জাতিকে সংযত করিয়া এক অখণ্ড মহাভারত-রচনা এবং বলা বাহুল্য, সেই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তিনি তাঁহার জীবনের প্রত্যেকটি কার্য নিয়ন্ত্রিত করিয়া-ছিলেন। নিজের স্বার্থ বা প্রতিষ্ঠার প্রতি কোন দিনই তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। এবং এমন কি, দেখা যায়, সে জন্য তিনি তাঁহার নিজের ব্যক্তিত্ব পর্যন্ত ক্ষুণ্ণ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

গীতার প্রতি ছত্রে আমরা তাঁহার উদার ধর্মমতের পরিচয় পাই; অথচ, কি আশ্চর্য, তিনি নিজে কোন নূতন

ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিয়া যান নাই। প্রকৃত কথা এই যে, তিনি তাঁহার অসামান্য ধীশক্তিবলে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার নিজের মত এবং কর্মপ্রণালী যতই উৎকৃষ্ট হউক, সকলকে তাঁহার অনুবর্তী করা সম্ভব নয়। এবং সেই জন্যই তিনি নিজের ব্যক্তিগত মতামত প্রচারে যত্নবান্ না হইয়া (কেননা, উহার অর্থই নূতন আর একটা ভেদ সৃষ্টি করা) প্রচলিত সকল মতের সমন্বয়সাধনপূর্বক এক অখণ্ড মহাভারত-রচনার পথটাই শুধু সুপ্রশস্ত করিয়া লইয়াছিলেন, এই মাত্র। পুরাণে আমরা যে তাঁহার অত্যধিক প্রকাশ দেখিতে পাই, মনে হয়, তাঁহার অম্লান ব্যক্তিত্বের ঐ প্রকার অকুণ্ঠ বিসর্জনই তাহার একমাত্র কারণ। সুতরাং তাঁহার জীবনের কি পারিবারিক, কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক প্রত্যেকটি কার্যই যে সেই মহদুদ্দেশ্যের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল, সেটা বস্তুতই অস্বাভাবিক নয়। সমস্ত যদুবংশীয়দিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার জন্য তিনি যে শুধু নিজের বাহুবলার্জিত মথুরারাজ্যটাই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা নয়, পরন্তু শতধাবিচ্ছিন্ন ইতোভ্রষ্ট ততোনষ্ট বিক্ষিপ্ত ভারতকে এক অখণ্ড মহাভারতে পরিণত করিবার জন্য নিজের করতলগত সার্বভৌম ধর্ম-নেতৃত্ব পর্যন্ত পরিত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই দেখা যায়। সুতরাং গীতার—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে'র্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ [১]
তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত ॥ ৬২।১৮

ইত্যাদি উক্তিটা তাঁহার ন্যায় অনহঙ্কৃতবুদ্ধি মহামানবের মুখেই শোভা পায়। মানুষের স্বার্থবুদ্ধি এবং আত্ম-প্রতিষ্ঠার মোহ এতই সুস্পষ্ট যে, তাহা বুঝিবার জন্য হৃদয়ের দিকে তাকাইতে হয় না। হৃদয়ের দিকে তাকাইতে হয়—পরার্থ এবং লোকপ্রতিষ্ঠা বুঝিতে হইলে। মস্তিষ্ক বরং অনেক সময়ে পরার্থ এবং লোকপ্রতিষ্ঠার ছদ্ম আবরণে স্বার্থ এবং আত্মপ্রতিষ্ঠারই উপদেশ দিয়া থাকে। এবং কথাটা তীক্ষ্ণমস্তিষ্ক কুশাগ্রবুদ্ধি নেতাদের সম্বন্ধেই বেশী খাটে। কিন্তু বীরজনসুলভ ঐ প্রকার দৌর্বল্য (heroic weakness) কৃষ্ণচরিত্রে বিন্দুমাত্রও দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার অলৌকিক শক্তিমত্তার নিরপেক্ষ পর্যালোচনা করিলেই আমরা অনায়াসেই বলিতে পারি, ইচ্ছা করিলে তিনি সার্বভৌম সম্রাট্, সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রবর্তক, অথবা অদ্বিতীয় বীর হইতে পারিতেন। কিন্তু সুখের বিষয়, তিনি সে সকল কিছুই হন নাই এবং না হইয়া ভালই করিয়াছেন। কেন না, তিনি যাহা হন নাই, অনেকেই তাহা হইয়াছেন; কিন্তু তিনি যাহা হইয়াছেন এ পর্যন্ত পৃথিবীতে আর কেহই সে রকম হইতে পারেন নাই। যুগে যুগে মনীষীরা যে তাঁহার উদ্দেশে "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" বলিয়া শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া আসিয়াছেন, সেটা বস্তুতই অত্যুক্তি নয়। এবং ভুলিয়া গেলেই চলিবে না, ঐ সমস্ত যিনি করিয়াছিলেন, আধুনিক দৃষ্টিতে তিনি একজন ঘোরতর সংসারী বৈ আর কিছুই নন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই ঘোরতর সংসারী যাহা করিয়াছিলেন, কোন ঘোরতর সন্ন্যাসী কোনদিনই তাহা করিতে পারেন নাই। তবে, এ কথাটাও অবশ্য সত্য যে, সামাজিক সুব্যবস্থার গুণে জনহিতকর কার্যে আত্ম-নিয়োগ করার সুযোগ এবং সুবিধা সংসারীদেরও সে সময়ে যথেষ্ট ছিল।

---

[১] কলির প্রারম্ভে প্রাচীন জাতিগুলির মধ্যে হিংসাদ্বেষের আর অন্ত ছিল না। ব্রহ্মা এবং ইন্দ্রাদি বিচক্ষণ দেবতারা সেইজন্যই সে সময়ে একটা সমন্বয়মূলক সমাজসৃষ্টির স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। এবং কৃষ্ণকে দিয়া সেই স্বপ্ন সফল হইতে পারে বুঝিয়াই তাঁহাকে তাঁহারা সর্বদেবময় বিষ্ণুপদদানে সম্বর্ধিত করেন। বলা বাহুল্য, কৃষ্ণও তখন তাঁহাদের সেই স্বপ্নের সার্থকতা বুঝিতে পারিয়া উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য নিজের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়া তাঁহাদেরই যন্ত্রস্বরূপ হইয়া কার্য করেন। কাহারও ব্যক্তিত্ব বস্তুতই বড় কথা নয়, যদি সেই ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়া তাহার জাতির সমষ্টি-রূপটি প্রকাশ না পায়। কথাটার সত্যতা কৃষ্ণ বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন এবং সেইজন্যই তিনি নিজেকে দেশ এবং জাতির উদ্দেশ্যসিদ্ধির যন্ত্রস্বরূপ ভাবিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ব্রহ্মাদি দেবগণ তখন জাতির সেই সমষ্টিরূপে এক একটি প্রতীক। তাঁহাদিগকে তিনি যে ততটা শ্রদ্ধা করিতেন, তাহারও মনে হয় ঐটাই কারণ ॥ ১২১। বিষ্ণু। হরিবংশ ॥ সুতরাং দেখা যাইতেছে, গীতার ঐ উক্তিটা ঐতিহাসিকতঃ সত্য। ওটাকে আধ্যাত্মিক কুজ্ঝটিকা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া ঠিক নয়। প্রত্যেক ব্যষ্টি যদি নিজেকে নেতার এবং নেতা (ঈশ্বর) আবার যদি নিজেকে প্রত্যেক ব্যষ্টির যন্ত্রস্বরূপ বলিয়া মনে করিতে পারেন, তাহা হইলে তো সকল লেঠাই চুকিয়া যায়।

বলিতে কি, সাড়ে তিন হাজার বৎসর পূর্বে সমাজ এবং জাতি, ধর্ম এবং বর্ণ, বিবাহ এবং যৌনসমস্যা-সমাধানের যে ইঙ্গিত তিনি করিয়া গিয়াছেন, নারী-স্বাতন্ত্র্য, অহিংসা এবং আন্তর্জাতিকতার যে স্বপ্ন তিনি দেখিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিছুই অদ্যাবধিও কল্পনা করিতে পারি নাই। খুব আন্তরিক ভাবে বলা যাইতে পারে, তাঁহার যে সময়ে জন্মগ্রহণ করা উচিত ছিল, তাহা অপেক্ষা তিনি অন্ততঃ তিন হাজার বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং সেই জন্যই তাঁহার ঐ সকল মতবাদ সে সময়ে ততটা প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু তথাপি ভাবিয়া দেখিবার বিষয় এই যে, কোথায় গেল প্রাচীন ভারতের সেই সকল দেব, দৈত্য, দানব, যক্ষ, রক্ষ, পক্ষী, নাগ, জম্বুক, সিংহ, ভল্লুক, গজ, কৃকলাস প্রভৃতি রংবেরঙের হাজার জাতি, আর তাহারই স্থলে গড়িয়া উঠিল চাতুর্বর্ণ্য সমন্বিত এক অখণ্ড মানবজাতি [২]। গীতার "চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ" উক্তিটা বস্তুতই মিথ্যা নয়। অসংখ্য ভেদজর্জরিত বর্তমান ভারতে পুনরায় এক অখণ্ড মহাজাতি গড়িয়া তুলিতে হইলে, পুনরায় তাঁহারই ন্যায় প্রতিভা এবং মনীষার একান্ত প্রয়োজন। তিনি যে উদাত্ত সমন্বয়বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন, ভারত-যুদ্ধের পরবর্তী সমন্বয়টা কি তাহারই অমৃতফল নয়? যে সমন্বয়বাণীর তরঙ্গ তুলিয়া এই সেদিনও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সারা জগৎটা তোলপার করিয়া রাখিয়া গেলেন, সেটা তৎকৃত আন্দোলন-সমুদ্রের একটা তরঙ্গ বৈ আর কিছুই নয়।

বেদ আত্মা, পুরাণ তাহার অবয়ব। আত্মা ছাড়া অবয়ব এবং অবয়ব ছাড়া আত্মা দুইটিই নিরর্থক। কৃষ্ণ সেই অবয়ব এবং আত্মার সম্মিলিত বিগ্রহ। সুতরাং, তাঁহার আদর্শ যিনি অনুসরণ করেন, তিনিই প্রকৃত হিন্দু, তিনিই প্রকৃত ভারতীয়। সর্বহারা দুঃস্থ ভারত আজ তাঁহারই মুখাপেক্ষী।

[২] ঋষিকুলে গোত্রধর্মপ্রবর্তনটাও দেখা যায় তাঁহারই কীর্তি॥ ৯।১।১০। ভাগবত॥ ইহা হইতেই বুঝা যায়, ঋষি-সঙ্ঘকে তিনি সংসারধর্মে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জাতির জনবলবৃদ্ধির সুব্যবস্থা করেন। বলা বাহুল্য, তৎপূর্বে তাঁহাদের মধ্যে সংসারবিরক্তির ভাব অত্যন্ত প্রবল ছিল এবং মহৎ কার্যের দোহাই দিয়া সংসার হইতে দূরে সরিয়া থাকাটাই তাঁহারা বেশী পছন্দ করিতেন। দশ হাজার শিষ্যের গুরু দুর্বাসাকে সংসারধর্মে প্রবৃত্ত করানো তাঁহার অতুলনীয় কীর্তি। ত্রেতার প্রারম্ভে বিষ্ণু যেমন শঙ্করকে উমার সহিত সংসারধর্মে প্রবৃত্ত করান, সেইরূপ কলির প্রারম্ভে কৃষ্ণও করান দুর্বাসাকে একানংশার সহিত। দুর্বাসাকে শঙ্করের, একানংশাকে উমার এবং কৃষ্ণকে বিষ্ণুর, অবতার যে গণ্য করা হয়, উহাই তাহার কারণ।

বর্দ্ধমানাধিপতির মহাপ্রয়াণে শ্রদ্ধাঞ্জলি

শ্রীশুভদর্শন দত্ত

বাজিল বিজয়-ভেরী, কৈলাস শিখরে,
হর-প্রতি হৈমবতী, ক'ন মৃদু হাসি,
"কহ নাথ কি উৎসব, আজি তব পুরে!
অন্তর আকুল কেন?" সাদর সম্ভাষি'
কহিলেন মৃত্যুঞ্জয়, "মৃত্যুজয়ী হয়ে
মর মর্ত্ত্যলোক হ'তে, মরণ বরিয়া,
মোর প্রিয় বরপুত্র, শ্রীবিজয়চাঁদ
নিষ্পাপ হৃদয় লয়ে, পশিল আসিয়া
মম পুরে; পুণ্য-রাধাষ্টমী তিথিযোগে।
নন্দন - কানন সম, বিজয় - বিহার
রেখেছি সাজায়ে, জ্ঞানে, কর্ম্মে ত্যাগে,
ধরা মাঝে নাহি হেরি, উপমা যাঁহার
এ রাজ-অতিথি মোর, সুযোগ্য সম্মানে,
সৎকৃত করিবে সদা, ওমা রমা, বাণী,
লয়ে মুক্ত স্বর্ণ-ঝাঁপি, বীণার বাদনে
তুষিবে সতত দোঁহে, মনে নাহি মানি
এত সুখে কার গৃহে, লক্ষ্মী সরস্বতী
পূজা পেলি দুই বোনে। করে কর ধরি'
ছিলি দোঁহে। ভুলি' চির বিরোধের নীতি।
সম জানি, রাজঋষি, জনকের পুরী।"

২৮

১৯২০ খৃষ্টাব্দে আত্মসমর্পণের ভাস্বর ক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দ দেখিয়াছিলেন আমার চিন্ময় সত্তাকে। তাঁর সানুরাগ দৃষ্টি ও অপার্থিব হৃদয়ের অমৃতাস্বাদ আমায় খুবই উদ্বুদ্ধ করিত। সে কত কথা; কিন্তু তাহা আর বিবৃত করিব না। এইবার অতি সংক্ষেপে ও অতি শীঘ্র আমার জীবনের মহিমাদীপ্ত শ্রীঅরবিন্দ-পর্ব্ব সমাপ্ত করিব।

চৈত্র মাস শেষ হইয়া আসিল। পূর্ণাঙ্গ বসন্তের আবির্ভাবে প্রবর্ত্তক আশ্রম ফলে-ফুলে সুশোভিত হইল। মধুমাসের জ্যোৎস্না-প্লাবিত গঙ্গা-তটে বারীনদার অভিহিত "বেঙ্কুড়"দের লইয়া মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত খেলা-ধূলায়, আলাপ-আলোচনায় অতিবাহিত হইত। যখন বাড়ী ফিরিতাম, গভীর প্রসুপ্তির চকিত ছায়ামূর্ত্তি আমায় ঘিরিয়া ধরিত। বাতায়ন-পথ দিয়া দেখিতাম শয্যাধারে গভীর নিদ্রারতা পত্নীকে। তাঁহাকে জাগ্রত করার প্রবৃত্তি হইত না। প্রাঙ্গণে আসিয়া পাদচারণা করিতাম। একদিন গভীর নিশীথে এইরূপ আমি একা প্রাঙ্গণে পাদচারণা করিতেছিলাম। থাকিয়া থাকিয়া কোকিল পাপিয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিতেছিল। আমার সঙ্গে বিচরণ করিতেছিল জ্যোৎস্নাবক্ষে আমারই প্রতিচ্ছায়া। মস্তিষ্কে বিধাতা লিখিয়া চলিয়াছেন পরদিনের কর্ম্মলিপি। এমন সকলের পক্ষে ঘটে কি না, জানি না; আমি আজিও অনাগত দিনের কর্ম্ম-সূচি এইরূপেই পাইয়া থাকি। মনে পড়িল এমনই গভীর রাত্রে, গত বৎসর এমনই এক সময়ে শ্রীঅরবিন্দের সহিত গলা ধরাধরি করিয়া পণ্ডিচারীর পথে বাহির হইয়াছিলাম; সুদীর্ঘ জেটীর প্রান্তভাগে তরঙ্গ-সঙ্কুল অসীম সমুদ্রের দিকে চাহিয়া আমরা কয় জন শ্রীঅরবিন্দের চাওয়াকে মূর্ত্তি দিতে কেমন নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়াছিলাম। শ্রীঅরবিন্দ আমাদের সে ভাব ভঙ্গ করিয়া কত হাস্য-কৌতুকরত হইয়াছিলেন। সে রাত্রিতে তাঁর অনুরোধে আমাদের প্রত্যেককেই গান গাহিতে হইয়াছিল। জীবনের কেন্দ্রতীর্থস্বরূপ এই শ্রীমূর্ত্তিকে ঘিরিয়া আমরা কয় জন তরুণ সে রাত্রিতে শ্রীঅরবিন্দ-প্রেমে অভিভূত হইয়া অপার্থিব সম্বন্ধের মধুময় আস্বাদ লাভ করিয়াছিলাম।

মনে পড়িল অরুণের কথা। শ্রীঅরবিন্দের প্রেম-স্পর্শে আমারই ন্যায় অভিভূত হইয়া কত কথাই সে লিখিতেছে। অরুণের পত্রের প্রতি ছত্রটী আমার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছিল—সে লিখিয়াছে "মহাসাগর-কূলে আসিয়া বালুখণ্ডে কতই খুঁড়িব; আমায় একেবারে ডুবাইয়া দিন, অতলে ডুবিয়া যাই—ফিরিব সেই অতলের অখণ্ড রসাস্বাদ লইয়া। অন্য কথা কিছু নাই। অরবিন্দের কথাই বলি—সে কি মানুষ গো? আছেন একেবারে অখণ্ডে—indivisible oneness, চেতনার, প্রাণের, ইন্দ্রিয়ের পর্য্যন্ত সেই অখণ্ডে রূপান্তর হইয়া গিয়াছে। শেষ কালে বাহ্য তনুটীকে পর্য্যন্ত ভাগবতী-তনু করিয়া গড়িয়া তুলিতেই বুঝি—কি সুন্দর! এই মানুষকেই তো জগৎ খুঁজিতেছে। কিন্তু জগৎ আজও কি তাঁহাকে বুঝিবে? আমরাই তাঁহাকে ধরিয়াছি, চিনিয়াছি কতটুকু, কতটুকু? কূল-কিনারা যে পাইব না!" আবার আর এক পত্রের কথা চিত্তে রেখাঙ্কিত করিল। এ পত্র শ্রীমান্ নলিনচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া লেখা। অরুণ লিখিয়াছে "না লিখিয়া থাকিতে পারি না, তাই লিখি। শোনা জিনিষগুলা শোনাবারও ইচ্ছা। নিজের কাছে স্পষ্টতর হয়; তাই লেখা। এই এখন প্রকাণ্ড ঘরে দোতলায় বিদ্যুতের তলায় আমি একেলা। পাশের ঘরে মীরা ও অরবিন্দ। কত কথাই না কহিতেছেন! আমি ভাবিতেছি কি, ভাবনা নয়, মনে মনে জপিতেছি "Be passive and receive him" এ যে আজ আমার প্রত্যক্ষ জপমন্ত্র। তোমরাও কেন বলিবে না—তোমরাও স্নেহাশীর্ব্বাদ দাও যেন নিথর হইয়া পরম জিনিষ লাভ করিতে পারি। তোমরা তো মায়ের সন্তান, তাঁর আশীষপুঞ্জ তোমাদেরও

স্নেহ-মধুর বুকে যে লুকান আছে……সত্যই স্বর্গের আনন্দ ভোগ করি। আমার স্বর্গ কোথায়, তোমাদের বেশী ক'রে' বোঝাতে যাওয়াই বাহুল্য। সে স্বর্গে আমরা সকলেই আছি। যারা তাঁর চরণে স্থান পেয়েছে।……"

অরুণের পত্র-মর্ম্ম আমার হৃদয় আকুল করিল। শ্রীঅরবিন্দ কয়েক দিন আগেই লিখিয়াছেন "অরুণ একটী পাতলা কাঁচের আলমারীতে বাস করিতেছে, টোকা মারিলেই বাহির হইয়া পড়িবে।" গর্ব্বে আমার হৃদয় ভরিয়া গিয়াছিল।

চাঁদটী আমাদের দ্বিতল অট্টালিকার আড়ালে গিয়া লুকাইয়াছে। প্রাঙ্গণে আর জ্যোৎস্না নাই। অন্ধকারে, ঊর্দ্ধে কয়েকটা নিস্তব্ধ তারকার দিকে চাহিয়া স্থির করিলাম অরুণ পণ্ডিচারীতেই থাকুক। স্থির করিলাম—কালই তাহাকে এই আদেশ তারযোগে জানাইয়া দিব। অন্ধকারে দাঁড়াইয়া এই সঙ্কল্প স্থির হইলে, পশ্চাতের বাতায়নপথে অনুচ্চ শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখিলাম—গৃহ-দেবীর নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। তিনি অনুচ্চ স্বরে বলিলেন "ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখ দেখি!" অস্পষ্ট আলোকে দেখিলাম—ঘড়ির বড় কাঁটাটা নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে; রাত্রি ৩॥০টা। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে ঘরে ডাকিলেন। আমি গিয়া শয্যা গ্রহণ করিলাম।

রাত্রিশেষের নিস্তব্ধতা বড় মধুর ও প্রীতিকর। সারা রাত্রি দক্ষিণা বাতাস বহিয়াছে, শ্রান্তি দূর করার জন্য বাতাসও স্তব্ধ। গৃহদেবী মাথায় পাখা করিতে করিতে বলিলেন "নিশাচরের ন্যায় প্রতি রাত্রি যদি এমন করিয়া কাটাও, শরীর আর কত দিন টিকিবে!" আমিও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। এই কথার উত্তর দিবার কিছু ছিল না। বাল্যে দেহের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছেন জননী। কৈশোরে এক মহীয়সী ধাত্রীর করুণায় দেহের পুষ্টি হইয়াছে। যৌবনে দেহের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছেন স্বয়ং গৃহলক্ষ্মী। এই কথা শুনিলে তিনি স্ফুরিতোষ্ঠ হইয়া তীব্র কণ্ঠে বলিতেন "বড় বড় কথা বৈঠকখানায় ছেলেদের কাছে ব'ল; আমি কি করব? ছেলেমানুষ নও, ধরে-বেঁধে রাখব; সারা রাত্রি পথে পথে ঘুরে বেড়াবে; একটা রোগ না হলে নিস্তার নাই!" কথার সঙ্গে ঘন ঘন পাখার বাতাসে বুঝিতাম—তিনি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। সারা রাত্রি অবসাদে চক্ষের পাতা মুদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্বর্গের ঘুম নামিয়া আসিল। পরদিন প্রাতঃকালে অরুণকে ফিরিতে নিষেধ করিয়া তার করিলাম। অরুণের অভ্যুত্থান ও তার আত্মার পুনর্জ্জন্মই আমার লক্ষ্য ছিল। শ্রীঅরবিন্দের আশ্রয়ে অরুণ পূর্ণকাম হউক—এই কল্যাণ-প্রার্থনাই ঈশ্বরের নিকট নিবেদন করিলাম।

অরুণের পত্র আমায় নিরাশ করিল। সে লিখিল "টেলিগ্রাম পাইলাম—অরবিন্দকেও দেখাইলাম। আপনারা দু'জনেই পাগল। অরবিন্দ কি বুঝিলেন কে জানে ……! অপার্থিব মাতৃ-হৃদয় একটা আত্মার পূর্ণ জাগৃতির জন্য নিবিড় স্নেহক্ষরণে নির্নিমেষ জাগ্রত হইয়াছে ভাবিতেছি। কিন্তু কি fulfilment হইবে; আমি জানি না; আপনার ইচ্ছা হইলে জানিব। আমার ছোট বুকখানি সারাদিন ভরপুর হইয়া ছিল; কূল মিলিল না। যুগ যুগ ধরিয়া এ মাতৃ-হৃদয়ের কূল ও তল মিলিবে না, ইহা আমি ভাল করিয়াই জানিয়াছি। ইহার পরও যদি সাধনা করিতে হয়, নিজেকে বাতুল মনে করিতে হইবে। অসীম তৃপ্তি লইয়া নির্নিমেষ চাহিয়া থাকা—কেবল দেখা কালী ও কৃষ্ণের আশীষ-লহরী জমিয়া জমিয়া মাথার উপরে কি দেব-তনু সৃজন করিতেছে। সেই অমর সৃষ্টিরই একটা প্রতীক্ষা আছে। পলে পলে জমিতেছে, গড়িতেছে যাহা, তাহাই কল্যাণ-তনু। তাহা অন্তর-দানেরই একটা ডেলা, একটা সমষ্টি……।" অনেক কথার পর অরুণ লিখিয়াছে "মরিতেই সাধ যায়, সে মরণ নূতন রক্ত-মাংস লইয়া মানবের নব জন্ম। আমি ফিরিব; এই সাধই আমায় উদ্বুদ্ধ করে……আমায় ডাকিবেন কি?"

সবই ওলটপালট হইয়া গেল। সহধর্ম্মিণীর দিকে চাহিলাম, তাঁহার সবখানি নূতন মূর্ত্তি ধরিয়াছে আত্ম-নিবেদনের তপস্যায়। সেখানেও দেখিলাম এমন ফাঁক নাই, আর কিছু আশ্রয় পায়। অভাবপূর্ত্তির এক বিন্দু আকাঙ্ক্ষা নাই। এই পূর্ণাঙ্গ নারীমূর্ত্তির মধ্যে পরিপূর্ণ চৈতন্য যেন আমার মধ্য দিয়া যে ইচ্ছার প্রকাশ হয়, তাহা পূরণ করার জন্যই উদ্যতমুখী। নয়নে দীপ্তি, ওষ্ঠে হাসি, সর্ব্বাঙ্গে ঐক্য ও প্রেমের অমৃত হিল্লোলিত। অরুণের পত্র তাঁহার হাতে দিলাম, তিনি হাসিলেন। অরুণের

পুনরাগমনে মাতৃ-হৃদয়ের ইহা কি স্বভাব-তৃপ্তি? না তাহা নহে, এ নূতন দৃষ্টি সাফল্যের অপ্রাকৃত অভিব্যক্তি। সম্বন্ধের অমৃতরসায়ণ অরুণকেও বুঝি পান করাইয়াছে পাত্র ভরিয়া এই মহানারী? তাঁহার চক্ষের আলোকেই আরও কয় জনের সাক্ষাৎ পাইলাম। প্রেম ও ঐক্যের বন্ধনে ইহারা আমায় কেন্দ্র করিয়া নূতন স্থষ্টিরচনায় যে বহু দূর অগ্রসর হইয়াছে। হায় আমি! শ্রীঅরবিন্দ আমায় ফুরাইয়া দিতে পারিলে এ দায় হইতে যে মুক্ত হই।

শ্রীঅরবিন্দ অজাগ্রত ছিলেন না। তখন তাঁর অখণ্ড মহাহৃদয়ের অমৃতাস্বাদ আমায় অভিষিক্ত করিত। তিনি একাধারে ছিলেন কালী-কৃষ্ণেরই পূর্ণাঙ্গ বিগ্রহ। শ্রীঅরবিন্দেরও পত্র পাইলাম; তিনি লিখিলেন, "অরুণ পৌছিলে দীর্ঘ দিনের জন্য সস্ত্রীক চলিয়া আসিবে।" আমি আকুল চিত্তে অরুণের প্রত্যাগমনপ্রতীক্ষায় রহিলাম।

(ক্রমশঃ)

হেমন্ত অমার নিশীথে

শ্রীজ্যোতি বাচস্পতি

অমার নিশায়
ঘনায় আঁধার বাহিরে—
সীমাহীন পথে
চলে রাহী পথ বাহি' রে!
প্রান্তর শেষে
কালো অম্বর
চুমে ছায়াময়ী মহীরে।
অপরূপ লীলা—
দেখে তারামালা
স্তিমিত চক্ষে চাহি রে!
অন্ধ অমার
কাজল নিশায়
কোন্ লীলাময়ী হাসিছে নীরব হাসি
তড়িৎ চমকে
ধরণীর বুকে—
সুরে বেজে উঠে সুখ-দুঃখের বাঁশী—
পিছনে তাহার কৌতুকে ওঠে
অনাহত বীণা বাজি' রে।
হাসির আড়ালে হাস্যময়ীর
এ কী কৌতুক খেলা—
ক্ষীণ নরে লয়ে বিরাট শক্তি
গড়ে অপরূপ মেলা।
রাগে বিদ্বেষে হাসি কান্নায়
জমে ওঠে তার গান

শেষে একদিন অজানা অসীমে
শেষ হয় অভিযান
রূপের মাঝারে অরূপা প্রকৃতি
গাহে ভাষাহীন গীতি রে
বেজে উঠে তার মহা ঝঙ্কার
অন্ধ অমার তিমিরে।
অন্ধ আঁখিতে ফোটে তার রূপ
বধির কর্ণে বাজে তার বাণী—
অমার নিবিড় আকাশেতে যেন
তার গূঢ় কথা হয় কাণাকাণি।
হৃত জ্ঞান চরণেতে তার
স্তব্ধ দিবস শিশিরে
আঁধার আলোক বেদনা-পুলক
এক সাথে গেছে মিশি' রে

এই শ্যামারূপ রহস্যময়ীর
হিমের অমায় জেগে ওঠে প্রাণে
তারি লাস্যের বিরাট ছন্দ
মন্ত্রের মত বাজে এসে কাণে
সকল ছাড়িয়া যেতে চায় প্রাণ
মন আজ মনে নাহি রে
অরূপের সাথে রূপের মিলনে
মিশেছে ভিতরে বাহিরে।

অভিসারিকা

ডাঃ শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

মুঙ্গেরে সেবার শীতের প্রকোপটা কিছু বেশী। আসন্ন সন্ধ্যা। এরই মধ্যে সহরের বুকে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। নন্দীবাবু গায়ময় গরম কাপড় জড়াইয়া এক দ্বিতল বাটীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

বাড়ীর রোয়াকে বসিয়া একজন একমনে খৈনি মালিস করিতেছিল। নন্দীবাবু তাহাকেই উদ্দেশ করিয়া ভাঙ্গা হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাঈজীর কি এই বাড়ী ?"

লোকটি মুখ তুলিয়া চাহিল, পরিষ্কার বাংলায় কহিল, "এখানে ত অনেক বাঈজী বাবু, আপনি কাকে চান ?"

নন্দীবাবু বলিলেন, "ছায়াদেবী বলে' কেউ আছে ?"

লোকটি খৈনির উপর বার দুই চপেটাঘাত করিয়া অর্দ্ধমুষ্টিবদ্ধ বামহস্তের চেটোর উপর দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সঞ্চালন করিতে করিতে কহিল, "আছেন। কিন্তু এখন ত দেখা হবে না বাবু!"

—"কেন ?"

ওষ্ঠপুটে খৈনি পুরিয়া চাপা কণ্ঠে সে উত্তর করিল, "মা এখন সন্ধ্যা করচেন কিনা, তাই।"

—"সন্ধ্যা করছে কিরে ?" নন্দীবাবুর স্বরে বিস্ময়।

লোকটি কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে উপর হইতে নারী-কণ্ঠের ডাক আসিল, রত্না !

—"যাই মা" বলিয়াই লোকটি উঠিল এবং বলিল, "মার সাথে দেখা করবেন ত আসুন ; মার সন্ধ্যা হয়ে গেছে।"

সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে নন্দীবাবু প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, "তুমি ত পরিষ্কার বাংলা বল রতন !"

রতন হাসিয়া ফেলিল, কহিল, "তা' আর বল্‌ব না ; আমি যে বাঙ্গালী, বাবু!"

নন্দীবাবু মনে মনে লজ্জিত হইলেন। কহিলেন, "তাই নাকি ! এ বাড়ীতে বুঝি সবই বাঙ্গালী ?"

রত্না কহিল, "তা' হবে কেন বাবু, মা-ই একা বাঙ্গালী। মা এ দেশী নকর পছন্দ করেন না।"

নন্দীবাবু কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু বলা আর হইল না। ততক্ষণে তাহারা দ্বিতলে উঠিয়া আসিয়াছিল। সামনেই এক মহীয়সী নারী-মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া। ভ্রমর-কৃষ্ণ এলায়িত কেশদাম। পরিধানে তুষার-শুভ্র গরদের সাড়ী। কাণে হীরার দুল। হাতে সাধারণ কয়েকগাছি সোণার চুড়ী। চন্দনচর্চ্চিত ললাট ও কপোল। সৌম্য শান্ত মুখমণ্ডলে স্নিগ্ধ চাঁদিমার লাবণ্য। মূল্যবান্ গালিচায় মণ্ডিত মেজের উপর দামী কয়েকখানি কোচ। একখানি কোচে বসিয়া জনৈক সৌখীন ধনী তরুণ। এ বিলাস-কক্ষে এই পূজারিণী নারী-মূর্ত্তি যেন খাপ খাইতেছিল না। নন্দীবাবু বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না যে, এই নারীই সেই বাঈজী ছায়াদেবী। নির্ব্বাক্ নন্দীবাবু বিমূঢ়ের মত কক্ষের এক কোণে গিয়া দাঁড়াইয়া রত্নার মুখের দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকাইল।

রত্নাই প্রথম কথা কহিল। বলিল, "মাইজী, বাবুজী আপনাকে খুঁজছিলেন কি না, তাই সঙ্গে করে' নিয়ে এসেছি।"

ছায়াদেবী করযোড়ে নমস্কার জানাইয়া নন্দীবাবুকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। বলিলেন, "আপনার কি প্রয়োজন বলুন তো ?"

নন্দীবাবু এমন অবস্থায় কোন দিন পড়েন নাই। কেমন যেন জড়সড় হইয়া গেলেন। আড়ষ্ট গলা বার দুই কাশিয়া পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, "গোঁসাইজী আমাকে পাঠিয়েছেন। রাধামাধবজীর মন্দিরে আপনাকে কীর্ত্তন গাইতে হইবে।"

"গোঁসাইজী—রাধামাধবজী !"

ছায়াদেবী বার তিনেক কথাটা স্বগতঃই উচ্চারণ করিলেন। বাঈজী যেন এ কথা বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। ছায়াদেবীর ইতস্ততঃ ভাব দেখিয়া নন্দীবাবু বলিলেন, "রামগোপাল প্রভু আপনাকে জানাতে বলেছেন, আপনার যথাযোগ্য প্রাপ্য কড়া-গণ্ডাই কীর্ত্তন-শেষে পাবেন।"

শান্ত কণ্ঠে ছায়াদেবী উত্তর করিল, "কবে, কোন্ সময় কীর্ত্তন গাইতে হবে ?"

—"আগামী কাল ঝুলন-পূর্ণিমা। মন্দিরে অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন হবে। ভোর থেকে ললিতমাধব কীর্ত্তনীয়া 'গোষ্ঠ'

আরম্ভ করবে, আটটা থেকে আপনার 'নৌকাখণ্ড', তারপর আবার সন্ধ্যায় আপনার 'মানভঞ্জন' গাইতে হবে" : নন্দীবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আবার বলিলেন : "আপনার কথা পেলেই উঠি, অনেক জায়গায় আমাকে আবার যেতে হবে।"

ভক্তিগদগদ্‌কণ্ঠে বাঈজি প্রত্যুত্তর করিল, "প্রভুকে বলবেন, আমি নিশ্চয়ই যাব। তাঁর এ কৃপার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।"

—"প্রভু আপনার কীর্ত্তন খুব পছন্দ করেন" বলিয়াই নন্দীবাবু উঠিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে জনৈক তরুণ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "ছায়া, ভদ্রলোকের সঙ্গে অনর্থক কেন এতক্ষণ তামাসা করলে? যাই বল, এটা তোমার উচিত হয়নি।"

—"কি উচিত হয়নি?" ছায়াদেবীর দৃঢ় কণ্ঠস্বর।

—"কেন, কাল তো সারাদিন আমার বাগান-বাড়ীর মজলিসে তোমায় থাকতে হবে। অনেক সম্ভ্রান্ত লোক নিমন্ত্রিত হয়েছে। তোমার অভাবে সব আমোদটাই মাটি হবে, এটা বুঝ্‌ছো না?"

—"সব বুঝ্‌ছি। লক্ষ্মী, এবারটা আমায় মাপ কর। এমন সৌভাগ্য এ বাঈজীর জীবনে এই-ই প্রথম আর শেষ।" ছায়ার সুরে মিনতি।

যুবকটি মাটিতে জুতো ঠুকিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, "আলবৎ, তোমায় যেতেই হবে—তা' যত টাকাই লাগুক।"

—"টাকায় কি মানুষের মন পাওয়া যায়? তোমাদের ধড়ে এইটুকু বিচার-বিবেচনা নেই!" : অতিশয় স্নিগ্ধ কণ্ঠে ছায়াদেবী বলিয়া চলিল : "জেনো, ছায়া টাকার লোভী নয়। এই নরক থেকে মুক্তি পেলে, সে ভিক্ষাও শ্রেয়ঃ মনে করে।"

যুবকটি আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "তোমায় যেতেই হবে, আমি অপমানিত হতে পারবো না।"

নিরুত্তর ছায়া পাশের ঘরে প্রবেশ করিল এবং একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "এই নাও তোমার বায়নার টাকা" : সম্মুখের টি-পয়ের উপর এক তাড়া নোট রাখিয়া ছায়া আদেশের সুরে বলিল : "তুমি এখনই এ স্থান ত্যাগ কর বল্‌ছি। এতদিন এ দেহটাকে নিয়ে উন্মত্ত হয়েছ, এবার আর ছায়ার ছায়াও নাগাল পাবে না বলে' দিচ্ছি।"

—"আচ্ছা, এ অপমানের নিষ্ঠুর প্রতিশোধ......" দাঁত কড়্‌মড়্‌ করিতে করিতে ও ক্রোধান্ধ পাশবিক পদবিক্ষেপে যুবকটি সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া গেল।

আশ্চর্য্য, যেন কিছুই হয় নাই—কোন ঘটনাই ঘটে নাই, এমনি সহজভাবে ছায়াদেবী তার পূজার ঘরে প্রবেশ করিল। রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহের সম্মুখে গললগ্নাঞ্চল হইয়া সে ভূনত প্রণাম করিল। তার স্মরণের পথে বার বার কেবলই উদিত হইতে লাগিল, রামগোপাল প্রভু আর রাধামাধবজী! কতদিন সে রাধামাধবজীকে দূর হইতে দেখিয়া ভাববিহ্বল হইয়াছে, ইচ্ছা হইয়াছে উচ্চৈঃস্বরে ঠাকুরের স্তুতি-বন্দনা করে, কিন্তু তাহা আর হইয়া উঠে নাই। এতদিনের অপূর্ণ সাধ আজ পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। ছায়াদেবী ভাবে, সত্যই আজ তার শুভদিন। বাঈজী-জীবনে তার সঙ্গীত-শিক্ষা সার্থক হইয়াছে। সার্থক—সত্যই আজ সে সার্থক! ছায়ার মনে হইল, সে যেন হাল্‌কা বোধ করিতেছে। অন্তরের দীর্ঘ সঞ্চিত আবর্জ্জনায় যেন আগুন ধরিয়াছে। সেই আলোকে তার সমস্ত অবচেতনা যেন দীপ্ত হইয়া উঠিল। ছায়া লক্ষ্য করিল, তার আরাধ্য দেবতা রাধাকৃষ্ণের মুখে হাসি। এমনটি সে আর কোনও দিন দেখে নাই। বাঈজী ছায়ার অন্তরের মণিকোঠায় যেন অকস্মাৎ প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল। ছায়ার অনুভবে জাগিল ঠাকুর যেন তাকে কৃপা করিয়াছেন। এমন স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দ ছায়ার জীবনে এই প্রথম। আনন্দে ছায়ার মরিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল। মনে পড়িল তার সেই অনাঘ্রাত কুমারীজীবন। পুরুষের প্রলোভন তাকে জীবনের সৌরভে বঞ্চিত করিয়াছে। এমন কত কি......

ছায়া প্রাণ ভরিয়া সন্ধ্যারতি করিল। পঞ্চোপচারে ইষ্টদেবতার ভোগ লাগাইল। প্রসাদ পাইয়া ছায়া শয্যা-গ্রহণ করিল। এমন শয্যাসুখ ছায়া ইতিপূর্ব্বে উপভোগ করে নাই। ছায়ার অন্তর উপচিয়া কেবলই কীর্ত্তনের সেই প্রিয় কলিটি নিঃশব্দে ধ্বনিত হইতে লাগিল : 'অমিয়-সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল।'

তন্দ্রায় নিদ্রায় ছায়ার অন্তর-কীর্ত্তন চলিয়াছে। নামের অপূর্ব্ব মহিমা! ভাববিহ্বলা ছায়ার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নৃত্য জুড়িয়া দিয়াছে। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়াই ছায়া বিরহ-বিচ্ছেদ-কাতর রাধা ও কৃষ্ণের মিলন ঘটাইতেছে। অপূর্ব্ব যুগলমিলন! বিগ্রহের ওষ্ঠপুটে অমরার হাসি আর চোখে স্বর্গের দীপ্তি। সেই দীপ্তির আলো-পথ ধরিয়া ছায়া যেন পারাপারহীন অমিয়সাগর-তটে উপনীত হইয়াছে। তারপর সিনান করিতে করিতে ছায়া যেন অমৃতের অতলে তলাইয়া গেল।

ভোরের মধু-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। ছায়া ধড়মড় করিয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিল। ভাবিল, বুঝিবা বেলা হইয়া গিয়াছে। আটটায় রাধামাধবজীর মন্দিরে তার কীর্ত্তন। প্রথমেই সে পাশের ফ্লাটের লছমী বাঈজীকে প্রস্তুত হইবার জন্য সতর্ক করিয়া দিল। লছমী হাসিয়া তামাসা করিয়া কহিল, "কি দিদি, এত উৎকণ্ঠিতা কেন? কত রাজ-রাজড়ার আসরে নেচে-গেয়ে এলি আর চুণো পুঁটি দেখে এত ভয়?"

ছায়া জিভ কাটিয়া বলিল, "ছিঃ, ও কথা মুখে আনাও পাপ। মানুষ আর দেবতা!"

ছায়াদেবী আর বিলম্ব করিল না। তাড়াতাড়ি কোন রকমে স্নান-পূজা সারিয়া তার দলবলসহ রওনা হইল। দেব-মন্দিরে পূজারিণী যেন তন্ময় হইয়া পূজা দিতে চলিয়াছে। ছায়ার সমগ্র চেতনা আজ রাধামাধবজীর ধ্যানে মগ্ন।

অলিগলি ঘুরিয়া চকবাজার হইয়া অতি সন্তর্পণ পদ-বিক্ষেপে ছায়াদেবী শ্রীশ্রীরাধামাধবজীর মন্দিরে উপনীত হইল। সিংহদ্বার দিয়া সদলবলে সে বিগ্রহের উদ্দেশ্যে ভূনত প্রণাম করিয়া নাটমন্দিরে উপবেশন করিল। উপস্থিত সকলের সাগ্রহ কৌতুহলী দৃষ্টি এক সঙ্গে বাঈজীর উপর গিয়া পড়িল। বাঈজীর কীর্ত্তনশ্রবণের জন্য সকলেই ব্যাকুল প্রতীক্ষমাণ। কেহ বা বাঈজীর কীর্ত্তন সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছে, আবার কেহ বা তাহার রূপ-যৌবন সতৃষ্ণ নয়নে অবলেহন করিতেছে। বিগ্রহের সেবাইত রামগোপাল প্রভু মন্দির-দ্বারে নয়ন মুদিয়া পদ্মাসনে বসিয়া আছেন।

ললিতমাধবের গোষ্ঠ ভাঙ্গিল। এইবার বাঈজী কীর্ত্তন সুরু করিল। বীণাবিনিন্দিত ভাবগদগদ্ কণ্ঠ। বিপুল শ্রোতৃবর্গের চাপা গুঞ্জন-ধ্বনি থামিয়া গেল। ছুঁচের পতন-শব্দ শ্রুত হয়, সারা আব্‌হাওয়ায় এমন একটা গভীর নীরবতা বিরাজ করিতেছে। পলে পলে ঘণ্টা কাটিয়া গেল। সুর-ছন্দ-তান-লয়ের সংযোগে কৃষ্ণ নাম-মহামন্ত্র যেন সম্মোহন সৃষ্টি করিল। বাঈজী সত্যই বাহ্যজ্ঞানশূন্যা। দেহ-ভঙ্গিমায় ছন্দের হিল্লোল। কীর্ত্তনীয়া অদৃশ্য হইয়াছে—শুধু যেন একটা সুরের কম্পন। বিশ্বছন্দঃ যেন আজ ছায়াকে আশ্রয় করিয়া হিল্লোলিত। কায়াহীন ছায়ার সুর সকলেরই অনুভূতির তারে অপার্থিব ঝঙ্কার তুলিয়াছে। রাধামাধবজীর পাষাণবিগ্রহে যেন আজ প্রাণসঞ্চার হইয়াছে। ঠাকুর যেন হাসিতেছেন—নড়িতেছেন। সকলেরই ভাববিহ্বল অবস্থা। এমনি সময়ে চোখের নিমেষে অঘটন ঘটিয়া গেল।

ভূমিকম্প····· প্রলয়কাণ্ড!

এক—দুই—তিনবার প্রবল ঝাঁকুনি। ধরিত্রী যেন ভাঙ্গিয়া চুরমার হইল। পাঁচ মিনিটে মুঙ্গের সহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইল।

ঠাকুর-মন্দিরের চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সিংহদ্বার ধূলিসাৎ। নাটমন্দির সহস্র কঙ্কাল বাহির করিয়া শ্মশানের বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়াছে। অপরাহ্নে যখন ধ্বংসস্তূপ সরাইয়া বিগ্রহের অনুসন্ধান করা হইল, তখন দেখা গেল—কাঠের কড়ি-বরগা-ইষ্টকপিষ্ট বাঈজির দেহ। ছায়ার শুষ্ক কণ্ঠে তখনও অজপা ধ্বনিত হইয়া চলিয়াছে 'দেহি পদ-পল্লবমুদারম্।' ছায়ার হৃতশ্রী বিকৃত তনু শ্মশান-সমাধি হইতে মুক্ত করা হইল। হইল, কিন্তু প্রাণপাখী দেহ-পিঞ্জর হইতে উড়িয়া গেল। বাঈজির শেষ নিঃশ্বাস ক্ষীণ—অতি ক্ষীণ ধ্বনি করিল 'দেহি পদ···'

চিদাকাশে নিঃশব্দ প্রতিধ্বনি বলিল 'পল্লবমুদা—র—ম্।'

রবীন্দ্র-দীপিকা

শ্রীধীরেন্দ্রমোহন মজুমদার

জন্ম—বাংলা ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ, ইংরেজী ১৮৬১ সালের ৭ই মে, সোমবার রাত্রি ২টা হইতে ৩টার মধ্যে ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনস্থ গৃহে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম হয়। পিতা—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাতা—সারদা দেবী। রবীন্দ্রনাথ পিতার চতুর্দ্দশতম সন্তান। রবীন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত জীবন-পরিচয় (ইংরাজী সনানুসারে) নিম্নে দেওয়া হইল।

১৮৭৩—ফেব্রুয়ারী, কবির বয়স, ১১ বৎসর নয় মাস, মাঘোৎসব উপলক্ষে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'শঙ্কর শিব সঙ্কটহারী' ও বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়ের 'জয় জগজ্জীবন জগৎপাতা হে' গাহিয়া খ্যাতি লাভ করেন। এই বৎসরে তাঁর উপনয়ন ক্রিয়াও সম্পন্ন হয়।

১৮৭৪—সেণ্ট জেভিয়াস কলেজে ভর্ত্তি হন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ছদ্মনামে 'অভিলাষ' কবিতা প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রকাশিত কবিতা।

১৮৭৫—৮ই মার্চ্চ কবির বয়স ১৩ বৎসর দশ মাস—মাতৃবিয়োগ। ২৫শে ফেব্রুয়ারী—তৎকালীন সাপ্তাহিক অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রথম স্বনামে কবিতা প্রকাশ। ১১ই ফেব্রুয়ারী কবিতাটি রচিত ও হিন্দুমেলা উৎসবে গীত হইয়াছিল।

১৮৭৬—কৃষ্ণদাস সম্পাদিত মাসিক জ্ঞানাঙ্কুরে 'বনফুল' প্রকাশিত হয়—৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকায় বহু কবিতা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 'ভানুসিংহের পদাবলী'র সূচনা। বঙ্কিম ও মধুসূদনের কাব্য-সমালোচনা।

১৮৭৭—১৬ বৎসর বয়সে অলীকবাবুর ভূমিকা অভিনয়।

১৮৭৮—২০শে সেপ্টেম্বর ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত কবির বিলাত যাত্রা, এই সময় 'কবি কাহিনী' প্রকাশিত হয়। বিলাত প্রবাসকালে 'ভগ্নতরী' রচনা, ভারতীতে 'ইউরোপ প্রবাসীর পত্র' প্রকাশিত হয়।

১৮৭৯—বিলাত প্রবাস।

১৮৮০—ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন। 'বাল্মীকি প্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া' প্রণয়ন।

১৮৮১—মে মাসে, মেডিকেল কলেজ হলে প্রথম প্রকাশ্য বক্তৃতা। বক্তৃতার বিষয়—সঙ্গীত। বাল্মীকি প্রতিভা, ভগ্নহৃদয়, ইউরোপ প্রবাসীর পত্র প্রকাশিত হয়। বিলাত যাত্রা, মাদ্রাজ হইতে ফিরিয়া আসেন।

১৮৮২—'সন্ধ্যা-সঙ্গীত' ও 'কাল মৃগয়া' প্রকাশ কলিকাতার ১০নং সদর রোড, চৌরঙ্গী ভবনে কবির অপূর্ব্ব অধ্যাত্মপ্রেরণা লাভ। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' রচনা। এখানে থাকিয়া 'বৌঠাকুরাণীর হাট' রচনা।

১৮৮৩—প্রভাত-সঙ্গীত ও বিবিধ প্রসঙ্গ ও বৌঠাকুরাণীর হাট প্রকাশ, ৯ই ডিসেম্বর—কবি ২২ বৎসর বয়সে যশোহরের ৺বেণী রায় চৌধুরীর কন্যা মৃণালিনী দেবীকে বিবাহ করেন।

১৮৮৪—আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক নিযুক্ত হন। ছবি ও গান, প্রকৃতির প্রতিশোধ, নলিনী; শৈশব-সঙ্গীত, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী প্রকাশিত হয়।

১৮৮৫—'বালক' পত্রিকার ভার গ্রহণ। রামমোহন রায় ও 'রবি ছায়া' প্রকাশিত হয়।

১৮৮৬—অক্টোবর, কন্যা মাধুরীলতার জন্ম। 'কড়ি ও কোমল' প্রকাশিত হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে কবি কর্ত্তৃক উদ্বোধন সঙ্গীত রচিত ও গীত হয়।

১৮৮৭—'চিঠি পত্র' ও রাজর্ষি প্রকাশিত হয়।

১৮৮৮—২৭শে নভেম্বর, জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথের জন্ম। সমালোচনা ও মায়ার খেলা প্রকাশিত হয়।

১৮৮৯—'রাজা ও রাণী' নাটক প্রকাশ। সাজাহানপুর যাত্রা করেন, এখানে বিসর্জ্জন রচিত হয়।

১৮৯০—কবির শান্তিনিকেতনে অবস্থান, 'মেঘদূত' কবিতা রচনা। ৩১শে জানুয়ারী দ্বিতীয় কন্যা রেণুকার জন্ম। ২২শে আগষ্ট—বন্ধু লোকেন পালিত ও সত্যেন্দ্রনাথের সহিত বিলাত যাত্রা। ইউরোপ হইতে ৪ঠা নভেম্বর ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন। জমিদারী সংক্রান্ত কাজে শিলাইদহে অবস্থান। 'বিসর্জ্জন', 'মন্ত্রী অভিষেক' ও 'মানসী' প্রকাশ।

১৮৯১—'সাধনা' পত্রিকায় 'ইউরোপ যাত্রীর ডায়েরী' প্রকাশ।

১৮৯২—১২ই জানুয়ারী, কনিষ্ঠা কন্যা মীরার জন্ম। 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'গোড়ায় গলদ' প্রকাশ।

১৮৯৩—'গানের বহি ও বাল্মিকী প্রতিভা' ও 'ইউরোপ যাত্রীর ডায়েরী, দ্বিতীয় খণ্ড' প্রকাশ। চৈতন্য লাইব্রেরী হলে 'ইংরেজ ও ভারতবর্ষ' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ। বঙ্কিমচন্দ্র সভাপতিত্ব করেন। সাধনার যুগ কবির তীব্র স্বদেশপ্রেমের যুগ।

১৮৯৪—৮ই এপ্রিল, বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হয়। চৈতন্য লাইব্রেরীতে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ। সাধনার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ। নভেম্বর মাসে কনিষ্ঠ পুত্র সমীন্দ্রনাথের জন্ম। 'সোনার তরী', 'ছোট গল্প', 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'বিদায় অভিশাপ' প্রকাশ।

১৮৯৫—সাধনার প্রকাশ বন্ধ। বিচিত্র গল্প, কথা চতুষ্টয় ও গল্পদশক প্রকাশ। সুরেন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথের সহিত স্বদেশী ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ।

১৮৯৬—ঠাকুর ষ্টেটের পার্টিশান উপলক্ষে উড়িষ্যায় গমন। পদ্মাবক্ষে কবির অবস্থিতি—নদী, চিত্রা, কাব্য গ্রন্থাবলী, মালিনী ও চৈতালী প্রকাশ।

১৮৯৭—নাটোর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সে কবির যোগদান। ভারতীর সম্পাদনাভার গ্রহণ। বৈকুণ্ঠের খাতা প্রকাশিত হয়।

১৮৯৮—তিলক ভাণ্ডারের জন্ম চেষ্টা, টাউন হলে সিডিসন বিলের বিরুদ্ধে বক্তৃতা। পঞ্চভূত প্রকাশ।

১৮৯৯—১১ই অক্টোবর, বুয়োর, যুদ্ধ বৃটিশ সাম্রাজ্যের ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে কবিতা প্রকাশ। কণিকা প্রকাশিত হয়।

১৯০০—বলেন্দ্রনাথের মৃত্যু। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতার সহিত কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর পুত্র শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বিবাহ। কথা, কাহিনী, কল্পনা ও ক্ষণিকা প্রকাশ।

১৯০১—বঙ্গদর্শন নবপর্য্যায়ের সম্পাদনাভার গ্রহণ, ২২শে ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা, নৈবেদ্য প্রকাশ।

১৯০২—লর্ড কার্জ্জনের অপমানকর উক্তির উত্তরে কবি 'অত্যুক্তি' নামক প্রবন্ধ লিখিয়া উত্তর দেন। সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের সহিত মধ্যমা কন্যা রেণুকার বিবাহ, ২৩শে নবেম্বর কবির পত্নী বিয়োগ হয়। পত্নীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে 'স্মরণ' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ।

১৯০৩—মে মাস কন্যা রেণুকার মৃত্যু। বঙ্গদর্শন পত্রিকায় নৌকাডুবির ধারাবাহিক প্রকাশ।

১৯০৪—১লা ফেব্রুয়ারী, সতীশচন্দ্র রায়ের মৃত্যু, মোহিতচন্দ্র সেন রবীন্দ্রনাথের সহিত যোগদান করেন। মোহিতচন্দ্র কবির কাব্যগ্রন্থ সম্পাদন আরম্ভ করেন। চৈতন্য লাইব্রেরী হলে বিখ্যাত 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধ পাঠ। 'শিবাজী উৎসব' কবিতা রচনা।

১৯০৫—১৯শে জানুয়ারী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৮৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। 'পার্টিসন অফ বেঙ্গল'-এর বিরুদ্ধে কবির টাউন হলে প্রবন্ধ পাঠ। রাখি-বন্ধন অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন ও বিখ্যাত কবিতা 'বাঙ্গলার মাটি বাঙ্গলার জল' রচনা।

১৯০৬—১৫ই আগষ্ট, জাতীয় শিক্ষা পরিষদ স্থাপনা, ওভারটুন হলে শিক্ষা সমস্যা নামক প্রবন্ধ পাঠ; আত্মশক্তি, ভারতবর্ষ, খেয়া, নৌকাডুবি প্রকাশিত। বঙ্গদর্শনের সম্পাদকত্ব ত্যাগ।

১৯০৭—বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম সভাপতি নির্ব্বাচিত। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত কনিষ্ঠা কন্যা মীরার বিবাহ। 'অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার' নামক বিখ্যাত কবিতা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। কনিষ্ঠ পুত্র সমীন্দ্রনাথের মৃত্যু। বিচিত্র প্রবন্ধ, চরিত্র পূজা, প্রাচীন সাহিত্য, লোক-সাহিত্য, সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য, হাস্যকৌতুক, ব্যঙ্গকৌতুক প্রকাশ।

১৯০৮—চৈতন্য লাইব্রেরীতে 'পথ ও পাথেয়' নামক প্রবন্ধ পাঠ। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ, প্রহসন, বৈকুণ্ঠের খাতা, গোড়ায় গলদ রাজা-প্রজা, সমূহ, স্বদেশ, সমাজ, শারদোৎসব, শিক্ষা, মুকুট প্রকাশ।

১৯০৯—রথীন্দ্রনাথের আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমন, কবির কলিকাতায় উপস্থিতি। শব্দতত্ত্ব, ধর্ম্ম, শান্তিনিকেতন, প্রায়শ্চিত্ত, [illegible]কা প্রকাশ। রথীন্দ্রনাথের বিবাহ।

১৯১০—রাজা, গোরা ও গীতাঞ্জলি প্রকাশ।

১৯১১—৭ই মে রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে উৎসব। অজিত চক্রবর্ত্তী সমগ্র রবীন্দ্র কাব্য আলোচনা করিয়া 'রবীন্দ্রনাথ' নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। শান্তি-নিকেতন গ্রন্থের ১২শ ও ১৩শ ভাগ প্রকাশ, প্রবাসীতে জীবন-স্মৃতি প্রকাশ আরম্ভ।

১৯১২—কবির পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কর্ত্তৃক অভিনন্দন। ২৭শে মে রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী সহ কবির তৃতীয়বার ইউরোপ যাত্রা। ১৬ই জুন ইংলণ্ডে শিল্পী রোটেনষ্টাইনের সহিত সাক্ষাৎ, ১০ই জুলাই ইয়েট্‌সএর উদ্যোগে ট্রেকাডোরা হোটেলে কবি-সম্বর্দ্ধনা। কবি ২৭শে অক্টোবর লণ্ডন হইতে নিউ ইয়র্কে পৌছেন। অক্টোবর মাসে ইণ্ডিয়া সোসাইটি কর্ত্তৃক গীতাঞ্জলির ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশ। ডাকঘর, জীবনস্মৃতি, ছিন্নপত্র, অচলায়তন, গল্প চারিটি প্রকাশ।

১৯১৩—জানুয়ারী, সিকাগো গমন। সিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা। ২৯শে রচেষ্টার গমন। ১৪ই ফেব্রুয়ারী হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা। এপ্রিল মাসে লণ্ডন প্রত্যাবর্ত্তন। জুন মাসে ক্যাক্সটন হলে বক্তৃতা। এই মাসের শেষভাগে রবীন্দ্রনাথের অস্ত্রোপচার। ৪ঠা সেপ্টেম্বর স্বদেশ যাত্রা। গার্ডনার, ক্রিসেণ্টমুন, চিত্রা, দি পোষ্ট অফিস, কবিরস পোয়েমস্ অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশ। ১৩ই নবেম্বর সুইডিস একাডেমী কবিকে নোবেল প্রাইজ পুরস্কার দানের ঘোষণা করেন। এসিয়ার মধ্যে তিনি সর্ব্বপ্রথম এই সম্মান লাভ করেন। ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কবিকে ডি. লিট্ উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৯১৪—প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় সবুজপত্র প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যায় সবুজের অভিযান কবিতা ও বিবেচনা ও অবিবেচনা প্রবন্ধ প্রকাশ। উৎসর্গ, গীতিমাল্য, গীতালি প্রকাশ।

১৯১৫—১৭ই ফেব্রুয়ারী, গান্ধীজী সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে আসেন। ২০শে মার্চ্চ কবি কর্ত্তৃক লর্ড কারমাইকেলকে অভ্যর্থনা। কাব্যগ্রন্থ, গল্প সপ্তক ও শান্তিনিকেতন, ১৪—১৬শ অধ্যায় প্রকাশ। ৩রা জুন স্যার উপাধি পান।

১৯১৬—৩রা মে, কবির পিয়ার্সন, এণ্ড্রুজ ও মুকুল দের সহিত জাপান যাত্রা। ২৯শে মে জাপান পৌছেন। সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকা যাত্রা। ফাল্গুনী, চতুরঙ্গ, ঘরে বাইরে, বলাকা, পরিচয়, সঞ্চয় প্রকাশ।

১৯১৭—বেসান্টের সাভনেত্রীত্বে কবি 'ভারতের প্রার্থনা' আবৃত্তি করেন। এ্যানি বেসান্টের ন্যাশন্যাল ইউনিভার্সিটির চ্যান্সেলার হন। 'কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম' নামক বক্তৃতা প্রকাশ।

১৯১৮—১৬ই মে, জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলার মৃত্যু। ২২শে ডিসেম্বর বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ। পলাতকা প্রকাশ।

১৯১৯—৩০মে জালিয়ানাওয়ালাবাগের অনাচারের প্রতিবাদে স্যার উপাধি ত্যাগ। ৩রা জুলাই শান্তিনিকেতনে বিদ্যাভবন প্রতিষ্ঠা। জাপান যাত্রী প্রকাশ।

১৯২০—২রা এপ্রিল, গান্ধীজীর আমন্ত্রণে গুজরাট সাহিত্য পরিষদে কবি কর্তৃক অভিভাষণ পাঠ। ১১ই মে বিলাত যাত্রা। ৬ই আগষ্ট প্যারিস নগরে গমন। ১৯শে সেপ্টেম্বর রটারডামে পৌঁছেন। বেলজিয়াম গমন। ২৮শে অক্টোবর আমেরিকায় যান। অরূপ রতন প্রকাশিত হয়।

১৯২১—মার্চ্চ, ইউরোপে প্রত্যাবর্ত্তন। ফ্রান্স, ষ্ট্রাসবুর্গ, জেনেভা, জার্ম্মাণী, হামবুর্গ, সুইডেন, মিউনিক, ভিয়েনা, প্রাগ প্রভৃতি নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা। শিক্ষার মিলন ও ঋণশোধ প্রকাশিত হয়। ১৬ই জুলাই বোম্বাই পৌঁছেন। ৪ঠা সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক কবি-সম্বর্দ্ধনা।

১৯২২—সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বোম্বাই, মাদ্রাজ ও ছলের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ ও বক্তৃতা। শিশু ভোলানাথ, মুক্তধারা ও লিপিকা প্রকাশিত হয়।

১৯২৩—এপ্রিল, বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি প্রকাশিত হয়। বসন্ত গীতিনাট্য প্রকাশ।

১৯২৪—চীন যাত্রা, চীনে কবির জন্মোৎসব অনুষ্ঠান। চীন হইতে জাপান যাত্রা। আমেরিকার স্বাধীনতার শত-বার্ষিকী উপলক্ষে কবি আমন্ত্রিত হন।

১৯২৫—ইতালী গমন ও বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা। ১৯শে ডিসেম্বর ফিলজফিক্যাল কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন। পূরবী, গৃহপ্রবেশ ও প্রবাহিনী প্রকাশিত।

১৯২৬—৩১শে মে রোমে মুসোলিনীর সহিত সাক্ষাৎ ও বিপুল সম্বর্দ্ধনা। আগষ্ট মাসে লর্ড সিংহের সহিত নরওয়ে যাত্রা। ষ্টকহলম্, কোপেনহেগেন প্রভৃতি স্থান হইতে জার্ম্মাণী গমন। হিণ্ডেনবুর্গের সহিত কবির সাক্ষাৎ। বল্কান ভ্রমণ শেষ করিয়া মিশরের পথে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন। রক্তকরবী, শোধবোধ, লিখন প্রকাশিত হয়।

১৯২৭—মার্চ্চ মাসের শেষে ভরতপুরের রাজার আমন্ত্রণে হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন। ৪ঠা মে কবি কর্তৃক প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের মন্দিরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা। জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর জাভা, সুমাত্রা, বলী, মালাক্কা ভ্রমণ।

১৯২৮—কবি হিবার্ট লেক্‌চারার মনোনীত হন। শ্রীঅরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎকার। ঋতুরঙ্গ অভিনয়। শেষরক্ষা প্রকাশিত।

১৯২৯—কানাডার National Council of Educationএর আহ্বানে কানাডা যাত্রা। জাপান ও ইণ্ডো-চায়না হইয়া ৫ই জুলাই কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত। পরিত্রাণ, যাত্রী, যোগাযোগ, শেষের কবিতা, মহুয়া ও তপতী প্রকাশিত হয়।

১৯৩০—২রা মার্চ্চ একাদশবার বিদেশ যাত্রা। প্যারিসে কবির চিত্র প্রদর্শনী। অক্সফোর্ডে হিবার্ট লেক্‌চার দান। ১১ই জুলাই বার্লিন গমন। ডেনমার্ক যাত্রা, কোপেনহেগেনে কবির চিত্র প্রদর্শনী। ১১ই সেপ্টেম্বর মস্কো গমন। ভানুসিংহের পত্রাবলী প্রকাশ।

১৯৩১—কবির ৭০ বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে জয়ন্তী উৎসব। টাউনহল ও ময়দানে হিজলী হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে কবির তীব্র প্রতিবাদ। রাশিয়ার চিঠি, বনবাণী, সঞ্চয়িতা প্রকাশ।

১৯৩২—বিমান পথে পারস্য ও ইরাক ভ্রমণ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রামতনু অধ্যাপক' নিযুক্ত। ১৯৩২—৩৩ সালের জন্য কমলা লেক্‌চারার নিযুক্ত। প্রফুল্ল জয়ন্তী উৎসবে সভাপতি। পরিশেষ, পুনশ্চ ও কালের যাত্রা প্রকাশ।

১৯৩৩—রামমোহন শতবার্ষিকীতে কবির পৌরোহিত্য। দুই বোন, বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ, শিক্ষার বিকীরণ, তাসের দেশ, চণ্ডালিকা, মানুষের ধর্ম্ম (কমলা লেক্‌চার), বাঁশরী ও বিচিত্রা প্রকাশিত হয়।

১৯৩৪—৬ই মে সিলোন যাত্রা, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের মন্টেসরি স্কুলের উদ্বোধন। টাউন হলে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধন। মালঞ্চ ও চার অধ্যায় প্রকাশিত হয়।

১৯৩৫—মাদ্রাজে কবির সম্বর্দ্ধনা। স্যার জন এ্যাণ্ডারসনের শান্তিনিকেতন গমন। শান্তিনিকেতনে ৭৫তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠান। ১৫ই জুলাই বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে টাউন হলে সভাপতিত্ব। ২১শে জুলাই দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু। শেষ সপ্তক, বীথিকা, সুর ও সঙ্গতি প্রকাশ।

১৯৩৬—২১শে জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কবিকে ডি, লিট্ উপাধি প্রদান। ২৫শে এপ্রিল পৌত্রী নন্দিতা গাঙ্গুলীর সহিত কৃষ্ণ কৃপালিনীর বিবাহ। পত্রপুট, নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা, শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ, ছন্দ, জাপানে পারস্যে, সাহিত্যের পথে, প্রান্তনী প্রকাশিত।

১৯৩৭—২৬শে ফেব্রুয়ারী চন্দননগরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের বিংশতিতম অধিবেশনের উদ্বোধন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্ব-প্রথম বাংলা ভাষায় কন্‌ভোকেশন বক্তৃতা। ১০ই সেপ্টেম্বর কবি বিসর্প রোগে আক্রান্ত ও আরোগ্যলাভ। খাপছাড়া, কালান্তর, সে, বিশ্ব-পরিচয় ও ছড়া ছবি প্রকাশিত হয়।

১৯৩৮—কবি কর্তৃক বাঙ্গলার রাজবন্দীদের মুক্তির দাবী। ২রা সেপ্টেম্বর জাপানের প্রসিদ্ধ কবি নোগুচির পত্রের উত্তরে জাপানের পররাজ্য লিপ্সার নিন্দা। ১লা মার্চ্চ ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কবিকে ডি-লিট্ উপাধি প্রদান, পথ ও পথের প্রান্তে, সেঁজুতি, বাঙ্গলা ভাষা পরিচয়, প্রহাসিনী প্রকাশ।

১৯৩৯—৮ই আগষ্ট চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে 'মহাজাতি সদনে'র ভিত্তি প্রতিষ্ঠা। মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর স্মৃতি-মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন। চণ্ডালিকা, আকাশ প্রদীপ, শ্যামা, পথের সঞ্চয়, রবীন্দ্র রচনাবলীর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। জহরলাল কর্তৃক হিন্দি ভবন প্রতিষ্ঠা।

১৯৪০—গান্ধী রবীন্দ্র সাক্ষাৎকার। শান্তিনিকেতনে কবির ৮০তম জন্মোৎসব। ৭ই আগষ্ট অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি-রূপে স্যার মরিস গাওয়ার, রাধাকৃষ্ণন্ ও বিচারপতি হেণ্ডারসন কবিকে ডি-লিট্ উপাধিতে ভূষিত করেন। কবির জন্মোৎসব উপলক্ষে চীনের রাষ্ট্রনায়ক মার্শাল চিয়াং কাইসেকের অভিনন্দন প্রেরণ। নবজাতক, সানাই, চিত্রলিপি, ছেলেবেলা, তিন সঙ্গী, রোগশয্যায় প্রকাশিত হয়।

১৯৪১—১৪ই এপ্রিল (১লা বৈশাখ) কবির একাশীতি জন্মোৎসব উপলক্ষে 'সভ্যতার সঙ্কট' শীর্ষক বাণী। ২৫শে বৈশাখ ১৩৪৮ সালে কবির একাশী বৎসর পূর্ণ হয় (ইং ৮ই মে ১৯৪১)। মিস্ র‍্যাথবোর্ণের পত্রের উত্তরে কবির উদ্দীপনাময়ী বিবৃতি দান, আরোগ্য, জন্মদিনে, সভ্যতার সঙ্কট, গল্প-স্বল্প প্রকাশিত হয়। প্রায় দেড় মাস মুত্রাশয়ে ভুগিয়া গত ২৫শে জুলাই কবি চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আসেন ৩০শে জুলাই অস্ত্রোপচার হয়, ক্রমশঃ কবির জীবনী-শক্তি স্তিমিত হইয়া আসে। অস্ত্রোপচারের পরও কবি একটি কবিতা রচনা করেন। ২২শে শ্রাবণ রাখিপূর্ণিমা দিবস (ইং ৭ই আগষ্ট বেলা ১২-১৩ মিঃ কবির মহাপ্রয়াণ।

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী

মহোপদেশক শ্রীমৎ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

বর্ষার অন্তে শোভন-দর্শন শরতের শুভাগমন হইয়াছে। প্রকৃতি-রাণী হরিদ্বর্ণের বস্ত্র পরিধান করিয়া হাস্য-শোভিত আস্যে বিরাজ করিতেছেন। নগর, গ্রাম, গোষ্ঠ প্রভৃতি জনপদে আনন্দের হিল্লোল ক্রীড়া করিতেছে। নদীসকল স্বচ্ছ-সলিলে পরিপূর্ণ। হ্রদসকল মনোমুগ্ধকর কমলদলে সুশোভিত। হংস, চক্রবাক্ প্রভৃতি জলচর পক্ষী জলাশয়সমূহে আনন্দে বিহার করিতেছে। বনসকল পত্র-পল্লব ও পুষ্পগুচ্ছে নৈসর্গিকভাবে সুসজ্জিত এবং পিকাদি বিহঙ্গের ও ভ্রমরকুলের শ্রুতিসুখকর সঙ্গীতে মুখরিত। স্থানে স্থানে শিখিকুল সুরম্য পুচ্ছ বিস্তার করিয়া আনন্দভরে নৃত্য করিতেছে। পুষ্পপরিমলবাহী সুখস্পর্শ মলয়ানিল মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছে। গগনমণ্ডল ধরিত্রীর উপরি নীল চন্দ্রাতপ-রূপে শোভা পাইতেছে। শারদ-প্রকৃতির এই মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের সহিত সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম-রমণীয় কাল সংযুক্ত হইল; রবিপ্রমুখ গ্রহ, অশ্বিনীপ্রমুখ নক্ষত্র ও অন্যান্য তারকাগণ শান্তভাব ধারণ করিল। রোহিণী নক্ষত্রের উদয় হইল। দিক্‌সকল প্রসন্ন হইল। গগনমণ্ডল নক্ষত্রমালায় বিভূষিত হইল। এই সকল বৈচিত্র্যসহ ভাদ্রের কৃষ্ণাষ্টমী উদিতা হইলে সাধুগণের হৃদয়ে আনন্দের প্রবল তরঙ্গ প্রবাহিত হইতে লাগিল। ত্রিদিবে দুন্দুভি নিনাদিত হইতে আরম্ভ হইল। কিন্নর ও গন্ধর্ব্বগণ মঙ্গলগান, সিদ্ধ ও চারণগণ স্তব এবং বিদ্যাধরগণ অপ্সরাগণের সহিত হ[illegible] নৃত্য করিতে লাগিলেন। দেবতা ও মুনিগণ আনন্দে পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। ভক্তের ভক্তিতে বাৎসল্য-রসের সেবকের পুত্রত্ব অঙ্গীকারকারী অজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শুভ আবির্ভাবকে অভিনন্দিত করিবার জন্যই ব্রজের অপ্রাকৃত প্রকৃতিরাণী এই সকল অপার্থিব শোভা-সম্পৎসহ প্রতীক্ষা করিতেছেন। নাস্তিক, সন্দেহবাদী, মায়াবাদী, ভগবত্তায় মর্ত্ত্যত্ব আরোপকারী ও মর্ত্ত্যত্বে ভগবত্তা আরোপকারী প্রমুখ ভগবদ্বহির্ম্মুখগণের তদ্দর্শনে অধিকার নাই। তজ্জন্য তাহাদের দৃষ্টি আচ্ছাদনার্থ এবং কংসাদি দুর্ব্বৃত্তগণের হৃদয়ের ত্রাস উৎপাদনের নিমিত্ত ভগবদিচ্ছায় তাঁহার আবির্ভাব-কালে ঘোরদর্শন মেঘগণ সহসা নভোমণ্ডল আচ্ছাদন করিয়া ভীষণ গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং মুহুর্মুহুঃ অশনি-সম্পাতের সহিত প্রবল শিলাবৃষ্টি হইতে থাকিল। ইত্যবসরে মধ্য-রাত্রিতে শ্রীভগবান্ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপিণী দেবকীর গর্ভ হইতে আবির্ভূত হইয়া ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। শ্রীবসুদেব ও দেবকী দেখিলেন,—দিব্য শিশু পীতাম্বরধর, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ-বিগ্রহ। তাঁহার লোচনদ্বয় কমলসদৃশ, বক্ষঃ শ্রীবৎসালঙ্কৃত, গলদেশ কৌস্তুভমণি-শোভিত এবং বর্ণ নিবিড় জলদতুল্য সুরম্য। বৈদূর্য্যমণি-শোভিত মুকুট ও কুণ্ডলদ্বয়ের ছটায়

তাঁহার কেশদাম সমুজ্জ্বল। অতিশয় দীপ্তিশালী মেখলা, কেয়ূর ও বলয়াদি অলঙ্কারে তাঁহার শ্রীঅঙ্গ ভূষিত। দিব্য শিশুর দর্শনে বসুদেব ও দেবকীর নয়ন হইতে আনন্দ-বারি বর্ষিত হইতে লাগিল। "ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরমপুরুষ, পরমব্রহ্ম, সর্ব্বান্তর্যামী, বাহ্যাভ্যন্তর ভেদরহিত, সর্ব্বকারণকারণ, অনাদি, সর্ব্বাদি, সর্ব্বশক্তিমান্ এবং প্রকৃতির অতীত পুরুষ—পরমেশ্বর"—এই মর্ম্মে শ্রীবসুদেব ও দেবকী তাঁহার স্তব করিলেন। দেবকীর প্রার্থনায় শ্রীভগবান্ দ্বিভুজ হইলেন।

'জন্মাষ্টমী' শব্দের শব্দগত সাধারণ অর্থ কোন ব্যক্তির জন্মতিথি কোন অষ্টমী হইলেও রূঢ়ি অর্থে 'জন্মাষ্টমী' বলিতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিথি মুখ্যচান্দ্র শ্রাবণ, গৌণচান্দ্র ভাদ্র-কৃষ্ণাষ্টমীই উদ্দিষ্ট হইয়া থাকে এবং 'জন্মাষ্টমী' শব্দ শ্রুতিগোচর হইবামাত্রই সকলেই শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-তিথিকেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। শাস্ত্র 'জয়ন্তী' শব্দেও শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিথি রোহিণী-নক্ষত্র-যুক্তা গৌণচান্দ্র ভাদ্র-কৃষ্ণাষ্টমীকেই মাত্র উদ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বর্ত্তমান সময়ে যে কোনও ব্যক্তির জন্মতিথিকে 'জয়ন্তী' শব্দে উদ্দেশ করা হইতেছে। পরমার্থের লীলানিকেতন ভারতবর্ষে এই সাধারণ ভ্রমটী অচিরে সংশোধিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ঐতিহাসিকের বিচারে—কোনও নির্দ্দিষ্ট কালে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার আর আবির্ভূত হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু অনর্থমুক্ত ভক্তের দর্শনে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব নিত্য। 'বসুদেব' শব্দে শুদ্ধসত্ত্ব। অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞানবাসনা-নির্ম্মুক্ত সেবন-নিরত শুদ্ধসত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য প্রকাশ বা আবির্ভাব। বসুদেবের হৃদয় হইতে শ্রীভগবান্ দেবকীর হৃদয়ে শুভবিজয় করিয়াছিলেন, দেবকী শ্রীভগবান্‌কে জগদ্বাসীর কল্যাণের জন্য প্রকাশ করিয়াছেন। বসুদেব—গুরুতত্ত্ব; দেবকী—শিষ্যা। শুদ্ধসত্ত্ব শ্রীগুরুদেব শিষ্যের অন্তঃকরণকে অনর্থ-নির্ম্মুক্ত করিয়া স্বীয় অন্তঃকরণের আরাধ্য শ্রীভগবান্‌কে শিষ্যের অন্তঃকরণে প্রকাশ করিয়া থাকেন। শিষ্য তখন গুরু হইয়া জগৎ-কল্যাণের নিমিত্ত শ্রীভগবান্‌কে জগতে প্রকাশ করেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম কিছু মায়াবদ্ধ জীবের জন্মের ন্যায় প্রাকৃত ব্যাপার নহে। তাঁহার জন্মাদি লীলার নিত্যত্ব লক্ষ্য করিয়া ভক্তগণ কীর্ত্তন করেন,—

"অদ্যাপিহ সেই লীলা করে শ্যামরায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥"

চতুর্দ্দশ-ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডে প্রতি কল্পে অর্থাৎ ব্রহ্মার একদিনে শ্রীকৃষ্ণ একবার স্বীয় ব্রজধাম ও ব্রজপরিকরগণসহ অবতীর্ণ হইয়া প্রকট-লীলা প্রদর্শন করেন। বিরজার জলে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভাসিতেছে। কোনও না কোনও ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলা সর্ব্বক্ষণই হইয়া থাকে। অচিন্ত্যশক্তিতে তিনি যুগপৎ ব্রহ্মাণ্ডে ও গোলোকে লীলা করিতেছেন। গোলোকের লীলা অপ্রকট-লীলা এবং ব্রহ্মাণ্ডের লীলা প্রকট-লীলা নামে অভিহিত। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগের সমষ্টি এক দিব্যযুগ বা মহাযুগ নামে অভিহিত। একাত্তর দিব্যযুগে এক মন্বন্তর। চৌদ্দ মন্বন্তরে এক কল্প বা ব্রহ্মার এক দিবস। কলিযুগের পরিমাণ চারি লক্ষ বত্রিশ হাজার সৌরবর্ষ। কলির দ্বিগুণ দ্বাপর, তিনগুণ ত্রেতা এবং চারিগুণ সত্যযুগ। সুতরাং এক দিব্যযুগের পরিমাণ তেতাল্লিশ লক্ষ বিশ হাজার সৌরবর্ষ এবং এক কল্প বা ব্রহ্মার একদিনের পরিমাণ ৪২৯,৪০,৮০,০০০ (চারিশত উনত্রিশ কোটি চল্লিশ লক্ষ আশি হাজার) সৌরবর্ষ। সূর্য্যসিদ্ধান্তানুসারে এক কল্পের এই গণনা লিখিত হইল। এই সময়ের মধ্যে এক ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের একবার প্রকট-লীলা হইয়া থাকে। যে ব্রহ্মাণ্ডে যে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়, সেই ব্রহ্মাণ্ডে তাহার পরবর্ত্তী কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব হইয়া থাকে। বর্ত্তমান কল্পে অষ্টাবিংশ দিব্যযুগের দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের এবং কলিতে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডে হইয়াছিল।

গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন তখনই তিনি দুষ্কৃতিদিগকে বিনাশ ও সাধুগণের পরিত্রাণের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। জগতের এই ভারহরণ কার্য্যটী তিনি তাঁহার অংশ স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণুর উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। ব্রজবিলাসী স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ অবতারী;

তাঁহা হইতে যাবতীয় অবতারের আবির্ভাব হইয়াছে। স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ ও আবেশ—এই ত্রিবিধরূপে শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ লীলা লক্ষিত হয়। স্বয়ংরূপ—ব্রজে গোপমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ। তদেকাত্মরূপ স্বাংশক ও বিলাস ভেদে দ্বিবিধ। কারণোদকশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী—এই ত্রিবিধ পুরুষাবতার এবং মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতি 'স্বাংশক' তদেকাত্মরূপ। 'বিলাস' তদেকাত্ম—'প্রাভব' ও 'বৈভব'ভেদে দ্বিবিধ। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ প্রাভব বিলাস। দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহান্তর্গত আবরণ মূর্ত্তি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ; তাঁহাদের দ্বাদশ প্রকাশমূর্ত্তি—কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ ও দামোদর এবং তাঁহাদের (দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহের) অষ্ট বিলাস মূর্ত্তি—পুরুষোত্তম, অচ্যুত, নৃসিংহ, জনার্দ্দন, হরি, কৃষ্ণ, অধোক্ষজ, উপেন্দ্র। ৪+১২+৮=২৪ বিষ্ণুবিগ্রহ বৈভববিলাস-তদেকাত্ম। পুরুষাবতার, লীলাবতার, গুণাবতার, মন্বন্তরাবতার, যুগাবতার ও শক্ত্যাবেশাবতার—শ্রীকৃষ্ণের এই ষড়্‌বিধ অবতারের বিষয়ও আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই। প্রবন্ধ-বিস্তারভয়ে তৎসমুদয়ের বিশদ আলোচনা এস্থলে না করিয়া আমরা প্রসঙ্গতঃ এইমাত্র বলিব যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতীর্ণ হন, তখন স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণুবিগ্রহগণ তাঁহার শ্রীঅঙ্গে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। অবতারী শ্রীকৃষ্ণে অবতারগণ সকলেই অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণের অসুর-সংহারাদি-দ্বারা পৃথিবীর ভারহরণ-কার্য্য উক্ত অবতারগণের দ্বারাই হইয়া থাকে। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-কাল যখন উদিত হয়, সেই সময়ে কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল, দন্তবক্র, চাণূর প্রভৃতি অসুরগণের অত্যাচারে পৃথিবী প্রপীড়িত হইলে ধরিত্রীর ভারহরণ-কালও উপস্থিত হইয়াছিল। তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় অসুর-সংহারাদি দৃষ্ট হয়। এই সকল কার্য্য তদন্তস্থিত স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণুবিগ্রহগণ-কর্ত্তৃকই হইয়াছিল। এই অসুর-সংহারাদি কার্য্য শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য লীলারও পুষ্টিবিধান করিয়া থাকে। তজ্জন্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর অঘ-বক-পুতনাদির বধকেও পূর্ণ মাধুর্য্যলীলার অন্তর্গত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। পরমরসিক ও পরম কারুণিক শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের মূল কারণ—প্রেমরসের নির্য্যাস আস্বাদন ও রাগমার্গীয় ভক্তি জগতে প্রচার। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে সকল জগৎ পরিপূরিত। ঐশ্বর্যজ্ঞানে প্রেমের শিথিলতাই হইয়া থাকে। ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি নাই। যে ভক্ত নিজেকে হীন জানিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করেন তাঁহার প্রেম ঐশ্বর্য্যগত। শ্রীকৃষ্ণ কখনই এই ঐশ্বর্যগত প্রেমের অধীন হন না। যিনি যে রসে শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সেই রসের সেবকরূপে অঙ্গীকার করেন। সুবল শ্রীদামাদি সখাগণ শ্রীকৃষ্ণকে সখা-জ্ঞানে সমান বুদ্ধি করেন। নন্দ-যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে পুত্রজ্ঞানে বাৎসল্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, ব্রজরামাগণ মধুররতিতে সর্ব্বাঙ্গদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সে[illegible] করেন। এই সকল সেবক শ্রীকৃষ্ণকে ঐশ্বর্য্য-বুদ্ধিতে না দেখিয়া সেবাব্যপদেশে নিজেদের সমান বা নিজদিগ হইতে হীন জ্ঞান করিয়া সেবা করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রীত হন। এই রাগমার্গীয় সেবনের সন্ধান প্রদানের জন্যই পরমকারুণিক শ্রীকৃষ্ণের অবতার।

শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই, শ্রীকৃষ্ণ যখন কংস-কারাগারে দেবকী হইতে আবির্ভূত হন, সেই সময়ে গোকুলে যশোদা হইতে যোগমায়ার জন্ম হয়। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় সেই সময়ে কারারক্ষী প্রহরিগণ নিদ্রিত হইয়া পড়ে এবং কংসের ভয়ে ভীত বসুদেব যখন শ্রীকৃষ্ণকে গোকুলে লইয়া যাইবার জন্য অগ্রসর হন, তখন কারাগৃহের দ্বার আপনিই মুক্ত হয়। বসুদেব নন্দালয়ে যাইয়া সকলকেই নিদ্রিত দেখিতে পান। সেই সময়ে যশোদার পার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণকে রাখিয়া বসুদেব যোগমায়াকে লইয়া কংসকারাগারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দ্বার পুনরায় আপনিই রুদ্ধ হয়। শ্রীল সনাতন গোস্বামী টীকায় জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, শ্রীযশোদা হইতে শুধু যোগমায়া নহেন, স্বয়ংরূপ অবতারী শ্রীকৃষ্ণেরও আবির্ভাব হইয়াছিল। বসুদেব যখন বাসুদেবকে লইয়া নন্দালয়ে উপস্থিত হন, তখন শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেবকে আত্মসাৎ করিয়া লন। এই বিচারের অনুকূল শ্লোকও শ্রীমদ্ভাগবতে আছে। বাসুদেব-কৃষ্ণ মথুরা ও দ্বারকায় লীলা করেন। যিনি

গোপেন্দ্রনন্দন, তিনি বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কোথায়ও যান না, যথা যামল বচন :—

"কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স কচিন্নৈব গচ্ছতি॥"

কৃষ্ণাষ্টমীতে রজনীর প্রথমার্দ্ধ অন্ধকার থাকে। দ্বিপ্রহর রাত্রিতে চন্দ্রের উদয়ে অন্ধকার তিরোহিত হয় এবং তৎপরে সমস্ত রাত্রিই আলোকিত থাকে। কৃষ্ণাষ্টমীর মধ্যরাত্রিতেই কৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাব। যে পর্য্যন্ত হৃদয়গগনে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের উদয় না হয়, সে পর্য্যন্ত জীব অজ্ঞানান্ধকারেই অবস্থিত থাকে। অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম-জ্ঞানাদি কৃষ্ণদর্শনের পথে অজ্ঞানান্ধকার। শুদ্ধা ভক্তির ফলে হৃদয়-বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইলে ঐসকল অন্ধকার আর হৃদয়ে স্থান পায় না শ্রীভগবত্তনুকে জড় জ্ঞান করিবার বা শ্রীভগবান্‌কে নিরাকার নির্ব্বিশেষ মাত্র ধারণা করিবার প্রবৃত্তি চিরতরে অপনোদিত হয়। নিত্য ভগবানের আবির্ভাব দর্শনে নিত্য সেবক নিত্য কাল তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন। ভগবান্—নিত্য; তাঁহার সেবক নিত্য; তাঁহার সেবা—নিত্যা।

ভক্তগণ দিবারাত্র উপবাস-সহযোগে শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলা-মাহাত্ম্য শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিয়া এবং দ্বিপ্রহর রাত্রিতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব সময়ে তাঁহার অভিষেক, বিশেষ অর্চ্চন, যাবতীয় উত্তম দ্রব্য সংগ্রহপূর্ব্বক বিবিধ উপচারে ভোগরাগ প্রদান, আরাত্রিক, জন্মাষ্টমী-প্রসঙ্গ পাঠ ও নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি সহযোগে মহোৎসব করিয়া শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী তিথি পালন করিয়া থাকেন। তাঁহারা সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমী পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধা অষ্টমীতেই উপবাস করেন। প্রয়োজন হইলে তাঁহারা নবমী তিথিতে উপবাস করেন, তথাপি সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমীতে উপবাস করেন না। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে বিদ্ধা ত্যাগের এই সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ রহিয়াছে। মনুষ্যমাত্রেরই সর্ব্বপাপহর সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ শ্রীজন্মাষ্টমীব্রত উপবাস-সহযোগে যথাশাস্ত্র পালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির উদ্দেশ্যে ব্রত উদ্‌যাপন করেন।

উপবাসের পরদিন পূর্ব্বাহ্নে পারণ বিধেয়, কিন্তু তৎসহ এই নিয়ম পালনীয়—রোহিণীযোগরহিতা কেবলা শুদ্ধা অষ্টমী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পরদিনও থাকিলে অষ্টমী তিথির অন্তে পারণ করিতে হইবে। কেবল রোহিণী নক্ষত্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পরদিন থাকিলে রোহিণীর অন্তে পারণ করিতে হইবে। অষ্টমী ও রোহিণী উভয়েই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পর দিন থাকিলে একটীর অন্তে পারণ করিতে হইবে। উভয়ে যদি সমপরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে উভয়ের অন্তে পারণ বিধেয়। পারণ-দিবসে নন্দোৎসব করিয়া মহাপ্রসাদবিতরণ বাঞ্ছনীয়।

রবীন্দ্র-প্রয়াণে

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

মানবের মর্ম্মলোকে যে উৎস আছিল গোপন
ঘন অন্ধকারে
হে মহর্ষি, মহাকবি তুমি কোন্ উদয়াদ্রি হ'তে
পরশিলে তারে?

প্রভাতীর পাঞ্চজন্যে প্রজ্ঞানের প্রমূর্ত্ত প্রয়াসে
তুমি ছিলে কবি,
ভারতের ভাগ্যাকাশে প্রভান্বিত ভারত ভাস্কর
বিমোহন ছবি।

সাহিত্যের সৌরলোক আজি ম্লান রসস্পর্শ বিনা
আজি সে অরম্য,—
সভক্তি প্রণাম লহ পৃথিবীর জ্ঞান-প্রভাকর,
জগৎ প্রণম্য!

মহাকবি মধুসূদন

শ্রীইন্দিরা দেবী

বাংলাভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম প্রবর্ত্তক মহাকবি মাইকেল মধুসূদন। বাংলাভাষা ও বাংলা সাহিত্যকে তিনি অগ্রগতির পথে এগিয়ে দিয়েছেন, ভাব-সম্পদে ও নব অলঙ্কারে বঙ্গবাণীর নিরাভরণ দেহে দিয়েছেন অপূর্ব্ব রূপ-সৌন্দর্য্য।

বাংলা-সাহিত্যের প্রবর্ত্তন করেছেন মাইকেল—স্বকীয় প্রতিভায়, এ কথা সর্ব্ববাদীসম্মত।

মধুসূদনের চরিত্রগত দোষ অথবা গুণ ছিল দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা। নিয়ম-শৃঙ্খলার ভিতর প্রচলিত মতবাদের মধ্যে বাঁধাধরা ছক-কাটা জীবনের মধ্যে তিনি হাঁফিয়ে উঠতেন, তাই এ দেশের এবং এই সমাজের সমস্ত বিধি-ব্যবস্থা ও নিয়ম-শৃঙ্খলা ভেঙ্গে তিনি বাইরে এলেন। ভাগ করা আকাশ দেখে তিনি সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি, পরিমিত সুখ তিনি পেতে চাননি—তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন তাঁর মাথার উপর ভাগ করা খণ্ড বিচ্ছিন্ন আকাশ নেই, আছে সীমাহীন নীলাকাশ, বদ্ধ ঘরে স্বল্প আলোয় তাই প্রাণ তাঁর কেঁদেছিল; তিনি চেয়েছিলেন আকাশ-সমুদ্রে আলোর প্লাবন। তাঁর এই চাওয়ার মূলে তাঁর চরিত্রগত দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষার জন্য তিনি দায়ী ছিলেন না, দায়ী ছিল তাঁর পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া, দায়ী তখনকার সময়ে ডিরোজিও প্রমুখ ইংরাজ শিক্ষক সম্প্রদায়।

বাংলাদেশ বাস করবার মত নয়, বাংলাভাষা ভাষা নয়—এই দেশের ধর্ম্ম, তার কোনও ভিত্তি নেই—এমনি একটা অহেতুক বিদ্বেষ মধুসূদনের অন্তর ছেয়ে ছিল। এ দেশের ভাষা, এ দেশের ধর্ম্ম, লোকাচার সব যেন তাঁর কাছে মিথ্যা মনে হয়েছিল, মাতৃভাষায় কথা বলতেও তাঁর বাধা আসতো। এ দেশের মেয়েরা প্রাণহীন জড়, এ দেশের মেয়েদের তিনি প্রীতির চোখে দেখতে পারেননি। বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপনের সময়ে তিনি তাঁর মাকে বলেছিলেন "মা, তুমি যাই বল, বাঙ্গালী মেয়েরা রূপে গুণে কখনই ইংরাজ মেয়ের শতাংশের একাংশও হতে পারে না।"

এ দেশের মেয়েদের সম্বন্ধে এরূপ হতশ্রদ্ধাক্তর উক্তি মধুসূদনের মুখ-নিঃসৃত হলেও এই উক্তি তখনকার যুব-সমাজের ইংরাজী শিক্ষার ও ইংরাজ শিক্ষক সম্প্রদায়ের বিকৃত রুচির উক্তি বলে' আমরা মনে করে নিতে পারি। কারণ তখনকার দিনে ইংরাজনবীশগণের নিজ নিজ সমাজ, সাহিত্য ও ধর্ম্মের ওপর কৃপা-করুণ কটাক্ষ-বিতরণ একটা অঙ্গ ছিল। মদ্য ও নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ করে' ধর্ম্মের ও লোকাচারের বিরুদ্ধ-পন্থী হওয়া তখনকার ইংরাজী শিক্ষিত যুবসমাজের একটা অবশ্যকরণীয় কাজ ছিল। এই ধর্ম্ম ও লোকাচার-বিগর্হিত কাজ না করার অর্থ ইংরাজী শিক্ষা অনুষ্ঠানের অঙ্গহানি। মধুসূদনের সহাধ্যায়ী বাংলা ও বাঙ্গালী সমাজের প্রণম্য ঋষি ৺রাজনারায়ণ বসু তাঁর আত্মজীবনীর এক স্থানে সেই দিনের একটা চিত্র দিয়েছেন—"তখনকার হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা মনে করিতেন যে, মদ্যপান সভ্যতার চিহ্ন, উহাতে দোষ নাই। আমি ও আমার কতকগুলি সহচর একত্র হইয়া গোল-দীঘিতে বসিয়া মদ খাইতাম। এখন যেখানে সেনেট হাউস হইয়াছে, সেখানে কতকগুলি শিক-কাবাবের দোকান ছিল। আমরা গোলদীঘির দেওয়াল টপকাইয়া (ফটক দিয়া বাহির হইবার বিলম্ব সহিত না), ঐ কাবাব কিনিয়া আনিয়া আহার করিতাম। আমি ও আমার সহচরেরা এইরূপ মাংস ও জলস্পর্শশূন্য ব্র্যাণ্ডি খাওয়া সভ্যতা ও সমাজ-সংস্কারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শক কার্য্য বলিয়া মনে করিতাম।"

এই ছিল তখনকার যুব-জন-সমাজের আদর্শ কাজ। মধুসূদন তখনকার দিনের এই আদর্শবাদের হাত থেকে রক্ষা পাননি, কিন্তু তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল আরও তীব্র, আরও ব্যাপক। কবি বায়রণ ছিলেন তাঁর স্বপ্নজগতের আদর্শ পুরুষ—কবে গিয়ে তিনি স্পর্শ করবেন স্কট-বায়রণের দেশের মাটি, সেজন্য অন্তর তাঁর হাহাকার করেছিল। বিলাতে না গেলে তাঁর কবি-প্রতিভার স্ফুরণ হবে না। তাঁর ইংরাজী শিক্ষা সমাপ্ত হবে না, এমনি একটা তীব্র ভয়-চকিত ভাব ছিল তাঁর মনে; তাই বিলাতে যাবার আশ্বাস পেয়ে তিনি নিজ ধর্ম্মকে স্বচ্ছন্দে ত্যাগ করতে কুণ্ঠিত হলেন না।

অপরিণত যুবক বয়সে দেশের মেয়েদের সম্পর্কে এই উক্তি সাধারণতঃ আমাদের ব্যথা দেয়। কিন্তু এ উক্তিকে আমরা মহাকবি মাইকেলের উক্তি বলে' গ্রহণ করতে পারি না, কেননা যে বয়সে এ দেশের মেয়ে সম্পর্কে এই হতশ্রদ্ধার উক্তি তিনি করেছিলেন, সে বয়সটা ছিল নিতান্ত কচি বয়স। ফলের চেয়ে ফুলের দিকেই মন বেশী ঝোঁকে যে বয়সে, সে বয়সে গুণের চেয়ে রূপই মনটাকে টানে, তাই ইংরাজ কন্যা বিড়ালাক্ষিরা তাঁর মন টেনেছিল। দেশের নারীর ইতিবৃত্তের অন্ধকারে ছিল ডি, রোজিও [illegible]র শিক্ষা আর প্রভাব।

দেশের নরনারী মানুষ নয়—এ দেশ শিক্ষিত লোকের বাস করার উপযুক্ত নয়—এমনি একটা ভাব মধুসূদনের মনে তখনকার আব্‌হাওয়া ও শিক্ষার গুণে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল—লর্ড মেকেলের ভাষায় তাঁর অন্তর যেন বলতে চেয়েছিল—"A single shelf of a good European library is worth the whole native literature of India and Arabia."

পূর্ণ বয়সেও তিনি মিল্টনকে কালিদাসের চেয়ে বড় কবি বলে' মনে করতেন এবং ইলিয়াডকে রামায়ণ-মহাভারত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কাব্য বলে' তিনি বিশ্বাস করতেন। হেক্টর বধের উৎসর্গ-পত্র থেকে এ কথা জানতে পারা যায়।

বিদেশী ভাষায় কবিতা লিখে অজস্র সম্মান তিনি পেয়েছিলেনও। এ দেশের ও বিদেশী বহু গুণীজনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেও, বেথুন সাহেবের কাছে তিনি পেলেন প্রথম আঘাত। শিক্ষাক্ষেত্রে এদেশবাসীর প্রণম্য মহাত্মা বেথুন বলেছিলেন, "এ শক্তি ও প্রতিভা এ দেশের সাহিত্য-সেবায় নিয়োজিত হলে আরও অনেক বেশী ফলপ্রসূ হত।"

মধুসূদনের প্রথম ইংরাজী কাব্যগ্রন্থ 'ক্যাপটিভ লেডি' সমালোচনা করে' 'আর্সিনিয়স' পত্রিকায় কোনও ইংরাজ লেখক বলেছিলেন "এতে এমন অনেক জায়গা আছে, যা বায়রণ বা স্কট নিজের বলে' প্রচার করতে কুণ্ঠিত হতেন না"—[What I believe neither Scott nor Byron would have been ashamed to own.]—একজন বাঙ্গালীর পক্ষে যে কত বড় কথা, তা' বলবার বা বোঝাবার নয়; কিন্তু মহাত্মা বেথুনের এই মৃদু-ভর্ৎসনা তাঁর প্রাণে এনেছিল বিপুল আবেদন ও আলোড়ন। এর পর থেকে বাংলাভাষার দিকে তিনি নজর দিলেন ও বঙ্গ-বাণীর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করলেন। তখন তাঁর মনে এল দৃঢ় সঙ্কল্প—

> "রচিব মধুচক্র—
> গৌড়জন যাহে
> আনন্দে করিবে পান
> সুধা নিরবধি।"

কিন্তু এমন সময়ে তাঁর মনে এল, যখন তাঁর অন্তরে বাহিরে এলো বিপুল পরিবর্ত্তন। একদিন বড় দুঃখে ও আশাভঙ্গের ব্যথায় তিনি কাতরোক্তি করেছিলেন—

> প্রেমের নিগড় গড়ি পরিলি যতনে সাধে—কি ফল লভিলি।
> জ্বলন্ত পাবক-শিখা লোভে তুই কাল-ফাঁদে উড়িয়া পড়িলি।
> পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়—ধাইলি অবোধ হায়
> না দেখিলি, না শুনিলি।'

মধুসূদন যুবা বয়সে এ দেশের মেয়েদের প্রতি অহেতুক অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেছিলেন সত্য, কিন্তু পরিণত বয়সে অশ্রদ্ধাকে শ্রদ্ধা-সম্মানের মালায় পূত পবিত্র করে' তুলেছিলেন। মেঘনাদবধ কাব্যে প্রমীলার যে জীবন্ত রেখাচিত্র আমাদের তিনি দিয়েছেন—প্রমীলার যে কঠোর কোমল ছবি এঁকেছেন তা' সত্যই অতুলনীয়। প্রমীলা রাক্ষসকুলবধূ,—রাক্ষস বলতে যে বীভৎস চিত্র আমাদের মনে আসে, মধুসূদন সে ভয়বিহ্বলতা ও ঘৃণা আমাদের মন থেকে দূর করে' দিয়েছেন; রাক্ষসেরা মানুষ, মানুষের মত বিরহ-মিলনের দুঃখ-সুখ তারাও ভোগ করতে পারে। রামচন্দ্র সীতাদেবী এঁরাও মানুষ, লক্ষ্মী-নারায়ণের অবতার নন। মেঘনাদ-বধ কাব্য মানুষের কাব্য, যারা ছিল অবজ্ঞাত, ঘৃণিত, যাদের নরমাংসভোগী বলে' আমাদের কাছে পরিচয় ছিল—তারাই আমাদের কাছে সাধারণ মানুষের বেশে ধরা দিল। মধুসূদনের পূর্ব্বে সাহিত্য-সমাজে অপাঙক্তেয়দের এত সহানুভূতি ও দরদ দিয়ে, এত সাহস করে' এরূপ বিশিষ্ট স্থান দিতে কেহ এগিয়ে আসেননি। মেঘনাদবধ-কাব্যের ভিতর প্রমীলার চরিত্র আমাদের অন্তরকে বড় গভীরভাবে নাড়া দেয়, কঠোর-

কোমলে অপূর্ব্ব চরিত্র প্রমীলার। প্রথমে আমরা দেখি অশ্রুসিক্ত বধূ প্রমীলা, স্বামী মেঘনাদ রামচন্দ্র-নিধনে যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করছেন—সাধারণ মেয়ের মত তিনি কাঁদছেন স্বামীকে বিদায় দিতে। মহাকবি মধুসূদন পরম চমৎকারভাবে বিরহিনী প্রমীলার ছবি এঁকেছেন—

কভু বা মন্দিরে পশি' বাহিরায় পুনঃ
বিরহিনী ; শূন্য নীড়ে কপোত যেমতি
বিবশা, কভু বা উঠি উচ্চ গৃহ-চূড়ে
একদৃষ্টে চাহে বামা দূর লঙ্কা পানে
মুহুমুহু চক্ষু-জল মুছিয়া আঁচলে।

প্রমীলা-চরিত্রই মধুসূদনের স্বকীয়তা ও শ্রেষ্ঠ কল্পনা-শক্তির পরিচয় দেয়। বাংলাদেশে মেয়েরা হয় বিলাসের সামগ্রী। যে যুগে মধুসূদন জন্মেছিলেন, সে যুগে মেয়েরা ছিল সবচেয়ে অবজ্ঞাত। এই মধুসূদন এঁকেছেন প্রমীলার কোমল বধূ-অন্তরের মাঝে বীর-জায়ার ছবি। প্রমীলা নতমুখী অশ্রুসিক্তা বধূই নন—বীরভূষণে সজ্জিতা, অশ্বারূঢ়া। পৃষ্ঠে পূর্ণ তূণ, উরুদেশে তীক্ষ্ণ তরবারি, কোমল হস্তে সুদীর্ঘ শূল, বীরজায়ার ছবি—প্রমীলার সখীরাও অনুরূপ বিভূষিতা, সে এক অতি অপরূপ দৃশ্য। স্বামি-সন্দর্শনে বধূ প্রমীলা যাত্রা করলেন বীরাঙ্গনা হয়ে। স্বামী মেঘনাদকে বিপন্মুক্ত করবার জন্য, স্বামীকে বাঁচাবার জন্য প্রমীলা আজ বীরভূষণে বিভূষিতা। পরাধীন ভারতে বহু যুগ পরে মধুসূদন তেজোদীপ্তা রমণীর ছবি আঁকলেন।

প্রমীলা সকলকে বিস্মিত ও হতবাক্ করে' লঙ্কায় প্রবেশ করলেন—জগতের কোন কবি বোধ হয় এমন মধুর ছবি এঁকে যেতে পারেননি। কোমলে কঠোরে, স্নেহ-ভালবাসায়, বীরত্বে ও শৌর্য্য-বীর্য্যে প্রমীলা-চরিত্র অতুলনীয় ও অনুকরণীয়। আপন শক্তি ও শৌর্য্যে যিনি লঙ্কায় বীরদর্পে প্রবেশ করলেন—তিনিই আবার সাধারণ বধূর মত শ্বশ্রূ-ভয়-ভীতা হয়ে স্বামীকে কোমল কণ্ঠে বলেছিলেন—

হায় নাথ,
ভেবেছিনু, যজ্ঞগৃহে যাব তব সাথে
সাজাইব বীরসাজে তোমায়। কি করি?
বন্দী করি স্বমন্দিরে রাখিলা শাশুড়ী
রহিতে নারিনু তবু পুনঃ নাহি হেরি
পদযুগ—

বীরত্বের কঠোরতা ও নির্ম্মমতার সঙ্গে বধূর এই কোমলতা সত্যই অপূর্ব্ব!

মনে পড়ে মধুসূদনের যুবা বয়সের কথা—একদি যে দেশের মেয়েদের অতি নগণ্য ভেবেছিলেন, পরিণত বয়সে তাঁর মহাকাব্যের ভিতর সেই দেশেরই মেয়েকে করে' গেলেন সকল জাতির সকল বীর রমণীদের অগ্রগণ্যা, রূপে, গুণে, ত্যাগে, তেজে, বীরত্বে অতুলনীয়া—বধূর কোমল মাধুর্য্য ও বীরত্বের কঠোরতায় মধুসূদন বাংলার বুকে বাঙ্গালী সমাজে আদর্শ বধূ ও আদর্শ নারীর স্মরণ-চিহ্ন হিসাবে রেখে গেলেন প্রমীলাকে।

২৯শে জুন—মহাকবি মাইকেলের তিরোভাব-দুঃখের লগ্নে স্মরণ করি মহাকবি মাইকেল মধুসূদনকে। বাংলার মেয়েরা স্মরণ করে মহাকবির মানসদুহিতা প্রমীলাকে—শ্রদ্ধাতর্পণ করে মহাকবির কল্পময় স্মৃতি-শ্রদ্ধা-মন্দিরে।

রবীন্দ্র-প্রয়াণে

শ্রীধীরেন্দ্রকুমার সরকার

জনগণ নন্দিত ভারতের বন্দিত
তুমি রবি কবি-সম্রাট্—
অস্তের শেষ কূলে তন্দ্রিত দেহ-ফুলে'
নিবেদিয়া বিশ্ব-বিরাট্
ছেড়ে গেলে তব রাজপাট।

তব আত্মারে স্মরি' হৃদি-অঞ্জলি ভরি'
দিনু আজি শ্রদ্ধা প্রণাম;
তুমি গুরু সুমহান্ দিব চির-পূজা-মান
স্মৃতি-পটে থাক্ তব নাম—
কবিগুরু, প্রণাম প্রণাম!

মেঘ ও স্বপ্ন

শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

এইবার কুমারীকল্যাণ সঙ্ঘের অধিবেশন।

সঙ্ঘ-সম্পাদিকা মল্লিকা মল্লিক উঠে দাঁড়াল। একহারা ...গড়ন। চোখে সোণার চশমা—হিষ্ট্রীতে এম্-এ। উপপি...তা রাশভারী চেহারা নয় অবশ্য, বরং ভারী ...দের ...একটী কমনীয়তা তার সমস্ত শরীর ঘিরে র'য়েছে। অপূর্ব ... দেখলে মনে হয় যেন স্বপ্নকন্যা, বিধাতা অপূর্ব মাধুরী দিয়ে মল্লিকা দেবীর চোখ দুটী সৃষ্টি ক'রেছেন—হাই পাওয়ারের চশমায় চোখের সেই অনির্বচনীয় সৌন্দর্যকে ...ন ক'রেছে ক্ষুণ্ণ সামান্য পরিমাণে।

সব থেকে বেশী ক'রে চোখে পড়ে মল্লিকা দেবীর চুল। মাথা থেকে যেন সমুদ্রের ঢেউ নেমেছে। কি ঘন আর কালো চুল! থাকে থাকে কাণের ওপর পর্যন্ত লীলায়িত ভঙ্গীতে নেমে এসেছে, তার মধ্যে থেকে দুটী হীরক-দুলের ক্ষণিক-দ্যুতি দেখা যায়—মেঘান্তরীণ সূর্যের ক্ষণিক দীপ্তি যেন!

মল্লিকা উঠে দাঁড়াল। সমস্ত সভা উৎকর্ণ হ'য়ে রইল। সামান্য একটু হেসে মল্লিকা দেবী সোজা হয়ে দাঁড়ালো। তারপরে 'কুমারীকল্যাণে'র গত কার্যকরী সমিতির বিবৃতি পাঠ শেষ করল।

তারপরে মৃদু অথচ পরিষ্কার ভাবে সমস্ত সভার দিকে চেয়ে সে বল্ল, "আজ আমাদের সঙ্ঘের একবিংশ অধিবেশন। বহু ঝড় এবং ঝঞ্ঝার মধ্যে দিয়ে সঙ্ঘ যে এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হ'তে পেরেছে, তারজন্যে আপনাদের কর্মপ্রচেষ্টাকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজ প্রায় সমস্ত বাংলায় আমাদের অনেকগুলি শাখা প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে, আশা করি, অবিলম্বে সমস্ত ভারতবর্ষে আমাদের এই নূতন কর্মপ্রেরণা আরও শাখা প্রতিষ্ঠা করবার যথেষ্ট সাহায্য করবে—আমাদের এক দিনের স্বপ্ন অন্যদিনের বাস্তবতায় পরিণত হবে।

সভার মধ্যে মৃদু একটু হাততালির শব্দ শোনা গেল। মল্লিকা আর একবার ভাল ক'রে সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করল।

"আজ সমস্ত জাতির দিকে আপনারা একবার চেয়ে দেখুন, ভাল ক'রে লক্ষ্য করুন—দেখ্‌বেন একটা জড়, মৃত, রক্তহীন শবের শোভাযাত্রা ক'রে শতাব্দীর পর শতাব্দী এরা সময়ের রাজপথ দিয়ে চ'লেছে! এদের না আছে রুচিবিকাশ, না আছে কর্তব্যবোধ। দু'হাতে নিজেদের জীবনকে যথেচ্ছ অপব্যয় ক'রে চ'লেছে। আপনারা ভাবতে পারেন এর শীর্ণ, ভীতিকর, কঙ্কালময় শরীরকে? এর অবশ্যম্ভাবী প্রতিফলকে? আমি আশ্চর্য হই যে, যে ভারতবর্ষে একদিন জেগেছিল বৌদ্ধ সংস্কৃতি—জেগেছিল মানবতার চরম অভিব্যক্তি—যে মানবতার জন্যে সম্রাট্ অশোক তাঁর সমস্ত সাম্রাজ্যকে দান ক'রেছিলেন—বিলিয়ে দিয়েছিলেন দু'হাতে—যার প্রেরণায় চণ্ডাশোক হ'ল ধর্মাশোক—সেই সত্য ও সুন্দরের একান্ত সাধনা-ভূমি মহাগরীয়সী এই ভারতবর্ষে আজ যে কি দুর্দিন ঘনিয়েছে তা আমি কেমন ক'রে বোঝাব আপনাদের।

"অথচ চিরকালই এমনি ছিল না—চিরকালই এই দুর্দিনের মধ্যে আমাদের পথ চল্‌তে হয় নি—ছিল শান্তি—ছিল পান্থ-পাদপ—আমরা পথ হেঁটেছি নির্বিঘ্নেই। যখন সেই অতীতকালের ইতিহাস পড়ি, তখন মনে হয় এই সভ্যতা—এই সংস্কৃতি থেকে যদি আমরা সেই দিনে—সেই কালে উপস্থিত হ'তে পারতাম! যদি আবার নিজেদেরকে সেই শান্ত-সংহত জীবন-প্রবাহে মিশিয়ে দিতে পারতাম!

"আজ আমাদের দুঃখ করবার অনেক কিছুই আছে। পলে পলে—মুহূর্তে মুহূর্তে আমরা ক্ষয় হ'য়েছি,—এখন যা' দেখছেন এটা সারহীন ক্ষয়িত গলিত শরীর—একদিন সে সময়ের প্রবল ঝটিকায় পৃথিবীর ধূলির সঙ্গেই মিশে যাবে, সমস্ত জগতে, সমস্ত বিশ্ব-পৃথিবীতে তার সামান্যতম কণিকাও খুঁজে পাবেন না—ধ্বংসের প্রলয়তাণ্ডবে আমরা একদিন নিশ্চিহ্ন হ'ব।"

মল্লিকা থাম্‌ল। মুখে রুমাল রেখে একটু কেশে নিয়ে আবার আরম্ভ করল।

"অথচ একথা ভাবতেও আমাদের কান্না আসে,—এই ভারতবর্ষ—এই সোণার দেশ—তার আগামীদিনের ধ্বংস-কল্পনার থেকে আমাদের কাছে আর কি মর্মান্তিক হ'তে পারে? আপনারা ভেবে দেখুন—কোন্ দিনের দিকে আমরা এগিয়ে চ'লেছি—কোন্ দুর্দিনের দিকে! প্রতি পদে—প্রতি মুহূর্তে আমাদের ধ্বংস নিকটতর হ'চ্ছে—আমরা আকাশে বাতাসে তার গন্ধ পাচ্ছি,—তবু—তবু আজও কি আমরা থাকব নিশ্চেষ্ট, জড়ের মত, মৃতের মত একটা শবদেহকে বহন ক'রে চল্‌ব যুগের পর যুগ—এম্‌নি মন্থর গতিতে—এম্‌নি নিঃসহায় নিঃসম্বল দারিদ্র্যকে সঙ্গী ক'রে!—আমাদের এই মানসিক দারিদ্র্য—আমাদের এই চিন্তার দারিদ্র্য বহুদিন থেকেই সহজাত হ'য়ে উঠেছে—আমাদের কি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সময় আজও আসেনি? আজও আসেনি তাকে দুর্বার বেগে বাধা দেবার সময়?

"আজ আমি ভেবে আশ্চর্য হই যে, আমাদের এই জাতীয় জীবনে পঙ্কিলতার কর্দমাক্ত স্রোতঃ কি ক'রেই প্রথমে প্রবাহিত হ'ল—আজ যা' আবিল করে তুলেছে সমস্ত জীবন-ধারাকে—সমস্ত শিক্ষাকে—সমস্ত সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে! আপনারা ভেবে দেখুন এই অধঃপতন, আপনারা অনুভব করুন এই অবনতি!"

উত্তেজনায় মল্লিকার সমস্ত মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠেছে, সে তখনও ব'লে চ'লেছে:

"একটা দৃষ্টান্ত থেকে আপনাদের এই জিনিষটাকে আমি সহজে বোঝাতে চেষ্টা করব। ধরুন, আমাদের জাতীয় জীবনে অবশ্য-প্রয়োজনীয় এই বিবাহ-সমস্যা। বিবাহকে সম্পূর্ণ সুশৃঙ্খল ভাবে ক'জন বিশ্লেষণ ক'রে দেখেছেন বলতে পারেন? ক'জন বিবাহ কথাটার অর্থ জানেন? যে মুহূর্তে একটি নারী একটা পুরুষের সঙ্গে মিলিত হল, সেই মুহূর্তে তাদের মধ্যে যে সুষমাধারা নাম্‌ল তা' অনির্বচনীয়, তা' বিশ্লেষণ ক'রে বোঝাবার মত ক্ষমতা আজ পর্যন্ত কোনও কবিরই হয়নি, তা' অব্যক্ত, তা' শুধু অনুভবনীয়! আমাদের দেশে, বিশেষ ক'রে বাঙ্‌লার এই বিবাহের নিয়ম অন্য দেশের থেকে যথেষ্ট বিভিন্নতর; এখানে ওঠে চুক্তির কথা, এখানে ওঠে চির-জীবনের প্রশ্ন! মনে রাখ্‌বেন এর দায়িত্ব গুরু। এর কর্তব্য-পথ অপেক্ষাকৃত ঘোরাল। অবশ্য এ কথাও ঠিক, বিবাহ মানেই চুক্তি এবং সেটা শুধু কর্তব্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, পৃথিবীর সমস্ত দেশেই এর গভীর অর্থ বিশ্লেষণ করা যায়, কিন্তু তাহ'লেও আমাদের দেশে এই সম্বন্ধ, এই সম্পর্ক চির জীবনের। আজ আরক্ত সন্ধ্যায় একটী নারী লজ্জা-কম্পি[illegible] হৃদয়ে যে পুরুষকে স্বামী ব'লে প্রণাম করল [illegible] জীবনের জন্যেই সেই নারীটার প্রতি তাঁ[illegible] আশীর্বাদ হ'য়ে প্রসারিত রইলো—প্রসারিত [illegible] দিন—যতদিন তাঁর সাম্‌নে মৃত্যু না নাম্‌ছে! [illegible]

"এই আমাদের দেশ, এই আমাদের নীতি, আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করি এই নীতিকে—এই নীতি [illegible] যুক্তিযুক্ত। ওদের দেশের যে ভাবধারা, তাকে হয় অনুমোদন করা যায়—কিন্তু আমাদের শান্ত জীবন যাত্রা মধ্যে তার নিমন্ত্রণ নেই। অন্ততঃ আমি এর ঘোর বিরোধী। আশা করি আপনারা বুঝ্‌তে পারছেন, আমি ওদের বিবাহ-বিচ্ছেদের কথাই ইঙ্গিত করছি। কিন্তু যাক্ একথা অ-প্রাসঙ্গিক। আমি বল্‌তে চাইছিলাম যে, আমাদের এই যে সুন্দর বিবাহ-প্রথা, এর মধ্যেও জেগে আছে এক কুৎসিত কঙ্কাল, এক ভীতিকর অমানুষিক বিভীষিকা, যা' আমাদের সমাজদেহকে কুরে' কুরে' তিলে তিলে ধ্বংস করছে। ধ্বংস করছে আমাদের দূর যাত্রার প্রথম যুগ্ম-পদপাতের সৌন্দর্য-চেতনাকে। তারই বিপক্ষে আজ আমার অভিযোগ!"

চারদিকে উচ্চ করতালিধ্বনিতে সমস্ত ঘর যেন কেঁপে উঠ্‌ল—এক মুহূর্তের জন্যে মল্লিকা থাম্‌ল—নতুন উৎসাহে আবার তার চোখ দুটী জ্বলে উঠ্‌ল—চশ্‌মার পেব্‌লে ঝলক তুলে' সে সোজা হ'য়ে দাঁড়াল।

"সেটা হচ্ছে আমাদের এই পণপ্রথা!" রুমাল দিয়ে সমস্ত মুখটা ভাল ক'রে মল্লিকা মুছে নিল, "আমাদের দেশের বিবাহের এই পণ-প্রথা!"

"আপনারা জানেন, কি বিরাট্ ধ্বংস এর মধ্যে নিহিত র'য়েছে কি বিরাট অকল্যাণ! প্রথম-মিলনের সমস্ত সৌন্দর্যবোধকে, সমস্ত সুষমাকে মানুষের এই লোভ চূর্ণ ক'রে দেয়—চূর্ণ করে দেয় তাদের আগামী জীবনের পাথেয় সম্পদকে। কিছুদিন আগে, আমার মনে হয় আপনারা

সকলেই জানেন, ঢাকায় এর একটী মর্মান্তিক দৃশ্য ঘটে' গেছে—এ দৃশ্য বাংলায় বিরল নয়—অর্থাভাবে শেষ পর্যন্ত মেয়েটী আত্মহত্যা করল—দিল নিষ্কৃতি তার অভিভাবকদের। চির জীবনের মত তাদের চিন্তার হাত থেকে উদ্ধার ক'রে গেল! আপনারা ভেবে দেখুন, আজ [illegible]াংলার ঘরে ঘরে এই সমস্যা—বাঙ্লার ঘরে ঘরে এই [illegible] ক্রন্দন—এই অনূঢ়া কন্যা-কুমারী-ভগ্নীদের জীবনের [illegible]স্তর-বেদনা!

[illegible] ভেবে আশ্চর্য হই, কেন মানুষের এই সমস্ত [illegible]র্থক-মুহূর্তে তাদের চোখে অর্থটাই স্থূল হ'য়ে উঠ্বে? কেন তারা বরাসন থেকে বরকে তুলে নিয়ে যা[illegible] সামান্য কিছু পণ কম পেয়েছে বলে'? কেন? কেন [illegible]রা মনুষ্যত্বকে ভুল্বে, কেন তারা আত্মাবমাননা করবে—[illegible]রবে অসম্মান, নিজেদের অসম্মান—সমস্ত জাতির অসম্মান—বিধাতার অসম্মান, বিধাতার সার্থক সৃষ্টির [illegible]মান!"

আবার সমস্ত সভাগৃহ করতালির শব্দে মুখর হ'য়ে উঠ্ল।

উত্তেজনায় মল্লিকার সারা শরীর থর-থর ক'রে কাঁপছিল। কোনও রকমে টেবিলের ওপরে সে নিজেকে সাম্লে নিলে।

"তাই—" অপেক্ষাকৃত নরম কণ্ঠে মল্লিকা বল্লে, "তাই এই পণপ্রথার বিরুদ্ধেই আমাদের বর্তমান অভিযান। আমাদের সঙ্ঘের শাখাপ্রশাখা আজ সমস্ত বাঙ্লার গ্রামে গ্রামে প্রসারিত হ'য়েছে—আরও প্রসারিত করতে হ'বে—আরও প্রচারিত করতে হ'বে। আপনাদের কাছে আজ আমার বিনীত নিবেদন এই—আপনারা আমাদের সহযোগিতা করুন—আমাদের উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলুন।

"কিছুদিন আগে কোনও বিখ্যাত পত্রিকায় আমাদেরই কোনও ভগ্নী এই নিয়ে দীর্ঘ অভিযোগ ক'রে সম্পাদকের কাছে পত্র লিখেছিলেন—সম্পাদক অবশ্য তা' প্রকাশ ক'রেছিলেন, কিন্তু তার বিরুদ্ধে, পরে যে সমস্ত দুর্বল যুক্তি দিয়ে পত্র প্রকাশিত হ'য়েছিল তা' আপনারা সকলেই দেখেছেন—কি অসহায়ভাবে, কি নিরুপায়ভাবে আমাদের আক্রমণ করা হ'য়েছে!

"আজ আপনাদের অনেকটা মূল্যবান্ সময় আমি নষ্ট ক'রেছি—অনেক রূঢ়, কঠিন কথা আজ আমাকে বাধ্য হ'য়েই বল্তে হ'ল—যদি কোনও ত্রুটি ঘটে' থাকে, তা'হলে আপনারা আমায় নিজগুণে ক্ষমা ক'রে নেবেন।

"বর্তমানে কাশীতে আমাদের একটী শাখাকেন্দ্র খোলা হ'য়েছে, আমরা সেখানে উপযুক্ত কর্তব্যপরায়ণা কয়েকটী ভগ্নীকে সহযোগিনী হিসেবে পেতে চাই, এর জন্যে তাঁদের উপযুক্ত সমস্ত ব্যয়ভারই আমরা বহন করব; যাঁরা যেতে প্রস্তুত, তাঁরা সঙ্ঘে আজকে ৫টার মধ্যেই আবেদন করবেন।

"সকলের শেষে আর একবার আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ভেবে দেখুন আমরা আজ কোন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আছি—কোন মহা অকল্যাণের অশুভ ইঙ্গিতে তিলে তিলে এগিয়ে চ'লেছি বিরাট্ ধ্বংস-গহ্বরের অভিমুখে। আমরা মানুষ, আমাদের কি জীবন নেই—আমাদের কি সত্তা নেই—আমরা কি মৃত—আমরা কি চিরকালই এ অসম্মান-কলঙ্কিত হ'য়ে, যুগ যুগ লাঞ্ছিত অন্ধ সংস্কারের পদদলিত হ'য়েই দিন কাটাবো? আপনারা মানী—আপনারা বিদুষী, আপনারা বুঝুন—আপনারা সমস্ত শরীর দিয়ে, সমস্ত চেতনা দিয়ে অনুভব করুন—এই বিরাট্ দুঃখকে—এই বিরাট্ দৈন্যকে, আপনাদের কাছে আজ আমার অন্তরের এই একান্ত নিবেদন—একান্ত প্রার্থনা!"

সমস্ত সভাগৃহ এবার করতালি-ধ্বনিতে ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হল। মল্লিকা কোন রকমে টল্তে টল্তে এসে ইজি-চেয়ারের ওপরে ব'সে পড়ল, উত্তেজনায় তার সমস্ত শরীর তখনও থর-থর!

অনেকক্ষণ পরে করতালি-ধ্বনি থাম্ল। মঞ্জুদি গার্গীর দিকে চাইলেন, বললেন, "বল্বি কিছু?" গার্গী মাথা নাড়ল, "শরীরটা মোটেই ভাল নেই মঞ্জুদি," মঞ্জুদি আভার দিকে চাইলেন—আভাও মাথা নাড়ল।

একটু ইতঃস্তত করে মঞ্জুদি উঠে দাঁড়ালেন, সমস্ত সভা মুহূর্তে নিস্তব্ধ হ'ল—একটা ছুঁচ পড়লেও শোনা যায়।

সভার দিকে চেয়ে এক মুহূর্ত মঞ্জুদি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপরে ধীরে অতি মৃদু কণ্ঠে বল্লেন:

"একটু আগে আমার পরম প্রিয়তমা ভগ্নী [illegible]

মল্লিকা দেবী যা' বললেন, তার মধ্যে আমার নিজের অনেক কথাই বলা হ'য়ে গেছে। আজ আমাদের মনে রাখ্‌তে হ'বে কোন্ দেশে আমাদের জন্ম—কোন্ রক্ত আমাদের দেহে প্রবাহিত হ'য়েছে। এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের মাটীতে জন্মে' আমাদের আজকের এই অন্ধসংস্কার, অন্ধ-অনুকৃতিকে দূর করতে হ'বে। একদিন এই ভারতবর্ষেই জন্মেছিলেন লীলাবতী, ক্ষণা, গার্গী, মৈত্রেয়ী—একদিন এই ভারতবর্ষে কুমারী সঙ্ঘমিত্রা প্রচুর কীর্তি রেখে গেছেন—আমাদের মধ্যেই জন্মেছিলেন রাণী দুর্গাবতী, সংযুক্তা, সীতা, সাবিত্রী, রাণী ভবানী ও দেবী উর্মিলা। আজ এই ঘন দুর্যোগের দিনে আমরা যেন সে কথা না ভুলি। প্রতি পদে প্রতি পদক্ষেপে আমরা যেন মনে রাখি—এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে আমাদের জন্ম।"

এদিকে ওদিকে সামান্য হাততালি পড়ল একবার।

"একটু আগে প্রিয়তমা ভগ্নী মল্লিকা দেবী আমাদের সংস্কারের বিরুদ্ধে রূঢ় ইংগিত ক'রেছেন—আজ আমরা যেন সেই ইংগিতকে অবহেলা না করি!

"সংস্কার কোন দেশে নেই? একদা মিশরে স্ত্রী মারা গেলে স্বামীর সেই সঙ্গে জীবন্ত অবস্থায় কবরে যাওয়ার প্রথা ছিল—জাপানে আজও আত্মহত্যা করাকে পরম পুণ্যকার্য ব'লে অভিহিত করা হয়—জাপানের হারিকিরির কথা আপনারা সকলেই জানেন—ফুজিয়ামার অগ্ন্যুৎপাতনিবারণের যে পৈশাচিক প্রথা তাদের মধ্যে প্রচলিত, তা' শুন্‌লে আমরা অবাক্-বিস্ময়ে স্তম্ভিত হ'য়ে যাই; প্রত্যেক বছরে একজন, সময়ে সময়ে একাধিক যুবতী নারীকে নিয়ে গিয়ে আগ্নেয়গিরির ক্রেটার-গহ্বরের ভেতরে ফেলে দেওয়া হয়—ধারণা, অগ্নিদেব সেই হতভাগিনী যুবতীটিকে পেয়ে শান্ত থাক্‌বেন, অগ্ন্যুৎপাতে সমস্ত দেশ আর পর্য্যুদস্ত হ'বে না।

"তাই বল্‌ছি, সংস্কার কোন দেশে নেই, পৃথিবী[illegible] আদিম যুগ থেকেই আমাদের এই সব সংস্কা[illegible] যেদিন থেকে মানুষ নিজেদেরকে চিন্‌তে[illegible] সেদিন থেকেই সংস্কারের ভিত্তি আরও [illegible] উঠ্‌তে লাগ্‌ল' মানব-সভ্যতার এ একটা [illegible] অভিশাপ, মানব-সভ্যতার এ একটা গলিত অংশ।

"আজ আমার শরীর অসুস্থ—অসুস্থ দেহ নিয়ে [illegible] কথা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়; শ্রীমতী মল্লিকা [illegible] যা' ব'লেছেন আপনারা সকলেই তা' শুনেছেন, আমার অন্তরের একান্ত প্রার্থনা তাই। আপনারা আমাদের উদ্বু[illegible] করুন, আপনারা আমাদের প্রেরণা দিন—বলুন একওদের এক কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে 'বন্দেমাতরম্'—বলুন 'সুজলাং সুফলাং শস্যশ্যামলং বন্দেমাতরম্'—বলুন, হে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ, হে পৃথিবীর প্রথম সভ্যতার শ্রেষ্ঠ জন্মস্থান, হে মাতঃ ভারতবর্ষ, আমরা যেন কোনদিনই তোমার অসম্মান না করি। কোনদিনই যেন তোমার অযোগ্য না হই—বলুন: বন্দেমাতরম্"।

সমস্ত সভাগৃহ বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে ধ্বনিত হ'য়ে উঠ্‌লো। মঞ্জুদি ধীরে ধীরে আসন গ্রহণ করলেন।

(ক্রমশঃ)

প্রণতি

শ্রীদেবব্রত মজুমদার (নীলু)

বিশ্বকবি হে রবীন্দ্র গিয়াছ সে কোন্ স্বর্গলোকে
অমর করিয়া অবদান তব নিখিল কল্পলোকে।
স্বরগ হইতে লও হে প্রণতি কর হে আশীর্ব্বাদ
তোমার আশীষে অমৃত হবে জীবন নির্ব্বিবাদ।

স্কট্‌ল্যাণ্ডে কয়েকদিন

শ্রীমতিলাল দাশ

(২)

৮ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার। পরদিন প্রাতরাশে ড্রেসিং গাউন পরিয়াই গিয়াছি, তাহাতে মিস টমসন রুষ্ট হইয়া টীকাটব্য করিলেন। মিস টমসন হৃদয়ের খেলায় [illegible] বিঁধিতে না পারিয়া এখানেই পরিচালিকার [illegible]ছেন, কিন্তু নবাগতের অজ্ঞানকৃত অপরাধে [illegible] তাহার পক্ষে অন্যায় হইয়াছিল এবং [illegible]শয় বেদনা অনুভব করিয়াছিলাম। এখানে [illegible]শেষ করিয়া বাসে করিয়া ফোর্থ সেতু দেখিতে [illegible]। ফোর্থ সেতু আমাদের দেশের হাডিঞ্জ ব্রিজের [illegible]নায় অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু স্কচেরা ইহাকে অতিশয় [illegible] মনে করে। একটী গাইড বুকের মন্তব্য তুলিতেছি :

"The bridge is one of the wonders of [illegible]otland, with its gigantic cantilevers [illegible] a mile and a half of shore and river. [illegible]e cost of that incalculably beneficient work of man was well less than a third of that of a battleship."

এই সেতুটি ডালমেনি নামক স্থানে অবস্থিত—বাসে আধ ঘণ্টার মধ্যে যাওয়া যায়। পথের শোভাটি চমৎকার লাগিল। বিস্তৃত নদীর উপর সুগঠিত সেতু প্রভাত-সূর্য্যে ঝলমল করিতেছিল। নদী পার হইয়া অপর পারে খানিক দূর অগ্রসর হইয়া গেলাম। একটী চাষীর বাড়ী গোবর জমাইয়া রাখিয়াছে—ঠিক আমাদের দেশেরই মত। শূকরের পাল কিলবিল করিতেছে। তাহাদের খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মনে হইল না। ফিরিবার পথে একটী লোক ধরিয়া বসিল—তাহার নিকট ছবি তুলিলাম—এই ছবি স্থায়ী হয় নাই।

এখান হইতে ফিরিয়া প্রিন্সেস ষ্ট্রীটের সম্মুখস্থ এবং ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী পুষ্পোদ্যানে বসিয়া ফল প্রভৃতি দিয়া মধ্যাহ্নভোজন শেষ করিলাম। প্রিন্সেস ষ্ট্রীট এডিনবরার চৌরঙ্গী—প্রায় এক মাইল লম্বা, ইহারই দুই পাশে সহরের বড় বড় হোটেল দোকানপসার। স্কচেরা এই রাজপথকে পৃথিবীর সুন্দরতম পথের অন্যতম মনে করে। পায়ে চলার সান-বাঁধানো পথটি চওড়া—তাহার পাশে সুসজ্জিত বিপণি, নৃত্যশালা, ক্লাব ঘর, হোটেল ও পানশালা অবিরল জনস্রোতঃ চলিয়াছে—অন্য দিকে নগরের উদ্যান—তাহার পর উচ্চ শৈলশিখরে প্রাসাদ—এই দৃশ্যটি সত্যই মনোমোহন। প্রাসাদ অতীতের সাক্ষী—অতীতের রাজা ও রাণীর, রাজকুমার ও রাজকুমারীদের জীবনের লীলাচঞ্চল অভিনয়ের মূক সাক্ষী—ইতিহাস ও কিম্বদন্তীর বাসভূমি, আর প্রিন্সেস ষ্ট্রীট বর্ত্তমান—চলন্ত যুগের প্রতীক। ইহাদের বৈষম্যটী হৃদয়কে প্রসন্ন করে।

এই রাজপথের মাঝখানে স্কটের স্মৃতিস্তম্ভ পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই স্তম্ভটি ২০০ ফুট উচ্চে—খিলানের পর খিলান উঠিয়াছে, খিলানগুলি কমিতে কমিতে সর্ব্বশেষে একটী চূড়ায় পরিণত হইয়াছে। এই স্তম্ভটি ইহাদের খুব প্রিয়। ইহার ছবি ইহারা যত্র তত্র ব্যবহার করিয়া জাতির শ্রদ্ধা জানায়।

সার ওয়াল্টার স্কট ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে এডিনবরা সহরে জন্মগ্রহণ করেন। স্কটের সমস্ত রচনার মধ্যে তাঁহার কবি-প্রাণ সুপ্ত আছে। নিসর্গের নানাবিধ মূর্ত্তি ও ভঙ্গী তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন ও আপন রচনায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা তাঁহার বৈশিষ্ট্য নয়। অতীতের কাহিনীর প্রতি তাঁহার অন্তরের গভীর টান ছিল—তিনি স্কট্‌ল্যাণ্ডের প্রাচীন পুরাণকে রূপ দিয়া জাতির অন্তর জাগাইয়াছিলেন, তাই তাঁহার রচনা চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

তাঁহার লেখা সম্বন্ধে একজন ইংরাজ সমালোচকের মত তুলিতেছি—"As a painter of manners he always excelled in the just quotations, vividness and life-like realities of his representations. To these qualities, it is due that he was able, if not to reproduce the past at least to make semblance of a revival live upon his page. His study of character was rather that of a keen observer, with

large share of genial humour, than of a porfound analyst. His well-dressed character in ordinary situations talk and act with conventional stiffness. It is in exciting situations or in painting humble life alone, that Scott allows himself full scope and in the latter his characters are rich, raised, full of humour and pathos and even full of life."

চরিত্র-চিত্রণে, ঘটনাসংস্থানে, বর্ণনার মাধুর্য্যে এবং সর্ব্বোপরি জাতির চরিত্রের প্রতি গভীর প্রীতির জন্য স্কট জাতির আদর্শ হইয়া আছেন। তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্র অনুপম। এই নর-বীরের প্রশস্তি-স্তম্ভ রচনা করিয়া ইহারা বীর-পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন। স্কটের মর্ম্মরমূর্ত্তি ভাস্কর ষ্টীলের অবদান আর স্থাপত্যশিল্পী কেম্পের রচনা। প্রিন্সেস ষ্ট্রীট পূর্ব্ব ও পশ্চিমে দীর্ঘ—উদ্যানটিও সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। পূর্ব্ব ও পশ্চিমে উদ্যানের মধ্যভাগে একটী কৃত্রিম মৃত্তিকাস্তূপ রচনা করা হইয়াছে। এইখানে দুইটী চিত্রশালা অবস্থিত, একটী রয়াল স্কটিশ একাডেমি, অপরটি স্কটল্যাণ্ডের ন্যাশন্যাল গ্যালারী।

মধ্যাহ্নভোজন শেষ করিয়া প্রথমে Giles Church দেখিতে গেলাম। সেখান হইতে পার্লিয়ামেণ্ট-হল দেখিয়া ন্যাশন্যাল গ্যালারী দেখিতে আসিলাম। এই চিত্রশালায় য়ুরোপীয় চিত্রবিদ্যার নানা যুগের ও নানা দেশের শ্রেষ্ঠ চিত্রকরদের ছবি সংগৃহীত আছে। তাহা ছাড়া স্কচ চিত্রকরদের ছবি পর্য্যায়ক্রমে সংগৃহীত আছে। ইহাতে বিখ্যাত চিত্রকর জেমিসন, উইলকি, ম্যাকুলক, নোয়েল প্যাটন, অটার্ডসন, স্যাম বাউ, ম্যাক্ ট্যাগার্ট প্রভৃতির সুন্দর চিত্রগুলি দর্শককে স্কচ চিত্র-রচনার একটী সংক্ষেপ পরিণতি বুঝাইয়া দেয়।

একাডেমী তাহাদের বাৎসরিক চিত্রকলা প্রদর্শনী, এপ্রিল হইতে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত অনুষ্ঠান করে। বৎসরের অন্য সময়েও কিছু কিছু প্রদর্শনী হয়।

সেখান হইতে ইহাদের ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী দেখিলাম। তাহার পর শেরিফ কোর্টে গিয়া ইহাদের বিচার-প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিলাম। পথে Midlothian county-council-গৃহ দেখিয়া লইলাম। পৌর-শাসনভবনটি সারল্য এবং সজ্জায় অনুপম। এখান হইতে জন নক্সের বাড়ী দেখিতে গেলাম। প্রত্নতত্ত্ব ইহাদের যেন মজ্জায় মজ্জায় গ্রথিত—প্রথিতযশা ব্যক্তিদিগের সম্মানের জন্য তাহাদের গৃহকে ইহারা জাতীয় মন্দির করিয়া তোলে। ইহাদের এই প্রীতির সহিত আমাদের দেশের নির্ম্মম ঔদাসীন্য তুলনা করিলে ব্যথিত হইতে হয়। জন নক্[illegible] ভবন দেখিয়া Holyrood house দেখিতে [illegible] কিন্তু এই গৃহ বন্ধ হইবার সময় হওয়ায় [illegible] স্মৃতি-মন্দির দেখিয়া লইলাম।

জর্জ্জ ষ্ট্রীটে এই স্মৃতি-মন্দির। এই রা[illegible] প্রসিদ্ধ লোকের স্মৃতি-সৌরভে সৌরভিত। [illegible] শেলী অপ্রাপ্তবয়স্কা হ্যারিয়েটকে বিবাহ করিতে না[illegible] এখানেই পলাইয়া আসিয়া বাসা করেন। স্কট, ডিকুই[illegible] ডিকেন্স, কালাসি এবং রবার্ট লুসি ষ্টিভেন্সন্ প্রভৃ[illegible] নামজাদা সাহিত্যিকগণ এই স্থানে অবস্থান করেন।

বার্ণসের কবিতায় দরিদ্রের ব্যথা ও [illegible] হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার প্রেমের কবিতাও [illegible] অমরত্ব লাভ করিয়াছে। আমার প্রেয়সী যেন [illegible] গোলাপের মালা (My love is like a red rose) অতি প্রসিদ্ধ এবং প্রিয় গান। মনুষ্যত্বের মহিমাও কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে। তিনিই গাহিয়াছিলেন—পদ-মর্য্যাদা কিছু নয়, সে যেন সোণার উপর ছাপা, মানুষ মানুষ হিসাবেই ছোট বড়।

তারপর রাজকীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের পাশ দিয়া ক্যালটন পাহাড়ে চড়িলাম। এই শৈল-শিখরে জাতীয় মনুমেণ্ট অসমাপ্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে ওয়াটার্লু যুদ্ধে এবং পেনিনসুলার ওয়ারে স্কটিশ সৈন্যদের বীরত্বের স্মারক এই স্তম্ভনির্ম্মাণ আরম্ভ হয়, কিন্তু অর্থাভাবে তাহা সমাপ্ত হয় নাই।

ইহা কলঙ্কের বিষয়, কিন্তু এই অর্দ্ধসমাপ্ত স্থাপত্যের সৌন্দর্য্য মন্দ নয়। একজন লেখক লিখিয়াছেন—"The great fluted pillars and the architecture are in themselves satisfying." এই পাহাড়টিতে প্রাচীন ও নবীন নগরের একটী চমৎকার ছবি দর্শককে বিমোহিত করে।

এই শৈলচূড়ার অবজারভেটরীর সন্নিকটে নেল্‌সন টাওয়ার অবস্থিত। এখানকার কবরখানায় আব্রাহাম লিনকনের একটী সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি আছে। আমেরিকান ভ্রমণকারীরা তাহা দেখিতে ভীড় জমান।

দিনের শেষে ক্লান্ত হইয়া যখন বাসায় ফিরিলাম, তখন ক্লার্ক ফোন করিলেন। তাঁহাকে আসিতে বলিলাম। [illegible] জন, সুপুরুষ, নিজের মোটর নিয়া আসিয়া- [illegible]প সুরু করিলেন—"আপনি একজন [illegible] তাঁহাকে আমার কার্ডটি দিলাম— [illegible]র নামের পাশে জুনিয়র জজ কথাটি

[illegible] ইবার সময়ে কলিকাতার প্রধান বিচারপতি [illegible]কে যে পরিচয়-পত্র দেন, তাহাতেই আমাকে জুনিয়র [illegible] লেখেন। তাঁহার এই সংজ্ঞাটি আমি গ্রহণ [illegible]শে মুন্সেফ বলিলে কেহ কিছু বুঝিবেনা। [illegible] দিগকে অতিশয় সম্মান করে। রাষ্ট্রের [illegible]—নিয়মস্থাপন এবং প্রবর্ত্তন। আইনের [illegible] সমাজ বিধৃত। বিচারক নির্ভীক এবং সত্যানুসন্ধী হইয়া নিয়ম প্রবর্ত্তন করেন, তাই সমাজে তাঁহার মর্য্যাদা এবং সম্মান অসীম। নিয়মানুগত্য আমাদের স্বভাবধর্ম্ম নয়, বিচারককে তাঁহার পদানুরূপে সম্মান আমরা কদাচিৎ দেই। মিঃ ক্লার্ক বলিলেন—"আমাদের যতটুকু সাধ্য আপনাকে সাহায্য করব, তা'ছাড়া আপনি আবার আমার মক্কেল সিন্‌ক্লেয়ারের বন্ধু—কাল আমার আফিসে যাবেন, আজ চলুন আপনাকে আমাদের সহরটি দেখিয়ে নিয়ে আসি—"

তাঁহার অনুরোধে সম্মত হইয়া বাহির হইলাম। স্নিগ্ধ আলোকে নগরের রূপ চোখে মধুময় মনে হইল। আমরা সহর ছাড়াইয়া আর্থারস্ সিট নামক শৈলচূড়ায় গেলাম। রাজা আর্থার বৃটেনের পৌরাণিক সম্রাট্—ন্যায় ও সত্যের আশ্রয়। তাঁহাকে ঘিরিয়া নানা কাহিনী ও পুরাণ গড়িয়া উঠিয়াছে। কবি টেনিসন এই আর্থার পুরাণ লইয়া চমৎকার কাব্য রচনা করিয়াছেন। আর্থার প্রয়াণের কয়েক পঙ্‌ক্তি তুলিতেছি—আর্থার শেষ যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত—বীডিভার ব্যতীত সমস্ত পার্শ্বচর মৃত—বীডিভার নৃপতির শোচনীয় অধঃপতনে দুঃখিত। তখন আর্থার তাঁহাকে কহিতেছেন :—

পোত হতে ধীর কণ্ঠে কহেন আর্থার বাণী :—

"পুরাতন পরিবর্ত্তি নূতন বিধান আনে,
বিধাতা বিধান তার পালেন বিবিধরূপে
সুন্দর বিধান শেষে পঙ্কিল না করে ধরা
তাই চলে নিত্যদিন—নব নব বিবর্ত্তন।
আপনি সান্ত্বনা লভ, কি সান্ত্বনা দিব আমি ?
আমার জীবন অর্ঘ্য, জীবনের ক্ষুদ্র কাজ
পবিত্র করুন বিধি, অসীম করুণা তাঁর।
কিন্তু তুমি এ বিচ্ছেদে কাতর সন্তপ্তাদি
আত্মার কল্যাণে মম করিও প্রার্থনা নিতি
বিশ্বের অচিন্ত্য শত অমোঘ কল্যাণধারা
প্রার্থনার জাত জেন। উচ্ছ্বসিত ফোয়ারার
জলধারা সম, রাত্রি-দিবা প্রার্থনা তোমার
উঠুক আমার তরে, উন্নত মানব কিসে
অজ-মেষাদির চেয়ে, ভগবানে জানি যদি
না তুলে ভক্তিতে হস্ত নিত্য উপাসনা তরে,
বান্ধব ও আপনার শাশ্বত মঙ্গল যাচি'।
বিধাতার সিংহাসন যুক্ত জেন বিশ্ব সনে
প্রার্থনার স্বর্ণসূত্রে—বিদায়, বিদায়, বন্ধু !"

কিশোর বয়সে আর্থার-প্রয়াণের অনুবাদ করিয়াছিলাম। আর্থারস্ সিটে দাঁড়াইয়া দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরের দিকে চাহিয়া টেনিসনের এই অমর কবিতার কথা মনে পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল অতীত অতীত—যে যায়, তাহার ধূলি সেদিনের সেই সুন্দর সন্ধ্যাকে ব্যাকুল করে না।

এখান হইতে "স্যালিসবারি ক্র্যাগ" হইয়া আলোকিত পুরীর মধ্য দিয়া বাসায় ফিরিলাম। এই ক্ষণিকের বন্ধুকে তাঁহার সহৃদয়তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া হোটেলে ফিরিলাম।

আলোচনা —

বাঙ্গালার তথা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে "ব্যাস ও পরাশর ব্রাহ্মণ"

শাণ্ডিল্য শ্রীনীরদবরণ মিশ্র-চক্রবর্ত্তী, গৌড়

৩

ব্যাস ও পরাশর ব্রাহ্মণ সমাজ যে কেবল বাঙ্গালা দেশেই বাস করেন, তাহা নহে, তাঁহারা বিহার, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, রাজপুতনা, গুজরাট, বোম্বাই, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতেও বাস করিয়া থাকেন। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে—

বিহার প্রদেশে গৌড়ের শাখা ব্যাস ব্রাহ্মণঃ—

যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও কাশ্মীরে পরাশর ব্রাহ্মণঃ—

রিজলে সাহেব ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছেন যে, বিহার প্রদেশের গৌড়ব্রাহ্মণের একটি শাখার নাম "ব্যাস"। ২৬

আম্বালার পণ্ডিত পরশুরাম শাস্ত্রী "গৌরব্রাহ্মণ বংশেতিবৃত্তম" গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে (N. W. P.) "পরাশা" (পরাশর); জাগ্রোত, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, পাঞ্জাব ও জম্মু (কাশ্মীর) প্রদেশে "পরাশরিয়া" (পরাশর) এবং বংগাল (বাংলা) দেশে "পূর্ব্বিয়া গৌড়" ব্রাহ্মণগণ বাস করেন। ২৭ পূর্ব্ব-পাঞ্জাবের হিমালয়পাদদেশে কাংড়া জেলায় ব্যাসনদীর উপত্যকায় "দ্বিতীয় শ্রেণী পরাশর" ব্রাহ্মণ বাস করেন। ২৮ কুরুক্ষেত্র ও স্থানেশ্বর প্রদেশ এক্ষণে কর্ণাল জেলার অন্তর্গত। কুরুক্ষেত্র প্রদেশে বা কর্ণাল জেলায় গুজরাটি বা ব্যাস (বি+আস) ব্রাহ্মণগণ বাস করেন। ২৯ ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ২৮ ও ২৯ ডিসেম্বর দিল্লীতে "অখিলভারতবর্ষীয় ঔদীচ্য ব্রাহ্মণ মহাসভা"র বার্ষিক অধিবেশনে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহু প্রতিনিধি যোগদান করেন। তন্মধ্যে **ইহারা ব্যাস ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত।** ৺দুর্গাদাস লাহিড়ী পৃথিবীর ইতিহাস ভারতবর্ষে (৩৫৪ পৃঃ) লিখিয়াছেন— "গুজরাটের ঔদীচ্য ব্রাহ্মণগণকে অনেকে পঞ্চগৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণের শাখা বলিয়া মনে করেন। গুজরাটের ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ঔদীচ্য ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক। "পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশে আট লক্ষের অধিক গৌড় ব্রাহ্মণের বাস আছে।"

রাজপুতনায় ব্যাস ও পরাশর ব্রাহ্মণঃ—

টড সাহেবের "রাজস্থান" ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যাল[illegible] গণের বীরত্ব কাহিনী" গ্রন্থদ্বয়ে বাপ্পারাওয়ালের [illegible] জা[illegible] অরণ্য" ও "পরাশর ব্রাহ্মণের" উল্লেখ আছে। [illegible] এই আজমীঢ় ও মারওয়ারার সেন্সাস্ রিপোর্টে তন্মে[illegible] ব্রাহ্মণ ও ১২০৩ পরাশর ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে [illegible] শাস্ত্রী "গৌড়ব্রাহ্মণবংশেতিবৃত্তম" গ্রন্থে (পৃঃ ৪৬, সংখ্যা [illegible]) "**গৌড়-ব্যাস**" এবং পুষ্করে "পরাশরী" ব্র[illegible] প্রমাণ আছে। ৩২ রাজপুতনায় ৫৮৭,২১৬ গৌড়, মধ্যভারতে [illegible] শ্রীগৌড়, করোলী ষ্টেটে ৭৪২ গৌড় ও গোয়ালিয়রে [illegible] ব্রাহ্মণের বাস আছে। (১৯৩১ খৃষ্টাব্দের সেন্সাস [illegible] করেন।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে ব্যাস [illegible] ব্রাহ্মণঃ—

পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি "হিন্দু জাতি ও [illegible]" কাথিয়াবাড়ের দক্ষিণপূর্ব্বাংশস্থ "পরাশরিয়া" ব্রাহ্মণের উল্লেখ করিয়াছেন। ৩৩

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের বোম্বাইএর সেন্সাস্ রিপোর্টে ১২২ শ্রেণীর ব্রাহ্মণের মধ্যে গৌড়, সারস্বত (সেনভী), করাতিয়া বা কয়াতিয়া, মধ, (মধ্যশ্রেণী) পরাশর বা পরাজিয়া বা আহিরগৌড়, শ্রীগৌড়, গৌড়মালবী, ঔদীচ্য ও ব্যাস ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে। গুজরাট, কাথিয়াবাড় ও কচ্ছপ্রদেশে ৯৭০৪ জন মধ (মধ্য), গুজরাট প্রদেশে ব্যাস এবং কচ্ছ ও কাথিয়াবাড় প্রদেশে পরাশর বা আহীর গৌড় ব্রাহ্মণগণ বাস করেন। ইহারা পুরোহিত ও লেখকের কাজ করিয়া থাকেন। ৩৪ লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশিত নাগর-ব্রাহ্মণের গোত্র প্রবরাধ্যায় (নাগর পুষ্পাঞ্জলি) গ্রন্থে গুজরাটের নাগর-ব্রাহ্মণের "করোচিয়া ব্যাস" নামে একটি শাখার উল্লেখ আছে। ইহারা "করোতিয়া ব্যাস" নামেও খ্যাত। ৩৫

---

(২৬) H. H. Risley, Ethnographic Glossary, vol. II P. 359.

(২৭) গৌড়ব্রাহ্মণবংশেতিবৃত্তম, পৃষ্ঠা ৫৪-৫৬, সংখ্যা ৮৯৭, ৯৬৩ ও ৯৯১।

(২৮) Kangra District Gazetteer, 1904, pp. 64 & 158.

(২৯) Karnal District Gazetteer, 1884, P. 111.

(৩০) Tales of Rajput Chivalry, Chap. 1, P P. 3-5.

(৩১) Census Tables of Ajmeer & Marwara, 1931, P. 38.

(৩২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ১মাংশ, পৃঃ ৩৮; Indian Antiquary vol. XL, P 19

(৩৩) Hindu Castes and Sects, P. 8

(৩৪) Bombay Census Report, 1931 Part 1, pp 504 and 506

(৩৫) কায়স্থ সমাজ ১৩৩৫, পৌষ-মাঘ, পৃঃ ৪৮৫।

বাম্বাইএর করাতিয়া বা করাতিয়া ব্রাহ্মণগণ ব্যাস ব্রাহ্মণ। ঔদীপ ব্রাহ্মণগণ কুরুক্ষেত্র প্রদেশে ব্যাস ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত আছেন। এতদ্ব্যতীত বোম্বাই প্রদেশে ৩৫০০০ হাজার আদ্যগৌড় ব্রাহ্মণও আছেন।

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে ব্যাস ও পরাশর [illegible]:—

[illegible] হিড়ী মহাশয় লিখিয়াছেন—"দ্রাবিড়ী বা কর্ণাটক উপনিষদ [illegible]গর ব্রাহ্মণগণের......ব্যাস প্রভৃতি উপাধি। [illegible]দের ভাব[illegible]র নাম্বুরী-ব্রাহ্মণবংশে শঙ্করাচার্য্যের জন্ম অপূর্ব্ব আলো[illegible]ভিন্ন পত্তি, মুক্তা, এলেন্দু, রামানন্দ, উড়িল, [illegible] আচার্য্য [illegible]াশর) প্রভৃতি আরও বহু ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় [illegible] উপ[illegible] আছেন।৩৬ বোম্বাইএর পণ্ডিত হরিকৃষ্ণ [illegible] দয় কর্ণাটক ব্রাহ্মণগণের **ব্যাস** সম্প্রদায়ের উল্লেখ [illegible]ছেন।৩৭ দাক্ষিণাত্য দ্রাবির দেশ হইলেও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে ৪৮৫১ [illegible] কোচিন রাজ্যে ৬২৭ গৌড়, বরোদা রাজ্যে ৮৪৮ গৌড় [illegible] গোয়া ও মহীশূর রাজ্যেও বহু আদ্য—গৌড় [illegible]

[illegible]ত ও সম্প্রদায়" গ্রন্থে ব্যাস ও [illegible] ব্রাহ্মণঃ—

সেরিং সাহেব "হিন্দুজাতি ও সম্প্রদায়" গ্রন্থে গৌড় ব্রাহ্মণের ২৭টী শাখার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে আদি-গৌড়, পুবিয়া-গৌড়, কাকারিয়া (করাতিয়া ব্যাস), পারিখ (পরাশর), ও ব্যাস শ্রেণী আছে।৩৮

গৌড়পাদাচার্য্যের "সর্ব্বব্রাহ্মণবৃত্তভাস্করে' ব্যাস ও পরাশর ব্রাহ্মণ:—

৭ম শতাব্দীতে কামরূপ হইতে গৌড়ে আসিবার পথে গৌড়-পাদাচার্য্যের সহিত শঙ্করাচার্য্যের সাক্ষাৎ হয়। গৌড়পাদের শিষ্য গোবিন্দপাদ এবং গোবিন্দপাদের শিষ্য শঙ্করাচার্য্য। অতএব গৌড়পাদ শঙ্করের মহাগুরু।৩৯ গৌড়পাদ গৌড়ব্রাহ্মণের ৪৫টি শাখার মধ্যে ব্যাস ও পরাশর নামক দুইটি শাখারও উল্লেখ করিয়াছেন।৪০

ব্রাহ্মণোৎপত্তি-মার্ত্তণ্ডে ব্যাস ও পরাশর ব্রাহ্মণ—

বোম্বাইএর পণ্ডিত হরিকৃষ্ণ শাস্ত্রী "ব্রাহ্মণোৎপত্তি-মার্ত্তণ্ড" গ্রন্থে ভারতীয় ১০৮টী ব্রাহ্মণ শ্রেণীর মধ্যে ব্যাস ও পরাশর শ্রেণীরও উল্লেখ করিয়াছেন। পুরাণ পাঠককে পৌরাণিক ব্যাস কহে। কর্ণাটক ব্রাহ্মণ মধ্যে ব্যাস শাখা এবং মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ মধ্যে ব্যাস গোত্র আছে। নীলকণ্ঠ-বিরচিত দধীচ-সংহিতায় "দধীচি-সারস্বত" হইতে সারস্বত, ও দাহিমা এবং দধীচিকুলোৎপন্ন পরাশর হইতে পারিখ ও পরাশর ব্রাহ্মণের উৎপত্তি লিখিত হইয়াছে। ইহারা পঞ্চ-গৌড় মধ্যে বহুধা গৌড় সম্প্রদায়।৪১

ভারতের বিভিন্ন শ্রেণী-ব্রাহ্মণ মধ্যে ব্যাস ও পরাশর গোত্র ও পদবী—

ঔদীচ্যসহস্র, টোলকাখ্য ঔদীচ্য, শ্রীমালী, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্রীয়, ক্মারোলা, গুগগুলী, নাগর, গিরিনারায়ণ, কণ্ডোল, চিৎপাবন, কান্যকুব্জ-সরযুপারী, আদি-গৌড়, শ্রীগৌড়, দধীচকুলোৎপন্ন গৌড়; দাহিমা, গুর্জ্জর-বায়ড়া, দিসাবল, রায়কবাল, রোয়ডা-গারুড়া, ভট্ট-মেবাড়, অনাবলা-ভাটোলা, আদি গৌড়ের শাখা সনাঢ্য, সপ্তশতী, পাশ্চাত্য-বৈদিক, গ্রহবিপ্র ও গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ব্যাস ও পরাশর অবটঙ্ক (পদবী) এবং ব্যাস, পারাশর্য্য ও পরাশর গোত্র আছে। ঔদীচ্য-টোলকাখ্য ব্রাহ্মণের ব্যাস ও ব্যাসত্ব পদবী ও তৈলঙ্গ-বল্লভাচার্য্য ব্রাহ্মণের "শ্রীমদ্‌চক্রবর্ত্তী" পদবী আছে।৪২

বৈদিক যুগের বেদ-ব্যাখ্যাতা ২৯টী ব্যাস—

বিষ্ণু পুরাণের তৃতীয়াংশে ২৮টী পুরাতন বেদব্যাস এবং দ্রৌণিকে লইয়া ২৯টী ব্যাসের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। (৩য় অধ্যায়)। দেবী ভাগবত (১৷৩৷৩৩), কূর্ম্ম-পুরাণ (৫১ অঃ) ও লিঙ্গ-পুরাণেও (২৪৷১২—১২৫), উক্ত ২৮টী ব্যাসের তালিকা আছে। ব্যুৎপত্তি বেদান্ ইতি ব্যাসঃ। বি—অস্‌+ঘঙ্‌ (শাস্ত্রার্থ বিশেষরূপে ক্ষেপণে) ব্যাসঃ শব্দ উৎপন্ন।

ব্যাস ব্রাহ্মণের সংজ্ঞা—

যে ব্রাহ্মণ পবিত্রচিত্ত, শুদ্ধমনা, এবং বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ ও অন্যান্য শাস্ত্রের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে স্পষ্ট, অদ্রুত, রসভাবযুক্ত কোকিল-কণ্ঠে বুঝাইয়া দিতে পারেন, তিনিই "ব্যাস" উক্ত হন। ভবিষ্যপুরাণে ও স্মার্ত্ত-তিথি-তত্ত্বে ব্যাস ব্রাহ্মণের সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে।৪৩ ব্যাস উপাধিটি কেবল ব্রাহ্মণেরও বিশেষণ।

(৩৬) পৃথিবীর ইতিহাস ভারতবর্ষ ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫৪-৩৫৬।

(৩৭) ব্রাহ্মণোৎপত্তি মার্ত্তণ্ড, ১১৯-১২০ পৃঃ।

(৩৮) Hindu Tribes & Sects vol. I, pp 68-69; হিন্দী গৌড় হিতকরী, মথুরা, ১৯২৮, অক্টোবর পৃঃ ১০।

(৩৯) মাধবীয় শঙ্কর চরিত।

(৪০) সর্ব্ব-ব্রাহ্মণ বৃত্ত ভাস্কর, গৌড় হিতকরী, ১৯২৮, ফেব্রুয়ারী, পৃঃ ১০।

(৪১) ব্রাহ্মণোৎপত্তি-মার্ত্তণ্ড, পৃঃ ৬, ৮৯, ১১৯-১২০, ১৪৮, ৪৩৭-৫১, ৪৪৯।

(৪২) ব্রাহ্মণোৎপত্তি-মার্ত্তণ্ড; বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস-ব্রাহ্মণ-কাণ্ড; গ্রহবিপ্র ইতিহাস। Bengal Census Report, 1931. P. 462.

(৪৩) শব্দকল্পদ্রুম, প্রকৃতিবাদ-অভিধান।

কোথাও কোথাও "ব্যাস+উক্ত" পদটী মিলিয়া "ব্যাসোক্ত" পদ হইয়া গিয়াছে।

ব্যাসব্রাহ্মণশ্রেণী—

পুরাণ পাঠে জানা যায় যে, প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে ব্যাস ব্রাহ্মণ শ্রেণী বিদ্যমান আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে "কবিগণের ব্যাস" (১১।১৬।২৭), ভাগবদ্গীতায় "মুনিগণের ব্যাস" (১০।৩৭), শিব পুরাণে "ব্যাসরূপ আচার্য্য" (৬৫ অধ্যায়), আধ্যাত্ম-রামায়ণে "ব্যাস-মুখ্য বিপ্রগণ" (১।৪০), স্মৃতিতে "ব্যাসসম দ্বিজগণ", স্কন্দ-পুরাণীয় সহ্যাদ্রিখণ্ডে "গৌড়বিপ্র ও দ্রাবিড় বিপ্রগণের মধ্যে পণ্ডিত কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যাসগণ" (উত্তরার্দ্ধ, ৬ অঃ, ১৬—১৯ শ্লোক), বৃহদ্ব্যাস সংহিতায় (৩।১০।৩) "ব্রহ্মপুত্র মহর্ষি বোঢ়ূর ব্যাস" আখ্যা (৩।১০) লিখিত আছে। পুরুষানুক্রমে ব্যাস উপাধি পাওয়ায়, ইহা কৌলিক শব্দে পরিণত হইয়াছে। এইরূপে ব্যাসব্রাহ্মণশ্রেণী গঠিত হইয়াছে।

বাঙ্গলার পাঠক ও কথক ব্যাস-ব্রাহ্মণ—

শব্দকল্পদ্রুম, প্রকৃতিবাদ-অভিধান, প্রকৃতিবোধ-অভিধান প্রভৃতি শব্দগ্রন্থে ব্যাস শব্দের অন্যান্য অর্থের মধ্যে "পাঠক ব্রাহ্মণঃ" "পুরাণাদি শাস্ত্রবক্তা" "কথক" অর্থও লিপিবদ্ধ আছে। কথকের নাম "ব্যাস" বলিয়া কথকের আসন "ব্যাসাসন" নামে খ্যাত। বৈদিক সাহিত্যে পুরাণের উল্লেখ আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদ্, বৃহদারণ্যক, অথর্ব্ববেদ, গোপথ ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় আরণ্যক, শতপথ ব্রাহ্মণ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, কৌশিতকী ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ; মহাভারত, চাণক্যের অর্থশাস্ত্র, যাভা ও বলিদ্বীপের চিত্রে, বজ্রশ্রী ও গুপ্তরাজত্বকালে, মিলিন্দ প্রশ্নে, পবন-প্রোক্তে, ৭ম—৯ম শতাব্দীতে, পালরাজগণের তাম্রশাসন, সমসাময়িক লিপি ও গ্রন্থে, আলবারুণীর বিবরণে পুরাণ ও পৌরাণিক ব্যাস-ব্রাহ্মণের উল্লেখ পাওয়া যায়। ডক্টর দীনেশ সেন "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে বাঙ্গালার প্রাচীন কথকগণের উল্লেখ করিয়াছেন।[৪৪] ৺রমেশচন্দ্র দত্ত বাঙ্গালার প্রাচীন কথকগণের পুরুষানুক্রমে কথকতার বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।[৪৫] দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন—"A class of reciters called kathakas have flourished in this country from olden times......and preserve from age to age the literary heritage of the nation." ইহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, বাঙ্গালা দেশের যুগযুগান্তর ধরিয়া একশ্রেণীর কথক, পাঠক বা ব্যাস ব্রাহ্মণ বিদ্যমান আছেন। পুরাণ পাঠ বা কথকতা তাঁহাদের একচেটিয়া ব্যবসায় ছিল। তাই [illegible] পঞ্চানন লিখিয়াছেন—"ব্যাস—এক জাতি (a cl[illegible] (Brahman) নহে ব্যাসের (দ্বৈপায়নের) জ্ঞাতি [illegible] রাঢ়ী, বারেন্দ্র, পাশ্চাত্য বৈদিক, দাক্ষিণাত্য [illegible] —কোন ব্রাহ্মণই যুগযুগান্তর ধরিয়া বাঙ্গা[illegible] এই[illegible] আসিতেছেন না। তাঁহারা নয়শত বৎসর হ[illegible] বৈদেশিক ব্রাহ্মণ মাত্র, কেহই গৌড়-বঙ্গের [illegible] না। অন্ধ্রবংশীয় রাজগণ খৃঃ পূঃ ৭৮ অব্দে মগধে রাজত্ব [illegible] ব্রাহ্মণ ছিলেন। একাদশ শতাব্দীতে নয়পালের সময়[illegible] ব্রাহ্মণ নৃপতি মগধে রাজত্ব করিতেন।[৪৬] তিনি যদি [illegible] আনাইয়া থাকেন; তাহা ১১শ শতাব্দীর কথা। তা[illegible] করেন [illegible] মাত্র ৯০০ বৎসরের বাসিন্দা। তাঁহারা ত্রেতা [illegible] গৌড়বঙ্গে বাস করিতেছেন না। বাঙ্গালাদেশে ব[illegible] উক্ত ব্যাস ও পরাশর বা গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণের [illegible] করিলেই, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় [illegible] ফাল্গুন মাসের ভারতবর্ষে সাবর্ণগোত্রীয় ভবদেববংশ, শাণ্ডিল্যগোত্র পালরাজমন্ত্রীবংশ ও ছান্দোগ্য-পরিশিষ্ট-প্রকাশ গ্রন্থকর্ত্তা বাৎস্য-গোত্রীয় নারায়ণের বংশ সম্বন্ধে যে সংশয়ে পতিত হইয়াছেন, তাহার সামঞ্জস্য হইয়া যাইত। পূর্ব্বোল্লিখিত অকাট্য প্রমাণ সত্ত্বেও ঐতিহাসিক শ্রদ্ধেয় মজুমদার মহাশয়ের "ব্যাস ও পরাশর বা গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণ" সমাজকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখা উচিত হয় না। সত্যের জয় হইবেই। ইতি

(৪৪) Bengali Literature and Language, 1911, P. 588.

(৪৫) Literature of Bengal, 1872.

(৪৬) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১১৩।

ডক্টর মজুমদারের মন্তব্য

উপরোক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় "ভারতবর্ষ"-সম্পাদক মারফত উক্ত প্রবন্ধলেখককে যে পত্র দিয়াছেন, তাহার এই প্রবন্ধসংশ্লিষ্ট অংশটুকু এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:—"আপনার ২৪।২ তারিখের পত্র ও তৎসহ প্রেরিত শ্রীযুক্ত নীরদবরণ মিশ্র-চক্রবর্ত্তীর পত্র পাইলাম। গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণের প্রাচীন বিবরণ কোন গ্রন্থে পাই নাই—সুতরাং এ বিষয়ে কোন প্রবন্ধ লেখা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমার নিকট কতকগুলি মুদ্রিত প্রবন্ধ ও পত্রিকা পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণের প্রাচীন ইতিহাস তো দূরের কথা, প্রাচীন কালে যে বঙ্গদেশে এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহারও কোন বিশিষ্ট প্রমাণ পাই নাই। সুতরাং চক্রবর্ত্তী মহাশয় যদি এই বিষয়ে কোন প্রবন্ধ লেখেন তাহা হইলে আমার আপত্তির কোন কারণ নাই।" [প্রঃ সঃ]

স্মৃতির পটে রবি-রশ্মি

শ্রীলীলাবতী সরকার

আলো-আঁধারের মেশামেশি। একটা স্বপ্নময় ধূসর নিঃশব্দ আব্‌হাওয়া। প্রেক্ষাগৃহের উদ্‌গ্রীব অপেক্ষমাণ দর্শকের হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন অনুভব করা যায়। ধীরে [illegible]নিকা উঠলো। রঙ্গমঞ্চের বিচিত্র আলোক-তরঙ্গ-[illegible] মাঝে উৎফুল্ল এক বাউল নিশ্চল দণ্ডায়মান। [illegible] দেহ আপাদস্কন্ধ বিচিত্র রঙের সিল্কের [illegible] সুগৌর, শান্ত, সৌম্য মুখশ্রী। বিহ্বল [illegible]নো যায় না।

[illegible]গণিত বালক-বালিকা এসে বাউলকে ঘিরে [illegible]র হাতে কাশকুসুম আর মেয়েদের হাতে [illegible]। প্রত্যেকটি বালক-বালিকা নিজ নিজ [illegible]ঙের সামঞ্জস্য রেখে বাউলের আলিফা হতে [illegible]ফিতে নিয়ে বিশেষ বিশেষ মুদ্রাভঙ্গীতে [illegible] করে' দাঁড়ালে। সকলের কণ্ঠে অনিন্দ্য [illegible] রং মেশানো···।' শতদলে বিকশিত কমলের [illegible]ল যেন এক সুডোল পাঁপড়ি।

এ অপূর্ব্ব দৃশ্য ভুলবার নয়। সে প্রায় পনের বিশ বছর আগের কথা। ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট হলে 'শারদোৎসবে' বাউলরূপে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে আমার সেই প্রথম দর্শন।

'বিসর্জ্জন' ও 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকে আরও দু'বার কবিকে রঙ্গমঞ্চে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। দেখার আশ তাতে মেটেনি। অভিনয়ে যাঁকে দর্শন করে' মুগ্ধ হয়েছি, সহজ মানুষের ভূমিকায় তাঁরই দর্শন-শ্রবণ-আলাপনের ব্যাকুলতায় অধীর দীর্ঘ প্রতীক্ষা করেছি।

কিন্তু সে সুযোগ খুব ভাল ভাবেই জুটলো এই মাত্র সে-দিন। ১৩৪৫-শের বৈশাখ। আমরা কালিম্পঙে আছি। কবিবরও হাওয়া-পরিবর্ত্তনে ওখানেই গেছেন এবং 'গৌরীপুর হাউসে' অবস্থান করছেন।

কবির সেক্রেটারীর সঙ্গে সব ব্যবস্থা হ'ল। সেক্রেটারী আমার স্বামীকে (ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার) জানালেন যে, কবি তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে নিজেই খুব উৎসুক। অবারিত দ্বার।

প্রথম দিন খুব ভয়ে ভয়ে অতি সসঙ্কোচে কবির ঘরে ঢুকলাম। ভূনত প্রণাম করে' উঠতেই তিনি বললেন, বেশ—বেশ। যে ক'দিন থাক, রোজ আস্‌বে।

বললাম, "আস্‌তে তো খুব ইচ্ছে করে, কিন্তু কার্ড-সেক্রেটারীর হাঙ্গামা"···

বাধা দিয়ে কবি উত্তর করলেন, "কার্ড-সেক্রেটারী আমাদের এই মানুষেরই সৃষ্টি। মানুষে-মানুষে মিলবার পথে সত্যই কত যে বাধা! কথা বলবার জন্য কণ্ঠ দিয়েছেন ভগবান, তাকে জোর করে' রুদ্ধ করা। আচ্ছা, তোমার অবাধ গতি রইলো। আর কি বলো—"

কি আর বলবো! বলবার অনেক ছিল, কিন্তু কবির সামনে সব যেন ঘুলিয়ে গেল। উপস্থিতভাবে বললাম, "বাঃ, কি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য! দূরে কাঞ্চনজঙ্ঘা। আপনার ঘর থেকে দিগন্ত-প্রসারিত দৃষ্টি কোথাও বাধা পায় না। এখানে লেখার নিশ্চয়ই খুব প্রেরণা পান!"

"হ্যাঁ, বিশেষভাবে পাই" : কবি বললেন : "সহরের ইট-কাঠের দুর্গ আমার চিরদিন অসহনীয়। চিত্ত সেখানে অবরুদ্ধ সঙ্কুচিত হয়। আর এখানে উন্মুক্ত আকাশের কোলে কোলে, মেঘে মেঘে, পাহাড়ের গায়ে গায়ে মন স্বচ্ছন্দে উড়ে বেড়াতে পারে। মাঝে মাঝে বিশ্বপ্রকৃতির এই আহ্বানে প্রত্যেকের সাড়া দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রকৃতির এই সবুজ সরস ভোজ সত্যিই স্বাস্থ্য ও শক্তি দেয়। তোমরা প্রাণভরে পান করে' নিও।"

আজকের মত প্রণাম করে' উঠলাম।

পরের দিন ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখি, নিবিষ্ট মনে কবি কি যেন লিখছেন। শক্ত একটা কাঠের চেয়ারে তিনি বসা। পায়ের নীচে রাখার কুশন-আঁটা চৌকিটা অদূরে। চুপি চুপি ঘরে ঢুকে চৌকিটা সরিয়ে পায়ের নীচে দিলাম। সাড়া পেয়ে মুখ না তুলে'ই কবি বললেন, "ওগো আমি তাই ভাবলাম ঘরে কে বা কি চুরি করতে ঢুকেছে!" তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন,

"ওঃ, তুমি, ভাবলাম বা আর কে যেন। তোমাদের এ জীবনে মুক্তি হবে না গো!"

"এই অপরাধে মুক্তি হবে না" : বললাম : "মুক্তি বুঝি আপনারই একচেটে।"

"আমার একচেটে হবে কেন" : মুখের দিকে চেয়ে কবি সহাস্যে বললেন : "ওগো তোমাদের জন্য আমি যা' লিখেছি, বলেছি তা' আর কি কেউ করেছে?" একটু স্তব্ধ হয়ে আবার স্মিতহাস্যে আরম্ভ করলেন : "তুমি বুঝি বেজার হলে? মুক্তি—মুক্তি, সে তো তোমাদেরই এক-চেটে! সেবায়, করুণায়, প্রীতিতে তোমরা আমাদের ঘিরে রেখেছ। পেটের মধ্যে জায়গা দিয়ে আমাদের এ সুন্দর পৃথিবীর মুখ দেখিয়েছ।" উচ্ছ্বসিত হাসির লহরী তুলে' পুনরায় তিনি বলিলেন, "মুক্তি নাই এই (আমার স্বামী ডক্টর সরকারের প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত করে') পণ্ডিতদের। মুক্তি চাও তো এই পণ্ডিতদের এড়িয়ে চ'লো।" ব'লেই রহস্যভরে ডক্টর সরকারকে করযোড়ে নমস্কার জানালেন। খানিকটা রঙ্গ-রহস্যের পর আমি বললাম, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো আপনার কবিতা সম্বন্ধে?"

সাগ্রহে কবি বললেন, "বলো, বলো।"

প্রশ্ন করলাম, "আপনি এক জায়গায় লিখেছেন, 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে', আবার অন্যত্র বলেছেন, 'মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান।' এ দুটো কেমন বিপরীত শোনায় না কি?"

কবি চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন। বললেন, "যখন যাব, তখন তাঁকে বলবো, তোমার আকাশ-বাতাস-পৃথিবী আমায় কত শান্তি দিয়েছে, দিয়েছে অপার তৃপ্তি আর আনন্দ। এক মুখে তা' বলে শেষ করা যায় না। বলবো—শতমুখ দিয়ে বলবো, এ পৃথিবী কত সুন্দর, কত আত্মীয়। আর মরণ! মরণ তো আসবেই—আসাই তাঁর মহিমা এবং করুণা। এ যে তাঁরই দান! কেন মরণকে ভয়ঙ্কর ভাববো? ভাবার যে হেতু নেই। শ্যামের মত আলিঙ্গন করতে চাই এই জন্য যে, শ্যামের চেয়ে আর প্রিয় কি আছে? আমার অনুভবের চশমায় না দেখলে আর কেউ তা' বুঝবে না। বুঝবে না এই বিশ্বচরাচর, পৃথিবীর প্রতিটি অণুপরমাণুর সঙ্গে আমাদের নাড়ীর রক্ত-চলাচলের কত নিবিড় অচ্ছেদ্য যোগ রয়েছে। এই অনন্ত প্রাণময় বিশ্বাত্মীয়ের সঙ্গে এ যোগ জীবনে-মরণে যে বিযুক্ত হবার নয়।"

কবীন্দ্র মৌন হলেন। উদ্দীপ্ত তাঁর বদন। কেমন যেন বিহ্বল অবস্থা। আমার আর কথা বলতে ভরসা হ'ল না। এবার কথা সুরু করলেন আমার স্বামী। দু'জনেই গভীর তত্ত্বালোচনার মধ্যে ডুবে' গেছে[illegible] যে গড়িয়ে গেছে, তারও ঠিক নেই। নীরবে [illegible] করছি। সাহসে ভর করে' একবার বলে' [illegible] এই [illegible] থাক, বেলা যে অনেক হয়েছে।" দু'জনেই [illegible] করে' উঠতেই বললাম, "আপনার স্বহস্তলিখিত [illegible] কবিতা আমায় উপহার দিতে হবে কিন্তু।"

কবি বললেন, "আচ্ছা, পরশু দিন এস।"

দু'দিন পরে একরাশ ফুল ও একটা [illegible] দিয়ে প্রণাম করতেই কবিগুরু কবিতাটি আ[illegible] দিয়ে বললেন, "তুমি তো আমায় ঢের [illegible] দেখছি।"

সবিনয়ে প্রত্যুত্তর করলাম, "বেশী আর কি? ফুল তো অতি তুচ্ছ। দিনের পর দিন, বর্ষে বর্ষে প্রকৃতির এ অপর্য্যাপ্ত দান অফুরন্ত। কিন্তু আপনি গেলে কবিতা অমর হয়ে থাকবে। আপনার এ দানের তুলনা নেই।"

হেসে বললেন, "তবে তোমার কাছে হারলাম। তুমি আমায় হারিয়ে দিলে।"

কথার মোড় ফিরিয়ে চীন-জাপান যুদ্ধের কথা তুললাম। বললাম, "এত বড় দেশ চীন জাপানের অধীন হতে চলেছে।"

গম্ভীর হয়ে কবি বললেন, "না, তা' কক্ষনো নয়। দেখো চীনকে জাপান নিতে নিয়ে সে নিজেই ক্ষয় হয়ে যাবে। এ আমার অনুভব। পরের স্বার্থান্ধ শিক্ষায় আমরা শিখেছি যে, চীন আফিংখোর, লম্পট, জুয়াচোর। কিন্তু চীন যে কত বড়, কি বিরাট্ তার সভ্যতা, তা' তার অন্তরকে যে অনুভব না করেছে, সে বুঝবে না।" এলোমেলো ভাবেই প্রশ্ন করে' বসলাম : "দিন

দিন এ দেশে জীবনযাত্রা যেরূপ কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে, সে সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা ?"

—"কোন্ বিষয়ের সমস্যা তাই আগে বল।"

—"এই ধরুন অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা।"

—"হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ? মুসলমানের দোষ [illegible] ? এ যে হিন্দুর স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত। [illegible] সত্যি গল্প বলি, শোন :

[illegible]মি কিশোর। বয়স ১৪।১৫ হবে। [illegible]লাইদহ কাছারীতে গিয়েছি। একদিন [illegible]কুর এবং টিপারার মহারাজ বেড়াতে [illegible] খুব আমোদ-আহ্লাদ হ'ল। মহারাজা [illegible] পাড়ে তাঁকে বিদায় দিতে আমরা [illegible]য়েছি। মহারাজ অপেক্ষমাণ ঘোড়ার [illegible]নিতে যেই পা দিয়েছেন আর অমনি [illegible] পিছন থেকে মহারাজার কাছা টেনে [illegible] 'কি ব্যাপার' বলে বিস্মিত হয়ে মহারাজ [illegible]লেন। যতীন্দ্রমোহন যেন একটু বিরক্ত হয়েই [illegible] 'জাত খোয়াবেন। পান চিবুতে চিবুতে মুসলমানের গাড়ীতে উঠছেন।' যত দূর মনে পড়ে মহারাজ উত্তর দিলেন, 'এতে যদি জাত যায় তো সে জাত থেকেই কি লাভ!' সারারাত আমার ঘুম হল না। কেবলই মনে হল, মানুষে মানুষে এত ভেদ, এত ঘৃণা। কিশোর চিত্তের সে আঘাতের দাগ আজও আমার মোছেনি।"

কবিবর বললেন, "এর অনেক দিন পরের আর একটা ঘটনা বলি। শুনে নিজেই বিবেচনা কর দোষ কার—হিন্দুর না মুসলমানের ?

'জমিদারীর ভার তখন আমার উপর। শিলাইদহের কাছারিতে গেছি। পুণ্যাহ উৎসব। প্রকাণ্ড হলঘর সাজানো হয়েছে। শুভক্ষণে ঘরে ঢুকতেই চোখে পড়লো বিচিত্র রকমের আসন—সিংহাসন, চেয়ার কুশন, গালিচা, দুলিচা, সতরঞ্চি, কুশাসন, মাদুর, চট ইত্যাদি। কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'নায়েব মশায়, এ কি ব্যাপার ? এত হরেক রকম বসবার ব্যবস্থা কেন ?'

অবাক্ হয়ে নায়েব আমার মুখের দিকে চাইলে বললে, 'আপনার, নায়েবের, ম্যানেজারের, ব্রাহ্মণের পণ্ডিতের, সদ্গোপ-চাঁড়াল-মুসলমানের জন্য বিভি[illegible] আসন করা হয়েছে। এই তো এখানের রীতি। বললাম, 'নায়েব মশায়, আমার অনুরোধ, সব আস[illegible] উঠিয়ে দিন। সকলে আজ একাসনে বসবো। সে[illegible] তো হবে হৃদ্যতা, বন্ধুত্ব!'

একটু গরম হয়েই যেন নায়েব উত্তর করলেন 'বামন-পণ্ডিত-শূদ্র-মুসলমান একাসনে বস্‌বে, এ বি[illegible] আপনার সৃষ্টিছাড়া কথা।'

বললাম, 'হ্যাঁ, সব একাসনই করে' দিন।'

'কোন কালে যা' হয়নি, তা' আজও হতে পারে না। নায়েব স্পষ্টকথা শুনিয়ে দিলেন। উগ্রমূর্ত্তি ধরে' বললাম 'আজ তা' হতেই হবে, এ আমার হুকুম।'

রাগে গর্-গর্ কর্‌তে কর্‌তে নায়েব মশায় ঘর থেকে[illegible] বেরিয়ে গেলেন। নায়েবের ধৃষ্টতার মূল কোথা, তা[illegible] ভাবছি। দশ মিনিটও হয়নি। প্রথমে এল পেয়াদ[illegible] পেছনে পেছনে ছোট-বড় সমস্ত আমলা-কর্ম্মচারী এ[illegible] এক সঙ্গে সকলে বললে, 'জাত-মান আমরা খোয়াতে[illegible] পারবো না, আমাদের চাকুরী থেকে রেহাই দিন হুজুর।'

আমারই অসমর্থ নিরুপায়তার মাঝে এ ঘটনার উপ[illegible] সেদিন যবনিকা পড়লো।"

কবিগুরু চোখ বুঁজে খানিকক্ষণ কি যেন ভাবলেন তারপর আমাকে নাম ধরে ডেকে বললেন, "ওগে[illegible] এত কথা শোনার পরে তুমিই বলো, হিন্দু কি তোমা[illegible] নির্দ্দোষী ? ঠুন্‌কো জাত এক পয়সার হাঁড়ীর মধ্যে[illegible] মুসলমান দাওয়ায় উঠলে যা' নষ্ট হয়ে যায়। বস্তু হারি[illegible] শুধু খোসাটার উপর পড়েছে তোমাদের লক্ষ্য। আ[illegible] মুসলমানের লক্ষ্য দেখো তো কত বড়—ইউনিভারসিটি[illegible] শ্রী, স্ত্রী, বন্দেমাতরম্ আর মসজিদের সামনে বাজনা[illegible] আসলে সমস্যারূপ বৃক্ষরোপণ করেছ তোমরা, এখ[illegible] তারই ফলভোগ করছ। দোষ দেবে কার, বলো!"

বিদায়ের দিন। কবির কাছে বসে' আছি। অনি[illegible] বাবু এসে বললেন, "গুরুদেব, হীরেন দত্ত মশা[illegible]

এসেছেন।" সেক্রেটারী বেরিয়ে গেলে আমি বললাম, "আপনি সত্যই গুরু—বিশ্বগুরু—লোকগুরু। জ্ঞানে মনীষায়, চেহারা-পোষাকে আপনার সবখানিতে গুরু-গুরু ছাপ যেন চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠে।"

কবি পরিহাসে যেন ভেঙ্গে পড়লেন: "ওমা-গো, তবে কি চুল-দাঁড়ি কেটে পোষাক ছেড়ে ছাই-ভস্ম মেখে বসে' থাকবো গো!"

হাসতে হাসতে বললাম, "যে চেহারা আপনার, তা' যদি করেন, তবে দীক্ষা নেওয়ার জন্য এ দেশের নারী-পুরুষ আপনাকে পাগল করে মারবে।"

"তবে কি করবো গো": অসহায় ভাবে যেন কবি বললেন: "কাদা-মাটি মেখে কোথায় লুকুবো গো।"

"কিছুতেই নিস্তার নেই, কাদা মাখলে কি গুরুর গন্ধ যায়!" আমার সময় আসন্ন। পরিহাস ছেড়ে মিনতি করলাম: "এখানে শরীর সারতে এসেছেন, এত লেখা-পড়া (যতদূর মনে পড়ে বিশ্বপরিচয় বইয়ের পাণ্ডুলিপি সে-সময়ে সংশোধন করছিলেন) করা এখন আপনার ঠিক নয়।"

কবি তাঁর জীর্ণ হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। আস্তিনটা একটু গুটিয়ে শান্ত সংযত কণ্ঠে বললেন, "এ দেহে আর কি আছে? কিছুই নেই। আসল ফুরিয়ে গেছে। সুদও প্রায় নিঃশেষ। এর মধ্যেই যতটুকু পারি, করে' যাই। খুবই অনুভব করছি যে, চলতি পথে সঞ্চয়হীন হয়ে চলা বিড়ম্বনা।"

কালিম্পঙের কটা দিন কবির সঙ্গ-লাভে মধুময় হয়ে উঠেছিল। বিচিত্র কথা-বার্ত্তা-রঙ্গ-রস-পরিহাসের মধ্যে কবির বিশাল হৃদয়ের স্পর্শ আমায় আনন্দে [illegible] করে' রেখেছিল। কিন্তু বিদায়-বেলায় তঁ[illegible] কণ্ঠের সঞ্চয়হীন চলার বিড়ম্বনার কথা শুনে [illegible] ভেঙ্গে পড়লো। উদ্গত অশ্রু চেপে কা[illegible] মাথা লুটিয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে প[illegible]

তিনটি—মাত্র তি-ন-টি বছর! বা[illegible] বাংলার অভ্রংলেহী গৌরব-রবি আজ অস্তমি[illegible] মনের আকাশে শ্রাবণধারায় অশ্রু-বরিষণ করেন [illegible] না। গৃহকোণের একান্ত নিরালায় থা[illegible] স্মৃতির পটে রবি-রশ্মি উঁকি-ঝুকি মারে। [illegible] পুষ্পের সাজি দিয়ে তোমায় প্রণাম করেছি [illegible] আজ নয়নাশ্রুর ডালি সাজিয়ে হে কবি, [illegible] নমস্কার করি।

আবার আসিবে ফিরে

শ্রীঅচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

'জীবনেরে কে রাখিতে পারে—'
এই যে শাশ্বত সত্য তাহা তুমি করেছ প্রত্যয়
আপন মৃত্যুর মাঝে, হে কবি, হে ঋষি মহীয়ান্!
তাই বুঝি গেলে চ'লে পিছে ফেলে যা কিছু সঞ্চয়;
ধূলার ধরণী হ'তে শুনিয়াছ তারার আহ্বান।

মৃত্যুরে দেখেছ তুমি কভু বন্ধু, কভু শ্যামরূপে;
লেখনীর তুলিকাতে আঁকিয়াছ তা'র চারু ছবি;
শ্যামের মোহন বাঁশী শুনি বুঝি তাই চুপে চুপে—
অভিসারে বাহিরিলে রাধিকার মত তুমি, কবি!

আবার আসিবে ফিরে; বেণুবনে জাগিবে কম্পন,
শ্রাবণ-গগন র'বে চেয়ে তব নয়নের পানে,
কদম-শাখায় শিখী মহানন্দে করিবে নর্ত্তন,
প্রিয় লাগি বিরহিনী সারা নিশি পোহাইবে গানে

আবার আসিবে ফিরে এ আমার নিশ্চিত বিশ্বাস;
তোমার লাগিয়া কাঁদে পৃথিবীর আকাশ বাতাস।

৺পূর্ণানন্দ-স্মৃতি

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

হুগলী জেলান্তর্গত জনাই গ্রামে নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ-[illegible] ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ৺দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের ঔরসে [illegible] জী জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পূর্ব্ব নাম [illegible] পিতার কনিষ্ঠ পুত্র। একদা [illegible] য়ের গৃহে নিত্য পুরাণপাঠ চলিতেছিল, [illegible] হার - পত্নী [illegible] একদিন [illegible] ন দয়া করুণ ভাবে [illegible] বলিলেন, [illegible] পাঠ খণ্ডিত [illegible] ক তাঁহাকে [illegible] শয় আপনি [illegible] ন না, যাঁহার [illegible] করিয়া আপনি [illegible] কর্ম্মে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহারই কৃপায় পাঠ সম্পূর্ণ না হইলে আপনার শুভাশৌচ ঘটিবে না।' সত্যই যেদিন ভগবৎপাঠ সম্পূর্ণ হইয়া পূর্ণাহুতি হইল, সেদিনই শুভমুহূর্ত্তে পূর্ণচন্দ্রপ্রতিম সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেন। সেই জন্যই পুত্রের নামকরণ হইল পুরাণচন্দ্র।

বালকের জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে সূতিকাগৃহে উপযুক্ত আলোক ছিল না, ইহা দেখিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় ঐ গৃহ যথোচিত আলোকিত করিতে বলেন। ইত্যবসরে ঐ স্বল্পান্ধকার গৃহেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া যায়। তন্মুহূর্ত্তেই মুখোপাধ্যায় মহাশয় লক্ষ্য করিলেন যে, ঐ অন্ধকার-গৃহ যেন হঠাৎ ঈষৎ আলোকিত হইয়া উঠিল! পরক্ষণেই আলোক আনীত হইলে, ঐ দিব্যজ্যোতিও তিরোহিত হইয়া গেল। মুখোপাধ্যায় মহাশয় সেই দৃশ্য দেখিয়া এবং বালকের জন্মসময় বিচার করিয়া বুঝিলেন যে, এ পুত্র সাধারণ বালক নহে। তিনি স্বীয় পত্নীকে বলিয়াছিলেন যে, "দেখ, তোমার এই পুত্র সামান্য নহে। ইহার কোষ্ঠীর জন্মসময় দেখিয়া বোঝা যায় যে, এ হয় রাজা, নয়ত যোগী হইবে এবং পরম দয়ালু হইয়া আমার বংশের মুখোজ্জ্বল করিবে।" পরবর্ত্তী জীবনে পিতার এই বাক্য দৈব-বাণীর ন্যায় সার্থক হইয়াছিল।

স্বামী পূর্ণানন্দ মহারাজ

পঞ্চম বর্ষ বয়সে পুরাণচন্দ্র স্বগ্রামেই বিদ্যারম্ভ করেন। মেধাশক্তি এতই প্রবল ছিল যে, তিনি নিত্য যাহা পড়িতেন তাহা একবার কিংবা দুইবার পড়িলেই মুখস্থ করিয়া ফেলিতেন। বালক পুরাণচন্দ্র নিত্য যে পাতাখানি অভ্যাস করিতেন, নিত্যই তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিতেন। তাঁহার ধারণা ছিল সেখানি পড়িবার আর প্রয়োজন হইবে না। প্রথম প্রথম বালকের মাতা বা গুরুমহাশয় এই কু-অভ্যাস লক্ষ্য করেন নাই, পরে যখন তাঁহারা জানিতে পারিলেন, তখন একদিন বালককে আগের দিনের পড়া লিখিতে বলিলেন। বালক যে পাতায় যাহা লেখা ছিল, অবিকল তাহা লিখিয়া দেখাইলেন এবং বলিলেন, "পণ্ডিত মহাশয়, আমার নাম যখন পুরাণ, তখন পুরাণো পাঠ যে আমার মনে থাকিবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি?"

পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্ত হইলে, উচ্চ শিক্ষার জন্য পুরাণচন্দ্র বরাহনগরের বাটীতে আনীত হন। সেই বৎসরেই তাঁহার উপনয়ন হয়। পরে পিতা পুরাণচন্দ্রকে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যা-বন্দনাদি, নারায়ণপূজা, শিবার্চ্চনা প্রভৃতিতে পারদর্শী করিয়া তুলিলেন। লেখা-পড়ায়, খেলা-ধূলায়, কথাবর্ত্তায়, পূজাপাঠে পুরাণচন্দ্রের সহিত কেহই পারিয়া উঠিত না। কোন বালক তাঁহাকে শ্রমশীলতায়, দৃঢ়তায় বা বুদ্ধিপ্রকাশে পরাস্ত করিয়া দেয়, ইহা তিনি কখনও সহ্য করিতে পারিতেন না।

রিষ্‌ড়া প্রেম-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ব্রহ্মচারী তারাচাঁদ

বিদ্যালয়ের ছুটীর পর তাঁহার পুরাতন ভৃত্য বংশীর সহিত তিনি প্রত্যহ বাড়ী ফিরিতেন। বংশী একদিন বাড়ী ফিরিবার পথে তাঁহাকে বলিল, "ছোট দাদাবাবু, এখানে একজন সাধু এসেছে, দেখতে যাবে?" পুরাণচন্দ্র সাধারণ বালকসুলভ উৎসাহে মাতিয়া তৎক্ষণাৎ সাধু দেখিতে চলিলেন। এই সাধু-সন্দর্শনই হইল পুরাণচন্দ্রের জীবনের গতিপরিবর্ত্তনের শুভ মুহূর্ত্ত। সাধুর নিকট খুব ভীড় ছিল। ভীড় ঠেলিয়া ফুটফুটে বালক পুরাণচন্দ্র একবারে সাধুর কাছে গিয়া বলিলেন, "সাধু, আমাকে কিছু শেখাবে?" সাধু ত অবাক্ হইয়া বলিলেন, "আমার কাছে কেউ এগিয়ে আসছে না আর তুই বেটা একেবারে গায়ের কাছে। আর কথা নাই, শুনা নাই, অমনি আমাকে কিছু শেখাবে? বস্ বস্, তোর দ্বারাই হবে। গাঁজা খেতে পারবি?" বালক বলিলেন "সাধুরা বুঝি গাঁজা খায়? সে আবার কি রকম? যদি কিছু শিখতে পারি তবে গাঁজা খাওয়া ত বড় ভারি কাজ!" সাধু তাঁহাকে এক নিমেষে একটী মাত্র ক[illegible] দেখিলেন, ইহাই সুস্পষ্ট বোঝা যায়। [illegible] মহাত্মা শ্রীভূতানন্দ স্বামী। ইঁহার [illegible] আপন পূর্ব্বজন্মের সংস্কারানুযায়ী পুর[illegible] সময়ের মধ্যেই হঠযোগের উচ্চাবস্থা [illegible] হইতেই পুরাণচন্দ্র হঠযোগের নানা[illegible] মনোযোগ দিতেন। তাঁহার অগ্রজ [illegible] অকপটে সকল কথাই ব্যক্ত করিতেন। [illegible] গৃহে ফিরিতে দেরী দেখিলে, খুবই চঞ্চল [illegible] আশঙ্কা হইত—পুরাণচন্দ্র বোধ হয় কোন [illegible] ছাড়িয়া যাইবেন।

ক্রমে পিতা দুর্গাচরণ পুরাণচন্দ্রের [illegible] কথা জানিতে পারিলেন। তিনি পুরাণচন্দ্রের কোন একটী ক্রিয়া দেখিতে চাহেন। পুরাণচন্দ্র একটী আসন দেখান এবং তাহার নাম মহামুদ্রা বলেন। পিতা দুর্গাচরণবাবু তাহা দেখিয়া স্তম্ভিত হন এবং জানিতে চান—ইহা করিলে কি হয়। পুত্র উত্তর করিলেন, "ইহার অভ্যাসে কুণ্ডলিনীশক্তি জাগ্রতা হইয়া সুষুম্নাপথে গমন করেন।" পুত্রের কথা শুনিয়া দুর্গাচরণবাবু অতিশয় প্রীত হইয়া পুত্রকে বলিলেন, "পুরাণ, তুমি এত অল্প বয়সে এইরূপ ক্রিয়ায় এমন নিপুণ হইবে তাহা আমার ধারণার অতীত ছিল। এই সব করা ভাল—তবে ইহাতে বিদ্যাশিক্ষার বিঘ্ন হইবে। তোমার যখন এত আগ্রহ, তখন ইহার সহিত বিদ্যাশিক্ষা যতদূর সম্ভব হয় তাহা করিও।"

ইহার কিছুদিন পর ভূতানন্দ স্বামী সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেলেও, পুরাণচন্দ্র গুরুদত্ত ক্রিয়াসাধনে বিন্দুমাত্র অবহেলা করেন নাই। তিন বৎসর পরে ভূতানন্দ স্বামীজির সহিত যখন তাঁহার পুনরায় সাক্ষাৎকার হয়, তখন পুরাণচন্দ্র

নানারূপ কঠিন হঠযোগের ক্রিয়ায় পরিপক্ক হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন।

পরীক্ষা দেওয়ার পর তাঁহার সহপাঠী কেদার বলিল, "ভাই, এখানে বুদ্ধদেব নাটক আসিয়াছে, চল না দেখে আসি, এখন ত আর আমাদের পড়ার চাপ নাই!" [illegible]ণচন্দ্র ভ্রাতৃগণের আজ্ঞা লইয়া অভিনয় দেখিতে [illegible]দেবের গৃহত্যাগ অভিনয় পুরাণচন্দ্রের [illegible]লোড়িত করিল। তাঁহার মানসিক অবস্থা [illegible]তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। [illegible]কেদারনাথকে তার ব্যাকুলতার কথা [illegible]বলিলেন তাঁহার মনের অবস্থাও খুবই [illegible]গৃহে থাকার বাসনা নাই। উভয়েই [illegible] কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, কিরূপে [illegible]প তাহাদের অস্থিরতা দূর হইবে, কিছুই [illegible]রিলেন না। আহারে রুচি নাই, শয়নে [illegible]চঞ্চল—সর্ব্বদা উদাসীন ভাব। অবশেষে [illegible] স্বগ্রাম জনাই গমন করিলেন। উভয়ের [illegible]ত্রকে এরূপ উদাস দেখিয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া কাহা অনেক ঠাকুরদেবতা মানৎ করিলেন, পূজা [illegible]ন, শান্তি করিলেন; কিন্তু তাঁহাদের মনের অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল না। এক রাত্রে অবশ ক্লান্ত চিত্তে স্বপ্নাবস্থায় পুরাণচন্দ্র দেখিলেন যে, তাহারা দুই বন্ধুতে মিলিয়া যেন বৈদ্যনাথ ধামে তপোবন পাহাড়ে গিয়াছেন, সেখানে এক জটাজুটধারী দিব্য জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের আশ্রয়ভিক্ষা করিতেছেন এবং তিনি একটী অঙ্গুলি নির্দ্দেশে কি যেন বলিতেছেন। রজনী প্রভাত হইবামাত্র তিনি কেদারের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িলেন। কেদারও তাঁহারই নিকট আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে দুই বন্ধুতে সেই রাত্রেই গৃহত্যাগের সমস্ত কথাবার্ত্তা ঠিক হইয়া গেল।

ইহার পর তিনি উক্ত বন্ধুর সহিত পিতামাতার অগোচরে পলাইয়া যান। কিন্তু তাঁহারা সন্ধান করিয়া তাঁহাদিগকে ধরিয়া লইয়া আসেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে তাঁহার মাতৃবিয়োগের পরেই তিনি প্রকৃত গৃহত্যাগ করেন। তখন তাঁহার বয়স ১৪।১৫ বৎসর মাত্র। এই সময়ে দৈবযোগে দেওঘরে ভীষণ বন্যজন্তুসমাকীর্ণ তপোবন পাহাড়ে শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎকার হয়। শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজী তাঁহার হঠযোগ ক্রিয়ায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। তৎকাল হইতেই ছায়ার ন্যায় গুরু-মহারাজজীর সহিত তিনি অরণ্যে, পর্ব্বতে ও তীর্থে ভ্রমণ করিতে থাকেন। এই ভ্রমণাবসরে তুষারমণ্ডিত নৈসর্গিক শোভাসমন্বিত পাঞ্জাবের উপরিভাগে মনমহেশের গিরিশৃঙ্গে গুরুমহারাজজী তাঁহার কর্ণে মন্ত্রদীক্ষা প্রদান করেন এবং এই সময় হইতেই তিনি পূর্ণানন্দ নামে অভিহিত হয়েন।

রাণী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

তাহার কিয়ৎকাল পরে হরিদ্বারে নিবাসকালীন গুরুমহারাজজী একদা ধ্যানযোগে নানারূপ বিভূতি দর্শন করেন এবং তাহা শিষ্য পূর্ণানন্দের নিকট ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, "দেখ পূর্ণানন্দ, আমি আজ ধ্যানে জাগতিক বিষয়ব্যূহ প্রত্যক্ষ করিলাম, মনে হইল যেন দেওঘরে আমরা গিয়াছি এবং তথায় শিবমন্দিরপ্রতিষ্ঠা হইতেছে ও ক্রমশঃ সাংসারিক বিষয়বিস্তার ভারপ্রাপ্ত হইতেছে। ইহার অল্পদিন পরেই ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ৺রামচন্দ্র বসুর নিকট হইতে তার পাইয়া তাঁহারা উভয়ে দেওঘরে আসিয়া করণীবাগ গ্রামে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই [illegible]

মাণ্ডোয়া ষ্টেটের অন্তর্গত নর্ম্মদা নদীর তীরস্থিত ৺গঙ্গানাথ নামক স্থান হইতে শ্রীশ্রীবালানন্দ মহারাজজী তাঁহার শিষ্যকে পাঠাইয়া তাঁহার গুরুদেব প্রাচীন মহাত্মা সিদ্ধপুরুষ শ্রীব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মচারীকে আনাইয়া তাঁহারই দ্বারা মহারুদ্র যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক ৺নর্ম্মদেশ্বর শিবের প্রতিষ্ঠাকার্য্য সমাধা করেন।

তদনন্তর নবীন ব্রহ্মচারী পূর্ণানন্দ স্বামীজী তাঁহার পরম গুরুদেবের সহিত গঙ্গানাথে যাইয়া কিছুকাল তাঁহার সেবায় রত থাকিয়া তাঁহার কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। পরম গুরুদেবের সিদ্ধহস্তের আশীর্ব্বাদ রাজচ্ছত্রসদৃশ পূর্ণানন্দজীর শিরোপরি তাঁহার অন্তিম কাল পর্য্যন্ত বিরাজমান ছিল।

শ্রীমৎ স্বামী বালানন্দ মহারাজজীর শিষ্যত্বগ্রহণের পর তাঁহার এই অন্যূন ৬০ বৎসরের মধ্যে একবার মাত্র তিনি তিন বৎসরের জন্য তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছিলেন; নচেৎ ইহার পর কখনও পূর্ণ এক বৎসর কালও তাঁহাকে ছাড়িয়া কোথাও তিনি থাকেন নাই। তিন বৎসরের মধ্যে তিনি নেপালে গিয়া পশুপতিনাথের দরবারে তপস্যা করেন ও তত্রত্য পূজারী রাওলের নিকট বিবিধ তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তদবধি নেপালের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় আকর্ষণ ছিল এবং মধ্যে মধ্যে তথায় একান্ত বাসপূর্ব্বক গভীর ধ্যানে রত থাকিতেন। তিনি দেওঘর বালানন্দ আশ্রমে ধ্যানযোগ, শাস্ত্রালোচনা এবং নানাপ্রকার পরোপকার কার্য্যে সর্ব্বদা ব্রতী থাকিতেন। তিনি আজন্ম কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিলেও, স্বভাবের কোমলতা হারান নাই। পূর্ণানন্দজীর স্নেহকোমল চোখের দৃষ্টি, মধুর ব্যবহার, অমায়িকতা, সারল্য ও দয়া কখনও ভুলিবার নহে। দুঃখীর জন্য তাঁহার চোখে যে করুণামাখা দৃষ্টি দেখিয়াছি, তাহা অপূর্ব্ব। যে তাঁহার সহিত কিছুদিন থাকিত, সেই তাঁহার উচ্চ, উদার, সরল, সুন্দর ব্যবহারে আকৃষ্ট না হইয়া পারিত না। দেওঘরের আশ্রমে যে সব বাঙ্গালী নরনারী যাইতেন, সকলেরই তিনি ছিলেন পরম শান্তিদাতা ও পরম বন্ধু।

তিনি ইংরাজী বিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী [illegible] কিন্তু স্বীয় অধ্যবসায়ের গুণে ইংরাজী [illegible] পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। ব[illegible] এই [illegible] ইংরাজী পুস্তক তিনি পড়িতেন ও অনে[illegible] গণের সহিত আলোচনা করিতেন। [illegible] বিদ্বান্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক সমাবৃত হইয়া থাকি[illegible] এবং বেদান্ত, যোগশাস্ত্রে নিষ্ণাত ছিলেন [illegible] যোগসাধন" পুস্তক পাঠ করিলেই একা[illegible] বহু শাস্ত্রবেত্তা ও মহানুভব পুরুষ, তাহা[illegible] পাওয়া যায়। অপিচ তিনি যে কেবল [illegible] বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন তাহা নহে, অধি[illegible] শীলতাজনিত ক্রিয়াত্মক জ্ঞান ও অনুভব প্র[illegible] তাঁহার জীবনকে আদর্শ করিয়া তুলিয়াছিল। ভ[illegible] পরিবৃত হইয়া ভগবৎ-মহিমা-কীর্ত্তন করিতে করি[illegible] অবিরলধারে নয়নাশ্রুতে তাঁহার গণ্ডদ্বয় সিক্ত হইয়া যাইত তাঁহার শেষ জীবন কেবলমাত্র অন্তর্লক্ষ্য রূপ সমাধি সাধনেই অতিবাহিত হইয়াছিল।

বর্ত্তমানের এই অবিশ্বাস ও অনাচারের যুগে এইরূপ এক অতি উচ্চাঙ্গের সাধক মহাপুরুষের জীবনী [illegible] স্মৃতি-কথা আলোচনা যত অধিক হয়, ততই মঙ্গল।*

* রিষড়া প্রেমমন্দিরে পূর্ণানন্দ স্মৃতি-বাসরে সভানেত্রীর অভিভাষণ

পূর্ণানন্দ-স্মৃতি

শ্রীধীরেন্দ্রকুমার সরকার

তুমি যোগী জ্ঞানতীর্থ মর্ত্তলোকে পূর্ণানন্দ স্বামী—
তব মাঝে ব্রহ্মজ্যোতি মূর্ত হ'য়ে এসেছিল নামি'।
তুমি যাহা রেখে গেছ মানবের ধর্ম্মালোক মাগি'—
তাহা লয়ে বিকশিত মানবাত্মা সুখশান্তি লাগি।'

গোয়ালিয়র সঙ্গীতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

শ্রীবরেন্দ্রনাথ বসু

কোন দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে আলোচনা [illegible]রতে গেলে, প্রথমেই সে দেশের ইতিহাস অল্পবিস্তর [illegible]নতে হয়। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, [illegible] পাব, গোয়ালিয়র বহু প্রাচীন দেশ। [illegible] রাজ্যের উত্থানপতনও ঘটেছে। সেই রাজা- [illegible] হাসের [illegible] ও একটি [illegible] ঠেছে। [illegible] সম্বন্ধে [illegible] নীরব। [illegible] তিহাসটি [illegible] হাস। [illegible] থেকে [illegible] পাই যে, [illegible] মহারাজ কাহ্নম কর্ত্তৃক গোয়া-[illegible]য়র নগর স্থাপিত হয়।

গোয়ালিয়রের সাঙ্গীতিক ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে, আমাদের সুরু করতে হয় মহারাজ মানসিংহের রাজত্বকাল থেকে। অবশ্য গোয়ালিয়রের মহারাজ মানসিংহ আকবরের প্রধান সেনাপতি অম্বরাধিপতি মানসিংহ নহেন। গোয়ালিয়রের মহারাজ মানসিংহ ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে রাজত্বলাভ করেন। এই মহারাজ মানসিংহের সময়েই গোয়ালিয়র শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে বিশেষ উন্নতিলাভ করেছিল। মুসলমান ঐতিহাসিক নিয়ামত্‌উল্লা, মহারাজ মানসিংহের উল্লেখ করে' লিখেছেন, "তিনি সঙ্গীতানুরাগী ও একজন সুগায়ক ছিলেন। তাঁর রচিত গানের প্রচলন অদ্যাপি আছে।"

পণ্ডিত ৺শঙ্কর রাও

মহারাজ মানসিংহের আদেশানুসারে "রাগদর্পণ" নামক একখানি সঙ্গীত শাস্ত্রীয় গ্রন্থ সঙ্কলিত হয়েছিল।

কথিত আছে, মহারাজ মানসিংহ একটি গুর্জ্জরী কুমারীর সঙ্গীতে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিবাহ করেন। তারপর সঙ্গীতশিক্ষার সুবিধা ও বহুল প্রচলনের জন্য মহারাজ মানসিংহ ওই গুর্জ্জরী রাণীর তত্ত্বাবধানে একটি সঙ্গীতবিদ্যালয় স্থাপন করেন। বর্ত্তমানে গোয়ালিয়র দুর্গের যেটী archaelogical museum, সেটী আগে ওই সঙ্গীত-বিদ্যালয়-ভবন ছিল। এখনও লোকে ওই বাড়ীটাকে "গুজ্‌রী মহল" বলে থাকে।

এরপর আমরা গোয়ালিয়র সঙ্গীতের উল্লেখ পাই তানসেনের সময়ে। তানসেন গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত বেহট্ গ্রামে এক হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তানসেনের জন্মকাল সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয় তাঁর 'হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের স্থান' পুস্তকে ১৫০৬ খৃষ্টাব্দে বলে উল্লেখ করেছেন। প্রথমে তানসেন গৌস মহম্মদের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। তারপর মথুরায় হরিদাস স্বামীর কাছে দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ শিক্ষা লাভ করেন। হরিদাস স্বামীর কাছ থেকে পুনরায় গোয়ালিয়রে ফিরে আসেন। গোয়ালিয়রে ফিরে তিনি কিছুকাল গুর্জ্জরী মহলে শিক্ষা গ্রহণ করেন।

এই থেকে দেখা যায়, তানসেন যখন বালক, এমন কি তানসেনের জন্মের বহু পূর্ব্বকাল থেকে গোয়ালিয়রে রীতিমত সঙ্গীতের চর্চা ছিল। যে জাতের সঙ্গীতের চর্চ্চা ছিল, তাকে রীতিমত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বলে' আমাদের মানতেই হবে, কারণ তানসেনকে হরিদাস স্বামীর কাছে বার বৎসর শিখেও, ওই গুজ্‌রী মহলে বিদ্যার্থী হতে হয়েছিল।

তারপর আরও একটী তথ্য ইতিহাস থেকে পাওয়া যায় যে, তানসেনের সমসাময়িক গোয়ালিয়রের অনেকগুলি গায়ক ও বাদক আকবর শাহের দরবারে বিশেষ সম্মানের সঙ্গে স্থান পেয়েছিলেন।

আবুল ফজল "আইন-ই-আকবরী"তে লিখেছেন, "আকবর বাদশাহ অত্যন্ত সঙ্গীতানুরাগী ও সঙ্গীতের একজন সত্যিকারের পৃষ্ঠপোষক। দরবারে বহু সঙ্গীতজ্ঞকে তিনি সম্মানের সহিত স্থান দিয়া থাকেন।"

আবুল ফজল "আইন-ই-আকবরী"তে কেবলমাত্র ভাল গায়ক ও বাদকদের নাম করেছেন। এঁদের মধ্যে কেবল মাত্র গোয়ালিয়র থেকেই তানসেনের সমসাময়িক ১৫ জন ছিলেন। তাঁদের নাম দেওয়া গেল :—

(১) মিঞা তানসেন (২) বাবা রামদাস (৩) সুভান খাঁ (৪) শ্রীজ্ঞান খাঁ (৫) মিঞা চাঁদ (৬) বিচিত্র খাঁ—সুভান খাঁর ভাই। (৭) বীরমণ্ডল খাঁ (৮) সাহেব খাঁ (৯) সারোদ খাঁ (১০) মিঞা লাল (১১) তানতরঙ্গ খাঁ —মিঞা তানসেনের ছেলে (১২) নানক জারজু (১৩) পূরবীন খাঁ—নানক জারজুর ছেলে। (১৪) সুরদাস—বাবা রামদাসের ছেলে। (১৫) চাঁদ খাঁ।

মোটামুটি হিসেবে একথা অনায়াসে বলা চলে যে, গোয়ালিয়রে সঙ্গীতচর্চা তানসেনের অনেক আগে থেকে চলত এবং বেশ ব্যাপক ভাবেই চলত।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের বাঙলা দেশে গোয়ালিয়রের সঙ্গীত সম্বন্ধে বড় একটা কেউ খোঁজ রাখেন না। প্রতি বৎসর বাঙালা দেশে, বিশেষ করে' কোলকাতায় যে বিরাট্ কন্‌ফারেন্সটী হয়ে থাকে, তাতে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা গোয়ালিয়র থেকে একজনও গায়ককে [illegible]কয়েন না!

[illegible] বছর আগে শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় মহাশয় একবার ভারতীয় সঙ্গীত-তীর্থগুলি পর্য্যটন করেছিলেন। তাঁরই বিবৃতি তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর "ভ্রাম্যমানের দিনপঞ্জিকা"তে। কিন্তু একথা আমরা বলতে বাধ্য যে, দিলীপবাবু সব সময়ে ঠিক সঙ্গীতরসজ্ঞের মত মতামত প্রকাশ করেননি। অনেক জায়গায় তাঁর egoism-এর ঝোঁকে অনেকের অযথা নিন্দাবাদ করেছেন। সব চেয়ে বেশী অন্যায় তিনি করেছেন, গোয়ালিয়র সঙ্গী[illegible] উদাসীনতা প্রকাশ করে'।

তানসেনের পর গোয়ালিয়র সঙ্গী[illegible] এই [illegible] বিরাট্ একটি ফাঁক রয়ে গেছে। তানসে[illegible] শতাব্দীর লোক। পরপর আবার আ[illegible] সঙ্গীতের সন্ধান পাই উনিশ শতাব্দীতে, [illegible] রাও সিন্ধিয়ার সময়ে। এই সুদীর্ঘ [illegible] মধ্যেকার অতি অস্পষ্ট একটী ইতিহাস পা[illegible] ইতিহাস বিশদ না হলেও, ভারতীয় সঙ্গীতে[illegible] ইতিহাস। আঠার শতাব্দীর গোড়ার দিকে[illegible] বংশধর শাহ্ সদারঙ্গ্ খেয়াল সঙ্গীতের [illegible] তারপর তাঁর পুত্র অদারঙ্গ খেয়াল সঙ্গীতের আর[illegible] বিধান করেন। এর বেশী আর বিশেষ কিছু [illegible] যায় না।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে মহারাজ জয়াজী রাও সিন্ধিয়া তখনকার সেরা গায়কদের তাঁর দরবারে বহাল করেন। হদ্দু খাঁ, হস্সু খাঁ, নথ্থু খাঁ, বালা সাহেব, পান্না গুরুজী ও হুসেন খাঁ সেতারীয়াকে দিয়ে জয়াজী মহারাজের দরবার গঠিত হল। হদ্দু, হস্সু ও নথ্থু এই তিন ভাই ছিলেন খেয়াল গায়ক। কারণ শাহ সদারঙ্গ যে দু'জন ভিক্ষু বালককে খেয়াল শিখিয়েছিলেন, এঁরা তাঁদেরই বংশধর। কাজেই এঁরাই শুধু গোয়ালিয়র কেন, সারা ভারতবর্ষের খেয়াল সঙ্গীতের শিক্ষাদাতা। এঁদের মধ্যে নথ্থু খাঁ ছিলেন সব চেয়ে ভাল ওস্তাদ। জয়াজী মহারাজ নথ্থু খাঁকে দরবারের প্রধান গায়ক করলেন। তখনকার দিনে তাঁর মাসিক তন্খা ছিল ৫০০৲। উপরন্তু নথ্থু খাঁর যাতায়াতের সুবিধার জন্য একটী হাতী দিয়েছিলেন।

এঁদের পর এলেন হদ্দু খাঁর দুই ছেলে রহমৎ খাঁ ও ছোটে মহম্মদ খাঁ আর তাঁর শিষ্য বিষ্ণুপন্ত ছত্র। হদ্দুর

কাছে শঙ্কর রাও পণ্ডিতও বার বছর তালিম নিয়েছিলেন। বিষ্ণুপন্ত ছত্রে শিক্ষা সমাপ্ত করে' গোয়ালিয়রের বাইরে চলে' যান।

হস্সু খাঁর ছেলে ছিল না। তাঁর শিষ্য বাবা দীক্ষিত, বাসুদেব রাও জোসি ও বড়ে বালকৃষ্ণ বুয়া। বাসুদেব রাও [illegible]র শিষ্য বিষ্ণুদিগম্বর পুলস্কর।

[illegible]র ছেলে নিসার হোসেন। নথু খাঁর শেষ [illegible]ছে শঙ্কর রাও পণ্ডিত কিছুদিন তালিম [illegible] আরও এলেন মেহেদী হোসেন খাঁ, গুলে [illegible]ত হুসেন খাঁ।

[illegible]দের মধ্যে আলি বক্স, তাজ খাঁ, নারায়ণ [illegible]বুয়া ইত্যাদি। আলি বক্সের দু'জন বাঙালী [illegible]র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীবামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। [illegible] কালে খুব বড় ওস্তাদ হয়েছিলেন। এঁদের [illegible]বাবুর নাম আজও সারা ভারতবর্ষের সেরা [illegible]ম্মানে স্মরণ করে' থাকেন।

[illegible]য় দফার গাইয়েদের মধ্যে নিসার হোসেন খাঁ [illegible]লেন সবচেয়ে বড় ওস্তাদ। তাঁর সম্বন্ধে নানা ধরণের সত্যমিথ্যা মিলিয়ে গল্প আজও প্রচলিত। তাঁর সবচেয়ে বড় কীর্ত্তি, তাঁর পরম প্রিয় ও একমাত্র শিষ্য পণ্ডিত শঙ্কর রাও।

নিসার হোসেনকে বাদ দিয়ে নাম করতে হয় পণ্ডিত শঙ্কর রাওয়ের। শঙ্কর রাও হয়েছিলেন তাঁর সময়কার সব চেয়ে বড় গায়ক। তাঁর মত অত বড় খেয়াল-গায়ক সারা ভারতবর্ষে খুব কমই ছিলেন। তিনি আজীবন শিক্ষাব্রতী ছিলেন। এমন কি তাঁর শেষ বয়স পর্য্যন্ত নিয়মিত রেওয়াজ করতেন। আর যে ক'টী শিষ্য তিনি তৈরী করে' গেছেন, তাঁরাই আজকার গোয়ালিয়র সঙ্গীতের প্রাণ—শুধু তাই নয়, সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে সেরা সেরা গাইয়ে। তাঁর প্রধান শিষ্যেরা হচ্ছেন: তাঁর পুত্র পণ্ডিত কৃষ্ণ রাও, রাজাভাইয়া পুঁছওয়ালে, রামকৃষ্ণ তিলঙ্গ, গোপাল রাও গুণে ও কাশীনাথ মূলে।

এর পরই আধুনিক গোয়ালিয়র। আজকের সেরা গাইয়েদের নাম পণ্ডিত কৃষ্ণ রাও, রাজাভাইয়া পুঁছওয়ালে, বালাভাউ উমডেকর, রামভাউ গুল্‌বাণী, নারায়ণ রাও গুণে, হুদুভৈইয়া মোরঘোড়ে, বিশ্বনাথ যোশী, নারায়ণ রাও সাহানে ও নিতাইচন্দ্র দাস। নিতাইচন্দ্র দাস এখনও বিদ্যার্থী, কিন্তু এরই মধ্যে ইনি গোয়ালিয়রের গাইয়ে মহলে বেশ নাম করেছেন। সকলেই এঁর ভবিষ্যতের সমুজ্জ্বল সম্ভাবনা সম্বন্ধে প্রায় একমত। পণ্ডিত কৃষ্ণ রাওয়ের ইনি সবচেয়ে প্রিয় শিষ্য। পণ্ডিতজী আমাকে বলেছিলেন, এই যুবকটীর ওপর তিনি অনেকখানি আশা পোষণ করেন।

পণ্ডিত কৃষ্ণ রাও

আজকের গোয়ালিয়র সঙ্গীতের কথা বলতে হলে, প্রথমেই নাম করতে হয় পণ্ডিত কৃষ্ণ রাওয়ের। একটা কথা অনায়াসে বলা চলতে পারে যে, বিশুদ্ধ ও traditional খেয়াল সঙ্গীত একমাত্র পণ্ডিতজীর কাছেই আছে। যদিও পণ্ডিত ভাতখণ্ডে মতানুবর্ত্তী সঙ্গীত বিদ্যালয়-গুলিতে বিশুদ্ধ খেয়াল শেখান হয়, তবুও মহামতি ভাতখণ্ডে খেয়াল সঙ্গীতকে ধারা নিয়ন্ত্রিত (systematise) করার জন্য অনেক ক্ষেত্রে নূতন নিয়মের প্রবর্ত্তন করতে বাধ্য হয়েছেন। তাতে সঙ্গীতশাস্ত্রের কোন ক্ষতি না হ'লেও traditional রূপটা অনেক ক্ষেত্রে ব্যাহত হয়েছে।

পণ্ডিত কৃষ্ণ রাও, গোয়ালিয়রে ভাতখণ্ডে মতানুবর্ত্তী সঙ্গীতবিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার অনেক আগে একটী সঙ্গীতবিদ্যালয় স্থাপন করেন। পণ্ডিত শঙ্কর রাওয়ের জীবিতকালে, ১৯১৪ সালের ৩১শে জানুয়ারী তিনি গান্ধর্ব্ব-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পিতার মৃত্যুর পর ১৯১৭ সালে পিতৃ-স্মৃতিরক্ষার্থে পণ্ডিতজী বিদ্যালয়টীকে শঙ্কর গান্ধর্ব্ব বিদ্যালয় নামে নামান্তরিত করেন।

পণ্ডিত কৃষ্ণ রাওয়ের পর উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন রাজা-ভাইয়া পুঁছওয়ালে। ইনি এখন সরকারী, ভাতখণ্ডে

বালাভাউ উমডেকর

মতাবলম্বী মাধব সঙ্গীতবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। ইনি ওস্তাদ হিসেবে বড় হলেও, এঁর গান তেমন সুখভোগ্য হয় না। অতিরিক্ত তানকর্ত্তব ও অনাবশ্যক অঙ্গসঞ্চালন অনেক সময়ে পীড়াদায়ক হয়ে পড়ে।

বালাভাউ উমডেকর আসলে একজন ভাল গাইয়ের চেয়ে একজন খুব বড় সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। এঁর কণ্ঠস্বর তেমন মিষ্টি নয়। কিন্তু এঁর গান শুনলে বোঝা যায় যে, মিষ্টি কণ্ঠস্বর সঙ্গীতের একটী খুব বড় অঙ্গ নয়। এঁর গলায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাজগুলি, [illegible] মীড় বা স্বরপ্রয়োগ সত্যিই [illegible]পূর্ব্ব। এঁর দ্বারা [illegible]

ভারতীয় সঙ্গীত ক্ষেত্রে একটী অমূল্য রত্ন। ইনি বহু পরিশ্রম করে' ত্রিশটী অপ্রচলিত শাস্ত্রোক্ত রাগ আবিষ্কার করেছেন। গ্রন্থখানিতে ইনি প্রতি রাগের শাস্ত্রীয় আধার, লক্ষণ-গীত ও স্বরলিপি দিয়েছেন। এখনও ইনি এই কাজেই বেশীর ভাগ সময় ব্যয় করে' থাকেন।

রামভাউ গুল্‌বানী ও নারায়ণ রাও ও গুণের [illegible] সত্যিই অপূর্ব্ব! শুদ্ধ খ্যাল সঙ্গীতকে যে এত [illegible] দরদ দিয়ে গাওয়া যেতে পারে, সেটা শুধু [illegible]জা[illegible] গান শুন্‌লে বোঝা যায়। এমন [illegible] এই[illegible] স্বর-প্রয়োগ ও লয়ের কাজ সত্যিই [illegible] পাওয়া যায়।

বাকী সকলের পরিচয় খুব একটা [illegible] হলেও, তাঁদের মধ্যে বিশেষত্ব আছে। [illegible] গায়কির, বিশেষ করে' পণ্ডিতজীর গায়কি[illegible] বিশেষত্ব আছে, যেটা ভারতবর্ষে আর [illegible] যায় না।

গোয়ালিয়রে বাঙালী ছাত্র অনেকেই আছে[illegible] মধ্যে বেশীর ভাগ মাধব সঙ্গীতবিদ্যালয়ের ছাত্র [illegible] অনেকের গান শোনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছি[illegible] এঁদের মধ্যে পণ্ডিত কৃষ্ণ রাওয়ের শিষ্য শ্রীযুক্ত নিতাইচন্দ্র দাসের গান আমাকে সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট করেছিল। এঁর কথা আমি পণ্ডিতজীর কাছে তুলেছিলুম। পণ্ডিতজী এঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। একজন বাঙালী সম্বন্ধে স্বয়ং পণ্ডিতজী অনেকখানি আশা পোষণ করেন শুনে সত্যিই বড় আনন্দ হয়েছিল ও বড়ই গর্ব্ব অনুভব করেছিলুম। অপ্রাসঙ্গিক হলেও, এখানে একটা কথা না বলে' পারা যায় না। আজকে বাঙলাদেশের সঙ্গীত দেউলিয়া হয়ে গেছে। সস্তা গান, বিলেতী ঢঙ আর অন্তঃসারশূন্য দরদ, আসলে যাকে ন্যাকামী বলতে হয়, সেই হয়েছে আজকের বাঙলার সঙ্গীত। প্রকৃত মার্গ-সঙ্গীতের চর্চ্চা বাঙলাদেশ থেকে উঠে গেছে। বাঙলাদেশ নিজের সম্বন্ধে এত বেশী ফেঁপে উঠেছে যে, তাদের অবস্থা হয়েছে "গাছে না উঠতেই এক কাঁদি।" গলায় সুর বসল না, স্বরজ্ঞান হ'ল না এক তিল, রাগের রূপ সম্বন্ধে কোন [illegible] হ'ল না, তবুও তাঁরা একজোড়া তম্বুরা নিয়ে

াসর জাঁকিয়ে, বেসুরো গলায় আব্দুল করিম বা কৈয়স াকে চালাতে চেষ্টা করে' থাকেন।

আজকের গোয়ালিয়রের নাম করা বাঈজী, মঙ্গু বাঈ -একদা ইনি একজন সুগায়িকা ছিলেন, এখন এঁর বয়স ত্নরের ওপর। শ্রীজান বাঈ, এঁর কণ্ঠস্বর অপূর্ব্ব। য়েদের মধ্যে এমন সুন্দর খ্যাল সঙ্গীতের উপযোগী তার শ্দুর্লভ। এঁর খেয়াল সঙ্গীত সত্যই উপভোগ্য। উপনিষদ ওঁর গান তেমন উচ্চাঙ্গের নয়। এঁর গলায় ঋষিদের ভাবধারা চেয়ে ঠুংরীই মানাত ভাল। কিন্তু ঠুংরী ...ল।

...। খাঁর পৌত্র, নন্নে খাঁর পুত্র হাফেজ আলি ...য়ালিয়রের যন্ত্রসঙ্গীতের অপূর্ব্ব সম্পদ্। ...আলিকে শুধু গোয়ালিয়রের সম্পদ্ বললে ...বে। হাফেজ আলির স্বরোদ সারা ...গৌরবের বস্তু। যেমন কণ্ঠসঙ্গীতে পণ্ডিত ...তমনি যন্ত্রসঙ্গীতে হাফেজ আলি। হাফেজ ...স মবারক আলি এখনও শিক্ষানবীশ। কিন্তু ... হাফেজ আলির পূর্ণ আস্থা আছে। মিঠ্ঠু কা...তবলার বিশেষত্ব, ইনি সঙ্গত করবার সময়ে কখনও ধৈর্য্য হারান না। মিঠ্ঠু খাঁর মত এমন সুন্দর ঠেকা দিতে বোধ হয় সারা ভারতবর্ষে আর একজনও নেই। পর্ব্বত সিংহের পাখোয়াজ চমৎকার। ছটুটু খাঁর সারেঙ্গী ভারী মিষ্টি। রামজী ভাইয়া হিরওয়ের জলতরঙ্গ মন্দ নয়।

গোয়ালিয়রের যুবক মহারাজ জীয়াজীরাও সিন্ধিয়া সঙ্গীতের খুব অনুরাগী। এখানকার প্রতি ভাল গাইয়ে বা বাজিয়ে মহারাজের দরবারভুক্ত।

গোয়ালিয়র যে আজও খেয়াল সঙ্গীতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এককালে এখানে ধ্রুপদের বহুল চর্চ্চা ছিল। কিন্তু আধুনিক গোলালিয়রে ধ্রুপদের চর্চ্চা নেই বললেই হয়। আর ঠুংরী ওখানে একেবারেই অচল।

এখানে দুটি সঙ্গীতবিদ্যালয় রয়েছে। তার মধ্যে শঙ্কর গান্ধর্ব্ববিদ্যালয় প্রাচীনতম। এই বিদ্যালয়টী পণ্ডিত কৃষ্ণ রাও কর্ত্তৃক পরিচালিত। এখানে মাহিনা দিতে হয়। এখানকার শিক্ষাকাল সাড়ে তিন বছর। এই সময়ের মধ্যে ৭২টী রাগের তালিম দেওয়া হয়। তবে এখানে কেবলমাত্র খেয়াল সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া হয়।

...টী মাধব সঙ্গীতবিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়টী ৺পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে মহাশয়ের চেষ্টায় ও মহারাজ মাধবজী রাও সিন্ধিয়ার সহযোগিতায় গত ১৯১৮ সালের ১০ই জানুয়ারী স্থাপিত হয়। মহামতি ভাতখণ্ডেজী যখন হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকে ধারানিয়ন্ত্রিত (systematise) করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করছিলেন। তখন তিনি বুঝেছিলেন যে, গোয়ালিয়র তাঁর মতকে
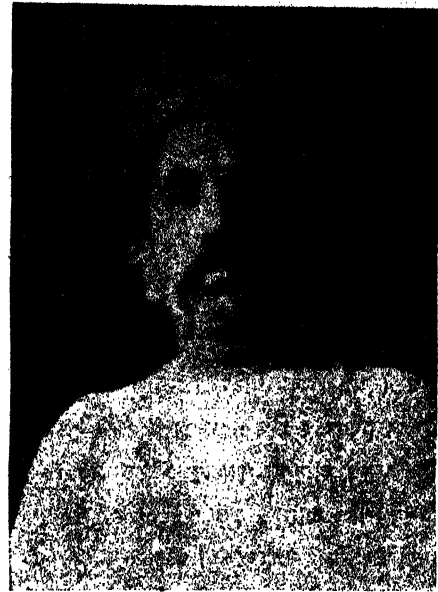
রাজাভাইয়া পুঁছওয়ালে

মেনে না নিলে, সারা ভারতবর্ষে কোথাও তাঁর মত কার্য্যকরী হবে না। সেই জন্য তিনি প্রথম চেষ্টা করেন গোয়ালিয়রে তাঁর মতানুবর্ত্তী একটী বিদ্যালয় স্থাপন করতে। গোয়ালিয়রের মাধব সঙ্গীতবিদ্যালয়, মহামতি ভাতখণ্ডের মতানুবর্ত্তী প্রথমতম সঙ্গীতবিদ্যালয়। এর অনেক পরে ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে ভাতখণ্ডে মতানুবর্ত্তী সঙ্গীতবিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে।

মাধব সঙ্গীতবিদ্যালয়ের স্থাপনকালে ওখানকার ... কর্ত্তৃক ভাল ভাল ওস্তাদকে মাসিক বৃত্তি দিয়ে, ... সঙ্গীতশাস্ত্র ও notation শেখার জন্য পাঠান হয়।

দফায় গিয়েছিলেন রাজাভাইয়া পুঁছওয়ালে (শঙ্কর রাওয়ের শিষ্য), পণ্ডিত বিষ্ণুবুয়া (বামন বুয়ার ছেলে), বলবন্ত রাও ভজনি (বামন বুয়ার শিষ্য), কৃষ্ণরা[illegible] নাপুরাও গোখলে, ভাস্কর রাও খাণ্ডেপারকর ও চুন্নিলাল।

মাধব সঙ্গীতবিদ্যালয়ের শিক্ষাকাল ছয় বৎসর। এই সময়ের মধ্যে ৪৫টী রাগের ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল ও লক্ষণ-গীত শেখান হয়। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতশাস্ত্র সম্বন্ধে বেশ ভাল ভাবে শেখান হয়। এখানে কোন মাহিনা লাগে না।

গোয়ালিয়রে গিয়ে ওখানকার বড়, ছোট, অনেকেরই গান শোনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তা'ছাড়া ওখানকার লোকসঙ্গীতও শুনেছি। আজ কেবল এই কথাই মনে হয় যে, ওখানকার অতি সাধারণ লোকেরা যেটুকু গান জানে বা বোঝে, তার কিছুটাও যদি আমাদের genius, বাঙলা দেশের তথাকথিত ওস্তাদরা জানত, বুঝত বা জানবার চেষ্টা করত, তা'হলে হয়তো আজকের বাঙলার রেডিও ও গ্রামোফোন মারফৎ ওস্তা[illegible] সঙ্গীতের নামে সঙ্গীত সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও সি[illegible] নামে অশ্লীলতাকে সহ্য করতে হ'ত না।

ব্রহ্মসূত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়

(দ্বিতীয় পাদ)

শ্রীমতিলাল রায়

মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্ ॥১১॥

হ্রস্ব (অল্প) বা পরিমণ্ডলাভ্যাম্ (ও অণু হইতে) মহদ্দীর্ঘবৎ (মহৎ ও দীর্ঘ পরমাণুর উৎপত্তি হওয়ার ন্যায়)।

অর্থাৎ হ্রস্ব দ্ব্যণুক পরমাণু হইতে তাহার বিপরীত পরিমাণবিশিষ্ট ত্র্যণুক, চতুরণুক এবং পরমাণু হইতে দ্ব্যণুকের উৎপত্তি বৈশেষিকেরা স্বীকার করেন।

ব্রহ্মসূত্রকার সাংখ্যবাদ নিরসন করিয়া বৈশেষিকের মতবাদ খণ্ডন করিতে এই সূত্রের অবতারণা করিতেছেন। বৈশেষিকেরা বলেন, কারণ-দ্রব্য কার্য্য-দ্রব্যে বিপরীত গুণ প্রকাশ করে। চেতন-ব্রহ্ম হইতে অচেতন জগৎসৃষ্টি এইরূপ; কারণ চেতন, কার্য্য অচেতন—বৈশেষিকের মতবাদ তবে গ্রাহ্য হইবে না কেন? ঋষি বাদরায়ণ বৈশেষিকের এই মত সমর্থন করেন না। বৈশেষিকেরা বলেন, সকল দ্রব্যই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে সংযুক্ত হইয়া উপজাত হয়। যেমন কার্পাসের অংশু হইতে সূতা, সূতা হইতে বস্ত্র। বস্ত্র একটী দ্রব্য। এই বস্ত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের সমবায়ে সৃষ্টি হইয়াছে। বস্ত্র অবয়বী, সূত্র তার অবয়ব। স[illegible] সূত্র অবয়বী, অংশু সকল তাহার অবয়ব। তারপর অংশুকে বিভাগ করিতে করিতে যখন তাহা[illegible] হয় অর্থাৎ আর অংশ করা যায় না, তাহাই পরমা[illegible] পরমাণু নিত্য। ইহা সৃষ্টিকালে কোন অদৃষ্ট কারণে স[illegible] হইয়া, এক পরমাণু আর একটীর সহিত সংযুক্ত হইয়া দ্ব্যণুক নামক পদার্থ সৃষ্টি করে। পরমাণু সকলের স্বরূপগত যে পরিমাণ, তাহারই নাম পারিমাণ্ডল্য। পরমাণুসংযোগে দ্ব্যণুকের সৃষ্টি হইলে, উহার সহিত এই পরমাণুর পারিমাণ্ডল্য পরিমাণে এক নহে। দ্ব্যণুকের পরিমাণ পরমাণুর পরিমাণ হইতে পৃথক্ হয়। এই পরিমাণকে হ্রস্ব পরিমাণ বলে। এই একটী দ্ব্যণুক পুনরায় পূর্ব্বোক্ত পরিমণ্ডলের সহিত সংযুক্ত হইয়া ত্র্যণুক পদার্থের সৃষ্টি করে। এই ত্র্যণুকের গুণ হ্রস্ব বা পারিমাণ্ডল্য নহে। ইহার পরিমাণের নাম মহৎ। এইরূপে দ্ব্যণুকে দ্ব্যণুকে চতুরণুকের জন্ম। এই চতুরণুকের পরিমাণ পারিমাণ্ডল্য, হ্রস্ব বা মহৎ নহে; পরন্তু দীর্ঘ। ইহা হইতে বুঝা যায়; কারণের যে গুণ, তাহা কার্য্যে একরূপ হইতেছে না। এই দৃষ্টান্তে বলা যায়—হ্রস্ব ও পরিমণ্ডল হইতে যখন তদ্বিপরীত মহৎ ও দীর্ঘ পরিমাণবিশিষ্ট পদার্থ জন্মে, তখন চেতন

হইতে অচেতন জন্মিবে, ইহা আর বিচিত্র কথা কি? তদুত্তরে বলা হইতেছে—

উভয়থাপি ন কর্ম্মাতস্তদভাবঃ ॥১২

উভয়থাপি (উভয় প্রকারই) ন কর্ম্ম (কোনরূপ কর্ম্ম হয় না) অতঃ (এই হেতু) তদভাবঃ (তাহার অভাব হয়)।

[illegible]সুদেব এক কথায় বলিতেছেন—পরমাণুবাদ সৃষ্টির [illegible]। কেন? তাহার যুক্তি এই—বৈশেষিকেরা [illegible] পরমাণুপুঞ্জ নিশ্চল ও অসংযুক্ত থাকে। [illegible] হারা অদৃষ্ট কারণে সচল হইয়া পরস্পর [illegible]ই যে পরমাণুপুঞ্জের প্রথম স্ফুরণ, তাহার [illegible]ক বা না হউক, উভয় পক্ষেই কর্ম্মোৎপত্তির [illegible] বস্ত্র অবয়বী। তাহার অবয়বনির্দ্ধারণ-[illegible]বিভাগের অভাব, তাহার নাম যখন পরমাণু, [illegible]পরমাণুর অবয়ববিভাগ অসম্ভব হইলেও, [illegible] অলক্ষ্য অবয়ব আছে, এ কথা স্বীকার [illegible]হইবে। বৈশেষিকেরা এই পরমাণুরাশিই [illegible]রণ বলেন। পরমাণু চারি প্রকারের, যথা—[illegible]ল, তেজঃ ও বায়ু। এই চারিটী দ্রব্যের সমবায়ে [illegible]বতীয় সৃষ্টি। পরমাণুনিচয় বিশ্লিষ্ট অবস্থায় উপনীত হইলে, প্রলয় হয়। প্রলয়কালে অসংখ্য পরমাণু বিশ্লিষ্ট থাকে। সৃষ্টিকালে এই চতুর্ব্বিধ পরমাণু স্ব-স্ব গুণযুক্ত পরমাণুর সহিত পুনঃ সংযুক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দ্ব্যণুক, ত্র্যণুক ও চতুরণুক সৃষ্টি করে। ভৌম, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় পরমাণু স্ব-স্ব গুণানুযায়ী দ্ব্যণুকাদি সৃষ্টি করিয়া পরস্পরের সমবায়ে বিশ্ব সৃষ্টি করে। সৃষ্টি ও লয় এইরূপে হইয়া থাকে। এক্ষণে কথা হইতেছে, পরমাণুর নিষ্ক্রিয় অবস্থা হইতে ক্রিয়মাণ অবস্থাপ্রাপ্তির কারণ কি? পরস্পরের মধ্যে সংযুক্তির প্রয়াস স্বতঃই হয় অথবা অন্য কিছু হইতে অভিঘাতপ্রাপ্তি ইহার কারণ কিম্বা কোন এক অদৃষ্ট কারণে পরমাণুপুঞ্জ সমবায়শক্তির দ্বারা একত্র হইতে উদ্যুক্ত হয়? প্রথম কথা, পরমাণুর অবয়ব আছে, এ কথা বৈশেষিকেরা স্বীকার করেন না। বস্তুর সহিত আত্মিক সংযোগ ব্যতীত কোন পদার্থে কোন প্রকার আয়াস হইতে পারে না। পরমাণু অনাত্মবস্তু, অতএব পরমাণুর সহিত পরমাণুর সংযুক্তি-হেতু প্রয়াসের কথা আসিতেই পারে না। পরমাণুও যখন অবয়ব নহে, তখন অভিঘাতের কথা অস্বী[illegible]। পরমাণুর ক্রিয়োৎপত্তির কারণ যদি অদৃষ্টই হয়, তাহা হইলেও এই অদৃষ্ট প্রয়াস ও অভিঘাত সৃষ্টি করিবে কি প্রকারে? বৈশেষিকের মতে অদৃষ্টও তো অচেতন। যাহা অচেতন, তাহার প্রবৃত্তি নাই; সে অন্যকেও প্রবৃত্ত করিতে পারে না। যদি বলা যায়—অদৃষ্টের আধার আত্মা, পরমাণুপুঞ্জের সহিত এই আত্মার সর্ব্বব্যাপী সম্বন্ধ আছে; ইহা হইলেও পরমাণুবাদীর মত দৃঢ় হইবে না। কেননা, এই সম্বন্ধ আজ আছে, কাল নাই, এরূপ হইতে পারে না। এই সম্বন্ধ চিরযুগের। তবে আবার পরমাণুপুঞ্জ প্রলয়কালে নিষ্ক্রিয় হয়, তাহার হেতু কি? কার্য্যের মূলে কারণ থাকা চাই—কারণ না থাকিলে, কার্য্য হয় না। পরমাণু যে পরমাণুতে সংযুক্ত হয়, তাহার আদ্য-ক্রিয়ার কোন কারণ পরমাণুবাদী দেখাইতে পারেন না। পরমাণুবাদ তাই কাল্পনিক। যাহা কল্পনা, তাহা সত্য নহে।

আরও আপত্তি আছে। পরমাণু যে পরমাণুর সহিত মিলিত হইয়া দ্ব্যণুক হয়, তাহা কি পরস্পরের সার্ব্বাত্মিক অর্থাৎ সর্ব্বাংশের ঐক্য? না পাশাপাশি জোড়া লাগিয়া পরিণতি লাভ করে? যদি সর্ব্বাংশে ঐক্যপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে পারিমাণ্ডল্যপরিমাণ সমান হইবে অর্থাৎ দুইটী পরমাণু একত্র হইলে, উহার পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি হইবে না। আর যদি আংশিক সংযোগ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে পরমাণুর অংশ মানিতে হইবে। পরমাণুর অংশ স্বীকার করিলে, পরমাণুবাদের ভিত্তিই ভাঙ্গিয়া যায়।

সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ ॥১৩

সমবায়াভ্যুপগমাৎ (সমবায় স্বীকার করা হেতু) চ (আরও) সাম্যাৎ (সমানতাপ্রযুক্ত) অনবস্থিতিঃ (অনবস্থা-দোষ উপস্থিত হয়)।

বৈশেষিকেরা দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়—এই ষড়বিধ পদার্থ স্বীকার করেন। গুণ ও কর্ম্ম দ্রব্যকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। সামান্য ও বিশেষ দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম, এই তিনে নিহিত থাকে। এক কথায়, পরমাণুবাদে দ্রব্যই প্রধান।

এক্ষণে বলা হইতেছে—বৈশেষিকেরা সমবায় [illegible] পৃথক্ পদার্থ স্বীকার করেন, তাহা [illegible]

অর্থাৎ পরমাণু সৃষ্টির কারণ, এই সিদ্ধান্ত কেমন করিয়া রক্ষা হইবে? অন্য পক্ষে পরমাণুতে পরমাণুকে মিলিয়া দ্ব্যণুক হয়। এই দ্ব্যণুকের পরিমাণ [illegible] পরমাণু হইতে ভিন্ন, পরমাণুর সমানতা প্রযুক্ত এইরূপ যুক্তি অনবস্থাদোষযুক্ত। যদি বলা হয়—পরমাণু এক পদার্থ, দ্ব্যণুক অন্য পদার্থ বটে; কিন্তু সমবায় এতদুভয়কে সম্মিলিত করে অর্থাৎ দুই পরমাণু এক হইয়া দ্ব্যণুকে পরিণত হয়। দ্ব্যণুক পরমাণু হইতে ভিন্ন হইলেও, সমবায় সম্বন্ধে পরমাণুতে দ্ব্যণুক অভিন্ন প্রত্যয়ের গোচর হয়। যদি তাই হয়, তাহা হইলে সমবায় ও সমবায়ী দ্রব্য পরস্পর ভিন্ন হইবে; সুতরাং তাহা অন্য এক সমবায় দ্বারা, সমবেত হওয়ার কথা আসিয়া পড়ে। যে কোন পদার্থই আশ্রয় ও আশ্রিত ভাবে অম্বিত। পদার্থ সম্বন্ধীয় একরূপ জ্ঞানের প্রতীতি—সমবায় সম্বন্ধবশতঃই হয়। আশ্রয় ও আশ্রিত ভাব থাকিলেই যে সমবায়-জ্ঞানের প্রতীতি হয়, এমন কোন কথা নাই। "যেমন কুম্ভে ঘৃত"—একটী আধার, অন্যটি আধেয়—ইহা সমবায় নহে। দ্রব্য ও গুণ এই ক্ষেত্রে পরস্পর অন্বিত হয় নাই। কর্ম্মই উভয়ের মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি করিয়াছে, এইজন্য দ্রব্যের এই জ্ঞানপ্রতীতি সমবায় নয়, সংযোগ।

সংযোগকে বৈশেষিকেরা যুতসিদ্ধ ভাব বলেন। সমবায় অযুতসিদ্ধভাব। যেমন সুতায় বস্ত্র, কপালে ঘট। উভয় ক্ষেত্রে পরস্পর অন্বিত হইয়া পদার্থের জ্ঞান জন্মায়। গো'র গোত্ব সমবায়-সম্বন্ধ। দ্রব্যের অন্বয়ে পদার্থ সমবায়-কারণে উৎপন্ন হয়; কিন্তু সূত্রের শুক্লত্ব বা কপালের রূপ বস্ত্র বা ঘটরূপে যে অন্বিত হয়, তাহাকে অসমবায়ী কারণ বলা হয়।

এক্ষণে কথা হইতেছে, সমবায় যদি পদার্থসৃষ্টির কারণ হয়, তাহা হইলে পরমাণু-কারণবাদের প্রয়োজন থাকে না, ইহা বলিতেই হইবে।

দ্ব্যণুক পরমাণু হইতে ভিন্ন পদার্থ। যদি বলা হয় —উৎপাদ্যমান দ্ব্যণুক পরমাণুদ্বয়ে সমবেত হয়, তাহাও সম্ভব নহে। পরমাণুকারণবাদ তাহাতে রক্ষিত হয় না; কেননা "সাম্যাৎ" অর্থাৎ সমানতাপ্রযুক্ত, অনবস্থাদোষ সাত্ত্বিক [illegible]।

অনবস্থা—যাহার মূল পাওয়া যায় না। ইহাতে সৃষ্টির কারণতত্ত্ব কেমন করিয়া অবগত হওয়া যায়? পরমাণু এক পদার্থ, দ্ব্যণুক অন্য পদার্থ, সমবায় কারণে পরস্পর মিলিত হয়—এ যুক্তিও অসঙ্গত। পরমাণু ও দ্ব্যণুকের ভিন্ন পরিমাণ, অথচ সমবায় কারণে দুইটী পরমাণু সমবেত হইয়া দ্ব্যণুকের ন্যায় প্রতীতি যদি জন্মায়, সমবায় ও সমবায়ী দ্রব্য পরস্পর ভিন্ন, সুতরাং তাহাও অন্য [illegible] সম্মিলিত হইবে। এরূপ হইলে, এক সমবা[illegible] জা[illegible] সমবায়, পর পর সমবায় কল্পনা করিয়া চ[illegible] এই

বৈশেষিকেরা বলিবেন—এমন হইবে [illegible] বস্ত্র, কপাল-কপালিকায় ঘট, এবম্প্রকার [illegible] নিত্য-সম্বন্ধ থাকার জন্যও হয়, পদার্থে [illegible] জন্য সম্বন্ধান্তর কল্পনা করিতে হইবে কেন? [illegible]

ইহাও ঠিক কথা নহে। তাহা হইলে [illegible] করেন। সংযোগও সমবায়ের ন্যায় স্বীয় আশ্রয় দ্রব্যের [illegible] সম্বন্ধের দ্বারা নহে। সংযোগ যদি পদার্থান্তরে [illegible] এই কারণেই তাহা সম্বন্ধবিশেষের অপেক্ষা [illegible] একই কারণে সমবায় স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া সম[illegible] অপেক্ষা করিবে।

অপেক্ষার কারণ কি! সম্বন্ধ-ভিন্নত্ব। এই কারণ সংযোগ পক্ষে যেমন, সমবায় পক্ষেও তদ্রূপ। সম্বন্ধ এক পদার্থ, তদ্বিষয় অন্য পদার্থ, এইরূপ ভিন্নতা সম্বন্ধান্তর থাকার কারণ হইলে, সমবায় পক্ষে ঐ প্রকার কারণ কেন থাকিবে না? অতএব সমবায়কে বৈশেষিক যে স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন, তাহাতেও সমবায়সিদ্ধির পক্ষে বিঘ্ন উপস্থিত হইতেছে। সমবায়ের অসিদ্ধি হেতু পরমাণুদ্বয়ে দ্ব্যণুক-সৃষ্টিও অসিদ্ধ হইতেছে। অতঃপর নিঃসংশয়ে বলা যায়—পরমাণুকারণবাদ যুক্তিসিদ্ধ নহে।

নিত্যমেব চ ভাবাৎ ॥১৪॥

নিত্যমেব (নিত্যকালই) ভাবাৎ (চলিয়াছে এই হেতু)।

অর্থাৎ নিত্যকালই সৃষ্টি ও প্রলয় চলিয়াছে, ইহার যুক্তি কি?

পরমাণুরাশি কি প্রবৃত্তি অথবা নিবৃত্তিশূন্য পদার্থ? যদি ইহার একটী হয়, তাহা হইলে হয় প্রলয়, না হয় সৃষ্টি, এই দুইয়ের একটী হইবে। আর যদি বলা হয়—পরমাণু

উভয়স্বভাববিশিষ্ট, ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ কথা। একাধারে উভয় স্বভাব থাকিতেই পারে না। যদি পরমাণু নিঃস্বভাব হয়, তাহা হইলে অদৃষ্ট কারণে সৃষ্টি ও প্রলয় দুইই হইতে পারে। কিন্তু বৈশেষিকের মতে, কাল ও অদৃষ্টাদি নিত্য ও নিয়ত সন্নিহিত। এই পক্ষেও নিত্য প্রবৃত্তি ও নিত্য [illegible] আপত্তি আছে। এই সকল কারণে পরমাণুবাদ [illegible]

[illegible]ত্বাচ্চ বিপর্য্যয়োদর্শনাৎ ॥১৫॥

[illegible] (পরমাণুর রূপাদি স্বীকার করা হেতু) [illegible] হইয়াছে) (কেন ?) দর্শনাৎ (লোক[illegible] বস্তুর স্থূলতা ও অনিত্যত্বই দেখা [illegible]

[illegible] মতে, চতুর্ব্বিধ পরমাণু রূপরসাদি গুণ-[illegible] কল্পনা করেন এই রূপাদিময় পরমাণু [illegible] কল্পনা; যুক্তি নহে। রূপাদি থাকিলেই [illegible]ত্ব লোক-মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। অতএব [illegible] বৈশেষিকের যে বিশ্বসৃষ্টির কারণজ্ঞান, [illegible]মাণুর রূপাদি কল্পনা বিপর্য্যস্ত হইয়াছে।

উভয়থা চ দোষাৎ ॥১৬॥

উভয়থা (পরমাণুর উপচয় ও অপচয়, এই উভয়ই) দোষাৎ (দোষ থাকা হেতু পরমাণুবাদ অনুপপন্ন)।

ভৌম, জলীয়, তৈজস, বায়বীয়, উপচিতাপচিত গুণযুক্ত। অর্থাৎ ভৌমের গুণ অধিক তদপেক্ষা জলের গুণ কম। এইরূপ জল হইতে তেজের ও তেজ হইতে বায়ুর গুণ অপচিত অর্থাৎ অল্প। পরমাণুতে গুণকল্পনা হেতু উহা অল্পাধিক যাহাই হউক, গুণবশতঃ পরমাণুর কারণবাদ অযুক্ত হয়। গুণবিশিষ্ট পদার্থ নিত্য হইতেই পারে না।

অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা ॥১৭॥

অপরিগ্রহাৎ (শিষ্টগণ কর্তৃক অগৃহীত হওয়া হেতু) অত্যন্ত অনপেক্ষা (অত্যন্ত অনাদরণীয় হইয়াছে) অর্থাৎ মন্বাদি শিষ্টজনেরা পরমাণুবাদ অস্বীকার করায়, বেদবাদিগণের নিকট পরমাণুবাদ অগ্রাহ্যের বিষয় হইয়াছে।

বৈশেষিকরা দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম ও সামান্য, বিশেষ ও সমবায়—এই ছয় পদার্থ অত্যন্ত ভিন্ন বলিয়া স্বীকার করেন। পরস্পর হইতে পরস্পর ভিন্ন অর্থে কেহ কাহারও অধীন নহে। এরূপ হইলে, দ্রব্য অত্যন্ত ভিন্নতাপ্রযুক্ত গুণাদিযুক্ত হইতে পারে না। অথচ দ্রব্য গুণের আশ্রয় বলিয়া বৈশেষিকেরা স্বীকার করিয়াছেন। ইহাতে নিজ মত অসঙ্গতিদোষযুক্ত হইতেছে। যদি ধূম ও অগ্নিকে পরস্পর পৃথক্ বলা হয় এবং ধূমের জ্ঞান অগ্নির অধীন, এইরূপ দ্রব্যের অধীন গুণ বলিলেও, তদুত্তরে বলা যায়, ধূম ও অগ্নি পরস্পর পৃথকরূপে যেরূপ ভাবে প্রতীত হয়, গুণ পক্ষে সেরূপ হয় না। শ্বেত, পীত বস্ত্র দ্রব্যের বিশেষণের দ্বারা পরস্পর পৃথক বোধ না জন্মাইয়া বস্ত্রকে প্রতীত করে, এই জন্য গুণ দ্রব্যের রূপ ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। এই একই যুক্তিতে কর্ম্ম, সামান্য, সমবায় প্রভৃতি দ্রব্যাত্মক বলিয়া সিদ্ধ হয়। যদি বলা যায়, অযুতসিদ্ধতায় অর্থাৎ সমবায়শক্তিতে দ্রব্য ও গুণ পরস্পর পৃথক্ প্রতীত না হইয়া একীভূত অনুভূত হয়; এরূপ স্থলে অযুতসিদ্ধ ব্যাপার সম্বন্ধে বিশেষ প্রণিধান করিতে হইবে। যুতসিদ্ধ অর্থে সংযোগ, অর্থাৎ কুণ্ডে দধি বলিলে কুণ্ড ও দধি পরস্পর পৃথক্ বস্তু; কিন্তু এক অপরের আশ্রয় হওয়ায়, বৈশেষিকের মতে, তাহাই যুতসিদ্ধ। অযুতসিদ্ধ এরূপ নহে; ইহাতে ইহা আছে, পরস্পর অপৃথকরূপে উৎপন্ন হয়, এই অপৃথকত্ব দেশ, কাল অথবা স্বভাবগত। যদি অপৃথক্ দেশ বলা হয়, তাহা স্ব-মত বিরুদ্ধ হইবে। কণাদ স্বয়ং বলিয়াছেন,

"দ্রব্যাণি দ্রব্যান্তরমারভন্তে, গুণাশ্চ গুণান্তরম্"

দ্রব্য দ্রব্যান্তর জন্মায়, গুণ গুণান্তর জন্মায়। সূত্র দ্বারা যে বস্ত্র প্রস্তুত হয়, তাহার কারণ দ্রব্য সূত্র। কার্য্য দ্রব্য—বস্ত্র। সূত্রনিষ্ঠ শুক্লাদি-গুণ কার্য্য-দ্রব্যে অনুস্যূত হয়। সৃষ্টিক্রিয়ায় বৈশেষিকের এই মত প্রখ্যাত। এই অবস্থায় দ্রব্য ও গুণের অপৃথক্‌দেশতা কেমন করিয়া সম্ভব হয়? সূত্রের দেশই বস্ত্রের দেশ। বস্ত্রের দেশ নাই। আবার শুক্লাদি গুণের দেশ বস্ত্রের দেশ বলিতে হইবে; সূত্রের উহা নহে। গুণ—গুণান্তর জন্মাইয়াছে, গুণ ও দ্রব্য পরস্পর স্বতন্ত্র ভাবে স্ব-স্ব স্বরূপ সৃষ্টি করিয়াছে; অতএব অযুতসিদ্ধতায় একদেশগত বলা অসঙ্গত হইল। কাল সম্বন্ধেও এই একই কথা। পশুর শৃঙ্গ এক কালে জন্মিলেও উহা অপৃথক্ নহে; যদি অপৃথক্ স্বভাব, অযুতসিদ্ধির লক্ষণ হয়, তাহা হইলেও দ্রব্য ও গুণের স্বরূপ[illegible]

অস্বীকার্য্য হয়। এই হেতু বৈশেষিকের পদার্থ পরস্পর ভিন্ন বলিয়া যে সিদ্ধান্ত, তাহা নিছক কাল্পনিক[illegible]।

বৈশেষিকেরা দুইটী পদার্থের যুতসিদ্ধ সম্বন্ধকে সংযোগ আখ্যা দিয়াছেন; আর অযুতসিদ্ধ পদার্থদ্বয়ের সম্বন্ধকে সমবায় বলিয়াছেন—এ সিদ্ধান্তও যুক্তিবিরুদ্ধ। কেননা উভয় পদার্থে অথবা অন্যতর পদার্থের মধ্যে কোন পদার্থ অযুতসিদ্ধ সাধন করিতেছে, তাহার কারণ অন্বেষণ করিলে দেখা যায়—কার্য্যের পূর্ব্বে কারণের সিদ্ধতা থাকায়, উভয়ের অযুতসিদ্ধতা কোন মতেই উৎপন্ন হয় না। অন্যতর পদার্থের মধ্যে অযুতসিদ্ধতা—তাহাও সম্ভব নহে, কেননা কারণ পৃথক্‌সিদ্ধ, কার্য্যও অপৃথক্‌সিদ্ধ এ কথা কি সঙ্গত হইতে পারে? কার্য্য দ্রব্য যদি অসিদ্ধ থাকে এবং উহা স্বরূপ লাভ না করে, তখন ঐ দ্রব্য কারণের সহিত সম্বন্ধবদ্ধ কিরূপে হইবে? সম্বন্ধ যখন পরস্পরাধীন, এক অন্যের অপেক্ষা রাখে, তখন এক দ্রব্য নিঃস্বরূপ থাকায়, অপর বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ হইতে পারে না। যদি বলা হয়, কোন কার্য্য-দ্রব্যের স্বরূপ নিষ্পত্তি হওয়ার পর কারণ-দ্রব্যের সহিত উহার সম্বন্ধ ঘটে, উহাকে আর সমবায় বলা যায় না। কুণ্ডে ঘৃত, দুটীই নিষ্পন্ন পদার্থ এই দুয়ের মধ্যে সংযোগ-সম্বন্ধই হয়। সমবায়-সম্বন্ধ হইতে পারে না। যদি এমন হয়, সংযোগের কারণ ক্রিয়া; উৎপত্তিক্ষণে দ্রব্য নিষ্ক্রিয় থাকে—এই অবস্থায় সংযোগ-সম্বন্ধ ঘটিতে পারে না। তদুত্তরে বলা যায়—কার্য্য-দ্রব্যের সহিত কারণ-দ্রব্যের সম্বন্ধ মাত্রেই উহা সং[illegible] সম্বন্ধ। সমবায় বলিয়া একটী পৃথক্ পদার্থ [illegible]

দেবদত্ত বৃদ্ধ হউক, বালক হউক, ব্রাহ্মণ [illegible] হউক, সে ব্যক্তি এক—তাহার স্বরূপ ও [illegible] এই নানা অর্থ দেওয়া যাইতে পারে। [illegible] জামাতা প্রভৃতি শব্দে অভিহিত হইলে [illegible] পণ্ডিত-মূর্খাদি নানা জ্ঞান থাকিলেও [illegible] নানাত্বে দেবদত্ত পৃথক্ পৃথক্ হইয়া পদার্থ [illegible] এই জন্য সমবায় একটী পৃথক্ পদার্থ বলি[illegible] করেন। [illegible] অভিমত শিষ্টগণ কর্ত্তৃক কোথাও স্বীকৃ[illegible] পরমাণুবাদ ঈশ্বর-কারণপ্রতিপাদক শ্রুতির [illegible] এই কারণেই ভারতের আর্য্যসমাজ পরমাণু[illegible] প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন।

(ক্রম[illegible]

রবীন্দ্র-বন্দনা

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

যুগ যুগ ধ'রে মূক ছিলো যারা, তাহাদেরে বাণী দিয়েচো কবি;
বাণীরে দিয়েচো নব আভরণ; অরূপে দিয়েচো দীপ্ত রূপ;
পথ-যাত্রার অভীক ইঙ্গ যাত্রীর বুকে দিয়েচো তুমি;
হে কবি, তোমার অজস্র দানে পৃথিবীরে তুমি করেচো ঋণী।

স্বার্থ-পাগল মানুষ যে হেথা হানাহানি করে পশুর মতো,
ধ্বংসী - বৃত্তি - ঘূর্ণাবর্ত্তে মানবতা আজি কলঙ্কিত—
ওগো স্বর্যাত! তব দানে যেন বঞ্চিত আজো না হয় ধরা;
তব আত্মার অমৃত আশীষ পৃথিবীতে যেন 'শিবম্' আনে।

ধরণীর অতি প্রিয় ছিলে তুমি, প্রিয়তর হ'লে স্বর্গতিতে,
বিশ্ব - মনের বেদনা - সিক্ত প্রণামেরে কবি গ্রহণ করো।

সাময়িক সাহিত্য

শূলপাণি

আধুনিক কালে চিত্রকলা বা সাহিত্য সম্বন্ধে সে [illegible] সারথ যাঁহারা তাঁহাদের, মতামত কলিকা পায় না; উপনিষদ ভা[illegible] হক্সলী বা এই ধরণের মুরুব্বিদের ভাষ্য [illegible]দের ভাবধারা—ইহাদের কোটেশনের ঠেকনা না [illegible]পূর্বক আলোক [illegible] বক্তব্যটা বেমজবুত হইয়া যায়। মেকলে [illegible] আচার্য্য হইতে [illegible] হইয়া গিয়াছেন—সাম্প্রতিকদের আসরে [illegible]র্শনিক উপ[illegible] [illegible]কের বাক্যের মত শুনাইবে, কাজেই [illegible] দয়া করি[illegible] ভয়ে ভয়ে এই গত শতাব্দীর এই [illegible]রসজ্ঞ বলিয়া পরিচিত ব্যক্তিটির একটি [illegible]তেছি। কবিতা বা গল্প লইয়া যাঁহারা [illegible]ন, তাঁহাদের ইহা কাজে লাগিতে পারে।

[illegible]st striking characteristic of the poetry of [illegible]e extreme remoteness of the associations [illegible] which it acts on the reader. Its effect [illegible]der is produced not so much by the ideas [illegible] directly conveys, as by the other ideas which [illegible] connected with them. He electrifies the mind [th]rough conductors. The most unimaginative man must understand the Iliad; Homer gives him no choice, but takes the whole on himself, and sets his images in so clear a light that it is impossible to be blind to them. Milton does not give a finished picture, a play for a mere passive listner. He sketches and leaves others to fill up the outline; he strikes the key-note and expects his hearers to make out the melody.

—Macaulay

মিল্টন সম্বন্ধে মেকলে সাহেব যাহা বলিয়াছেন, সত্যকারের শিল্প-সৌন্দর্য্যের ইহাই বোধ হয় একমাত্র মানদণ্ড। সে যুগের সাহিত্যরসিকের কাছে সাহিত্য-সৃষ্টির যে কথাটা সহজেই ধরা পড়িয়াছিল, একালের গতিশীল অগ্রসরমাণ যুগ তাহাকে বেমালুম ভুলিয়া শিল্পবোধ ও রুচির বিভিন্ন মানদণ্ড সৃষ্টি করিতেছে। সাহিত্যবিচারের এই মতবাদ—চিত্রকলায় হয়তো কিছুটা গ্রাহ্য হইয়াছে; কিন্তু সাহিত্যের ব্যাপারে সূক্ষ্ম রসবোধের এই দিকগুলি হারাইয়া আমরা নূতন নূতন form সৃষ্টি করিতেছি—নূতন প্রকাশভঙ্গী গড়িয়া তুলিতেছি। সাহিত্যের প্রাণধর্ম্ম রহিল বাহিরে পড়িয়া, অথচ ইহাদের বহিরঙ্গকে লইয়া চীৎকার আজ হাটের গণ্ডগোলে পরিণত হইয়াছে।

ভারতবর্ষ—ভাদ্র, ১৩৪৮ঃ

কীর্ত্তন—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার। এ মাসে ভারতবর্ষে এইটিই সবচেয়ে ভাল গল্প। হাসি ও অশ্রু মিশাইয়া সুন্দর যে আলেখ্য রচনা করা হইয়াছে, সাহিত্যরসের দিক দিয়া উহা আমরা উপভোগ করিয়াছি। এই ধরণের রচনায় সূক্ষ্ম মাত্রাজ্ঞান বজায় না রাখিলে, সমস্ত ব্যাপারটাই হাস্যকর হইয়া পড়ে। গল্পটি সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, ইহার মধ্যে এমন একটি প্রশংসনীয় সংযমের পরিচয় আছে, যাহার ফলে রচনাটি প্রথম শ্রেণীর পর্য্যায়ে উঠিয়াছে। রচনার প্রায় অধিকাংশ জুড়িয়া হাস্য ও কৌতুকের যে ধারাটি অব্যাহত আছে, তাহার অন্তরালে এই কীর্ত্তনীয়া প্রফেসার মানুষটির সাংসারিক জীবনের ব্যর্থতা ও বেদনা মনে বেশ একটি বেদনার স্পর্শ আনিয়া দেয়। লেখক আগাগোড়া রহস্য ও কৌতুকের যে প্রশস্ততর ক্ষেত্রটি প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার ফলে দু'একটি কথায় প্রফেসারের চরিত্রের পৌরুষ ও সাংসারিক অসহায়তার দিকটি যেন অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া ধরা পড়িয়াছে। লেখকের পক্ষে ইহা কৃতিত্বের কথা।

ফরাসী গণিকা—শ্রীগঙ্গাপদ বসু। ইহা অনুবাদ গল্প কিনা লেখক সে কথা বলেন নাই, কিন্তু আসলে একটি বিখ্যাত ফরাসী গল্পের উপর রাহাজানি করিয়া চালান হইয়াছে। লেখক মহাশয় ব্যক্তি, তবে না বলিয়া লওয়ার বিদ্যায় এখনও পোক্ত হইয়া উঠিতে পারেন নাই। বিখ্যাত ফরাসী লেখক মোপাঁসার "Mademoisélle Fifi and other stories" নামক পুস্তকের প্রথম গল্প Mademoiselle Fifi ভারতবর্ষের মহিমায় অরিজিন্যাল গল্প বলিয়া চলিয়া গিয়াছে। গোড়ায়ই যার গলদ সে সম্বন্ধে মন্তব্য বাহুল্য।

সেক্সপীয়রের জন্মভূমিতে—শ্রীমতিলাল দাশ। আভন-এর অমর কবি সেক্সপীয়রের জন্মভূমিতে লেখক গিয়াছিলেন। ইহারই বিবরণ লেখকে[illegible] ভাষায় ফুটিয়াছে। তাঁহার রচনার মধ্যে লেখক আমাদের দেশের কোন কোন ব্যবস্থার ত্রুটি ওদেশের তুলনামূলক আলোচনায় বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করিতেছেন। সম্প্রতি পত্রিকান্তরে ইহা লইয়া লেখককে বেশ দু'চার কথা শুনিতে হইয়াছে। ফাঁকা কথা শুনাইয়া মুরুব্বিয়ানা করিবার মত লোক এদেশে বহু আছে, ইহাদের দ্বারা কাজ অপেক্ষা অকাজ হয় বেশী। এই ধরণের বহু আলোচনায় আমাদের জাতীয় জীবনের গলদ ও ত্রুটিগুলি যদি সাধারণের নজরে পড়ে, তাহারও একটা মূল্য আছে।

সেকালের ইংরেজসমাজ—শ্রীহরিহর শেঠ। প্রবীণ লেখকের রচনায় সে-যুগের ইংরেজ সমাজের এক সুন্দর ছবি ফুটিয়া উঠিতেছে। ঐতিহাসিক প্রয়োজনের কথা ছাড়িয়া দিলেও, সাধারণ পাঠকের নিকট এই প্রবন্ধ যে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বর্ষাসুখ—শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত। কোন দিক্ দিয়াই কবিতাটি সার্থক হইয়া ওঠে নাই। না আছে ইহাতে বর্ষার বস্তুতান্ত্রিক বিবরণের সমারোহ, না আছে একটা আধ্যাত্মিক বস্তুনিরপেক্ষ চেতনা, যাহা রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতায় অপরূপ সুরের মায়া সৃষ্টি করিয়াছে। প্রবীণ কবির এই রচনায় কোনটিরই সন্ধান পাই নাই।

প্রকাশ—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র। আর একটি কবিতা। মৈত্র মহাশয়ের আধুনিক কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সুস্পষ্ট। শুধু প্রভাব বলিলে সব বলা হয় না। কবিগুরুর রচনার টেকনিক, তাঁহার ছন্দঃ ও ভাষার সুরটুকু পর্য্যন্ত রচয়িতা তাঁহার বহু কবিতায় ধরিতে চেষ্টা করিতেছেন। এই ধরণের অপচেষ্টা আরও কেহ কেহ করিতেছেন। ইহার ভাল ও মন্দের সবকিছু যুক্তি দিয়া বোঝানো অসম্ভব। ইহার হাস্যকর অবাস্তবতা ও দৈন্যের দিকটিও কি প্রবীণ মৈত্র মহাশয়কে আজ বুঝাইয়া দিতে হইবে?

আখেরী—শ্রীশ্যামধন বন্দ্যোপাধ্যায়। একটি গল্প। মধ্যে stunt ও প্যাঁচ আছে, কাজেই সাধারণ ইহা ভাল লাগিবে। গল্পটিকে কাটিয়া ছাঁটিয়া ছোট করিতে পারিলে, ইহা ভাল হইয়া উঠিত। লেখকের ভাষা ও বলিবার ভঙ্গীটি ভাল।

ফল্গু—শ্রীপরিমল মুখোপাধ্যায় এম-এ। গল্পটি ভালই হইয়াছে। অল্পের মধ্যে একটি বঞ্চিতার জীবনের গভীর বেদনার দিক্ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে গৌরব করিবার মত গল্পটি নয়। তথাপি অনুভূতি ও আবেদনের সূক্ষ্মতায় ইহা হইয়াছে উত্তীর্ণ।

ভারতবর্ষের অন্যান্য features যথাযথ[illegible] এই সূত্রে আমাদের একটি বক্তব[illegible] সমালোচনা করিতেছি ভাদ্রের 'ভারতব[illegible] কবিগুরু লোকান্তরিত হইয়াছেন। [illegible] হইলাম—ভাদ্রের ভারতবর্ষে কবিগুরু[illegible] উল্লেখ নাই। ব্যবসায় বুদ্ধিরও একটা [illegible] বলিয়া আমরা মনে করি।

জয়শ্রী—শ্রাবণ, ১৩৪৮ঃ

রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির সংঘাত এব[illegible] ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়। লেখক এই প্র[illegible] ক্রম-বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া অর্থনীতিক ঘাতপ্রতিঘা[illegible] ভাবে আত্মপ্রকাশ করে, তাহার সুন্দর বিবরণ দিয়াছেন। লেখক বলিয়াছেন—"ইউরোপীয় সমাজের উৎপত্তি ও বিকাশকে বিশ্ব-ইতিহাসের একটা আংশিক ধারা হিসাবে দেখলে একথা কিছুতেই বলা চলে না যে, শ্রেণী সংঘর্ষ আর্থিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের অনিবার্য্য কারণ এবং মূলসূত্র। এমন কি মার্ক্সও সমাজের একটা অন্তিম বিরামস্থান পরিকল্পনা করেছেন, যেখানে শ্রেণীও থাকবে না, শ্রেণীসংঘর্ষও থাকবে না এবং সমাজবিবর্ত্তন যেখানে, রাজনৈতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হবে না।" রাজনৈতিক পরিধির বাহিরেও যে সমাজবিবর্ত্তন ও সাংস্কৃতিক ধারা বহিতে পারে—প্রাচ্যের রাষ্ট্রীয় ও সমাজতাত্ত্বিক ইতিহাসে তাহার বহু প্রমাণ আছে। ইউরোপের প্রাণধারার সহিত রাষ্ট্রনীতির যে যোগাযোগ, তাহার ফলে শ্রেণী-সংঘর্ষ এড়াইয়া সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিবর্ত্তন সম্ভব, তাহা বর্ত্তমানে কল্পনাও করা যায় না। প্রবন্ধটিতে চিন্তার যথেষ্ট উপাদান আছে।

তবুও একাকী উত্তরিতে হবে—বিনয়েন্দ্রনাথ রায়। কবিতাটি আমাদের ভাল লাগিল।

রুদ্ধ কপাট—আশাপূর্ণা দেবী। গল্পটি আমাদের বিশেষ ভাল লাগিল না। শেষ পর্য্যন্ত নাস্তি ও কাঞ্চনের গৃহত্যাগের ব্যাপারে, গল্পটির শেষ রক্ষা হয় নাই। গৃহত্যাগের ব্যাপারে আপত্তি নাই, তবে ইহারা পলাইয়া [illegible] হইয়া ওঠার পথে কাঁটা দিয়া গিয়াছে।

উপনিষদ ভা[illegible]—শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। গল্পটি [illegible] ঋষিদের ভাবধারা [illegible] অপূর্ব্ব আলোক [illegible] একটা কিছু ধারণা করিয়া লইয়াছিলাম। [illegible] আচার্য্য হইলে [illegible] পড়িয়া বোঝা গেল, পরিশ্রমটা নেহাৎ দার্শনিক উপ[illegible]। লেখক বলিতেছেন—ইহাও কাহিনী [illegible] দয়া [illegible] কাহিনীর ভূমিকা মাত্র। অতএব এই বৃহত্তর [illegible] অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।

[illegible] শিল্পশিক্ষা—সুধীর খাস্তগীর। বেশ সুন্দর [illegible] ছাত্রীর শিল্প শিক্ষার ব্যাপারে লেখক যাহা [illegible]তা আমরা সমর্থন করি।

[illegible]—তড়িৎকুমার ঘোষ। কবিতাটিতে অত্যধিক [illegible]র হইয়াছে। electrocution-এর ভয় কাহা[illegible] [illegible]ন্ত বেশী, কাছে ঘেঁসা সুবিধার নয়। 'গোখরো সাপ'-এর সহিত 'বাপ্‌রে বাপ'-এর মিলের মহিমা ধরিতে পারিলাম না।

পুত্রী—ক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ—ধারাবাহিক গল্প, এ পর্য্যন্ত মন্দ হয় নাই।

প্রত্যর্পণ—অমর ভট্ট। কবিতা। চলন সই।

সমসাময়িক রাজনীতির ইঙ্গিত—শ্রীঅনিলচন্দ্র রায়। ভারতের বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে লেখক সুন্দর ভাষায় কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। এই চিন্তাশীল লেখকের রচনা জয়শ্রীর একটি বিশেষ আকর্ষণ। লেখক যে সকল arguments উপস্থিত করিয়াছেন তাহা চিন্তা করিবার।

জীবন-সন্ধ্যায়—অমিয়া দাস। একটি সাধারণ কবিতা।

কুৎসিৎ—রাখাল তালুকদার। কাঁচা হাতের রচনা।

হিন্দু (সাপ্তাহিক)—১৭শ, ১৮শ ও ১৯শ সংখ্যা

সম্প্রতি উপরোক্ত সংখ্যা হিন্দু পত্রিকায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে উপলক্ষ্য করিয়া যে ভাষায় আক্রমণাত্মক মন্তব্য ও ইঙ্গিত করা হইয়াছে, তাহার প্রতিবাদ করিবার মত প্রবৃত্তি আমাদের নাই। প্রতিবাদের যোগ্যও উহা নহে। আমরা শুধু ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইতেছি, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু[illegible]র মাসাধিক কাল এখনও অতীত হয় নাই, দেশের প্রতি প্রান্ত এখনও এই মনীষীর বিরহ-ব্যথায় উদ্বেলিত অথচ ঠিক এমনই সময়ে 'হিন্দু'র পরিচালকবৃন্দ সকল সুরুচিবোধ, ভব্যতা ও মাত্রাজ্ঞান ভুলিয়া এইরূপ অহিন্দুচিত কুৎসিৎ ইতরামিতে মাতিয়া উঠিতে পারে তাহা কল্পনা করাও কঠিন। ব্যক্তিগত মতামতের স্বাধীনতা সকলেরই আছে। কবিগুরুর জীবিতকালেও 'হিন্দু' তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কটূক্তি ও বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই 'হিন্দু'র এই অভদ্রোচিত আক্রমণ অমার্জ্জনীয়। ২৪শে শ্রাবণ তারিখের হিন্দুতে 'অস্তমিত রবি' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে শ্রদ্ধাঞ্জলীর দুই একটি নমুনা আমরা নীচে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :

"আমাদের দুঃখ, এতবড় একটি প্রতিভা সুদীর্ঘকাল তাহার রশ্মিজাল বিকীর্ণ করিয়াছিল ভারতবর্ষকে—চিরন্তন ভারতবর্ষকে উজ্জ্বল করিবার জন্য নহে, দগ্ধ করিবার জন্য ; * * * * একটি মহৎ জীবনের শেষ হইয়া গেল যাহার বিফলতার কাহিনী চিরদিন কলির বিদগ্ধ ইতিহাসের সহিত বিজড়িত হইয়া থাকিবে।"

মুসলমান পরিচালিত সাম্প্রদায়িক 'মোহাম্মদী' এবং জাতীয়তাবাদী 'শিশুমহলের' রবীন্দ্র-সংখ্যা বাহির হইয়াছে। 'হিন্দু' ছাড়া বাংলা অন্য কোন পত্রিকা আমাদের চোখে পড়ে নাই যাহা কবিগুরুর একখানা ছবি প্রকাশ করে নাই। শাস্ত্রের নির্ব্বোধ গোঁড়ামী এবং সনাতনী সাজিবার ভাঁড়ামী 'হিন্দুকে' যে কতখানি হেয় এবং উপহাসাস্পদ করিয়া তুলিয়াছে, তাহাও এই পত্রিকার ধুরন্ধর পরিচালকদের বুঝিবার সামর্থ্য নাই। এইরূপ কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন তথাকথিত সনাতনী কর্ণধারদের হাতে পড়িয়া হিন্দুত্বেরও লাঞ্ছনার শেষ নাই। তাই ইঁহারা সমাজের শ্রদ্ধা হারাইয়া ক্রমশঃ অপাঙ্‌ক্তেয় হইয়া পড়িতেছে। আমরা বলি, 'হিন্দু' রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এখন এই অসহিষ্ণু বিষোদ্গার না করিয়া কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিবার মত শিষ্টাচারটুকু দেখাইলে অধিকতর শোভন সঙ্গত ও বুদ্ধিমানের কাজ হইত।

সত্যকার শিল্প-সৃষ্টি

সকল রকম চারুশিল্প যেমন সাহিত্য, চিত্র, নৃত্য, সঙ্গীতের চর্চ্চা আজকাল যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছে, তেমনি উহার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও স্বরূপ লইয়া নানারূপ মতামত ও তর্কবিতর্কের অবসর মাথা তুলিয়াছে। এ সম্বন্ধে শ্রাবণ মাসের উত্তরায় 'মায়ের সঙ্গে আলাপ' শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুত নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় যে ইঙ্গিত দিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা শিল্পরসিকগণের অনুধাবনীয়। আমরা উহার সারাংশ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:

শিল্পের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্যকে প্রকাশ করা—কিন্তু বিশ্বধারার সাথে নিবিড় সম্বন্ধ রেখে। শ্রেষ্ঠ জাতি সব, যে সব মানব-গোষ্ঠী শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত তারা সর্ব্বদা শিল্পকে জীবনধারার অংশ বলে দেখেছে, সর্ব্বদা তারাই সেবায় নিযুক্ত রেখেছে। জাপানের শিল্প এই ধরণের ছিল—তার মহত্তর দিন কালে; তবে বেশীর ভাগ শিল্পীই হলেন পরগাছার মত, জীবনধারার আশে পাশে তাদের বাসা—মনে হয় তাদের যেন এ জ্ঞানটি নাই যে শিল্প হবে ভগবানের প্রকাশ; জীবনের সহায়ে, জীবনের মধ্যে সত্যকে প্রকাশ করতে হবে সত্যের অগণিত ছন্দে, সকল জিনিষের মধ্যে, সর্ব্বত্র, সকল সম্বন্ধের ভিতর দিয়ে; জীবনের প্রত্যেকটি অঙ্গ হবে সৌন্দর্য্যের, সম্মেলনের প্রকাশ। দক্ষতা শিল্প নয়, গুণবত্তাও শিল্প নয়। শিল্প হল জীবন্ত একটা সম্মেলন ও সৌন্দর্য্য, জীবনের যাবতীয় অঙ্গ দিয়ে তাকে ব্যক্ত করতে হবে। এই সত্যকার শিল্প-সৃষ্টি হল ভাগবত-সিদ্ধির এক অংশ, হয়ত তার অধিকাংশই।

অতিমানসের দৃষ্টিতে ভগবানের জন্য কোন প্রকাশের মতনই সমান প্রয়োজনীয় হল সৌন্দর্য্য ও সম্মেলন। কিন্তু তাই বলে এদের পৃথক করে ধরা উচিত নয়, অন্য সকল রকম সম্বন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন করেও নয়, সমগ্র থেকে সরিয়ে ফেলেও নয়—জীবনের একটা অখণ্ড অভিব্যক্তির সঙ্গে তাদের মিলিয়ে ধরতে হবে। * *

* * সত্যকার শিল্প কিন্তু একটা অখণ্ড, সমগ্র বস্তু—জীবনের সাথে এক হয়ে মিলে ও মিশে আছে। এই যে একটা নিবিড় ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সমগ্রতা তার কিছু উদাহরণ পাওয়া যায় প্রাচীন গ্রীসে ও প্রাচীন মিশরে; কারণ সেখানে ছবি, মূর্ত্তি, কারুবস্তু সকলেরই স্থান [illegible] হেতু নির্দ্দিষ্ট হয়েছে একখানি স্থাপত্যগত পরিকল্পনা [illegible] প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ছিল সমগ্রের এক অংশ এবং সমগ্রের সম্মিলিত সামঞ্জস্যের সহায়। জাপানেও ঠিক তাই দেখি—অন্ততঃ দুদিন আগে পর্য্যন্ত এই রকমই ছিল,—বাহ্য সাফল্য আর লাভই কেবল [illegible] আধুনিকতা, তার আক্রমণ তখন সুরু হয় নাই। [illegible] জাপানী বাড়ী এক অত্যাশ্চর্য্য অখণ্ড কারুবস্তু। [illegible] যথাযথ স্থানে—অতিরিক্ত কিছু নাই, আবার কে[illegible] এই [illegible] নাই। একটা অনুভব হয় যেন সমস্তখানি দৃঢ়বদ্ধ [illegible] যেমন হওয়া দরকার ঠিক তেমনটিই; আর বা[illegible] প্রাকৃতিক দৃশ্যের সাথে সুন্দর মিলে মিশে রয়েছে। [illegible] দেখি চিত্র, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য সব একটা সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ [illegible] ভগবদারাধনার এক সম্মিলিত ধারার মধ্যে একীভূত [illegible]

* * সার্থকনামা শিল্পী যাঁরা তাঁরা যোগীদের [illegible] করেন। [illegible] লাভ করবার, গ্রহণ করবার জন্য গভীর ধ্যানের [illegible] একটা সত্য সত্যই সুন্দর জিনিষ সৃষ্টি করবার জন্যে [illegible] অন্তরের দৃষ্টি দিয়েই সে জিনিষটি দেখতে হয়, আপন [illegible] তার একটা সর্ব্বাঙ্গীণ রূপ গড়ে তুলতে হয়। নিজের [illegible] রকমে আবিষ্কার করে, দৃষ্টিগোচর করে, অধিকার করে তবে [illegible] তার আকার তাঁরা রচনা করতে সক্ষম হয়ে থাকেন—অন্তরের ভাবময় দর্শন তার বস্তুময় প্রস্ফুরণই হল তাঁদের সৃষ্টি। * *

* * মনের উর্দ্ধে, বহুদূরে, একটা রাজ্য আছে যাকে বলা যেতে পারে ছন্দের জগৎ। যদি সেখানে উঠে যেতে পার, তবে আবিষ্কার করবে পৃথিবীর যত রকম ছন্দ প্রকাশ পেয়েছে তাদের সকলের মূল রয়েছে সেখানে। * *

* * সকল শিল্পের এই যে উৎপত্তি স্থান এখানে পৌঁছিবার সামর্থ্য দিতে পারে যোগ-সাধনা—এখানে পৌঁছিলে তোমার যদি ইচ্ছা হয় তবে যাবতীয় শিল্পেরই তুমি পরম শিল্পী হয়ে উঠতে পার। তবে প্রায়শঃ যারাই সেখানে যায়, তারা এই সৌন্দর্য্যের ও মহানন্দের রসভোগে মগ্ন থাকাই বেশি শ্রেয়ঃ ও আরামদায়ক বোধ করে, পৃথিবীর উপর তাদের প্রকাশ করতে, একটা স্থূল আকার দিতে চায় না। কিন্তু এই যে বিরতি তা যোগের চরম সত্য নয়; বরং তা হল যোগশক্তির কর্ম্মতৎপর মুক্তগতির বিকৃতি ও খর্ব্বতা—তার হেতু বৈরাগ্যের নেতিমুখী বৃত্তি। ভগবৎ ইচ্ছার স্বরূপই হল আপনাকে প্রকাশ করা, পরম নৈষ্কর্ম্ম্যের মধ্যে, চরম নীরবতার মধ্যে আপনাকে নিবৃত্ত করা নয়। ভাগবত চৈতন্য অর্থ সত্য সত্যই যদি নৈষ্কর্ম্ম্য আর অব্যক্ত আনন্দ, তবে সৃষ্টি বলে কিছু হতে পারত না।
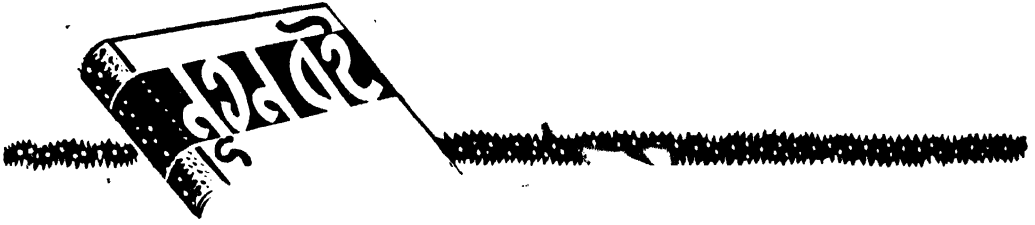
উপনিষদের আলো—ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ সংখ্যা ১৫৯, মূল্যের উল্লেখ নাই।

উপনিষদ ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার আলোক-স্তম্ভ। যুগে যুগে [illegible]দের ভাবধারা আমাদের জাতীয় জীবনের সাংস্কৃতিক দিকটিকে অপূর্ব্ব আলোকে মহিমান্বিত করিয়াছে। শঙ্কর, রামানুজ, বল্লভ [illegible] আচার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া সোপেনহার, এমারসন প্রভৃতি দার্শনিক উপ[illegible] আলোকে সত্যের সন্ধান করিয়াছেন। আধুনিক [illegible] দয়া করি[illegible]ন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীষীর সাধনার মূল [illegible]। ডক্টর সরকারের রচনার প্রসাদগুণে উপনিষদের [illegible] সৃষ্টিলীলায় পরিণতি লাভ করিয়াছে। আলোচ্য [illegible]ধারণের জন্য সহজ ও সরলভাবে উপনিষদের মূল [illegible]র সহিত তুলনামূলকভাবে বিবৃত করিয়াছেন। [illegible] ইহার প্রয়োজন আছে। আমাদের ধর্ম্ম ও [illegible]র সহজবোধ্য ভাষায় আলোচনা হওয়া উচিত। [illegible]ই ধরণের পুস্তকের যে বিশেষ সমাদর আছে তাহা [illegible]টির দ্বিতীয় সংস্করণেই প্রকাশ। পুস্তকটির গঠন-সৌষ্ঠব দৃষ্টি আকর্ষণ [illegible]রে। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

কো ভ্যাডিস—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম, সি, সরকার এ্যাণ্ড সন্স লিঃ, ১৪ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। পৃঃ সংখ্যা ১০২, দাম আট আনা।

ইহা পোলিশ সাহিত্যের একখানি জগদ্বিখ্যাত উপন্যাস। লেখক স্বাধীনভাবে ইহার অনুবাদ করিয়াছেন—literal অনুবাদ ইহা নয়। তাহা সত্ত্বেও মূল উপন্যাসের ভাব ও সৌন্দর্য্যের অনেক কিছু ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইংরাজীতে যাঁহারা অনভিজ্ঞ তাঁহারা এই পুস্তকের মধ্য দিয়া পোলিশ সাহিত্যের এই রত্নখনির সহিত অন্ততঃ কিছুটা পরিচয় স্থাপন করিতে পারিবেন। মূল্য বেশ সুলভ। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই সাধারণ।

আমাদের পরিচয়—শ্রীসুধীরকুমার দাশগুপ্ত, এম-এ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—বীণা লাইব্রেরী, ১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। পৃঃ সংখ্যা ২২২, দাম দুই টাকা।

আমরা কি? কোথা হইতে আসিয়াছি? জাতির কোন পরিচয় পত্র বহন করিয়া ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতা যুগ-যুগান্তের পথ অতিক্রম করিতেছে—তাহার বৈচিত্র্য ও গৌরব জাতির পরম সম্পদ। সকল জাতির পক্ষেই ইহা সত্য। বর্ত্তমান যুগে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির অভিমান শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, সমাজের প্রাণশক্তি গিয়াছে দেউলিয়া হইয়া, একটা অনন্ত আঁধার যেন পথ আগুলিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। এই অবস্থাকে ফিরাইতে হইবে এবং ইহা অত্যন্ত আশার কথা যে, সে দিক দিয়া কিছু কিছু কাজও যে সুরু হইয়াছে, এরূপ পুস্তক প্রণয়নই তাহা প্রমাণ করিবে।

আলোচ্য পুস্তকটি দ্বাদশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। প্রথমার্দ্ধের ছয়টি অধ্যায়ে আলোচনা বেশ সহজ ও সরল। দ্বিতীয়ার্দ্ধের ছয়টি অধ্যায়ে হিন্দু দর্শন ও সাধনপ্রণালীর কিছু কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। ইহার মধ্যেও লেখকের অন্তর্দৃষ্টি ও সহজ চিন্তাশীল মন কোথাও জটিলতার সৃষ্টি করে নাই। সাধারণের বোধগম্য করিয়া হিন্দুর ধর্ম্ম-শাস্ত্রগুলির এই যে তাত্ত্বিক আলোচনা ইহার প্রয়োজন এ যুগে অত্যন্ত বেশী। পুস্তকটি শিক্ষিতশ্রেণীর সমাদর লাভ করিবে, ইহা আমরা বলিতে পারি। গঠন-পারিপাট্যেও পুস্তকটি হইয়াছে আকর্ষণীয়।

চারণ গাথা—শ্রীমহুজচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী প্রণীত। মূল্য ছয় পয়সা।

হিন্দুর জাতীয়তাকে উদ্বোধন করিবার পক্ষে এই গাথা বেশ সময়োপযোগী। রচনার মধ্যে শুধু ভক্তি-বিনম্র মনেরই পরিচয় পরিস্ফুট হয় নাই, একটি সরল জাতীয় প্রাণের বন্দনাগান ইহাতে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে।

পূরবী—এস্, এ, জাফর প্রণীত। প্রকাশক—সালাহ্ উদ্দিন আজাদ। পি ২, সুহ্‌রাওয়ার্দ্দি এ্যাভিনিউ, পার্ক সার্কাস, কলিকাতা। পৃঃ সংখ্যা ২১৬, দাম দুই টাকা।

আলোচ্য উপন্যাসটি পড়িয়া আমরা লেখক সম্বন্ধে আশান্বিত হইয়াছি। উপন্যাসের ক্ষেত্রে লেখক নবাগত হইলেও উপন্যাসের আখ্যানভাগ ও চরিত্রচিত্রণে কোথাও অস্বাভাবিকতা ফুটিয়া ওঠে নাই। ঘটনার গতিবেগ স্বচ্ছন্দভাবে শেষ পর্য্যন্ত পাঠকের কৌতূহলকে অব্যাহত রাখিয়াছে। বিষয়বস্তু নির্ব্বাচনে লেখক আধুনিক,—সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য কোথাও অযথা মাত্রা ছাড়াইয়া যায় নাই; সর্ব্বত্রই একটি প্রশংসনীয় সংযমের পরিচয় পাইয়াছি। কয়েকটি চরিত্র আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে। ইহারই মধ্যে অপূর্ব্ব, পূরবী, হরিপ্রিয় প্রভৃতি কয়েকটি চরিত্র উল্লেখযোগ্য। বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, লেখক কোথাও বক্তৃতার [illegible]

অথচ আধুনিক যুগে অনেক উপন্যাসকার যে প্রকার অনর্থক বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের পরিচয় দিয়া থাকেন তাহাতে অবাক্ হইতে হয়। উপন্যাসের ভাষা প্রাঞ্জল ও গতিশীল। গঠন [illegible] পুস্তকটি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়—(সংক্ষিপ্ত পরিচয়) স্বামী সত্যানন্দ গিরি প্রণীত। প্রকাশক: যোগদা সৎসঙ্গ (শ্যামাচরণ মিশন) ১১৭ সি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা। মূল্য সাত আনা।

রচয়িতা শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীশ্রীলাহিড়ী মহাশয়ের উপদেশের মধ্যে এমন সহজ ও কার্য্যকরী ব্যবস্থার নির্দ্দেশ আছে যাহা সহজেই সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করে। লেখক সত্যই বলিয়াছেন, ধর্ম্মনীতির এই বাক্‌চাতুর্য্য ও কথাসর্ব্বস্বের যুগে কথা ছাড়িয়া কাজে উদ্যোগী হওয়া, কেবল শাস্ত্র বিচার না করিয়া অনুষ্ঠানে যত্নবান হওয়া, নিজের দিকে লক্ষ্য রাখা, পরোক্ষ চিন্তার পরিবর্ত্তে অপরোক্ষ অনুভূতির প্রতি মনোযোগী হওয়া ইত্যাদি অতি প্রয়োজনীয় পথপ্রদর্শন ঠাকুর করিয়া গিয়াছেন। শ্রীশ্রীলাহিড়ী মহাশয়ের ভক্তমণ্ডলী পুস্তকটি পড়িয়া তৃপ্তি পাইবেন। সাধারণ পাঠকও এই মহাপুরুষের জীবনীর মধ্যে অনেক কিছু জানিবার বস্তু পাইবেন। আমরা পুস্তকটির বহুল প্রচার কামনা করি।

দীক্ষা ও অর্চ্চন-বিধি—ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী। বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়েরস্থ শ্রীশ্যামকুঞ্জ হইতে ডাঃ ললিতমাধব ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পৃঃ সংখ্যা ৮২, ভিক্ষা ছয় আনা।

গ্রন্থকার সাধারণের বোধগম্য করিয়া অতি সহজ ও সরল ভাষায় এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। আকারে ইহা বৃহৎ নয়, তথাপি দীক্ষা ও অর্চ্চনের বিষয় ইহাতে সুখবোধ্যভাবে বর্ণিত হইয়াছে। দীক্ষার্থী ও দীক্ষিত উভয়েই এই পুস্তকের সাহায্যে দীক্ষা ও অর্চ্চনার অনেক ব্যবহারিক নির্দ্দেশ পাইবেন।

যক্ষ্মা চিকিৎসা (প্রথম খণ্ড)—শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায়, এম, এ, প্রণীত। গ্রন্থকার কর্ত্তৃক ১৭২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। পৃঃ সংখ্যা ১৬২, মূল্য আড়াই টাকা।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা জগতে লেখক সুপরিচিত। লেখক তাঁহার অভিজ্ঞতা-লব্ধ চিকিৎসাপ্রণালী ও সুচিন্তিত প্রয়োগবিধি সহজবোধ্য ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। বর্ত্তমানে বাঙলা দেশে যক্ষ্মার প্রকোপ বাড়িয়া গিয়াছে। বাঙালীর স্বাস্থ্যহীনতার রন্ধ্রপথে এই যে অভিশাপ প্রবেশ করিয়াছে ইহার আশু প্রতিকার ব্যবস্থা প্রয়োজন। আমরা [illegible] সুখী হইলাম, লেখকের [illegible] সাধারণ শিক্ষিত পাঠকের [illegible] সংক্ষিপ্ত [illegible]

কর্ম্মপ্রচেষ্টার অভাবই দৃষ্ট হয়। লেখক এই পুস্তকের মধ্য দিয়া যেটুকু চেষ্টা করিয়াছেন আজিকার দিনে তাহার মূল্য আছে। পাঠক-সমাজে পুস্তকটি আদৃত হইলে আমরা সুখী হইব।

ম্যাজিকের কৌশল—যাদুকর শ্রীযুক্ত পি, সি, সরকার প্রণীত ও আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫নং কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত, মূল্য এক টাকা।

বইখানি যাদুকর পি, সি, সরকারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুস্তক। সাধারণের নিকট ইহা ছেলেদের ম্যাজিক (দ্বিতীয় ভাগ) নামে পরিচিত। ইহাতেও অনেকগুলি নূতন খেলা বহুল চিত্রযোগে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বইটীর শেষাংশে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যাদুকরগণের যে সংক্ষিপ্ত জীবনী দেওয়া হইয়াছে তাহাতে বইখানির প্রয়োজনীয়তা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ব্যবহারিক যাদুবিদ্যার ক্ষেত্রে পি, সি, সরকারের নাম আজ পুরোভাগে কিন্তু তিনি শি[illegible] না [illegible] অবতারণা করিয়া যে নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করিয়া[illegible] নাম অমর হইয়া থাকিবে। এই বইখানির ছাপা [illegible] আমরা পুস্তকটির প্রচার কামনা করি।

ছেলেদের ম্যাজিক—যাদুকর [illegible] সরকার প্রণীত ও আশুতোষ লাইব্রেরী, [illegible] স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত মূল্য এক [illegible]

যাদুবিদ্যার বিচিত্র খেলা দেখাইয়া লেখক বিশে[illegible] করিয়াছেন। ম্যাজিক সম্বন্ধে মিঃ সরকারের কয়েকখানি ব[illegible] বেশ জনপ্রিয় হইয়াছে। আলোচ্য পুস্তকও জনপ্রিয়তার দাবী রা[illegible] তাহার প্রমাণ অল্পদিনের মধ্যেই পুস্তকটির তৃতীয় সংস্করণ হইয়া গিয়াছে। বুঝাইবার কৌশলে ও ব্যবহারিক নির্দ্দেশের পুঙ্খানুপুঙ্খতায় পুস্তকটি ছেলেদের মনে এক রহস্যের মায়াজাল সৃজন করিবে—পুস্তকটি সম্বন্ধে ইহাই বোধ হয় বড় কথা। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই আরও মনোরম হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল।

ম্যাজিক শিক্ষা—যাদুকর পি, সি, সরকার প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—এ, মুখার্জ্জি এণ্ড ব্রাদার্স, ৬নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ৪৮ পৃষ্ঠা, মূল্য চারি আনা।

'ম্যাজিক শিক্ষা' লেখকের সর্ব্বাপেক্ষা কম দামের বই। ইহাতে অনেকগুলি সুন্দর খেলা ছবির সাহায্যে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যাদুকরগণ কখনও নিজেরা নিজেদের খেলার রহস্য উদ্‌ঘাটন করেন না, কাজেই যাদুকর সরকারের এই প্রচেষ্টায় নূতনত্বই আছে বলিতে হইবে। ছেলেদের এইরূপ নির্দ্দোষ আমোদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণে এই সব বই সহায়ক হইবে, এই দিক দিয়া যাদুকর সরকার প্রশংসার যোগ্য। চারি আনার বই এক সংখ্যা ভিঃ পিঃ করাতে অসুবিধা হইবে বিবেচনায় প্রকাশকগণ পাঁচ আনার ডাক টিকিট পাইলেও এই পুস্তক পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। বইখানির শেষাংশে লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

শ্রীকলিঙ্গনাথ ঘোষ এম-এ

"শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে" গীতার এই মহাবাক্য সফলকাম হইতে দৃষ্ট হয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জন্ম ও জীবনে। কলিকাতা যোড়াসাঁকোর সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুর পরিবারে মহর্ষির আবির্ভাব। তিনি দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র, অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে লালিত-পালিত, বাল্যে ও যৌবনে তাঁহার চারিদিকে কেবল ভোগ-বিলাস ও ঐহিক আমোদ-প্রমোদের অনুকূল বায়ু অহর্নিশ প্রবাহিত ছিল; হৃদয়ে শ্রদ্ধাভক্তি লাভ করিবার তেমন সুযোগ তিনি তখন পান নাই, ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ পাওয়া তো দূরের কথা। মহর্ষি নিজেই বলিয়াছেন যে, তাঁহার উপর আনন্দময় পরমপুরুষের এই অপার কৃপার কোথাও তুলনা মিলে না; এই প্রতিকূল অবস্থাতেও ঈশ্বর [illegible] দয়া করিয়া তাঁহার মনে বৈরাগ্য দিলেন; তাঁহার [illegible] কাড়িয়া লইলেন; তিনি সংসারে সন্ন্যাসী [illegible] আঠারো বৎসর বয়সে তাঁহার অধ্যাত্মজীবনের [illegible] তাঁহার দিদিমার মৃত্যুর পর তাঁহার কাছে [illegible] নীরস, পৃথিবী শ্মশানতুল্য", তখন তিনি [illegible]র একটি ছিন্ন পত্র কুড়াইয়া পাইলেন: [illegible] দ্বারা সমস্ত আচ্ছাদিত কর; তিনি যাহা দান [illegible]ছেন, তাহাই ভোগ কর। মা গৃধঃ কস্যসিদ্ধনম্—কাহারো ধনে লোভ করিও না।" ঈশ্বরের জন্য যখন তিনি ব্যাকুল, উপনিষদের এই ছিন্ন পত্র তখনই দৈববাণীর মত তাঁহার কাছে আসিয়াছিল। পিতামহীর মৃত্যুর প্রাক্কালে দেবেন্দ্রনাথ জীবনে প্রথম ব্রহ্মানন্দের আস্বাদ পাইলেন; সহসা তাঁহার হৃদয়-পদ্মে জ্যোতির্ম্ময় পরম পুরুষের সাক্ষাৎকারলাভ ঘটিয়াছিল। তাঁহার দিদিমার যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত, বাড়ীর লোক তখন তাঁহাকে লইয়া গঙ্গাতীরে একটি খোলার চালাতে রাখিয়াছিলেন এবং তিনি তথায় তিন রাত্রি জীবিত ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ সেই সময় সেখানে গঙ্গাতীরে নিয়ত তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। দিদিমার মৃত্যুর পূর্ব্বদিন রাত্রে তিনি ঐ চালার নিকবর্ত্তী নিমতলার ঘাটে একখানা চাঁচের উপর বসিয়াছিলেন। মহর্ষির নিজের ভাষায় বলি—"ঐ দিন পূর্ণিমার রাত্রি, চন্দ্রোদয় হইয়াছে, নিকটে শ্মশান। হঠাৎ আমার মনে এক আশ্চর্য্য উদাস ভাব উপস্থিত হইল। আমি যেন আর পূর্ব্বের মানুষ নই! ঐশ্বর্য্যের উপর একেবারে বিরাগ জন্মিল। এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপস্থিত হইল। ভাষা সর্ব্বথা দুর্ব্বল, আমি সেই আনন্দ কিরূপে লোককে বুঝাইব? তাহা স্বাভাবিক আনন্দ, তর্ক করিয়া, যুক্তি করিয়া সেই আনন্দ কেহ পাইতে পারে না। সেই আনন্দ ঢালিবার জন্য ঈশ্বর অবসর খোঁজেন। সময় [illegible] তিনি আমাকে এই আনন্দ দিয়াছিলেন। রাত্রি দুই প্রহরের সময় আমি বাড়ী আসিলাম। সে রাত্রিতে আমার আর নিদ্রা হইল না। এ অনিদ্রার কারণ আনন্দ। সারা রাত্রি যেন একটা আনন্দ-জ্যোৎস্না আমার হৃদয়ে জাগিয়া রহিল।"

পরে এইরূপ স্বাভাবিক আনন্দ পাইবার জন্য তাঁহার পুনঃ পুনঃ চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা আর তিনি পাইলেন না। সেই আনন্দের অভাবে ঘন বিষাদ আসিয়া তাঁহার মনকে আচ্ছন্ন করিল; এই সময়ে তাঁহার মনে কেবলই ঔদাস্য আর বিষাদ। ঈশ্বর তাঁহার মনের মধ্যে এই আনন্দ ঢালিয়াছিলেন, শুধু তাঁহার অনুরাগ বৃদ্ধির জন্য। এই স্বাভাবিক আনন্দ তাঁহার অনুরাগ উৎপাদন করিয়া দিল। কিরূপে আবার সেই আনন্দ পাইবেন, তাহার জন্য তাঁহার মনে বড়ই ব্যাকুলতা জন্মিল।

মহর্ষির পরম সৌভাগ্য—কৈশোরে তিনি রামমোহনের অলৌকিক প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। রাজর্ষির অপূর্ব্ব মুখশ্রী এবং চরিত্র দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করিয়াছিল। মহর্ষি নিজেই বলিয়াছেন:—"ইংলণ্ডে গমন করিবার সময়ে রাজা আমার পিতার নিকটে বিদায় লইতে আসিলেন, আমাদের বাড়ীর সকলে এবং আমাদের অনেক প্রতিবেশী, রাজাকে দেখিবার জন্য আমাদের সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে একত্র হইয়াছিলেন। আমি তখন সেখানে ছিলাম না, তখন আমি সামান্য বালক। তথাচ রাজা আমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি আমার পিতাকে বলিয়াছিলেন যে, আমার হস্তমর্দ্দন না করিয়া তিনি এ দেশ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আমার পিতা আমাকে ডাকাইলেন। তখন রাজা আমার হস্তমর্দ্দন করিয়া ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। রাজা সস্নেহে আমার হস্ত ধারণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাব ও অর্থ তখন বুঝিতে পারি নাই। বয়স অধিক হইলে উহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি।"

মহর্ষি ছিলেন সমদর্শী, প্রকৃত ভক্ত, তাঁর জীবন ছিল দীপ্তিময়, আলোকময়, কোনরূপ সংকীর্ণতা, নীচতা-হীনতা তাঁহাকে কদাপি স্পর্শ করিতে পারিত না। মহর্ষির উদার অসাম্প্রদায়িক ভাবের একটি উদাহরণ মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের ভক্তিযোগ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—"একদিন বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। মহর্ষির টেবিলের উপরে একখানি খৃষ্টধর্ম্মীয় বিখ্যাত গ্রন্থ দেখিয়া তিনি কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। মহর্ষির খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি বিশেষ বিদ্বেষ [illegible] জানিতেন। কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া [illegible]

কারলেন, আপনার টেবিলের উপরে খৃষ্টধর্ম্মীয় এ গ্রন্থ কেন? মহর্ষি উত্তর করিলেন, "পূর্ব্বে যখন ভূমিতে হাটিতাম, তখন কেবল জমির আলি [illegible], এই জমিটুকু একজনের, চারিদিকে আলি বেষ্টিত; এ জমিটুকু অপর একজনের, চারিদিকে আলি বেষ্টিত; এখন কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে উঠিয়া আর আলি দেখিতে পাই না; এখন দেখি সকল জমিই একজনের।"

যুগমানব রামমোহনের পদাঙ্ক অনুসরণপূর্ব্বক তিনি পরব্রহ্মের উপাসনাকে শ্রেষ্ঠ উপাসনা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহর্ষির ভাগবত-জীবনের সকল সাধনার উৎস ছিল অধ্যাত্মযোগ, আধ্যাত্মিক অনুভূতি। তিনি ছিলেন "একান্ত রহসিস্থিতঃ", "ব্রহ্মনিষ্ঠ", "ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণ", "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণিস্থিতঃ।"

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় মহর্ষির সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "সকল কর্ত্তব্য কার্য্যই তাঁহার ঈশ্বরের সত্তা ও সান্নিধ্য জ্ঞানের সহিত করার রীতি ছিল। তিনি যাহা কিছু করিতেন, সকলই পরম ব্রহ্মে সমর্পণ করিতেন। এমন কি বিষয়ের কোন বন্দোবস্ত করিতে গেলেও, তিনি কিছুদিনের মত লোকজন যাতায়াত, দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করিয়া দিয়া ধ্যানস্থ হইয়া বসিতেন এবং মধ্যে মধ্যে বিষয়-সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখিয়া লইতেন। এমনি করিয়াই তিনি ঈশ্বরের সান্নিধ্যে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতেন।"

মহর্ষির অসাধারণ মননশক্তির এবং ধ্যানযোগের নানা বৈচিত্র্যের কেন্দ্র ছিল তাঁহার আধ্যাত্মিকতা। মহর্ষি ছিলেন গীতার আদর্শ পুরুষের সামিল, 'স্থিতধী, স্থিতপ্রজ্ঞ, দুঃখেষনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগত স্পৃহঃ।' গীতার অনাসক্তি যোগ মহর্ষির ভাগবত-জীবনে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি ব্রহ্মোপাসনায় সেই স্তরে পৌঁছিয়াছিলেন, যে অবস্থায় পৌঁছিলে জ্ঞানে, প্রেমে, কর্ম্মে পরম ব্রহ্মই সর্ব্বময় হয়েন।

পিতৃঋণ পরিশোধ ব্যাপারে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্মবুদ্ধি, সত্যনিষ্ঠা ও সাধুতার কথা সর্ব্বজনবিদিত। এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রী মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন, "মহর্ষির নিজমুখে তিনি শুনিয়াছেন, যেদিন দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত করিয়া পাওনাদারদের হাতে দিতে যান, সেদিন তাঁহার বাড়ীতে মহাবিপ্লব উপস্থিত। তাঁহার ছোট কাকা রমানাথ ঠাকুর মহাশয় রাগ করিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া তাঁহাদের বাড়ী হইতে চলিয়া যান। তিনি বলিয়া গেলেন, 'তোমরা পথে দাঁড়াও, আমার কাছে আর যেয়ো না।' দেবেন্দ্রনাথ যাইবার জন্য যখন বাহির বাড়ীতে আসিতেছেন, তখন অন্তঃপুরে স্ত্রীলোকদের কান্নার রোল উঠিল—যেন কাহারও মৃত্যু হইয়াছে। ঘরে বাইরে এই প্রতিবাদের মধ্যে তিনি স্থির থাকিয়া অবিচলিত চিত্তে নিজের কর্ত্তব্য করিয়া গেলেন। বিষয় সম্পত্তির তালিকা তৈরী করার সময় তিনি আপনার হাতের একটি বহুমূল্য আংটি তালিকাভুক্ত করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। বড় লোকের ছেলে, জিনিষপত্র আভরণের তো কোনো অভাব নাই—আংটিটা যে আঙ্গুলে ছিল, তাহা তাঁহার মনেই ছিল না। তালিকা পড়ার সময় তিনি উঠিয়া বলিলেন, এই আংটিটা আমার হাতে আছে, আমার বিষয় সম্পত্তির তালিকার মধ্যে ইহাকেও ধরা উচিত।"

মহর্ষি যথার্থই বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়া সমস্তই দিয়া দিলেন। তিনি জীবনে উপনিষদের যে মন্ত্রগুলি গ্রহণ করিয়াছিলেন—সত্যং—মা গৃধঃ কস্যসিদ্ধনম্—তাহার উপর ভরসা ও শ্রদ্ধা রাখিয়া, শুভবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া অবিকম্পিত হৃদয়ে সত্য ও ন্যায়ের দুর্গম পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। যুগপ্রবর্ত্তক রামমোহনের পন্থার পথিক দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মজ্ঞানের জ্যোতির্ম্ময় দ্যুতি দ্বারা দেশব্যাপী অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের ঘন অন্ধকার দূর করিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছিলেন। যুগ-যুগান্তের পুঞ্জীভূত আবর্জ্জনায় জাতির জীবন-ধারা তখন পঙ্কিল, রুদ্ধস্রোত। তাই তো সত্য শিব সুন্দর-এর উপাসক তত্ত্বান্বেষী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, পাহাড়ে পর্ব্বতে, নদীতে প্রান্তরে কান্তারে সৌন্দর্য্যবিমুগ্ধ থাকিয়া—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্র হইতে অনন্তের তত্ত্ব একান্ত যত্ন ও অভিনিবেশ সহকারে সংগ্রহ করিয়া, তত্ত্বজ্ঞান ও অধ্যাত্ম-সাধনার গঙ্গা ও যমুনার মহাসঙ্গমেই ব্রহ্মধর্ম্মের নূতন প্রয়াগ-তীর্থ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন এবং এই জন্য মহর্ষির ঔরসে রবীন্দ্রনাথের মত পূর্ণ মানবের জন্ম সম্ভব হইয়াছে।

রবীন্দ্র-প্রয়াণে

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আর বাইশে শ্রাবণ
জীবনেরই শুধু ইতি।
কাব্যলোকের নব রস দানে
রেখেছ অমর স্মৃতি।

জাতীয় দেশ-রক্ষাপরিষৎ

শাসনপরিষৎবিস্তারের সহিত আর একটী পরিষদ্‌গঠনের সিদ্ধান্তও গৃহীত হইয়াছে—ইহা দেশরক্ষাপরিষৎ। এই পরিষৎটী এমনভাবে গঠন করার চেষ্টা হইয়াছে, যাহাতে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ, সম্প্রদায় ও জনশ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। পরিষদের দুই মাস অন্তর গোপন বৈঠক বসিবে, সে অধিবেশনের সভাপতি থাকিবেন বড়লাট এবং তিনি ইচ্ছা করিলে ও প্রয়োজন বুঝিলে, শাসনপরিষদের সভ্য ও অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীদেরও বৈঠকে আহ্বান করিতে পারিবেন। এই সকল বৈঠকে যুদ্ধের যথার্থ অবস্থা সম্বন্ধে নিঃসঙ্কোচে সকল আলোচনাই হইবে।

দেশরক্ষা-পরিষদের সভ্যসংখ্যা স্থির হইয়াছে প্রায় ৩০ জন। দেশীয় রাজন্যবৃন্দের প্রতিনিধি, বাংলা, পঞ্জাব, সিন্ধু ও আসাম প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী, কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যবসায়প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এই পরিষদে আছেন। আর আছেন স্বয়ং দ্বারভঙ্গেশ্বর মহারাজাধিরাজ কামেশ্বর সিং কে-সি-এস্-আই, ছত্রীর নবাব স্যার মহম্মদ আহ্মেদ সৈয়দ খাঁ কে-সি-এস্-আই, কে-সি-আই-ই, &c, প্রমুখ কয়েক জন দেশীয় নৃপতি এবং বেগমশা নওয়াজ, যিনিই একমাত্র নারী সদস্যা। হরিজন সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে ডাক্তার আম্বেদকরও নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—যদিও তিনি বড়লাটের শাসনপরিষদে কোনও হরিজন প্রতিনিধি না গ্রহণ করায় অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন এবং বিলাতে তীব্র প্রতিবাদ পাঠাইয়াছেন। মোটের উপর, এই সকল সদস্যকে লইয়াই দেশরক্ষা সংসৎটীর জাতীয় আখ্যা অর্থপূর্ণ করার চেষ্টা হইয়াছে। পরিষদের কার্য্য শীঘ্রই আরম্ভ হইবে, শুনা যাইতেছে।

আমরা দেখিতেছি যে, কেন্দ্রীয় শাসনপরিষদে শ্রীযুক্ত রাঘবেন্দ্র রাও-এর উপর যে দেশরক্ষা দপ্তরের ভার দেওয়া হইয়াছে, উহা সম্পূর্ণ দেশরক্ষা বিভাগ নয়, সিভিল ডিফেন্স অর্থাৎ অসামরিক দেশরক্ষা মাত্র। সামরিক বা মিলিটারী ডিফেন্সের কর্তৃত্ব স্বয়ং জঙ্গীলাটের উপরই রাখা হইয়াছে। নূতন জঙ্গীলাট স্যার আর্চিবল্ড ওয়েভেল সাহেব অবশ্য উচ্চ ব্যবস্থাপরিষদের পাঁচ জন ও নিম্ন ব্যবস্থাপরিষদের ছয় জনকে লইয়া একটা সমরপরামর্শসমিতি গঠন করিয়াছেন। ইহার উপর এই ন্যাশনাল ডিফেন্স কাউন্সিল গঠনের উদ্দেশ্য—বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সমরপরিচালনায় যাহাতে অধিক সংখ্যক বে-সরকারী ভারতবাসীর সহযোগিতা পাওয়া যায়, তাহারই ব্যবস্থা করা ছাড়া অন্য কিছু নহে। তবে শাসনপরিষদের উপরোক্ত প্রকার বিস্তৃতি গঠনতন্ত্রের নিয়মানুযায়ী লোকমতের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায়, জাতির পক্ষ হইতে উহা যথেষ্ট সহানুভূতি ও সমর্থনলাভে সমর্থ হইবে না, ইহা অনুমান করিয়াই, জাতীয় দেশরক্ষা সংসদ্‌গঠনের দ্বারা সে অভাব কথঞ্চিৎ পূরণ করার একটা সময়োপযোগী কৌশল অবলম্বন করা হইয়াছে। এই রাজনৈতিক কৌশল যে আশানুরূপ সাফল্যলাভ করিবে না, ইহা পূর্ব্বাহ্নেই বুঝা যাইতেছে। কেননা, জাতীয় দেশরক্ষাপরিষৎ ভারতবাসীকে শুধু শাসনকর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেওয়ার সুযোগ আনিয়া দিয়াছে, আসল দেশরক্ষায় দায়িত্বের অংশ কিছুই তাহাদিগকে অর্পণ করিতেছে না। এই অবস্থায়, পরিস্ফীত শাসনপরিষদের ন্যায় এই জাতীয় দেশরক্ষাপরিষৎও ভারতের অন্তরে যথার্থ আশা ও উৎসাহ সঞ্চার করিবে না।

মডারেট বৈঠক

পুণায় মডারেট বৈঠকে ধীরপন্থী নেতা স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু ঠিক এই কথাই মুখ ফুটিয়া বলিয়াছেন। তাঁহার কথা "কেন্দ্রীয় শাসনপরিষদে গভর্ণমেণ্ট যে আট-জন ভারতীয় সদস্যকে মনোনীত করিয়াছেন, তাঁহাদের যে কেহই অর্থবিভাগ, স্বরাষ্ট্র-বিভাগ ও দেশরক্ষাবিভাগের এক একটির ভার গ্রহণ করিতে পারিতেন; কিন্তু [illegible] সত্ত্বেও তাঁহাদিগকে সে ভার দেওয়া হয় [illegible]

একমাত্র কারণ—গভর্ণমেণ্ট ভারতবাসীকে ঐ দায়িত্ব-ভার দিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন না।"

ভারতের কি ধীরপন্থী, কি চরমপন্থী [illegible] কি মুসলীম লীগ—সকলেই শাসক জাতির এই আস্থাটুকুই ভারতের পক্ষ হইতে নানাচ্ছলে দাবী করিতেছেন। চাহিবার ভঙ্গী বিচিত্র এবং বিভিন্ন হইলেও, উহার মূল উদ্দেশ্য অন্য কিছু নহে—দেশের শাসনকার্য্যে অর্থাৎ আত্মশাসনে ও আত্মরক্ষায় দায়িত্বগ্রহণ। কিন্তু বৃটিশরাজ এইখানেই ভারতবাসীকে যেন কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। আমাদের ধারণা, এই বিশ্বাস অর্জ্জন করার একটিমাত্র উপায় আছে, উহা প্রতিবাদ নয়, নিষ্ক্রিয় বা সক্রিয় প্রতিরোধ নয়, উহা স্বাধিকারের জন্য রক্তমোক্ষণ। যুদ্ধ আজ উপলক্ষ। ভারতের যে অংশ আজ স্বাধিকার লক্ষ্যে রাখিয়া এই মহাযুদ্ধে রক্তমোক্ষণে যতখানি অগ্রসর, সেই অংশ ততখানি দায়িত্বপ্রাপ্তির যোগ্যতা ও আস্থা যুগবৎ অর্জ্জন করিবে। এই জন্য রাজনৈতিক কথা ও যুক্তিতর্ক ছাড়িয়া, আমরা ভারতবাসীকে সামরিক শিক্ষা ও সাধনায় সমধিক পরিমাণে যোগদান করিতে আহ্বান করিব। এই আহ্বান মহাকালের কণ্ঠ হইতেই আজ মুহুর্মুহু রণিত হইতেছে। তরুণ ভারতই এ আহ্বানে সাড়া দিতে পারে।

হিন্দু ব্যবস্থাবিধির সংস্কার

গত ১৯৩৭ সালে হিন্দু নারীর দায়াধিকার সম্পর্কে যে আইন প্রণীত হয়, তাহা এরূপ ত্রুটিযুক্ত ছিল যে, পরবৎসরেই তাহার সংশোধনের প্রয়োজন অনুভূত হয়; কিন্তু ১৯৩৮ সালে সেই সংশোধিত বিলেও ত্রুটিশূন্য না হওয়ায়, ইহার পুনঃ সংশোধন সম্বন্ধে বিবেচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক একটি কমিটী নিযুক্ত হয়। এই কমিটীর সভাপতি স্যার বি-এন রাও এবং সদস্য ডাঃ দ্বারকানাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত ঘরপোরে, পুণা ল-কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ও বরোদার বাসুদেব বিনায়ক যোশী। সম্প্রতি এই রাও-কমিটী আলোচনান্তে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, জোড়াতালি দিয়া কাজ হইবে না—একটা আমূল নূতন "কোড" অর্থাৎ হিন্দু সমাজের [illegible] রচনা করিতে হইবে, কেননা, হিন্দু সমাজ [illegible] পরস্পর অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধযুক্ত যে, খণ্ড খণ্ড ভাবে আইনের ত্রুটি সংশোধন করিতে গেলে সবটাই অতিশয় জটিল হইয়া পড়ে। এই মর্ম্মেই কমিটী প্রস্তাব করিয়াছেন যে, "এই নূতন কোডে উত্তরাধিকার বিধি বোধায়নের মতের উপর না হইয়া জৈমিনী মতের উপর সংঘটিত হউক। পরিণয় বিধি মনুর মতানুবর্ত্তী সর্ব্বোত্তম যে বিবাহ-পদ্ধতি, তদনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হউক। সমাজে নারী-পুরুষের সমান মর্য্যাদা স্বীকৃত হউক। অর্থাৎ এক কথায় হিন্দুর যে সকল বিভিন্ন সামাজিক অনুশাসন-শাস্ত্র আছে, তাহা হইতে বাছাই করিয়া উৎকৃষ্ট নব্য ব্যবহারবিধি সঙ্কলিত হউক।"

রাও কমিটীর এই মন্তব্য কিরূপ গুরুত্বপূর্ণ, তাহা চিন্তাশীল হিন্দুমাত্রেই নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করিবেন; কিন্তু এই মন্তব্য কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে, সমগ্র হিন্দু সমাজের মধ্যে যে একটা অভাবনীয় বিলোড়ন উপস্থিত হইবে, ইহাও অবধারিত। আর্য্য ভারতের সমাজবিধান গড়িয়াছে ঋষির প্রতিভা ও মনীষায়—মনুর ন্যায় একচ্ছত্র সম্রাট তাহা রাজকীয় ক্ষমতাপ্রয়োগে সমাজে প্রবর্ত্তন করিতে সহায়তা করিয়াছেন। আজ সিদ্ধ শাস্ত্র-বুদ্ধির সহিত অমিশ্র ভারতীয় প্রতিভায় অনুপ্রাণিত রাজ-শক্তির সহায়তা ও সহযোগিতা দুইয়েরই অভাব আমরা পরিলক্ষ্য করিতেছি। কাজেই কমিটীর "কোড"-রচনার পরিকল্পনা বর্ত্তমান মিশ্রবুদ্ধি ও মিশ্রশক্তির উপর নির্ভর করিয়া কত দূর কল্যাণপ্রসূ হইতে পারিবে, সে সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট দুর্ভাবনা আছে। ঋষিদৃষ্টির কথা ছাড়িয়া দিলেও ভারতে রঘুনন্দনের ন্যায় নব্য-স্মৃতি-কারের আবির্ভাব আজ প্রয়োজনীয় যদি হইয়া থাকে, আমরা তাহার লক্ষণ অবশ্যই দেখিতে পাইব। আমাদের বিশ্বাস, হিন্দু সমাজের আত্মসাধনার উপরই ইহা নির্ভর করে। এই সমাজ-সমষ্টিপুরুষেরই জাগরণ প্রতীক্ষা করি। রাও কমিটীর অভিমত হিন্দুর এই সমষ্টিসত্তার দিক্ হইতে কি সাড়া তুলে, আমরা সেই দিকেই উপস্থিত চাহিয়া থাকিব। গভর্ণমেণ্টকেও এই ক্ষেত্রে আমরা অতিশয় সতর্কতা ও বিবেচনার সহিত কর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

সাময়িকী

স্বাদেশিক সংবাদ

প্রফুল্ল জয়ন্তী :

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ৮১তম জন্মতিথি উপলক্ষে শনিবার ১৭ই শ্রাবণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে মহাসমারোহে প্রফুল্ল জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় সভার পৌরোহিত্য করেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও নারী সমাজের পক্ষ হইতে আচার্য্যদেবকে মানপত্র অর্পণ করা হয়। বিপুল জন-

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

সমাগমে সুবিস্তৃত সেনেট হলে তিল ধারণের স্থান ছিল না। দেশবাসীর হৃদয়ে আচার্য্যদেব যে প্রকৃত প্রীতি ও শ্রদ্ধার আসন অধিকার করিয়াছেন, তাহা তাঁহার জয়ন্তী উৎসবে সম্যক পরিস্ফুট হইয়াছিল।

মানপত্রের উত্তরে আচার্য্যদেব বলেন—

"অন্তহীন অভাবের তীব্র জ্বালা যাদের নিত্য সহচর আমি তাদেরই একজন। আমাকে অভিনন্দিত করে অভিনন্দন জানালে তোমরা নির্য্যাতিত জনগণকে। যখন আমি থাকব না, তখন যদি একজনও আমাকে স্মরণ করে, তবেই হবে আমার জীবনের সার্থকতা। আমার দিন যখন ফুরিয়ে যাবে তখন আমি যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকতে চাইব তাদেরই মাঝে যারা অন্যায়, অত্যাচার, দারিদ্র্য ও অশিক্ষার বিরুদ্ধে চলবে সংগ্রাম করে—যতদিন না আমার দেশজননীর ললাট থেকে মুছে যায় এই কলঙ্ক-কালিমা।"

বর্দ্ধমান মহারাজাধিরাজের পরলোকগমন :

গত ১২ই ভাদ্র শুক্রবার অপরাহ্নে পাঁচ ঘটিকার সময় বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয়চাঁদ মহাতাব তাঁহার বর্দ্ধমানের প্রাসাদে পরলোকগমন করিয়াছেন। গত দুই মাস তিনি অল্প জ্বর ও [illegible] রোগে ভুগিতেছিলেন। শুক্রবার প্রাতে তিনি আপনাকে কিছু সুস্থ বোধ করিয়া বিকাল ৪॥০টা পর্য্যন্ত অফিসের কাজ করেন। অতঃপর তিনি অসুস্থ বোধ করেন এবং প্রায় পাঁচটার সময় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার ফলে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুকালে তাঁহার ৬১ বৎসর বয়স হইয়াছিল। মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয়চাঁদ শিক্ষিত ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি 'ষ্টাডিস' নামে একখানি ইংরাজী গ্রন্থ, 'বিজয়-গীতিকা' নামক একটি বাঙলা গীতিকাব্য ও আরও কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। তিনি মহারাণী, মহারাজকুমার উদয়চাঁদ মহাতাব (এম, এ, এ) ও মহারাজকুমার অভয়চাঁদ মহাতাব এই দুই পুত্র [illegible] মহারাজকুমারী সুধারাণী দেবী ও মহারাজকুমারী [illegible] দেবী নাম্নী দুই কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

মহিলার কৃতিত্ব :

এই বৎসর নমঃশূদ্র জাতির কুমারী সুষমা মল্লিক বি, এস্.সি এবং কুমারী সুশীলা মণ্ডল ইতিহাসে সেকেণ্ড ক্লাসে অনার্স নিয়া বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন। তপশীলভুক্ত জাতির মধ্যে ইঁহারাই প্রথম নারী গ্র্যাজুয়েট্।

অবনীন্দ্রনাথের জন্মতিথি উৎসব :

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অন্তিম ইচ্ছানুসারে [illegible] ভাদ্র শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের ৭০তম জন্মোৎসব এবং প্রশান্ত মর্য্যাদার সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে চারি দিবসব্যাপী একটি প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল [illegible]